সচিত্র

মাসিক বসুমতী

২২শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৫০ সাল— কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক' রোটাঃ

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২২শ বর্ষ] ১৩৫০ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

দুষ্মন্ত-শকুন্তলা

কার্তিক, ১৩৪০] [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

২২শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫০ | ১ম সংখ্যা

সংস্কৃতনাট্যে প্রহসন

৩

দর্পণকার বলিয়াছেন—'ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্'—কবিকল্পিত নিন্দনীয় চরিত্র হইবে প্রহসনের উপাদান। নাটকে থাকিবে—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার সমাবেশ, আর প্রহসনে কবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত নিন্দনীয় চরিত্র চিত্রণ করিয়া হাস্যরসকে ফুটাইয়া তুলিবেন। কবি আপনার রুচি অনুসারে যাহা নিন্দনীয় মনে করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রহসন-সৃষ্টি করিতে পারিবেন। ইহার ফলে সংস্কৃতনাট্যের প্রহসনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এক একটি শতাব্দীর এক একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা—প্রহসনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া তৎকালের সাক্ষ্য দিতেছে। 'লটকমেলকে' তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে আর একখানি সুলিখিত প্রহসনের পরিচয় আমরা পাই। তাহার নাম 'মত্তবিলাসম্'। ইহা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্ম নামক নরপতি-প্রণীত। মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মার রাজত্বকাল সম্বন্ধে—কথিত আছে যে, তিনি খৃষ্টীয় ৬০০ শতাব্দী হইতে ৬২৫ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি পল্লবকুলসম্ভূত শ্রীসিংহবিষ্ণু বর্ম্মার পুত্র। কাঞ্চী ইঁহার রাজধানী ছিল। পিতৃনামে এবং তাঁহার পরিচয়ে তিনি যে এক জন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, ইহা অনুমান করা যায়।* শুধু বিষ্ণুভক্ত নহেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এ জন্য ভরতবাক্যে বলিয়াছেন যে—

শশ্বদ্‌ভূত্যৈ প্রজানাং বহতু বিধিহুতামাহুতিং জাতবেদা
বেদান্ বিপ্রা ভজন্তাং সুরভিদুহিতরো ভূরিদোহা ভবন্তু।
উদ্‌যুক্তঃ স্বেষু ধর্ম্মেষ্বয়মপি বিগতব্যাপদাচন্দ্রতারং
রাজস্থানস্তু শক্তিপ্রশমিতরিপুণা শত্রুমল্লেন লোকঃ॥

প্রজাদিগের নিত্য কল্যাণের জন্য, অগ্নিদেব বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করুন—ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন করুন—ধেনুগণ বহু দুগ্ধ প্রদান করুন আর এই লোকসমূহ নিজ ধর্ম্মে উদ্যমশীল থাকিয়া চন্দ্রতারার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিপদ-রহিত হইয়া থাকুন। নিজশক্তি দ্বারা শত্রুদমনকারী মহেন্দ্রবিক্রম দ্বারা লোক সুরাজ-সৌভাগ্য লাভ করুক।

ভগবদজ্জুকীয় এবং মত্তবিলাস প্রহসনের বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে,—উভয় গ্রন্থই এমন একটি সময়ে লিখিত হইয়াছিল—যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় দেখা দিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের—চরিত্রগত অবনতির চিত্র হাস্যরসের বিষয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ভগবদজ্জুকে—কেবলমাত্র একটি সাধারণ বৌদ্ধ শিষ্যের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে—মত্তবিলাসে কাপালিক ও তাহার স্ত্রী, এক শাক্যভিক্ষু, পাশুপত ও উন্মত্তক এই পাঁচটি প্রধান ভূমিকা গৃহীত হইয়াছে,* ইহারা

* প্রজ্ঞাদানদয়ানুভাবধৃতয়ঃ কান্তিঃ কলাকৌশলং
সত্যং শৌর্য্যমমায়িতা বিনয় ইত্যেবং প্রকারা গুণাঃ।
অপ্রাপ্তস্থিতয়ঃ সমেত্য শরণং যাতা যমেকং কলৌ
কল্পান্তে জগদাদিমাদিপুরুষং সর্গপ্রভেদা ইমে॥

প্রজ্ঞা, বদান্যতা, দয়া, ধৃতি, কান্তি, কলাকৌশল, সত্য, শৌর্য্য, অমায়িকতা ও বিনয়—এই প্রকার গুণ সমূহ—নিরাশ্রয় হইয়া কলিতে একমাত্র যাহাকে—আশ্রয় করিয়া আছে। যেমন কল্পশেষে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তু নিরাধার হইয়া একমাত্র জগতের আদিভূত আদিপুরুষ (নারায়ণ)কে আশ্রয় করে।

* কেহ কেহ মনে করেন যে, ভগবদজ্জুক ও মত্তবিলাস একই কবি কর্ত্তৃক রচিত। ভগবদজ্জুক গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, মত্তবিলাসে মহেন্দ্র বর্ম্মার নামই উল্লিখিত আছে। মামন্দুর

সকলেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিরোধী। কাপালিকের নাম কপালী। কাপালিকগণ যে বৌদ্ধ তন্ত্রমার্গে উপাসনাপরায়ণ, তাহা বহু মনীষীর স্বীকৃত।

'মত্তবিলাসম্' প্রহসনের প্রথমে দেবসোমা নামিকা স্ত্রী সহ কপালীর প্রবেশ। কপালী এত মদিরা পান করিয়াছে যে—টলিতে টলিতে আসিতেছে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিতেছে যে—তপস্যা দ্বারা যে কামরূপতা (যথেচ্ছ রূপ ধারণ করিবার শক্তি) লাভ করা যায়, তাহা সত্যই, কেন না, তুমি যে পরম ব্রত যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার কি রূপই না ফুটিয়াছে! চন্দ্রবদনে ঘর্ম্মবিন্দু—কুঞ্চিত ভ্রূলতা, অকারণ হাস্য, অস্পষ্ট বাণী, রক্তবর্ণ চক্ষু, ঘূর্ণিত তারা, আর কেশদাম শিথিল হইয়া ঝুলিতেছে!

দেবসোমা বলিল—প্রভু! আমাকে যেন মাতাল—মাতালের মত বর্ণনা করিলেন!

কপালী জিজ্ঞাসা করিল—কি বলিলে?

দেবসোমা—না, কিছু বলিনি ত'?

কপালী। আমি মাতাল হইয়াছি?

দেবসোমা। কে এ কথা বলে? প্রভু, পৃথিবী যেন ঘুরিতেছে—পড়িয়া যাই—ধরুন, আমাকে এখনই ধরুন।

কপালী। প্রিয়ে! এই ধরি! (ধরিতে যাইয়া নিজেই পড়িয়া গেল) প্রিয়ে! তুমি কি কুপিতা হইয়াছ—নহিলে—আমি ধরিতে যাইলে তুমি আগে চলিয়া যাও কেন? দেবসোমা বলিল—কুপিতা হইয়াছে সোমদেবী (সোমরসজাত সুরা দেবী), যাহাকে আপনি প্রণাম করিয়া অনুনয় করিলেও দূরে চলিয়া যাইতেছে।

কপালী। যা'ক, আজ হইতে আমি মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

দেবসোমা। প্রভু! আমার জন্য আপনি ব্রতভঙ্গ করিয়া তপস্যা নষ্ট করিবেন না, (পায়ে ধরিল)।

কপালী সানন্দে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল—নমঃ শিবায়। প্রিয়ে!

> সুরাপান—প্রিয়তমা-মুখ নিরীক্ষণ।
> সুললিত বেশ কিংবা কুবেশ ধারণ।
> এমন মোক্ষের পথ দেখালেন যিনি।
> দীর্ঘজীবী হ'ন দেব সে পিনাকপাণি।*

দেবসোমা। প্রভু, জৈনরা কিন্তু মোক্ষের পথ অন্যরূপে বর্ণনা করে!

কপালী। প্রিয়ে! তা'রা মিথ্যাদর্শী, কেন না,—

> "কার্য্য ও কারণ—দু'য়ে হ'বে নিঃসংশয়
> সমরূপ"—যুক্তিবলে করিয়া প্রমাণ।
> কষ্টকর কর্ম্ম হ'তে সুখের উদয়?
> নিজ বাক্য বিরোধেতে তারা হতমান!*

দেব। পাপ কথায় আর কাজ নাই।

কপালী। ঠিক বলিয়াছ—নিন্দার জন্যও তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে নাই, চল, এই পাপ ক্ষালনের জন্য মদ্য দ্বারা জিহ্বাটা ধুইয়া ফেলিতে সুরার আপণে যাই।

উভয়ে সুরার আপণে আসিয়া সুরার প্রশংসা করিতে করিতে আসিতে লাগিল, এ-দিকে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে পথে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। নেপথ্যে এক জন ভিক্ষা প্রদানে উদ্যত হইল কপালী তাহার ভিক্ষাপাত্র খুঁজিয়া পাইল না; ভিক্ষাপাত্র ছিল একখানি কপাল (মড়ার মাথার খুলি) তাহা না পাওয়ায় আপদ্ধর্ম্মরূপে একটি গোশৃঙ্গের মধ্যে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিল।

কপালীর মনে হইল—বোধ হয় কপালখানি সুরার আপণে ফেলিয়া আসিয়াছে। দূর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—উত্তর পাইল যে,—না—আপণে ফেলিয়া আসে নাই। তখন তাহার আশঙ্কা হইল যে, সে ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে শূল্য মাংস ছিল, সুতরাং তাহা হয় কুকুরে না হয় কোন বৌদ্ধভিক্ষু লইয়া গিয়াছে কাপালিকের সঙ্গে সর্ব্বদা কপাল থাকা চাই, নতুবা তাহার তপস্যা ভ্রংশ হইবে। তাই দেবসোমা বলিল—প্রভু, সমস্ত কাঞ্চীপুর অন্বেষণ করিতে হইবে।

কপালী বলিল—নিশ্চিত!

এই সময়ে এক বৌদ্ধভিক্ষু মৎস্যমাংসাদিযুক্ত ভোজ খাইয়া আনন্দে কাঞ্চীর পথে চলিয়াছে। আর বলিতেছে—পরমকারুণিক সর্ব্বজ্ঞ তথাগত মৎস্যমাংসাদির ব্যবস্থা দিলেন—আর নারী-সম্ভোগ ও সুরাপানের বিধান করিলেন না কেন? তিনি নিশ্চিতই বিধান দিয়াছিলেন; আমার মনে হয়, কোন কোন দুষ্ট বৃদ্ধ স্থবির আমাদের মত তরুণদিগের উপর বিদ্বেষ বশতঃ এই বিধানগুলি পিটক গ্রন্থ হইতে মুছিয়া দিয়াছে। যাহা হইতে মূলপাঠ নষ্ট হয় নাই, এমন একটি সম্পূর্ণ বুদ্ধোপদেশ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সঙ্ঘের উপকার করিব।

এমন সময়ে দেবসোমা বলিল—দেখ দেখ, প্রভু—এই রক্তবস্ত্র-পরিহিত ভিক্ষু যেন একটু শঙ্কিত ভাবে পাদবিক্ষেপ করিয়া ত্বরিত গতিতে চলিয়াছে।

কপালী দেখিয়া বলিল—প্রিয়ে, তাই ত? এর চীবরে আবৃত হস্তে একটা কিছু আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

তাম্রশাসনে দেখা যায় যে···গবদজ্জুক মত্তবিলাসাদি···ইহার পর অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এই তাম্রশাসনে 'গবদজ্জুক' যে ভগবদজ্জুক, তাহা বুঝিতে পারা যায়, ভগবদজ্জুক ও মত্তবিলাস একত্র যুক্ত থাকায় একই গ্রন্থকারের দুইখানি গ্রন্থ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তবে, উক্ত তাম্রশাসনের অবশিষ্টাংশ বিলুপ্তাকার হওয়ায় প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হওয়া দুষ্কর।

* মূলের শ্লোকটি এই

> পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষিতব্যং
> গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
> যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষবর্ত্ম
> দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবন্ স পিনাকপাণিঃ॥

* কার্য্যস্য নিঃসংশয়মাত্মহেতোঃ
> সরূপতাং হেতুভিরভ্যুপেত্য।
> দুঃখস্য কার্য্যং সুখমামনন্তঃ
> স্বেনৈব বাক্যেন হতা বরাকাঃ॥

দেবসোমা। প্রভু—উহাকে ধর—ধর।

কপালী বলিল—ওহে ভিক্ষু, দাঁড়াও।

ভিক্ষু সেই কাপালিককে দেখিয়া ভয়ে আরও ত্বরায় চলিতে লাগিল।

কপালী বলিল—এর নিকট নিশ্চিতই আমার কপাল আছে—নতুবা আমার ভয়ে এত ত্বরায় যাইবে কেন ?

(দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া) ধূর্ত্ত ! এখন যাইবে কোথায় ?

ভিক্ষু বলিল—এ কি ? এরূপ করিও না।

কপালী। তোমার বস্ত্রে আবৃত কি আছে—দেখাও !

ভিক্ষু। এ আবার দেখিবে কি ? ভিক্ষাপাত্র আছে।

কপালী। এই জন্যই ত' দেখিতে চাই।

ভিক্ষু। উপাসক ! ইহা যে গোপনে লইয়া যাইতে হয়।

কপালী। এইরূপ প্রচ্ছাদনের সুবিধার জন্যই বোধ হয় বুদ্ধদেব—বহু বস্ত্র পরিধানের উপদেশ দিয়াছেন !

ভিক্ষু। সত্যই তাই।

কপালী। অরে ধূর্ত্ত ! আমার কপালখানি দাও দেখি !

ভিক্ষু। তোমার ভিক্ষাপাত্র আমি কোথায় পাইব ?

দেবসোমা। প্রভু, কেবল প্রার্থনায় দিবে না, হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে।

কপালী তাহার হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র কাড়িতে উদ্যত হইল, ভিক্ষু পদাঘাতে তাহাকে ফেলিয়া দিল।

কপালী তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল—ইতিমধ্যে এক পাশুপত আসিয়া পড়িল।

কপালী তাহাকে জানাইল যে, এই ভিক্ষু তাহার ভিক্ষাপাত্র অপহরণ করিয়াছে।

পাশুপত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিল—ইহা কি সত্য ?

ভিক্ষু তখন বুদ্ধের শিক্ষাপদ আবৃত্তি করিল, অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরত হইবে, মিথ্যাভাষণ হইতে বিরত হইবে—অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরত হইবে—প্রাণবায়ুর অতিশয় ক্ষয়কর কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে, অকাল-ভোজন হইতে বিরত হইবে—এইগুলি শিক্ষাপদ; বুদ্ধধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি। *

পাশুপত বলিল—ইহাদের যখন এরূপ আচার, তখন আর কি বলা যাইতে পারে।

কপালী। আমাদেরও আচার—মিথ্যা না বলা।

পাশুপত। তাহা হইলে এখন নির্ণয়ের উপায় কি ?

কপালী। বস্ত্রে আচ্ছাদিত ভিক্ষাপাত্রটি দেখাইলেই নির্ণয় হইতে পারে।

ভিক্ষু তখন তাহা দেখাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পাত্রটির বর্ণ কিরূপ ছিল ?

কপালী। বর্ণ বলিয়া লাভ কি—আমি দেখিয়াছিলাম—বস্ত্রমধ্যে ইহা কাক অপেক্ষাও কালবর্ণের কপাল ছিল।

ভিক্ষু। এটা যখন কাষায় বর্ণের, তখন যে আমার, ইহা ত' তুমিই স্বীকার করিতেছ।

কপালী। স্বীকার করিতেছি যে,—বর্ণ বদলাইয়া দিতে তোমার বেশ নৈপুণ্য আছে !

দেবসোমাও বিশ্বাস করিল যে,—তাহাদের শুভ্রবর্ণের কপালখানি গেরুয়াবর্ণের হইয়াছে—এই ভিক্ষুর এমন কৌশল জানা আছে। সে তখন কাঁদিতে বসিল।

কপালী তাহাকে সান্ত্বনা দিল। পাশুপত তখন ব্যবহারালয়ে যাইবার জন্য উপদেশ দিতেই দেবসোমা বলিয়া উঠিল—আমাদের আর কপালে প্রয়োজন নাই। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু অনেক বিহার হইতে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে—ব্যবহারালয়ের কারুণিকদিগের মুখ পূরাইতে ইহার শক্তি আছে, আমরা দরিদ্র, আমাদের সে শক্তি নাই। অতএব আর কপালে কাজ নাই।

এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেল।

তৎপরে কাঞ্চীর পথে এক জন উন্মত্ত একটা কুকুরের পশ্চাতে দৌড়াইয়া যাইতেছে ও বলিতেছে—এই দুষ্ট কুকুরটা শূল্য মাংসপূর্ণ একটা কপাল মুখে করিয়া দৌড়াইতেছে। আরে বেটা, কোথায় যাইবি ? এই পাথর দ্বারা তোর দন্ত ভাঙ্গিয়া দিব। এইবার বেটা পলাইয়া গেল—ইহার ভুক্তাবশিষ্ট মাংসটা এইবার খাইব।

ইতিমধ্যে কতকগুলি বালক তাহাকে দূর হইতে ইষ্টক দ্বারা মারিতে লাগিল।

এ দিকে পাশুপত, ভিক্ষু, কপালী ও দেবসোমা সেই পথে আসিয়া পড়িল।

উন্মত্ত তাহাদিগকে দেখিয়া পাশুপতকে নিজ আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিল এবং বলিল—মহাশয় ! এক চণ্ডালের কুকুরের নিকট হইতে এই কপালখানি পাইয়াছি গ্রহণ করুন। পাশুপত বলিল—পাত্রে দান কর। উন্মত্ত ভিক্ষুকে দান করিতে উদ্যত হইল। ভিক্ষু কপালীকে দেখাইয়া বলিল—ইনি মহাপাশুপত—এটা ইহারই যোগ্য।

উন্মত্ত তখন কপালখানি মাটীতে রাখিয়া কপালীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল—মহাদেব ! অনুগ্রহ করুন—।

কপালী বলিল—এটা আমাদের কপাল।

দেবসোমা তাহাতে সম্মতি জানাইল।

কপালী সাগ্রহে যেমন কপালখানি তুলিয়া লইবে, অমনি উন্মত্ত গালি দিয়া বলিয়া উঠিল—বেটা ! বিষ খা—এই বলিয়াই কপালখানি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কপালী পিছু পিছু দৌড়াইয়া বলিল—ওরে—দাঁড়া দাঁড়া। সে দাঁড়াইল—তখন পাশুপত ও ভিক্ষু তাহার সহিত আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। উন্মত্ত বলিল—কেন আমায় আটকাইতেছিস্।

কপালী বলিল—আমার কপালখানি দিয়া চলিয়া যাও।

উন্মত্ত বলিল—অরে মূর্খ, দেখছিস্ না—এটা যে সোণার পাত্র।

ভিক্ষু বলিল—কি বলিলে ?

উন্মত্ত বলিল—এটা যে সোণার পাত্র।

ভিক্ষু বলিল—এটা উন্মত্ত ?

---

* অদত্তাদানাদ্ বিরমণং শিক্ষাপদম্
মৃষাবাদাদ্বিরমণং শিক্ষাপদম্।
অব্রহ্মচর্য্যাদ্বিরমণং শিক্ষাপদম্।
প্রাণাতিপাতাদ্বিরমণং শিক্ষাপদম্
অকালভোজনাদ্বিরমণং শিক্ষাপদম্।
অস্মাকং বুদ্ধধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
ভগবদজ্জুকীয় প্রহসনেও এই শিক্ষাপদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

উন্মত্ত বলিয়া উঠিল—উন্মত্ত—উন্মত্ত এ কথা বহু বার শুনিলাম—এটা গ্রহণ করিয়া উন্মত্তের স্বরূপটা দেখাইয়া দাও। এই বলিয়া কপালীকে কপাল প্রদান করিল এবং নিজে প্রস্থান করিল। সেই মড়ার মাথার খুলিখানি পাইয়া কপালী পরম আনন্দলাভ করিল।

প্রহসনের সমাপ্তি এইখানে।

এই প্রহসনে আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ একখানি মড়ার মাথার খুলি লইয়া এরূপ চরিত্র সৃষ্টি দেখিলে বিদেশীয় মনীষিগণের মনে খুবই বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাবে কাপালিক পাশুপত সম্প্রদায়, বৌদ্ধভিক্ষুসমূহ এবং উন্মত্তক (অঘোরপন্থী)দিগের নিকট এই কপাল যে স্বর্ণপাত্রবৎ মহামূল্য ছিল, তাহা এই প্রহসনেই সূচিত হইয়াছে। তৎকালে এই সম্প্রদায় হইতে দর্শনশাস্ত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছিল এবং বর্ণাশ্রমী নৈয়ায়িকগণের সহিত এই কপালের শুচিত্ব বা অশুচিত্ব লইয়া বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। 'নরশিরঃ কপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ' ইত্যাদি অনুমানের আকার আজ ন্যায়শাস্ত্রের অঙ্গে স্থান পাইয়া অতীত যুগের কপাল-ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সূচনা করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান দৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ হইলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইহা খুবই কৌতুকাবহ ছিল।

উন্মত্তক—অঘোরপন্থীদিগেরই নামান্তর। এ জন্য কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে কোন আপত্তি নাই বা মড়ার মাথায় ভোজন করিতেও কোন দ্বিধাবোধ নাই। মোটের উপর এই প্রহসনখানি পাঠ করিলে তাৎকালিক একটি অপূর্ব্ব চিত্র চক্ষুতে ভাসিয়া উঠে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

বৈষ্ণবমত-বিবেক
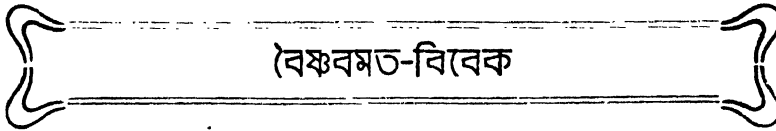
[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভীষ্ট লাভ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের, শ্রীগোবিন্দের ও শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আরও অনেকগুলি ছোট-বড় দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং শ্রীবৃন্দাবন একটি ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিবার পর শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কার হওয়ায় এবং দাস-গোস্বামীর কঠোর ভজনের পরাকাষ্ঠা দর্শনে অনেক ভক্ত বৈষ্ণবই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সুপ্রসিদ্ধ সেবার ভার শ্রীল দাস-গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের গুরু ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথের উপর সমর্পণ করায় এই স্থান শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অবস্থানের একটি উপনিবেশরূপে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীবিঠ্ঠলনাথ গোবর্দ্ধন সন্নিকটস্থ পাঁচুনি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহই শ্রীব্রজমণ্ডলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বপ্রথম বিগ্রহ। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে পরম আগ্রহভরে এই স্থানে আগমন করিতেন। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের মত জনবিরল স্থানও ভক্ত সমাগমে পূর্ণ হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে এই সময় পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন নাই। শ্রীল দাস-গোস্বামীর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীই শ্রীরাধাকুণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নামে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন।* আমাদের মনে হয়, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ রচিত হইবার পরে এই বিগ্রহ স্থাপিত হন,—কারণ, শ্রীচরিতামৃতের মধ্যেও এই বিগ্রহ স্থাপনের কোনও নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় না, বরং সেখানে শ্রীল দাসগোস্বামী শ্রীল মদনগোপাল বা মদনমোহনকেই নিজের 'কুলাধিদেবতা' বলিয়া নমস্কার করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই; কারণ ভক্ত বিগ্রহরূপে বৃদ্ধ দাস, গোস্বামীই শ্রীরাধাকুণ্ডে যত দিন বিরাজ করিতেছিলেন, তত দিন দেশ-বিদেশ হইতে বহু ভক্ত সাধক তাঁহাকে বারেক মাত্র দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে সমাগত হইতেন, অন্য কোনও বিগ্রহ দর্শনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহারা এখানে আসিতেন না। ঐ সময়ে শ্রীদাস নামক এক জন ব্রজবাসী শিষ্য ভক্তিভরে শ্রীল দাসগোস্বামীর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেবা করিতেন। শ্রীল দাস-গোস্বামী ঐ সময়ে অধিকাংশ সময়ে পরম সমাহিত অবস্থায় বা অন্তর্দ্দশায় অবস্থান করিতেন।

তাঁহাকে শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দিরে নিজের নিকটে লইয়া আসেন এই সঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহও শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে আনীত হন। এখনও শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দিরে এই বিগ্রহের সেবাপূজা যথারীতি হইয়া থাকে। শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে যে শ্রীল গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে গুঞ্জামালা তাঁহার সঙ্গেই সমাহিত হন। শ্রীল গোবর্দ্ধনশিলা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার অতি বৃদ্ধকালে তাঁহার সেবাপরায়ণ শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজ এই শিলার সেবাভার প্রাপ্ত হন। শ্রীল মুকুন্দ কবিরাজ "শ্রীরাধাকৃষ্ণর ঠাকুরাণী" নামে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীকে এই শিলা প্রদান করেন। এই কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃতী শিষ্য শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা; শ্রীল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বালবিধবা কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী এই শিলা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রদান করেন। তখন হইতেই এই শিলা তাঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দের সহিত সেবিত হইতেছেন।

* শ্রীল দাস-গোস্বামীর তিরোভাবের পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অসমর্থ হইয়া পড়িলে শ্রীজীব গোস্বামী

করিয়া তাঁহার "স্বামিনীর" স্বারসিকী সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন—কি খাইতেন বা কিরূপ অবস্থায় থাকিতেন এ অবস্থায় তাঁহার অনুসন্ধান মাত্রও অনেক সময়ে থাকিত না। শ্রীল দাস নামক ভক্তিমান্ ব্রজবাসী কোনও প্রকারে পলাশপত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া তাহার এক দোনা পূর্ণ করিয়া "মাঠা" শ্রীদাস গোস্বামীকে খাওয়াইতেন। সাধারণতঃ যে পত্রগুলির দ্বারা দোনা প্রস্তুত করিতেন তাহা তেমন বৃহৎ নয়, বৃহৎ পত্র পাইলে একটু বড় দোনা প্রস্তুত করিতে পারিলে উহাতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে মাঠা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা ভাবিয়া ঐ ব্রজবাসী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোচারণ-কালে নিকটে পলাশপত্রের সন্ধানে যাইয়া 'সখীস্থলী' গ্রামে তাঁহার মনের মত সুবৃহৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ বৃক্ষ হইতে পত্র আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বৃহৎ দোনা প্রস্তুত করিলেন। এই "সখীস্থলী" গ্রামটি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীল চন্দ্রাবলীর আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীল চন্দ্রাবলী দেবী শ্রীল রাধিকার প্রতিযোগী গোপীদলের অধিনায়িকা বলিয়া প্রসিদ্ধা। শ্রীল বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধিকার সখী শ্রীললিতা-বিশাখা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা ও শৈব্যার উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতে তাহা জানা যায়। বলা বাহুল্য, সাধারণ জীবের পক্ষে প্রাকৃত ভাবের ভঙ্গিতে এই ব্রজলীলার স্বরূপ-রহস্য একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। রসপুষ্টির জন্য শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী ইত্যাদি নায়িকার বিভিন্নতা ও ভাব-পার্থক্য এই লীলায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গ সখীবৃন্দ শ্রীচন্দ্রাবলীর বিরোধী ভাবে ভাবিতা। বলা বাহুল্য, সিদ্ধদেহে শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারের অভিমানী। এই জন্য লীলারস পুষ্টির জন্য তিনি শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর পক্ষের প্রতি প্রতিকূল ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় "সখীস্থলী" বা শ্রীচন্দ্রাবলীর আবাসস্থলী হইতে প্রাপ্ত পত্রের দোনা পূর্ণ করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদিত মাঠা যখন শ্রীল দাসগোস্বামীকে ভোজনের জন্য দেওয়া হইল, তখন ঐ দোনার পত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ সুবৃহৎ পত্র কোথায় পাওয়া গেল? ব্রজবাসী দাস উত্তরে বলিলেন যে, ঐ পত্র সখীস্থলী গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল দাসগোস্বামী ঐ সময়ে অর্দ্ধবাহ্যদশায় অবস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ ঐ সময়ে সিদ্ধ দেহে আবিষ্ট চৈতন্যের সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতি ঘটে নাই এবং বাহ্য দেহের ব্যবহারিক জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসে নাই। ব্রজগোপীর মুখে 'সখীস্থলীর' নাম শুনিয়া তিনি অতিশয় রুষ্ট হইয়া মাঠাপূর্ণ দোনাটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দাসকে বলিলেন,—"সাবধান, তুমি কখনও আর ঐ স্থান গমন করিও না, উহা চন্দ্রাবলীর আবাসস্থল।"

এইরূপ অর্দ্ধবাহ্যদশায় সাক্ষাৎ দর্শনের স্মৃতির পরিপূর্ণ আলোকে উজ্জ্বল হইয়াই তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক স্তবস্তুতি ও মুক্তাচরিত ও দানকেলি-চিন্তামণি নামক লীলাগ্রন্থদ্বয় বিরচিত হইয়াছিল! সম্ভবতঃ তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যদশায় হইলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঐ চমৎকার লীলাগ্রন্থ দুইখানি ও স্তবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক বঙ্গভাষায় রচিত কয়েকটি পদও বর্ত্তমান ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। উহার মধ্যে একটি পদ এখনও পাওয়া যায়। কেহ কেহ আবার উহা রঘুনাথ দাস নামক কোন পরবর্ত্তী সহজিয়া বৈষ্ণবের রচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, পাঠকগণ যাহাতে আপনাদের বিচারবুদ্ধি-অনুসারে ঐ বিষয়ে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, এই জন্য আমরা পদটি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীবেহাগ

চন্দ্রবদনী ধনীরে মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণি।
মধুরিম হাসিনী, কমলবিকাশিনী, মোতিমহারিণী কম্বুকণ্ঠিনী।
থির সৌদামিনী গলিতকাঞ্চন জিনি তনুরুচিধারিণী পিকবচনী॥
উরজ-লম্বিত বেণী, মেরু পর যেন ফণি, আভরণ বহুমণি গজ-গামিনী।
বীণা-পরিবাদিনী চরণে নূপুর ধ্বনি রতিরসে পুলকিনী জগমোহিনী।
সিংহ জিনি মাঝখিনি, তাহে মণিকিঙ্কিণী, ঝাঁপি ওড়নী তনুপদ-অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনী, জগজনবন্দিনী, দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিণী॥ *

১৫০৪ শকে খেতরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই স্থির করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ছয়টি বিগ্রহ স্থাপনের উপলক্ষেই ঐ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ঐ মহোৎসবে গৌড়-বঙ্গ ও উৎকলের যাবতীয় বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। খড়দহ হইতে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবী দেবীও ঐ উৎসবে সপরিকরে যোগদান করেন। উৎসব শেষ হইলে ঐ স্থান হইতেই সপরিকরে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে দাস-গোস্বামীর আর শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবার সামর্থ্য নাই—এ কথা শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীজাহ্নবী দেবীর নিকট নিবেদন করেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীজাহ্নবী দেবী অতি শীঘ্র শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে শ্রীল দাস-গোস্বামী তাঁহার নিত্যক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্যক্রিয়ার অবসর সময়ে শ্রীজাহ্নবী দেবীর আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলেন। পানিহাটীর দণ্ড মহোৎসবে যাঁহার অপরিসীম করুণার পরিচয় পাইয়াছিলেন—সেই শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবী দেবী স্বয়ং তাঁহাকে কৃপা করিয়া দর্শনদান করিতে আসিয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইয়া প্রেমাশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইল, তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া ভজন-কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীল জাহ্নবী দেবী দেখিতে পাইলেন যে, যাঁহার অলৌকিক সাধন-রীতির কথা তিনি শুনিয়া আসিতেছেন, সেই দাস-গোস্বামী তাঁহার চরণে আসিয়া প্রণত হইলেন—তাঁহার শরীর অতি ক্ষীণ হইলেও সাধন-বলে তিনি সূর্য্যসম তেজস্বী। তিনি যেরূপ বিনয় ও দৈন্য সহকারে নিজের সাধন-ভজনে অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল—তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল—তিনি পাদমূলে পতিত সেই দৈন্য ও বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহকে হস্তে ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অতঃপর দাস-গোস্বামী মাধব আচার্য্য-প্রমুখ শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন। আরিট গ্রামের ব্রজবাসিগণ এই মহামিলনোৎসব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

* বর্ত্তমানের ব্যাকরণ-রীতি পদটির অনেক পদে রক্ষিত হয় নাই, এই জন্য পদটি প্রাচীন ভাবের গাম্ভীর্য্য ও অনবদ্যতায় দাস-গোস্বামীর রচিত বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীল জাহ্নবী দেবী ও দাসগোস্বামি-প্রমুখ শ্রীরাধাকুণ্ডের ভক্তগণের আগ্রহে শ্রীরাধাকুণ্ডে তিন-চারি দিন অবস্থান করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পণ করিয়া ব্রজবাসী ও সমাগত সকল ভক্তকে সেই প্রসাদে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই তিন-চারি দিন ধরিয়া শ্রীল জাহ্নবী দেবী ও শ্রীল দাসগোস্বামী নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। সমাগত ভক্তগণ ইঁহাদের কথোপকথনে পরমানন্দ লাভ করিলেন। এই কয় দিন শ্রীরাধাকুণ্ডে যে মহা মহোৎসব হইল, তাহা সত্যই অতুলনীয়। শ্রীজাহ্নবী দেবী এই স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া "ভক্তিরত্নাকরের" একাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই স্থান হইতে শ্রীল দাসগোস্বামীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া শ্রীজাহ্নবী দেবী সপরিকরে শ্রীগোবর্দ্ধন ও মানসগঙ্গাদি তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীজাহ্নবী দেবী এই তীর্থ দর্শনের অনুমতি চাহিলেও বিনয়ের অবতার—

"শ্রীদাসগোস্বামী ভূমে পড়ি প্রণমিয়া।
দিলা অনুমতি দৈন্যে নিমগ্ন হইয়া॥
শুনিতে সে দৈন্য কার হিয়া না বিদরে।
কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে।"—(ভঃ রঃ ১১শত রঙ্গ)

শ্রীল জাহ্নবী দেবীর ব্রজে আগমনের পূর্ব্বে শ্রীল কবি কর্ণপূর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দও শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারাও শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামীকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের নীলাচল-লীলার অনেক কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ভক্ত বৈষ্ণব তাঁহার নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগের কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। তাঁহার সাধন-ভজন ও নিত্য ক্রিয়ার অবসরে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা শুনাইয়া কৃতার্থ করিতেন। এমন কি, তিনি তাঁহার নিয়মিত নিত্যক্রিয়ার মধ্যে এক প্রহর কাল শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-কথার আলোচনার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনে গম্ভীরা লীলায় যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শ্রীল দাস-গোস্বামীরও ক্রমে সেই সকল ভাবের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীল স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন; শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর বিয়োগে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভোজনাগ্রহ চলিয়া গিয়াছিল। ব্রজবাসী শ্রীদাস ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে অনেক সময়ে কিছু ভোজন করাইতে পারিতেন না। ভক্তিরত্নাকর বলিয়াছেন, তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবের পর মাত্র জল ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাবের পর তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী কুত্রাপি তাহা বলেন নাই। * যাহা হউক, দাস-গোস্বামী এই সময়ে ভোজন ব্যাপারে একান্তই কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন—ভোজনের আগ্রহের পরিচয় তিনি কোন দিনই দেন নাই, এই সময়ে সেই আগ্রহের অভাব যে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াই শ্রীরাধাকুণ্ডকে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভজনাগ্রহপূর্ণ স্তব সমূহের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক নামে যে স্তবটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই শ্রীকুণ্ড আশ্রয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। * এই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের চারি পার্শ্বেই শ্রীরাধিকার প্রধানা সখীরা নিজ নিজ নামে "সুমধুর নিকুঞ্জ" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রধানা অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জের মধ্যে উত্তরে "ললিতা"—সুখদ নামে শ্রীমতী ললিতাদেবীর কুঞ্জ, শ্রীল কবি কর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীই ব্রজলীলার ললিতা সখী। শ্রীল দাসগোস্বামী গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে শ্রীরতিমঞ্জরী হইলেও গৌরলীলায় তিনি স্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরবর্ত্তী স্থানে যেখানে গৌরলীলায় স্বরূপ-দামোদররূপে অবতীর্ণ শ্রীললিতা দেবীর কুঞ্জ ছিল, সেই স্থানেই নিজ ভজন-কুটীর নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দেশ করেন। এই স্থানেই তিনি নিজ দেহে স্বীয় যূথেশ্বরী শ্রীললিতাদেবীর অনুগতা হইয়া শ্রীকুণ্ডেশ্বরী শ্রীরাধিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে সুললিত শ্রীরাধিকাষ্টকটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি শ্রীরাধিকাকে "সুললিতললিতান্তঃ স্নেহফুল্লান্তরাত্মা" অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত শ্রীমতী ললিতা সখীর অতি সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্ল বলিয়া বর্ণনা করিয়া আকুল প্রাণে তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অমলকমলরাজিতে সুশোভিত ও সংস্পর্শিবায়ুশীতল স্বীয় সরোবরে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে নিজ সখীগণের সহিত জলক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া লীলা করাইতেন—শ্রীরাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের এই রাধাকুণ্ডে এইরূপ জল-ক্রীড়ার অবস্থাই তাঁহার ধ্যানের মুখ্য বস্তু ছিল। স্বপ্রচিত শ্রীরাধাষ্টকেও এই বিষয়ে তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :—

অমলকমলরাজিস্পর্শিবাতপ্রশীতে
নিজ-সরসি-নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
প্রণয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদায়ং॥

অর্থাৎ অমলকমলরাজি স্পর্শে সুশীতল শ্রীরাধিকার নিজকুণ্ড-সলিলে যিনি নিজ পরিজনগণের সহিত মিলিতা হইয়া বকারি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে নিযুক্ত করিবেন?

যে দিন শ্রীরাধিকা তাঁহাকে নিজ সখীগণসহ নিজ লীলার সঙ্গিনী করিয়া লইবেন—ক্রমে ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল। নিদাঘের সায়ংকালের ন্যায় রমণীয় শরৎ ঋতুর আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথি

* কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তথাপি চরিতামৃতে শ্রীরূপের বা শ্রীসনাতনের তিরোভাবের কথার কুত্রাপি উল্লেখ নাই।

* এই স্তবটির প্রত্যেক শ্লোকের শেষ পাদটীতে আছে—"তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে" অর্থাৎ সেই অতিসুরভি বা পরম মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।"

আসিল। শ্রীজীবাদি শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের, গোবিন্দকুণ্ডের ও শ্রীগোবর্দ্ধনের ভক্তগণও শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে সুখস্পর্শ মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধাকুণ্ডের মানসপাবন ঘাটের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে অর্দ্ধোপবিষ্ট শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীল মহাপ্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধনশিলা বুকে রাখিয়া গুঞ্জামালা কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দিকে অনিমেষে নিরীক্ষণ করিয়া গোপীজনবল্লভের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। সখীগণসহ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন—এই দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল, তিনি সিদ্ধদেহে নর্ম্মসহচরী মঞ্জরীবৃন্দের সহিত যোগদানে অগ্রসর হইলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী অগ্রসর হইয়া তাঁহার কর-ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বগণভুক্ত করিয়া লইলেন ; ললিতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধার করে সমর্পণ করিলেন। মন্দমধুর সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণের গোপীজনবল্লভ নাম সার্থক হইল। শ্রীজীব কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি সিদ্ধ ভক্তগণ দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন—শ্রীল দাসগোস্বামী শ্রীরাধিকার নিজ নিজ মধ্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"বন্ধুক-বর্ণ-বসন-বসানাং
তড়িৎপ্রভা-দিগ্ধ তনুচ্ছবিং চ।
শ্রীরাধিকায়াঃ নিকটে বসন্তীং
ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাং।"

অর্থাৎ—বন্ধুকপুষ্পবর্ণের বসন-পরিহিতা অঙ্গকান্তিতে তড়িৎপ্রভা-বিজয়িনী শ্রীরাধিকার নিকটে বিরাজমানা অতি সুরূপা রতিমঞ্জরী নাম্নী নর্ম্মসখীকে আমি ভজনা করি।

শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীর সংস্কৃত সূচক

শ্রীল দাসগোস্বামীর প্রিয়তম শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর ও শ্রীদাস নামক ব্রজবাসীর নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীদাস-গোস্বামীর একটি সংস্কৃত সূচক স্তোত্র পাওয়া যায় ; আমরা বঙ্গানুবাদসহ কয়েকটি সূচক উদ্ধৃত করিয়া এই মহাপুরুষের জীবন-কথা শেষ করিতেছি।

রাধাকৃষ্ণ ইতি স্বনামদদতা গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিলাং
গুঞ্জ-হারমপি ক্রমাৎ ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে যঃ স্বয়ং।
রাধায়াঞ্চ সমর্পিতঃ করুণয়া চৈতন্যগোস্বামিনা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ।

যাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় রাধাকৃষ্ণ নাম দান পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা অর্পণ পুরঃসর স্বয়ং গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধার করে করুণাভরে সমর্পণ করিলেন, সেই শ্রীরঘুনাথ কত দিনে পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

পঞ্চাশদ্ ঘটিকাঃ সদানয়দহোরাত্রস্য ষট্‌সংযুতা
রাধাকৃষ্ণবিলাস সংস্মৃতিযুতৈঃ সংকীর্ত্তনবন্দনৈঃ।
যঃ শেতে ঘটিকা চতুষ্টয়মিহাপ্যালোকতে স্বেশ্বরৌ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ।

যিনি অহোরাত্রের ষট্‌পঞ্চাশৎ ঘটিকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের সম্যক্ স্মৃতিযুক্ত সংকীর্ত্তন ও বন্দনার দ্বারা যাপন করিতেন এবং যিনি মাত্র চারি ঘটিকা মাত্র শয়ন করিতেন এবং তাহাতেও নিজা-ভীষ্ট শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতেন, সেই শ্রীরঘুনাথ কত দিনে পুন-রায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

রাধামাধবয়োর্বিয়োগবিধুরো ভোগানশেষান্ ক্রমাৎ
চৈতন্যস্য স্বরূপস্য যশ্চ রসান্ ষট্ চাহমপ্যত্যজৎ।
শ্রীরূপস্য জলং বিনা হরিকথাং বাচং সনাতনস্য
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥

যিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের বিয়োগে বিধুর হইয়া ক্রমে ক্রমে অশেষ ভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ ও সনাতনের বিয়োগে যিনি জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কথার দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেন, সেই শ্রীরঘুনাথ কত-দিনে পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

হা রাধে ক নু কৃষ্ণ হা ললিতে ক ত্বং বিশাখেঽসি
হা চৈতন্য মহাপ্রভো ক নু ভবান্ হা হা স্বরূপ ক বা।
হা শ্রীরূপ সনাতনেত্যনুদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥

হা রাধে! হে কৃষ্ণ! হা ললিতে! তুমি কোথায়? হা বিশাখে! হে মহাপ্রভো! হে শ্রীচৈতন্যদেব! আপনিই বা কোথায় গেলেন? হা স্বরূপ গোস্বামি, আপনি কোথায় আছেন? হা শ্রীরূপ! হা শ্রীসনাতন বলিয়া যিনি শেষ লীলায় সর্ব্বদা দিবারাত্রি রোদন করিতেন, সেই শ্রীরঘুনাথ কত দিনে পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

সাঁঝের মেয়ে

সাঁঝের মেয়েটি আসে নিতি সাঁঝে নিরজন বন-পথে,
আগমনী-বাণী আসে যে ধরায় মৃদু-সমীরণ-রথে।

তরুবীথি-তলে চরণের ধ্বনি মৃদু মৃদু শুনা যায়,
পূরবীর সুরে সাঁঝের বালিকা চুপি চুপি গান গায়।
কাননে কাননে ফুলকুঁড়ি-মুখে ফোটায় মধুর হাসি,
চরণে তাহার লুটাইয়া পড়ে মুগ্ধ বকুলরাশি।
বনের আড়ালে ওঠে ধীরে চাঁদ, মিটি মিটি জ্বলে তারা,
সাঁঝের মেয়ের অপরূপ রূপে সকলে আত্মহারা!

ফুলের সুবাস মাখানো তাহার চুলের গন্ধ ভাসে,
আকুল ভ্রমর তাই বুঝি চুপে চোরের মতন আসে!
দস্যি ছেলের ঘুম সে পাড়ায় ঘুম-পাড়ানিয়া গানে,
সোনার কাঠির রূপার কাঠির সন্ধান বুঝি জানে!
চঞ্চলা সে যে সাঁঝের বালিকা কখন বুঝি না হায়,
নীরব চরণ ফেলি অগোচরে দূর গাঁয়ে চলে যায়!

শ্রীরবিদাস সাহা রায়।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৩১

শিশু যেমন নূতন খেলনার দোষগুণ বিচার করিতে পারে না, গভীরতম আনন্দে খেলনাকেই প্রিয় জ্ঞান করিয়া অনুক্ষণ তাহা লইয়া থাকিতে চায়, বিচার করিতে জানে না সে খেলনার কতটুকু দাম, তার স্থিতির কালই বা কত দিন, অলকের পত্রখানা তেমনি আনন্দের আমেজ আনিয়া দিল! মন অনুক্ষণ সেই ছত্র কয়টা লইয়াই ভরপুর। চিঠিখানা যেন নেশার মত রত্নাকে পাইয়া বসিয়াছিল। গভীর বেদনায় রত্নার মনে হইল, চিঠিখানা যেন গৌরবের বরণ-ডালা সাজাইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে!

আতুর মন কেবলই ভাবিত, তাহার কোন মূল্য, কোন মর্য্যাদা নাই। থাকিলে এতখানি তাচ্ছিল্য সহিতে হয়? এ চিন্তা মনে জাগিবামাত্র চিন্তায় মুখ রোধ করিয়া ভাবিত, না, না, অমিয় তাহার কেহ নয়! অমিয়কে সে ভালোবাসে না। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি যদি মানুষকে সব সময়ে চালিত করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত জটিলতার—যত কিছু দুষ্কৃতির নিমেষে বিলোপ ঘটিত! কিন্তু তাহা হইবার নয়।

রত্না মনে মনে ভাবে, ভাগ্যে মাসিমা আসিয়াছিলেন, নয় ত রত্না দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া কি যে করিয়া বসিত,—করিলে তাহার লজ্জায় সমগ্র জীবন সে মরমে মরিয়া থাকিত! সে খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! কি উন্মত্ততাই না তাকে ঘিরিয়াছিল! এবং এই বাঁচার স্বস্তি ভোগ করিতে গিয়া মন বলে, অমিয় যেন কচের মত নিষ্ঠুর! সে বলিয়াছিল,—

"আমি বর দিনু দেবী সর্ব্বসুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্বদুঃখ বিপুল গৌরবে।"

ব্যর্থতার বিক্ষুব্ধ নিশ্বাসে মন ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া সারা হয়। অমিয়কে যে রূঢ় কটূক্তি করিয়াছে তাহার জন্য মনে অনুতাপ জাগে।

অলকের চিঠি খুলিয়া সে তিক্ত চিন্তা রত্না পরিত্যাগ করিতে চায়। মনে মনে সঙ্কল্প করে, গোস্বামী-প্রাসাদে গিয়া অলক রায়কে সে ধন্যবাদ দিবে। তাহাকে অভিনয়ে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া গোস্বামী-প্রাসাদের সঙ্গে অনিলের মুখও স্মৃতি-পটে জাগে। অনিল তাহার অনুরক্ত। সে যদি অমিয়কে না ভালোবাসিয়া অনিলকে আকাঙ্ক্ষা করিত,—তাহা হইলে কল্পনার মত সে-ও মস্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইত। মাসিমার মত প্রৌঢ় বয়সেও দাম্পত্য-জীবন মধুময় করিতে অনিলের জন্মদিনে সে-ও এমনি উৎসব-আনন্দ করিত। পৃথিবীতে মাসিমাই ভাগ্যবতী, কমলা-বীণাপাণি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন! অমন ভাগ্য নারী মাত্রেই কামনা করে।

এক দিন সকালে রমেশ সকন্যা কলিকাতায় যাত্রা করিলেন এবং রত্নাকে বোর্ডিং-এ রাখিয়া ফিরিবার প্রাক্কালে তাহার কথার উত্তরে বলিয়া গেলেন—না মা, ভুলবো কেন? সত্যর ওখান হয়েই বাড়ী যাবো।

*　*　*　*

তার পর প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেছে। গোস্বামী-প্রাসাদের কেহ রত্নার তত্ত্ব লইতে আসে নাই। রত্নার মন উতলা হয়। যে খাঁচা স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, সেই খাঁচার মধ্যে বসিয়া বনের পশু যেমন সম্মুখে খোলা যেটুকু জায়গা দেখিতে পায়, দু'চোখের দৃষ্টিতে বহির্জ্জগতের সেইটুকুর পানেই চাহিয়া মুক্তির আশায় অধীর হয় ছটফট করে,—অবশেষে দিনান্তে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেদিনকার মত মুক্তির আশায় অবসন্ন হয়, তেমনি করিয়াই রত্না তাহার এবারকার বোর্ডিং বাসের দিনগুলা যাপন করিতেছিল। নিত্যই মনে মনে হিসাব করিত,—কত দিন গোস্বামী গৃহের কোন মানুষ রত্নার খোঁজে আসিল না! কেন আসিল না, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে মন যে দিকে ইঙ্গিত করে, রত্না তাহাতে ভীত হয়। না, মাসিমা যথার্থই তাহাকে স্নেহ করেন। এমন করিয়া তিনি রত্নার সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া দিতে পারেন না—এ কথা বলিয়া মনকে সে সান্ত্বনা দেয়।

ছুটির পর কল্পনা বোর্ডিংএ ফিরিয়াছে! কিন্তু রত্না তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিত না। কল্পনার দিকে চাহিলেই দেহে-মনে কেমন ঈর্ষার জ্বালা ধরিত!

এক দিন ঝরণার মুখে রত্না শুনিল, কল্পনার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কল্পনার ইচ্ছা, শুভ কাজটা বি-এ পাশের পরে হয়। উভয় পক্ষই তাহাতে সম্মত।

রত্না কোন উত্তর দিল না। ঝরণা বলিতে যাইতেছিল, তুই জানিস্ না,—তোর ওই গোস্বামী সাহেবের ছেলের সঙ্গে যে।

রত্না সে কথারও কোনো সাড়া তুলিল না! শুধু পিতাকে লিখিয়া জানাইল,—মেসোমশাইয়ের ওখানকার খবর সে বহু দিন জানে না।

তাহার পরের শনিবার মিসেস্ গোস্বামী স্বয়ং আসিয়া রত্নার নিকটে উদিত হইলেন। প্রসন্ন হাস্যে নিজের কাজের মস্ত ফর্দ দিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া রত্না কহিল,—আপনি আমায় ভুলে গেছেন, মাসিমা। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বেত পলাশের বুকে কৃষ্ণ-তারকা হইতে গ্রন্থিহারা ক'টি মুক্তা ঝরিয়া পড়িল।

মিসেস্ গোস্বামী স্নেহপরায়ণা, তাঁহার মন নিমেষে মমতায় ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, বাস্তবিক এই প্রচ্ছন্ন বিমুখতায় রত্নার প্রতি মস্ত অবিচার করা হইয়াছে।

রত্নার পিঠ চাপড়াইয়া স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে আদর করিয়া তিনি কহিলেন,—পাগল মেয়ে! আমি কি ভুলতে পারি? চলো, আজই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। প্রিন্সিপালকে বলছি।

রত্নার মুখে যেন শরৎ-আকাশের এক ঝলক্ সোনালী কিরণ পড়িল।

মোটরে বসিয়া মিসেস্ গোস্বামী রত্নাকে কহিলেন,—আমি ভাবতুম, তোমাকে আনা আর ঠিক নয়। পরীক্ষা এসে পড়েছে!

কুয়াশা-ঢাকা আকাশ পরিষ্কার করিয়া অরুণোদয় হইল। অন্তরের সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল। পড়ার ক্ষতির জন্যই মাসিমা আসিতেন না! রত্না অথচ কি যে সব ভাবিত!

রত্নাকে দেখিয়া মিষ্টার গোস্বামী বিস্ময় সারিয়া লইয়া কহিলেন,—ও:, এই যে, অনেক দিন পরে! বেশ ভালো আছ? কাল তোমার বাবার একখানা চিঠি পেয়েছি।

নমস্কার করিয়া নতমুখে রত্না জানাইল, সে ভালো আছে।

সন্ধ্যায় উৎসুক চক্ষে চারি দিকে চাহিয়া রত্না কহিল,—অনিল-দা নেই?

—অনিল,—ও! না, ওরা সব পূজার সময় রায়পুরে শীকার করতে যাবে,—সুশীলের খুব শীকারের ঝোঁক কি না, সব সেখানে গেছে। সেখান থেকে বোধ হয় সিনেমা যাবে।

রত্নার বুকের ভিতরটা ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠে সে কহিল,—আপনি কোথাও যাবেন না, পূজোর ছুটীতে?

—তাই তো, কোথায় যাবো, কিছু এখনো স্থির করিনি। বলিয়া রত্নাকে খুশী করিবার জন্ম কহিলেন,—তুমিই বলো তো রত্না, কোথা যাই।

রত্না হাসিল। কহিল,—বা:! আমি কি পাঁচটা ভালো মন্দ দেশ দেখেছি যে বলবো!

—তাতে কি হয়েছে! পাঁচখানা বই তো পড়েছো!

রত্নার মনে পড়িল,—গত বছর ঝরণারা মুসৌরী গিয়াছিল, মুসৌরীর কত গল্প সে করে। মৃদু হাসিয়া সে কহিল,—মুসৌরী কেমন?

প্রসন্ন হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—বেশ ভালো! সুন্দর বলেছো রত্না। কল্পনার মা-বাবা সব মুসৌরী যাবে বলছিলো।

রত্নার মুখ পাংশু হইয়া গেল।

পরের দিন রত্নাকে দেখিয়া অনিল কহিল,—এই যে রত্না! কেমন আছো? ভালো তো!

নমস্কার জানাইয়া রত্না কহিল,—ভালো! তুমি কেমন? ভালো তো?

অনিল কহিল,—নিশ্চয়! চেহারাতে মালুম পাচ্ছ না?

রত্না দেখিল, অনিল যেন আরও উজ্জ্বলকান্তি সুপুরুষ হইয়াছে।

অনিল হাসিয়া কহিল,—তার পর কল্পনার খবর কি?

জানালার দিকে সরিয়া রত্না কহিল,—আমি অত পাঁচ জনের খবর রাখি না।

অনিল হাসিল। কহিল,—তা বটে! তোমার সঙ্গে তার আবার এই যে কি বলে,—একটু—

মুখ ফিরাইয়া অনিলের প্রতি চাহিয়া রত্না কহিল,—একটু কি শুনি?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে অনিল কহিল,—না, এমন কিছু নয়—ওই যে জেলাশি না কি বলো তোমরা! আচ্ছা থাক তার খবর—তোমার খবর কি বলো?

ঔদাস্য সহকারে রত্না কহিল,—আমার আবার খবর কি? খবর তো তোমাদেরই।

—তা বটে! আমাদের একটা খবর আছে। আমরা একটা থিয়েটারের আয়োজন কচ্ছি।

রত্না চমকিয়া উঠিল। কহিল,—ও! আচ্ছা যিনি উর্ব্বশী অভিনয়ে নারদ সেজেছিলেন, তাঁর খবর জানেন?

বিস্মিত কণ্ঠে অনিল কহিল,—কেন, রায়ের খবরে তোমার প্রয়োজন?

রত্না অপ্রতিভ হইল। উত্তর দিতেই হইবে। ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—না, এই একখানা—

স্থির চক্ষে রত্নার কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া অনিল কহিল,—একখানা কি?

কুণ্ঠিত স্বরে রত্না কহিল,—তিনি আমায় একখানা চিঠি লিখেছেন।

—রায় তোমায় চিঠি লিখেছে? অনিলের স্বর অপ্রসন্ন।

রত্না থতমত খাইয়া গেল। জবাবদিহির মত জড়াইয়া জড়াইয়া সে কহিল,—থিয়েটার করবার জন্যে। বন্যা-রিলিফ ফণ্ডে সাহায্য করবে না কি—

—ও! অনিলের ওষ্ঠে তাচ্ছল্য ফুটিল। কহিল,—রায় তোমার ঠিকানা জানলে কি করে?

—অভিনয়ের দিন বাবার নাম-ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন।

অনিল আর কিছু বলিল না। শুধু তাহার মুখের সে অসন্তোষের ছায়াটুকু মুছিয়া গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রত্না কহিল,—তিনি এখানে আসবেন না?

—কে? রায়? হ্যাঁ, আসবে বৈ কি। আজ দশটায় আসবে।

রত্না বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল—বয় আসিয়া জানাইয়া গেল, ছোট সাহেব সেলাম ভেজা, রায় সাহেব আয়া।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া মন্থর গমনে সে বারান্দায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রেলিংটা ধরিয়া কি ভাবিল। তাহার পর সুরার গন্ধে আকৃষ্ট মাতালের মত সে রায় সাহেবের কাছে আসিয়া দর্শন দিল।

সসম্মানে আসন ত্যাগ করিয়া যুক্ত করে ললাট স্পর্শ করিয়া নমস্কার জানাইয়া রায় কহিল,—ভালো আছেন?

প্রতি-নমস্কার জানাইয়া রত্না কহিল,—হ্যাঁ।

অনিল কহিল,—ভালো না থাকলে আর এখানে উপস্থিত!

চেয়ারে বসিয়া রত্না কহিল,—আপনি ভালো আছেন?

বক্র কটাক্ষে অনিলের পানে চাহিয়া অলক কহিল,—হ্যাঁ! বুঝলে কি না অনিল, আমাদের নাটকখানা অভিনয়ের জন্য এই—

সহাস্যে অনিল কহিল,—কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক! মিস্ বোসের কাছে আগেই সব শুনেছি। কিন্তু অভিনয়ে কি উনি যোগ দেবেন? এটা হচ্ছে পাবলিকের জন্য—দস্তুর-মত টিকিট বিক্রী হবে এখানে।

অলক কহিল,—কিন্তু কত দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত্ত, আর্ত্ত, আতুর নরনারীর উপকার করা হবে। অন্নহারা, গৃহহারা, বস্ত্রহীন সেই প্রপীড়িতদের কথা ভাবো দেখি অনিল! মার কোলে ছেলে শুকিয়ে মরছে মিস্ বোস! তার পাশে অনশন-জীর্ণ মাও মরছে। বস্ত্রাভাবে মেয়ে বাপ-মা'র সামনে বার হতে পারছে না। শেয়াল-কুকুরের মত ক্ষুধার্ত্তের দল উচ্ছিষ্ট পাতা চেটে খাচ্ছে—এই দুঃসহ দৃশ্য একবার স্মরণ করুন।

বিভীষিকা দর্শনের মত রত্নার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ব্যাকুল কণ্ঠে সে কহিল,—না, না, আমি আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয় যোগ দেবো।

পুলকিত কণ্ঠে অলক জবাব দিল,—এমনি উত্তরই আমি আশা করেছিলুম। মেয়েরা স্নেহ-পরায়ণ জাত। তাই চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছিলুম। আপনি ভাবুন, এই নৃত্যকলা কাদের জন্ম হচ্ছে? এর মাঝে থাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ! আপনার বাবা অমত করবেন বলে মনে হয় না!

দৃঢ় স্বরে রত্না কহিল,—না, বাবা কিছুতেই অমত করবেন না। আমি আপনাদের অভিনয়ে যোগ দেবো মিষ্টার রয়, এবং অন্তরের সমস্ত উৎসাহ নিয়েই যোগ দেবো।

আনন্দ-গদ-গদ কণ্ঠে অলক কহিল,—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আপনার মন খুব উঁচু। আর দেখবেন,—এই নৃত্য-কলা আপনাকে গৌরবের কোন্ স্বর্গ-সিংহাসন দেবে। আপনার অলৌকিক নৃত্য-প্রতিভা পাভ্‌লোভার মতই আপনাকে এক দিন যশস্বিনী করবে। সারা বার্ণার্ডের রোজগার জানেন? আর ইউরোপে আমেরিকাতে বড় বড় ষ্টার আছেন, যাঁরা স্বামীর সঙ্গে একত্রে নামচেন।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল! টেবলের উপর হাত রাখিয়া সে কহিল,—মিষ্টার রায়, আমার মনের কথার প্রতিধ্বনিই যেন আপনার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে।

অনিল সব কথায় যোগ দেয় নাই। উত্তরও কিছু দিল না। নূতন কেনা জাপানী কুকুরটার সহিত সে ক্রীড়া করিতে মত্ত।

* * * *

তরুপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে রবি-কিরণের ঝিকিমিকি খেলার ন্যায় সমস্ত কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অমিয়র চিত্তে রত্নার চিন্তাটা উঁকি মারিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিত এবং সেই অন্যমনস্কতা এক এক সময় এত গভীর হইত যে, হাতের কাজ-কর্ম্ম হাতে লইয়াই সে বসিয়া থাকিত। মনের পটে জাগিত রত্নার ছবি! হুঁস হইলেই অমিয় নিজেকে তিরস্কার করিত, শাসন করিত। অবাধ্য মন কিন্তু বশ মানিত না! ভূতের মত উৎপাত করিতে ছাড়িত না।

এবার কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে মা তাহাকে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় দেন নাই, সে কথা মনে পড়িত। অন্তর ক্ষুব্ধ হইত। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত যে কথা মনে উদ্ভাসিত হইত, তাহাতে অমিয় ভাবিত, ভালই হইয়াছে! পলাইয়া আসিয়া সে ভালো কাজ করিয়াছে! শুভগ্রহই তাকে সুমতি দিয়াছিল।

আদালতের কাজ সারিয়া অমিয় ক্লাবে যাইত। সেখান হইতে ফিরিয়া ডিনার শেষে সে প্রবেশ করিত নিজের লাইব্রেরী-কক্ষে। বিশ্বের সকল জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার পুস্তকরাজি অধ্যয়নে তার ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ!

আজও তেমনি একখানা বই হাতে লইয়া সে বসিল। বইখানা ছিল মনোবিজ্ঞানের। সাইকলজি অমিয়র বড় প্রিয়। বইয়ে মনও নিবিষ্ট হইয়াছিল,—কিন্তু গোপন অভিসারিকার ন্যায় চিত্ত যে চুপে চুপে কোন ফাঁকে পড়া হইতে সরিয়া রত্নাকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কিছুই এই বিচক্ষণ হাকিম জানিতে পারিল না।

অমিয় ভাবিতেছিল, রত্নার সে দিনের সেই ব্যবহার। সে-মনের কতখানি প্রমত্ত অবস্থা, সেই কথা! কেবল অনুমান করিতে পারিতেছিল না, মনে এমন বিক্ষিপ্ততা তাহার কেন আসিল? রত্নার প্রতি নিজের প্রত্যেকটি আচরণ মনে মনে একাধিক বার নাড়িয়া চাড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়া সে দেখিতেছিল। কোন্ ঘটনার সূত্র দিয়া তাহার বুকে দুর্জ্জয় প্লাবনের মত দুরন্ত বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—কি সে ঘটনা?

রত্নাকে লইয়া অমিয় মোটরে বাহির হইয়াছিল। রত্নার প্রতিভার কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিল, এই নবতম বিদ্যার আনন্দ-স্বাদ তাহাকে দিয়া নিজে একটু পুলক উপভোগ করিবে মাত্র এবং তাহার পর যে কটা দিন গিয়াছিল, সে রত্নার একান্ত জিদের আকর্ষণেই! ভাবিয়াছিল,—প্রতিভাশালীর লক্ষণই এই—যখন যেটা গ্রহণ করে, এমনি বিপুল আগ্রহেই করে। ইহাই তাহাদের প্রকৃতি-স্ফুরণের একটা বিশিষ্টতা এবং রত্নাকে যে আশ্বাস সে দিয়াছিল, তাহার মধ্যে এতটুকু কপটতা ছিল না! বাস্তবিক আজও সে প্রস্তুত—শিক্ষা সম্বন্ধে রত্নার সমস্ত অভাব পূরণ করিতে! তবে এত বড় একটা বিপত্তি আসিল কোন্ পথ দিয়া? এমনি করিয়া রত্নার সহিত জড়িত প্রতি ঘটনা বাছিয়া অমিয়র মন যখন মালা গাঁথিতেছিল,—তখন বিচার-বুদ্ধি সহসা প্রশ্ন করিল,—এই ফুলগুলির মধ্যে কি যে কীটের বাসা আছে, তাহা কি অন্তর্দৃষ্টির অবিদিত রহে? তাহার বুকে কি কোন গোপন তৃষ্ণা লুকাইয়া ছিল না? অন্তর কি দিনের পর দিন ক্রমশঃ রত্নার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল না? দৃষ্টি কি তাহার অপরূপ রূপ-সুধাপানের নিমিত্ত লালায়িত হইত না? এ সকল কি মিথ্যা? অন্তর কি অতি সংগোপনে রত্নাকে ভালোবাসিতে সুরু করে নাই? অমিয় শিহরিয়া উঠিল। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রত্নার প্রতি উদাসীন হইতে চেষ্টা করিয়াছে। উপায় ছিল না বলিয়াই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিল। তাহার পরেই সে নিরালায় ছুটিয়া আসিয়াছিল,—আপনাকে শান্ত করিতে। রত্না যে বালু-তিলোত্তের মত পাঁচ জনের মাঝে মিশিয়া গেল, তাহাতে অমিয় স্বস্তিবোধ করিয়াছিল। কিন্তু সেই নির্জ্জন বিশ্রাম-আসরের কথা স্মরণে আসিতেই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল আর একটি দৃশ্য।

কনিষ্ঠ অনিল কল্পনার নিভৃত বিশ্রামের সঙ্গী। নিরালায় আলাপের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল ও অন্ধকার তাহারা খুঁজিতেছে। অনিল কল্পনার বাহু ধরিয়া তাহার মনোরঞ্জন-প্রয়াসী! কল্পনা অনিলের সঙ্গ-পিয়াসী। সেই কল্পনাকে অমিয় বিবাহ করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু মায়ের কাছে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কিছু প্রকাশ করা যায় না। অমিয় বলিতে পারিত, কল্পনাকে সে চায় না। মা অমনি অন্য মেয়ের জন্য সুপারিশ করিতেন। কিন্তু বিবাহ অমিয়র পক্ষে—ছায়াচিত্রের মত চোখের সামনে ভাসিতে থাকে কত ছবি ফারপোতে সে রত্নাকে লইয়া চা খাইতে গিয়াছিল। বন্ধুদের সেই হাস্য-কৌতুক রঙ্গ-রহস্যের মাঝে যদি কিশোরীর চিত্তে বিভ্রম জাগে—অমিয়কে পাইবার বাসনা যদি সেই মুহূর্ত্ত হইতে রত্নার বুকে জাগিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? রত্না? না, অমিয়?

প্রগলভা বলিয়া রত্নাকে নিন্দা করিয়া অমিয় মনে মনে তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। অমিয় রত্নাকে দেখিয়াছে,—শিশুর মত সরল-প্রকৃতি, অভিমানী কিশোরী, অল্পে তুষ্ট, সামান্যে খুশী কল্পনার মত জাল বিছাইয়া নিজের অধিকার সে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে জানে না। বানের জলের মত ছুটিয়া আসে, দুর্ব্বার আকর্ষণে সে

ভাসাইয়া লইতে চায়, আবার বানের জলের মতই সরিয়া যায়। পর-মুহূর্ত্তে শান্ত হইয়া পড়ে।

অমিয়র মনে হইল, রত্নাকে কি গ্রহণ করা যায় না? তাহার অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন সুগভীর ভালবাসা রত্নার এই দুরন্ত বাসনা এ দু'য়ের সম্মিলনে দু'টি জীবনই মধুময় হইয়া ওঠে! রত্নাকে বিবাহে বাধা কি? সেই মুহূর্ত্তে দীর্ঘ দিনের সংস্কার তীক্ষ্ণ তীরের মত অন্তরে বিঁধিল! পিতৃপিতামহের রক্তের ধারা তাহার দেহে প্রবহমান। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান—গেঞ্জির তলায় যে ক'গাছি সূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার অমর্য্যাদা করা অমিয়র পক্ষে দুঃসাধ্য।

অমিয় সিদ্ধান্ত করিল,—কিছু কাল সে গৃহে ফিরিবে না। বাড়ীর সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না। শত প্রয়োজনেও না। জননী কষ্ট হন হোন্, তিরস্কার করেন করুন,—পিতৃ-প্রকৃতি সে জানে, ইচ্ছায় না গেলে, জিদের আহ্বান কখনও তিনি করিবেন না। মা কল্পনার সহিত অনিলের বিবাহ দিবেন বলিয়াছেন! যে দিন সে শুভ সংবাদ কানে আসিবে, নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইবে অমিয় কেবল দাদা ও ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিতে! আর যদি কখনও শোনে রত্নার বিবাহ, অমিয় যাচিয়া রত্নাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া দিবে! না, না, নব-দম্পতীর সুখ-কামনা-যৌতুক দিতে সে স্বয়ং উপস্থিত হইবে। আনন্দের সহিত বলিবে, তুমি সুখী হও রত্না। না, না, অমিয় কদাচ আর রত্নার সম্মুখীন হইবে না! রত্নার শান্ত মন যদি স্বামীর পাশে থাকিয়া অমিয়র জন্য চঞ্চল হয়? তাহা হইলে অপরাধ হইবে, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম—সে শ্রদ্ধা করে। অমিয় তাহার বিপরীত মতবাদ যুক্তি তর্ক আচার ব্যবহারে জ্বলিয়া যাইত। অমিয় মনে করিত সংযমেই মনুষ্যত্বের পরিচয়! কিন্তু যে সমাজে বাস করিত, তাহার আবহাওয়া এই নীতিপ্রিয় মানুষটির নিকট বিষাক্ত বাষ্পের মত ক্লেশকর হইত। তাই সে দূরে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে ভালবাসিত।

কিন্তু অকস্মাৎ অমিয়র মনে হইল—তাহার দীর্ঘ দিনের নীতি-জ্ঞান কেমন করিয়া শিথিল হইল, মন রত্নাকে ভালবাসিয়া ফেলিল! মনের কঠোর শ্লেষ-উক্তি আমরণ তাহার চিত্তে জ্বলিতে থাকিবে। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন, সে কটূক্তি রত্না কাণে শোনে নাই।

ঘড়ির শব্দে অমিয়র হুঁশ হইল,—অনেক রাত্রি অবধি বই লইয়া পড়িয়া আছে। পৃষ্ঠা উলটানো অবধি হয় নাই। বই রাখিয়া আলো নিবাইয়া সে শয়ন-কক্ষে আসিল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ছবিতেও রত্না বিচরণ করিতে লাগিল। মোটরে অমিয়র পাশে সে বসিয়াছে! অমিয়র কাঁধে হাত রাখিয়াছে! অমিয়র ঘরে ঢুকিয়া অশ্রু-বিবশ মুখে অমিয়র হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় অমিয় নিজেকে সম্বরণ করিতেছে।

ভোরের আলো চোখে লাগিতেই অমিয় শয্যা-ত্যাগ করিল।

বাংলোর বাগানে পাখীরা গানের জলসা বসাইতেই অমিয় উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

খানিকটা বেলায় গৃহে ফিরিয়া দেখিল,—ডাক আসিয়াছে। চিঠি-গুলা নাড়া-চাড়া করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বন্ধু সুশীলের চিঠি পাইল।

বন্ধু সুশীল অমিয়কে শীকারে যাইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়াছে—এবার সে আয়োজন করিয়াছে প্রচুর।

নিমেষে অমিয়র মন নাচিয়া উঠিল। আজ আবার একটু বাঘ, বরাহদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে আনন্দ উপভোগ হইবে। এই একঘেয়ে জীবন-যাত্রা আর ভালো লাগে না! অস্বস্তি ধরিয়াছে। সব চেয়ে আনন্দ যে, এই ভূতুড়ে চিন্তার হাত হইতে হয়তো নিষ্কৃতি মিলিবে!

৩৩

হরিশ ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিত।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিবামাত্র একখানা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন হাতে আসিল। কাগজখানা পকেটে পূরিয়া অফিসের তাড়ায় ট্রামে উঠিয়া বসিল।

কিন্তু পাশের যাত্রী যখন কহিল,—ইস্, রত্না বোসও যে নামবে! তখন মুখ তুলিয়া হরিশ লোকটার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল।

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লোকটা কথা কহিয়াছিল, সে কহিল,—হাঁ, হাঁ, সমস্ত রথ-রথীরাই রয়েছেন! ওই বন্যা-সাহায্য হুজুগ।

—তা হোক মশাই, টিকিট কিনতে হবে!

—সে তো হবেই! এমন থিয়েটারটা দেখবো না? ভগবানের দেওয়া চক্ষু দু'টো ওদের না দেখলে সার্থক হবে কি করে?

হরিশ অফিসে আসিল। সেখানেও ওই থিয়েটারের প্রসঙ্গ! হরিশের সহকর্ম্মীরা কহিল,—হরিশ বাবু, টিকিট কেনা হয়েছে?

হরিশ প্রশ্ন করিল,—কিসের টিকিট?

—ও, তোমার কার্ড আসবে বুঝি? মুকুন্দ কহিল।

হাসিয়া বড় বাবু কহিলেন,—হরিশের ভাই-ঝি খুব নাম করেছে!

হরিশ থতমত খাইল। এটা সুখ্যাতি, না প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ? মাথা চুলকাইয়া হরিশ কহিল,—আজ্ঞে, স্যার—

কেশিয়ার বাবু প্রবীণ ব্যক্তি। হাসিয়া তিনি কহিলেন,—হ্যাঁ হে হরিশ, তুমি তো করো যাট্ টাকা মাইনের চাকরী! দাদাটি তো দেশের স্কুলে হেড মাষ্টার! ভাই-ঝি এ হোমরা-চোমরা দলে ভিড়ল কি করে!

নিতাই কহিল,—সাবধান হরিশ! ওরা সব এক-একটি রাঘব বোয়াল—এ চুনোপুঁটি দলের বিপদ ওইখানে!

হারাধন কহিল,—রাখো রাখো তোমার বক্তিমে, হরিশের ভাই-ঝিকে গোস্বামী সাহেব পুষ্যি নিয়েছে জানো—বলিয়া সে বন্ধুদের চোক টিপিল! এবং অত্যন্ত ভাল মানুষের মত কহিল,—ছাখো হরিশ, আমি একটা সৎ-পরামর্শ দি। ভাই-ঝি যখন অত-বড় হাই সার্কেলে চলা-ফেরা করে, তখন তাকে মুরুব্বি ধরে একটা বড় চাকরীর জোগাড় করে নাও। এই বেলা বুঝে ছাখো, সুযোগ বার-বার আসে না।

কোন কথারই হরিশ আজ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এক দিন মহা উৎসাহে যে-কথা যে-পরিচয় সে দিয়াছিল, বন্ধু-মহলে বড় গলায় যাহা বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিল, আজ অপরের মুখে তাহার পুনরুক্তি হইতেছে! কিন্তু প্রত্যেকটি কথা যেন বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে! তথাপি কোন রূঢ় উত্তরের খোঁচায় এই ভীমরুলের ঝাঁককে সে আহত করিতে পারিল না! নিজের টেবলের সামনে আসিয়া বসিল।

সারাদিন ঘাড় গুঁজিয়া কাজ সারিয়া যখন উঠিতেছে, কেসিয়ার বাবু গলা বাড়াইয়া কহিল,—ভায়া, আমার জন্য একখানা পাশ।

বিরক্ত হইয়া হরিশ কহিল,—না বসন্ত বাবু, মাপ করুন, আমি ও-সব জানি না।

গৃহে ফিরিয়া সোজা সে অগ্রজের কাছে আসিয়া বলিল,—এ কি ব্যাপার দাদা?

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া রমেশ কহিলেন,—কিসের ব্যাপার?

—রত্না না কি থিয়েটারে নামচে! চার দিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে!

রমেশের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আহ্লাদের স্বরে কহিলেন,—তাই না কি! বলো কি? কোন্ কাগজে দেখলে? সব বলো যে বুঝি, কি বলছো!

—যা বলছে, তা খুব শ্রুতিমধুর নয়।

অবাক হইয়া রমেশ কহিলেন,—শ্রুতিমধুর নয় মানে? ওরা কি বলছে, রত্না পারবে না, ভড়কে যাবে?

জ্যেষ্ঠের বাক্যে হরিশের গা জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত কণ্ঠে সে কহিল,—সে সব কথা হচ্ছে না দাদা। আমি বলছি, আমরা যে সমাজের লোক, যে দরের মানুষ, যেমন অবস্থা, তেমনি চলা-ফেরা করাই ভালো। তুমি এ সবের প্রশ্রয় দিয়ো না!

এতক্ষণে রমেশ ভ্রাতার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কহিলেন,—দেখ হরিশ, তুমি যে তোমার বৌদির বায়না ধরলে! কিন্তু সে মেয়েমানুষ! ঘরের কোণে বন্দী, তার কথা আলাদা। তুমি তো তা নও, বেশী না হলেও কিছু তো লেখাপড়া শিখেছো। তুমি ষাট টাকা মাইনেতে জন্ম খোয়াচ্ছ বলে মণির কি পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভালো? না, তুমি কামনা করো না, মণি হাইকোর্টের জজ হোক—একটা দিক্‌পাল হোক?

দাদার বিদ্‌কুটে যুক্তি শুনিয়া হরিশ হতবাক্ হইয়া মুহূর্তে ভাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল,—সে বেটাছেলে,—বাইরের সমাজই তাকে টানছে। কিন্তু এ মেয়েমানুষ, এ রাজরাণী হোক—আশীর্ব্বাদ করি! কিন্তু—

হরিশের সব কথা বলা হইল না। দুই হাত তুলিয়া রমেশ কহিলেন—থাক্ থাক্ হরিশ, তুমি না বললেও, সে সব আমার জানা আছে। কিন্তু ও মামুলী গৎ শুনতে আমি রাজি নই। আচ্ছা, হরিশ, বড় কথা তো তোমরা বুঝবে না, শুধু এই একটা ছোট কথাই শোনো। রত্না যে-সে নয়। ও কে, জানো? তোমার বৌদি বুড়েশ্বর মহাদেবের মাদুলী পরে তার দোর ধরেছিল, তাতে না কি ছেলে হতেই হয়। কিন্তু আমার ভাগ্যে জন্মাল মেয়ে! তখনি বুঝলাম, সাক্ষাৎ সরস্বতী এলেন। বিধাতার ভুল-চুক। কিন্তু শঙ্করের প্রভাব ওর ওপর যেন ষোল আনা। তুমি তো রত্নাকে তেমন করে স্টাডি করোনি—আমি করেছি। জানি। তাই তোমরা যে-পথে ওকে চালাতে চাও, আমি তা চাই না।

অপ্রসন্ন মুখে হরিশ নীরব রহিল। রমেশ কহিলেন—রত্নার গতি তীব্র. গ্রহণ করবার শক্তি প্রখর, আয়ত্তে আনবার ক্ষমতা অদ্ভুত! ওর এতখানি প্রতিভা আমি তোমাদের পরামর্শে নষ্ট হতে দেবো না, দিতে পারি না।

হরিশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গমনকালে বলিয়া গেল,—অতি জিনিষটা ভাল ফল দিতে পারে না, দাদা, আবহমান কাল শুনছি! ও আনে কেবল দুঃখ। বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

অমলার কাণে যখন এ কথা উঠিল, কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত রহিল, তার পর কহিল,—বল্লো কি ছোটবাবু! রাস্তায় রাস্তায় কাগজে মারা হয়েছে এ-কথা।

বিশ্বাস না হয় এই কাগজখানা পড়ে দ্যাখো। এতগুলো ব্যাটাছেলে, মেয়ে-ছেলে, এদের কাউকে তুমি চেনো—কেউ রাজা কেউ রাণী, কেউ সহচরী, কেউ সখা, কেউ সখী। এ-সব কি বৌদি?

রুষ্ট কণ্ঠে অমলা কহিল,—কত মানা করি, কে কাণে কথা তোলে! মেয়ে আমার দোষী নয়। তোমার দাদাই তাকে এমনি করছে—সে আমার লক্ষ্মী মেয়ে! অমলার স্বর বাষ্প-রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হরিশ কহিল,—তুমি এক কাজ করো বৌদি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলা চাহিলেন।

—রত্নার একটা বিয়ে দিয়ে ফেল। ও এবার দেশে এলে, কেঁদে কেটে যেমন করে পারো, সেই ব্যবস্থা করো।

—বিয়ে! অমলা দুই চোখ কপালে তুলিলেন। কহিল,—তোমার ভাই তেড়ে মারতে আসবে ছোটবাবু। মেয়েই পেয়ে ধরেছি,—বাস্, এই যা!

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরিশ কহিল,—মিথ্যা বলনি, কিন্তু দেখ বৌদি, সহজে ছাড়বে কেন। যত রকমে পারো।

আক্ষেপের হাসিতে অমলা কেবল কপালে হাত দিল।

রাত্রে আহারাদির পর অমলা কাগজখানা হাতে লইয়া এক পাড়িতেই রমেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—হরিশ বুঝি তোমার কাছে বিশখানা করে বলে গেছে?

সহোদরের উপর এমন উক্তি রমেশ কদাচ করিতেন না। বিস্মিত কণ্ঠে অমলা কহিল,—বিশখানা আবার কি! আমি মেয়েকে থিয়েটার করতে কলকাতায় পাঠাইনি, পড়তে পাঠিয়েছি।

তড়াক্ করিয়া রমেশ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন! রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—জানি, জানি,—আমি তখন ছোট, ইস্কুলের ছেলে, এক যাত্রা করতুম—অমনি বাবার কানে সব বলতো, উচ্ছন্ন গেছি—অথচ এগজামিনে বরাবর ফার্ষ্ট হয়েছি! বখে গেছি—বখে গেছি, বলে আমার অত বড় প্রতিভাটাকেই নষ্ট করে দিলে। তেমনি পাঁচ শত্রুর আমার মেয়ের পিছনে লেগেছে। কিন্তু আমি বাপ, আমি তার সহায়।

রাগ করিয়া অমলা কহিল,—শত্রুর আবার কে? বলেছে এই তোমার মা'র পেটের ভাই! আর সে মিথ্যে বলেনি। গায়ে লাগে, তাই বলেছে।

রমেশ কহিলেন,—আমি শুনতে চাই না! যত যে পারে বলুক! কারো কথা আমি কাণে তুলবো না! বুঝতে পারো না,—ওর হরিমতী আছে—তাই!

আশ্চর্য্য হইয়া অমলা কহিল,—ওর হরিমতী আছে, তাতে কি!

তপ্ত স্বরে রমেশ কহিলেন,—হুঁ! তাতে কি! আমার মেয়ের হিংসেয় ও তাই জ্বলে মরছে!

অমলা যেন এক নিমেষে পাথর হইয়া গেল। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

প্রজাপতি

পৃথিবীতে যাহা-কিছু সুন্দর ও প্রীতিকর আছে, সেগুলির মধ্যে ফুল, প্রজাপতি এবং পাখী এই তিনটির স্থান অতি উচ্চে। যেখানে ফুটন্ত ফুল, সেইখানেই উড়ন্ত প্রজাপতি। একটি সুন্দর আর একটি সুন্দরকে আহ্বান করে—আকর্ষণ করে। যেখানে ফুল নাই, সেখানে প্রজাপতির দেখা মিলিবে না। ফুলের মধ্যে বর্ণ সম্বন্ধে যেগুলি অধিক সমৃদ্ধ, সেগুলির প্রতিই প্রজাপতিরা বেশী আকৃষ্ট হয়। যে ফুলের বর্ণের বাহার বড় বেশী, সে প্রায়ই সুরভিশূন্য হইয়া থাকে। বর্ণাড়ম্বর-হীন শুভ্র ফুলই সুমধুর সুরভির অধিকারী, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রজাপতিরা বিলাসী বাবুদের ন্যায় রূপ-পিপাসু। যেখানে রূপের হাট, প্রজাপতি সেইখানেই সাগ্রহে ছুটিয়া যায়। প্রত্যেক ফুলের একটা না একটা গন্ধ আছেই। বিবর্তবাদী ডারউইন পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন—পুষ্পরাজির মধ্যে সুগন্ধি ফুলের সংখ্যা শতকরা ১৪.৬ এবং বর্ণৈশ্বর্যশালী কুসুমকুলের মধ্যে সুগন্ধি কুসুমের সংখ্যা ৮.২। প্রজাপতির মধ্যে যাহারা দিবাচর, তাহারা সাধারণতঃ পুষ্পপুঞ্জের বিচিত্র বর্ণরাগে আকৃষ্ট হয়। যাহারা নিশাচর, তাহারা সাধারণতঃ সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত শুভ্র ফুলদলের তীব্র সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া উহাদের দিকে ধাবিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে 'মথ্'-জাতীয় প্রজাপতির সংখ্যাই অধিক।

মথ্ এবং বাটারফ্লাই—উভয়কেই আমরা প্রজাপতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। প্রজাপতিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেপিডপ-টেরা। শব্দটি গ্রীক। এক প্রকার আঁইশবৎ পদার্থে পূর্ণ পক্ষ—গ্রীক শব্দটির ইহাই অর্থ। প্রজাপতির সুদৃশ্য পাখা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার আঁইশবৎ পদার্থের সমষ্টি. অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। প্রজাপতিদের মুখাকৃতি বিচিত্র। চুষিয়া বা শুষিয়া খাওয়াই এই মুখের কাজ। ইহারা মুখের দ্বারা পুষ্প মধু শুষিয়া লয়। ইহাদের চোয়াল বা চিবুকাস্থি দেখা যায় না বলিলেও চলে। তবে উপর চোয়ালের হাড় এক প্রকার শুণ্ডাকার অঙ্গে পরিণতি পাইয়াছে। এই শুঁড়ের ভিতর দিয়া ইহারা পুষ্প-রস বা মধু শোষণ করে। পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইবার সময় এই অপরূপ পতঙ্গদল বিধাতার বিচিত্র বিধানে আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করে। ইহারা এইরূপ না করিলে পুষ্প-জগতে এত বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাইতাম না। মধু শোষণের সময় সেই মধুর আধার পুষ্পের পরাগ প্রজাপতির শরীরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়। সে যখন পুষ্পান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্ব-পুষ্পের সেই রেণু পরবর্ত্তী পুষ্পের বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে প্রজাপতিরা বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণসঙ্কর পুষ্পের সৃষ্টির কারণ হয়।

আজ-কাল য়ুরোপ ও আমেরিকার পুষ্পতত্ত্ববেত্তা উদ্যান-রচনা-নিপুণ পণ্ডিতরা পুষ্পে-পুষ্পে পরিণয় ঘটাইয়া নিত্য নানা প্রকার নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সৃষ্টির প্রত্যূষে যখন উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, তখন তাহাদিগের এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ও সবুজ 'ফ্লোরেট' বা কুসুমিকা মাত্র ছিল। বর্ণ-বিচিত্র কমনীয় কুসুমকুল তখন ছিল না। সেই আদিম অবস্থার উদ্ভিদ্ আজও রহিয়াছে। ক্রিপ্টোগ্রাম-জাতীয় পুষ্পবিরহিত বনস্পতি শ্রেণীর উদ্ভিদে, তাল-জাতীয় তরুরাজিতে, ফার্ণে এবং সবুজ শৈবালদলে আমরা সেই সৃষ্টির প্রত্যূষের দৃশ্য দেখিতে পাই। পণ্ডিতদের মতে বর্ণ-সম্পদে সমৃদ্ধ প্রকৃত পুষ্পপুঞ্জের জন্ম সেই টার্শারী যুগে, যখন লেপিডপটেরা জাতীয় জীবগণ অর্থাৎ প্রজাপতিকুল এই অদ্ভুত অভিনয়-মঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং কমনীয় কুসুমকুলের সহিত রমণীয় প্রজাপতি-পালের এই মধুর সম্বন্ধের ধারা সৃষ্টির প্রভাত হইতে প্রবাহিত।

পুষ্প ও প্রজাপতি উভয়ের সম্পর্ক সত্যই বিচিত্র। পুষ্প না হইলে যেমন প্রজাপতির চলে না, তেমনি প্রজাপতি না হইলে পুষ্পেরও চলে না। এইরূপ আদান-প্রদান চিরকাল চলিতেছে। আপনার প্রসার বা বংশবিস্তার প্রত্যেক প্রাণীরই কাম্য। অবশ্য বিধাতা তাই চান। সেই জন্যই বংশ-বিস্তারের প্রবল প্রবৃত্তি তিনি প্রাণীমাত্রেরই প্রাণে প্রবাহিত করিয়াছেন। ব্যক্তি মরুক, কিন্তু জাতি যেন জীবিত থাকে। বংশধারার বিলোপেই প্রকৃত মৃত্যু। প্রজাপতির প্রতি পুষ্পের অনুরাগকে নিষ্কাম ভালবাসা বলা চলে না। পুষ্প প্রজাপতির প্রতি অনুরক্ত—আপনার শ্রেণী বা জাতিকে যুগ যুগ জীবিত রাখিবার জন্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রজাপতিরা এক প্রকার শুঁড়ের সাহায্যে পুষ্পের মধু শুষিয়া বা চুষিয়া খায়। পুষ্পেরা আপনাদের শরীরটিকে প্রজাপতিদের এই শুণ্ডাকার প্রত্যঙ্গের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে বলিলে ভুল হইবে না। এই উপযোগিতা না থাকিলে প্রজাপতির পক্ষে এই প্রত্যঙ্গটি প্রবেশ করাইয়া পুষ্প-মধু পান করা সম্ভব হইত না। প্রকৃতির অপূর্ব্ব-প্রেরণায় পুষ্পের বুকে প্রজাপতির ভোজের আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই চলিতে থাকে। অবশ্য এই আয়োজন পুষ্পের নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য। অন্য দিকে পুষ্প ভিন্ন প্রজাপতির প্রাণ রক্ষা অসম্ভব। ভূমি-চম্পক শ্রেণীর এবং কমল ও কুমুদ জাতীয় কুসুমকুলের কমনীয় কায়া ও কায়াবর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই পরস্পর নির্ভর-পরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই।

এমন কতকগুলি ফুল আছে, যাহারা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কীট-পতঙ্গমের সহিত সম্মিলিত না হইলে গর্ভ গ্রহণে কিছুতেই সমর্থ হয় না। সেই নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর প্রজাপতি-দলকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহারা নানা প্রকার বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ঘৃতকুমারী বা মুসব্বর জাতীয় বৃক্ষকে বৈজ্ঞানিকগণ "য়ুকা-গ্লোরিওজা" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পগুলিকে আমরা উপরে উল্লিখিত ব্যাপারের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। এই সকল ফুল এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় মথ্-জাতীয় প্রজাপতির মধ্যস্থতা ভিন্ন কিছুতেই গর্ভ গ্রহণ করিবে না। এই রৌপ্য-শুভ্র-শরীর প্রজাপতিগুলির বৈজ্ঞানিক নাম 'প্রোনুবা-য়ুকাসেলা'। এই জাতীয় পুষ্পের পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়া এবং এই শ্রেণীর প্রজাপতিদের 'ইমাগো' বা পূর্ণ পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া উভয় ব্যাপারের বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুধু সাদৃশ্য নয়, উভয়ের বিকাশ সম-সাময়িকও বটে। এই ক্ষুদ্রকায় মথ-জাতীয় প্রজাপতিরা যে ভাবে এই শ্রেণীর পুষ্পপুঞ্জের গর্ভোৎপাদন করে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। প্রজাপতি প্রথমে পুষ্পের নবোদ্গত গর্ভ-কেশরগুলি খুঁজিয়া উহার ভিতর

আপনার ডিমগুলি রাখিয়া দেয়। তার পর দীর্ঘ শুঁড়ের সাহায্যে পুষ্পের পরাগগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র গোলকের আকারে পরিণত করে। এই পরাগ-পিণ্ডটি যতই ক্ষুদ্র হোক্, ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতির মস্তকের প্রায় তিন-গুণ। সেই পিণ্ডটিকে চুয়ালের নীচে চাপিয়া প্রজাপতি উড়িয়া যায় এবং আর একটি ঐ জাতীয় পুষ্পের উপর বসিয়া উহার গর্ভকেশরের ভিতর কিছু ডিম ও পিণ্ডাকারে পরিণত সেই পরাগগুলির কিয়দংশ রাখিয়া দেয়। ক্ষণস্থায়ী জীবন-মঞ্চের উপর মরণ-যবনিকা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। এই ব্যাপার সম্পাদিত হইবার চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে প্রজাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ডিমগুলি হইতে শুঁয়া পোকা বাহির হয়। অনেকেই জানেন, দারুণ ক্ষুধা লইয়া এই কীট-শিশুগুলি সংসারে আসে। অবশ্য স্রষ্টার আশ্চর্য্য নিয়মে আহার্য্য তাহাদের মুখের কাছেই প্রস্তুত থাকে। জন্মিয়াই যেখানে পাইতে পাইবে প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাদের জননীরা তাহাদিগকে সেইরূপ জায়গাতেই রাখে। গর্ভকেশরের বক্ষে রক্ষিত ডিম্ব হইতে সদ্যজাত শূককীটগুলি পুষ্পের 'ওভিউল' বা বীজ-মূলগুলি সম্মুখে পাইয়া বুভুক্ষু রাক্ষসের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে সেইগুলি ভক্ষণ করে। পরে সেই ক্ষুদ্রকায় রাক্ষসরা পুষ্পের অন্তস্তবকের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিম্নস্থ ভূমিতলে অবতীর্ণ হয় এবং পর-বৎসর 'য়ুকা' ফুল ফুটিবার সময় না আসা পর্য্যন্ত নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। পেরুপ্রদেশে এক প্রকার ভুঁই-চাঁপা জাতীয় ফুল জন্মায়; ইহারাও এক শ্রেণীর প্রজাপতির সংসর্গ ভিন্ন গর্ভ গ্রহণ করিতে পারে না।

ইউপ্লিয়া মালসিবার

ব্রহ্মা ওয়ালিচি

এটাকাস্ এট্‌লাস

প্যাপিলিও সেরজেলাস্

নিকটিপাও ম্যাক্রপস্

টিনোপ্যালপাস ইম্পিরিয়ালিস

মথ-জাতীয় প্রজাপতির মুখের অংশ বা অঙ্গগুলি এরূপ পরিবর্ত্তন-প্রবণ যে, পুষ্পের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা চলিতে পারে। ইহারা পুষ্পের কয়েক ইঞ্চি গভীর গর্ভ-কেশরের ভিতরেও আপনাদের শুণ্ড অনায়াসে প্রবেশ করাইতে পারে। কতিপয় মথ-জাতীয় প্রজাপতির মুখ-প্রান্তে কয়েকটি করিয়া দন্তও থাকিতে দেখা যায়। এই দাঁতের দ্বারা ইহারা ফলের উপরকার আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার রস শুষিয়া লয়। এমন কতকগুলি মথ আছে, যাহাদের মুখের অঙ্গগুলির এরূপ অবিকশিত অবস্থা যে, উহাদের সাহায্যে এই সকল পতঙ্গের আহার্য্য-গ্রহণ আ- সম্ভব হয় না, অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হ- এচেরোণ্টিয়া নামক এই শ্রেণীর এক প্রকার প্রজাপতি আছে; ইহাদিগকে মৃত্যুর মস্তক (ডেথস্ হেড্) আখ্যাতেও অভিহি- করা হয়।

প্রজাপতিদের অনুভব-শক্তির প্রধান আশ্রয় শুঁড়। এ- পরম প্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গটি নানা আকারের। এক জাতীয় প্রজাপতি ছাড়া আর সকলেরই শুঁড়ের প্রান্তটিতে একটি গোলাকার গ্রন্থি

(গ্ল্যাণ্ড) আছে। 'হেস্পেরিডাই' শ্রেণীর প্রজাপতিদের শুঁড়ের শেষাংশটি সূক্ষ্মাগ্র। প্রজাপতিদের পাখাগুলি এক প্রকার ঝিল্লী-বিশিষ্ট। এক রকম সূক্ষ্ম আঁইশ ও লোম পক্ষগুলির গাত্রে ঘন ভাবে সন্নিবিষ্ট। এগুলি এমন ভাবে সজ্জিত যে, আঁইশগুলির প্রান্ত ভাগ লোমগুলির প্রান্তের উপর গিয়া পড়িয়াছে বলা চলে। পক্ষগুলির তলদেশে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিরাজিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত। সম্মুখের পাখায় ১২টি এবং পশ্চাতের

একটিয়াস্ সাইলেনি

কালিমা ইনাচিস্

একটিয়াস্ লেটো

ট্রোবাটা বিষ্ণু

ইউসেমিয়া এডালাটি্স

পেরেনিয়া ফেকিনারিয়া

পাখায় ৮টি শিরা আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত। মথজাতীয় প্রজাপতির পাখাগুলি 'ফ্রেনুলাম' নামক এক প্রকার উপাঙ্গের দ্বারা সংযুক্ত। এই উপাঙ্গটি পশ্চাতের পাখার কিনারার তলদেশ হইতে বাহির হইয়া পুরোভাগের পাখার অধঃপার্শ্বের লোমগুলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রজাপতির উদরদেশ আট বা নয়টি সুকোমল অংশের সমষ্টি। ইহাদের পা'গুলি এইরূপ যে, প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়। কতিপয় প্রজাপতির পা আকারে এত ছোট যে, দেখিলে লোম বলিয়া মনে হয়। এইরূপ পায়ের সাহায্যে চলা-ফেরা চলে না।

হিমাচলের উত্তর-পশ্চিমাংশে আমরা যে সব প্রজাপতি দেখিয়াছি, তাহাদের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বর্ণ পাণ্ডুর। পূর্ব্ব-হিমাচলের প্রজাপতিরাও আকারে বৃহৎ, কিন্তু তাহাদের রঙ গাঢ়। সে জন্য হিমাচলের পশ্চিমাঞ্চলের প্রজাপতি অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলের প্রজাপতিরা অধিক চিত্তাকর্ষক। ভারতবর্ষের উপদ্বীপাংশের অপেক্ষাকৃত স্বল্প-সলিল, অনুর্ব্বর প্রদেশসমূহের প্রজাপতিদের আকার ক্ষুদ্র এবং বর্ণ পাণ্ডুর। উপদ্বীপের সলিলসিক্ত নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যে সকল প্রজাপতি দেখা যায়, তাহারা আকারে ছোট বটে, কিন্তু বর্ণে গাঢ়তা আছে। প্রাণি-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই, ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি, না আবহাওয়া-ভেদে এ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে?

প্রজাপতিদিগকে দুইটি বিরাট বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—রোপালো-সেরা ও হেটেরো-সেরা। নাম দুইটি গ্রীক। রোপালো-সেরা নামটি দুইটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে সম্ভূত। এই জাতীয় প্রজাপতির শুঁড়টির প্রান্তভাগ গ্রন্থিবিশিষ্ট বলিয়া এইরূপ আখ্যা। মথজাতীয় প্রজাপতিদেরই বৈজ্ঞানিক গ্রীক নাম হেটেরো সেরা। নামটির অর্থ বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট শৃঙ্গ। পণ্ডিতদের অনুমান, প্রথমটি অর্থাৎ রোপালো-সেরারাও (ইহারাই বাটারফ্লাই আখ্যায় অভিহিত) মথ-জাতীয় পিতৃপুরুষ হইতেই সম্ভূত। বাটারফ্লাই বা খাস প্রজাপতিরা ছয়টি উপবিভাগে বিভক্ত অথচ মথদিগের ভিতর প্রায় ৩৪টি উপ-শ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং খাস প্রজাপতি অপেক্ষা মথদিগের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য অনেক অধিক। উভয়ের জীবন-প্রবাহই চারিটি বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া আশ্চর্য্য ভাবে রূপান্তরিত হয়। প্রথমটি (এগ) ডিম্বাবস্থা, দ্বিতীয়টি (লার্ভা) শুঁয়া পোকার অবস্থা, তৃতীয়টি (পুপা বা ক্রিসালিজ) পক্ষোদ্গমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জড়কীটাবস্থা, শেষ বা চতুর্থটি (ইমাগো) উদ্গতপক্ষ উড্ডয়নশীল পূর্ণ-পরিণত প্রজাপতি-অবস্থা। প্রজাপতি-মাতা এক-একটি করিয়া পৃথক্ ভাবে, কখনও বা গুচ্ছে গুচ্ছে বা একত্র অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া থাকে। কখনও কখনও মাতা আপনার দেহ হইতে সূক্ষ্ম ও সুকোমল লোমসমূহ উৎপাটিত করিয়া উহাদিগের দ্বারা ডিমগুলিকে আচ্ছাদিত করে। ডিমগুলির আকারগত ও বর্ণগত বৈচিত্র্য বিস্ময়জনক ও একান্ত চিত্তাকর্ষক। পত্র বা পুষ্পের উপর বিরাজিত বিভিন্ন-বর্ণরাগে বিচিত্র ডিমগুলিকে রমণীয় রত্নরাজি বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

• ডিম পাড়িবার পর লেপিডপটেরা জাতীয় পতঙ্গগণের অর্থাৎ

প্রজাপতিদিগের ভাবী সন্তানদের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা দেখা যায় না। অথচ শাবকের জন্য পক্ষিণীর বিপুল ব্যাকুলতা। প্রজাপতিদের স্বভাব অনেকটা সুবেশে সজ্জিত আত্মসুখাভিলাষী বিলাসী বাবুর ন্যায়। প্রজাপতিদের পক্ষে কোন দার্শনিক মতবাদ যদি অবলম্বন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া চার্ব্বাক-দর্শনের সুখবাদকেই আগ্রহে গ্রহণ করিত। আমরা যেগুলিকে রেশম-কীট বলি, তাহারা এক প্রকার মথ-জাতীয় প্রজাপতি। রেশম-কীট শ্রেণীর মথদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি অদ্ভুত স্বভাবের প্রজাপতি আছে—যাহাদের স্ত্রী-জাতি পুং-প্রজাপতিদিগের সহায়তা ভিন্ন পুরুষানুক্রমে বংশ বিস্তার করিয়া আসিতেছে। যাহারা এইরূপ করে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাদিগকে "পার্থেনো-জেনেটিক" বলা হয়।

ডিম পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অভ্যন্তরস্থ শুঁয়া পোকা উপরের আবরণ কামড়ের সাহায্যে বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে এবং ক্ষুন্নিবারণের জন্য সর্ব্বাগ্রে ডিমের অবশিষ্ট অংশগুলি খাইয়া ফেলে। শুঁয়া পোকার শরীর সাধারণতঃ ১৩টি অংশে বিভক্ত। প্রথমে মাথা, তার পর বুক। বুকের সহিত দুইটি পা সংলগ্ন আছে। ইহারা প্রকৃত পাই বটে। ইহার পর পেট। পেটের সহিত চারি জোড়া বা আটটি পা সংলগ্ন রহিয়াছে। লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, উহারা বিচরণোপযোগী প্রকৃত চরণ নহে, আরোহণ করিবার অবলম্বন মাত্র। পা না বলিয়া উহাদিগকে উদরদেশের সহিত সংলগ্ন কতিপয় মাংসময় সন্ধি বা গ্রন্থি বলা চলে। ইহারা শুঁয়া পোকাকে পত্র-পুষ্পে আরোহণ করিতে সাহায্য করে। আমরা শুঁয়া পোকার শরীরের যে অংশ বা অঙ্গগুলির তালিকা দিলাম—উহাদের কতিপয়ের গাত্রে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ছিদ্রগুলির সাহায্যে শুঁয়া-পোকা শ্বাস গ্রহণ করে। গোলাকার ও গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট স্ফোটকবৎ উচ্চাংশসমূহে ছিদ্রগুলি অবস্থিত। স্ফোটকের চারিপার্শ্বে শৃঙ্গবৎ কাঠিন্য। কোন কোন শুঁয়া পোকার গাত্র মসৃণ ও অনাবৃত এবং কাহারও কাহারও দেহ রেশমের ন্যায় মোলায়েম একপ্রকার লোমাবলীতে আচ্ছাদিত। কোন কোন শূককীটের শরীরে ভাল্লুকের মত লোম। কোন কোন কীটের সমগ্র শরীর লোমাবৃত না হইয়া লোমগুচ্ছ স্থানে স্থানে অবস্থিত। কোন কোন শুঁয়ার সর্ব্বাঙ্গে আব। আবার এমন শুঁয়া পোকাও অনেক দেখা যায়, যাহাদের দেহ কণ্টকাকীর্ণ। এই কণ্টকবৎ অংশগুলিই শূক বা শুঁয়া। এমন শুঁয়া পোকা আছে, যাহাদের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবের পরিবর্ত্তে বড় বড় স্ফোটক, যেন পিঠের উপর কয়েকটি কুব্জ বিরাজিত।

এমন শুঁয়া পোকাও আমরা দেখিয়াছি, ভীমরুলের ন্যায় তাহাদের শক্তিশালী হুল আছে। একটি মাত্র হুল নয়। এক একটা কীটের শরীরে এক এক গোছা হুল আছে। এই রকম শূককীট সিকিমের দিকেই বেশী দেখা যায়। হিমাচলের পূর্ব্বাঞ্চলে একরূপ শুঁয়া আছে, যাহাদের গৃহের কাছে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। কারণ, বালুকার ন্যায় এক প্রকার অতি সূক্ষ্মাকার লোমাবলী ইহাদের বাসস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদা ভাসিতেছে। অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই ধূলি বা বালুবৎ সূক্ষ্ম লোমগুলির আকার অনেকটা হুলের ন্যায়। এই হুলাকার ধূলা দর্শকের দেহে কোন প্রকারে লগ্ন হইলে অত্যন্ত জ্বালা জন্মায়। সিকিমে 'লাইমা-কোডিডাই' আখ্যায় অভিহিত এক জাতীয় শুঁয়া আছে, যাহাদের দেহে সারিবদ্ধ ভাবে বিরাজিত কণ্টকরাজি একপ্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট তরল পদার্থে পূর্ণ। কণ্টকশ্রেণীর প্রান্তদেশে একটি আবের ন্যায় অংশ এবং সেই অংশের গায়ে ক্ষুদ্র বা খর্ব্ব কিন্তু তীক্ষ্ণ কুঁচির ন্যায় লোমাবলী। এই শ্রেণীর শুঁয়া পোকা কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তৎক্ষণাৎ পা গুটাইয়া লয় এবং সারিবদ্ধ ভাবে প্রসারিত ঐ কণ্টকাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত তীব্র তরল পদার্থ নির্গত করে। ঐ পদার্থ দর্শকের দেহে একটি কণা যদি লাগে, তাহা হইলে জ্বালা-যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

কেরিয়া-সবিটিক্সিস্ আখ্যায় অভিহিত এক শ্রেণীর শুঁয়া পোকাও প্রধানতঃ সিকিমেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের বুকের অংশ শোথ রোগীর শরীরের ন্যায় স্ফীত এবং উহাতে এমন একটি গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি আছে, কীটটি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে তাহা হইতে এক প্রকার যন্ত্রণাজনক তীব্র তরল দ্রব্য নিঃসৃত হয়। প্যাপিলিয়নিডেট-জাতীয় শুয়া পোকার শরীরে এক অদ্ভুত অঙ্গ বা যন্ত্র আছে। অঙ্গটির নাম অস্ম্যাটেরিয়াম্। ইহার আকার অনেকটা ইংরেজী 'ওয়াই' অক্ষরের ন্যায়। বুকের অংশবিশেষের দ্বারা প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া শুয়ার শরীরের এই বিচিত্র যন্ত্রটি বাহির হইতে দেখা যায় না। কীটটি উত্তেজিত হইলে এই যন্ত্র হইতে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। একপ উত্তেজনার সময় শুঁয়া তাহার মাথা নোয়াইয়া শরীর বেঁকাইয়া এক প্রকার বিচিত্র ভঙ্গী অবলম্বন করে। ইহারাও জ্বালাজনক সূক্ষ্ম লোম-ধূলি উড়ায়। ঐ অপ্রীতিকর গন্ধটিও অনিষ্টজনক।

শূককীটগুলিকে সর্ব্বভুক্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে সকলের ক্ষুধা ও রুচি সমান নয়। কয়েক শ্রেণীর শুঁয়া পোকা নানা প্রকার উদ্ভিদ ভোজন করে। আবার এমন শ্রেণীও আছে, যাহার অন্তর্ভুক্ত কীটগুলি কেবল একপ্রকার খাদ্যই গ্রহণ করে। উহারা অনাহারে মরিবে তবু অন্য রকম আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। কতকগুলি কীট সকলের সমক্ষে ভোজ্য উদরস্থ করিতে দ্বিধা করে না। অন্য দিকে কতিপয় কীট ভোজন-ব্যাপার গোপনে সম্পাদিত করিতে ভালবাসে। কেহ খাদ্য খুঁজিয়া খায়, কেহ খাদ্যের মধ্যেই বাস করে। শেষোক্ত শ্রেণীর কীটদিগের কেহ কেহ বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, এমন কি শিকড়ে পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া এই সকল বিভিন্ন অংশকে কুরিয়া খাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহারা পুষ্প বা পত্র যাহাই পাক্, সমস্তই রাবণের চিতার ন্যায় চিরপ্রজ্বলিত উদরাগ্নিতে আহুতি দেয়। এমন কীট আছে, যাহারা আহার্য্য নির্ব্বাচনে ও গ্রহণে সংযমের পরিচয় দেয়। নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ন্যায় কতকগুলি শূককীট বিশুদ্ধ টাটকা খাদ্য ছাড়া কিছুতেই অন্য কিছু খাইবে না। অন্য দিকে কতকগুলি কীট পরিত্যক্ত চুল, ন্যাকড়া প্রভৃতি ঘৃণারজনক জিনিষ উপাদেয় খাদ্যবোধে সানন্দে সেবন করে।

শূককীট ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার সময় দুই হইতে পাঁচ বার পর্য্যন্ত খোলশ ছাড়ে। খোলশ ছাড়িবার পর বর্ণ ও আকার উভয়েরই পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়। ইহাদের দেহের দুই দিকে দুইটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিদ্বয় হইতে এক প্রকার নিঃস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। এই নিঃস্রাব বাতাসের স্পর্শে তরলতা পরিত্যাগ করিয়া রেশমী সূত্রাকারে পরিণতি পায়। এই রেশমী সূত্র অবলম্বন করিয়া শুঁয়া পোকা বিস্ময়কর রূপান্তরিত প্রাপ্ত হইবার জন্য ঝুলিতে থাকে। এইবার এই বিচিত্র প্রাণী প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত

পূর্ব্ববর্ত্তী পুপা বা ক্রিসালিজ অর্থাৎ জড়কীটাবস্থা লাভ করিবে। পুপায় পরিণতি পাইতে ইহারা তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করে। একটি উপায় পূর্ব্বোক্ত রেশমী সূত্রের সাহায্যে আপনাদের দেহকে দোদুল্যমান করা এবং ঐরূপে জড়কীটে রূপান্তরিত হওয়া। কোন কোন শুঁয়া পোকা এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে (এক শ্রেণীর যোগীর ন্যায়) ভূগর্ভস্থ গুহাগৃহে অবস্থান করে। কেহ বা এই অবস্থায় আপনার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার রেশমী গুটি প্রস্তুত করে। এই গুটির ইংরেজী নাম কোকুন। এই জড়কীটাবস্থায় ইহাদের বহির্জ্জগতের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। এই অদ্ভুত অবস্থা কিছু কাল থাকার পর বিশ্বস্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি এই প্রাণী 'ইমাগো' বা পূর্ণ পরিণত অবস্থা লাভ করিয়া পক্ষচতুষ্টয়-বিশিষ্ট ষট্পদশালী প্রজাপতি নামক পতঙ্গে পরিণতি পায়। কণ্টকাকীর্ণকায় বৃক্ষে যাহা কদর্য্য কীট যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়া-বলে রূপান্তরিত হইয়া অকস্মাৎ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের আধার পক্ষপুট প্রসারিত করিয়া পুষ্পে পুষ্পে উড়িতে আরম্ভ করে।

লেপিডপটেরা জাতীয় এই পরম মনোরম পতঙ্গমগণের দীপ্তিশালী বিচিত্র বর্ণ-সমূহের কারণ নির্দ্ধারণ করিলে দেখিব, ইহাদের দেহস্থ কতিপয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে এই চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য রচিত হইয়াছে। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের অন্যতম হেতু প্রজাপতিদের এই আশ্চর্য্য বর্ণৈশ্বর্য্য, এই অপরূপ রূপ শুধু যে অলঙ্কারের কার্য্য করিতেছে তাহা নয়, ইহাদের বিচিত্র জীবনধারার পক্ষে এই চিত্তাকর্ষক বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য এবং যৌন জীবনের প্রয়োজনসাধনের জন্যও ইহা আবশ্যক। অনেকে হয় তো জানেন, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু হইতে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বহির্গত হয় ও বিলয় পায়। অন্য দিকে শুভ্রবর্ণের ধর্ম্ম উত্তাপ-সংরক্ষণ। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, বর্ণ শুধু বাহিরের ব্যাপার নহে, প্রাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহের সহিত তাহার সুখ-দুঃখের সঙ্গেও উহার সম্পর্ক আছে।

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রজাপতিদের পক্ষে বর্ণ-বৈচিত্র্যের আবশ্যকতা আছে—এই সত্য আমরা পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এই বৈচিত্র্যের জন্যই পুষ্পের উপর বিরাজিত প্রজাপতিকে পুষ্প বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজাপতির দেহে যে বর্ণের প্রাধান্য, সেই বর্ণবিশিষ্ট পদার্থের উপর উপবিষ্ট থাকিলেই শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রম জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রজাপতির রঙ এবং তাহার খাদ্যের আধার বৃক্ষ-লতার রঙ প্রায়ই অভিন্ন। পারিপার্শ্বিকের সহিত এইরূপ বিস্ময়কর বর্ণগত সাদৃশ্য অপার কৃপার পারাবার বিধাতার জীবের প্রতি অনন্ত অনুকম্পার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পারিপার্শ্বিককে নকল করিবার কৌশল কেমন করিয়া আয়ত্ত করে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সিকিমের জঙ্গলে ভ্রমণকালে কীট-পতঙ্গদিগের অনুকরণ-কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখিয়াছিলাম। বৃক্ষপত্রে অবস্থানকালে একটি শুঁয়া পোকাকে সেই পত্র চর্ব্বণের দ্বারা এমন ভাবে কর্ত্তন করিতে দেখিয়াছি যে, উহা অচিরে তাহার শরীরের অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্যই সে এই কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই। জিয়োমেট্র জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়া পোকারা বৃক্ষের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখায় বা পাতায় বাস করে, ঠিক সেই প্রশাখা বা পাতার অনুরূপ বর্ণ ও আকার তাহারা ধারণ করিয়া থাকে। অন্ততঃ তাহারা এমন কৌশল অবলম্বন করে যে, পারিপার্শ্বিক ও তাহাদের দেহ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ হয় না।

শত্রুকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য এই সকল শুককীট ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে যে, সে সহিষ্ণুতায় বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে ইহারা এই ধ্যানস্তব্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আহারের জন্য অবস্থান্তর অবলম্বন করে। কয়েক জাতীয় প্রজাপতিদের শুঁয়া পোকারা আত্মরক্ষার জন্য সত্য সত্যই বর্ণান্তর ধারণ করে—পণ্ডিতেরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু যে প্রণালী বা প্রক্রিয়ায় এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয়, তাহার রহস্য তাঁহারা আজিও ভেদ করিতে পারেন নাই। ফিনিক্স-শ্রেণীর প্রজাপতির কীটরা বৃক্ষের বক্ষে আহার্য্য গ্রহণ করিবার সময় সমুজ্জ্বল সবুজ বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু যখন তাহারা জড়-কীটাবস্থা বা পুপা রূপ পরিগ্রহের জন্য ভূতলে অবতরণ করে, তখন তাহাদের দেহ বাদামী বর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। 'ফিনিক্স' এই আখ্যার কারণ—এই জাতীয় প্রজাপতির কীটগুলির আকৃতি কতকটা মিশরের ফিনিক্স নামক অদ্ভুত মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ—এইরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

এক প্রকার প্রজাপতিকে প্রাণিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ 'ষ্টাউরোপাস সিকিমেনসিস' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সিকিমের নিবিড় জঙ্গলে বাস বলিয়া এইরূপ নাম। শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্য এই জাতীয় প্রজাপতিদের শুঁয়া পোকারা শরীরের পশ্চাদ্ভাগের প্রান্তকে স্ফীত করিয়া দেহটিকে অন্য প্রকার প্রাণীর অনুরূপ করিয়া তুলিতে সক্ষম। এই শ্রেণীর অল্পবয়স্ক শুঁয়ারা শরীরটিকে ঠিক পিপীলিকার মত আকার প্রদান করে এবং বয়স্ক কীটগণ এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে মাকড়সা বলিয়া বিভ্রম জন্মায়। ইহাদিগের দেহের গঠনগত বৈশিষ্ট্যও ইহাদিগকে এ বিষয়ে সহায়তা করে। ইহাদের প্রথম পা-যোড়া অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। দেখিলে কোন হিংস্র কীট-পতঙ্গের ভয়াল চুয়াল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বয়স্ক কীটরা শরীরটিকে উল্টাইয়া এরূপ ভীতিজনক ভঙ্গী অবলম্বন করে যে, দেখিবামাত্র মনে হইতে পারে—কোন ক্রুদ্ধ মাকড়শা শিকার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। 'ইচনিউমন্স' আখ্যায় অভিহিত এক প্রকার মক্ষিকা প্রজাপতিদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু। ইহারা পরাঙ্গ-পুষ্ট প্রাণী। এই ভয়ঙ্কর শত্রুর অন্তরে বিভ্রম জন্মাইবার জন্য ইহারা বহু বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বন করে। যখন দেখে শত্রু আসিতেছে, তখন শরীরের গাঢ় কৃষ্ণচিহ্নাঙ্কিত প্রচ্ছন্ন অংশবিশেষ তাহার সম্মুখে এমন ভাবে প্রকটিত করিয়া তুলে যে, মক্ষিকা পোকাটিকে অপরের দ্বারা পূর্ব্বেই আক্রান্ত, মনে করিয়া ফিরিয়া যায়। এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট প্রাণীর বিচিত্র বৈশিষ্ট্য—ইহারা অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রাণীকে কখনও আক্রমণ করে না। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ চিহ্নগুলিকে তাহারা আক্রান্ত কীটের জমিয়া যাওয়া রক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রজাপতির শুঁয়া পোকার পুচ্ছটি খণ্ডিত বা ফাটলবিশিষ্ট। কীটটির ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি ভাবান্তর জন্মিলে এই পুচ্ছের ঈষৎ লাল, মাংসল ও চাবুকাকৃতি প্রত্যঙ্গবিশেষ প্রকটিত করিবার প্রবণতা দেখা

যায়। শুঁয়া পোকার মাথাটি সমতল। শরীরের দ্বিতীয় অংশটির উপর মাথা ভাঁজ করা আছে বলিয়া মনে হয়। উত্তেজিত হইবামাত্র শুঁয়া পোকার মস্তকের চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল একটি লাল বৃত্ত দেখা যায়। বৃত্তটি তাহার দেহের দ্বিতীয় অংশের (অর্থাৎ বক্ষস্থলের) প্রান্তে পরিদৃষ্ট হয়। ঐ লাল বৃত্তের ভিতর এমন স্থানে দুইটি গাঢ় কৃষ্ণচিহ্ন বিদ্যমান থাকে যে, ঐ চিহ্নদ্বয়কে দুইটি চক্ষু বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। বৃত্তটি আগাইয়া আসিয়া অবিশ্রাম স্পন্দনে অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য প্রকাশিত করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তখন শত্রুদলের পক্ষে সেই পোকাকে ভয়াবহ প্রাণী বলিয়া মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শত্রুপক্ষ ইহাতেও ভীত না হইলে পূপ-মথ-জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়া পোকারা আর এক উপায় অবলম্বন করে। পূর্ব্বোক্ত লাল বৃত্তটির নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত একটি গ্রন্থি হইতে অত্যন্ত তীব্র ও কটু এক প্রকার নিঃস্রাব সবেগে নির্গত করে। এই নিঃস্রাবে ফর্ম্মিক এসিড নামক দারুণ দাহজনক দ্রব্যের পরিমাণ অধিক বলিয়া চোখে যৎসামান্য লাগিলেও যন্ত্রণাকর প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

ওফিদেরিস জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়াদিগের ইচ্ছা ও চেষ্টা আপনাদের দেহকে সর্প-শির বলিয়া ভ্রম উৎপাদনের দিকে। ইহারা মাথাটিকে নত করিয়া এমন ভঙ্গীতে দেহটিকে বক্র করে যে, ইহাদের শরীরকে সর্প-শির বলিয়া বিভ্রম জন্মান অসম্ভব হয় না। ইহারাও দুইটি কালো চিহ্নকে এমন ভাবে আগাইয়া দেয় যে, উহাদিগকে দুইটি অপলক চক্ষু বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। যখন কীটটির শরীর পল্লবাদির অন্তরালে অংশতঃ প্রচ্ছন্ন থাকে, তখন ঐ নিষ্পলক চক্ষুবৎ কৃষ্ণচিহ্নদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের অনুরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকটিত করে সন্দেহ নাই। সিকিমের পোর্থেজিয়া—উরাণটিয়াকা ও ওর্গিয়া-পোষ্টিকা এই দুই প্রকার শুঁয়া পোকাও ফর্ম্মিক এসিডের অনুরূপ দাহজনক নিঃস্রাব গ্রন্থিবিশেষ হইতে নিঃসৃত করে। ইহা গায়ে লাগিলে এক প্রকার স্ফোটক জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রজাপতিদের আশ্চর্য্যজনক বর্ণৈশ্বর্য্য যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধেও সাহায্য করে, সে কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ডারউইনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পুং-প্রজাপতি বর্ণ-বৈচিত্র্যের দ্বারা স্ত্রী-প্রজাপতিদিগকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রী-প্রজাপতিরা এই সকল পাণিপ্রার্থী পুং-প্রজাপতিদলের মধ্যে তাহাদিগকেই পতিত্বে বরণ করে—যাহারা তাহাদের রুচি অনুযায়ী বিচিত্র বর্ণ-সম্ভারে সজ্জিত এবং কার্য্যদক্ষ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, প্রজাপতিদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব্বপুরুষরা এরূপ বিচিত্র বর্ণ সম্পদের অধিকারী ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে কোন নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের ফলে এই চিত্তচমৎকারী বর্ণবৈচিত্র্য জন্মিয়াছে। এই রাসায়নিক ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশের সহিত যৌন আকর্ষণও উহার আনুষঙ্গিক আবেগের সম্বন্ধ আছে এই সত্যও পণ্ডিতরা আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ আকর্ষণ ও আবেগের রহস্যজাল এখনও তাঁহারা ছিন্ন করিতে পারেন নাই।

অনেকের মত, স্ত্রী ও পুরুষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরস্পরকে চিনিতে পারে। এই অনুভবশক্তি শুঁড়ের ভিতর রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শুঁড়ই প্রজাপতির অধিকাংশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আধার, অনেকে এমন কথাও বলেন। যে গন্ধের সাহায্যে যৌন পরিচয় ও সম্মিলন সম্ভব হয় তাহা কোথা হইতে সম্ভূত, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রজাপতিদের দেহে কতিপয় গন্ধপ্রসূবিশিষ্ট অংশ বা অঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের আকার সূক্ষ্মাগ্র লোমগুচ্ছের ন্যায়। পুং-প্রজাপতিদের পশ্চাদ্বর্ত্তী পাখার প্রান্তে এই লোমাকার গন্ধপ্রসূ অঙ্গগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরাজিত। কতিপয় মথ-জাতীয় প্রজাপতির মধ্যে এই অঙ্গগুলি লোমাকার না হইয়া চন্দ্রাকার এবং উহারা পশ্চাদ্ভাগের পাখার ভাঁজের ভিতর অবস্থিত। হেপিয়ালি শ্রেণীর পুং-প্রজাপতির পশ্চাদ্বর্ত্তী পায়ে এক প্রকার স্ফীতি দেখা যায়। কতকগুলি গ্রন্থি এই স্ফীতির কারণ। এই গ্রন্থিগুলি হইতে মৃগনাভির ন্যায় এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতিদের দেহ হইতেও এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হয়, কিন্তু মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা অনুভূত হইতে পারে না; পুং-প্রজাপতিরা উহা অনুভব করিতে পারে, এই সত্য সংশয়াতীত। কোন স্ত্রী-প্রজাপতিকে বৃক্ষের শাখা বা পত্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে অল্পক্ষণ পরেই দেখা যাইবে, কতকগুলি পুং-প্রজাপতি তাহার চারি ধারে ঘুরিয়া বা উড়িয়া বেড়াইতেছে।

জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য প্রজাপতিদের পুচ্ছের প্রয়োজন আছে। কাহারও পুচ্ছ দীর্ঘ ও সরু, কাহারও পুচ্ছ মোটা ও খাটো কিন্তু পুচ্ছের অবস্থা সকলের বেলায় সমান। এ পুচ্ছ সকল জাতের প্রজাপতিরই পশ্চাদ্বর্ত্তী পাখার সহিত সংলগ্ন থাকে। যখন আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন শরীরের পরম প্রয়োজনীয় প্রধান অঙ্গগুলি হইতে সরাইয়া শত্রুর দৃষ্টিকে এই গৌণ অঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, প্রজাপতির পক্ষে পুচ্ছ-বিহীন হইয়াও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়।

কোন-কোন জাতির শুয়া পোকারা ক্ষুধিত রাক্ষসের ন্যায় একটা বিরাট বনের সমস্ত বৃক্ষপত্র উদরস্থ করিয়া ফেলিতে পারে। সময়ে সময়ে সমস্ত সবুজ বীজ-শস্য খাইয়া ইহারা কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কোন কোন প্রজাপতি আবার সর্ব্বভুক্ প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক প্রকার পক্ষশূন্য স্ত্রী-মথ আপনাকে জীবন্ত সমাহিত করে। সেই সমাধি-কন্দরের অভ্যন্তরেই পুং-প্রজাপতির সহিত তাহার পরিণয় ঘটে এবং সেই স্থানেই তাহার গর্ভের সঞ্চার হয়। সন্তান সম্ভূত হওয়ার পর সেই কারাগার মাতার শবাধার হইয়া পড়ে। শুয়ারূপী সন্তান সেই কারাগৃহ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয় এবং মাতার মৃতদেহ সেখানে পড়িয়া থাকে। কোন কোন কীটের বেলায় এই কারাগৃহটি একটি রেশমের গুটি।

মথ-প্রজাপতিরা যদি মানব জাতির কোন অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ তাহারা ভাল ভাবে করিয়া থাকে। যে রেশম শিল্প ও বাণিজ্য জগতের একটি পরম লাভজনক সামগ্রী, তাহা এই মথ-প্রজাপতিদের অনুপম অবদান। প্রধানতঃ বম্বিসিদাই ও স্যাটার্নিদাই এই দুই জাতীয় মথ হইতেই রেশমের জন্ম। এই দুই জাতীয় মথের সংখ্যাও বিস্ময়কর। ইহাদের শুঁয়া পোকারাই সিল্ক-ওয়ার্ম বা গুটিপোকা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। রেশম পাইবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা ইহাদিগকেই সযত্নে পালন করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে রেশম-চাষ ও

রেশম-শিল্প চীনবাসীর দ্বারাই সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের দুই বা তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও চীনারা এই মথ জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়া পোকা পালন করিয়া রেশম উৎপন্ন করিবার প্রক্রিয়া বা প্রণালী জ্ঞাত ছিল। এই রেশম-রহস্য তাহারা অন্য কোন জাতিকে জানাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। চীনবাসিনী এক মোঙ্গোলীয়ান রাজকন্যা মধ্য-এশিয়ার জনৈক রাজপুত্রের সহিত পলায়ন-কালে রেশমপ্রসূ প্রজাপতিদের কতকগুলি ডিম, কতকগুলি শুঁয়া পোকা এবং তৎসঙ্গে রেশম-কীটের খাদ্য কিছু তুঁত গাছও গোপনে লইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার দেড় শত বৎসর পরে রেশমতত্ত্ব পারস্যে ও গ্রীসে এবং অবশেষে রোমে প্রবেশ করিয়াছিল। পুরোহিতরা শূন্যগর্ভ যষ্টিসমূহের ভিতর রেশম-প্রজাপতির ডিম সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে রোম-সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানের নিকটে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত। রোমবাসী প্লেটোর (গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন) কন্যা প্যামফাইল ঐ মহানগরের ভিতর সর্ব্বপ্রথম রেশমসূত্র হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়াছিল বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি অনুসারে রেশমকীট গৃহপালিত ও বন্য এই দুই প্রকার আখ্যায় অভিহিত হয়। 'বন্য'-শ্রেণীর পোকারা বন্দী অবস্থায় কিছুতেই আহার্য্য গ্রহণে সম্মত হয় না। সেই জন্য ইহাদের প্রত্যেককে বৃক্ষকুঞ্জের বিভিন্ন অংশে রাখিতে হয়। সাধারণতঃ শাল প্রভৃতি কয়েকটি আরণ্য পাদপ ইহাদের বাস-স্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেন অন্য কোন গাছ-গাছড়া বা আগাছা রেশম-কীটগুলির বাসস্থলে না জন্মায়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এই বন্য-শ্রেণীর অন্যতম এ্যান্থেরিয়া প্যাফিয়া জাতীয় মথ প্রজাপতিরাই তসর-কীট। আর এক প্রকার আরণ্য রেশমকীটকে আনথেরিয়া আসামা আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ইহাদের কীটগুলিকে কেবল এক প্রকার চম্পক বৃক্ষের পত্র খাওয়াইয়া রাখিলে ইহারা অতি সুন্দর ও শুভ্র রেশম প্রসব করে। এই সকল কীটকে সাধারণতঃ আসামে দেখা যায়। পূর্ব্বে আসামের আহোম নৃপগণ ছাড়া এই উৎকৃষ্ট রেশম অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পাইত না বলিয়া কথিত। এই জাতীয় রেশম-কীটের স্বভাবও রাজোচিত। ইহাদের জন্য নির্ব্বাচিত বৃক্ষে পূর্ব্ব হইতে অন্য কীট থাকিলে ইহারা সেই বৃক্ষে থাকিয়া পত্র ভক্ষণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইবে না। য়্যাটাসাস-রিসিনি-জাতীয় রেশম-কীট পালন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এড়ণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর বক্ষস্থ যে কোন জায়গায় ইহারা সানন্দে বাস করিবে। ইহারাই এণ্ডি বা এড়ি নামক রেশম প্রসব করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক জাতীয় মথ মৃত্যুর মস্তক আখ্যায় অভিহিত। কীটগুলি আকারে বৃহৎ এবং গাঢ় বাদামী বর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের বুকের মাঝখানে এক প্রকার পীতাভ বিচিত্র চিহ্ন। চিহ্নটির আকার অনেকটা মানুষের মাথার খুলির ন্যায়। এই জন্যই নাম মৃত্যুর মস্তক। ইহাদের দেহ সবুজ ও বেশ মসৃণ এবং উহা বেগুনী রঙের রেখায় আচ্ছাদিত। ইহাদের শরীর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্নে মণ্ডিতও বটে। ইহাদের পুচ্ছের নিকটবর্ত্তী একটি অংশ বক্র হইয়া শৃঙ্গাকারে পরিণতি পাইয়াছে। অংশটি শক্ত এবং এক প্রকার স্ফোটকে পূর্ণ। এই জাতীয় মথদের শুঁয়ারা চা এবং ধুতুরা বৃক্ষের পত্র খাইতে ভালবাসে বলিয়া ইহাদিগকে এই সকল বৃক্ষে প্রায়ই দেখা যায়। এক প্রকার বিস্ময়কর বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ইহাদের বিদ্যমান। ভীত হইলে ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার অদ্ভুত কিচকিচ শব্দ নির্গত হয়। এই শব্দ অনেকটা ইন্দুরদের শব্দের ন্যায়। এই শব্দরহস্য পণ্ডিতগণ এখনও ভেদ করিতে পারেন নাই। তবে অনুমান হয়, একটি পায়ের দ্বারা ধীরে ধীরে চাপ দিয়া ইহারা এই শব্দ করে। মাথাটিকে বুকের উপর ঘষিয়া এই শব্দ বাহির করা হয়, এইরূপ অনুমানও কেহ কেহ করেন। শুণ্ডদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া এইরূপ শব্দ নির্গত করাও অসম্ভব নয়। এই জাতীয় শূককীট ও প্রজাপতি উভয়েই এই শব্দ করিতে পারে। এই শব্দ এবং বুকের উপর অঙ্কিত মাথার খুলির ন্যায় চিহ্নের জন্য এই জাতীয় মথদিগকে ভারতবর্ষে এবং য়ুরোপেও অকল্যাণকর মনে করা হয় এবং ইহারা জনসাধারণের মনে প্রীতির পরিবর্ত্তে ভীতি উৎপাদন করে। এই জাতীয় মথরা শুঁয়া পোকার অবস্থায় মৌচাকে ঢুকিয়া সমস্ত মধু যে ভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ক্ষণিকা

শরৎ-উষারে কহিল শেফালী: 'যাই সখী আমি যাই,
সাঁঝের তারকা বরিল আমায় প্রভাত দিল না ঠাঁই।
আশার মুকুল রহিল মুদিয়া করুণ বেদনা ভরি'
পথের শিশিরে ম্লান হ'নু আমি ক্ষণিক জীবন বরি'!
প্রভাতী শানাই ডেকে কয় মোরে—'নাই আর নাই, নাই—
আগমনী তোর হয়েছে অতীত বিজয়া এসেছে ওই'!

আমি হেসে বলি—'আসুক বিজয়া ক্ষণিক জীবনে মোর,
সারা রাত ভরি' চাঁদের কিরণ জীবন করেছে ভোর!
ক্ষণিকের স্মৃতি ক্ষণিক-জীবনে জ্বেলেছে অমর শিখা,
যাহার জীবন তাহারে দিয়েছি হবে যা ভাগ্যে লিখা'!
প্রভাত-আলোতে রাতের শেফালী পথেতে পড়িল ঝরি'—
ধূলার ধরণী কোলে নিল তারে কত গৌরব করি।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী।

সত্য যুগ

[গল্প]

গত শ্রাবণ মাসের মাঝা-মাঝি হইতে সত্য যুগ পড়িয়াছে। মাঠে-ঘাটে-হাটে সর্ব্বত্রই সত্য যুগ পড়ার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। মাঠের খবরটা সকালেই কাণে আসিল—হারাধন নন্দীর দোকানে। দু'-চার পয়সার সওদা আনিতে গিয়া দেখি, দোকানের সম্মুখে বেজায় ভীড় জমিয়াছে, আর সেই ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ও-পাড়ার দীনু চক্কোত্তি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। তাঁহার পশ্চিম-মাঠের দেড়-বিঘা আউস-ক্ষেতের সমস্ত ধান গত রাত্রে কে বা কাহারা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সে-দিনের পর হইতে প্রায় প্রত্যহই মাঠে-মাঠে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের ভূত গ্রামের গেরস্থদের ফল-পাকুড়ের গাছে-গাছেও হানা দিতে সুরু করিল। আমার খিড়কীতে দুই কাঁদি মর্ত্তমান কলা ও মাচায় সাতটা চাল-কুমড়া ফলিয়াছিল। সত্য যুগের ভয়ে সেগুলি অপরিপক্ক অবস্থাতেই গাছ হইতে স্থানান্তরিত করিলাম।

সে-দিন মোড়ল-পুকুরে স্নান করিতে গিয়া ঘাটেও সত্য যুগের আভাস পাইয়া আসিলাম। হরি মুকুয্যে মশায় স্নান করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘাটে উঠিতেছিলেন আর রাজা বাগ্দীর ছেলে নেড়া বাগ্দী স্নানের উদ্দেশে ঘাটে নামিতেছিল। অসতর্কতা বশতঃ মুকুয্যে মশায়ের পা নেড়া বাগ্দীর পায়ে লাগে। সঙ্গে-সঙ্গেই নেড়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মুকুয্যে মশায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটু ভদ্রতা জ্ঞান আপনাদের নেই! গায়ে যে পা-টা লাগলো, তার জন্য একটু লজ্জিত হওয়া নেই, একটু দুঃখ প্রকাশ করাও নেই! আস্পদ্দাটা আপনাদের যত দূর বাড়বার তত দূর বেড়েচে!" মুকুয্যে মশায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি রে নেড়া! তোর পায়ে আমার পা লেগেছে, তার জন্যে লজ্জাই বা কিসের, আর দুঃখ প্রকাশই বা কিসের! তোর বাবা যে দিনে দশ বার কোরে পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিত!"

"বাবার মাথা খারাপ ছিল বলে আমাদের ত মাথা খারাপ নয়! আর তা ছাড়া 'নেড়া' 'নেড়া' বলে সম্বোধন করছেন, সেটাও খুব দোষের কথা। আমার আসল নাম ত আর 'নেড়া' নয়; আমার নাম নরেন—নরেন্দ্রনাথ মারিক!"

রাজা বাগ্দী মারা যাইবার সময় নেড়ার বয়স ছিল বারো বছর। সেই সময় সে এক বাবুর ভৃত্যরূপে কলিকাতায় গিয়া বাস করে। এখানে সে পাঠশালায় পড়িত; সুতরাং কিছু কিছু বাঙলা লিখিতে ও পড়িতে পারিত। তার পর বারো-তেরো বৎসর কলিকাতায় থাকিবার ফলে সে দুই-দশটা ইংরাজী বুকনিও বলিতে শিখিয়াছে এবং সম্প্রতি কিছু দিন হইতে ত্রিশ টাকা মাহিনায় 'এ, আর, পি'র কি একটা কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে শুধু রাজা বাগ্দীরই যে মাথা খারাপ ছিল তাহা নয়, হরি মুকুয্যে মশায়েরও মাথা খারাপ বলা যাইতে পারে! কলি যুগে যাহা চলিত, এখন সত্য যুগে যে তাহাই চলিবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং হরি মুকুয্যের দিকে চাহিয়া আমি একটু হাসিতে হাসিতে কহিলাম—"আপনারই দোস হোয়েছে, মুকুয্যে মশাই।" পরে নেড়া বাগ্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম—"বাড়ী এলেন কবে নরেন বাবু? নমস্কার।"

নেড়া কি উত্তর দিল, সে-দিকে আমার খেয়াল ছিল না, তবে আমার প্রশ্নে তাহার মুখের প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে-মনে সত্য যুগেরই আভাস পাইলাম।

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া কৌপীন-বাস পরিলাম। সত্য যুগের এমনি মহিমা যে, ধীরে ধীরে সকলেরই অজ্ঞাতসারে সকলকে সাধু-সন্ন্যাসীর পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিতেছে। গত বৎসর কলির শেষ মাস-কয়টায় ১০ হাত কাপড় পরিয়াছি; তার পর মধ্যে ৯ হাত, ৮ হাত; এক্ষণে কৌপীনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। গৃহিণী অভয়া দালানের এক প্রান্তে ঠাঁই করিয়া ভাত দিয়া গেল। উপকরণ—কাঁচকলা ভাতে আর চাল কুমড়ার ঘণ্ট। হবিষ্যান্নেরই একটু উর্দ্ধতন এডিশন। খাইতে খাইতে ঠিক করিলাম, ও-বেলা হাটে গিয়া আনা-চারেকের মাছ লইয়া আসিব, যেহেতু দীর্ঘ দিনের একঘেয়ে নিরামিষ মুখটা বদলানো দরকার। সুতরাং আহারান্তে একটু গড়াইয়া লইয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং 'সবে ধন নীলমণি'—দুইটি টাকার একটিকে পকেটে ফেলিয়া হাটের পথে যাত্রা করিলাম।

নদীর পোলের বটতলায় আসিয়া দেখি, দু'জন লোক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামের চৌকীদার নীলু সর্দ্দার তাহার নীল রংয়ের জামা আর পাগড়ী পরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম, সত্য যুগ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু পুণ্যাত্মা প্রত্যহ স্বর্গে গমন করিতেছে! আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পথিপার্শ্বে একটা গাব গাছের তলায় পাঁচ সাত জন কঙ্কালসার স্ত্রী-পুরুষ সজিনাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্তূপাকার করিয়াছে, সম্মুখে একটা হাঁড়ীতে ভাতের ফ্যান্ থাকায় তদুপরি মাছি ভ্যান্-ভ্যান করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক শুষ্ক ডাল-পালা দিয়া আগুন তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিলাম, সজিনা-পাতাগুলি সিদ্ধ করিয়া, ফ্যান্ সংযোগে সকলে আহার বা অদ্ধাহার দ্বারা সত্যযুগের প্রাণটাকে রাখিবার চেষ্টা করিবে। সত্য যুগ পড়িয়া অবধি এ দৃশ্য নিত্যই যথা-তথা দেখিতেছি, সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছু না থাকায় মন ততটা আকৃষ্ট করিতে পারিল না। হাটের পথেই অগ্রসর হইলাম।

হাটে গিয়া দেখিলাম, মাছ যদিও এখন পর্য্যন্ত ভরি-দরে বিক্রয় হয় নাই, সের-দরেই হইতেছে, তথাপি মাছ কিনিতে অনেকটাই ঘোরা-ঘুরি করিতে হইল। কিন্তু মাছ লইবার পর দাম দিতে গিয়া একেবারে তিন পাক চরকী ঘুরিয়া গেলাম। এক হাজার তিন শো উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে পীরপুরের এই হাটে যা কখনো হয় নাই, তাহাই হইয়াছে! পকেট হইতে টাকাটি বেমালুম অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। কলিকাতার বড়বাজার নয়, হ্যারিসন রোড নয়, কালীঘাটের কালীবাড়ী নয়, এসপ্লানেডের মোড় নয়, হাওড়া-শিয়ালদার ষ্টেসন নয়, জেলা নদীয়ার অজ পাড়া-গাঁ পীরপুরের হাট! উঃ, সত্য যুগের পুণ্য-প্রকোপ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিলাম এবং গোড়াতেই তাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, মাঠে-ঘাটে-হাটে সর্ব্বত্রই সত্য যুগ পড়ার লক্ষণ সুপরিস্ফুট!

রিক্ত হস্ত এবং অতিরিক্ত মনোভার লইয়া হাট হইতে বাটী ফিরিলাম। তিন ঘটী জলের তেষ্টা পাইয়াছিল, এক ঘটী জল খাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া-শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করা যায়! এ দুর্দ্দিনে দু'টো প্রাণকে কি কোরে বাঁচিয়ে রাখা

যায়! পাঁচ বিঘে 'ভাগরা' জমির অর্দ্ধেক ধান ত ভবিষ্যতের সম্বল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাঠের সে-ধান যে ঘরে আসিয়া পৌঁছাইবে তার কোন আশা নেই। হারাধন নন্দী দোকানের উঠ্‌নো'ও বন্ধ করেচে। ঘরে এক রতি সোনা-দানাও নেই যে এ-সময় তা বিক্রী কোরে দু'-চার মাস চালাবো! সুতরাং·····' যত দিক্ দিয়ে যত রকম চিন্তা করি, সকল চিন্তায় শেষে ঐ 'সুতরাং'-ই আসিয়া পড়ে এবং সবগুলি 'সুতরাং' এক জোট হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শুধু দেখাইয়া দিতে থাকে—কলিকাতার পথ।

পরদিন অভয়া বিমর্ষ মুখে কহিল—"এ রকম করে কত দিন আর চলবে?"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে আমি কহিলাম—"বেশী দিন নয়।"

"তা হোলে উপায়?"

"উপায়—কোলকাতা।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এই ভাবে পীরপুরে আমার বসে থাকলে আর চলবে না; কোলকাতায় গিয়ে কিছু উপায়-সুপায়ের চেষ্টা করতে হবে। যা হোক ম্যাট্রিকটা ত পাশ করেচি, একটা কাজ-কম্ম লেগে যেতেও পারে। শুনচি, অনেক আকাট-মুখ্যুও এ বাজারে না কি তরে যাচ্চে।"

"কিন্তু আমি একলা কি কোরে এখানে থাকবো!" স্বরটা একটু ভীতি-জড়িত।

কহিলাম—"তুমি হলে অভয়া, তোমার আবার ভয় কিসের?"

কথাটা মুখে বলিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে আমারও ওই চিন্তা। অভয়ার বয়স ২৪।২৫ বৎসর। এই বয়সে একাকী তাহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়! মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। এ অবস্থায় সদুপায় কি? একমাত্র সদুপায় আছে, কিন্তু···কিন্তু···। এখান থেকে শ্বশুর-বাটী তিন ক্রোশ দূরে। শ্বশুরের কাছে অভয়াকে রাখিয়া আসিলে হয়, কিন্তু···কিন্তু···। শ্বশুরের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর ঘাড়ে অভয়াকে চাপানো উচিত হবে না। এই দুর্মূল্যের বাজারে একটা লোকের খাই-খরচও ত বড় কম নয়! গভর্ণমেন্টের হিসাবে, একটা মেয়ে-ছেলের রোজ সাড়ে সাত ছটাক করেও যদি চা'ল ধরা যায়, তার সঙ্গে আরো জিনিস আছে, সুতরাং কুড়িটা টাকার কমে তার একটা পেট চলে না। অতএব······

কিন্তু গতকল্যকার 'সুতরাং'-এর যিনি উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, আজিকার 'অতএব' সমস্যারও তিনিই সমাধান করিয়া দিলেন। দিন তিন-চার পরে শ্বশুর মশায় হঠাৎ এ বাটীতে আসিলেন এবং কহিলেন—"বাবাজি, তোমার শাশুড়ীর শরীরটা ক'মাস থেকে বড় ভাল যাচ্চে না। এ সময় অভয়া যদি কিছু দিন গিয়ে আমার ওখানে থাকে, তা হোলে তাঁর একটু কষ্টের আসান হয়। অবশ্য, তোমার একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু···। তা তোমার মত কি বাবা?

অত্যন্ত বাধ্য সন্তানের ন্যায় বলিলাম—"নিয়ে যান আপনি। আমার একটু কষ্ট হবে, তা তার জন্যে কিছু আটকাবে না।"

সুতরাং মহা সন্তুষ্ট হইয়া পরদিনই শ্বশুর মহাশয় অভয়াকে লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং আমিও প্রয়োজনমত বাড়ী চৌকী দিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। তাহার পর সাতকড়ি পালের নিকট তিন বিঘা ধান-জমি বন্ধক রাখিয়া দেড় শত টাকা লইলাম এবং তাহাই সম্বল করিয়া এক দিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতার ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম।

* * * *

কলিকাতায় আসিয়াছি।

আসিয়া উঠিয়াছিলাম প্রথমে বৌবাজারের এক 'মেস্'-য়ে। মেস্-খরচা রোজ এক টাকারও বেশী। আতঙ্ক হইল। এরূপ খরচের মধ্যে থাকিয়া কত দিন চালাইতে পারিব? কলসীর জল গড়াইয়া ত খরচ করা! কলসীতে সম্বল ত মোটে একশো পঞ্চাশ কৌটা জল! তাহাতে কত দিনই বা চলিবে! মহা চিন্তায় পড়িলাম। কিন্তু—'যে খায় চিনি—যোগান চিন্তামণি।' চিন্তামণিই চিন্তার হাত হইতে বাঁচাইলেন। দিন-পনেরো পরে তাঁর কৃপায় খাই-খরচ ইত্যাদির হাত হইতে এড়াইলাম। বেলেঘাটার এক বাঁশ-খুঁটির গোলায় আমার স্থানলাভ হইল। সেখানে দু'টি ছোট ছেলেকে ঘণ্টা-দুই করিয়া রোজ পড়াইতে হয়; পরিবর্ত্তে আহার এবং থাকিবার জায়গা! আজ ২১ দিন হইল এই বাঁশ-খুঁটির গোলাতেই আছি।

সকালে 'নেড়া' আর 'ভেড়া'—অর্থাৎ ঐ ছেলে দু'টিকে পড়াই। দুপুর বেলা আহারাদির পর চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া আসি। বৈকালের দিক্‌টায় কোন দিন কাছের কোনও পার্কে গিয়া বসি, কোন দিন বা গোলার বাইরে বাঁধানো চাতালটায় বসিয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখি। সন্ধ্যায় 'ব্ল্যাক-আউট'য়ের কল্যাণে কোথাও বাহির হই না, আপন আস্তানায় বসিয়া হয় খবরের কাগজ পড়ি, নয় ত বা অভয়ার কথা, পীরপুরের কথা ভাবি।

এক দিন সকালে গোলার মালিক মশায় একখানা 'বিল' আদায়ের জন্য আমাকে নেবুতলার এক ভদ্রলোকের কাছে পাঠাইলেন। ভদ্রলোকের নাম গুণময় ঘোষ। মস্ত বড় লোক। প্রকাণ্ড বাড়ী। লোকটির গুণময় নাম সার্থক হইয়াছে। এত ধনী লোক, তবু অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। আমি যাইতেই খুব প্রীতিভরে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; একে ত আমি 'গোলা' লোক এবং গোলার লোক, তায় আবার বাঁশ-খুঁটির গোলা! তবুও তিনি তাঁর সামনেকার চেয়ারে আমায় বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দেশ কোথায়?"

বলিতে যাইতেছিলাম—'পীরপুর'; কিন্তু সত্য যুগের ছোট গোছের একটা ঢেউয়ের ধাক্কা আসিয়া মুখে লাগিল। পীরকে একেবারে না ছাড়িয়া একটু হাতে রাখিলাম। বলিলাম—"ক্ষীরপুর।"

"ক্ষীরপুর? ২৪ পরগণা জেলা না?"

"আজ্ঞে, না।"—'ইতি গজ'র মত না-টা মুখের ভিতরেই উচ্চারিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নজীরের উপর নির্ভর করিয়াই কাজটা করিয়া ফেলিলাম।

অতঃপর আরও দুই-চারিটা কথার পর তিনি আমার হাতে গণিয়া একখানা ১০ টাকার নোট, ১৩ খানা এক টাকার নোট, ২টা সিকি, তিনটা আনি ও ১টা আধ আনি দিলেন। বিল ছিল ২৩৸৵১৫ পয়সার, কিন্তু বর্ত্তমান উন্নত যুগ এক তাম্রকূট ছাড়া তাম্র সম্বন্ধীয় সকল জিনিসেরই হতাদর। তাম্রলিপ্ত তাম্রশাসন প্রভৃতি যেমন আজকাল শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়,

তাম্রমুদ্রাও তেমনি আজকাল শুধু পাটীগণিতে অঙ্কের খাতায় এবং 'বিল'-এর পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ জন্য বিল ২৩৷৷৵১৫ পয়সার থাকিলেও ঘোষ মহাশয় আমায় দিলেন—২৩৷৷৵১০। কিন্তু পথে আসিয়া গণিয়া দেখি—২৪৷৷৵১০। ১৩ খানা এক টাকার নোটের স্থলে ১৪ খানা হইতেছে। তিন বার গণনার পরও চৌদ্দ কিছুতেই তের হইতে চাহিল না। অগত্যা ফিরিয়া গিয়া কহিলাম —"একটা টাকা আমাকে বেশী দিয়েচেন"—বলিয়া নোট কয়খানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি ভাল করিয়া গণিয়া দেখিলেন যে, একখানা এক টাকার নোট বেশীই দিয়াছেন বটে। আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। কহিলেন—"একটু চা খেয়ে যাও।" অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় চেয়ারখানা টানিয়া বসিলাম।

কিছু পরেই একটি রেকাবীতে দুইটি সন্দেশ ও এক কাপ চা আসিল। সন্দেশে যদিও একটু গন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আজকালকার দিনে আমাদের মত লোকের কাছে অমূল্য দ্রব্য! বহু দিন উদরস্থ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। সুতরাং বিচারশূন্য হইয়া সে দু'টি গলাধঃকরণ করতঃ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণের আলাপে গুণময় বাবুর সহিত বহু ক্ষণ ধরিয়া বহু কথাবার্ত্তা হইল। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী ও কাউনসিলারের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব এবং তাঁহাদের উপর প্রভাব—দুই-ই আছে। কহিলাম—"আমি চাকরীর জন্যেই পীর—ক্ষীরপুর থেকে এসেচি। যদি দয়া কোরে···

"চাকরী? আচ্ছা, লাগিয়ে দেবো তোমাকে। তুমি দিন-দুই বাদে একবার এসো।"

আশায় এবং আনন্দে মনটা ভরিয়া উঠিল। দুই দফা নমস্কার জানাইবার পর সে-দিন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

দুই দিন পরে গিয়া দেখা করিতেই কহিলেন—"খুব ভাল জায়গায় তোমার চাকরীর জন্য চেষ্টা কর্চি। যদি তোমার ভাগ্য ভাল হয় ত লেগে যাবে।"

খুব খুশী ও বিনয়ের সঙ্গে কহিলাম—"আপনার দয়া হোলে আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই ভাল হবে।"

আজও চা আসিল। তবে সন্দেশ নয়; তার বদলে দু'খানা বিস্কুট। চা খাইয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, গুণময় বাবু কহিলেন —"বড় ভাল ছেলে তুমি বাবা! তোমায় একটা ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দিতেই হবে। তুমি রোজই একবার ক'রে আসবে।"—সুতরাং নেড়া-ভেড়াকে পড়াবার 'টাইম্'টা সন্ধ্যার পর করিয়া লইয়া রোজ সকালে গুণময় বাবুর কাছে আসিতে লাগিলাম।

এক দিন গুণময় বাবু কহিলেন—"দেখ নন্দ, দিন-কতক চাকরটাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাজারটা ক'রে দাও দেখি। চুপ-চাপ বসে থাকা কিছু নয়। একটু খাটলে-খুটলে শরীর ভাল থাকবে।" সুতরাং সেই দিন হইতে সমস্ত সকালটা গুণময় বাবুর সংসারে বাজার করা, দোকান করা ইত্যাদি কার্য্যে কাটিতে লাগিল। কোন কোন দিন এই সব কাম করিতে অনেক বেলা হইয়া যাইত। এক দিন গুণময় বাবু বলিলেন,—"তোমার চাকরীর জন্য আবার কাল গিয়েছিলুম। বোধ হয় এইখানেই হয়ে যাবে। এক কাজ কর, দুপুর-বেলা চুপ-চাপ গোলায় বসে থেকে ফল কি? খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে আসার পক্ষে তোমার অসুবিধা হবে কি?"

"আজ্ঞে না, অসুবিধা আর কি!"

"তবে আজ থেকে তাই এসো। তোমায় ভাবচি, অন্য আফিসে না দিয়ে কর্পোরেশনেই দিয়ে দি। ও-মাসেই একটা কাজ খালি হবে। ৭০ টাকা মাইনে। ১২০ পর্য্যন্ত হবে। তোমার কি ইচ্ছে?"

"এ চাকরী হ'লে ত খুব ভালই হয়। আর আপনার একটু চেষ্টা থাকলে হবেই!"

"আচ্ছা, এইখানেই দেবো এখন লাগিয়ে। তা হোলে রোজ দুপুর বেলায় এখানে চলে আসবে, বুঝলে? তোমার উন্নতি হবে বাবা। যারা কাজকে ভয় করে, তাদের কিছু হয় না।"

অতএব সেই দিন হইতেই সকালে ত বটেই, অধিকন্তু দুপুর বেলা আহারাদির পরও গুণময় বাবুর গৃহে নিত্য হাজিরা দিতে লাগিলাম।

* * * *

এক মাস পরের কথা।

আমার বেশ ভাল কাজই হইয়াছে। যাহাকে চাকুরী বলে, ঠিক যদিও তাহা হয় নাই, তবে কাজ হইয়াছে। কাজের আর বিরাম নাই। গুণময় বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই কাজের পিছনে আমাকে ছুটাছুটি করিতে হয়। এই ছুটাছুটির পরিবর্ত্তে গুণময় বাবুর বাটীতেই থাকি আর খাই। সুতরাং চাকরী—অবৈতনিক; আর ফ্রী কোয়ার্টার—গুণময় বাবুর বৈঠকখানার এক পাশে একখানি তক্তাপোষ। কিছু উপরি পাওনাও আছে। তাহা হইতেছে—গুণময় বাবুর মিষ্ট কথা আর আশার বাণী। এই দুইটি উপরি পাওনার আকর্ষণই আমাকে বেলেঘাটার বাঁশ-খুঁটির গোলা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিতে বাধ্য করিয়াছে।

সে-দিন দুপুর বেলা বসিয়া বসিয়া একগাদা দলীলপত্রের নকল করিতেছি, গুণময় বাবু আসিয়া সামনের চেয়ারখানা টানিয়া বসিলেন; কহিলেন—"আর কত বাকী? করে ফেল বাবা, করে ফেল! এইগুলো কাপি করা হোয়ে গেলে একবার তোমায় চীৎপুরে সরকার কোম্পানীর দোকানে যেতে হবে।"

"কোন দরকার আছে?"

"দরকার বোলেই ত একবার যেতে হবে, বাবা। দশটা টাকা ওদের কাছে আমার পাওনা ছিল। সকালে আমি তাই গিয়েছিলুম, টাকাটা ওরা দিয়ে দিলে। কিন্তু কথা কইতে কইতে টাকাটা আমি ওদের বাক্সর ওপর থেকে নিতে ভুলে গেছি। বাড়ী এসে মনে পড়লো যে, টাকাটা ওরা যেমন দিয়েছিল, তেমনি ওদের সেই বাক্সর ওপরেই ফেলে এসেচি।—হ্যাঁ বাবা, বাণান ভুল-টুল বেশী হচ্চে না ত?"

"আজ্ঞে, খুব সাবধান হোয়েই ত কাপি······"

"না, না, তুমি খুবই সাবধান, সে আর আমাকে বলতে হবে না। তোমার জন্যে যে আমি কত ভাবি, তা ত তুমি জান না, বাবা! এত দিনে কি আর তোমায় কোনও চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে পারতুম না? তোমায় ত আর আমি পর বোলে মনে ভাবি না, ঘরের ছেলে বোলেই তোমাকে ভাবি। যে-সে জায়গায় তোমাকে ঢোকাবো না। এমন জায়গায় ঢোকাবো, যেখানে আখেরে খুব উন্নতি আছে। তাই ত কর্পোরেশনের ও-চাকরীটায় তোমাকে আর ঢোকালুম না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় গুণময় বাবু কহিতে

লাগিলেন—"মিষ্টার টোম্যানের কাছে কাল গিয়েছিলুম। টোম্যান্ হোল 'বার্টান্ টোম্যান্ এণ্ড কোম্পানি'র বড় সাহেব। ১৬৫ টাকার একটা পোষ্ট শীগ্‌গিরই খালি হবে। এ কাজটায় লেখাপড়া জানা বেশী চাই না, চাই বিশ্বাস। তোমার জন্য খুব সুপারিশ ধরলুম। টোম্যান খুব আশা ত দিলে। সম্ভবতঃ এইখানেই ঠিক লেগে যাবে।"

আশার বাণীতে আর মন নাচে না। গোড়া হইতে গুণময় বাবুর মারফৎ বহু আশাই পাইয়াছি, কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হয় নাই! কেবল তাঁহার কাজে আমার দিবারাত্র অবৈতনিক পরিশ্রমটাই খুব কার্য্যকরী হইয়া আসিতেছে। লিখিতে লিখিতে অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। গুণময় বাবু কহিলেন—"তা হোলে বাবা, বেড়াতে বেড়াতে টাকা দশটা এনে রেখো, আমি একটু ভবানীপুরের দিকে বেরুচ্ছি।"

"তা হোলে একটু শ্লিপ লিখে দিন, নইলে আবার হয় ত...."

"ঠিক বোলেচ। বিজনেস্ ইজ্ বিজনেস্। এই সব গুণের জন্যেই তোমাকে আমি এত পছন্দ করি।" তাড়াতাড়ি গুণময় বাবু একটা শ্লিপ লিখিয়া দিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে কাপির কাজ শেষ করিয়া আমি চৌরঙ্গীর দিকে যাত্রা করিলাম।

সরকার কোম্পানির দোকানে ইহার আগে গুণময় বাবুর সঙ্গে দু'-একবার গিয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ ছিল। শ্লিপটা দিতেই তাঁহারা পড়িয়া দেখিয়া আমাকে টাকা দশটা দিয়া দিলেন। নবীন সরকার মশাই দোকানের মালিক। আমার সহিত এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"অনেক দিন ত আপনার কাটলো গুণময় বাবুর কাছে, চাকরী মিললো নন্দ বাবু?" কথাটার ভিতর একটু রহস্যের সুর ছিল। আমি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলাম—"এবার ঠিকই হবে। টোম্যান কোম্পানির অফিসে। মাইনে ১৬৫ টাকা!" আমার বলিবার ভঙ্গীর ভিতরেও একটা রহস্যের ছাপ ছিল।

নবীন সরকার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল—"গুণময় বাবুর অশেষ গুণের মধ্যে গিয়ে পড়েচেন, চাকরী-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে হবে নন্দ বাবু! উঃ! একটা 'লোক' বটে! কি করে আপনি ওর খপ্পরে এসে পড়লেন, আমি তাই ভাবি!"

"আমিও ভাবি, ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই......"

বাধা দিয়া নবীন বাবু বলিলেন—"কর্ম্ম খুবই আছে! তবে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান বা বিচার-বিবেচনা—সে সবের ধার ধারেন না। জগতে এসে চিনেছেন কেবল টাকা।"

"আর চিনেছেন সাধু-সন্ন্যাসী। তাদের পিছনে ত খুবই ঘোরেন দেখি।"

আবার নবীন বাবুর প্রাণ-খোলা হাসির হো-হো ধ্বনি দোকানের বাতাসকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কহিলেন—"সেটা কিন্তু ভক্তির কাঙ্গাল হিসেবে নয়—টাকার কাঙ্গাল হিসেবে। কি কোরে কিছু টাকা মারবেন তাঁদের আশীর্ব্বাদে, ফন্দিটা হচ্চে তাই। বুঝলেন না নন্দ বাবু?"

আরও দু'-একটা কথাবার্ত্তার পর উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় নবীন বাবু আমায় বলিলেন,—"দেখুন নন্দ বাবু, ৬৫ নং এজরা পার্কে কতকগুলো লোক নেবে। মাইনেও ভাল। লাগিয়ে দিন ত একখানা দরখাস্ত। ভগবানের দয়ায় যদি......"

একটু আশান্বিত হইয়া আফিসের ঠিকানাটা একখণ্ড কাগজের কোণায় টুকিয়া লইলাম এবং আরও দু'-একটা কথার পর উঠিয়া পড়িলাম। নবীন বাবু মৃদু হাসির সহিত কহিলেন—"ট্রাম-ভাড়ার পয়সাটাও বোধ হয়...নিশ্চয়ই চরণ-ট্রামে এতটা পথ যাতায়াত..."

উত্তরের পরিবর্ত্তে একটু হাসিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। মনে-মনে কহিলাম, সত্য যুগ! সত্য যুগ!

* * * *

আসল সত্যকার সাধু-সন্ন্যাসীরা লোক-কোলাহলের মধ্যে বড়-একটা আসেন না; কিন্তু উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কখনো কখনো তাঁদের আসিতেও হয়।

এইরূপ এক জন সাধু মহাত্মা সম্প্রতি বাগবাজারে আসিয়া আসন পাতিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা যেমন অসীম, শিষ্য এবং ভক্তের সংখ্যাও তেমনি অসংখ্য। তিনি টপ্ করিয়া কাহাকেও ধরা দেন না। সে কারণ লোকের সঙ্গে বেশী কথাও কহেন না। গঙ্গার ধারে ছোট একটি দ্বিতল বাটীতে তিনি থাকেন, বৈকালে ঘণ্টা-দুই সময় ছাড়া তিনি নীচে দর্শনার্থীদের সম্মুখে আসেন না। আমাদের কাণে এ খবর আসিবার বহু আগেই গুণময় বাবু তাঁহার কথা জানিতে পারেন এবং তাঁহার কাছে আজ কয় দিন ধরিয়া খুবই যাতায়াত করিতেছেন।

সে-দিন দ্বিপ্রহরে গুণময় বাবুর ফরমাসী অনেকগুলি কাজ সারিয়া, বৈঠকখানার এক ধারে আমার সেই ফ্রী-কোয়ার্টার চৌকিখানিতে ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া শ্রান্ত মনে অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম।—অনেক দিন হ'য়ে গেল পীরপুর থেকে এসেছি, কিন্তু কাজকর্ম্মের কোন সুবিধাই ত হ'ল না। মধ্যে অনেক দিন হ'ল অভয়ার একখানা চিঠি পেয়েছিলুম, তার পর অনেক দিন হ'য়ে গেল আর কোন খবর পাইনি। সকলে কেমন আছে, কে জানে! কাল আর একখানা চিঠি দিতে হবে। লিখেছি, এখানে কোন কাজের সুবিধা হচ্চে না, বাড়ী চলে যাব। তোমার হয়ত ওখানে অন্য কোন কষ্ট না হ'তে পারে, কিন্তু......

"কি ভাবচো শুয়ে শুয়ে? ওঠো, চলো।"—দেখি, সামনে দাঁড়াইয়া গুণময় বাবু। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিলাম—"কোথায়?"

"চল, বাগবাজারে 'প্রভু'র ওখানে তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

অগত্যা জামাটা গায়ে চড়াইয়া গুণময় বাবুর সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

বেলা চারিটা নাগাদ 'প্রভু'র ওখানে পৌছিলাম। তিনি তখন দুই-চারি জন ভক্ত-পরিবৃত হইয়া নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন। দীর্ঘ দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়ার বদলে নীল চেলী পরিহিত, তদুপরি নীল কৌষেয় বস্ত্রের উত্তরীয়, চোখে সুবর্ণ ফ্রেমে আঁটা চশমা। আমরা উভয়েই ভক্তিভরে তাঁর পায়ের একটু তফাতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলাম। 'প্রভু' মুখে কোন আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন না; হয়ত মনে মনে করিলেন! তার পরই গুণময় বাবু উঠিয়া

দাঁড়াইলেন এবং সামনের প্রাঙ্গণে যেখানে একটা জলের ট্যাপ্ ছিল, সেইখানে গেলেন। আমাকে ইসারা করাতে আমিও গেলাম এবং তাঁহার দেখাদেখি করপুটে খানিকটা কলের জল লইয়া উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া 'প্রভু'র সামনে আসিয়া বসিলাম। 'প্রভু' তখন দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই জল স্পর্শ করিয়া দিলেন এবং আমরা উভয়ে তাঁর সেই চরণামৃত পান করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়—অদ্ভুত এই চরণামৃত! ইহা যে স্বর্গীয় বস্তু, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিচয় পাইলাম। করপুটের সেই অতি সাধারণ কলের জল সুমিষ্ট আস্বাদযুক্ত এবং সদ্যপ্রস্ফুটিত যূথিকা-গন্ধে আমোদিত হইয়া গিয়াছে। মুগ্ধ প্রাণের সমস্ত আকর্ষণে পুনরায় অশেষ শ্রদ্ধাভরে প্রভুর পদতলে উভয়ে প্রণাম করিলাম।

দুই-দুই বার প্রণামের ফলে কিন্তু কোনও আশীর্ব্বাদ-বাণী আমাদের ভাগ্যে শুনিতে পাইলাম না। প্রভু কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। শুনিয়াছিলাম, এইরূপই তাঁহার স্বভাব। যখন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন, খুবই বলেন; আবার যখন বলেন না, তখন কিছুই বলেন না। হয়ত তখন একঘেয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাত্র দু'-একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আবার নীরবে বসিয়া থাকেন। আজও হঠাৎ মুক্ত দুয়ারের ফাঁকে পশ্চিমাকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—"অস্ত-রবির কিরণে মেঘের রং-খেলা। এই সোনালী, পরমুহূর্ত্তে রক্তবর্ণ, সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিকে পীত। একদম ক্ষণস্থায়ী! খেলা—মায়া—অনিত্য!"

বুঝিলাম—প্রভু সত্যকার এক জন দার্শনিক ভাবুক এবং সেই ভাবেতেই বিভোর। আরও খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর গুণময় বাবু ও আমি প্রভুকে বিদায়-প্রণাম জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

পথে আসিতে আসিতে গুণময় বাবু কহিলেন—"সাক্ষাৎ দেবতা। এ-যুগে এই ধরণের খাঁটি সাধু বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত শক্তি!"

"চরণামৃতে ত তার পরিচয় পেলুম।"

উৎসাহ-গদ্গদ স্বরে গুণময় বাবু কহিলেন—"পেলে ত? আরও ব্যাপার আছে। চরণামৃতে আজ কোন্ ফুলের গন্ধ পেলে?"

"যুঁইয়ের।"

"কাল আবার পাবে হয়ত বকুলের। আর এক দিন হয়ত পাবে গোলাপের!—একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাতে আর কোন ভুল নেই! নইলে আমি তোমার গিয়ে……বেহালা থেকে একটি ভক্ত আসতো, তার ওপর প্রসন্ন হোয়ে তাকে বোধ হয় লাখ-খানেক টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।"

আমি কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, তৎপূর্ব্বেই গুণময় বাবু বলিলেন—"আবার কাল আসতে হবে। আসবে তুমি, নন্দ?"

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম—"আপনি যদি দয়া কোরে আনেন, নিশ্চয়ই আসবো।"

অতঃপর নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় উভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিন গুণময় বাবুর কতকগুলা কাজে আমাকে বাহির হইতে হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিলাম বেলা প্রায় দুইটার সময়। তার পর স্নানাহার সারিয়া একটু শুইয়াছি, গুণময় বাবু আসিয়া কহিলেন—"নন্দ, ওঠ; চল—যাওয়া যাক।"—সুতরাং আর বিশ্রাম করা হইল না। জামা-জুতা পরিয়া তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

এ-দিনও প্রভু ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। আজিকার চরণামৃতে সত্যই প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ পাইলাম। তাঁকে প্রণাম ও তাঁর চরণামৃত পানের পরই আজ তিনি হঠাৎ গুণময় বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তুই ত অনেক টাকা বাইরে থেকে ঘরে আনবি। ঠিকই আনবি। যা, কিছু টাকা নিয়ে ধানের কারবার চালা গে যা। মাঝে মাঝে আসিস্ এখানে। বিস্তর টাকা পাবি। যা।"

বড়ই ইচ্ছা হইল, আমার চাকরীর কথাটা একটু নিবেদন করি! কিন্তু সাহসে কুলাইল না। চুপ করিয়া গুণময় বাবুর পাশে বসিয়া রহিলাম।

* * * *

শ্যাওড়াফুলী।

ও-দিকে গঙ্গা, সে-দিকে রেল-ষ্টেশন, এ-দিকে গঞ্জ। তারি মধ্যে ছোট একটা বাসা-বাড়ী; আর কাছেই করোগেটের স্বতন্ত্র একটা গুদাম-ঘর।

আজ কয় দিন হইল, গুণময় বাবু ও আমি এখানে আছি। ধানের কারবার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে এক জন পাচক, আর এখানকার এক জন চাকর। শ্যাওড়াফুলী ধান কেনা-বেচার একটি প্রধান কেন্দ্র। উঠিয়া-পড়িয়া ধান কেনার কাজ চলিতেছে ও তাহা গোলা-জাত করা হইতেছে। খাটা-খাটুনী সব আমাকেই করিতে হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। গুণময় বাবু শুধু টাকা লেন-দেনের কাজটা নিজের হাতে রাখিয়াছেন। তিনি তাহাই করেন, আর আমায় আশার উপর আশা, উৎসাহের উপর উৎসাহ দেন। আমায় বলেন—"কিসের চাকরী করতে যাবে তুমি! ভেবেছিলুম বরং তোমায় একটা ভাল পোষ্টে লাগিয়ে দেবো। টোম্যান্ কোম্পানীর আফিসে তোমার কাজের একেবারে পাকা-পাকি ব্যবস্থাই কোরে ফেলেছিলুম। কিন্তু ও-সবে আর হবে কি? এর পর না হয় মাসে তিনশো, কি, বড়-জোর চারশো! ধান-চালের কারবারে তোমাকে আমি আলাদা করে এমন লাগিয়ে দেবো যে, বছরে তোমার অন্ততঃ বারো-চোদ্দ হাজার লাভ হবে। সবুরে মেওয়া ফলে! একটু সবুর কোরে আমার কাছে তুমি থাকো, আর বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে খেটে যাও। খাটুনি নিষ্ফল হয় না কখনো!"

সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই গুণময় বাবুর কাজে দিন-রাত খাটিয়া যাইতেছি।

ধান কিনিবার জন্য কোন-কোন দিন আমাকে শ্যাওড়াফুলীর বাহিরেও যাতায়াত করিতে হয়। দক্ষিণে ময়নাপোল, তেঘরা, গুরুদাসপুর, চক্‌মারী; পশ্চিমে হরিরামপুর, নাড়াবোনা, কোড়গাঁ প্রভৃতি কোন-না-কোন গ্রামে আমাকে প্রায়ই যাইতে হয় ও চাষাদের দাদন দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে হয়। মোটের উপর জোর কাজ চালাইতেছি। এক-এক দিন স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত পাই না। গুণময় বাবু আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু—কিন্তু…

কিন্তু কাজের ফাঁকে এক-এক দিন বসিয়া বসিয়া ভাবি। ভাবি,

কি উদ্দেশ্য নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলুম, আর কি-ই বা করচি। কোথায় বা অভয়া, আর কোথায় বা আমি! এত দিন বেলেঘাটার বাঁশ-খুঁটীর গোলায় থাকতুম আর যেমন কাজের চেষ্টা করছিলুম, সেই রকম করতুম, তাহোলে হয়ত যা হোক কোন কাজ এত দিন লেগে যেত। কি কুক্ষণেই যে বিলের টাকা আদায় করতে গুণময় বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম, আর কি কুক্ষণেই যে ২৪৸৶১০র মধ্যে একটা টাকা তাঁকে ফেরত দিতে গেলাম! এখন আমার অবস্থা সাপে ব্যাং-গেলার মত। গুণময় বাবুকে ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না।···বাড়ীর খবরও পাইনি অনেক দিন। শ্বশুর শাশুড়ীই বা কেমন আছেন; অভয়াই বা কেমন আছে! পীরপুরের বাড়ীরই বা কি অবস্থা—কিছুই জানি না!' নিজের অজ্ঞাতে বুক ফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া যায়।

এই সময়টায় হঠাৎ ও-দিকে একটা ধ্বংসের হাওয়া বহিতে সুরু করিল। ঐ সমস্ত গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দিল। শ্যাওড়া-ফুলীর চারি দিক্‌কার গ্রামগুলি হইতে প্রত্যহ মৃত্যু সংবাদ কাণে আসিতে লাগিল। আমাকে প্রায় প্রত্যহই ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাইতে হয়। আমার একটা আতঙ্ক হইল। গুণময় বাবু বোধ হয় সেটা বুঝিতে পারিয়া আমায় কহিলেন—"প্রভুর কৃপায় আমাদের কোন বিপদ হবে না, নন্দ। কিছু ভয়-টয় কোরো না। ফুর্ত্তির সঙ্গে কাজ কোরে যাও।" মনে মনে কহিলাম—"প্রভুর কৃপা—সে-ও আপনার ওপর, আমার ওপর ত নয়!" যাই হোক্—জোর করিয়া মনে বল আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং নিয়তই নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, লেবু-নুণ জল খাইতে লাগিলাম আর রুমালে কর্পূর বাঁধিয়া মাঝে-মাঝে শুঁকিতে লাগিলাম।

দু পাঁচ দিনের মধ্যেই আশ-পাশের গ্রামগুলির অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠিল। সে দিন ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাকে পাঁচপুকুর গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাটী যাইতে হয়। কিন্তু গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে অন্তরাত্মা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ আগে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূটিকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমি যখন গিয়া পৌছিলাম, তখন তাহার মৃত ভগিনীটিকে বাঁশের সহিত বাঁধা হইতেছে। ওদিকে একটি ঘরের বারান্দায় মেজ ছেলেটি এই কাল রোগের সঙ্গে শেষ লড়াই করিতেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। ভয়-কাতর অন্তরে তাহার বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পাশের গ্রামে গিয়া দেখিলাম, সেখানেও সমান অবস্থা। এমন গৃহ নাই যেখানে এই কাল-ব্যাধি তাহার ধ্বংসের হাত প্রসারিত করে নাই। চক্‌মাধী গ্রামে একটি সধবা স্ত্রীলোক কাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছে; তাহাকে আজ এত বেলা পর্য্যন্ত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় নাই। কারণ, এ বিপদের সময় গৃহে তাহার দ্বিতীয় লোক নাই। আজ কিছু দিন হইল, অভাবের তাড়নায় স্বামী তাহাকে একাকী রাখিয়া কলিকাতায় কাজের চেষ্টায় চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর এই নিদারুণ সংবাদ সে কিছুই জানে না। অভাগিনী আজ এই অবস্থায়······ মনটা আমার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সমস্ত দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; মাথার ভিতরটা সহসা যেন খালি হইয়া গেল। পথের ধারের একটা তেঁতুল গাছের তলায় আমি বসিয়া পড়িলাম।

প্রায় মিনিট-পনেরো এই ভাবে নির্জ্জীবের মত বসিয়া থাকিবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম। চারি দিকের আঁধার কাটিয়া গিয়া আবার চোখের সামনে সূর্য্যালোক ফুটিয়া উঠিল। তখন আমার মনে কেবলই অভয়ার কথা, পীরপুরের কথা জাগিতে লাগিল। পাখীর মত যদি আমার পাখা থাকিত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমি পীরপুরে চলিয়া যাইতাম! ওঃ! অভয়াকে রাখিয়া কেন আমি চলিয়া আসিলাম! আর নয়; খুব ভুল করিয়াছি। আর এখানে কিছুতেই থাকিব না।—অবসাদগ্রস্ত মনের মধ্যে একটা জোর আনিয়া তেঁতুল-তলা হইতে উঠিয়া পড়িলাম ও শ্যাওড়াফুলীর গঞ্জের দিকে যাত্রা করিলাম।

বাসায় যখন ফিরিলাম, বেলা তখন প্রায় দুইটা। দেখিলাম, গুণময় বাবু বাসায় বা গুদামে নাই। ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, আটটার ট্রেণে তিনি কলিকাতা গিয়াছেন, সন্ধ্যার পরই ফিরিবেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি ফিরিলেন। কহিলেন—"আরো হাজার দুই টাকার দরকার, তাই আজ আনবো বোলে গেলুম। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুললুমও বটে, কিন্তু আসবার সময় তাড়াতাড়িতে আনতে ভুলে গেছি। তোমার মা-ও মনে করে দিলে না, আমিও একেবারে ভুলে······যাক্, শুক্রবার আবার ত আমায় যেতে হবে, সেই দিনই আনবো। ওরে বাবা, তোমাকে কাল ফার্ষ্ট ট্রেণে একবার মগরার গঞ্জে যেতেই হবে। কালকের ধানের দরটা ওখানকার জেনে আসবে।"

দেহ মন দুই-ই খুব খারাপ ছিল; সুতরাং সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

বেলা অনুমান সাতটা সাড়ে-সাতটা হইবে।

শ্যাওড়াফুলী ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পায়চারী করিতেছি, মগরার গঞ্জে যাইতে হইবে। টিকিট কেনা হইয়া গিয়াছে। টিকিট করিয়াছি, কিন্তু মগরার নয়, করিয়াছি—কলিকাতার। রাত্রে শুইয়া অনেক ভাবিয়াছি। ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি—আর নয়, আজই কলিকাতা এবং তথা হইতে দেশে চলিয়া যাইব।

একটু পরে ট্রেণ আসিলে তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। বাসা হইতে চা খাইয়া আসিবার সুবিধা হয় নাই; সুতরাং হাওড়ায় নামিয়া চায়ের চেষ্টায় একটা দোকানে ঢুকিলাম। ঢুকিয়া দেখি, 'সরকার কোম্পানি'র সেই নবীন সরকার একখানি চেয়ারে বসিয়া চায়ের অপেক্ষায় আছেন। তিনি বর্দ্ধমান যাইবেন। গাড়ীর এখনো দেরী আছে।

চা খাইতে খাইতে গুণময় বাবুর সম্বন্ধে, তাঁহার ধানের ব্যবসা ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কথার মধ্যে তিনি বলিলেন—"বাগবাজারের সেই 'প্রভুবর' চম্পট দিয়েচেন যে, গুণময় বাবুকে বলবেন।"

আমি বলিলাম—"কে প্রভুবর? যাঁর কাছে উনি···"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঁর কাছ থেকেও তিনি বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়েছেন। লোকটা আচ্ছা ভোল্ নিয়ে বসেছিলো। বহু লোককে চরণামৃত খাইয়ে বোকা বানিয়ে তল্পী গুছিয়ে শেষে দে চম্পট্!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম—"বলেন কি!"

"বলছি ঠিকই। আমাদের দু'-একটি বন্ধুও তাঁর কাছে খুব জমে

গেছলেন কি না। খবর আমার কাছে এড়াবার জো নেই। লোকটা মহা ধড়ীবাজ! অনেকের অনেক কিছু নিয়ে সট্‌কেচে! পড়ে আছে তাঁর ওপরের ঘরে শুধু একরাশ 'স্যাকারিন্' আর 'সেণ্ট'-এর খালি শিশি!"

মনের এই অবস্থাতেও খুব বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। উঃ! সত্য যুগ যে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ঠিকই সত্য যুগ!

কিছু পরে ট্রেণের সময় হইয়াছে বলিয়া নবীন সরকার উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এজরা পার্কে সেই দরখাস্ত করবার কথা বলেছিলুম, করেছিলেন?"

দরখাস্ত যে করা হয় নাই, সে কথাটা আর না বলিয়া শুধু ঘাড় নাড়িলাম। নবীন বাবু সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া দ্রুতপদে প্লাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

এজরা ষ্ট্রীটের ঠিকানা ও আফিসের নাম একটা কাগজে আমার লেখা ছিল। পকেট-বুক হইতে সেখানা বাহির করিলাম। এ কাগজখানা গুণময় বাবুর লিখিত সেই শ্লিপ, যাহাতে তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন—'টাকাটা ফেলে এসেচি; নন্দকে পাঠালাম, উঁহার হাতে দিয়া দিবে। ইতি শ্রীগুণময় ঘোষ।' শ্লিপটায় সরকার বাবুদের কাহারো নাম অথবা কাহাকেও সম্বোধন ছিল না। তাড়াতাড়িতে সংক্ষেপ লেখা! কাগজের টানাটানির জন্য সে-দিন এই শ্লিপখানার পিছনের পিঠে এক কোণাতেই এজরা ষ্ট্রীটের ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

সত্য যুগের প্রভাব বলিয়া হঠাৎ মাথায় একটা সৎ-মতলব আসিল। সুতরাং আর দেরী না করিয়া বরাবর গুণময় বাবুর গৃহে গেলাম। গিন্নীমা আমাকে দেখিয়া কহিলেন—"টাকা ফেলে গেছেন, সেই জন্যেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন!"

আমি অতিমাত্র নিরীহের মত কহিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্বে খুব ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়াছিলাম।

গিন্নীমা কহিলেন—"কিছু লিখে দিয়েচেন?"

"হ্যাঁ মা!"—বলিয়া সেই শ্লিপটা তাঁহার হাতে দিলাম। কহিলাম—"পরের ট্রেণেই ফিরে যেতে বোলেচেন। ফিরে গিয়ে সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবো। টাকার জন্যে সব কাজ আটকে আছে।"

সুতরাং······খুব সুন্দর 'সুতরাং'! সত্য যুগের সামান্য একখানি শ্লিপ আমাকে নগদ দু'টি হাজার টাকা জোগাইয়া দিয়া, সুস্থ ভবিয়তে এবং খোশ মেজাজে সেই দিনই পীরপুরে পৌঁছাইয়া দিলেন! দেশের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে আমি সত্য যুগের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

গান

নিরমল আলো জ্বলে,—
আলো কই? তারি তলে
দেখা দেয় চুপি চুপি
আলোকের বহুরূপী,
আঁধারের ভ্রূকুটিকে
লুকায়ে সে রাখে ছলে।
কুসুমের হাসিখানি
মেলে দিয়ে মায়া-আঁখি,
ফণিনীর বিষ-জ্বালা
গোপনে যে রাখে ঢাকি।
তাই এই ধরণীর
দহনেতে ঝরে নীর,
শুধু ছলা, শুধু জ্বলা
জীবনের পলে পলে।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস।

সর্ব্বহারা

"অন্ন দাও অন্নপূর্ণা" প্রার্থনা করে আজ শিব—
অনাহারে প্রাণ দেয় প্রতিদিন অগণন জীব।
আজো যারা বেঁচে আছে, হইয়াছে কঙ্কালসার
রাক্ষসী তিলে তিলে জনপদ করিছে সংহার।
রাজেন্দ্রাণী বঙ্গভূমি এ ভারতে ছিল চিরকাল—
আজ আর কিছু নাই, রহিয়াছে স্মৃতির কঙ্কাল!
একদা জননীসম সবাকারে করিত পালন
আজি রিক্তা কাঙালিনী "অন্ন দাও" করিছে রোদন—
বন্যায় ভেসে গেছে—ধান্য কিছু নাই আর মাঠে!
সর্ব্বহারা পল্লীর দিন আজ উপবাসে কাটে।
কাঁদে জায়া কাঁদে পুত্র—কাঁদিতেছে বন্ধু-পরিজন!
খাদ্য বিনা হইয়াছে আজি হায় দুর্ব্বহ জীবন।
ক্ষুধাতুর ফুকারিছে, "প্রাণ যায় খাদ্য দাও দু'টি—"
পথে পথে শ্বাসহীন ক্ষীণ দেহ পড়িতেছে লুটি।

বন্দে আলী মিয়া

নাট্যদর্পণের যুগ্ম গ্রন্থকার রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র শান্তকে রস-রূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংসার-ভয়-বৈরাগ্য-তত্ত্বচিন্তা-শাস্ত্রালোচনাদি বিভাব-সঞ্জাত শান্ত-রস। ক্ষমা-ধ্যান-উপকারাদি-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য (১)।

ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উঁহারাই বলিয়াছেন—সংসার-ভয় বলিতে বুঝায়—দেব-মনুষ্য-নারকি-তির্য্যগ্-রূপে বহুধা ভ্রমণের নামই সংসার (২); ইহা হইতে যে ভয় তাহাই সংসার-ভয়। বৈরাগ্য—বিষয়ে বিমুখভাব (৩)। তত্ত্বচিন্তা-জীব-অজীব, পুণ্য-পাপ প্রভৃতির বিশ্লেষণ-দ্বারা স্বরূপ-বোধ (৪)। শাস্ত্র—মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র; পুনঃ পুনঃ তাহার বিমর্শন বা চিত্তে ন্যাস—তদ্বিষয়ক চিন্তা। এই সকল বিভাব-দ্বারা শম-স্থায়ি-ভাবাত্মক শান্ত-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে (৫)। এই শম কিরূপ, তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—কাম-ক্রোধ-লোভ-মান-মায়া প্রভৃতি দ্বারা যাহা উপরঞ্জিত নহে, অন্য বিষয়ে যাহার উন্মুখতা নাই—ও যে চিত্তে ক্লেশ নাই, তাদৃশ চিত্তই শম নামে আখ্যাত হইয়া থাকে (৬)। ক্ষমা—তর্জ্জন-বধ-বন্ধনাদি সহন। ধ্যান—জীব-অজীব প্রভৃতি তত্ত্ব-ভাবনা। ইহা হইতে শান্তের অনুভাব নিশ্চল দৃষ্টি প্রভৃতি সবই সূচিত হইতেছে। উপকার—মৈত্রী-প্রমোদ-কারুণ্য-মধ্যস্থতা প্রভৃতি অনুভাব (৭)। ইহার ব্যভিচারি-ভাব—নির্ব্বেদ-স্মৃতি-মতি-ধৃতি প্রভৃতি (৮)। পরিশেষে গ্রন্থকারদ্বয় বলিতেছেন—এই শান্ত-রসের কথা কোন কোন আলঙ্কারিক বলেন নাই। যাঁহারা শান্ত-রস স্বীকার করেন নাই, বুঝিতে হইবে যে, সকল-ক্লেশ-মোচন-স্বরূপ পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-বিষয়ে তাঁহারা পরাঙ্মুখ (৯)। অর্থাৎ যাঁহারা শান্ত-রস স্বীকার করেন না, তাঁহারা মোক্ষ-বিষয়ে অজ্ঞান—ইহাই বুঝিতে হইবে।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) 'রসগঙ্গাধরে' নব-রসের নাম করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের টীকায় নাগেশও বলিয়াছেন—কাব্যে নব রস (১০)। অবশ্য এই নবম রসটি 'শান্ত'। পণ্ডিতরাজ বলিতেছেন—এই বিষয়ে মুনির (ভরতের) বচনই প্রমাণ। এই বিষয়ের বিচার-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—'কাহারও কাহারও মতে যেহেতু শান্ত-রস শম-সাধ্য অর্থাৎ শম-স্থায়িক, আর যেহেতু নটে শম-স্থায়ী অসম্ভব,—অতএব নাট্যে আটটিই মাত্র রস—শান্ত-রস নাট্যে হইতেই পারে না।' অপর পক্ষ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নটে শম অসম্ভব—এই প্রকার হেতুটি অসঙ্গত। কারণ, নটে রসের অভিব্যক্তিই ইঁহাদিগের মতে স্বীকার্য্য নহে। সামাজিকগণ শমবিশিষ্ট হইতে ত কোন আপত্তি নাই। অতএব, সামাজিকগণের চিত্তে শান্ত-রসোদ্বোধে বাধা থাকিতে পারে না (১১)।

এখন প্রশ্ন উঠিবে এই যে, নটে যদি শম না থাকে, তাহা হইলে সে অভিনয়ে তাহার প্রকাশ করিবে কিরূপে? যাহার যাহা নাই, সে তাহার প্রকাশ করিতে পারে না—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নটে ত ভয়-ক্রোধাদি কোন স্থায়িভাবেরই বস্তুতঃ সত্তা থাকে না। তথাপি অভিনয়ে সে ঐ সকল ভাবের প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন ভাবের অভাব যদি তাহার অভিনয়ে প্রকাশের প্রতিবন্ধক হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলির প্রকাশ কোনরূপেই সম্ভব বা সঙ্গত হইত না। আর যদি এরূপ মনে করা যায় যে, নটে ক্রোধাদির অভাবহেতু ঐ সকল ভাবের বাস্তব (অর্থাৎ যথার্থ) কার্য্য অকৃত্রিম বধ-বন্ধনাদির উৎপত্তি অসম্ভাবিত হইলেও কৃত্রিম তৎকার্য্যের উৎপত্তি শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে শম-স্থায়ীর পক্ষেও তুল্য যুক্তি খাটিতে পারে (১২)।

---

(১) "সংসারভয়বৈরাগ্যতত্ত্বশাস্ত্রবিমর্শনৈঃ। শান্তোঽভিনয়নং তস্য ক্ষমাধ্যানোপকারতঃ"। নাঃ দঃ (৩।১২২)

(২) সংসার—যাহার মধ্যে সম্যগ্‌রূপে সরণ (অর্থাৎ ভ্রমণ) করিতে হয়—ইহলোক-পরলোকে পুনঃ পুনঃ আগমন-গমনই সংসার-পদ-বাচ্য।

(৩) ইহা হইতে বুঝা যায়—নাট্যদর্পণ-মতে বৈরাগ্য স্থায়ি-ভাব নহে। এ মতে বৈরাগ্য বিভাব।

(৪) অজীব—গ্রন্থকারদ্বয় জৈন-সম্প্রদায়-ভুক্ত। জৈন-মতে সংক্ষেপতঃ পদার্থ দ্বিবিধ—জীব ও অজীব। ভামতী-কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"বোধাত্মকো জীবো জড়বর্গস্ত্বজীবঃ"—জীব চেতন, অজীব—অচেতন। ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ জৈন গ্রন্থাদিতে অথবা ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যে (২।২।৩৩) দ্রষ্টব্য।

(৫) এ মতে—শম স্থায়ী—বৈরাগ্য বা নির্ব্বেদ নহে।

(৬) "এবমাদিভির্বিভাবৈঃ কাম-ক্রোধ-লোভ-মান-মায়াদ্যনুপরক্ত-পরোন্মুখতাবিবর্জ্জিতাক্লিষ্টচেতোরূপশমস্থায়ী শান্তো রসো ভবতি"—নাঃ দঃ (৩।১২২)।

(৭) মধ্যস্থতা—ঔদাসীন্য।

(৮) এ মতে—নির্ব্বেদ ব্যভিচারি-ভাব; বৈরাগ্য—বিভাব। আর শম—স্থায়ী। অতএব শম, বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ পরস্পর ভিন্ন

(৯) "অয়ঞ্চ কৈশ্চিন্নোক্তঃ, তেষাং সকলক্লেশবিমোক্ষলক্ষণ-মোক্ষপুরুষার্থপরাঙ্মুখত্বমেব দূষণমিতি"।—নাঃ দঃ। তাঁহারা মোক্ষ বিষয়ে অজ্ঞান—ইহাই বুঝিতে হইবে।

(১০) "শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরোঽদ্ভুতস্তথা। হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভৎসশ্চেতি তে নব"। ইত্যুক্তেন বধা। মুনিবচনং চাত্র প্রমাণম্।—(রসগঙ্গাধর, ১ম আনন)। "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্র-বীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ কাব্যে নব রসাঃ স্মৃতাঃ"।—নাগেশ, গুরুমর্ম্মপ্রকাশ। জগন্নাথের মতে নাট্যেও নব রস। কিন্তু নাগেশ এ স্থলে কাব্যেই নব রস বলিলেন। ইহা জগন্নাথের স্বারসিক মত নহে—মতান্তরে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

(১১) "কেচিত্তু—"শান্তস্য শমসাধ্যত্বান্নটে চ তদসম্ভবাৎ। অষ্টাবেব রসা নাট্যে ন শান্তস্তত্র যুজ্যতে॥ ইত্যাহুঃ—("শমসাধ্যত্বাৎ শমস্থায়িকত্বাৎ"—নাগেশঃ) তদপরে ন ক্ষমন্তে। তথাহি। নটে শমাভাবাদিতি হেতুরসঙ্গতঃ। নটে রসাভিব্যক্তেরস্বীকারাৎ। সামাজিকানাং শমবত্ত্বে তত্র রসোদ্বোধে বাধকাভাবাৎ"। (রঃ গঃ)

(১২) "ন চ নটস্য শমাভাবাত্তদভিনয়প্রকাশকত্বানুপপত্তিরিতি

শান্ত-রস স্বভাবতঃ সর্ব্বচেষ্টা-বর্জ্জিত—সর্ব্ব-ব্যাপার-বিরোধী—বিষয়-সমূহে বিমুখতাই উহার স্বরূপ। পক্ষান্তরে, গীত-বাদ্যাদি-দ্বারা বিষয়ে আকর্ষণ জন্মে। অতএব, নাট্য-গীত-বাদ্যাদি শান্ত-রসের বিরোধী। আর গীত-বাদ্যাদি নাট্যাভিনয়ের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এখন পুনরায় নূতন প্রশ্ন উঠিতে পারে। অভিনয়ে শান্ত-বিরোধী গীত-বাদ্যাদির অস্তিত্ব-হেতু সামাজিকগণের চিত্তেই বা বিষয়-বৈমুখ্য-রূপ শান্ত-রসের উদ্রেক কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহার উত্তরে জগন্নাথ বলিয়াছেন—যাঁহারা নাট্যে শান্ত-রস স্বীকার করেন, তাঁহারা অভিনয়াঙ্গ গীত-বাদ্যাদিকে শান্তের বিরোধী বলিয়া কল্পনা করেন না। কারণ, বিষয়-চিন্তা মাত্রকেই যদি শান্ত-রসের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শান্ত-রসের আলম্বনীভূত সংসারের অনিত্যতা ও উহার উদ্দীপন-হেতু পুরাণ-শ্রবণ-সৎসঙ্গ-পুণ্যবন-তীর্থাবলোকন প্রভৃতিও বিষয় বলিয়াই শান্তের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, বিষয়-চিন্তামাত্রকেই শান্ত-বিরোধী বলা চলে না। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া দোষদুষ্ট—তাহারাই শান্তের প্রতিকূল। আর যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগবিমুখ করিয়া সংসার-বৈরাগ্য উৎপাদিত করে (যথা—শাস্ত্রশ্রবণ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি), তাহারা শান্তের অনুকূল। যে সকল গীত-বাদ্যাদি ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা আনয়ন করে, তাহারাই শান্ত-বিরোধী। পক্ষান্তরে, এমন উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-সঙ্গীতাদি আছে—যেগুলি ইন্দ্রিয়ের চাপল্য দূর করিয়া দেয়, বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ—আত্মনিষ্ঠ করিতে সহায়তা করে। এইরূপ শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্গীতাদি শান্ত-রসের বিরোধী ত নহেই—বরং অনুকূল। ইহাই পণ্ডিতরাজের উক্তির তাৎপর্য্য (১৩)।

পরিশেষে সঙ্গীত-রত্নাকরকর্ত্তা শার্ঙ্গদেবের বচন উদ্ধৃত করিয়া জগন্নাথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বলিয়া থাকেন যে, নাট্যে অষ্টরস মাত্র; ইহা সুচারু মত নহে—কারণ, নট স্বয়ং কোনরূপ রসই আস্বাদন করেন না'। অতএব, নাট্যেও শান্ত-রস বর্ত্তমান। ইহাই স্বারসিক সিদ্ধান্ত (১৪)।

তবে যাঁহারা নিতান্তই নাট্যে শান্ত-রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারাও কাব্যে নাট্য-রসের সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, পূর্ব্বোল্লিখিত বাদ-প্রতিবাদগুলির পর্য্যালোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শান্ত-রসের নাট্যে অভিনয়-যোগ্যতা আছে কি না—ইহা লইয়াই যত বিবাদ—শান্ত-রসের অস্তিত্ব লইয়া কোন বিবাদই উঠে নাই। বিশেষতঃ মহাভারত-পুরাণাদি প্রবন্ধ যে শান্ত-রস-প্রধান—ইহা অখিল-লোকের অনুভব-সিদ্ধ। অতএব, কাব্যে শান্ত-রস অবশ্য স্বীকার্য্য। আর ঠিক এই কারণেই মম্মট ভট্টও উপক্রমে 'নাট্যে অষ্ট রস' বলিয়া কাব্যপ্রকাশের রস-বিবরণের প্রারম্ভ করিয়া—'শান্তও নবম রস' বলিয়া ঐ প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন (১৫)।

অতঃপর জগন্নাথ বলিয়াছেন, শান্ত-রসের স্থায়িভাব নির্ব্বেদ (১৬)। উহার লক্ষণ-নিরূপণ করিয়াছেন—নিত্যানিত্য বস্তু বিচার-জনিত বিবেক হইতে উদ্ভূত বিষয়-বৈরাগ্যই নির্ব্বেদ (১৭) ইহাই যথার্থ নির্ব্বেদ। গৃহে কলহাদি হইতে উদ্ভূত যে সামান্য নির্ব্বেদ, তাহা শান্ত-রসের স্থায়ী হইতে পারে না—উহা বড় জোর ব্যভিচারি-মাত্র-রূপে গণ্য হইতে পারে (১৮)।

জগন্নাথের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়—তিনি নির্ব্বেদকে শান্ত-রসের ব্যভিচারী বলিয়াছেন, তাহা একোনপঞ্চাশ ব্যভিচারি-ভাব-সমূহের অন্তর্গত সাধারণ নির্ব্বেদ ভাব নহে। ইহা পরম নির্ব্বেদ বা পরম বৈরাগ্য। অনায়াসে ইহারই অপর নাম 'শম' দেওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কারণ, জগন্নাথ স্বয়ং পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, সামাজিক

বাচ্যম্। তস্য ভয়ক্রোধাদেরভাবেন তদভিনয়প্রকাশকত্বস্য অপাসঙ্গত্বাপত্তেঃ। যদি চ নটস্য ক্রোধাদেরভাবেন বাস্তবতৎকার্য্যাণাং বধবন্ধাদীনামনুৎপত্ত্যাসম্ভবেঽপি কৃত্রিমতৎকার্য্যাণাং শিক্ষা-সাধিত উৎপত্তৌ নাস্তি বাধকমিতি বিভাব্যতে তদা প্রকৃতেঽপি তুল্যম্"।—রঃ গঃ।

এখন প্রশ্ন ত উঠিতে পারে—শান্তে যখন রোমাঞ্চাদির একান্ত অভাব, তখন শান্ত-রসের অভিনয় প্রদর্শনই সম্ভব হয় না। অতএব, নাট্যে শান্ত-রস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে নাগেশ বলিয়াছেন—সর্ব্ব-চেষ্টা-রাহিত্য-স্বরূপেই শান্ত-রসের অভিনয় সম্ভব হইতে পারে। "প্রকৃতেঽপি তুল্যমিতি। ন চ শান্তস্য রোমাঞ্চাদি-রাহিত্যেনানভিনেয়ত্বাৎ কথং নাট্যে স ইতি বাচ্যম্। সর্ব্বচেষ্টা-রাহিত্যরূপেণৈব তদভিনয়সম্ভবাদিত্যাহুঃ"।—নাগেশ।

(১৩) "অথ নাট্যগীতবাদ্যাদীনাং বিরোধিনাং সত্ত্বাৎ সামাজিকেষ্বপি বিষয়বৈমুখ্যাত্মনঃ শান্তস্য কথমুদ্রেক ইতি চেৎ। নাট্যে শান্তরসম্ভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ ফলবলাত্তদঙ্গীতবাদ্যাদেস্তস্মিন বিরোধিতায়া অকল্পনাৎ। বিষয়চিন্তাসামান্যস্য তত্র বিরোধিত্বস্বীকারে তদীয়ালম্বনস্য সংসারানিত্যত্বস্য তদুদ্দীপনস্য পুরাণশ্রবণসৎসঙ্গপুণ্যবন-তীর্থাবলোকনাদেরপি বিষয়ত্বেন বিরোধিত্বাপত্তেঃ।"—রঃ গঃ।

(১৪) "অতএব চ চরমাধ্যায়ে সঙ্গীতরত্নাকরে—"অষ্টৌ রসা নাট্যেষ্বিতি কেচিদচূচুদন্। তদচারু, যতঃ কশ্চিন্ন রসং স্বদতে নট ইত্যাদিনা নাট্যেঽপি শান্তরসোঽস্তীতি ব্যবস্থাপিতম্।"—রঃ গঃ।

নাগেশ বলিয়াছেন, যেহেতু নাট্যেও শান্তরস সম্ভব, এই কারণে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। "অতএব প্রবোধচন্দ্রোদয়স্য নাটকত্বং স্বীকৃতং সর্ব্বৈঃ।"—নাগেশ।

(১৫) "যৈরপি নাট্যে শান্তো রসো নাস্তীত্যভ্যুপগম্যতে তৈ বাধকাভাবান্মহাভারতাদিপ্রবন্ধানাং শান্তরসপ্রধানতয়া অ লোকানুভবসিদ্ধত্বাচ্চ কাব্যে সোঽবশ্যং স্বীকার্য্যঃ। অত নাট্যে রসা ইত্যুপক্রম্য শান্তোঽপি নবমো রস ইতি মম্ম অপ্যুপসমহার্ষুঃ।"—রঃ গঃ।

(১৬) "রতিঃ শোকশ্চ নির্ব্বেদক্রোধোৎসাহাশ্চ বিস্ময়ঃ। ভয়ং জুগুপ্সা চ স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী"।—রঃ গঃ।

(১৭) "নিত্যানিত্যবস্তুবিচারজন্মা বিষয়বিরাগাখ্যো নির্ব্বে —রঃ গঃ।

বেদান্তমতে বলা হইয়াছে—একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তা অপর সকলই অনিত্য—বিচার-দ্বারা এইরূপ বিবেক-জ্ঞানই নিত্যবস্তুবিবেক। বিবেক—বিবেচনা, পৃথক্করণ—differentiation.

(১৮) "গৃহকলহাদিজস্তু ব্যভিচারী"। এই জাতীয় প্রকৃত পর-বৈরাগ্য নহে। অনেকটা শ্মশান-বৈরাগ্যের তুল্য।

শমভাব-বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে শান্ত-রসের উদ্বোধ হওয়ার কোন বাধা থাকিতে পারে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রকারান্তরে শমকেই শান্তের স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর কণ্ঠোক্তি-দ্বারা এস্থলে নির্ব্বেদকে স্থায়ী বলিতেছেন। অতএব, তাঁহার মতে নির্ব্বেদ ও শম একই। তাঁহার মতে—এ নির্ব্বেদ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার-জনিত তত্ত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বিষয়ে পরম বৈরাগ্য। যোগশাস্ত্র-মতে এইরূপ বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য—ইহাই ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। আর অভিনবগুপ্তও ত বলিয়াছেন যে, যদি তত্ত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে শমেরই নামান্তর নির্ব্বেদ। অতএব, এ ক্ষেত্রে আচার্য্য অভিনবগুপ্তের সহিত জগন্নাথের মতের অভিন্নতাই অনুমিত হইতেছে। কারণ, আচার্য্যপাদও অভিনবভারতীতে বলিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই আত্মস্বরূপ। আবার তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ-সাধন। অতএব মোক্ষ-স্বরূপ শান্ত-রসে তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়ী। অর্থাৎ—আত্মাই স্থায়ী। এই আত্মাকে (= আত্মজ্ঞানকে) যদি 'শম' বা 'নির্ব্বেদ' নামে অভিহিত করিতে চাও, করিতে পার। কিন্তু সাবধানে মনে রাখিও যে, এই শম—চিত্তবৃত্তি-বিশেষ নহে—বা এই নির্ব্বেদ দারিদ্র্যাদি-জনিত নির্ব্বেদতুল্য নহে (১৯)। অভিনবগুপ্ত এইরূপে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় পর-বৈরাগ্য পরম নির্ব্বেদ ও শম-স্থায়ীকে এক—অভিন্ন বলিয়াছেন। অবশ্য জগন্নাথ এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে নির্ব্বেদ ও শমের ... বলিলেও তাঁহার পূর্ব্বাপর উক্তির একবাক্যতা করিলে নির্ব্বেদ ও শমের অভিন্নতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ...

গোবিন্দ ঠক্কুর কাব্য-প্রকাশ-কারের নির্ব্বেদ স্থায়ী—এই মত ... প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আত্মাবমাননা-স্বরূপ নির্ব্বেদ স্থায়ী হইতে পারে না। সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি-বিরাম স্থায়ী—এ মতও দুষ্ট। কারণ, অভাব কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব,

(১৯) "···তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি কেচিৎ। তথাহি দারিদ্র্যাদি-প্রভবো যো নির্ব্বেদস্ততোঽন্য এব···নন্ন তত্ত্বজ্ঞানিনঃ সর্ব্বত্র দৃঢ়তরং বৈরাগ্যং দৃষ্টম্···ভবতো ব্রবং "তাদৃশং তু বৈরাগ্যং জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠেতি" ভুজঙ্গবিভুনৈব ভগবতাভ্যধায়ি। ততশ্চ তত্ত্বজ্ঞানমেবেদং তত্ত্বজ্ঞান-মালম্ব্য পরিপোষ্যমাণমিতি ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানমেব স্থায়ীতি ভবেৎ।···কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি শমস্যৈবেদং নির্ব্বেদনাম কৃতং স্যাৎ···তস্মান্ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ীতি। ইহ তত্ত্বজ্ঞানমেব তাবন্মোক্ষসাধনমিতি তস্যৈব মোক্ষে স্থায়িতা যুক্তা। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ নামাত্মজ্ঞানমেব। আত্মনশ্চ ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়স্যৈব জ্ঞানং পরো ক্ষেবমাত্মনাস্যৈব স্যাৎ।···তেনাস্যৈব···স্থায়ী।···তত্ত্বজ্ঞানন্তু সকল-ভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং সর্ব্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং···অতএব পৃথগস্য গণনা ন যুক্তা। তেনৈকোনপঞ্চাশদ্ভাবা ইত্যব্যাহতমেব।···সমাত্ম-স্বভাবস্য শমশব্দেন মুনির্ব্যপদিষ্টঃ। যদি তু স এব শমশব্দেন ব্যপদিশ্যতে নির্ব্বেদশব্দেন বা তন্ন কশ্চিদ্দোষ এব কেবলং শমশ্চিত্ত-বৃত্ত্যন্তরং, নির্ব্বেদোঽপি দারিদ্র্যাদিবিভাবান্তরোত্থিতনির্ব্বেদতুল্য-জাতীয়ো ন ভবতি।···তদিদমাত্মস্বরূপমেব তত্ত্বজ্ঞানং শমতা" —অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৪-৩৮। এ সম্বন্ধে বিচার শ্রাবণের মাসিক বসুমতীতে (পৃঃ ২৮৮-২৯০) দ্রষ্টব্য।

স্বাত্ম-বিশ্রান্তি-সুখ-স্বরূপ যে শম, তাহাই স্থায়ী (২০)। ইহার সমালোচনায় বলা চলে—নির্ব্বেদ ত আত্মাবমাননা-স্বরূপ নহে। আত্ম-শব্দের মিথ্যার্থ (দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি) গ্রহণ করিলেও তাহাতে তুচ্ছত্ব-বোধ (আত্মাবমাননা) নির্ব্বেদ নহে। নির্ব্বেদ পর-বৈরাগ্য—ইহা অভিনবগুপ্ত বহু যুক্তি-সহকারে স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি-বিরাম অভাবরূপ হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধই নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। উহাতে আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব, সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি-বিরামে যে স্বপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থান, তাহাই আত্মজ্ঞান ও তাহাই আত্মস্বরূপ। ইহাকেই অভিনবগুপ্ত শান্তের স্থায়ী বলিয়াছেন। স্বাত্মবিশ্রামানন্দ এবংবিধ সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তি-বিরামেই ত অনুভূয়মান হইতে থাকে। অতএব, গোবিন্দ ঠক্কুর যে নির্ব্বেদ ও শমের পার্থক্য দেখাইতে গিয়াছেন, তাহা যোগ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের

(২০) "ন চৈতস্য স্থায়ী নির্ব্বেদো যুজ্যতে। তস্য বিষয়েঽলং-প্রত্যয়রূপত্বাদাত্মাবমাননরূপত্বাচ্চ।···অতএব "সর্ব্বচিত্তবৃত্তিবিরামোঽস্য স্থায়ী" ইতি নিরস্তম্, অভাবস্য স্থায়িত্বাযোগাৎ। তস্মাচ্ছমোঽস্য স্থায়ী। নির্ব্বেদাদয়স্তু ব্যভিচারিণঃ। স চ—"শমো নিরীহাবস্থায়ামানন্দঃ স্বাত্মবিশ্রামাৎ" —(কাব্য-প্রকাশ-প্রদীপ, আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ১২৫)। এ স্থলে নির্ব্বেদ—দারিদ্র্যাদি-জনিত। আর শম—আত্মজ্ঞান বা আত্মস্বরূপানন্দের প্রকাশ। উহাই পরবৈরাগ্য—বা পর নির্ব্বেদ। এ সম্বন্ধে বিচার শ্রাবণের বসুমতীতে (পৃঃ ২৮৭-৮৮) দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দের কাব্য-প্রদীপের উপর নাগোজির 'উদ্দ্যোত' ব্যতিরিক্ত বৈদ্যনাথের 'প্রভা'-নামে একখানি টীকা আছে। উহাতে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নাই। তবে নির্ব্বেদ স্থায়ী—কাব্য-প্রকাশকারের এই মত খণ্ডন-পূর্ব্বক শম-স্থায়ী এই মত গোবিন্দ প্রকাশ করিয়াছেন —"তস্মাচ্ছমোঽস্য স্থায়ী···স চ শমো নিরীহাবস্থায়ামানন্দঃ। স্বাত্ম-বিশ্রামাদিতি" (নির্ণয়-সাগর-প্রকাশিত কাব্যপ্রদীপের পাঠ)। উহার উপর নাগোজি যেরূপ আলোচনাপূর্ব্বক শম স্থায়ী এই মত খণ্ডন করিয়া—নির্ব্বেদ স্থায়ী—প্রকাশের এই মূল মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বৈদ্যনাথ সেরূপ করেন নাই। তিনি শম স্থায়ী ইহাই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—"নিখিলবিষয়পরিহারেণ বৈরাগ্যেণ জনিতো য আত্মমাত্রে বিশ্রামো বিগলিতবেদ্যান্তরতয়া চিত্তস্থিতিস্তেন য আনন্দঃ শমাখ্যস্তস্য প্রাদুর্ভাবোঽভিব্যক্তিস্তৎস্বরূপত্বাদনুভবাদিত্যর্থঃ। নিরীহেতি। বিষয়ব্যাসঙ্গশূন্যতা" —প্রভা (নির্ণয়সাগর সং, পৃঃ ১০, ১১)। নাগোজির মতেও নিরীহাবস্থা অর্থে নিস্তৃষ্ণ অবস্থা। নিখিল বিষয় বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্য-জনিত যে আত্ম-স্বরূপ-মাত্রে বিশ্রাম (অর্থাৎ—যে চিত্তের আর জ্ঞাতব্য কিছু নাই এরূপ ভাবে চিত্তের অবস্থান), তাহা হইতে যে আনন্দ তাহাই শম। উহার প্রাদুর্ভাব (বা অভিব্যক্তি) হইলে তাহার যে স্বরূপানুভব—তাহাই যদি গোবিন্দ বা বৈদ্যনাথের শম-স্থায়ী হয়—তবে উহাই ত আত্মানন্দ বা আত্মজ্ঞান—উহাই ত আত্মার স্বরূপ। উহাকে 'শম' বলিব—নির্ব্বেদ বলিব না, অথবা 'নির্ব্বেদ' বলিব—শম বলিব না—এরূপ শুষ্ক কলহ গোবিন্দ-নাগেশের মধ্যে অত্যন্ত অশোভন। এ প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্ত আমরা পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত করিয়াছি। উহাই যথার্থ সমাধান—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সিদ্ধান্ত-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্য বা গৃহ-কলহ প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন যে সাময়িক নির্ব্বেদ যাহা ব্যভিচারিরূপে গণ্য, তাহার সহিত শমের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু যে নির্ব্বেদ পর-বৈরাগ্য-স্বরূপ, তাহা শম হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। আর এ শমও চিত্তের কেবল একটি বৃত্তি-বিশেষ। (অর্থাৎ চিত্ত-সংযম-রূপ) নহে। ইহাও আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতির নামান্তর। অভিনবগুপ্তের বাক্যাবলী পর্য্যালোচনায় এই তত্ত্বই স্ফুটতর হইয়া উঠে।

মহামনীষী নাগোজি ভট্টও সম্ভবতঃ অভিনবগুপ্তের এই আলোচনা-মূলক অভিনবভারতীর অংশ দর্শন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাহা হইলে তিনিও নির্ব্বেদ ও শমের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার প্রয়াসী হইতেন না। তিনি যে মম্মট ভট্ট ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের প্রভাবে বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন—এরূপ অনুমান অনায়াসে করা চলে। গোবিন্দ ঠক্কুর কাব্যপ্রকাশের উক্তি (নির্ব্বেদ-স্থায়ী) খণ্ডনপূর্ব্বক শম-স্থায়ী বলিতেছেন—এ কথা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নতুবা তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবেই বা শম-স্থায়ী এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া নির্ব্বেদ-স্থায়ী এই সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হইবেন কেন (২১)? ভরতের মূলগ্রন্থ তাঁহার দেখা ছিল। তাহাতে ত শম-স্থায়িক শান্ত-রস বলা হইয়াছে। গোবিন্দকে খণ্ডন করিতে যাইয়া তাঁহার যখন খেয়াল হইল যে, তাই ত, এরূপ ভাবে শম-স্থায়ি-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলে স্বয়ং মুনির মতও খণ্ডিত হইয়া যায়, তখন তিনি ব্যাকরণের কূট-প্রক্রিয়া অবলম্বনে মুনি-মত রক্ষায় প্রয়াসী হইলেন। তিনি দেখাইলেন যে—নাট্যশাস্ত্রে যে শম-স্থায়ী বলা হইয়াছে, তথায় 'শম'-শব্দটি অপাদান-বাচ্যে ব্যুৎপন্ন। যাহা হইতে শমিত হয় (শম্ + অপ্, অপাদান-বাচ্যে—'শম্যতে যতঃ'), তাহাই শম (২২)। অর্থাৎ ভরতের মতে এ শম নির্ব্বেদেরই পর্য্যায়। কারণ, নির্ব্বেদ হইতেই সকল কামনা শমিত হয়। ইহাই যদি তাঁহার মতে যথার্থ সমাধান হয়, তাহা হইলে তিনি এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোবিন্দের সিদ্ধান্ত (শম-স্থায়ী) খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? মুনির সিদ্ধান্ত যে প্রক্রিয়ায় তিনি সমর্থন করিলেন, সেই প্রক্রিয়া-বলে ত গোবিন্দের সিদ্ধান্তও সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু ততটুকু তলাইয়া দেখিবার মত মনোবৃত্তি তাঁহার তখন ছিল না। কারণ, প্রকাশ-কারের সিদ্ধান্ত-সমর্থনের আগ্রহে তিনি যুক্তি অপেক্ষা আক্রোশেরই অধিকতর বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দকে খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অতএব মোটের উপর বলা চলে যে, গোবিন্দ ও নাগেশ উভয়েই এ প্রসঙ্গে একদেশদর্শী হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে অভিনবের সিদ্ধান্ত অতুলনীয় যুক্তিজাল-বিমণ্ডিত। জগন্নাথ স্পষ্ট সে সিদ্ধান্তের কণ্ঠোক্তি-দ্বারা প্রতিধ্বনি না করিলেও অর্থতঃ উহার সূচনা করিয়াছেন। আর প্রকাশ-কারের উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট। তিনি এ স্থলে 'নির্ব্বেদ' বলিতে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা বলা অতি কঠিন।

জগন্নাথ বলিয়াছেন—জগতের অনিত্যতা-জ্ঞান শান্ত-রসের আলম্বন-বিভাব। বেদান্ত (উপনিষৎ) শ্রবণ, তপোবন গমন, তাপসাদি সাধুজনের সঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। বিষয়ে অরুচি, শত্রু-মিত্রে সমভাব (ঔদাসীন্য), সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার বিরাম, নাসাগ্রে দৃষ্টি (যোগাদি সাধন) প্রভৃতি অনুভাব। হর্ষ-উন্মাদ-স্মৃতি-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী (২৩)।

জগন্নাথের শান্ত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ভানুদত্ত মিশ্র তাঁহার 'রস-তরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে চিত্তবৃত্তি দ্বিবিধ—(১) প্রবৃত্তি ও (২) নিবৃত্তি। নিবৃত্তি-মূলক চিত্তবৃত্তির উদয়ে শান্ত-রস অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। নাট্যভিন্ন স্থলে নির্ব্বেদ-স্থায়িভাব-বিশিষ্ট নবম রস শান্ত তাঁহার মতে অবশ্য স্বীকার্য্য। নির্ব্বেদের পরিপোষ-স্বরূপ শান্তরস। অথবা উহাকে দোষের প্রশমন-স্বরূপও বলা চলে। দোষ বলিতে বুঝায় কাম-ক্রোধাদি। বিষয়ের দোষ-বিচার, বিরক্তি (বৈরাগ্য) প্রভৃতি ইহার বিভাব। আনন্দাশ্রু-পুলক-হর্ষ-গদ্গদ-বাক্যাদি অনুভাব (২৪)।

(২১) "···বস্তুতো···তত্ত্বজ্ঞানজনির্ব্বেদমুপজীব্য শমাদিপ্রবৃত্তেঃ স এব স্থায়ী ন শমঃ"। (এ স্থলে অভিনবের উক্তি স্মরণ করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান-জনিত যে নির্ব্বেদ তাহাই ত পরবৈরাগ্য—উহাই ত শমের নামান্তর মাত্র। এইরূপ পরম নির্ব্বেদ ও শমের ভেদ উদ্ঘাটনের চেষ্টা নাগেশের পক্ষে বড়ই অশোভন হইয়াছে।)

(২২) "ন চ ক্বচিচ্ছম ইতি মুন্যুক্তিবিরোধঃ। শম্যতে যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্য নির্ব্বেদপরত্বাৎ"। (ভরতের সুস্পষ্ট উক্তিতে 'শম'ই স্থায়ী—উহার ত আর খণ্ডন করা চলে না—তাই এইরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে নাগেশ বাধ্য হইয়াছেন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অগত্যা স্বীকারও করিতে হইয়াছে যে, শম ও নির্ব্বেদ একই। সেই যদি শেষ পর্য্যন্ত ব্যাকরণের সাহায্যে শম ও নির্ব্বেদের ঐক্যই মানিয়া লইতে হইল, তখন তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার-পূর্ব্বক অভিনব-মতানুসারে শম ও নির্ব্বেদের তাদাত্ম্য স্বীকার করিলেই ত এত গোলমাল নিঃশব্দে মিটিয়া যায়।) "অতএবৈকোনপঞ্চাশদ্ভাবা ইতি মুন্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে।···শমস্যাপি ভাবত্বে ত্বাধিক্যাপত্তিঃ"। এ আধিক্য কেন হইবে না, তাহা অভিনব স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন—শ্রাবণ, বসুমতী, পৃঃ ২৮৯ ও ১৯নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(২৩) "শান্তস্যানিত্যত্বেন জ্ঞাতং জগদালম্বনং, বেদান্তশ্রবণ-তপোবনতাপসদর্শনাদ্যুদ্দীপনং, বিষয়ারুচিশত্রুমিত্রৌদাসীন্য-চেষ্টাহানি-নাসাগ্রদৃষ্ট্যাদয়োঽনুভাবাঃ, হর্ষোন্মাদস্মৃতিমত্যাদয়ো ব্যভিচারিণঃ"। —রঃ গঃ (১ম আনন)

(২৪) "চিত্তবৃত্তির্দ্বিধা—প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চেতি। নিবৃত্তৌ যথা শান্তরসঃ···"রঃ তঃ, বেঙ্কটেশ্বর সং, পৃঃ ১৬১ ; কাশী লিথো সং পৃঃ ৮৩। নাট্যভিন্নে পরং নির্ব্বেদস্থায়িভাবকঃ শান্তোঽপি নবমো রসো ভবতি। নির্ব্বেদস্য পরিপোষঃ শান্তো রসঃ, দোষপ্রশমো বা। দোষাঃ কামক্রোধাদয়ঃ। অস্যবিষয়দোষবিচারবিরক্ত্যাদয়ো বিভাবাঃ। অনুভাবা আনন্দাশ্রুপুলকহর্ষগদ্গদবচনাদয়ঃ। যথা—হেয়ং হর্ম্ম্যমিদং নিকুঞ্জভবনং শ্রেয়ঃ প্রদেয়ং ধনং, পেয়ং তীর্থপয়ো হরের্ভগবতো গেয়ং পদাম্ভোরুহম্। নেয়ং জন্ম চিরায় দর্ভশয়নে ধর্ম্মে নিধেয়ং মনঃ স্থেয়ং তত্র সিতাসিতস্য সবিধে ধ্যেয়ং পুরাণং মহঃ। যথা বা—বেদস্যাধ্যয়নং কৃতং পরিচিতং শাস্ত্রং পুরাণং শ্রুতং, সর্ব্বং ব্যর্থমিদং পদং ন কমলা-কান্তস্য চেৎ কীর্ত্তিতম্। উৎখাতং সদৃশীকৃতং বিরচিতং সেকোঽম্ভসা ভূয়সা সর্ব্বং নিষ্ফলমালবালবলয়ে ক্ষিপ্তং ন বীজং যদি"। রঃ তঃ বেঃ সং পৃঃ ১৬৩-১৬৫ ; কাশী লিথো, পৃঃ ৮৪-৮৬ (পঞ্চম তরঙ্গ)

গঙ্গারাম তাঁহার 'নৌকা'-নাম্নী টীকায় রসতরঙ্গিণীর ঐ উক্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—গ্রন্থকার পূর্ব্বে ভরত-সম্মতি দেখাইয়া নাট্যে অষ্ট রস বলিয়াছেন (২৫)। কিন্তু নাট্য-ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ আদিকাব্য-ইতিহাসাদিতে নব রসই দৃষ্ট হয়। শান্ত-রস যে অতিরিক্ত নবম রস, এ বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ মুনির বচন নৌকা-টীকাকার তুলিয়াছেন। যুক্তিও দিয়াছেন—নটে শমাভাববশতঃ ও অভিনয়ে বিষয়-বৈমুখ্য-স্বরূপ শান্ত-রসের বিরোধী গীতবাদ্যাদির অস্তিত্ববশতঃ নাট্যে শান্ত-রস সম্ভবই নহে (২৬)। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য এই যে, নৌকা-টীকাকার বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকারের মত সমর্থন করিবার পরও—জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের মত (নাট্যেও নব রস) পণ্ডিতরাজের পঙ্‌ক্তিগুলি হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য উহা যে পণ্ডিতরাজের মত, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কেবল 'পক্ষান্তরে নবীনগণ বলিয়া থাকেন'—এই কথা বলিয়াছেন (২৭)। আর এ নবীন-মত স্বীকার না করিলেও শ্রব্য-কাব্যে শান্ত-রস যে উভয় মতেই নির্ব্বিবাদ—ইহাও টীকায় পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন।

নৌকা-টীকাকার নির্ব্বেদের অর্থনির্ণয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—নিত্যানিত্য-বস্তুর বিচার হইতে উৎপন্ন বিষয়-বৈরাগ্য-রূপ চিত্তবৃত্তি-বিশেষই নির্ব্বেদ। উহারই অপর নাম 'অলংপ্রত্যয়' (২৮)। বিষয়-দোষ কি, তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—উহা বিষয়ের অনিত্যতা-জ্ঞান। বিষয়-দোষের বিচারই বিভাব (২৯)।

নৌকা-টীকা-কার পুনশ্চ প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যদি উক্তরূপ নির্ব্বেদকে স্থায়িভাব বলা হয়, তাহা হইলে আর শম বা শান্তকে ত স্থায়ী বলা চলে না।

(নিখিল-বিষয়-পরিহার-জনিত আত্ম-স্বরূপমাত্রে বিশ্রামের যে আনন্দানুভব, উহাই শান্তি বা শম। এই কারণেই ত শাস্ত্রে বলা হয়—ইহলোকের কামসুখ অথবা দিব্য মহৎসুখ—ইহাদিগের কোনটিই তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের এক কলারও অর্থাৎ ষোড়শভাগেরও তুল্য হয় না। এই তৃষ্ণাক্ষয়-সুখই আত্মবিশ্রামানন্দ, বা শম।) অথচ এই শম যখন আনন্দরূপ, তখন ইহাই ত শান্ত রসে পরিণত হইবার যোগ্য; কারণ, শান্ত-রসও ত পরমানন্দ-স্বরূপ। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সকল চিত্তবৃত্তির বিরামমাত্রকেই স্থায়ী বলা যায় না—যেহেতু, উহা ত অভাবমাত্র। আর কেবল অভাবই বা স্থায়ী হয় কিরূপে (৩০)? এই সকল যুক্তি-প্রয়োগ-পূর্ব্বক নৌকা-টীকাকার নিম্নোক্তরূপ সমাধান করিয়াছেন। গ্রন্থকার কেবল নির্ব্বেদের পরিপোষককেই শান্ত-রস বলেন নাই। এ বিষয়ে আর একটি বৈকল্পিক মতও দিয়াছেন—শান্ত দোষ-প্রশমন-রূপ। কাম-ক্রোধাদিরূপ দোষের অপগমাবস্থায় আত্মমাত্র-স্বরূপে বিশ্রামের যে আনন্দ, উহা সর্ব্বানুভব-সাক্ষিক—উহাই শম। উহাকেও স্থায়ী বলা চলে। অতএব, রসতরঙ্গিণী মতে নির্ব্বেদ বা শম—এই দুইটির যে কোন একটিকে শান্তের স্থায়ী বলা চলে। নির্ব্বেদ—বিষয়ে বৈরাগ্য। আর শম দোষ-প্রশমন-জনিত আত্ম-বিশ্রামানন্দ। এই কারণে দুইটি বৈকল্পিক মতের অনুসরণে শান্ত-রসের দুইটি দৃষ্টান্ত ভানুদত্ত দিয়াছেন (৩১)।

কাব্যপ্রকাশ-কার যে উপক্রমে নাট্যে অষ্ট রস বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন শান্তও নবম রস,—তাহার তাৎপর্য্য দুই শ্রেণীর আলঙ্কারিক দুইটি পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোবিন্দ বলিয়াছেন—কোন কোন আলঙ্কারিক বলেন যে, একমাত্র শৃঙ্গারই রস, আবার কেহ বা বলেন দ্বাদশটি রস,—এই সকল অবাস্তব মত নিরাস করিবার নিমিত্তই প্রকাশকার এস্থলে নাট্যরস আটটি বলিয়া উপক্রম করিয়াছেন। শান্তও রস বটে। তবে উহাতে রোমাঞ্চাদি না থাকায় উহা অভিনয়-যোগ্য-রূপে গণ্য হয় না। এ কারণে উহাকে কেবল শ্রব্যকাব্য-গোচর রস বলা চলে। নাট্যে

---

(২৫) "যদাহ ভরতঃ—"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চ নাট্যে চাষ্টৌ রসাঃ স্মৃতাঃ"।—রঃ তঃ, বেঃ সং পৃঃ ১২৪ ; কাশী লিথো, পৃঃ ৬৫ (পঞ্চমতরঙ্গ)।

(২৬) "আদিকাব্যেতিহাসাদৌ দ্বিতার্থঃ। নবম ইতি। নমু শান্তরসস্যাতিরেকে কিং মানমিতি চেৎ। মুনিবচনম তদ্ যথা—'শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরাদ্ভুতস্তথা। হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভৎসশ্চেতি তে নব॥ ইতি—নৌকা কাশী সং, পৃঃ ৮৪।" "নটে শমাভাবান্নাট্যে গীতবাদ্যাদীনাং বিষয়বৈমুখ্যাত্মকশান্তরসবিরোধিনাং সত্ত্বাচ্চ ন তত্র শান্তরসসম্ভব ইত্যাশয়েনোক্তং নাট্যভিন্নে ইতি। তদুক্তং—শান্তস্য···যুজ্যত ইতি"।—নৌকা, পৃঃ ৮৪

(২৭) "নব্যাস্তু—নটে শমাভাবাদিতি হেতুরসঙ্গতঃ, নটে রসাভিব্যক্তেরস্বীকারাৎ।—···যতঃ কশ্চিন্ন রসং স্বদতে নট ইত্যাদিনা নাট্যেঽপি শান্তরসোঽস্তীতি ব্যবস্থাপিতমিত্যাহুস্তত্র বিস্তর ইতি প্রাহুঃ। যৈরপি নাট্যে শান্তরসো নাস্তীত্যভ্যুপগমাতে তৈরপি বাধকাভাবান্মহাভারতাদিপ্রবন্ধানাং শান্তরসপ্রধানতয়া সকললোকানুভবসিদ্ধত্বাচ্চ কাব্যে সোঽবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যস্তৎ সিদ্ধং নঃ সমীহিতমিত্যেতদভিপ্রায়কমেব শান্তরসপ্রধানতয়া নাট্যভিন্নে পরমিত্যত্র কাব্যে শান্তরসস্য নির্ব্বিবাদতাসূচকং পরং পদমুপাত্তম্। অতএবাষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ইত্যুপক্রম্য শান্তোঽপি নবমো রস ইতি মম্মটভট্টা অপ্যাপসমহার্ষুঃ"।—নৌকা, পৃঃ ৮৪।

(২৮) "নির্ব্বেদস্য নিত্যানিত্যবস্তুবিচারজন্মনো বিষয়বিরাগাখ্যচিত্তবৃত্তিবিশেষস্যেত্যর্থঃ। অসাবেবালংপ্রত্যয় ইত্যুচ্যতে"। নৌকা পৃঃ ৮৫। এ মত গোবিন্দের কাব্যপ্রদীপোক্ত মতের অনেকটা অনুরূপ। তিনিও নির্ব্বেদকে বিষয়সমূহে অলংপ্রত্যয় বলিয়াছেন। 'অলংপ্রত্যয়' অর্থে হেয়ত্বপ্রত্যয়—নাগেশের কৃত অর্থ।

(২৯) অত্রৈব বিষয়ত্বে নিত্যত্বামতিরূপং বিষয়দোষবিচারং বিভাবং বক্ষ্যতি"—নৌকা, পৃঃ ৮৫

(৩০) "নমু নিরুক্তনির্ব্বেদস্য স্থায়িভাবত্বে শান্তেনিখিলবিষয়পরিহারজন্যাত্মমাত্রবিশ্রামানন্দপ্রাদুর্ভাবময়ত্বানুভববিরোধঃ। উক্তং চ। যচ্চ কামসুখং······ষোড়শীং কলামিতি। অতএব সর্ব্ববৃত্তিবিরামোঽস্য স্থায়িভাব ইত্যপি নিরস্তম্। অভাবস্য স্থায়িত্বাযোগাচ্চেত্যভিপ্রেত্যাহ।" (এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নৌকা-কার গোবিন্দের প্রদীপস্থ উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন।)

(৩১) "সর্ব্বানুভবসাক্ষিকঃ কামক্রোধাদিরূপদোষাপগমাবস্থায়ামাত্মমাত্রবিশ্রামসম্ভূতানন্দ ইত্যেতস্মান্নির্ব্বেদস্য নিরুক্তদোষপ্রশমস্য বা স্থায়িত্বমিত্যুক্তমতভেদেনৈবোদাহরণভেদোঽবসেয়ঃ"।—

উহার প্রবেশ নাই। অতএব, নাট্যে মাত্র আটটি রস—আর শ্রব্য-কাব্যে শান্তকে অতিরিক্ত ধরিয়া নয়টি রস পরিগণিত হইয়া থাকে (৩২)। ইহা এক জাতীয় মত। এ বিষয়ে মতান্তরের উল্লেখও গোবিন্দ করিয়াছেন। অথবা, এ কথাও বলা চলে—এ স্থলে আটটি রসের কথা বলা হইল। এই আটটি নাট্যে ও কাব্যে সমভাবে প্রযোজ্য। নবম রস যে শান্ত—তাহাও নাট্য-কাব্য-সাধারণ—তবে উহা এখানে বলা না হইলেও উহার কথা পরে বলা যাইবে। অতএব, এ মতে শান্তও নবম নাট্যরস (৩৩)। নবম কাব্যরস হিসাবে শান্তের স্থান উভয় মতেই নির্ব্বিবাদ (৩৪)।

এইবার দশম রস বৎসলের বিষয় আলোচ্য। সাহিত্যদর্পণ-কার বৎসলকে মুনীন্দ্রসম্মত দশম রসই বলিয়াছেন। মুনি স্বয়ং অবশ্য নব রসেরই (কোন কোন বিশিষ্ট পাঠানুসারিগণের মতে অষ্ট রসের) লক্ষণাদি ষষ্ঠাধ্যায়ে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ে দশম রস বাৎসল্যের কোন লক্ষণ দেন নাই—এমন কি নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। তবে কাব্যমালা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে সপ্তদশ অধ্যায়ের ১০৫ শ্লোকের পর 'বাৎসল্য' শব্দটি করুণ ও ভয়ানক এই দুইটি রসের বাচক শব্দের মধ্যে পঠিত হওয়ায় অনুমান হইতে পারে যে, করুণ ও ভয়ানকের ন্যায় বাৎসল্যও রস-বিশেষ (৩৫)। কিন্তু সে স্থলেও বাৎসল্য রস কি না—তাহা স্পষ্ট রস-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ স্থলে কেবল বিশ্বনাথের উক্তিই প্রমাণ। নিম্নে বিশ্বনাথ প্রদত্ত বাৎসল্য-রসের লক্ষণ প্রদত্ত হইল। চমৎকারিত্ব-নিবন্ধন পরিস্ফুট বৎসলকে (কেহ কেহ) রস বলিয়া থাকেন। উহাতে বৎসলতা-স্নেহ স্থায়ী। পুত্রাদি আলম্বন। ঐ আলম্বনের চেষ্টা, বীর্য্য, শৌর্য্য-দয়া প্রভৃতি উদ্দীপন। আলিঙ্গন-অঙ্গস্পর্শ-শিরশ্চুম্বন-সস্নেহনিরীক্ষণ-পুলক আনন্দাশ্রু—অনুভাব। অনিষ্টশঙ্কা-হর্ষ-গর্ব্ব প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব। বৎসলের বর্ণ পদ্মগর্ভতুল্য। লোক-মাতৃগণ ইহার দেবতা (৩৬)।

---

(৩২) "কেচিদাভরেক এব শৃঙ্গারো রস ইতি কেচিচ্চ দ্বাদশেত্যাদি (কি কি দ্বাদশ রস—পরে যথাস্থানে বিচারিত হইবে) তন্নিরাসায় ভেদানাহ—'শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ'। শান্তস্য রোমাঞ্চাদিবিরহেণানভিনেয়ত্বাৎ কাব্যমাত্রগোচরত্বমিত্যভিধানান্নাট্যে ইত্যুক্তম্"।—প্রদীপ। বৈদ্যনাথ প্রভায় বলিয়াছেন—এস্থলে 'কাব্য' বলিতে শ্রব্যকাব্য বুঝিতে হইবে। কারণ, নাট্যও কাব্য-বিশেষ—তবে উহা দৃশ্যকাব্য। নাগোজি উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—শান্ত সর্ব্ববিষয়োপরতি-স্বরূপ—অতএব অভিনয়ের অযোগ্য। বিশেষতঃ অভিনয়ের অঙ্গ গীত-বাদ্যাদি শান্তের বিরোধী—"অনভিনেয়ত্বাদিতি। সর্ব্ববিষয়োপরম-স্বরূপত্বাত্তস্যেতি ভাবঃ। গীতবাদ্যাদেস্তদ্বিরোধিত্বাচ্চেত্যপি বোধ্যম্।" বৈদ্যনাথ বলিয়াছেন—এ মত তাঁহাদের যাঁহারা বলিয়া থাকেন—'শান্তস্য শমসাধ্যত্বান্নটে চ তদসম্ভবাৎ' ইত্যাদি। ইহাই রসগঙ্গাধরে পূর্ব্বপক্ষ মত।

(৩৩) "বস্তুতো নাট্যে তাবদষ্টৌ রসাঃ প্রতিপাদিতাঃ। অতঃ কাব্যেঽপি তাবন্ত এব"।—প্রদীপ। "অত্র পক্ষে 'শান্তোঽপি নবমো রস' ইত্যেবক্ষ্যমাণং নাট্যকাব্যসাধারণম্। তস্যাপ্যভিনেয়ত্বস্য বহুভিরঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ। গীতাদিকমপি তদ্বিষয়ং ন তদ্বিরোধী-ত্যাহুঃ"।—নাগেশ। অর্থাৎ—শান্তরসেরও অভিনয়-যোগ্যতা বহু আলঙ্কারিক স্বীকার করেন। শান্তরস-বিষয়ক গীত-বাদ্যাদি তাহার বিরোধী হয় না। বৈদ্যনাথ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বস্তুতঃ নটের শম না থাকিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, নটে রসাভিব্যক্তি কেহ কেহ স্বীকার করেন না। সামাজিক (দর্শক)গণের মধ্যে শম থাকে—উহাতেই শান্ত রস জন্মিতে পারে; শূন্যদৃষ্টি-প্রদর্শনাদি দ্বারা শান্তের অভিনয়ও সম্ভব হয়। সংসারের অনিত্যতা-প্রতিপাদক গীতাদি ও তদঙ্গ বাদ্যাদিও উহাতে সম্ভব। আর এ স্থলে 'নাট্যে অষ্ট রস'—এই বাক্যের এরূপ অর্থ নহে যে, নাট্যে আটটিই মাত্র রস। উহার অর্থ নাট্যে যেগুলি দেখান হইল সেগুলি কাব্যেও বর্ত্তমান। গোবিন্দ যে বলিয়াছেন—নাট্যে অষ্ট রস প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাব্যেও ততগুলিও রস (তাবন্ত এব) তাহার অর্থ ইহা নহে যে—শান্তরস রস-শ্রেণী হইতে বাদ পড়িল। শান্ত বাদ পড়ে নাই—উহা পরে পৃথক্ বলা হইবে—এ কারণে এ ক্ষেত্রে আপাততঃ আটটি রস বলা হইল—ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে কেবল বাৎসল্য প্রকৃতিকে—যেগুলি আসলে রসই নহে। "বস্তুতো নটে শমাভাবেঽপি ন ক্ষতিঃ। তত্র রসাভিব্যক্তেরনঙ্গীকারাৎ। সামাজিকেষু শমবত্ত্বেনৈব শান্তরসসম্ভবাৎ। অভিনয়স্যাপি শূন্যদৃষ্টি-ত্বাদিনা সম্ভবাৎ। সংসারানিত্যতাপ্রতিপাদকগীতাদ্যঙ্গতয়া বাদ্যাদেঃ সম্ভবাচ্চ নাট্যেঽপি শান্তসম্ভব ইত্যাশয়েনাহ—যদ্বেতি। নাট্যেঽষ্টাবে-বেতি নার্থঃ। কিন্তু যে নাট্যে দর্শিতাস্ত এব কাব্যেঽপীত্যর্থঃ। তাবন্ত এবেতি। ন শান্তব্যবচ্ছেদঃ। তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। কিন্তু বাৎসল্যাদীনামিতি জ্ঞেয়ম্"।—প্রভা। জগন্নাথেরও ইহাই সিদ্ধান্ত।

(৩৪) এ মতটিরও উল্লেখ জগন্নাথ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে বোধ হয় তিনি বিশ্বাস করেন—মম্মট-মতে নবম রস শান্ত কাব্যরস মাত্র।

(৩৫) "করুণবাৎসল্যভয়ানকেষ্বদ্ভুতস্বরিতকম্পিতৈর্বর্ণৈঃ পাঠ্য-মুপপাদয়েতি"—নাঃ শাঃ (কাব্যমালা), ১৭।১০৫এর পরবর্ত্তী গদ্যাংশ, পৃঃ ১৮৭। কাশী-সংস্করণে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—"করুণবাৎসল্য-ভয়ানকেষ্বদাত্তস্বরিতকম্পিতৈঃ বর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়েদিতি"—নাঃ শাঃ (কাশী সং), ১৯।৪৩এর পরবর্ত্তী গদ্যাংশ, পৃঃ ২২২।

(৩৬) "স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ। স্থায়ী বৎস-লতাস্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্। উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টাবিদ্যাশৌর্য্যদয়া-দয়ঃ। আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্। পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ সঞ্চারিণোঽনিষ্টশঙ্কাহর্ষগর্ব্বাদয়ো মতাঃ। পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ"।—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ। "স্ফুটম্ উৎকটম্। বিস্তরিতি কেচিদিতি শেষঃ। অন্যে পুনরস্য ভাব-কাব্যত্বমিচ্ছন্তি; তন্ন; চমৎকারাতিশয়যোগেন রসত্বস্যৈব যুক্তত্বাৎ"। রামতর্কবাগীশ-টীকা। তর্কবাগীশ বলেন—চমৎকারিতা-নিবন্ধন ইহাকে ভাব বলা চলে না—রসই বলা উচিত। বৎসলতা অর্থে প্রেম। "তৎসহিতস্নেহো রতিঃ সা চ লালনপালনাদীচ্ছা। পুত্রাদীত্যাদিনা ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্"।—রাঃ তঃ টীকা।

মহর্ষি ভরত প্রথমে আটটি ও পরে অতিরিক্ত একটি (শান্ত)—এই নয়টি রসেরই মাত্র লক্ষণ দিয়াছেন (৩৭)। এ কারণে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন যে, এই নয়টির অধিক রস সম্ভব নহে। কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন—এ স্থলে নব-সংখ্যাটির বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, তাহা ঠিক নহে—ইহাই অভিনবের অভিপ্রায়।

কেহ কেহ বলেন, আর্দ্রতা-স্থায়িক স্নেহ রস। উহা ঠিক নহে। কারণ স্নেহ হইতেছে আসক্তি—উহা রতি-উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইরূপে গর্ব্ব-স্থায়িক লৌল্য-রসেরও প্রত্যাখ্যান করা হইয়া থাকে। হাস-রতি বা অন্য কোন ভাবান্তরে তাহার পর্য্যবসান সম্ভব। ভক্তিও রস নহে—ইহা অভিনবের মত (৩৮)। পরন্তু দেবাদিবিষয়ে রতি-ভাব মাত্র—ইহা অন্য আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন।

কাব্যপ্রকাশেও যে অষ্ট নাট্য-রস প্রথমে বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন-প্রসঙ্গে গোবিন্দ বলিয়াছেন—রস একটি মাত্র বা দ্বাদশ প্রকার ইত্যাদি বিভিন্ন মত—এই উক্তি-দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। রস একটি মাত্র—এমতে—সে রসটি কি? উত্তর গোবিন্দই দিয়াছেন—শৃঙ্গারই একমাত্র রস—কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন—যথা, ভোজরাজ। বৈদ্যনাথ টীকায় বলিয়াছেন—লোকে শৃঙ্গারের আস্বাদ্যতা সর্ব্বানুভব-সিদ্ধ। কাব্যে গুণ অলঙ্কার প্রভৃতির যোগে উহারই অধিক আস্বাদ্যতা সম্ভব—এ কারণে শৃঙ্গারই একমাত্র রস, অন্যগুলি নহে—ইহাই শৃঙ্গারৈক-রসবাদিগণের যুক্তি। অবশ্য এ যুক্তি অপ্রমাণ। কারণ, অন্যান্য রসও লোকে সুখরূপে আস্বাদ্য না হইতে পারিলেও কাব্যে পর্য্যাপ্তরূপেই আস্বাদ্য হইতে পারে (৩৯)। কোন কোন আলঙ্কারিক অদ্ভুতকেই একমাত্র রস বলিয়াছেন—ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (৪০)। ইহার খণ্ডনার্থ বৈদ্যনাথ বলিয়াছেন—নীরস উদ্ভটালঙ্কার বর্ণনাতেও বিস্ময়-প্রকৃতিক অদ্ভুত থাকে—তবে নীরস বিষয়ে বর্ত্তমান থাকায় উহাকে রস-মধ্যে সর্ব্বদা গণনাই করা যায় না (৪১)। আবার ভবভূতি উত্তররামচরিতে বলিয়াছেন—একই মাত্র রস—উহা করুণ—অন্য রসগুলি তাহার রূপভেদ (বিবর্ত্ত) মাত্র। ইহাও অতিশয়োক্তি মাত্র (৪২)। অবশ্য অভিনব যাহা বলিয়াছেন—পারমার্থিক দৃষ্টিতে রস এক ও অখণ্ড, তবে ব্যাবহারিক বিভাগদর্শীর দৃষ্টিতে উহার শৃঙ্গারাদি ভেদ—তাহা অতি খাঁটি কথা। কিন্তু এই পারমার্থিক অখণ্ড রসের ‘শৃঙ্গার’ বা ‘অদ্ভুত’ বা ‘করুণ’ এরূপ নামকরণ করা চলে না। উহা কেবল অখণ্ড রস-স্বরূপ মাত্র। নামকরণ করিলেই উহা বিশিষ্ট খণ্ড রস হইয়া পড়ে—তখন উহাকে আর এক অদ্বিতীয় বলা চলে না (৪৩)।

দ্বাদশ রস কি কি? নাগেশ বলিয়াছেন—প্রেয়াংস, দান্ত, উদ্ধত সহ নব রস—মোট দ্বাদশ। স্নেহ-স্থায়িক প্রেয়াংস। ইহাই বাৎসল্য নামে খ্যাত। ধৈর্য্য-স্থায়িক দান্ত। গর্ব্ব-স্থায়িক উদ্ধত। নিন্দাদি-দ্বারা পরকে অবজ্ঞা করার নাম গর্ব্ব। নাগেশ বলেন—এগুলি রস নহে—ভাবের অন্তর্গত। এইরূপে অভিলাষ-স্থায়িক লৌল্য-রস, শ্রদ্ধা-স্থায়িক ভক্তিরস, স্পৃহা-স্থায়িক কার্পণ্য-রস প্রভৃতি মতও খণ্ডিত হইয়াছে। এগুলি সবই ভাব-বিশেষ মাত্র (৪৪)।

বৈদ্যনাথ বলিয়াছেন—ভক্তি, বাৎসল্য ও শ্রদ্ধা এই তিনটির সহিত পূর্ব্বোক্ত নয়টি যোগ দিলে দ্বাদশ রস হয়—ইহা এক মত। ভক্তি—ভগবানে মতি, উহা অতি প্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধা—দৃঢ় আস্তিক্য-নিশ্চয়—বেদাদি-শাস্ত্র-বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে—শিষ্টগণের নিকট ইহা অতি প্রসিদ্ধ। বাৎসল্য—পুত্র-মিত্রাদিতে স্নেহ। ইহার খণ্ডন-প্রসঙ্গে বৈদ্যনাথ বলিয়াছেন—বাৎসল্য ও ভক্তি ভাবের অন্তর্গত। দেবাদি বিষয়া রতি-ভাবই ভক্তি। পুত্রাদি-বিষয়া রতি বাৎসল্য।

---

(৩৭) “এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নবলক্ষণলক্ষিতাঃ”।—নাঃ শাঃ, প্রথম ভাগ, বরোদা সং ৬।১০৮

(৩৮) “তেন রসান্তরসম্ভবেঽপি···সঙ্খ্যানিয়ম ইতি যদন্যৈরুক্তং তৎ প্রত্যুক্তম্।···আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিসঙ্গঃ। স চ সর্ব্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্য্যবস্যতি।···এবৈব গর্ব্বস্থায়িকস্য লৌল্যরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণির্মন্তব্যা হাসে বা রতৌ বান্যত্র পর্য্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি”—অভিনবভারতী নাঃ শাঃ, প্রথম ভাগ, পৃ পৃঃ ৩৪১-৪২।

(৩৯) “শৃঙ্গারস্য লোকে আস্বাদ্যতায়াঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ কাব্যে গুণালঙ্কারযোগেনাধিকাস্বাদগোচরতয়া রসত্বং যুক্তম্, ন ত্বিতরেষাম্। লোকে সুখাত্মত্বাননুভবাৎ কাব্য এব তথাত্বকল্পনায়া অপ্রামাণিকত্বাৎ”। (প্রভা, পৃঃ ৭৪)

“তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্”—এ মত বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৪৮ দ্রষ্টব্য।) অবশ্য নারায়ণ-মতে এ অদ্ভুত পারিভাষিক বিস্ময়-প্রকৃতিক অদ্ভুত-রস নহে। নারায়ণ-সম্মত অদ্ভুত সর্ব্ব-রসের সারভূত চমৎকার-স্বরূপ—উহাই aesthetic thrillএর পরম পরিপোষাবস্থা—উহাই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পারমার্থিক রস। যাঁহারা বিস্ময়-স্থায়িক পারিভাষিক অদ্ভুতকেই একমাত্র রস বলেন, বৈদ্যনাথ তাঁহাদিগেরই মত খণ্ডন করিয়াছেন। অভিনব বা নারায়ণের ন্যায় পরমার্থ-রস-বাদীর মত খণ্ডন করেন নাই। কারণ, এ পরমার্থ-রস-সিদ্ধান্ত সাক্ষাৎ শ্রুতি-সম্মত (“রসো বৈ সঃ”)।

(৪১) “অদ্ভুতস্য চ বিস্ময়প্রকৃতিকত্বাৎ তস্য চোদ্ভটালঙ্কার-বর্ণনাদাবপি নীরসেঽভ্যুপগমান্ন রসত্বম্”—প্রভা, (পৃঃ ৭৪)।

(৪২) “একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবা-শ্রয়তে বিবর্ত্তান্” ইত্যাদি—(উঃ চঃ ৩।)

(৪৩) “এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ। সোঽপি চ ন তদেকমুখপ্রেক্ষিতামতিবর্ত্ততে”—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৭৩। (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৪৮, পৃঃ ৪৪৭ দ্রষ্টব্য।)

(৪৪) “প্রেয়াংসদান্তোদ্ধতৈঃ সহ বক্ষ্যমাণা নবেত্যর্থঃ। তত্র স্নেহপ্রকৃতিঃ প্রেয়াংসঃ। অয়মেব বাৎসল্য ইতি বোধ্যম্। ধৈর্য্য-স্থায়িভাবকো দান্তঃ। গর্ব্বস্থায়িভাবক উদ্ধতঃ। নিন্দাদিতঃ পরাবজ্ঞা গর্ব্বঃ···এতে ত্রয়স্তু ভাবান্তর্গতা ইতি ভাবঃ। এতেনাভিলাষস্থায়িকো লৌল্যরসঃ শ্রদ্ধাস্থায়িকো ভক্তিরসঃ স্পৃহাস্থায়িবঃ কার্পণ্যাখ্যো রসোঽতিরিক্ত ইত্যপাস্তম্”।—নাগেশ, উদ্দ্যোত (আনন্দাশ্রম সং), পৃঃ ১০৬। কেহ কেহ বলেন এগুলি শৃঙ্গার-শান্ত-হাস্যের ব্যভিচারী। “তে শৃঙ্গারশান্তিহাস্যানাং ব্যভিচারিরূপা ইতি কেচিৎ”—উদ্দ্যোত।

আর শ্রদ্ধা ত সুখাত্মকই নহে ; চমৎকারের অনুৎপাদক বলিয়া উহার রসত্ব-সম্ভাবনাই নাই (৪৫)।

বিশ্বনাথ দেবাদিবিষয়া রতি (ভক্তি) প্রভৃতিকে ভাবান্তর্গত বলিলেও পুত্রাদিবিষয়িণী রতিকে বাৎসল্য-রস-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ইহাই বৈশিষ্ট্য। কেবল তাহাই নহে। নাট্যশাস্ত্রের একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্যাংশমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বৎসলকে মুনীন্দ্র-সম্মত রস বলিয়াছেন। ইহা কত দূর যুক্তিসহ তাহার বিচার অপক্ষপাত সুধীগণই করিবেন।

এই প্রসঙ্গে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, এই নয়টিকেই মাত্র রস বলা হইবে কেন ? যে ভক্তিরসে স্বয়ং ভগবান্ আলম্বন-বিভাব, রোমাঞ্চ-অশ্রুপাত প্রভৃতি অনুভাব, হর্ষাদি ব্যভিচারিভাব, ভাগবত-পুরাণাদি শ্রবণকালে ভক্তগণ যাহার অনুভব করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি-রসকে অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? শ্রীভগবানে অনুরাগ-রূপা ভক্তি এ ক্ষেত্রে স্থায়িভাব। উহা শান্ত-রসেরও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না—কারণ, অনুরাগ (ভক্তি) ও বৈরাগ্য (শান্তি) পরস্পর-বিরোধী। অতএব, এ ভগবদনুরাগ ভক্তিরসের জনক হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে পণ্ডিতরাজ বলিয়াছেন—ভক্তি দেবাদিবিষয়া রতিরূপা মাত্র—উহা ভাবান্তর্গত—রস নহে। পুনরায় এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে—তাহা হইলে কামিনী-বিষয়া রতিকেও রসপোষক স্থায়িভাব না বলিয়া সাধারণ ভাবমাত্র বলিতে বাধা কি ? কারণ, দেবাদি-বিষয়া রতিই হউক, আর কামিনী-বিষয়াই হউক—উভয়ের মধ্যে রতিই সাধারণ ভাব। অথবা, দেবাদিবিষয়া রতিকেই স্থায়িভাব বল—উহা হইতেই ভক্তিরসের উৎপত্তি স্বীকার কর ; আর কামিনী-বিষয়া রতিকে স্থায়িভাব না বলিয়া সাধারণ ভাবমাত্র বলিতে কি প্রতিবন্ধক ? এ বিষয়ে এমন কি যুক্তি আছে যে—দেবাদিবিষয়া রতি কেবল সাধারণ ভাবরূপে গণ্য হইবে ; পক্ষান্তরে, কামিনীবিষয়া রতিকে স্থায়িভাব বলা হইবে, আর উহা হইতে শৃঙ্গার-রস জন্মিবে ? উত্তরে জগন্নাথ বলিয়াছেন—এ বিষয়ে ভরতাদি মুনিগণের বচনই একমাত্র প্রমাণ। তাঁহাদিগের বচন-বলেই প্রথম প্রকারটিকে কেবল ভাব ও দ্বিতীয়টিকে রস-পোষক স্থায়িভাব বলা হইয়া থাকে। অন্যথায়, পুত্রাদিবিষয়িণী রতিকে রস না বলিবার অন্য কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ! আর জুগুপ্সা-শোক প্রভৃতিকে শুদ্ধভাব না বলিয়া রসপোষক স্থায়িভাব কেন বলা হইয়া থাকে—তাহার পক্ষেও কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল মুনির বচন-বলেই ইহাদিগের মধ্যে কোন কোনটিকে রসপোষক স্থায়িভাব, অপর কোন কোনটিকে বা শুদ্ধভাব বলিয়া বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে (৪৬)। এ বিষয়ে অন্য কোন বিভাগ-কারণ নাই।

কেবল ভরতের বচনই কোনটিকে রস, কোনটিকে স্থায়িভাব, কোনটি বা শুদ্ধভাব (ব্যভিচারী)—এইরূপে চিরদিনের নিমিত্ত একটি বিভাগ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—উহার মূলে কোন যুক্তি নাই—জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের এই উক্তি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না। ভরতের বিভাগ-ব্যবস্থা যে কতদূর যুক্তিসহ ও নির্দোষ—তাহা অন্য প্রবন্ধের আলোচ্য হইবে—এ প্রবন্ধে উহার বিচার অবান্তর।

রসতরঙ্গিণী-কার ভানুদত্তও ভরত-বচন উদ্ধৃত করিয়া এক-রস-বাদী ও দ্বাদশ-রস-বাদীর মত নিরাস করিয়াছেন। নৌকা-টীকায় বলা হইয়াছে—নারায়ণের মতে অদ্ভুতই একমাত্র রস—অপর কোন কোন আলঙ্কারিকের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র রস—আর আধুনিক কবিগণের মতে—দ্বাদশ রস—এ সকলই অসঙ্গত (৪৭)।

দ্বাদশ রস কি কি ?—ভানুদত্ত স্বয়ংই পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছেন—বাৎসল্য-লৌল্য-ভক্তি-কার্পণ্য এই চারিটি অতিরিক্ত রস। ইহাদিগের স্থায়িভাব যথাক্রমে—আর্দ্রতা-অভিলাষ-শ্রদ্ধা-স্পৃহা। ভানুদত্ত খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—ইহারা সকলেই ব্যভিচারি-ভাব-মধ্যে গণনীয়। বাৎসল্য করুণের ব্যভিচারি-ভাব, লৌল্য হাস্যের, ভক্তি শান্তের ও কার্পণ্য হাস্যরসের ব্যভিচারী (৪৮)। অতএব ভানুদত্ত-মতে নাট্যে অষ্ট রস—কাব্যে নব রস—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে ভানুদত্তের রসতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত দুইটি অভিনব মতবাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন।

---

(৪৫) "ভক্তিবাৎসল্যশ্রদ্ধাখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহিতাঃ শৃঙ্গারাদয়ো নব··· তত্র ভক্তির্ভগবতি প্রসিদ্ধা। শ্রদ্ধাপ্যাস্তিক্যনিশ্চয়াত্মিকা বেদশাস্ত্র-বিষয়া শিষ্টানাং প্রসিদ্ধৈব। বাৎসল্যমপি পুত্রমিত্রাদৌ স্নেহাভিধানম্। ···তত্র ভক্তিবাৎল্যয়োর্ভাবান্তর্গতিঃ। 'রতির্দেবাদিবিষয়া' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। শ্রদ্ধায়াশ্চাসুখাত্মকত্বাচ্চমৎকারানুৎপাদকত্বাচ্চ ন রসত্বম্"—(প্রভা, পৃঃ ৭৪)

(৪৬) "অথ কতমেত এব রসাঃ ? ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রু-পাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদ-নুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ, ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে। ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ। "রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তস্তদাভাসা হ্যনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিতাঃ"।—ইতি হি প্রাচাং সিদ্ধান্তাৎ। ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবত্বমস্তু রতিত্বাবিশেষাৎ, অস্তু বা ভগবদ্ভক্তেরেব স্থায়িত্বং কামিন্যাদিরতীনাঞ্চ ভাবত্বং বিনিগমকাভাবাদিতি বাচ্যম্। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবত্বাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অন্যথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যান্ন স্যাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সাশোকাদীনামিত্যখিলদর্শনমাকুলী স্যাৎ"—রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন। জগন্নাথের এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে, তিনি ভক্তি ও বাৎসল্যকে রস বলিবার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী। কেবল মুনির সমর্থন না পাওয়ায় উহাদিগকে রস বলিতে সাহসী হন নাই। অতএব, বৎসল তাঁহার মতে মুনি-সম্মত নহে।

(৪৭) "অদ্ভুত এবৈকো রস ইতি নারায়ণপ্রভৃতয়ঃ। শৃঙ্গার এব রস ইত্যপি কেচিদালঙ্কারিকাঃ। তে দ্বাদশেতি চাপ্যাধুনিককবয়ঃ। তৎসর্ব্বমযুক্তম্···"নৌকা, পৃঃ ৬৫।

(৪৮) "নন্ন বাৎসল্যং লৌল্যং ভক্তিঃ কার্পণ্যং বা কথং ন রসঃ ? আর্দ্রতাভিলাষশ্রদ্ধাস্পৃহাণাং স্থায়িভাবানাং সত্ত্বাদিতি চেন্ন। তেষাং ব্যভিচারিরত্যাত্মকত্বাৎ। নন্ন কস্য রসস্য তে ব্যভিচারিভাবা ভবেয়ুরিতি চেৎ ? সত্যম্। বাৎসল্যে করুণো রসঃ। লৌল্যে হাস্যঃ। ভক্তৌ শান্তঃ। কার্পণ্যে হাস্য এব"। রঃ তঃ, বেঙ্কটেশ্বর সং, পৃঃ ১২৫ (৫ম তরঙ্গ) ; কাশী লিথো সং, পৃঃ ৬৬।

প্রথমতঃ, ভানুদত্তের মতে রস দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক-সন্নিকর্ষ-জনিত রস অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার—সংযোগ, সমবায়, সংযুক্ত-সমবায়, সমবেত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ও বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব—এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ নৈয়ায়িকগণের সুপরিচিত। পক্ষান্তরে, অলৌকিক সন্নিকর্ষ জ্ঞান-মাত্র। ইহ জন্মে সাক্ষাৎ কোন বস্তুর অনুভূতি না হইলেও প্রাক্তন সংস্কার-দ্বারা উহার জ্ঞান (অথবা স্বাপ্নিক পদার্থের যে জ্ঞান) তাহাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। এই অলৌকিক-সন্নিকর্ষ-জনিত রস অলৌকিক। অলৌকিক রস ত্রিবিধ—(১) স্বাপ্নিক, (২) মানোরথিক ও (৩) ঔপনায়িক (ঔপনায়ক) (৪৯)।

কাব্যের পদ-পদার্থ হইতে যে চমৎকার অনুভূত হয়, তাহাতে ঔপনায়িক রস বর্ত্তমান। নাট্যেও উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বাপ্নিক ও মানোরথিক রস কখন কখন দুঃখ-মিশ্রিত হইলেও কাব্যে ও নাট্যে উহা একরূপ—সুখাত্মক মাত্র।

মানোরথিক রস সাধারণের নিকট পরিচিত না হইলেও ভানুদত্ত মানোরথিক শৃঙ্গারের দৃষ্টান্ত দিয়া উহার সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন (৫০)।

ভানুদত্তের দ্বিতীয় মতের আভাস পাওয়া যায়—তাঁহার মায়া-রসের বিবরণে। এই মতটি তাঁহার পূর্ব্বমত অপেক্ষাও অধিকতর কৌতূহল-জনক।

তিনি বলিয়াছেন—চিত্ত-বৃত্তি দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিবৃত্তিতে যেমন শান্ত-রস, প্রবৃত্তিতেও সেইরূপ মায়া-রস। যদি নিবৃত্তিতে রসোৎপত্তি (শান্ত-রসোৎপত্তি) সম্ভব বলা চলে, তবে প্রবৃত্তিতে রসোৎপত্তি হয় না—ইহা বলা যায় না। ইহাকে সাধারণ ব্যভিচারি-ভাব মাত্র (ভক্তি প্রভৃতির মত) বলা যায় না। ইহা কাহার ব্যভিচারী ? শৃঙ্গারের নহে—কারণ, শৃঙ্গার-বিরোধী বীভৎসও ইহাতে বিদ্যমান। এইরূপে ভানুদত্ত একে একে দেখাইয়াছেন যে, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি কোন রসেরই ইহা ব্যভিচার-ভাব মাত্র হইতে পারে না ; যেহেতু যে রসেরই ব্যভিচারি-ভাব বলিতে যাওয়া হইবে, সেই রসেরই বিরোধি-ভাবের তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিতি দৃষ্ট হইবে। ইহা শান্তেরও ব্যভিচারী নহে—যেহেতু ইহা শান্ত-বিরোধী। শান্ত নিবৃত্তি-মূলক। ইহা প্রবৃত্তি-মূলক। ইহাই মূল সাধারণ (common) রস—অপর রস-গুলি ইহার অবান্তর ভেদ-বিশেষ মাত্র—ইহাও বলা চলে না। কারণ, তাহা হইলে ইহার অত্যন্ত বিরোধী শান্ত-রস আর রস-রূপে গণ্য হইতে পারে না—রসাভাসে পরিণত হইয়া যায়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, মায়া-রস বলিয়া এক প্রকার রস বর্ত্তমান। রতি-হাস-শোক, ক্রোধ-উৎসাহ-ভয়-জুগুপ্সা-বিস্ময় প্রভৃতি অষ্ট রসের অষ্ট স্থায়িভাব বিদ্যুদ্বিলাসের মত উহার উপর একবার আবির্ভূত ও একবার তিরোভূত হয়। অতএব, ঐ অষ্ট স্থায়িভাবই—মায়ারসের ব্যভিচারি-ভাব। ইহার লক্ষণ—মিথ্যাজ্ঞান (অবিদ্যা)-বাসনা প্রবুদ্ধ অর্থাৎ (উদ্‌বুদ্ধ) হইয়া মায়া-রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অতএব, মিথ্যা-জ্ঞান (অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান-বাসনা) ইহার স্থায়িভাব। সাংসারিক ভোগের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম (পুণ্য-পাপ-কর্ম্ম). ইহার বিভাব। পুত্র-কলত্র-বিজয়-সাম্রাজ্যাদি অনুভাব (৫১)। এই মায়া-রস সৃষ্টি-ভোগাদির মূল। ইহার বিরোধী শান্ত-রস মোক্ষ-হেতু।

সুদীর্ঘ 'রস'-প্রবন্ধ আপাততঃ এই মায়া-রসের বর্ণনান্তেই সমাপ্ত করা হইল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

---

(৪৯) "স চ রসো দ্বিবিধঃ লৌকিকোঽলৌকিকশ্চেতি। লৌকিকসন্নিকর্ষজন্মা রসো লৌকিকঃ। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্মা রসোঽলৌকিকঃ। লৌকিকসন্নিকর্ষঃ ষোঢ়া বিষয়গতঃ। অলৌকিক-সন্নিকর্ষো জ্ঞানম্। তেষু চাননুভূতেষু সাক্ষাদেতজ্জন্মানভূতেষ্বপি (তেষু) প্রাক্তনসংস্কারদ্বারা জ্ঞানমেব প্রত্যাসত্তিঃ। অলৌকিকো রসস্ত্রিধা—স্বাপ্নিকো মানোরথিক ঔপনায়িকশ্চেতি (ঔপনায়কশ্চেতি)।"

(৫০) "ঔপনায়িকশ্চ কাব্যপদপদার্থচমৎকারে নাট্যে চ। পরন্ত দ্বয়োরপ্যানন্দরূপতা। ননু মানোরথিকো রসো ন প্রসিদ্ধ ইতি চেৎ ? সত্যম্—·········অস্মাকন্ত মনোরথোপরচিতপ্রাসাদ······কেলি-কৌতুকজুষামায়ুঃ পরিক্ষীয়তে ইত্যাদৌ মানোরথিকশৃঙ্গারশ্রবণাৎ"। রঃ তঃ, বেঃসং, পৃঃ ১২৩—২৪ ; কাশী লিথোঃ পৃঃ ৬২—৬৪।

(৫১) "চিত্তবৃত্তির্দ্বিধা—প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চেতি। নিবৃত্তৌ যথা শান্ত-রসস্তথা প্রবৃত্তৌ মায়ারস ইতি প্রতিভাতি। একত্র রসোৎপত্তিরপরত্র নেতি বক্তুমশক্যত্বাৎ।······তর্হি স কস্যাস্তু ব্যভিচারী ? ন শৃঙ্গারস্য, তদ্বৈরিণো বীভৎস্যাপি তত্র সত্ত্বাৎ। অতএব ন বীভৎস্যাপি। ন হাস্যস্য ······। নাপি শান্তস্য তদ্বিরোধিত্বাৎ। ন চ সামান্য এব রসস্ত-দ্বিশেষা ইতরে ভবন্তি, শান্তরসস্য তর্হি রসাভাসত্বাপত্তেঃ। কিন্তু বিদ্যুত ইব রতিহাসশোকক্রোধোৎসাহভয়জুগুপ্সাবিস্ময়াস্তত্রোৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে চ। তেন তত্র তে ব্যভিচারিভাবা ইতি। লক্ষণং চ প্রবুদ্ধমিথ্যাজ্ঞানবাসনা মায়ারসঃ। মিথ্যাজ্ঞানমস্য স্থায়িভাবঃ। বিভাবা সাংসারিকভোগার্জ্জকধর্ম্মাধর্ম্মাঃ। অনুভাবাঃ পুত্রকলত্র-বিজয়সাম্রাজ্যাদয়ঃ···" ইত্যাদি।—রঃ তঃ বেঃ সং, পৃঃ ১৬১-১৬২ (৭ম তরঙ্গ) ; কাশী লিথো সং, পৃঃ ৮২-৮৪।

আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও পরম স্নেহভাজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, এম্-এ, মহাশয়, মায়া-রস-সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে-ছেন। আশা করা যায়, তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোক পাওয়া যাইবে। এ কারণে এ বিষয়ে অধিক কিছু আর বলা চলে না।

। শুভমস্তু ।

[উপন্যাস]

পঞ্চদশ পল্লব

রহস্য ভেদ

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টনের হত্যার অভিযোগে বিচারালয়ে নীতা ওলিভিয়া ডেন মুক্তিলাভ করিবার পরের দিন ডেভিড গারসাইডের নিকট সকল ঘটনার বিবরণ শুনিবার জন্য চারি জন ভদ্রলোক আগ্রহ-ভরে তাহার সম্মুখে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাদের এক জন ডিটেক্টিভ-ইন্‌স্পেক্টর উইলিয়ম মরিসন—যিনি ট্রেন্টন-হত্যার মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে পুলিশের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'অয়ারের' প্রধান সম্পাদক এফ, ই, আর্ডলে; তৃতীয় ব্যক্তি 'অয়ারের' সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক মেডলি এবং চতুর্থ ব্যক্তি আসামীর কৌঁসুলী জন গারসাইড—ডেভিডেরই তিনি সহোদর ভ্রাতা।

ট্রেন্টনের হত্যা-সংক্রান্ত সকল বিবরণ ডেভিড বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল, "হোরেসিও স্বার্থডেলই কথাশিল্পী পিটার ট্রেন্টনকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল, এই সংবাদ বিশ্বাস করিতে আপনাদের হয়ত প্রবৃত্তি হইবে না; কিন্তু ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। স্বার্থডেল যে সময় এই দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সময় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। সে যখন বিচারাসনে বসিয়া 'সায়ানাইড অফ পটাসিয়ামের' বটিকা সেবন করিয়াছিল, সেই সময় সে প্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে সেই বটিকা মুখবিবরে নিক্ষেপ করিবার সময় কি ভাবে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কি তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে জন? সে সময় তাহার মুখে শয়তানের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, তাহার কুকর্ম ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া সে জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুবিচারের অভিনয়ে মিস্ ওলিভিয়া ডেনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা অসাধ্য হইবে—এইরূপই তাহার ধারণা হইয়াছিল—সন্দেহ নাই।

"কিন্তু মিস্ ওলিভিয়া ডেন কি হোরেসিও স্বার্থডেলের অপরিচিতা বা নিঃসম্পর্কীয়া সাধারণ আসামী? তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারে কি স্বার্থডেলের কোন স্বার্থ ছিল না? সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে।

"আমি যে সময় লণ্ডনে নানা শ্রেণীর অপরাধিগণের অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রকার দুষ্কর্মের বিবরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুণ্ডাদলের বাস-পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই সময় আমি গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি—হোরেসিও স্বার্থডেল কেবল খ্যাতনামা বিচারক নহে, সে আরও অনেক গুণের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আমি তাহার অনেক লজ্জাজনক গুপ্ত কথা জানিতে পারিলেও 'সন্' পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় নাই। বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারি—অনেকগুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সচ্চরিত্রা রূপবতী মহিলাগণকে নানা কৌশলে আয়ত্ত করিয়া পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিত। ঐ সকল বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, এই সংবাদও জানিতে পারি; কিন্তু সেই ব্যক্তি যে স্বার্থডেল, এ সন্দেহ প্রথমে আমার মনে স্থান না পাওয়ায় তাহাকে আমি এই দলে টানিয়া আনিতে পারি নাই; কিন্তু সোহো পল্লীর ইতর জনসাধারণের সহিত আমি যখন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিলাম, সেই সময় নানা সূত্রে জানিতে পারিলাম—ভিগো নামক একটা দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা ভিক্টোরিয়ার অদূরে যে আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল, বিচারক স্বার্থডেল সেই আড্ডায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। পুলিশ কি কারণে সেই আড্ডা খানাতল্লাস করিয়া গুণ্ডাগুলাকে দমনের চেষ্টা করে নাই, তাহা জানিতে পারি নাই কিন্তু পূর্ব্বে 'মাউস্ অফ দি এবমিনেবেল' নামক যে আড্ডার কথা বলিয়াছি—সেখানে এরূপ গর্হিত ও লোমহর্ষণ দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান হইত যে, তাহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই।

"এম ভিগোর সেই প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকার আড্ডায় আর এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টন। সুন্দরী তরুণীদের দেখিলে তাহাদিগকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই ঔপন্যাসিক সাহিত্য-সেবার উপলক্ষে আর যে সকল অপকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। স্বার্থডেলের প্রকৃতিতে সদাশয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত না; বিশেষতঃ, তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র থাকায় সে খুনী-মামলার বিচার-ভার গ্রহণের জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিত। দীর্ঘকাল অপরাধিগণের বিচার-কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বিচারকের প্রধান গুণ সমদর্শিতা ও সহিষ্ণুতায় সে বঞ্চিত ছিল। তাহার স্ত্রী সহসা এক দিন তাহার অদ্ভুত খেয়ালের কথা জানিতে পারেন। আমি এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"ট্রেন্টন স্বার্থডেলের বন্ধু হইলেও তাহাদের বিরোধের কারণ আমার অজ্ঞাত; তবে তাহারা পরস্পর কলহ করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। কারণ, এক দিন আমি ঘটনাক্রমে তাহাদের বিরোধের সময় উপস্থিত ছিলাম।

"মিঃ মেড্‌লি, যে সময় উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সময় আমি 'সন' নামক দৈনিক পত্রিকার সংবাদ-দাতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম—এই সংবাদ সম্ভবতঃ আপনার অবিদিত নহে। এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমি কার্জ্জন স্কোয়ারে পিটার ট্রেন্টনের বাস-ভবনে উপস্থিত ছিলাম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট সেই সময় আমাকে সেই স্থানের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেও আমি তাহার সেই অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া সেই কক্ষস্থিত গালিচার উপর যে দ্রব্যটি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহা সংগ্রহ করিয়া পকেটে রাখিয়াছিলাম। সেই দ্রব্যটি সার্টের বোতামের অর্দ্ধাংশ।"

মিঃ আর্ডলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সার্টের বোতামের অর্দ্ধাংশ? কিরূপ বোতাম?"

ডেভিড তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "উহা এক জোড়া হাতের বোতামের এক অংশ বলিলেই ঠিক হইত। সেই বোতামের উপর খোদিত একটি বিচিত্র নক্সা দেখিয়া আমার কৌতূহলের উদ্রেক হওয়ায় আমি বোতামটি লইয়া বণ্ড ষ্ট্রীটের বিখ্যাত জহরী মণ্টিসের দোকানে গমন করি; তাঁহারা তাহা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—সেই বোতাম তাঁহারাই কোন ভদ্র-লোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন সেই ভদ্রলোকটি কে, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন কি?"

ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর মরিসন বলিলেন, "আমার অনুমান, স্বার্থডেলই সেই বোতাম ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু মিঃ গারসাইড, সেই বোতাম পুলিশের হেফাজতে গচ্ছিত না করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া আপনার উচিত হয় নাই! এই দায়িত্ব-ভার আপনার গ্রহণ করিবার কি কোন সঙ্গত কারণ ছিল?"

মুখ ঈষৎ বিকৃত করিয়া ডেভিড বলিল, "আমি এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও গুরুতর দায়িত্ব-ভার বহু দিন হইতেই স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছি ইন্‌স্পেক্টর! আপনাকে অসঙ্কোচে বলিতে পারি, ভবিষ্যতেও কোন দিন তাহা বহনে কুণ্ঠিত হইব না। সেই মূল্যবান্ প্রমাণটি মুহূর্ত্তের জন্য হস্তান্তরিত করিতে আমার আগ্রহ হয় নাই। এই প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, স্বার্থডেল অল্প দিন পূর্ব্বে নিহত ঔপন্যাসিকের বাস-কক্ষে গমন করিয়াছিল। এই জন্যই আমি ঐ সময় হইতে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

"তদন্তের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি—ট্রেন্টন অট্টালিকার চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটে বাস করিতেন। সেই ফ্ল্যাটে তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়নের বাহিরে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় পলায়নের জন্য যে সোপানশ্রেণী সংরক্ষিত ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—ট্রেন্টনের হত্যাকারী উক্ত সোপানশ্রেণীর সাহায্যে সেই কক্ষের বাতায়নে উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে, এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই পথেই প্রস্থান করে। আমার এই ধারণা অসঙ্গত মনে করিবার কারণ নাই। দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তির সাহসের অভাব না হইলে এই কার্য্য সম্পাদন করা আদৌ কঠিন নহে। এ কথার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই সময় স্বার্থডেল বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল; কারণ, তাহার বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু বার্দ্ধক্যেও তাহার ব্যায়াম-পুষ্ট সুদৃঢ় দেহে প্রচুর সামর্থ্য ছিল, বিশেষতঃ, যৌবন-কালে সে পরাক্রান্ত ব্যায়াম-বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, পরিণত বয়সেও সে দৈহিক বলের পরিচয় দিয়া ব্যায়াম-প্রদর্শনীর দর্শকগণকে বিস্মিত করিত। এ জন্য কেহই—"

ডেভিডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর মরিসন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু স্বার্থডেলই যে ট্রেন্টনকে ভুজালি দ্বারা হত্যা করিয়াছিল; ইহার অকাট্য প্রমাণ ত আপনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই মিঃ গারসাইড!"

ডেভিড অসহিষ্ণু হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই? আপনি বলিতেছেন কি? আমি চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু যে প্রমাণ আমি পাইয়াছি, তাহা যে-কোন চাক্ষুষ প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং ভ্রম-প্রমাদের ফলে তাহা বিকৃত হইবারও নহে। তবে আমার সংগৃহীত প্রমাণ আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে একটি কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না। আপনি কি বলিতে পারেন, ইন্‌স্পেক্টর, স্বার্থডেল এই মামলার বিচার-শেষে জুরিগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া তরুণী আসামীকে মুক্তিদান করিয়াই বিচারাসনে বসিয়া আত্মহত্যা করিল, এবং এই ভাবে বিচারাসনের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না—ইহা কি অকারণ? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা অকারণ নহে! কিন্তু সেই কারণটি আপনাদের সকলেরই অজ্ঞাত; এই জন্য আপনাদের প্রতীতি উৎপাদনের নিমিত্ত আপনাদের নিকট তাহা বিবৃত করা একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করিতেছি।

"আমি স্বার্থডেলের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে এই লোমহর্ষণ মামলার বিচার শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাত্রিকালে তাহার বাস-ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি তাহাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলাম,—'মিঃ ট্রেনটনকে কে হত্যা করিয়াছিল তাহা আমি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছি, এবং তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।'—আমার এই উক্তি ধাপ্পা নহে; তাহাকে আমি সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলিয়াছিলাম। যদি ইহা জীবন-মরণের ব্যাপার না হইত, এবং এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রগাঢ় রহস্যভেদের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেও আমি এ সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিতাম না।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া 'অয়ার' পত্রিকার সম্পাদক বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; আপনার কোন কথাই বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ কর্ম্মচারীরা আপনার কথা শুনিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য; কিন্তু আমার ধারণা, অপরাধিগণের অনুষ্ঠিত বিবিধ অপকার্য্যের সংবাদ সংগ্রহে আপনার দক্ষতা অতীব প্রশংসনীয়; আপনি অদ্ভুত তৎপরতার সহিত এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আপনার কার্য্যদক্ষতায় আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, আপনি যদি আমাদের সংবাদ-বিভাগের কার্য্যে স্থায়িভাবে যোগদান করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিব। এ জন্য আপনাকে আমরা বার্ষিক দুই হাজার পাউণ্ড বেতন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না। মেডলি, এ সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।"

'অয়ারের' সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক মেডলি বলিলেন, "আমার মনে হয়, উঁহার বার্ষিক বেতন দুই হাজার পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে আড়াই হাজার পাউণ্ড ধার্য্য করিলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে উনি স্থায়িভাবে চাকরী গ্রহণে সম্মত হইতে পারেন। আপনি আমার ব্যক্তিগত অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়াই আমার অভিপ্রায় আপনার গোচর করিলাম।"

প্রধান সম্পাদক বলিলেন, "আমি 'অয়ারের' পরিচালকবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিতেছি। আমার বিশ্বাস, পরিচালক-সমিতি আমার সঙ্গত প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না। কারণ, মিঃ গারসাইডের যোগ্যতা তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে; কিন্তু মিঃ গারসাইড, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।"

ডেভিড বলিল, "সংবাদপত্রের সেবাই আমার উপজীবিকা, সুতরাং আপনারা যখন আমার বেতন সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিলেন, তখন আপনাদের প্রস্তাবে আপত্তির আর কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, কুড়ি লক্ষ পাঠকের মনোরঞ্জন করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করি।"

* * * *

যখন তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় স্বার্থডেলের শোকাকুলা পত্নী গৃহে বসিয়া অশ্রু-সজল নেত্রে তাঁহার স্বামীর রোজনামচা (diary) হইতে শেষের কয়েকখানি পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উহা ভবিষ্যতে কোন প্রকারে জনসমাজে প্রকাশিত হইলে তাঁহার পরলোকগত স্বামীর ও তাঁহার সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণের কলঙ্কের কথা সকলেই জানিতে পারিবে, এবং তাঁহাদের দুর্নামেরও সীমা থাকিবে না।

এই ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এক দিন মিঃ স্বার্থডেল তাঁহার গোপনীয় ডায়েরী পাঠ-কক্ষের টেবলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াই কক্ষান্তরে টেলিফোনে সাড়া দিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় মিসেস্ স্বার্থডেল সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার স্বামীর ডায়েরী টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ সেই পৃষ্ঠার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলেন। ডায়েরির সেই পৃষ্ঠায় তিনি ১ই অক্টোবরের ঘটনাগুলির বিবরণ লিখিত দেখিয়া তাহা পাঠের ইচ্ছা দমন করিতে পারেন নাই। তিনি বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে পাঠ করিলেন,—"পিটার ট্রেন্টনকে স্বহস্তে হত্যা করিলাম। গত-রাত্রিতে সে আমাকে এই কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল যে, * * * কে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, কিন্তু আমি গোপনে তাহাকে হত্যা করায় তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। পিটার আমার বহু দিনের বন্ধু; আমি তাহার শয়ন-কক্ষে গোপনে প্রবেশ করিয়া তাহারই অস্ত্রের আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়াছি—কেহই ইহা ধারণা করিতে পারিবে না। আমার তৎপরতায় তাহার ইহজীবনের অবসান হইল। আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পরাভূত; আজ হইতে আমি নিষ্কণ্টক। * * *"

* * * *

তরুণী জুন তাহার উপবেশন-কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে যে যুবকের হাস্যোজ্জ্বল মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাকে সে তখন সেখানে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই।

আগন্তুক তাহার প্রণয়ী ডেভিড গারসাইড।

ডেভিড জুনের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কোমল স্বরে বলিল,—"হাল্লো ডার্লিং, তোমার জন্য আমি সদ্য ফোটা মিষ্ট গন্ধ ফুলের একটি তোড়া আনিয়াছি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুন্দর বস্তু—তোমার মুখের সহিত তুলনার যোগ্য।"

জুন সবিস্ময়ে বলিল, "ডেভিড! তুমি! তুমি আসিয়াছ?"

ডেভিড ফুলের তোড়াটি চেয়ারে রাখিয়া তাহার প্রণয়িনীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "হাঁ, আমিই আসিলাম। আমাকে কি তোমার কোন কথাই বলিবার নাই জুনি?"

জুন নিঃশব্দে ডেভিডের সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কথা ফুটিল না; কিন্তু হৃদয়ে তুফান বহিতেছিল। জুনের মনের আবেগ প্রশমিত হইলে ডেভিড সংযত স্বরে বলিল, "একটা নূতন খবর আছে জুনি! আমি বার্ষিক আড়াই হাজার পাউণ্ড বেতনে 'অয়ার' সংবাদপত্রের অফিসে চাকরী লইয়াছি। এই বেতন 'অয়ারের' প্রধান প্রবন্ধ-লেখকের বেতনের সমান।"

"হাঁ ডেভিড, ইহা সুসংবাদ বটে!"

"কিন্তু এক সর্ত্তে আমাকে এই চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে; আমাকে মদ ছাড়িতে হইবে। অনেক কালের অভ্যাস!"

জুন বলিল, "চেষ্টা করিলে তুমি কি এই অভ্যাস ছাড়িতে পারিবে না? কাজটা কি এতই কঠিন?"

ডেভিড হাসিয়া বলিল, "হাঁ কঠিন বটে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি! জীবনের মত মদ ছাড়িয়াছি। কেবল চাকরীর জন্য নহে, তোমার প্রেমের জন্য কোন কাজই আমি অসাধ্য মনে করি না। এখন কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে জুনি? আমি পূর্ব্বে তোমাকে এই অনুরোধ করিতে সাহস করি নাই, কারণ, পূর্ব্বে আমি এ জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এখন আমি এই অভ্যাস ত্যাগ করা—"

জুন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আর তোমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই ডার্লিং!"

সেই রাত্রিতে তাহারা স্কটের রেস্তোরাঁয় নৈশ ভোজন শেষ করিল। তাহাদের সঙ্গে আরও দুই জন যোগদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এক জন ট্রেন্টন হত্যার আসামীর কৌঁসুলী—জন গারসাইড তাঁহার সঙ্গিনী ও তাঁহার প্রণয়িনী ওলিভিয়া ডেন। তাঁহারা সকলেই বিবাহ-প্রসঙ্গের আলোচনায় রত হইলেন; কিন্তু হতভাগ্য বিচারক হোরেসিও স্বার্থডেলের শোচনীয় পরিণামের বেদনাপূর্ণ স্মৃতি তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল।

সমাপ্ত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ভক্ত রবিদাস

ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাস গঙ্গাবতরণের মতই বিচিত্র। গঙ্গার পুণ্য ধারার স্পর্শে যেমন বহু প্রদেশ উর্ব্বর হইয়া নানা ফসলদানে জীবের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি ভারতীয় ধর্ম্ম-সাধকদিগের অমৃত উপদেশ-বাণীতেও আসুরিক শক্তির হাত হইতে ভারতীয় কৃষ্টি পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া আসিতেছে চিরকাল।

সাধক রবিদাসের কথা আজ আমরা আলোচনা করিতেছি।

তিনি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পুণ্য সাধনার বলে সাধু-সজ্জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এবং শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকের ন্যায় তিনি আজ জাতির হৃদয়ে স্মরণীয় ও বরণীয় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সাধক রবিদাস চর্ম্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত। চর্ম্মকার সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে নিম্নস্তরের দরিদ্র; অবজ্ঞাত অংশে ইহাদের বাস। ইহাদের জীবিকার উপায় গ্রামের বা সহরের মৃত পশু বহন ও তাহাদের চর্ম্মে পাদুকা নির্ম্মাণ ও পাদুকা সংস্কার। দেবালয়ে কিংবা শিক্ষা-মন্দিরে তাহাদের স্থান ছিল না। এ সম্প্রদায় সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য, তথাপি হিন্দু সমাজ এই সম্প্রদায়কে কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখে নাই। অবজ্ঞা এবং ভীষণ দারিদ্র্যে পরিবর্দ্ধিত মানবের জীবনে সুকুমার বৃত্তির পরিস্ফুরণের ও হৃদয়-সম্প্রসারণের সুযোগ অতি অল্পই ঘটে। রবিদাস নিজ সম্প্রদায়ের দুরবস্থার কথা অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

ওগো নাগরাজ, দুঃখী মোর জাতি
চর্ম্মকার নামে খ্যাতি।
মোর জ্ঞাতিগণ অতি অভাজন,
হীনকুলে তারা জাত।
কাশী সন্নিকটে, কাঙ্গালের বেশে
ক্ষুন্ন মনে তারা ফেরে,
যত মৃত পশু, করিয়া বহন
জীবিকা অর্জ্জন করে।

ভগবানের কাছেও রবিদাস অতিশয় দীন ভাবে আত্মনিবেদন জানাইয়াছেন—

"জাতি ওছা, পাতি ওছা
ওছা জনম হামারা।"

ভক্ত নিবেদন করিতেছেন যে প্রভু, তোমাকে পাইবার জন্য মহাযোগেশ্বর, মহাতাপস ও কামবিজয়ী ভগবান্ রুদ্রদেব কত ব্যাকুল! কত বিরাট্ সাধনা, কত মহান্ ত্যাগ না প্রভু পার্ব্বতীনাথ তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য করিয়াছেন! সেই মহাযোগীর আরাধনার ধন তুমি! কেমন করিয়া এই অধম, এই দীন তোমাকে পাইবে?

"সাঙ্গ, তেরী প্রীত সমাধি লাগি।
দহি অনঙ্গ, ভসম্ অংগ, সংতত বৈরাগী।
অনল নৈন, দীপ্ত বৈন সীম জটাধারী।
কোটি কল্প, ধ্যান অল্প, মদন-অন্তকারী।
পরম তত্ত্ব, ধ্যান-মন্ত্র, কোটি সুরজমালা।
প্রেম-মগন নৃত্য গগন বেঢ়ি বহ্নি জ্বালা।
অস মহেশ রুদ্র ভেস অজহু দরশ আসা।
কৈসে সাঙ্গ মিলো তোহি গাবে রৈদাস।"

আত্মনিবেদিত এমনই আকুল হৃদয়ে সত্যের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ইহাতে সকল মলিনতা বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইলে প্রেমময়ের প্রেম-স্পর্শে সাধক তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। উপমায় ভক্ত বলিতেছেন,—

"সুরসরি সলিলকৃত বারুণীরে
সগুজন করত নহি পানং।
সুরা অপবিত্র ন ত অবর জনরে
সুরসরি মিলত নাহি হোহি আনং।"

এ কথা সত্য যে, গঙ্গাজল-কৃত সুরা সাধুজন পান করেন না। কিন্তু সুরা যদি সুরধুনীর পূত সলিলে পড়িয়া তাহার অনন্ত জলরাশির মধ্যে আত্মবিলোপ করে, তখন সে সুরা অপবিত্র থাকে না এবং সেই সুরা-মিশ্রিত গঙ্গার জলও আর অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ভক্ত রবিদাস নিজের পরিশ্রমে নিজের জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন এবং পরিশ্রমলব্ধ অর্থের অর্দ্ধেক সাধুসেবায় নিয়োজিত করিতেন। ভক্তমালে লিখিত আছে—

"দুই জোড়া জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক জোড়া দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া।
এক জোড়া বেচি করে দেহ নির্ব্বাহন।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন।"

কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে রবিদাসের দিন অতিবাহিত হইত। কখনও উপবাস করিয়া থাকিতেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া এক সাধু তাঁহাকে একখানি স্পর্শমণি দিয়াছিলেন। রবিদাস সেই মণি দেখিয়া সাধুকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর, পাথর দিয়া ভুলাইতেছ!" সাধু সেই স্পর্শমণির গুণ পরখ করিয়া দেখাইলেন।

"প্রভু কহে এ পাথর লৌহ ছোয়াইলে।
তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে।
এত কহি চামকাটা রাম্পি ছোয়াইল!
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোনার হইল।
তাহা তেঁহো দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া,
কহেন, করিলে কিবা? দিলে বিগড়িয়া।
দিন গুজরন মোর ইহা হোতে হয়।
তুমি তা করিয়া স্বর্ণ কৈলে অপচয়।
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
কাজ নাহি মোর, তুমি নিয়া যাহ ধন।

* * *

তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা।
রুইদাস নিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিলা।
প্রেমানন্দ রত্নে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তার মন ধায়।"

যিনি নির্লোভ মহারত্নের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার কাছে স্পর্শমণি সামান্য একখণ্ড প্রস্তর। পরম বৈষ্ণব সনাতন প্রভুও স্পর্শমণি পাইয়া যমুনাতীরে বালুকারাশির মধ্যে সেটি রাখিয়াছিলেন। রবিদাস কাতর কণ্ঠে প্রভুর করুণা চাহিয়া বলিয়াছেন—

"পরশ সোহৈ লোহকু
কিরপা জোহৈ দীনহীন।

হোসঙ্গ দীন হীন নহি
রাখু চরণি নিসদিন।"

ভক্তের সহিত ভগবানের বন্ধন অচ্ছেদ্য। ভক্তের প্রাণের কামনা ভগবানের নিবিড় সত্তায় আত্মনিমজ্জন। সেই আত্মনিমজ্জনের সঙ্কল্প রবিদাসের আবেগময়ী বাণীতে কেমন সুন্দর ভাবে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে :—

শ্রদ্ধাবান্, ভগবানে নির্ভরশীল ভক্ত সংসারের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ভগবানের ভজনগানে বিভোর থাকিতেন। এই ভজনের নির্ম্মলানন্দ হৃদয়ের মলিনতা দূর করে। প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেই তাঁহার অনুভূতি. ও সচ্চিদানন্দের প্রকাশ তাঁহারই অনন্ত কৃপায় ঘটিয়া থাকে।

কিছু দিন পরে যে সাধু রবিদাসকে স্পর্শমণি দিয়াছিলেন, তিনি আবার আসিলেন। দেখিলেন, রবিদাসের সাংসারিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে জুতা মেরামত করিয়াই অতি কষ্টে তাঁর দিন কাটিতেছে। রবিদাসকে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবিদাস, সে স্পর্শমণি কি করিলে?" চালের বাতার মধ্য হইতে পাথর আর রাম্পি বাহির করিয়া রবিদাস সাধুকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন; বলিলেন, "ওগুলা না আন হেথা, অন্য কারে দেহ"। সাধু বলিলেন, "আচ্ছা। তোমার আরাধ্য দেবতার আসনতলে প্রত্যহ প্রাতে তুমি পাঁচটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পাইবে।" সাধুর কথামত রবিদাস দেখিলেন, ঠাকুরের শয্যাতলে পাঁচটি মোহর আছে।

"দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল
কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল।
টান মারি দূরে ডারি দিল ক্রোধ করি।
পুনঃ প্রভু আইল তাহার কষ্ট হেরি।"

সাধু আবার আসিলেন। রবিদাস তাঁহার হাতে মোহরগুলি দিলেন। সাধু বলিলেন—একটি মোহর তুমি রাখো, রবিদাস! সাধুর ঐকান্তিক যত্নে মুগ্ধ হইয়া রবিদাস বলিলেন—"কে তুমি? কেন এ হীনকে এমন অনুগ্রহ করিতেছ? কি জন্য এই অস্পৃশ্য চর্ম্মকার-গৃহে বার বার তোমার আগমন?"

"তেঁহো কহে আমি তোর রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ নেহারি অন্তরে দুঃখ পাই।"

ভক্ত রবিদাস বলিলেন,—"তুমি যদি আমার ইষ্টদেব হও তো একবার তোমার স্বরূপ দেখাও। আমার নয়ন-মন সার্থক হোক। দেখাও প্রভু, তোমার সেই করুণায় ঢল-ঢল নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম মোহন রাম-রূপ। রবিদাসের সর্ব্বকামনা সার্থক কর।" ভক্তের প্রার্থনায় কমললোচন তাঁহাকে নয়নাভিরাম ভুবনমোহন নবঘনশ্যাম রূপ দেখাইলেন।

"বিদ্যুতের মত সাধু এক বার হেরি
স্থবিরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি।"

ভক্ত স্তব্ধ, চিত্ত স্পন্দনশূন্য, চেতনা বিলুপ্ত। নয়নজলে ভক্তের হৃদয় ভাসিয়া গেল। ভক্ত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—"ওগো প্রাণের ঠাকুর, তুমি বার বার আমার কাছে এসেছ। আমি মূঢ়, তাই তোমাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার অপরাধের সীমা নাই। এ বেদনা কেমনে ভুলিব?"

"কাসনি বেদনি আখু।
রাম বিন জীবন ন রহৈ, কস রাখু।
এ বেদনা কহিব কায়
রাম বিনা প্রাণ না রয়।"

ঠাকুরের অর্থে মন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইল। বৈষ্ণবের মেলা বসিল। ভজন-গানে মন্দির মুখরিত হইল।

"স্বয়ং শ্রীল রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয়।"

রবিদাস আজ আপনাহারা—প্রেমসাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন। সকল স্থানেই ভগবদ্দর্শন করিতেছেন। ভজন-গানে সেই ভাব সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে—

"যব হম হোতে তব তু নাহি
অব তু হী মেঁ নাহী।"

প্রভু জানকীবল্লভ, আজ তোমায় কেমন বন্দী করিয়াছি! আজ রবিদাসের মন্দির ছাড়িয়া তুমি চলিয়া যাও, দেখি। এক দিন আমার মোহ-বাঁধন কাটিয়া আমায় মুক্ত করিয়াছিলে, আজ তোমার মুক্তি নাই।

ভক্ত আজ ভগবানের পূজার জন্য ব্যাকুল! প্রেমময়ের পূজার কি উপকরণ দেওয়া যায়? চিরশুদ্ধ ও চিরবুদ্ধ দয়াল ঠাকুরকে কোন্ নির্ম্মাল্যে পূজা করা যায়? কিসে তাঁহার তৃপ্তি হইবে?

দুধুতো বছরৈ অনহু বিটারিও।
ফুলু ভারি, জালু মীনি বিগারিও।
মাই, গোবিন্দ পূজা কাহা লৈ চরাবউ।
আবরু ফুলু ন পাকউ।

দুগ্ধ, ফল, জল ও চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণে ভাল ও মন্দ দুই-ই একসঙ্গে রহিয়াছে। সেইরূপ আমার দেহে প্রেম ও প্রীতি প্রভৃতির সহিত ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি মিশিয়া আছে। শুনিয়াছি প্রভু, তোমায় কোন দ্রব্য দান করিলে তুমি তাহা গ্রহণ কর। লও প্রভু আমার হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগণকে। উহারা যেন আর আমায় পীড়া না দেয়। আর লও প্রভু আমার প্রেম ও ভক্তি। ঐগুলি ত তোমাকে পাইবার উপায়। ঐগুলি গ্রহণ করিয়া প্রেমময় আমায় মুক্তি দাও—

"তন্ মন্ অরপউ, পূজা চরাবউ।
গুরু পরসদি নিরংজন্ পাবউ।"

রবিদাসের বিমল চরিত্র, অপূর্ব্ব সাধনা ও বিশ্বমানবতা বহু ভক্তকে আকর্ষণ করিল। নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রবিদাস মানুষের দুঃখ-কষ্ট কত তীব্র, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই রবিদাস ছিলেন দরদী। মানব-সেবা তাঁহার সাধনার বিশেষ অঙ্গ ছিল। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই বিশ্বজনীন ভাবের ভাবুক ছিলেন রবিদাস। তিনি বলিতেন, আমার উপাসনা-ক্ষেত্র, আমার মন্দির এই পৃথিবী। আমার দেবতা প্রাণবন্ত, হৃদয়বান্ ও দেহধারী।

নীলা গুম্বট উচ্চ বিশাল
চরমী দেব জীবিত কামাল।

কত "জীবিত চরমী দেবতা" তাঁহার সাধনায় ও তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছে। মেবারের ভক্তিমতী রাণী মীরাবাঈ তাঁহাকে

গুরুরূপে পাইয়া রাজ্যৈশ্বর্য্য, রাজসম্মান ও আভিজাত্য-গৌরব উপেক্ষা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"নহি মে পীহর সাসরো নহি পিয়া জীরী সাথ।
মীরা নে গোবিন্দ মিলাজী গুরু মিলিয়া রৈদাস॥"

ভক্তমালে আর এক রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁহার নাম ঝালি। তিনি রবিদাসের অপূর্ব্ব সাধনায় ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া এই পরমভাগবতের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। হীন চর্ম্মকারের সন্তানের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে তার্কিক ব্রাহ্মণগণ রাণীকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিচলিত-সঙ্কল্পা রাণী দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"নীচ যে কহিলে অতি অনুচিত এহ।
শাস্ত্র দূরে থাকু যুক্তি করিয়া বুঝহ॥
পরাৎপর জগন্নাথ পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার॥
তাঁর শ্রীচরণ যেহ হৃদয়ে ধরয়।
তারে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়॥
ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচ জাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয়?"

কথিত আছে, একবার এই রাণী এক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসব-উপলক্ষে কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। বলা বাহুল্য, রাণীর গুরু রবিদাসও এ উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ রবিদাসের নিকট হইতে কিছু দূরে আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল—

"রবিদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও রবিদাস বসিয়াছে পাশে॥
পুনর্ব্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
পুনঃ দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে।"

ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইলেন। শত শত লোক উচ্চ-নীচ জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহার ভক্তি-সাধনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। মানব-কল্যাণকামী ভক্ত রবিদাস আর্ত্ত মানবগণের অন্তরের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিলেন। প্রেম ও ভক্তির উপাসক, সত্যের উপাসক বিশ্বময় ভগবানের বিকাশ দেখিয়াছেন। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া দেবতার আরতির কালে রবিদাসের দিব্যদৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দূরে—বহু দূরে যেখানে জড় দৃষ্টিশক্তি পথহারা হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই উদার অনন্ত অম্বরতলে সজ্জিত রহিয়াছে অসংখ্য কাঞ্চনদীপ। তাহারা স্তব্ধ ভাবে পূত আরতির অগ্নি বক্ষে ধারণ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার আরাধনার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। কত কোটি সূর্য্য সেই বিরাট্ পুরুষের আরতির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। কখন অনন্ত অন্ধকারকে জ্যোতি দান করিয়া তাহারা নিঃস্ব, আবার সেই মহা জ্যোতিষ্ময়ের দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইতেছে। এই অন্ধকার ও আলোকের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মহাশূন্যে ধ্বনিত হইতেছে এক অনাহত শব্দঝঙ্কার। এই শব্দঝঙ্কারের মধ্য হইতে কত লয়, কত সুর, কত তাল, কত সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া সেই মহা মহিমময়ের মহিমা-গানে সার্থক হইতেছে। কত দেবতা, কত কিন্নর, কত অপ্সর সেই অপরূপ গীতধ্বনির সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিয়া ধন্য হইতেছে। এই মরণভীতিহীন নিত্যানন্দময় আরতি ভক্তের প্রাণে পুলক-স্পর্শ জাগাইয়া তোলে।

"আরতি কঁহা লৌ জোবৈ।
দেখি মহারতি অচংভ হোবৈ॥
অনংত কংচনদীপ জলাবৈ।
জড় বৈরাগ দৃষ্টি ন আবৈ॥
কোটী ভান আবত সোহাবৈ।
কঁহ নিত আরতি অগ্নি পাবৈ॥
অপার অংধের অনংত ভান।
নৃত্য চলে নিত আরতি গান॥
রৈদাস আরতি দেখৈ মাহী॥
জনম মরণ ভয় কছু অব নহী॥"
আরতির ধ্বনি জাগে বিশ্বময়।
সেই মহারতি দেখি লাগিছে বিস্ময়॥
কাঞ্চন-দীপমালা জ্বলিছে অম্বরে।
জড় দৃষ্টি মোর যায় না অত দূরে॥
কোটী ভানু তথা করে ঝলমল।
কোথা হতে পায় জ্যোতি নিরমল?
অনন্ত আঁধার আর মহাজ্যোতি।
আরতির সঙ্গীতে মুখর অতি॥
রবিদাস দেখে এই মহারতি।
ভুলিয়াছে জীবন-মরণ-ভীতি॥"

আজও নীল আকাশতলে, উন্মুক্ত উপাসনাক্ষেত্রে শত শত সৎনামীর ভাবপূত কণ্ঠে এই মহারতি-গান গীত হয়! ধন্য রবিদাস! ধন্য তাঁহার সহজ সাধনা! আজও রবিদাসপন্থী সৎনামী সম্প্রদায় তাঁহার সাধনার পূত অগ্নি ও পবিত্র আদর্শ পরম যত্নে রক্ষা করিয়া ধন্য হইতেছে। আর ধন্য সেই মহাপুরুষ জ্বলন্ত পাবকতুল্য ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ রামানন্দ স্বামী—রবিদাসের গুরু! তাই পরশমণির পবিত্র পরশে চর্ম্মকার রবিদাস ও জোলা কবীর প্রভৃতি বহু সাধক সুবর্ণময় হইয়াছেন।

"লোহা কাঞ্চন হিরণ হোই কৈসে
জউ পারস নহি পরসৈ।"

মহাপুরুষ রামানন্দ স্বামীর বিরাট্ ব্যক্তিত্ব, উদার ধর্ম্মমত ও ব্রাহ্মণ্যবল নীচ জাতিকে দীক্ষা দিয়া ম্লান হয় নাই। ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব, ব্রাহ্মণের দান ও ব্রহ্মণ্য-শক্তির বিকাশ কত দূর, রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-পরিচয়ে তাহা বুঝা যায়। অহমিকাশূন্য ভগবদ্ভক্ত শিষ্য রবিদাস গুরুর পদে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

"তুম চন্দন হম ইরংড বাপুরে,
সংগি তুমারে বাসা
নীচ রখতে উচ ভয়ে হৈ,
সংধ সুগংধ নিবাসা।
চন্দনতরু তুমি,　　ক্ষুদ্র এরণ্ড আমি
শুধু তব সনে মোর বাস।
অধম আমার মত　　যদি হয়ে থাকে পূত,
দায়ী তব অঙ্গের নিশ্বাস।"

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

ছেদীলাল
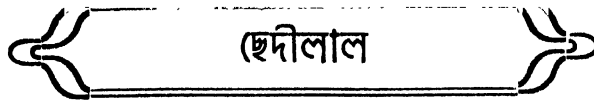
[গল্প]

হোষ্টেল, বোর্ডিং অথবা মেসে থাকিবার সুযোগ ছেলেবেলা হইতে কোন দিন হয় নাই। কিন্তু আয়ুষ্কালের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া সে সুযোগ একেবারে অকাট্য ভাবে মিলিয়া গেল। গৃহিণীর পূজনীয় পিতৃদেব শত্রুর বিমান-আক্রমণে কলিকাতার অবস্থা কি রকম হইতে পারে, তাহারই একটা ভয়াবহ ছবি আমার চোখের সামনে আঁকিয়া ধরিয়া এক রকম বিনা নোটিশেই মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। চাকরীর মায়া ছাড়িয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে পারিলাম না; আত্মীয়-স্বজনরা আগেই যে যে দিকে চোখ যায় সরিয়া পড়িয়াছিলেন—কাজেই, তাঁদের স্কন্ধেও ভর করিতে পারিলাম না; সোজা এক বোর্ডিংএ গিয়া উঠিলাম।

বোর্ডিংএর নাম 'হোম কম্ফর্টস্'। গৃহিণীকে চারশ' মাইল দূরে রাখিয়াও যদি মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে 'গৃহসুখ' ভোগ করা যায়, সেই লোভে সাইনবোর্ডটি চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

সম্ভবত: কলিকাতা যে সময় সুতানুটী নামে অভিহিত হইত, সেই সময়কার বাড়ী। বাড়ীখানি কিন্তু প্রকাণ্ড। তিন তলা জুড়িয়া প্রায় চল্লিশখানি ঘর। ইহারই একটিতে সদ্য: গৃহসুখবঞ্চিত আমি বকলমে গৃহসুখ-প্রাপ্তির আশায় আস্তানা গাড়িয়া বসিলাম।

আমার ঘরটা তিন তলার এক প্রান্তে, রাস্তার দিকে। এই ঘরগুলিতেই আলো-বাতাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, আর ঘরগুলির অবস্থা গুদামঘরের সামিল। আমার ডান পাশের ঘরটিতে টেলিগ্রাফ-কলেজের দুই জন ছাত্র, এক জন সিনেমা-অপারেটর এবং সদাগরী অফিসের এক জন কেরাণী একুমালি ব্যবস্থায় বাস করেন। ঘরখানি প্রকাণ্ড, কলরবও প্রচণ্ড। বাঁ পাশের ঘরটি আমার ঘরের মতই ছোট; এটি কোন্ সদাগরী অফিসের বড়বাবু নিত্যস্মরণ বাবুর একার দখলে।

অদ্ভুত মানুষ এই নিত্যস্মরণ বাবু। তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেব কাহাকে প্রতিদিন স্মরণ করাইবার জন্য ছেলের এই নাম রাখিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে পারি না; কিন্তু মেসের ঠাকুর চাকরের এবং আমার মত পার্শ্ববর্ত্তীদের কাছে তিনি যে অনেক দিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিত্য বাবুর প্রাতরাশ খাঁটি একপোয়া জলে গুটি-চারেক পাতিনেবুর রস। একটি বছর পাশের ঘরে থাকিয়া দেখিয়াছি, কোন দিন সকালে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহার পর একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামাগুলি মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক পাঠ এবং কেহ সামনে আসিয়া পড়িলে সেগুলির সম্বন্ধে সোৎসাহে আলোচনা। তার পর ক্ষৌরকর্ম্ম। ক্ষৌরকর্ম্মের পর প্রায় আধ ঘণ্টা চাকরগুলির নাম ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার এবং তাহাদিগের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ। নিত্য বাবু অফিস হইতে আসিয়া সেই যে উপরে উঠেন, পরদিন অফিসে যাইবার সময়ের আগে তাঁহাকে আর নীচে নামিতে দেখা যায় না। তাঁহার মুখ ধোওয়া হইতে আঁচানো এবং স্নান পর্য্যন্ত সকল রকমের প্রয়োজনীয় জল চাকরগুলিকে এই তেতলায় তুলিয়া দিতে হয়। ক্ষৌরকার্য্য সমাধার পর চীৎকারটি শুধু স্নানের জলের জন্য। নিত্য বাবুর শরীরটি খুব ছোটখাট নয়, কাজেই চার বালতি জল না হইলে তিনি ঠিক স্নানের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না।

এত বড় বোর্ডিং-বাড়ীটায় চাকর মাত্র তিন জন। সকাল বেলায় ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘরে ঘরে কুঁজোগুলিতে পান করিবার জল তোলা, চা-বিস্কুট, খাবার, ডাইং-ক্লিনিংএর কাপড় আনা···সব রকম কাজের ভার তাদেরই উপর। এক একটি তলার ভার এক এক জন চাকরের। তিন তলার চাকর যুধিষ্ঠির একতলার কোন বোর্ডারের ফরমাস খাটিলেই শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থা! ইহার উপর 'ফাউ' হিসাবে নিত্য বাবুর চার বালতি জল তুলিবার সময় হইলেই শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু নিত্য বাবুর জল চাই ঠিক ঘড়ি-কাঁটা ধরিয়া। কাজেই তিনি যথা-সময়ের আধ ঘণ্টা আগে হইতেই চীৎকার আরম্ভ করেন। বোর্ডাররা প্রতিবাদ করিতে ভয় পায়। প্রাচীন লোক, তায় মস্ত একটি অফিসের বড়বাবু! ম্যানেজার কথা বলিতে সাহস করেন না; কারণ, 'হোম-কম্ফর্টসের' সুদীর্ঘ এবং বিচিত্র ইতিহাসে একমাত্র নিত্য বাবুই একাদিক্রমে কুড়ি বছর বাস করিতেছেন; এমন কি, ঘর পর্য্যন্ত বদল করেন নাই।

নিত্য বাবু আহার করেন উপরেই। সকলের সঙ্গে বসিয়া আহার করাটা তাঁহার বড়বাবুর পদের সঙ্গে ঠিক মানায় না। চেয়ারের উপর কম্বলের আসন পাতিয়া, কেরোসিন কাঠের একটা জরাজীর্ণ টেবলের উপর থালা-বাটি সাজাইয়া তিনি দুই-বেলা আহার-পর্ব্ব উদ্‌যাপন করেন। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দুই-বেলা সেই কাঠের টেবলটিকে গোময়লিপ্ত করিয়া শুদ্ধ রাখে।

প্রথম প্রথম ভাবিতাম, একটি লোক অফিসের সময়টুকু ছাড়া দিবারাত্রির প্রায় সর্ব্বক্ষণ ঘরের মধ্যে বসিয়া ও শুইয়া কাটায় কি করিয়া?

সকালের ইতিহাস আগেই বলিয়াছি। বিকালের ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম দিনকতক পরে।

নিত্য বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসিয়া নিয়মিত ভাবে মদ্য পান করেন। ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় খুব গোপনে। যুধিষ্ঠির ভিন্ন কেহ জানিতে পারে না। সে-ই প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিত্য বাবুর জন্য দুইটি সোডার বোতল এবং খানকয়েক চিংড়ির কাটলেট ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়।

কথাটা শুনিয়া অবধি মনটা ভয়ানক অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ঘোর নীতিবাগীশ নই, তবু যেন মনে হইতেছিল, নিত্য বাবুর এই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন টাকার দম্ভ এবং ফ্যাসিষ্ট মনোবৃত্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কহিয়া ঘর বদলের ব্যবস্থা করিব কি না, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম; এমন সময় স্বয়ং নিত্য বাবুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আমাকে উঠিয়া বসিতে হইল।

নিত্য বাবু বিনা ভূমিকায় আমার ঘরের কোণের টেবলটার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। টেবলের উপর দিয়াশলাই পড়িয়া ছিল; সেটা

তুলিয়া লইয়া একটা সিগারেট ধরাইলেন ; তার পর এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, ব্যাটা যুধিষ্ঠিরকে একটি ঘণ্টা আগে দেশলাই আনতে পাঠিয়েছি, এখনও হারামজাদার দেখা নেই। তার পর কেমন আছেন, বলুন ? আপনার সঙ্গে তো এক দিন আলাপ করবার সুযোগই পেলাম না। এক-আধ বার ভুল করে গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন। আমি তো প্রায় সব সময়েই—

'যাব বই কি, নিশ্চয় যাব।' বলিয়া পরিচয়-পর্ব্বটা সংক্ষেপেই সারিবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু নিত্য বাবুর চোখ হঠাৎ একটা বইয়ের উপর পড়িয়া গেল। বইখানার নাম—"বেডষ্টার ওভার চায়না"। খোলা টেবলেই পড়িয়া ছিল।

নিত্য বাবু একটু চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বে-আইনী কেতাব নয় তো ?

হাসিয়া বলিলাম, না।

—দেখবেন, আমরা রেসপন্সিবল পোষ্ট-হোল্ডার, তার ওপর পাশের ঘরেই থাকি ! বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মনটা আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে কিন্তু বিনা ভূমিকায় আবার তিনি আমার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সোজা টেবলের কাছে গিয়া ক্যান্থারাইডিনের শিশিটা হাতে তুলিয়া লইলেন এবং খানিকটা তেল হাতের তালুতে ঢালিয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন,—বাঃ, খাসা গন্ধ ! আপনি সৌখীন লোক দেখছি। আমার তেলটা ফুরিয়েছে। যুধিষ্ঠির ব্যাটাকে আনতে দিলে কি ছাইভস্ম এনে হাজির করবে, তাই ভাবলাম—

কি ভাবিলেন সেটুকু আর আমাকে জানাইবার আবশ্যকতা বোধ না করিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাঁহার মেদবহুল অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি বারান্দার ধারে গিয়া স্নানের জলের জন্য যথারীতি হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিলেন।

এমনি ছোটখাট উপদ্রব প্রায় ঘটিতে লাগিল। সিগারেট, দাঁতের মাজন প্রভৃতি সময়ে অসময়ে ফুরাইতে লাগিল। লোকটির সম্বন্ধে আমার রাগ ও বিরক্তির শেষ রহিল না। ম্যানেজারের কাছে নালিশ করিতে গেলাম ! কিন্তু কোন ফল হইল না।

ম্যানেজার বলিলেন, এই একটি ব্যাপারে আমি নিরুপায়। ওঁর বিরুদ্ধে আমায় কোন অনুরোধ করবেন না।

বললাম, কেন ?

ম্যানেজার কহিলেন, প্রবীণ লোক। বোর্ডিং-এর গোড়া থেকে আছেন, তা ছাড়া সময়ে অসময়ে চাইলেই টাকা পাওয়া যায়।

বুঝিলাম, জলের চেয়ে রক্ত ঘন। বলিলাম, বেশ, তা হলে আমার অন্য একটা ঘর ঠিক করে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন, সেটা বরং চেষ্টা করে দেখতে পারি। আটাশ নম্বর ঘরটা এই মাসের শেষেই খালি হবে !

সুতরাং মাস-কাবারের প্রতীক্ষায় ঘরে রাগ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া করিবার কিছু রহিল না। দিন কতক পরে শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির এক দিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরে ঢুকিয়া নীরবে বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি চাই ?

উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়া সে সংক্ষেপে যাহা জানাইল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তাহাকে মাসখানেকের জন্য দেশে যাইতে হইবে। বদলীতে সে লোক দিয়া যাইবে, বোর্ডারদের কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু হাতে তাহার টাকা-কড়ি কিছুই নাই। কাজেই সবাই যদি কিছু কিছু—

প্রকারান্তরে রাহা-খরচটা আমাদের ঘাড় দিয়া চালানোই শ্রীমানের উদ্দেশ্য, সেটা বুঝিতে পারিলাম। সবাই কিছু কিছু দিলেন, আমাকেও দিতে হইল। রাত্রির ট্রেণে সে বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই পাশের ঘরে নিত্য বাবুর চীৎকারে সচকিত হইয়া উঠিলাম। শুনিলাম, নিত্য বাবু বলিয়া যাইতেছেন, আরে মশাই, ছাগল দিয়ে আবার যব মাড়ানো চলে না কি ? ওইটুকু ছেলে করবে বোর্ডিং-এর কাজ ! তা হলেই হয়েছে আর কি ! ব্যাটা ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে, কিন্তু ঘরের ধুলো ঘরেই রয়েছে, একটু এদিক ওদিক হয়নি ! আরে ছ্যা, ছ্যা :—

বুঝিলাম, শ্রীমান্-স্থলাভিষিক্ত নূতন চাকরটা নিত্য বাবুর প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই।

বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইবার জন্য টুথ-ব্রাশ ও তোয়ালে লইয়া নীচে নামিতেছিলাম। নামিতে নামিতে দেখিলাম, বছর বার-তেরর একটা ছেলে দুই হাতে প্রকাণ্ড দুইটি বালতি লইয়া ভাঙ্গা ও ফাটা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। তখনও সে দোতলা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, কিন্তু হাতের শিরাগুলি তার বাঁকিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, নিত্য বাবুর স্নানের জল।

মুখ-হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া দেখি, ছেলেটা বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতেছে। আরও দুই বালতি জল তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। বোধ হয়, সেই চিন্তায় মুখ তাহার শুকাইয়া উঠিয়াছে।

এই ছেলেটাই যে শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের বদলে বাহাল হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোর নাম কি ?

ছেলেটা তখনও হাঁফাইতেছে, কোন রকমে বলিতে পারিল, ছেদীলাল।

হিন্দুস্থানী ?

জী।

ঘর কোন্ জিলা ?

অযোধ্যা।

বড় বাবুর জল আনিতে দেরী হইয়া যাইবে, কাজেই আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া আসিলাম। বাকী দুই বালতি জল তুলিয়া দিয়া সে যখন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে, সেই সময় তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া আনিলাম।

ছেলেটার বয়স সত্যই কম। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, শক্ত-সমর্থ চেহারা। নেড়া মাথা, গলায় লাল সুতায় বাঁধা মরা সোনার একটা ছোট চাকৃতি ঝুলিতেছে। গায়ের রং ফর্সা নয়, কিন্তু চোখ দু'টি বেশ বড়, মুখের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করে। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের বদলে কে তাহাকে এখানে জুটাইয়া দিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ছেলেটা গ্রাম্য হিন্দীতে যাহা বলিল তার অর্থ এই যে, 'হোম-কম্ফর্টস'র দ্বারওয়ান অর্থাৎ যে লোকটা দুই বেলা ষ্টেশনে হানা দিয়া যাত্রী ধরিয়া আনে, সে তাহার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ছেদীলালের বাপ

কোন একটা আপিসে চাপরাসীর কাজ করিত। লেখাপড়া শিখাইবার জন্য মাসখানেক আগে ছেলেকে সে কলিকাতায় লইয়া আসে! কিন্তু বরাত এমনই খারাপ যে, ছেদীলাল কলিকাতায় পৌঁছিবার পর দিন পনেরোর মধ্যেই সে কলেরায় মারা গেল। বাপ পয়সা কড়ি কিছুই রাখিয়া যায় নাই বলিয়া দ্বারওয়ান ছেদীকে ধরিয়া আনিয়া এখানে কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। এক মাস খাটিয়া যাহা মিলিবে, তাহাতেই সে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত তেতলার ঘরগুলো ঝাঁট দেওয়া, কুঁজোয় জল তোলা, বাসন মাজা, বড়বাবুর জল তোলা, এত শক্ত কাজ কি তুই পারবি?

উত্তরে ছেদীলাল বলিল, কাহে নহি?

অর্থাৎ পারিবে না কেন, খুব পারিবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আমাকে আরও জানাইল, ভেইয়া অর্থাৎ দ্বারওয়ান বলিয়াছে, বেতন ছাড়া বাবুদের কাছে বকশিসও পাওয়া যাইবে। সেই বকশিসের টাকায় সে কয়েকটা খিলৌনা আর বুটিদার একখানি লাল শাড়ী কিনিয়া লইয়া যাইবে। খেলনা এবং বুটিদার শাড়ী লইয়া সে কি করিবে জিজ্ঞাসা করিতে ছেদীলাল বলিল, বাড়ীতে তার একটি 'বহিন' আছে—মোটে পাঁচ বছর বয়স, বিলামিয়া তাহার নাম। লাল শাড়ী বার খিলৌনা পাইলে সে ভারি খুশী হইবে আর বাবার মৃত্যুর দুঃখও কতকটা ভুলিয়া থাকিবে।

ছেদীলালের কথা শুনিতে শুনিতে আমি যেন চোখের সামনে আম ও পিপুল গাছের ছায়ায় ঢাকা ছোট একটি চালাঘর দেখিতে লাগিলাম। মাটী ও গোবর লেপিয়া ঘরের বাইরের দাওয়াটা ঝকঝকে, পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের বাহিরের দিকের মাটীর দেওয়ালে চুণ লেপিয়া তাহার উপর লাল-নীল রং দিয়া, পাগড়ি-পরা, ঘোড়ায়-চড়া কতকগুলি সিপাহীর মূর্ত্তি আঁকা হইয়াছে। দুয়ারের কাছে বড় একটা ছাগল কতকগুলি ছানা লইয়া পরম আলস্যে ঘাস চিবাইতেছে আর সেগুলির পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছে ছেঁড়া, ময়লা একটা জামা-পরা পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। এই ছোট সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম যে ব্যক্তি কলিকাতার কোন সদাগরী অফিসে উর্দ্দী ও তকমা আঁটিয়া চাপরাশির কাজ করিত, তাহার মৃত্যুর খবর এখনও হয়তো সেখানে পৌঁছে নাই! ডাকঘর হইতে গ্রামের দূরত্ব হয়তো কুড়ি পঁচিশ মাইল, মাসে দুই তিন বারের বেশী ডাক বিলি হয়'তো সেখানে হয় না···

ছেলেটা কিন্তু অসাধারণ খাটিতে পারে। খাটিতে পারে বলিয়া তিন তলার বোর্ডারদের ফরমাসের মাত্রাও যেন বাড়িয়া গিয়াছে। ছেদীলাল কারও হুকুমের প্রতিবাদ করে না। সবাইকে খুশী করাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেদীলাল জানে, চাকরীর মেয়াদ তাহার এক মাসের বেশী নয়, সুতরাং সবাইকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে এক মাস পরে যখন তাহার বাড়ী যাওয়ার সময় হইবে, তখন হয়তো ভাল বখশিসও পাওয়া যাইবে না।

কেবল অসুবিধায় পড়িয়াছেন নিত্য বাবু। হুইস্কির বোতল তাঁর ঘরে প্রায় সব সময়ই মজুদ থাকে, মুস্কিল বাধিয়াছে সোডার বোতল আনা, খোলা ও ঢালিয়া দেওয়া লইয়া। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির এই ব্যাপারে একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিল, কিন্তু ছেদীলালকে তিনি এই সব কাজের ভার দিতে সাহস করেন না, বোধ হয় একটু সঙ্কোচও হয়। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, নীচের তলার চাকরদের সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহাকে সোডার জল এবং চিংড়ির কাট্‌লেট আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়! নীচের তলার চাকর তাঁহার কাজে উপর-তলায় আসিলেও কোন গণ্ডগোল ঘটে না, কারণ তিনি সব নিয়মের ব্যতিক্রম। অসুবিধা এই যে, নীচের তলায় কোন কাজ থাকিলে সেটা না সারিয়া তাহারা উপরে আসিতে পারে না; কাজেই একটু-আধটু বিলম্ব হইয়া যায় এবং যে দিন বিলম্ব হয়, সে দিন তিনি ছেদীলালের নিয়োগের জন্য তাহার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়টির এবং ম্যানেজারের অদূরদর্শিতার অজস্র নিন্দা না করিয়া পারেন না।

কিন্তু একটা মাস আর ক'টা দিন! দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল। সে দিন ঘরে বসিয়া স্ত্রীকে চিঠি লিখিতেছিলাম। লিখিতেছিলাম, তোমরা তো প্রাণ বাঁচাইবার জন্য চার শ' মাইল দূরে সরিয়া গেলে, কিন্তু বোমাও পড়িল না এবং আমরা ঠিক আগের মতই বাঁচিয়া আছি·········

হঠাৎ দেখিলাম, ছেদীলালকে সঙ্গে করিয়া তাহার আত্মীয়টি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবস্রোতে বাধা পড়ায় একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি চাই?

উত্তর দিল ছেদীলালের আত্মীয় ধরমবীর।

ছেদী কাল ঘর জায়েগা।

আর কিছু বলিতে হইল না। ছেদীর প্রথম দিনের কথাগুলি মনে পড়িল। ব্যাগ খুলিয়া একটি টাকা ছেদীর হাতে দিলাম। ধরমবীর ছেদীলালকে লইয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

নিত্য বাবু তখনও আফিসে যান নাই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কাঠের পার্টিশান ভেদ করিয়া আমার চিঠি লিখিবার প্রেরণাটা একেবারে নষ্ট করিয়া দিল।

শুনিতে পাইলাম, নিত্য বাবু সদাগরী অফিসের বড়বাবু-সুলভ অপূর্ব্ব হিন্দী ভাষায় বলিতেছেন—ঘর যায়েগা তো আমার কি পিতৃ-মাতৃ দায় হ্যায়? এই সে দিন যুধিষ্ঠির বাড়ী গিয়া, তাকে বকশিস দিতে হুয়া, আবার এক মাস যেতে না যেতে বকশিস্! বলি, রূপেয়া কি কলকাতা সহরমে ছড়াছড়ি যাতা হ্যায়?

আর একটু কাণ পাতিয়া থাকিবার পর বুঝিতে পারিলাম, বড়বাবু ছেদীলালকে বকশিস্-স্বরূপ একটি একানী দিয়াছিলেন; ছেদীলাল এবং ধরমবীর তাহার বেশী কিছু প্রত্যাশা করাতেই এই অনর্থের সূত্রপাত।

বড়বাবুর মুখের কথা এবং ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দুই সমান। কাজেই ছেদীলালের ছলছল চোখ এবং ধরমবীরের অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইল না। একানীটা লইয়াই তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল। আর কারও ব্যবহার ঠিক এই রকম হইলে হয়তো আশ্চর্য্য হইতাম, কিন্তু বড়বাবু সম্বন্ধে আমার ধারণাটা কয় দিনে অভিজ্ঞতার পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে বলিয়া ব্যাপারটা বোধ হয় মনের উপর তেমন রেখাপাত করিতে পারিল না। চিঠির কাগজের প্যাডটা টানিয়া লইয়া আবার লিখিবার চেষ্টা করিতে বসিলাম।

রাত্রে খাইতে বসিয়া শুনিলাম, শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির কালই আসিয়া পৌঁছিবে এবং ছেদীলাল সকালের কাজকর্ম্ম সারিয়া তার আগেই চলিয়া যাইবে। ছেদীলাল আমাকে জল গড়াইয়া দিয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিবার আনন্দে তার মুখখানি আজ প্রফুল্ল দেখিব। কিন্তু তার মুখ-চোখ আজ আরও বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম বহিনের জন্য তার লালশাড়ী এবং খিলৌনা কেনা হইয়াছে কি না? ছেদীলাল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, নহি বাবুজী।

বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না। তাহার আত্মীয় ধরমবীর একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিল। তাহার মুখের দিকে এক বার ভয়ে ভয়ে চাহিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও ক্ষোভের সুর আমাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করিল।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, একবার তাহাকে কাছে ডাকিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সমস্ত দিনের খাটুনী এবং এক পেট ভাত বোঝাই করিবার পর শরীরটা যেন ঘুমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিবার উৎসাহ খুঁজিয়া পাইলাম না। ছেদীলাল ত কাল সকালেও থাকিবে, তখনই তাহাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রায় নটা বাজে। হয়তো আরও কিছুক্ষণ ঘুমাইতাম, কিন্তু নীচে তলা হইতে যে প্রচণ্ড কলরব শুনা যাইতেছিল, তাহারই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ-হাত ধুইতে নীচে নামিয়া দেখি, উঠানের মাঝখানে রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। প্রায় সব কয় জন বোর্ডার আসিয়া জড় হইয়াছেন, এমন কি নিত্য বাবু পর্যন্ত। নিত্য বাবুর মেদবহুল দেহ উত্তেজনায় কাঁপিতেছে; মোটা একটা লাঠি তিনি উঁচু করিয়া ধরিয়া আছেন—যেন এখনই সেটা কাহারও পিঠে পড়িবে!

ভিড় ঠেলিয়া কাছাকাছি পৌঁছিয়া দেখি, সেই চক্রব্যূহের মাঝখানে বসিয়া আছে ছেদীলাল। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ দুইটি তার লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। ম্যানেজার হইতে আরম্ভ করিয়া ধরমবীর এবং ঠাকুর-চাকরের দল সবাই ক্রুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি?

উত্তর দিলেন নিত্য বাবু।

—ব্যাপার ভয়ানক। আপনারাই আস্কারা দিয়ে ছোঁড়াটার মাথা বিগড়ে দিলেন কি না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিলাম।

নিত্য বাবু বলিতে লাগিলেন, আপনি কাল ব্যাটাকে এক টাকা বকশিস দিয়েছিলেন না? হারামজাদা কি করেছে জানেন? আজ শনিবার, বাড়ী যাব বলে নাতনীটার জন্য কতকগুলো খেলনা কিনে এনেছিলাম, ব্যাটা সকাল বেলা ঘর ঝাঁট দিতে ঢুকে বেমালুম সেগুলো চুরি করেচে। কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। বলিলাম, আপনি কোথায় ছিলেন?

নিত্য বাবু প্রায় দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া উত্তর দিলেন, কোথায় আবার থাকবো? পায়খানা সেরে আসতে একটু দেরী হয়েছিল, সেই সময়—

বলিলাম, ছেদী স্বীকার করেচে?

নিত্য বাবু বলিলেন, স্বীকার করলে তো হাঙ্গামা মিটেই যেত মশায়। কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই স্বীকার করবে না। এখন আমি কি করি বলুন দেখি? পাঁচ পাঁচটা টাকার খেলনা—একটা বড় পুতুল একটা এঞ্জিন, একটা এরোপ্লেন—

খেলনার তালিকা শুনিবার ধৈর্য্য ছিল না; ছেদীর কাছে গিয়া বলিলাম, তুম লিয়া হ্যায়?

ছেদী ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, নেহি বাবুজী।

তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, লিয়া হ্যায় তো দে দেও।

ছেদী আবার বলিল, নেহি লিয়া।

নিত্য বাবু আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, নহি লিয়া তো গেল কোথায়? ব্যাটা পাজী, চোর, বদমায়েস। ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, এখন আমি কি করি বলুন তো? বাড়ী গেলে নাতনীটা কেঁদেকেটে অনর্থ বাধাবে—ওঃ, কি ঝকমারিতেই পড়েছি মশাই!

বলিলাম, একটু চুপ করুন। আমি ওকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখচি! সঙ্গে করিয়া তাহাকে উপরে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। প্রথমে কিছুই বলিলাম না। টেবলের উপর যে কাগজপত্রগুলো পড়িয়াছিল, সেগুলো লইয়া অকারণে নাড়াচড়া করিতে লাগিলাম।

ছেদীলাল অপরাধীর মত মুখ হেঁট করিয়া, মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝিলাম, নিত্য বাবুর সন্দেহ মিথ্যা নয়! বলিলাম, খেলনাগুলো কোথায় রেখেছিস্ বার করে দে।

ছেদীলাল আগের মত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, নেহি লিয়া।

বলিলাম, হাম জান্‌তা তুম্ লিয়া হ্যায়। আপনা বহিনকে ওয়াস্তে লিয়া। যাও, বাবুকো দে দেও।

ছেদীলাল এবার প্রতিবাদ করিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিলাম, তার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, চোরি কিয়া কাহে?

ছেদীলাল এতক্ষণে প্রায় ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবুলোক বখশিস্ কাহে নহি দিয়া?

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে বখশিস্ দেয়নি তোকে?

উত্তরে ছেদী জানাইল যে, অধিকাংশ বোর্ডারই তাহাকে কিছু দেন নাই। যাঁহারা দয়া করিয়াছেন, তাঁহারাও এক আনা দুই আনার উপরে উঠিতে পারেন নাই। কারণ মাসের শেষ, এই সে দিন যুধিষ্ঠিরের জন্য কিছু খরচ হইয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটের উপর সে বেতনের পাঁচটি টাকা ছাড়া এক টাকা তের আনার বেশী সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই এক টাকা তের আনা এবং বেতনের পাচটি টাকা হইতে এক টাকা দস্তুরী হিসাবে কাটিয়া লইয়া তাহার ভেইয়া ধরমবীর তাহার হাতে ঠিক পাঁচটি টাকা গণিয়া দিয়াছে। এই পাঁচ টাকা তাহার রাহা-খরচেই ফুরাইয়া যাইবে, বিলাসিয়ার জন্য বুটিদার লালশাড়ী দূরে থাক, খেলনা সে কিনিবে কি করিয়া?

ধরমবীরের ব্যাপারটা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, সে তোর টাকা কেটে নিল কেন?

ছেদীলাল বলিল, ওহি তো কামমে লাগায় দিয়া।

সুতরাং কমিশান-হিসাবে এক টাকা তের আনা কাটিয়া লইবার অধিকার তাহার আছে। কাহারও সরলতার সুযোগ লইয়া মানুষ যে এত নীচে নামিয়া যাইতে পারে, সে কথা আগে জানিতাম না। ছেদীলালের উপর বিষম রাগ হইল। কিন্তু বলিলাম, কারও দয়ার ওপর তো তোর জোর নেই, তা ছাড়া তোরই ভাই টাকা কেটে

নিয়েচে। কার ওপর রাগ করে তুই খেলনা চুরি করেচিস্? যা নিয়ে আয় ওগুলো—

ছেদীলাল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া গেল। আমি জানিতাম, খেলনাগুলো ফিরাইয়া দিতে তার যে কষ্ট হইবে চুরির অপবাদের চেয়েও সেটা অনেক বেশী। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে জিনিষগুলো তার ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত। ছেদীলালের বোন বিলাসিয়ার খেলনা না পাওয়ার দুঃখটা নিতান্তই পরোক্ষ ব্যাপার, কিন্তু নিত্য বাবুর নাতনী যে খেলনা না পাইলে রীতিমত অনর্থ বাধাইবে, সে কথা এইমাত্র নিত্য বাবুর মুখে শুনিয়া আসিলাম। নিত্য বাবু পয়সাওয়ালা লোক, তিনি ঘরে বসিয়া মদ্য পান করিলে বোর্ডিংএর সুনাম হানি হয় না; পরের ঘর হইতে সিগারেট বা টুথপেষ্ট তুলিয়া লইয়া গেলে সৌজন্য বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু ছোটলোক ছেদীলাল—

কিছুক্ষণ পরে ছেদীলাল ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ময়লা কাপড়ে জড়ানো কাঁচকড়ার একটা বড় পুতুল, টিনের এঞ্জিন ও রেলগাড়ি, একটা এয়ারোপ্লেন, দুটো কাঠের বল—

বলিলাম, যা, দিয়ে আয়।

ছেদীলাল ঘাড় নাড়াইয়া বলিল, নেহি সকেগা। অর্থাৎ সে পারিবে না।

কেন পারিবে না, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। দেখিলাম, তার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে। বুঝিতে পারিলাম, এই খেলনাগুলি বিলাসিয়ার সামনে সাজাইয়া ধরিলে সেই পাঁচ বছরের মেয়েটার মুখ কি গভীর বিস্ময় আর আনন্দে ভরিয়া উঠিত, তাহারই কল্পনায় সে এতক্ষণ নির্ব্বিবাদে সকলের কটূক্তি ও ধমক সহ্য করিয়াছে। কেবল আমার সম্বন্ধে তার মনে কোথায় যেন একটু দুর্ব্বলতা ছিল, তারই খাতিরে সে আমার কথায় 'না' বলিতে পারে নাই। এখন সেই খেলনাগুলিই নিজের হাতে নিত্য বাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলাম, তুই এটা রাখ। আমি খেলনাগুলো নিত্য বাবুকে দিয়ে এসে তোর বোনের জন্যে খেলনা আর কাপড় কিনে দেব।

ছেদীলাল ঘাড় নাড়াইয়া বলিল, নেহি বাবুজী, ও হাম নহি লেগা।

ভাবিয়াছিলাম, এটা তার অভিমানের কথা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্যই তাহাকে রাজী করিতে পারি নাই।

ছেদীলাল চলিয়া যাওয়ার পর দরমবীরের কাছে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাহার নামে একটা পার্শেল পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

দেহ ও চরিত্রে কুল-সংক্রমণ

কুল-সংক্রমণের ইংরেজী প্রতিশব্দ হেরিডিটি (heredity) কথাটিই বোধ হয় আমাদের নিকট অধিক পরিচিত। পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে নানা দোষ-গুণ পুত্রকন্যার মধ্যে স্বতঃই সংক্রমিত হয় বলিয়া বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে জানা আছে। ইহারই ফলে বিবাহাদি কার্য্যে কৌলীন্য এবং বংশ-পরিচয় লইয়া এত বাঁধাবাঁধি। অবশ্য সামাজিক জীবনে ইহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক গণ্ডী ছাড়াইয়া শুধু করণীয় অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; উপরন্তু, কুল-সংক্রমণের প্রকৃত তথ্য সে-যুগে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জানা ছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

ধারাবাহিক ভাবে জীব-বিজ্ঞানের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে,—চার্লস্ ডারউইন, টমাস্ হেনরী হাক্সলী-প্রমুখ বিবর্ত্তনবাদীদের (evolutionists) অক্লান্ত পরিশ্রমে। চার্লস্ ডারউইনের পিতামহ ইরাস্মাস্ ডারউইনও এক জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রকৃতিবাদী (naturalist) ছিলেন। সেই অবধি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এ-দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে জীব-বিজ্ঞানে প্রচুর মূল্যবান্ তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে। গ্যালিলিও বা কোপার্নিকাসের ন্যায় ইহাদিগকেও বহু সামাজিক নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল; কারণ, এই সময় সকলের (বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ও সমাজপতিদের) বিশ্বাস ছিল যে, নক্ষত্র-জগৎ ও জীব-জগৎ সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। ফলতঃ, জীববিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগকে ঈশ্বর-বিদ্বেষী বলিয়াই মনে করা হইত। যাহা হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে জীববিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ করে; কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীরও এই সময়ে বহু পরিবর্ত্তন ঘটে।

কুল-সংক্রমণ সম্বন্ধে অনেকের এখনও নানা প্রকার ধারণা আছে। কেহ মনে করেন, পিতা বা মাতার বংশ হইতে সন্তানগণ স্বতঃই সমস্ত দোষগুণ পাইয়া থাকে; আবার কেহ মনে করেন, কুল-সংক্রমণের ধারণাটি সর্ব্বৈব ভুল! যে-ছেলে যেমন ভাবে মানুষ হয়, সে সেই রকমই হয়। উভয় ধারণাই বিশ্বাসের গোঁড়ামি মাত্র। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইব, প্রথম—শারীরিক বা গঠনগত; দ্বিতীয়তঃ চরিত্রগত কুল-সংক্রমণ।

শারীরিক বা গঠনগত কুল-সংক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। ছেলে-মেয়েদের মুখের আদল বাপ মা পিসী মাসীর মতন হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আবার অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের মুখে তাহাদের ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুমার ছেলেবেলাকার মুখের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পান। শুধু মানুষের বেলাই নয়, জীবজন্তু

উদ্ভিদ্ এবং ফল-ফুলের বর্ণ, আকৃতি, ওজন প্রভৃতি দৈহিক বৈশিষ্ট্যে তাহাদের পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষদের গঠনের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গৃহপালিত গাভী, বিলাতী কুকুর, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ইত্যাদির বংশ-তালিকা ক্রেতা-বিক্রেতা ও রেশ-খেলোয়াড়গণ বিশেষ যত্নসহকারে বিচার করিয়া থাকেন। মানব-দেহের গঠন, মুখের ভাব, চিবুকাস্থি ও নাকের গঠন, মাথার খুলি বা করোটির আকৃতি, দেহের বর্ণ প্রভৃতি খুব ব্যাপক ভাবে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতির দৈহিক গঠনের বিশিষ্টতা এবং বংশ-পরম্পরায় ঐ সকল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মূল নীতির উপরেই পৃথিবীর জাতিবিভাগ (আর্য্য, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি) স্থাপিত।

স্বাভাবিক ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় দেহাবয়ব যেমন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়, মিশ্রজাতির উদ্ভবের ফলেও তেমনি নানারূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে মিশ্রপ্রজনন বা Cross-breeding তথ্য বিশেষ মূল্যবান্। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অষ্ট্রীয়াবাসী মেণ্ডেল (Mendel) মিশ্র-প্রজনন সম্পর্কে গবেষণা করিয়া কুল-সংক্রমণ বিষয়ে বহু মূল্যবান্ তথ্যের এবং সূত্রের আবিষ্কার করেন।

মেণ্ডেল পরীক্ষা আরম্ভ করেন বিভিন্ন শস্যাদি ফুল-ফল মক্ষিকা কীটপতঙ্গাদি লইয়া। জনক ও জননীর কোন একটি বৈশিষ্ট্য মধ্যবর্ত্তী শক্তি লইয়া সন্তানে সংক্রামিত হয়। তিনি ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফুলের পরাগ স্পর্শে নূতন বংশশ্রেণীর আবির্ভাব হয় এবং দেখা যায়, বড় ও ছোট জাতের ফুলের মিশ্রণে যে-সকল ফুল প্রথম বংশে উৎপন্ন হয়, সেগুলি হয় মাঝারী আকারের। আবার এই মাঝারী আকারের হইতে দ্বিতীয় পুরুষে যে সকল ফুল উৎপন্ন হয় সেগুলি হয় ভিন্ন জাতের; পিতামাতার ন্যায় মাঝারী এবং পিতামহ পিতামহীর ন্যায় ছোট ও বড়। এইবার অনেক সময় পিতামহ পিতামহীর বৈশিষ্ট্য অধিকতর শক্তি লইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে। নানা শ্রেণীর মোরগ, ইন্দুর প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মেণ্ডেলীয় নিয়ম বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়,—শুধু আকৃতিতেই নয়, ওজন, বর্ণ, আয়ুষ্কাল প্রভৃতিতেও। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক পুরুষ পরে পূর্ব্বতন কোন পুরুষের বৈশিষ্ট্য অকস্মাৎ অত্যন্ত স্পষ্টাকৃতি লইয়া প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। ইহাকে পূর্ব্বানুকরণ বা atavism বলে।

এই সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যেমন কুল-সংক্রমণের ধারা সহজে বুঝা যায়, যুগব্যাপী ধীর, ক্রম-বিবর্ত্তন ধারা হইতেও তেমনি কুল-সংক্রমণ তথ্যের সুস্পষ্ট সমর্থন পাই। তবে ইহার মধ্যে দুইটি তথ্য পাশাপাশি আছে; কুল সংক্রমণের প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেকে মনে করেন যে, এই দু'য়ের একটি সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। জীববিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ দৈহিক গঠনে এখনকার মত ছিলেন না, তখনকার অবস্থানুযায়ী কতকগুলি গঠন ভিন্ন ধরণের ছিল। কঠিন খাদ্যাদি চর্ব্বণের উপযোগী বৃহত্তর দন্ত, দীর্ঘতর চিবুকাস্থি, রৌদ্রাতপে চলিবার উপযোগী লোমশ দেহ, দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য্য ইত্যাদি প্রয়োজনানুযায়ী ছিল। কালক্রমে সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তদনুসারে দেহ-গঠনের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তন পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ধারাবাহিক ভাবে সংক্রমিত ও সংরক্ষিত হয়।

আবার আরও স্পষ্ট ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বুঝিতে পারা যায় বিভিন্ন ভূভাগের মানুষ, জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর সমস্ত আলোচনা করিলে। অবস্থা-ভেদে গৃহপালিত পশুপক্ষীর সহিত বন্যগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তারতম্য দেখা যায়। এগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুস্পষ্ট ছাপ। অল্প-ব্যবহারে বা অতি-ব্যবহারে অঙ্গবিশেষ হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। পেঙ্গুইন প্রভৃতি সামুদ্রিক পক্ষী সাধারণতঃ অত্যন্ত নির্জ্জন মেরুপ্রদেশে বাস করে এবং সেখানে সচরাচর জীবজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় না থাকায় অনতি-ব্যবহারে তাহাদের পক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের উড়িবার ক্ষমতাও অতি সামান্য। অবস্থা-বৈচিত্র্যের প্রভাব ও কুল-সংক্রমণ উভয়ের মিশ্রক্রিয়ায় জীব-বিবর্ত্তন-নিয়ন্ত্রিত।

কুল-সংক্রমণ ও দৈহিক সাদৃশ্যের ধারাবাহিক বিবর্ত্তন নানা ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করিলেন, বাস্তবিক কি উপায়ে এই সকল দৈহিক বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত হয়। এ কথা স্বতঃই অবশ্য পরিস্ফুট যে, কোন-না-কোন প্রকারে এই সকল বৈশিষ্ট্যের বীজ পিতা ও মাতার দেহস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (cell) ও জৈবনিকের (protoplasm) মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু ঠিক কোথায় কি ভাবে আছে এবং কি উপায়ে সংক্রমিত হয়, তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

আমাদের দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। অনুবীক্ষণের সাহায্যে এই সকল কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে এক প্রকার গাঢ় তরল পদার্থ থাকে, তাহাকে বলে জৈবনিক। তাহার মধ্যে আরও একটি ছোট কণিকা ভাসমান। ইহাতে ক্রোমেটিন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। জীবদেহের ক্ষয় পূরণের জন্য কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি সর্ব্বদা আবশ্যক। কোষগুলি আপনা হইতেই একে একে দ্বিখণ্ডিত হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবদেহের ক্ষয় পূরণ করে। কোষ-কণাটি দ্বিখণ্ডিত হইবার সময় তন্মধ্যস্থ ক্রোমেটিনও দ্বিধা-বিভক্ত হয়। এই সময় ক্রোমেটিন কণিকাটি লম্বা লম্বা সূতার আকারে কদমফুলের রূপ ধারণ করে; পরে সমান ভাগে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দ্বিধাভগ্ন কোষের দুই অংশে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি ক্রোমেটিন-সূত্রের গঠন মালার ন্যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার সমষ্টি। দানাগুলির অবস্থান, সজ্জা ও বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, ইহাদের উপরই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিতেছে।

সন্তানের দেহ-কোষের মধ্যে যে সকল ক্রোমেটিন সূত্র বা ক্রোমোসম (chromosom) থাকে, তাহার প্রত্যেকটিতে মাতার অর্দ্ধেক ও পিতার অর্দ্ধেক ক্রোমোসমের অনুরূপ ক্রোমোসম থাকে। সন্তান-সৃষ্টির প্রাক্কালে জনক ও জননীর দেহ-কণিকার প্রথম সংযোগ ও পরবর্ত্তী দ্বিধা-বিভাগের সময় ক্রোমোসমেরও সমান ভাগে আধা-আধি ভাগ হয়। এই ভাবে সন্তানের প্রত্যেকটি দেহকোষ পিতা ও মাতার ক্রোমোসম অর্দ্ধাঅর্দ্ধি লাভ করে। এইরূপে পিতা-মাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততিতে ক্রোমোসম দ্বারা সংক্রমিত হয়। আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পিতা মাতার ক্রোমোসম-গুলি পিতামহ পিতামহী ও মাতামহ মাতামহীর ক্রোমোসম হইতে

উৎপন্ন। এই কারণে বংশগত সাদৃশ্যের সংরক্ষণ ও পূর্ব্বজানুকরণ সম্ভব।

কিন্তু কুল-সংক্রমণের ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রেই অলঙ্ঘনীয় চরম কথা বলিয়া ধরিলে ঠিক হইবে না। অনেক ক্ষেত্রে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা জন্মগত ও বংশগত গঠনে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্যবান্ পিতা-মাতার সন্তান স্বভাবতঃ সুস্থ সবল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অনিয়মে অযত্নে তাহার ভাবী স্বাস্থ্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আবার স্বভাবতঃ রুগ্ন প্রকৃতির পিতা-মাতার সন্তানের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভঙ্গুর হওয়া স্বাভাবিক হইলেও উপযুক্ত খাদ্য ও ব্যায়ামাদির সাহায্যে তাহার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করা সম্ভব।

দৈহিক সাদৃশ্য ও কুল-সংক্রমণ আলোচনার পরে এখন দেখিব, মানসিক, চারিত্রিক ও শিক্ষাগত কৌলীন্য কি পরিমাণে সংক্রমিত হয়। এই স্থলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাব সচরাচর এত প্রবল থাকে যে, নির্ভুল বিচার করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা কেবল মাত্র আবেষ্টনীর প্রভাবে আস্থাবান্, তাঁহারা বলেন, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বাপ-মা-কাকার মতো হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, তাহারা তাহাদের আবহাওয়াতেই সাধারণতঃ মানুষ হয়। বলা বাহুল্য, পিতামাতা হইতে শিশুদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া নিছক কুল-সংক্রমণের প্রভাব পরীক্ষা করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। তবে বর্ত্তমানে আমেরিকায় ঐরূপ পরীক্ষারও চেষ্টা চলিতেছে।

মানসিক বৃত্তিও যে কিছু পরিমাণে বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূল কারণ এই যে, দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ, নিছক বস্তুগত ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় মস্তিষ্ক, স্নায়ু, কোষ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গঠনে বিশেষ বিশেষ মনের উৎপত্তি হয়। অতএব দৈহিক কুল-সংক্রমণ সত্য হইলে মানসিক কুল-সংক্রমণও সত্য হইবে। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ, মস্তিষ্ক স্নায়ু-কোষাদির গঠনের সঙ্গে মানসিক বৃত্তির কি সম্বন্ধ, বৈজ্ঞানিকগণ এখনও তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। মানুষের মন গড়িয়া ওঠে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও সঙ্গী-সাথী আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারের ধারায় শিশুদের মত অবস্থানুযায়ী গড়িয়া ওঠে। এই সময় শিশুর প্রতি অন্যের ব্যবহার অনেকটা নির্ভর করে তাহার শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর। ইহার চরম উদাহরণ যমজ সন্তান। দৈহিক গঠন ও স্বাস্থ্য একই প্রকার হইলে কর্ম্মক্ষমতাও অনেকটা অনুরূপ হয়, এবং কাজের মধ্য দিয়া মনও অনুরূপ ভাবে গড়িয়া ওঠে।

দৈহিক অপেক্ষা মানসিক কুল-সংক্রমণের ব্যাপারটি অধিকতর প্রচ্ছন্ন। দেহগত সৌসাদৃশ্যের মধ্য দিয়া পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষের অসংখ্য গুণাগুণের সম্ভাবনার (Potentialities) বীজ সন্তানের মধ্যে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে লুপ্ত থাকে। অবস্থা-বিশেষে শিক্ষা, অভ্যাস ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়া কয়েকটি অংশ মাত্র প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে। এই কারণে স্বভাব-চরিত্রকে অনেক সময় অর্জ্জিত আখ্যা (acquired character) দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, গণিতজ্ঞ পিতা কখনও আশা করিতে পারেন না যে, তাঁহার পুত্র বিনা শিক্ষায় কেবল মাত্র কুল-সংক্রমণের প্রভাবে গণিতে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিবে; জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষা, রুচি, আচার-ব্যবহার সকলই শিক্ষণীয় ও অর্জ্জনীয়।

যদি বংশগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, ভালোই; কিন্তু তাহাকে সুশিক্ষার স্বাভাবিক উপাদান বলিয়াই মনে করিতে হইবে। তখন আত্মীয়-স্বজনদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—কি উপায়ে এই সকল বীজ অঙ্কুরিত করিয়া মহীরুহে পরিণত করা যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে সকল শিশুর মধ্যেই অসংখ্য দোষ-গুণের বীজ থাকে। সঙ্গী-সাথী ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিচালনানুযায়ী অনেক শিশুই ভবিষ্যতে বেশ ভালো বা খারাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ক্লাসে অনেক গাধা ছেলে দেখিতে পাইলেও শিক্ষক মহাশয়দের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃত গাধা বা হাবার (idiot) সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। জন্মান্ধ বা বিকলাঙ্গ-সন্তান যেমন অল্পই প্রসূত হয়, হাবা গাধাও তেমনি অল্প জন্মায়; তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। অন্য দিকে মনীষীর (genius) সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প। কিন্তু সাধারণ ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে পারিলে তাহাদের নিকট হইতে প্রচুর সম্ভাবনা লাভ হয়। প্রথমেই আত্মীয়-স্বজন শিক্ষক ও গুরুজনদের গুরুতর দায়িত্ব।

শ্রীকমলেশ রায় (এম, এস্-সি)

বর্ত্তমান

ফেনিল অম্বুধি-তীরে সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি-পানে
তাকাইয়া নিষ্পলকে; বর্ণালীর অযুত কামনা
সজাগ অন্তরে তব। ওগো বীর প্রদীপ্ত-নয়না,
কটাক্ষে বিজিত দেশ, রাজ্য কত ভরে জয়-গানে!

রঙীন বাসনা কত জন্ম লয় তোমার ইঙ্গিতে
হইতেছে সব। ঋণজীবী তুমি, অজস্র সম্পদ
ভবিষ্যের বক্ষ হতে লহ সব,—রাজ্য জনপদ
অবহেলে দিয়ে যাও মহাকাল প্রাচীন অতীতে।

তোমার কালের রথ ছুটে চলে বিজয়-গরবে
দুর্ব্বার গতির বেগে। ধরণীর কুঞ্জোদ্যান ভরি'
তব তুষ্ট বর-দানে মুঞ্জরিয়া উঠে কল্পতরু,—
ত্রিনয়ন-বহ্নি-দাহে মহা পৃথ্বী হয় শুষ্ক মরু!

অতীত-ভবিষ্য-মাঝে বহে দোঁহা অভিষিক্ত করি'
তোমার নির্ঝর-ধারা;—তব জয় গাহে সবে স্মরি'।

কে, এম, শমশের আলি (এম-এ)।

ঢাকা নগরীর জন্মকথা

সকলেই জানেন, কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব। কিন্তু বঙ্গের দ্বিতীয় নগরী ঢাকার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইহার প্রতিষ্ঠা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সহকারে সম্পন্ন হয় নাই,—ইহা আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহই নগরী-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই স্থানে আগমন করেন নাই এবং এই উদ্দেশ্যে কাহাকেও চেষ্টা-চরিত্র কিছুমাত্র করিতে হয় নাই। কথাটি বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এই প্রবন্ধে আমরা সেই চেষ্টাই করিব।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই রাজমহল-যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাঙ্গলার শেষ সুলতান দায়ুদ মোগলগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। বঙ্গদেশ নামে মোগলদের শাসনাধীন হইয়া মোগলরাজশ্রেষ্ঠ আকবরের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই দিন হইতেই রাজাহীন এই বাঙ্গলাদেশের নেতাহীন সামন্তবর্গের সহিত প্রবল-প্রতাপ মোগল সম্রাট আকবরের সেনানায়কদিগের দীর্ঘ-কাল স্থায়ী কঠোর সংগ্রামের সূচনা হইল। এই সামন্তগণই সাধারণতঃ ভূঞা নামে পরিচিত এবং এই যুগটি এই জন্য বারভূঞার আমল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'বার' কথাটির এই স্থানে বিশিষ্ট কোন অর্থ নাই। কারণ, যে সকল সামন্ত এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় নিশ্চয়ই 'বার' জনের বেশী ছিলেন। হিন্দু মুসলমান সামন্তগণের স্বাধীনতা রক্ষার এই অদ্ভুত এবং সুদীর্ঘ প্রয়াস ঐতিহাসিকগণের হস্তে উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করে নাই। ডঃ স্মিথ সাহেব তাঁহার সম্রাট আকবর সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। বঙ্গীয় সামন্তদের বীরত্বের এই কাহিনী ঐতিহাসিকগণ যে অন্যায় রকমে উপেক্ষা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে শুধু একটি স্থল উদ্ধৃত করিতে চাহি। "সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর (১৫৭৫-১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যাপী বঙ্গীয় সামন্তবর্গের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঐতিহাসিকদিগের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতা-রক্ষার্থে আজীবন প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাট আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। কিন্তু বাঙ্গলার স্বাধীনতা-সমরে যে সমস্ত ভৌমিক মৃত্যু পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—কি অপরাধে আমরা তাঁহাদিগকে আজ ভুলিয়া গিয়াছি? তাঁহারাও তো একই প্রকারের বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! রাণা প্রতাপের সহিত যে মোগল সেনাপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, বাঙ্গালীরাও তাঁহাদের সহিতই যুঝিয়াছেন। রাণা প্রতাপের বল ছিল অশ্বারোহী সৈন্যে, আর বাঙ্গালীদের বল ছিল রণতরী-সমূহে। এই বাঙ্গালী ভৌমিকগণ পুনঃ পুনঃ মোগল সেনানায়কদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। অবশেষে বহু বৎসর যুদ্ধের পর ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশ মোগলগণকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। বঙ্গসন্তানগণের সাহায্যেই বাঙ্গালী ভৌমিকগণ বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষার্থে এইরূপে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য ভাড়া করিয়া নেপাল বা রাজপুতানা হইতে সৈন্য আমদানী করিতে হয় নাই।"

আমি এই অদ্ভুত স্বাধীনতা-সমরের প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনা কালানুক্রম-অনুসারে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১১ই জুলাই—১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ—রাজমহল যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাঙ্গলার সর্ব্বশেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদের শিরশ্ছেদ এবং খাঁ জাহান বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ—ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলীর নেতৃত্বে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে আফগানগণের বিদ্রোহ। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার সীমা পর্য্যন্ত খাঁ জাহানের অগ্রসর হওয়া এবং আফগান-হস্তে নিদারুণ পরাজয়।

১৫৭৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাস—খাঁ জাহানের মৃত্যু।

১৫৮০ খ্রীঃ এপ্রিল মাস—পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মুজঃফর খাঁ বিদ্রোহ দমনের চেষ্টায় বিদ্রোহী আফগানগণ কর্ত্তৃক নিহত। বাঙ্গলাদেশে মোগল শাসনের অবসান। নূতন শাসনকর্ত্তা খান্-ই-আজমের বাঙ্গলাদেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দুর্ব্বল প্রচেষ্টা।

১৫৮৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাস—বিদ্রোহী আফগান ও মোগলগণে টাঁড়ার নিকট ঘোরতর সংগ্রাম। খান-ই-আজমের বিদ্রোহ-দমনে অসমর্থতা ও বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ। খান-ই-আজমের পর সাহাবাজ খাঁ ও তাহার পর ওয়াজির খাঁর বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ। উভয়েরই বিদ্রোহ-দমনে বিফলতা।

১৫৯৪ খ্রীঃ মে মাস—মানসিংহের বাঙ্গলার সুবাদার পদে নিয়োগ।

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস—মানসিংহের টাঁড়া পরিত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া বাঙ্গলার তদ্ধব ভৌমিকগণের বাঙ্গলার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরীকরণ।

১৫৯৫—১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ—মানসিংহ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলী ও বিক্রমপুরের প্রতাপশালী কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে রত, কিন্তু বিশেষ সাফল্যের অভাব।

১৫৯৭ খ্রীঃ মার্চ্চ মাস—মানসিংহের পুত্র হিম্মৎ সিংহ নিহত।

১৫৯৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাস—মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ বিক্রমপুরের অদূরে ঈশা খাঁর সহিত নৌযুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত। সুবাদার মানসিংহ বিদ্রোহী হস্তে বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া দিয়া দেশ ত্যাগ করেন। বাঙ্গলাদেশে তাই এই সময়ে মোগল শাসনকর্ত্তা আর কেহ রহিল না।

১৫৯৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাস—ঈশা খাঁর মৃত্যু।

১৫৯৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাস—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের মৃত্যু।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ—বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত মানসিংহ আবার সুবাদাররূপে বাঙ্গলাদেশে প্রেরিত এবং সামন্তগণের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ও কিয়দংশে কৃতকার্য্য।

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ—বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায় যুদ্ধে নিহত

মানসিংহ অতঃপর বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন ও আকবরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার-ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ—আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ।

১৬০৬ খ্রীঃ—মানসিংহ সুবাদাররূপে পুনঃপ্রেরিত এবং দশ মাস কর্ম করিয়া প্রত্যাবৃত্ত।

১৬০৬ খ্রীঃ—কুতবুদ্দিনের শাসনকর্তা হইয়া বঙ্গদেশে আগমন এবং বর্দ্ধমানে শের আফগান কর্তৃক নিহত। বাঙ্গলাদেশে পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস—বাঙ্গলাদেশের শাসনকর্তার পদে ইসলাম খাঁর নিয়োগ।

সম্রাট্ আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বে বাঙ্গলাদেশ মোগলশাসনের কি পরিমাণ অধীনে ছিল, উপরে সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী হইতেই পাঠকগণ সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন।

দায়ুদের পিতা সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী গৌড়ের অদূরে অবস্থিত টাঁড়া বঙ্গের রাজধানী হয়। বঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ফলে মহামারীতে গৌড় নগরী ধ্বংস হইয়া গেল এবং বঙ্গদেশ হইতে মোগল-শাসনের সামান্য অবশেষও লুপ্ত হইল। ইহার পর রাজধানী টাঁড়াতে স্থানান্তরিত হইল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানসিংহ উহা রাজমহলে অর্থাৎ আরও পশ্চিমে বিহার সীমান্তে স্থানান্তরিত করিলেন। সুতরাং ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইসলাম খাঁ আসিয়া যখন বঙ্গ-শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন বাঙ্গলার রাজধানী বঙ্গদেশের স্বাভাবিক সীমার বাহিরে ছিল। দেশের রাজধানী দেশের সীমানার মধ্যে ফিরাইয়া আনার ভার ইসলাম খাঁর উপর পতিত হইল। ইসলাম খাঁর শাসনকালের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্যারী নগরীর "বিব্লিওথেক ন্যাশানেল" পুস্তকাগারে রক্ষিত মিজ্জা নাথনের প্রসিদ্ধ পুস্তক বাহারীস্তান-ই-ঘায়বী হইতে জানা গিয়াছে। এই পুস্তকখানি আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পারসী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ আসাম বিভাগের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকটির অনুবাদ ও প্রকাশ ব্যাপারে আমি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলাম। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত ইসলাম খাঁর দ্বন্দ্বের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমরা এই পুস্তক এবং অন্য এক আকর হইতে প্রায় দিন হইতে দিন অনুধাবন করিতে পারি। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল :—

(১) পাবনা জিলার অন্তর্গত শাহজাদপুর ও চাটমোহর। এই চাটমোহরেই মাসুম-খাঁ কাবুলী নামে জনৈক বিদ্রোহী নায়কের রাজধানী ছিল।

(২) কতিপয় হিন্দু জমিদারের অধীনে ঢাকা জিলার ধলেশ্বরী নদীর উভয়-তীরবর্ত্তী সিন্দুরী, খলসী ও চাঁদপ্রতাপ পরগণা। এই জমিদারগণের কয়েক জনের নাম বাহার-ই-স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) গাজী জমিদারগণের অধীনে অধুনা ঢাকা জিলার অন্তর্গত সুলতানপ্রতাপ, সেলিমপ্রতাপ, কাশিমপুর ও ভাওয়াল পরগণা।

(৪) ঈশা খাঁর পুত্রগণ, উসমান এবং কতিপয় ভৌমিকগণের অধীনে ঢাকা জিলার অবশিষ্টাংশ, ময়মনসিংহ জিলা এবং ত্রিপুরা। এই জন্য ইসলাম খাঁকে স্বতঃই স্বাধীনতাকামী ভৌমিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে এই অঞ্চলের দিকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

ঈশা খাঁর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকগণের বিস্ময়কর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা পাঠ করিতে চহেন, তাঁহারা মূল বাহার-ই-স্তান গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পাঠ করিবেন। অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার বাহার-ই-স্তান অবলম্বন করিয়া অনেক বছর আগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন ; সেই প্রবন্ধগুলিও পঠিতব্য। বাহার-ই-স্তানের গ্রন্থকার মির্জ্জা নাথন এই দীর্ঘ অভিযানের এক জন ক্ষুদ্র সেনানায়ক ছিলেন, এবং নিজের চোখে দেখিয়া সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। ঢাকা নগরীর জন্মকথার অনুধাবনে সেই দীর্ঘ বিবরণ অনুসরণ করায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। মোটামুটি ঘটনাগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দক্ষিণবঙ্গের প্রভূত ধন ও বলশালী ভৌমিক প্রতাপাদিত্যের মতিগতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া ইসলাম খাঁর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই আমলে প্রতাপাদিত্যের মত অর্থ ও জনবলে বলী ভৌমিক বাঙ্গলায় আর দ্বিতীয় ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল পনর লাখ টাকা ; তাঁহার পদাতিকের সংখ্যা ছিল ২০০০০ এবং তাঁহার যুদ্ধ-নৌকা ছিল সাত শত।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইসলাম খাঁ আসিয়া রাজমহলে উপনীত হন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার পুত্র সংগ্রামাদিত্য ও মন্ত্রী সেখ বাদীর মারফত প্রচুর উপহারাদি রাজমহলে পাঠাইয়া এই নব-নিযুক্ত সুবাদারের অভ্যর্থনা করিলেন। দক্ষিণের বিষয়ে এইরূপে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া ইসলাম খাঁ পূর্ব্বদিকে বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজশাহী জেলার নাটোরের নিকটস্থ বজ্রপুর নামক স্থানে যশোররাজ প্রতাপাদিত্য এবং ভূষণারাজ শত্রাজিৎ আসিয়া ইসলাম খাঁর সহিত দেখা করিলেন (এপ্রিল—১৬০৮) এবং সমস্ত রকম সহায়তায় প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতাপাদিত্যের নামের চারি দিকে বহু উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এক জন জাতীয় বীরের আমাদের বড় প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই আন্দোলনে কোন কোন নেতার প্রতাপাদিত্যকে প্রকাণ্ড স্বদেশহিতৈষী বীর বানাইয়া তুলিলেন। অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে দেশে প্রতাপ-জয়ন্তীর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই উৎসবকামিগণ কি ইতিহাসের নব্যতর সিদ্ধান্তগুলির কিছুমাত্র খবর রাখেন না? প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য বাঙ্গলার শেষ সুলতান দায়ুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উৎকোচস্বরূপ মোগলের নিকট হইতে যশোর জমীদারী লাভ করেন। আজীবন তিনি মোগল পক্ষের লোক ছিলেন এবং প্রতাপাদিত্যও যে মোগল পক্ষের ভৌমিক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতাকামী হিন্দু মুসলমান ভৌমিকগণ যখন প্রাণপণে ইসলাম খাঁকে বাধা দিবার জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন, তখন প্রতাপাদিত্য পুত্র ও মন্ত্রী পাঠাইয়া নবনিযুক্ত সুবাদারকে রাজমহলে অভ্যর্থনা-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। কিছু দিন পরে নিজে আসিয়া তিনি বজ্রপুরে সুবাদারের সহিত দেখা করিলেন এবং প্রচুর সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া গেলেন। পরে অপ্রচুর সাহায্য প্রেরণের অপরাধে ইসলাম খাঁ যখ

...চার করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করিলেন, তখন তিনি প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন মন্দ নয়, কিন্তু কোন যুদ্ধেই সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল-কথিত মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয়ের কাহিনী যে একেবারেই মিথ্যা, ইসলাম খাঁর সেনাপতিগণের হস্তেই যে তিনি পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এই সত্যও বহু বার প্রচারিত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীনপন্থী অনেকের নব্যতম ঐতিহাসিক গবেষণার উপর, বিশেষতঃ বাহার-ই-স্তানের উপর সংশয়-কণ্টকিত দৃষ্টি যাইতে চাহে না! বাহার-ই-স্তান অনূদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক গ্রন্থশালায়ই উহা প্রাপ্তব্য। পাঠ করিয়া দেখিলে পাঠকমাত্রেই এই যুগের ইতিহাসের একটা সত্য ধারণা লাভ করিবেন এবং একখানি অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

ইসলাম খাঁ বাঙ্গলাদেশে সুবেদার হইয়া আসিলে প্রতাপাদিত্য নিজের পুত্র ও মন্ত্রীকে পাঠাইয়া রাজমহলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বয়ং নাটোরের নিকটস্থ বজপুরে যাইয়া সুবেদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান ভৌমিকগণ কিন্তু তাঁহার অন্য রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকগণ ভীমরুলের মত চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। পাবনা জেলায় শাহজাদপুর ও চাটমোহর অঞ্চলে অবিরাম ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ হইতে লাগিল। ভৌমিকগণের নায়ক ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁর জমীদারীর দিকে অগ্রসর হইতে হইলে বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় প্রবেশ করা আবশ্যক ছিল। স্থল-সৈন্য ও যুদ্ধ-নৌকার বহর সহ ইসলাম খাঁ ... ছাড়িয়া আত্রেয়ী দিয়া করতোয়াতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ... করতোয়া হইতে ঢাকা জেলার দক্ষিণ প্রান্তবাহিনী ইছামতী ...তে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। অমনি ভৌমিকগণের সহিত ...নক যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

এই যুদ্ধ বুঝিতে হইলে এই আমলে এই অঞ্চলের নদীগুলির গতি ...প ছিল, সে-একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন পদ্মার কীর্ত্তিনাশা অংশ তখন ছিল না, ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ...মার যাত্রাপুর নামক বিখ্যাত বন্দরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ...জা দক্ষিণে বহিয়া আড়িয়াল খাঁ খাত দিয়া পদ্মা সাগরে চলিয়া ...ত। এই আমলে ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাঙ্গ মেঘনার সহিত উহার দেখাই ...ত না। ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তমানে পাবনা-ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী জিনাই বা ...া খাতে প্রবাহিত,—সেই আমলে উহা ময়মনসিংহ, হোসেনপুর, ...রসিন্ধু হইয়া ভৈরববাজারে মেঘনার সহিত মিলিত হইত। ...খাতটিতে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ আর বহে না সত্য, কিন্তু এই ...চ এখন পর্য্যন্ত বেশ সুপ্রশস্ত আছে এবং বর্ষাকালে উহা সচল ...। ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা এবং পদ্মা নদী, এই উভয় উত্তর-দক্ষিণবাহী ...হ সংযুক্ত করিয়া সেই আমলে পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহী দুইটি নদী ...। একটি, ঢাকা জেলার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী ইছামতী; অপরটি, ...ার বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণস্থ কালীগঙ্গা। এই কালীগঙ্গার ...ই পদ্মা প্রবাহিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে কীর্ত্তিনাশার সৃষ্টি হয় ... শ্রীপুর সহর, রাজনগর, লড়িকুল বন্দর ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নিজ নাম সার্থক করে। কাজেই, দেখা যাইতেছে যে, পাবনা অঞ্চল হইতে ঢাকা জেলায় আসিতে হইলে সেই আমলে ইছামতী দিয়া আসিতে হইত। ইছামতীর দুই মুখ ছিল; এক মুখ করতোয়া-পদ্মা সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী, অপর মুখ ইহার অনেকটা দক্ষিণ-পূর্ব্বে। যাত্রাপুর স্থানটি এই দ্বিতীয় মুখের উপর অবস্থিত ছিল। পদ্মা-করতোয়া সঙ্গমের নাম ছিল কাটাশগড়ের মোহনা।

কাটাশগড়ের মোহনা হইতে ইছামতী নদীতে ঢুকিবার চেষ্টা করা মাত্র ইসলাম খাঁর সহিত ভৌমিকগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের নায়ক ছিলেন ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ। তাঁহার সহযোগী ছিলেন চাটমোহরের জমীদার মাসুম খাঁ কাবুলীর পুত্র মির্জ্জা মুমিন; ভাওয়ালের গাজী জমীদারগণ,—বাহাদুর গাজী, আনোয়ার গাজী, সোণা গাজী, খলসীর জমীদার মাধব রায়, এবং চাঁদ প্রতাপের জমীদার বিনোদ রায়। ভোর বেলা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুশা খাঁর কোশানৌকাগুলি হইতে কামানশ্রেণী অনল বর্ষণ করিতে লাগিল। ইসলাম খাঁ প্রাতরাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তাঁবুর উপর গিয়া গোলা পড়িতে লাগিল। প্রথম গোলাতেই তাঁহার বাসনপত্র সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, তাঁহার ত্রিশ জন অনুচর নিহত হইল। দৈবানুগ্রহে তিনি বাঁচিয়া গেলেন, নচেৎ বঙ্গাভিযান ঐখানেই শেষ হইত। দ্বিতীয় গোলায় তাঁহার পতাকা ও পতাকা-বাহক চূর্ণ হইয়া গেল,—মোগলরা বাঙ্গালী গোলন্দাজের লক্ষ্যভেদ-ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়ে, আতঙ্কে অভিভূত হইয়া গেল। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রাম যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মাধব রায়ের পুত্র এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত হইলে এই নির্ভীক বাঙ্গালী বীরদ্বয়ের জেদ যেন আরও চড়িয়া গেল। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-নৌকা লইয়া পারের দিকে গিয়া অবতরণের চেষ্টা করিলেন এবং নামিয়া মোগলের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্থলযুদ্ধে অশ্বারোহী সৈন্যের সহায়তায় মোগলরা বাঙ্গালীদের হটাইয়া দিতে লাগিল। তৃতীয় বারের আক্রমণের পরে অবশেষে বাঙ্গালীরা ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল এবং নৌকায় চড়িয়া পিছনে হটিয়া আসিল।

এই প্রথম দিনের যুদ্ধের বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীরা কি প্রকার মরিয়া হইয়া লড়িতেছিল। ইসলাম খাঁ পূর্ব্বদিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বাঙ্গালী ভৌমিকরা ততই তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইসলাম খাঁর অদম্য অধ্যবসায় ছিল, তাই তিনি অগ্রসর হইয়াই চলিলেন। এই শান্তমূর্ত্তি সুপ্রাচীন নদীটির উভয় তীর অবিরত রক্তরঞ্জিত করিতে করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। যাত্রাপুর, কলাকোপা, পাথরঘাটা, প্রত্যেক স্থানে বাঙ্গালীরা মোগলদের রুখিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বা নিকটবর্ত্তী কোন দিনে ইসলাম খাঁ ঢাকায় পৌছিলেন। ভৌমিকগণ আরও পূর্ব্বদিকে হটিয়া গিয়া শীতললক্ষ্যা নদীকে আশ্রয় করিয়া ইসলাম খাঁকে বাধা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঢাকা নগরীর জন্মকথার বিবৃতিতে সেই বিবরণের আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

এই ঢাকা সহরের স্থানটি ইসলাম খাঁকে কিসে আকর্ষণ করিয়াছিল, বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই জন্য সেই আমলের এই

অঞ্চলের নদী জনপদাদির অবস্থার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঢাকা সহরটি বর্ত্তমানে যে নদীর তীরে অবস্থিত, তাহাকে আমরা বুড়ীগঙ্গা বলিয়া জানি। ফুলবেড়িয়ার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ফতুল্লার দক্ষিণে ইহা আবার ধলেশ্বরীতেই পড়িয়াছে। মিজ্জা নাথন কিন্তু এই নদীটির নাম দোলাই বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দোলাই নদী দুই শাখায় যাইয়া শীতললক্ষ্যায় পড়িয়াছে। একটি শাখা ডেমরা নামক স্থানে শীতললক্ষ্যার সহিত মিলিত, অপরটি খিজিরপুরে শীতললক্ষ্যার সহিত মিলিত। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জ সহরের উত্তরাংশের নাম খিজিরপুর, তথায় অদ্যাপি মোগল-পাঠান যুগের একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। খিজিরপুরের প্রায় ৮ মাইল উত্তরে ডেমরা। বর্ত্তমানে দোলাই বা বুড়ীগঙ্গা নদীর ডেমরাগামী শাখা দোলাই খাল নামে পরিচিত এবং খিজিরপুরগামী শাখা সামান্য খালে পরিণত। বুড়ীগঙ্গা এখন শীতললক্ষ্যায় না পড়িয়া ধলেশ্বরীতে পড়িতেছে, ইহার ফতুল্লা হইতে ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত মুখ পূর্ব্বে ছিল না,—ইহা ১৬০৮এর পরের সৃষ্টি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যমুনা-করতোয়া অঞ্চল হইতে, এমন কি ইছামতী হইতেও শীতললক্ষ্যা মেঘনায় আসিবার সংক্ষিপ্ত পথ ছিল এই দোলাই বা বুড়ীগঙ্গা নদী। এই নদী ভাওয়ালের কঙ্করময় উচ্চ ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। কাজেই স্থায়ী সহর পত্তনের জন্য বুড়ীগঙ্গার তীর অপেক্ষা উপযুক্ততর স্থান এই অঞ্চলে আর ছিল না। পদ্মা-মেঘনা সংযোজনকারী সংক্ষিপ্ত নদীপথের উপর অবস্থিত এই ঢাকা অঞ্চলের, যুদ্ধ বিগ্রহাদি ব্যাপারে গুরুত্ব প্রাক্‌মোগল যুগেই দৃষ্ট হইয়াছিল। মিজ্জা নাথন লিখিয়াছেন, দোলাই নদী যেখানে দুই মুখ হইয়াছে, সেখানে ডেমরাগামী শাখার দুই ধারে বেগ মুরাদ খাঁর নামে চিহ্নিত দুইটি দুর্গ ছিল। নাথন ও তাঁহার পিতাকে ইসলাম খাঁ এই দুইটি দুর্গে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসলাম খাঁ এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই এই দুর্গ দুইটি এই স্থানে ছিল। সম্ভবতঃ দুর্গ দুইটি প্রাক্‌-মোগল যুগের। প্রাক্‌-মোগল যুগেও যে এই স্থান সামরিক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত, এই দুর্গ দুইটির অস্তিত্ব তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। তদুপরি দেখা যায়, বুড়াশিবের মন্দিরের মত সুপ্রাচীন হিন্দু তীর্থস্থান এই স্থানে ছিল এবং প্রাক্‌মোগল যুগের দুইটি মসজিদও এই স্থানে আছে, একটি নারায়ণদিয়ায়, (ইটের পুলের সংলগ্ন উত্তর) এবং অপরটি চুড়ীহাট্টায় (চক বাজারের লাগ পশ্চিম)। চুড়ীহাট্টা মসজিদের শিলালিপি বর্ত্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইসলাম খাঁ আসিবার পূর্ব্বেও ঢাকা হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিপূর্ণ বেশ সমৃদ্ধ স্থান ছিল। ঢাকার নবাবপুরের বসাকগণের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত যে, কেদার রায়ের পতনের পর তাঁহার গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা বসাকগণের হস্তগত হয় এবং তাহাই অদ্যাপি নবাবপুরে প্রতিষ্ঠিত। সেই লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মানেই ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিল বিগত তিন শত বর্ষাধিক ধরিয়া প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইতেছে। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কেদার রায়ের পতন হইলে কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর হইতে তাঁতী ও শাঁখারীগণ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া বাসস্থাপন করে। এইরূপে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ঢাকায় ছোটখাট একটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। ইসলাম খাঁ আসিয়া লাখখানেক লোক লইয়া এই স্থানে তাঁবু ফেলিয়া বন্দরের পরিধি বাড়াইয়া তুলিলেন এবং এইখানে স্থির হইয়া ভৌমিক-দমনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সুবেদারের বাস হেতু এইখানে দ্রুত রাজধানী-সহর গড়িয়া উঠিল। সুবেদার নূতন সহরের নাম রাখিলেন জাহাঙ্গীরনগর। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, জাহাঙ্গীরনগর রাজধানী হইতে জাহাঙ্গীরের মুদ্রা মুদ্রিত হইতেছে। এইরূপে ঢাকায় বাঙ্গলার রাজধানী গড়িয়া উঠিল এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দকাল রাজধানী এই স্থানে স্থির হইয়া রহিল।

মিজ্জা নাথনের বাহার-ই-স্তান হইতে প্রাচীন ঢাকার চমৎকার চিত্র আমরা মধ্যে মধ্যে পাই। সকলেই জানেন, ঢাকার লালবাগ কিল্লা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে যে স্থানে জেলখানা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে ঢাকার প্রাচীন কিল্লা অবস্থিত ছিল। এই কিল্লার দুইটি চিহ্ন বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আছে। কিল্লার অভ্যন্তরে পাকা বাঁধান পাড়যুক্ত একটি পুষ্করিণী ছিল, উহা অদ্যাপি আছে। আর কিল্লা হইতে সোজা পূবে কিল্লার পূর্ব্ব দরজার বরাবর যে রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, তাহার নাম অদ্যাপি লোকে বলে পূরব-দরজার রাস্তা। বর্ত্তমানে এক জন মিউনিসিপাল কমিশনারের নামে এই ঐতিহাসিক নাম সম্বলিত রাস্তাটির পুনর্নামকরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের নিকট প্রাচীন নামই অদ্যাপি প্রচলিত। এই কিল্লার অভ্যন্তরে সুবেদার ইসলাম খাঁর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিজ্জা নাথন এবং তাঁহার পিতা দোলাই খালের মুখের দু'ধারে বেগ মুরাদ খাঁর দুই কিল্লায় বাস করিতেন। ইহা বর্ত্তমানে ফরাসগঞ্জ মহল্লার পূর্ব্ব প্রান্ত। একদা কোন কারণে সুবেদারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মিজ্জা নাথন কালন্দর (ফকীর) বনিয়া গেলেন। সুবেদার ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি নিজের পা শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কিল্লায় সুবেদারের সহিত দেখা করিতে গেলেন। এই যাত্রাপথের বিবরণ হইতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ঢাকার একটি মনোরম চিত্র আমরা পাই। নাথন লিখিয়াছেন, তিনি পাল্কীতে চড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সুবাদারের সহিত দেখা করিতে রওনা হইলেন। সেই আমলে প্রাচীন ঢাকা ও নূতন ঢাকার সংযোগস্থলে একটা প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ ছিল,—সেই পাকুড় গাছ হইতেই পরবর্ত্তী কালে ঐ মহল্লার নাম পাকুড়তলী হইয়াছিল। সেই পাকুড় গাছের কাছে আসিয়া নাথন দেখিতে পাইলেন যে, পাকুড় গাছ হইতে কিল্লা পর্য্যন্ত অশ্বারোহী সৈন্যগণ মুক্ত তরবারি হস্তে রাস্তার দুই ধারে পাহারা দিতেছে। এই পাকুড় গাছ হইতে নূতন ঢাকার আরম্ভ দেখিয়া তৎকালীন পুরানো ঢাকা কত দূর ছিল এবং নূতন ঢাকা কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান বাবুর বাজারের খাল (যাহার পশ্চিমে পাকুড়তলী) হইতে দোলাই খাল পর্য্যন্ত প্রাচীন ঢাকা ছিল। বাবুর বাজারের খালের পশ্চিমস্থ পাকুড়তলী, পাথরহাট্টা, মোগলটুলি, সোয়ারীঘাট, চাঁদনীঘাট, চকবাজার, রহমৎগঞ্জ, ইমামগঞ্জ, বেগমবাজার, আরমানীটোলা, ইত্যাদি অঞ্চল জুড়িয়া ইসলাম খাঁ নূতন ঢাকার পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঢাকার অধিকাংশই হিন্দু পল্লী,—যথা তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, পটুয়াটুলি, কুমারটুলি, গোয়ালনগর, সূত্রাপুর, জালুয়ানগর, লক্ষ্মীবাজার, বানিয়ানগর ইত্যাদি। এই

হিন্দু ঢাকা এবং ইসলাম খাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন ঢাকার ঠিক মধ্যে ইসলামপুর অবস্থিত। ইহারই দুই ধারে জিন্দাবাহার, শাঁচীপান-দারিপা ইত্যাদি অঞ্চল দেখিয়া মনে হয়, ইসলাম খাঁ সর্ব্বপ্রথম এই অঞ্চলেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, পরে পশ্চিম দিকে সরিয়া নূতন ঢাকার পত্তন করেন। দিল্লীতে যেমন যুগে যুগে নূতন নূতন অঞ্চলে সরিয়া সরিয়া রাজধানী বসিয়াছে, এবং ১৪।১৫ মাইল স্থানের মধ্যে সাতটি পৃথক্ পৃথক্ রাজধানীর চিহ্ন পাওয়া যায় (ব্রিটিশ নয়া দিল্লীতে অষ্টম রাজধানী বসিয়াছে), এও ঠিক তেমনি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা যখন আবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়, তখন এমনি করিয়াই ব্রিটিশ সহর রমনা প্রাচীন ঢাকার উত্তরাংশে সংযুক্ত হইয়াছিল।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে পরিণত হইয়া ঢাকা অনতিবিলম্বে সমৃদ্ধ সহর হইয়া উঠিল। ১৬২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে মগ দস্যুগণের আক্রমণে ঢাকা একবার বিধ্বস্ত হয়। সুবেদার শায়েস্তা খাঁ আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে মগ দমন করিয়া মগদের প্রধান আড্ডা চাটগাঁ অধিকার করিলে ঢাকা নিরাপদ এবং বঙ্গের সমৃদ্ধতম সহরে পরিণত হইল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বাউরি নামক এক জন ইংরেজ কেপটেইন্ ঢাকা স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঢাকার পরিধি ৪০ মাইল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ যখন ঢাকায় প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত করেন, তখন নদীর পারে যায়গা না পাইয়া নদীর পার হইতে প্রায় চার মাইল উত্তরে তেজগাঁও নামক স্থানে যাইয়া তাঁহাদের কুঠি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। লালদীঘি নামক যে দীঘিটির পারে তাঁহাদের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান। দীঘিটিতে এখনও জল আছে। এখন তাহাতে অজস্র শ্বেতপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। এই লালদীঘিরই পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত স্থান লইয়া বর্ত্তমানে সরকারী কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পুণ্যাত্মার প্রতি

বেদনারি ক্ষুব্ধ প্রাণে কি জানাবো, হে যুগাবতার,
দারুণ দুর্দ্দৈব আজি, অন্নাভাবে করি আর্ত্তনাদ!
পৃথ্বীব্যাপী মহাযুদ্ধ, স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ!
নিরীহ মানুষ ত্রাসে চতুর্দ্দিক দেখে অন্ধকার!
বড় অসহায় মোরা, বাঁচিবার পন্থা নাহি আর!
মনুষ্য-নিধন-যজ্ঞে মেতে আছে অসংখ্য নিষাদ,
প্রাসাদে কুটীরে তাই সর্ব্বদেশে বিরাজে বিষাদ!
বোমারু বিমানগুলি বোমা ফেলি' করিছে সাবাড়!
হে দেবতা, কোথা তুমি ধ্যানমগ্ন আছ নিরালায়!
মোদেরে বাঁচাও আসি', শঙ্কাভরে কম্পিত হৃদয়!
পিতা মাতা পুত্র কন্যা সমভাবে কাঁদি উভরায়!
পিষিতেছে পশুশক্তি,—তুমিও কি হয়েছ নিদয়?
করো শান্ত সমাহিত, দৈব-বলে করো বলীয়ান;
জাগাও দানব-যুদ্ধে মানবের মহত্ত্ব মহান্!

পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন আত্মঘাতী ছিন্নমস্তা আজি,
স্বহস্তে মস্তক ছেদি' নিজ রক্ত নিজে করি' পান
তৃপ্ত তবু নহে, হায়, মেলি' তার জিহ্বা লেলিহান
তপোবন-সভ্যতারে আত্মনাশে করিয়াছে রাজী!
স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মৃত্যুমুখে আছি মোরা সাজি'!
মোদেরে ফিরাতে পারো, কোথা তুমি পুরুষ-প্রধান?
রুদ্ররূপে এসো পুনঃ, কম্বুকণ্ঠে করো গো আহ্বান!
ভিখারিণী জন্মভূমি হবে তবে জগৎ-সম্রাজ্ঞী!
একাধারে রাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপে এসো এবে তুমি!
ধর্ম্মের হয়েছে গ্লানি, অধর্ম্মের বড় আস্ফালন!
এসো এসো নরদেব, আঁখি মুদি পদযুগ চুমি!
তুমি যদি নাহি এসো, তবে আর বাঁচে না জীবন!
তোমার উপাস্য কালী—সেই নারী উপেক্ষিতা আজ!
হিন্দুর সর্ব্বস্ব গেল, গেল ধর্ম্ম পবিত্র সমাজ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

এখানকার সমাচার

বন্ধু আমার খবর চাহিয়া লিখিয়াছ চিঠি মোরে
কি লিখিব হায়, দিন কেটে যায় ভাবিলে যে মাথা ঘোরে!
শোনো তবু বলি হেথার খবর যতটুকু জানি আমি—
দিনে দিনে মোরা চলার পথেতে মরণের অনুগামী!

চালের অভাবে নেয়াপাতী ভুঁড়ি শুকায়েছে একেবারে—
রেজকিটি নাই পকেটেতে ভাই জিনিস পাই না ধারে!
প্রতিদিন প্রাতে লাইনের প'রে লাইন দিতেছি মোরা—
চাল চিনি আর আটার লাগিয়া বাজারে বাজারে ঘোরা!

ট্রেণের মাঝেতে ট্রামে আর বাসে শুধু দেখি ভীড়ে ভীড়!
বাঁচিতে সবাই সহরে আসিয়া বাঁধিতে চাহিছে নীড়!
কাপড় কিনিতে উদাসীন আমি, বেজায় বেয়াড়া দাম—
আপনি বাঁচিলে তবে ত কাপড়—মুখে বলি রাম-রাম!

দ্বাপরের মত লজ্জা বাঁচাতে যদি আসে নারায়ণ—
পারিবে না আজ বাঁচাতে মোদের শুধু শুনি রণ-রণ!
মাথার উপরে দিন-রাত ঘোরে হাওয়াই জাহাজ কত—
চালের অভাবে মানুষ হেথায় মরিতেছে শত শত।

পথে, ঘাটে, মাঠে গুজবের চোটে চোখে লেগে যায় ধাঁধা—
প্রাণ যেন নাই মন যেন নাই দিয়েছি সকলি বাঁধা!
পথে পথ নাই, হয়েছে শ্মশান, পথেতে বেরুনো দায়!
ডাল যদি পাই, চাল ঘরে নাই কেমনে বাঁচিব হায়!

আজিকার দিনে ভাবি তাই মনে পাপ আর কত সবে!
মানুষ গড়িছে দেবতা ভাঙিছে যুগে যুগে এই ভবে!
কাগজের দর ডবলের বেশী বুঝিবার কিছু নাই—
অতএব আজ এইখানে শেষ, বিদায় লইনু ভাই।

শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী

অতর্কিত আক্রমণে জাপান পৃথিবীকে সচকিত করিয়া তুলিবামাত্র প্রশান্ত মহাসাগর পাছে জাপানী-নিগ্রহে অশান্ত হয়, সেদিকে আমেরিকার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাই জাপানকে শায়েস্তা রাখিতে ব্রিটিশ-কলম্বিয়া হইতে ভাঙ্কুবারের কাছে আষ্টরিয়া পর্যান্ত প্রায় ৭০০ মাইল তীরভূমি আমেরিকা সমর-সজ্জার বিপুলতায় দুর্ভেদ্য করিয়া ফেলিয়াছে। আলুশিয়ানে জাপানীরা নামিয়াছিল বলিয়া ওদিকে আলাস্কার পশ্চিমে আটটু হইতে পানামা পর্যান্ত প্রায় ১০০০ মাইলব্যাপী স্থান আজ দুরধিগম্য। শূন্য-পথ হইতে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হইবে যেন গোলোকধাঁধা রচিত রহিয়াছে! অসংখ্য বেলুন-বারেজ, সেই সঙ্গে কামান ট্যাঙ্ক তাঁবু প্রভৃতির কুরুক্ষেত্র পর্ব্ব!

জাপান হইতে আলাস্কা খুব বেশী দূরে নয়; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকা যে ব্যূহ-গণ্ডী রচিয়াছে, সেটির দূরত্ব টোকিয়ো হইতে ৪৭০০ মাইল। এই গণ্ডীতে নৌঘাঁটী, ডক, এরোপ্লেনের কারখানা, জাহাজের কারখানা, খনি, বিরাট রেলোয়ে টার্ম্মিনাস্ প্রভৃতি যদি শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! পোর্টল্যাণ্ড, শীট্ল, টাকোমা, ভাঙ্কুবার, ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স রুপার্ট—এগুলির উপর শত্রুপক্ষ যে কোনো সময়ে শূন্যপথ হইতে বোমা বর্ষণ করিতে পারিত—কিন্তু মার্কিণ সমর-বিভাগের কর্ম্ম-তৎপরতায় এ সব অঞ্চল এখন এমন সুরক্ষিত হইয়াছে যে, বিপক্ষ দলের একটা মক্ষিকাও বোধ হয় এদিকে আসিতে দ্বিধা বোধ করিবে! গোপন-অন্তরালে অসংখ্য অতিকায় রাইফেল এবং এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফট গান সুসজ্জিত আছে—নিমেষে সেগুলি জীবন্ত হইয়া প্রলয়ের সৃষ্টি করিবে। তার উপর জলের বুকে আছে ডেষ্ট্রয়ার মাইন সাবমেরিণ প্রভৃতি। স্থলপথে সজাগ ফৌজ সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিতেছে।

সাগরতীর হইতে বহু দূর পর্যান্ত কাঁটা তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া যে গণ্ডী রচিত হইয়াছে, জনসাধারণ তাহার সীমারেখার ওদিকে পদার্পণ করিতে পাবে না। কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা বিরাট ক্ষেত্রে সামরিক উদ্যোগ-আয়োজনের নিমেষ-বিরাম নাই। সেখানে ট্রাক্ ট্রাক্টর বুলডোজার এবং চক্রবাহী অতিকায় কামানের জীবন্ত লীলাভিযান চলিয়াছে।

গভীর রাত্রে জাহাজে চড়িয়া ট্রেণে চড়িয়া সাগর-তীরবর্ত্তী ঘাঁটীগুলিতে অগণিত ফৌজ আসিয়া নামিতেছে। অন্ধকারে তারা বুঝিতে পারে না, কোথায় কোন্ প্রদেশে নামিল! শুধু জানে, ঠিক জায়গাটিতেই তাহাদের আনা হইয়াছে! প্রত্যেকটি ডক যেন বড় বড় বাজার! ডকের ভাণ্ডারে এঞ্জিন, প্লেন, গাড়ীর প্লেনের ও জাহাজের বাড়তি অংশ-সমূহের স্তূপ হইতে সুরু করিয়া ফ্লাশ-ল্যাম্প, সাবান, কট, বাক্স, হাঁড়ি প্রভৃতি তৈজস; চিনি, বিস্কুট, রুটী, তাঁবু অর্থাৎ সব রকমের জিনিষ মজুত আছে একেবারে অজস্র পরিমাণে। খাদ্য-সামগ্রীর এত বৈচিত্র্য ও অজস্রতা যে, সে-খাদ্যে এক-এক জন সেনার দু'লক্ষ ষাট হাজার বৎসর নির্ভাবনায় কাটিতে পারে!

এখানকার বন্দরগুলিতে রাশিয়ান জাহাজেরও যাতায়াত চলিয়াছে।

দলে দলে ফৌজ আসিয়া নামিতেছে

জাহাজী কারখানার শ্রমিকদল—পোর্টল্যাণ্ড

গম আটা ময়দা এবং প্রয়োজনীয় আরো বহু দ্রব্য—কামান বন্দুক সিমেণ্টও এই সব বন্দর হইতে রাশিয়ায় চালান যাইতেছে। রাশিয়ান জাহাজের এক জন কাপ্তেন বলিতেছিলেন, ভ্লাডিভষ্টকের পথে জাপানীরা আমাদের গতিরোধের চেষ্টায় কখনো নিবৃত্তি দেয় নাই। কিন্তু আমরা তাহাদের গ্রাহ্য করি না। এবারে আমাদের

জাহাজে শুধু কামান আর বন্দুক চলিয়াছে! জাপান কি করিবে? প্রান্তরের বুকে পাঁচ-সাত-তলা উঁচু বহু পাহারা-মঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছে। সে সব মঞ্চের উপর নিপুণ কর্ম্মচারীরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা-দারী করিতেছে—শত্রু আসে কি না। এ সব মঞ্চের উপরে উঠিয়া বেসামরিক অধিবাসীরাও পাহারাদারীর কাজ শিখিতেছে। তাদের হাতে আছে দূরবীণ যন্ত্র। সে যন্ত্রে সুদূর দিগ্‌দেশে তাদের দৃষ্টি সকল সময়ে নিবদ্ধ। টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে; সেই টেলিফোন মারফৎ কোথায় কত দূর দিয়া কাহাদের ক'খানা প্লেন চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে ঘাঁটীওয়ালাদের সকল সময়ে রিপোর্ট দিতে হয়। বেসামরিক নর-নারীদের মধ্যে যারা নিপুণ, তাদের প্রত্যেককে পালা করিয়া সপ্তাহে কয় ঘণ্টা ধরিয়া এই মঞ্চে উঠিয়া আকাশ-পথের পাহারাদারী করিতে হয়; এ জন্য পারিশ্রমিক মেলে না। এমনি বেসামরিক মঞ্চপ্রহরীর সংখ্যা এখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। মঞ্চের উপর হইতে পাহারদারী আছে, তার উপর পাহারাদারী আছে অকূল সমুদ্রবক্ষে বয়ার উপরে। পাহাড়ের মাথায় গোপন শিলাগৃহে, গ্রামে এবং বনে মেয়েরা পাহারাদারী করিতেছে। সকল শ্রেণীর প্রহরীর পরিচ্ছদের সঙ্গে টেলিফোনের সরঞ্জাম আঁটা আছে সারাক্ষণ। প্লেনের সংবাদ মিলিবামাত্র এই টেলিফোন মারফৎ সে সংবাদ তখনি দিকে দিকে বিঘোষিত হয়।

বেলুন-বারেজ

সামরিক ফৌজ ছাড়া ডিফেন্স-বিভাগ আছে। সাধারণ অধিবাসীরা এই ডিফেন্স-কোরের সদস্য। শুধু শীটল্ সহরেই বেসামরিক ফৌজের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। ইহাদের প্রধান কাজ, বিপক্ষ-প্লেন সম্বন্ধে খবরদারী করা। বমারের আগমন-সম্ভাবনা বুঝিবামাত্র সে-সংবাদ পীত ও লাল আলোর সঙ্কেতে প্রচার করা হয়। পীত আলোর মর্ম্ম 'এখনি ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা করো—বিপদের আশঙ্কা।' লাল আলোর অর্থ—আক্রমণ সমুদ্যত—তৈরী হও! এ আলোর সঙ্কেতে স্ত্রী-পুরুষ সকলে যথা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিমেষে সচেতন হয়।

আজ এই মহাপ্রলয়ের দিনে সকলের নিত্য দিনের জীবন-যাত্রার প্রণালীই বদলাইয়া গিয়াছে। যে সব কারখানায় পূর্ব্বে মোটর গাড়ী ও বাস তৈয়ারী হইত, সেগুলিতে এখন তৈয়ারী হইতেছে ট্যাঙ্ক ও কামান প্রভৃতি মারণ-সরঞ্জাম; যে-সব ফার্ম্মে স্নানের পোষাক তৈয়ারী হইত, সেখানে এখন তৈয়ারী হইতেছে ফৌজের জন্য উর্দ্দী, হেলমেট, কম্বল প্রভৃতি। নির্জ্জন প্রান্তরে আজ বিমান-ঘাঁটী গড়িয়া উঠিয়াছে; বন কাটিয়া সেখানে বসিয়াছে আজ ফৌজের ব্যারাক; জলা বুজাইয়া তার বুকে তৈয়ারী হইয়াছে বারুদখানা। স্কুল-গৃহ, অফিস, টাউনহল—সেগুলি আজ গোরা ফৌজের প্যারেড-কোলাহলে এবং অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় মুখরিত। ফুটবল ও বেশবল্ খেলার মাঠে উড়ন-ভূমি ও ফৌজের ছাউনি; গলফের ও ঘোড়দৌড়ের মাঠের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে—সেখানে উঠিয়াছে ছোট বড় মাঝারি দুর্গশ্রেণী।

লোকজনের চিঠিপত্রে আর সে অবাধ স্বাধীন উচ্ছ্বাস থাকিবার উপায় নাই। সব চিঠিপত্র সেন্সরের হাত ঘুরিয়া যাতায়াত করিতেছে। কারো এতটুকু অসতর্ক বাণী বা অহেতুক আতঙ্ক পাছে সে চিঠির লেখায় প্রকাশ পায়—দেশ তার জন্য বিপন্ন হইতে পারে! ঘুম ভাঙ্গিয়া সমস্ত দেশ যেন সমর-সাজে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। সাগর-তীরের বন্দরগুলি পূর্ব্বে ছিল বাণিজ্যের

বন্দী জাপানীর দল

বিপুল কেন্দ্র,—মাছ, কাঠ এবং বিবিধ কাঁচা মালের ভারে সব সময়ে পরিপূর্ণ থাকিত! এখন এ সব বন্দরে মাছের আঁইশ বা কাঠের চোকলাও দেখা যায় না! যে দিকে দৃষ্টি মেলিবে দেখা যাইবে শুধু যুদ্ধের রসদপত্র সাজ-সরঞ্জাম!

মাটী ফুঁড়িয়া যেন দলে দলে কর্ম্মী শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটিতেছে! কোথায় তারা থাকিবে? কি খাইবে? কোথায় শয়ন করিবে? কোথায় বা তাদের ময়লা জামা-কাপড় কাচা হইবে—শুকাইবে,—এ কথা কাহারো মনে উদয় হয় না! লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে

বিষ-বাষ্পে মুখোশ-আঁটা ফৌজের লড়াই শেখা

কানাডা বিমান-বাহিনীর ভলি-বল্ খেলা

জ করিতেছে—সকলে যেন কলের মতো! যে সব কারখানার রনাও কেহ করে নাই, দিকে দিকে এখন তেমনি বহু কারখানা তা গড়িয়া উঠিতেছে। এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং রোসিলিকনের প্রয়োজনীয়তা অসম্ভব বাড়িয়াছে। সে জন্ম নূতন কারখানা; এবং খুব অল্প ব্যয়ে সোডিয়াম ক্লোরেট ও ক্যাল-সিয়াম কার্বাইড তৈয়ারী করিবার জন্ম মহাসাগরের কূলে ও মিসি-শিপির পশ্চিমে যে দুই বিরাট্ কারখানা তৈয়ারী হইয়াছে, সেখানকার কাজের পরিমাণ দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না!

এলুমিনিয়মের নবনির্ম্মিত কারখানাগুলি যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলিতেছে, সে শক্তিতে ,পোর্টল্যাণ্ড এবং স্পোকেনের মত বড় বড়

শিবাস্তিয়ান অন্তরীপ—ওরগন্
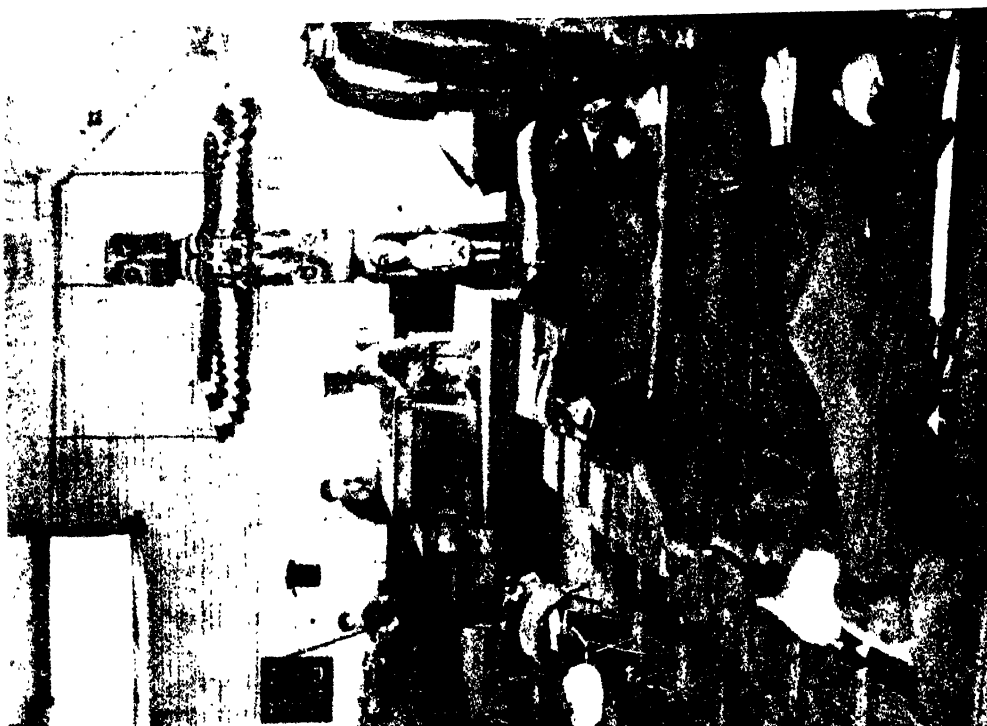
কলম্বিয়া নদী—পোর্টল্যাণ্ডে

কাউন্সিল-গৃহে ফৌজের আস্তানা

কারখানার কাজে মেয়ে

এরোপ্লেন-ফ্যাক্টরীতেও মেয়ে-শিল্পী

অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ গ্যান্ ছোড়া—পা বাঁধা

কানাডা-ফৌজে স্ত্রী-পুরুষ কর্ম্মচারী—ভাঙ্কুবার

দু'টি বাণিজ্য-সহরকে বোধ হয় পাঁচ-সাত শত মাইল দূরে টানিয়া লইয়া যাওয়া চলে।

পোর্টল্যাণ্ড এবং কানসাশে জাহাজের কারখানাগুলিতে প্রায় এক লক্ষ লোক কাজ করিতেছে। এ কারখানাগুলিতে বৈদ্যুতিক প্রবাহের জোগান মিলিতেছে কলম্বিয়া নদীর বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস হইতে। কলম্বিয়া নদী এখন আমেরিকার শক্তির উৎস-স্বরূপিণী। এ নদী গিরিবক্ষ হইতে নির্গত হইয়া উইলামেটি নদীর সঙ্গে মিশিয়া অতুল শক্তি লাভ করিয়াছে। এই নদীর মুখে এ্যাষ্টোরিয়া প্রদেশ। পশুলোমের ব্যবসায়ে এ্যাষ্টোরিয়ার সমৃদ্ধির সীমা নাই; এবং এ ব্যবসায়ের এত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে শুধু কলম্বিয়া নদীর কল্যাণে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে বহু নদী আছে; কিন্তু এই কলম্বিয়া নদী হইতেই সমগ্র যুক্তরাজ্য তার বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহ-লাভে ধন্য হইয়াছে! নদীর উভয় তীরে প্রদেশগুলি উর্ব্বর; সেখানে প্রচুর ফশল ফলে। প্লেন-নির্ম্মাণে বিপুল অজস্র এলুমিনিয়ামের প্রয়োজন। এ এলুমিনিয়াম মিলিতেছে কানশাস এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে; তার উপর ওয়াশিংটনের মাটী হইতেও প্রচুর এলুমিনিয়াম মিলিতেছে। এলুমিনিয়ামের কাজে বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন—কলম্বিয়া হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহ পাওয়া যাইতেছে। তাহার ফলে পনেরো লক্ষ মণ এলুমিনিয়াম মিলিতেছে। পূর্ব্বে এ সব অঞ্চলে জাপানী কুলিদের দিয়া চাষবাসের কাজ চলিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সে সব জাপানীকে কারা-বন্দী করা হইয়াছে; এখন মার্কিণরা নামিয়াছে চাষের কাজে।

যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী করার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজেও আমেরিকার সমান তৎপরতা। না খাইয়া মানুষ যুদ্ধ করিবে না! কাজেই সকলে যাহাতে পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পুষ্টিকর খাদ্য পায়, সে দিকে মার্কিণের প্রখর লক্ষ্য। তার ফলে দেশে খাদ্য-ফশলের অভাব নাই!

বন্দীদের উপর মার্কিণের ব্যবহার বেশ শিষ্ট ও ভদ্র। বন্দীরা স্বচ্ছন্দ ভাবে বাস করিতেছে। অন্ন-বস্ত্র বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ঘটে নাই।

সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষকে এক জন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিয়াছিলেন—শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি—এ সবের উপর যুদ্ধের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে কি? উত্তরে অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন—নিশ্চয় করে। খুব বেশী রকম নির্ভর করে। ঝড়-জলের জন্য স্পানিশ আর্মাডা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; দারুণ শীতের জন্য ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের সৈন্যের

বিমান-ফৌজের নিরাপদ পরিচ্ছদ

অলক্ষ্য পাহারাদারী

সেতু-মুখে পাহারা

রাতের পাহারা—মাইক্ হাতে

এ্যাষ্টোরিয়ার হোটেল

প্রাণে মরিয়াছিল! প্রশ্ন হইল—এখন তো শূন্য-পথে যুদ্ধ—এখনো সে ভয় আছে?

প্রিন্স রূপার্ট হইতে ভাঙ্কুবারের পথে (শূন্যলোক হইতে)

উত্তর মিলিল,—নিশ্চয় আছে। শূন্য-পথে আঁধির ভয় সহজ নয়! একটি বমারের রেঞ্জ বা শক্তি-সামর্থ্য হয়তো ৩০০০ মাইল পর্য্যন্ত—কিন্তু ত্রিশ মাইল বেগে যদি ঝড় দেখা দেয়, সে ঝড়ে বমারের সব শক্তি মিথ্যা হইবে! এ জন্য ঝড়ের সময় বমার যাহাতে তিলমাত্র বাধা বা আঘাত না পায়, তার গতি অব্যাহত থাকে, সে সম্বন্ধে পাইলটের সুগভীর জ্ঞান থাকা চাই,—এবং ঝড় হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সদুপায়ের সকল ব্যবস্থাও প্লেনে থাকা চাই। মেঘলা দিনে বা রাত্রে যে সব প্লেন মন্থর গতিতে চলে, তারাও বিপুলতর শক্তির বড় প্লেনকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারে—যদি বড় প্লেন ঝড়-প্রতিরোধ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করে! তাছাড়া যুদ্ধে প্লেন ছাড়িলে আকাশ স্বচ্ছ থাকা চাই; নহিলে নিপুণ পাইলট বা বোমারুর পক্ষেও বানচাল হইবার ভয় অত্যধিক। এ-কারণে ঋতু-অনুশীলন সম্বন্ধে ফৌজ-বিভাগকে বিশেষ সচেতন থাকিতে হয়। আমেরিকার বিমান বিভাগ ঋতুর পাঠ সম্বন্ধে আজ খুব অবহিত হইয়াছে। ঋতু সম্বন্ধে পুঙ্খাণুপুঙ্খ রিপোর্ট না জানিলে এবং সে রিপোর্ট কাছে না থাকিলে সামরিক বিভাগ কোনো প্লেনকে শূন্যে উঠিতে দেয় না। তার উপর সুদূর উত্তর-অঞ্চলে অরোরা বোরিয়লিশ (সুমেরু জ্যোতিঃ) প্লেনের রেডিয়ো-যন্ত্র ও টেলিফোনকে সম্পূর্ণ বিকল করিয়া দিতে পারে।

প্রচার বিভাগের দিক্ দিয়াও মার্কিণ আজ অসাধ্য সাধন করিতেছে। সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-সাগরকূলে গ্রামে-বন্দরে সর্ব্বত্র বেতার-ষ্টেশন অবস্থিত আছে। এ সব ষ্টেশনে নিপুণ শব্দ-যন্ত্রী ও সাংবাদিকের দল চব্বিশ ঘণ্টা অবিরাম ভাবে কাণে-মুখে যন্ত্র আঁটিয়া বসিয়া আছে—বিদেশী বা বিপক্ষ দলে কোথায় কি কথা উঠিতেছে, কোথায় কি ঘোষণা বা জল্পনা চলিতেছে—'আকাশে পাতিয়া কাণ' তারা সে-সবের বার্ত্তা সংগ্রহ করিতেছে। এ কাজে যারা নিযুক্ত আছে, তারা সর্ব্বজাতির সর্ব্ব-ভাষায় সুনিপুণ। জাপানী, চীনা, মান্দারিণ, ক্যান্টনীজ—

কোনো ভাষার কোনো কথা তাহাদের বুঝিতে বা বলিতে বাধে না। জাপান, থাইল্যাণ্ড, মলয়, ফিলিপাইন্‌স্‌, ব্রহ্মদেশ, ইতালী, জার্মাণী—এ সব জায়গায় যখন যে জল্পনা-কল্পনা বক্তৃতায় বা বার্ত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, সে সব কথার ও বক্তৃতার সবটুকু ফনোগ্রাফের রেকর্ডে তখনি মুদ্রিত করা হইতেছে। শুধু বিপক্ষ-পক্ষের বাণী ও বার্ত্তা নয়, মিত্রপক্ষের বাণীও এমনি ভাবে রেকর্ড করিয়া বিঘোষিত হয়। রেকর্ডে এ সব বার্ত্তা পাঠানো হয় ওয়াশিংটনে—সেখান হইতে সামরিক এবং ষ্টেটের অন্যান্য বিভাগে এ সব সংবাদ যথারীতি প্রচারিত হয়।

জলের বুকে যেমন নৌ-ফৌজ—তীরেও তেমনি স্থল-ফৌজের ভিড়—কোনো দিকে তদারক-পাহারাদারীর অন্ত নাই। জল-প্রহরীরা যদি মাইনের সন্ধান পায়, তখনি কামান দাগিয়া তারা সে মাইন ধ্বংস করিয়া দেয়। কাজ একঘেয়ে। অনেক সময় মাইনের দেখা মেলে না, তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকা দায়! কাজ চাই! এই প্রসঙ্গে এক জন জল-প্রহরী বলিতেছে,—অনেক সময় মাইনের সন্ধান মেলে না—তখন নকল মাইন তৈয়ারী করিয়া তার উপরে পড়িয়া সেটাকে কামান ছুড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিই।

নৌ-ঘাঁটীর কর্ম্মচারীরা এমন কষ্টসহিষ্ণু ও সুনিপুণ যে, প্লেনে করিয়া সারা দিনে হাজার মাইল ঘুরিতেও তাদের ক্লান্তি নাই! নভেম্বরে—দারুণ তুষার-বর্ষণের মধ্যেও দু-এক দিন মাত্র হয়তো প্লেনে ওঠা হয় না—নহিলে অন্য সব কটা দিনই দিনে-রাতে প্লেনে চড়িয়া পাহারাদারী করিতে হয়! বমার লইয়া বাহির হইয়া এক-পাড়িতে বারো-পনেরো ঘণ্টা কাটিয়া যায়। বমারগুলিকে সব সময় ঠিক রাখা চাই—ভিতরে বোমা, কামান, বন্দুক, রসদপত্র সব একেবারে বাছিয়া প্রস্তুত রাখা হয়। সঙ্কেত পাইবামাত্র এক মিনিটের মধ্যে বমারগুলি কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে আকাশে চড়াও হইতে পারে।

পাহারা-মঞ্চ

ব্লক-সাহায্যে চীনা মেয়ে প্রহরীরা প্লেনের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে

কাজে ফৌজের তৎপরতার সীমা নাই। বিশ্রাম-অবসরে আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলারও সুব্যবস্থা আছে।

যে সব নৌসেনা জাহাজে থাকে, তাদের চিঠিপত্রাদি যায় সানফ্রানসিশকো, নিউইয়র্ক, শিট্‌ল্‌ এবং কানাডার দু'-একটি বন্দর-মারফৎ। সপ্তাহে যে সব চিঠিপত্র এভাবে নৌ-ফৌজদের কাছে যায়, সেগুলি ওজনে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫৮০০ টন।

বিপক্ষের বমার দেখিলে যে এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট্‌ গান ছোড়া হয়, মিনিটে তাহাতে ১২০ বার গুলী ছোটে। এ গান্‌ যে ছোড়ে

মেশিন-গান্ উদ্যত রাখিয়া সারাক্ষণ পাহারাদারী

আকাশে বহু উর্দ্ধ-পথ বাহিয়া সমরাভিযানে বাহির হইতেছে। বিপক্ষ-প্রদেশে বোমা-বর্ষণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়; উড়ন-দুর্গ (flying fortresses) নামে অতিকায় বিমান-রণ-পোতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাহারাদারী করাও এ-সব বমারের কাজ। ত্রিশ-হাজার ফুট উর্দ্ধ পথেও ইহাদের গতি যেমন অবাধ, তেমনি স্বচ্ছন্দ। অত উঁচুতে দূরবীণ-সাহায্যেও তাদের উপর নজর চলে না।

সব-চেয়ে আধুনিক রীতিতে যে (flying fortresses) বিমান-রণপোত তৈয়ারী হইয়াছে, তার নাম ষ্ট্রাটোচেম্বার। ০ শূন্যের নীচে ৬৫ ডিগ্রী টেম্পারেচারে

অফ্-ডিউটির আরাম

তার পায়ে দড়ি বাঁধা থাকে। তার কারণ, উত্তেজনার বশে বেশী গুলী সে অপচয় করিতে না পারে—কিম্বা সুদূর লক্ষ্যে গুলী ছুড়িয়া তাহা ব্যর্থ না করে! পা দিয়া ট্রিগার চাপিয়া এ কামান ছুড়িতে হয়! তাই এ রকম ব্যবস্থা।

বিমান-বাহিনীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক অভিনবত্বের সীমা নাই! যে-সব বমার নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলি আমেরিকা হইতে ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়া জার্ম্মাণীতে চকিতে গিয়া যেমন পৌঁছাইতে পারে, তেমনি টোকিয়োয় হানা দিতেও তাদের সামর্থ্য আছে। হাজার-হাজার বমার

পথ-সন্ধানী বিমান ফৌজ

বায়ুলেশহীন স্থানে এ প্লেনের যাত্রীদের এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না! অগণিত ফৌজকে নিত্য দিন এ সব প্লেনে চড়াইয়া তাদের দেহ-মনকে সকল অস্বাচ্ছন্দ্য সহিবার যোগ্য করা হইতেছে। এত উঁচুতে উঠিলে মানুষ বাঁচে না—এ জন্য এ প্লেনের গঠন-কৌশল এমন যে, অত উর্দ্ধে উঠিলেও যাত্রীরা নিরাপদ থাকে। ষ্ট্রাটোচেম্বারে উঠিতে হইলে পূর্ব্বে অভিনব প্রণালীর ব্যায়ামে দেহের রক্তে যে নাইট্রোজেন আছে, সেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমাইতে হইবে—তার পর বিশেষ পরিচ্ছদ গায়ে আঁটা।

খাদ্য সম্বন্ধে এ প্লেনের যাত্রীদের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। যে-সব

খাদ্য-পানীয় গ্রহণে দেহে বায়ু জমে, তেমন খাদ্য অত উর্দ্ধলোকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। চিনি এবং সাদাসিধা চকোলেট পরিপাক করিতে খুব অল্প পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন ; সুতরাং চিনি এবং চকোলেট উর্দ্ধ-পথের যাত্রীদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ খাদ্য! তার উপর এ প্লেন যখন ভূতলাবতীর্ণ হইতে থাকে, যাত্রীদের তখন ঘন ঘন হাই তুলিতে হয় বা Chewing gum মুখে রাখিয়া অবিরাম তাহা চিবাইতে হয়। অত উর্দ্ধে উঠিয়া কথা কহিলে পাশের লোক সে কথা শুনিতে পায় না, —শিস্ দিবার সামর্থ্যও মানুষের লোপ পায়। কথা কহিতে গেলে অধরে চাপ পড়ে না—সে জন্য কথা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করা অসম্ভব। এ প্লেন লইয়া এখনো এখানে পরীক্ষা চলিতেছে। বায়ু-তত্ত্বজ্ঞ প্লেন-শিল্পীরা বলেন, এক বছরের মধ্যে এ প্লেনকে তাঁরা সকল দিক্ দিয়া স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তুলিবেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে নানা স্থানে ফৌজদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রণ-কৌশল শিখানো হইতেছে। সামরিক বিভাগের বিচক্ষণ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা শিক্ষকতা করিতেছেন —ইঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পটুতা দেখাইয়াছেন অসামান্য-রকম। ছাত্রদের মধ্যে ১১।২০ বৎসর বয়সের তরুণ মার্কিণ, কানাডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান ও চীনা অসংখ্য। নকল বোমা নিক্ষেপ,—নিক্ষেপান্তে তাহার ফটো তোলা হইতে সুরু করিয়া প্লেনে উঠিয়া প্যারাশুট-যোগে নামা—কোনো শিক্ষাই তালিকা হইতে বাদ পড়ে নাই!

প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এই বিরাট্ ঘাঁটী খুলিবার ফলে কানাডার সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাজ্য মিলিয়া আজ এক হইয়াছে। উভয়ের আজ এক প্রাণ, এক মন, এক স্বার্থ, এক লক্ষ্য! এক উদ্দেশ্য লইয়া দুই প্রদেশের সমর-উদ্যোগ নির্ব্বাহিত হইতেছে। দু'টি প্রবল
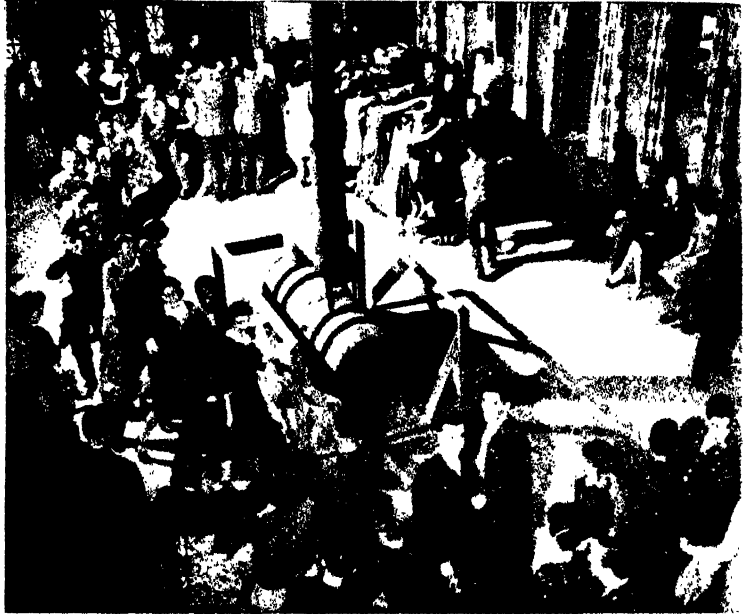
নিশীথ-অবসরে ফৌজের নৃত্যলীলা

শক্তির এমন সমন্বয়-হেতু বিপক্ষ যে এখানকার সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিবে না, এ শক্তির সংঘর্ষে যথাসময়ে পরাজিত হইবে,—সে সম্বন্ধে মিত্র-পক্ষের আশা হয়তো দুরাশা নয়!

সভ্যতা কি এই বর্ব্বরতা ?

পথের ধূলার মাঝে জন্ম নিল যারা সর্ব্বহারা
শত ছিন্ন চীরধারা মূর্ত্তিমান নগ্ন কদর্য্যতা,
কোন দিন ক্ষণ তরে ভেবেছ কি ইহাদের কথা ?
পথ-কুক্কুরের চেয়ে ঘৃণ্য হেয় এরা সব কারা ?
দু'মুঠা ক্ষুধার অন্ন খুঁটে খায় রাজপথ হতে,
দলে দলে নর-নারী মুষ্টিভিক্ষা লভিতে প্রত্যাশী
ধনীর প্রাসাদ-দ্বারে ব্যগ্র-কর বাড়াইছে আসি',
স্রোতের শৈবাল সম ভাসিয়া চলেছে কালস্রোতে!
শুক্ল অর্দ্ধ-রাত্রে যদি অকস্মাৎ দশমীর শশী
তব শুভ্র-শয্যাপ্রান্তে দেখা দেয় গবাক্ষ খুলিয়া,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শিশুপুত্র দুহিতা ভুলিয়া,
এদের স্মরণে এনো, দুগ্ধ-শুভ্র শয্যাপ্রান্তে বসি'!
স্মরণে আনিয়ো বন্ধু, মানুষের কৃত্রিম-সভ্যতা
কি প্রভেদ সৃজিয়াছে—সভ্যতা কি এই বর্ব্বরতা ?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল)

স্মৃতি

কাহারে খুঁজেছি আমি বিস্মৃতির তলে
মনে পড়ে আজ ; কোন্ প্রাচীন গুহায়
সবুজ অরণ্যে আর তটিনীর জলে ;
কেন তারে আজ শুধু মনে পড়ে যায় ?
দেখি সেই কবে কোন্ পথের ধূলি
ফিরে আজ এল মোর ঘরে স্বর্ণ-রথে,
কল্পনার বলাকারা কি লহর তুলি'
ফিরেছে রূপালী মেঘে আকাশের পথে!
আজ সেই ভুলে-যাওয়া ধূ ধূ প্রান্তর
কোন্ ঝড়ে ভেসে আসে শুধু অকারণে,
মৃত গাছ পাতাদের মৃদু মর্ম্মর,
একে একে ফিরে আসে পুরাতন মনে।
যাহারে মরেছি খুঁজে কত দিনে-রাতে,
ফিরেছে তাহারা মোর স্মরণের সাথে।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

ভারতে বীমা-প্রথার প্রসার

যুদ্ধের অভিঘাতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অপরিসীম ক্ষয় ও ক্ষতি প্রশমনার্থ বীমা-প্রথাই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

অসহায় অসমর্থ প্রতিপাল্য পরিজনবর্গের অভিভাবকহীন অবস্থায় ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার্থ এবং আকস্মিক দৈবদুর্বিপাকে অথবা প্রতিকূল ঘটনাচক্রে, বিনষ্ট ধন-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণার্থ বীমা-সংস্থান অধুনা সুবুদ্ধিসম্মত অপরিহার্য্য অত্যাবশ্যক এবং অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এমন এক দিন ছিল, এবং বহু দিন পূর্ব্বেও নহে,—যখন বীমা-দালালকে লোকে "উৎপাত" মনে করিত; এবং কেহ কেহ এই নারিহ জন-হিতৈষী ব্যক্তিকে ধূমকেতু, অথবা চা-বাগানের আড়কাঠির ন্যায় এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। বর্ত্তমান লেখকও এই শেষোক্ত দলভুক্ত। এখন বীমা-দালাল সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব সমাজে সম্মানার্হ জন-হিতৈষী বলিয়া সমাদৃত। সমাজতন্ত্রে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান; এবং রাজদ্বারেও তাঁহার সম্মান প্রচুর। তাঁহার বৃত্তি মহৎ।

নীলাকাশতলে, নীল সমুদ্রের উন্মুক্ত প্রশস্ত দিগন্ত-বিস্তৃত পথ, চিরদিনই বাণিজ্যের প্রধান বর্ত্ম। ঝড় তুফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের বিপত্তি হেতু বিনষ্ট পণ্যের ক্ষতিপূরণার্থ বীমা-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন। তার পর অগ্নি, চৌর, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি অনৈসর্গিক উপদ্রবে বিনষ্ট ধন-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণার্থ এই প্রথার প্রসার বৃদ্ধি হয়। এখন নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি-প্রসূত ক্ষতি এই বীমা প্রথার দ্বারা পূরণ হইতেছে। এমন কি, সমাজের অত্যাচারেরও কথঞ্চিৎ প্রতিকার এই বীমা-প্রথার কল্যাণে মিলিতেছে। সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবকের অকাল-মৃত্যুতে অতি বিপন্ন অসহায় অসমর্থ অপোগণ্ড শিশু হইতে অনাথা বিধবা প্রভৃতি অতি-নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আত্মীয়-স্বজনের অশন বসন, শিক্ষা ও সেবার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা এই বীমা-প্রথায় সম্পাদিত হইতেছে। জীবন-বীমা ব্যতীত মেয়াদী-বীমার উদ্ভাবন দ্বারা কন্যার বিবাহ, পুত্রের শিক্ষা, গৃহনির্ম্মাণ এবং বার্দ্ধক্যের শেষ সম্বলের সংস্থান এই সর্ব্বব্যাপী বীমা-প্রথায় সম্ভব হইয়াছে। বীমা প্রথা এখন যথার্থ ই যেন কল্পতরু।

পাশ্চাত্ত্য প্রথার অনুকরণে ইহা অবশ্য অনুষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্য-বিনাশের ক্ষতিপূরণার্থ বীমা-প্রথার প্রচলন ছিল; কিন্তু জীবন-বীমার প্রয়োজন হইত না। তখন কার স্ত্রী যৌথ-পরিবার-প্রথা বীমা-প্রতিষ্ঠান, ধন-প্রতিষ্ঠান এবং সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন প্রকট করে নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিপন্নের অশন-বসন এবং সেবা-চিকিৎসার অভাব ঘটিত না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসারের সহিত এদেশেও পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ক্ষুদ্র-স্বার্থে সঙ্কুচিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বন প্রথার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই; সুতরাং দুঃস্থ ও দুর্ব্বলের ভার আত্মীয়-স্বজনের স্কন্ধ হইতে বৃহত্তর সমাজের সমবায় সাহায্য ও সংস্থানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে।

ভারতে এই পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত বীমা-প্রথার আয়ুষ্কাল শতবর্ষও পূর্ণ হয় নাই। ভারতে সর্ব্বপ্রথম বীমা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহার প্রসার কিরূপ বিলম্বিত, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকট।

প্রবর্ত্তন	নাম	প্রদেশ
১৮৪৭ খৃঃ	ক্রিশ্চিয়ান মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স	পাঞ্জাব
১৮৪৮ খৃঃ	বম্বে ফ্যামিলি পেন্সন্ ফাণ্ড অফ গবর্ণমেণ্ট সারভাণ্টস্	বোম্বাই
১৮৪৯ খৃঃ	টীনেভেলি ডাওসিশান কাউন্সিল উইডোস্ ফাণ্ড	মান্দ্রাজ
১৮৫০ খৃঃ	ট্রাইটন ইন্সিওরেন্স	বাঙ্গালা
১৮৫৯ খৃঃ	বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি পেন্সন্ ফাণ্ড	"
১৮৭০ খৃঃ	জেনারেল ফ্যামিলি পেন্সন্ ফাণ্ড	"
১৮৭১ "	বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এস্যুর‍্যান্স সোসাইটি	বোম্বাই
১৮৭২ "	হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফাণ্ড	বাঙ্গালা
১৮৭৪ "	ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুর‍্যান্স ফাণ্ড	বোম্বাই
১৮৭৬ "	বম্বে উইডোস্ পেন্সন ফাণ্ড	"
১৮৮৩ "	ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল মিউচুয়াল এস্যুর‍্যান্স ফাণ্ড	"
১৮৮৪ "	ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড	মান্দ্রাজ
১৮৮৫ "	এসোসিয়াকাও গোয়েনা ডি মুটুও অক্সিলো	বোম্বাই
১৮৮৮ "	বিবি এণ্ড সি-আই রেলওয়ে কো-অপারেটিভ মিউচুয়াল ডেথ্ বেনিফিট্ সোসাইটি ফর ইণ্ডিয়ান ষ্টাফ	"
" "	মাঙ্গালোর রোমান ক্যাথলিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড	"
১৮৮৯ "	বম্বে জোরোয়াষ্ট্রিয়ান্ মিউচুয়াল ডেথ্ বেনিফিট্ ফাণ্ড	"
১৮৯১ "	হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এস্যুর‍্যান্স	বাঙ্গালা
" "	গুজরাটি পার্শি মিউচুয়াল ডেথ বেনিফিট্ ফাণ্ড	বোম্বাই
১৮৯২ "	ইণ্ডিয়ান্ লাইফ এস্যুর‍্যান্স কোম্পানী	সিন্ধু
১৮৯৬ "	ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী	পাঞ্জাব
১৮৯৭ "	এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ এস্যুর‍্যান্স কোম্পানী	বোম্বাই
১৮৯৯ "	মিউচুয়াল হেলথ এসোসিয়েশন, সিমলা	নূতন দিল্লী

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাইশটি মাত্র সর্ব্বপ্রকারের বীমা-প্রতিষ্ঠান অতি-বিলম্বিত অগ্রগতি সূচনা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যথা-প্রসূত স্বদেশী আন্দোলনের পর-বৎসর হইতে বীমা ব্যাপারে ভারতবাসীর ঐকান্তিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তখন ভারতবাসীর চৈতন্য উদ্দীপিত হয় যে, বিদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্নি, সামুদ্রিক ও জীবন-বীমা কারবারে বহু অর্থ আমাদের দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। ফলে ১৯০৬ হইতে ১৯৩৯, অর্থাৎ যুদ্ধ পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত, তেত্রিশ বৎসরে অন্যূন ১৭৫টি বীমা-প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর অর্থ সামর্থ্যে প্রতিষ্ঠিত, এবং ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ২২টি লইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৯৭টি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছিল। তন্মধ্যে ৩৮টির অস্তিত্ব ছিল ১৯১২ খৃষ্টাব্দের আইন বিধিবদ্ধ

হইবার পূর্ব্বে। এতদ্ব্যতীত ৫০৫টি ভবিষ্যৎ-সংস্থান-বীমা সমিতি (Provident Insurance Societies) আছে।

মানুষের লোভের অন্ত নাই। সদুপায়ে অর্থলাভ করিয়াও কোন কোন লোক অসদুপায়ে অধিকতর উপার্জ্জনের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। অবশ্য সর্ব্বদেশেই এরূপ জঘন্য প্রকৃতির লোক আছে,—কোথাও কম, কোথাও বেশী; এইমাত্র প্রভেদ। বীমা-কারবারের প্রবর্ত্তন ও প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কারবারে অনভিজ্ঞ, অথবা স্বল্প-অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অনুপযুক্ত অল্প মূলধন লইয়া বীমা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য-নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহার অধিকাংশই অচিরে বিপন্ন হইয়া, বহু বীমাকারীর (Policy holder) অর্থের অপব্যবহার করিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল। ফলে বহু লোক তাহাদের কষ্টার্জ্জিত ও কায়ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ হইতে বঞ্চিত, এবং কোন-কোন দুষ্ট লোক সেই অর্থে অন্যায় ভাবে লাভবান্ হইতে লাগিল। যথার্থ বীমা-প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন ব্যয়-সাধ্য হেতু বহু সুচতুর লোক ভবিষ্যৎ-সংস্থান-বীমা সমিতি (Provident Insurance Society) প্রতিষ্ঠান দ্বারা একটি অর্থনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। স্বভাবতই সরকারের দৃষ্টি এই অনাচারের প্রতি অচিরে আকৃষ্ট হইল এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জীবন বীমা-প্রতিষ্ঠান (Indian Life Assurance Companies Act) ও ভবিষ্যৎ-সংস্থান বীমা (Provident Insurance Act) আইন বিধিবদ্ধ হইল। কিন্তু আইনের বাঁধন যত শক্ত হয়, ধূর্ত্ত লোকের কৌশলও তত কূটনীতি অবলম্বন করে। সুতরাং পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, কঠোরতর ভারতীয়-বীমা-আইন (Indian Insurnce Act) বিধিবদ্ধ হয়। অপব্যবহার নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইতিমধ্যেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইহারও সংশোধন (Insurance Amandment Act, 1941) করিতে হইয়াছে। আইনের ফলে বীমা-ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটিয়াছে এবং বীমা-সহায়ে ধনজনের নিরাপত্তা সাধনার্থ লোকের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন আইনের প্রভাবে অনেক দুঃস্থ ও দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান সুস্থ ও সবল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত, অথবা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভ পূর্ব্বক বীমা-কারীর (Policy-holder) স্বার্থ নিরাপদ করিয়াছে। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ভাবে আইনের কার্য্য-পরিচালনার্থ কেন্দ্রীয় সরকার একটি উপদেষ্টা-সমিতি সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতের বাণিজ্য-সচিব এই সমিতির সভাপতি এবং বীমাতত্ত্বাবধায়ক (Superintendent of Insurance) সহকারী সভাপতি। এই দুই জন রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত সরকার আরও তিন জন সদস্য মনোনীত করেন এবং বিভিন্ন বীমা-প্রতিষ্ঠান সম্মিতি পাঁচ জন সদস্য মনোনীত করেন। সভাপতি ইচ্ছা করিলে, আরও দুই-এক জন অতিরিক্ত সদস্য কোন বিশেষ অধিবেশনের জন্য লইতে পারেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১২ জুন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আইনের অধীনে ২১৪টি বীমা-প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে ১১৮টি ভারতে সংগঠিত, ৯৪টি ভারতের বাহিরে সংগঠিত এবং দুইটি লয়েড্সের (Society of Lloyds) সহিত স্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ। ভারতে প্রতিষ্ঠিত ১১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭২টি বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, ৪৮টি বাঙ্গালার, ৩২টি মান্দ্রাজের, ১৭টি পঞ্চনদের, ১২টি দিল্লীর, ৭টি যুক্ত প্রদেশের, ৩টি মধ্যপ্রদেশের, ৩টি সিন্ধু অঞ্চলের, দুইটি বিহারের, একটি আসামের ও ১টি আজমীড় মাড়ওয়ারার। ভারতের বহির্ভূত ৯৪টি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৩টি যুক্তরাজ্যে সংগঠিত, ২.. ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ও কলোনীতে, ৩টি মহাদেশিক য়ুরোপে, ৬টি যুক্ত রাষ্ট্রে এবং একটি জাভায়। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ জীবন-বীমায় ব্যাপৃত। তাহাদের সংখ্যা ১৬১। বাকী ৩.. ১৮টি জীবন-বীমার সহিত অন্যান্য প্রকার বীমা কার্য্যও ... এবং অবশিষ্ট ১৯টি জীবন বীমা ব্যতীত অন্য প্রকারের বীমা-কার্য্য পরিচালন করে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ... পারস্পরিক সুবিধা-বিধায়ক (Mutual), অথবা সমবায় নীতি-মূলক (Co-cperative)। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি সরকারী চাকুরী সংশ্লিষ্ট অবসর-বৃত্তি ভাণ্ডার (Pensicn Funds) আছে, কিন্তু তাহারা বীমা-আইনের গণ্ডী বহির্ভূত। অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জীবন-বীমা ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের বীমা-কার্য্য পরিচালন করে। এই শ্রেণীভুক্ত ৯৪টি প্রতিষ্ঠানের ... ৭৮টি জীবন বীমা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার বীমা-কার্য্য করে, ... মাত্র কেবল জীবন-বীমায় নিযুক্ত এবং দশটি জীবন-বীমার সহিত অন্যান্য প্রকার বীমা-কার্য্য করে। জীবন-বীমায় লিপ্ত ... প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১টি যুক্তরাজ্যের সংগঠন, ৪টি ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ও কলোনীর এবং ১টি সুইজারল্যাণ্ডের।

জীবন-বীমায় ব্যাপৃত ভারতীয় ও অ-ভারতীয় উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানের ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত নূতন বীমা-চুক্তির সংখ্যা হইয়াছে ২,০৬,০০০; চুক্তি সমষ্টির একুন মূল্য ৩৬·১১ কোটি টাকা এবং বাৎসরিক আয় (Annual premium) ১·৮৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের চুক্তির (Policies) সংখ্যা ১,৯৮, ... চুক্তিবদ্ধ অর্থের পরিমাণ ৩২·৩২ কোটি এবং চুক্তিলব্ধ আয় ১·.. কোটি; নবলব্ধ চুক্তি-মূল্য সমষ্টির ১·৯৬ কোটি টাকা বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির অর্জ্জিত, ১.৭৭ কোটি বৃটিশ ডমিনিয়ন ও কলোনি অর্জ্জিত এবং একটি মাত্র সুইস্ প্রতিষ্ঠানের অংশ .. কোটি টাকা। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক লব্ধ নববীমার চুক্তি-প্রতি ১.৬৪৫ টাকা; এবং অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নবলব্ধ অর্থ-সমষ্টির গড় চুক্তি-প্রতি ৩,৯৬৩ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ... সংগৃহীত নবলব্ধ জীবন বীমা-চুক্তি সমষ্টির পরিমাণ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যায় ১৫,৫৩,০০০ এবং মূল্যে ভবিষ্য-উপরি লভ্যাংশ (Reversionary bonus additions) সমেত ২৮... কোটি এবং বাৎসরিক আয় ১৩·১৯ কোটি ছিল। এই একুনের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ,—১৩,৭২,০০০ চুক্তি, মূল্য ২২.. কোটি টাকা এবং বাৎসরিক আয় ১০·৬৯ কোটি টাকা। আলোচ্য বর্ষে বার্ষিক-বৃত্তিমূলক (New annuity business) নূতন কাজের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ২·৩২ লক্ষ টাকা। এই সমষ্টির ৪৫,০০০ টাকা ছিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ। বর্ষশেষে এই ব্যাপারে সমুদায় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব ছিল বাৎসরিক ১৭·৮৬ লক্ষ টাকা এবং তন্মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ ছিল ৬·১২ লক্ষ টাকা।

কোন কোন ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান ভারতের বাহিরে—প্রধানতঃ ব্রহ্মা, সিংহল, মালয় প্রণালী উপনিবেশ এবং ব্রিটিশ ইষ্ট

আফ্রিকায় কারবার পরিচালন করিত। গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই সকল স্থানে নূতন কারবারের একুন মূল্য হইয়াছিল ২'১১ কোটি টাকা এবং ইহার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ০'১৬ কোটি টাকা। উক্ত বৎসরের শেষে ভবিষ্য উপরি-লভ্যাংশ সমেত ১৮'৪০ কোটি টাকায় চুক্তি-সমষ্টি অক্ষুন্ন ছিল, এবং ইহার বাৎসরিক আয় ছিল ০'৯৬ কোটি টাকা।

মোটের উপর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক সংগৃহীত নূতন আমদানীর মূল্য হইয়াছিল ৩৫'১৩ কোটি টাকা এবং বর্ষশেষে নূতন ও পুরাতন সম্মিলিত কারবারের একুন অক্ষুন্ন ছিল ২৪৩'৯১ কোটি টাকা এবং তাহার মোট আয় ছিল ১২'৬৭ কোটি টাকা। গড়ে চুক্তি-প্রতি বীমা-বদ্ধ অঙ্ক ছিল ১,৮৮৫ টাকা এবং প্রতি হাজার টাকায় পণ-মূল্য ছিল গড়ে ৫২ টাকা। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই দুই অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ১,৬৮৬ টাকা এবং ৪৭'৮ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে জীবন-বীমা তহবিলে ৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ষশেষে একুন অঙ্ক দাঁড়াইয়াছিল ৮২'৪১ কোটি টাকায়। আয়-কর বাদ দিয়া এই সঞ্চিত লগ্নীকৃত অর্থের সুদ হইয়াছিল শতকরা ৪'৩৭। ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক অর্জ্জিত নিট্ সুদের হার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে এরূপ ছিল :—

বৎসর	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
বাৎসরিক সুদের হার	৪'৬১	৪'৭৬	৫'১২	৪'৬৮	৪'৩৭

কর্ম্মপরিচালনার একুন ব্যয় পণের আয়ের (Premium income) হিসাবে ঐ পাঁচ বৎসরে ছিল শতকরা :—

বৎসর	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
খরচের অনুপাত	৩২'৫	৩১'২	৩১'৭	৩৩'২	২৮'৯

সর্ব্বাধিক পণ আয় সম্পন্ন ৫টি ছয়েক প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক বাদ দিলে আয়ের অনুপাতে খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা :—•

বৎসর	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
খরচের অনুপাত	৪৩'৩	৪২'২	৪১'১	৪১'৮	৩৬'০

১৯৮টি ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪টির ১৯৪০ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল যথাসময়ে। এই ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টি মূল্য-নিরূপণ (Valuation) পর্য্যায় পৌঁছাইতে পারে নাই। বাকী ১৫৬টির মূল্য-নিরূপণ-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষশেষে তাহাদের একুন চুক্তি-সংখ্যা ছিল ১৩,১৪,০০০ এবং উপরি-লভ্যাংশ ও বার্ষিক বৃত্তিসমষ্টি ২০'১১ লক্ষ টাকার সহিত ২১৮'৩২ কোটি টাকার দায় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের জীবন-বীমা-তহবিল দাঁড়াইয়াছিল ৫৪'৭৫ কোটিতে এবং তাহাদের বাৎসরিক পণ-আয়ের পরিমাণ ছিল ১০'৭৯ কোটি। ১০০টি প্রতিষ্ঠান, মূল্য-নিরূপণ-ফলে উদ্বৃত্তের (Surplus) অধিকারী হইয়াছিল এবং ৫৬টির ভাগ্যে ঘাটতি ঘটিয়াছিল। উদ্বৃত্তের মোট সমষ্টি হইয়াছিল ৪১৪'২ লক্ষ টাকা। এই অঙ্কের ৩৯'৪ লক্ষ টাকা গিয়াছিল—বীমাকারিগণের অংশে; ২৭'২ লক্ষ অংশীদারগণের তরফে এবং বাকী টাকা গিয়াছিল হয় অতিরিক্ত মজুত ভাণ্ডারে, অথবা পরবর্ত্তী বৎসরের তহবিলে। ঘাটতির মোট পরিমাণ ছিল ৪৩'০ লক্ষ টাকা। ৩২টি প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি পূরণ হইয়াছিল অংশীদার-প্রদত্ত মূলধনের অংশ হইতে; বাকী ২৪টির পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

এই মূল্য-নিরূপণের ভিত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং ব্যয়ের পরিমাণ লাঘব ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ্ ও সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। কোন আকস্মিক অথবা অনিশ্চিত কারণে সম্পদ্ সম্পত্তির অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি, এবং লগ্নীকৃত অর্থের সুদের অসঙ্গত হ্রাস, হর্ষের অথবা বিষাদের কারণ হইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অচিরস্থায়ী কারণ অচিরে বিনষ্ট হইতে পারে। এই নিমিত্ত দূরদর্শী প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই কর্ত্তব্য, অস্থায়ী উন্নতির অতিরঞ্জনে বিরত হইয়া, ভবিষ্যতের আকস্মিক, অতর্কিত, অচিরস্থায়ী অথবা বিলম্বিত অবনতির নিমিত্ত গুপ্ত সঞ্চয়ের (Hidden reserves) সংস্থান করা। কিরূপে বীমালব্ধ অর্থ উপযুক্ত ও নিরাপদ কারবারে খাটাইয়া উচ্চ সুদ লাভ করা যায় এবং পরিচালন-ব্যয়ের হার ন্যূনতম করিতে পারা যায়,—ইহাই প্রত্যেক বীমা-প্রতিষ্ঠানের চিন্তনীয় বিষয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূল্য-নিরূপণ-নির্দ্ধেশের সহিত সমঞ্জস অবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তা সংস্থাপিত হইতে পারে না। কিরূপে পরিচালন-ব্যয়ের হার শতকরা ৬০।৭০ অংশ হইতে শতকরা ১৫ অংশে অবনত করা যায়, তাহাই বীমা-প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই বিবেচ্য। শতকরা ২০ অংশ মূল্য-নিরূপণ-হারের তুলনায় যদি কোন বৎসর নূতন-পত্তন-ব্যয়ের (Renewal expense ratio) অনুপাত শতকরা ৪০ অংশ হইতে ৩০ অংশে অবনমিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সূচিত হয়, তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত মূল্য-নিরূপণ-হার, পরিচালন-ব্যয়ের হার অপেক্ষা উচ্চতর থাকিবে, সে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তা সুনিশ্চিত নহে; তবে শেষোক্ত হারের শতকরা ৪০ অংশে অবস্থিতি অপেক্ষা শতকরা ৩০ অংশে অবস্থিতি অপেক্ষাকৃত কল্যাণপ্রদ।

সুদের হারের সহিত সম্পদের নিঃশঙ্কতার (Security of assets) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উচ্চ সুদের সহিত নিরাতঙ্ক নির্ভরতা একত্রে দুর্লভ। অথচ, বীমাকারীর পক্ষে সম্পদ্ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা অধিকতর স্পৃহনীয়, কারণ প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সামর্থ্যের নিরাপত্তার উপর যথাসময়ে তাহার দাবী মিটাইবার নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

এই প্রসঙ্গে সুদে বীমা-প্রতিষ্ঠানের অর্থ খাটাইবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নতিকল্পে এই অর্থের বিনিয়োগ সমর্থনযোগ্য; কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠানের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের তুলনায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ কারবারের সুনিশ্চিত স্বল্প সুদও বরণীয়। জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান-গুলির আর একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অনেক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারদের প্রতিশ্রুত অংশ-মূল্যের নিমিত্ত দেয় টাকার ন্যূনাধিক কিয়দংশ বাকী থাকা সত্ত্বেও, ঋণ দ্বারা সরকারে জমা দিবার টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদের দায় গ্রহণ করে। বীমাকারীর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা তাহার স্বার্থের প্রতিকূল। অকারণ সুদ-ভার বহন করিয়া, প্রতিষ্ঠানের অর্থ অপব্যয় না করিয়া, অংশীদারদের নিকট হইতে তাহাদের দেয় অংশ-মূল্য আদায় করিয়া জমার টাকা দাখিল করাই সঙ্গত। আর একটি বিষয়েও প্রতিষ্ঠানগুলির সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কোন আকস্মিক, অথবা অনিশ্চিত কারণে স্থাবর

সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইলে, মূল্য-নিরূপণ হিসাব-নিকাশ সময়ে অস্থায়ী মূল্য-বৃদ্ধির পূর্ব্বে যেরূপ মূল্য ছিল, তাহাই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। যদি মূল্য-বৃদ্ধি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-মূল্য এবং বর্দ্ধিত মূল্যের পার্থক্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ সামর্থ্যের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। মোটের উপর জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান-কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বপ্রকারে মিতব্যয়ের সাহায্যে, যাহাতে জীবন-বীমা-ভাণ্ডারে অর্থ বৃদ্ধি হয় এবং ব্যয়ের হার মূল্য-নিরূপণ-হিসাব-নিকাশের সমতুল হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা অতীব প্রয়োজন।

জীবন-বীমার কথা শেষ করিয়া এক্ষণে আমরা অগ্নি, (Fire) সামুদ্রিক (Marine) এবং অন্যান্য (Miscellaneous) বীমা-কারবারের আলোচনা করিব। জীবন-বীমা ব্যতীত, অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বীমালব্ধ পণের নিট্ মোট আয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছিল ৩·৭১ কোটি টাকা। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ ১·১৮ কোটি এবং অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ ২·৫৩ কোটি। এই সমষ্টির ১·৪৫ কোটি অগ্নি সংক্রান্ত, ১·৩১ কোটি সামুদ্রিক এবং ৮৫ লক্ষ টাকা অন্যান্য বিবিধ বীমালব্ধ। ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি অর্জ্জন করিয়াছিল—অগ্নি-বীমায় ৫৬ লক্ষ টাকা, সামুদ্রিকে ২৯ লক্ষ এবং অন্যান্য বীমায় ৩২ লক্ষ মাত্র। পক্ষান্তরে, অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি লাভ করিয়াছিল—অগ্নি-বীমায় ৯২ লক্ষ টাকা, সামুদ্রিকে ১·০২ কোটি এবং বিবিধ বীমায় ৫০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন দেশ হিসাবে এই ত্রিবিধ বীমা-কারবারের অংশ-বিভাগ ছিল এইরূপ :—

	অগ্নি	সামুদ্রিক	বিবিধ	মোট
	টাকা (লক্ষ)	টাকা (লক্ষ)	টাকা (লক্ষ)	টাকা (লক্ষ)
যুক্তরাজ্য	৬৯·৮	৪০·৫	৪২·৬	১৪৭·৯
ডমিনিয়ন ও কলোনীগুলি	১৫·৬	৪৮·৯	৭·২	৭১·৪
যুক্তরাষ্ট্র	৮·২	১·৯	·০০	১৮·১
মহাদেশিক য়ুরোপ	০·৪	·০০	...	০·৮
জাভা	০·৬	২·৩	...	২·৯
মোট—	৯১·৭	১০১·৬	৪৯·৮	২৪৩·১

উপরে উদ্‌ধৃত নিট্ অঙ্ক হইতে ভারতের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অগ্নি, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য বীমা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই; কারণ, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় উভয়বিধ প্রতিষ্ঠান তাহাদের ভারতে কৃত বীমার একটি প্রকৃষ্ট অংশ ভারতের বাহিরে পুনঃ বীমাকৃত (Reinsured) করিয়া দায়-ভার লঘু করে। যে সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বেশ মোটা রকমের অগ্নি-সংক্রান্ত ও সামুদ্রিক বীমা-কর্ম্ম করে, তাহারাও ভারতের বাহিরে কার্য্য করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই সকল প্রতিষ্ঠান ভারতের বাহিরের কার্য্য হইতে ১৩ লক্ষ টাকা নিট্ পণ-আয় লাভ করিয়াছিল।

বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ খাটাইবার কথা পূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি; প্রদত্ত অঙ্ক-তালিকা হইতে সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদের একটি প্রকৃষ্ট ধারণা জন্মিবে।

	টাকা (ক্রো[illegible]
সম্পত্তি বন্ধক	২·১৮
বীমা-চুক্তির উপর ঋণ (ছাড়ন মূল্যের অভ্যন্তরে—Within surrender values)	৭·১৭
কোম্পানীর কাগজ ও যৌথ কারবারের অংশের উপর ঋণ	০·২১
অন্যান্য ঋণ	০·৩৮
ভারতীয় সরকারী খৎ (Indian Government Securities)	৪০·১২
ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের খৎ	০·৪৯
ব্রিটিশ, ঔপনিবেশিক ও বিদেশী খৎ	৮·৯১
মিউনিসিপাল, পোর্ট ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট খৎ	৫·৯৭
ভারতীয় যৌথ কারবারের অংশ	১৮
ভূ ও গৃহ-সম্পত্তি	
এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য, বাকী চুক্তি পণ, বাকী এবং অর্জ্জিত সুদ ইত্যাদি	
আমানত, নগদ এবং ষ্ট্যাম্প	
বিবিধ	
মোট—	৭

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় বীমা [illegible]গুলির অর্থের অধিকাংশই শেয়ার বাজারে চলতি খাতে নিবদ্ধ—[illegible] ৫১·৭৯ কোটি টাকা। লগ্নীকৃত সম্পদ মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি-নিরূপণ ভাণ্ডারের (Investment Fluctuation Fund) অর্থ [illegible] কোটি টাকা, পূর্ব্বোক্ত সমষ্টির বহির্ভূত; অর্থাৎ ঘাট্‌তি-[illegible] সংস্থান ব্যতীত যাবতীয় সম্পদের শতকরা ৬৯ অংশ।

অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় সম্পদের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা। ইহার ১৮·৯৬ কোটি যুক্তরাজ্যের প্রতি[illegible], ১০·৮৫ কোটি ডমিনিয়ন ও কলোনী প্রতিষ্ঠানের, ০·২২ কো[illegible] যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের, ০·১৪ কোটি মহাদেশিক য়ুরোপের এবং [illegible] কোটি একটি মাত্র জাভা প্রতিষ্ঠানের। এই ২৬·১৯ কোটি [illegible] ২৩·২৭ কোটি টাকা হইতেছে—সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে [illegible] বীমায় লিপ্ত অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ।

এইবার আমরা ভবিষ্য সংস্থান-সমিতিগুলির (Provident Insurance Societies) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া [illegible] উপসংহার করিব। ১৯৩৯ সালে ৫০৫টি সমিতির অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ বীমা-বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বে পরিচালকবর্গের অনভিজ্ঞতা, উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্যের অভাব, অসম্ভব ও অসঙ্গত পরিকল্পনা প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক কারণে, নূতন আইনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। ২০টি জাল গুটাইয়াছিল, ৫৯টির সাকিম খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বহু প্রতিষ্ঠান আমানতি টাকা জমা দিতে পারে নাই। ৫১টি নিজেরাই রেজেষ্টারী [illegible] করিয়াছিল, ৩৫টির রেজেষ্টারী আইনানুযায়ী আদালতের [illegible] বাতিল করা হইয়াছিল। ভারতীয় যৌথ-কারবার আইন (Indian Companies Act) অনুসারে সংগঠিত ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে যৌথ কারবার রেজিষ্ট্রার (Registrar of Joint Stock Companies) বাতিল করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রকারের ৬৩টি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই জাল গুটাইয়াছিল। আমানতি টাকা জমা দিতে [illegible]

পারায় ৭৮টিকে বাতিল করা হইয়াছিল। আরও কয়েকটির ভাগ্যে এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। ফলে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষে মাত্র ১৩৮টি সুস্থ ও সবল প্রতিষ্ঠান কর্ম্মক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসান হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীমা কারবারের ছিল নিরঙ্কুশ সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাল। তাহার পরে যুদ্ধের জটিল ও কুটিল পরিস্থিতি-হেতু বিবিধ বাধা-বিঘ্ন ও সংশয়-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি বীমা কারবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যুদ্ধাবসানে ইহার দ্রুত প্রসার ও প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

অঙ্গে অঙ্গে ললিত ছন্দ

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'—নারীর শ্রী-সৌন্দর্য্যের এই রূপের আদর্শ শুধু যে প্রাচীন কবির দিনেই সকলে মানিয়া চলিত, তা নয়; এখনো 'পটিমটি-বৃটি' শোভিতাদের মধ্যেও দেহ-ছন্দ গড়িয়া তাহা রক্ষা করার দিকে তাঁদের লক্ষ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই! তবে দেহের যতি-ছন্দ রক্ষা করিতে যে নির্লিপ্ত অবসর এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, নানা কারণে শুধু তাহারি অভাব ঘটিতেছে। এ যুগে আমাদের দেশেও অলঙ্কার বা বস্ত্র-বাহুল্যের মায়া কমিয়াছে। অলঙ্কার এবং বস্ত্রভারে দেহের শ্রীসৌন্দর্য্য অনেকখানি যেমন ঢাকা থাকে, তেমনি প্রাণও যেন তাহার চাপে বাহির হইবার উপক্রম করে! কিন্তু ফ্যাশনের দাপট কমিলেও দেহের ছন্দ গড়িয়া তোলার দিকে মেয়েদের ঔদাস্য ক্রমে সীমা ছাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ণে-সুষমায় উজ্জ্বল, মুখখানি হয়তো প্রতিমার মত—কিন্তু অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাটো-মোটা এবং মুখের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান—অর্থাৎ মুখখানি শুধু খুলিয়া রাখিয়া গলা হইতে পা পর্য্যন্ত পর্দ্দায় ঢাকিয়া দিলে মনে হয়, ষোড়শী বা সপ্তদশী; কিন্তু গায়ের আচ্ছাদন খানিকখানি সরাইয়া লইলে বিকৃত গড়নের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তাহা দেখিয়া মনে হইবে বয়স গিয়া উঠিয়াছে যেন চল্লিশের কোঠায়—আমাদের সমাজে এমন বহু রূপসীর দেখা মিলিবে! সারা দেহের এই যে ঢিলা ঢালা ভাব—যার জন্য বাংলার মেয়েরা কুড়িতে বুড়ী বলিয়া প্রবচন সৃষ্টি করিয়াছেন—এ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে শুধু প্রতি অঙ্গ ললিত ছন্দে বাঁধিয়া তুলিতে হয় কি করিয়া, তাহা না জানিবার জন্য এবং অঙ্গ-পরিচর্য্যায় ঔদাস্যবশতঃ।

দেহের শ্রীসৌন্দর্য্য বলুন, মাধুরী বলুন—তাহা নির্ভর করে প্রত্যেকটি অঙ্গের সমঞ্জস বিকাশে। মুখ হাত পায়ের গড়ন চমৎকার, কিন্তু বুক-পেট একেবারে বিরাট স্থূল বা তার কোথাও কোনো শৃঙ্খলা নাই—দেহ-ছাঁদে এ বিকৃতি ঘটে শুধু দেহচর্য্যার অভাবে। এ বিকৃতি ঘটাইয়া অঙ্গে অঙ্গে ছন্দের সমতা সাধন করিয়া মাধুরী-শ্রী ফুটাইয়া সে মাধুরী-শ্রী রক্ষা করা সহজ হয়—বিশেষ কয়টি ব্যায়াম-সাধনায়।

আমাদের সমাজে যাঁরা ফ্যাশন-বিলাসিনী বলিয়া অহঙ্কারে মাতিয়া আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের অঙ্গে শ্রীছাঁদের চিহ্ন দেখি না—তাঁদের ফ্যাশনের গর্ব্ব শুধু ব্লাউশের রকমারি 'কাটে',—শাড়ী পরিবার অভাবনীয় ভঙ্গীতে—এবং ব্রুম-রুজ-পাউডার-পোমেডের বৈচিত্র্যে—coquettishপানায়। রঙ্গিণীর এ রঙ্গ দেখিয়া অনেকে মনে মনে হাসেন—সুন্দরী বলিয়া এ সব 'ককেট্'কে কেহ তারিফ করেন না!

অথচ ব্যায়াম-চর্য্যায় ছন্দ-ছাঁদে অঙ্গ গড়িয়া সে ছাঁদ বজায় রাখিতে পারিলে স্বাস্থ্য শ্রী যেমন অটুট থাকিবে, তেমনি যাঁরা সুন্দরী বলিয়া গণ্যা হইতে চান, তাঁদের সে মনোবাসনাও চরিতার্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই!

মার্কাশ অরিয়লাস ছিলেন প্রাচীন রোমের মস্ত এক জন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—Be not unmindful of the graces of life. Let the whole body make manifest the alertness of thy mind, yet let all this without affectation. অর্থাৎ বিধাতা যে শ্রীসম্পদ নিজে হইতে দিয়াছেন, সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়ো। তোমার সারা দেহ এমন হইবে যেন সে দেহে তোমার মনের সজীবতা ও তৎপরতা প্রকাশ পায়; অথচ এ প্রকাশ হইবে সহজ; এ প্রকাশে ছলাকলা-কৌশলের বাষ্পও থাকিবে না। এ কথার অর্থ—দেহ হইবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব—গতির দোলায় সহজ স্বচ্ছন্দ। ছন্দে যেমন কবিতার মাধুর্য্য, নারীর চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে ছন্দ থাকিলে তবেই তার সৌন্দর্য্য-মাধুরী।

অঙ্গে সুকুমার ছন্দ জাগাইয়া তাহা রক্ষা করিতে চাহিলে এই কয়টি ব্যায়াম-বিধি মানিতে হইবে।

১। ১নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া ডান পায়ের পাতা মেঝেয়

১। হাঁটু মুড়িয়া ডান পায়ের পাতা

পাতিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়িয়া বাঁ পা ঐ ছবির মত পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। কনুইয়ের কাছে মুড়িয়া ডান হাত রাখুন মাথার উপর; বাঁ হাত থাকিবে পিছন দিকে প্রসারিত। পিঠ হইতে মাথা সামনের দিকে ছবির ভঙ্গীতে ঝুঁকিয়া থাকিবে। এমনি ভাবে থাকিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে বুক

চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া দিন—যতখানি হেলাইতে পারেন। এমনি ভঙ্গীতে থাকিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া আবার ঐ ১নং ছবির ভঙ্গীতে অবস্থান; তার পর আবার ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে পুনরাবর্ত্তন। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিট পরে বাঁ পায়ের পাতা মেঝেয় রাখিয়া ডান পা সেই দিকে প্রসারিত করিয়া উক্ত রীতিতে বাঁ হাত মাথায় রাখিয়া ডান হাত প্রসারিত করিয়া পাঁচ মিনিট ব্যায়াম-চর্য্যা।

২। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান। ৩নং ছবির ভঙ্গীতে ডান পায়ে ভর রাখিয়া দাঁড়ান—ডান হাত প্রসারিত করিয়া মেঝে

২। বুক চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে

৩। ডান পায়ে ভর—ডান হাতে মেঝে ছোঁয়া

মেঝে স্পর্শ—ডান পা সিধা প্রসারিত করিয়া ডান হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গোণা—পর্য্যায়ক্রমে ডান পা

স্পর্শ করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা এই ছবির মতো সিধা প্রসারিত রাখিবেন—বাঁ হাত তুলিবেন উর্দ্ধে; এমনি ভাবে অবস্থান করিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত—তার পর বাঁ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো, বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া ডান হাত ও বাঁ পা বাঁ হাত এমনি ভঙ্গীতে রাখিয়া ব্যায়াম—পাঁচ মিনিট।

৩। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন দিকে মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত হেলাইয়া দিবেন; দুই হাত পিছন
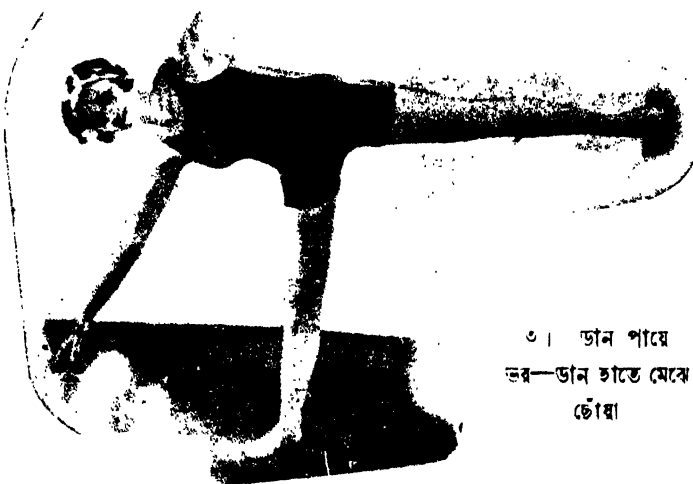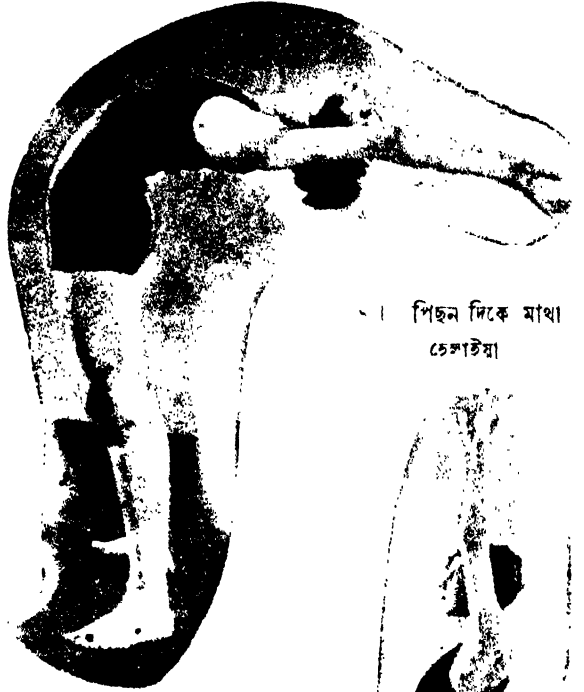
৬। পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া

দিকে প্রসারিত থাকিবে; দুই পা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন ৪নং ছবির রীতিতে। এমনি ভাবে থাকিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া সামনের দিকে হেলিবেন—দুই হাত মেঝেয় ঠেকিবে—মেঝেয় হাত ঠেকিবা-মাত্র সবলে ঝাঁকানি দিয়া আবার এ ছবির রীতিতে পিছন দিকে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত হেলানো। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৫। দুই হাত উর্দ্ধে প্রসারিত

৪। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত সংলগ্ন ভাবে উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া দিন—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালি তুলিয়া আঙুলির উপর মাত্র ভর রাখিয়া সমস্ত দেহখানিকে মৃদু ভঙ্গীতে নৃত্য-ছন্দে যতখানি পারেন উর্দ্ধে প্রসারিত করিবেন; তার পর ধীরে ধীরে আবার পায়ের গোড়ালি নামাইয়া সমস্ত পা পাতিয়া মেঝের উপর দাঁড়ানো—তার পর

গোড়ালি তুলিয়া আঙুলগুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৮। এবার ৮নং ছবির ভঙ্গীতে ওঠ-বোস্ করা। ওঠ-বোস্

৮। ওঠ-বোস্ করা

করিবেন পাঁচ মিনিট। হাত ও পায়ের অবস্থান হইবে ৮নং ছবির মত—সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

নিত্য যদি এ কয়টি ব্যায়াম অভ্যাস করেন, তাহা হইলে দেহখানি সুকুমার ছন্দে বাঁধা থাকিবে চিরদিন; চিরতারুণ্য লাভ করিবেন।

——

পাশের বাড়ী

সহরে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি গেঁষাঘেঁষি বাড়ী—তার উপরে আছে তিন-তলা, চার-তলা, পাঁচ-তলা ফ্ল্যাট; এই সব বাড়ীতে কিংবা ফ্ল্যাটে ক'খানা কামরা নিয়ে আমরা কত পরিবার যে সংসার পেতে বাস করছি, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই! নিজের বাড়ীতে জায়ে-জায়ে, ননদ-ভাজে বাস করতে পরস্পরের সুখ-সুবিধায় আর স্বার্থে কত আঘাত লাগে; আর এ তো অজানা অনাত্মীয় পাড়া-পড়শীর সঙ্গে বাস! অসুবিধার কি আর অন্ত আছে!

সন্ধ্যাবেলায় পাশের ঘোষাল-বাড়ীর উনুনে আগুন দিলে আমার বাড়ী তার ধোঁয়ায় ভরে আচ্ছন্ন হলো! ফ্ল্যাটের একতলা-ঘরে মিত্তির-গিন্নীর চাকর জ্বাললো উনুন, দোতলায়-তেতলায় আমার ঘরের মধ্যে সে ধোঁয়া এসে ঢুকলো। এর জন্য রাগে গা জ্বলে কি রকম, আমার মত যাঁদের নিত্যাদিন ভুগতে হয়, তাঁরা এক আঁচড়েই তা বুঝে নেবেন!

অথচ উপায় কি? পাশের বাড়ীর ঘোষাল-গিন্নীকে এ সম্বন্ধে একটু হুঁশিয়ার হতে বলেছিলুম, তাতে তিনি জবাব দিলেন—কোথায় গিয়ে উনুন ধরাবো, বলে দাও? ফ্ল্যাট-বাড়ীর মিত্তির-গিন্নীও ঐ জবাব দেন। বলেন, একসঙ্গে থাকতে হলে খানিকটা সহ্য করতে হবে দিদি! এই যে তোমার দোতলার ঘরে মেঝের তোমার ছেলে-মেয়েরা জুতা-পায়ে দাপাদাপি করে,—সে-দিন আমার ছোট ছেলে পিণ্টু জ্বরে একেবারে বেহুঁশ,—তোমার ছেলে-মেয়ের দাপাদাপিতে বেচারী একেবারে খুন হয়ে গিয়েছিল।

মিত্তির-গিন্নীর কথায় আমার যেন চমক ভাঙ্গলো! ভাবলুম সত্যি তো, মিত্তির-গিন্নীর উনুনে আগুন দেওয়া বন্ধ হতে পারে না, আমার ঘরে তার ধোঁয়া আসবে বলে! ওকে রান্না-বান্না করতে হবে! ও ধোঁয়া আমি সইতে না পারি, আমাকে অন্য বাসা দেখতে হবে। না পারি, ওদের ও-ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ওই সময়টায় ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই!

আমার বাড়ীর সামনে গাঙ্গুলিদের বাড়ী—দিন-রাত রেডিয়ো খুলে কি গণ্ডগোলেরই না সৃষ্টি করে। গাঙ্গুলিদের পাশের বাড়ীতে দত্তদের বাড়ী—সেখানে বারোটা রাত্রি পর্য্যন্ত চলছে কন্‌সার্টের রিহার্শাল! আমার সহ্য হয় না—তা বলে ওরা তো চুপচাপ থাকতে পারে না!

আমার বাড়ীতে বিয়ে-পৈতে উপলক্ষে ধুম-ধাম করে লোক খাওয়াচ্ছি—রাত দুটো-তিনটে অবধি হৈ-চৈ রব! তার পর বাড়ীর সামনে মাছের কাঁটা, উচ্ছিষ্টের স্তূপে একেবারে নরক সৃষ্টি করে তুলি! যারা আমার প্রতিবেশী, তাদের পক্ষে সে আবর্জ্জনার কদর্য্যতা সহ্য করা কঠিন। তারা এসে যদি বলে,—বাড়ীর কাছে ও সব উচ্ছিষ্ট ফেলাবেন না—দুর্গন্ধে টেঁকা দায় হবে! এ কথার উত্তরে ধমকি দিয়ে আমি বল্‌বো,—আপনার নাকে দুর্গন্ধ লাগবে বলে আমার বাড়ীতে কাজ বন্ধ থাকবে—বটে?

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে-পাড়ায় বাস করবো, সে-পাড়ার লোক-জনকে সয়ে তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে বাস করতে না পারলে স্বস্তি মিলবে না। কথায় কথায় নিজের 'হক্'-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে হক-রক্ষার জন্য কাটাকাটি-মারামারি করে কোনো লাভ হবে না—তাতে শান্তি বা স্বস্তির আশা সুদূর-পরাহত হবে।

সংসারে পাঁচ জনকে নিয়ে তাদের সঙ্গে মানিয়ে-বনিয়ে চলে যেমন শান্তি রক্ষা করতে হয়, পাড়ার সম্বন্ধেও ঠিক সেই ব্যবস্থা। যাঁরা তা না করতে পারবেন, তাঁদের উচিত লোকালয় ছেড়ে অরণ্য-প্রদেশে কিম্বা মরুভূমির বুকে গিয়ে বাস করা!

আসল কথা, আমি যদি সয়ে থাকি, মানিয়ে-বনিয়ে চলতে পারি,—মিষ্ট ব্যবহারে, শিষ্ট বচনে প্রতিবেশীকে আপ্যায়িত করতে পারি, তিনিও তাই করতে বাধ্য হবেন।

পরস্পর সম্প্রীতি আর দরদ থাকলে পাশাপাশি বাস করায় এতটুকু অশান্তির ভয় থাকবে না; অনেক সময় দায়ে ঠেকলে উপকার সাহায্য পাওয়া যাবে।

দোষ-ত্রুটি কার না হয়? সে দোষ-ত্রুটিতে মার-মূর্ত্তি ধরলে সুফল মিলতে পারে না। তার কারণ আমরা নিজেদের দোষ কখনো চোখে দেখতে পাই না; পরের দোষ অতি ক্ষুদ্র হলেও তা আমাদের চোখে বিরাট্ রূপে প্রকাশ পায়। প্রতিবেশীর সহস্র ত্রুটি যেমন আমাদের চোখে পড়ে, তেমনি আমাদেরো কত ত্রুটি প্রতিবেশীর চোখে পড়ছে! এ জন্য এক জন ইংরেজ যে-কথা বলে গেছেন—**The first step to get good neighbours is to learn to be good neighbours ourselves.** অর্থাৎ আমরা যদি চাই প্রতিবেশীরা ভালো হোক, তাহলে আমরা যাতে ভালো প্রতি-বেশী হতে পারি, তার যোগ্য শিক্ষা আমাদের থাকা প্রয়োজন।

ছোটদের আসর

চতুরালি

সলিল সেন আর গগন গুপ্ত দুই বন্ধু। বেকার—অর্থাৎ চাকরী বাকরী কিছুই নেই। অথচ বেশ পয়সা উপার্জ্জন করে। বালীগঞ্জে সুদৃশ্য একটি ছোট বাড়ীতে থাকে। দরজায় সাইন-বোর্ড লাগান আছে—"সলিল সেন এস্কোয়ার, প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ।"

সলিল সেন সত্যই স্কোয়ার ছেলে। কথায় কথায় গুপ্তকে বলে—"ব্রাদার, কলকাতায় পয়সা উড়ে বেড়ায়—ধরতে জানা দরকার।" গগনের বুদ্ধিটা ছেলেবেলা থেকেই গুপ্ত, প্রকাশ আর পেল না। শুধু মাথা নেড়ে সে সায় দেয়—"ধরতে জানা দরকার।"

সেদিন সকালে চা খেতে খেতে সলিল গগনকে বললে—"পঞ্চানন পোদ্দারকে চেনো?" গগন যেন গগন থেকে পড়ল! "পঞ্চানন পোদ্দার? কই, চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

সলিল তখন পরিচয় দিলে—"পঞ্চানন পোদ্দার যুদ্ধের বাজারে বেশ দু'পয়সা করেছে। বাপের ঘানি এখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক তেলের কল। বলদ বদলে হয়েছে বিদ্যুৎ। ছ'-আনা সের তেল বাজারে এখন বিকাচ্ছে দেড় টাকায়। বিরাট সরকারী এবং সামরিক কণ্ট্রাক্ট লাভ করে তোফা পয়সা পিটুচ্ছে। যত পয়সা আসে তত কিপটেপনা বাড়ে। এক-মুখ দাড়ী-গোঁফ, মোটা আধময়লা কাপড়, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত বনাতের কোট। গরীব-দুঃখীকে এক পয়সা দিতে কাতর। তবে কিছু দিন আগে কণ্ট্রাক্ট পাবার জন্য হাজার কুড়িক টাকা হাসিমুখে উপুড়-হস্ত করেছে। টাকায় টাকা আনে—অতএব যেখানে আসবার চান্স আছে, সেখানে টাকা ছড়াতে সে মোটেই গররাজি নয়। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে তামাক টানতে টানতে আদালতের বিচিত্র খবর পড়াই তার একমাত্র রিক্রিয়েশন।"

এত বড় কাহিনী শোনবার পরেও গগন যে তিমিরে সেই তিমিরে! জিগেস করলে—"তার সম্বন্ধে এত খবর জেনে লাভ? আমরা ত তেলের ব্যবসা করব না।" সলিল হেসে বললে—"সম্বন্ধ করে নিতে হবে। পাতাবার চেষ্টা করছি। ক'দিন থেকেই পোদ্দারের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভদ্রলোকের বাতিক আছে নিলামে শস্তায় জিনিস কেনার। কাল একটা কাঠের বাক্স কিনেছে।" গগন বিস্মিত হয়ে বললে—"এ সব কথা জেনে কি হবে?" "ধীরে বন্ধু, ধীরে"—সলিল উত্তর দিলে—"অনেক কাজে লাগবে। এই ত্যাখো, লাল পেনসিল দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দাগ দিয়ে রেখেছি।" এই বলে কাগজটা এগিয়ে দিলে। গগন পড়ে দেখলো—"বহরমপুর অঞ্চলে ছোট একটি দ্বিতল বাগান-বাড়ী বিক্রয়। দাম দশ হাজার টাকা অথবা কাছাকাছি।" কাগজটা হাতে নিয়ে হাঁ করে গগন বসে রইল। সলিল জিজ্ঞেস করলে, "কিছু বুঝলে?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গগন উত্তর দিলে—"না, একটি বর্ণও নয়।" একটু হেসে সলিল বললে—"আজকের ট্রেণে বহরমপুর যাবে। এই বাড়ীটা তুমি কিনতে যাবে। বাড়ীটার প্ল্যান আমার কাছে আছে। আমি এক দিন গিয়ে দেখেও এসেছি। আমার টেলিগ্রাম পেলে বাড়ীটা কিনে ফেলবে নচেৎ ফিরে আসবে। মনে রাখবে, তুমি আমাকে চেনো না।" গগন কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে সলিলে দিকে চেয়ে থেকে বললে—"কিছুই বুঝতে পারছি না। স হেঁয়ালী। হয় তুমি ক্ষেপে গেছ, না হয় আমাকে বেকুব বানা চেষ্টা করছ।"

"দু'টোর কোনটাই নয়। সব বলছি, শোন।" এই ব সলিল নিম্নস্বরে গগনকে অনেক কথাই বললে, যার ফলে দুপু ট্রেণে গগন বহরমপুর যাত্রা করল।

গগন চলে যাবার পর সলিল অত্যন্ত পুরাতন—প্রায় ছিঁড়ে যা এমন কাগজে ঘণ্টাখানেক ধরে হাতের লেখা বদলে কি সব লিখ তার পর সযত্নে লেখা কাগজটি পকেটে পুরে সেজেগুজে বাড়ী থে বেরিয়ে পড়ল।

সেদিন রবিবার। পঞ্চানন পোদ্দার আদুড় গায়ে তামাক টা টানতে দোকানের খাতাপত্র মেলাচ্ছিল এবং ট্যাক্স ইত্যাদি ফাঁকি জন্য দরকার মত অদল-বদল করছিল। এমন সময় ভৃত্য এ কার্ড দিল—"সলিল সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।" দেখা কর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ডিটেকটিভ—কি চায়? কৌতূহল নিবৃ বড়ই প্রবল; দমন করা ভারী শক্ত। "নিয়ে এসো" খাতা বন্ধ করে ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে বসল। অল্পক্ষণ পরে সলিল স পঞ্চানন পোদ্দারের সম্মুখে নীত হ'ল।

নাকের ওপরের চশমাটা একটু ঠেলে দিয়ে পোদ্দার মশাই বলল —"কার্ডে তো দেখছি আপনি এক জন সখের টিকটিকি। তা আমা সঙ্গে কি দরকার?" সলিল পকেট থেকে নোট-বই বার করে বললে—"আপনি মেট্রোপলিটান অকশন-হাউস থেকে নিলামে একটি বা কিনেছেন। সেই বাক্সর মধ্যে কয়েকটি দরকারী চিঠিপত্র আছে। বাক্সটি স্বর্গীয় নবাব মোজাম্মেল বদরুদ্দীন হাসান ইমামী সাহে সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। তিনি সিরাজদ্দৌলার পিসতুত ভাইয়ের বংশ ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় কুরবান আলি বলে এক জন বিশ্বা গরীব বন্ধুকে তিনি এই বাক্সটি রাখতে দেন। বন্ধুটি বহরমপু থাকতেন। বহু দিন তাঁরা এই বাক্সটি যত্ন করে রেখেছিলেন। তা পর ভ্রম বশতঃ হাত-ছাড়া হয়ে যায়। বাক্সর মধ্যের চিঠিপত্র ফেরত চাই। সেগুলি আপনার কোন কাজেই লাগবে না, কিন্তু তাদের কাছে সেগুলি অমূল্য।"

পঞ্চানন প্রশ্ন করলেন—"কাদের কাছে?"

সলিল সেন উত্তর দিলে—"নবাব সাহেবের বংশধরদের কাছে। যত টাকা লাগে, তাঁরা দিতে রাজী আছেন। আপনি বা কততে কিনেছিলেন?"

পঞ্চানন বললে—"যততেই কিনে থাকি তা জেনে আপনা কোন লাভ নেই। বাক্সটা আমার পছন্দ হয়েছিল—কিনেছি।"

সলিল বললে—"বাক্স আপনারই থাক্। কেবল চিঠিপত্রের জ আপনাকে তাঁদের হয়ে দু'শ টাকা অবধি আমি দিতে রাজী আছি।"

পঞ্চানন পাকা ব্যবসাদার। বুঝতে দেরী হলো না যে, চিঠিপ গুলির দাম নিশ্চয় অনেক বেশী। নাহলে এই মাগ্‌গি-গণ্ডা বাজারে এক-কথায় কেউ দু'শ টাকা ছাড়ে! বললে—"হ্যাঁ, কাগজপত্র তার মধ্যে আছে বটে, কিন্তু আমি এখনও পড়ে দেখিনি।"

কাল সকালে আসবেন। আজ রাত্রে ভালো করে সব পড়ে দেখে পরে জবাব দেবো। বেচবোই, এমন কথা বলছি না। বেচতে পারি—আবার না-ও বেচতে পারি।"

সলিল খুব একদফা ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—"দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন, কাগজপত্রগুলো এক বার আপনার সামনেই দেখতে পারি কি? ধরুন, যদি আসল কাগজ তার মধ্যে না থাকে তবে অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আশা করি, এ অনুরোধটুকু রাখবেন!"

পঞ্চানন হেসে বললে—"এতে আর আপত্তি করবার কি আছে! বেশ, বাক্সটা এইখানেই আনাচ্ছি।"

বাক্স এলো। দু'জনে দেখতে লাগল। যত সব বাজে চিঠি-পত্র। এই দেখার ফাঁকে সলিলের হাতের কৌশলে তার পকেটের কাগজ বাক্সের কাগজপত্রের মধ্যে মিশে গেল।

সলিল বললে—"আমার মনে হচ্ছে, এইগুলিই আপনারা চান। কাল সকালে আসবো, কি বলেন?"

পঞ্চানন উত্তর দিলে—"পকেটে দু'শ টাকা নিয়ে আসবেন। যদি আমি বিক্রী করি তো নগদ দামেই করব। তবে কোন কথা দিচ্ছি না, মনে রাখবেন।"

নমস্কার এবং ধন্যবাদ-পর্ব শেষ করে সলিল পথে বার হলো। লেট এবং আরজেন্ট ফী দিয়ে গগনকে টেলিগ্রাম করলে—"বাড়ীটা কিনে ফেল।"

প্রায় সমস্ত রাত ধরে পঞ্চানন বাক্সের কাগজপত্রগুলো পড়ল। একটি কাগজ পড়তে পড়তে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে লাগল। কত বার যে কাগজটা পড়লো তার সংখ্যা নেই। বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কাটলো। মোহন-জো-দোড়ো, ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, লুপ্ত সম্পত্তি, গুপ্ত ভাণ্ডার—পুনরুদ্ধার! এই সবের স্বপ্ন!

সকাল হতেই সলিল পঞ্চাননের বাড়ী উপস্থিত হলো। পঞ্চানন বাবু উত্তর দিলেন—"কাগজপত্র কিছুই আমি বেচবো না। বাক্সটা যখন কিনেছি, তখন কাগজগুলিও আমার সম্পত্তি।"

বিরস বদনে সলিল বললে—"তা বটে। কিন্তু—"

"এতে কিন্তু নেই মশাই। আচ্ছা নমস্কার!" পঞ্চানন উঠে পড়লেন। বিমর্ষ সলিল "অগত্যা" বলে পোদ্দারের গৃহ ত্যাগ করলে।

বাড়ীর বাহিরে পা দিতেই সলিলের বিষণ্ণ চেহারা আনন্দোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। নিজের মনে শীস্ দিতে দিতে সোজা সে ষ্টেশনে গিয়ে বহরমপুর-গামী ট্রেণে উঠে বসল।

সেখানে পৌঁছে গগনের সঙ্গে দেখা করে কয়েকটি দরকারী কাজ সেরে এবং তাকে পরামর্শ দিয়ে সেই দিনই সে কলকাতায় ফিরে এল।

পরদিন সকালে বহরমপুরে গগনের বাড়ীতে পঞ্চানন পোদ্দার এসে উপস্থিত। গগনকে বললে—"আপনার বাড়ীটি বেশ। কত দিন আছেন?"

গগন উত্তর দিলে—"বেশী দিন নয়। সম্প্রতি কিনেছি।"

"এ বাড়ীটা আগে কার ছিল?"

"তা ঠিক জানি না। শুনেছি, বহু দিন আগে কুরবান আলি বলে কোন্ ভদ্রলোকের ছিল। পরে অনেক হাত-বদল হয়েছে। আমি এক দালালের কাছ থেকে কিনেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। কলিকাতায় যা গণ্ডগোল! এখানে দিব্য নিরি-বিলিতে আছি মশাই।"

"আমিও এই রকম একটা বাড়ী খুঁজছিলুম। আমার নাম পঞ্চানন পোদ্দার। আচ্ছা, আপনি বাড়ীটা কতয় কিনেছেন?"

গগন বললে, "দশ হাজারে। কেন বলুন তো?"

পঞ্চানন বললে—"আমি এ বাড়ীটা কিনতে চাই। বড্ড পছন্দ হয়েছে। যে দামে কিনেছেন, তার উপর আরো কিছু টাকা আমি আপনাকে দেবো। আপনার লোকসান হবে না।"

গগন বিস্মিত হয়ে বললে—"দেখুন, ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সকলেই আমার এই বাড়ীটা কেনবার জন্য এত উৎসুক কেন?"

ব্যস্ত হয়ে পঞ্চানন প্রশ্ন করলে—"আরও কেউ কিনতে চেয়েছে না কি?"

গগন উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হাঁ। সলিল সেন বলে এক সখের টিক্‌টিকি এসেছিল কিনতে। কুড়ি হাজার টাকা দিতে সে রাজী। তার পর এক দালাল এলো, বললে, পঁচিশ হাজার দেবো। কাউকে পাকা কথা দিইনি। কিন্তু মশাই, ভয়ানক অবাক্ হয়ে গেছি। বহু দিনের পড়ো-জমি-শুদ্ধ এই বাড়ীটার ওপর এত সুনজর সকলের কেন? বাড়ীটা এমন কিছু ভাল নয়।"

পঞ্চানন বললে—"বহু দিনের পুরোনো বাড়ী—ঐতিহাসিক স্মৃতি-চিহ্ন! আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকা দি?"

গগন বললে—"একবার ওঁদের সঙ্গে দর করে দেখবো না? ওঁরা যদি আরও বেশী ছাড়েন?"

মিনতির স্বরে পঞ্চানন বললে—"দেখুন, বাড়ীটা দেখে অবধি আমার মনে নানা ভাবের উদয় হচ্ছে। পৈত্রিক ভিটের উপর মানুষের যেমন মায়া হয়, অনেকটা সেই রকম! আপনি আর দরাদরি করবেন না।"

কিছুক্ষণ ভেবে গগন বললে—"বেশ। তবে তাই হোক্।"

অতঃপর কলকাতায় গিয়ে উকিলের মারফত লেখাপড়া শেষ করে বাড়ী হাত-বদল হলো। গগন নগদ টাকা ভালবাসে—চেক-টেকের ধার ধারে না। কড়কড়ে ত্রিশ হাজার টাকা সে গুণে নিলে।

পরদিন সকালে বাক্সর একটি দলিল হাতে বহরমপুরের সদ্য-ক্রীত বাড়ীতে পোদ্দার মাপ-জোপ করলে। "বাড়ীর পিছনে জামরুল-গাছের উত্তর-পশ্চিম কোণে পঁচিশ হাত এগিয়ে" কোদাল চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটি কাঠের সিন্দুক বার হলো। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে এবং গুপ্তধন-প্রাপ্তির উত্তেজনায় পঞ্চানন হাঁফাতে লাগল। মাটী খুঁড়ে সিন্দুক বার করে তার ডালা ভাঙ্গতে দেখা গেল—ভিতরে কিছুই নেই। কেবল এক-টুকরো কাগজ। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখলে, দলিলের সঙ্গে হাতের লেখা হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাগজে লেখা ছিল—"অতি লোভের সাজা!" পোদ্দার মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল।

পঞ্চানন কলকাতায় ফিরে গগন গুপ্ত আর সলিল সেনের অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের কোন পাত্তা পায়নি।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ)।

কুকুরের মনন-শক্তি

স্নেহ, মায়া, বিশ্বাস, শেখবার শক্তি—মনোবৃত্তির এতখানি উৎকর্ষ নিয়েও কুকুর আমাদের সমাজে অস্পৃশ্য বলে' গণ্য—এতে আমাদের মনোবৃত্তির সুখ্যাতি করা চলে না! কুকুরের প্রভুভক্তি স্নেহ-মায়ার নানা কাহিনী তোমরা বইয়ে পড়েছো, কেউ বা চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছো! আমরাও এ আসরে কুকুরের নানা গুণের কথা তোমাদের বলেছি। আজ কুকুরের আরো ক'টি অপূর্ব্ব শক্তির কথা বলছি। সে সব কাহিনী শুনলে কে না বলবে, পশু হলেও কুকুর অন্য সব পশুর সেরা—তারো মন আছে! মানুষের মতো সে-মনের অসাধারণ প্রসার না থাকলেও কুকুরের মন এবং মননশক্তি তুচ্ছ করবার নয়!

তোমাদের মধ্যে যারা বাড়ীতে কুকুর পুষেছো, ধৈর্য্য ধরে যত্ন করে বাড়ীর কুকুরদের এমন অনেক কাজ শিখিয়েছো যা তারা
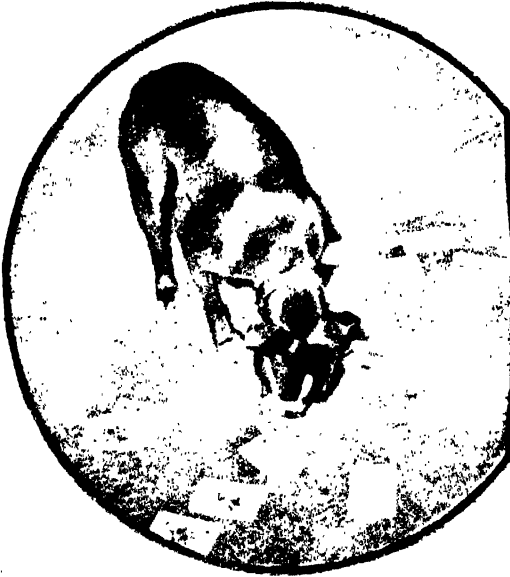
গন্ধ শুঁকে তাস তোলা

রুটিন মেনে করে! বল ছুঁড়ে দিলে সে বল কুড়িয়ে আনা; মুখে করে' মনিবের লাঠি বা লণ্ঠন বওয়া—এ সব কাজে কুকুরের কৃতিত্ব কতখানি, তোমাদের মধ্যে অনেকে তা প্রত্যক্ষ করেছো নিশ্চয়। এ সব কাজ সহজ, রুটিন-গত। এ সব কৃতিত্বের কথা বলছি না—কিন্তু শুনলে বিশ্বাস করবে কি যে কুকুর অঙ্ক কষে? ম্যাজিকে তারা ওস্তাদীর পরিচয় দিতে পারে?

আমেরিকার এক ভদ্রলোক তাঁর পোষা কুকুরকে তাসের খেলা শিখিয়ে আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করেছেন। এ খেলা কেমন, জানো?

এক-প্যাক তাস থেকে ক'খানি তাস বার করে ভদ্রলোক তাঁর পোষা কুকুরকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। কুকুরকে বার করে দিয়ে ভদ্রলোক তাঁর জমায়েত বন্ধুদের বললেন—এই ক'খানি তাসের মধ্য থেকে একখানি বেছে নিয়ে আপনারা দেখে রাখুন। বন্ধুরা একখানি তাস বাছলেন। বাছা সেই তাসখানি ভদ্রলোক হাতে নিলেন; নিয়ে খানিকক্ষণ পরে এ-তাসখানি তাসের প্যাকে মিশুলেন; মিশিয়ে সব তাসগুলি ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে ফেললেন। কুকুরকে এবার ঘরে নিয়ে এসে ভদ্রলোক ইঙ্গিতে জানালেন—বাছাই-করা তাসখানি খুঁজে বার করো। ইঙ্গিত পাবামাত্র কুকুর নাক গুঁজে ঘরময় ঘুরে রাশীকৃত ছড়ানো তাসের মধ্য থেকে সেই বাছাই-করা তাসখানি খুঁটে মুখে করে নিয়ে এলো। এ ব্যাপার দেখে বন্ধুরা বিস্ময়ে হতভম্ব!

কি করে কুকুর বাছাই তাসখানি বার করলে, জানো? ঘ্রাণ-শক্তির জোরে।

বাছাই-করা তাসখানি হাতে নিয়ে ভদ্রলোক তাতে খাবারের বা অন্য কোনো জিনিষ, যাতে গন্ধ আছে, সেই গন্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষার গুণে কুকুর সেই গন্ধটুকুকে মজ্জাগত করে এবং ইঙ্গিত পাবামাত্র সেই গন্ধ শুঁকে বাছাই-করা তাস বার করে

জুতা খোঁজা

যোগে অঙ্ক

দেয়! তাসের এ খেলা তোমরাও দেখাতে পারো। খানিক ধৈর্য্য ধরে কুকুরকে যদি শেখাও, দেখবে, কুকুর এ খেলা ঠিক শিখবে! এমনি গন্ধ-শিক্ষার গুণে কুকুর এক-জাতের বহু জিনিষের মধ্য থেকে—যেমন জামা কাপড় জুতো রুমাল—বাছাই-করা জিনিষটি ইঙ্গিত পাবামাত্র নির্ভুল ভাবে নির্দ্দেশ-নির্দ্ধারণ করে দিতে পারে!

কুকুর অঙ্ক কষে। অবশ্য প্রাকটিশ, রুল অফ থ্রী কিম্বা টৈরের অঙ্ক নয়—যোগ-বিয়োগের অঙ্ক। উপরের ছবিতে দেখছো, মনিবের হাতে প্লেট—প্লেটে ইংরেজীতে ৩ আর ২—দু'টি অঙ্ক লেখা। প্লেটখানি কুকুরকে দেখিয়ে মনিব বললেন—যোগফল কত? অঙ্ক দেখে কুকুর পাঁচ বার ডেকে ঠিক জানিয়ে দেবে, যোগ ফল ৫।

কুকুরকে এ সব বিদ্যা শিখিয়ে যিনি ওস্তাদ করে তুলেছেন, তাঁর নাম মরিশ ব্লাম্ক। তিনি এক জন চিকিৎসক। মনোবিজ্ঞান আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। অঙ্ক শেখানো সম্বন্ধে তিনি বলেন—আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরদের প্রথমে তিনি ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক শেখান; তার পর কালো বোর্ডে খড়ির রেখায় ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক লিখে—ইংরেজী হরফে; তোমরা বাংলা

তরফে শেখাতে পারো—সেই সঙ্গে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে আর মুখে প্রত্যেকটি অঙ্ক উচ্চারণ করে করে কুকুরদের তিনি অঙ্কবিদ্যায় এমন নিপুণ করে তুলেছেন যে, তিনি যদি

তাসের খোঁজে

বলেন, দশ বার ডাকো, কুকুর ঠিক দশ বার ডাকবে! ইংরেজী তরফের অঙ্ক দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কত'র অঙ্ক, বলো? বোর্ডে-লেখা অঙ্ক দেখে ঘেউ ডাক ডেকে সে জবাব দেবে,—অঙ্কের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে! শেখাতে অবশ্য সময় লাগে। এক একটি অঙ্ক মরিশ সাহেব শিখিয়েছেন তিন-চার সপ্তাহে! তবে কুকুর একবার যা শেখে, তা কখনো ভোলে না! এ বিষয়ে অনেক বোকা ছেলের চেয়ে কুকুরের স্মরণ-শক্তি যে খুব বেশী প্রখর, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই! কি বলো?

মরিশ সাহেব কুকুরদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে পণ্ডিত-সমাজে তারা যাতে পাংক্তেয় হয়, অক্লান্ত পরিশ্রমে সে চেষ্টা

আঙুল নেড়ে অঙ্ক শেখানো
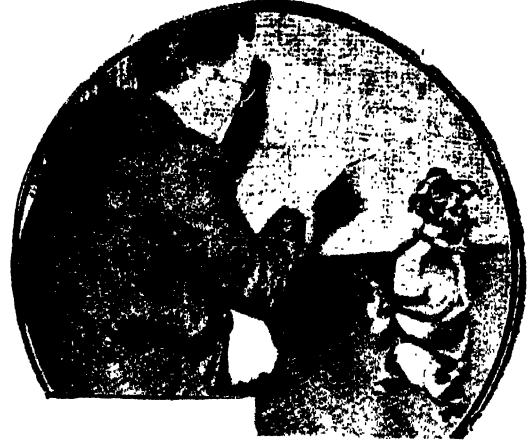
করছেন। হিষ্ট্রী জিওগ্রাফি বা কম্পোজিসন প্রবন্ধ রচনা করতে না পারলেও কুকুর যে নানা বিদ্যায় মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, মরিশ সাহেবের মনে সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নেই! গাধা পিটে ঘোড়া হয় কি না, তার প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি! কিন্তু মরিশ সাহেবের মত দরদী এবং অধ্যবসায়ী গুরুর হাতে পড়ে কুকুর হয়তো এক দিন 'মানুষ' হয়ে উঠবে! হলে মন্দ হবে না!

প্রাগৈতিহাসিক

রক্তে মোর দোলা দেয় প্রাচীন বর্ব্বর রসাবেশ,
আমার বিরাট্ ছায়ে ঝরি পড়ে দুরন্ত কিংশুক;
বিস্মৃত দিবস রাখে দিগন্তের চুম্বনাবশেষ
স্মৃতির মরণ-গেহে হতে চায় অমৃত-উৎসুক।
ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি; বনস্পতি গূঢ় অন্তরালে
নিঃসাড়ে মৃত্যুর দূত ঘুরে মরে শাণিত ক্ষুধায়;
শিকারী নয়নে তার প্রলুব্ধ আলোর ছুরি জ্বলে।
তারকার হৃত প্রাণ ভয়ঙ্কর করিল সন্ধ্যায়!
অজানা পল্লবগাত্রে ঝরি পড়ে ক্ষুর-ধার জ্বালা,
ধরিত্রীর স্তনবৃন্ত ভাঙ্গি ঝরে লাভার প্রবাহ।
কীটদষ্ট পুষ্পরাজি গাঁথিয়াছে আসক্তির মালা;
বিষদিগ্ধ প্রকৃতির কি উদ্দাম মিলন আগ্রহ!

আমার প্রেয়সী তুমি যাচিয়াছ শক্তির গৌরব,
কটাক্ষে চাহিয়া শুধু আনিয়াছ অগ্নিময় কণা;
চাপিয়া মৃত্যুর বেণী শুষিয়াছি অমৃত-আসব।
বেদনা-বিদ্যুতে মোর রক্তধারা হলো মদালসা।
তীব্র তব দেহাধারে জ্বালায়েছ কামনার শিখা।
সত্যের নিষ্ঠুর রূপে করো নাই মিথ্যার বেসাতি।
কালের বালুর 'পরে নাহি তব পদচিহ্ন লিখা
অমর্ত্ত তমিস্রামাঝে মিলে গেছে তোমার আরতি।
আমারে ফিরায়ে লহ তোমার চিরায়ু বক্ষ'পরে,
আবার রক্তের ঝড়ে হয়ে যাই উদ্দাম মাতাল—
আবার আসুক শান্তি জীবনের জয়ধ্বনি ভরে;
মৃত্যু দাও—প্রাণ দাও—পূর্ণ করো ছন্দহীন কাল।

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞান-জগৎ

ট্রাক্টরের টিউব

যুদ্ধের জন্য কামান-বন্দুক এবং প্রয়োজনীয় রশদপত্র বহিবার উদ্দেশ্যে আজ যে সব অতিকায় ট্রাক্টর ছুটাছুটি করিতেছে, সে সব ট্রাক্টরের গতি-পথ মসৃণ বা প্রশস্ত নয়। দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পথেও এ সব ট্রাক্টরকে নিত্য যাতায়াত করিতে হয়। বন্ধুর পথে টিউব ফাটিবার ভয় খুব
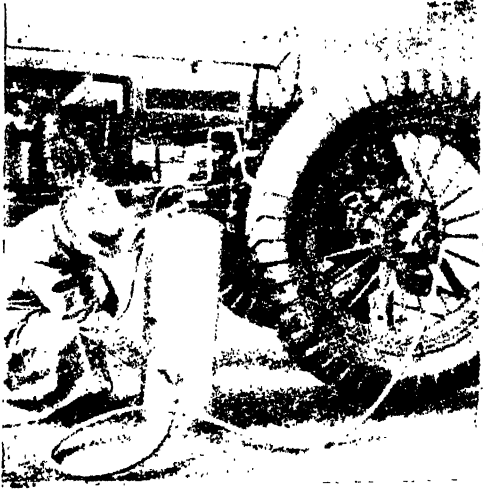
টিউবে জলভরা

বেশী। এ জন্য এ সব ট্রাক্টরের টিউবের মধ্যে বাতাস নয়, রীতিমত জল ভরিয়া টিউবের মুখে পাঁচ আঁটিয়া সে-জলকে কায়েমি ভাবে রক্ষা করা হইতেছে! টিউবের মধ্যে জল থাকিবার ফলে ঢিলাঢালা পথে বা পাথরে পাহাড়ে ঠোক্কর খাইলেও টিউব ফাটিবার আশঙ্কা কম! টিউবে জল থাকার দরুণ ট্রাক্টরগুলি বন্ধুর পথে কম্প-কম্পের জখম

জলে ক্যালসিয়াম্-ক্লোরাইড মেশানো

হইতে নিস্তার পাইতেছে! টিউবে জল ভরিবার পূর্ব্বে জলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্ মেশানো হয়, তার ফলে ঠাণ্ডায় টিউবের জল জমিয়া যায় না।

বর্ষার কাদা

বর্ষার দিনে ভিজা কর্দ্দমাক্ত পথে চলিতে কাপড়ে মোজায় পেণ্টলানে কাদা ছিটকাইয়া লাগে। কাদা লাগার দরুণ সে কাপড়-মোজা-পেণ্টলান না কাচাইয়া আর ব্যবহার করা চলে না! এ কাদার স্পর্শ বাঁচাইবার জন্য এলুমিনিয়ামের তৈরী এক-রকম পদাবরণ বিলাতের বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইতেছে। ব্যাণ্ড-আঁটা এ আবরণ পায়ে বাঁধিয়া জল-কাদা-ভরা পথে চলিতে কাপড়ে মোজায় বা পেণ্টলানে সে-কাদা ছিটকাইয়া লাগিবার আশঙ্কা নাই!

পদ-রক্ষা

জল কৈনু থল!

কালান্তক যুদ্ধে সকল দেশে হাহাকার উঠিয়াছে! এক দিকে যেমন সর্ব্বনাশ, প্রাণের সীমা-পরিসীমা নাই,—তেমনি আবার অন্য দিকে রণ-বৈজ্ঞানিকদল নয়কে হয় করিয়া কৃষ্টি-কৌশলের অপূর্ব্ব পরিচয় দিতেছেন! যে-প্লেন শুধু মাটির মায়া ত্যাগ করিয়া আকাশে উঠিত,—সে-প্লেনের নীচে তাঁরা পোনটুন্ (pontoon) জুড়িয়া প্লেনকে তাঁরা জলের বুকেও নৌকার মত ভাসাইয়া রাখিতেছেন! শুধু তাই নয়—পোনটুনের নীচে এমন চাকা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে

প্লেনে পোনটুন আঁটা

যে, ইচ্ছামাত্র প্লেন জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়া উঠিতেছে। জল এবং স্থল—দু'জায়গা হইতেই প্লেন এখন অবাধে এবং নিরুপদ্রবে আকাশে উঠিতেছে!

কাগজের বগ্‌লি

যুদ্ধে ফৌজের ব্যবহারার্থে কত রকম রশদ-পত্রের জন্ত কত রকম পাত্রের প্রয়োজন। গুলীগোলা বারুদ-বন্দুক তো আছেই,—তার উপর লেবুর রস, মোটর-তৈল, সুরা, কফি, ঔষধপত্র, পানীয় প্রভৃতি। এত টিন

খোলা বগ্‌লি

ও এলুমিনিয়াম-পাত্র জোগানো সম্ভব নয়। যুদ্ধে এলুমিনিয়াম এবং টিনের আরো বহু প্রয়োজন আছে অন্য দিকে। কাজেই আমেরিকান্ বিজ্ঞান-শিল্পীরা অটুট মজবুত কাগজ তৈয়ারী করিয়াছেন। সেই কাগজের বগ্‌লিতে ফৌজের জন্ত সুরা, ঔষধ, লেবুর রস, পানীয় প্রভৃতি

বগ্‌লি-ভরা কত-কি

রশদ সামগ্রী ভরিয়া অনায়াসে তাহার রক্ষা-সাধন হইতেছে। সেগুলির মারফৎ ঐ সব সামগ্রী অনায়াসে চালান এবং এ-সব পাত্রে ও-সব সামগ্রী রক্ষা করা যাইতেছে। টিনের পাত্রের মত এ সব কাগজের বগ্‌লি ফাঁশে না; মজবুত এবং অটুট থাকে।

জীবন-রক্ষক আলো

জাহাজে চড়িয়া যারা যুদ্ধ করিতেছে কিম্বা দৈব-দুর্বিপাকে যাদের জলে পড়িবার আশঙ্কা আছে,—এমন ফৌজের উর্দীর সঙ্গে জীবন-রক্ষক বা লাইফ-প্রিজার্ভার-জামা সব সময়ে মজুত থাকে। নিশীথ রাতের অন্ধকারে জলে পড়িলে তাদের যাহাতে নিশানা মেলে, এ জন্য ফৌজের জল-পোষাকের সঙ্গে সম্প্রতি বিশেষ ভাবে তৈয়ারী ইলেক্‌ট্রিক-ল্যাম্প সংলগ্ন করা হইতেছে। জলে পড়িবামাত্র এ ল্যাম্প আপনা হইতে জ্বলিয়া ওঠে। জিঙ্ক এবং কার্বন সংযোগে এ ল্যাম্পের ব্যাটারি প্রস্তুত হইয়াছে; কাজেই লোণা জলের

জামায় আলো

স্পর্শ লাগিবামাত্র ব্যাটারি সক্রিয় হয়—সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে। চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা এ আলো অবিরাম অনির্ব্বাণ ভাবে জ্বলে; সুতরাং জলে বানচাল্ হইয়া মরণের আশঙ্কা কমিয়াছে।

ভিজা মাটী নিমেষে শুকায়

যদি বৃষ্টি হইল তো রেশের মাঠ, খেলার মাঠ ভিজিয়া ঢোল! মাঠ হয় কাদায় কাদা—পঙ্ক-কর্দ্দমের কুণ্ড! সে-মাঠে রেশ বা খেলা চলে না! ফুটবলের দিনে বৃষ্টি ঝরিলেই আমাদের এ দেশে

মাঠের জল শুকাইবার গাড়ী

অনেকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়! মোহনবাগানের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া তাঁহাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়! আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা বৃষ্টি-ভেজা চপ্‌চপে কাদায়-কাদা রেশ ও খেলার

মাঠকে যন্ত্রযোগে নিমেষে এখন শুষ্ক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। ষ্টীম-রোলারের রীতিতে গড়া চক্রযান চালাইয়া তাঁরা মাঠের জল শুকাইয়া আর্দ্রতা ঝরাইয়া মাঠকে নিমেষে খট্‌খটে শুষ্ক করিয়া তুলিতেছেন। ইস্পাতের প্লেটের নীচে কেরোসিনের মশাল জ্বালাইয়া তাঁরা তৈয়ারী করিয়াছেন জল-শুকানো গাড়ী; ভিজা মাটীর উপর দিয়া এই গাড়ী চালাইয়া দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে মাটীর তিন ফুট নীচে হইতে জল শুষিয়া টানিয়া তাহার আর্দ্রতা মোচন করিতেছেন। কেরোসিনের মশালের আঁচে যে-তাপ বাহির হয়, তার মাত্রা ফারেন্‌হাইটের মাপে ৩০০০ ডিগ্রী। কাজেই জল শুকাইতে বিলম্ব ঘটে না।

গ্যাসে ভয় নাই

যুদ্ধে-আহত ব্যক্তিদের ষ্ট্রেচারে তুলিয়া হাসপাতালে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ষ্ট্রেচারে ব্যবহারোপযোগী ক্যাম্বিশের বায়ু-বন্ধ এক-রকম আচ্ছাদন তৈয়ারী হইয়াছে; আচ্ছাদনের উপরিভাগে এবং চারি দিকে সেলুলয়েডের সার্শি আঁটা। এ আচ্ছাদনটি ষ্ট্রেচারে

গ্যাসের ঢাকা

শায়িত আহত ব্যক্তির মুখের উপর স্বচ্ছন্দ ভাবে আঁটিয়া বিষাক্ত বাষ্পের স্পর্শ বাঁচাইয়া তাকে নিরাপদে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া চলে। ষ্ট্রেচার বহিবার সময় রোগীকে অক্সিজেন-বাষ্প-প্রয়োগ করিবারও সুব্যবস্থা হইয়াছে।

গাছে গাছে টেলিফোন

রণক্ষেত্রকে মার্কিণরা নানা ভাবে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। দূরকে তারা নিকট করিয়াছে! রণক্ষেত্রের পথে-ঘাটে যত্র-তত্র গাছে গাছে টেলিফোন আঁটিয়াছে। এই টেলিফোনের কল্যাণে যুদ্ধ করিতে গিয়াও আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে যতখানি সম্ভব সম্পর্ক রাখা

গাছে টেলিফোন

সম্ভব হইয়াছে,—সে জন্য বিদায়-ব্যথা মনে তেমন কঠিন হইয়া বাজে না!

ছিন্ন শিরা

আহত সেনাদের পরিচর্য্যা-ব্যাপারে রাশিয়ান্ চিকিৎসকেরা মানুষের ছিন্ন শিরা-উপশিরাগুলিকে জোড়া-তালি দিয়া বেমালুম সুস্থ ও আরোগ্য করিয়া বিজ্ঞান-জগতে অভিনব কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। মৃত মানবের দেহ হইতে এবং কয়েক জাতির পশুদেহ হইতেও অবিচ্ছিন্ন শিরা কাটিয়া লইয়া আহত ব্যক্তির ছিন্ন শিরার সঙ্গে তাহা জুড়িয়া দিয়া বা বদল করিয়া আহতদের ছিন্ন বা বিনষ্ট শিরা-উপশিরাকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সক্রিয় করিতেছেন। এ বিষয়ে মস্কো এবং লেনিনগ্রাডের মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান-বিশারদ প্রোফেশর কে লাভরেনতিয়েভ সকলের অগ্রণী। লেনিনের মৃত্যু হইলে লেনিনের মস্তিষ্ক এই লাভরেনতিয়েভ অটুট ভাবে নিষ্কাশিত করিয়া রাশিয়ার সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান-মন্দিরে তাহা সুরক্ষিত করিয়াছেন। রাশিয়ায় যে সব সেনার শিরা-উপশিরা কাটিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্ন হওয়ার দরুণ তাহাদের প্রাণের আশা মাত্র ছিল না, লাভরেনতিয়েভের উদ্ভাবিত রীতিতে মৃত মানবের ও পশুর অটুট শিরা-সংযোগে তারা সুস্থ সবল হইয়া আবার গিয়া যুদ্ধে নামিতেছে!

প্লেনের বন্ধু

বিমান-ঘাঁটী হইতে যে-সব প্লেন বিপক্ষ-দমনে বাহির হয়, তাদের সঙ্গে খবরাখবর রাখিবার জন্য আমেরিকান বিমান-ঘাঁটিগুলিতে চক্রপিঞ্জর

চক্র বাল

রচনা করা হইয়াছে। এ চক্র-পিঞ্জর হইতে বেতার শর্ট-ওয়েভ-সূত্রে বাঁটীর আবহাওয়া এবং অবস্থা সম্বন্ধে বহু দূর পর্য্যন্ত সংবাদের আদান-প্রদান চলে।

ব্লড-ব্যাঙ্কের রক্ত

আহতের পরিচর্য্যার জন্য দেশে দেশে ব্লড-ব্যাঙ্ক খুলিয়া সুস্থ জনসাধারণের দেহ হইতে রক্ত লইয়া সে রক্ত সঞ্চয় করা হইতেছে। এই সঞ্চিত রক্তের কল্যাণে আমেরিকার বিশেষজ্ঞেরা বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সঞ্চিত এই রক্ত হইতে 'লাল কণিকা' (red cells) লইয়া তাহা প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা দুষ্ট দুরারোগ্য ক্ষত সম্পূর্ণ ভাবে সারাইয়া তুলিতেছেন। বহু দুরারোগ্য রোগও সুস্থ ব্যক্তির রক্ত-সংযোগে সারে। রক্তের এই লাল-কণিকার প্রয়োগে দেহের দুঃসাধ্য দুরারোগ্য ব্যথা-বেদনা সম্পূর্ণ সারিতেছে। সুস্থ দেহ হইতে সংগৃহীত রক্তের এই লাল-কণিকাগুলির শক্তি অমোঘ। যাহার রক্তহীনতা রোগ-কিছুতে সারিতে চায় না, এই লাল-কণিকা-সংস্পর্শে অতিশয় অল্পকালের মধ্যে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেছেন।

—

যারা গুজব রটায়

মার্কিন বিজ্ঞান-সভায় মিথ্যা গুজব রটানোর রহস্য সম্বন্ধে সম্প্রতি সুগভীর অনুশীলন হইয়া গিয়াছে। নানা পরীক্ষা-গবেষণার ফলে সভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যারা মিথ্যা গুজব রটায়, তারা মনে-জ্ঞানে নিজেদের অক্ষম ও দুর্ব্বল বলিয়া জানে; যারা অপরের মতামত—সামান্য ভ্রূ-ভঙ্গীটিকেও ভয় করে, তারাই মিথ্যা গুজবের গোলাম! নিজেদের যারা কখনো নিরাপদ মনে করে না, যাদের মস্তিষ্ক-শক্তি হীন, বিচার-বুদ্ধি অল্প, তারাই গুজব রটাইতে এবং গুজব শুনিতে ভালোবাসে। সুস্থ সবল চিত্তের মানুষ গুজব রটায় না, গুজবে বিশ্বাস করে না—গুজবে তাদের আন্তরিক বিরাগ এবং ঘৃণা।

এ নহে বিদায়

নির্ম্মম শীতের বায়
বনানীর যত পত্র জানি ঝরে যায়,—
অলক্ষ্যে তাহারি মাঝে পুনঃ জন্ম লয়
চঞ্চল রক্তিম-দীপ্ত শত কিশলয়!

এ নহে বিদায়!
জীবনের কর্ম্মময় একটি নিমেষ—
শুধু তার শেষ!
কে বলে বিদায় এরে?
অনন্ত জীবন-স্রোতে যুগ হতে যুগান্তরে
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন যেতে হবে নাহি তায় ভুল!
পথের দু'ধারে কভু হয়তো বা ফুটে রবে ফুল,
কভু বা কণ্টক, কভু শত বাধা আরো দুর্নিবার
গতি বন্ধ করিবে তোমার!
সব উপেখিয়া দাঁড়াবে রুখিয়া—
চলিতে হইবে পথে দেশ হতে দেশান্তরে—
লঙ্ঘি গিরি-কান্তার-প্রান্তরে!
আজিকার ক্ষণিক মিলনে
এইটুকু বলে রাখা শুধু, হাসি-কথা-গানে
যাত্রা-পথ হোক সাবলীল,
পবিত্র নির্ম্মল স্নিগ্ধ হোক অপিচ্ছিল;
আর শুধু বলে রাখা হৃদয়ের দুরন্ত উচ্ছ্বাসে,
ভুলিয়া যেয়ো না—
এসেছিলো যারা তব হৃদয়ের পাশে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

২৩

মাথার উপর পাহাড়ের ভার…মাথা তোলা যায় না! কামাখ্যা সাহেব বসিয়া ভাবিতেছিল, বুদ্ধি-কৌশলে চারি দিক্ কেমন স্বচ্ছন্দ সুখময় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলাম! বাহিরের দিকেই শুধু লক্ষ্য ছিল! ঘরের দিকেও মানুষের লক্ষ্য রাখা চাই…নহিলে ঘর এমন করিয়া পর হইয়া যায়, এ কল্পনা কোনো দিন মনের কোণে উদয় হয় নাই!…ছেলেদের কি না দিয়াছে? নিজে ও-বয়সে কি কঠিন সংগ্রাম করিয়া কাটাইয়াছিল! যেখান হইতে কিছু পাইবার প্রত্যাশা, সেইখানেই কঠোর তপশ্চারীর মতো সাধনা করিয়াছে! এত দিয়াও ছেলেদের আপন করিতে পারিল না! শেষে তারা বাপের সঙ্গে শত্রুতা করিতে চায়! জয়া বলিতেছে, যে সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি গড়িয়া তুলিয়াছ, তাহা রক্ষা করিতে রাজীবকে ডাকিয়া না হয় একটা মিটমাট করিয়া ফ্যালো…নহিলে পিনাকী যে-কথা বলিয়া গেছে, সত্যই যদি তা করে, তাহা হইলে এখানে মুখ তুলিয়া কাহারো পানে আর চাহিতে পারিব না!

সমৃদ্ধি-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য সারা জীবন ঐতিহাসিক যুগের সেকন্দর, নাদির শাহের মতো যে-কামাখ্যা-সাহেব মহাদর্পে অভিযান করিয়া বেড়াইয়াছে, যে-কামাখ্যা-সাহেবের মনে নিমেষের জন্য দ্বিধা-ভয় বা সংশয় জাগে নাই, সে-মন সহসা আজ ছায়া দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে!…

না, না…কিসের দুর্ব্বলতা! যে-তেজে এতখানি উঁচুতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে তেজকে নিবাইয়া দিবে ঐ তুচ্ছ রাজীব আর পিনাকী?

জয়ার মনে শান্তি নাই! জ্যাঠা বাবুর কাছে সেই প্রতিশ্রুতি…কাঁটার মতো মনে বিঁধিয়া আছে। সে কাঁটা মন হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে নাই! ব্যথা যখন অসহ্য বোধ হইয়াছে কামাখ্যা সাহেবের কাছে আসিয়া বলিয়াছে, কিছু ওদের দাও গো…এই তো কাছে এসে রয়েছে! মহেন্দ্র বাঁচিয়া,…অসুখ যখন বাড়িয়াছিল…সে খবর বাসন্তীতে জয়ার অজানা ছিল না! মন তখন আকুল হইয়া বার-বার মহেন্দ্রর উদ্দেশে ছুটিয়াছিল! মনে হইয়াছিল, কি জানি, যদি সব শেষ হইয়া যায়? একবার গিয়া দেখিয়া আসিব না? যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল…কিন্তু পা বাড়াইতে গিয়া মনে হইয়াছে, টাকা! যদি মহীন বলে, জ্যাঠা বাবু তার উপরে তেমনি অভিমান আর রাগ লইয়াই চলিয়া গেছেন? তখন তার সে-প্রশ্নে জয়া কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে? কি করিয়া মিথ্যা বলিবে?…

এদিকে স্বামী…ওদিকে ভাই! সহোদর নয়, তবু এক-সঙ্গে পাশাপাশি দু'জনে মানুষ হইয়াছে! দু'জনেই ছিল অনাথ, অসহায়! ছেলেবেলায় দু'জনে কি ভালোবাসাই না ছিল! সেই মহীনকে জয়া তার প্রাপ্য হইতে ফাঁকি দিয়াছে!…পৃথিবীতে টাকাটাই সব-চেয়ে বড়? এত বড় যে স্নেহ-মায়া তার পাশে থিতাইতে পারে না!…সেই টাকার জন্য জয়া করিয়াছে এত বড় অন্যায়!…অধর্ম, পাপ…স্বর্গ নরক…এ সবের জন্য নয়! অন্যায়…জয়ার কাছে মহীন কোনো অপরাধ করে নাই! আর জয়া…

জ্যাঠা বাবুর কাছে কথা দিয়া সে-কথা এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! জয়ার আশ্বাসে অন্তিম-শয়নেও জ্যাঠা বাবুর চোখে আনন্দের সেই দীপ্তি…

হায় রে, স্বামী তার কাছে এত বড় হইয়াছিল? স্বামীর কথায় জয়া এ মহাপাপে স্বামীর সহায়তা করিয়াছে! স্বামীকে সে বারণ করে নাই? এ সব কথা যখনি মনে জাগিয়াছে, মন যেন আগুনে জ্বলিয়া খাক্ হইয়াছে! যাতনার একশেষ! এ জ্বালা আরো তীব্র হইয়াছে সম্প্রতি ঐ রাজীবকে দেখিয়া!

সংসারের কষ্ট দেখিতে! ছেলে মেয়ে…জামাতা,……এই পাপেই বুঝি সে ধ্বংস ভস্মের মতো চূর্ণ হইয়া যাবে!

ভয়-ভাবনার মধ্যে একটা মাস কাটিয়া গেল। রাজীব আসিল না। পিনাকীরও কোনো সাড়া নাই!

তার পর জানকী বাবু এক দিন দুম্ করিয়া বলিয়া বসিলেন,—রুচির বিয়ে…আর দিন পনেরো পরে। এখানে এসে বিয়ে দিতে ওঁরা রাজী হয়েছেন। ওঁরা হলেন সুপ্রসন্ন বাবুর আত্মীয়। সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে এসে সেখান থেকেই সব ব্যবস্থা করবেন!

কামাখ্যা সাহেবের বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল। কোনো মতে কামাখ্যা সাহেব বলিল—ওঁদের আতিথ্যের ভার আপনাকেই নিতে হবে তো?

মৃদু হাস্যে জানকী বাবু বলিলেন—নেওয়া উচিত। আমাদের দেশে সেই বিধিই চলে আসছে! আমি সে-কথা লিখেছিলুম…কিন্তু ওঁরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে জানিয়েছেন, ওঁদের অভ্যর্থনার ভার নিলে ওঁরা অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করবেন! তাতে মনে করবেন আমার উপর পীড়ন করছেন!…সুপ্রসন্ন বাবু ওঁদের ভার নিতে চান। কাজেই আমিও তাতে সায় দিয়েছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া জানকী বাবু চুপ করিলেন।

কামাখ্যা সাহেব ভাবিতেছিল, এ সব ব্যবস্থা হইয়াছে বহু চিঠিপত্র চালাইয়া, নিশ্চয়! জানকী বাবু সে আলোচনায় কামাখ্যা সাহেবকে ডাকেন নাই…পরামর্শ করিতে! অথচ চিরকাল যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছেন, কোনো অনুষ্ঠান-পর্ব্ব…সে-সবের বেলায় কামাখ্যা সাহেবের সঙ্গেই তিনি আলোচনা-পরামর্শ করিয়াছেন! এবারে এ-সম্বন্ধে কামাখ্যা সাহেবকে সম্পূর্ণ ছাঁটিয়া রাখার মানে…

মানে খুঁজিতে প্রথমেই যে-কথা মনে উদয় হইল, তাহাতে কামাখ্যা সাহেবের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! রাজীব এখন পাত্রপক্ষের লোক! কে জানে, হয়তো সেখানে উইলের কথা পল্লবিত করিয়া রাজীব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে! পরচর্চ্চায় মানুষের উৎসাহ হয় প্রবল। বিশেষ সে-চর্চ্চায় যদি প্রতিষ্ঠাপন্ন কাহাকেও ভূতলশায়ী করা যায়! এ ক্ষেত্রে যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে? যদি উমাপ্রসন্ন বসু ঐ সত্যবান জজ কিম্বা সুপ্রসন্নর সেই মুখরা বিধবা ভগ্নী ইঁহাদে

জানকী বাবুর কাণে কথাটা তুলিয়া দিয়া থাকে···কামাখ্যা সাহেবের বিরুদ্ধে রাজীবের সেই অভিযোগের কথা ?

বুকের মধ্যে যেন সার-সার কামানের গাড়ী চলিয়াছে !

মনকে কামাখ্যা সাহেব তখনি বুঝাইল, যদি বলিয়া থাকে, দমিলে চলিবে না ! সব অস্বীকার করিব। তুচ্ছ একটা খানসামা চাকরের কথায় জানকী বাবু চাহিবেন কামাখ্যা সাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ ? অসম্ভব ! চাহিলেও কামাখ্যা সাহেব সবলে অস্বীকার করিবে !···আদালতের বিচার নয় তো যে ও-পক্ষের একটা কথায় তার বিরুদ্ধে ডিক্রী-ডিসমিসের ব্যবস্থা পাকা হইয়া যাইবে ! তাছাড়া জানকী বাবু মনিব হইতে পারেন, জজ নন্ !

জানকী বাবু বলিলেন—আমাদের আয়োজন করা দরকার। ভাদকে বাজনা-বাদ্যিতে ধুমধাম করবো ভেবেছিলুম ! কিন্তু ছেলে-মেয়ের তাতে দারুণ আপত্তি। ওরা বলে, বাজনা-বাদ্যিতে যে টাকা খরচ করবে বাবা, সে-টাকায় গরীব-দুঃখীকে কিছু বরং দান করো। কাঙ্গালী ভোজন, বিদায়—এ-সব অবশ্য হবে···তবু ওরা বলে, তাদের এমন কিছু দাও, যাতে কোনো দিক্‌কার সামান্য একটা অভাবও তাদের ঘোচে !···আমিও তাই ভেবেছি···

বাধা দিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—ছেলেমেয়ে ভালো কথাই বলেছে। তবে বাজনা-বাদ্যির ব্যবস্থা করলে বাজনদার-গুলোও কিছু পেতো ! তারাও কিছু পাবার প্রত্যাশা রাখে।

কামাখ্যা সাহেবের মনের ভার খানিকটা লঘু হইল ! জানকী বাবু তার সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন···তাই সাহস পাইয়া কথার পর মৃদু হাস্য করিয়া কামাখ্যা সাহেব চাহিল জানকী বাবুর পানে।

২৪

পাকা দেখায় সমারোহের সীমা রহিল না। সারা বাসন্তীর নিমন্ত্রণ হইল।

সত্যবান, জগদীশ রায়···সকলের সঙ্গে সুপ্রসন্ন পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। কামাখ্যা সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সহাস্যে বলিলেন,—জানকী বাবুকে যদি বলি ব্রহ্মা···বাসন্তীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এঁকে বলবো বিষ্ণু ! বাসন্তীকে ইনি পালন করছেন !

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—চাটুয্যে সাহেবকে না পেলে আমার মনের কল্পনাকে রূপ দিতে পারতুম কি না, সন্দেহ !

সত্যবান বলিলেন—ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই, কিন্তু উমাপ্রসন্ন বাবু···মস্ত বড় বিজনেশ-ম্যান···তাঁকে আমি খুবই জানতুম। তিনিই ওঁর স্ত্রীকে মানুষ করেছিলেন···ওঁদের বিবাহ দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে হাজারিবাগে তিনি আস্তানা নিয়েছিলেন। আমি তখন সেখানে মুন্সেফী করি। দায়ে-অদায়ে হাজারিবাগের বাঙালীদের তিনি ছিলেন মাথা।···হাজারিবাগেই তিনি মারা যান···আমি তখন ঐ হাজারিবাগে পোষ্টেড্। আপনিও তো ছিলেন সে সময় সেখানে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী···তিনি যখন মারা যান্ ?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ছিলুম।

কথাটা বাহির হইল যেন বুকের মধ্যকার কোন্ গভীর গহ্বর হইতে···বহু বাধা ঠেলিয়া।

সত্যবান বলিলেন—মস্ত বাড়ী বাগান···কত রকমের ফল-ফুল ছিল বাগানে। একটা মেহগ্নি গাছও ছিল ! বহু যত্নে সেটিকে তিনি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সে বাড়ী বাগান···তিনি তাঁর ভাগনেকে দিয়ে যাবেন বলতেন।···তা সে বাড়ী এখন···?

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কামাখ্যা সাহেব বলিল,—সে বাড়ী ভাড়া আছে।

—ভাগনে পেয়েছে ? না···

রাগে কামাখ্যা সাহেবের অস্থিমজ্জা জ্বলিয়া উঠিল। আসিয়াছ নিমন্ত্রণ-সভায়···শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠানে ! তার মধ্যে পুলিশ সাজিয়া তদারকী করিতে চাও !

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না। তিনি উইল যা করে গেছেন, তাতে আমার স্ত্রীকেই সব দিয়ে গেছেন।

সত্যবান বলিলেন,—কিন্তু শেষ-সময়ে আমাকে বার বার বলতেন একটা উইল লিখে দেবেন ? আপনি হলেন হাকিম মানুষ··· আইন-কানুন বাঁচিয়ে লিখতে পারবেন ! বলতেন, আমার কেবলি মনে হয় আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে সত্যবান বাবু···এক-এক সময় এমন হয় যে, মনে হয় প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে ! বলতেন, ভাগনের উপর রাগ করে মস্ত অবিচার করেছি···সে-অবিচারের জ্বালা নিয়ে না চলে যেতে হয় ! উইল লিখে দিচ্ছি-দেবো করে আমি গড়িমাসি করতুম। কে জানে, সত্যি আর বাঁচবেন না ! শেষে খপর পেলুম, তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে—জ্ঞান নেই। শুনে তখনি ছুটে তাঁকে দেখতে যাই···জাষ্ট হোয়েন হী ওয়াজ গাস্‌পিং !

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সত্যবান চুপ করিলেন। কামাখ্যা সাহেব যেন কাঠ ! উঠিয়া সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু উঠিতে পারিল না···পা দু'টা পাথরের মতো ভারী।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সত্যবান বলিলেন,—আপনার স্ত্রী আর ঐ ভাগনে···এই দু'জনকে নিয়েই ছিল তাঁর সব। বিয়ে-থা করেননি।

সত্যবান চাহিলেন জানকী বাবুর দিকে ; কহিলেন—আপনি জানতেন না···উমাপ্রসন্ন বাবুকে ? উমাপ্রসন্ন রায় ? তখনকার দিনের এক জন বিজনেশ-ম্যাগনেট ?

জানকী বাবু বলিলেন—নাম শুনেছি। আলাপ-পরিচয় ছিল না। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী তো তাঁরি জামাই !

সত্যবান বলিলেন,—হ্যাঁ, ভাইঝি-জামাই।···আমার কাছে গল্প করতেন নিজের জীবনের সম্বন্ধে···নানা কথা !

কামাখ্যা সাহেবের সারা দেহে রোমাঞ্চ-রেখা ফুটিতে লাগিল। কেবলি মনে হইতেছিল, এখনি উঠিবে বুঝি মহেন্দ্রর কথা ! এবং উঠিলে তার পর সে-কথা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে···

মাথার উপর যেন খড়্গ ঝুলিতেছে···কখন্ কণ্ঠে পড়ে !

সে-খড়্গ কণ্ঠে পড়িল না···কামাখ্যা সাহেব বাঁচিয়া গেল··· পুরোহিত আসিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদের লগ্ন উপস্থিত···আপনারা তাহলে অবহিত হোন !

নিমেষে একটা চাঞ্চল্য···শাঁখ বাজিল···সঙ্গে সঙ্গে সালঙ্কারা সুরুচি আসিয়া আসরে দেখা দিল।

আশীর্ব্বাদ···স্বস্তিবাচন···যৌতুক···

তাহারি মধ্যে ফাঁক পাইয়া কামাখ্যা সাহেব আসর হইতে সরিয়া পড়িল।

সরিয়া সে গিয়া দাঁড়াইল একেবারে ও-দিক্‌কার হল-ঘরে। সেখানে আসন পাতিয়া রূপার পাত্রাদিতে বিভিন্ন ভোজ্য-পানীয় সাজাইয়া রাখা হইতেছিল···চোখ পড়িল দিলুর উপর। এখানকার এ অনুষ্ঠানের ম্যানেজার দিলু।

মনে আবার বিরূপতা জাগিল! ঘটনাগুলো যেন চারি দিক্ হইতে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছে! মহেন্দ্র···এত দেশ থাকিতে সে আর যাইবার জায়গা পায় নাই···আসিল এই বাসন্তীতে!···তা আসিলেও ক্ষতি ছিল না···কামাখ্যা সাহেবের মনে তার জন্য এতটুকু অশান্তি জাগে নাই! সেই মহেন্দ্র ইহলোক হইতে সরিয়া গেল··· নিঃশব্দে! কামাখ্যা সাহেবের মন হইতে সকল দুশ্চিন্তা মুছিয়া গিয়াছিল। পরম নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটিত। নির্ম্মল নীল আকাশ! সে-আকাশে আবার অতর্কিতে মেঘ আসিয়া দেখা দিল ঐ রাজীব! তাহাতেও আশঙ্কা হয় নাই! তার উপর কোথা হইতে আজ জীবনের পৃষ্ঠায় এই সত্যবানের প্রবেশ! নাটক-নভেলের শেষের দিকে আনাড়ি লেখক যেমন এখান হইতে সেখান হইতে রাজ্যের লোক টানিয়া আনিয়া বই শেষ করিতে চায়···ঠিক তেমনি ব্যাপার!···এখন এই সত্যবান কি করিতে চায়? হাজারি-বাগের বাড়ী-বাগান লইয়া কথা তুলিয়া বসিল। এ কথা তোলার পিছনে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে না কি?···

যদি থাকে, কিসের ভয়। কামাখ্যা সাহেবের পক্ষে সহায় মৃত্যুর বহু দিন পূর্ব্বেকার লেখা উমাপ্রসন্নর উইল! সে-উইলে যথাসর্ব্বস্ব তিনি দান করিয়া গিয়াছেন জয়ার নামে! আদালতে সে উইল প্রমাণ হইয়া গিয়াছে···সে উইলের প্রোবেট্ হইয়াছে! পরে উমা-প্রসন্নর লেখা দ্বিতীয় উইল ভিন্ন জয়ার নামের ও-উইল বাতিল বা নামঞ্জুর করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই। সত্যবান জজ হইলেও তার মুখের কথায় প্রোবেট্-পাওয়া সে-উইল বাতিল হইতে পারে না! তবে?

এমনি চিন্তায় কামাখ্যা সাহেব মনকে সুদৃঢ় সবল করিয়া তুলিল। ভাবিল, জোর-গলায় সত্যবানের সঙ্গে কথা কহিবে। সত্যবান জজ আছে, থাকুক। কামাখ্যা সাহেবও তুচ্ছ ব্যক্তি নয়। সুপ্রসন্ন বাবু বলিয়াছেন, বাসন্তীর সে বিষ্ণু। জানকী বাবুও সে-কথায় সায় দিয়া বলিয়াছেন, কামাখ্যা সাহেব না থাকিলে বাসন্তী আজিকার এ রূপ লইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারিত না!···তবে?

অন্দরে কিন্তু ব্যাপার বেশ ঘনাইয়া উঠিল। গৌরী ঠাকুরাণী নিজে গিয়া সুভাষিণীকে এ-বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছেন। সুভাষিণী আসিতে চায় নাই···সজল নয়নে বলিয়াছিল,—শুভ কাজে আমার দাঁড়াতে ভয় করে দিদি···গৌরী ঠাকুরাণী সে-কথার জবাব দিলেন—তাহলে মা-মাসি-পিসীকে দূরে রেখে শুভ কাজ করতে হবে, বলো? মা-মাসি দাঁড়ালে শুভ কাজে কখনো অকল্যাণ হতে পারে না, বৌ!

সুভাষিণীকে দেখিয়া সুরুচি যেন তাকে মাথায় তুলিয়া লইল! সুভাষিণীর পাশে বড় বড় বাড়ীর গৃহিণী-মেয়েরা একেবারে এতটুকু!

সত্যবানের স্ত্রী উমাশশী এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। গৌরী ঠাকুরাণী মাঝে আছেন, কুটুম বলিয়া কোনো ব্যবধান তিনি রাখিতে দেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বেই দু'-বাড়ীকে মিলাইয়া-মিশাইয়া এক করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, কুটুম-কুটুম করে' আমরা খাতির অভ্যর্থনায় শুধু আড়াল গড়ে তুলি! গোড়া থেকেই মনে-প্রাণে মেলামেশা করলে জানাজানি হয় কত···তার ফলে কুটুমে-কুটুমে কখনো মন-কষাকষি হতে পারে না!

উমাশশীর মেয়ে উৎপলাকে দেখাইয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন সুভাষিণীকে—এই মেয়েটি আমি দেখে ঠিক করে রেখেছি বৌ দিলুর জন্য। মেয়ে দেখতে যেমন চাঁদের মতো, বুকে তেমনি মায়া-মমতা!··· চাকর-বাকরদের উপরও কি মমতা!···লেখাপড়া জানে, গান-বাজনা জানে···অথচ এতটুকু দেমাক-অহঙ্কার নেই!···সত্যবানকে বলেছি ···মেয়ের মাকেও বলেছি,···বলেছি, যাচ্ছো তো সব বাসন্তীতে··· ছেলেকে দেখবে, ছেলের মাকে দেখবে! দেখে, বিয়ের ঠিকঠাক করবে।

পাশে ছিল জয়া; কথাটা জয়ার কাণে গেল। জয়াকে লক্ষ্য করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি অমন কুটুমের মতো চুপচাপ বসে আছো কেন ভাই? এ তো তোমার ভাজ···মহীন বাবুর স্ত্রী··· আলাপ-পরিচয় করো। পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতিয়ে মানুষ পরকে আপন করে! এই দ্যাখো না আমায়···কোথাকার কে, তবু বৌ আমাকে দেখে যেন কত আপনার জন! আর তুমি আপনার জন ননদ হয়ে···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গৌরী ঠাকুরাণী সুভাষিণীর দিকে চাহিলেন, কহিলেন,—তোমার ননদ···নাম শোনোনি? জয়া দেবী? সেই জয়া!···মহীন বাবু আর জয়া···এঁরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। উমাপ্রসন্ন বাবু···তোমার মামাশ্বশুর···শোনোনি এ সব কথা?

মাথা নাড়িয়া সুভাষিণী জানাইল, শুনিয়াছে। উঠিয়া সুভাষিণী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

জয়া তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিল; বলিল,—চেনা নেই, জানা নেই···অথচ কত জানাশোনা থাকবার কথা!···শুনেছিলুম··· অনেক পরে অবশ্য···যে, মহীন এসেছে বাসন্তীতে চাকরি নিয়ে।··· কোনো দিন দিদি বলে খবর নিতে আসেনি···আমার মনে অভিমান হয়েছিল, ভাই!

সুভাষিণীর মনের মধ্যে অতীত দিনের স্মৃতি কালো মেঘের মতো দিগন্ত প্রসারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রর মনে এ দুঃখ কত প্রবল ছিল···বড় লোক বলিয়া, মান-সম্ভ্রম আছে বলিয়া জয়াদি তার কোনো খবর লইল না!

সে-কথা সুভাষিণীর মনেই রহিল। সুভাষিণী জবাব দিল না।

জয়া বলিল—তার পর শুনলুম, সব চুকে গেছে। তখন আর কোন্ মুখে এসে দেখা করবো?···তাই আপন হয়েও পর হয়ে আছি!

জয়ার স্বরে বাষ্পের আভাস! সুভাষিণী আশ্চর্য্য বোধ করিল··· তবে যে জয়ার সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়াছে···

জয়া বলিল—ক'টি ছেলে?

সুভাষিণী বলিল—তিনটি।

—মেয়ে?

সুভাষিণী বলিল—নেই। হয়নি।

জয়া বলিল—ছেলেরা তো ভালোই হয়েছে, শুনি। মহীনও খুব ভালো ছিল···এগজামিনে ফার্ষ্ট ছাড়া কখনো সেকণ্ড হয়নি।

কথার মধ্যে গৌরী ঠাকুরাণী কথা কহিলেন ; বলিলেন,—বড় ছেলে দিলু···শুনতে পাই, জানকী বাবুর সে ডান হাত হয়ে উঠেছে। কোথায় নতুন অফিস নিয়েছেন···সেখানে তাকেই জানকী বাবু সবার হেড করে পাঠিয়েছেন ! ছেলেরা বড় হবে···এ কথা আমি সেই প্রথম থেকেই বলে আসছি। মা-বাপ ভালো হলে ছেলেমেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে না। মা-বাপের পুণ্যে ছেলেমেয়েরা ভালো হবেই!

কথাটা ছুরির ফলার মতো জয়ার মনখানাকে যেন চিরিয়া দিল! তাই বুঝি অত সুবিধা থাকিতেও তার ছেলেরা ভালো হইল না··· কোনো দিকে নয়। না লেখাপড়ায় না স্বভাবে!···মেয়ে শুক্লা···সেও অহঙ্কারে মটমট করিতেছে! কি দুর্জ্জয় গোঁ···যা ধরিবে, করিবে। বড় হইয়াছে···বিবাহ দিতে হইবে। জয়ার মনে ভয় তাই নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে···পরের ঘরে তারা এ তেজ সহিবে কেন? বড় লোকের ঘর না দেখিয়া জয়া দেখিতেছে গরীবের ঘর। সেখান হইতে ছেলে আনিয়া তার হাতে শুক্লাকে দান করিবে। পয়সার জোরে ছেলেকে যদি বশে রাখিতে পারে! পয়সার জন্য শুক্লার এ-তেজ সে ছেলে যদি কোনো মতে সহিয়া থাকে!···

জয়াকে উদ্দেশ করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—তোমার জ্যাঠা মশাইয়ের তো অনেক টাকার সম্পত্তি···রাজীব ছিল তাঁর খানশামা···অনেক বছর ধরে'···না?

রাজীবের নামে জয়ার মন একটু কাঁপিল। জয়া বলিল,—হ্যাঁ।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আচ্ছা, কিছু মনে করো না ভাই, রাজীবের কাছে শুনেছি, উমাপ্রসন্ন বাবু না কি মারা যাবার আগে নতুন উইল করতে চেয়েছিলেন। মহীন্দ্র বাবুর উপর রাগ করে বিষয় থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে উইল লিখে তোমাকেই সর্ব্বস্ব দিয়েছিলেন···আগেকার সে উইল বদলে আবার নতুন উইল করতে চেয়েছিলেন না?

জয়া বলিল—চেয়েছিলেন। কিন্তু সে উইল আর হলো কৈ? সে উইল হবার আগে হঠাৎ তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, জ্ঞান লোপ পেলো···কিছু করে যেতে পারলেন না!

গৌরী ঠাকুরাণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন···তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কোনো উইল হয়নি? মহীন্দ্র বাবুকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে?

জয়া চাহিল সুভাষিণীর দিকে···সুভাষিণী তার পানেই চাহিয়াছিল। সুভাষিণীর দু'চোখে করুণ মমতা-মাখানো দৃষ্টি···সে-দৃষ্টি জয়ার মনে বিঁধিল।

জয়া বলিল,—উইল লেখানো হয়েছিল···সে-লেখা সই করতে পারলেন কৈ! সই হলো না। উকিলরা বললে, জ্যাঠা বাবুর উইল বলে সে-লেখা কোনো আদালত গ্রাহ্য করবে না! কাজেই সব মিথ্যা হয়ে গেল!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—যারা আইন নিয়ে নাড়া-চাড়া করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বোঝে না, মানুষের সুখ-দুঃখ বোঝে না, তাদের কাছে মিথ্যা হলেও, যাদের সঙ্গে স্নেহ-মায়ার সম্পর্ক, তাদের কাছেও মিথ্যা হবে ভাই? আপন-জনের অন্তিম কালের শেষ সাধ? শেষ ইচ্ছা?

জয়া এ কথার উত্তর দিতে পারিল না···উত্তর দিল না। মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—সব সম্পত্তি তাহলে তোমারই হয়েছে?

জয়া বলিল—পুরানো উইল দাখিল করা হলো কোর্টে—সে উইলের প্রোবেট বেরুলো···

গৌরী ঠাকুরাণী শুধু বলিলেন—হুঁ···তবে এ কথা সত্যি, এ অবস্থায় তুমি যদি সম্পত্তির অর্দ্ধেক এনে তোমার ভাইকে দিয়ে বলতে,···উমাপ্রসন্ন বাবুর ইচ্ছা ছিল এ-অর্দ্ধেক তোমাকে দেবেন··· তাহলে মহেন্দ্র বাবু কিছুতেই তা নিতেন না। যেটুকু তাঁকে জেনেছি, জানি তো···কি তেজী মানুষ ছিলেন···তাঁর সম্ভ্রমবোধ ছিল কতখানি। পরের কাছ থেকে কিছু নেওয়া···তাকে ভিক্ষা বলে মনে করতেন!

আলাপ-আলোচনার মধ্যে এ-প্রসঙ্গ কেমন যেন কালো পর্দ্দা টানিয়া দিল···একটা গভীর নিঃশব্দতা।

সুরুচি আসিয়া সে নিঃশব্দতা ভাঙ্গিল। সুরুচি আসিয়া বলিল—আসুন পিসিমা, আপনি বললেন সকলকার খাবার বন্দোবস্ত করতে। বন্দোবস্ত হয়েছে।···আসুন সকলে···আর খুব একটা ভালো খবর আছে···কৌমুদীর টেলিগ্রাম এসেছে···কাল ওরা এসে পৌঁছুবে।

২৫

রাত্রে জয়া বাড়ী ফিরিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে যেন ঝড়ের কলরোল! বাড়ী ফিরিয়া দেখে, অফিস-কামরায় আলো জ্বলিতেছে।

জয়া আসিয়া অফিস-কামরায় ঢুকিল। কামাখ্যা সাহেব কাঠের পুতুলের মতো গট্ হইয়া বসিয়া আছে।

জয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল; বলিল—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে···খুব দরকারী কথা।

কামাখ্যা সাহেবের যেন চেতনা হইল! নিশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—এখনি বলতে চাও?

জয়া বলিল—হ্যাঁ। এখনি।

অবসন্নের মতো কামাখ্যা সাহেব বলিল—বলো···

জয়া বসিল সামনের চেয়ারে। বসিয়া জয়া বলিল—আমার নামে যে ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, সে সব কাগজ কালই আমি এনডোর্শ করে দিতে চাই মহীনের বৌয়ের নামে। পারবে তুমি তার ব্যবস্থা করে দিতে? না, জানকী বাবুর কাছে গিয়ে তাঁকেই এ কাজটুকু করে দিতে বলবো?

কথা শুনিয়া কামাখ্যা সাহেবের দু'চোখ এত বড় হইয়া উঠিল!

জয়া বলিল—পয়সা-পয়সা করে পৃথিবীতে সকলকে যে চিরদিন ছেঁটে ফেলে চলেছো···তার ফলে এ পয়সায় কি পেয়েছো, বলতে পারো? ছেলেমেয়ে···তারা এমন হয়েছে যে, লোক-সমাজে তাদের পরিচয় দিতে লজ্জা হয়! যারা আপন-জন···এই পয়সার জন্য তাদের তফাৎ করে দেছ! কিসের জন্য···কি লোভে···কি পাবার আশায়···বলতে পারো আমায়?

কামাখ্যা সাহেব বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ও-বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে যতক্ষণ ছিল, এমনি অপ্রিয় প্রসঙ্গ···বাড়ীতে আসিয়াও স্ত্রীর মুখে সেই লেকচার!

জয়া বলিল—বলো আমাকে। বলতেই হবে! পয়সার জন্ত ধর্ম্ম মানোনি! তা না হয় ছেড়ে দিলুম···ধর্ম্ম অনেকে মানে না! কিন্তু স্ত্রী-পুত্র? তাদেরো তুমি মানোনি কখনো! শুধু পয়সার সাধনা করেছো!

একটা কথা কামাখ্যা সাহেবের মাথায় জাগিল। চট্ করিয়া বলিল,—কিন্তু এ পয়সার সাধনা আমি করেছি স্ত্রী-পুত্রকে সুখে রাখবো বলে!

জয়া বলিল—পেরেছো সুখে রাখতে? সুখ কাকে বলো? বাড়ী-গাড়ী? দামী শাড়ী-গহনা? পোষাক-পরিচ্ছদ? ভালো খাওয়া? এই সব?···এ সব দিয়ে ছেলেদের কি অমানুষ করে তুলেছো, তা দেখছো! যে-টাকা নিজের সামর্থ্যে মানুষ পায়, নিজের দামে··· সে টাকার উপর যে-টাকা তুমি এনেছো, তা পরের টাকা! তাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। পরকে ঠকিয়ে সে-টাকা তুমি নিজের ঘরে এনে পুরেছো। তখনি আমার বলা উচিত ছিল। বলিনি! তার কারণ, তুমি পুরুষ-মানুষ, স্বামী···তোমার মনে দুরভিসন্ধি আছে, এ-সন্দেহ কখনো করিনি! তুমি বুঝিয়েছিলে, আদালত তোমার সে-লেখাকে উইল বলে গ্রাহ্ম করবে না। আমাকে বুঝিয়েছিলে মহীনকে যদি কখনো পাও, এ থেকে তার ভাগ তাকে দিলেই চলবে। তা তুমি দাওনি। আমার উচিত ছিল, চাড় করে মহীনের ভাগের টাকা মহীনকে ডেকে এনে বুঝিয়ে দেওয়া। তুমিই আজ দেবো, কাল দেবো করে' তা দিতে দাওনি। এ গ্লানি আজ আমার অসহ্য হয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলো···লজ্জায় মাথা তুলে কথা কইতে পারলুম না। নিরীহ নিরপরাধ ওরা···ওদের বঞ্চিত করা!···কাজই আমি এর হেস্তনেস্ত করতে চাই। ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ এনডোর্শ করে মহীনের বৌয়ের কাছে দিয়ে আসবো। আর হাজারিবাগের বাড়ী-বাগান···জ্যাঠা বাবু বলেছিলেন, ও তিনি মহীনকে দিতে চান। সে সম্বন্ধে তুমি ব্যবস্থা করে দাও, ভালো! না হলে সে-ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে। বলো, পারবে তুমি এ কাজ করতে?

কামাখ্যা সাহেব কোনো জবাব দিল না···অচপল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল জয়ার দিকে।

জয়া বলিল,—চোরের লজ্জা সর্ব্বাঙ্গে বয়ে আমি আর একদণ্ড বাঁচতে পারবো না। তুমি যদি না পারো, আমি করবো উপায়। এর জন্ম আমাকে যদি তুমি ত্যাগ করো, সে-ত্যাগ আমার সহ্য হবে! কিন্তু এ গ্লানি আমি আর একদণ্ড সহ্য করবো না।

কথাটা বলিয়া জয়া উঠিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। কামাখ্যা সাহেব বসিয়া রহিল নিস্পন্দ নিশ্চল! তার দেহ হইতে প্রাণটা যেন বাহির হইয়া গিয়াছে···পড়িয়া আছে শুধু জড় দেহখানা!

পরের দিন। বেলা তখন বারোটা।

সুভাষিণী স্নান করিয়া নিত্য-পূজায় বসিবে, জয়া আসিয়া ডাকিল,—বৌ···

জয়াকে দেখিয়া সুভাষিণী অবাক্···বলিল—আপনি!

জয়া বলিল—হ্যাঁ।

বলিয়া রুমালে-বাঁধা এক-তাড়া কাগজ সুভাষিণীর হাতে গুঁজিয়া দিল। দিয়া বলিল,—এগুলো আগে তুলে রাখো। ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ···জ্যাঠা বাবু মহীনকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এত কাল আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। এছাড়া অনেক টাকার শেয়ার আছে···সেগুলো আমার নামেই আছে এত দিন··· উকিলকে দিয়ে ব্যবস্থা করিয়ে সেগুলো দু'-এক দিনের মধ্যে তোমার নামে ট্রান্সফার করে' দেবো। আর হাজারিবাগের বাড়ী-বাগান ···জ্যাঠা বাবুর উইলে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। মারা যাবার আগে আমাকে তিনি মুখে বলে' গেছেন,···ও-বাড়ী মহীনকে যেন দেওয়া হয়। আজ মহীন নেই! কাজেই বাড়ী-বাগানের সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা, জানকী বাবুকে মাঝখানে রেখে তাও করে দেবো, ভাই।···উইলে নেই বলে' আদালত না মানতে পারে, কিন্তু জ্যাঠা বাবুর শেষ ইচ্ছা, তাঁর বিশ্বাস···সে বিশ্বাস যদি না রাখি, তাহলে নরকেও আমার স্থান হবে না!···

সুভাষিণী বিস্ময়ে বিহ্বল! তার মনে হইতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! তার মুখে কথা ফুটিল না!

দিলু বাড়ী আসিল···ডাকিল—মা···

তার পর একটু অগ্রসর হইয়া আসিতেই যা দেখিল···

সুভাষিণী বলিল—তোমার পিশিমা···প্রণাম করো দিলু।

দিলু আসিয়া জয়ার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দিলুর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন লইয়া জয়া বলিল—সকল সুখে সুখী হও বাবা।···আমি পিশিমা হই।

দিলুর দু'চোখ আনন্দে বিহ্বল···দিলু বলিল—জানি। বাবাকে ছেলেবেলায় বলতুম, আমাদের কেউ আপন-জন নেই বাবা···তুমি আর মা ছাড়া? তাতে বাবা বলতেন, আছে রে···আর-এক জন মাত্র আপন-জন আছেন আমাদের···তিনি আমার জয়াদি··· তোমাদের পিশিমা।···কত দিন মনে করেছি, পিশিমার কাছে যাবো, পরিচয় দিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবো···যেতে পারিনি, পিশিমা!

জয়ার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। জয়া বলিল—আমার ভাগ্য মন্দ ছিল বাবা, তাই তোমাদের পেয়েও এত দিন পাইনি! আজ থেকে পিসিমাকে পাবে! তোমরা ছাড়া পিশিমার আজ আপন বলতে···পিশিমার মুখ চাইতে আর কেউ নেই···এ পৃথিবীতে, জেনো।

সজল নেত্রে জয়া দিলুকে বুকে জড়াইয়া দিলুর মাথা নিজের বুকে রাখিল···জয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

দিলু ডাকিল,—পিশিমা···

দু'হাতে দিলুর মাথা বুকে চাপিয়া দু'চোখ বুজিয়া জয়া বলিল —বাবা···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শেষ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রুশ-রণাঙ্গন—

একমাত্র রুশ-রণাঙ্গনেই এখন প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের তুলনায় ইটালীতে সঙ্ঘর্ষ নিতান্তই গুরুত্বহীন। গত জুলাই মাসে কুরস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার পর সোভিয়েট-বাহিনী ক্রমাগত শত্রুকে আঘাত করিতেছে। রুশ সেনার এই প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত কোন অপরিসর রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়, সুদীর্ঘ দেড় হাজার মাইল রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই তাহাদের কঠোর আঘাত পতিত হইতেছে। তবে, রণকৌশল হিসাবে সময় সময় এক একটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাহাদের আঘাত বিশেষ ভাবে প্রকটিত।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে স্মলেন্স্কের পতনের পর সোভিয়েট সেনা হোয়াইট রুশিয়া প্রদেশে প্রবেশ করে; এই প্রদেশে
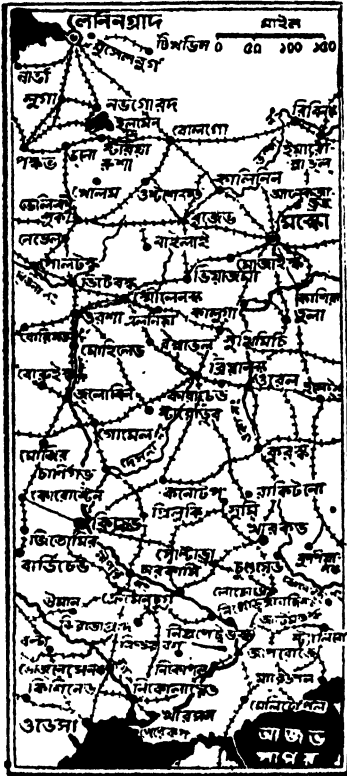
ভাইটেবস্ক, মগিলেভ ও গোমেলের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত রুশ সেনা পৌঁছিয়াছিল। তিন দিক্ হইতে জার্ম্মাণীর পরবর্ত্তী ঘাঁটা মিনস্ক পরিবেষ্টনের উদ্দেশ্যেই তাহাদের এই আক্রমণ চলে। এই সময় অকস্মাৎ শরৎকালীন বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় পথঘাট দুর্গম হইয়া পড়ে; স্বভাবতঃ তখন এই অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা হ্রাস পায়। ইহার পর রুশ সমরনায়কগণ মনোযোগ দিয়াছেন দক্ষিণ রণাঙ্গনে। এখানে—ইউক্রেণ প্রদেশে নীপার নদীর পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী প্রায় সমগ্র অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণ সেনা বিতাড়িত হইয়াছে; জাপোরোঝের দক্ষিণে স্বল্পপরিসর অঞ্চলে যে সামান্ত সৈন্ত আছে, সম্প্রতি মেলিটোপোলের পতনে এখন তাহারা বিশেষ ভাবেই বিপন্ন, আত্মরক্ষার জন্ত ইহারা দ্রুত পলায়নে বাধ্য হইতেছে। ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভের উদ্দেশে রুশ সেনার ত্রিমুখী আক্রমণ প্রসারিত; স্থানে স্থানে তাহারা কিয়েভের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে। কিয়েভ্ পরিত্যাগের আয়োজনস্বরূপ জার্ম্মাণরা এখন দ্রুত এই নগরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতেছে। নীপার নদীর বাঁকেই সোভিয়েট সেনার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক সাফল্য। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহারা ক্রেমেনচুগের দক্ষিণে নীপার অতিক্রম করিয়া প্রবল বিক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সম্প্রতি তাহারা নীপার বাঁকের কেন্দ্রস্থলে নীপ্রোপেট্রভস্ক অধিকার করিয়াছে। শ্রমশিল্প-কেন্দ্ররূপে অতীতে এই নগরের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। এখন সমগ্র নীপার বাঁকে প্রভুত্ব-বিস্তারের পক্ষে নীপ্রোপেট্রভস্কের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই বাঁকের মধ্যে অবস্থিত জার্ম্মাণ বাহিনী এখন বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রুশ সেনার প্রসারিত বেষ্টনী এড়াইয়া ইহারা পশ্চিম দিকে অপসরণ করিতে পারিবে কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

জার্ম্মাণ সেনাপতিমণ্ডল নীপারের তীরে প্রবল প্রতিরোধের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদায়" জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক কর্ম্মচারীর উক্তি প্রকাশিত হয়; এই কর্ম্মচারীটি রুশিয়ায় বন্দী ছিলেন। ইনি বলেন—নীপারের তীর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পশ্চাদপসরণ করা যায় বলিয়া জার্ম্মাণ সেনাপতিগণের বিশ্বাস; তবে তাহার অধিক নয়। নীপারের তীরে নাৎসী সেনার ব্যূহশ্রেণীকে জার্ম্মাণ সেনাপতিরা সত্যই অলঙ্ঘ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অগ্রগামী রুশ সেনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্ত এই অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ জার্ম্মাণদের প্রতি-আক্রমণ হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহাদের নূতন সৈন্ত আসিয়াছে। কিন্তু রুশ সেনানায়কদের আক্রমণ-কৌশলে এবং রুশ সেনার প্রবল বিক্রমে জার্ম্মাণ সেনাপতিদিগের সকল চেষ্টাই এখন ব্যর্থ; এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ-ব্যূহ কেবল ভিন্ন হয় নাই, একটি বিশাল নাৎসী বাহিনী এখানে বিপন্ন!

ক্রিমিয়ার দ্বারস্বরূপ মেলিটোপোল রক্ষার জন্ত জার্ম্মাণরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার জন্ত এক পক্ষকাল তুমুল যুদ্ধ হয়, নগরের অভ্যন্তরে রাস্তায় রাস্তায় জার্ম্মাণরা রুশদিগকে বাধা দিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা সফল হয় নাই। জাপোরোঝে হইতে আজভ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জার্ম্মাণ-ব্যূহ এখন বিদীর্ণ; রুশ সেনার ক্রিমিয়ায় প্রবেশপথ এখন উন্মুক্ত। কেবল তাহাই নহে, রুশ সেনা এখন নীপারের মোহনার দিকে আক্রমণ প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার ফলে, নীপার বাঁকের মধ্যে জার্ম্মাণ সেনার বিপদ বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। রুশ বাহিনী এখন খারসন্ ও নিকোজায়েভের দিকে অগ্রসর হইয়া পেরিকপ্ যোজক অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিবে। ইহাতে ক্রিমিয়ায় অবস্থিত জার্ম্মাণ সেনা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

নীপার অঞ্চলে জার্ম্মাণ-ব্যূহ ভেদ করিতে বিলম্ব হওয়ায় জার্ম্মাণরা রণক্ষেত্রের পশ্চাতে ব্যাপক ভাবে ধ্বংসকার্য্য পরিচালনের সুযোগ পাইয়াছে। অতঃপর ব্যাপক ধ্বংসকার্য্যের দ্বারা রুশ সেনার

অগ্রগতিতে বাধা দানই জার্ম্মাণ সেনানায়কদের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী আক্রমণকালে রুশ সেনা যাহাতে পথ-ঘাট না পায়, আশ্রয় না পায়, সে জন্য তাঁহারা পশ্চাদপসরণের সময় পরিত্যক্ত অঞ্চল শ্মশান করিয়া যাইতেছেন।

নীপার অঞ্চলে জার্ম্মাণীর প্রাণপণ প্রতিরোধ-প্রয়াস লক্ষ্য করিবার পর একটি জনরবের আশান ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। ডাঃ গোয়েবল্‌স্‌ কিছু কাল ধরিয়া প্রচার করিতেছিলেন যে, রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর আপোস-মীমাংসা আসন্ন; এই জন্যই নাৎসী সেনা ধীরে ধীরে রুশভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে। বলশেভিক আতঙ্কগ্রস্ত ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদিগকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে রুশ-রণাঙ্গনে পরাজয়ের কৈফিয়ৎ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই হাস্যকর প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল। নীপার অঞ্চলের যুদ্ধ গোয়েবল্‌সের এই কৌশলী প্রচারকার্য্য ব্যর্থ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। ধীরে ধীরে রুশভূমি পরিত্যাগ করাই যদি নাৎসী সেনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা মধ্যপথে এইরূপ দৃঢ় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া এত সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয় করিত না। তাহার পর, পশ্চাদপসরণকালে জার্ম্মাণ সৈন্যের ব্যাপক ধ্বংসকার্য্যও রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর আসন্ন আপোষ-মীমাংসার দ্যোতক নয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত অনিবার্য্য কারণে ধ্বংস এক কথা, আর স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত অঞ্চল শ্মশান করিয়া যাওয়া অন্য কথা।

ইটালীয় রণাঙ্গন—

ইটালীতে যুদ্ধের গতি নৈরাশ্যজনক। ইটালীতে রণক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এক শত মাইলেরও কম। জার্ম্মাণীর মাত্র ২০।২৫ ডিভিসন সৈন্য এখানে নিয়োজিত; ইহা বর্দ্ধিত হইয়া এখনও ৩০ ডিভিসনের অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে, রুশিয়ায় দেড় হাজার মাইল রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর ২ শত ডিভিসন সৈন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। ইটালীর এই ক্ষুদ্র রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাদোগলিও-সরকারের আত্মসমর্পণের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষের সেনা প্রবল প্রতিরোধ ভেদ করিয়া অতিকষ্টে সেলারণোতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পর, নেপলস্‌ তাঁহারা একরূপ বিনা যুদ্ধেই অধিকার করিয়াছেন; কারণ, ব্যাপক কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের জন্য জার্ম্মাণরা পূর্ব্বেই নেপলস্‌ ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর ভলটুর্ণো নদীর তীরে জার্ম্মাণ সেনা প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়। এখানেও জার্ম্মাণ-ব্যূহ ভেদ হইয়াছে; তবে, অত্যন্ত বিলম্বে এবং অত্যধিক আয়াসে। পূর্ব্ব উপকূলে ফোগিয়ার বিমানক্ষেত্রগুলি অধিকারের পর সম্মিলিত পক্ষের সেনা টারমলি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্গমতা অতিক্রম করিয়া বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে কি না, সন্দেহ; তাহারা এখন রোম লক্ষ্য করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী।

সেলারণোর বিশাল পোতাশ্রয় এবং ফোগিয়ার বিমানক্ষেত্রগুলি অধিকৃত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের বেগ প্রবল হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অবশ্য, সম্প্রতি উত্তর ইটালীতে এবং বলকানে সম্মিলিত পক্ষের বিমান আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহাদের বিমান বাহিনী দক্ষিণ অষ্ট্রীয়ায়ও আঘাত করিয়াছে। দক্ষিণ ইটালীর বিমান ঘাঁটা হইতেই হয় ত এই সকল আক্রমণ চালিত হইতেছে। দক্ষিণ ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ বলকানে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই। বলকানে সাফল্যের সহিত আক্রমণ-পরিচালনের জন্য ডোডেকেনীজে সম্মিলিত পক্ষের প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেও তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এ দিকে টিরানিয়ান্‌ সাগরে সার্দ্দিনিয়ায় ও কর্সিকায় সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এই সকল ঘাঁটী যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হইবার কোন লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। অথচ, এই অঞ্চলের সমুদ্রবক্ষে এখন সম্মিলিত পক্ষের একাধিপত্য।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তা—

রুশিয়া আজ দুই বৎসর যাবৎ তাহার পাশ্চাত্য সহযোদ্ধৃগণের নিকট দাবী করিতেছে, "য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাত কর।"

আঘাতের রূপ কেমন হইবে, সে সম্বন্ধেও রুশিয়ার দাবী স্পষ্ট। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আক্রমণে জার্ম্মাণীর অন্ততঃ ৬০ ডিভিসন সৈন্য যাহাতে পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে স্থানান্তরিত হয়, এইরূপ ভাবে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবার জন্য রুশিয়া পুনঃ পুনঃ দাবী জানাইয়াছে। ইটালীর যুদ্ধে জার্ম্মাণীর মাত্র ৩০ ডিভিসন সৈন্য লিপ্ত; তাহারাও পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে স্থানান্তরিত হয় নাই।

আবিসিনিয়ায় সৈন্য পরিচালনে মার্শাল বাদোগ্‌লিও

কাজেই, ইটালীর যুদ্ধ যে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন নয়, তাহা সুস্পষ্ট। অবশ্য, ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকরা ইটালীর যুদ্ধকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলেন নাই। মিঃ চার্চ্চিলের ভাষায় এই অঞ্চলের যুদ্ধ তৃতীয় রণাঙ্গন। সম্ভাবিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সকল আয়োজন না কি তাঁহাদের স্থির আছে।

সম্প্রতি রুশ-রণাঙ্গনে ও ইটালীতে জার্ম্মাণীর যে প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা জার্ম্মাণীর যতই প্রতিকূল হউক না কেন, তাহার সামরিক শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ। বর্ত্তমানে তাহার যে প্রতিরোধ-শক্তি প্রকট হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে রণক্ষেত্র সংক্ষেপ হইলে উহা আরও প্রবল ভাবে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-য়ুরোপের রণাঙ্গন দেড় হাজার মাইলব্যাপী; ভবিষ্যতে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনী যখন রুশ-সীমান্ত ত্যাগে বাধ্য হইবে, তখন স্বভাবতঃ ঐ রণক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইবে। তখন স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই, যুদ্ধের দ্রুত অবসানের জন্য অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মার্শাল স্মাটস্ সম্প্রতি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় শুনাইয়াছেন যে, আগামী বৎসর সকল শক্তি প্রয়োগে হিটলারের য়ুরোপীয় দুর্গে আঘাত করা হইবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, ঐ বৎসরই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা হইবে। তাহার পর শুনা গেল যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; তবে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ কখনই নিষ্ক্রিয়তায় অতিবাহিত হইবে না। এখন আবার ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হইতেছে! মার্শাল স্মাটসের এই উক্তি তাঁহার নিজস্ব নয়; বৃটিশ মন্ত্রিসভার জ্ঞাতসারেই—তাঁহাদের পক্ষ হইতে তিনি এই উক্তি করিয়াছেন। বৃটিশ সরকার স্মাটসের মুখ দিয়া রুশিয়াকে পুনরায় আশ্বাস দিতে চাহিয়াছেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন অদূরবর্ত্তী; সুতরাং মস্কৌ সম্মিলনে রুশ কর্ত্তৃপক্ষ যেন অধৈর্য্য প্রকাশ না করেন। ইতঃপূর্ব্বে যে ভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কিত কথার খেলাপ হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ সরকারের কোন মুখপাত্র হয় ত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের কথা উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিলেন।

সে যাহা হউক, এখনও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির এই দ্বিধা ও সঙ্কোচ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এই দ্বিধার কারণ যে প্রধানতঃ রাজনীতিক, তাহাও এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সামরিক দিক্ হইতে এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির শক্তি যে সম্মিলিত পক্ষের আছে, তাহা সঙ্গত ভাবেই মনে করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি হয় ত অন্যত্র জার্ম্মাণীকে আঘাত করিয়া সোভিয়েট বাহিনীর একক মধ্য-য়ুরোপে প্রবেশের সুযোগ কিছুতেই সৃষ্টি করিবে না। রুশ সেনা যদি মধ্য-য়ুরোপে প্রবেশের সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে সোভিয়েটের রাজনীতিক প্রভাব কিছুতেই নিবারিত হইবে না। এই জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি হয় ত, সোভিয়েট বাহিনী রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করিবামাত্র তাহাদের সহিত সামরিক সহযোগিতার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ রুশিয়ায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে তাহারা হয় ত তখন বল্‌কানে আক্রমণ আরম্ভ করিবেন এবং রুশ
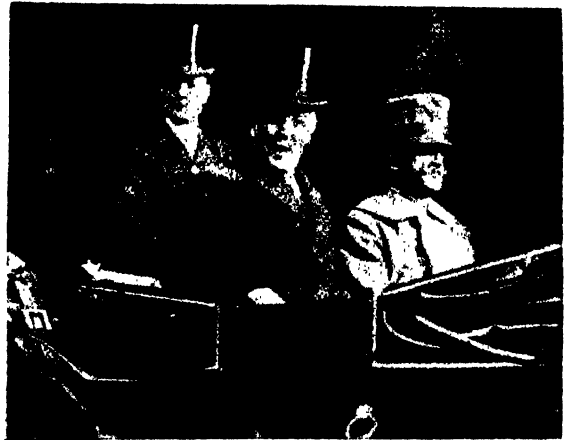
আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসন্
ও ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্

সৈন্যের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য যাহাতে একযোগে মধ্য-য়ুরোপে প্রবেশের সুবিধা পায়, তাহার জন্য প্রয়াস করিবেন। এই পরিকল্পনা যদি সত্যই রচিত হইয়া থাকে এবং উহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই উহাতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইবে না—একই রণাঙ্গন প্রসারিত হইবে মাত্র।

হিটলার এক সময় দম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,

দুইটি বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কাইজারের কৃত ভুল কখনই করিবেন না। সম্মিলিত পক্ষ আজ পর্য্যন্ত হিটলারকে এই "ভুল" পথ গ্রহণে বাধ্য করাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ভয় পান। তাঁহারা যদি সত্যই এই ভীতিপূর্ণ পথ এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান পরাজয় সত্ত্বেও তাহার সমরনীতির সাফল্যই ঘটিবে। জার্ম্মাণী এখন সুদীর্ঘ কাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিয়া সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে মতবিরোধের জন্ম প্রতীক্ষা চাহিতেছে; রণক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিজয় লাভের আশা সে আর করে না। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবে যদি সত্যই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ সমরনীতিরই জয় হইল বলিতে হইবে।

ত্রিশক্তির সম্মিলন—

য়ুরোপে যুদ্ধ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। এখন সমস্যা—ইটালীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট বাহিনী যখন পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিবে, তখন ঐ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? বিশেষতঃ, লণ্ডনে আশ্রিত পোল সরকারের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনীতিক সম্বন্ধ এখন বিচ্ছিন্ন। যুগোশ্লোভিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সমর্থনপুষ্ট মিহাইলোভিচ্‌কে সোভিয়েট রুশিয়া সমর্থন করে নাই। এখন এই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধ পরিচালনকালে অক্ষশক্তির অধিকৃত দেশগুলির সম্বন্ধে যেরূপ রাজনীতিক ব্যবস্থা হইবে, যুদ্ধোত্তর কালে এ সকল দেশে তাহার বিশেষ প্রভাব বিস্তারিত হইবেই। কাজেই, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গুরুত্বহীন নয়, আর এই বিষয়ে তিনটি শক্তির ঐকমত্য স্থাপিত না হইলে যুদ্ধও যথাযথরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার সম্মিলিত বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল। আটলাণ্টিক সনদ বা ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না। এ সকল রাজনীতিক দলিল অস্পষ্ট; উহাদের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব।

অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মস্কোয় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন এবং মার্কিণী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ কার্ডেল্ হালের সহিত রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। স্বভাবতঃ আলোচনার বিষয় এবং ইহার গতি সম্বন্ধে কোন কথাই এখন প্রকাশ করা হইতেছে না। বিভিন্ন সাংবাদিকের পরিবেশিত টুকরা সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আলোচনা সন্তোষজনক ভাবেই চলিতেছে।

ত্রিশক্তির সম্মিলন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রুশিয়ার পক্ষ হইতে যে আভাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, মস্কো-সম্মিলনীতে রুশিয়াও সামরিক বিষয়ের—অর্থাৎ দ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মাণীর পরাজয় সাধন সম্পর্কিত সমস্যার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিবে। যুদ্ধোত্তরকালীন রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জটিল বিতর্ক তুলিয়া এখন যুদ্ধ পরিচালনকার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা সোভিয়েট রুশিয়ার অভিপ্রেত নয়। বস্তুতঃ, যুদ্ধ রাজনীতিক উদ্দেশ্যেরই অনুসরণ। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন—ফ্যাসিজমের সম্পূর্ণ ধ্বংসই গণশক্তির অভ্যুত্থানের একমাত্র উপায়। এই মতবাদের পরিপূর্ণ ধ্বংসের জন্য সর্ব্বপ্রথম ফ্যাসিজমের প্রধান ভিত্তি নাৎসী জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি চূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই শক্তি চূর্ণ হইবামাত্র অপ্রধান ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অসহায় হইয়া পড়িবে, তাহাদিগের কর্ণধাররা পলায়নের পথ খুঁজিবে, অন্যান্য দেশের ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী ব্যক্তিরা দিশাহারা হইবে। এই ভাবে য়ুরোপের গণশক্তির বুকের উপর হইতে ফ্যাসিজমের জগদ্দল পাথর অপসারিত হইবামাত্র সে শক্তিকে আর কেহ রুধিতে পারিবে না, ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীরাও না। নাৎসী জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের পূর্ব্বে মধ্যপথে যদি তাহার সহিত কোনরূপ মীমাংসার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে উহাই য়ুরোপের গণশক্তি ও গণরাষ্ট্র রুশিয়ার পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। কাজেই, মধ্যপথে যুদ্ধ মিটাইবার সকল প্রয়াস বন্ধ করাই এখন রুশ কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সামরিক উদ্দেশ্য সফলের জন্য সাধারণ ভাবে রাজনীতিক বিষয়ের সিদ্ধান্তে রুশিয়া আপত্তি করিবে না। সে শুধু এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে, য়ুরোপের গণশক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটিবার মত কোন সিদ্ধান্তের সহিত সে সংশ্লিষ্ট হইয়া না পড়ে।

সুদূর প্রাচী—

সুদূর প্রাচীতে কোন পক্ষেরই বিশেষ সামরিক তৎপরতা নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারল ম্যাক্ আর্থারের সামান্য তৎপরতা চলিতেছে। এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সেনা সম্প্রতি নিউ গিনির অন্তর্গত ফিন্‌স্‌হাফেন্ অধিকার করিয়াছে। ইহাই সুদূর প্রাচীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তবে পূর্ব্ব-এশিয়ার নব-নিযুক্ত প্রধান সেনাপতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ ইতোমধ্যে তাঁহার প্রধান কেন্দ্র দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন। তথায় সহকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া তিনি চুংকিংএ গিয়াছিলেন। সেখানে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্, জেনারল ষ্টীল্‌ওয়েল ও অন্যান্য সমরনায়কদের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে।

সম্মিলিত পক্ষ একাধিক বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, য়ুরোপে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তি পরাভূত হইবার পর তাঁহারা প্রাচ্য অঞ্চলে অবহিত হইবেন; তবে, বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনকে সাহায্যদানের প্রয়াস হইবে। কিন্তু চীনকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিবার প্রয়াস এবং জাপানের চরম পরাজয় সাধনের জন্য যুদ্ধ—এতদুভয়ের পার্থক্য সৃষ্টি করা কিরূপে সম্ভব? সে দিনও মার্শাল স্মাট্‌সের বক্তৃতায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, য়ুরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পর প্রাচ্য অঞ্চলে মনোযোগ দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ কি ইহাই যে, 'লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে এখন প্রাচ্য অঞ্চলে ব্যাপক অভিযানের প্রত্যাশা করিও না?' বস্তুতঃ সম্মিলিত পক্ষ যদি আপাততঃ প্রাচ্য অঞ্চলে ব্যাপক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না চাহেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম অভিযান তথা ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিবার সমস্যাও আপাততঃ শিকায় উঠিবে; এখনও অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এই মোলাকাৎ, শলাপরামর্শ ও তোড়যোড় চলিবে।

বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-চীন পথই জাপানের মৃত্যুবাণ প্রেরণের একমাত্র রন্ধ্র। কাজেই, জাপান ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিবে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে শক্তিক্ষয়ের জন্য জাপানের প্রতিরোধক্ষমতা যদি হ্রাস পাইয়া থাকে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তবে ইহা সত্য যে, সম্মিলিত পক্ষ জাপানের চরম পরাজয়-সাধন-সম্পর্কিত যুদ্ধের তুলনায় ব্রহ্ম অভিযানকে গৌণ মনে করিলেও জাপান এতদুভয়কে অভিন্ন মনে করে এবং তদনুসারেই সে ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইতোমধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গে জাপানের প্রতিরোধমূলক বিমান-আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে; অতি সত্বর উহা পূর্ব্ব-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পূর্ব্ব দিক্ হইতে চীনা বাহিনীর ব্রহ্ম-অভিযান নিবারণের জন্যও জাপান সম্প্রতি য়ুনান প্রদেশে বিশেষ তৎপর হইয়াছে।

২১।১০।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

অন্নাভাবে বাঙ্গালা

বৎসরের পর বৎসর যখন চাউলের জন্ত বাঙ্গালার পরনির্ভরতার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন ইংরেজ সরকার তাহার প্রতিকার-প্রয়াস প্রয়োজন মনে করেন নাই। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি কখন ক্ষুণ্ণ হইবে না—প্রাচীতে অপরাজেয় সিঙ্গাপুর প্রভৃতি থাকিতে কোন দেশ সে শান্তি ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস করিবে না—এই অটল বিশ্বাসে ইংরেজ শাসকরা নিশ্চিন্ত ছিলেন—ব্রহ্ম হইতে চাউল আসিবে, সুতরাং বাঙ্গালা নির্ভয় হৃদয়ে পাটের চাষ বৃদ্ধি করিতে পারে ;—তাহার তুলার চাষেও অবহিত হইবার প্রয়োজন নাই—কারণ, মার্কিণের ও মিশরের তুলা ত আছেই—প্রয়োজন হইলে ভারতের অন্তান্ত স্থান হইতেও তাহা পাওয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধের আঘাতে সে বিশ্বাস ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার যে অবস্থা দিন দিন প্রবল হইতেছে, তাহা ভয়াবহ। যে সকল কারণ ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ার সহিত যুক্ত হইয়া দুর্দ্দশার প্রাবল্য ঘটাইয়াছে, সে সকলের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা করিব না। ইহাতে আমরা অন্নাভাবে বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহারই পরিচয় প্রদান করিব।

ভাতই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। সেকালে লোকের আকাঙ্ক্ষা ছিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের আরম্ভ সেই সন্ধিস্থলে যে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বাঙ্গালার অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, তাহার পর বহু দিন বাঙ্গালায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয় নাই। যদি কোন জিলায় কোন বৎসর শস্যহানি হইয়া থাকে, তবে ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্ত স্থান হইতে আমদানী ধান্তে ও চাউলে সেই অভাব অনায়াসে দূর হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে যে অন্নাভাব ঘটে, তাহার প্রতীকার যত সহজসাধ্য—মানুষের কার্য্যে যাহা ঘটে তাহার প্রতীকার তত সহজসাধ্য হয় না। বিশেষ শাসকদিগের যদি দূরদৃষ্টির অভাব হয়, তবে অবস্থা যেমন জটিল তেমনই ভয়াবহ হয়। বাঙ্গালায় তাহাই হইয়াছে।

বাঙ্গালী কয় মাস হইতে যে অভাব অনুভব করিতেছিল এবং যে ভয় করিতেছিল, তাহা যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দিল, তখন—তাহার পরিচয় পাইয়াও—সচিবগণ আবশ্যক প্রতীকার-ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না বা করিলেন না।

নূতন সচিবসঙ্ঘ কায়েম হইবার পর যখন প্রথম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইল, তখন সচিব-সমর্থক দলের মুসলমান সদস্য খাঁন বাহাদুর আবদুল ওয়াহেদ খাঁন বলিলেন (১৩ই জুলাই)—

বাখরগঞ্জ হইতে ৭০।৮০ লক্ষ মণ ধান্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উপযুক্তরূপ প্রচারকার্য্যের অভাবে অজ্ঞ কৃষকগণ সঞ্চয়বিরোধী অভিযানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই এবং তাহাদিগের সামান্ত সঞ্চিত ধান্তও লইয়া যাওয়া হইবে, এই আশঙ্কায় অভিযানের পূর্ব্বেই সব ধান্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হয়।

তিনি আপনার অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন—

"পটুয়াখালীতে বিক্রয়ার্থ বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে আনা হইতেছে। লোক আহার্য্য সংগ্রহ-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া স্ত্রী ত্যাগ করিতেছে। অনেকে অখাদ্য—এমন কি, মৃত পশুর মাংসও ভক্ষণ করিতেছে।"

তাঁহার এই কথায় লোকের চক্ষুর সম্মুখে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" চিত্র ফুটিয়া উঠে। সেই—লোক "গোরু বেচিল, লাঙ্গল যোয়াল বেচিল, বীজ-ধান খাইয়া ফেলিল, ঘর-বাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। * * * ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল।" জীবিতগণ মৃতের মাংসও খাইতে লাগিল।

যে সময় ব্যবস্থা পরিষদে খাঁন বাহাদুর আবদুল ওয়াহেদ খাঁন মফঃস্বলের এই বিবরণ প্রদান করেন, তখনই লোক অন্নাভাবে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বহু দিন অনাহারে বা অপূর্ণ আহারে জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া শেষে—অনন্যোপায় হইয়া—কলিকাতায় আসিতেছিল। ২৬শে জুলাই তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান মিষ্টার আমেদ বলেন, এক দিনে হিন্দু সৎকার সমিতি কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টি (হিন্দুর) শব সৎকারার্থ অপসৃত করিয়াছিল ; আঞ্জুমান মফীদুল ইসলাম আরও কতকগুলি শব (মুসলমানের) লইয়া গিয়াছিল।

যখন সহরে এইরূপ অবস্থা হয়—যে স্থানে দুর্গতগণ লোকের দয়ায় খাদ্য পায় তথায়ও লোক পথে পড়িয়া মরিতে থাকে, তখন মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মফঃস্বল হইতে জীর্ণবাস, শীর্ণকায় নরনারীশিশু—অন্নের সন্ধানে সহরের পথে যেন প্রেতের শোভাযাত্রা করিতেছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এক একটি পরিবার যত দিন পারিয়াছে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা সম্ভব হয় নাই—ক্ষুধার তাড়নায় পিতামাতা পুত্র-কন্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে ও হইতেছে—দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। যথাকালে গ্রামে গ্রামে সাহায্যদান-ব্যবস্থা করিলে—লোককে কায করিয়া অন্নার্জ্জনের উপায় করিয়া দিলে, কখনই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারিত না। কারণ, দেশে খাদ্য-শস্যের এমন অভাব হয় নাই যে, তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অনিবার্য্য। প্রধানতঃ ব্যবস্থার অভাবেই এমন হইয়াছে।

জুলাই মাসের প্রথমেই শ্রীহট্ট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের কয়টি জিলা হইতে বোমাপাতে বিধ্বস্ত গ্রামবাসী ও অন্নহীন নরনারী দলে দলে শ্রীহট্টে যাইতেছে—অনেকে রেলের কামরায়, অনেকে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে, কেহ বা বৃক্ষতলে, কেহ বা রাত্রিতে যে অস্বাস্থ্যকর গৃহে আশ্রয় লয় তথায় শীর্ণ দেহ রক্ষা করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, তাহাদিগের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তারলাভ ঘটিতেছে—প্রাপ্তবয়স্কারা হীনপ্রকৃতি লোকের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইতেছে। বাঙ্গালার নানা স্থান হইতেও এইরূপ দুর্দ্দশার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কিরূপে পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের বিবৃতি হইতে বুঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানকারীরা কলিকাতায় আগত ৫ শত ৪টি পরিবারের সংবাদে নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) যাহারা কৃষিকার্য্যে শ্রমিকের কায করে এবং যে সকল কৃষক স্বল্প জমি চাষ করে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছে। তাহারা যে গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে আগামী ফসলেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি তাহাতে বুঝিতে পারা যায়।

(২) পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। স্বামীরা স্ত্রীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, স্ত্রীরা রুগ্ন স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; সন্তানগণ অক্ষম ও বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; ভ্রাতারা ভগিনীদিগের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করে নাই; যে সকল বিধবা ভগিনী এত দিন ভ্রাতৃগণের দ্বারা প্রতিপালিত হইত, তাহারা এই দারুণ দুর্দ্দিনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জুলাই মাসের শেষ ভাগের অবস্থা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তাহার পরে বর্ষা আসিল। যাহারা সহরে আসিল, তাহাদিগকে আশ্রয়দানের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিয়া রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল—শিশুরাই সর্ব্বাগ্রে মরিতে লাগিল।

আগষ্ট মাসে অবস্থা দিন দিন অধিক শোচনীয় হইতে লাগিল। সেই সময়ে কলিকাতা হইতে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও কুমার সার জগদীশপ্রসাদ কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-সদস্যের নিকট যে বিবৃতি প্রেরণ করেন (২১শে আগষ্ট, ১৯৪৩) তাহাতে তাঁহারা অবস্থার প্রতীকারকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব করেন। সেই বিবৃতির প্রারম্ভে অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছিল :—

"এ কথা স্বীকৃত যে, যখনই লোক অনির্দ্দিষ্ট ভাবে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিতে থাকে, তখনই বুঝিতে হয়, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আর যখন সে সকল লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায় না, তাহারা দলে দলে ঐ ভাবে যায়, তখনই বুঝিতে হয়, তাহারা যে সকল স্থান হইতে আসিয়াছে, সে সকল স্থানে সাহায্য প্রদানে বিলম্ব হইয়াছে। (ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট ৩৮ প্যারা) দলে দলে ক্ষুধিত পুরুষ নারী শিশু খাদ্যের সন্ধানে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিতেছে। প্রায়ই দেখা যায়, শীর্ণকায় লোক—আর চলিতেও অক্ষম অবস্থায় অনাবৃত অবস্থায় রাজপথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

"প্রতিদিন এইরূপ ৬০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক দুর্গত অন্নসত্রে যাইতেছে। প্রতিদিন রাজপথ হইতে শব অপসারিত করিতে হইতেছে। বিভিন্ন জিলায় অনাহারে মৃতের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু নির্ভরযোগ্য সংবাদে বুঝা যায়, নোয়াখালী ও মেদিনীপুরের মত জিলায় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিতেছে।

"গত ১৬ই হইতে ২১শে আগষ্ট এই কয় দিনে যখন কলিকাতাতেই অবসন্ন মৃতের শব-সংখ্যা ৭ শত ৬৩ হইয়াছিল এবং তাহার পরে প্রতিদিন সেইরূপ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে, তখন পূর্ব্বোক্ত অনুমানই করিতে হয়—ইত্যাদি।"

সার নৃপেন্দ্রনাথ ও কুমার সার জগদীশপ্রসাদ উভয়েই কেন্দ্রী সরকারে সদস্যের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা যে কোনরূপ অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা মনে করা যায় না। পরন্তু, তাঁহারা অত্যন্ত সাবধান ও সংযত উক্তি প্রযুক্ত করিয়াছেন।

এই বিবৃতি প্রদানের পরেই সার জগদীশপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জিলার অবস্থা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দ্বিতীয় বিবৃতি প্রচার করেন। তাহাতে তিনি বলেন, কেন্দ্রী সরকারের এক জন কর্মচারী যে বলিয়াছেন— অবস্থার অতিরঞ্জন করা হইয়েছে, তাহা যে মিথ্যা তাহা তাঁহারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলেন :—

"ফরিদপুরে একটি সাহায্যদান কেন্দ্র আমি দেখিয়াছি, এক জন লোক কুকুরের মত খাদ্য চাটিয়া খাইতেছে। আমি দেখিয়াছি, পরিত্যক্ত শিশুরা শীর্ণতার শেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; লোকের বহু দিন অনাহারে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে চিকিৎসকের বিধান ব্যতীত তাহাদিগকে আহার্য্য দান করা যায় না। এক জন লোক খাদ্যলাভের ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাশ গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া মরিয়া যায়। যখন তাহার শব অপসারিত করা হইতেছিল, সেই সময় এক কোণে উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোক একটি পুটুলি ঠেলিয়া দিয়া বলে—'এও লইয়া যাও।' সেটিতে শিশুর শব। এক জন স্ত্রীলোক তাহার পীড়িত ও ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর জন্য প্রতিদিন খাদ্যদান কেন্দ্রে যাতায়াতে ১২ মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করিতেছিল।"

১০ই সেপ্টেম্বর এই বিবৃতি প্রচারিত হয়।

ইহার পূর্ব্বে ২০শে আগষ্ট সরকারী স্বীকৃতিতে জানা যায়, ১৬ই হইতে ২০শে আগষ্ট ৫ দিনে পুলিস কলিকাতার রাজপথ হইতে ১ শত ২০টি শব অপসারিত করে। রাজপথে পতিত অন্নাভাবে মৃতপ্রায় ১ শত ৬০ জনকে হাসপাতালে লওয়া হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে ১১ জন হাসপাতালে মরিয়া যায়।

কলিকাতায় এত দুর্গতের সমাগম হইতে থাকে যে, বাঙ্গালা সরকার গ্রামে সাহায্যদানের কোন ব্যবস্থা না করিয়া কলিকাতায় তাহাদিগের আগমন বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;

আগষ্ট মাসের শেষ দিনে ও ১লা সেপ্টেম্বরে কলিকাতার যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

৩১শে আগষ্ট বিভিন্ন হাসপাতালে এক শত ৩৭ জন অনাহারকাতরকে লইতে হয়,—২৫ জনের মৃত্যু হয়। পুলিসের শবাপসরণকারীরা রাজপথ হইতে ১১টি শব অপসারিত করে।

১লা সেপ্টেম্বর ৮১ জনকে হাসপাতালে লওয়া হয়।

২৮শে আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে কলিকাতার মৃত্যু-সংখ্যা—১ হাজার ১ শত ৫১।

অনুমিত হয়, তখনই কলিকাতায় মফঃস্বল হইতে আগত দুর্গতের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার।

যখন এইরূপ অবস্থার জটিলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্যদান-ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে সাহায্যদানের যেরূপ ব্যবস্থা ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে সরকার করিয়াছিলেন, তাহা হয় না। এ দিকে নানা প্রদেশে বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ লক্ষিত হয়; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে সাহায্যদান-কার্য্য ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। সরকারের

খাদ্যদান-কেন্দ্রেও সময় সময় চাউল প্রভৃতির অভাবে কায বন্ধ থাকে এবং কোন কোন স্থানে সরকার নির্দ্দেশ দেন—অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় স্থানীয় লোককে দিতে হইবে। অথচ স্থানীয় লোকরাই বিপন্ন ও বিব্রত।

বাঙ্গালার কি হইতেছে, তাহা শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বল্প কথায় নাগপুরে বলিয়াছেন—বাঙ্গালার অর্থনীতিক ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা এতই বেদনাদায়ক যে, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদিগের বেদনার আতিশয্য অবস্থায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই জন্য আমরা প্রথমে অন্য প্রদেশের ও বিদেশের লোকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অবস্থার স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিব।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অবস্থা অবগত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং প্রথম বারেই শিশুদিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়টি সাহায্যদান-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এলাহাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তিনি বলেন :—

(১) "অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং না দেখিলে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। এই বিপদে শিশুরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত পাইয়াছে। পিতামাতা একমুষ্টি অন্নের জন্য পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়াছে—ইহাও আমি শুনিয়াছি।"

(২) কয় মাসের মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন না। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও শিশুদিগের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। নিরাশ্রয়—পিতৃমাতৃহারা শিশুদিগের সমস্যা প্রবলই থাকিবে।

(৩) অনন্যোপায় হইয়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বহু বাঙ্গালী শিশু ও বালককে অন্য প্রদেশে পাঠাইয়াছেন। তিনি সে ব্যবস্থার বিরোধী। তাহারা বাঙ্গালার সন্তান—তাহাদিগকে বাঙ্গালায় রাখিয়া "মানুষ করিতে" হইবে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী আবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এই বার তিনি যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা হইতে আমরা কয়টি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "দুই সপ্তাহ পরে বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিলাম, অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে। গত কয় সপ্তাহে (ভারত-সচিব) মিষ্টার আমেরী বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, প্রকৃত অবস্থা তাহার বিপরীত।"

(২) "লোকের অন্নাভাব রহিয়াছে এবং ব্যাধি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। ম্যালেরিয়া ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে—দারিদ্রগণ (অনাহারে) জীবনীশক্তি হারাইয়া দলে দলে মরিতেছে। কলেরা ও আমাশয় বৃদ্ধি পাইতেছে—সহরে ও গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইতেছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়; যে সকল স্থানে সঙ্কটকালীন চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল স্থানেও ঔষধের অভাবে চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে। আমি যে স্থানেই গিয়াছি, সেই স্থানেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, ঔষধের অভাবে তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছেন না।"

(৩) "খড়গপুর হইতে কাঁথীর মধ্যে আমি ৩টি শব ও ৫টি নরকঙ্কাল দেখিয়াছি। শকুন একটি শব আক্রমণ করিয়া তাহার অন্ত্র অপসারিত করিয়াছে, শকুনের আরব্ধ কার্য্য কুক্কুর শেষ করিতেছে।

"আর এক স্থানে একটি সদ্যমৃত বৃদ্ধের শব পতিত রহিয়াছে—তাহা তখনও শীতল হয় নাই। তাহার দেহের শীর্ণতা ও মুখের ভাব এত ভয়াবহ যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।"

"দেখিলে দুঃখ হয়, এক জন মৃতা স্ত্রীলোক একখানি মলিন বস্ত্রাংশ ও একটি মৃৎপাত্র ধরিয়া আছে—পরলোকে যাত্রাকালেও সে যেন তাহার সেই পার্থিব সম্বল ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল না।

"কতকগুলি স্থানে শব নিকটবর্ত্তী পথিপার্শ্বস্থ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—গলিত মাংসের দুর্গন্ধ দুঃসহ।"

(৪) "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের কৃষকগণ ও শ্রমিকরা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আহার্য্যের সন্ধানে সহরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। যাহাদিগের কিছু তৈজসপত্র ছিল, তাহারা কয়টি পয়সার জন্য বা সামান্য পরিমাণ খাদ্য-শস্যের জন্য সে'সব বিক্রয় করিয়াছে। হাটের দিন পথিপার্শ্বেই গার্হস্থ্য পাত্রাদি ও স্ত্রীলোকদিগের রৌপ্যালঙ্কার বিক্রীত হইতে দেখা যায়।"

(৫) "দূরস্থ গ্রামে দুর্দ্দশা আরও শোচনীয়। * * * * কোন কোন গ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছে—শূন্য কুটীর শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। যে সকল খালের পথে এই সকল গ্রামে যাইতে হয়, সে সকলের জল গলিত শবে দুষ্ট হইয়াছে—কোন কোন শব পচিতেছে। মৃতদিগের মলিন বস্ত্র ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে; রোগ বিস্তার করিতেছে।"

(৬) "সর্ব্বত্র লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে না জানিয়া তাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সরকারের সাহায্যে যে সকল খাদ্যদান কেন্দ্র পরিচালিত হয়, সে সকলের সংখ্যা কেবল অল্প নহে, পরন্তু সে সকলে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা এতই অল্প যে, কেন যে তাহা দেওয়া হয়, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। জিলায় কোন কোন কেন্দ্রে প্রদত্ত মণ্ড কৃষ্ণবর্ণ।"

(৭) "কাঁথীতে আমি যাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি নিজব্যয়ে প্রতিদিন ২ শত লোককে অন্নদান করিতেন। লোক তাঁহার অন্নসত্রে দলে দলে সমাগত হইত। যে দিন আমি তথায় উপস্থিত, সেই দিন মহকুমা হাকিম সেই অন্নসত্র বন্ধ করিতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, উহা বন্ধ না করিলে দূরস্থ গ্রাম হইতে লোক আসিবে এবং তাহাতে সহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইবে! অথচ সহরে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই লক্ষিত হয় নাই।"

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দিন্দার—মৃত পুত্রের জন্মতিথিতে আরব্ধ অন্নসত্রের কথা বলিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে অন্নসত্রের পরিচালকের অতিথি ছিলেন, তাহাই বোধ হয়, পরিচালকের "অপরাধ" বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মহকুমা হাকিমের কাঁথীতে অধিক দুর্গতি সমাগমে আপত্তির অন্য কারণ পরে অনুমান করা গিয়াছে—লর্ড ওয়াভেল কাঁথী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের যে ৫ জন সিনেটর পরিদর্শনজন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন—র‍্যালফ ব্রুষ্টার বলিয়াছেন—

তাঁহারা দেখিয়াছেন, চারি দিকে শব পতিত রহিয়াছে—স্ত্রীলোক ও শিশুরা মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। "ইহারা যে রাত্রিকালে উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করিয়া থাকার সময় দুষ্কৃতকারীদিগের দ্বারা বলপূর্ব্বক অত্যাচারিত হইয়াছে, ইহাও আমি শুনিয়াছি। কতকগুলি লোক অসহায় ও আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া লইয়াও যাইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার কোন সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা হয় নাই।"

পণ্ডিত শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া স্বয়ং অবস্থা দেখিতে আসিয়াছিলেন। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণা জিলাত্রয় পরিদর্শন করিয়া আসিয়া তিনি যে বিবৃতি প্রদান করেন, আমরা তাহা হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কলিকাতায়ও আমি যে সব দৃশ্য দেখিয়াছি, সে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতির অভাবগ্রস্ত লোকও কখন ভুলিতে পারিবে না। কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্র আমি দেখিয়াছি, মানুষ শবের আকার হইয়াছে—ক্ষুধার্ত্ত দুর্গতগণ শস্যকণার সন্ধানে আবর্জ্জনাস্তূপে ও গলিত তরকারীর মধ্যে সন্ধান করিতেছে। কিন্তু কাঁথী ও তমলুক (মেদিনীপুর জিলার) মহকুমাদ্বয়ে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

"আমি কাঁথীতে ও তমলুকে যাইবার পূর্ব্বেই জানিতাম যে, এই দুইটি মহকুমা গত বৎসর বন্যায় ও বাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বর্ষেও তথায় কোন কোন অংশে বন্যা হইয়াছে। তথাপি আমি যে ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি অতিরঞ্জন করিতে চাহি না; কিন্তু কাঁথী যেন প্রেতপুরী বলিয়া মনে হয়। আমি যে স্থানেই গিয়াছি, তথায়ই কতকগুলি শব দেখিয়াছি; আর স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দেখিলেই দুঃখ হয়। আমি যে সকল গ্রামে গিয়াছি, সে সকলে অবস্থা কাঁথীর তুলনায় আরও শোচনীয়। লোক যেন মৃত্যু-কবলিত। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি লোকের জীবনরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে এবং আমি শুনিয়াছি, সরকারও কাঁথী মহকুমায় অনেকগুলি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু খাদ্য-শস্যের অভাবে কোথাও আবশ্যক সাহায্য প্রদান সম্ভব হইতেছে না। আমি দেখিলাম, যথাসময়ে খাদ্যশস্য না পাওয়ায় একটি অন্নসত্র বন্ধ হইয়াছে।

"সাধারণতঃ তমলুকে অবস্থা কাঁথীর তুলনায় ভাল। কিন্তু তমলুক মহকুমায়ও অন্নাভাবের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তমলুকে, মহিষাদলে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আমি যে গ্রামেই যাইতে পারিয়াছি সেই গ্রামে শব পতিত থাকিতে দেখিয়াছি। চক্ষুর সম্মুখে দেখা যাইতেছে, স্ত্রীলোক ও শিশুরা অনাহারে মরিতেছে, অথচ তাহার কোন প্রতীকার করা যাইতেছে না, ইহা হৃদয়বিদারক অবস্থা। আমি কাঁথী ও তমলুক উভয় মহকুমায় অবগত হইয়াছি, লোকের মৃত্যু হইবার পূর্ব্বেই শৃগাল ও কুক্কুর তাহাদিগের দেহ আহার করিতে আসিয়াছে।

"রাজকর্ম্মচারীরা যেন মনে করেন, প্রধানতঃ পেশাদার ভিক্ষুকরাই অনাহারে মরিয়াছে। আমি সে কথা বলিতে পারি না। সে কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, কাঁথীর সকল লোকই ভিখারী। আমার অনুসন্ধান-ফলে আমি বুঝিয়াছি, অনশনে মৃতদিগের অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে অল্প হইলেও কিছু জমির অধিকারী অথবা ভূমিশূন্য শ্রমিক ছিল।"

কয় দিন পরে কলিকাতায় এক সভায় (২৮শে আশ্বিন) ডাক্তার হৃদয়নাথ বলিয়াছিলেন:—

"যে সকল দৃশ্য আমি দেখিয়াছি, সে সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে পীড়িত করিবে। আমি দেখিয়াছি, স্ত্রীলোক ও শিশুরা কোনরূপ প্রতিবাদ পর্য্যন্ত না করিয়া অনাহার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি, ব্যয়িতজীবনীশক্তি শিশুরা ভূমিতে মস্তক রাখিতেছে—আর উঠিতেছে না। আমি দেখিয়াছি, পোষ্যদিগকে খাইতে দিতে না পারিয়া স্বামী স্ত্রীকে ও পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

(১) "আমি দেখিয়াছি, হাসপাতাল শবাকার মানবে পূর্ণ। * * * যাহারা চিকিৎসিত হইতেছে, তাহারা বাঁচিবে কি না এবং বাঁচিলে কখন পূর্ব্বাবস্থ হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদিগের জীবনীশক্তি এত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে যে, আমন ধান্য উঠিলেই তাহাদিগের সব দুঃখের অবসান হইবে মনে করা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা।"

(২) "আমি যে স্থানেই গিয়াছি, দেখিয়াছি শব পড়িয়া আছে—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সে শব ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপসারিত হয় নাই।"

এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, যখন অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, তখনও বাঙ্গালার সচিব কৃষকদিগকে মসলেম লীগের নামে সঞ্চিত শস্য দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন! বাঙ্গালার পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

দিল্লীতে যাইয়া ডাক্তার হৃদয়নাথ বলিয়াছেন—(১৫ই কার্ত্তিক)—তাঁহার সহিত যে সকল ভারতীয় বা য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ হইয়াছে তাঁহারা কেহই বলেন নাই—তাঁহাদিগের এলাকায় কৃষকগণের নিকট অধিক শস্য সঞ্চিত আছে। লোকের যে অবস্থা—দুরবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সঞ্চিত শস্য থাকিলে লোকের যে সে অবস্থা হইতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার সহিত যে সকল রাজকর্ম্মচারীর আলোচনা হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন বা দুই জন বলিয়াছেন—প্রতি গ্রামে যে সপ্তাহে অন্ততঃ এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। সেই হিসাবে যদি মনে করা যায়, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক গ্রামে অনাহারে মৃত্যু নাই, তাহা হইলেও বলিতে হয়, সমগ্র প্রদেশে সপ্তাহে ৫০ হাজার লোক মরিতেছে।

শ্রীমতী রাজন নেহরু সাহায্যদান ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি পরিভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বলিয়া গিয়াছেন:—

"আমি ও আমার সঙ্গীরা বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলাম—দুঃখাচ্ছন্ন ও হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।"

গত ১লা আগষ্ট হইতে ৩০শে অক্টোবর এই প্রায় ৩ মাসে কেবল কলিকাতায় ১০ হাজার ৬ শত ৩১ জন

মৃত্যু—বিলাতের সরকারের ভারত-সচিবের হিসাব হীন মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

যে মফঃস্বল হইতে দলে দলে লোক মৃত্যুর বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরে আসিতেছে, সেই মফঃস্বলে অবস্থা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়, তাহা বলা বাহুল্য।

মাড়বারী সাহায্যদান সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুত বালচন্দ্র শর্ম্মা বলিয়াছেন :—

"মেদিনীপুরে আমি দারুণ অভাবজনিত যে দুর্দ্দশার দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কিন্তু আমি যে দেখিয়াছি, কঙ্কালসার নরনারী বৃক্ষের পত্র ও বনের লতাগুল্মাদির মূল খাইতেছে, শিশুরা কুকুর বিড়ালের সঙ্গে পথের ধূলিতে পড়িয়া আছে, শতছিদ্র বস্ত্র-পরিহিতা তরুণীরা রাজপথে আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত খাদ্যাবশেষ সন্ধান করিতেছে, অনাহারক্লিষ্ট সন্তানের ভার বহনে অক্ষম পিতামাতা কর্ত্তৃক ত্যক্ত শিশুরা অসহায় অবস্থায় রহিয়াছে—এ সকল কিছুতেই স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না।"

সপ্তাহ কাল মেদিনীপুর পরিদর্শনান্তে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমতী রাজন নেহরু বলেন (৩০শে আশ্বিন)—

"আমি যে সকল স্থানে গিয়াছি, সে সকলের মধ্যে, বোধ হয়, কাঁথীতেই দুর্দ্দশা সর্ব্বাধিক। তথায় ৬।৭ লক্ষ লোকের মধ্যে অর্দ্ধাংশ মৃতপ্রায়—অপরার্দ্ধও দ্রুত মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। কাঁথীর চারি পার্শ্বে বহু নারী ও শিশু পতিত অবস্থায় পানীয়ের জন্য 'খাবি খাইতেছে'—তাহাদিগের নড়িবার বা কথা বলিবার সামর্থ্যও নাই। কি শোচনীয় দৃশ্য—প্রায়-বিবস্ত্রা শীর্ণকায় নারীরা অনাহার-দুর্ব্বল শিশুদিগকে লইয়া যাইতেছে—শিশুরা মাতৃস্তন হইতে স্তন্য-লাভের মর্ম্মান্তিক চেষ্টা করিতেছে। কুকুর ও শকুন মাংসলোভে মুমূর্ষু শিশুর পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে, এ দৃশ্য বিরল নহে।"

লর্ড ওয়াভেল কাঁথীতে গিয়াছিলেন। তিনি কি এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন ?

ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) হইতে সংবাদ পাওয়া যায়—পাত্রসায়ের গ্রামের শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র হাজরার গৃহ হইতে যে উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লইতে নারায়ণ বাউরীর পুত্র অগ্রসর হয় এবং ঐ উচ্ছিষ্টলোলুপ একটি কুকুর তাহাকে দংশন করে।

২৬শে ভাদ্র ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে সংবাদ পাওয়া যায়—

মগরা বাজারের সংবাদে প্রকাশ, এক জন অনশন-দুর্ব্বল লোক পথিপার্শ্বে পড়িয়া ছিল। নিশীথে শৃগাল তাহার পদ চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করে। এক পথিক তাহার যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে শৃগালের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। কিন্তু সে বাঁচে নাই।

৬ই আশ্বিন মালদহ হইতে সংবাদ পাওয়া যায় :—

লাহারপুর গ্রামের (নবাবগঞ্জ থানা) ভোগুরদী মণ্ডল ১০ দিন পূর্ব্বে তাহার প্রায় ৩ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র মজাফ্‌রকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। তাহার পরিবারস্থ সকলের না কি ৩।৪ দিন আহার্য্য জুটে নাই—সেই জন্য বিভ্রান্ত হইয়া সে ঐ কায করিয়াছিল। মালদহের দায়রা জজ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া—আইনানুসারে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া—অবস্থা বিবেচনা করিয়া—সরকারের নিকট তাহাকে অনুগ্রহ করিবার আবেদন জ্ঞাপন করেন।

৫ই কার্ত্তিক ঢাকা হইতে সংবাদ পাওয়া যায় :—

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বারোটী ইউনিয়নের একটি লোক—কঙ্কালসার অবস্থায় অন্নের জন্য ইউনিয়নের অন্নসত্রে আসিয়া মগ্ন হয় এবং তাহার পর নিকটেই শুইয়া পড়ে। প্রভাতে লোক দেখিতে পায়—সে তখনও জীবিত থাকিলেও শৃগাল তাহার দেহের কতকাংশের মাংস খাইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, রাত্রিকালে সে যখন শৃগাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে তাড়াইয়া দিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে একটি স্ত্রীলোকের শব পথিপার্শ্বে দেখা গিয়াছিল, সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবামাত্র—সে জন্য কে দায়ী, সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছিল।

গত ৮ই কার্ত্তিক ধীবর সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ একটি শিশু লইয়া পরস্পরকে ধরিয়া দয়াগঞ্জের (ঢাকা) নিকট ট্রেণের সম্মুখে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুটি বাঁচিয়া যায়। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা এই কায করিয়াছিল।

ধীবর সম্প্রদায়ের দুর্গতির বিশেষ কারণ আছে। সার জন হার্ব্বার্ট যখন সচিবদিগের সহিত পরামর্শও না করিয়া নৌকা অপসারিত করিবার আদেশ দেন, তখন—সেই কারণেই বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের উপায় নষ্ট হয়। কুমার সার জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বিবৃতিতে ফরিদপুর প্রভৃতি জলপথবহুল স্থানে ইহাদিগের জন্য বিশেষ সাহায্য-ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন।

গত ১৭ই কার্ত্তিক তমলুক (মেদিনীপুর) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

দেবীপুর গ্রামে একটি বৃদ্ধ অনাহারে দুর্ব্বল হইয়াছিল। সে একটি খালের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে পড়িয়া যায়। তিনটি শৃগাল তাহাকে আক্রমণ করে। কয় জন লোক সেই দিকে যাইতেছিল। তাহারা আসিয়া শৃগালগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। বৃদ্ধের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—স্থানীয় মোক্তার-লাইব্রেরীর সম্মুখে পতিত এক জন মুমূর্ষুকে শৃগাল ও কুকুর খাইতেছে—দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ সংবাদ প্রতিদিন নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, অনেক সংবাদই পাওয়া যায় না। যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, সে সকলের অনেকগুলি আবার সংবাদ-প্রেরকের পরিচয় না জানায় সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

দিকে দিকে অবস্থা এইরূপ হইলেও খাদ্যবিভাগ যে সচিবের অধীন, তিনি বলিয়াছেন—বাঙ্গালার সকল অংশই যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নহে, তখন বাঙ্গালাকে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বলিয়া ঘোষণা করা যায় না। কোন্ কোন্ অংশে যোগ্য ও অযোগ্য সকল লোকই বাঙ্গালার সচিবের অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে, তাহা কি তিনি বলিতে পারেন ?

ইহার পরে যে রোগ বিস্তার লাভ করিবে, তাহা অতীত দুর্ভিক্ষের সামান্য অভিজ্ঞতা থাকিলেই সচিবরা বুঝিতে পারিবেন। "ছিয়াত্তরের

মন্বন্তরে" যাহা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী সংবাদ হইতে 'আনন্দ মঠে' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিহারে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিলে সার বার্টল ফ্রেয়ার বিলাতে এক বক্তৃতায় বলেন—

"দুর্ভিক্ষে মরিবার বহু পূর্ব্বেই মানুষ মরণাহত হয়। বহু দিন স্বল্পাহারে অকালমৃত্যু অনিবার্য্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকের যে অবস্থা ঘটে, তাহাতে, তাহার পরে ঔষধ ও পথ্যে কিছুতেই আর তাহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভ হয় না। দুর্ভিক্ষের ফলে আবার জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধিতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে।"

যাহাদিগের জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়; তাহারা রোগাক্রান্ত হইলে আর বাঁচে না। আর কুখাদ্য খাইয়াও বহু লোক বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। এ বার কোন কোন স্থান হইতে বিসূচিকায় এক একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

গত ১৭ই কার্ত্তিকের সংবাদ:—

(১) সিরাজগঞ্জে গারুদহে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরা সংক্রামক রোগের আকারে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। এক পক্ষকালে গারুদহ গ্রামে ১৮ জনের ও বালুহাটায় ৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

(২) মালদহে সর্ব্বত্র কলেরা দেখা দিয়াছে। গত ২৩শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ৫ শত ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রপুরে হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকগণ বহু লোককে কলেরার টীকা দিতেছেন। জিলা বোর্ডের অফিসে শোধক পাওয়া যায় না; আর বোর্ড কলেরার টীকার জন্য যে ঔষধ সরবরাহ করিতেছেন, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প।

আমরা কোন্ স্থানের কথা ত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানের কথা বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল যে কলিকাতায় লোক মরিতেছে, তাহা নহে—অধিক লোক গ্রামেই মরিতেছে। গত ২২শে কার্ত্তিক প্রচার-সচিব শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিক স্বীকার করিয়াছেন—কলিকাতা শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলে ২৩ লক্ষ লোকের জন্য ২২ লক্ষ মণ খাদ্য-দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে, আর বাঙ্গালায় অবশিষ্ট ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ লোক মাত্র ১৬ লক্ষ মণ পাইয়াছে। এই নির্লজ্জ উক্তির সমালোচনা করিতেও ঘৃণা হয়।

ভারত-সচিব বিলাতে পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন—সপ্তাহে বাঙ্গালায় এক হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছে—মৃতের সংখ্যা কিছু অধিক হইতেও পারে। এই উক্তি এত অসঙ্গত যে, মনে করা যায়—তিনি ইচ্ছা করিয়া, বিলাতের লোককে ভুল বুঝাইবার হীন অভিপ্রায়ে—মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তাঁহার হিসাব নির্ভরযোগ্য নহে—নানা পত্রাদিতে ইহা বলা হইলে, ভারত সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে কলিকাতার সাপ্তাহিক মৃত্যু-সংখ্যা তার করিতে নির্দ্দেশ দেন। কলিকাতায় দুর্গত মৃতের সংখ্যা যখন এত অধিক হইতে আরম্ভ হয় যে, তাহা আর গোপন থাকে না, তখন হইতে বাঙ্গালা সরকার প্রতিদিন সে সম্বন্ধে হিসাব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সে হিসাবে কিন্তু কেবল হাসপাতালে মৃত দুর্গতদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইত। গত ২৪শে আশ্বিন বিভিন্ন হাসপাতালে দুর্গত মৃতের সংখ্যা ১ শত ২—

ক্যাম্পবেল হাসপাতালে	... ৩০
বেহালা হাসপাতালে	... ৫৯
কামারহাটী হাসপাতালে	... ৪
লেক ক্লাব হাসপাতালে	... ৭
সুরেশচন্দ্র রোড হাসপাতালে	... ১
শ্রী মেমোরিয়াল হাসপাতালে	... ১

গত ৮ই কার্ত্তিকের হিসাব—

ক্যাম্পবেল হাসপাতালে	... ২৬
বেহালা হাসপাতালে	... ৩৩
কামারহাটী হাসপাতালে	... ১১
লেক ক্লাব হাসপাতালে	... ৬
সুরেশচন্দ্র রোড হাসপাতালে	... ৮
অন্যান্য হাসপাতালে	... ৯
মোট	... ১০১

গত ৯ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে মোট মৃত্যু-সংখ্যা—১ হাজার ৯ শত ৬৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে এই সময়ে গড় মৃত্যুসংখ্যা ৫ শত ৭৩ মাত্র।

গত ১৬ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় মৃতের সংখ্যা—২ হাজার ১ শত ৫৪।

যে কারণে বা যে উদ্দেশ্যেই কেন হউক না—লর্ড ওয়াভেলের কলিকাতায় আগমনের কয় দিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা হইতে দুর্গতদিগকে অপসারিত করিবার কার্য্য প্রাবল্য লাভ করে। তথাপি গত ১৬ই কার্ত্তিক কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে দুর্গত মৃতের সংখ্যা ৮৪ হইয়াছিল।

গত ১লা আগষ্ট হইতে ৩০শে অক্টোবর ৩ মাসে কলিকাতায় দুর্গত মৃতের সংখ্যা—১০ হাজার ৬ শত ৩১ হইয়াছে।

ইহাতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। আর ইহা হইতে মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

বিলাতে ও এ দেশে সরকার বহু দুর্গতকে অন্নদান করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সে ঘোষণার উদ্দেশ্য যাহাই কেন হউক না—সরকারের খাদ্য-দান কেন্দ্রে যে "খাদ্য" প্রদান করা হয়, তাহাতে যে জীবনরক্ষা হয় না, তাহা চিকিৎসকগণ অকুণ্ঠকণ্ঠে বলিয়াছেন। অবশ্য লোককে যে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুতে খাদ্য সমস্যার সমাধান করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, এমন কথা কল্পনা করাও যায় না। কিন্তু যে খাদ্যে লোকের প্রাণরক্ষা হয় না—সেই খাদ্য দিয়া তাহাদিগের যন্ত্রণাকাল বর্দ্ধিত ও স্বাস্থ্য আরও ক্ষুণ্ণ করা যে কখনই অপরাধ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবে? সে অপরাধের জন্য যদি মানুষের দ্বারা শাস্তিবিধান না হয়, তবে কি দেবতাও তাহা উপেক্ষা করিবেন? মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় প্রত্যেক দুর্গতকে অর্দ্ধ সের কি ৩ পোয়া চাউল দেওয়া হইবে, সেই প্রশ্ন উঠিলে তৎকালীন ভারত-সচিব নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—কিছু অধিক দেওয়াও ভাল, কিছু কম দেওয়া অন্যায়। কিন্তু সেই অন্যায় বাঙ্গালায় কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিবে না?

অনাহারে ও রোগে বাঙ্গালায় জন-সংখ্যা কিরূপ হ্রাস পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অনেক গ্রামে স্বর্ণকার, সূত্রধর, ধীবর প্রভৃতি কাযের অভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আশঙ্কার কারণ আছে, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" ফলে যাহা হইয়াছিল, এ বারও তাহাই হইবে—কৃষকের অভাবে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালার সকল ক্ষেত্রে চাষ হইবে না। যদি অন্যান্য প্রদেশ হইতে কৃষক বা শ্রমিক আনিয়া বাঙ্গালায় চাষের ব্যবস্থা হয়, তথাপি জনশূন্য গ্রাম আর জনগুঞ্জন-মুখরিত হইবে না। সেই ব্যাপারই ঘটিবে—"যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের সন্ধান করে।"

অথচ এই দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার ফল নহে। ইহার জন্য প্রাচীর যুদ্ধকেও সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। কারণ, গত বৎসর বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এবং বর্ত্তমান বৎসরেও যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে শস্যহানি হইলেও সে শস্যহানিতে সমগ্র প্রদেশে দুর্ভিক্ষ লোকক্ষয় করিতে পারে না। প্রাচীর যুদ্ধে ব্রহ্ম হইতে বাঙ্গালায় চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময় ব্রহ্ম হইতে এ দেশে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল আমদানী হইত, তাহার মধ্যে লক্ষ টন বাঙ্গালায় আসিত। তাহার অভাবে বাঙ্গালায় এমন দুরবস্থা ঘটিতে পারে না। বিশেষ, বিলাতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সেরূপ ব্যবস্থা হইলে ঐ পরিমাণ চাউল অনায়াসে বাঙ্গালায় অধিক উৎপন্ন হইতে পারিত। সে সকল হয় নাই। মানুষের—বাঙ্গালার ভাগ্য যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহাদিগের উপেক্ষা, ও অজ্ঞতা নিষ্ঠুরতার সীমায় উপনীত না হইলে কখন এমন হইত না—হইতে পারিত না!

যে দেশে দুগ্ধের অভাব, সেই দেশে যে দুগ্ধের অভাব ও কৃষি-কার্য্যের প্রয়োজনও উপেক্ষিত হয়, তাহার প্রমাণ—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার গৃহপালিত পশু নিহত হইয়াছে, আর পশু-পালনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হয় নাই! গৃহ-পালিত পশুর অভাব কত দিনে পূর্ণ করা সম্ভব হইবে? আর যে সচিবসঙ্ঘ নিরন্ন বাঙ্গালীর জন্য খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবার সময় বাজারে অল্প দিনের মধ্যে ক্রীত গমে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন, সেই সচিবসঙ্ঘকেই বিদেশী শাসকগণ বাঙ্গালার নিরন্ন-দিগের ভাগ্য লইয়া খেলা করিবার সুযোগ দিতেছেন।

এ দেশে ইংরেজ শাসকরা বলিতেন, তাঁহাদিগের কার্য্যফলে এ দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে। তাহা যে সত্য নহে—পরন্তু তাঁহাদিগের ক্রটিতেই যে—মানুষের সৃষ্ট—দুর্ভিক্ষ লোকক্ষয় করিতে পারে, বাঙ্গালায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালায় যখন এই দুরবস্থা, সেই সময়ে বাঙ্গালার সচিবরা যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে লোকের দুঃখে তাঁহাদিগের সহানুভূতি সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্যই হয়। প্রথমেই পঞ্জাব সরকারের অন্যতম সচিব যখন বলেন, বাঙ্গালা সরকার পঞ্জাব হইতে গম কিনিয়া লাভবান হইয়াছেন। তখন সচিব সুরাবর্দ্দী তাহা অস্বীকার করেন। তাহার পরে পঞ্জাবের আর এক জন সচিব—সর্দ্দার বলদেও সিংহ আবার সেই অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেও তিনি বলেন—তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। কিন্তু তাহার পরেই স্যর্ রুজিন গারবেট বলেন, "পঞ্জাব সরকারের সহিত সাম্প্রতিক গম ক্রয়ের ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন।"

সে কথা ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরীও অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন—ঐ লাভের টাকা পরে নিরন্নদিগকে অন্নদানে ব্যয়িত হইয়াছে। কি ভাবে যে তাহা হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পরে যখন অন্নদান করা হইয়াছে—তখনই অন্নাভাবে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং সে মৃত্যুর জন্য কে বা কাহারা দায়ী, তাহা কি তিনি জানেন?

গত ২৪শে অক্টোবর লাহোরে পঞ্জাবের সচিব সর্দ্দার বলদেও সিংহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছেন, পঞ্জাব সরকার যে দুর্গতদিগের জন্য খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিয়া কোন-রূপ লাভ করেন নাই, কেবল তাহাই নহে—বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব গিয়াছিল তাহা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন—

বাঙ্গালার সরকারী প্রতিষ্ঠান ২টি বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চাউল ২৮ টাকা মণ দরে কিনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন পঞ্জাবে চাউলের মূল্য ১৭ টাকা মণ। পঞ্জাব সরকার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিলে—তাহাতেই ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ করিতে পারিতেন।

এই অভিযোগের গুরুত্ব যে অসাধারণ, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালার বেসরকারী সরবরাহ বিভাগ এক জন পঞ্জাবীকে তাঁহাদিগের "এজেন্ট" নিযুক্ত করিয়া পঞ্জাবে পাঠাইয়াছেন। তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসাব্যঞ্জক নহে। আমরা কি জানিতে পারিব—

(১) বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে কে ২টি বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দালালী করিয়াছিলেন?

(২) ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পরিচয় কি?

(৩) এই অভিযোগের কোন তদন্ত কেন্দ্রী সরকার করিবেন কি না?

যদি সর্দ্দার বলদেও সিংহের অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন না হয়, তবে কি এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে না? আর যদি তাহা সত্য হয়, তবে কি বর্ত্তমান ব্যবস্থার সম্পূর্ণ—আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হইবে? লর্ড ওয়াভেল যে খাদ্য বিভাগের কতক ভার সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে সচিবরা পদত্যাগ না করিতে পারেন—কিন্তু তাহাতে যে আবশ্যক প্রতীকার হইতে পারিবে, তাহাও মনে হয় না।

আজ বাঙ্গালায় মৃত্যুর বিভীষিকা—সর্ব্বনাশের অগ্নিশিখা অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মত দেখা যাইতেছে; সর্ব্বত্র আশঙ্কা, সর্ব্বত্র আতঙ্ক—গৃহে শব—পথে শবাকার নরনারী—মাতৃবক্ষে মৃত শিশু—জীবিত শিশু জীবন্মৃত বা মৃত মাতার শুষ্ক বক্ষ হইতে স্তন্য-লাভের আশায় চেষ্টা করিতেছে—নদীর ও খালের জল গলিত শবে অপেয়—বাতাসে গলিত মাংসের দুর্গন্ধ—শৃগাল ও শকুন জীবিতকেও আক্রমণ করিতেছে—লোকের চক্ষুতে অশ্রুও শুকাইয়া গিয়াছে—কণ্ঠে আর্ত্তনাদও বাহির হয় না।

ইহাই বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের স্বরূপ—ইহাই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গালার দৃশ্য। আজ নিরাশ হওয়া যত স্বাভাবিকই কেন হউক না, বাঙ্গালীকে নৈরাশ্য জয় করিতে হইবে—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও সেই হস্ত কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে স্মরণ রাখিতে হইবে:—

বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালার পুনর্গঠনের দায়িত্ব বাঙ্গালীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লাটের বিদায়

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় ছুটীতে থাকিবার পরে বিদায় লইয়াছেন। তিনি এখনও অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় রহিয়াছেন। যে বাঙ্গালা তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির শ্মশান হইয়াছে, সেই বাঙ্গালায় তাঁহার প্রাণান্ত হইবে কি না, তাহা এখনও বলা যায় না। তিনি দেশে ফিরিয়া যাউন—ইহাই বাঙ্গালীর অভিপ্রেত।

তিনি তাঁহার নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করুন। কিন্তু সুস্থ হইলে তিনি বাঙ্গালায় যে সুযোগ হারাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া মানসিক অশান্তি ভোগ করিবেন, এমন মনে করা অসঙ্গত হইবে না। তিনি বাঙ্গালায় আসিবার পরে জাপানের বাহিনী মালয় ও ব্রহ্ম জয় করিয়া—সিঙ্গাপুরে আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া বাঙ্গালার সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে—বাঙ্গালায় বোমা বর্ষিত হইতেছে।

এই সময়ে সার জন হার্ব্বার্ট অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই. হয়ত তাহা করেন নাই।—

(১) তিনি সাম্প্রদায়িকতার নরকাগ্নি দলিত ও নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই। বহু বাঙ্গালী হিন্দু বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে সামন্তরাজ্যে যাইয়া আশ্রয় ও অভয় সন্ধান করিয়াছে।

(২) তাঁহার সচিবরা অভিযোগ করিয়াছেন, তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচিবদিগের সহিত পরামর্শও করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন, তাহাই বাঙ্গালায় লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

(৩) তাঁহার সচিবদিগের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ও তাঁহার সহিত মতভেদ-হেতু পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি—যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নিজ প্রয়োজনে সমাদর করিয়াছেন আবার তুচ্ছ করিয়াছেন—সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নিয়মও দলিত করিয়া ব্যবস্থা পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া আপনার মনোমত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছিলেন।

(৪) তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে স্বৈরশাসনের আদর করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে রাজকর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে দারুণ অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে তাহার প্রতীকার করা প্রয়োজন কি না, সে বিবেচনাও করেন নাই।

(৫) তিনি গণতন্ত্রের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতারও পরিচয় দিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রীতিপ্রদ ছিল না।

(৬) তিনি যে বাঙ্গালার লোকের অন্নাভাবের প্রতীকার করেন নাই, তাহার জন্য বাঙ্গালীরা কখনই তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।

তিনি আজ রোগশয্যায় জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ সময় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না। কারণ, সে আলোচনা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না।

আজ যে রাজপথে শব—জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত নরনারী শৃগাল কুক্কুর শকুনের ভক্ষ্য হইতেছে—সে অবস্থা নিশ্চয়ই তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের অনুকূল হইতে পারে না। কারণ, তিনি কখনই এই পরিবেষ্টনে মানসিক শান্তি লাভ করিবার আশা করিতে পারেন না।

আর তিনি কি জানিতে পারিতেছেন, তিনি ব্যবস্থা পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া যে সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সচিবসঙ্ঘের কার্য্যকালে চাউল কেবল দুষ্প্রাপ্য নহে, পরন্তু অদৃশ্য হইয়াছে?

আমরা আজ তাঁহার সম্বন্ধে কেবল বলিতে পারি ও বলিব—আধ্যাত্মিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত ও অহিংসার দীক্ষায় দীক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারে—কিন্তু তাঁহার কৃত কার্য্য ভুলিতে পারে না। সব যায়; থাকে—কীর্ত্তি আর থাকে—অকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি।

বড়লাট পরিবর্ত্তন

বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো দীর্ঘ ৭ বৎসর পরে কর্ম্মভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কার্য্যকালে ভারতবাসীর কল্যাণকর কোন স্মরণীয় কায করিয়া যান নাই। লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন—

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারই একটি সহজ হিসাবে দেখা যাইতে পারে; আমরা (ইংরেজরা) যেন এ কথা বিস্মৃত না হই যে, আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষ শাসন না করিয়া ভারত-বাসীর স্বার্থের জন্য ভারত শাসন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।"

সেই আদর্শে বিচার করিলে লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল স্মরণীয় হইতে পারে না। তিনি ভারত-শাসন আইনের দ্বিতীয় ভাগও কার্য্যে পরিণত করিতে অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করিতেও পারেন নাই বা সে জন্য আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই। কৃষি কমিশনের সভাপতি-রূপে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"বহু শতাব্দীর জাড্য যদি অতিক্রম করিতে হয়, তবে গ্রামের উন্নতি-সাধনকার্য্যে সরকারের সকল শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। যে সকল বিভাগের সহিত গ্রামবাসিগণের সম্বন্ধ, সেই সকল বিভাগেই স্থায়ী চেষ্টা প্রযুক্ত করিতে হইবে।"

কিন্তু বড়লাট হইয়া আসিয়া তিনি সে কথা বোধ হয়, বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কারণ, সেরূপ কোন কাযই তিনি করেন নাই।

তিনি অর্ডিনান্সের বাহুল্যে কখন দ্বিধানুভবও করেন নাই।

যুদ্ধের সময় তিনি ভারতরক্ষা নিয়মের ব্যবহারে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি খ্যাত, অখ্যাত ও কুখ্যাত কতকগুলি লোকের সহিত আলোচনা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল! স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ যখন বিলাতের সরকারের প্রস্তাব লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখনও লর্ড লিন্‌লিথগো রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বলিলে অসঙ্গত হয় না।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও তিনি দেশে—বিশেষ যে বাঙ্গালা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সেই বাঙ্গালার অন্ন-সমস্যার সমাধানে অবহিত হয়েন নাই। তিনি পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গালায় ব্রহ্ম হইতে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করেন নাই এবং তাহার পরেও বিলাতের মত এ দেশে খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই। ফলে যে বাঙ্গালা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত সেই বাঙ্গালায়—মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—কলিকাতার রাজপথেও নরনারী শিশু মরিয়া পড়িয়া থাকিতেছে। তিনি এক বার বাঙ্গালায় আসিয়া অবস্থা পরিদর্শনও করেন নাই—তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এমন কি, তাঁহার বিদায়ী বক্তৃতায় তিনি বাঙ্গালার অন্ন-কষ্টের উল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই।

তিনি সেই বক্তৃতায় আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। যে রাজনীতিক বিক্ষোভ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং যাহার উপলক্ষ করিয়া কেন্দ্রী সরকার গান্ধীজী-প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃগণকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সেই বিক্ষোভসম্ভূত আন্দোলনেরও উল্লেখ করেন নাই।

তিনি যে ৭ বৎসর এ দেশে বড়লাট ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়া এ দেশে সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার ব্যাপক ব্যবস্থাও করিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী তাঁহাকে যে সকল বিষয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সে সকল সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানও করিয়াছেন, এমন প্রমাণ আমরা পাই নাই।

লর্ড লিন্‌লিথগো দীর্ঘকাল—সঙ্ঘর্ষের সময়ে এ দেশে বড়লাট ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজনীতিকোচিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব জঙ্গীলাট ওয়াভেল লর্ড ওয়াভেল হইয়া লর্ড লিন্‌লিথগোর পদে আসিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন—হয়ত সেই জন্যই তাঁহাকে এই পদ প্রদান করা হইয়াছে। তবে তিনি আসিয়াই বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে দুর্গতদিগকে অপসারিত করা আরম্ভ হয় এবং কাঁথীতেও তিনি পথে বা পথিপার্শ্বে শব বা নরকঙ্কাল দেখিতে পায়েন নাই তথাপি তিনি যে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

গত ৮ই অক্টোবর কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা না করিয়া নিম্নলিখিত কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"নূতন বড়লাটের পক্ষে প্রথম সুযোগে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা করা রীতি। আমি সে রীতির ব্যতিক্রম করিব—স্থির করিয়াছি। তাহার প্রথম কারণ, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা যে সময়ে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কয় মাস অবস্থা লক্ষ্য ও বিবেচনা করিবার সময় পাইয়াছেন। আমি তাহা পাই নাই। দ্বিতীয় কারণ, আমাকে এখন সময় ও মনোযোগ প্রধানতঃ খাদ্য-সমস্যায় ব্যয় করিতে হইবে। সে সম্বন্ধে আমি অদূর ভবিষ্যতে যে কোন বিস্তৃত বিবৃতি দিতে পারিব, তাহাও মনে হয় না।"

তিনি বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার সমাধান-কার্য্যে সমর বিভাগের সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার সচিবের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত না করায় যে "দ্বৈত-শাসনের" উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফল আশানুরূপ হইবে কি না, বলা যায় না।

হিসাবের বহর

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার-সচিব শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিক এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—

(১) গত মার্চ্চ হইতে অক্টোবর এই ৮ মাসে—বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালা হইতে মোট ৬৫ লক্ষ ৩০ হাজার মণ খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

(২) সেই ৬৫ লক্ষ ৩০ হাজার মণের মধ্যে কলিকাতা শিল্পপ্রধান অঞ্চলে ২২ লক্ষ ও বাঙ্গালার অবশিষ্ট ভাগে মোট ১৬ লক্ষ মণ দেওয়া হইয়াছে!

পুলিনবিহারীর হিসাবের সহিত কিন্তু ভারত-সচিবের হিসাবের যে অসামঞ্জস্য তাহা কিছুতেই মিটান যায় না। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষে—সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বলা হয়—বর্ত্তমান বৎসরে ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন ৬ মাসে ঐ রেলপথেই কলিকাতায় ৫৫ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শত ২ মণ খাদ্য-শস্য আমদানী হইয়াছে।

তাহার পরে ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে বলেন, গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর ৬ মাসে রেলে ও ষ্টীমারে কলিকাতায় আমদানী খাদ্য-শস্যের পরিমাণ—১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার মণ।

তাহার পরে ভারত-সচিব গত ৪ঠা নভেম্বর পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন—১ কোটি ১ লক্ষ ১৫ হাজার মণের সহিত যে সময়ে প্রদেশে অবাধ বাণিজ্য ছিল, সেই সময়ে আমদানী ২৭ লক্ষ মণ যোগ দিতে হইবে।

সেই সঙ্গে—ভারত-সচিবের হিসাবানুসারে অক্টোবর মাসের আমদানী—প্রায় ৩০ লক্ষ ১৬ হাজার মণ।

সুতরাং মার্চ্চ মাস হইতে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত আমদানী—১ কোটি ৬৮ লক্ষ মণ—৬৫ লক্ষ মণ মাত্র নহে।

অথচ পুলিনবিহারী বলিয়াছেন, লোক যে বলিতেছে, যে খাদ্য-শস্য ও খাদ্য-দ্রব্য আমদানী হইতেছে তাহা রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে—তাহা দুষ্টপ্রচারকার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এখন—এই হিসাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়—মিথ্যা প্রচারকার্য্য কাহারা পরিচালিত করিতেছে?

তাহার পর সচিবের স্বীকারোক্তি, যে কলিকাতায় লোকসংখ্যা ২২।২৩ লক্ষ তাহার জন্য ২২ লক্ষ মণ খাদ্য-দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে, আর সমগ্র বাঙ্গালার অবশিষ্ট ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ লোকের জন্য এ পর্য্যন্ত কেবল ১৬ লক্ষ মণ খাদ্য-দ্রব্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

এরূপ কথা বলিবার সময় যে বক্তার জিহ্বা ক্ষতে খসিয়া পড়ে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। যখন কলিকাতা শিল্প অঞ্চলে ২২ লক্ষ মণ খাদ্য-দ্রব্য দিয়াও লোকের অভাব ও হাহাকার ঘুচান যাইতেছে না, তখন ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ লোককে মাত্র ১৬ লক্ষ মণ খাদ্য-দ্রব্য প্রদান কি তাহাদিগকে নিশ্চয় মৃত্যুর মুখে অগ্রসর করাই নহে? এ বার

সরকার যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হয় না,—তাঁহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত করেন নাই; তাঁহারা নিরন্নদিগের জন্ত খাদ্য কিনিয়াও লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা খাদ্য-দ্রব্যের অভাব নাই—এই ভিত্তিহীন কথা বলিয়াছেন; তাঁহারা প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের যে হিসাব দিতেছেন—তাহাতে কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-সদস্য সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের কথাই সমর্থিত হয়, বাঙ্গালার যে খাদ্য-শস্য ও খাদ্য-দ্রব্য আসিয়াছে, তাহা কোন অতল গহ্বরে রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে।

—

দুর্গত-দূরীকরণ

কলিকাতা হইতে সোৎসাহে দুর্গতদিগকে বলপূর্ব্বক দূর করা হইতেছে। লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিবেন, এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে এই কার্য্যে অধিক তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে, তাহা "কাকতালীয়বৎ" কি না—কে বলিতে পারে? আমরা স্বয়ং যে সকল দৃশ্য দেখিতেছি, সে সকল স্মরণ করিতেও কষ্ট হয়। সরকার অনায়াসে বলিয়াছেন—এ কাযে স্বল্প বল-প্রয়োগের নৈতিক সমর্থনও তাঁহাদিগের আছে। তাঁহাদিগের নীতি কি, সে সম্বন্ধে ২ জন মহিলার বিবৃতি হইতে আমরা একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দুর্গতগণ ভীতিবিব্হ্বল হইয়াছে এবং যাহারা নিজ নিজ গ্রামে যাইতেছে তথায় তাহারা—আগামী ফশল না পাওয়া পর্য্যন্ত—অনাহারে বা কুখাদ্য খাইয়া মরিবে, মনে করা যায়। তাহারা ভয়ে সেতুর নিম্নে, লোকের বারান্দার তলে ও বস্তীতে লুকাইয়া থাকিতেছে এবং পাছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই ভয়ে বাহির হইতে না পারায় অনাহারে মরিতেছে।"

তাঁহারা বলিয়াছেন—

শিশুদিগকে মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইতেছে—স্বামীকে স্ত্রীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে।

এইরূপ নির্ম্মম কায কাহার বা কাহাদিগের কল্যাণকল্পে করা হইতেছে? ইহা কি কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে?

—

অভিনয়?

বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারতে (বিশেষ বাঙ্গালায়) দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনার বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, আলোচনায় কোন পক্ষেই আন্তরিকতার পরিচয় ছিল না। যেন সবই একটা অভিনয়। বাঙ্গালায়—বাঙ্গালা সরকার কলিকাতায় দুর্গত মৃতের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন—কেন্দ্রী সরকার বহু দিন তাহাও বিদেশে প্রচারিত হইতে দেন নাই। কিন্তু তাহা যখন প্রকাশিত হইল, তখন—সমগ্র সভ্যজগৎ পাছে মনে করে—ইংরেজ তাহার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই জন্য ইংরেজের এই আলোচনা প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—এক ধনুতে দুইটি জ্যা থাকিলে ভাল হয়। সেই হিসাবে বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডল সরকার পক্ষের কথা বলিতে ২ জনকে মনোনীত করিয়াছিলেন—এক জন স্বয়ং ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী; আর এক জন সার জন এণ্ডারসন। সার জনকে মনোনীত করিবার কারণ—যে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবলতম, তিনি কয় বৎসর সেই বাঙ্গালায় গভর্ণর ছিলেন এবং যে আয়ার্লণ্ড আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথায় দমন-নীতি পরিচালনে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া—বোধ হয় পুরস্কার হিসাবে—বাঙ্গালার গভর্ণরের চাকরী পাইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, সার জন এণ্ডারসন "বিনাইয়া নানা ছাঁদে" বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা ব্যক্ত করিয়া বৃটিশ জাতিকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

সম্প্রতি মিষ্টার জয়াকর একটি বিষয়ের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—পার্লামেণ্টের ৬ শতের কিছু অধিক সংখ্যক সদস্যের মধ্যে ঐ আলোচনাকালে কখন বা ৩৫ জন কখন বা ৫৩ জন উপস্থিত থাকিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ জাতির প্রতিনিধিদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার চার্চিল আলোচনাকালে পার্লামেণ্টে উপস্থিত ছিলেন না। মিষ্টার জয়াকর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট ৭ হাজার মাইল দূর হইতে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, পার্লামেণ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে এ দেশ শাসন করেন না—তাঁহারা আমলা গোমস্তার দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত করেন এবং তাহা বৃটেনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হয়।

ভারতে দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষে অনাহারে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু—এ সবই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও আলোচনার ফলে না কি—

পার্লামেণ্টের সদস্যরা বিশ্বাস করিয়াছেন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী ভারতের উভয় সরকারই দুর্ভিক্ষ দমনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নহে এবং বৃটিশ সরকারের কাযে প্রকৃত সাহায্যই সপ্রকাশ হইয়াছে।

অর্থাৎ দোষ যদি কাহারও থাকে, তবে সে ভারতবাসীর অদৃষ্টের—তাহারা সুসভ্য সরকারের সদিচ্ছা থাকিলেও আহার্য্য পায় নাই এবং আহার্য্য না পাইয়াও দেহে জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহা যদি তাহাদিগের দোষ না-ও হয়, তথাপি তাহা নিশ্চয়ই তাহাদিগের অদৃষ্টদোষ।

বলা হইয়াছে, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন খাদ্য-দ্রব্য প্রবল বন্যার মত বাঙ্গালায় যাইতেছে এবং ইংরেজী বৎসর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে বন্যার স্রোতঃ বন্ধ হইবে না। আর আগামী ধান্যের ফশল পাইলেই বাঙ্গালীর সব দুঃখ দূর হইবে।

"রয়টার" সংবাদ দিয়াছেন:—

"পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যে দুর্ভাবনা লইয়া আলোচনায় যোগ দিতে আসিয়াছিলেন—তাহা অনেকটা লঘু হইল মনে করিয়াই যে যাহার গৃহে ফিরিয়াছিলেন।"

ইহাতে যাহা মনে করা যায়—আমরা তাহার অতিরিক্ত আর কিছু মনে করিতে পারি না—চাহিও না।

—

চার্চ্চিলের অশিষ্ট উত্তর

বিলাতে বক্তৃতায় বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার ধাতুগত অশিষ্টতার পরিচয় দিয়া—জার্ম্মাণীকে গালি দিবার সুযোগে ভারতের বিরাট্ হিন্দু-সম্প্রদায়ের মনে আঘাত দিয়া আনন্দলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই! তিনি বলিয়াছেন, যে জার্ম্মাণ শক্তি ও অত্যাচার এক সময়ে রাক্ষস জগন্নাথের মত ছিল, রুশিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রুশিয়া যে জার্ম্মাণ শক্তি ও অত্যাচার ভাঙ্গিয়াছে এবং বৃটেন সে জন্য কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে না, তাহা বৃটেনের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। কিন্তু সে কথাও বলা প্রয়োজন হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথকে কদাকার বলা হইয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চিল কি ভারতের হিন্দু-সম্প্রদায়কে আঘাত দিবার জন্যই এই হীন কায করেন নাই? আর যে সকল অশিষ্ট—ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি মিথ্যা মূলধন করিয়া ব্যবসা করে, তাহারা কি কদাকার নহে? তবে বার্ক বলিয়াছেন—

"I have seen persons in the rank of statesmen with the conceptions and character of pedlers"

—

অন্নাভাবের নিদান-নির্ণয়

সর্দ্দার সার যোগেন্দ্র সিংহ বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য। সম্প্রতি তিনি পরিদর্শন-ব্যপদেশে বাঙ্গালায় আসিয়া ঢাকায় বেতারে ১১শে কার্ত্তিক যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালার অন্নাভাবের নিদান-নির্ণয়ের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা একদেশদর্শিতা-দুষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃতি বাঙ্গালাকে প্রাচুর্য্যের প্রচুর উপকরণ দিয়াছেন—মানুষই তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিয়া আপনার উন্নতি-সাধন করিতে পারে নাই। তিনি বাঙ্গালীকে পরামর্শ দিয়াছেন:—

"আপনাদিগের যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন সে সকল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে মনোনিবেশ করুন এবং সর্ব্ববিধ খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করুন। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করুন; সবল হউন এবং উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সহযোগ করুন। বর্ত্তমান ঐক্যে অর্থ-নীতিক সমৃদ্ধিলাভ করুন এবং রাজনীতিক স্বাধীনতায় তাহার ফল সম্ভোগ করুন।"

এক নিশ্বাসে তিনি অনেক কথা—আহার হইতে স্বাধীনতা পর্য্যন্ত—বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার—দৈন্যের নিদান-নির্ণয় করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন—তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা যে সুফলা ও শস্যশ্যামলা ছিল, তাহার কারণ সে সুজলা ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে বাঙ্গালী কখন কুণ্ঠিত হয় নাই। এক দিকে যেমন বার্ণিয়ার বর্ণিত রাজমহল হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বে বহু খালের সম্বন্ধে সেচ-বিশারদ উইলকক্স বলিয়াছেন, সে সকল বাঙ্গালীরাই খনিত করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই বিষ্ণুপুরের বাঁধে ও পুষ্করিণীতে বাঙ্গালীর পুষ্করিণীর জলে সেচ-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সপ্রকাশ হইয়াছিল। এক দিকে নদীর জলে বাহিত পলি যেমন ভূমিতে উর্ব্বরতা প্রদান করিত, অপর দিকে তেমনই পুষ্করিণীর, খালের ও বাঁধের জলে সেচকার্য্য হইত। নদীর গতি যে মন্থর হইয়াছে, সে জন্য যেমন বাঙ্গালার লোককে দোষী করা যায় না, পুষ্করিণী প্রভৃতির অসংস্কৃত অবস্থার জন্য তেমনই তাহাকে অপরাধী বলা সঙ্গত নহে।

সে জন্য যদি কেহ দায়ী হয়েন, তবে সে সরকার। কারণ, সরকারের আইনে ও সরকারের কার্য্যে সে সকলের অবনতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালায় সেচের প্রয়োজন নাই, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে সরকার সেচ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রতি অবিচার করিয়াছেন—বাঙ্গালার অর্থে পঞ্জাবে, যুক্ত-প্রদেশে, মান্দ্রাজে, সিন্ধুপ্রদেশে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে—বাঙ্গালায় খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। সে দিন ভারত-সচিব স্বীকার করিয়াছেন, গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালায় উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশেরও অধিক কমিয়াছে। বিলাতের 'ডেলী ওয়ার্কার' পত্র তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতে বৃটিশ শাসনের ইহার অধিক নিন্দার আর কিছুই নাই। সেচের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য। সরকার সে কর্ত্তব্য অবজ্ঞা করিয়াছেন।

সার যোগেন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন—এ বার ৩০ লক্ষ একর অধিক জমিতে চাষ হইয়াছে। এই জমি কেন "পতিত" ছিল, তাহা বুঝিলেই তিনি বাঙ্গালার অন্নাভাবের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। সেচ, সার, শিক্ষা—এ সকল সম্বন্ধে সরকারের উপেক্ষা যেমন নিন্দনীয়—খাদ্য-শস্যের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস হয় সেরূপ ফসলের (পাট, তিসি প্রভৃতি) চাষে উৎসাহ প্রদানও তেমনই নিন্দনীয়—অথচ বিদেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য সরকার তাহা বুঝিতে চাহেন নাই।

সার যোগেন্দ্র সিংহ কৃষির কথাই বলিয়াছেন, নহিলে আমরা তাঁহাকে ঢাকার কার্পাসশিল্প কেন—কাহার দ্বারা—কাহাদিগের স্বার্থের জন্য নষ্ট হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতাম। তিনি এক কালে যে 'ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তাহাতেই সার হেনরী কটন সে কথা বুঝাইয়াছিলেন।

সরকারী চাকরীয়া হইলে যে সরকারের ত্রুটির উল্লেখ করা নিষিদ্ধ, তাহাই কি সার যোগেন্দ্র সিংহ দেখাইতে চাহেন?

—

প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয় কলিকাতার প্রাচীনতম মধ্য-ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান! ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যাঁহাদিগের আন্তরিক চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রমানাথ লাহা মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যা-লয়ের বহু ছাত্র পরে যশস্বী হইয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর ইহার নিজস্ব-গৃহের ভিত্তিস্থাপন হয় এবং পর-বৎসর প্রতিষ্ঠান ঐ গৃহে স্থানান্তরিত হয়। তখন বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডারে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল। গৃহ-নির্ম্মাণে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হওয়ায় যে ১০ হাজার টাকা ঋণ হয়, তাহার মধ্যে ৪ হাজার টাকা পরিশোধ হইলেও এখনও ৬ হাজার টাকা ঋণ রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ সেই ঋণ শোধার্থ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, আহিরীটোলা পল্লীর ধনবান্ অধিবাসিবৃন্দ ও শিক্ষাবিস্তারকামী-দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

আশুতোষ মজুমদার

পরিণত বয়সে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক আশুতোষ মজুমদারের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি হাওড়া জিলার পাতিহাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় শিক্ষা-লাভান্তে পিতার ব্যবসায়ে যোগ দেন। পৈতৃক প্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যতীত তিনি "দেব সাহিত্য কুটীর," "দেব লাইব্রেরী" "বরদা টাইপ ফাউণ্ডারী" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ বার মাড়বারী রিলিফ সোসাইটীর সহায়তায়, নিজ গ্রামে ৮ শত লোককে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ মজুমদার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গত ১৩ই আশ্বিন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জিলায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছাত্রজীবনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে সিটী কলেজে ও পরে এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে শিক্ষকের কার্য্য ত্যাগ করেন এবং তদবধি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাংবাদিকের কার্য্যে লোকশিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে কায করিতে থাকেন।

তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি সাংবাদিকের কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন এবং সেই অবস্থায় এ দেশে অন্ধদিগের শিক্ষালাভের জন্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া পাঠের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করেন। তাহার পর তিনি 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক পত্র সম্পাদন করেন। প্রায় তিন বৎসর সে কায দক্ষতা-সহকারে সম্পন্ন করিয়া তিনি তাহা ত্যাগ করেন। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে 'প্রবাসী' প্রচারিত হয়। উহার সূচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

"পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে। প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিক পত্রও প্রচার করেন।

তাঁহার পত্রদ্বয় বিশেষ আদর লাভ করে। তিনি মাসের পর মাস সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিতেন, সে সকলে তাঁহার নির্ভীকতার ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় সপ্রকাশ থাকিত। তাঁহাকে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকারের দ্বারা অভিযুক্ত হইতেও হইয়াছিল।

রামানন্দ বাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং রামানন্দ বাবুর পত্রদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে—রামানন্দ বাবুর পত্রদ্বয়কে রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রচারের কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রামানন্দ বাবু ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে কায করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধি এতই অধিক ছিল যে, তিনি প্রবাসে থাকিয়া 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে, আমাদিগের রাজনীতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া, 'প্রবাসী'র ব্যাখ্যায় গোবিন্দচন্দ্র রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করেন "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।" তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম কারণ।

সমাজের কল্যাণকর নানা কার্য্যে রামানন্দ বাবুর সাগ্রহ যত্ন ও চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে। রাজনীতিতে তিনি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বরাজ লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সহানুভূতি সক্রিয় ছিল।

বাঁকুড়ার উকীল হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোরমা দেবীর সহিত রামানন্দ বাবুর বিবাহ হয়। কয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়।

রামানন্দ বাবু প্রায় এক বৎসর ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন। এই সময়ে বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

রামানন্দ বাবু পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে নানা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় কায করিয়া

রামানন্দ বাবুকে অন্ধদিগের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

সার সুলতান আমেদ বলিয়াছেন, তাঁহারা রাজনীতিক "রা" কাড়িতে পারিবেন না। তবে কি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বিদেশের লোক বুঝিতে পারিবে—ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্য? কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এক-জন সদস্য বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্ত যে অর্থের অপব্যয় হইবে, তাহা বাঙ্গালার নিরন্নদিগের জন্ত ব্যয়িত হইলে ভাল হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন অধিকাংশ সদস্য কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সরকারের কাযের নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সরকারের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। কারণ, তাঁহারা স্বৈর-ক্ষমতাসম্পন্ন।

গিয়াছেন। সে সকলের জন্ত—বিশেষ অর্দ্ধশতাব্দী কাল তিনি নিষ্ঠা-সহকারে সাংবাদিকের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবেন।

পরলোকে সতীশচন্দ্র মিত্র

কলিকাতার শিষ্ট সমাজে ও ব্যবসাক্ষেত্রে সুপরিচিত সতীশচন্দ্র মিত্র পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে আপনার অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সাধুতার জন্ত প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সমাজে সম্মানিত ছিলেন এবং "রাজা মিত্র"কে সকল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা যাইত। বঙ্গীয় বণিক্ সভার সহিত তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ভাড়াটিয়া প্রচারক

স্বদেশে অখ্যাত ও কুখ্যাত জন কয়েক লোককে ভারত সরকার—প্রত্যেকের জন্ত প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া ভারতের প্রতিনিধি সাজাইয়া বিদেশে প্রচারকার্য্যের জন্ত পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা তথায় ভারতের সমর-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাধা গলায় বাঁধা বুলি কপচাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন, ভারতবর্ষে সমর-প্রচেষ্টা অসাধারণ। এ যেন "মাথা নাই মাথা ব্যথা"—ভারতবর্ষ পরাধীন, তাহার কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সমর-প্রচেষ্টা থাকিতে পারে না; যে প্রচেষ্টা আছে, তাহা ভারতের বিদেশী সরকারের। সরকারের পক্ষে

ভারতের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, বিদেশী বেতারে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হয়, জাপানের সাহায্যার্থ ভারতীয় সেনাদল গঠনের চেষ্টা হইতেছে এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সে কাযে যোগ দিয়াছেন। বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে 'টকিং পয়েণ্টস' ও 'ফিফটী ফ্যাক্টস'—প্রভৃতির দ্বারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন—তাহার পরেও কি তাঁহারা জাপানের প্রচারে কেবল বিশ্বাস করা নহে—তাহা বাইবেলের মতই বিবেচনা করেন? প্রচার-কার্য্যে হয়ত জাপান বৃটেনের অনুকরণ করিয়া মিথ্যা কথাই বলিতেছে। তাহাতে গুরুত্বস্থাপন কি তবে—সুবিধাজনক বলিয়াই করা হইতেছে?

অতিলাভে দণ্ড

ভারতরক্ষা নিয়মের বলে—অতিলাভের জন্ত অভিযুক্ত কয় জনের বিচার হইলে কলিকাতা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তি-দিগকে কেন তাঁহাদিগের দণ্ড বর্দ্ধিত হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে আদেশ করেন। যাঁহারা দণ্ডিত তাঁহাদিগের কয় জন

আলীপুরে ও কয় জন কলিকাতায় মামলা-সোপর্দ্দ হইয়াছিলেন। মামলার বিচারের পর গত ২৫শে কার্ত্তিক হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন—বড় বড় ব্যবসায়ীরা প্রায় কেহই অভিযুক্ত হয় নাই—আর যাহারা প্রথমে মাল বিক্রয় করিয়াছিল তাহারা অর্থাৎ প্রকৃত মহাজনরা কেহই অভিযুক্ত হয় নাই। অর্থাৎ ফিরিওয়ালা, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতিকেই অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই উক্তির পশ্চাতে কোন ইঙ্গিত আছে কি না, তাহা কে বিবেচনা করিয়া কায করিবে? হাইকোর্ট এই সব মামলায় কঠোর দণ্ড দানের উপদেশ দিয়াছেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহারা লাভের লোভে লোককে অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করে, তাহারা সমাজের অনিষ্টকারী, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল ফিরিওয়ালা বা ছোট দোকানদার অধিক মূল্য লয়, তাহাদিগকে সরকারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে মাল কিনিতে হয় কি না এবং হইলে কাহারা তাহাদিগের নিকট অধিক মূল্যে মাল বিক্রয় করে তাহার সন্ধান লওয়া কি সরকার অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করেন?

হাইকোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে স্থানে জরিমানা যথেষ্ট নহে মনে হইবে, সে স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেটরা যেন আসামীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতীকারার্থ হাইকোর্টের এই আগ্রহ যে প্রশংসনীয়, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু এমন অভিযোগও কি উপস্থাপিত হয় নাই যে, সরকার নিরন্নদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া লাভ করিয়াছেন? সেরূপ কায কি অতিলোভের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না?

'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' পঞ্জাবে খাদ্য-শস্যের মূল্যের সহিত বাঙ্গালায় বিক্রয়ের মূল্য তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Sufficient data is available to prove conclusively that there is either gross mismanagement, criminal profiteering or unexplained leakage in the Bengal transactions."

আমদানী বন্ধ

গত ২৫শে কার্ত্তিক বিলাতে পার্লামেণ্টে এ দেশে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন হইয়াছিল। সে সকলের যে উত্তর ভারত-সচিব দিয়াছেন, তাহাতে কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে :—

(১) দুর্ভিক্ষে কোন য়ুরোপীয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর সার টমাস রাথারফোর্ড বলিয়াছেন—বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে পেশাদার ভিক্ষুকরাই প্রথমে মরিয়াছে। এ দেশে যে সকল য়ুরোপীয় ভাগ্যান্বেষণে আসিয়া থাকে, তাহাদিগকেও ভিক্ষুক শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি না তাহা বোধ হয়, কমিশন নিযুক্ত না করিলে স্থির হইবে না। তবে "ম্যাক্স ওয়েল" তাঁহার 'জন বুল অ্যাণ্ড কোম্পানী' পুস্তকে অষ্ট্রেলিয়ার অশ্বারোহী ভিখারীর কথা লিখিয়াছেন। তিনি যখন ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘোড়াটি কি তাহার? তখন সে উত্তর দেয়; "নিশ্চয়। ঘোড়া আমার হইবে না কেন?"

(২) ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে শীতকালে ও বসন্তে ভারতে বিদেশ হইতে মোট দেড় লক্ষ টন গম আমদানী হইয়াছে। আরও গম আমদানী করা যাইত। কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে গমের ফসল ভাল বুঝিয়া ভারত সরকার আর আমদানী বন্ধ করিতে বলেন। সে মে মাসের কথা।

তাহার ফলে কি হইয়াছে, তাহা আমরা ভুক্তভোগীরা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছি ও বুঝিতেছি। তাহার ফলে ও ব্যবস্থার অভাবে বাঙ্গালায় বহু লোক অনাহারে মরিয়াছে ও মরিতেছে এবং পঞ্জাবে গম কিনিয়া বাঙ্গালায় নিরন্নদিগকে বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালা সরকার, তাঁহাদিগের এজেণ্ট, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকের দুর্দ্দশায় যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিয়াছেন। গম আমদানী বন্ধ করিতে বলার জন্য কে দায়ী, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য নিষ্প্রয়োজন।

কোন্ কথা বিশ্বাস্য?

বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বলিয়াছেন, গত ৩০ বৎসরে ভারতে লোক-প্রতি খাদ্য-শস্যের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগের অধিক কমিয়াছে। অথচ সে দিন কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে :—

কেবল ভারত সরকারই নহেন, প্রাদেশিক সরকারসমূহও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে খাদ্য শস্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ-হ্রাস সম্বন্ধে কিছু কাল হইতেই অবহিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের আর্থিক অবস্থায় যাহা করা সম্ভব—সেচের ব্যবস্থা করিয়া, গবেষণা ও গবেষণাফল প্রয়োগ করিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। মোটের উপর ভারতে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ—প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা মাত্র ৪ ভাগ কমিয়াছে। যখন বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আনিয়া সে অভাব অতি সহজে পূর্ণ করা যাইত, তখন যে সকল কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে টাকা পাইত, সে সকলের চাষ কমাইয়া খাদ্য-শস্যের চাষ বাড়াইবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

ভারত-সচিব বলিতেছেন, হ্রাসের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ; আর ভারত সরকার বলিতেছেন, তাহা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র।

এই অসামঞ্জস্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন উপায় কি থাকিতে পারে?

কিন্তু ভারত সরকারের কথাই যদি সত্য হয়, তবে কি জিজ্ঞাসা করা যায়—ভারতবর্ষের—সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের আহারের জন্য যে খাদ্য-শস্য প্রয়োজন, যদি তাহার শতকরা মাত্র ৪ ভাগের অভাব হয়, তবে তাহাতেই কি বাঙ্গালায় সপ্তাহে প্রায় ৫০ হাজার লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং উড়িষ্যায়ও অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে?

অবশ্য ভারত-সচিবই হউন আর ভারত-সরকারের চাকরীয়াই হউন আর বাঙ্গালার সচিবই হউন—কেহ কোন উক্তি করিলে যদি তাহা প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তবে সে জন্য তাঁহারা লজ্জানুভবও করেন না—তাঁহাদিগকে কোনরূপ দণ্ডভোগও করিতে হয় না। কাযেই সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত
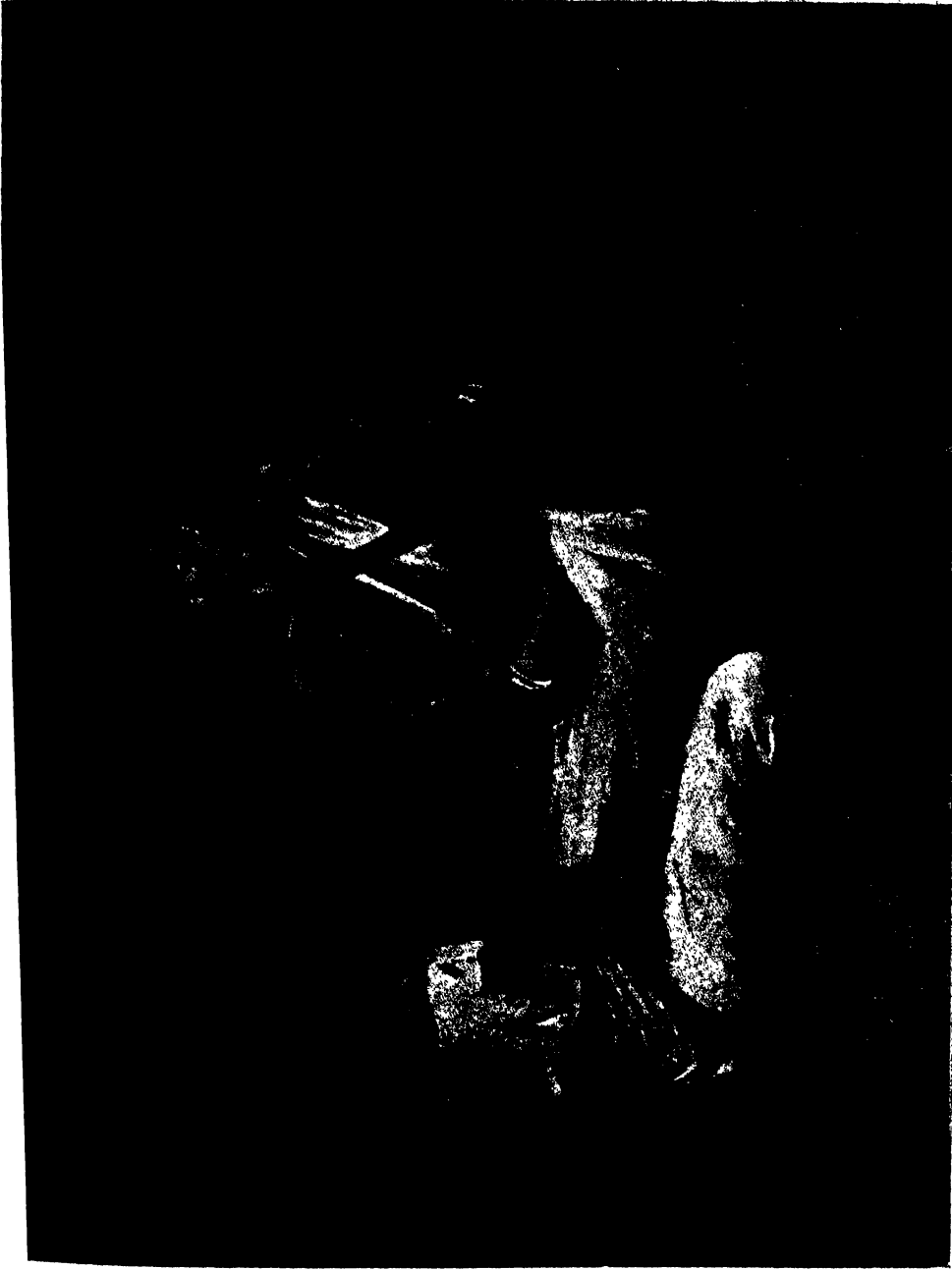
'মা যা হইয়াছেন।'

অগ্রহায়ণ, ১৩৫০]

[শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

ভাব

মহর্ষি ভরত 'নাট্যশাস্ত্রে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'রস' ও সপ্তম অধ্যায়ে 'ভাব'-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রসাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে—অতঃপর ভাব-লক্ষণ বলিবেন (১)। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব-সংযোগে স্থায়িভাব হইতে রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে—ইহাই মহর্ষির সিদ্ধান্ত (২)। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—শৃঙ্গার-রসের নিষ্পত্তি। উহা রতি স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত, ঋতু-মাল্যাদি উহার বিভাব (হেতু), নয়ন-চাতুরী ইত্যাদি উহার অনুভাব (কার্য্য), হর্ষ-লজ্জাদি উহার ব্যভিচারি ভাব (বা সঞ্চারি-ভাব), স্বেদ-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক-ভাব। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—স্থায়িভাব কিরূপ? রতি কিদৃশী? বিভাব কাহার নাম? অনুভাব কাহাকে বলে?—ব্যভিচারী, সাত্ত্বিক ইত্যাদি ভাবেরই বা লক্ষণ কি? এই সকল বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই রসাধ্যায়ের পর মহর্ষি ভাবাধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন (৩)।

'ভাব'-শব্দটির পর্য্যালোচনা করিলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—ভাব-শব্দটির নিষ্পত্তি হইতে পারে কিরূপে?—যাহা হয় (অর্থাৎ উৎপন্ন হয়)—এই অর্থে 'ভূ'-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া 'ভাব'-পদের নিষ্পত্তি, অথবা যাহা হওয়ায় (অর্থাৎ উৎপন্ন করে) এই অর্থে ভূ-ধাতুর উত্তর ণিচ্ ও ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া ভাব-পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (৪)।

উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—বাগঙ্গসত্ত্বোপেত কাব্যার্থ ভাবিত (অর্থাৎ উৎপাদিত) করে বলিয়াই ইহা 'ভাব' নামে খ্যাত (৫)।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত মহর্ষির আশয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

রসাধ্যায়ের প্রথমেই ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'ভাব বলা কেন হয়?' এ প্রশ্ন যখন ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে এক বার করা হইয়াছে, তখন সপ্তম অধ্যায়ে আবার তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কেন?—'যাহা হয়' তাহাই ভাব, অথবা যাহা হওয়ায় তাহাই ভাব (৬)। এইরূপ প্রশ্নের পুনরুক্তি দেখিয়া কোন কোন আলঙ্কারিক বলেন—ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে—'ভাব বলা হয় কেন'?—এই প্রশ্ন ও ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে 'অতঃপর ভাবসমূহের লক্ষণ বলিব'—এই প্রতিজ্ঞা বিভাবাদি সর্ব্বসাধারণ ভাব-বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। এখন উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই বিভাবাদির লক্ষণ করিতে হয়। কিন্তু বিভাবাদি ত চিত্তবৃত্তি-স্বরূপ নহে। স্থায়িভাব ও ব্যভিচারি ভাবই চিত্তবৃত্তি-রূপ বলিয়া প্রধানতঃ ভাব-পদ-বাচ্য।

এস্থলে সপ্তমাধ্যায়ে প্রধান ভাব অর্থাৎ স্থায়ী ও ব্যভিচারীর

১। "এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নবলক্ষণলক্ষিতাঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্"।—ভরত-নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠাধ্যায়, ১০১ শ্লোক, বরোদা সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২

২। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—নাঃ শাঃ, বরোদা, সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪

৩। "ভবনাদিলক্ষণং রসলক্ষণমেব পূর্ব্যতে, রতিস্থায়িভাব-প্রভবঃ ঋতুমাল্যাদিবিভাবকো নয়নচাতুর্য্যাদ্যনুভাবক ইত্যুক্তমপি সাকাঙ্ক্ষমেব। কীদৃশী হি রতিঃ, কশ্চ বিভাবঃ, কশ্চানুভাবঃ?..." অভিনবভারতী, নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২

৪। "অত্রাহ—ভাবা ইতি কস্মাৎ? কিং ভবন্তীতি ভাবাঃ? কিং বা ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ?"—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৩৪৩

৫। "উচ্যতে—বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি"।—ঐ, পৃঃ ৩৪৩

৬। "ভাবাশ্চাপি কথং প্রোক্তাঃ" (৬।৩)—ইত্যত্রৈব প্রশ্নে কৃতে পুনরিহাধ্যায়ে কিং ভবন্তীত্যাদি চ কিমর্থমুচ্যতে?"—ঐ, পৃঃ ৩৪৩

লক্ষণ প্রথমে দেওয়া হইতেছে বলিয়া পুনশ্চ নূতন করিয়া প্রশ্ন-প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে (৭)।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত স্বয়ং এ মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে—ভাব-শব্দ-দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি-বিশেষই লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণেই ভাবের সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ বলিয়া মহর্ষি ভাব-প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন। (অবশ্য এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা ভাল যে—এই একোনপঞ্চাশৎ ভাবের মধ্যে আটটি স্থায়িভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব।) —এইগুলিই চিত্তবৃত্তি-বিশেষ-রূপ বলিয়া যথার্থতঃ ভাব-শব্দ-বাচ্য। এই একোনপঞ্চাশৎ ভাবগুলিই যোগ্যতানুসারে স্থায়িভাব-সঞ্চারিভাব ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর ঋতু-মাল্যাদি যে গুলি বিভাব অথবা বাহ্য বাষ্পাদি অনুভাব—বস্তুতঃ সেগুলি ভাব-পদবাচ্যই নহে (৮)।

এখন কেহ কেহ এরূপ ত বলিতে পারেন যে—এই সকল বিভাব-অনুভাবও সংবিৎস্বভাবে (৯) নিমজ্জিত হয় ও তাহা হইতে উন্মজ্জিত হইয়া থাকে। এ হেতু তাহারাও সংবিদাত্মক—অতএব ভাবরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে ত এ কথাও বলা চলে যে, গৌণভাবে ধরিলে সমগ্র বিশ্বই ভাবময় হইয়া দাঁড়ায়, অথবা বিজ্ঞানবাদ আশ্রয় করিলেও সমগ্র বিশ্বই বিজ্ঞানময় (অতএব ভাবময়) হইয়া উঠে—আর তাহা হইলে অভিনয়-ধর্ম্মাদির পৃথগ্‌রূপে প্রতিপাদন অনুপপন্ন হইয়া পড়ে (১০)। অতএব, স্থায়ী-ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক—এই তিন শ্রেণীই মুখ্যতঃ ভাব-পদ-বাচ্য হইতে পারে। বিভাব-অনুভাব ইত্যাদি গৌণতঃ ভাব-পদ-বাচ্য। সপ্তম অধ্যায়ে মুখ্য ভাবগুলির লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিকরূপে বিভাবাদি গৌণ ভাবগুলিরও লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (১১)।

অতঃপর আচার্য্য অভিনবগুপ্ত 'ভাব'-শব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে 'ভবন্তীতি ভাবাঃ'—উৎপন্ন হয়—এই পক্ষ অবলম্বনে তিনি দেখাইয়াছেন—রতিরূপে ভাব যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহা তৎস্বরূপেই ক্ষণমাত্রও অবস্থান করে না—প্রতিক্ষণে উহার গতিবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে (১২)।

৭। "অত্র কেচিদাহুঃ—ভাবাশ্চাপীত্যধ্যায়াদৌ ভাবানামপি লক্ষণমিত্যধ্যায়ান্তে চ বিভাবাদীনাং সর্ব্বসাধারণ্যেন প্রশ্নপ্রতিজ্ঞাদি। অধুনা তু বিভাবাদিষু বক্তব্যেষু প্রথমং তাবৎ প্রাধান্যাচ্চিত্তবৃত্তিরূপাঃ স্থায়িব্যভিচারিণো লক্ষণীয়া ইতি তদ্বিষয়ৈবেয়ং প্রতিজ্ঞা প্রশ্নশ্চ"। —অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৩

৮। "বয়ন্ত ব্রূমঃ—ভাবশব্দেন তাবচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ। তথা চ 'একোনপঞ্চাশতা ভাবৈঃ (৭।১৬২) রিত্যাদৌ তানেবোপসংহরিষ্যামি। তেষান্ত যোগ্যতাবশাদ্‌যথাযোগং স্থায়িসঞ্চারি-(বি?) ভাবানুরূপতা সম্ভবতি। যে ত্বেতে ঋতুমাল্যাদয়ো বিভাবা বাহ্যাশ্চ বাষ্পপ্রভৃতয়োঽনুভাবাস্তে ন ভাবশব্দব্যপদেশ্যাঃ"। —অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৩

৯। সংবিৎ = জ্ঞান = চৈতন্য = চিৎ। রস অনাবৃত চিদ্রূপ। বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাব-সাত্ত্বিক—এ সকলই সংবিদ্রূপ রসে নিমগ্ন ও তাহা হইতে উন্মগ্ন হয় বলিয়া তাহারাও সংবিদাত্মক-রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নহে। কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণ-ভাবের মধ্যে কোনই ভেদ আর থাকে না।

১০। ঘট-রূপ কার্য্য মৃত্তিকা-রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। আবার নিজ-রূপ-ধ্বংসে উহা মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া যায়—এ কারণে ঘটকে মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন ব্যবহার-দশায় বলা চলে না। অদ্বৈতবাদের পরমার্থ-দৃষ্টিতে কার্য্য-কারণের অভেদ হইলেও ব্যাবহারিক-লৌকিক দৃষ্টিতে কার্য্য-কারণের ভেদ থাকিবেই। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে কার্য্য-কারণের ভেদ অদ্বৈত-বেদান্তও স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব, লোক-ব্যবহারে কার্য্য-কারণের অভেদ বলা হইলে উহাকে ঔপচারিক, লাক্ষণিক বা গৌণ প্রয়োগ বলাই সঙ্গত। সংবিৎ-স্বভাব রসে উন্মগ্ন নিমগ্ন হয় বলিয়া বিভাবাদিও সংবিদাত্মক—একথা বলাও লাক্ষণিক বা গৌণ উক্তি—মুখ্য প্রয়োগ নহে। আর এক বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে এরূপ প্রয়োগ সম্ভব। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে—বাহ্য কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—বাহিরে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রই আন্তর বিজ্ঞানের রূপান্তর (বা পরিণাম-মাত্র)। এ সিদ্ধান্তে কেবল ঋতু-মাল্যাদি বিভাব বা অনুভাব কেন, বিশ্বের সকল বাহ্য বস্তুই বিজ্ঞান-স্বরূপ হইয়া উঠে। এ কারণে আর বিভাবানুভাবকে মুখ্যতঃ ভাব বলায় কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ হইলে আর অভিনয়-ধর্ম্মাদির পৃথক্ প্রতিপাদনের কোন সার্থকতাই থাকে না। আপাততঃ বাহ্যরূপে দৃশ্যমান সকল বাহ্য বস্তুর যথার্থ স্বরূপ যদি আন্তর-বিজ্ঞানাত্মকই হইল, তাহা হইলে আর আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিকাদি অভিনয়ের ভেদোক্তি সার্থক হয় কিরূপে? সবই যদি এক বিজ্ঞানের রূপ হয়, তবে বৈচিত্র্য বা ভেদ হয় কিরূপে? অভিনয়ের মধ্যে নানা ভেদ আছে। মূলতঃ অভিনয়ের কোন কোন অঙ্গ (যথা, আহার্য্য অভিনয়—সাজ পোষাক, মেক্‌-আপ্‌ ইত্যাদি) অত্যন্ত বাহ্য ও আবার কোন কোন অঙ্গ (যথা,—সাত্ত্বিক অভিনয়—ভাবের অভিব্যক্তি) আন্তর ভাবের বাহ্য অভিব্যক্তি-স্বরূপ। বস্তুতঃ, যদি সকল অঙ্গই নির্ব্বিশেষে আন্তর বিজ্ঞানের রূপান্তর-মাত্র হয়, তাহা হইলে এ বাহ্যাভ্যন্তরভেদ—এ বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভবে?—ইহাই আচার্য্যের বক্তব্যের সার। অতএব, আচার্য্য-মতে স্থায়িভাব—ব্যভিচারি-ভাব ও সাত্ত্বিক-ভাবই (যেগুলি নিছক মনোবৃত্তি-রূপ) মুখ্যতঃ ভাব-নামে গণ্য হইবার যোগ্য; আর ঋতু-মাল্যাদি বিভাব ও কটাক্ষাদি অনুভাব (যেগুলি বাহ্য বিষয়স্বরূপ-মাত্র) গৌণরূপে ভাব-নামে পরিচিত হইতে পারে। সপ্তমাধ্যায়ে মহর্ষি মুখ্যতঃ প্রধান ভাবগুলির ও আনুসঙ্গিকরূপে গৌণ ভাবগুলির লক্ষণ-বিবরণাদি প্রদান করিয়াছেন।

১১। "নন্থ(তে) সংবিৎস্বভাবে নিমজ্জনাদন্ত এবোন্মজ্জনাচ্চ তেঽপি সংবিদাত্মকাঃ। এবং তর্হি বিশ্বমেব ভাবময়ং স্যাদুপচারাৎ, বিজ্ঞানবাদাশ্রয়াদ্বেতি অভিনয়ধর্ম্মাদীনাং পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ স্থায়ি-ব্যভিচারি-সাত্ত্বিকা এব ভাবাঃ। বিভাবানুভাবানাঞ্চ প্রাসঙ্গিকং লক্ষণমেতচ্চ বক্ষ্যামঃ।"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪

১২। "নন্থ চিত্তবৃত্ত্যাত্মান এব চেষ্টাবান্তর্হ্যেতেষু ব্যুৎপত্তিদ্বয়মপি সম্ভাব্যতে। তথা হি—রতিভূত প্রাদুর্ভাবে প্রকর্ষগমেশ্চ পুনরভিধানাত্তেন যেন তরতমপূর্ব্বকতয়ৈব প্রাদুর্ভবতি ন তু ক্ষণমবতিষ্ঠতে। তেভ্যো ভাবাৎ চিত্তবৃত্ত্যাত্মানুভাবজ্ঞানস্ত পরিমিতকালভাবিত্বাৎ (?)—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪ (অভিনব-ভারতীর এই পঙ্‌ক্তি

আবার 'ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ'—উৎপাদন করে—এই পক্ষ অবলম্বনে বুঝাইয়াছেন—'ভাবয়ন্তি' পদের অর্থ—আস্বাদন করিয়া থাকে—হৃদয়কে ব্যাপ্ত করে (১৩)।

এখন ভবন্তি-পক্ষই হউক, আর ভাবয়ন্তি-পক্ষই হউক—মূলতঃ তাৎপর্য্য উভয় পক্ষেই যে এক—ইহা আচার্য্য অভিনব দেখাইয়াছেন। কারণ—'ভবন্তি' অর্থে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া কি করে বা কি ব্যাপ্ত করে?—উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্ম কি, তাহাই প্রধানতঃ নিরূপণীয় (১৪)।

মহর্ষি স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া নিজেই উহার সমাধানপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছেন—কাব্যার্থকে ভাবিত করিয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন—'কাব্যার্থ' কি পদার্থ? কু (কু) ধাতু (যাহার অর্থ শব্দ করা) অথবা কব্ ধাতু (যাহার অর্থ রচনা করা) হইতে 'কাব্য'-পদটি নিষ্পন্ন। কাব্যের পদার্থ (পদগত অর্থ) ও বাক্যার্থ রসেই পর্য্যবসান লাভ করে। এ হেতু 'কাব্যার্থ' বলিতে বুঝায় 'রস'। 'অর্থ' বলিতে অভিধেয় বস্তুকে এ ক্ষেত্রে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে যাহার প্রধানতঃ অনুসন্ধান করা হয় (অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু)। কাব্যের মধ্যে যাহা মুখ্যতঃ অনুসন্ধানের যোগ্য তাহাই কাব্যার্থ—রস (১৫)।

যাহা এইরূপ কাব্যার্থকে (অর্থাৎ রসকে) ভাবিত করে, তাহাই ভাব (১৬); অর্থাৎ—স্থায়ি-ব্যভিচারি-সমূহ-দ্বারাই আস্বাদ লৌকিকার্থ (অর্থাৎ লৌকিক-দশায় আস্বাদ্য রস) উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বেই স্থায়িভাবাদিরূপে যাহা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা হইতে তাহাকেই সর্ব্বসাধারণ-রূপে আস্বাদিত করান হয়। অতএব, যাহা পূর্ব্বে বোধের গোচর হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কালে নিষ্পাদ্যমান আস্বাদ্য রসের ভাবক (অর্থাৎ—নিষ্পাদক—উৎপাদক) হইয়া থাকে (১৭)।

কয়টি অশুদ্ধি-বহুল বলিয়া দুর্ব্বোধ্য। আমরা উহার ভাবার্থ যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিলাম। সুধীগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ভাল হয়)।

১৩। "যদি বা ভাবয়ন্তি—আস্বাদনং কুর্ব্বন্তি হৃদয়ং ব্যাপ্নুবন্তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪

১৪। "কিং ভবন্তি ভাবয়ন্তি বা, ভবন্তি চ কিমেতৎ কুর্ব্বন্তি ব্যাপ্নুবন্তি বা, তত্র চ দ্বয়েঽপি কিং কর্ম্ম?"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪

১৫। "কোঃ কবতের্বা কবনীয়ং কাব্যম্, তত্র চ পদার্থ-বাক্যার্থৌ রসেষ্বেব পর্য্যবস্যত ইত্যসাধারণ্যাৎ প্রাধান্যাচ্চ কাব্যস্যার্থাঃ রসাঃ। অর্থ্যন্তে প্রাধান্যেনেত্যর্থাঃ। ন ত্বর্থশব্দোঽভিধেয়বাচী"। অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪। সাধারণতঃ 'শব্দ' বলিতে আমরা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অর্থ বলিতে উহার পর্য্যায় শব্দান্তর বুঝি। কিন্তু উহা ঠিক নহে। বস্তুতঃ, 'অর্থ' পর্য্যায়-শব্দ নহে—বরং বাচক শব্দের বাচ্য বস্তু মাত্র। শব্দ অভিধান, অর্থ অভিধেয় (Corresponding object)। এ ক্ষেত্রে কিন্তু 'অর্থ' বলিতে বুঝাইতেছে মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

১৬। "এবং কাব্যার্থান্ রসান্ ভাবয়ন্তি কুর্ব্বতে স্থায়িব্যভিচারিকলাপেনৈব হ্যাস্বাদ্যো লৌকিকার্থো নির্ব্বর্ত্ত্যতে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪

১৭। "পূর্ব্বং হি স্থায্যাদিকমাগচ্ছতীতঃ সর্ব্বসাধারণতয়াস্বাদয়ন্তি। তেন পূর্ব্বাবগমগোচরীভূতঃ সন্নুত্তরভূমিকাভাগিন আস্বাদ্যস্য ভাবকো নিষ্পাদক উচ্যতে। তেন ভাবয়ন্তীতি করণে দর্শয়ন্তি—বাগঙ্গেত্যাদি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি-যোজনা-প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বরোদা সংস্করণে এত অশুদ্ধি-বহুল-রূপে মুদ্রাপিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে প্রতিপদের আক্ষরিক অর্থ সংগ্রহ করা সুকঠিন। তবে তাৎপর্য্যার্থ যতদূর বুঝা যায়, তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

মহর্ষি বলিয়াছেন—বাগ্-অঙ্গ-সত্ত্ব-বিশিষ্ট কাব্যার্থ (অর্থাৎ—রসকে) যাহা ভাবিত (অর্থাৎ নিষ্পাদিত) করে, তাহাই 'ভাব'। এই পঙ্‌ক্তিটি হইতে অনুমান হয়—'ভাব'-শব্দের অন্তর্ভূত 'ভূ'-ধাতুর অর্থ—করা। এই 'করা'-ক্রিয়ার করণভূত হইতেছে বাগ্-অঙ্গ-সত্ত্ব। 'বাক্' বলিতে বুঝায় বাচিকাভিনয়—উহা বর্ণনাত্মক—বর্ণনা-দ্বারাই রসোদ্বোধে সহায়তা করে। 'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ—আঙ্গিকাভিনয়—অঙ্গের নানাবিধ সন্নিবেশ-বলনাদি দ্বারাও রসনিষ্পত্তি হয়। আর 'সত্ত্ব'-পদ সাত্ত্বিকাভিনয়ের বাচক। স্তম্ভ-স্বেদাদি সাত্ত্বিকাভিব্যক্তিও রসপুষ্টি করিয়া থাকে। এ হেতু বাগ্-অঙ্গ-সত্ত্ব—রসনিষ্পত্তির করণভূত। এই করণ-সমূহ-দ্বারা উপেত (অর্থাৎ যুক্ত) হইয়া ভাব রসের নিষ্পাদক হইয়া থাকে। অর্থাৎ—সরল কথায়—ভাব আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত হইলে রসাকারে অভিব্যক্ত হয়।—ইহাই অভিনবগুপ্তের উক্তির তাৎপর্য্য (১৮)।

এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—অভিনয় ত চতুর্ব্বিধ—বাচিক-আঙ্গিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক। তবে এ ক্ষেত্রে মহর্ষি কেবল ত্রিবিধ অভিনয়ের কথা বলিয়া আহার্য্যাভিনয়কে রসনিষ্পত্তির করণ-শ্রেণী হইতে বাদ দিলেন কেন?

ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন যে, যদ্যপি আহার্য্যাভিনয় অভিনয়ের অন্যতম অঙ্গ, তথাপি উহাতে চিত্তবৃত্তি অপগত হইয়া থাকে। আহার্য্যাভিনয় নিতান্ত বাহ্য—বহিরঙ্গ অভিনয়—চিত্তবৃত্তির কোন ক্রিয়া উহাতে নাই। এ কারণে বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়েরই অন্তরঙ্গতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রব্য-কাব্য হইতেও রসাস্বাদ জন্মে। কাব্যে আহার্য্যাভিনয়ের কোন স্থান নাই। এ কারণে রসোৎপত্তি প্রসঙ্গে মহর্ষি আহার্য্যকে করণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই (১৯)।

তাহা হইলে মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই যে, চিত্তবৃত্তিগুলি স্বতঃ অলৌকিক—যেহেতু উহারা অতীন্দ্রিয়। যাহা অলৌকিক, তাহার আস্বাদন হয় না। পরন্তু, বাচিকাদি অভিনয়-প্রক্রিয়া রূঢ় হওয়ায় ইহারা স্বস্বরূপকে লৌকিকদশায় আস্বাদ্য করিয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগের নাম ভাব (২০)। আরও সরল ভাষায় বলা চলে—যে সকল চিত্ত-বৃত্তি স্বস্বরূপে আস্বাদ্য না হইলেও লোক-ব্যবহার

১৮। অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৪—৪৫। অভিনবের পঙ্‌ক্তিগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

১৯। "অত আহার্য্যং তু যদ্যপি···তথাপি তদনন্তরং চিত্তবৃত্ত্যপগতো বাচিকাদীনামেবান্তরঙ্গতা। তথা হি কাব্যাদপি রসাস্বাদা ভবন্তীত্যুক্তম্। তত্র চ ন পূর্ণতাহার্য্যস্য তেনাস্য নোপাদানম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৫

২০। "এতদুক্তং ভবতি—চিত্তবৃত্তয় এবালৌকিকাঃ। বাচিকাভিনয়প্রক্রিয়ারূঢ়তয়া স্বাত্মানং লৌকিকদশায়ামনাস্বাদ্যং (? দশায়ামাস্বাদ্যং) কুর্ব্বন্তীত্যতস্ত এব ভাবাঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৫

কালে বাচিক আঙ্গিক-সাত্ত্বিক-অভিনয়-যুক্ত হইয়া আস্বাদ্য রস-রূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারাই 'ভাব'-শব্দ-বাচ্য।

অতঃপর মহর্ষি যেরূপে ভাব-শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, তাহার কিছু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

'ভূ'-ধাতুর অর্থ 'করণ' (করা)। এ কারণে 'ভাবিত', 'বাসিত' 'কৃত'—এ সকল পদ পরস্পরের পর্য্যায়-স্বরূপ (২১)।

অভিনব এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভূ-ধাতু ণিজন্ত হইলে লৌকিক ব্যবহারে কৃ-ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে (২২)।

কেবল যে ভাবিত অর্থে কৃত—ইহাই লোকে প্রসিদ্ধ, তাহা নহে; ভাবিত অর্থে ব্যাপ্ত—এরূপ প্রয়োগও যে হইতে পারে, মহর্ষি তাহা দেখাইয়াছেন—লোকে এরূপ প্রসিদ্ধি দৃষ্ট হয়—'অহো! এই গন্ধ বা রস দ্বারা সকলই ভাবিত হইয়াছে'। এ ক্ষেত্রে 'ভাবিত' পদের অর্থ ব্যাপ্ত (২৩)।

যদি এরূপ কেহ আশঙ্কা করেন—এ ক্ষেত্রেও 'ভাবিত' শব্দের অর্থ 'কৃত' হইতে বাধা কি?—তাহার উত্তরে অভিনব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভরতের উক্তিটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

'অহো! এই গন্ধ দ্বারা সকল গন্ধ ভাবিত'—ইহাই মহর্ষির উক্তি। 'এই গন্ধ' বলিতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে যদি কস্তুরিকা-গন্ধ ধরা হয়, তাহা হইলে 'সকল গন্ধ' (যাহা কস্তুরিকা-গন্ধ-দ্বারা ভাবিত) কি কস্তুরিকা-গন্ধ-দ্বারা কৃত হইয়াছে—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে? বস্তুতঃ সেরূপ অর্থ স্বীকার-যোগ্য নহে। কারণ, কস্তুরিকা-গন্ধ কস্তুরীতেই থাকে—উহা অন্যত্র সংক্রান্ত হইতে পারে না; অথবা অন্যত্র কস্তুরিকা-গন্ধ-সদৃশ গন্ধান্তরও উৎপন্ন হইতে পারে না। কেবল গন্ধ কেন, সর্ব্ববিধ গুণের পক্ষেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। যে গুণ যে দ্রব্যে থাকে, তাহা হইতে সে গুণ দ্রব্যান্তরে সংক্রান্ত হইতে পারে না—অথবা দ্রব্যান্তরে তৎসদৃশ গুণান্তরও উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহাই নিয়ম। কারণ, যে দ্রব্যে যে গুণ থাকে, সেই দ্রব্যের সহিত সে গুণের নিত্য-সম্বন্ধ—সে দ্রব্যকে ছাড়িয়া সে গুণ অন্যত্র যাইতে পারে না। কারণ, এক দ্রব্য ছাড়িয়া দ্রব্যান্তরে সংক্রমণের কালে গুণ কোন্ আশ্রয়ে থাকিবে? দ্রব্য ব্যতীত নিরাশ্রয়ে গুণ থাকে না—ইহাই নিয়ম। আবার কস্তুরিকা-সংস্পর্শে বস্ত্রে যে গন্ধ উৎপন্ন হয় তাহা ত কস্তুরীরই গন্ধ—কস্তুরী-গন্ধের সদৃশ গন্ধান্তর নহে। অতএব, সদৃশ গুণান্তরের উৎপত্তিও সম্ভাবিত নহে। গন্ধাদি গুণ যতক্ষণ সেই গুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে থাকে, ততক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যত্র বস্ত্রাদিতে উহাকে সংক্রামিত করিতে যাইলে উহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব, গন্ধের দ্রব্যান্তরে সংক্রামণ বা সদৃশ গন্ধান্তরের উৎপত্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত অস্বীকার্য্য। তাই অভিনব বলিয়াছেন—গন্ধাদি গুণ-পদার্থের স্বভাব এই যে, উহা নানাবিধ রূপ-দেশ-চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করে। এ হেতু কস্তুরিকা-গন্ধ কেবল কস্তুরিকা ব্যতীত বস্ত্রাদিকেও ব্যাপ্ত করে—বস্ত্রাদি কস্তুরিকা গন্ধে ভাবিত—আমোদিত হইয়া থাকে।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিলে দাঁড়ায় এইরূপ—

বাচিকাদি অভিনয় যখন প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োজিত হইতে থাকে, তখন মনে হয় যেন উহা বিশিষ্ট দেশ-কাল-পাত্র-গত। তথাপি বস্তুতঃ উহা নট-রূপ পাত্রেই নিয়ত বা সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার কারণ এই যে, বাচিকাদি অভিনয় যথার্থতঃ রামাদি-চরিত্রের ধর্ম্ম। নট রাম সাজিয়া যে বাক্যগুলি বলিতেছে, সে বাক্যগুলি বস্তুতঃ রাম-চরিত্রের মুখেই সাজে—উহা রামেরই গুণ বা ধর্ম্ম—নটের নহে। ঐরূপ আঙ্গিকাদি অভিনয়ও রাম-চরিত্রের ধর্ম্ম—নটের নহে। নট উক্ত বাগঙ্গাদি অভিনয়ের মুখ্য আশ্রয় নহে। আর যেহেতু নট রাম-চরিত্রের অনুকারক মাত্র, এ কারণে পরমার্থতঃ রাম-চরিত্র নটে বর্ত্তমান থাকে না। অতএব, রাম-চরিত্রের নিয়ত ধর্ম্ম বাচিকাদি অভিনয় নটে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কস্তুরিকা-গন্ধের ন্যায় সামাজিক (দর্শক)-গণকেও ব্যাপ্ত করে (২৪)।

যদি একথা বলা হয়—অভিনয় নটে বর্ত্তমান—ইহা ত প্রত্যক্ষ; কিন্তু সামাজিকগণকে অভিনয় ব্যাপ্ত করে—ইহা অপ্রত্যক্ষ;—তাহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—নট-গত অভিনয় সামাজিক-চিত্তকে ব্যাপ্ত করে। এই চিত্তব্যাপন-দ্বারাই সামাজিকগণকেও উহা ব্যাপ্ত করিয়া থাকে (২৫)—ইহা বলা চলে।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

২১। "ভূ ইতি করণে ধাতুস্তথা চ ভাবিতং বাসিতং কৃতমিত্যনর্থান্তরম্"—নাঃ শাঃ, ৭ম অঃ, পৃঃ ৩৪৫

২২। "ভবতের্হি ণ্যন্তং প্রাকৃতং করোত্যর্থমাহেতি দর্শয়তি ভূ ইতীতি। তকার উচ্চারণার্থঃ। ণিচা সম্বন্ধেনেতি ইতি ইকারে প্রত্যয়ে সতি ভূধাতুঃ করোত্যর্থে বর্ত্ততে। এতদেবোপা সংহরতি—ভাবমিতি (ভাবিতমিতি?)। অনর্থান্তরমিতি একোঽর্থ ইতি যাবৎ —অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৫

২৩। "লোকেঽপি চ প্রসিদ্ধমহো হ্যনেন গন্ধেন রসেন বা সর্ব্বমেব ভাবিতমিতি, তচ্চ ব্যাপ্ত্যর্থম্"—নাঃ শাঃ, পৃ পৃঃ ৩৪৫-৪৬

"ন কেবলং ভাবিতং কৃতমিতি লোকে প্রসিদ্ধম্। যাবদ্ব্যাপ্তমিত্যপি এতদপি চেত্যনেনোক্তম্। সর্ব্বমিত্যেতদ্ গন্ধরসমপি"—অঃ ভাঃ, পৃ ৩৪৫।

২৪। "নন্থ তত্রাপি কৃতমিত্যেবার্থোঽস্ত্বিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চ ব্যাপ্ত্যর্থমিতি। ন হি কস্তুরিকাগন্ধেন প্রস্তরং তৎকারং ক্রিয়তে গুণস্যাসংক্রান্তেঃ, ন চ তৎ সদৃশগুণান্তরোৎপত্তিঃ। যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদ্ গন্ধাদীনাং বস্ত্রাদৌ চ বিনাশপ্রতিপত্তেঃ, (ন) কেবলং কস্তুরিকাদ্রব্যমেব (অপি তু) তাবদ্রূপদেশচৈতন্যাক্রমণস্বভাবং বস্ত্রাদিকেঽপি তথা প্রতিপত্তিমাধত্তে। তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি। ত এব বাচিকাদ্যাঃ অভিনয়াঃ প্রমুখদশায়াং দেশকালবিশেষগতত্বেন যদ্যপি ভান্তি, তথাপি নটস্য নির্গুণাদিহ ন তত্বাদ্ রামাদেঃ পরমার্থসত্ত্বাদ্ভ্রান্তিজ্ঞানাভাবাচ্চ নিয়ততাং বিজহতঃ সাধারণীভাবমনু-প্রাপ্তাঃ সামাজিকজনমপি মৃগমদামোদদিশা ব্যাপ্নুবন্তি"।—অঃ ভাঃ, পৃ পৃঃ ৩৪৫-৪৬

২৫। "স্বচিত্তবৃত্তিব্যাপনদ্বারেণ তেন ভাবয়ন্তি সামাজিকাত্মানমিতি ভাবাঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

এক

১

পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ প্রায় চার যুগেরও আগেকার কথা! যে-যুগে মানুষ-হিসাবে মানুষের কোনো দাম ছিল না; মানুষের দাম কষা হইত তার টাকা-কড়ি, জায়গা-জমি এবং প্রতিপত্তির হিসাবে; যে-যুগে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসাকে তুচ্ছ করিয়া মানুষ নিজের স্বার্থ, অহঙ্কার এবং আচার-সংস্কারের বাহ্য-প্রকাশকেই সর্ব্বস্ব করিয়া দেখিত।

কলিকাতা-সহর হইতে খানিক দূরে চালশা গ্রাম। এখনকার মতো এমন জীর্ণ কঙ্কাল-মূর্ত্তির গ্রাম নয়; চারি দিকে লোক-জন; সমৃদ্ধি-সম্পদও প্রচুর। বাড়ী, বাগান; নদীতে নৌকায় করিয়া বাচখেলা, যাত্রা-কথকতা-আমোদ-প্রমোদের কী ধূম! বড়-বড় বোনেদী ঘরগুলায় পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে পাল্লা দিয়া যে-সমারোহ চলিত, এ-যুগে আমরা সে-সমারোহের কল্পনাও করিতে পারি না!

চালশায় তখন সবচেয়ে প্রতিপত্তি মাখন গাঙ্গুলির। বৈভব-প্রতিপত্তি অপরিসীম। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে; অথচ জাতের বিচার করেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রকম। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া মাখন গাঙ্গুলির জ্ঞাতি-ভাই পরেশ গাঙ্গুলি খানিকটা ঋণ-জালে বিজড়িত হইয়াছে। মাখন গাঙ্গুলির উপর পরেশের আক্রোশ ধূমায়িত হইতেছিল···এমন সময় মাখন গাঙ্গুলির সম্ভ্রম ও মর্য্যাদায় বেশ খানিকটা ঘা দিয়া তাঁর বড় ছেলে বিজয় কোথা হইতে টাকার জোগাড় করিয়া সেই টাকায় বিলাত চলিয়া গেল। বোম্বাই হইতে মায়ের নামে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল—

মা

তোমাদের না জানাইয়া তোমাদের অনুমতি না লইয়া বিলাত চলিলাম। টাকার জোগাড় করিয়াছি। আমার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমি মানুষ হইতে চাই। যেটুকু বুঝিয়াছি, বিলাতে গিয়া সেখানকার আব-হাওয়ায় কিছু দিন বাস করিলে তবেই এ যুগে বাঁচিবার মতো মানুষ হইতে পারিব। এখানে ভয়ে-শ্রদ্ধায় যাদের পানে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকি, বিলাতে গিয়া একবার দেখিতে চাই তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোন্‌খানে!

তোমার স্নেহ-মুখখানি স্মরণ করিয়া ভালো থাকিব বলিয়া মনে করি। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো মা, কুপুত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়ো না। তোমার আশী-র্ব্বাদের জোরে আমার এ-যাওয়া সার্থক হইবে।

জানি, বাবা খুব রাগ করিবেন। হয়তো আমাকে ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। হয়তো সেখান হইতে এমন কিছু আমি লইয়া আসিব, যার জোরে সেলামবাজি করাকেই জীবনের কাম্য বলিয়া মনে হইবে না!

জমিদারী বজায় রাখিতে গেলেও এ-যুগে সত্যকার মানুষ হওয়া চাই। নহিলে জন্ম-গর্ব্বে মাতিয়া সকলের উপর হুকুম চালানো— বেশী দিন তাহা চলিবে না, বুঝিতেছি।

সেখানে পৌঁছিয়া তোমাকে চিঠি দিব। সাবধানে থাকিব। সেখানে এমন কোনো কাজ করিব না, যার জন্য আমার পরিচয় দিতে আমার মায়ের মুখ লজ্জায় নুইয়া পড়িবে!

তুমি আমার শতকোটি প্রণাম ও ভালোবাসা জানিবে এবং বাবাকে জানাইবে। ছোট ভাইবোনদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইয়ো।

তোমারই শ্রীচরণাশ্রিত
বিজয়

চিঠি নয়! মাখন গাঙ্গুলির গৃহে যেন কামানের জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পড়িল!

চিঠি পড়িয়া মাখন গাঙ্গুলি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—হুঁ! তোমার কলকাতার বেয়াই! তার বাড়ীতেই এ-সম্বন্ধে জল্পনা করে' সব ঠিক হয়েছে।

ছ' মাস পূর্ব্বে ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ-উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। বধূ নীলিমা কলিকাতা হাইকোর্টের মস্ত পশারওয়ালা উকিলের কন্যা। নীলিমা মেমেদের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছে। বোনার কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ছবি আঁকা—এ-সবও শিখিয়াছে। ইংরেজীতে কথা বলিতে পারে, চিঠি লিখিতে পারে; ভুল হয় না। মাসখানেক পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মাখন গাঙ্গুলি যে আর্জী পেশ করিয়াছিলেন, শ্বশুরের কথামতো সে-আর্জী নীলাই মুশাবিদা করিয়া দিয়াছে।

শ্বশুরের আহ্বানে বধূ নীলা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল···ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া। শাশুড়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন বধূর পাশে—প্রহরীর মতো।

শ্বশুর বলিলেন—বিজয় বিলেত গেছে, তুমি জানো বৌমা?

ইংরেজী লেখাপড়া শিখিলেও শ্বশুরের সঙ্গে সরাসরি কথা কহিবে বধূ—এ বাড়ীতে সে বিধি নাই! সে-বিধি মানিয়া নীলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

সে মাথা-নাড়া শ্বশুর দেখিলেন; বলিলেন—সে কলকাতায় গেছে শনিবার···আজ বারো দিন আগেকার কথা। তুমিও বাপের বাড়ী থেকে এখানে এসেছো মাত্র পাঁচ দিন। শনিবারে বিজয় তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠেছিল?

মাথা নাড়িয়া এবারও বধূ জানাইল, না।

শ্বশুর বলিলেন—শনিবারে সে যে সেই কলকাতায় গেল তার পর কলকাতা থেকে বিলেত পালালো, এর প্রশ্রয় পেয়েছে তোমার বাপের বাড়ীতেই! তোমার সঙ্গে বা তোমার বাবা-মার সঙ্গে নিশ্চয় এ-সম্বন্ধে পরামর্শ হয়েছিল···এ সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও বৌমা?

অস্ফুট কণ্ঠে বধূ বলিল শাশুড়ী বিন্দুমতীকে উদ্দেশ করিয়া,—

আমি জানি না মা। এ-সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেননি বা লেখেননি।

শ্বশুর বলিলেন—তোমার বাবার সঙ্গে বিজয়ের মন্ত্রণা চলেনি··· আমাকে লুকিয়ে ?

শাশুড়ীর পানে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে নীলা বলিল—সোমবারে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, আমি তা জানি না। আমাকে শুধু বলেছিলেন, বড্ড ভারী কাজে ব্যস্ত আছেন—কিছু দিনের জন্ম বাইরে যেতে হবে। আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্ম শুধু দেখা হয়েছিল। আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন না ভাবি! এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি।

অস্ফুট মৃদু ভাবে উচ্চারিত হইলেও শ্বশুর এ কথা স্পষ্ট শুনিলেন! শুনিয়া তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—তোমার বাবা নিশ্চয় আছেন এ ষড়যন্ত্রে!

শাশুড়ী বলিলেন—বৌমার সঙ্গে চুকলো তোমার কথা? বৌমা এখন যেতে পারে? ঠাকুর-ঘরের কাজ করতে করতে উঠে এসেছে। আজ আবার ইতু-পূজো···ভটচাষ্যি-মশাই এখনি আসবেন।

শ্বশুর বলিলেন—উনি যেতে পারেন।

নীলা চলিয়া গেল—যেন ভাবহীন পুতুলের মতো! শাশুড়ী নীলার পানে চাহিয়া রহিলেন। মমতায় তাঁর বুক উথলিয়া উঠিল! ইচ্ছা হইল, নীলাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, ভাবিস্ নে মা, তার অদর্শন আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধিতেছে—তোর বুকেও এমনি কাঁটার যাতনা! তবু তোকে বুকে চাপিয়া ধরি আয়, তোর সব বেদনা তুই আমার বুকে দে!···

কিন্তু তাহা পারিলেন না; ফিরিয়া স্বামীর পানে চাহিলেন।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—শোনো, আজ থেকে সে আমার ত্যজ্য পুত্তুর। আজই আমি সদরে লোক পাঠিয়ে উকিল আনাবো··· উকিলকে দিয়ে বিষয়-সম্পত্তির নতুন ব্যবস্থা করবো। সে-ব্যবস্থায় তোমার বিজয় একটি পাই-পয়সা পাবে না! বুঝলে!

গৃহিণী এমনিতে শান্ত-মেজাজের মানুষ···কিন্তু তেজ আছে। তিনিও যে-সে ঘরের মেয়ে নন্। তাঁর বাবার মস্ত জমিদারী। সে জমিদারীর পাশে মাখন গাঙ্গুলির জমিদারী যেন তালের কাছে তিল্‌টুকু! তিনি বলিলেন—এখনি তাড়াতাড়ি যশ্ করে কিছু করো না। চিঠিতে সে যা লিখেছে···মানুষ হবার জন্ম গেছে··· আগে ত্যাখো, কি হয়ে সে ফেরে! তার পর···

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বিলেত গিয়ে কেউ মানুষ হয়ে ফেরে না, ফিরতে পারে না···ও আমার ঢের জানা আছে!···তাছাড়া আমি হলুম সমাজের মাথা···সমাজের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে তো! শশধর গাঙ্গুলির বংশ···জানো, আমাদের বংশ কি ভাবে আচার-নিষ্ঠা মেনে আসছে চিরদিন!

গৃহিণী বলিলেন—আচার-নিষ্ঠার কথা যদি তুললে তো বলি বাবু সেকালের আচার-নিষ্ঠা তাঁদের মতো তুমি সমান ভাবে মানতে পারছো কি? শুনেছি, আমার দাদাশ্বশুরের আমোলে নবাব-দরবার থেকে কে নাজিম না দাওয়ান এসেছিলেন। তাঁকে দাদাশ্বশুর তোমাদের বাড়ীর মধ্যে সেবার জন্ম আসন ত্যাননি···ভিটের বাস্তু-দেবতা আছেন বলে'! বাইরে নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে সেই তাঁবুতে তাঁর অভ্যর্থনা করেছিলেন! আজ তোমার বৈঠকখানায় দেখছি পুলিশ-সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব···এরা তো হামেশাই আসছে! তাদের খাতির-অভ্যর্থনা করতে তুমি যে মুর্গী কেটে ভোজ দিচ্ছ সেই বাস্তুভিটেয়!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তার পর সে-ঘর গঙ্গা-জলে ধুয়ে গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হয় না? তুলসী দিয়ে নারায়ণ-শিলা নিয়ে গিয়ে কত ক্রিয়া করা হয়! কিন্তু ও-সব কথা থাক্···এখন আমার স্পষ্ট কথা, বিজয়ের বিয়ের সময় এখানে অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন···তোমার বেয়াই অর্থাৎ বিজয়ের শ্বশুর জ্ঞানপ্রিয় বাবু সাহেব-সুবোর সঙ্গে বড্ড বেশী মেলামেশা করেন; হোটেলে খানা খান। সে জন্ম অনেকে গোলযোগ তুলেছিল। এখন আমাদের না বলে চুপি-চুপি ঐ শ্বশুরকে সহায় করে বিলেত-পালানো··· পাঁচ জনে এখনি এর কৈফিয়ৎ চাইবে! এবং সে কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হবে। ওরা বলবে, সাহেব-ঘেঁষা বেয়াইয়ের সঙ্গে মাখন গাঙ্গুলি গোপনে শলা-পরামর্শ করে ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছে!···কাজেই নিজের মান রাখতে হলে এখন আমার প্রথম কথা, বৌমাকে জিজ্ঞাসা করো, উনি এখানে থাকতে চান? না, বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন?

গৃহিণী বলিলেন—তার মানে?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—মানে, আমার এখানে থাকলে ওঁর পরিচয় উনি এ-বাড়ীর বৌ। জ্ঞানপ্রিয় চাটুয্যের মেয়ে উনি— সে কথা ওঁকে ভুলে যেতে হবে। আর উনি মনে করবেন, বিজয়··· ওঁর স্বামী বিজয়···আমার ছেলে···সে মরে গেছে।

—ষাট! ষাট! বলিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন— কি যে বলো! মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেছ একেবারে! ছি···

—ছি নয়। আমার বাড়ীর বৌ হয়ে এ বাড়ীর আচার-নিষ্ঠা পালন করে উনি যদি থাকতে পারেন, তা হলেই উনি আমার পালনীয়া···সযত্নে পালনীয়া···ওঁকে আমি পালন করবো। আর তা যদি উনি না চান অর্থাৎ বাপকে ত্যাগ করতে না পারেন, জাতিচ্যুত স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান, তাহলে এ বাড়ীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক রাখা চলবে না! বুঝলে?

গৃহিণী কহিলেন,—ছেলেটা সত্ত এই এমন করে চলে গেছে··· যাবার সময় বেচারীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করে যায়নি···ওকে বলেও যায়নি! বেদনায় ও জরজর হয়ে আছে। একটু মমতা হয় না? বৌ হলেও ও মানুষ!···তাছাড়া যাকে নিয়ে এখানে ও ঘর করতে এসেছে···যার উপরে ওর নির্ভর···সে নির্ভর পুরোপুরি পাবার আগেই সে দূরে চলে গেল! আমরা এখন স্নেহে-মায়ায় ভুলিয়ে কোথায় ওর বেদনা মুছে ওকে আপন করে তুলবো···তা নয়, এ সময়ে তুমি এলে সমাজপতি সেজে তোমার গদা উঁচিয়ে!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—এ সব হলো ধর্ম্মের কথা···সমাজের কথা। তুমি মেয়ে-মানুষ···এ সবের মর্ম্ম তুমি···

কথা শেষ হইল না। গৃহিণী সঙ্কারে বাধা তুলিয়া বলিলেন— এই যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, আচার হয়···স্নেহ-মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে আপন-জনকে ত্যাগ করা···তাহলে তোমার ও-ধর্ম্ম ও-সমাজ নিয়ে পরম-সুখে তুমি বাস করো, বৌমাকে নিয়ে যেখানে আমার দু'-চক্ষু যায়, আমি চলে যাবো।

এ কথা বলিয়া গৃহিণী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না…গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর মেজাজ দেখিয়া মাখন গাঙ্গুলিও আর কথা বাড়াইলেন না…চুপ করিয়া রহিলেন।

২

এ ঘটনার পর কোথাও কলরব উঠিল না। মাখন গাঙ্গুলির গলার জোরে গ্রামের লোক বুঝিল, বিলাত গিয়াছে বলিয়া বিজয়কে মাখন গাঙ্গুলি তাঁর গৃহে আর স্থান দিবেন না।

নীলা এইখানেই রহিল। শাশুড়ীর বেদনা বুঝিয়া শাশুড়ীর স্নেহে তাঁর মুখ চাহিয়া সে নিজের দুঃখ চাপিয়া রাখিল।

তার পর বিপর্য্যয় গোলযোগ উঠিল চার বৎসর পরে…বিজয় যখন বিলাত হইতে চাষের বিদ্যা শিখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল।

মাকে সে প্রণাম করিতে আসিল…ধুতি পরিয়া চিরকালের সেই সরল সহজ বাঙালীর বেশে। মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে দেখা হইল না। দেখা হইল নদীর ঘাটে…গৃহে তার প্রবেশ নিষেধ। গ্রামের গরীব-দুঃখীদের ঘরে গিয়া তাদের সংবাদ লইল। সমাজ লইয়া যারা শুধু ঘোঁট করিয়া বেড়ায়, তাদের ত্রিসীমাও সে মাড়াইল না! তারাও বিজয়কে দেখিয়া ভয়ে-ভয়ে সরিয়া রহিল…কি জানি, বিলাতী হাওয়া গায়ে লাগিলে সমাজে যদি কথা ওঠে!

মাকে প্রণাম করিয়া বিজয় বলিল—পাশে মাজারগাঁ। ঐ গাঁয়ে জমি পেয়েছি মা। শ্বশুর-মশাইয়ের মক্কেলের জমি ওখানে আছে। প্রায় চার-পাঁচশো বিঘে…সেইখানে চাষ-বাস করবো।

মায়ের দু'চোখে জল…ছেলের চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন—প্রায়শ্চিত্ত কর্ বাবা। বামুন-পণ্ডিতের দল বলছে…

হাসিয়া বিজয় বলিল—কোনো পাপ করিনি মা! কোনো অপরাধ নয়! কিসের প্রায়শ্চিত্ত?

মা বলিলেন—ওঁরা যে বলছেন, বাবা!

বিজয় বলিল—ওঁরা যদি অন্যায় কথা বলেন, সে কথা রাখতে হবে? তুমিও এমন কথা বলো? তুমি যদি মন থেকে এ-কথা বলো, তাহলে আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো।…জানো, তোমার কথা আমি ঠেলতে পারবো না। তুমি বলচো আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে? …আমার অপরাধ?, ঐ বিলেত যাওয়া?

মা বলিলেন—না বাবা…তুমি যা অন্যায় মনে করবে, তা আমি কখনো তোমায় করতে বলবো না।

বিজয় বলিল—নীলা…তাকে আমার কাছে পাঠাবে তো?

মা বলিলেন—নিশ্চয়। সে তোমার সঙ্গে যাবে বৈ কি।…যে করে ক'টা বছর সে কাটিয়েছে!…তার পুণ্যে তোর মঙ্গল হবে, বিজু! তোর বাসা ঠিক কর্…ভালো দিন দেখিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে তোর ঘরে আমি প্রতিষ্ঠা করে আসবো।

তার পর বিজয়ের গৃহে নীলার যেদিন যাইবার কথা…

মাখন গাঙ্গুলির বুকে আবার জ্বলিল ব্রহ্মতেজ! তিনি বলিলেন—কুলের কুলবধূ…তিনি যাবেন সেই ম্লেচ্ছের ঘরে?

গৃহিণী বলিবেন—ম্লেচ্ছ হোক, দেবতা হোক…স্বামী…সে-ই ওর সব। তার কাছে যাবে না তো কোথায় যাবে, শুনি?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—শুনছি, ও সেখানে হাড়িডোম-চাঁড়াল মানছে না। তাদের সঙ্গে মাখামাখি করে, আমার ঘরের বৌ গিয়ে তার ওখানে থাকবে?

গৃহিণী বলিলেন—থাকবে।…তোমার ঘরের বৌ হলেও মায়া-মমতা-ভালোবাসাকে বিসর্জ্জন দিতে পারেনি। তোমার মতো বুক-খানাকেও পাথর করে ফেলেনি!

—বৌমা নিজে বলেছেন, যাবেন?

—বলেছে!

—সেখানে ওর সঙ্গে থাকলে কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না বৌমার।

—তোমার সঙ্গে চায় না ও সম্পর্ক রাখতে! ছেলেকে যে বিনাদোষে ত্যাগ করে, সে ওর কেউ নয়! ওর সব-চেয়ে যে বড় …ওর স্বামী, তাকে তুমি মানুষ ভাবো না…

—হুঁ…বেশ! আজ থেকে বৌমা আমার কেউ নন্!

গৃহিণী বলিলেন—যে-রকম তোমার মতিগতি, কেউ তোমার থাকবেও না আর এর পরে। মানুষ হয়ে মানুষের দাম বোঝে না… স্নেহ-মায়ার ধার ধারে না যে, তার সঙ্গে সম্পর্কের দাম কি?

তার পর চারটি বৎসর…সোনার রঙে দিনগুলি উজ্জ্বল হইয়া কাটিল।

বিজয়ের মনে দুঃখ নাই। বুকে প্রচণ্ড শক্তি, জীবন্ত উৎসাহ। সে-শক্তি সে-উৎসাহের স্পর্শে মাজারগাঁ যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! শক্তিমান পাঁচ জনের চরণ-তলকেই যে সব নিরক্ষর গরীব-দুঃখীর দল আশ্রয় বলিয়া জানিত, শক্তিমানের জুলুম-জবরদস্তি নিঃশব্দে সহিয়া চলিত…নিজেদের বুকে শক্তি আছে এমন কথা ঘুণাক্ষরে যারা কল্পনা করিতে জানিত না, তারা বুঝিয়াছে তারাও মানুষ! যে-শক্তি তাদের আছে, সে শক্তিও অসাধ্য-সাধন করিতে পারে।

নীলা বিজয়ের সকল কাজে সহায়। দীন-দুঃখীদের ঘরে গিয়া তাদের মৌন মুখে সে ভাষা জোগায়—তাদের বুকে জ্বালিয়া দেয় আশার প্রদীপ।

মায়ের সঙ্গে বিজয়ের দেখা হয়; নদীর ঘাটে। বাড়ীতে এখনো বিজয়ের ও নীলার প্রবেশের পথ বন্ধ। মায়ের প্রাণ আকুল হয়… বিজয়ের গৃহে গিয়া তার ঘরকর্ণা দেখিয়া গুছাইয়া দিয়া আসেন।

নীলা বলে,—না মা, আপনার তো একটি নয়! আর-পাঁচ জনের যদি অসুবিধা হয়? সমাজে চলতে তাঁদের যদি বাধে?

মা শুধু নিশ্বাস ফেলেন! বলেন—তাই থাকো মা…দূরেই থাকো। তোমরা ভালো আছো, এটুকু জানলেই আমার পরম লাভ!

হাসিয়া নীলা বলে—ভাবুন, বাড়ী ছেড়ে আপনার ছেলে বিদেশে চাকরি করতে গেছে। এমন তো কত লোক যাচ্ছে!

গম্ভীর মুখে মা জবাব দেন,—হুঁ!…

সেদিন মাখন গাঙ্গুলি খাইতে বসিয়াছেন, গৃহিণী বলিলেন—শুনছো?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—বলো…

গৃহিণী বলিলেন—বিজয়ের ছেলে হবে। সামনের মাসেই বোধ হয়!

মাখন গাঙ্গুলি কোনো জবাব দিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন—বড় ছেলে···তার এই প্রথম। আমি মা··· মনে আমার কত সাধ হয়!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—ছেলে যদি কুপুত্র হয়ে বাদ সাধে, উপায়?

গৃহিণী বলিলেন—আর যা বলতে চাও বলো, কুপুত্র বলো না। ওর সুখ্যাতি সকলের মুখে। এ তোমার বৈঠকখানার মোসাহেবের মুখের সুখ্যাতি নয়! তারা গতর খাটিয়ে খায়—ওর জমিদারীতেও বাস করে না। সেদিন একটি মেয়ে এসেছিল এ-বাড়ীতে তরকারী বেচতে—কত সুখ্যাতি করতে লাগলো। বললে, কি দুঃখ-কষ্টেই আমাদের দিন কাটতো মা···রোগে একটু 'আহা' বলে কেউ সুধোতো না···না খেয়ে পড়ে থাকলে ডেকে কেউ জিজ্ঞাসা করতো না, ···পশুর অধম হয়ে বাস করেছি মা চিরদিন···মানুষ হয়ে জন্মে নিজেদের কোনো দিন মানুষ বলে' মনে করিনি! আজ ওঁদের কৃপায় মানুষ বলে নিজেদের বুঝতে পেরেছি। আমরা বাঁচতে শিখেছি! ওঁরা যেন মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়ে দেছেন!

মাখন গাঙ্গুলি শুনিতে লাগিলেন···কোনো জবাব দিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন,—তুমি রাগই করো আর আমাকে ত্যাগই করো···ভালো দিনে আমি গিয়ে বৌমাকে সাধ খাইয়ে আসবো। পেটে ধরেছি···ছেলে···সেই ছেলের বৌ···কত ভাগ্য থাকলে মানুষ বৌয়ের মুখ দেখে। তা আমার কোনো সাধ পূরবে না? কেন? কিসের জন্যে পূরবে না, শুনি?

শেষের দিকে গৃহিণীর কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে আর্দ্র ও রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—যা খুশী করো। কিন্তু ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে···এই যে মেনকার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে উলুন্দার জমিদার-বাড়ী থেকে···ওটি কেঁশে যাবে! জানো না তো তাদের কি ভয়ানক রকমের নিষ্ঠা! কর্ত্তা সেদিন কোথায় গিয়েছিলেন মেয়ে দেখতে··· সঙ্গে এক জন বামুন গিয়েছিল কুঁজোয় গঙ্গাজল ভরে'···আর এক জন লোক গিয়েছিল পাথরের বড় ডাবায় করে' বাড়ীর তৈরী সন্দেশ নিয়ে। কর্ত্তা কারো বাড়ীতে জলস্পর্শ করেন না···এমন নিষ্ঠা!

গৃহিণী বলিলেন,—মেনকার সঙ্গে বিয়ে দিতে যে তারা রাজী হলো? এই শুনেছিলুম যে-বাড়ীর ছেলে বিলেত গেছে, সে-বাড়ীর সঙ্গে তারা কুটুম্বিতে করবে না।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—সে ঐ পরেশ ছুঁচোর কাজ। জ্ঞাতি-শত্রু তো! ওদের খপর দিয়েছিল, বিলেত-ফেরতের ঘর···লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া-আসা আছে! আমি জানতে পেরে শেষে নিজে গিয়ে তাদের সব কথা খুলে বলি। বলি, সে-ছেলে অন্য গাঁয়ে থাকে, আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিই না! তার উপর তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করেছি! উইল পর্য্যন্ত দেখিয়ে এসেছি বিজয়ের নামে একটি কাণা-কড়ির ব্যবস্থা নেই! তবেই না রাজী হয়েছে···মেয়ে দেখতে আসবে বলেছে। ছেলের জন্ম-নক্ষত্র মিলিয়ে ভালো দিন দেখে সেই দিনে আসবে।···বৌকে তুমি সাধ খাওয়াতে যাচ্ছো, কিন্তু··· সে কি আর এ-বাড়ীর বৌ আছে? যেদিন এ-বাড়ী থেকে চলে গেছে, সেই দিন থেকেই আর এ বাড়ীর বৌ সে নয়।

গৃহিণী বলিলেন,—ছেলে···তোমাকে তো পেটে ধরতে হয়নি, তুমি কি বুঝবে নাড়ীর টান! নিষ্ঠেধরের ঘরে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়-না-হয় আমার তা দেখবার দরকার নেই! তোমার সমাজ তোমায় রাখুক বা দূর করে দিক, আমার ছেলে-বৌ···তারা আমার সমাজের উপরে···তাদের যাতে কল্যাণ হয়, আমি তা করবোই! কারো বাধা মানবো না। তোমাদের বিধান মেনে চলে আমি আর মা নেই, রাক্ষসী হয়ে গেছি!

ঠাণ্ডা মানুষ হইলেও গৃহিণী যে জিদ ধরেন, সে জিদ চিরদিন বজায় রাখেন। কাজেই মাখন গাঙ্গুলি তাঁকে নিরস্ত করিলেন না; শুধু বলিলেন,—বেশ, তাদের ওখানে গিয়ে তোমার যা কল্যাণ-কর্ম্ম করবার, করে এসো। তা বলে এও জেনে রেখো, তুমি একা যাবে। আমার অন্য ছেলেমেয়ে কেউ সেখানে যাবে না। আর আমার হুকুম, তুমি নিজে সে-বাড়ীতে জলস্পর্শ করবে না···এতে যদি রাজী থাকো, যেতে পারো।

গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিলেন; কহিলেন,—তাই হবে। আমার মরণও হয় না! কি করে এ-সংসারে বেঁচে আছি! সংসার নয়, যেন শরশয্যা! যে দিকে ফিরি, শুধু কাঁটার যাতনা!

গৃহিণীর সাধ মিটিল। কিন্তু বিধাতা পরম-সাধে চরম বাদ সাধিলেন। যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিয়া নীলার সেই যে মূর্চ্ছা হইল, সে-মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না!

লোক-মুখে তিন দিন পরে গৃহিণী এ সংবাদ পাইলেন। বিজয় মাকে এ সংবাদ জানায় নাই।

কাঁদিয়া তিনি আসিয়া বিজয়ের গৃহে লুটাইয়া পড়িলেন। শিশুকে বুকে তুলিয়া অশ্রুর ঝর্ণা বহাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর ফিরিল বিজয়···জীর্ণ মলিন মুখ! বিজয় ডাকিল— মা···

শিশুকে শোয়াইয়া তার পানে চাহিয়া মা কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন। বিজয়ের আহ্বানে মা বলিলেন—এসেছিস!

—হ্যাঁ মা···

বিজয় বসিল মায়ের পাশে।

ছেলের পানে মা চাহিয়া রহিলেন···অনেকক্ষণ···নিশ্চল নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! তার পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম বাবা যে তোকে দেখবার জন্য যাকে এনেছি, তার যত্নে তার ভালোবাসায় তুই কোনো অভাব, কোনো দুঃখ জানবি নে। ভেবেছিলুম, সংসার সাজিয়ে মা-বাপ ছুটী নেয় চিরদিন। তাই হয়ে আসছে···তোরও সংসার সাজিয়ে দিয়েছি···আমার ছুটী হয়ে গেছে! —কিন্তু বৌমা এ কি করলে···এমন করে চলে গেল!

বিজয়ের দু'চোখ বহিয়া জলধারা বহিল···কোনো কথা সে বলিতে পারিল না।

আঁচলে ছেলের চোখের জল মুছাইয়া মা বলিলেন—আমার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেছে! এই এক কোঁটা বাচ্ছা···আমার কত সাধের ···কত কামনার ধন! এই চাঁদের কণাটুকুকে কার কাছে রেখে গেলেন? বড় ঘর থেকে বড় ঘরে এসেছিলেন···কত সাধ-আশা নিয়ে···কিছু ভোগ হলো না! শুধু দুঃখ সয়েই চলে গেলেন!

শোকের সিন্ধু তরঙ্গে উদ্বেল। সে-তরঙ্গে অতীত দিনের লক্ষ লক্ষ স্মৃতি ফেনার মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! তার বিরাম নাই···বিশ্রাম নাই।

ঘড়িতে ন'টা বাজিল। বিজয় বলিল—রাত হলো মা, বাড়ী যাও।

মা বলিলেন—না···সেখানে আমি আর যাবো না। আমি এইখানেই থাকবো বাবা। না হলে তোকে কে দেখবে? আর এই গুঁড়োটুকু?

বিজয় বলিল—আমাকে কারো দেখতে হবে না মা। আর এর জন্য আমি ব্যবস্থা করেছি। এক জন নার্শ এনেছি···বাঙালী নার্শ। মেয়েটি খুব ভালো!

মা বলিলেন—না বাবা, তা হয় না। একে কারো হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।

বিজয় বলিল—কিন্তু না গেলে ওদিকে গোলমাল হবে, মা।

মা বলিলেন—কিসের গোলমাল?

বিজয় বলিল—মেনির বিয়ের কথা হচ্ছে। এখানে তোমার থাকা চলে না যে!

মা বলিলেন—চলে···চলে···চলবে! আমি বাবা, তোর নাস্তিক মা! আচার-নিষ্ঠা মেনে আমার প্রাণের সার-জিনিষকে আমি ফেলে দিতে পারবো না! তোর এখানে তোর কাছে আমাকে থাকতে দে। আমায় তুই তাড়িয়ে দিস্‌নে।

মা গেলেন না।···

পরের দিন বাড়ী হইতে সরকার-মশাই আসিল, ভৃত্য আসিল, দাসী আসিল। মা বলিয়া দিলেন,—আমার যাবার উপায় নেই।

এ-নিরুপায়তা বিধাতা আরো বাড়াইয়া দিলেন এক মাস পরে।

কোথা হইতে জ্বর লইয়া বিজয় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল। পরের দিন সে-জ্বর এমন বিষম হইয়া উঠিল যে, মা গিয়া ছুটিয়া স্বামীর পায়ে পড়িলেন—ওগো, আমার বিজয়কে তুমি বাঁচাও! রাগ রেখো না! অভিমান রেখো না!

মাখন গাঙ্গুলির বুকের পাথর একটু যেন নড়িল! তিনি ডাক্তার ডাকিয়া দিলেন। চিকিৎসা চলিল। কিন্তু সে-চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া তৃতীয় দিনে বিজয় ইহলোকের সহিত সব সম্পর্ক কাটিয়া চলিয়া গেল।

মায়ের চোখে তিন-ভুবন শূন্য হইয়া গেল। কিন্তু এত বড় শোক তিনি সবলে চাপিলেন বিজয়ের অনাথ অসহায় শিশু-পুত্রটিকে বুকে তুলিয়া।

স্বামীকে বলিলেন—অস্পৃশ্য বলে আমায় ত্যাগ করতে চাও, করো, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা···কখনো যদি তোমাদের সংসারকে এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকি, আমার সেবায় কখনো যদি তুমি তৃপ্তি পেয়ে থাকো, তাহলে আমায় এ-ভিক্ষা দাও! বিজুর এ স্মৃতি-টুকুকে আমি গলার হার করে রাখবো···যে কটা দিন বাঁচি। তার পর একে জলে ভাসিয়ে দিতে চাও দিয়ো, গলা টিপে তোমার কলঙ্ক মোচন করতে চাও করো! যে ক' দিন এটা বাঁচে···তোমার ঐ বাগানে যে ছোট্ট একটু আশ্রয় আছে, একে নিয়ে সেখানে আমাকে মাথা গুঁজে থাকতে দিয়ো! এ ছাড়া এ-জন্মে তোমার কাছে আর কিছু আমি চাইবো না···কখনো না!

বিন্দুমতী চিরদিন অল্প কথা কন্‌···চিরদিন সহিয়া আসিতেছেন, মুখে একটি কথা বলেন নাই! আজ তাঁর মুখে কথার এমন উচ্ছ্বাস ···মাখন গাঙ্গুলির বুকের পাথর আর-একটু নড়িল!

এ-কথায় মাখন গাঙ্গুলি এক বার চক্ষু মুদিলেন। বুঝি ভাবিলেন, সমাজ! তার পর বলিলেন,—বেশ, থাকো! ওর খরচ আমি দেবো! আর ও যদি বাঁচে, ওর জন্ম কিছু ব্যবস্থাও করে দেবো! তবে বাড়ীতে স্থান হবে না।

গৃহিণী বলিলেন,—তোমার এ দয়া কখনো ভুলবো না।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নির্মোক

ক্ষুধার্ত্ত পৃথিবী কাঁদে, আকাশে উঠেছে ঘন মেঘ;
বিশীর্ণ বক্ষের 'পরে অসুরের চলেছে তাণ্ডব,
নিরন্ন মানুষ কাঁদে, শীর্ণ পেটে ক্ষুধার আবেগ!
প্রেম আর ভালোবাসা নিঃশেষিয়া মুছে গেছে সব!
বিদগ্ধ মাঠের বুকে অবলুপ্ত সবুজের রেখা—
আকাশ ধোঁয়াটে কালো, ধূমায়িত সূর্য্য-গ্রহ-চাঁদ;
সোনালি মুহূর্ত্ত শেষ। ইতিহাসে রক্তময় লেখা;
হতভাগ্য কবি আমি, কণ্ঠে মোর রূঢ় প্রতিবাদ!
আমার দু'চোখ ভরে জমা-করা অনন্ত জিজ্ঞাসা!
চারি দিকে দেখি আজ বিষণ্ণ করুণ আঁখি দিয়ে
পুঞ্জীভূত পাপ শুধু ঠেলে ওঠে বিষ-গন্ধ নিয়ে—
সব-স্বপ্ন মুছে গেছে! মুছে গেছে প্রেম ভালোবাসা!
এখন নিশীথ ঘোর, মৃত্যু খোঁজে ক্ষুধার্ত্ত শকুন!
নীলাভ স্বপ্নের নেশা তবু আজ ভরে দুটি চোখ!
জানি এ মুহূর্ত্ত যাবে, খসে যাবে রক্তাক্ত নির্মোক,—
ধ্বংস-স্তূপ এ-শ্মশানে মূর্ত্ত হবে পৃথিবী নতুন।

শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ

যুগান্তরের ঘূর্ণি-হাওয়ায় স্তূপীকৃত ক্লেদ
তুলেছে মাটির বুকে গ্লানিময় খেদ।
পঙ্কিল জীবনের মর্ম্মান্তিক ত্রাস—
ধ্বনিয়া তুলেছে শুধু মৃত্যুর আভাস।
বন্দী পৃথ্বী মূঢ়তার তমিস্রা বিদারি,
প্রজ্ঞা-পূত সমুজ্জ্বল আলোক প্রসারি
কোন্ গ্রহের মহিমাময় শুভ্র জ্যোতি
লিখিবে পৃথ্বীর পক্ষে আশাদীপ্ত গীতি?
পথ-হারা মানুষের নৈরাশ্যের সুর
আকাশে-বাতাসে করে বিক্ষুব্ধ বিধুর!
প্রাণের প্রাচুর্য্য দিয়ে পথের ইঙ্গিত
কে সাধিবে মানুষের সুমহান্ হিত?
ধরার ধূলায় হবে নির্ম্মল কমল?
দুঃখ-দ্বন্দ্বে প্রাণ-গর্ভ মৃত্যুঞ্জয়ী বল?
হলাহলে নীলকণ্ঠ মানব-প্রেমিক
ভরিবে অমৃতে কি সে রিক্তের বুক?

শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়

ইজারা-ঋণ

এবারকারের যুদ্ধে একটা নূতন কথা শুনিতেছি—লেণ্ড-লীজ (lend-lease)। এ কথার বাঙলা তর্জ্জমা দেখিতেছি, ইজারা-ঋণ! এই ইজারা-ঋণ কি বস্তু, বুঝিবার চেষ্টা করিব।

লেণ্ড-লীজ বা ইজারা-ঋণ আধুনিক রাজনীতিকদের বুদ্ধি-সম্ভূত। গত বারের মহাযুদ্ধে মিত্র-পক্ষীয়েরা নিজের-নিজের তহবিল হইতে যুদ্ধের ব্যয় জোগাইয়াছিলেন। এবারকারের যুদ্ধে সাহায্য-কল্পে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লোক-লস্কর আসবাব-সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু দিতেছে, তাহা এই নব-প্রবর্ত্তিত লেণ্ড-লীজ্ রীতিতে। যুদ্ধের প্রারম্ভে মার্কিণ যুক্তরাজ্য বৃটেনের সাহায্য-কল্পে যে মার্কিণ ফৌজ পাঠাইয়াছিল, সে ফৌজের জন্য গত তেরো মাসে যুক্তরাজ্যের খাশ তহবিল হইতে ব্যয় হইয়াছে দশ লক্ষ ডলার। গত মহাযুদ্ধে য়ুরোপে মার্কিণ ফৌজ পাঠাইয়া সে ফৌজের জন্য যুক্তরাজ্যের ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল আড়াইশো কোটি ডলার।

বৃটেনে এখন যে মার্কিণ ফৌজ রহিয়াছে, তাদের জন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সাত মাসে বৃটেন জোগাইয়াছে দশ লক্ষ টনের চেয়ে অনেক বেশী ওজনের খাদ্যসম্ভার; অন্য প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও মার্কিণ ফৌজের জন্য যখনই যাহা প্রয়োজন, পদস্থ অফিসার সহি-করা পত্রে চাহিবামাত্র বৃটেন তাহা জোগাইতেছে; জোগাইতে বাধ্য। সে জোগানোর ব্যাপারে যত-কিছু ব্যয়, সে টাকা দিবে বৃটেন। অর্থাৎ আমেরিকা ধার দিয়াছে মানুষ-জন—বৃটেন দিবে তাদের থাকিবার ঠাঁই এবং তাদের খাওয়া-পরা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও বৃটেন করিবে। এ ব্যবস্থায় সকলের পক্ষেই সুবিধা। কারণ, বৃটেন রক্ষা পাইলে আমেরিকা রক্ষা পাইবে; বৃটেনকে রক্ষা করায় আমেরিকার স্বার্থ আছে। রাশিয়া ও চীনকে রক্ষা করাতেও আমেরিকার স্বার্থ আছে। তারা রক্ষা পাইলে ফ্যাসিষ্টের আক্রমণ হইতে আমেরিকা রক্ষা পাইবে; কাজেই আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও চীন—পরস্পরের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই সহযোগিতার সম্পর্ক; এবং সে-সম্পর্ক অটুট করা হইয়াছে লেণ্ড-লীজ রীতিতে।

লেণ্ড-লীজ রীতি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বৃটেন এবং মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য সাম্রাজ্যের যুদ্ধের জন্য সকল দিক দিয়া ব্যয় হইতেছিল হাজার-হাজার কোটি ডলার (seven million dollars)! এ টাকার সবটুকু যাইতেছে শুধু মার্কিণ যুক্তরাজ্যে। এ টাকায় বিমানপোত-নির্ম্মাণের কাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হয়। তার পর

মোটর-কারখানায় ইংরেজের মেয়ের সঙ্গে কাজ করিতেছে মার্কিণ ও অষ্ট্রীয়ান শিল্পী
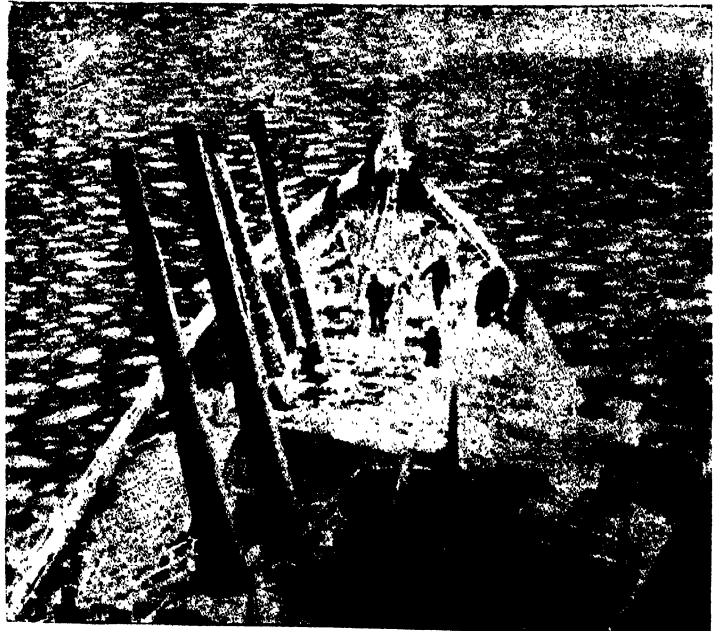
পানামা-খালে ব্রিটিশ কামান-বোট্

বৃটেনের টাকায় টান পড়িল। মার্কিণ যুক্তরাজ্য দেখিল, পর্য্যাপ্ত রসদ-পত্র না পাইলে বৃটেনের পক্ষে শত্রু দমন করা সম্ভব হইবে না, বৃটেনের বিপদ ঘটিবে; বৃটেনের বিপদে আমেরিকারও বিপদ

প্রচুর। অতএব বৃটেনকে সাহায্য-দানে তৎপরতা আবশ্যক। অথচ বৃটেনের টাকার টান্ পড়িয়াছে। উপায় ?

এ সমস্যা সমাধান করিতে লেণ্ড-লীজ বা ইজারা-ঋণ রীতির উদ্ভব। ইজারা-ঋণের আসল অর্থ—লেনা-দেনা! আমেরিকা বৃটেনকে দিতেছে জমাট দুধ; তার দাম টাকায় লইতেছে না—দাম লইয়াছে বারাজ-বেলুনে। কথাটা আরো খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

আমেরিকার কানসাস্-সিটিতে ডিম সুরক্ষিত করা হইতেছে,—এ সব ডিম যাইবে মিত্রপক্ষের ঘাঁটাতে

বাইসিকলে মার্কিণ বাহিনী—ইংলণ্ডে

আমেরিকার উপর ভার, আমেরিকা ট্যাঙ্ক গড়িয়া দিবে। বৃটেনে লক্ষ লক্ষ ট্যাঙ্ক গড়িবার লোকের অভাব। যারা গড়িবে—তারা চলিয়াছে সম্মুখ-সমরে। টাকা না পাইলে ট্যাঙ্ক গড়া চলিবে না! আবার ট্যাঙ্ক না মিলিলে বৃটেনের পক্ষে টি'কিয়া থাকা কঠিন; বৃটেন গেলে যুদ্ধের ধাক্কা সবেগে আসিয়া আমেরিকায় লাগিবে। বৃটেনকে আমেরিকা বলিল, যত চাও, ট্যাঙ্ক দিব। কিন্তু এত ট্যাঙ্ক গড়িতে বহু কারখানা চাই, বহু যন্ত্রপাতি চাই,—সে-সবের ব্যবস্থা করিতে সময় লাগিবে। তখন স্থির হইল, আমেরিকা ট্যাঙ্ক গড়িবে, বাড়তি যে কারখানা এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, সে সব দিবে বৃটেন! তার পর ট্যাঙ্ক তৈয়ারী হইলে তাহা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে! বৃটেন আমেরিকাকে ডেষ্ট্রয়ার পাঠাইল পঞ্চাশখানি। আবার উত্তর কেরোলাইন অঞ্চলে যুক্ত-রাজ্যের রশদ-পত্র এবং সৈন্যবাহী জাহাজ যাহাতে নিরাপদে পাড়ি দিতে পারে, সে জন্য বৃটেন লইল সে অঞ্চলে পাহারাদারীর ভার। অপর যে সব মার্কিণ জাহাজ পাহারাদারী করিবে, টাকার পরিবর্ত্তে সে সব জাহাজের কর্ম্মচারীদের জন্য বৃটেন জোগাইবে খাদ্য-পানীয়—মায় চা ও সুরা পর্য্যন্ত।

বৃটেনের শক্তিশালী এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট্ কামান মার্কিণের পানামা খালে পাহারাদারীর কাজ করিতেছে। এ খালের বুক বহিয়া আমেরিকা এবং বৃটেন দু'জাতেরই জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। তার উপর বৃটেন তার নিজের বুক হইতে যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও কুঠিসমেত বড় বড় বহু কারখানা উপড়াইয়া সেগুলিকে আমেরিকার বুকে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। মার্কিণ শিল্পী-শ্রমিকের দল মিলিয়া সে সব কারখানায় কামান-বন্দুক ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে। পার্ল হার্বার বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেই এ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এবং এ ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকা একেবারে সংখ্যাতিরিক্ত যন্ত্রাদি তৈয়ারী করিয়া 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সমরোদ্যত হইতে পারিয়াছে! বৃটেন হইতে তিনটি বড় বারুদখানা সরাসরি উপড়াইয়া জাহাজে তুলিয়া সেগুলিকে এক রকম অটুট দেহে ব্রুকলিনে আনিয়া বসানো হইয়াছে। তা ছাড়া বারোটি শেল-নির্ম্মায়ক প্ল্যাণ্ট—মার্কিণ

যুক্তরাজ্যকে বৃটেন দান করিয়াছে। এই বারোটি প্ল্যান্টের প্রত্যেকটিতে সপ্তাহে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার সংখ্যায় শেল প্রস্তুত হইতেছে।

বারাজ-বেলুন বৃটেনের সৃষ্টি। বৃটেন হইতে হাজার-হাজার বারাজ-বেলুন আমেরিকায় পাঠানো হইয়াছে। সে-সব বেলুন আমেরিকাকে শুধু নিরাপদ করে নাই, সে-বেলুনের আদর্শে আমেরিকাও আজ হাজার-হাজার বেলুন তৈয়ারী করিতেছে।

ব্রিটিশ ও মার্কিণ ফৌজ—জাহাজ হইতে কূলের দিকে—মরক্কোর অদূরে

রোমেলের বিরুদ্ধে অভিযানের পূর্ব্বে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া আফ্রিকার দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য বুকে বহু-বিস্তীর্ণ রেল পাতিয়া পথ তৈয়ারী করিয়া সেখানে বিপুল বাহিনী, মায় ট্রাম-ট্রেণ প্রভৃতি চালান দিতে বৃটেন যে সমর্থ হইয়াছিল, সে এই লেণ্ড-লীজ, রীতির বলে। নহিলে কুবেরের ভাণ্ডার খুলিলেও এ কাজ করা হইত না। তাছাড়া এত টাকা কোথা হইতে আসিত? টাকা আসিলেও এত লোক মিলিত কি করিয়া! ওদিকে য়ুরোপে যুদ্ধ চলিয়াছে, লোকজন সেদিক লইয়া মত্ত! তার উপর এদিকে আফ্রিকা! লেণ্ড-লীজ এ দায়ে 'বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন' হইয়াছিল।

বৃটেনে আজ সর্ব্বত্র আদেশ জারি হইয়াছে, য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রের যে-কোন স্থান হইতে মার্কিণ সমর-বিভাগ কোনো-কিছু চাহিবামাত্র আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া, আর সকল দিকে অসুবিধা ঘটাইয়াও মার্কিণ সমর-বিভাগকে অবিলম্বে সে-সব বস্তু জোগানো চাই-ই!

টেলিফোনে এমন চাওয়ার দাবী বৃটেনে নিত্য আসিতেছে মার্কিণ কর্ণেল জানাইলেন, পঁচিশ ওয়াগন-ভর্ত্তি পেট্রোল চাই কালই 'অমুক' জায়গার ডিপোয় যেন এ পেট্রোল আসিয়া পৌঁছায়

যুদ্ধ-জাহাজে মার্কিণ পাচক—হাতে নিশানা

তার পর কাল হইতে দশ দিন ধরিয়া প্রত্যহ ২৫ ওয়াগন করি পেট্রোল জোগাইতে হইবে।

মার্কিণ সমর-বিভাগ আদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত! বৃটেনকে ত রেলওয়ে-টাইমটেবলে বিপর্য্যয়-বিভ্রাট ঘটাইয়া বে-সামরিক যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া রেলওয়ে-মারফৎ পেট্রো জোগাইতে হইবে!

যুদ্ধে বৃটেনের সাহায্য-কল্পে এ বৎসর জুন মাস পর্য্যন্ত আমেরি বিশ লক্ষের উপর লোক দিয়াছে। এই বিশ লক্ষ লোকের ব্যয়-ব ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার খাশ তহবি হইতে ব্যয় হইয়াছে মাত্র পঁচিশ হাজার ডলার। অবশিষ্ট স

ব্যয়-ভার বৃটেন জোগাইয়াছে। ইহার উপর আরো বৃটেন দিয়াছে কলকব্জা প্রভৃতি উপকরণে প্রায় পনেরো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টন ওজনের জিনিষ; যে-পরিমাণ খাদ্য-পানীয় কাপড়-চোপড় সিগারেট-সাবান প্রভৃতি জোগাইয়াছে, সে সবের মোট ওজন এগারো-লক্ষ-একুশ-হাজার টন ?

সামরিক কর্ম্মচারীদের ব্যবহারার্থে খাদ্য-পানীয় হইতে সুরু করিয়া সখের জিনিষ পর্য্যন্ত—প্রধানতঃ কমিশেরিয়েট বিভাগ মারফৎ জোগানো হয়। সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের ষ্টক এ বিভাগে সংগ্রহ করিয়া জড়ো করা হয় রাজার ভাণ্ডারের মত। বৃটেনে এবং বৃটিশ সমর-ঘাঁটাগুলিতে ব্রিটিশ কমিশরিয়েট বিভাগ এমনি ভাণ্ডার খুলিয়াছে। কোনো মার্কিণ সেনা ব্রিটিশ সাবান বা পাইপ বা

মিত্রপক্ষকে আমেরিকা দিতেছে জমাট দুধ, বিশুদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত ডিম, চাজ, সংরক্ষিত (প্রিজার্ভ) মাংস এবং শুষ্ক বীন; এ সব লাগিতেছে বৃটিশ ফৌজ এবং রয়েল এয়ার ফোর্সের প্রয়োজনে। বৃটেন অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ জীলাণ্ড আবার যুদ্ধে সমুপাগত মার্কিণ ফৌজদের জন্ম বাড়ী-ঘর খাদ্য-পানীয়াদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জোগাইতেছে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা তার দেওয়া ফৌজের জন্য অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ জীলাণ্ডের নিকট হইতে নানা রকমের আহার্য্য মাংস লইয়াছে। এ মাংসের মূল্য-বাবদ আমেরিকা যুদ্ধের জন্ম ফৌজ পাঠাইয়াছে রাশিয়ায়, বৃটেনে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। নিত্য এই সব জিনিষ জোগাইবার ব্যাপারে অসুবিধা না ঘটে, এ জন্ম নিউ জীলাণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ায় বে-সামরিক অধিবাসীদের আহার্য্যের

সমর-গত মার্কিণের কুল-নারীর জামার বোতামে নিশানা

মার্কিণ সমর-বিভাগের বিভিন্ন নিশানা রচনা

ক্ষুরের ব্লেড—এ জিনিষের জন্য সে নগদ দাম দিল। এ টাকা জমা হইল গিয়া মার্কিণ ফৌজের বাজার-তহবিলে। কমিশরিয়েট-বিভাগ বৃটেনে এবং ব্রিটিশ-ঘাঁটীতে বসিয়া ব্রিটিশ-মেক্ ব্রাশ, টুথপেষ্ট, রুমাল, দেশলাই, তাস, ক্ষুর, ছুঁচ-সুতা, জুতার ফিতা, টর্চ, ফ্লাশল্যাম্প প্রভৃতি অজস্র পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে এ সব জিনিষের যে পাইকারী দর দিল, সেই দর দিয়া এত মাল জড়ো করিয়াছে যে, বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীরা প্রয়োজনানুরূপ মাল পাইতেছে না। কিম্বা পাইলেও সে সবের জন্য তাহাদিগকে বেশ চড়া দাম দিতে হইতেছে! কাজেই আমেরিকা লোক-বলে বৃটেনকে বলী করিয়া সে-বলের ভাড়া-স্বরূপ তাদের প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় বৃটেনের কাছ হইতে আদায় করিতেছে।

মাত্রা কমাইতে হইয়াছে। সেখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকে মাসে তিনটির বেশী ডিম খাইতে পান না; ছেলেরা স্কুলে যে-দুধ খাইত তাদের সে দুধ খাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে; এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিলাণ্ডে চাষ ও দুধের ব্যবসায়কে সমুন্নত করিয়া তোলা হইয়াছে। তার ফলে এ দুই প্রদেশে কৃষিজাত শস্যাদির উৎপাদন বাড়িয়াছে চার গুণের উপর; গোবৎস-পালনেও তাহাদের তৎপরতা বহু গুণ বাড়িয়াছে। বৃটেনকে আমেরিকা খাদ্যশস্য জোগাইতেছে; কারণ বৃটেনের পরিসর অল্প; তার উপর সেখানকার জন-শক্তি আজ যুদ্ধে নিয়োজিত; খাদ্য-শস্য-উৎপাদনে সে শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। অনুরূপ-পরিমাণ খাদ্য না জোগাইলে বৃটেনের পক্ষে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে; এ জন্ম এই লেণ্ড-লীজ

রীতিতেই বৃটেনকে আজ আমেরিকা আংশিক ভাবে তার খাদ্য জোগাইতেছে।

আলু এবং বাঁধা কপি পুষ্টিকর। আলু এবং বাঁধাকপি অজস্র প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারিলে খাদ্য-সমস্যার অনেকখানি সমাধান সম্ভব হয়। এ জন্য এ দু'টি জিনিষের ফলন বাড়ানো

জাহাজের কারখানা-রক্ষায় ব্রিটিশ বারাজ-বেলুন—কালিফোর্ণিয়া

হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও স্কটলাণ্ডে চার্চ্চ-সংলগ্ন সমগ্র খোলা জায়গায় আলু ও বাঁধা কপির চাষ চলিয়াছে। গল্‌ফ খেলার মাঠে আজ আর গল্‌ফের বল লইয়া খেলা চলে না; সে সব মাঠে আলু এবং বাঁধা কপির প্রচুর ফসল ফলিতেছে। মাঠে-বাটে কোথাও আর এতটুকু পড়ো জমি খালি পড়িয়া নাই! সেখানে যত পড়ো জমি ছিল, সর্ব্বত্র খাদ্য-শস্যাদির চাষ চলিয়াছে। বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য হইতে বেশীর ভাগ খাদ্য আজ বৃটেনে-অবস্থিত মার্কিণ ফৌজের সেবায় ব্যবহৃত হইতেছে! রেশনিংয়ের ব্যবস্থায় বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীরা প্রত্যেকে এখন পান মাসে তিনটি করিয়া ডিম; সপ্তাহে আড়াই পাইট দুধ, দু' আউন্স চা, পাঁচ পোয়া মাংস, চার আউন্স চীজ এবং টিনে ভরা ফল ও মাংস প্রভৃতি। ইজারা-ঋণে সর্ত্ত হইয়াছে, য়ুরোপের সমরাঙ্গনে যে সব মার্কিণ সেনা

মার্কিণের পাঠানো খাদ্যে বৃটিশ ছেলেমেয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তি

মার্কিণ ফৌজ ও ব্রিটিশ পানীয়

যুদ্ধ-রত থাকিবে, তাদের জন্য বৃটেনকে খাদ্য জোগাইতে হইবে বছরে দু' লক্ষ টন ওজনের খাদ্য। উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর হওয়া চাই।

ফৌজের খাওয়ার খরচ-বাবদ আমেরিকার এক কপর্দ্দক ব্যয় নাই। তার উপর আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক বাহিরে যুদ্ধ করিতে

ওরানে ব্রিটিশ-ও-মার্কিণ বাহিনীর মিলিত অভিযান

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। এ সম্মেলনে সৈন্য এবং মাল-পত্র ছিল প্রধানতঃ আমেরিকান; ৫০০ মাল ও রসদ-পত্রবাহী জাহাজ ও ৩৫০খানি যুদ্ধ-জাহাজ ছিল বৃটেনের। এ অভিযানে বৃটিশ ও আমেরিকান সেনা প্রথম এই পাশাপাশি অবস্থান করিয়াছে। এ অভিযানে যিনি নৌ-বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন, তিনি বৃটিশ কমাণ্ডার। এ-বাহিনী ওরানে নামিয়াছিল। ওরানকে গড়িয়া তুলিতে বৃটেন দিয়াছিল দু' হাজার মাইল-ব্যাপী ইলেকট্রিকের তার, পাঁচ লক্ষ এ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক মাইন, চার হাজার সাবমেরিণ-গান। ফৌজদের থাকিবার গৃহগুলিও বৃটেন তৈয়ারী করিয়াছিল।

মার্কিণ সেনা প্রথম যখন বৃটেনে গিয়া নামে তখনো যুদ্ধ ছিল জটিল সমস্যার মত। বৃটেনের কোথাও এতটুকু স্থান ছিল না বাহিরের লোক যেখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে। জার্ম্মাণ বোমার ঘায়ে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; তার উপর বিপন্ন বিধ্বস্ত বহু প্রদেশ হইতে বহু লোক আসিয়া বৃটেনে আশ্রয় লইয়াছে, কাজেই একান্ত স্থানাভাব। মার্কিণ বাহিনী যে আসিল, তারা কোথায় থাকিবে? এত লোককে স্থান দিবার মত গৃহ বৃটেনে নাই! শুধু গৃহ নয়, এত লোককে খাওয়ানো-পরানো—অর্থাৎ তাদের মানুষের মত রাখা চাই! কোন মতে মাথা গুঁজিবার যোগ্য আশ্রয় রচনা

মাঠে-বাটে মার্কিণ-ফৌজের আশ্রয়-নীড়—বৃটেন

গিয়াছে, সে জন্যও আমেরিকার প্রচুর খাদ্য বাঁচিতেছে। যে খাদ্য বাঁচিতেছে, তাহা হইতে ইজারা-ঋণ-রীতিতে আমেরিকা বৃটেনকে জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি দিতেছে।

ছোট-বড় সদাগরী জাহাজ লইয়া বৃটেনের প্রায় ২৫০০ জাহাজ সর্ব্ব সময়ে সমুদ্র-বক্ষে বিরাজ করিতেছে। মাল-পত্র সমেত এ সব জাহাজের যাত্রা নিরাপদ করিতে রণতরী ও এয়ার-ক্রাফ্‌টের প্রয়োজন। তার উপর বৃটেনের প্রায় ৩০০ যুদ্ধ-জাহাজও সব সময়ে সাগর-বক্ষে ইতস্ততঃ বিরাজমান—পাহারাদারীর কাজে বৃটেনের এয়ার-ক্রাফ্‌টের ও রণতরীর সহিত মার্কিণ এয়ার-ক্রাফ্‌ট এবং রণতরীও আজ সংযোগিতা করিতেছে।

ইজারা-ঋণ-রীতির প্রবর্ত্তন-হেতু গত বৎসর নভেম্বর মাসে উত্তর-আফ্রিকায় মার্কিণ ও বৃটিশ বাহিনীর সম্মিলিত আবির্ভাব

করিতেও লোকবলের প্রয়োজন। বৃটেনের পুরুষ-শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৭০ জন যুদ্ধে গিয়াছে—অথবা সমরায়োজনে ব্যাপৃত, তাহাদের কাহারো অন্য দিকে চাহিবার অবসর নাই। স্ত্রীলোক, ষাট বৎসরের বৃদ্ধ, কিম্বা পনেরো বছর ও তন্নিম্ন বয়সের বালক-বালিকারাই শুধু খালি হাতে আছে! তখন যাহাদের সামনে পাওয়া গেল, তাহাদিগকে লইয়াই মার্কিণ ফৌজের আশ্রয় রচনার ব্যবস্থা হইল। মার্কিণ সেনাদের মধ্য হইতে শতকরা চৌষট্টি জন আসিয়া যোগ দিল এই নীড় রচনার কাজে। এ কাজের জন্য বৃটেনের ব্যয় হইল সপ্তাহে প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার হিসাবে। অচিরে হাজার হাজার ব্যারাক, সাপ্লাই ডিপো, বিমান কেন্দ্র, নূতন পথ, রেলোয়ে লাইন এবং বহু হাসপাতাল নির্মিত হইল। সে সব হাসপাতালে খাটের সংখ্যা মোট নব্বই হাজার। এ নির্মাণ-কার্য্যে বৃটেনের ব্যয় হইল দু'কোটি ডলার। নির্মাণ-কার্য্য হইল আমেরিকার নির্দ্দেশ অনুযায়ী।

মার্কিণ সেনাদের বাইসিকলের প্রয়োজন ঘটিল। এক সপ্তাহের মধ্যে ১৩০০০ বাইসিকল গেল মার্কিণ সামরিক বিভাগ হইতে। বৃটেনের বে-সামরিক অধিবাসীরা তাঁদের নিজেদের ব্যবহারের গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সে সব গাড়ী গেল মার্কিণ-ফৌজের সুবিধা-কল্পে। বিশেষ কোন কারণ ব্যতিরেকে বৃটেনে এখন বে-সামরিক অধিবাসী-দিগের মধ্যে কেহ মোটর চড়িতে পারেন না,—বিধি হইয়াছে। আমেরিকার যে-বাড়ী হইতে পুরুষরা যুদ্ধে গিয়াছে, সে-বাড়ীর মেয়েদের বোতামে বিশেষ 'নিশানা' আঁটিয়া তাঁদের 'চিহ্নিত' করা হইতেছে। তাঁরা বিশেষ কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিতেছেন—এ সুবিধা করা হইয়াছে নূতন মার্কিণ বিধানে।

ইজারা-ঋণ-রীতির কল্যাণে আমেরিকা এক দিক দিয়া প্রচুর ভাবে লাভবান হইয়াছে—সে দিক ব্রিটিশ আবিষ্কার (inventions) এবং শিল্পকলার টেকনিকের দিক। আজ আত্ম-রক্ষার জন্য বৃটেন তার নানা বৈজ্ঞানিক তন্ত্রমন্ত্রের বহু সাধনা-লব্ধ গোপন রহস্য আমেরিকাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। ট্যাঙ্ক, ম্যাগনেটিক মাইন, বিস্ফোরক, সাবমেরিনের লীলা-রহস্য,—এ সবের খুঁটিনাটি তত্ত্ব শুধু বৃটেনের মজ্জাগত ছিল, সৌখীন আমেরিকা এ সব তথ্যের ধার ধারিত না; বৃটেন আজ স্বার্থরক্ষা করিতে সে সব তথ্যের তত্ত্ব আমেরিকাকে শিখাইয়াছে। লেণ্ড-লীজ বা ইজারা-ঋণের জন্য মিত্রপক্ষীয়কে অর্থবলে, লোক-বলে এবং রসদের বলে দুর্দ্ধর্ষ বলীয়ান করিয়া তোলা হইয়াছে। এ যেন মাটী খুঁড়িয়া সকলে মিলিয়া সেই খোঁড়া মাটীর বুকে এক-বাটি বা এক-বালতি করিয়া,—অর্থাৎ যার যেমন সামর্থ্য—জল আনিয়া ঢালিয়া দীঘিকে জলপূর্ণ করা! জলে ভরিয়া উঠিলে এ-দীঘি পিপাসার বারি-দানে সকলকে তৃপ্ত করিবে,—জলের কল্যাণে পিপাসায় কেহ মরিবে না, সকলে বাঁচিতে পারিবে! তেমনি সকলের মিলিত শক্তি আজ এ-সব জাতির জীবন রক্ষা করিবে; এ জীবন-রক্ষার মর্ম্ম বিজয়-লাভ! সেই এক-লক্ষ্য স্থির অবিচল রাখিয়া আমেরিকা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জীলাণ্ড, রাশিয়া ও চীন যে ভাবে আজ মিলিত হইয়াছে, সে-মিলন পুরাণের অষ্টবজ্র-সম্মিলনের মত জয়-যুক্ত হউক!

আবাহন

শতাব্দীর কালচক্রে বক্ষে ধরি লক্ষ অপমান
ফেলেছি অনেক শত্রু, জন্ম জন্ম বেদনার গান
ভীরুতা এনেছে শুধু আনে নাই তোমার বারতা
সঙ্কীর্ণ বিজন পথে ওগো বন্ধু, তুমি আজ কোথা!

মনে পড়ে এক দিন সঙ্গিহীন ঝঞ্চাক্ষুব্ধ রাতে
ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে পরিচয় হলো তব সাথে;
সে দিন তোমার মূর্ত্তি এনেছিল ক্ষণিক বিস্ময়
চূর্ণ করি পশ্চাতের সব দ্বন্দ্ব সব দ্বিধা-ভয়!

তার পর প্রভাতের রক্তরাগ, শান্ত সৌম্য হাসি
তোমারে মুছিয়া দিল—তন্দ্রাতুর রাখালের বাঁশী
উদ্দীপ্ত স্নায়ুর মাঝে আনিয়াছে হতাশার সুর,
নির্লিপ্ত জীবন-ছন্দে কোথা আজ তোমার ডমুর?

প্রেম নয়, আশা নয়, বিদ্রোহীর মৃত্যু দাও আনি,
কল্পনার রাজ্য হতে মসীলিপ্ত অন্ধকারে টানি
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জড়ত্বের নির্ম্মম বিদ্রূপে,
চূর্ণ করি আমাদের সৃষ্টি করো নবতম রূপে!

মৃত্যুরে বরণ করি আশা ছিল হবো মৃত্যুঞ্জয়!
মেটেনি বাসনা কভু, মনে তবু জাগিছে সংশয়,
কোন্ দুর্নিবার শক্তি রাখিয়াছে বিস্মৃতির ডোরে
সৃষ্টির রহস্য-মাঝে আমাদের সৃষ্টি-ছাড়া করে!

দুখের অমোঘ মন্ত্রে উদ্দীপিত অনন্ত নির্ব্বাণ
আকণ্ঠ অমৃত সম একবার করি শুধু পান
লুপ্ত যদি হয় হোক আমাদের জীর্ণ পরিচয়—
সে মৃত্যু অনেক ভালো—ভয় করি স্বাভাবিক ক্ষয়!

মুক্তি চাই, চির-মুক্তি শোষণের অতি জীর্ণ স্তূপে
মুমূর্ষু জাতির অশ্রু অভিশপ্ত প্লাবনের রূপে
আঘাত করুক আসি, আবর্ত্তিয়া মহা ঊর্ম্মি তার
মৃত্যু-ভয়-ভীত কণ্ঠে ভাষা দিক তব বন্দনার!

শ্রীঅমর ভট্ট

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৩৪

অমিয় আসিয়াছে শীকারের নিমন্ত্রণে।

সুশীল ইভা এবং অমিয় চা খাইতে বসিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে সুশীল কহিল,—কাল তা হলে বেরুনো যাবে। আজ দশটার ট্রেণে কল্পনাও আসছে।

ঈষৎ খিন্নিত হইয়া অমিয় প্রশ্ন করিল,—সে আসছে না কি?

সুশীল কহিল,—নিশ্চয়! হ্যাঁ, ভালো কথা, সেদিন তোমাদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে তোমাকে পাবো ভেবেছিলুম; কিন্তু শুনলুম, দু'টোর গাড়ীতে তুমি চলে গেছ। কিসের এত তাড়া ছিল হে?

অমিয় উত্তর দিতে যাইতেছিল, ইভা কহিল,—আর এক জনকেও আমরা দেখতে পেলুম না মিষ্টার গোস্বামী!

অমিয় কহিল,—আর এক জনটি কে?

সুশীল হাসিয়া কহিল,—যার বিদায়-ব্যথা সইতে পারবে না বলে আগেই তুমি পালালে,—সেই মিস্ বোস্!

সহাস্যে অমিয় কহিল,—ধন্যবাদ সুশীল! তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার দেখে তোমাকে তারিফ করছি।

ইভা কহিল,—কেন, তিনিও তো ছিলেন না!

অমিয় কহিল—তিনি না থাকতে পারেন! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার চলে আসার কোন সম্পর্ক ছিল না।

অমিয়র পরিহাস-তরল কণ্ঠ শেষের দিকে কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিল।

স্বামি-স্ত্রী চকিতে দৃষ্টি-বিনিময় করিল। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি একটু জোরে হাসিয়া কহিল,—স্যরি! এমন একটি কথা ভেবেছিলুম সে জন্যে—কিন্তু যাক, তোমায় শুভ আনন্দ-সংবাদ জানাচ্ছি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অমিয় চাহিল।

সুশীল কহিল,—কল্পনা শীগ্‌গির তোমার খুব নিকট-আত্মীয় হবে! অর্থাৎ অনিলকে আমরা নিজের করে পাবো।

সহাস্যে অমিয় কহিল,—খুশী হলুম! এত দিন বন্ধুত্ব ছিল, এবার আত্মীয়তায় জড়িত হবো! ভগবান্ এ মিলনকে মধুময় করুন!

দশটার সময় কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগিনীকে একা দেখিয়া সুশীল কহিল,—অনিল?

—তার আসবার কথা ছিল, বন্দোবস্তও তেমান হয়েছিল! হঠাৎ বললে, জরুরী কাজ।

আশ্চর্য্য স্বরে সুশীল কহিল,—আদালত তো বন্ধ—পূজা ভেকেসন্।

অপ্রসন্ন মুখে কল্পনা কহিল,—আমি কি তার কাজের হদিস্ রাখি! বোধ হয় রত্নাকে ট্রেণে তুলে দেবে বলে আসতে পারলে না। বলিয়া কটাক্ষে সে অমিয়র পানে চাহিল।

অমিয় কোন জবাব দিল না! সামনের বাগানের দিকে যেমন চাহিয়া ছিল, তেমনি নিরুৎসাহ মুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু রত্নার প্রসঙ্গ উঠিতে আর-এক জন মানুষ স্থির থাকিতে পারিল না—সে ইভা। কৌতূহলী কণ্ঠে ইভা কহিল,—তোমাদের থিয়েটার খুব ভালো হয়েছিল!

কল্পনা কহিল,—নিশ্চয়। বলিয়া প্রফুল্ল মুখে অমিয়র পানে চাহিল, কহিল,—জানেন মিষ্টার গোস্বামী, এক-রাত্রে চার হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে।

অমিয় একটু হাসিল। বলিল,—তাই না কি! খুব ভীড় হয়েছিল তো?

উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—নিশ্চয়! যাকে বলে ফুল হাউস! সমস্ত টিকিট আগে থেকে বুক হয়ে গিয়েছিল। আপনি কাগজে পড়েননি—অভিনয় সম্বন্ধে যা লিখেছিল?

ঔদাস্য-সহকারে অমিয় কহিল,—চোখে পড়েছিল। তেমন ভালো করে পড়া হয়নি।

বিদ্রূপের ছোট একটা খোঁচা দিয়া কল্পনা কহিল,—কিন্তু—কিন্তু আপনি নাট্যকার!

হাসিয়া অমিয় কহিল,—নাট্যকার হতে পারি—কিন্তু "নট" নই।

ইভা উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল,—কাগজে দেখলুম, সব চেয়ে রত্নার অভিনয়ই ভালো হয়েছে।

তাচ্ছল্যের স্বরে কল্পনা কহিল,—উর্ব্বশীর ভূমিকাতে ও ভালো পারে বটে, আর বইখানা "বিক্রম-উর্ব্বশী"। ওকে নিয়েই তো সব!

সুশীল কহিল,—তোমরা তো ভূমিকা নির্ব্বাচন করেছিলে, বদল করে নিতে পারতে!

কল্পনা হাসিল। কহিল,—আহা, দাদা তুমি ভুল করছো। রত্না উর্ব্বশীর ভূমিকাটা ভালো করে। কাজেই ওকেই সবাই সেটা দিতে চাইলে! তা বলে রাণীর পার্ট দিলে ও পারতো কি? কাজেই সে পার্ট আমায় নিতে হলো। এই যেমন পারুলদি, কত ভালো প্লে করে—তবু আজ তার নাম চাপা দিয়ে সবাই রত্না-রত্না করছে!

সুশীল প্রশ্ন করিল,—অনিল কেমন প্লে করলে? সে তো বিক্রম সেজেছিল?

কল্পনা কহিল,—ভালোই। বলিয়া অমিয়র পানে তাকাইয়া কহিল,—আপনার অর্জ্জুনের মত সাকসেস্‌ফুল কেউ হতে পারেনি কিন্তু!

সুশীল সোৎসাহে কহিল,—হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। যেমন উর্ব্বশী, তেমনি অর্জ্জুন! অনেক অভিনয় আমি দেখেছি অমিয়, কিন্তু এমন জীবন্ত অভিনয় অতি অল্পই দেখেছি। অভিসারে উর্ব্বশীর ব্যর্থতা—তোমরা তার যে-অভিনয় করলে, মনে হলো, কল্পনার রাজ্য ছেড়ে সত্যকার মাটীতে যেন পা দিলে! মিষ্টার বাক্‌চিকে তো ধরে রাখা দায়! ষ্টেজের দিকে ছুটেছে—বলে, দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো আমি। মিসেস্ গোস্বামীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

ইভা কহিল,—বাস্তবিক উর্ব্বশীর অভিসারে অর্জ্জুনের মুখের ছবি যেন জলদ-জালে ঢাকা আকাশ! কবিরা যেমন বর্ণনা করেন! আর সে-মেঘে বিদ্যুৎ ওই উর্ব্বশী! উঃ, আমার বুকখানা কেঁপে উঠেছিল!

সুশীল সোল্লাসে কহিল,—ব্রাভো ইভা, তোমার উপমার

আমি তারিফ করি। সত্যই একটা জল-ভরা মেঘ! যেমন স্নিগ্ধ কোমল—সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, তেমনি ভয়ানক ভীষণ—সব লয় করে! আর তারই বুকের শোভা সৌদামিনী! কি চঞ্চল, কি দীপ্তিময়ী! ধ্বংসকারী অথচ কত মনোরম!

অমিয় হাসিল; কহিল,—ভাগ্যে আদালত বন্ধ সুশীল! না হলে এমনি কাব্য-উচ্ছ্বাস নিয়ে যদি রায় লিখতে!

হাসিয়া সুশীল কহিল,—যেমন কেউ কেউ রায়ও লেখেন-আবার নাটকও রচনা করেন!

উভয় বন্ধু হাসিয়া উঠিল।

ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া কল্পনা কহিল,—বৌদি, তুমিও কি দাদার সঙ্গে শীকার করতে যাবে?

ইভা কহিল,—না ভাই! দ্বিপদই আমি শীকার করি! তোমাদের মত চতুষ্পদ শীকার করতে গেলে আমার বুক কাঁপে। অমন করে তোমার মত বন্দুক ধরবার আগেই আমি মূর্চ্ছা যাবো।

অমিয় কহিল,—কল্পনাও যাবে না কি?

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কল্পনা কহিল,—তবে কি এখানে থিয়েটার দেখতে এসেছি?

অমিয় হাসিল। কহিল,—না, তা আসোনি! আমি ভেবেছিলুম, দাদার কাছে বুঝি নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা ভোগ করতে এলে!

হাসিয়া ইভা কহিল,—ঠিক বলেছেন! রাণী সেজে বিক্রমকে উর্ব্বশীর হাতে দিয়ে এলেন! মিষ্টার গোস্বামী যদি বলেন, ভাঙা মন জোড়া দেবার জন্ম বনৌষধি খুঁজতে এসেছ, তা হলেও দোষ দেওয়া যায় না।

কল্পনার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল।

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। বন্ধুর পানে চাহিয়া কহিল,—চলো, ওদিক্‌কার ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।

সুশীল কহিল,—চলো, দু'টো হাতীও জোগাড় করা গেছে! এবার আমরা দলে হয়েছি আট জন। দলটি মন্দ হয়নি, কি বলো?

কল্পনা ইভাকে অভিবাদন জানাইয়া বন্ধুদ্বয় উঠিয়া গেল।

শীকারের সরঞ্জাম নাড়াচাড়া করিতে করিতে অমিয় সুশীলকে প্রশ্ন করিল,—কল্পনা কখনো বাঘ মেরেছে?

সুশীল উত্তর দিল,—না। নীল গাই মেরেছে, হরিণও অনেক মেরেছে! খুব ছোট বেলা থেকে ওর এদিকে ঝোঁক। বলিয়া বন্ধুকে নীরব দেখিয়া পরক্ষণে কহিল,—তুমি বুঝি আবার মেয়েদের শীকার পছন্দ করো না?

অমিয় কহিল,—আমার জন্ম ভাবনা নেই! অনিল ভালোবাসে।

সুশীল কহিল,—অনিল থাকলে বেশ হোত! অনিল যাবে বলেই আমি কল্পনাকে আসতে লিখেছিলুম।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল,—তোমার ইভা বেশ।

সুশীল হাসিল। হাসিভরা মুখে কহিল,—হ্যাঁ, ওর মধ্যে বিত্তের ঝাঁজ নেই! আর মনটা খুব নরম। আমার হাতে পড়ে মেম্ সেজেছে, না হলে দেশী! আর হবেই বা কি করে? ওর বাবা মা ছিলেন একেবারে সে-কেলে। আমার বিলেত যাবার আগেই বিয়ে হয়েছিল। তখন দু'জনেই ছিলুম ছোট। ইস্, ফিরে এসে সে কি গণ্ডগোল! ওর ঠাকুরদা বলেন, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো। আমি বলি, দায়ে পড়েছে—রইলো আপনার নাতনি! কথাটা বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তার পর কহিল,—কিন্তু তোমাদের তেমন দুর্ভোগে পড়তে হবে না! তোমাদের সংসার বেশ! আমার আনন্দ হয়, হিংসাও হয়!

অমিয় কোন উত্তর দিল না। অলক্ষ্যে শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। মনে হইল, যেখানে অপরে তৃপ্তি অনুভব করে, সেইখানেই সে বিড়ম্বনা ভোগ করে! কেন এমন হয়? কাহার দোষ? তাহার? না, যে বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার?

অমিয় বন্দুকগুলা খুলিয়া পরাইতে লাগিল।

৩৫

সারা গ্রামে দু'খানি মাত্র প্রতিমা উঠিত। একখানি জমিদার-বাড়ীতে; অপরখানি মধু নন্দী আড়তদারের গৃহে। তথাপি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে মা আসিবেন বলিয়া আনন্দ-উৎসাহের সীমা থাকিত না! সারা বৎসরের প্রতীক্ষিত মাতৃ-আগমন—বাঙ্গালা দেশের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত উল্লাস জাগে—আনন্দের কল্লোল বহিয়া যায়। যাহারা প্রবাসে থাকিয়া স্নেহ-মুখগুলি স্মরণ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই পূজাবকাশে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহার যেমন সাধ্য তেমনি উপচার দিয়া স্নেহ-ভাজনদের আনন্দ, প্রিয়জন ও গুরুজনদের তুষ্টি সাধন করিতেছে। যাহার ঘরে কিছু নাই, সেও মাগিয়া পাতিয়া এই ক'টা দিনের জন্ম গৃহে ভালো-মন্দ কিছু করিতেছে! তাহাদের দুঃখ-মলিন মুখেও আজ একটু আনন্দের আলো ফুটিয়াছে।

রত্না পূজার ছুটীতে দেশে ফিরিয়াছে।

রমেশের ক'দিন ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হইয়াছিল। কন্যাকে আনিতে যাইতে পারেন নাই। গোস্বামী সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়া রত্নাকে দেশে পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি বাধিত হইবেন।

চিঠি পড়িয়া অনিল কহিল,—বেশ তো বাবা, আমি রত্নাকে রেখে আসছি। আমাদের মোটরে যাবো, ওদের দেশ-শুদ্ধ লোকের তাক লাগবে'খন।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বেশ, তাই যাও। অমনি আমার মামার বাড়ীটাও ঘুরে এসো। মা আর বড়-মামা—দু'মাসের ব্যবধানে গত হবার পর আমি আর সেখানে যাইনি।

উৎসাহে অনিল লাফাইয়া উঠিল, এমনি কলকণ্ঠে কহিল—তাই যাবো। কিন্তু তাঁরা কি আমায় চিন্‌তে পারবেন?

গোস্বামী সাহেব উত্তর দিলেন,—না চিন্‌তে পারলেও আমার নাম হবে তোমার পরিচয়।

কথাটা রত্নার কাণেও উঠিল। কিন্তু মন তাহাতে আনন্দে ভরিল না! সে দ্বিধায় পড়িল! এই সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে সে তার পিতৃ-গৃহ দেখাইবে কি করিয়া? লজ্জা হয়! তাই ম্লান, ম্রিয়মাণ মুখে সে মৌন রহিল।

অনিল মহা কৌতুকে রত্নার মুখের পানে চাহিয়া ছিল,—রত্নার এই কুণ্ঠায় সে আনন্দ বোধ করিল। সহাস্যে কহিল,—বেশ, আমার সঙ্গে না যাও, বাবাকে বলছি। কিন্তু তুমি সারা পথ গাড়ী

চালাতে পেতে! নতুন বিদ্যা শিখেছ—কতটুকুই বা! ভুলতে দেরী হবে না।

গাড়ী চালানোর লোভ রত্নার পক্ষে সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। মাতালের কাছে সুরা যেমন লোভনীয়, সব দ্বিধা সব সঙ্কোচ ভুলিয়া সে যেমন সুরাপাত্রের লোভে হাত বাড়ায়, রত্নার মনের অবস্থা তেমনি!

অন্তরের সমস্ত অনিচ্ছা বাতাসে-উবিয়া-যাওয়া কর্পূরের ন্যায় মনের গহনে মিলাইয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছ, দেশের ভাইবোনদের জন্য কিছু কিনেছ?

গ্রীবা হেলাইয়া রত্না জানাইল, না।

স্নেহ-হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অনিলের সঙ্গে বাজারে গিয়ে কিছু খেলনাপত্র কিনো—পূজোর সময় যাচ্ছ!

বোধ করি, পূজা বলিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় কোনো পুরানো স্মৃতির দোলায় বিচলিত হইতেছিল! তাই তিনি অকস্মাৎ অত্যন্ত সদয় হইয়া রত্নার প্রতি সহসা উদার হইয়া পড়িলেন।

আনন্দে বিভোর রত্না সুদীর্ঘ পথে পাড়ি দিয়া মোটর হাঁকাইল। গ্রামে ঢুকিবামাত্র অনিল কহিল,—রত্না, তুমি ভিতরে এসো এবার। আমি গাড়ী হাঁকাই। কারণ, এটা তোমাদের পাড়াগাঁ।

রত্না বুঝিল, কথাটা সঙ্গত। বিনা-প্রতিবাদে গাড়ী থামাইয়া শীট বদলের জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সহসা অনিল রত্নার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। আবেগের স্বরে ডাকিল,—রত্না!

রত্নার চোখ-কাণ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া আসিল! ধপ্ করিয়া সে অনিলের পাশে বসিয়া পড়িল।

রত্নার হাতখানার উপর মৃদু চাপ দিয়া অনিল কহিল,—কত দিন তোমায় দেখতে পাবো না রত্না! কে জানে, এই আমাদের শেষ দেখা কি না! অনিলের দৃষ্টি মলিন।

সেই মলিন দৃষ্টির পানে চাহিয়া আবিষ্টের মত রত্না অনিলের কাঁধের উপর মাথা রাখিল।

সেই মুহূর্ত্তে দু'টি পল্লী-বালক অদম্য কৌতূহল লইয়া সহরের হাওয়া-গাড়ীকে অচল দেখিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সেই নিশ্চল গাড়ীখানার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার রূপসুধা পান করিতে গিয়া সজ্জিত দুইটি মনোরম নর-নারীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি রত্নার উপর নিবদ্ধ হইল। এক জন অপরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—দেখ্ ভাই, মেম্-সাহেবের মুখখানা ঠিক হেড্-মাষ্টার মশায়ের মেয়ের মত।

ত্রস্তে অনিল ও রত্না নিজেদের সম্বৃত করিল।

অনিল নামিয়া গাড়ীর পিছনের দরজা খুলিয়া দিল; এবং রত্না পিছনের শীটে বসিবামাত্র দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সোফারের আসনে বসিয়া সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

বিস্ময়-ব্যাকুল ছেলে দু'টো কি বলাবলি করিতে লাগিল। সে দিকে কাণ না দিয়া অনিল গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

গাড়ীর অভ্যন্তরে সুকোমল গদির উপর মাথা রাখিয়া আগুনের তাপ-লাগা বিবর্ণ ফুলের মত ম্লান মুখে চক্ষু মুদিয়া রত্না আড়ষ্ট পড়িয়া রহিল। সমস্ত মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। কাণে গিয়াছিল সেই কথা—হেড্ মাষ্টার মশায়ের মেয়ের মত না? এই একটি কথা তাহার সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল! অবসাদের মত দুর্নিবার লজ্জা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, ক্ষুব্ধতার মধ্যেও রত্নার মনে জাগিল অমিয়র পিঠের উপর যে-দিন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়াছিল, চিত্ত ব্যথিত হইলেও মন সে-দিন নিমেষের জন্য এতখানি লজ্জা অনুভব করে নাই! নির্জ্জন কক্ষে একা বসিয়া যতই সে ভাবিয়াছে, অমিয়র স্কন্ধে মাথা রাখিয়াছে, তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে—সে মধুর স্পর্শ ততই সারা দেহে পুলক শিহরণ জাগাইয়াছে! কিন্তু আজ নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত অনিলের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া তাহার তপ্ত ঘন শ্বাস নিজের মুখের উপর অনুভব-মাত্র বাহ্য-জ্ঞান-হারার ন্যায় আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিতেছিল! সে মুহূর্ত্তে হেড্ মাষ্টার মশায়ের মেয়ে—এই কথাটুকু সপাৎ করিয়া চাবুকের মত পলকে তাহার সম্বিত ফিরাইয়া দিল! তখন ক্লেদসিক্ত দেহের মত অন্তর-বাহির শুধু গ্লানির অস্বস্তিতে পীড়িত হইতে লাগিল! কেন? কেন?

গাড়ী ছুটিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া অনিল কহিল,—রত্না, তোমাদের পাড়াটা?

ঝাঁকানি খাইয়া ঘুম-ভাঙ্গার মত রত্না চকিত হইয়া কহিল—এই পুকুর-পাড়ের পাশ ধরে যাও। ওই শিব-মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটে ছাড়িয়ে তার পর আমাদের বাড়ী।

রত্নার নির্দ্দেশ-মত গাড়ীর গতি হ্রাস করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রত্নাদের গৃহদ্বারে আসিয়া অনিল থামিল।

হরিশের ছেলেমেয়েরা অঙ্গনে ছুটাছুটি করিয়া চোর-চোর খেলিতেছিল। ভিতরে রান্নাঘরে বসিয়া অমলা নারিকেল-নাড়ুর তাড়া নাড়িতেছিলেন।

দরজার সামনে একখানা ঝক্‌ঝকে বড় গাড়ী দেখিয়া বালকের দল ছুটিয়া আসিল। অনিল তখন গাড়ী হইতে নামিয়া রত্নার দিক্‌কার দরজা খুলিতেছে।

—ও মা রত্না-দি! ও জ্যাঠাইমা, রত্না-দি এসেছে।

মহা হট্টগোলে সংবাদটা জ্যা'ঠাইমার কর্ণ-গোচর করিতে তাঁহারই উদ্দেশে সকলে ছুটিল। এক অমলা দুম্ করিয়া কড়া নামাইয়া মাথায় কাপড় তুলিতে তুলিতে সদর অন্দরের মধ্যস্থলে আসিয়া থমকিয়া গেলেন।

মোটরের দরজা খুলিয়া কে এক জন সাহেববেশী অপরিচিত লোক মেয়ের হাত ধরিয়া তাকে নামাইল।

—অনিল-দা, ভিতরে এসো। বাঃ! বলিয়া অঙ্গনে পা দিয়া থামের আড়ালে মাকে দেখিয়া রত্না ছুটিয়া সেই দিকে গেল এবং দুই হাতে হতবাক্ মাকে জড়াইয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে কহিল,—আমি এসেছি মা। অনিল-দা এসেছে। বাবা কোথায়?

চাপা গলায় মা কহিলেন,—হাটে গেছেন সব কিনতে। বলিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া মেয়েকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে, গোস্বামী সাহেবের ছেলে?

—হ্যাঁ মা! বলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া রত্না প্রশ্ন করিল,—তুমি সামনে বেরুবে না?

মা দ্বিধায় পড়িলেন, কহিলেন,—বেরুনো কি ঠিক হবে ?

জিদের সুরে রত্না কহিল,—কেন হবে না ? মাসিমা তো বাবার সামনে বার হন, কথা কন্।

ব্যস্ত হইয়া অমলা কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ততক্ষণ ওকে বাইরের ঘরে বসা। আমি চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করি। বলিয়া ত্বরিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রত্না ফিরিল, অনিলের কাছে আসিতেই অনিল কপট অনুযোগের সুরে কহিল,—তুমি বেশ রত্না ! আমাকে সদরে দাঁড় করিয়ে রেখে চো-চা'দৌড় !

লজ্জা-রাঙা মুখে আমতা-আমতা করিয়া রত্না কহিল,—মার সঙ্গে কথা কইছিলুম।

—মা ! মাসিমা বুঝি আমার সামনে বার হবেন না ? অনিল হাসিল।

রত্না অপ্রতিভ হইল। কহিল,—বাঃ, তাই কি বলেছি ? বলিয়া পিতার বসিবার ঘরে অনিলকে লইয়া আসিল।

বাড়ীর মধ্যে এই ঘরখানিই উত্তমরূপে সাজানো থাকিত। ঘরখানি খুব বড় নয়। দু'টি আলমারি আছে বইয়ে ঠাশা, একটি লিখিবার সরঞ্জাম সাজানো টেবল, কাঠের খান-দুই চেয়ার এবং তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চিতে চাদর বিছানো, তার উপর গোটা দুই তাকিয়া। রমেশের বৈঠকখানা। মান্যবর অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে এ-ঘর গৌরবান্বিত হয়। এই ঘরে অনিলকে বসাইয়া রত্নার মাথা যেন লজ্জায় কাটা যাইতেছিল।

অনিল রত্নার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিল। নিজেদের গৃহস্থ-সংসারে অনিলকে টানিয়া সে নিজেকে যেন অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিতেছে। এই সঙ্কোচ দূর করিতে সহাস্যে অনিল কহিল,—এক কাপ চায়ের চেষ্টা ছাখো ! না, নিজের ঘরে কাঠের পুতুলটি হয়ে থাকবে ! আমাকে আবার একবার বাবার মামার বাড়ী ঘুরে আসতে হবে।

টেবলের উপর হইতে একখানা মাসিক-পত্র অনিলের হাতে দিয়া রত্না বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মুটের মাথায় বাজারের জিনিষ চাপাইয়া নিজের দু'হাতে কতকগুলা সামগ্রী লইয়া রমেশ গৃহে ফিরিলেন। বৈঠকখানাঘরের দরজা খোলা দেখিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে গিয়া সাহেব-বেশী মনুষ্য-মূর্ত্তিকে চেয়ারে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

রমেশের গৃহ-প্রবেশের সাড়া পাইয়া অনিল হাতের বই নামাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল ! রমেশের হতভম্ব মূর্ত্তি চোখে পড়িলে মৃদু হাস্যে সে কহিল,—আমি ! আমি অনিল। ভালো আছেন রমেশ বাবু ?

রমেশ যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, —এঁ্যা, তুমি—অনিল ! তুমি এসেছ এই গরীবের কুঁড়েয় ! ওরে, কে আছিস্ ? ও, তুমি বুঝি রত্নাকে নিয়ে এলে ! আমার এই সর্দ্দির ধ্বর ! ভয়ানক দুর্ব্বল করেছে কি না—তবে বুঝছ কি না, আজ হাট্-বার—বলিতে বলিতে হাতের জিনিষগুলা সেইখানে নামাইয়া মুটেকে ভিতর-বাড়ীর পথ দেখাইয়া উড়ানীতে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—কতক্ষণ এসেছ বাবা ? একা বসে !

আনন্দের আতিশয্যে কোন কথাই রমেশ গুছাইয়া শেষ করিতে পারিতেছিলেন না। কথাগুলা শুধু মনের মধ্যে ভীড় করিয়া তালগোল পাকাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মত ঠেলাঠেলি করিতেছিল এবং চাপাচাপি করিয়া যে যেটুকু পারে বাহির হইতেছিল।

অনিল কহিল—বেশীক্ষণ আমি আসিনি। রত্না চা আনতে গেছে।

রমেশ ব্যস্ত স্বরে কহিলেন,—তা হোক ! তা হোক ! তুমি একা এমন চুপ করে বসে আছো। একটু যদি আক্কেল—

কথা শেষ হইল না ! রত্না এক-হাতে চা অন্য হাতে জলখাবারের রেকাবী লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অনিল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাহার হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া কহিল,—অমন করে দু'হাতে দু'টো জিনিষ আনে ! গরম চা !

এ অনুযোগে রত্নার মুখ আরক্ত হইল। অনিল যে তাহার মুখের ঘর্ম্মবিন্দু লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা সে বুঝিল। বুঝিলেন না কেবল রমেশ। কোন কিছু না বুঝিয়া সায় দিয়া তিনি কহিলেন—ঠিক বলেছো ! ওর কি এ সব অভ্যাস আছে ! তোমার মা তো এ সব পারতো। সে কি কাছারীতে বসে আছে যে তুমি অনিলকে একা ফেলে—

রত্না লজ্জিত হইল। পিতার আল্‌গা মুখে কথার কোন হিসাব থাকে না ; হয়তো আরও কত কি অনর্গল বকিয়া যাইবেন, তাই বাধা দিতে সে কহিল,—না আমিই ছিলুম, কেবল খাবারটা আন্‌তে গিয়েছিলুম। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো বাবা—তোমাকেও চা দেবো।

রমেশ কিন্তু সে-ধার দিয়াও গেলেন না ! কহিলেন,—অতিথি নারায়ণ জানো, তাকে কি রকম করে সেবা করতে হয়, তুষ্ট করতে হয় !

—হ্যাঁ বাবা, জানি। সে আমি জানি। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো। মা কচুরি ভেজে আনচে। অনিলদা তুমি আরম্ভ করো।

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! নাও বাবা, এটুকু খেয়ে ফেলো। আমি আসছি। কাল অবশ্য ডাক্তার দু' আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল—বলিয়া তিনি ত্বরিতে বাহির হইয়া গেলেন !

অনিল কহিল,—কি করেছ রত্না ! এই এক থালা লুচি-তরকারী খাবে কে ?

হাসিয়া রত্না কহিল,—কেন, তুমি ! আমি ওই জন্যেই ভয় পেয়েছিলুম অনিল-দা, তুমি কি এ সব খেতে পারবে।

—ইস্, তাই না কি ? এগুলো কি অখাদ্য ? না, বাড়ীতে আমরা এ সব খাই না ? বলিয়া অনিল খাবারের থালাখানা টানিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে রমেশ আসিলেন। কহিলেন—এই যে বাবা খাচ্ছো ! হ্যাঁ, এমন দিনে গাছে চড়ে সত্যকে নারকোল পেড়ে খাইয়েছি ! সে কি আনন্দ ! গরম মুড়ি আর নারকোল—আমাদের বকুল-তলার রোয়াকে আড্ডা ! তোমাদের ক্লাবের মত আর কি ! আজ সে সুরেন অধিকারীও মরেছে, দেশের আনন্দও গেছে।

রহস্য-ভরে অনিল কহিল,—দেশের যায়নি ! আপনাদের গেছে ! বলিয়া ভোজ্যগুলি নিঃশেষ করিতে সে মনোযোগী হইল।

৩৬

জমিদার-বাড়ী যাইতে অনিল রমেশের নিকট বিদায় চাহিল। রমেশ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন,—তুমি গিয়ে একখানা চিঠি দিয়ো বাবা।

হাসিয়া অনিল কহিল,—দেবো।

অনিল চলিয়া গেলে অমলা জানলার পাশ হইতে সরিয়া আসিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীকে কহিলেন,—দিব্বি ছেলে! যেন রাজ-পুত্তুর! বলিয়া মেয়েকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে রত্না, বিয়ে-থা হয়েছে?

রত্নার মুখ সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া সে কহিল,—না।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর রত্না তাহার তোরঙ্গ খুলিল। ভাই-বোনদের জন্ম সে উপহার আনিয়াছিল, সব বাহির করিতে বসিল।

অমলা দেবরের পুত্র-কন্যাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে পুত্র-কন্যাদের পশ্চাতে তাদের পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বপ্রথম বাহির হইল পারুলের খোকা। সেলুলয়েডের পুতুল। সকলে দেখিয়া হাসিয়া খুন। অমলা কহিলেন,—ওমা রত্না, এ যে তোর কাকিমার বাঘার মত রে!

বাঘা হরিশের কনিষ্ঠ পুত্র। ছ'মাসের শিশু।

মণির জন্ম পকেট-ক্যামেরা বাহির হইল। মণি লাফাইয়া উঠিল।—ইস্ রত্না-দি, ভাগ্যিস্ তুমি কলকাতা গেছলে ভাই! কিন্তু তাহার চেয়ে লোভনীয় বাহির হইল,—টুনুর উড়ো জাহাজ। সেটা দেখিয়া সকলে অবাক্। আনন্দিত হইল। দম দিলে ভূমি ছাড়িয়া শূন্যে ওঠে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া দম ফুরাইয়া গেলে আবার মাটীতে নামে। সকলের তাক লাগিয়া গেল।

প্রফুল্ল মুখে হরিশ কহিলেন,—এটায় ক'টাকা পড়লো?

পুলকিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—দশ টাকা।

বিস্ময়ে হাঁ করিয়া হরিশ খানিকক্ষণ ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর টানিয়া টানিয়া হাসিয়া কহিলেন,—দ-শ টা-কা! এঁ্যা, একটা খেলনার জন্ম!

রত্নার খুব মজা লাগিতেছিল। সে কহিল,—এগুলোর দাম আরো বেশী কাকামণি। মণির ক্যামেরাটা পড়েছে পঁচিশ টাকা।

—এঁ্যা, বলিস্ কি রত্না! এমন করে টাকাগুলো ছিনিমিনি করে খরচ করেছিস্? খেলনা পুতুল কিনে! বেটী আমার দিল-দার মেজাজী! বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

সগর্ব্বে রত্না কহিল,—এতেই তোমাদের তাক লাগছে কাকামণি—সব অবাক্ হচ্ছো, কিন্তু খেলনার দোকানে গেলে সত্যি অবাক্ হতে। কি ভীড়! সাহেব-মেমরা সব মোটরে করে আসচে—কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ টাকা দামের খেলনা কিনছে সব। এতো আমাদের মত নয় যে, দু'পয়সার মাটীর পুতুল দিলেই ঢের হলো!

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিশ কহিলেন,—তা বটে! তা বটে! পয়সার মায়া ওরা জানে না। মানে, দুঃখও তো ওদের পোয়াতে হয় না।

প্রতিবাদ তুলিয়া রমেশ কহিলেন,—না হে, তা নয়! ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসতে মানুষ করতে ওরাই জানে। ওরাই বোঝে তাদের কি রকম করে রাখতে হয়। শুধু আমাদের মত সোনার গোপাল, ননী খা—বল্লে হয় না! আমরা ছেলের হাতে চুষী-কাঠি দিয়ে খালাশ! ওই চুষীতেই জন্ম গেল। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত বাড়বে, সভ্যতার বিকাশ বিজ্ঞানের উন্নতি হবে তত বেশী। হ্যাঁ রে রত্না, ওই যে সে বাক্সে কি খেলনা এনেছিলি?

হাসিয়া রত্না কহিল,—বিল্ডিং ব্লক্স্।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! বালকের বুদ্ধির বিকাশ করাতে কি সুন্দর খেলনা, বলো দিকি!

হরিশ কহিলেন,—তা বটে! মানুষ যত দেখবে, তত শিখবে তো।

রত্না কহিল,—কাকামণি হরিমতীর জন্ম কিছু আনিনি। তাকে একখানা শাড়ী দেবো।

হাসি-মুখে হরিশ কহিলেন,—সে তুমি তোমার ভাই-বোনদের জন্ম যেমন যা বুঝবে, মা!

রাত্রে কন্যাকে একা পাইয়া অমলা কহিলেন,—হ্যাঁ রে খুকী, তোকে যে টাকা পাঠাতেন মাসে মাসে, সব খরচ হতো?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেয়ে কহিল,—বলো কি মা? বলে, মাসের শেষে একটা পাই-পয়সা হাতে থাকতো না।

আশ্চর্য্য স্বরে মা কহিলেন,—তবে?

রত্না হাসিল। কহিল,—এ সব খেলনা মিষ্টার গোস্বামী কিনে দিলেন। বল্লেন, বাড়ী যাচ্ছো, নিয়ে যাও। তাঁর সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছিলুম কি না!

পিতা শুইয়া তামাক টানিতে ছিলেন। কহিলেন,—সত্য নিয়ে গেছলো বুঝি?

—না! তাঁর ছোট ছেলে। মাসিমা বল্লেন কি না, পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছ, কিছু নিয়ে যেতে হয়। ওদেরও সব মুশৌরী যাবার বাজার হচ্ছে।

—কাকে মাসিমা বলিস্? সত্যর স্ত্রীকে তো?

—হ্যাঁ, মিসেস্ গোস্বামীকে তিনি তাই বলতে বলে দিয়েছেন।

চোখে-মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ মাখাইয়া রমেশ কহিলেন,—আমার কথাটা খুব রেখেছে, না রে? ওরা সবাই তোকে খুব ভালোবাসে! আচ্ছা, বড় ছেলে হাকিম, সে কেমন?

রত্নার মুখ ঈষৎ রক্তিম হইল! সে কহিল,—সবাই ভালো। এই তো অনিল-দা বল্লে, আমাদের সঙ্গে মুশৌরী যাবে রত্না?

অমলা প্রশ্ন করিলেন,—তুই তাতে কি বললি?

মেয়ে কহিল,—আমি আর কি বলবো? মেসোমশাই বল্লেন,—সে হয় না! পূজোর সময় মা-বাপের কাছে থাকবে রত্না, ওর মা পথ চেয়ে আছেন!

সায় দিয়া অমলা কহিলেন,—তা সত্যি! আমি বলে, ধড়্‌ফড় করে মরছি এখানে!

উচ্চ-স্বরে রমেশ কহিলেন,—রাখো তোমার ধড়্‌ফড়ানি! কত দেশ দেখতো। ওদের সঙ্গে থাকলে সাহেবদের মত থাকতো! কত আদব-কায়দা শিখতো!

স্বামীর কথায় বিরক্ত হইয়া অমলা কহিলেন,—শিখে কি হবে?

ও তো আর সত্যিকারের মেম-সাহেব হবে না, এই গেরস্ত-ঘরই তো করতে হবে ওকে।

শ্লেষ-ভরে রমেশ প্রত্যুত্তর করিলেন,—তাই না কি? সেই জন্তেই মেয়েকে আমি এত করে মানুষ করছি! ঘটে বুদ্ধি থাকলে এমন পাড়াগাঁয়ে থাকতে না।

—কি করতুম? সহরে গিয়ে বায়োস্কোপ?

—ঢের, ঢের ভালো! সিনেমায় যারা নামে, তাদের কত নাম, জানো? ফিল্ম-ষ্টার বললে লোকে চমকে ওঠে! হুঁ:! এ জন্মটাই বৃথা গেল।

স্বামীর দুরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ আপশোষ এবং মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া অমলার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিক্ততার পাত্র এখন উপচাইয়া পড়িল। রাগে মুখ ঘুরাইয়া অমলা কহিল,—কি করবে, বলো? কপাল! মনের খেদ আর-জন্মে মিটিয়ো! মেয়েকে হাজার চোখের সামনে নাচিয়েছ, তাতেও সাধ মেটেনি?

খড়ের গাদায় আগুন লাগিল! তিক্ত স্বরে রমেশ কহিল,—বেশ করেছি,—যারা হিংসেয় জলে মরে, যাদের মেয়েরা পেত্নী জুজুবুড়ী, তারা অমন মিথ্যে করে বলে বেড়ায়! জানো, চার দিকে রত্না বোস রত্না বোস নাম। এ কম কথা! এই যে সত্য আমায় অত করে নেমন্তন্ন করেছিল—সে এই রত্নার জন্তেই তো! আমি গেলুম না, তাই!

মুখ তুলিয়া রত্না কহিল,—ছাখো বাবা, তুমি যদি ওদের নেমন্তন্নে যাও, সুট পরে যেয়ো। থিয়েটারের দিন দেখলুম সবাই সুট পরে এসেছিল।

মৃদু হাস্য করিয়া পিতা কহিলেন,—আমি যদি যেতুম হরিশকে দিয়ে চাঁদনীর বাজার থেকে কোট-প্যান্ট সব কিনে তাই পরেই যেতুম রে!

ব্যস্ত হইয়া রত্না কহিল,—না, না, তা করো না বাবা, তাহ[লে] সবাই ওখানে হাসবে! মনে মনে আমোদ পাবে! তুমি কিন্তু কি[ছু] টেরও পাবে না! ওরা তোমায় সং ভাববে। তুমি আমায় টা[কা] দিয়ো, আমি র‍্যাংকেনের বাড়ী থেকে তোমায় পোষাক তৈরী করি[য়ে] দেবো। তারা খুব ভালো টেলর! গোস্বামী সাহেবদের সব ওঁ[দের] খান থেকে তৈরী হয়ে আসে।

মা কহিলেন,—তুই কি পরেছিলি?

—আমি? বলিয়া রত্না হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—আমা[য়] একখানা একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন মাসিমা আর আমার এই চুড়ি-হারে চললো না। সব খুলে ফেলতে হলো মাসিমা তাঁর মুক্তোর ব্রেসলেট আর মুক্তোর কণ্ঠি আমায় পরতে দিলেন। দু'-আঙুলে দু'টো হীরে পান্নার আংটী দিলেন! এম[ন] চমৎকার আমায় দেখাচ্ছিল, তুমি দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে; যত মেয়ে এসেছিল, সকলের চেয়ে আমাকেই সুন্দর দেখাচ্ছিল; অমিয়-দা বললে, কি আশ্চর্য্য, যারা গয়না পরবার জন্ত দুনিয়ায় এসেছে, অভাব তাদেরই! আমায় বললে—তোমায় দেখে মডেল করতে ইচ্ছে হচ্ছে রত্না!

অমলা এ সকল কথার কোন উত্তর দিলেন না।

স্নেহপ্লুত দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চাহিয়া রমেশ কহিলেন,—অমিয় কিছু মিছে বলেনি! আমার পয়সাই নেই। কিন্তু মেয়ে আমার লক্ষ্মী প্রতিমা! সত্য কি অমনি অমনি মেয়ের মত ওকে ভালোবাসে, কি বলো? বলিয়া যাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি হাস্য করিলেন, তিনি তখন অনাসক্ত সুরে রত্নাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—রাত হয়েছে রে খুকী, শুয়ে পড়্।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

আমি ছুটে চলি চন্দ্র-সূর্য্য চলে—

ভুল করি আমি এই ভয়ে তুমি কাঁদো,
আমি কেঁদে মরি একটু ভুলের লাগি।
তুচ্ছ এ দেহ, ধন আর মান নিয়ে
শঙ্কিত তব পরাণ রহে গো জাগি।

ভালোবাসো তুমি—ভালোবাসি আমি জানি—
ভালোবাসাবাসি আর ত লাগে না ভালো।
নিতি নিতি এই বিরহ-মিলন নিয়ে
কত অনুরাগ-অভিমান-শিখা জ্বালো!

অন্ধ কামনা আফিংএর নেশা সম—
নীরবে ঘুমায়, বসন্ত কেটে যায়।
বাসনারে বলি এই ত স্বরগ মম
আর যাবি কোথা সব কিছু সঁপি আয়।

সহসা কে যেন হাতছানি দেয় দূরে,
তাকে—বলে, আয় দিগন্ত-রেখা-পারে।
বল্গা-বিহীন অশ্ব যে আমি ওরে!
স্বপ্ন আমার মিলায় অন্ধকারে—

কারে ধরেছিলি ওরে ও ছলনাময়ি,
ঘুম পাড়াবারে চেয়েছিলি তুই কারে?
আমি যে উল্কা ক্লান্তি-শ্রান্তি-জয়ী
বাঁধা যায় কি রে নীল অঞ্চল-ডোরে?

আমি ছুটে চলি চন্দ্র-সূর্য্য চলে।
রমণী ঘুমায় রিক্ত বকুল-তলে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)

শুভদৃষ্টি

[গল্প]

১

গোলাপ ফুলের মত অমন সুন্দর যার গায়ের রং তার ডাক-নাম 'ভোমরা'। মা-বাপ কেন যে তাকে ভোমরা বলিয়া ডাকিতেন, তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে এটা তার আটপৌরে নাম। বাড়ীতে এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে ভোমরা হইলেও তাহার আর একটা পোষাকী নাম ছিল। স্কুলে এবং কলেজে সে 'মণিমালা' নামে পরিচিত। এই রকম তোলা বা পোষাকী এবং আটপৌরে বা ডাক-নাম এ দেশে ও বিদেশে অনেকের আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং তাহার নাম লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

মণিমালার সহিত সৌরীনের প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় হয় মণিমালার বান্ধবী সুলোচনার বিবাহ-উপলক্ষে। ম্যাট্রিক পাশের পর হইতে সুলোচনার দাদা অজয় সৌরীনের সঙ্গে পড়িতেছে। বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে দু'জনে একসঙ্গে বি. এ পাশ করিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে এম. এ পড়িতেছে। ভগিনীর বিবাহ-উপলক্ষে অজয় সৌরীনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সুলোচনাও সহপাঠিনী মণিমালাকে নিজের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। অজয় বাল্যকাল হইতে সৌরীনের সঙ্গে একত্র পড়িত বলিয়া অজয়দের বাড়ীতে সৌরীনের যাতায়াত ছিল অবাধ। অজয়ের পিতামাতা সৌরীনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন। সৌরীন অজয়দের বাড়ীতে 'ঘরের ছেলে', কিন্তু অজয় সৌরীনদের বাড়ীতে "ঘরের ছেলে" হইতে পারে নাই। তার কারণ, সৌরীন মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিল, হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। অজয় দুইবার মাত্র বর্দ্ধমানে সৌরীনদের দেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। সৌরীনের বাড়ী বর্দ্ধমান সহরে নহে, বর্দ্ধমান হইতে পাঁচ মাইল দূরে মাধবপুর গ্রামে। সৌরীনের পিতা সেই গ্রামের জমীদার। জমীদারীর, কলিকাতার বাটীর আয়, কৃষিক্ষেত্রের এবং তেজারতী কারবারের সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার বাৎসরিক আয় বেশ মোটা-রকম। সুতরাং বারো মাসে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি ছোট বড় তের পার্ব্বণেরও ব্যবস্থা আছে।

সৌরীনের পিতা হরদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীগ্রামের জমিদার হইলেও অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত নহেন, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী। স্বয়ং উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া একমাত্র পুত্রকে উচ্চশিক্ষিত করিয়াছিলেন। হরদেব বাবুর দুই কন্যা এক পুত্র; কন্যা দুইটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আভা তাঁহার প্রথম সন্তান, তাহার পর পুত্র সৌরীন, সৌরীনের পর বিভা।

হরদেব বাবু উচ্চশিক্ষিত হইলেও এক বিষয়ে তিনি সেকালের বৃদ্ধদের অপেক্ষা নিষ্ঠাবান ছিলেন। কৌলীন্য মর্য্যাদায় তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজে স্বভাব-কুলীন, কন্যাদের বিবাহ দিবার সময় ভাবী জামাতার কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া তবে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। ছোট মেয়ে বিভার বিবাহের পূর্ব্বে একটি সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন; পাত্রটি রূপে গুণে সমান, পিতার একমাত্র সন্তান, এম, এ পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট আফিসে এক শত পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরী পাইয়াছে, পরে যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে, তাহার পিতাও সরকারি আফিসে চারি শত টাকা বেতনে চাকরী করেন, কলিকাতায় নিজের বাড়ী আছে, তাহার উপর পাত্রপক্ষের কোনরূপ খাঁই ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, হরদেব বাবু ঘটক লাগাইয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই পাত্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভগিনীর যাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার কুলে না কি "বীরভদ্রী" ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, সুতরাং সে পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে না। তাঁহার এই আপত্তির কারণ শুনিয়া পত্নী সৌদামিনী বলিয়াছিলেন, সামান্য একটু দোষের জন্য অমন পাত্রকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কিন্তু হরদেব বাবুর এক যুক্তি—সোনা-রূপায় দাগ পালিশ করিলে উঠিয়া যায়, কিন্তু কুলে যদি কোন দাগ লাগে, সে দাগ কিছুতেই মুছিয়া যায় না, বংশাবলীক্রমে সে দাগ বিদ্যমান থাকে। মোটের উপর এক এক জন শুচিবায়ুগ্রস্ত থাকে সকল দ্রব্যই অশুচি বলিয়া মনে করে, হরদেব বাবুও কৌলীন্য সম্বন্ধে তেমনি শুচি-বায়ুগ্রস্ত ছিলেন।

সৌরীন বি, এ পাশ করিলে নানা স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু হরদেব বাবু প্রত্যেক সম্বন্ধেই কোন না কোন দোষ বাহির করিতে লাগিলেন; কাহারও "বীরভদ্রী" দোষ, কাহারও "কেশবকুণী" দোষ, কাহারও "অবসথী" দোষ। পিতার এই আচরণে সৌরীন মনে মনে বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস করিত না। সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না যে, পিতা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সকল বিষয়ে এত উদার হইয়াও কৌলীন্য-মর্য্যাদা সম্বন্ধে এমন অনুদার কেন? হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেন কোন্ ব্রাহ্মণের কি গুণ দেখিয়া তাঁহাকে কি মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, এখন এই বিংশ শতাব্দীতে সে মর্য্যাদার মূল্য কি? সৌরীন জননীকে জানাইয়া দিল যে, সে এম, এ পাশ না করিয়া বিবাহ করিবে না; তাহার পূর্ব্বে পিতা যেন কোথাও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ না স্থির করেন।

২

সুলোচনার বিবাহ উপলক্ষে মণিমালার পিতা বাগবাজারের সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বাবু করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সুলোচনা এবং মণিমালাকে অবলম্বন করিয়া এই দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল; সামান্য ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে পরস্পরের বাটীতে নিমন্ত্রণ হইত।

করুণাময় বাবু হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিলেও মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম চারি-পাঁচ বৎসর এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া পরে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথি হইতেই আর্থিক উন্নতির সূত্রপাত। এখন তাঁহার ভিজিট ষোল টাকা, পশারের শেষ নাই, অনেক দিনই আহার ও বিশ্রামের সময় পান না। বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা, দু'খানা মোটর-গাড়ী, দাস দাসী, বেহারা খানসামা প্রভৃতি তাঁহার পশার ও ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার

তাহা দেখিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কাল তোমাকে এক জোড়া জুতা কিনে দেবো, জুতা না পায়ে দিলে কি করে লছমন-ঝোলায় যাবে ? শুনেছি, বাস থেকে নেমে আধ ক্রোশের উপর পাহাড় দিয়ে যেতে হয়। দুপুরবেলা পাথর এত গরম হয় যে, তাতে পা দেওয়া যায় না। শুধু পায়ে কার সাধ্য সে পথে চলে ?"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া হরির মা বলিল—"জুতো পায়ে দিতে পারবনি মা। আমার কায নেই লছমন-ঝোলা দেখে। আমি এইখান থেকে মা লছমন-ঝোলাকে পর্‌ণাম্ কচ্ছি।" এই বলিয়া করযোড়ে কপাল স্পর্শ করিয়া লছমন-ঝোলার উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক বলিল, "মা লছমন-ঝোলা, আমার অপ্‌রাধ নিউনি মা।"

পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদির পর ডাক্তার বাবু হরির মা ব্যতীত আর সকলকে লইয়া হৃষীকেশ ও লছমন-ঝোলা দর্শনের জন্ত যাত্রা করিলেন। হরির মা ধর্ম্মশালায় রহিল।

৪

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাবুরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত দিন পাহাড়ে-পথে, বাসে যাতায়াত করায় সকলেই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন আর কেহ গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেন না, সকাল সকাল আহারাদি করিয়া সকলেই শয়ন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সস্ত্রীক ডাক্তার বাবু যথারীতি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আসিয়া ভোমরা ও সুধাময়কে লইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে বেড়াইতে গেলেন। বেলা প্রায় ন'টার সময় তাঁহারা বাসায় ফিরিয়া আসিলে হরির মা বলিল, "মা, ওদিক্‌কার ঐ কোণের ঘরে এক বাঙ্গালী ভদ্দর নোক পরশু এসেছে। কাল তাদের ঘরে বেড়াতে গিয়ে আলাপ করে এসেছি। লোক বেশী সঙ্গে নেই। কর্ত্তা ও গিন্নী, আর এক জন আধা-বয়সী বিধবা। বোধ হয় রাঁধুনী হবে ; আর এক জন চাকর। কাল শুনলুম, কর্ত্তার জ্বর হয়েছে, গিন্নী ত ভেবেই সারা। বিদেশ বিভুই, সঙ্গে আপনার নোক কেউ নেই। চেহারা দেখে বেশ ভাগ্যিমন্ত বলে মনে হল। কর্ত্তার চেহারা যেন মহাদেবের মতন, গিন্নীও তেমনি—যেন সাক্ষেৎ মা নক্ষী ! তা গিন্নীকে আমি বল্লুম—মা, তুমি ভেবোনি। আমাদের বাবু কলকেতার মস্ত বড় ডাক্তার, দু'খানা মটোর গাড়ী, বাবু আমাদের সাক্ষেৎ ধন্বন্তরি। তিনি—ও মা, এই যে বামুন ঠাকরুণ—"

হরির মার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা এক প্রৌঢ়া বিধবা হরির মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কাল তুমি বল্লে না, তুমি কোন ডাক্তার বাবুর সঙ্গে এসেছ ? যদি ডাক্তার বাবু একবার দয়া করে আমাদের ও-ঘরে যান, তাই বলতে এসেছি। আমাদের বাবু ভোর থেকে কেমন যেন অঘোরে রয়েছেন। গিন্নীমা ভয়ে অস্থির। ইনি ?" এই বলিয়া ভোমরার মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হরির মা বলিল, "ইনি ডাক্তার বাবুর পরিবার।"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর দু'টি হাত ধরিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "মা, ডাক্তার বাবুকে একটু দয়া করতে বলুন। টাকার জন্ত কোন ভাবনা নেই। আমাদের বাবুর লক্ষ্মীর সংসার।"

ডাক্তার বাবু ঘরের ভিতর হইতে ইহাদের কথোপকথন শুনিয়া বলিলেন, "আমি এখনই কাপড় ছেড়ে যাচ্ছি, দেরি হবে না।"

ডাক্তার বাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন্ পূর্ব্বক সেই বৃদ্ধার সহিত রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক প্রৌঢ় মুদিত নয়নে বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন। শয্যার এক পার্শ্বে তাঁহার প্রৌঢ়া পত্নী ম্লান মুখে বসিয়া আছেন। বৃদ্ধার সহিত ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ঘরের অন্ত পার্শ্বে উঠিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু রোগীর কাছে বসিয়া তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়া রোগীর হৃৎপিণ্ড, বক্ষঃ, পাঁজর ও পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ভয় নেই, শীঘ্রই ভাল হবেন। ব্রহ্মকুণ্ডে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করাতে ডান দিকের পাঁজরায় একটু সর্দ্দি জমেছে। এইখানটা দু'বেলা ফোমেণ্ট করে গরম সরষের তেল মালিস করে দেবেন। জল-গরমের জন্ত যদি ষ্টোভের দরকার হয়—"

বাধা দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"আমাদের সঙ্গেও এষ্টোভ আছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বেশ, তাহলে একটু জল গরম করুন। মাঝে মাঝে একটু একটু গরম দুধ কি কমলালেবুর রস খেতে দেবেন। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিন ঘণ্টা অন্তর এক পুরিয়া খাওয়াবেন। আমি আবার ও-বেলা আসব। আপনারা কিছু ভাববেন না, সাত-আট দিনের মধ্যেই সেরে যাবেন।"

রোগীর পত্নী মৃদু স্বরে বলিলেন, "এখানে অত দিন থাকতে দেবে না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "যাতে থাকা হয়, তার ব্যবস্থা হবে এখন, সে জন্ত চিন্তা নাই। আমার ঝিকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, জল গরমের ব্যবস্থা করুন।" হোমিওপ্যাথ ডাক্তারেরা ঔষধের বাক্স সঙ্গে না লইয়া কোথাও যান না। ডাক্তার বাবু চার পুরিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, "তুমি নিজে এই ওষুধ ওঁর স্ত্রীকে দিয়ে এস। তাঁকে একটু ভরসা দিয়ো। রোগ বিশেষ কিছু নয়, সামান্ত একটু ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। হরির মাকে নিয়ে যাও। আমি একবার গুরুদেবকে বলে ওঁদের এখানে দশ-পনের দিন থাকবার ব্যবস্থা করে আসি।"

"ভোমরাকে নিয়ে যাব ?"

"আজ থাক, এর পর নিয়ে যেয়ো।"

ডাক্তার বাবু স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, আমার একটা নিবেদন আছে।"

"কি নিবেদন ?"

"আপনার ধর্ম্মশালায় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক পীড়িত হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে ঔষধ দিয়ে এসেছি। তাঁকে এখন দশ-বারো দিন এখানে থাকতে হবে, দয়া করে আপনাকে সেইরূপ আদেশ দিতে হবে।"

"পীড়া কঠিন ? জীবনের আশঙ্কা আছে ?"

"এখন কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ অবস্থায় নড়াচড়া করলে রোগ কঠিন হতে পারে।"

"ধর্ম্মশালাতে এক সপ্তাহ রাখবার নিয়ম। তবে 'আতুরে নিয়মো নাস্তি।' আমি ম্যানেজার বাবুকে বলে দেবো, বাবুটি যত দিন ভাল না হন, তত দিন ধর্ম্মশালায় থাকতে পারবেন। রোগী থাকলে ডাক্তারকেও থাকতে হবে।"

"যখন তাঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছি, তখন আমারও থাকা দরকার। এখন আপনার যা আদেশ।"

"তুমি সেই বাবুকে আরোগ্য করে দাও।"

৫

ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা-গুণেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, চার-পাঁচ দিন পরে রোগীর জ্বর ত্যাগ হইল। যে ক'দিন জ্বর ছিল, ডাক্তার বাবু রোগীকে শয্যা ত্যাগ করিতে বা অধিক কথা কহিতে দেন নাই। জ্বর ত্যাগ হইলেও চার-পাঁচ দিন দুধ, বার্লি ছাড়া রোগীকে অন্য কোন পথ্য দেন নাই। এত দিন ডাক্তার বাবু রোগীর সহিত রোগ ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করেন নাই। রোগী যে দিন অন্ন পথ্য করিলেন, সেই দিন অপরাহ্নে ডাক্তার বাবু রোগীকে বলিলেন, "এত দিন আপনি দুর্ব্বল ছিলেন বলে আপনার সঙ্গে অসুখেয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা হয়নি। আপনার নাম-ধাম কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি!"

রোগী হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও আমি আপনার পরিচয় পেয়েছি। এত দিন লোকমুখে কলকাতায় ডাক্তার করুণাময় মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি, এবার আপনার রোগী হয়ে সেই সুখ্যাতির সার্থকতা উপলব্ধি করেলাম। আমার নাম হরদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ী বর্দ্ধমানের নিকট মাধবপুরে। আমাদের গ্রাম গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরেই।"

"মহাশয়ের সন্তানাদি কি?"

"একটি ছেলে, দু'টি মেয়ে। ছেলেটি এ বৎসর এম্, এ পরীক্ষা দিয়ে পূজার পর এক বন্ধুর সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গেছে। বি, এ পরীক্ষা দিয়ে সে একবার এ-দিকে বেড়াতে এসেছিল। তার সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা হওয়াতে সে আর আমাদের সঙ্গে এলো না।"

ছেলেটি এম্, এ দিয়াছে, সাংসারিক অবস্থা ভাল, পিতা-মাতাকে দেখিয়া বোধ হয়, ছেলেটিও সুন্দর ও চারু-দর্শন হইবে। ডাক্তার বাবু ভাবিলেন, যদি কুল-মর্য্যাদায় না বাধে, তাহা হইলে হরদেব বাবুর পুত্রের সহিত ভোমরার বিবাহের প্রস্তাব করিলে কেমন হয়?

হরদেব বাবুর পীড়ার জন্য এত দিন ডাক্তার বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় করিবার সুবিধা হয় নাই বটে, কিন্তু হরদেব বাবুর পত্নী সৌদামিনীর সহিত ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর এ কয় দিনে আলাপ-পরিচয় বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সখিত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। হরদেব বাবুর কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, সকল প্রকার সৎপাত্র পাইয়াও যে হরদেব বাবু সামান্য ত্রুটির জন্য সে পাত্র মনোনীত করেন নাই, ইহা সৌদামিনী সখীর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভোমরার রূপলাবণ্য দর্শনে সৌদামিনীর একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ভ্রমরকে পুত্রবধূ করেন। কিন্তু কি জানি, যদি কুলশীলে সম্পূর্ণ মিল না হয়, তাহা হইলে হরদেব বাবু কিছুতেই সম্মত হইবেন না জানিয়া মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, হরদেব বাবুর এই কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতি একান্ত নিষ্ঠার কথা ডাক্তার বাবু পত্নীর নিকটে শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি কথায় কথায় হরদেব বাবুকে বলিলেন, "মহাশয় স্বভাব? না ভঙ্গ ভাব?"

আর হরদেব বাবুকে পায় কে? তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আমি স্বভাব, ভগীরথ বন্দ্যোর সন্তান, ফুলে মেল।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমরাও স্বভাব, ফুলে মেল, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান।"

"তবে ত আপনি আমাদের স্বঘর। বেশ, বেশ। নিকষ কুলীনের সংখ্যা এত কমে গেছে যে, আর খুঁজে বড় পাওয়া যায় না। মেয়ে দু'টির বিয়ের জন্য কম বেগ পেতে হয়েছে!"

ডাক্তার বাবু আর এ প্রসঙ্গে অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা পূর্ব্বক প্রায় পনর মিনিট অতিবাহন করিয়া সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার ভিজিট আর ঔষধের বিলটা আপনি এইখানেই মিটাইয়া দিবেন? না বাড়ী গিয়া কলিকাতায় আমাকে পাঠাইয়া দিবেন?"

হরদেব বাবু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন ডাক্তারবাবু, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমি বড় কড়া। কারও কাছে আমি ঋণী থাকতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আপনি এই বিদেশে যে ভাবে আমার প্রাণরক্ষা করে আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছেন, সে ঋণ ত পরিশোধ করতে পারব না।"

ডাক্তার বাবু করযোড়ে বলিলেন, "পারবেন। যদি অনুগ্রহ করে আমার বড় স্নেহের বড় আদরের ভোম্‌রাকে আপনাদের চরণসেবার অধিকার দেন! তাকে মেয়ে বলে আপনার সংসারে একটু স্থান দেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হই।"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া হরদেব বাবু বলিলেন, "আপনার মেয়েকে দেখে আমার বড় সাধ হয়েছিল যে, মা-লক্ষ্মীকে যদি সৌরীনের বৌ করতে পারি তাহলে আমার ঘর-আলো-করা বৌ হয়। কিন্তু আপনি কলকাতার বড় লোক, আমি দূর পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ মাত্র। আপনার মত লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতার আশা বামনের চাঁদ ধরবার আশার মতই নয় কি?

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ও-কথা বলবেন না। আমরাও দিন-মজুরি করি, যত দিন শরীর বইবে, তত দিন রোজগার। বড়লোক তাঁরা, যাঁদের অন্ন-চিন্তা নাই।"

হরদেব বাবু বলিলেন, "আমার স্ত্রীও আপনার মেয়েকে বৌমা করবার জন্য পাগল। আমি তাঁকে সে আশা করতে নিষেধ করেছি। আর একটা কথা, সৌরীন সকল বিষয়ে আমাদের বাধ্য হলেও কিছু লেখাপড়া শিখেছে, বয়সও হয়েছে। আমার ইচ্ছা, সে কলকাতায় এলে এক দিন আপনার ওখানে গিয়ে মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসুক। আপনারা ত ছেলের বাপ-মাকেই দেখলেন, ছেলেকেও একবার দেখা দরকার ত। তার পর মেয়ের বিবাহ দিতে হলে ঘর-বর দুই-ই দেখা দরকার। এখান থেকে ফেরবার সময় যদি দয়া করে একবার বর্দ্ধমানে নেমে মাধবপুর হয়ে কলকাতায় যান, তাহলে ভাল হয় না?"

"সে কথা ভাল। তাহলে চলুন না, সকলে একসঙ্গেই যাওয়া যাক। আর দিন চার-পাঁচ পরে আপনার যেতে কোন কষ্ট হবে না। যাবার দিন স্থির করে আমি কলকাতায় চিঠি লিখে দিই, আমার একখানা মোটর যেন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমার স্ত্রী এ খবর শুনলে আহ্লাদে আটখানা হবেন।"

"আমার স্ত্রী বোধ হয় আহ্লাদে ষোলখানা হবেন!" বলিয়া হরদেব বাবু হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তার বাবুও প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিলেন।

৬

সমুদ্রে স্নান সারিয়া বেলা এগারোটার সময় অজয় ও সৌরীন হোটেলে ফিরিবামাত্র হোটেলের ভৃত্য সৌরীনের হাতে একখানা পত্র দিয়া

বলিল, "বাবু, এ ভাষা খণ্ডিয়ে আপনক্কর নামরে আসিছি।" সৌরীন পত্র লইয়া দেখিল, হরিদ্বার ডাকঘরের ছাপ। তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পত্র পাঠ করিয়া তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বন্ধুর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অজয় বলিল, "কি হে, সংবাদ ভাল ত? মুখখানা অমন পেচকনিভ হলো কেন?"

সৌরীন বলিল, "খবর ভাল কি মন্দ পড়ে দেখ। ঠিক জানি, বাবা কুল রাখতে গিয়ে এই রকম একটা কিছু করবেন।" এই বলিয়া পত্রখানা অজয়ের হাতে দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। অজয় পড়িল—

"প্রাণাধিক সৌরীন!

আমার পীড়ার সংবাদ তোমাকে জানাই নাই, কারণ, তাহাতে তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা হইত। এখানে আসিবার তৃতীয় দিনে আমি জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ব্রঙ্কাইটিশ হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপাথ ডাক্তার করুণা বাবু সে সময় আমাদের ধর্ম্ম-শালায় ছিলেন, তাঁহার চিকিৎসায় ভাল হইয়া উঠিয়াছি। কাল অন্ন পথ্য করিয়াছি, তবে শরীর এখনও দুর্ব্বল। চার পাঁচ দিন পরে তাঁহাদের সঙ্গেই দেশে ফিরিব। ডাক্তার বাবুর ভোমরা নামে একটি মেয়ে আছে। সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছে। আমার ও তোমার জননীর একান্ত ইচ্ছা, তাহাকে পুত্রবধূ করি। ডাক্তার বাবু আমাদের স্বঘর। কথায় কথায় একটা কুটুম্বিতাও বাহির হইয়াছে—বিভার মামী-শাশুড়ী ডাক্তার বাবুর ভগিনী! সুতরাং কুল-শীল সম্বন্ধে আর অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। আমি এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আমার পুত্র যদি ভোমরাকে দেখিয়া পছন্দ করে, তবে আমার আপত্তি নাই। তুমি কলিকাতায় ফিরিয়া এক দিন তোমার দুই-একটি বন্ধুকে লইয়া ডাক্তার বাবুর কন্যাকে দেখিয়া বাড়ী আসিবে। তোমাদের পরীক্ষার ফল কবে বাহির হইবে? আশা করি, তুমি ও অজয় ভালই আছ। ইতি—"

পত্র পাঠ করিয়া অজয় বলিল,—"এ ত সুসংবাদ! এতে মুখ ভার করবার কি আছে? তুমি মেয়ে পছন্দ না করলে ত আর বিয়ে হবে না, তবে আর ভাবনা কি?"

"ভাবনার কথা নেই? আমি যদি পছন্দ না করি, তাহলেই বাবার রাগ হবে! কুল-শীলের দিকে বাবার ঝোঁকের কথা ত জান। এক এক জনের ঠিকুজী-কুষ্ঠীর উপর ঝোঁক থাকে, বাবার সেই রকম কুল-শীলের উপর ঝোঁক। এ মেয়ের নাম যখন ভোমরা, তখন বুঝতেই পারছ রঙ কি রকম! ফরসা মেয়ের নাম কি কেউ ভোমরা রাখে?"

"কিন্তু যখন বাবার হুকুম, তখন এক দিন মেয়ে দেখতে যেতেই হবে। চল, কলকাতায় গিয়ে এক দিন শৈলেনকে নিয়ে মেয়ে দেখে আসা যাক্। মেয়ে পছন্দ হ'ক আর না হ'ক, এক দিন মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ত হবে।"

"আবার শৈলেনকে কেন?"

"তাকে চাই বই কি। মেয়ে দেখতে গিয়ে মেয়েকে কি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তা তুমি জান না, আমিও জানি না। শৈলেন নিজে মেয়ে দেখে বিয়ে করেছে, সে ও-বিষয়ে একেবারে ঝানু।"

হরিদ্বার হইতে গৃহে ফিরিবার দিন-আষ্টেক পরে, সৌদামিনী, মাধবপুরে অজয়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। অজয় লিখিয়াছে—

"মা, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং বাবাকে জানাইবেন। কাল বৈকালে আমি ও সৌরীন আমাদের বন্ধু শৈলেনকে লইয়া করুণাময় বাবুর বাড়ীতে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা সৌরীনকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। সৌরীনের মত গুণবান্ এবং রূপবান্ ছেলে যে তাঁহাদের জামাতা হইবেন, ইহা তাঁহারা কল্পনা করেন নাই। করুণা বাবু ও তাঁহার স্ত্রী সৌরীনকে যত পছন্দ করিয়াছেন, সৌরীন ভোমরাকে দেখিয়া তাহার শতগুণ পছন্দ করিয়াছে। তাহার কারণ, আমার ছোট বোন সুলোচনার বিবাহের রাত্রে সৌরীন ভোমরার রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিল। আপনি জানেন না, আমাদের সঙ্গে করুণা বাবুদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার বোনের সঙ্গে ভোমরা কলেজে এক ক্লাসে পড়ে, আমাকে 'অজয় দা' বলিয়া ডাকে, অনেক সময় ওরা দু'জনেই আমার কাছে পড়া বলিয়া নেয়। ভোমরা রোজ কলেজে যাতায়াতের সময় আমাদের বাড়ীতে এসে সুলোচনাকে ডেকে নিয়ে যায়।

ভোমরার একটা ভাল নাম আছে 'মণিমালা'। কলেজে সকলে তাকে মণিমালা বলেই ডাকে, তার ভোমরা নাম কেউ জানে না। করুণা বাবুর স্ত্রী পশ্চিম হইতে আসিয়াই আমার মাকে বলিয়াছেন যে, মাধবপুরের জমিদার হরদেব বাবুর ছেলের সঙ্গে ভোমরার বিবাহের কথা হইতেছে, ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ হয়, তাহলে আগামী মাঘ কিম্বা ফাল্গুনেই বিবাহ হইবে। কাকীমার (ডাক্তার বাবুর স্ত্রী) কথা শুনে মনে মনে হাসিলাম, মাধবপুরের জমিদারের ছেলে যে আমার বন্ধু সৌরীন, মা বা কাকীমার কাছে সে কথা প্রকাশ করি নাই। আবার সৌরীনকেও বলি নাই যে, করুণা বাবুর মেয়ে ভোমরাই সুলোচনার বান্ধবী মণিমালা। মেয়ে দেখবার সময় পাছে আমি ডাক্তার বাবুর ও ভোমরার সুপরিচিত বলে সৌরীনের কাছে ধরা পড়ি, তাই কাল সকালে কাকীমাকে সাবধান করে দিয়ে এসেছিলাম যে, মেয়ে দেখাবার সময় আমি পাত্রের বন্ধু হয়ে বসে থাকব, আমাকে যেন ঘরের ছেলে বলে পরিচয় দেবেন না। যা হ'ক, যথাসময়ে মেয়ে দেখতে গিয়ে আমরা তিন জনেই গম্ভীর হয়ে বসে আছি, শৈলেন কাকাবাবুর সঙ্গে দু'-একটা কথা কইছে, এমন সময় ভোমরাকে সেই ঘরে নিয়ে এল। আমি দেখলাম, ভোমরাকে দেখেই সৌরীন চমকে উঠল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল। ওদিকে আমার ভোমরা দিদিরও সেই দশা! তার পর শৈলেনের প্রশ্নের উত্তরে ভোমরা যখন বল্লে যে, তার নাম মণিমালা, তখন সৌরীন আমাকে এমন একটা চিমটি কাটলে যে কি আর বলব?

আর একটা সুসংবাদ দিয়ে চিঠি শেষ করি। খবর নিয়ে জানলেম, সৌরীন ও আমি দু'জনেই প্রথম বিভাগে পাশ করেছি, আগামী সপ্তাহে গেজেট হবে। কাল নিশ্চয় আপনার কাছে যাব। হাঁড়িতে চারটি বেশী করে চাল নিতে বলবেন। ইতি।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ পাঠের উপকরণ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবদ্ ব্যাসদেব-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে তাহার কিছু বাহ্যিক বা অবান্তর বিষয়ের পরিচয় রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ, এই পরিচয় পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে ইহার পাঠে অনেক ভ্রম-প্রমাদ এবং সময়ে সময়ে উপেক্ষা বুদ্ধিও হইয়া থাকে। অনেক সময় টোলে বা বিদ্যালয়াদিতে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াও ইহার অনেক কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা নিজে নিজে ইহার আলোচনা করেন, তাঁহাদের সেই অসুবিধা আরও অধিকই হয়। ইহার কারণ অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থ হইতে ইহার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, এবং ইহার অর্থে নানা মতভেদ ঘটিয়াছে। এমন সম্প্রদায়ই নাই, যিনি স্বমতে ইহার অর্থ করেন নাই। বিদ্যালয়াদিতে অনেক কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার সুবিধাই হয় না। টোলের অধ্যাপকগণের অনেকেই ইহার প্রতিপাদ্য-বিষয়াবগতির জন্য ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ইহার ইতিহাস প্রভৃতি বাহ্যিক পরিচয় সম্বন্ধে মনোনিবেশ করেন না। অনেক সুপণ্ডিত অধ্যাপকও ইহার কত মতের ভাষ্য আছে, তাহারই সংবাদ রাখেন না। অনুবাদ প্রভৃতিও ইহার এরূপ হয় নাই, যাহাতে এই সব অবান্তর কথা জানিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, এই সব অবান্তর বা বাহ্যিক কথার দ্বারা ইহার ভিতরের অনেক কথা অনেক স্থলে বেশ পরিষ্কৃত হয়। ফলতঃ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ যেরূপ প্রয়োজনীয়, তদুপযুক্ত ইহার বর্ত্তমান সময়োপযোগী আলোচনা এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। অথচ এই সব কথা না জানিতে পারিলে প্রাচীন কালে ইহার যে কিরূপ বিশদ ও নিপুণ আলোচনা হইয়াছিল এবং ইহার যথার্থ মর্ম্মার্থ কি, তাহা জানিতেই পারা যায় না। এই আলোচনার মধ্যেই আমাদের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস বহুল পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। এ জন্য এ স্থলে ব্রহ্মসূত্র বিষয়ক বাহ্যিক কতিপয় অবান্তর বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। আশা করা যায়, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মসূত্রপাঠার্থীর কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে এ স্থলে ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে যে কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে, তাহা এই—

প্রথম—ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয়—ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচনার উদ্দেশ্য।

তৃতীয়—ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচনার কৌশল।

চতুর্থ—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বুঝিবার জন্য যে সব গ্রন্থ পাঠ্য।

পঞ্চম—বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের পরিচয়।

ষষ্ঠ—বেদান্ত সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের পরিচয়।

সপ্তম—ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পরিচয়।

এই কয়টি বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে থাকিলে ব্রহ্মসূত্র পাঠে অনেক সুবিধা হইবার কথা। এক্ষণে দেখা যাউক, এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কিরূপ—

প্রথম—ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের বহু নাম প্রসিদ্ধ, যথা—বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, শারীরকমীমাংসা, শারীরকসূত্র, উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা, ইত্যাদি। পাণিনি ব্যাকরণে "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" ৪।৩।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য প্রোক্ত এক ভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ আছে। এই পারাশর্য্য—পরাশরতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এ জন্য অনেকে বলেন, ইহাতে ব্রহ্মসূত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই ব্রহ্মসূত্র কলির প্রারম্ভে প্রায় ৩১০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, এই ব্রহ্মসূত্র মধ্যে যখন সৌত্রান্তিক প্রভৃতি বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা উক্ত বৌদ্ধমতের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ, অর্থাৎ ইহা খৃষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতাব্দীর গ্রন্থ। কিন্তু তাঁহারা যদি বৌদ্ধমতের প্রাচীনত্ব অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বতনত্ব বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ওরূপ চিন্তা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। বস্তুতঃ, সূত্রমধ্যে সৌত্রান্তিক প্রভৃতি কোন আধুনিক শব্দের ব্যবহারই নাই। উহা ভাষ্যমধ্যেই দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিবৃতির জন্য তন্মতের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের যুক্তি ও বাক্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। ভাষ্যকারের বাক্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রে আধুনিকত্ব বা গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তিত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত। আর বৌদ্ধমতের অতি প্রাচীনত্ব বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। এই সব কথা পরে বিশদ ভাবে আলোচিত হইবে। অতএব এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ কলির প্রারম্ভের গ্রন্থ—এই প্রবাদের সত্যতা মনে করা যাইতে পারে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে, বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাঙ্কর ভাষ্য মতে ৫৫৫টি সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই শাঙ্কর ভাষ্য খুবসম্ভব খৃষ্টীয় ৭০০ সাত শত অব্দে রচিত হইয়াছিল। কারণ, শঙ্করাচার্য্যের জন্ম খুব সম্ভব ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। (এ জন্য আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) এবং তিনি ১৬ বৎসর বয়সে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন—এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে, যথা—

> "অষ্টবর্ষে চতুর্বেদী দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
> ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।"

অর্থাৎ মুনি শঙ্করাচার্য্য অষ্টবর্ষে চারিবেদজ্ঞ, দ্বাদশবর্ষে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াছিলেন, ষোড়শবর্ষে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং বত্রিশ বৎসরে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৬+৬৮৬=৭০২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার ভাষ্য রচনার কাল।

এখন ব্রহ্মসূত্রের যত ভাষ্য পাওয়া যায় সকলই এই শাঙ্কর ভাষ্যের পরবর্ত্তী। এই ভাষ্যমধ্যেই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ৫৫৫টি সূত্র আছে, বলা হইয়া থাকে। অবশ্য অন্যান্য ভাষ্যমতে এই সূত্রসংখ্যায় মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা অপ্রাচীন বলিয়া তাহাদের সম্মত সংখ্যা এ স্থলে গৃহীত হইল না।

অতঃপর ইহার সূত্রের আকার ও প্রকার সম্বন্ধে একটি ধারণা করিতে হইলে ইহার প্রথম সূত্র চারিটি এবং শেষ সূত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারা যায় ; যথা ইহার—

প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

ইহার অর্থ—অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এখানে "অথ" শব্দের অর্থ অনন্তর। ইহার অর্থ—সাধন চারিটি সম্পন্ন হইবার পর। সেই সাধন চারিটি (১) নিত্য ও অনিত্যের জ্ঞান, (২) ইহ পরকালে বৈরাগ্য, (৩) শমদমাদি ছয়টি সাধন। ইহার মধ্যে (১) শম অর্থ অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, (২) দম অর্থ বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, (৩) উপরতি

অর্থ ত্যাগ, (৪) তিতিক্ষা অর্থ—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, (৫) শ্রদ্ধা অর্থ গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, (৬) সমাধান অর্থ—সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা। (৪) মুমুক্ষুত্ব অর্থ—মোক্ষের ইচ্ছা। "অথ" অর্থ এই চারিটি সাধনের অনন্তর। "অতঃ" শব্দের অর্থ—এই হেতু। ইহার অর্থ বেদাধ্যয়ন দ্বারা কর্ম্মের ফল অনিত্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিত্য—এই কথা জানা যায় বলিয়া "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাসাধ্য বিচার কর্ত্তব্য।

সেই ব্রহ্মের লক্ষণ কি, তজ্জন্য দ্বিতীয় সূত্র বলা হইতেছে—

দ্বিতীয় সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

ইহার অর্থ—জন্মাদি "অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও লয়, "অস্য" অর্থাৎ এই জগতের "যতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে হয়, তাহাই ব্রহ্ম।

এক্ষণে—সেই ব্রহ্মের প্রমাণ কি অথবা সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ কি না, তজ্জন্য তৃতীয় সূত্র বলা হইতেছে—

তৃতীয় সূত্র—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"

ইহার অর্থ—"শাস্ত্র" অর্থাৎ বেদ হইয়াছে "যোনি" অর্থাৎ জ্ঞানের উপায় যাহার তাহাই শাস্ত্রযোনি, তাহার যে ধর্ম্ম তাহাই শাস্ত্রযোনিত্ব, সেই শাস্ত্রযোনিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া 'ব্রহ্মের' প্রমাণ আছে, আর তাহাই বেদ। অথবা শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান যিনি, তিনি শাস্ত্রযোনি, তাহার যে ধর্ম্ম তাহা শাস্ত্রযোনিত্ব। সেই শাস্ত্রযোনিত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। প্রথম প্রকারের অর্থে ব্রহ্মের প্রমাণ আর এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থে ব্রহ্মের লক্ষণ পূর্ণ করিয়া বলা হইল।

সেই ব্রহ্মে যে বেদের তাৎপর্য্য তজ্জন্য বলা হইতেছে—

চতুর্থ সূত্র—তৎ তু সমন্বয়াৎ।

ইহার অর্থ—যদি বল, সেই ব্রহ্মই বেদের তাৎপর্য্য কেন হইবে? ধর্ম্ম বা কর্ম্মই বেদের তাৎপর্য্য কেন নয়? এতদুত্তরে বলা হইতেছে—তৎ তু সমন্বয়াৎ। "তু" অর্থ না, কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বেদের তাৎপর্য্য নহে, "তৎ" অর্থ সেই ব্রহ্মই বেদের তাৎপর্য্য, কারণ, "সমন্বয়াৎ" অর্থাৎ বেদবাক্যের সমন্বয় করিলেই বুঝা যায়। পণ্ডিতগণ বলেন, এই চারি সূত্রমধ্যেই এই সমুদায় ব্রহ্মসূত্রের বক্তব্য নিহিত আছে।

এইবার দেখা যাউক, এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের শেষ সূত্রটি কিরূপ—সেটি এই—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

ইহার অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অনাবৃত্তি হয় অর্থাৎ সংসারে আগমন আর হয় না। ইহা শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতে জানা যায়। আর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনাবৃত্তি হয় বলায় সংসার যে অজ্ঞানসম্ভূত তাহাও বলা হইল।

ইহাই হইল এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সূত্র সমূহের আকার ও প্রকারের কিঞ্চিৎ পরিচয়। ইহার বিশেষ পরিচয় ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচনা-কৌশল প্রসঙ্গে কথিত হইবে।

যাহা হউক, ইহার ৫৫৫টি সূত্রই চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটি পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং প্রত্যেক পাদ আবার কতকগুলি অধিকরণে অর্থাৎ বিচারে বিভক্ত করা হইয়াছে, আর প্রত্যেক অধিকরণ বা বিচার আবার কতকগুলি সূত্রদ্বারা রচিত হইয়াছে। যেমন—

অধ্যায়	পাদ	অধিকরণ	সূত্র
প্রথম অধ্যায়ে	প্রথম পাদে	১১টি অধিকরণে	৩১টি সূত্র আছে ;
"	দ্বিতীয় "	৭টি "	৩২টি " "
"	তৃতীয় "	১৩টি "	৪৩টি " "
"	চতুর্থ "	৮টি "	২৮টি " "
	মোট	৩৯টি অধিকরণে	১৩৪টি সূত্র আছে।
দ্বিতীয় "	প্রথম "	১৩টি "	৩৭টি " "
"	দ্বিতীয় "	৮টি "	৪৫টি " "
"	তৃতীয় "	১৭টি "	৫৩টি " "
"	চতুর্থ "	৯টি "	২২টি " "
	মোট	৪৭ অধিকরণে	১৫৭টি সূত্র আছে।
তৃতীয় "	প্রথম "	৬টি "	২৭টি " "
"	দ্বিতীয় "	৮টি "	৪১টি " "
"	তৃতীয় "	৩৬টি "	৬৬টি " "
"	চতুর্থ "	১৭টি "	৫২টি " "
	মোট	৬৭ অধিকরণে	১৮৬টি সূত্র আছে।
চতুর্থ "	প্রথম "	১৪টি "	১৯টি " "
	দ্বিতীয় "	১১টি "	২১টি " "
	তৃতীয় "	৬টি "	১৬টি " "
	চতুর্থ "	৭টি "	২২টি " "
	মোট	৩৮টি অধিকরণে	৭৮টি সূত্র আছে।

এইরূপে চারিটি অধ্যায়ের অধিকরণের ও সূত্রের সংখ্যা একত্র করিলে দেখা যায়—

প্রথম অধ্যায়ে ৩৯ অধিকরণে ১৩৪টি সূত্র
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ " ১৫৭টি "
তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৭ " ১৮৬টি "
চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৮ " ৭৮টি " আছে, আর ইহাদিগকে একত্র করিলে চারিটি অধ্যায়ে ১৯১ অধিকরণে ৫৫৫টি সূত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ইহাদের প্রত্যেক অধিকরণে কোন্ কোন্ সূত্র বা কত সূত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ, বৈয়াসিক ন্যায়মালা মধ্যে অথবা সদাশিবেন্দ্রসরস্বতী-কৃত ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা, অথবা রামকিঙ্কর ধর্ম্মকৃত-ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নামক বৃত্তি অথবা "ব্যাসসম্মতব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়ঃ" নামক গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য। ইহাতে দেখা যাইবে, কোন কোন অধিকরণে ১ হইতে ১৭টি পর্য্যন্ত সূত্র গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন মতের ভাষ্যমধ্যে এই অধিকরণ ও সূত্র-বিভাগ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, এই সব অধিকরণের নাম সূত্রমধ্যস্থ প্রধান পদ দ্বারা প্রায়ই করা হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারেও তাহা করা হয়। যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রদ্বারা যে অধিকরণটি হইয়াছে, তাহার নাম "জিজ্ঞাসাধিকরণ" বলা হয়। এ স্থলে সূত্রমধ্যস্থ "জিজ্ঞাসা" পদের দ্বারাই এই নামকরণ হইয়াছে। তদ্রূপ যেখানে একাধিক সূত্র দ্বারা একটি অধিকরণ রচনা করা হয়, যেমন পঞ্চম "ঈক্ষত্যধিকরণ"। এই অধিকরণে ৫ম সূত্র হইতে ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্র আছে। এই অধিকরণের প্রথম সূত্রের "ঈক্ষতি" পদ দ্বারা ইহার নাম "ঈক্ষত্যধিকরণ" করা হইয়াছে। সুতরাং একাধিক সূত্রের অধিকরণে সেই অধিকরণের

প্রথম সূত্রের প্রধান পদের দ্বারা নামকরণ করা হয়। তদ্রূপ "অতএব প্রাণঃ" (১।১।২৩) এই সূত্রে যে অধিকরণ হইয়াছে, তাহার নাম "প্রাণাধিকরণ" করা হইয়াছে। কিন্তু "প্রাণস্তথানুগমাৎ" (১।১।২৮) সূত্রে যে অধিকরণ করা হইয়াছে তাহার নাম "প্রাণাধিকরণ" না করিয়া "প্রতর্দ্দনাধিকরণ" করা হইয়াছে। ইহার কারণ, এই সূত্রের প্রধান পদ যে "প্রাণ" শব্দ, তদনুসারে ইহার নাম "প্রাণাধিকরণ" করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণাধিকরণের সহিত ইহার অভেদ হইবার শঙ্কা হইত। এই কারণে এ স্থলে এই "প্রাণস্তথানুগমাৎ" এই সূত্রে যে শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে, সেই শ্রুতি অনুসারে ইহার নাম "প্রতর্দ্দনাধিকরণ" করা হইয়াছে। কারণ, সেই শ্রুতিবাক্যটি কৌষীতকি উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন আখ্যায়িকার একটি বাক্য। এইরূপে অধিকরণের নাম সর্ব্বত্র অধিকরণের প্রথম সূত্রের মুখ্যপদ দ্বারাই করা হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। অথবা কোথাও কোথাও বিষয় শ্রুতি অথবা প্রতিপাদ্য বিষয়াদি অনুসারে করা হইয়া থাকে।

স্থূলভাবে ইহাই হইল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইবার দেখা যাউক, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের এইরূপ বাহ্যিক পরিচয় লাভ করিয়া ফল কি? ইহাতে ত তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন জ্ঞান লাভও হইতেছে না? ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাতে ত তাহার কোন সহায়তা হইতেছে না?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এই বাহ্যিক পরিচয়লাভেরও ফল আছে। বস্তুতঃ, ইহাতে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞানই পরিপুষ্টি লাভ করে।

প্রথম, ইহার পূর্ব্বোক্ত নানা নাম হইতে জানা যায় ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি? কারণ, ইহাতেই অনেক মতভেদ ঘটিয়াছে। যেমন "বেদান্তদর্শন" ইহার এই নাম হইতে জানা যায় যে, ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বের কথাই আলোচিত হইয়াছে, এবং যে দার্শনিক তত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা বেদান্ত বা উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত। তাহা স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত বিষয় নহে। অতএব যুক্তি-তর্কের স্থান ইহাতে গৌণ, মুখ্য নহে।

এই "ব্যাসসূত্র" নাম হইতে বুঝা যায় যে, ইহা বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসদেবের রচিত। ইনিই বাদরায়ণ নামে সূত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছেন। আর তজ্জন্য যে সব সূত্রে কোন নাম নাই, সেখানে ইহাতে বেদান্তের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তই আছে।

"শারীরকমীমাংসা" বা "শারীরকসূত্র" এই নাম হইতে জানা যায় যে, এই কুৎসিত শরীররূপ উপাধি, যে চৈতন্য ধারণ করিয়াছেন, তিনিই শারীরকপদবাচ্য হন বলিয়া তিনিই জীবপদ বাচ্যও হন। সেই জীবের স্বরূপ যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য সম্বন্ধে যে সব ভ্রম বা সংশয় হয়, তাহার একটা মীমাংসা ইহাতে আছে। উপাধিহীন চৈতন্যের ভেদ কল্পনা করা যায় না বলিয়া জীবের স্বরূপ ও চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ যে অভিন্ন, তাহাও এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে। শারীর পদের উত্তর ক-প্রত্যয় দ্বারা শরীরকে কুৎসিত বলায় শারীরজীব যে চৈতন্যের অঙ্গ নহে তাহাও বুঝা যায়। এইরূপে এই নামটি হইতে জীব-ব্রহ্মের অভেদ যে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, তাহাই বুঝা যায়। শারীরকসূত্র এই নাম হইতে এই সব কথা যে সূত্রাকারে গ্রথিত তাহাও বুঝা যায়।

"উত্তর-মীমাংসা" এই নাম হইতে বুঝা যায়—ইহা বেদের শেষ অংশ, যে বেদান্ত বা উপনিষৎ, তাহার মীমাংসা, অথবা বেদার্থের শেষ মীমাংসারূপ গ্রন্থ। সুতরাং "পূর্বমীমাংসার" লক্ষ্য যে কর্ম্ম বা ধর্ম্ম, তাহা ইহার লক্ষ্য নহে; ইহাতে যে মীমাংসা আছে, তাহাতেই বেদার্থের চরম তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মমীমাংসা" বা "ব্রহ্মসূত্র" এই নাম হইতে জানা যায়—বেদের লক্ষ্য ব্রহ্মবস্তু। "পূর্ব্বমীমাংসার" লক্ষ্য যে কর্ম্ম বা ধর্ম্ম, তাহা ইহার লক্ষ্য নহে। বেদার্থের চরম তাৎপর্য্য ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই ইহাতে সূত্রিত বা সূচিত হইয়াছে।

"ভিক্ষুসূত্র" এই নাম হইতে জানা যায়—ইহা সন্ন্যাসীদিগের অবলম্বনীয় গ্রন্থ। সুতরাং গৃহস্থের কর্ম্মকাণ্ডের কথা ইহার আলোচ্য নহে। আর পাণিনি সূত্রে ইহা "পারাশর্য্য" ব্যাসরচিত বলায় সূত্রোক্ত বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহাও বুঝা যায়। তাহার পর এতদ্দ্বারা ইহার রচনা-কালেরও একটা আভাষ পাওয়া যায়। আর তজ্জন্য ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত তৎকালের দার্শনিক বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহাতে খণ্ডিত সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মতগুলির প্রাচীন রূপ আবিষ্কার করিয়া ইহার সূত্রার্থ বুঝা আবশ্যক। ঐ সব মতবাদের আধুনিকরূপের সহিত সূত্রার্থের সম্বন্ধ অল্প।

এইরূপে এই সব কথা ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন নাম হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থের নাম কি, তাহা এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় না। তদ্রূপ ইহার প্রণেতা কে, তাহাও স্পষ্টভাবে এ গ্রন্থে উক্ত হয় নাই। ইহাই হইল এই গ্রন্থ সম্বন্ধীয় বাহ্যিক অবান্তর কথার আলোচনার প্রথম ফল। এইবার দেখা যাউক—ইহার দ্বিতীয় ফল কি?

দ্বিতীয়তঃ, ইহার সূত্রসংখ্যার জ্ঞান থাকিলে ইহার সূত্রসমূহের আরম্ভ ও শেষ কোথায়, তাহার একটা নিয়মের প্রতি লক্ষ্য পতিত হয়। কারণ, বিভিন্ন ভাষ্যে এই সূত্রসংখ্যার অন্যথা দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ভাষ্যে একটি সূত্রকে দুইটি করায় অথবা দুইটি সূত্রকে একটি সূত্র করায়, সূত্রসংখ্যার ব্যতিক্রম হইয়াছে। তদ্রূপ কোন ভাষ্যে কোন সূত্র বর্জ্জন, কোন নূতন সূত্র গ্রহণও করা হইয়াছে—দেখা যায়। এই সূত্রসংখ্যার জ্ঞান থাকিলে এই সব বিষয়ে একটা নিয়ম আবিষ্কারের জন্য একটা চেষ্টা হইবার কথা, আর তাহার ফলে সূত্রার্থ বুঝিবার সহায়তা হইবে।

তৃতীয়তঃ, অধিকরণ-সংখ্যার জ্ঞানেও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে। কারণ, পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন অধিকরণ রচনা করিয়াছেন দেখা যায়। অধিকরণগুলি এক একটি পৃথক্ বিচার; সুতরাং অধিকরণ বিভাগের অন্যথা হইলে বিচার্য্য বিষয়েরও অন্যথা হইয়া যাইবে। এজন্য অধিকরণ-সংখ্যা ও সূত্রসংখ্যার জ্ঞান ব্রহ্মসূত্রার্থ বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, অধ্যায় বিভাগ ও পাদবিভাগে কোন মতভেদ নাই। ইহার জ্ঞান থাকিলে এক অধ্যায়ের কথা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হইলে তাহা তখন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইবার কথা। সুতরাং তাহার বল নিজ অধ্যায়ের বিষয়ের সহিত সমান হয় না। যেমন প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মে শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় দ্বারা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মতান্তরের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন

দ্বারা তত্ত্বনির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, এমন যদি তৃতীয় অধ্যায়ের ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ ভাবের তত্ত্ব-কথা থাকে, তাহা হইলে তাহা তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নহে, কিন্তু সাধনের উদ্দেশ্যে কথিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার পর অধ্যায়-বিভাগের জন্য ব্যাসদেবের বৈদিক সাহিত্যের অনুকরণে সূত্রাবয়বের পুনরুক্তি করিয়াছেন, গ্রন্থশেষের জন্য সমগ্র সূত্রের পুনরুক্তি করিয়াছেন, কিন্তু পাদবিভাগের জন্য সেরূপ কোন লক্ষণ সূত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। অথচ পাদ-বিভাগে সকলেই একমত। এজন্য মনে হয়, স্বরিতাদি স্বর বিশেষের দ্বারা সূত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল, তাহা দেখিয়া পাদশেষ বুঝিতে পারা যাইত। আর তজ্জন্য বুঝিতে হইবে সূত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য ব্যাসদেবের সম্প্রদায়াগত ব্যাখ্যার মূল্য অধিক হইবার কথা।

এইরূপে এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সম্বন্ধে বাহ্যিক বা অবান্তর কথাগুলি ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে। অনেকেই বেদান্তদর্শন আলোচনা করেন, কিন্তু এই সব বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। যাহার অর্থ লইয়া সকল সম্প্রদায় বিবাদে প্রবৃত্ত, যাহার অর্থের উপর আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ভর করে, যাহার অর্থ অনুসারে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার পক্ষে যাহা সহায় হয় তাহার জ্ঞানও আবশ্যক। কিন্তু এই আবশ্যকতা আরও অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়, যখন আমরা দেখি—এই সব বাহ্যিক কথার আলোচনা করিয়া আজকাল অনেক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মনীষী বেদান্তদর্শনের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলেন, কেহ বা ইহাকে বৌদ্ধ চিন্তার ফল বলেন, কেহ বা ইহাকে বেদব্যাস রচিতই বলেন না, কিন্তু কোন বাদরায়ণ নামধেয় ব্যক্তির রচিত বলেন, কেহ বা ইহাকে আধুনিক গ্রন্থই বলেন, এইরূপ নানা কথা নানা মনীষী বলিয়া থাকেন। ইহার ফলে বেদান্তদর্শনে আমাদের প্রামাণ্য-বুদ্ধি থাকে না, ইহাতে শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বেদান্তে অপ্রামাণ্যবুদ্ধি জন্মিলে বা ইহাতে শ্রদ্ধা হ্রাস হইলে আমাদের বৈদিক সমাজের যে কি ক্ষতি, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সব কথার সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগকেও এই সব অবান্তর কথার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। এই জন্য এস্থলে এই সব কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। অতঃপর আমরা দেখিব, আমাদের প্রতিজ্ঞাত দ্বিতীয় বিষয়টি কি অর্থাৎ এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যটি কি? [ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ

ইতিহাসের অনুসরণ

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

লর্ড লিটনের আমলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ কেন ঘটিয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকট অনেকটা অজ্ঞাত। সাধারণ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মধ্য-এসিয়ার তুর্কী রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া রুশ তাহার রাজ্যের সীমা প্রায় ভারতের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ঘটে। আফগান রাজ্যের আমীর শের আলী ইংরেজ রাজদূত সার নেভিল চেম্বারলেনকে খাইবার গিরি-সঙ্কটের পার্শ্বস্থ আলি মসজেদ অতিক্রম করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই; অধিকন্তু তিনি রুশ-দূত সেনাপতি ষ্টোলিওটফকে (Stolietoff) সসম্মানে কাবুলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এইটুকু মাত্র জানিলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের প্রকৃত কারণ বুঝা যাইবে না। উহার অন্তরালে এমন অনেক কথা আছে—যাহা না জানিলে প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে আমি তাহার কিছু আভাস দিব।

লর্ড ডালহৌসীর শাসন-কালে ইংরেজ সরকার ভারতের বহু স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। উহাতে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। সে অসন্তোষও সিপাহি-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। সেই জন্য সিপাহি-বিদ্রোহের অবসান হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ঘোষণা-বাণীর মধ্যে এ কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের রাজ্যের বর্ত্তমান সীমানা আর বিস্তৃত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। (We desire no extension of our present territorial possession)।" সকলেই সে জন্য যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "সর্ব্বশক্তির আধার পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব-শক্তি পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের এই ইচ্ছা প্রতিপালিত করিবার জন্য দৃঢ়তা দান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।" ভারতবাসী অবশ্য এই উক্তির ব্যতিক্রম হইবে না মনে করিয়াছিল।

কিন্তু অধিক দিন অতিক্রান্ত না হইতেই ইংরেজ রাজনীতিকগণ সেই রাজকীয় প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেলেন। ইহার অল্প দিন পরেই বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলিলেন যে, তাঁহারা ভারতের বাহিরে একটি বৈজ্ঞানিক সীমা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার টানিয়া লইয়া যাইবেন। লর্ড ডালহৌসীর আমলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার খেলাতের খাঁয়ের সহিত এক সন্ধি করেন। সেই সন্ধির ফলে খেলাতের খাঁ সাহেব আপনাকে ভারত সরকারের সামন্ত রাজন্যে পরিণত এবং কোয়েটা অঞ্চল ইংরেজকে দান করেন। ইহাতে আফগান রাজ্যের অধিবাসীদিগের মনে কতকটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতে লর্ড ডালহৌসীর হাতে অনেক কাজ ছিল; সে জন্য তিনি ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রথমে এই সন্ধির সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন সকলেরই মনে ধারণা জন্মিল, ইংরেজ আর তাহার অধিকার বিস্তার করিবেন না,—তখন ইংরেজের সৈন্য কোয়েটায় উপস্থিত হইলে সকলেরই চমক

ভাজায় ভারতের এবং আফগান রাজ্যের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

লর্ড ডালহৌসীর আমলেই আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল ম্যাকেসন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জনৈক আফগানের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইনি যে কেবল বৃটিশ সরকারের জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন তাহা নয়, লর্ড ডালহৌসীর এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে ডালহৌসী স্বজন-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করেন। তবে লর্ড ডালহৌসী প্রথম আফগান যুদ্ধের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভুলিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সমীচীন মনে করেন নাই। এ বিষয়ে জন লরেন্সের সহিত একমত হইয়া তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময় (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) খোকানের খাঁ সাহেব ভারতীয় বৃটিশ সরকারের নিকট রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার প্রার্থনা জানান। ইংরেজ সরকার সে প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। তাঁহারা রুশিয়ার সহিত গায়ে পড়িয়া বিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। আফগান রাজ্যের আসল আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ তখন ভারতে বৃটিশ সরকারের হাতে বন্দী। খোকানে রুশ অভিযান এবং পারস্যের সহিত সম্ভাবিত হাঙ্গামার জন্য পেশোয়ারের তদানীন্তন কমিশনার হার্ব্বার্ট এডোয়ার্ডস লর্ড ডালহাউসীকে পরামর্শ দিলেন যে, ভারতের অত্যন্ত সন্নিহিত আফগান রাজ্যের সহিত বৃটিশ সরকারের মিত্রতা করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য। মেজর হার্ব্বার্ট এডোয়ার্ডস পরামর্শ দিলেন যে, দোস্ত মহম্মদ খাঁকেই আবার আফগান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এডোয়ার্ডস জানিতে পারিলেন যে, দোস্ত মহম্মদ ভারতীয় বৃটিশ সরকারের সহিত সাহচর্য্য করিতে সম্মত আছেন। সার জন লরেন্স কিন্তু ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমীরের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই আফগান রাজ্যের রাজনীতিক অবস্থার এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সহিত এমন ভাবে বিজড়িত হইতে হইবে যে, তাহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় মনে হইবে না। লর্ড ডালহৌসী বলিলেন, "উহা বাঞ্ছনীয় বটে, তবে উহা করা অত্যন্ত কঠিন।" ফলে সহজে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইল না। তখন লর্ড ডালহৌসী উহার চরম নিষ্পত্তির ভার হার্ব্বার্ট এডোয়ার্ডসের হস্তে দিলেন। মেজর এডোয়ার্ডস এই বিষয়ে যে কথোপকথন চালাইয়াছিলেন, তাহার ফলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আফগানের আমীরের সহিত বৃটিশ সরকারের এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আমীর বৃটিশ সরকারের যাঁহারা বন্ধু, তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবেন এবং বৃটিশ সরকারের যাঁহারা বিপক্ষ, তাঁহাদের সহিত বিপক্ষতা করিবেন স্থির হয়। সার জন লরেন্সও (পরে লর্ড লরেন্স) এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের সহিত বৃটিশ সরকার আর একটি সন্ধি করেন। তখন পারস্যের সহিত বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ বাধিয়াছে। ঐ সন্ধিতে এই সর্ত্ত হয় যে, পারস্য এবং বৃটিশ সরকারের বিবাদের যত দিন অবসান না হইবে, তত দিন প্রতি মাসে আফগান রাজ্যের আমীর এক লক্ষ করিয়া টাকা সাহায্য পাইবেন। কিন্তু যে দিন ঐ বিবাদের অবসান হইবে, সেই দিন হইতে বৃটিশ সৈন্য ভারতে ফিরিয়া আসিবে এবং আফগান রাজ্যের মাসহারা-প্রাপ্তিও বন্ধ হইবে। অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের মর্জ্জি অনুসারে কাবুলে এক জন বৃটিশ দূত রাখিতে হইবে। এই ব্যক্তি হইবেন মুসলমান—য়ুরোপীয় হইবেন না। অধিকন্তু, পেশোয়ারে কাবুল সরকারের এক জন প্রতিনিধিও রক্ষিত হইবে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র শের আলি খাঁ হইলেন কাবুলের আমীর। ইনি ইংরেজের দূতরূপে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে আফগান-রাজের দরবারে উপস্থিত থাকিবার প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নাম আতা মহম্মদ। তিনি উচ্চবংশীয় সুশিক্ষিত চতুর এবং কর্ম্মকুশল। তিনি অতি সুন্দর ভাবেই দূতের কার্য্য পরিচালিত করিতেছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময়ে রক্ষণশীল দল বিলাতের শাসন-তরণী পরিচালনের ভার পাইয়াছিলেন। ডিসরেলী ছিলেন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। রাজ্যজয়ে তাঁহার বুভুক্ষা ছিল অসাধারণ। আফগান রাজ্যের উপরে যে তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে নাই,—তাহা মনে হয় না। তিনি প্রস্তাব করেন যে, আফগান দরবারে এক জন য়ুরোপীয় দূত রাখিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শের আলি তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতের বড়লাট। তিনি ঐ প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু ডিসরেলী হইলেন নাছোড়বান্দা। তিনি লর্ড নর্থব্রুককে কেবল বুঝাইতে লাগিলেন—ইংরেজের রাজনীতিক কূটনীতি কোন ভারতবাসীই বুঝে না। উহা ইংরেজরা বুঝে। এ দিকে আমীর অটল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেই মুসলমান রাজদূতের পদে ইংরেজ রাজদূত বসাইবার বিশেষ চেষ্টা হয়। লর্ড সলসবারি তখন ভারত-সচিব। মিষ্টার ডিসরেলী এবং লর্ড সলসবারি দুই জনেই ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। লর্ড নর্থব্রুক দৃঢ়চিত্ত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি সাম্রাজ্যবাদী হইলেও এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। লর্ড সলসবারি অবশ্য এক ডেসপ্যাচে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, "যে মুসলমান ভদ্রলোকটি এখন কাবুলে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি আছেন, তিনি বুদ্ধিমান এবং বিবেচক, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আমীর যে সকল তথ্য আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করেন না, তাহা তিনি আপনাকে জানাইতে সমর্থ হইবেন না। ধর্ম্ম-বিষয়েও দূতদিগের নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক। এ গুণ কেবল য়ুরোপীয়তে সম্ভবে ইত্যাদি।"

এ দিকে আমীর কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমীর এবং আফগান জাতি য়ুরোপীয় দূতদিগের কার্য্যে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না। মনে হয়, রাও হোলকারের গদিচ্যুতি ব্যাপারে এই সন্দেহ এ দেশের সকলের মনে ঘনীভূত হইয়াছিল। তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র দূতদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা যে অনেক ভারতবাসীর এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতির মনে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি, যে জেনারেল গর্ডন খার্তুম নগরে মেহেদী-হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তিনিও ইংরেজ কূট রাজনীতিকদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিতেন! তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "আমাদের কূট রাজনীতিকগণ প্রতারক এবং সরকারী কার্য্য সম্পাদন হিসাবে সাধু নহেন। আমি অবশ্য বলিব যে, আমি আমাদের কূট রাজনীতিকদিগকে ঘৃণা করি। আমি বলিব, কয়েক জন ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অপর সকলে অতি কদর্য্য বঞ্চক।

আমার মনে হয়, তাঁহারাও তাহা জানেন (১)। কেবল সেনাপতি গর্ডন এই কথা বলেন নাই। নীতিধর্ম্ম-বিষয়ক লেখক Carveth Reid অন্ত জাতির মধ্যে ঐরূপ ধারণা আছে, তাহা বলিয়াছেন। গর্ডন, রীড প্রভৃতি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা বলা যায় না। তবে সকল কূট রাজনীতিক যে প্রতারক এবং কদর্য্য-স্বভাব তাহা মনে হয় না। তাহা না হইলেও এদেশীয়দিগের মনে এরূপ একটা ধারণা কোম্পানীর আমল হইতে জন্মিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই কাবুলে বৃটিশ দূত প্রতিষ্ঠিত করিতে শের আলির পক্ষে সঙ্কোচ স্বাভাবিক। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, আফগান আমীর এবং তাঁহার প্রজাদিগের মনে ধারণা জন্মিল, সার উইলিয়াম ম্যাকনটেন আফগান দেশে নানারূপ বিবাদ বাধাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনটেনের অনুমোদন অনুসারেই তাঁহার সহকারী ক্যাপ্তেন জে, বি, কোনোলী বৃজিনবাদ সর্দ্দারগণকে, সেরিয়ান খাঁকে এবং অন্যান্য সিয়া-মতাবলম্বীদিগকে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার জন্য যে উত্তেজনা জোগাইয়াছিলেন, তাহা আফগানদিগের অজ্ঞাত ছিল না। সে কথা আর গোপন নাই। উহা পরে সরকারী কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং আমীর আর ইচ্ছা করিয়া নিজ গলায় ফাঁসী পরিতে চাহিলেন না। তিনি সে কথা ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডিসরেলী-চালিত বৃটিশ মন্ত্রি সভায় ভারত-সচিব লর্ড সল্‌সবারি নাছোড়বান্দা। তিনি বার-বার লর্ড নর্থব্রুককে এই কার্য্য করিবার জন্য জিদ করিতে থাকিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে লর্ড নর্থব্রুক লর্ড সলসবারির ডেস্‌প্যাচের উত্তর দানে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহাদের মতের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আমি বলিতেছি যে, আমীর তাঁহার দরবারে এক জন ইংরেজ দূত লইতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না।" কিন্তু বিলাতী মন্ত্রীদল যাহা মনস্থ করিবেন, তাহা না করিয়া ছাড়িবেন না! সুতরাং তাঁহারা লর্ড নর্থব্রুকের উপর বিশেষ ভাবে চাপ দিতে লাগিলেন। ভারত সচিব কুটিল পথ ধরিয়া কার্য্যসিদ্ধির পরামর্শ দিলেন।

মার্কুইস্ অব সলসবারি যে ভাষায় লর্ড নর্থব্রুককে কাবুলে দূত-প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল (২)। লর্ড নর্থব্রুক ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। তিনি তাঁহার জবাবে বলিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ যে মুসলমান ভদ্রলোকটি কাবুলের দরবারে বৃটিশ দূতের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনি কোন কথা গোপন করিতেছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি আমীরকে সকল কথা জানাইয়া তবে পাঠান ইহা ঠিক নহে। আমীরের ইচ্ছা অনুসারে তিনি কোন কথা গোপন করেন না। দ্বিতীয়তঃ, কূট পথ অবলম্বন করিলে আমীর তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি আর তাঁহার দরবারে ইংরেজ দূত-গ্রহণে সম্মত হইবেন না। অধিকন্তু, আমি আমার ৭ই জুন তারিখের ডেস্‌প্যাচে বলিয়াছি যে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমীরের সহিত লর্ড মেয়ো উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে সর্ত্ত করিয়াছিলেন,—কাবুলে য়ুরোপীয় রাজদূতের প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা লঙ্ঘন করা হইবে, এবং তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে না। ডিস্‌রেলী সরকার লর্ড নর্থব্রুকের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অগত্যা লর্ড নর্থব্রুক ভারতের বড়লাটের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পর লর্ড লিটন ভারতে আসিয়াছিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে লর্ড লিটন কখনই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি কেবল কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অযোগ্য লোককে ভারতের শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল দেখিয়া বিলাতের লোক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড সলসবারি চাহিয়াছিলেন এমন এক জন লোক—যিনি বিনা-বিচারে তাঁহার হুকুম তামিল করিবেন। অতঃপর লর্ড ক্র্যানব্রুক বিলাতী মন্ত্রিসভায় ভারত-সচিব হইয়াছিলেন এবং মিষ্টার ডিসরেলীই আভিজাত্য লাভ করিয়া লর্ড বিকনফিল্ড নাম ধারণ করিয়াছিলেন। লর্ড ক্র্যানব্রুক অপেক্ষাকৃত ধীর-পন্থী ছিলেন। লর্ড লিটন ভারতে আসিবার পরই আবার আফগান রাজ্যে ইংরেজ দূত প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে বিঘ্নসঙ্কুল, তাহা লিটনের ন্যায় লোকের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। আফগান জাতি অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তাহারা কোন কথা সহজে বিস্মৃত হয় না, প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য তাহাদের দেশে যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। সেই জন্য কোন ইংরেজের জীবন আফগান রাজ্যে নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সে জন্যও আমীর তাঁহার দরবারে বৈদেশিক দূত গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

ইতোমধ্যে একটা বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। রুশাধিকৃত তুর্কিস্থানের রুশ শাসক কাবুলে এক জন দূত পাঠাইবার প্রস্তাব

---

(১) Our diplomatists are conies and not officially honest. I must say I hate our diplomatists. I think with few exception they are arrant house bugs and I expect they know it.

(২) The first step. therefore, in establishing our relations with Amir upon a more satisfactory footing, will be to induce him to receive a temporary embassy in his capital. It need not be publicly connected with the establishment of a permanent mission within his dominion. There would be many advantages in ostensibly directing some object of smaller political interest which it will not be difficult for your Excellency to find or if need be to create. I have therefore to interest you on behalf of Her Majesty's Government * * * to find some occasion for sending a mission to Cabul, and to press the reception of the mission very earnestly upon Amir.

করিয়াছিলেন। আমীর সাগ্রহে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ, আফগান রাজ্য তখন দুইটি ভাসমান লৌহ-পাত্রের মধ্যস্থ মৃন্ময় ঘট মাত্র। কখন কাহার আঘাতে তাহাকে তলাইয়া যাইতে হইবে তাহা বুঝা কঠিন। তখন বৃটিশ সরকার কাবুল হইতে তাহাদের মুসলমান দূতকে সরাইয়া লইয়াছিলেন। কাযেই পরিণাম-ভীত আমীর অন্ত প্রবল পক্ষের সহিত মিত্রতা করিবার জন্ত আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রুশ মিশন কাবুলে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। লর্ড লিটন সে কথা লর্ড ক্রানক্রককে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ক্রানক্রক এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়া তথ্যাবধারণ করিবার কথা বলিলেন। কিন্তু লর্ড লিটন আফগান রাজ্যে এক জন বৃটিশ দূত রাখিবার জন্ত বড়ই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাশিয়া কর্তৃক আফগান রাজ্যে এই দূত প্রেরণ ব্যাপারটি সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপক হইলেও অদূরদর্শী লর্ড লিটন উহা ভারতীয় সমস্তায় পরিণত করিবার জন্ত ক্রানক্রককে তারযোগে জানাইয়াছিলেন যে, আফগান রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিলে উহার ফলে ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে এবং অবস্থা অত্যন্ত বিপদ্সঙ্কুল হইয়া পড়িবে। লর্ড ক্রানক্রক ব্যাপারটা সাম্রাজ্য-সম্পর্কিত বলিয়া মনে করিলেও লর্ড লিটনের প্ররোচনাতেই উহা ভারতীয় সমস্তার মধ্যে গণনা করিলেন। তিনি অবিলম্বে কাবুলে বৃটিশ দূত রাখিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন। এ-দিকে বিলাতের তদানীন্তন মন্ত্রী লর্ড বিকন্সফিল্ডও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বিলাতের পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়া-ছিলেন যে, ঐ অবস্থায় রাশিয়া যাহা করিয়াছে তাহা অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু "ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।" লর্ড লিটনের জিদই বজায় রহিল। মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেনকেই কাবুলের দূত-পদে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইয়াছিল; এই দূত প্রেরণের প্রস্তাব-সম্বলিত পত্রের বাহক হইয়াছিলেন নবাব গোলাম হোসেন খাঁ। ইনি আতা মহম্মদ খাঁর পূর্ব্বে কাবুলের দরবারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কাবুল দরবারের বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। লর্ড লিটন যেন ইচ্ছা করিয়াই কাবুল দরবারের অপ্রীতিভাজন এই ব্যক্তিকে পত্র-বাহকের পদে বরণ করিয়াছিলেন। পত্রের ভাষাও বিশেষ সৌজন্ত-সূচক ছিল না। সে পত্রের অংশ এ স্থানে বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। এই সময়ে আমীরের এক পুত্রবিয়োগ-হেতু তাঁহার মন বড় বিষণ্ণ ও চঞ্চল হইয়াছিল। এ-দিকে দূত সার নেভিল চেম্বারলেনের সহিত এত অধিক লস্কর পাঠান হইয়াছিল যে, উহা যেন এক অভিযাত্রী চমূর ন্তায় বোধ হইতেছিল। আমীর এ বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্ত সময় চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে তখন সময় দেওয়াও লর্ড লিটন সঙ্গত মনে করেন নাই। যাহা হউক, ৪০ দিন শোক-পালনের পর আমীর সুষ্ঠু ভাষায় লর্ড লিটনের পত্রের জবাব দিলেন। তাহার পূর্ব্বেই ভারতের তদানীন্তন জঙ্গীলাট লর্ড লিটনকে কাবুলে অভিযান করিবার সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড লিটন আফগান রাজ্যটি আয়ত্ত করিবার জন্ত সঙ্কল্প-আরূঢ় হইয়াই ছিলেন। তিনি কর্ণেল কেলি (Colley), মেজর রবার্টস এবং মেজর ক্যাভেগনারী নামক তাঁহার সমতাবলম্বী তিন জন সামরিক পুরুষের মত শুনিয়াই কাবুলে দূত পাঠাইবার জন্ত দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিলেন।

কর্ণেল কেলি এই বিষয়ে এতই আগ্রহশীল ছিলেন যে, তিনি এইরূপ শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পাছে আমীর বিলাতী সরকারের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পান; তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। পুত্রশোক কতকটা প্রশমিত হইলে আমীর ভারতের বড়লাটকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে সৌজন্তের কোন অভাব ছিল না। আমরা সেই বিস্তৃত পত্র এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। আমীর অন্তান্ত কথার মধ্যে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রশোকে কাতর ছিলেন বলিয়া হয় ত তাঁহার পত্রের উত্তর সুষ্ঠু হয় নাই; কিন্তু সে জন্ত কিছু মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সপার্ষদ লর্ড লিটনের মন তাহাতে বিগলিত হয় নাই।

এ-দিকে আমীরের আদেশ-মত বৃটিশ দূতগণ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পেশোয়ার হইতে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর সার নেভিল পেশোয়ার হইতে যাত্রা করেন। মেজর কাভেগনারী অপেক্ষাকৃত অল্প লোক লইয়া আলি মসজেদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তথায় আমীরের সৈন্তগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমীরের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবেন। এ-দিকে স্বয়ং সার নেভিল জামরুদ দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফলে আমীর কর্তৃক বৃটিশ দূতগণকে এইরূপ বাধা-দানকার্য্য লর্ড লিটনের সরকারের নিকট অত্যন্ত গুরু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তিনি বরং আফগান রাজ্য বিজয় করিবার ইহাই সুযোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি আমীরকে যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহা যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের চরম পত্র। তিনি আমীরকে লিখিয়াছিলেন যে, ২০শে নভেম্বরের মধ্যে আমীর যদি ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক কাবুলে স্থায়িভাবে বৃটিশ দূত রাখিবার প্রস্তাব স্বীকার করিয়া ঐ পত্রের উত্তর না দেন, তাহা হইলে আর কোন কথা না বলিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমীর ঐ তারিখের মধ্যে লর্ড লিটনের পত্রের কোন জবাব দেন নাই। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার পূর্ব্ব হইতে ভারত সরকার আফগান-সীমান্তে বহু সেনা সমাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন ইঙ্গিত মাত্র বিশাল বৃটিশ বাহিনী আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ২১শে নবেম্বর হইতে বৃটিশ বাহিনী আফগান রাজ্যে প্রবেশ আরম্ভ করে। ইংরেজ সৈন্ত তিন দিক্ দিয়া আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকিল। আমীর শের আলি রাশিয়ার নিকট হইতে যে সাহায্য পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। তিনি নিরাশ হইয়া রুশ-অধিকৃত তুর্কীস্থানে পলায়ন এবং তথায় দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডামক নগরে ইংরেজ সরকারের সহিত এক চুক্তি করিলেন। এই চুক্তিতে ইংরেজের যাহা অভিপ্রেত তাহাই তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সাধারণ ইতিহাস-পাঠক তাহা অবশ্য জানেন। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। এই ব্যাপারে লর্ড লিটন কিন্তু বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া-ছিলেন। তিনি ছিলেন উৎকট সাম্রাজ্যবাদী। লর্ড সলসবারিও

তাহাই। তাঁহাদের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার। কাজেই তাঁহারা যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। পক্ষান্তরে, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ মিষ্টার গ্লাডষ্টোন ছিলেন খাঁটি উদারনৈতিক। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল শান্তি, ব্যয়সঙ্কোচ এবং শাসন-সংস্কার। সুতরাং উভয়ের নীতিগত পার্থক্য অনেক ছিল। আফগান সংগ্রামে অর্থ অত্যন্ত অধিক বায়িত হইয়াছিল এবং লর্ড লিটনের শাসন কাল ব্যাপিয়া ভারতে ঘোর দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় করিতেছিল বলিয়া বিলাতের লোক আফগান অভিযানে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। মিষ্টার গ্লাডষ্টোন এই অভিযানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। ফলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিলাতে যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল, তাহাতে গ্লাডষ্টোনের উদারনৈতিক দল জয়যুক্ত হন। লর্ড লিটন ভারতীয় বড়লাটের পদ ত্যাগ করিলেন। ইতোমধ্যে আফগান রাজ্যে যে সব ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল, বিস্তারিত ভাবে এখানে তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ক্যাভেগনারীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিলাতের লোক বুঝিয়াছিল যে, আফগান রাজ্য অধিকার করিলে তাহার ফল ভাল হইবে না। ইহার ফলে বৃটিশ সৈন্য কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিল। কিন্তু ইহার মধ্যে উদারনৈতিক দল বিলাতী রাজনৈতিক তরণীর পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রক্ষণশীল দলের সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিত্যক্ত হইল। আফগান রাজ্য আর বৃটিশ অধিকারের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত হইল না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

গোয়ালিয়রে নবরাত্রি উৎসব

নবরাত্রি উৎসব আমাদের শারদোৎসবেরই নামান্তর। পিতৃপক্ষের শেষ হয় সর্ব্বপিতৃ-অমাবস্যার দিন, যে দিনটিকে আমরা "মহালয়া" বলি। পিতৃপক্ষের সমাপ্তির সঙ্গেই সুরু হয় দেবীপক্ষ। বৎসরের মধ্যে এই সময়টিই দেবীপূজার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত। যখন আকাশে বাতাসে আনন্দের সাড়া জাগে, মানুষের মনও আপনা থেকেই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। বাংলাদেশ শক্তিপূজার কেন্দ্র, সে জন্য এই সময়ে এখানে যত আড়ম্বর আয়োজন এবং আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে উৎসবের প্রকাশ—এ রকম আর কোথাও নয়। তাহলেও উৎসব সর্ব্বজনীন ও সারা ভারতের এবং ভারতের সর্ব্বত্রই শারদোৎসবের অনুষ্ঠান হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। বাংলার বাহিরে এ উৎসব নবরাত্রি উৎসব বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কর্ম্মব্যপদেশে মধ্য-ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রের উৎসবে যোগ দেবার সুযোগ আমার হয়েছিল, তাই যা কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, তার আলোচনা করবো।

মহারাষ্ট্রীয়েরা সাধারণতঃ শৈব, কিন্তু মহারাষ্ট্র-জাগরণের নেতা পুণ্যপ্রতাপ শিবাজী দেবী ভবানীর বরপুত্র বলে খ্যাত; ভবানী শিবাজীর কার্য্যে সুপ্রসন্না হয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদী খড়্গ এবং অস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। গোয়ালিয়রের মহারাষ্ট্রীয় সিন্ধিয়া রাজবংশ মহাদেবের উপাসক হলেও ভবানীর পূজা করে থাকেন। সে জন্য নবরাত্রির ক'দিন রাজ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয়। সরকারী মন্দির ও রাজ্যের মধ্যে যেখানে দেবীর মন্দির আছে, সেখানে শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্য্যন্ত ঘটা করে পূজা হয়। প্রত্যেকটি মন্দির এই সময় পুষ্পমাল্য, পতাকা ও সহকার-শাখায় সাজানো হয়; সন্ধ্যার পর দীপমালায় বিভূষিত হয়ে মন্দির অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। নৈশ আকাশের বক্ষে প্রজ্বলিত দীপাবলীর কম্পমান শিখায় মন্দির যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কোন কোন মন্দিরে যে আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে তা বোঝা যায় বিদ্যুৎ-বাতিতে সজ্জার ব্যবস্থা দেখে। বিদ্যুৎ-বাতির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে সাজানোর উদ্দেশ্য সফল হয় বটে, কিন্তু প্রদীপের মালায় যে কমনীয়তা ও স্নিগ্ধ পবিত্রতা—বিদ্যুৎবাতিতে তা পাওয়া যায় না।

এ ক'দিন প্রত্যহ উষাগমের সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে প্রভাত-ভেরীর সুমধুর সংকীর্ত্তন শ্রুতিগোচর হয়; তাছাড়া প্রতি দেবীমন্দিরে অষ্টপ্রহর বিভিন্ন দলের ভজন চলতে থাকে। সব ভজনের দলই পেশাদারী নয়, এই সময় ভজন গান করবার জন্য অনেকে পারিবারিক ভজন দল গঠন করেন। স্বয়ং মহারাজেরও ভজন দল সংগঠিত হয়। ভজন গান খুবই চিত্তাকর্ষক, এবং সমস্ত দিন একই দল গান করে না বলে মোটে একঘেয়ে লাগে না।

সাধারণ অধিবাসীরা, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে নবরাত্রি উৎসব পালন করেন। পালনের প্রথা অবশ্য এক রকম নয়। ঐক্য দেখলাম শুধু এই যে, ক'দিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সারিবন্দী মহিলারা পূজোপকরণ নিয়ে চলেছেন মন্দির-অভিমুখে, এবং এই অভিযান চলে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম; ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে যেন মন্দিরে মিশে যাচ্ছে!

পালনের সাধারণ রীতি, যা লক্ষ্য করলাম,—অধিকাংশ পরিবারে প্রতিপদের দিন ঘট স্থাপনা করা হয়। পূর্ণকুম্ভের উপর পঞ্চপল্লব দেওয়া হয় এবং ঘটের মুখে দেওয়া হয় একটি নারিকেল (বোধ হয়, সশীর্ষ ভাবের অভাবে)। ঘটই দেবীর প্রতীক এবং প্রতিপদের দিন থেকে দশমী পর্য্যন্ত প্রতি গৃহস্থ দুই বেলা এই ঘটের পূজা করে থাকেন। এই ন'দিন সকলের খুব আমোদ-প্রমোদে কাটে সন্দেহ নেই। সকলে নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ পরেন এবং এই ক'দিন চলে নিত্য ভোজ। কিন্তু গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর পক্ষে এ সময়টা কঠিন সংযমের—তাঁরা সমস্ত দিন উপবাসী থাকেন; সন্ধ্যার পর দেবীপূজা করে দুধ ও ফলাহার করেন। সাধারণ নিয়ম এই হলেও কেউ কেউ কঠিনতর ভাবেও নিয়ম পালন করেন। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুণ্যলোভাতুরা মহিলারাই কঠিনতার পক্ষপাতী তাঁরা ন'দিন পূর্ণ উপবাস করেন; প্রতি রাত্রে দেবীর পূজার প

প্রসাদ হিসাবে একটিমাত্র লবঙ্গ মুখে দেন। অপর দিকে আধুনিক ভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা সহজতম পন্থাই সুবিধাজনক মনে করেন; তাঁরা মাত্র মহাষ্টমীর দিন উপবাস করেন।

নবমীর রাত্রে ব্রত উদ্‌যাপন হয় হোম ও বলিদানের সঙ্গে; প্রায় প্রতি গৃহস্থই ছাগ ও মেষ বলি দেন। বাংলাদেশে যে কামারকে দিয়ে বলিদান করানোর প্রথা আছে, এখানে সে রকম কিছু নেই। গৃহস্বামীকে স্বহস্তে বলি দিতে হয়, অন্যথা পরিবারভুক্ত কেউ দিলেই চলে। যাঁরা প্রাণিহত্যার বিরোধী, তাঁরা লাউ কুমড়া ইত্যাদি বলি দিয়ে নিয়ম রক্ষা করেন।

ঘটস্থাপনার সময় আর একটি রীতি, যা খুবই কৌতুক উদ্রেক করেছিল—অনুষ্ঠানটিকে এ দেশে "জবারা" বলা হয়। যেখানে ঘট স্থাপিত করা হয় তার কাছাকাছি জায়গায় মাটীতেই হোক বা মাটীর পাত্রেই হোক শস্যের বীজ (সাধারণতঃ গম ও সরিষা) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ন'দিন জলসিঞ্চনে সেই বীজ থেকে গাছ জন্মায়, দশম দিনে পরীক্ষা করা হয় কার কত বড় ও কি রকম গাছ হয়েছে। এই পরীক্ষাটা সকলে সম্বৎসরের ভবিষ্যদ্বাণী বলেই মনে করে। যার গাছ যত বড় ও ঘন, সেই অনুপাতে তার সৌভাগ্য সূচিত হয়। সহরবাসীদের কাছে এটা একটা luck tryতেই পর্য্যবসিত হয়েছে; কিন্তু আমার মনে হয়, এর আসল তাৎপর্য্য আজও গ্রামবাসীরা হারায়নি। দেবী পূজার দোহাই দিয়ে চাষারা তাদের ঘরে যে শস্যের বীজ থাকে, তার পরীক্ষা করে নেয় এবং যার বীজ ভাল তার পক্ষে যে সেটা সৌভাগ্যের বৎসর, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নবরাত্রি উপলক্ষে মহারাজের পক্ষ থেকে যা কিছু অনুষ্ঠানাদি সবই হয়ে থাকে "গোর্‌খী মন্দিরে।" এই গোর্‌খী মন্দিরের ইতিবৃত্ত যা জানা যায়, এই প্রসঙ্গে বলে নিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন; কিন্তু এই প্রাসাদকে মন্দির হিসাবেই ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এখানেই আছেন সরকারী বিগ্রহগুলি—তাঁদের নিত্য পূজা করেন রাজ-পুরোহিতরা। সিন্ধিয়া পতাকা রাজকীয় নিদর্শনগুলি ও যে সকল সম্মানসূচক উপহার মোগল মসনদ থেকে সিন্ধিয়ারা পেয়েছেন, সেগুলিও পরম সমাদরে এই মন্দিরে রক্ষিত আছে এবং তাদেরও যথারীতি পূজা অর্চ্চনা হয়ে থাকে। কিন্তু এই মন্দিরের "গোর্‌খী" নাম হওয়ার কারণ এখানে শ্রী সাহের মনসুর সাহের সমাধি বা গোর আছে। কথিত আছে, মুসাফির ফকির মনসুর সাহের কৃপাতেই পানিপথের যুদ্ধের পর মহারাজ মাহারজী সিন্ধিয়ার জীবন রক্ষা হয়েছিল। সেই থেকে তিনি হলেন মাহারজী মহারাজের গুরু—তাঁকে জায়গীরও দেওয়া হয়েছিল। সে জায়গীরের বার্ষিক আয় অন্যূন ৬৪০০০৲ টাকা।

দশেরার দিন যে সব অভিনব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা থেকে সিন্ধিয়া রাজাদের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁদের কাছে নবরাত্রি-উৎসবের পারমার্থিক মূল্য যতটা থাকুক না থাকুক, যুদ্ধযাত্রার আয়োজনের উদ্যোগপর্ব্ব হিসাবে অনেক বেশী মূল্য আছে। সিন্ধিয়া রাজবংশের স্থাপনা থেকেই রীতি চলে আসছে, দশেরার দিন বিজয়-যাত্রায় বেরুতে হবে। তখনকার দিনে সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্টের এত কষাকষি ছিল না। দেশীয় নরপতিরাও এত Constitutional minded ছিলেন না। যেন তেন প্রকারেণ রাজ্য-বিস্তৃতিই ছিল রাজাদের সব চেয়ে প্রিয়। মহারাজ প্রায়ই থাকতেন রাজ্যজয়ের উন্মাদনায়—অবসর-সময়ও কাটতো বন্য হিংস্র শ্বাপদ শিকারের উত্তেজনার মধ্যে। তাঁদের কাছে শান্ত জীবন ছিল কাপুরুষতার পরিচায়ক। বৎসরের মধ্যে বিজয়-যাত্রায় বেরুবার জন্য বিশেষ ভাবে এই সময় নির্দ্দিষ্ট করার কারণ, মুখ্যতঃ—ঋতুর প্রভাব। বর্ষার পর ধরিত্রী যখন শান্ত সৌম্য শ্রী ধারণ করে এবং ত্রিভুবনে আনন্দের প্লাবন জেগে ওঠে, তার বেশ সাড়া জাগায় সকলের হৃদয়ে। তখনই নিজের নিজের বাসনা চরিতার্থ করার সময়। সকলেই ইচ্ছা করে মনকে বল্গাহীন ভাবে আনন্দের রাজ্যে ছেড়ে দিতে। পরাক্রমশালী মারাঠা রাজবংশের আনন্দ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া কি অন্য কোন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে?

এই রকম এক দশেরার সময় বিজয়-যাত্রায় বেরিয়েছিলেন মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গোহাদ্ দুর্গ দখল করতে। গোহাদ পরগণা ছিল ধোলপুর রাজ্যের অধীনে, কিন্তু ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই সিন্ধিয়া রাজ্যের "গিদ্দ" জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

দরবারী দপ্তর থেকে প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখান যায় যে, অম্বা শেওপুর প্রভৃতি কয়েকটি পরগণাও বিভিন্ন দশেরার সময় এই ভাবে সিন্ধিয়া রাজ্যভুক্ত হয়েছে। এখানে সে সব ঐতিহাসিকতার কচকচি নাই করলুম!

এখন অবশ্য সত্য বিজয়-যাত্রায় বেরুনো সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনীয়তাও নেই,—তাই দশেরা আজ উৎসবেই পর্য্যবসিত হয়েছে। যদি চ উৎসবের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, এখনকার দিনে এগুলি কত অর্থহীন। এককালে কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অঙ্গের অতি গভীর মূল্য ছিল। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য—"দপ্তর পূজন"; অর্থাৎ রাজ্যের শাসন-যন্ত্রের পূজা। আসল তাৎপর্য্য বোধ হয় যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজ স্বয়ং সকল ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন; আধুনিক কথায় বলতে গেলে—manouvre ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি যুদ্ধের জানোয়ারদের এই দিন খুব সমাদরে পরিচর্য্যা করা হয়ে থাকে। সেই মত সাধারণ গৃহস্থেরাও গৃহপালিত অশ্বের পূজা করেন। আশ্চর্য্যের কথা, সে-দিন টাঙ্গা পাওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, অধিকাংশ টাঙ্গাওয়ালাই সে-দিন সম্বৎসরের নির্দ্দয় ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে ঘোড়ার প্রতি সেবার আতিশয্য প্রকাশ না করে পারে না।

সকালে মহারাজ ষোড়শ অশ্ববাহিত বিচিত্র কারুকার্য্য করা গাড়ীতে আসেন "গোরখী"তে দপ্তর পূজনের জন্য। এখানে সর্দ্দাররা, মন্ত্রীরা ও বিভাগীয় মুখ্য কর্ম্মচারীরা মহারাজকে আতর-পাণ দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। তাঁর গোর্‌খীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে ২১টি তোপধ্বনি হয়। প্রথমে অর্চ্চনা করেন স্বয়ং মহারাজ রাজত্বের প্রতীক যে ১১টি রাজমুদ্রা ও চিহ্নগুলি আছে সেগুলিকে। এই সম্মানসূচক পদার্থগুলি মোগল সম্রাট্ উপহার দিয়েছিলেন মাহাধজী সিন্ধিয়াকে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে মুগ্ধ হয়ে; এগুলিকেও শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—"মাহী মারাতীব" (Mahi maratib) বা মৎস্য-মুদ্রা—মোগল দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান বললেই হয়। সম্রাট্ শাহ আলম্ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মাহাধজী সিন্ধিয়াকে এই "মাহী

মারাতীব" ভূষণে বিভূষিত করেন। দু'টি সোনার মাছ (প্রত্যেকটি ১৮ ইঞ্চি লম্বা) আটকানো আছে দু'টি দণ্ডের উপর এবং মাছের উপর আছে একটি করে সোনার হাতের পাঞ্জা (৮ ইঞ্চি লম্বা)। অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে—আফ্‌তাব্ (সুবর্ণ সূর্য্য); আরবী ভাষায় 'লেখ'-সমেত চন্দ্রকলা; দুইটি পাঞ্জাসমেত হাত; দুইটি সোনার globe এবং এক জোড়া আলম্ বা বিচিত্র পতাকা। একটি বাঘের মাথাও আছে এই মুদ্রাগুলির মধ্যে। সর্ব্বশুদ্ধ ১১টি মুদ্রা;— তাৎপর্য্য এই যে, মৎস্য পৃথিবীর আদিম জীব (বিষ্ণুর দশাবতারের প্রথম অবতারও মৎস্য), এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলিও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের প্রতীক, অর্থাৎ মুদ্রাগুলি বোঝায় সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য সারা বিশ্বের উপরেই। এই সব মুদ্রা ছাড়া আরও দুইটি সুন্দর জিনিষ আছে,—অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করা একটি তাঞ্জাম এবং ঐরূপই একটি আরাম কেদারা; এ দু'টিও সম্রাট্ শাহ আলমের দেওয়া।

দপ্তর পূজনের মধ্যে সবচেয়ে কৌতুক লাগে যখন সবশেষে মহারাজ যুদ্ধের ঘোড়া, হাতী ও উটের "মুজিরাস্" (প্রণাম) গ্রহণ করেন। পাঁচটি সর্দ্দার হাতী ধীরে ধীরে বেদীর নীচে দাঁড়ায় ও একসঙ্গে তিন বার শুঁড় নাড়িয়ে কায়দা অনুসারে মুজিরাস্ করে ও আস্তে আস্তে মহারাজের পায়ে শুঁড় ঠেকায় ও তার পর পিছু হেঁটে হেঁটে চলে যায়। কোর্ট থেকে ২১টি তোপ দাগার সঙ্গে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বৈকালে দশেরার শোভাযাত্রা বেরোয়। সকলে এই শুভ দিনটির জন্য সারা বৎসর ধরে উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। এই দিন দূর-দূরান্তর থেকে প্রজারা আসে সহরে দশেরার শোভাযাত্রা দেখতে, সর্ব্বোপরি তাদের মহারাজকে দর্শন করতে। সে দিন মনে হয় যেন কোন্ মন্ত্রবলে শান্ত সহর অদম্য পুলকে মেতে উঠেছে। জনাকীর্ণ রাজপথগুলিতে বিপুল জনস্রোত ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সর্ব্বস্তরের আবালবৃদ্ধবনিতা রাজপথের দু'ধারে স্থান সংগ্রহ করতে থাকে দুপুর থেকেই। যতই শোভাযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হয় ততই জনসমাগম বাড়তে থাকে। রাজপথের মাঝখানটি শোভাযাত্রা যাবার জন্য শান্ত্রীদের অতি কষ্টে খালি রাখতে হয়। দু'পাশের জনসমাবেশের মাঝখানে ক্ষীণ রাজপথরেখা দেখায় পাহাড়ের উপর দিয়ে সর্পিল গতিতে নেমে আসা বাঁধনহারা নদীর মতই অপূর্ব্ব!

রাস্তার ধারে যাঁদের বাড়ী তাঁদের তো সে দিন বাড়ী-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পুষ্পমালা এবং আলো দিয়ে সুসজ্জিত রাখতেই হয়; তার উপর তাঁদের সে দিন মহা সুযোগ বন্ধুবান্ধবদের আদর আপ্যায়ন করার। কারণ, সকলেই এইরূপ বাড়ীতে আশ্রয় পেতে চেষ্টা করেন নির্ব্বিবাদে শোভাযাত্রা দেখতে পাবার লোভে। অধিকাংশ স্থলেই উপরের বারান্দা ও ছাদ দখল করেন মহিলারা ও নীচের রোয়াকে ও তৎসংলগ্ন ঘরগুলিতে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় পুরুষদের।

ঠিক পাঁচটার সময় কোর্ট থেকে সুরু হলো ২১টা তোপ। এই তোপই মহারাজের প্রাসাদ থেকে নিস্ক্রামণের নির্দ্দেশ। মহারাজ তাঁর দেহরক্ষী অশ্বারোহীদল-পরিবেষ্টিত হয়ে বিচিত্রিত গাড়ীতে চলেছেন গোর্‌খী মন্দিরে, কারণ সেখান থেকেই তো বিজয়-যাত্রার সুরু হয়ে থাকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শোভাযাত্রার আরম্ভ-সূচক তোপ দাগা হলো—এবারেও ২১টা। রাস্তার দু'ধারে গোয়ালিয়র পদাতিক দল লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের "attention"এ দাঁড়ান দেখেই বোঝা গেল শোভাযাত্রার অগ্রভাগ নিকটবর্ত্তী। প্রথমেই গোয়ালিয়র ফৌজের বিভিন্ন দল নিজ নিজ বাদ্য-সহযোগে মার্চ্চ করে সামনে দিয়ে যেতে লাগলো। তাতে ছিল Lancers, Infantry, Artillery, Field Battery এবং Mountain battery। অশ্বারোহীদের বর্শার উপর পশ্চিম দিগন্তের শেষ সূর্য্যের রক্তিম ঝলকানি, পদাতিকের তীব্র পদধ্বনি ও বন্দুকের ঝনঝনানি, Battery unitsয়ের কামানের ঘড় ঘড় শব্দ—সব মিলিয়ে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটাকে কোন মতেই পবিত্র বা পূজার উপযুক্ত বলা চলে না, বরং এইখানেই আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

সৈন্য-বাহিনীর কাওয়াজী-অভিযানের পর মোগল মসনদ থেকে পাওয়া রাজমুদ্রাগুলিকে, এমন কি তাঞ্জাম দু'টিকেও নিয়ে যাওয়া হলো খুব সসম্ভ্রমে। পুরোভাগে যাচ্ছিলেন দু'টি হাতীর পিঠে চড়ে দু'জন "তাজিম সর্দ্দার" (বিশেষ সম্মানিত সর্দ্দার—যাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে ওঠেন)। রাজমুদ্রাগুলির সঙ্গে ধূপধুনা নিয়ে এবং চামর ব্যজন করতে করতে চলেছিল জমকালো পোষাক-পরা দপ্তরের জমাদার ও চাপরাসীরা। পিছনে একটি হাতীতে আসছিলেন রাজ-পুরোহিত ও তার পর গোযানে অন্যান্য পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ। এই গোযানগুলির বিশেষত্ব এই যে— এগুলি যথেষ্ট উঁচু এবং বাহনগুলিও দক্ষিণী। তার উপর তাঁদের বড় বড় শিংগুলি পিতল দিয়ে বাঁধান থাকাতে শোভাযাত্রার শোভা মোটেই ক্ষুন্ন হয়নি। ভারতবর্ষের দিল্লীস্থ গো-পালের এই জীবগুলি দেখলে খুবই স্নেহের উদ্রেক হয় সন্দেহ নেই।

পুরোহিত-বাহিনীর পিছনে আসছিলেন্ ঘোড়ায় চড়ে এক জন সওয়ার—শ্রীমন্ত মহারাজের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করতে করতে। মিনিট দুইয়ের মধ্যে "Maharajah's own Band"-এর সুমধুর ঐক্যতান বাজনা শোনা যেতে লাগলো। কাছে এলে দেখলাম, পুরো band party ঘোড়ায় চড়ে; সব ঘোড়াগুলিই একই size-য়ের এবং সবগুলিই ধূসর রঙের। এইবার দেখা গেল মহারাজের বিভিন্ন দেহরক্ষীদল; যেমন সওয়ারদের পোষাকের জাঁকজমক, তেমনি ঘোড়াগুলির ঝক্‌ঝকে সাজ—সত্যি মহারাজের উপযুক্ত। তিনটি দলের তিন রকম ঘোড়া ছিল—কুচকুচে কালো, ধবধবে সাদা ও লাল —প্রত্যেকটি দলে ৮০ জন করে অশ্বারোহী।

ঘণ্টার শব্দে তাকিয়ে দেখি, সুবৃহৎ হাতীর উপর সোনার হাওদায় অধিষ্ঠিত শ্রীমন্ত মহারাজ। তিনিও পোরে রয়েছেন অপরূপ সোনার কাজ করা পোষাক ও পাগড়ী (মারাঠা)। দেখলে মনে হয় যেন একটি সুবর্ণ বিগ্রহ। তাঁর বাহনের সাজও বড় অল্প নয়, শুধু যে তাকে সোনার ও রূপার নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করা হয়েছে তাই নয়, তার গায়েও যে বিচিত্র ভাবে কলাকারের তুলি বোলান হয়েছে এবং তাতে তার আসল রং কোথায় চাপা পড়েছে, খুঁজে বের করাই মুস্কিল। সমবেত জনতা আকুল আবেগে আনন্দে মহারাজের জয়-ঘোষণা করছে, মহারাজও বার-বার দু'হাত জোড় করে সকলকে প্রত্যভিবাদন করছেন। মহারাজের হাতী যখন আমাদের সামনে এসে পড়লো, সকলের সঙ্গে আমরাও কায়দা অনুযায়ী "মুজিরাস্" জানিয়ে দিলাম। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম স্থানীয় বাঙালীদের

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-মণ্ডপের কাছেই। মহারাজও হাতীর গতি খুবই শ্লথ করে দিয়েছিলেন আমাদের প্রতিমা দর্শন করার জন্ত; দেখে আনন্দই হলো, যখন মহারাজ হাতীর উপর থেকেই ৺দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন।

মহারাজের হাতীর বাঁ পাশেই আর একটা হাতীতে রূপার হাওদা লাগান ছিল, তাতে চলেছেন রেসিডেণ্ট (অর্থাৎ এ রাজ্যে ভারত সরকারের প্রতিনিধি)। বিপুল শোভাযাত্রার মধ্যে তাঁর সেই tailcoat পরিহিত মূর্ত্তিখানি বড়ই বিসদৃশ লাগছিল।

যাই হোক, মহারাজের হাতীর পিছনে সারিবন্দী হাতীতে করে সর্দ্দাররা, জায়গীরদাররা ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা যেতে লাগলেন। কিন্তু শোভাযাত্রাটা আগাগোড়াই সামরিক। সেই জন্তই বোধ হয় আর এক দল পদাতিক সৈন্ত ও পুলিশ বাহিনী দিয়ে শেষ করা হলো। শোভাযাত্রা গিয়ে থামে সহরের পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ের কোলে একটি দেবী-মন্দিরের নীচে (মান্দ্রের মাতাকী মন্দির)। সেখানে সুপ্রশস্ত মণ্ডপের মধ্যে যজ্ঞ ও শমী-পূজন হয়। শমীপূজনের বিশেষত্ব এই যে, পাণ্ডবরা অজ্ঞাত-বাসে যাবার সময় তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র শমী-গাছে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁরা শমী-গাছ থেকে সেগুলি নামিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। মারাঠা রাজারাও বিজয়-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শমীপূজন করে থাকেন; বোধ হয় পাণ্ডবদের মতই বিজয়-কামনায়। এখন অবশ্য ঐ দিন বিজয়-যাত্রায় আর যাওয়া হয় না। যজ্ঞ করার পর পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গেই তোপধ্বনি হতে থাকে এবং মহারাজ ফেরেন গোরখীতে।

বিজয়-যাত্রার পরিবর্ত্তে আজকাল দশেরার পরদিন মহারাজ সহরের বাহিরে শিকারে যান, এবং এ দিন শিকার করা চাই-ই!

বাংলা দেশে যেমন বিজয়া দশমীর পর প্রীতি-সম্মেলন ও কোলাকুলির রীতি আছে, এখানেও তার অভাব নেই। তবে সেই সঙ্গে পরস্পরকে শমীবৃক্ষের পাতার আদান প্রদান করতে হয় পরস্পরের বিজয়-কামনায়। অনেকের ধারণা, পাণ্ডবদের মাহাত্ম্যে শমীবৃক্ষের পাতাগুলি সোনায় পরিণত হয়েছিল, সে জন্ত শমীপাতায় সোনালী রঙ করা হয়ে থাকে; এবং পাতাকে বলা হয় "সোনাপাতা"। আজকাল এইগুলি দেবার উদ্দেশ্য শুভেচ্ছা ও প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন মাত্র—তাছাড়া আর কিছুই নয়!
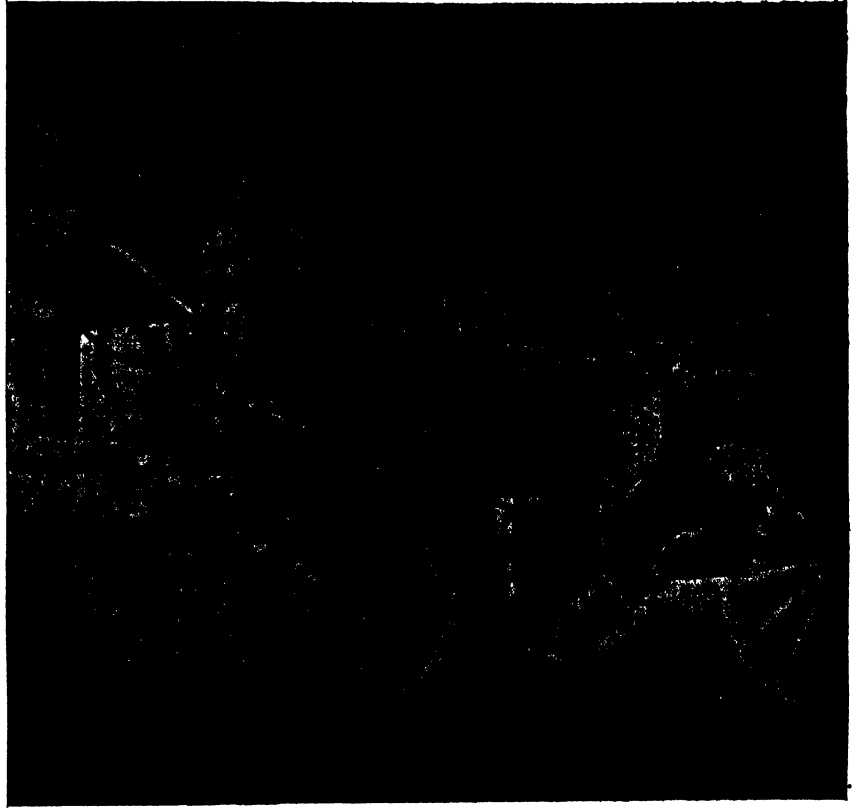
নবরাত্রি উৎসবে শোভাযাত্রা—গোয়ালিয়র

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র (এম-এ)

সারা নিশি অশ্রু ঝরে

বুলবুলি শীশ্ দেয় কেতকীর কানে
বাবেক যদি সে চায় মদির নয়ানে!
নভে চাঁদ মিনতি করে
সারা নিশি অশ্রু ঝরে
পাপিয়া ব্যাকুল হলো গানে আর গানে।

জাগিল চাঁপার কুঁড়ি, কেতকী গো নয়!
বুলবুলি তারে আজ মানে পরাজয়।
যার লাগি হৃদয় কাঁদে
পায় না সে সুদূর চাঁদে—
এমন মাধবী নিশি গেল অভিমানে।

বন্দে আলী মিয়া।

সমাধান

[গল্প]

এক

বিয়ে বাড়ী। লোকজনের হৈ-চৈ-এর শেষ নাই। আদর, আপ্যায়ন, অতিথি, অভ্যাগত, সাজ, পোষাক গাড়ী মোটরেরও অন্ত নাই—যেন দেখায় ও দেখানোয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। এর শেষ কোথায়, বলা কঠিন।

যে দু'টি প্রাণীকে কেন্দ্র করে এই সমারোহের সৃষ্টি, তাদের মধ্যে কিন্তু পরিচয়ের নিবিড়তা এখনও ঘটেনি। তাদের প্রাণ দু'টি মেল্‌বার জন্য সমুৎসুক হয়ে উঠলেও দেশাচার বা লোকাচার মেনে চল্‌তে হবে তো। ধীরে হবে সে পরিচয়ের সুরু।

রায় বাহাদুর অনাদিনাথ মিত্র। সংক্ষেপে শুধু রায় বাহাদুর—বড় চাকরী করেন—তাঁরই একমাত্র ছেলে অবনীর বিয়ে। সুতরাং ধুমধাম যে অপরিহার্য্য এ কথা বলা বাহুল্য। রায় বাহাদুর লোকটি অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্রলোক—আত্মপরে ভেদাভেদ-শূন্য বল্‌লে চলে—কিন্তু দু'-একটি ব্যাপারে তিনি নিজের যে-কথা সেই-কাজ 'এই' নীতি মেনে চলেন—শত অনুরোধে বা মিনতিতে টলেন না।

রায় বাহাদুরের এই মেজাজের সঙ্গে তাঁর পরিজনবর্গের পরিচয় তো ছিলই—বন্ধু-বান্ধবও তাঁর এই মেজাজের বিষয় জ্ঞাত ছিল। বিবাহের পক্ষপাতী তিনি খুবই ছিলেন—তবে এতে তাঁর একমাত্র আপত্তি ছিল পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে হলে পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে। বৌ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! সুতরাং সে-দিকে মন একটু কম দিয়ে বইগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করে ফেলাই উচিত। তখন আর বলার কিছু থাক্‌বে না।

অবনীকে এ কালের পক্ষে অতিমাত্রায় লাজুক বল্‌তে হবে। আর্টস-এর পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হয়েও সে খুব মুখ-চোরা হয়ে বাড়ীতে থাকে। সিনেমা দেখে; কিন্তু বাড়ীতে তার কোন আলোচনা করে না! 'কো-এডুকেশনের' দোহাই দিয়ে কোন সহপাঠিনীর নামও তার মুখে শোনা যায় না। বন্ধু-বান্ধব আছে—বাড়ীতে তার কোন প্রকাশ নাই। এক কথায় সে অতিমাত্রায় "ভালো ছেলে।" তাই বিয়ের ব্যাপারে বাইরে তার এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না—কিন্তু হৃদয়-বার্ত্তার খবর রটলো বন্ধু-বান্ধব এবং অন্তরঙ্গ-মহলে। অন্তরে তার সমারোহের শেষ রইলো না। মনে-প্রাণে সে তার মানসীর অপেক্ষা করে রইলো।

রায় বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক যামিনীনাথকে এক রকম সত্যবন্দী করে নিয়েছিলেন যে, যত দিন না অবনীর এম-এ পরীক্ষা শেষ হচ্ছে, তত দিন পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ীর আদরটা তিনি যেন মুলতুবী রেখে দেন! বিয়ে সেরে মনস্থির করে পড়া আরম্ভ করতে করতে আবার যদি শ্বশুরবাড়ীর আদরের অত্যাচার আরম্ভ হয়, তাহলে তার পক্ষে পাশের আশা খুব কম। যদিও এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষাতেই সে বিফলতা দেখায়নি—এখন এই বারের টাল্‌টা সামলে দিলে হয়। ক্ষুব্ধ হয়ে যামিনী বাবু বলেছিলেন, "তা এই ক'টা মাস পরেই একেবারে বিয়ে দিলে পারতেন! বিয়ে একটা নেশার মতো! এর মাদকতায় আচ্ছন্ন হয় না—এমন লোক তো দেখি না।"

হা-হা হেসে অনাদি বাবু বলেছিলেন, "তা হ'লে কি আর আমি আমার 'মা'টাকে পেতাম! কা—র ঘরে আপনি চালান করে দিতেন! বাড়ীর মেয়েদের একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন, আদর-যত্ন তাঁরা পরে ঢের করবেন—জামাই তো রইলই। আমরা দু'ভায়ে একটু শক্ত হয়ে যদি হাল ধরে চলে যেতে পারি, তবেই আমাদের ছেলে-মেয়ে দু'টি সুখে-শান্তিতে থাক্‌বে।"

যামিনী বাবু আর কিছু বল্‌লেন না। মেয়ের নিরঙ্কুশ সুখ বা শান্তিতে বাধা দেবে, এমন মূর্খ কে আছে?

এই তো গেল বিয়ের আগেকার কথা। বিয়ে হয়ে গেল। জামাই দেখে এবং জামাইয়ের ব্যবহারে যামিনী বাবুর বাড়ীর সকলে এবং বৌ দেখে অনাদি বাবুর বাড়ীর সকলে অতিমাত্রায় খুশী হলো। যাদের নিয়ে এই আনন্দমেলার সৃষ্টি, তারা কিন্তু পরস্পরের পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। শুভদিনে শুভক্ষণে এই পরিচয়ের সুরু—তাই শুভলগ্নের অপেক্ষায় দু'জনেই মনে মনে উৎসুক হয়েছিল।

রাত্রি আন্দাজ এগারোটা হবে। বাইরের কোলাহল থেমে এসেছে। অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে সুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। নতুন বৌ মৈত্রেয়ীকে নিয়ে তাদের এই চঞ্চলতা। সুখের বিষয়, অনাদি বাবু বিয়ের আনুষঙ্গিক এই অবশ্য-পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির উপর তাঁর অমোঘ আইন জারি করেননি। তাই মেয়েরা বিয়ের ক'টা দিন অবনী আর মৈত্রেয়ীকে নিয়ে খুব আমোদ করে নিচ্ছিল। সবাই জান্‌তো, এর পরে আস্‌বে অনাদি বাবুর সত্য-রক্ষা—যা লঙ্ঘন করতে কেউ সাহস পাবে না! এমন কি, তাঁর স্ত্রী বসুমতীও নয়!

শ্বশুরের চুক্তির কথা বধূ মৈত্রেয়ীও জান্‌তো। সাধারণতঃ যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়, সে বয়সটা সে একটু ছাড়িয়েই গিয়েছিল—সুতরাং শ্বশুর-বাড়ীর সকলকে—বিশেষ করে যা'কে ভরসা করে জীবন-তরণী ভাসালো, তাকে জান্‌বার জন্য তার আগ্রহ এবং কৌতূহলের অন্ত ছিল না। লোকটিকে বাসর-ঘরে যতটুকু দেখেছিল তা'তে তা'কে মন্দ লাগেনি—সে পরিচয়টুকুর আনন্দ তাকে অবনীর দিকে টেনে নিয়ে চলেছিল!

মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি পার হয়ে মৈত্রেয়ী যখন একেবারে অবনীর কাছে এসে পড়লো, তখন প্রথম পরিচয়ের মাধুর্য্যের আভাসে মন ভরে থাক্‌লেও তার পা দু'খানি কাঁপছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও। ননদ-সম্পর্কে যে-মেয়েটি তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিল, কাণে কাণে সে বল্‌লে,—"ভালো করে চেনা-জানা করে নিয়ো। জ্যেঠামশায়ের পণ জানো তো? পরিচয় করার মেয়াদ তোমাদের বেশী দিনের নয়। এই ক'দিনের পাথেয় সম্বল করেই দাদার এম-এ পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কাটাতে হবে হয়তো।"

মৃদু হেসে মৈত্রেয়ী তার হাতখানা চেপে ধরলো। একটু হেসে মেয়েটি বল্‌লে—"আমাকে ধরে রাখলে তোমার তো কিছু সুবিধা হবে না ভাই! পরিচয়ের সুযোগ তাতে বাধা পাবে—তার চেয়ে কাল সকালে সব শুন্‌বো, কেমন?" দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে

মেয়েটি চলে গেল। এবারে সে একা—একেবারে একা। অবনী দরজা বন্ধ করে খাটের ওপরে তার পাশে বস্‌লো। লাল 'বাল্‌বের' রক্ত-আভায় ঘরের সর্ব-কিছুকে মায়াপুরীর মত মনে হচ্ছিল। মৈত্রেয়ীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মৃদু স্বরে সে বল্লে, "তোমাকে এক বার খুব ভালো করে আমায় দেখতে দেবে?"

এর উত্তরে বলবার আর কি আছে? মৈত্রেয়ী ছোট মেয়ে নয় —মনও তার অপরিণত নয়—স্বামীর সান্নিধ্য তারও কামনার জিনিষ। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে হাসিমুখে সে চাইলো। অবনী বল্লো—"বাবার কথা শুনেছো বোধ হয়?"

ঘাড় নেড়ে মৈত্রেয়ী জানালো সে ও-কথা জানে। অবনী আবার বল্লো—"কখনো আমি বাবার অবাধ্য হইনি—কিন্তু এবার একটু অবাধ্য হবো ভাবছি। এতটা নিয়মানুবর্ত্তিতায় চলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। যাই হোক, উপায় একটা আমি ঠিক করে নেবোই অবশ্য বাবাকে অসন্তুষ্ট না করে। এখন যে ক'টা দিন কাছে পাওয়া যায়, তাই লাভ।"

দুই

বিয়ের পরে জামাই-ষষ্ঠী। নিজ প্রতিশ্রুতি-মত যামিনী বাবু অনাদি বাবুর কাছে জামাই নিয়ে যাওয়ার কথা বল্‌তেই পারলেন না। ষষ্ঠীবাটা পৌঁছে দিয়ে কুটুম-বাড়ীর সুখ্যাতি মুখে নিয়ে লোকজনরা ফিরে এলো। সব শুনে মৈত্রেয়ী ওপরে চলে গেল। ভাবলো— এই তো প্রথম বার, জামাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ সকলেই করে থাকে। বিশেষ করে এটায় জামাইদেরই প্রাধান্য—একটি দিনের জন্য ছেড়ে দিলে পড়াশুনার এমন ব্যাঘাতই বা কি হতো! সকলের বাবাই তো বিয়ের পরে এমন কড়া নজর রাখেন না ছেলেদের উপরে—তার বেলাতেই বা এমন বিধি কেন? এমনি ধারা নানা এলোমেলো চিন্তায় মন তার ভারী হয়ে উঠলো। আশপাশের বাড়ী থেকে আনন্দ-কোলাহল ভেসে এলো—সে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ কি একটা গোলমালে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। শুনলো, নীচে তার বাবা আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বল্‌ছেন, "এসো বাবা এসো। আমি আশা করতে পারিনি—বেয়াই-এর কাছে আমি কঠিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। না হলে আজকের দিনে জামাই নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করতে কার না সাধ যায়! মেয়েরা আমার ওপর চটে আছে! ওগো, এই দেখ, অবনী এসেছে।"

মৈত্রেয়ী ভাবছিলো, সে স্বপ্ন দেখছে না তো? কিন্তু না। আশঙ্কায় বুক দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠলো। দৈবাৎ জানাজানি হয়ে গেলে শ্বশুর কি দণ্ডই না বিধান করবেন!

ঘরের ভেজানো দরজা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মার গলা শোনা গেল। "আজকের রাতটুকু কোনো মতে থাকা হয় না বাবা? শুধু আজকের রাতটুকু?"

মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল—"আপনি তো সব জানেন। আমি একেবারে নিরুপায়। এ ধারে এসেছিলাম একটা দরকারে, তাই ভাবলাম—মা কাল জিজ্ঞাসা করছিলেন কি না! তাই..."

"বেশ করেছ বাবা! আমারও তো দেখতে সাধ যায়! তা এমনি অদেষ্ট! এখন ভালোয়-ভালোয় পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বাঁচি।"

মৈত্রেয়ী ততক্ষণে উঠে বসে খোলা চুল জড়িয়ে নিয়ে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উঠে বসেছে। একটি মাত্র দরজা—তার সামনেই অবনী দাঁড়িয়ে—বেরিয়ে যাওয়া হলো না! মুহূর্ত্তের মধ্যে দুই ব্যাকুল বাহু তাকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেললো।

খুব মৃদু স্বরে অবনী বললো—"আজ আমি না এসে কিছুতেই থাকতে পারলাম না মৈত্রী। সিনেমা দেখার নাম করে পালিয়ে এসেছি। টিকিট কিনেছি। মায় একখানা প্রোগ্রামও নিয়েছি। এরাই আমার স্বপক্ষে দরকার হলে সাক্ষী দেবে। আরো একটা খবর জানাতে এলাম—বাবা তোমাকে দিন-কয়েকের মধ্যেই নিয়ে যাবেন আর আমাকে পত্র-পাঠ হোষ্টেল-বাসে যেতে হবে।"

একটু হেসে মৈত্রেয়ী বললো,—"এখানে আসাতেই না হয় বাবার আপত্তি! তা বলে নিজের বাড়ী যাওয়া-আসায় তো আর আপত্তি করবেন না!"

অবনী বললো—"উঁহু! বাবার আপত্তি তোমার সঙ্গে মিশতে দিতে। তা সে এখানেই হোক বা নিজের বাড়ীতেই হোক্। তুমি যাবে বলেই তো আমার হোষ্টেলে নির্ব্বাসন—না হলে ওই বাড়ীতে পড়েই এত দিন আমি পাশ করে এসেছি! বড়-বড় ছুটি ছাড়া বাড়ীতে ফেরার হুকুম নেই আমার—হয়তো তখন তোমাকে আবার এখানে ফিরতে হবে!"

অবনীর কথায় মৈত্রেয়ীর মুখ বিষাদে ভরে গেলো। লক্ষ্য করে অবনী বল্লো—"এখন থেকে ওই নিয়ে মন খারাপ করতে হবে না। নিজের বাড়ী আসতে ছুতোর অভাব হবে না—উপায় একটা আমি বের করবই। কথা বলতে না পাই, চোখে দেখ্‌তে পাবো তো!"

মৈত্রেয়ী কিছু না বলে চুপ করে রইলো। একটু পরে অবনী বললে, "গম্ভীর হয়ে গেলে যে! কি ভাব্‌ছো? ভাব্‌ছো, সকলের মত তোমার অদৃষ্ট নয় কেন? না?"

"অদৃষ্ট আমার খারাপ নয়।" বলে মৈত্রেয়ী হাস্‌লো।

হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে অবনী চমকে উঠ্‌লো। ইস্ প্রায় দশটা! আবার একটা মিথ্যা কৈফিয়তের সৃষ্টি করতে হবে ভেবে তার এতক্ষণের এ-আনন্দ উবে গেল। হাতের প্রোগ্রাম-খানা দিয়ে মৈত্রেয়ীর গালে মৃদু আঘাত করে সে বললে, "You naughty girl! মনে করিয়ে দাওনি বাবার কথা।" বলে সে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবনী যা' বলেছিল তাই হলো। দু'-চার দিন পরেই মৈত্রেয়ী শ্বশুরবাড়ী গেল, আর অবনীর হলো হোষ্টেলে নির্ব্বাসন। চিঠি লেখারও উপায় নেই—কারণ, Letter-Box অনাদি বাবু নিজে খোলেন।

দিন পনেরো পরে হোষ্টেল থেকে অবনী হঠাৎ বাড়ী এলো। কারণ-অনুসন্ধানে জানা গেল, হোষ্টেলে থাকা তার পোষাচ্ছে না— কারণ, ও-রকম খাওয়া তার কোন কালে অভ্যাস নাই। না খেয়ে শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—শরীর যদি ভাল না থাকে, তবে পড়বে কি করে?

খাওয়ার কষ্ট! তাতে আবার সে ছেলে! এবং একটি মাত্র ছেলে! স্বামীর ওপর কথা বলা অবনীর মা'র প্রকৃতিগত না হলেও এ ব্যাপারে তিনি তর্ক তুলবেন স্থির করলেন। অবনী মা'র কাছে বলেই খালাস—বাবার মুখের সামনে এত কথা তার জোগাতো না।

রাত্রে পিতা-পুত্রে খেতে বস্‌লে নিত্য অভ্যাসমত মা সেখানে বস্‌লেন। অনাদি বাবুর খাওয়া অর্দ্ধেক হয়ে গেলে তিনি

বললেন, "খোকাকে আমি আর মেসে যেতে দেবো না—এত কষ্ট করে ওর লেখাপড়া শেখার দরকার নেই। একটা ছেলে! সে-ই যদি 'হাভাতে' 'হাঘরের' মত মেসে পড়ে রইলো তো বাড়ীতে বসে আরাম করে পাঁচ তরকারী দিয়ে ভাত খাওয়া আমার পোষাবে না। আমার ঝি-চাকরটার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে আমি দেখি, আর নিজের ছেলে—ঠাকুরের ভরসায় সে মেসে পড়ে থাকবে?"

অনাদি বাবুর খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—স্ত্রীর বক্তব্য শেষ হলে তিনি বল্লেন, "হলো কি? একেবারে কাল্-বোশেখী নিয়ে এলে যে!"

"সাধে নিয়ে আসি! খোকা কোন দিন বাড়ীর ভাত ছাড়া খেয়েছে যে তাকে তুমি ঠেলে মেসে পাঠালে? না খেয়ে না খেয়ে শরীরটা আধখানা হয়েছে।"

ব্যাপারটার মূল কারণ আবিষ্কার করতে অনাদি বাবুর মত বিচক্ষণ লোকের একটুও দেরী হলো না। বাইরে তার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে আহার-রত অবনীর দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, "খাওয়া-দাওয়ার কি রকম অসুবিধে হচ্ছে খোকা? হোষ্টেলটা ভাল বলেই তো জানতাম। আর-পাঁচ জন ভদ্রলোকের ছেলেরাও থাকে সেখানে।"

মাকে অবনী যা-হয় বলে বুঝিয়েছিল; কিন্তু রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির বাবাকে যা-তা' বলে সে বোঝাতে পার্‌লো না। সে কিছু বল্‌বার আগেই স-ঝঙ্কারে বসুমতী বল্লেন, "সে যাদের চিরদিন মেসে থাকার অভ্যাস আছে, তারা পারে। ও কি-দুঃখে সেখানে পড়ে থাক্‌বে, শুনি? ওর নিজের বাড়ীতেই বলে কে থাকে!"

অনাদি বাবু বেশী কথার মানুষ নন্। গম্ভীর গলায় বল্লেন, "যে ছেলে শুধু আদরে-আদরে মানুষ হয়—যথার্থ 'মানুষ' সে হয়ে উঠ্‌তে পারে না। অভাব, অভিযোগ, অসুবিধা, অনটনের মধ্যে ভেঙ্গে না পড়ে যে খাড়া থাকে, "মানুষ" সে-ই হয়। দৈবাৎ আমার 'চারটি' টাকা আছে—তাই! যদি না থাক্‌তো? তা তোমার যদি সত্যিই অসুবিধে হচ্ছে মনে করে থাকো তো খোকা বাড়ী চলে আসুক। 'চার্জ্জ' যদিও পূরো মাসেরই দিয়েছি, তা হোক্ গে। মোদ্দা, এম-এ পাশ করা চাই ভালো করে।"

বয়স্ক ছেলেকে এর বেশী কি বা বলা যায়।

অবনী কোন রকমে আজ্ঞে, হ্যাঁ বলে জল খেয়ে উঠে চলে গেল।

ছেলে চলে গেলে অনাদি বাবু বল্লেন, "মায়ে-পোয়ে মতলবটি মন্দ বের করোনি। যে-ব্যবস্থা করেছিলাম, তোমাদের পছন্দ হোল না! বেশ! এত দিন নিজের ইচ্ছামত চলে এসেছি, ঠকিনি কখনও। এবার তোমাদের ইচ্ছামত চলে দেখি—ঠকি, না, জিতি!"

স্বামীকে আর চটাতে সাহস না হওয়ায় বসুমতী চুপ করে গেলেন।

নিজের বস্‌বার ঘরের পাশের ঘরটিকে অবনীর পড়ার জন্ত ঠিক করে দিয়ে অনাদি বাবু মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, ছেলেরা ভাবে, বাবারা বয়স হলেই বুঝি ওল্ড ফুল্ হয়ে যায়! দেখি, এবার আবার বাবাজী 'বাজিমাৎ' করার জন্ত কি চাল চালেন!

দিনে-রাত্রে দু'টি বার মাত্র অবনী খাবার জন্ত ভিতরে যেতে পায়। তাও খেতে হয় পিতা-পুত্রে একত্র। জলখাবার চাকরের হাতে দু'বেলা বাহিরে আসে। সেই জল-খাবারের থালায় বাহুল্য এবং পারিপাট্যের অভাব না থাকলেও আন্তরিকতার সস্নেহ অনুরোধের অভাবে সে-সব তার কাছে বিস্বাদ বোধ হয়। কিন্তু বলবারও কিছু উপায় নেই! কারণ, অনাদি বাবুর নিজেরও এই ব্যবস্থা। এক পক্ষ অন্ত পক্ষকে হারাবার জন্ত যতই নতুন নতুন ফন্দী বার করে, সে-পক্ষ ততই না-হারবার জন্ত জিদ্ ধরে বসে। এক-এক দিন মনে হয়, খাবারের থালাটা সজোরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মনের আক্রোশ মেটায়! কিন্তু উঁহু! পাশের ঘরেই সশরীরে পিতা! এখনি কৈফিয়ৎ চাইবেন।

টেবিলের ওপরে বই স্তূপাকারে জমা হয়ে থাকে। সব দিন খোলা হয় না। 'শেলীর' বইয়ে ধূলা জমে উঠলো—অনাদৃত হয়ে বইগুলির অভিমানের যেন আর সীমা নেই!

অন্দরমহলে যে একটি প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে, তার কোনো আভাসও পাওয়া যায় না! সে-ও কি নিজের সম্বন্ধে এত সচেতন? ছাতের ওপরে দু'-চারখানা শাড়ী-সেমিজ শুকোতে দেখে বোঝা যায় যে, মৈত্রেয়ী এ-বাড়ীতে আছে। কখনো তার গলার শব্দ, গহনার মৃদু ঝঙ্কারও শোনা যায় না—তবে কি সে-ও অবনীকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়? কিন্তু কেন? অবনী তাকে ভালোবেসে ফেলেছে, এ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সে-ও সরে থাক্‌তে চায়? ইচ্ছা করলে মৈত্রেয়ী কি দেখা দিত না? নাঃ! সব বাজে!

টেবিলের ওপর থেকে 'ফিলজফি'র বই একখানা টেনে নিয়ে অবনী খুলে বসলো। কিন্তু বৃথা! মনের দাবীকে কি আর 'ফিলজফি' দাবিয়ে রাখতে পারে? 'ফিলজফি' বলে 'সংসার মায়াময়' 'জীবন অনিত্য'! সজোরে কাণের মধ্যে ঝঙ্কার ওঠে, "Life is real, life is earnest, life is not an empty dream" হাতের বই সশব্দে ফেলে দিয়ে অবনী টেবিলে মাথা রাখে।

তিন

দিন কয়েক পরে। দুপুরের নিরালায় নিজের ঘরে শুয়ে মৈত্রেয়ী বোধ হয় নিজের কথাই ভাবছিল। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু স্বামীর গেল জ্ঞান আহরণ করতে—আর তার? তার গেল ঝিয়ের সাহচর্য্যে 'বড়লোকের' পুত্রবধূ হয়ে কড়ি-কাঠ গুণে দিন কাটাতে! কাব্য-লোকের দরজার দু'পারে দু'টি প্রাণ অধীর আগ্রহে মাথা খুঁড়ে মরছে—মাঝের ব্যবধান অচল, অটল।

শুয়ে থাক্‌তে আর ভাল লাগলো না—উঠে জানলার পর্দ্দা সরিয়ে তার ফাঁকে চোখ রেখে মৈত্রেয়ী উদাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইলো। দৃষ্টি ঘুরে শেষে বাগানে এসে আটকে গেল। দেখলো, গাছে জল দেওয়ার 'ঝারি' নিয়ে মালী বাগানের ফুল গাছে জল দিচ্ছে, আর তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে অবনী তাকে কি বলছে! সরে যেতে গিয়েও জান্‌লা থেকে সরে যাওয়া হলো না। কত দিন সে স্বামীর সান্নিধ্যে যেতে পায়নি! এক-বাড়ীতে, এক-আকাশের নীচে থেকেও সে তার কাছ থেকে কত দূরে!

স্বামীর প্রিয় মূর্ত্তিখানি চোখের দৃষ্টি দিয়ে যতটা কাছে নিতে পারা যায়! ব্যাকুল আগ্রহে পলকহীন নেত্রে সে চেয়েই রইলো।

অভ্যাসের বশে হোক বা খেয়াল-মতই হোক ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে অবনী দোতলার জানলায় মৈত্রেয়ীকে দেখতে পেলে। ঘরে আর যাওয়া হলো না। দু'জনেই অধীর আগ্রহ নিয়ে চেয়ে রইলো, মাঝের

ব্যবধান তাদের মাঝে অটল হয়ে আছে! কতক্ষণ তারা এই ভাবে ছিল জানে না, হঠাৎ মৈত্রেয়ী জানলা ছেড়ে চলে গেল। অবনীর মনে হলো যাওয়ার সময় সে যেন চোখটাতে একবার হাত দিয়েছিলো।

অবনী ঘরে ঢুকলো এইটুকু ভাবতে ভাবতে মৈত্রেয়ী কি তবে কাঁদছিল? না, তার চোখে কিছু পড়েছিল? মন এ কথায় সায় দিল না। মৈত্রেয়ী যে কাঁদছিল এবং তারই জন্য—মনে করতেই ভাল লাগে। না-পাওয়া দিনের বঞ্চনা যেন সার্থক হয়ে ওঠে!

অনেক ভেবে সে ঠিক করলে যে এম-এ পাশ করে ভাল ছেলে হওয়া তার মাথায় থাকুক্। এম-এ এবারে না হয় পরের বারে হবে, কিন্তু জীবন-কাব্যের পাতাগুলি পড়ে নিতে অবহেলা করলে তাদের আর পাওয়া যাবে না। আলেয়ার মত এগুলি এক বার জ্বলে উঠে তখনি নিবে যায়! কিন্তু পরীক্ষা না দেওয়ার কথা পিতাকে জানানো যায় কি সূত্রে? মায়ের ওপরে ভার দেবে? উঁহু! মা স্নেহান্ধ মন নিয়ে হয়তো বিভ্রাট বাধিয়ে বস্‌বেন—যার ফলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে তার চালাকি তো ধরা পড়বেই এবং তার ফলে পরীক্ষা দেওয়া এবং ফেল হওয়া—দুই-ই অনিবার্য্য হবে!

বিকেলে বেড়াতে না বেরিয়ে চৌকীতে শুয়ে ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। চাকর খাবারের রেকাবীখানি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে চলে গেল। অবনীর সে ঘুম ভাঙ্‌লো বেশ রাত্রি হবার পরে। দেখলো, পিতা তার ঘরে চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টে যাচ্ছেন—লজ্জা পেয়ে চোখ দু'টি ভাল করে রগড়ে সে উঠে দাঁড়ালো। অনাদি বাবু বল্লেন, "অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে খোকা? শরীর ভাল আছে তো? দেখছি, বিকেলে খাবার খাওনি—আমি দু'বার এসে দেখে গেছি।"

নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতার এই অকৃত্রিম উদ্বেগ দেখে অবনী বল্‌লে, "না না, আমি ভালই আছি! রাত্রি জেগে পড়ব বলে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে নিলাম। সন্ধ্যাবেলা পড়ার একটু ব্যাঘাত হয়—রাত্রে সব নিস্তব্ধ হলে পড়ার সুবিধা হয়।"

হাতের কাগজ মুড়ে রেখে অনাদি বাবু উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, "যাই হোক্—মোদ্দা শরীর বুঝে কাজ করো। আজকের দিনটা না হয় বিশ্রাম নাও। ঘুমোচ্ছ শুনেই তোমার মা তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যাই, তাঁকে খবর দিইগে যে ভাল আছ।"

তিনি চলে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবনী ভাব্‌তে লাগলো, শরীরের অসুখের ভাবনাই সকলে ভাবে। মা অসুখ হবার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছেন! কিন্তু আর এক জন? সে কি খবর রাখে কিছু? তার মনে কি আমার সুখ, শান্তি, আরামের তরঙ্গ দোলা দেয়? না ভাবলেশহীন মুখ এবং অক্ষত মন নিয়ে যন্ত্রচালিতার মত সে চলাফেরা করছে!

রাত বারোটা কি সাড়ে বারোটা।

অবনীকে টেবিলের সামনে বস্‌তে দেখে অনাদি বাবু নিশ্চিন্ত মনে শুয়েছেন। লাল-নীল পেন্সিলটা দাঁতে চেপে ধরে টেবিলের ওপরের একটা বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবনী বসেই আছে। এক জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া দু'টি লাইন তার দৃষ্টিকে আটকে রেখেছে। লাইন দু'টি এই :—

"চঞ্চলা বনানীর বন-হরিণী
বাহুতে দিল না ধরা নয়নমণি।"

কি সুন্দর কথাগুলি! ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে গেল—পড়ার বই আর খোলা হলো না।

মৃদু কণ্ঠে শব্দ,—"দাদাবাবু!"

অবনী চকিতে সোজা হয়ে বল্‌লো। যে ডেকেছিল, সে ভিতরে এলো। বললে, "দাদাবাবু, মা আপনাকে এক বার ডাকছেন—তাঁর বুকের ব্যথাটা আজ বেড়েছে।"

চেয়ার ছেড়ে যেতে যেতে অবনী বল্‌লে, "বাবা উঠেছেন জানো? আমি একেবারে ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাচ্ছি।"

সুরে মিনতি ভরে ঝি বল্‌লে, "অত সোরগোল করতে হবে না আপনার! মাকে দেখে এসে ডাক্তারকে খবর দেবেন।"

চিন্তিত মুখে অবনী ঝি-এর আগে আগে চল্‌লো—লক্ষ্য করলে অবনী দেখ্‌তে পেতো চাপা হাসিতে ঝিয়ের মুখ ভরে উঠেছে।

মার ঘরে পৌঁছে সে দেখলো—চোখ দু'টি বন্ধ করে তিনি মেঝের ওপরে একটা মাদুরে শুয়ে আছেন। পাশে কাচের একটা তেলের বাটি আর এক ঘটি জল। মাথার কাছে মৈত্রেয়ী বসে পাখার বাতাস করছে। ঘরের বড় আলোটি বন্ধ, নীল বাল্‌বের আলোয় ঘরের হাওয়া যেন অসুস্থ হয়ে উঠেছে! দ্বিধা না করেই অবনী মায়ের পাশে বসে পড়ে ব্যাকুল হয়ে 'মা' 'মা' করে ডাক্‌তে লাগলো। বসুমতী বন্ধ চোখ দু'টি একবার খুললেন; পরক্ষণে বল্‌লেন, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে বাবা!"

ব্যস্ত হয়ে অবনী মায়ের বুকের এখানে-ওখানে হাত বুলিয়ে যেন তাঁর যন্ত্রণা লাঘব করে দিতে চাইলো। ভাবনায় তার মন ভরে উঠলো! এই মার কাছেই তার যত আবদার! এই মাকে যদি হারিয়ে ফেলে, তবে তার অবস্থা কত কঠিন হয়ে উঠবে!

রাত্রি দু'টো হবে। বন্ধ চোখ দু'টি খুলে বসুমতী বল্‌লেন, "তোমরা এখনও বসে আছ? একটু বিশ্রাম করোগে, আমি ভালই আছি এখন।"

মায়ের এ কথায় অবনী বিষম চম্‌কে উঠে এক বার মৈত্রেয়ীর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলে। দেখলে, সে মুখে ভাবের কোনো খেলাই নেই!

উঠে ধীরে ধীরে অবনী তার পড়ার ঘরের দিকে চল্‌লো দেখে বসুমতী বল্‌লেন, "পাশের ঘরে শো খোকা। আবার যদি ব্যথা বাড়ে, কে তখন বাইরে ছুটে যাবে ডাক্‌তে?"

অবনী চলে গেলে মৈত্রেয়ীর হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে বসুমতী বল্‌লেন, "তুমিও একটু শুয়ে নাওগে মা—রাত আর বেশী নেই!"

বার-বার পীড়াপীড়ি করায় পাখা রেখে দিয়ে মৈত্রেয়ীও উঠে গেল।

দরজার কাছেই অবনী দাঁড়িয়েছিল—হাতটা টেনে ধরে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে সে মৈত্রেয়ীর কাণে কাণে বল্‌লে, "মার কি সত্যি অসুখ করেছে? না, ছলনা?"

একটু হেসে মৈত্রেয়ী মাথা নীচু করলে। শাশুড়ীর স্নেহের এই ছলনাটুকু বুঝতে দেরী না হলেও তার লজ্জা করছিল খুব।

চার

অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙ্গে ওঠা অনাদি বাবুর চিরদিনের অভ্যাস। পড়ার অছিলায় অবনীরও একই সময়ে উঠতে হয়—যদিও পড়া হয় না কিছু। আজ তার কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি ভাবলেন, রাত জেগে পড়ে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্নেহ-সজাগ মন নিয়ে তিনি তার শারীরিক অবস্থা জানবার জন্ম মশারিটা ধীরে তুলে ফেললেন। এ কি! বিছানায় অবনী নাই তো! বিছানায় না থাকার একমাত্র সম্ভাবনা বিদ্যুচ্চমকের মত তাঁর মাথায় খেলে গেল—বধূর অঞ্চলে আশ্রয় নেয়নি তো? রাগে এবং ক্ষোভে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগলো। একটা বড় অফিস এত কাল ধরে চালিয়ে এসে শেষে নিজের বাড়ীতেই 'ডিসিপ্লিন' ভঙ্গ! ছেলে, বৌ—কাউকে তিনি আজ আর খাতির করবেন না—এমনি একটা দুর্জ্জয় পণ নিয়ে ভিতরে চলে এলেন নিঃশব্দে!

অবনীর ভাগ্য তখনকার মত ভালই ছিল বলতে হবে—না হলে অনাদি বাবু গিয়ে তাকে বসুমতীর ঘরে দেখতে পাবেন কেন?

অবনী নীচু হয়ে মায়ের কাণে কাণে বলছিল, "কেমন আছ এখন মা? আর তো কষ্ট হচ্ছে না কিছু? আমি তাহলে এখন যাই। দরকার বোধ করলেই ডেকে পাঠিয়ো।"

দেখে-শুনে অনাদি বাবুর আর বকা হলো না। রাগ নিবে গেল। স্ত্রীর বুকের অসুখের কথা তাঁর অজানিত ছিল না। রীতিমত ভয় পেয়ে তিনি কোনো কুশল প্রশ্ন করতেও ভুলে গেলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অবনী বল্লে, "আমি ডাক্তারকে ফোন্ করতে যাচ্ছি। মা কাল রাত্রে খুব বেশী ছটফট করেছেন।"

নেমে যাওয়ার মুখে মৈত্রেয়ী যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরে ঢুকে একবার ঘুমন্ত মৈত্রেয়ীকে দেখে যাবার লোভ তার মনে জেগে উঠলো—কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে সাহস হলো না। কি জানি, বাবা যদি এ ঘরে আসেন!

পরের দিন সকাল।—সকালের খাবার সাজিয়ে বসুমতী স্বামি-পুত্রের অপেক্ষায় ছিলেন—আজ আর বাইরে খাবার যায়নি। প্রথমে অবনী তার পিছনে একটু গম্ভীর মুখে অনাদি বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

একটু অনুযোগের সুরে অবনী বললে, "তুমি আবার উঠে এই সব করছ কেন মা? রোজের মত আজও কেন বাইরে খাবার পাঠিয়ে দিলে না?"

ছেলের মতে সায় দিয়ে অনাদি বাবুও বললেন, "হুঁ—সেই তো ভাল ছিল। অসুখ শরীরে এ-সব করা ঠিক নয়।"

একটু উষ্মার সঙ্গে বসুমতী বললেন, "না, ঠিক নয়। দিন-রাত 'শরীর গেল' 'শরীর গেল' করে আলমারীতে সাজানো কাচের পুতুলের মতো পড়ে থাকি! মেয়ে-জাতের যা ধর্ম্ম, যা প্রাণ, সেটা বাদ দিয়ে বিধি-নিষেধের পাঁচিল তুলে আমি বাঁচতে চাই না।"

খেতে খেতে মুখ তুলে অবনী বললে, "কিন্তু তুমি যে অসুস্থ মা!"

"ওরে, এ অসুখ তো আর আজ আমার নতুন নয় বাবা—তবে শুধু শুধু এই যে প্রাণটা যেমন কণ্ঠার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে,—হয়তো তোর মুখখানা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই বেরিয়ে যাবে! কাল ভাগ্যিস্ বৌমা ছিল কাছে—না হলে হয়তো মরা মুখ দেখতিস্ এসে।" বলে তিনি অনাদি বাবুর দিকে চাইলেন।

অনাদি বাবু এদিকে দৃঢ়চেতা হলেও স্ত্রীর মরার কথায় নিজেকে কেমন একটু দুর্ব্বল অসহায় বোধ করতেন! এখন এ কথায় চমকে উঠে বললেন, "তুমি একেবারেই সব ছেড়ে দিলে! ওষুধও খাবে না, বিকেলে বেড়াতেও যাবে না! গাড়ীখানা শুধু শুধু পড়ে থাকে।"

খাবার খেয়ে অবনী ছোট ছেলের মত মায়ের কাছে এসে বসলো। মা-ও তাঁর একমাত্র সন্তানের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "খোকা, তুই আমাকে ভুল বুঝিস্‌নে বাবা। কি যে ওঁর গোঁ! যখনকার যা তখনকার তা'। আমি দেখতে পারিনে এ-সব। আমি যেমন করে পারি, ওঁর মত আদায় করবই। তুমি কিন্তু বাবা, ভাল করে পড়ে এম-এ ডিগ্রীটি নেবে। ওঁর বড় ইচ্ছে, তুমি ভাল করে পাশ করো—তোমার ওপর ওঁর কত বড় আশা। আমার মুখ রেখো বাবা।"

অবনীর মুখ লাল হয়ে উঠলো। তবু মাতা-পুত্রে কোন গোপনতা ছিল না বলে অসঙ্কোচে সে বললে, "মা, তোমার মুখ আমি রাখবই।"

রাত্রি সাড়ে ন'টা। বসুমতী ঘরের মেঝেয় পাটী পেতে শুয়ে আছেন। কাছে বসে মৈত্রেয়ী একখানা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল। জুতার শব্দে বই রেখে চেয়ে দেখলে, শ্বশুর! "এখন কেমন আছ?" জিজ্ঞাসা করে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

বসুমতী মৈত্রেয়ীকে বললেন, "যাও মা, একটু ঘুরে ফিরে এসো। অনেকক্ষণ থেকে এক ভাবে বসে আছ।"

মৈত্রেয়ী ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে একেবারে ছাদে চলে গেল।

ছাদের নীচে চাইলে বাগান দেখা যায়। তার ও-পিঠে অবনীর পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে—সেই আলোর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে সে চেয়ে রইলো—শেষে তার চোখ দু'টো জ্বালা করতে লাগলো।

সোজা স্বামীর দিকে চেয়ে বসুমতী বললেন, "দেখ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ছেলেকে উপযুক্ত বুঝে তুমি তার বিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তার পরের ব্যবস্থাটা আমার মোটেই সঙ্গত ঠেকছে না। বাধা যেখানে প্রবল, সে বাধা লঙ্ঘন করবার ইচ্ছাও সেখানে তেমনি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ছেলে আমার খুব ভাল, তাই তোমার নিষেধের প্রতিবাদ করে না! কিন্তু শুকনো মুখে দু'টিতে ঘুরে বেড়ায়, কেউ যেন কাউকে চেনে না, রাত্রে আমার পাশটিতে শুয়ে বৌমা কেবলি এ-পাশ ও-পাশ করে! এ সব কি ভালো? আমার মোটে ভাল ঠেকে না। চিরদিন তোমার কথা আমি শুনে এসেছি, কিন্তু এবারে আর তোমার কথা শুনবো না।"

অনাদি বাবু বললেন, "আমার মতে চলে কারো কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না—তবে এবারেই বা সামান্য বিষয়ে তোমার জিদ্ হবে কেন? ছেলে যদি ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ হয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা নাম রাখতে পারে, তবে সে গৌরবের একটা অংশ তুমিও পাবে।"

রুষ্ট স্বরে বসুমতী বললেন, "গৌরব-অগৌরবের কথা হচ্ছে না। তোমার নিজের কথাও ভেবে দেখো—আঠারো বছরে বিয়ে করেছিলে, আর পড়ুয়া অবস্থাতে। কিন্তু কই 'ফেল' হওনি তো! বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়—জীবন-সংগ্রামেও নয়।"

"সে-কাল বদ্‌লে গেছে গিন্নি! আজকাল ছেলেরা বইয়ের চেয়ে 'বউ'কেই বেশী ভালবাসে। তাই—"

"তাই! রেখে দাও তোমার তাই! খোকাকে আমি আমার পাশের ঘরে রাখবো—বারোটার আগে শুতে আর পাঁচটার পরে উঠতে পাবে না,—এর জন্য দায়ী আমি। সমস্ত দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই পাঁচ ঘণ্টা তোমার এলাকায় না থাকলে ছেলের তোমার 'দিগ্‌গজ' বনতে একটুও আট্‌কাবে না। ও-সময়টা ঘুমেরই সময়।"

"হুঁ! তুমি তো বললে—কিন্তু এই পাঁচ ঘণ্টা কতখানি মারাত্মক, তা তুমি বুঝতে পারছ না। এ-যে কি নেশা!"

"তুমি তা ভুললেও আমি ভুলিনি। তাই বলছি, এ নেশার টান্ প্রবল হলে মানুষের দিখিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তখন? তখন কি করবে? যাক্, আমি আর বক্‌তে পারছি না—আমার হাঁফ্ ধরছে!"

স্ত্রীর এ কথায় অনাদি কেমন বিহ্বলের মত হলেন। মাথার কাছে রাখা টেবিল-ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে। তুমি এ ব্যাপার নিয়ে মনে আর ব্যথা পুষে রেখো না। তোমার হার্টের যা' অবস্থা!"

স্ত্রীর আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথার আশঙ্কায় তাঁর মুখ ম্লান এবং কণ্ঠ সজল হয়ে এলো।

পাঁচ

এর পরের ঘটনা খুব সামান্য এবং সহজ।

বসুমতীর কল্পিত অসুখ মৈত্রেয়ী আর অবনীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে দিল। প্রৌঢ় বয়সে অনাদিও ছেলের পাহারাদারী থেকে মুক্তি পেলেন। এতে যে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এমন বোঝা গেল না।

আষাঢ়ের বর্ষণক্লান্ত রাত্রি। সন্ধ্যায় গাঢ় মেঘের অন্ধকার কেটে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ হাস্‌তে হাস্‌তে আকাশে ভেসে চলেছে। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের অফুরন্ত জ্যোৎস্নার এক ফালি ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। সেইটুকুর মধ্যেই পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত ধরে মৈত্রেয়ী আর অবনী বসে। মুখে তাদের ভাষা নাই—চোখ পলকহারা!

সেই জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রের মৌন ভাষার আবেদন প্রৌঢ় দম্পতীকেও ঘরের বাইরে এনেছিল। ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় বসুমতী অতি সন্তর্পণে খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে স্বামীকে কাছে ডাকলেন। সেই কৌতুকময়ী অতিমাত্রায় কুতূহলী প্রকৃতির চিরন্তনী নারী!

অনাদিনাথ একটু হেসে প্রায় কাণে কাণে বললেন, "হ্যাঁ গা, সম্বন্ধটার কথা বুঝি আর মনে রইলো না!"

মুখে আঙুল দিয়ে বসুমতী চুপ করতে বললেন। মিনিট দুই পরে তিনি ফিরে নিজের ঘরে গেলেন, অনাদিনাথ বল্লেন, "ঘরে এলে যে! এই যে বললে, গরম লাগছে—বাগানে বেড়াবে!"

বসুমতী নিমেষে নিজের কিশোরী-অবস্থায় ফিরে গেলেন। কণ্ঠস্বর অতি মৃদু। সে কণ্ঠে মাধুরী-মিশ্রিত। তিনি বললেন,—"বলেছিলাম বটে—কিন্তু এখন আর যাব না। ওরা যদি বাগানে যায়, কি ভাববে বলো! সে লজ্জা আমি লুকোব কোথায়?"

* * * *

অসংখ্য দেবদেবীর পায়ে অফুরন্ত মানত শোধের দাবী রেখে পরীক্ষার দিনটি এগিয়ে এলো। অবনীর পরীক্ষা তো বটেই, মৈত্রেয়ীরও যেন পরীক্ষা! মনের শুদ্ধ কামনাটি সে দেবতার পায়ে জানাচ্ছিল।

মাস দেড়েক পরে। অবনীর পাশের খাওয়া খেয়ে বন্ধুবর্গ আর আত্মীয়-স্বজন যখন বাড়ী ফিরছিল, সে তখন মার্কেটে দোকানে-দোকানে চঞ্চল পায়ে ঘুরছে, মনের মত জিনিষ না পেয়ে তার ক্ষোভের আর সীমা নেই।

শেষে এক জায়গায় এসে সে থামলো। রাশি রাশি ফুলের মাঝে চমৎকার আধফোটা একটি পদ্ম-কলি। যেমন সাদা তেমনই রূপ-লাবণ্যে ঢলঢল। সেই একটি ফুলই সে অনেক দাম দিয়ে কিনে বাড়ী নিয়ে গেল।

রাতের নিরালায় মৈত্রীর সঙ্গে যখন তার মেলবার সুযোগ হলো, আনন্দে উদ্বেল কণ্ঠে সে বল্লে, "মৈত্রী—আজ আমাদের বিয়ে নতুন করে হলো। যাকে দেখলে তোমার কথা মনে পড়ে তাকে আজ তোমার হাতে দেবো বলে অনেক খুঁজে নিয়ে এসেছি। এখন পাশাপাশি রেখে দেখি, কোনটা বেশী সুন্দর!"

সার্থকতার আনন্দে মৈত্রেয়ীর মুখে হাসির দীপ্তি। অবনী এগিয়ে এসে সেই পদ্ম-কলিটি তার হাতে তুলে দিলে। তার পর একেবারে বর্ষা-বারি-পুষ্ট বন্যার মত অজস্র আদরে তাকে প্লাবিত করে দিল। ঘরে মাথার ওপরে একশ'-বাতির বিদ্যুৎ আলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলো।

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

ভাগ্য ও পৌরুষ

ভাগ্য তব মন্দ হলে পৌরুষে হায় করবে কি?
বিদ্যা বলো, শক্তি বলো ভাগ্যহীনে অর্থ কি?
বিদ্যা তব বুদ্ধি তব নাই বা থাকুক নাই ক্ষতি,
ভাগ্য তব এনে দিবে মুক্তা-মণি খর-জ্যোতি।

বিধাতা বাম হন্ যদি হায়, কোথায় রবে বিদ্যা-বল?
রাম-রাবণের সংগ্রাম—সে বিধাতারই মন্ত্র ছল!
শ্রীবৎসের ঐ শনির দশা, সাধ্বী সতীর বনবাস—
ভাগ্যহীনের বক্ষে বহে এমনি কত দীর্ঘশ্বাস!

শ্রীসুবোধ পাল (বি-এ)

হিপ্নটিজম্

আজকাল হিপ্নটিজম্, মেসমেরিজম্ প্রভৃতির কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই হিপ্নটিজম্ বা মেসমেরিজম্ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—উহা এক প্রকারের 'ঘুম' মাত্র। তবে এই নিদ্রার বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রদর্শকের ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পাত্র যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ প্রদর্শকের সর্ব্বপ্রকার আদেশ সে মানিয়া চলে।

যে বিদ্যার প্রভাবে এক ব্যক্তি অপরকে মোহিত বা বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা অভীপ্সিত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে পারে, সে বিদ্যার নাম সম্মোহন-বিদ্যা। অনেকে সম্মোহন-বিদ্যাকে 'হিপ্নটিজম্' বলিয়া থাকেন। কিন্তু মোহ হইলে জ্ঞান থাকে না, হিপ্নটিজমে জ্ঞান থাকিতেও পারে। মোহাবস্থায় আত্মবোধ সম্পূর্ণ লোপ পায়, কিন্তু হিপ্নটিজমে উহা প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। (সম্মোহন = সম্ - নিজন্ত মুহ্ = 'মোহি' + অনট্ ভা। সম্যক্ মোহ-প্রাপ্ত। সম্যক্ = সম্পূর্ণ, মোহনিদ্রা = মায়াজনিত সুপ্তি, মুগ্ধতা হেতু ঘুম) কাজেই দেখা যায়, হিপ্নটিজম্ ও সম্মোহন বিদ্যাকে এক আখ্যা দেওয়া ভুল। তবে সমস্তই ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞানের সমুন্নত শাখা।

অনেকে সম্মোহন বিদ্যাকে মেসমেরিজম্ বলিয়া থাকেন। ইহাও ঠিক নয়। 'মেসমেরিজম্' শব্দটি ইহার আবিষ্কারক ভিয়েনা নগরীর মেসমার সাহেবের নাম হইতে গঠিত। ডাক্তার মেসমার এই শক্তিকে চিকিৎসা-কার্য্যে নিয়োগ করিয়া উহার দ্বারা বহু কঠিন রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করেন। যে শক্তির সাহায্যে তিনি মোহিত করিতেন, তাহাকে তিনি 'প্রাণিদেহস্থ চুম্বকশক্তি' বা 'এ্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজম্' আখ্যা দিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই বিদ্যাকে 'মেসমেরিজম্' আখ্যা দেন। ডাক্তার ব্রেইড নামক ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী জনৈক চিকিৎসক ইহাকে হিপ্নটিজম্ আখ্যা দেন। হিপ্নটিজম্ এই ইংরেজী শব্দটি নিদ্রা অর্থে ব্যবহৃত গ্রীকশব্দ 'হিপ্নস্' হইতে উদ্ভূত।

হিপ্নটিজম্ করিবার যতগুলি প্রক্রিয়া আছে, মনোবিদ্‌গণ সবগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ১। প্রভাব-মূলক সম্মোহন (Hypnotism by domination); ২। সমবায়মূলক সম্মোহন (Hypnotism by Co-operation) প্রভাবমূলক হিপ্নটিজমে সম্মোহক তাঁহার পাত্রের উপর নিজের মানসিক শক্তির ক্রিয়া দেখান। ভয়ে এবং বিস্ময়ে পাত্রের মন তিনি অভিভূত করিয়া দেন এবং পাত্রকে প্রথম হইতেই নিজের বাধ্য করিবার জন্য সম্মোহক অনেক প্রক্রিয়া করেন। পুরাকালের কাপালিকগণের সম্মোহন ও ইতিহাস-বর্ণিত যাদুকর রাসপুতিনের সম্মোহন অনেকটা এই শ্রেণীর ছিল। কিন্তু সমবায়মূলক সম্মোহনে ঐরূপ জোরের কোন প্রশ্ন নাই। সেখানে পাত্র ও প্রদর্শকের ইচ্ছাশক্তির পরস্পর-বিরোধে হিপ্নটিজম্ উৎপন্ন হয় না, পরস্পরের মিলনে তাহা সঙ্ঘটিত হয়। কাজেই পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হোক, দুর্ব্বল হোক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সেখানে সম্মোহক তাঁহার পাত্রকে একটা আরাম-কেদারায় শোয়াইয়া যত দূর সম্ভব আরাম দিবেন। তার পর বলিতে হয়, "তুমি তোমার মন হইতে দুঃখ ক্লেশ সব ভুলিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে কর এবং দেহকে কৌচের উপর এলাইয়া দিয়া উহাই ভাবিতে থাক। মনে কর যে, তোমার ঘুম আসিতেছে—তুমি ঘুমাইবে।" সম্মোহক সে সময় পুনরায় বলেন, "তুমি ঘুমাও—ঘুমাও"। এই কথা বলিয়া তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই পাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। এই নিদ্রোৎপাদনই 'হিপ্নটিজম্'। কাজেই দেখা যাইতেছে, পাত্রের প্রথমে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহা অনাসক্তির লক্ষণ। কারণ, এই অবস্থায় যদি তাহাকে বলা হয়, তুমি চক্ষু খুলিতে পারিবে না, সে কিছুতেই তাহা পারিবে না। সে তখন বলিবে, "আমি খুলিতে পারি, কিন্তু মোটেই ইচ্ছা করিতেছে না।" ইহার পর ক্রমেই এ নিদ্রা গাঢ় হইতে আরম্ভ করে। পাত্র তখন শত চেষ্টা করিলেও আর চক্ষু মেলিতে পারিবে না। ইহার পর গাঢ়তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার নামই 'সংজ্ঞাস'। পাত্র তখন ক্রিয়া-প্রদর্শকের ইচ্ছাধীন ভৃত্য মাত্র, তাহার দেহ সুদৃঢ় কঠিন করিয়া তদুপরি গুরুভার জিনিষ দিলেও সে বুঝিবে না অথবা দেহে বোধরহিতাবস্থা সৃষ্টি করিয়া অস্ত্রোপচার করিলেও সে তাহা জানিবে না। ইহারই নাম "পূর্ণ সম্মোহন" (complete hypnotism)।

'মেসমেরিজম্' বিদ্যার আবিষ্কারক ডাক্তার মেসমার সম্মোহন বিদ্যার মূলে শারীরিক কারণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, জীবদেহ মাত্রেই এক প্রকার তড়িৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। এক দেহ হইতে অন্য দেহে তাহা প্রবাহিত করিলে সেই অপর ব্যক্তি অভিভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার মতে এই "জীবদেহের তড়িৎশক্তি" অনেকটা বিদ্যুৎ বা চুম্বক শক্তির অনুরূপ। উহাকে তিনি জীবদেহে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মেসমার সাহেব মনে করেন যে, এই চুম্বক শক্তির নিজেরই রোগ-প্রতিবিধায়ক ক্ষমতা আছে। বর্ত্তমানে যে আদেশ (suggestion) সম্মোহন করিবার উপায়-স্বরূপ দৃষ্ট হয়, উহা অনেক পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে প্রচলিত বর্ত্তমান কালের মেসমেরিজম্ বিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার সম্পর্কে তিনটি প্রধান মতবাদ আছে। যথা—(১) মেসমারের মত (The Mesmer school) (২) নান্সি মত (The Nancy school) (৩) প্যারিস বা চার্কোর মত (The Paris or Charcot school).

মেসমার স্কুল অনুযায়ী মেসমেরিজম্ উৎপন্ন হয় ক্রিয়াপ্রদর্শক কর্ত্তৃক প্রদত্ত মানসিক বা মৌখিক আদেশ বা অভিভাব (suggestion) এর প্রভাবে। এই মতবাদের মূলেই রহিয়াছে এই সম্মোহন আদেশ, যাহা পাত্রের উপর প্রয়োগ করিলে সে সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ে।

প্যারিস স্কুল বা চার্কোর মতানুযায়ী ইহাতে জীবদেহস্থ চুম্বক বা বিদ্যুৎ শক্তি কিম্বা অভিভাব বা আদেশ ইত্যাদির কিছুই নাই। চার্কো সাহেবের মতে মেসমেরিজম্ এক প্রকার স্নায়ুগত ব্যাধি মাত্র। যে সকল লোক ক্ষীণমনা অথবা দুর্ব্বলচিত্ত, তাহারাই সহজে এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় একটি অসুখ-বিশেষ।

মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড মেসমার সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উপায়টি বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, পাত্রকে যদি একটি উজ্জ্বল জিনিষের প্রতি তাকাইয়া রাখানো হয়, তাহা হইলে সে সম্মোহিত হইয়া পড়ে। তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমি সাধারণতঃ একটি উজ্জ্বল জিনিষ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জ্জনী ও মধ্যমা—এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা পাত্রের চক্ষু হইতে পনের ইঞ্চি দূরে ধরি এবং তাহাকে ইহার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জোরে তাকাইয়া থাকিতে বলি।" ঐ ভাবে থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া আসে এবং পাত্র অতি সহজে নিদ্রাভিভূত হয়। এই নিদ্রাকেই ব্রেইড সাহেব 'হিপ্নটিজম্' নাম দিয়াছিলেন। ডাক্তার লয়েড টাকী নামক সুপ্রসিদ্ধ মনোবিদ্ এই ব্যাপারের সুন্দর যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাত্র এক চিত্তে ও এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ক্রমে ক্রমে কম আকৃষ্ট হইয়া শুধু ঐ জিনিষটিই দেখিতে আরম্ভ করে। তখন সে ঐ একই জিনিষ ব্যতীত অন্য কিছুই জানিবে না। কারণ, তাহার দৃষ্টিকেন্দ্র ক্রমে ক্লান্ত হয় এবং উত্তেজিত হয় না। সেই ভাবে দর্শন-স্নায়ুও ধীরে ধীরে সংবেদনে বিরত হয় এবং সেই পাত্র 'অজ্ঞান অবস্থা' বা মানসিক শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। সুস্থ মানুষের মনে পারিপার্শ্বিক বহুবিধ চিন্তাধারা আসিয়া তাহার মনকে আপ্লুত করে, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টিসাধনা দ্বারা সে কেবল একটি বিশিষ্ট বিষয়ের প্রতিই তাহার মনকে নিবিষ্ট করিতে থাকে এবং ক্রমে উহা পারিপার্শ্বিক প্রায় সর্ব্ববিধ চিন্তাধারা হইতে মুক্ত হইয়া শুধু ঐ একটি বিষয়েই আবদ্ধ হয়। সহজ ভাষায় ইহাকে একবিষয়ণী-মন বলা চলে। এই অবস্থায় মনের পরিণতি হয় চিন্তাশূন্যতায়। একটি অন্ধকার ঘরে সামান্য আলোক-রশ্মি পতিত হইলে সেখানটা খুব বেশী আলোকিত বলিয়া মনে হয়; কারণ, সেখানে ঐ এক বিন্দু রশ্মি ব্যতীত অপর কোন আলোকের চিহ্ন নাই, রহিয়াছে শুধু বিরল অন্ধকার। সেইরূপ নিদ্রিত (সম্মোহিত) লোকের চিত্তে কোনরূপ 'আদেশ' প্রদান করিলে খুব বেশী জোরের সহিত তাহা কাজ করিবে; কারণ, সেখানেও উক্ত আদেশ বা 'অভিভাব' ব্যতীত অপর কোন চিন্তাধারার স্থান থাকে না।

হিপ্নটিজম্ করিবার পর সেই ব্যক্তিকে কোনরূপ আদেশ দিলে তাঁহার অন্তর্মন উহা প্রতিপালন করে। এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, মনস্তত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করিয়াছেন মানুষের মন দুইটি—অর্থাৎ বিভিন্ন ভাব বা প্রকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি মানসিক ক্রিয়া বিদ্যমান আছে। উহাদিগের নাম অন্তর্মন (Subjective mind) ও বহির্মন (Objective mind)। মানুষ প্রতিদিন যত কাজ করে সমস্তই এই মন দুইটির উত্তেজনায় করিয়া থাকে। মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই মন দুইটির দাস। উহারা যে যেমন আদেশ করিবে, মানুষ নির্ব্বিচারে তাহাই প্রতিপালন করিতে বাধ্য, সেখানে কোনরূপ ওজর-আপত্তি খাটে না। এই মন দুইটির মধ্যে একটি সেন্‌সরি নার্ভ (Sensory Nerve) নামক স্নায়ুর মধ্য দিয়া কার্য্য করে; অপরটি মোটর নার্ভ (Motor Nerve) নামক স্নায়ুর মধ্য দিয়া কার্য্য করে। কাজেই এক মন সর্ব্বদাই জাগ্রত; কারণ, উহা ভাল মন্দ গুণাগুণ বিচার-শক্তিসম্পন্ন এবং নিয়তই সতর্ক থাকে। অপর মন বিচারশক্তিহীন ও অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় থাকে। সম্মোহিত অবস্থায় এই মনের সাহায্য লইতে হয়। বিখ্যাত মনোবিদ্ পণ্ডিত হাডসন (Hudson) সাহেব মনের দ্বিত্ব-বিধির (Duality of mind) খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হিপ্নটিজম্ করিবার পর মানুষের জাগ্রত বহির্মনের ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং সে বিচারশক্তিহীন অন্তর্মন কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা আরও সহজ হইবে। একটি বালককে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি গোল আলু দিয়া যদি বলা হয়, এটি 'রসগোল্লা' তুমি এটি খাইয়া ফেল, সে নিশ্চয়ই ইহাতে আশ্চর্য্য অথবা ক্রুদ্ধ হইবে। কারণ, তখন তাহার উভয় মনই জাগ্রত আছে। তাহার বিচারশক্তিসম্পন্ন সতর্ক মন (যাহাকে বহির্মন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে) তাহার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিচার করিয়া বলিয়া দিবে যে, ওটি রসগোল্লা নয়, একটি গোল আলু মাত্র। সে চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছে ইত্যাদি। সমস্ত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে ইহার প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া লইতেছে। কিন্তু ঐ বালকটিকেই যদি হিপ্নটিজম্ করা হয়, তখন তাহাকে যাহা বলা যাইবে, সে তাহাই মনে করিবে। সে অবস্থায় সে ঐ আলুকেই রসগোল্লা বলিয়া স্থির জানিবে। এমন কি, উহা চুষিলে রসগোল্লার ন্যায় মিষ্ট রসও সে অনুভব করিবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সে তখন চক্ষুতে দেখিয়া ইহার পার্থক্য স্থির করিতে অক্ষম; শুধু তাহাই নয়; জিহ্বা দ্বারা উহার প্রকৃত আস্বাদন জানিতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। এই অবস্থায় পাত্রের নিজের বিচারশক্তি লোপ পায় এবং প্রদর্শক যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন সেইরূপই সে বুঝিতে আরম্ভ করে। তাই একই জিনিষ এক বার আলু পরক্ষণে রসগোল্লা এবং পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে যাহা মাটীমাখা ছিল পর-মুহূর্ত্তে উহা সরস মিষ্ট হইল কিরূপে? এ কথাও তাহার চিন্তাপথে উদিত হয় না।

সম্মোহকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, তিনটি শক্তির সাহায্যে মানুষের বহির্মনকে নিশ্চেষ্ট করিতে পারা যায়। উহারা যথাক্রমে দৃষ্টি, স্পর্শ ও ইচ্ছা। এই তিনটি কোন ব্যক্তির উপর নির্দ্দিষ্টরূপে প্রয়োগ করিলেই তাহার বহির্মন কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চেষ্ট থাকিবে এবং সে অন্তর্মনের আজ্ঞাধীন ভৃত্যবৎ কার্য্য করিবে। আলুকে রসগোল্লা বলিয়া ভুল করা, সামান্য কয়েক খণ্ড কাগজকে লুচি মনে করা প্রভৃতি দৃষ্টি-ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় আদেশ বা অভিভাব দ্বারা শুধু তাহার মনে ভ্রম নহে, তাহার শরীরস্থ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ এবং বৃত্তিগুলিকেও অনেকটা বশীভূত করা সম্ভব হয়।

সম্মোহিত অবস্থায় পাত্রের নবজীবন আরম্ভ হয়। বিশেষজ্ঞগণ এই নূতন জীবনকে ইংরেজীতে Second personality বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বাভাবিক (প্রথম জীবনের) সত্তা তখন লুপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় জীবনের সত্তার প্রাধান্য লাভ ঘটে। তবে এই ব্যাপারের একটি চমৎকার অবস্থা (phase) আছে। নিদ্রিতাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করাইলে পাত্র প্রায় উহা জাগ্রত অবস্থায় পালন করিয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করাইবার নিমিত্ত প্রদর্শক যে সমস্ত আদেশ দিয়া থাকেন, তাহাই 'পোষ্টহিপ্নটিক' আদেশ বা 'সম্মোহনোত্তর অভিভাব' নামে অভিহিত। ইহার দ্বারা

পাত্রকে নানারূপ সংকাজে প্রবৃত্ত করান যাইতে পারে। এই আদেশের সাহায্যে কোন ব্যক্তি তাহার বাঞ্ছিত কোন ব্যক্তিবিশেষকে চিরদিনের জন্য নিজের ইচ্ছার অধীন রাখিতে পারে। কাজেই ইহার দ্বারা এমনই অত্যদ্ভুত কার্য্যাদি করান যাইতে পারে, যাহা মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় কল্পনা করিতে সাহসী হয় না। ইহা দ্বারা লোকের যেমন উপকার করা যায়, তেমনই নানাবিধ অপকারও করা অসম্ভব নয়। সে জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করিতেছেন, যাহাতে ইহার দ্বারা সমাজের অপকার সাধিত না হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে (International Congress of Physicians Practising Hypnotism) সম্মোহন চিকিৎসকদের আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হয় যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কঠোর আইন দ্বারা এই হিপ্নটিজম্ প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন যে, সমাজের উপকারের নিমিত্ত এই বিত্তার প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু অপরের ইচ্ছা-শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাকে দিয়া তামাসা দেখানো মোটেই সঙ্গত নয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে অনুরূপ প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

হিপ্নটিজমের এই দিক্ ছাড়া অপর দিকও আছে। ইহা দ্বারা পিতামাতা তাঁহাদের দুরন্ত সন্তানদিগকে বাধ্য করিয়া রাখিতে পারেন, ডাক্তারগণ নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন, দোকানদার ও দালালগণ অধিক-সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন, নিজের বা অপরের কুৎসিত অভ্যাস ও মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা ত্যাগ করাইতে, পাঠে মনোযোগ শক্তি, স্মৃতি-শক্তি, মেধা, রচনা ও বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এইরূপ বহুবিধ সমাজ-হিতকর কার্য্যাদি করাও সম্ভব। চরিত্রদোষ দূর করিয়া মনে পবিত্র ভাব আনয়ন করিতেও সম্মোহন যথেষ্ট সহায়তা করে। ডাক্তার গ্রেগরি তাঁহার 'এ্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজম্' পুস্তকে এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নীচ বংশের ১৩।১৪ বৎসরের সুন্দরী কিশোরীকে হিপ্নটিজম্ করিয়া তাহার মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার মুখশ্রী অপরূপ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে। তাহার দেহে দেব-ভাবপূর্ণ একটা পবিত্র জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়—যাহা সাধারণতঃ সাধারণ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না।" রায়কেন্‌বাক-গবেষণা বিবরণে (Riechenbach's Researches) উল্লিখিত আছে যে, এই হিপ্নটিজম্ বিদ্যা দ্বারা জনগণ বিশেষ উপকার পাইতে পারে। সুস্থ ব্যক্তিদিগকে যদি পূর্ব্ব হইতেই এক বার সম্মোহিত করিয়া রাখা যায়, তবে ভবিষ্যতে হঠাৎ কোন প্রকার রোগ বা দুর্ঘটনার সময় প্রয়োজন হইলে অনায়াসে পুনরায় হিপ্নটিজম্ করিয়া তাহার চিকিৎসা করা যাইবে। রায়কেন্‌বাক্ সাহেব বলেন যে, ভবিষ্যতে সম্মোহন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এমন কোন একটা উপায় উদ্ভাবিত হইবে, যাহা দ্বারা ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা যাইবে। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। সর্ব্ববিভাগে এ যুগে যেরূপ দ্রুত উন্নতি করিতেছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বর্ত্তমানে মনোবিত্তা, মনঃসমীক্ষণ প্রভৃতি লইয়া চতুর্দ্দিকে যেরূপ গবেষণা চলিয়াছে তাহাতে এ আশা যে শীঘ্র সফল হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

সাধারণতঃ সম্মোহিতাবস্থায় পাত্রের কি কি ঘটিয়াছে, জাগ্রত হইয়া তাহা সে স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পুনরায় সম্মোহিত করিলে তাহার পূর্ব্বেকার সম্মোহিত অবস্থার কথা স্মরণে আসা সম্ভব। কিন্তু মজা এই যে, পুনরায় জাগ্রত হইলে যদিও সে ঘটনার বিবরণ স্মরণ করিতে পারে না, তবু নিজের প্রতিশ্রুত বিষয়গুলি নির্ব্বিচারে পালন করিয়া থাকে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ লুই (Lewis) সাহেব এক জন পানাসক্ত ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন, জাগ্রত হইবার পর হইতে সে আর মদ্য পান করিবে না। পাত্র জাগ্রত হইয়া এ প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল সত্য; কিন্তু মদ্যপানে তাহার আসক্তি দূর হইয়াছিল। ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে মদ খাইতে নিষেধ করিত। প্রতিজ্ঞার কথা কিছুমাত্র স্মরণ না থাকিলেও এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া দিলেও পাত্র নির্ব্বিচারে তাহার নিদ্রিত অবস্থার প্রতিশ্রুতি জাগ্রত অবস্থায় অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। একটি উদাহরণ হইতে এ ব্যাপার আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এক জন বন্ধুকে সম্মোহিত করিয়া তাহাকে আদেশ দিলাম যে, আমি তোমাকে শীঘ্রই জাগ্রত করিয়া দিতেছি, কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—আমি যখনই বিছানায় শুইয়া পড়িব, তুমি অমনি আমার বৈদ্যুতিক পাখাটির সুইচ টিপিয়া জোরে চালাইয়া দিবে। সম্মোহন শেষ হইবার পর যেই আমি বিছানায় শুইলাম, অমনি বন্ধুটি গিয়া সুইচ টিপিয়া পূর্ব্ববর্ণিত নির্দ্দেশ-অনুযায়ী জোরে পাখা ছাড়িয়া দিল। হয়তো তখন শীতকাল—কিন্তু বন্ধুকে তখন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবে, "আমার পাখা খুলিবার ইচ্ছা হইতেছে।" এ ক্ষেত্রে সে সম্মোহিত অবস্থায় প্রদত্ত আদেশটি ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করিতে ভুলে নাই। ইহা মজার ব্যাপার নয় কি? স্মৃতি নাই অথচ আদেশ মানিয়া সমস্ত কাজ করিতে সে বাধ্য হইতেছে! বিখ্যাত সম্মোহন-বিত্তাবিদ্ প্রফেসার বিনি (Beannis) এক বার এক জন ভদ্র-মহিলাকে সম্মোহিত করিয়া বলেন যে, আগামী নববর্ষের প্রথম দিন উক্ত মহিলার গৃহে গিয়া তিনি বলিবেন যে, 'ভদ্রমহিলা নমস্কার' (Bon jour, mademoiselle)। জুলাই মাসে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ইহার প্রায় ছয় মাস পরে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনে উক্ত ভদ্রমহিলা প্রফেসার বিনিকে লিখিয়া জানান যে, তিনি আসিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন কেন? শুধু তাহাই নয়, ঐ দিন বিনি সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ সেই জুলাই মাসের সেইদিনকার পোষাকই ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১লা জানুয়ারী তারিখে উক্ত ভদ্রমহিলা ছিলেন নান্‌সিতে এবং প্রফেসার বিনি ছিলেন বহু দূরে পারিস্ নগরীতে। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ম্যাক্‌ডুগ্যাল (Mc Dougall) সাহেবও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একটি সৈনিককে তিনি হিপ্নটিজম্ করিয়া বলেন যে, "তুমি দু'দিন পরে বেলা ১২টার সময় আমার অফিসে আসিবে।" তার পর সম্মোহন-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ঠিক

দু' দিন পরে দেখা গেল যে, বারোটার সময় পূর্ব্বোক্ত সৈনিকটি মাকডুগ্যাল সাহেবের অফিসের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন করিতে সে বলিল, কি জানি কেন সাহেবের সঙ্গে তাহার দেখা করিতে ইচ্ছা হইতেছে ! ঠিক বারোটার সময়ই সে সাহেবের অফিসে ঢুকিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্মোহিত-অবস্থায় পাত্রের মনে গভীর ভাবে আদেশ দেওয়া হয় বলিয়াই সে উহা গ্রহণ করে এবং পরে ঐ প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে। সহজ বা সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তদপেক্ষা হিপ্নটিজম্ হইলে তৎকালে গৃহীত প্রতিজ্ঞা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। কারণ, ঐরূপ নিদ্রাকালে বা প্রসুপ্ত অবস্থায় বিরোধী সংস্কার থাকে না ; সুতরাং ঐ অবস্থায় বিশ্বাস অধিকতর সবল হয় এবং অধিকতর কার্য্যকারী হয়। বিরোধী সংস্কারের বা সংজ্ঞানের অভাবেই শীঘ্র শীঘ্র বিশ্বাস (Faith) উৎপন্ন হয় এবং এই বিশ্বাসের ক্রিয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

হিপ্নটিজম্ বিদ্যার অপপ্রয়োগ দ্বারা সমাজের বহু অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বার্ণার হলেণ্ডার সাহেব তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্লোরোফর্ম্ম ও বিষ যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে লোকের ভাল করিবার (অর্থাৎ রোগ নিরাময় করিবার) জন্য ব্যবহার করা হয়, আবার উহা দ্বারা লোকের মৃত্যু ঘটানোও সম্ভব, তেমনই হিপ্নটিজম্ বিদ্যার দ্বারাও লোক-সমাজে অনুরূপ ভাবে ভালো এবং মন্দ দুইই করা চলে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ হিপ্নটিজম্ দ্বারা দুরারোগ্য বহু ব্যাধি যেমন সহজে আরোগ্য করিতে পারেন (হয়ত কেবলমাত্র ঔষধ ব্যবহারে তাহা সম্ভব হইত না), তেমনই দুর্বৃত্তগণ নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্যও এই হিপ্নটিজম্ বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারে। জন-সমাজের উপকারের জন্যই তিনি এই সতর্ক বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত সমাজের হাতে এ বিদ্যা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। নতুবা দুর্বৃত্তদের হাতে পড়িলে তাহারা বহু গর্হিত পাপকার্য্য এবং সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিবে।

পি, সি, সরকার (যাদুকর)

আবু পাহাড়

ভ্রমণে বাহির হইয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই চোখে পড়িল রাজস্থানের Olympus (স্বর্গ) আবু পাহাড়। আবু পাহাড়ে যাইতে হইলে বি, বি, সি, আই রেলওয়ে (মিটারগেজ) লাইনের আবু রোড ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। বোম্বাই বা দিল্লী হইতে আবু রোড যাইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। আবু রোড বড় ষ্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনি। কয়েক হাজার রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসস্থান এইখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। দুইটি রেলওয়ে হাই স্কুল চলিতেছে। সহরে বাজার, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি আছে। আবু রোড়ে এক-ঘর মাত্র বাঙ্গালী থাকেন। তিনি এখানকার টেলিগ্রাফ-মাষ্টার। তাঁহার নাম শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রায় বিশ বৎসর এখানে এই কাজ করিতেছেন। তাঁহার পুত্রও এখানে গুড্‌স্ অফিসে কাজ করেন। আবু রোড হইতে আবু পাহাড় মাত্র ১৬ মাইল ; নিয়মিত বাস-সার্ভিস আছে। বাস সকালে ও সন্ধ্যায় যায় এবং আসে। বাসে আবু পাহাড়ে উঠিতে বা নামিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। বাসে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনটি শ্রেণী আছে—শ্রেণী হিসাবে ভাড়ার তারতম্য। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গেলাম—ভাড়া ১৸৴০ আনা লাগিল। ইহার মধ্যে আবু মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স আট আনা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাবুর নিকট আমার কিছু জিনিষপত্র রাখিয়া পাহাড়ে উঠিলাম।

মোটর-বাসে আবু পাহাড়ে উঠিবার সময় মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মন আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাজস্থানের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-লেখক কর্ণেল জেমস্ টডের কথা মনে হইল। তিনি আবু পাহাড়ে উঠিবার প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন,—"It was nearly noon when I cleared the pass of Sitla-mata and as the bluff-head of mount Abu opened upon me, my heart beat with joy as, with the sage of Syracuse, I exclaimed EUREKA." আবু পাহাড়ে একটু উঠিয়াই শীতলা মাতার মন্দির। বাংলা দেশের ন্যায় রাজস্থানেও শীতলাদেবীর পূজা হয়। আজমীরে শীতলাদেবীর বড় মেলা বসে। আমরা সন্ধ্যায় আবু পাহাড়ে পৌছিলাম এবং শ্রীভৈরবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের অতিথি হইলাম। ভৈরবী বাবুই আবু পাহাড়ে এখন একমাত্র বাঙ্গালী। তিনি স্থানীয় ওয়াল্টার এ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলের হেড মাষ্টার। তাঁহারই প্রাণপাত পরিশ্রমে স্কুলটি বর্দ্ধিত হইয়া এই বৎসর হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ভৈরবী বাবুর পিতা ৺রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুতানায় গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরী করিতেন। ভৈরবী বাবুরা দুই-তিন পুরুষ প্রবাসে আছেন ; তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল যশোহর জেলায়। আবুতে আমাদের বাসা ছিল নক্কী তালাও-এর কাছে। নক্কী নখ্‌কী শব্দের অপভ্রংশ। নখকী=নখের দ্বারা তৈরী। প্রবাদ যে, এই তালাওটি দেবতারা নখে খুঁটিয়া তৈয়ারী করেন। তালাওটি আবু সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে অনেকখানি।

নক্কী তালাওর চারি দিকে ভ্রমণোপযোগী একটি রাস্তা আছে। তালাওটি পূর্ব্ব দিকে অগভীর কিন্তু অন্যান্য দিকে বেশ গভীর। সহরের অধিকাংশ লোক এখানে নিত্য স্নান করেন। স্নানের জন্য বাঁধান ঘাট আছে। বন্দরমিয়ার তালাও এবং ট্রেভর তাল নামক আর দু'টি বড় জলাশয় আবুতে আছে। ট্রেভর তালটি দিলওয়ারা গ্রামে। রাজপুতানাস্থ দেশীয় রাজ্যগুলির তদানীন্তন

(গবর্ণর-জেনারেলের) এজেণ্টের সম্মানে এই তালাওটি সিরোহীর মহারাজা কর্ত্তৃক প্রভূত অর্থব্যয়ে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই তিনটি তালাওতে সিংগী, পাখাল ও লিরি প্রভৃতি মাছ আছে। সরকারের অনুমতি লইয়া লোকে মাছ ধরিতে পারে। সাঁতার দেওয়ার পক্ষে তালাওগুলি প্রশস্ত।

মাউণ্ট আবু বা আবু পাহাড়ের প্রকৃত নাম অর্বুদাচল বা অর্বুদগিরি। আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ অংশ। সহরটি ছোট। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার। সহরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে চার হাজার ফুট উঁচু। গুরুশিখর নামক আবুর সর্ব্বোচ্চ শিখরটি ৫৬৫০ ফুট উঁচু। হিমালয় এবং নীলগিরির মধ্যে এত উচ্চ শিখর আর নাই। আবু পাহাড় দেবতা ও ঋষিগণের লীলাক্ষেত্র, সাধুগণের তপোভূমি এবং হিন্দু ও জৈনদের পুণ্যতীর্থ। স্থানীয় জনৈক হিন্দু আমাকে বলিলেন যে, ধ্যানস্থ হইলে এই স্থানে এখনও মুনি-ঋষিগণের উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি এবং বেদগান শোনা যায়! আবু তীর্থের এমন মাহাত্ম্য যে, এই ক্ষেত্রে এক দিন উপবাস করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং এখানে এক বৎসর বাস করিলে না কি ঈশ্বর-দর্শন হয়! প্রবাদ আছে যে, এই স্থানটি পুরাকালে রমণীয় সমতল-ভূমি ও দেবক্ষেত্র ছিল। এই দেব-ভূমির মধ্যে একটি গভীর গহ্বর ছিল। দৈবাৎ এক দিন বশিষ্ঠ মুনির প্রিয় গাভী নন্দিনী এই গহ্বরে পড়িয়া যায়। গাভীর প্রাণরক্ষার্থ মুনি সরস্বতী দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন; তখন আশ্চর্য্য-ভাবে গহ্বরটি জলপূর্ণ হয় এবং জলের উপর পতিতা নন্দিনী ভাসিয়া ওঠে। বশিষ্ঠদেব গাভী ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু গহ্বরটি মানব ও পশুগণের ভীষণ ভয়ের কারণ-স্বরূপ হইল। মুনিজী মহাদেবকে দিয়া হিমাচলেশ্বরকে এই গহ্বরটি পূর্ণ করিয়া দিবার জন্ত মিনতি জানান। হিমাচলেশ্বর বশিষ্ঠদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র নন্দীবর্দ্ধনকে এই গহ্বর পূর্ণ করিতে আদেশ দেন। নন্দীবর্দ্ধন ছিলেন খঞ্জ। সে জন্ত শেষ নাগের পুত্র অর্বুদ তাঁহাকে বহন করিয়া এখানে আনিলেন। উভয়ে গহ্বরমধ্যে পতিত হইলেন, কিন্তু গহ্বর এত গভীর ছিল যে, নন্দী-বর্দ্ধনের নাসিকামাত্র দেখা যাইতেছিল। অর্বুদের গর্জ্জনে পর্ব্বত কম্পিত হইতে লাগিল। মহাদেবকে আবার প্রার্থনা নিবেদন করা হইল। তখন মহাদেবের কৃপায় এই গহ্বরের উপরে একটি বিশাল পর্ব্বত সৃষ্ট হইল। অর্বুদের নামানুসারে তাহার নাম হইল অর্বুদা-চল। আবু শব্দটি অর্বুদের অপভ্রংশ। অর্বুদাচলকে কৈলাস-পুত্রও বলা হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এই কলিযুগে বিন্ধ্যাচল ও আরাবল্লীর মহিমা হিমালয় অপেক্ষাও অধিক। অর্বুদশাস্ত্র নামক অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থে অর্বুদাচলের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

আবু পাহাড় সিরোহী ষ্টেটের অন্তর্গত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্ব্বপ্রথম গোরা সৈন্তদের বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্ত প্রেরণ করা হয়। সিরোহীর তদানীন্তন রাজা শিবসিংহ সৈন্তদের স্বাস্থ্য-নিবাস-নির্ম্মাণের নিমিত্ত কয়েক খণ্ড ভূমি সরকারকে প্রদান করেন। তাঁহার একমাত্র সর্ত্ত ছিল যে, আবুতে গাভীহত্যা হইবে না বা গো-মাংস আনা চলিবে না। ক্রমে আবুর প্রাধান্ত প্রচারিত হইল। রাজ-পুতানাস্থ দেশীয় রাজ্যগুলির বৃটিশ প্রতিনিধির আবাস ও অফিস-রূপে এই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বৃটিশ সরকার আবু পাহাড়ের অধিকাংশ স্থান শিরোহী রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। বৃটিশ-অধিকৃত অংশকে এখন আবু জেলা বলা হয়। আবু জিলার শাসন-ভার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ন্যস্ত; আবু মিউনিসিপ্যালিটীর স্থায়ী চেয়ার-ম্যানও এই জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। আবু পাহাড় হিন্দু ও জৈনদিগের পরমতীর্থ। দিলওয়ারার
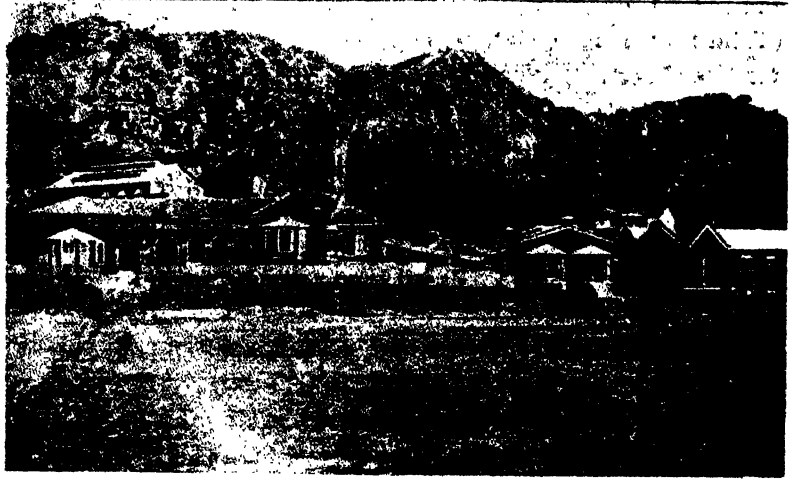
রাজপুতানা ক্লাব

প্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরের জন্ত এই স্থান জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে শত শত পর্য্যটক ও যাত্রী এই স্থান দর্শন করিতে আসেন। কাথিয়াবাড়স্থ গীর্ণার পাহাড় ও সত্তরঞ্জা পাহাড় এবং আবু পাহাড়—এই তিনটি স্থানেই জৈনদিগের বিখ্যাত ও প্রাচীন মন্দিরগুলি বিদ্যমান। রাজপুতানার রাজা এবং রাজকীয় কর্ম্মচারী এবং মাড়োয়ার, গুজরাত ও কাথিয়াবাড় হইতে শত শত ধনী লোক গ্রীষ্মকালে আবু পাহাড়ে আসিয়া বাস করেন। গরমের সময় আবুর জনসংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। আবুর জল, বায়ু ও দৃশ্য অতি চমৎকার। চার হাজার ফুট উচ্চ হইলেও এখানকার শীত অসহ্য নয়। গরমের সময় যে ইহা অতি মনোরম, তাহা বলা বাহুল্য। বৎসরের অধিকাংশ সময় এখানে বাস করা চলে। খুব গরমের সময়ও এখানকার উত্তাপ ৯৫ ডিগ্রীর অধিক হয় না, সাধারণতঃ ৮০ ডিগ্রী থাকে এবং রাত্রে ১৬ ডিগ্রী কম হয়। তবে বর্ষা একটু অধিক এবং বৎসরে প্রায় ৫০ ইঞ্চি জল হয়। সহরে ইলেকট্রিক লাইটের স্থায়ী বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই হইয়াছে এবং শীঘ্রই কলের জলের ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানে কূপের জল পান করা হয়। আবু পাহাড় চির-হরিৎ লতাপল্লবে সমাচ্ছন্ন। জঙ্গলে আম, জাম, করমচা, আমলকী, বহেড়া, রীঠা প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে

জন্মায়। বাব্‌লা ও নিম গাছ এখানে হয় না, কিন্তু বাঁশ ও খেজুর গাছই বেশী। জঙ্গলে বাঘ, ভালুক ও শূকর প্রভৃতি বন্য জন্তু এবং কুক্কুটাদি বন্য পক্ষীর অভাব নাই। ছুটীর দিনে দেশী ও বিদেশী শীকারীদের বন্দুক হস্তে জঙ্গলের পাশে পাশে ঘুরিতে দেখা যায়। গোলাপ, চামেলী, মোগ্রা, কচনার, কেতকী, শেমতী ও জুঁই প্রভৃতি পুষ্প বনে-জঙ্গলে সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকে। সন্ধ্যায় বা সকালে সহরের পথে ও প্রান্তরে বেড়াইবার সময় এই সব ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া থাকে।

প্রথমে আমরা অর্বুদা দেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। অর্বুদা দেবীই অর্বুদাচলের (বা আবুর) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নক্কী তালাও-তীরস্থ রাস্তা হইতে প্রায় চারি শত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এই মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরটি অতি প্রাচীন এবং পর্ব্বতের এক গুহায় অবস্থিত। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ এবং এক রকম শুইয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের চারি দিক্ পুরাতন আম-জামাদি বৃক্ষে বেষ্টিত। ইহা সিরোহী ষ্টেটের অধীনে। বাতি জ্বালিয়া ব্রাহ্মণ পূজারী আমাদিগকে দেবীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইলেন। মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত। মনে হইল, ইহা অতীতে কোন সাধুর তপস্যার স্থান ছিল। সাধুদের জীবনব্যাপী তপস্যার দ্বারাই এইরূপে তীর্থের উদ্ভব হয়। এই স্থান হইতে সহর ও নক্কী তালাও-এর দৃশ্য অপূর্ব্ব। মন্দির-পার্শ্বে 'দুধ-বাউরী' নামক একটি জল-কুণ্ড আছে—জল দুগ্ধবর্ণ। প্রাচীন কালে না কি ইহা দুগ্ধকুণ্ড ছিল এবং দেবতা ও ঋষিগণ ইহার দুগ্ধ পান করিতেন!

এক দিন আমরা বশিষ্ঠাশ্রম ও গোমুখ দেখিতে গেলাম। সহর হইতে মোটর-রোডে প্রায় এক মাইল এবং খানিকটা পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিবার পর সাত শত সিঁড়ি নামিয়া আমরা বশিষ্ঠাশ্রমে ও গোমুখে পৌঁছিলাম। পথে হনুমানজীর মন্দির। পথের উভয় পার্শ্বে ফল ও ফুল গাছে ঘন জঙ্গল। অতি নির্জ্জন স্থান। অদূরে জঙ্গলের মধ্যে বন্য জন্তুর পদশব্দ শুনা যাইতেছিল। গোমুখে স্নান ও জলপান করিতে হয়। সারা বৎসর ধরিয়া এই গোমুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ প্রবলবেগে জলধারা উৎসারিত হইতেছে। লোকে এই জলকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। গোমুখের কাছেই অযোধ্যা-রাজ দশরথের গুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। আশ্রমটি প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে মন্দির। মন্দিরে বশিষ্ঠদেবের সুন্দর মূর্ত্তি এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। বশিষ্ঠদেবের পত্নী অরুন্ধতী এবং প্রিয় গাভী নন্দিনীর মূর্ত্তিও মন্দিরে আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির, পূজারীর বাসস্থান এবং যাত্রীদের বিশ্রাম-ঘর আছে। মন্দিরের চারি দিকে পুষ্পবৃক্ষের সারি। আশ্রমের অগ্নিকুণ্ড দর্শনীয়। প্রবাদ, পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইবার পর ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের ঈশ্বরদত্ত রক্ষকের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। আবুস্থিত সাধু মহাত্মাগণ দেবতাদের আহ্বান করিয়া এই অগ্নিকুণ্ডে এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে দেবতারা তুষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই চারি দেবতা চারি জাতীয় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিকুণ্ডটি সিরোহী দরবার কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বশিষ্ঠাশ্রম অতি প্রাচীন ও পবিত্র স্থান। এখানে কিছুক্ষণ বসিলে মন অন্তর্মুখীন এবং ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হয়।

বশিষ্ঠাশ্রমে গুরু-পূর্ণিমার দিন বৃহৎ মেলা হয়। সে সময় সহর ও দূরস্থান হইতে শত শত নরনারী মন্দির দর্শনে আসেন। উদয়পুরের মহারাণা কুম্ভ ১৩১৪ বিক্রমাব্দে এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, মন্দির-গাত্রে এই মর্ম্মে একটি শিলালিপি আছে। মন্দিরের মোহান্তজী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। চারিটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় অন্যতম এবং ইহার প্রধান মন্দির রাজপুতানার কিষণগড় ষ্টেটের সালেমাবাদ নামক স্থানে অবস্থিত। বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান স্থানও রাজপুতানার —উদয়পুর ষ্টেটের নাথদ্বারা নামক স্থানে। বশিষ্ঠাশ্রম হইতে ৫ মাইল দূরে গৌতমাশ্রম, আশ্রমটি দুর্গম স্থানে বিদ্যমান। পথও নিরাপদ নহে, কারণ, পথে হিংস্র জন্তুর উৎপাত আছে। গৌতমাশ্রমের মন্দিরে বিষ্ণু, গৌতম-পত্নী অহল্যার মূর্ত্তি আছে। স্থানটি অতি নির্জ্জন ও রমণীয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্কুল ব্যতীত আবুতে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে; ইহা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহা ছাড়া খৃষ্টান পাদ্রিগণের দুইটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে—একটি বালকদের জন্য এবং অপরটি বালিকাদের জন্য। যেটি বালকদের জন্য তাহার নাম সেণ্টমেরী হাইস্কুল। ইহা ১৮৮৭ খৃঃ বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে স্বীয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্থাপন করেন। এই স্কুলে জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং মাত্র এক শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারে। স্কুল সহর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। ইহাদের নিজেদের ইলেকট্রিক লাইট প্ল্যাণ্ট আছে। লরেন্স স্কুল নামক আর একটি বিদ্যালয় আবুতে আছে—ইহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, রাজপুতানার তদানীন্তন বৃটিশ এজেণ্ট সার জন লরেন্সের নামে ইহার নাম লরেন্স স্কুল। বৃটিশ সৈন্যদের পুত্রগণের শিক্ষার জন্যই ইহা স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আবুতে রাজপুতানার ষ্টেটগুলির গ্রীষ্ম-নিবাস, বৃটিশ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য-নিবাস, হাসপাতাল, ক্লাব এবং খেলার মাঠ অনেক আছে। জয়বিলাস প্রাসাদ, রাজপুতানা ক্লাব এবং 'সূর্য্যোদয় নিবাস' উল্লেখযোগ্য। জয়বিলাস প্রাসাদটি ১৯২৯ খৃঃ আলোয়ারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রভূত ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এক শত তেত্রিশ একর ভূমির মধ্যে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত। কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়। পালানপুর নবাবের প্রাসাদ, বিকানীর প্রাসাদ ও জয়পুর প্রাসাদও খুব সুন্দর। রাজপুতানা ক্লাবটি রাজস্থানের ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য; এই ক্লাবে হকি, ক্রিকেট, টেনিস, গল্‌ফ্ ও বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলার বন্দোবস্ত আছে। সূর্য্যোদয় নিবাসটি আমেদাবাদের কোন ধনী পার্শী কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রস্তুত। তাহা ছাড়া অনেক ক্লাব, ডাক-বাংলো, বিশ্রাম-ভবন, লজ্ এবং একটি লাইব্রেরী এখানে আছে। বিশ্রাম-ভবনটি সাধারণ যাত্রি-নিবাস। লাইব্রেরীতে হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটি ও ইংরেজী পুস্তক অনেক আছে।

আবু পাহাড়ে প্রসিদ্ধ জৈনমুনি শান্তিবিজয়জী থাকেন। ইনি জৈন-জগতে বিশেষ পূজিত। আবু পাহাড়ের নানা স্থানে তাঁহার ৩।৪টি আশ্রম আছে। তিনি শান্তি ও প্রেমের উপাসক ও প্রচারক। হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান—সকল ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার নিকট যাতায়াত করেন। অচলগড় জৈন মন্দিরে তাঁহার গুহী

শিষ্যগণের উদ্যোগে একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় চালিত হয় এবং আবু পাহাড়ে তাঁহার একটি পশু-হাসপাতাল আছে। অশ্ব, গরু, কুকুর প্রভৃতি সকল প্রকার গৃহপালিত পশু এই হাসপাতালে রক্ষিত ও চিকিৎসিত হয়। গরীব লোকের পশু সকলের চিকিৎসা ফ্রী করা হয় এবং ধনীদের পশুর চিকিৎসার জন্ম সামান্ত খরচ লওয়া হয়। লিম্‌ডীর ভূতপূর্ব্ব মহারাজা এবং রাজপুতানার গবর্ণর-জেনারেলের ভূতপূর্ব্ব এজেন্ট স্যর অগিল্‌ভি এই পশু-হাসপাতাল নির্ম্মাণে মুনিজীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। উভয়ে মুনিজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। মিসেস্ রিভার্স রাইট নামক জনৈক ইংরেজ-মহিলা এই হাসপাতালের সম্পাদিকা। শান্তিবিজয় মুনিজীর একটি ইংরেজ শিষ্যের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া জৈন সাধু হইয়াছেন। জৈন সাধুর মত শ্বেতবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া তিনি খালি পায়ে থাকেন এবং স্বল্পাহার করিয়া কঠোর ভাবে জীবন যাপন করেন।

নক্কী তালাওএর তীরে দুলেশ্বর মন্দির, রঘুনাথজীর মন্দির,
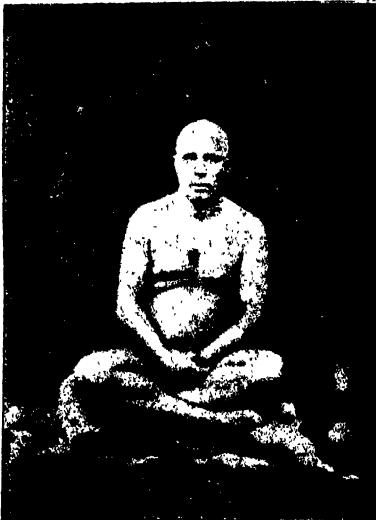
শ্রীদামোদর দাসজী

রামকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির আছে। দুলেশ্বর মন্দিরটি দশনামী সন্ন্যাসিগণের আখড়া। রঘুনাথ মন্দিরটি নক্কী তালাওএর তীরে উচ্চ পর্ব্বতে অবস্থিত। এই মন্দিরের মোহান্ত শ্রীদামোদর দাসজী সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মহা-তপস্বী এবং অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। রঘুনাথ মন্দিরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা তাঁহারই সাধনার ফল। তিনি রামানন্দ সম্প্রদায়ের শ্রীবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী রামশোভা দাসজী বর্ত্তমান মোহান্ত। ব্রহ্মচারীজী মিষ্টভাষী, পণ্ডিত এবং সাধক। তিনি এই আশ্রমকে আধুনিকভাবাপন্ন করিয়া সমাজসেবায় লাগাইতেছেন। আশ্রমে একটি বড় হল আছে; তথায় সভা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বা নাটকাদি অভিনয় পর্য্যন্ত হয়। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর সেবাই এই আশ্রমের আদর্শ। আশ্রমে যাত্রীদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। ব্রহ্মচারীজী আশ্রম হইতে প্রকাশিত "শ্রীরামানন্দ দিগ্বিজয়" নামক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন। পুস্তকটি সংস্কৃত ও হিন্দীতে লেখা। রামানন্দ স্বামীর জীবনী, উপদেশ এবং কার্য্যাবলীর বিবরণ এই পুস্তকে আছে। স্বামী রামানন্দ ব্রহ্মসূত্রের উপর যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম আনন্দভাষ্য। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'গীতাভাষ্য' অপূর্ব্ব এবং অদ্যাবধি অমুদ্রিত। রামানন্দাচার্য্যের বৈষ্ণব মতাব্জ-ভাস্কর' এবং 'রামার্চ্চন পদ্ধতি'ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ। চতুর্দ্দশ শতকে রামানন্দজী যুক্তপ্রদেশে আবির্ভূত হন এবং কবীর, তুলসীদাস এবং রামদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের গুরু ছিলেন। আবু পাহাড়ের গুরু-শিখরে তাঁহার পদচিহ্ন আছে। কথিত আছে, রঘুনাথ মন্দির-স্থিত রঘুনাথজীর মূর্ত্তিটি তাঁহার দ্বারাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এখানে

দিলওয়ারা বিমল শাহের জৈন-মন্দির

স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়া শ্বেতপ্রস্তরের ৺রঘুনাথ-জীর জন্ম চমৎকার একটি মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

রঘুনাথজীর মন্দিরের অধীনে রামকুণ্ড নামক একটি মন্দির এবং 'রাম-ঝরোকা', চম্পা-গুফা, হাতী-গুফা প্রভৃতি কয়েকটি গুম্ফা আছে। চম্পা গুহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অপানন্দ পূর্ব্বে থাকিতেন এবং 'রাম-ঝরোকা'তে স্বামী কৈবল্যানন্দ নামক এক জন বাঙ্গালী সাধু বহু বৎসর ছিলেন। কৈবল্যানন্দজী উচ্চ-শিক্ষিত এবং আলোয়ার মহারাজের সঙ্গে একবার পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে গমন করেছিলেন।

আমরা এক দিন দিলওয়ারা জৈন মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহা সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। দিলওয়ারা = দেবল ওয়াড়া = দেবালয় উপাশ্রম। জৈন সাধুগণ যেখানে বাস করেন এবং উপদেশ দেন তাহাকে 'উপাশ্রা' বলে। এইখানে পাঁচটি জৈন মন্দির আছে—তন্মধ্যে দুইটি মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের জন্ম আবু ভারত-বিখ্যাত হইয়াছে। চিত্রে বিমল শাহ

দিলওয়ারা জৈন-মন্দির

পাথরের। উঠানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অম্বা দেবীর মন্দির। অম্বা দেবীর মূর্ত্তি বহু রত্ন-খচিত বস্ত্রে এত আবৃত যে, দর্শক মূর্ত্তির আকার নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। অম্বা দেবীর মন্দির জৈন মন্দির অপেক্ষা অনেক প্রাচীন এবং অনেকের মতে অন্ততঃ পঁচিশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন।

প্রবাদ আছে যে, স্বপ্নে অম্বা দেবীর আদেশ-গ্রহণান্তর বিমল শাহ এই মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হন। জৈনগণ দেবীর উপাসক; জৈনধর্ম্মে দেবীপূজা ও শক্তিবাদ বেশ উন্নত হইয়াছিল। উঠানের মধ্যে আদি-নাথের মন্দির—মূর্ত্তিটি তাম্র-নির্ম্মিত, চক্ষু হীরকের এবং গলায় রত্নহার। প্রধান মন্দিরের সম্মুখে বিশাল মণ্ডপ। মণ্ডপের গম্বুজের অন্তর্দৃশ্য চমৎকার। গম্বুজের কারুকার্য্য দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই গম্বুজের ভিতরে ষোলটি জৈনদেবীর মূর্ত্তি আছে কেন্দ্রের চারি দিকে। দেবীগণ

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জৈন মন্দির দ্রষ্টব্য। সব মন্দিরগুলিই উত্তম মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। বিমল শাহ রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৮।১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৩১ বিক্রমাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আবুর প্রথম রাজা জৈন মন্দিরের জন্ম স্থান বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হন। বিমল শাহ স্থানটিতে রৌপ্য মুদ্রা বিছাইয়া এবং জমির মূল্য স্বরূপ এই সকল মুদ্রা দিয়া ভূমি ক্রয় করেন। পশ্চিম ভারতে তখন জৈন ধর্ম্ম (বিশেষতঃ গুজরাত, রাজপুতানা ও কাথিয়াবাড়ে) প্রভাবশালী ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিল। জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু আচার্য্য বলেন, "হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন বিশেৎ জৈন-মন্দিরম্।" দিলওয়ারা জৈন মন্দিরগুলির মার্ব্বল পাথরের উপর এমন সূক্ষ্ম এবং সুন্দর কারুকার্য্য আছে যে, তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অতুলনীয়। মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভে, ছাদের অন্তর্দেশে ও দরজায় হিন্দু শিল্পীরা যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কর্ণেল জেমস্ টড্ তাঁহার গ্রন্থে (১) লিখিয়াছেন—আবু পাহাড়ে অবস্থিত বিমল শাহের জৈন মন্দির "is the most superb of all the temples of India and there is not an edifice besides the Tajmahal (of Agra) that can approach it." বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে (২) বলেছেন—"I knew no spot in India so exquisitely beautiful as Abu (Jaina Temples)." Rajputana Gazetteer গ্রন্থে আছে যে, বিমল শাহের মন্দিরটির উঠান ১৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ৯০ ফুট প্রস্থ। উঠানের চারি পার্শ্বে ৫২টি ছোট ছোট মন্দির এবং প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে এক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি। এই সকল মন্দির, মূর্ত্তি এবং মেঝে সবই মার্ব্বল

দিলওয়ারা জৈন-মন্দির—অন্তর্দৃশ্য

চতুর্ভুজা ও আয়ুধধারিণী। অম্বা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে ভৈরবের মূর্ত্তি, মূর্ত্তির হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক, মস্তক হইতে রক্তবিন্দু পড়িতেছে এবং এই রক্তবিন্দু পান করিবার জন্ম একটি কুকুর ঊর্দ্ধমুখ ও উদ্গ্রীব। বহির্দেশে মন্দিরগুলি সাধারণ এবং ইহাদের

(১) Annals and Antiquities of Rajasthan by Col. Tod.

(২) History of Indian and Eastern Architecture by Fergusson.

ভিতরে যে এত শিল্পসম্ভার আছে, বাহির হইতে তাহা মনে হয় না। উঠানের অগ্রে হাতীখানা। হাতীখানায় ১০টি হাতীর মার্ব্বল-মূর্ত্তি এবং বিমল শাহের মূর্ত্তি। মার্ব্বল প্রস্তরের এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য জগতে অদ্বিতীয়।

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ মন্দিরটির নাম লুনবসহি। ইহা বস্তুপাল এবং তেজপাল নামক দুই ভ্রাতা কর্ত্তৃক ১২৩১ বিক্রমাব্দে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। বিমল শাহ মন্দিরের মতই ইহা বিশাল, কারুকার্য্য-বিশিষ্ট এবং সুন্দর। এই মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তিটি দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের। গুম্বজের অন্তর্দেশে জৈন পুরাণের আখ্যায়িকা ক্ষোদিত। কর্ণেল টডের মতে এই মন্দিরের প্ল্যান বিমলশাহের মন্দিরের অনুরূপ; তবে এই মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য অধিক পরিমাণে প্রকাশিত। ইহার মণ্ডপটিও উচ্চতর এবং অধিকতর কারুকার্য্য-যুক্ত। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমরা যেন কোন স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি এবং বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত আশ্চর্য্য প্রাসাদসমূহ অবলোকন করিতেছি। ফার্গুসন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রতি ক্ষুদ্র কণার উপর অসীম পরিশ্রম এবং অসাধারণ শিল্পদক্ষতা ঢালিয়া হিন্দুগণ পূর্ব্বযুগে তাঁহাদের মন্দিরকে দেববাসযোগ্য করিবার সাধনা করিতেন। এই মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে দুই ভ্রাতার দুই পত্নী স্বীয় অর্থব্যয়ে 'দুরাণী জেঠানী কা আলিয়া' নামক দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি মন্দিরের অন্যতম চৌমুখজীর মন্দির। ব্রহ্মার ন্যায় এই মূর্ত্তির চারি মুখ—মন্দিরের চারি পার্শ্বের দরজা হইতে মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। যে শিল্পী ও মিস্ত্রিগণ উপরোক্ত প্রধান মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অবসর সময়ে অল্প পারিশ্রমিক না লইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অপর দু'টি মন্দির শান্তিনাথ ও বাচ্চা শাহের। দিগম্বর জৈনদের একটি মন্দিরও এখানে আছে। জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই দলে বিভক্ত। শ্বেতাম্বর জৈন সাধুগণ শ্বেত অম্বর (বস্ত্র) পরিধান করেন এবং দিগম্বর জৈন-সাধুগণ দিক্ বস্ত্র পরিধান করেন অর্থাৎ উলঙ্গ থাকেন। দিলওয়ারার দক্ষিণে কয়েকটি পুরাতন জীর্ণ হিন্দু মন্দির আছে। কয়েকটি মন্দিরে মূর্ত্তি নাই। একটি মন্দিরে 'বালাম রম্য' ও গণেশের মূর্ত্তি। এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটি মন্দিরে এক দেবীমূর্ত্তি এবং দেবীর দিকে তাকাইয়া এক ঋষিমূর্ত্তি।

রাজপুতানা গেজেটিয়ারে দু'টি মূর্ত্তির সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকাটি বিবৃত আছে। একদা বাল্মীকি ঋষি এই স্থানে বাস করিবার সময় একটি বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বালিকার মাতা প্রথমে অত্যন্ত অসম্মত হইয়া অবশেষে এই সর্ত্তে বালিকাকে ঋষির সহিত বিবাহ দিতে মত দেন যে, সন্ধ্যা হইতে সকালের মধ্যে ঋষি আবু পাহাড় হইতে সমতল দেশ পর্য্যন্ত একটি ভাল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ঋষি রাজী হইয়া পথ-নির্ম্মাণে লাগিয়া যান এবং গভীর রাত্রে যখন নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া আসিল, তখন বালিকার মাতা ঋষিকে বাধা দিবার এবং ধাঁধাঁ লাগাইবার জন্য মুরগীর ডাক ডাকিলেন। প্রাতঃকাল সমাগত মনে করিয়া ঋষি বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন বুঝিলেন, ইহা মাতার চাতুরী মাত্র এবং রাত্রি প্রভাত হইতে অনেক দেরী, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া মাতা ও কন্যাকে অভিশাপ দিয়া প্রস্তরে পরিণত করেন এবং মাতার প্রস্তর-মূর্ত্তিকে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করেন। অবশিষ্ট
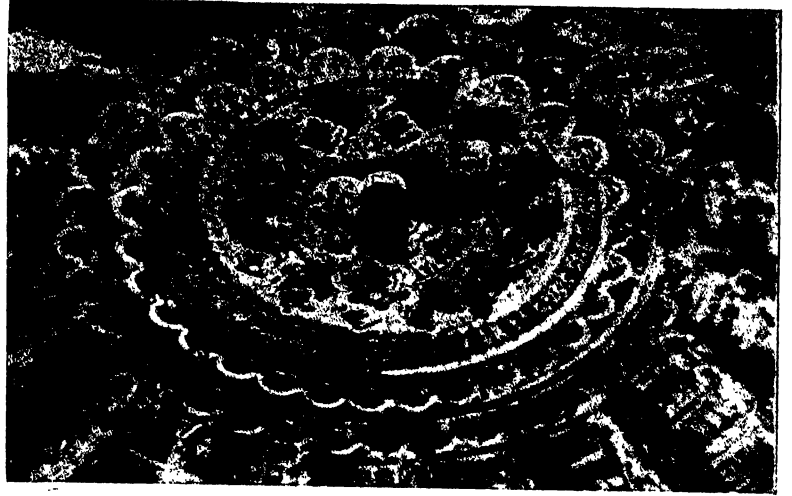
দিলওয়ারা জৈন মন্দির—গম্বুজের অন্তর্দৃশ্য

অচলগড় জৈন মন্দির

বালিকা-মূর্ত্তিটিই অদ্যাপি মন্দিরে রক্ষিত ; মূর্ত্তিটির নাম কন্যা-কুমারী। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তেও কন্যাকুমারীর মূর্ত্তি ও মন্দির বিদ্যমান।

আর এক দিন আমরা অচলগড়ে গিয়াছিলাম। অচলগড় আবু সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও দুইটি বিখ্যাত জৈন মন্দির আছে। এই মন্দিরে বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ জৈনমুনি শান্তিবিজয়জী অবস্থান করেন। মন্দিরটি উচ্চ পর্ব্বতশীর্ষে। অনেক সিঁড়ি চড়াই করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। এই মন্দিরটি পূর্ব্বে একটি দুর্গ ছিল। দুর্গটি প্রমর রাজা কর্ত্তৃক নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই দুর্গ-মন্দিরে রাণা কুম্ভ এবং তৎপুত্র উদা'র মূর্ত্তি আছে। দ্বিতল মন্দিরে চতুর্ম্মুখ আদিনাথের মূর্ত্তি। মন্দিরের চারি দিক হইতে এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়, দুইটি জৈন মন্দিরে মোট ১৫টি মূর্ত্তি এবং এই সকল মূর্ত্তিতে প্রায় চৌদ্দ শত চুয়াল্লিশ (১৪৪৪) মণ সোনা আছে. 'এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে চতুর্দ্দিকের মনোহর দৃশ্য দেখা যায়। অদূরে 'শ্রাবণ-ভাদ্র' নামক জলকুণ্ড। ইহাতে বারো মাস জল থাকে। অদূরে পর্ব্বত-শিখরে আর একটি দুর্গ—ইহা মেবারের মহারাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক ১৪৫২ খৃঃ নির্ম্মিত ; দুর্গের নিম্নদেশে দ্বিতল গুহা। এই গুহায় বিখ্যাত সন্ন্যাসী রাজা হরিশ্চন্দ্র তপস্যা করিতেন। শ্রাবণ-ভাদ্র কুণ্ডের নিকটে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির, ত্রিশূল হাতে রাণা লক্ষ, ভর্ত্তৃহরি গুহা, রেবতী কুণ্ড, ভর্গ আশ্রম, গোমতীকুণ্ড, শিরোহীর রাজা মানের সমাধি, শান্তিনাথের জৈন মন্দির প্রভৃতি অবস্থিত।

এই পর্ব্বতের পাদদেশে অচলেশ্বর শিবমন্দির এবং বশিষ্ঠ ঋষির যজ্ঞকুণ্ড। অচলেশ্বর আবু পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং তাঁহার মন্দিরও অতি প্রাচীন। এখানে মহাদেবের পদচিহ্নের নিম্নে পাতালস্পর্শী একটি গর্ত্ত। কারণ, এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি বা লিঙ্গ নাই—শিবের পদাঙ্গুষ্ঠ এখানে পূজিত হয়। গর্ত্তে কাহাকেও হাত দিতে দেওয়া হয় না। মন্দিরে অচলেশ্বরের পত্নী মেরা দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে পিত্তল-নির্ম্মিত শিব-বাহন একটি বৃহৎ বৃষভ। বৃষভ-গাত্রে আঁচড় দেখা যায়। প্রবাদ যে, আমেদাবাদের রাজা মহম্মদ বেগ্রা ধনসম্পদের লোভে এই বৃষভকে ভগ্ন করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। রাজা সসৈন্যে আবু ত্যাগ করিতে না করিতেই এক ঝাঁক ভ্রমর তাহাদিগকে আক্রমণ ও দংশন করে; তখন তাহারা প্রাণভয়ে অস্ত্রাদি এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ছাড়িয়া পলায়ন করে। বৃষভ-গাত্রে ১৪০৭ বিক্রমাব্দের এক শিলালিপি আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে বিষ্ণু আদি কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির। অচলেশ্বর মন্দিরের নিকটে যজ্ঞকুণ্ড বা মন্দাকিনী-কুণ্ড। কুণ্ডটি দীর্ঘে ১০০ ফুট এবং প্রস্থে ২৪০ ফুট। কুণ্ডটি প্রচলিত প্রবাদানুসারে ঘৃতপূর্ণ ছিল। তিনটি রাক্ষস মহিষ-বেশে রাত্রে এখানে আসিয়া ঘৃত পান করিত। প্রমর রাজা আদিপাল এক শরাঘাতে তিনটি রাক্ষসকে বিনাশ করেন। যজ্ঞকুণ্ডে আদিপাল এবং তিনটি মহিষের মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান।

এখান হইতে আমরা আবু পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—গুরু শিখর দেখিতে যাই। অচলগড় হইতে গুরু শিখর তিন-চার মাইল দূরে। পথ দুর্গম। গুরু শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬০৫ ফুট উচ্চ। গুরু শিখরে ক্লান্ত শরীরে উঠিয়া আমরা বিশ্রাম ও আহার করিলাম। গুরু দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন এখানে পূজিত হয়। কাথিয়াবাড়স্থিত গীর্ণার পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরেও গুরু দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন পূজিত হয়। গীর্ণার শৃঙ্গে এবং আবু পাহাড়ের গুরু শিখরে দত্তাত্রেয় ঋষি তপস্যা করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য্য রামানন্দের পদচিহ্নও গুরু শিখরে আছে। ১৪১১ বিক্রমাব্দের লিপিযুক্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা এই মন্দিরে ঝুলানো আছে। গুরু শিখরে কয়েকটি সুন্দর গুহা, মন্দির ও যাত্রিনিবাস আছে। এইগুলি সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সিরোহী দরবারের নির্দ্দেশে পরিচালিত। স্থানটি অতি মনোরম। এই স্থানের নিভৃত গুহাতে বসিলে মন হইতে স্বতঃই দুনিয়ার কোলাহল ও স্মৃতি মুছিয়া যায়। এখানকার আকাশে-বাতাসে
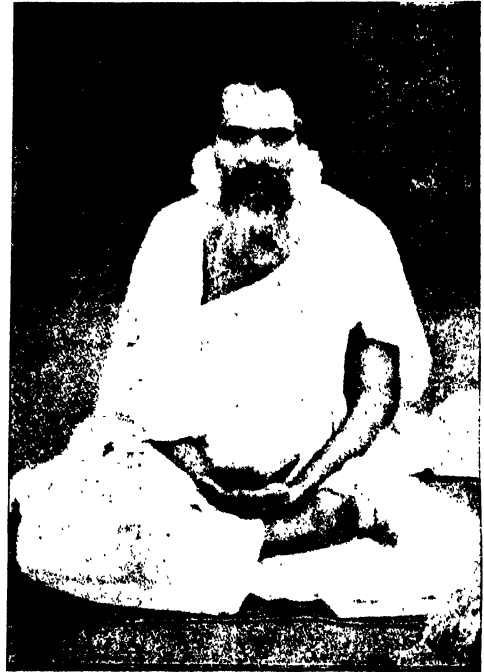
আবু পাহাড়ের প্রসিদ্ধ জৈনমুনি শান্তিবিজয়জী

যেন অশরীরী বাণী কর্ম্ম-মত্ত মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—'আবৃতচক্ষুঃ হইয়া হৃদয়-গুহায় শান্তি-সুধা পান কর'। এখানকার গোশালা, মন্দির ও বাসস্থান সবই পর্ব্বত-গুহায় অবস্থিত। এক সময় যে উহা তপস্বী সাধুগণের আস্তানা ছিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গুরু শিখর হইতে শ্রান্ত-কলেবরে আমরা আবুতে ফিরিয়া আসিলাম এবং ২।১ দিন বিশ্রামান্তে আবু রোডে চলিলাম। আবু পাহাড় হইতে আবু রোডের মধ্যে মোটর-রোডে বারো মাইল অতিক্রম করিলে হৃষীকেশ-মন্দির। এই স্থানটি আবু রোড ষ্টেশনের চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে। অমরাবতীর রাজা অম্বরীশ এই মন্দির স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব সাধুগণ ইহার পরিচালক। স্থানটি অতি চমৎকার ও নির্জ্জন। ষ্টেশনের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একদা সমৃদ্ধ এবং অধুনালুপ্ত চন্দ্রাবতী সহর। এই সহরটি বানানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং আবু প্রমর রাজগণের রাজধানী ছিল। প্রবাদ যে, এই সহরে নয় শত হিন্দু মন্দির ছিল। মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ বহু মাইল বিস্তৃত। সহরটির পরিধি ছিল আঠার মাইল। মুসলমানগণ এই মন্দির সকল ধ্বংস করিয়া অন্য স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহু ভগ্ন

দেবমূর্ত্তি এখনও এখানে দেখা যায়। ষ্টেশন হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে অম্বাজী মাতার মন্দির। এই মন্দিরে ষ্টেশন হইতে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। এই স্থানটি একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। গুজরাত, কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানা হইতে শত শত হিন্দু নরনারী এই তীর্থ-দর্শনে আসেন। এই অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে যে, এই দেবীদর্শন না করিয়া চারি ধাম দর্শন নিষ্ফল। মন্দিরের চারি দিকে পর্ব্বত। একটি পর্ব্বতের নাম গাবুর পাহাড়। এই পাহাড়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থায় 'কেশ-কর্ত্তন' অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রুক্মিণী মাতা না কি অম্বা দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

সহজিয়া সাধন

সহজ বা সহজিয়া সাধন নিবিড় রহস্যজালে সমাবৃত। সাধারণের এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, এই সাধনায় স্ত্রীলোক লইয়া বহু বীভৎস আচরণের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক সহজিয়া সাধনে স্ত্রীলোকের কোন প্রয়োজন নাই; এই সাধনা সাধকের দেহমধ্যস্থ সাধনা। এই সাধন-প্রক্রিয়ার সহিত তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনী-সাধন প্রক্রিয়ার মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। তন্ত্রের প্রায় সর্ব্ববিধ সাধন-প্রক্রিয়ার সহিতই সহজিয়াগণের সাধনার যে সম্পূর্ণ মিল আছে—ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে। অধিকন্তু প্রসঙ্গক্রমে ইহাও আলোচনা করা হইবে যে, বৌদ্ধ বজ্রযান বা সহজযানের সাধনা, কবীরের সাধনা, বাউলের সাধনা, হিন্দু যোগতন্ত্রের সাধনা, কপিলাদি সিদ্ধগণের সাধনা—মূলতঃ সহজিয়াগণের সাধনার সহিত অভিন্ন। তত্ত্বদর্শন বিষয়ে তো কোনই পার্থক্য নাই, সাধন-প্রণালীতেও কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য আছে শুধু সাধন-প্রণালীর বর্ণনাভঙ্গীতে, রূপক শব্দ ও সংজ্ঞা ব্যবহারের রীতিতে এবং সর্ব্বোপরি সাধনার বিষয় গোপন রাখিবার উৎকট আগ্রহে (১)। শাক্ত ও শৈব তন্ত্রাদিতে বর্ণিত সাধন-প্রণালী অনেকটা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যায়, কিন্তু সহজিয়াগণের রাগাত্মিক পদাবলীতে ঐ সাধনাই রস-শাস্ত্রোক্ত শব্দ ও সংজ্ঞার আবরণে এরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সাধক ভিন্ন এমন সাধ্য কাহার আছে, সেই রাগাত্মিক পদগুলির প্রত্যেকটির বিশদ ভাবে অর্থ করিতে পারেন? সাধারণ লোকে এই আলো-আঁধারি ভাষায় লেখা পদগুলির কতক বুঝিতে পারে, কতক পারে না। আর এক ব্যাপার এই যে, এই ধরণের অধিকাংশ পদই দ্ব্যর্থমূলক। বাহ্যিক অর্থ করা যায়, আবার আধ্যাত্মিক অর্থও করা যায়। সাধন-প্রণালী গোপন রাখাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু পদগুলিকে এইরূপ হেঁয়ালি ভাষায় রচনা করাতে সমাজের পক্ষে ভাল হইয়াছে, না মন্দ হইয়াছে—ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

কারণ, উক্ত রাগাত্মক পদগুলির কদর্থ করিয়া ধর্ম্মসমাজে প্রবল ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতগণ তো সহজিয়া বা পরকীয়া সাধনার নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

১। বুঝিতে বিষম নহে সহজ কথা বটে।
স্পষ্ট করি লিখি যদি তবে দোষ ঘটে। (অমৃতরসাবলী)
"সহজের ধর্ম্ম নহে প্রচার করিতে।" (ভৃঙ্গরত্নাবলী)

'সহজ' শব্দের অর্থ লইয়াই সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা আরম্ভ করা যাক। হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে—

"রাজযোগঃ সমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী।
অমরত্বং লয়স্তত্ত্বং শূন্যাশূন্যং পরম্ পদং।
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্।
জীবন্মুক্তিশ্চ সহজা তূর্য্যা চেত্যেকবাচকাঃ।

রাজযোগ, সমাধি, উন্মনী, মনোন্মনী, অমরত্ব, লয়, তত্ত্ব, শূন্যাশূন্য, পরমপদ, অমনস্ক, নিরালম্ব, নিরঞ্জন, জীবন্মুক্তি, সহজ ও তুরীয়—এই সকল শব্দ একার্থবাচক।

এখানে 'সহজ' শব্দ সমাধি-অর্থে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অন্যান্য স্থলেও সহজ শব্দে সমাধিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

"চিত্তানন্দং তদা জিত্বা সহজানন্দসম্ভব।"
"যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং।"

কপিলগীতায় লিপিবদ্ধ পঞ্চ অবস্থার মধ্যে সহজ অবস্থার কথাও উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যথা—

"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তূর্য্যাবস্থা চ উন্মনী।
সা চৈব সহজাবস্থা পঞ্চাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

স্ব-স্ব-রূপে আত্মার স্থিতির যে অবস্থা, তাহা সহজাবস্থা বা জীবন্মুক্ত অবস্থা। উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থের আরও অনেক স্থলে 'সহজে'র প্রসঙ্গ আছে।

তেজোবিন্দু উপনিষদে আছে—"ইতি বা তস্তবেন্মৌনং সর্ব্বং সহজসংজ্ঞিতং।" প্রাণতোষণী তন্ত্রে আছে—

"স্বভাবং সহজং সত্যং শান্তিঃ শান্তিস্বরূপতঃ।"
(৪৩৮।৪৩৯ পৃঃ)

জৈন সাধক আনন্দঘনের পদে সহজের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"ঘটমন্দির দীপক কিয়ো সহজ সুজ্যোতি সরূপ।" (পদ ৪)

কবীরদাসের পদাবলীতে সহজের বহু প্রসঙ্গ রহিয়াছে। যথা;—

"সহজৈ সহজৈ সব গ এ
সুত বিত কামিনি কাম।
একমেক হৈব মিলি রহ্যা জিহ্
দাসি কবীরা রাম।"
(কবীর গ্রন্থাবলী, পদ ৪০৮)

আর এক স্থলে কবীর দাস বলিতেছেন ;—

"কধ্যা ন উপজৈ উপজাং নাহি জানৈ
ভাব অভাব বিহুনঁা।
উদয় অস্ত জহাঁ মতি বুধি নাহী
সহজি রাম ল্যেৌ লীনঁা।।"

(কবীর গ্রন্থাবলী, পদ ১৭৬)

উল্লিখিত পদে কবীর দাস সহজতত্ত্বকে ভাবাভাববিবর্জ্জিত, উদয়-অস্তবিহীন নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

ভক্ত দাদূর পদাবলীতেও সহজ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"দাদূ দীপক সাজি লে। সহজই সো মিটি জাই।"
"সহজ রূপ মনকা ভয়া। হোই হোই মিটী তরঙ্গ।"
"দাদূ ডোরী সহজকী। যোঁ আনী ঘর ঘেরি।" ইত্যাদি
"দাদূ বহুত ন বোলিয়ে। সহজই রহই সমাই।"

বাউলদের গানেও সহজ প্রসঙ্গের অভাব নাই। যথা ;—

"মন লও রে গুরুর উপদেশ
জানতে পার সহজে।" (৩৮)
"সহজ মানুষ ছিল হৃদয়-বৃন্দাবনে।
জানি না তায় হারাইলাম কোন ক্ষণে।"

(লালন ফকির)

বাউলেরা গুরুকে বলেন 'সাঁই'। যথা ;—

"সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।" (২৮)

(লালন ফকির)

দাদূর পদাবলীতেও বহু স্থলে 'সাঁই' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। লালন ফকিরের গানে যেমন 'আলেক মানুষ আলেকে রয়।' প্রভৃতি বচন পাওয়া যায়, সেইরূপ দাদূর পদেও অনেক স্থলে এই 'আলেকের' উল্লেখ দেখা যায়।

দাদূর পদাবলীতে অনেক স্থলে কবীরেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দাদূ, কবীর ও বাউলদের সাধনা যে এক এবং অভিন্ন, পরে প্রসঙ্গক্রমে ইহা দেখান হইতেছে। বৌদ্ধ সহজযানীদের সহজ এবং পূর্ব্বোক্ত সহজ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। বৌদ্ধ হেবজ্র গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্ব্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্ব্বাণং বিশুদ্ধাকারচেতসা"

এখানে স্বরূপতত্ত্বকেই সহজ বলা হইয়াছে এবং এই স্বস্বরূপে অবস্থিতিই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধ সহজযানের সিদ্ধেরা বলিয়াছেন—সহজে ভাব অভাব নাই, পাপ-পুণ্য নাই, রাগ-বিরাগ নাই—সহজ স্বভাবতঃই নির্ম্মল। এই সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে স্কন্ধ, ভূত, আয়তন ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়। এই কারণে ভগবান্ বুদ্ধদেবের একটি নাম সহজনেত্র।

বৌদ্ধতান্ত্রিক কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাতেও সহজের উল্লেখ আছে। যথা,—

কাহ্নু বিলস অ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন বইসি নিবিতা। ধ্রু।

"আসবমত্ত কৃষ্ণ, সহজরূপ নলিনীবনে প্রবেশ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।"

চণ্ডরোষণ নামক বৌদ্ধতন্ত্রে সহজানন্দের কথা আছে। ইহাতে গ্রাহ্যগ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। যথা,—"এতেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণাভিমানরহিতং পরমং সুখমুৎপত্ততে।" ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি—এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরমানন্দ কহে। শূন্যতার নামই বিরমানন্দ। যথা,—"শূন্যতা বিরমানন্দঃ"—ইহাই অনাদিনিধন সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ। যথা,—"তত্র হেতুরনাদিনিধনসহজৈকস্বভাবং জ্ঞানং মহাসুখং (চণ্ডরোষণ তন্ত্র, ১ম পটল)

রাগানুগভজনদর্পণ নামক এক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে,—

"সহজ ভজন এই শব্দের অর্থ এই যে, জীব অণুচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার সহজ।"

রসকদম্বকলিকা নামক এক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে,—

"সহজ বস্তু হয় সেই ব্রজেন্দ্রকুমার।"

এইবার বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম করে আচরণ
এ বড় বিষম দায়।
সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায়।"

চণ্ডীদাসের পরে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট হইতে এই সহজ সাধনা পাইয়াছিলেন; বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নরোত্তম দাসের বস্তুতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"সহজ নহিলে কৃষ্ণ না পায় কোন জন।
ব্রজবাসি-জন করে সহজ ভজন।"

অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীতেও এই সহজ সাধনার বহুবিধ উল্লেখ দেখা যায়। মুকুন্দরাম দাস তাঁহার 'ভৃঙ্গরত্নাবলী' গ্রন্থে বলিতেছেন ;—

কহিব সহজ ধর্ম্ম সহজ রতির মর্ম্ম
সহজ বস্তু কাহারে কহিব।
* * * *
সহজ বস্তু জগতের সার" ইত্যাদি

মুকুন্দরাম দাসের 'আত্মসারস্বতকারিকা'য় আছে ,—

"এবে কহি শুন কিছু সহজ লক্ষণ।
সহজে বিলসে কৃষ্ণ সহজেই স্থিতি।
সহজ পীরিতি রসে করে গতাগতি।
পুরুষ প্রকৃতি-রূপে কৃষ্ণের বিলাস। (১)
বিনা গুরু-উপদেশে না হয় বিশ্বাস।"

১। পুরুষ-প্রকৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস, তাহাই সহজ পীরিতি। কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার সহিত রাধারূপিণী জীবাত্মা বা জীবশক্তির (কুণ্ডলিনীর) নিত্য বৃন্দাবন বা সহস্রার পদ্মে যে সম্মিলন ও বিলাস, ইহাই সহজ পীরিতি। রাধারূপিণী জীবশক্তি কামসরোবর বা মূলাধার হইতে উত্থিতা হইয়া নিত্য বৃন্দাবন বা সহস্রারে গতাগতি করেন। ইহাই সহজ পীরিতি রস

কৃষ্ণদাস তাঁহার অদ্বৈতকড়চায় লিখিয়াছেন ;—

"পুরী কহে শুন তার উপাসনা তত্ত্ব।
স্বতঃসিদ্ধি সহজের হয় মহাসত্ত্ব॥

এক্ষণে এই সহজ সাধন কি? ইহার পরকীয়া সাধন প্রণালীই বা কিরূপ? মুকুন্দরাম দাস তাঁহার অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থে লিখিতেছেন ;—

জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে।
শতদল পদ্ম পাবে খুঁজিলে তাহাতে॥
সহস্র দলের পরমাত্মা অধিকারী।
অমৃত সরোবর নাম রসের ভাণ্ডারী॥
সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা আহা পরিমল॥
মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্মা হয়।
পুনঃ পুনঃ এই কথা গ্রন্থকার কয়॥
* * *
অকৈতব পদ্ম সেই মন রতি হয়।
কামসরোবরে পদ্ম রতির উদয়॥ (১)
সেই রতি প্রকৃতি পদার্থ সরোবর।
পদ্মের উপরে ভৃঙ্গ রতির উপর॥
ভৃঙ্গ রতি কোমল পুং-রতির সার।
সহজ বস্তু প্রকাশ করিবে অঙ্গীকার॥"

উপরোক্ত পদে মুকুন্দরাম দাস বলিতেছেন ;—

"জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে।"

তিনি স্বীয় দেহমধ্যেই জগত্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে বলিতেছেন। অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—

"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পীরিতি বলিব তারে।"

(আত্মসারস্বতকারিকা)

মুকুন্দরাম দাস আরও বলিতেছেন—

"দুর্গম সাধন পথ দূরাদূর হয়।
দূরে হইতে নিকটে নিকটে দূর হয়॥
তবে যদি আপনার জানে দেহতত্ত্ব।
দেহকে না জানিয়া হয় কার অনুগত।"

এই পদটিতে মুকুন্দরাম দাস দেহতত্ত্ব সাধনারই নির্দ্দেশ দিতেছেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না।

মুকুন্দরামের পদ্মকড়চা নামক গ্রন্থে আছে—

"মস্তক উপরে আছে অক্ষয় সরোবর।
সহস্রদল পদ্ম হয় তাহার উপর।"
"বক্ষস্থলমধ্যে আছে সিদ্ধি সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম আছে তাহার উপর।"
"নাভিতলে আছে পৃথিবী সরোবর। (২)
তিন পদ্ম আছে তার জলের ভিতর।"
"তিন পদ্ম তিন বর্ণ কহিল নির্ণয়। (১)
শুক্ল রক্ত নীল এই তিন স্থিতি।
কহয়ে মুকুন্দ দাস সহজ পীরিতি।"

এই সমস্ত দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মুকুন্দ দাসের "সহজ পীরিতি" সাধন সম্পূর্ণ দেহতত্ত্বসাধনা। ইহা স্ত্রীলোক লইয়া কোন পীরিতি সাধনা নহে।

এখন, এই আলোকে বৈষ্ণব পদাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে কোথায় কিরূপে এই দেহতত্ত্বসাধন বা পদ্মতত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে।

আনন্দভৈরব নামক এক সহজিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে—

"হর কহে বাহ্য গুণ কহিলে আমারে।
অন্তরের গুণ কহ মন আছে স্থিরে॥
শক্তি কহে চক্ষু মুদে করহ শ্রবণ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু অন্তরের গুণ॥
সহস্রদল হয় মস্তিষ্ক ভিতরে।
অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে॥
উদর ভিতরে আছে মান সরোবরে।
তথা হৈতে ফুল গেল সহস্রদল উপরে॥
উর্দ্ধমুখে অধোমুখে হইয়া নাসার।
সর্ব্বকাল মূলবস্তু আছে তার ভিতর॥
অক্ষয় সরোবরের জল রসাল অধর।
তথা হৈতে যায় বহি মান সরোবর॥
পদ্মের ডাঁটা বেয়ে উর্দ্ধগতি বলে। (২)
সত্তা সহিতে পুন মিশায় সেই জলে॥
মান সরোবরের উপর ক্ষীরোদ সরোবর।
তথা হৈতে উপজিল পদ্ম শতদল॥
মূল বস্তুর স্বরূপ সেই পদ্মে রয়।
তার নাম সরোবর পৃথ্ নাম হয়॥
তথা হৈতে উপজিল অষ্টদল পদ্ম।
তার নাম সরোবর বুঝিবারে ধন্দ॥
অষ্টদল পদ্মে পরাৎপর বস্তু হয়।
ঘোর অন্ধ সরোবরে উক্ত পদ্ম উপজয়॥
এই মত কত আছে কহা নাহি যায়।
শুনিলে হবে অসম্ভব দেখাব তোমায়॥"

অমৃতরসাবলী নামক সহজিয়া গ্রন্থেও এই পদ্মতত্ত্বের বিষয় বর্ণিত দৃষ্ট হয়। যথা,—

"এক সরোবর পৃথিবী ভিতর কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে দুধার বহিয়া যায়॥"

উক্ত গ্রন্থে পদ্ম ও সরোবরতত্ত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কৃষ্ণদাসের অদ্বৈতকড়চায় আছে,—

১। কামসরোবর বা মূলাধার পদ্মে রতি বা প্রাণশক্তির (কুণ্ডলিনীর) উদয় বা উদ্বোধন হয়।

২। পৃথিবী সরোবর—পৃথ্বীচক্র বা মূলাধার চক্র।

১। তিন পদ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের প্রতীক তিন পদ্ম।

২। পদ্মের ডাঁটা অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ী বাহিয়া রতি বা প্রাণশক্তির (কুণ্ডলিনীর) উর্দ্ধগতি হয়।

"দেহের লক্ষণ কহি শুন ভাল মতে।
যেখানে যেমন রূপে আছয়ে কায়াতে॥
কাইকী সাধক সিদ্ধি শক্তিরূপা হয়।
শক্তিদ্বারে এই দেহ নিত্য বস্তু কয়॥
তার পর নিত্য হয় শ্বেত পীত নীল।
এই তিন বস্তু হয় ঘটনা সলিল॥
সেই ত সংসারে স্থিতি মস্তক উপর।
সহস্রদল পদ্ম পঙ্ক নলিনী কৈসর॥
সেই ত সায়রে হয় শ্বেতবর্ণ দ্বীপ।
অষ্ট দল অষ্ট পদ্ম তাহার সমীপ॥
সেই পদ্ম দল হয় বক্ষস্থলে।
পীতবর্ণ হয় পদ্ম সাগরের জলে॥
বুঝিবে সায়র সেই পরম আবিষ্ট।
তিন স্থানে তিন পদ্ম ইথে হয় দৃষ্ট॥
অর্দ্ধ মধ্যে অপূর্ব্ব তিন সায়রে।
তিন খণ্ড মিশ্রিত রতি ফিরে নিরন্তরে॥ (১)
কামের সায়রে নাভিপদ্ম মূর্ত্তিমান। (২)
তাহার আশ্রিত হয় কাম নিত্যস্থান॥

নরোত্তম দাসের পদাবলীতে আছে ;—

সপ্ত পাতাল ভেদি উঠিল এক পদ্ম। (৩)
ব্রজলীলা তথি মধ্যে গোপগোপী সদ্ম॥

পদ্মনির্ণয় নামক এক সহজিয়া গ্রন্থে দেহমধ্যস্থ পদ্মসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে মাত্র কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল। যথা ;—

শ্রীরূপ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
সংক্ষেপে কহিল পঞ্চ পদ্মের নির্য্যাস॥
সবার উপরে এক পদ্ম দুই দল। (৪)
রসে গঠিয়াছে পদ্ম রূপে টলমল॥ (৫)

বৃন্দাবন দাসের 'আগুজিজ্ঞাসা' গ্রন্থেও লিখিত দৃষ্ট হয়।

রসাশ্রয়-বস্তু-নিরূপণ নামক গ্রন্থে বহু স্থলে এই পদ্মতত্ত্বেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাসের আগুতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"স্বরূপ বস্তু যেহো তেহো পরকীয়া। (১) তেহো শুদ্ধ, আদি শুদ্ধ পরমশুদ্ধ অবেদ্য বস্তু। জীবাত্মা (২) আছেন কোথা। গুহ্যদেশে। কয় দল পদ্মে। চার দল পদ্মে। (৩)"

অন্য আর একটি পদে কৃষ্ণদাস বলিতেছেন,—

"রসিক ভকতগণ শুন মিনতি আমার।
রস বস্তু কোথা আছে কোন বর্ণ তার॥
লাল পদ্ম নীল পদ্ম শ্বেত পদ্ম হয়।
কোন পদ্মে থাকে রস কোথা উদয় হয়॥
অপ্রাকৃত রস বস্তু জীবে উদয় হয়।"

কৃষ্ণদাস দেহমধ্যস্থ পদ্মে রসের উল্লেখ করিতেছেন। এই রস অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় দেহতত্ত্বের ব্যাপার ; কোন মেয়েমানুষের সহিত এই রসের কোন সম্পর্ক নাই। পরকীয়া বলিতেও তিনি স্বরূপ বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই পরকীয়ায় মেয়েমানুষের কোন প্রসঙ্গই উত্থিত হইতে পারে না।

চণ্ডীদাসও এই দেহতত্ত্ব বা পদ্মতত্ত্ব সাধনার কথা পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন। যথা,—

"সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥"
"কিবা কারিকরের আজ্ঞা কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরমশিবের স্থল।"
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃৎপদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে॥ (৪)
নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তন্তু পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটী॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥
সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষট্‌চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥

১। এই রতি কোন মেয়েমানুষের রতি নয় ; ইহা দেহতত্ত্বের ব্যাপার।

২। কোন কোন মতে মণিপুর বা নাভিপদ্ম কামের স্থান ; কারণ এখান হইতে কুণ্ডলিনী কামবায়ুসহ সহস্রারে গমন করেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকার ভোজরাজ লিখিয়াছেন ;—"নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্" (সাধনপাদ, ৫০ সূত্র)।

৩। পদতল হইতে মূলাধারের নিম্ন পর্য্যন্ত স্থানমধ্যে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; মূলাধার হইতে উপরে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানমধ্যে সপ্তলোকের অবস্থিতি। উল্লিখিত সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক লইয়া দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনের কল্পনা করা হয়।

৪। আজ্ঞাচক্র।

৫। এই রূপ ও রস অতীন্দ্রিয় ; মেয়েমানুষের সংস্রব ইহাতে নাই।

১। কৃষ্ণদাস স্বরূপ বস্তুকে অর্থাৎ তত্ত্ব বস্তুকে পরকীয়া বলিতেছেন। ইহা স্ত্রীলোক লইয়া পরকীয়া নহে।

২। জীবশক্তি কুণ্ডলিনীকে জীবাত্মা বলা হইয়াছে।

৩। গুহ্যদেশে—মূলাধারে ; তন্ত্রমতেও মূলাধারে চার দল পদ্মের কথা আছে।

৪। চণ্ডীদাসের মতে নাভিমূল বা মণিপুর কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের স্থান। কৃষ্ণদাসের মতে গুহ্যদেশ বা মূলাধার (চার দল পদ্ম) জীবশক্তি কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন স্থান।

দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ইড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যে স্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে।
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার। (১)
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার।
প্রাণ, আপান ব্যান, উদান, সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান।
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাড়ীর ভিতরে সমান করে সমাধান।
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান।
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোমা উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদনাভিপদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়।
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে। (২)
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে।

চণ্ডীদাসের উল্লিখিত পদে আমরা তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র সাধনার উল্লেখ পাইতেছি। অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীতেও ষট্‌পদ্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম বৈষ্ণবশাস্ত্রে ষট্‌গ্রন্থি, ষট্‌মণি, ষট্‌সরোবর, অণ্ড, দেশ, পাড়া প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত রহিয়াছে। ভজনসংহিতা নামক এক বৈষ্ণব গ্রন্থে গ্রন্থিভেদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। যথা ;—

"পুছিলে শিষ্য তুমি গ্রন্থিভেদ কথা।
পরম গোপিনি তত্ত্ব কহিনু সর্ব্বথা।
দেহমধ্যে গ্রন্থিগণ আছয়ে গাথনি।
বীজ সহ জপি নাম বীজ তার জানি।
দক্ষিণে পিঙ্গলা বামে ইঙ্গলা বসয়ে।
মধ্যেতে সুমেরু তথা সুষুম্না কহয়ে।
তাহাকে ভেদিয়া নাম যে জনা জপয়ে।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে তার বিশ্বাস নির্ভয়ে।"

ষট্‌মণি নিরূপণ নামক এক বৈষ্ণব গ্রন্থে ষট্‌মণির উল্লেখে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ প্রভৃতি ছয় পদ্ম বা চক্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থের শেষের দিকে লিখিত আছে ;—

"ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্ময় রস সহস্রদলে বৈসে। (১)
শুক্লবর্ণ আত্মারূপে হৃদয়ে বিলাসে।"

মুকুন্দ দাস চক্রসমূহকে সরোবর আখ্যা দিয়াছেন ; এই সরোবরের বিবরণ অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে চক্রসমূহ অণ্ড নামেও অভিহিত দৃষ্ট হয়। যথা—

সুমেরু শিখর তার মধ্যে বেবহিত।
তাহা তেঞি রাত্রি দিবা হয় নিয়োজিত।
ঐছে কৃষ্ণলীলাগণ ভ্রমে সূর্য্যপ্রায়।
এক অণ্ড ছাড়ি লীলা আর অণ্ডে যায়।"

চক্রসমূহকে দেশ নামেও উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যথা—

"দেশে দেশে উপাসনা দেশে দেশে গতি।"

(লতাসিদ্ধি)

'পাড়া' বলিয়াও চক্রসমূহ অভিহিত দৃষ্ট হয়। যথা—

"সেই ঘরেতে ফুল বাগিচা পাড়ায় পাড়ায় মেয়া।"

আত্মসারস্বতকারিকায় আছে ;—

"পবনের গতি নাহি সূর্য্য নাহি চলে।
অচল আকৃতি তার পদ্ম সহস্র দলে।
চিন্তামণি ভূমি শোভে কল্পবৃক্ষগণ।
তাহার ভিতরে শোভে রত্ন সিংহাসন।
রত্নসিংহাসনে শোভে কনক আসন।
তাহে বসি আছে রস রূপ সনাতন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

১। এই লীলা মানব-মানবীর লীলা নহে। ইহা অতীন্দ্রিয় কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব।

২। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—প্রেম-সরোবরে অষ্টদল পদ্মে রতি বা প্রাণ-শক্তি (কুণ্ডলিনী) স্থির ভাব অবলম্বন করেন। এই রতির সহিত কোন মেয়েমানুষের সম্পর্ক নাই। চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর।"
"অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার।"

এই অষ্টদল চক্রে যে লীলার সঞ্চার হয় অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন হয়, ইহা অতীন্দ্রিয় লীলা ; মানব-মানবীর লীলা নহে। অন্য একটি পদেও আছে ;—

"আসিয়া বসিল বস্তু পদ্মে অষ্টদল।
শব্দ গন্ধ রূপ রস করে ঝলমল।
বিলাস করিতে বস্তু যবে হৈল মন।
রতি সঙ্গে বিলাস করয়ে সর্ব্বক্ষণ।
এক পদ্ম বিকসিত আর পদ্ম কোড়া।
উর্দ্ধমুখী অধোমুখী দুই পদ্ম জোড়া।"

১। সহজিয়া সাধকের রস চিন্ময়। বেদান্তসারে সবিকল্প সমাধিজ আনন্দের অবস্থাকে রসাস্বাদ বলা হইয়াছে। যথা—

"চিত্তবৃত্তে সবিকল্পানন্দাস্বাদনং রসাস্বাদঃ।"

এই রস ও রতি অতীন্দ্রিয় দেহতত্ত্বসাধনার বিষয়। আত্মসারস্বত-কারিকায় আছে—

"সপ্ত অঙ্গে সপ্ত দ্বীপ বুঝিতে বিরল।
দেহমধ্যে আছে আর বৃক্ষাদি সকল।
মধ্যে প্রেম রসরূপগণ চারিপাশে।
পরকীয়া ভাব রতি সতত বিলাসে।"

অমৃতরত্নাবলী নামক গ্রন্থে আছে—

"নব নাড়ী বত্রিশ কোটা আছয়ে শরীরে।
কোনখানে কেবা আছে কে জানিতে পারে।
কহিব তাহার কথা শুন ভক্তগণ।
কাম সরোবরে আছে নাড়ী তিন জন।
ঘাটপদ্মে আটকোটা আছয়ে বেড়িয়া।
মদনমোহন নাড়ী পদ্ম আচ্ছাদিয়া॥
ছাড়িয়া সুন্দর নাড়ী লতাতে বেড়ায়।
শ্বেতপদ্ম মূল হয় রতি উপচয়॥"
"পূর্ব্বদিগে আছে রতি পদ্ম নীলবর্ণ।
সেই পরমাত্মা রতির বিলাস কারণ॥"
সেই পূর্ব্বদিগে হয় রতির মন্দির।
নীল পদ্মে মূলরতি সাধকেতে স্থির॥

বিজ্ঞান-জগৎ

তরল অনল

এ যুদ্ধে একটি নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে—তরল অনল-বর্ষী বন্দুক—লিকুইড্-ফায়ার-গান্। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নিম্ন মালভূমি ও ফ্রান্স-বিজয়ে জার্ম্মানরা এ বন্দুকের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল; তার পর জাপানীরাও এ বন্দুকের কল্যাণে বহু অসাধ্য সাধন করিতেছে। বিপক্ষকে বাধা দিবার জন্ত যে সব ছোটখাট দুর্গ, খানা, খোন্দোল, ট্রেঞ্চ এবং দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীরাদি নির্ম্মিত হয়, সেগুলি এই তরল অনলবর্ষী বন্দুকের মুখে নিমেষে ধ্বংস পায়। এ বন্দুকে থাকে অতিদাহ্য তৈল। ট্রিগার টানিবা মাত্র বন্দুকের মুখ হইতে পিচকারীর মোটা ধারায় তরল অনল-রাশি বাহির হয়। এ বন্দুক সেনারা অনায়াসে পিঠে বহিয়া চলে—সে জন্ত বন্দুকগুলি আকারে ছোট।

সেনার পিঠে বন্দুক

প্রাচীর ভেদ

ছোট বলিয়া এ বন্দুকের লক্ষ্যও খুব সীমাবদ্ধ—বিশ গজ মাত্র। পদাতিক-দল এই বন্দুক লইয়া বাহিনীর আগে-আগে চলে এবং তাদের পিছনে চলে ভারী কামান ও ট্যাঙ্কারের দল। এ বন্দুকের অনল-ধারা সজোরে গিয়া যেখানে লাগে, নিমেষে সেখানে বহু রন্ধ্রের সৃষ্টি হয় এবং সেই সব রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তৈল-সতেজ অনল প্রবেশ করিয়া অনিবার্য্য ধ্বংস-লীলা সমাধা করে। ভারী বন্দুকও আছে; সেগুলি হইতে বাট-সত্তর গজ বা আরো বেশী দূরে অবস্থিত কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গ-বাধাদি নিমেষে চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হয়। জার্ম্মানি এবং জাপানের হাতে এ-বন্দুকের সাফল্য দেখিয়া আমেরিকা ও বৃটেনের সমর-বিভাগও এ বন্দুক-নির্ম্মাণে তৎপর হইয়াছে। তিনটি চোঙার সঙ্গে পাইপ-যোগে এ-বন্দুককে সক্রিয় করা হইয়াছে।

বিষবর্ষী কামান

মার্কিণ সমর-বিভাগ এক-জাতের ছোট কামান নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ কামানের তারা নাম দিয়াছে, "লিট্‌ল্ পইজন্" বা একটু-বিষ। ছোট জাতের মারণাস্ত্রের মধ্যে এটি হইয়াছে সকলের সেরা। এ রকম ট্যাঙ্ক এবং প্লেন সর্ব্ব সীমান্তে দারুণ ভাবে ধ্বংস সাধন করিতেছে। এ কামান একাধারে এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক, এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট, ট্যাঙ্ক-কামান ও এয়ারপ্লেন-কামানের শক্তি ধারণ করে। চক্রবাহী

সামনের পথ লক্ষ্য করিয়া কামান 'রেডি'

এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ গানের কাজ করে

এ-কামান পথে-বিপথে খানা-ঢিপি ভাঙিয়া ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলে—বত্রিশ সেকণ্ডের মধ্যে এ কামান ধ্বংসলীলা-সাধনে প্রস্তুত হইতে পারে। এ কামানের গাড়ীতে ড্রাইভার ও সেনাদল নিজেদের সম্পূর্ণ গোপন ও নিরাপদ রাখিতে সমর্থ এবং এ

কামানের লক্ষ্য অমোঘ এবং অব্যর্থ। এ কামান-গাড়ীতে যাত্রী থাকে ছ'জন—এক জন কর্পোরাল বা অধিনায়ক; এক জন ড্রাইভার; এক জন গানার, এক জন সহকারী গানার এবং দু'জন বারুদবাহী! এক জন মাত্র লোক অনায়াসে এ কামান ব্যবহার করিতে পারে—ট্যাঙ্কের প্রচুর অগ্নি-বর্ষণের মধ্যেও কামান-ভরা কামান-গাড়ীর যাত্রীরা নিরাপদ থাকে। এ কামানের শক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্কও বিধ্বস্ত হয়।

প্যারাশুট-বাহিনী

ষ্ট্রেচার খুলিয়া পাতা

প্যারাশুট-বাহিনীর শ্রেণীবিভাগ আছে। এক দল করে সেবা-শুশ্রূষার কাজ, আর এক দল করে ভাঙ্গনের কাজ। ভাঙ্গনের দলে যারা থাকে, তাদের পিঠের বগলিতে থাকে খুব কড়া-ধাতের বিস্ফোরক। ভাঙ্গনের কাজে ইহারা বিপক্ষদের পাইপ ধ্বংস করে, গাড়ীর এঞ্জিন বিকল করিয়া দেয়।

সশস্ত্র প্যারাশুট্-সেনা

অপর দল স্বপক্ষের লোকজনকে আহত দেখিলে তখনি বগলি হইতে ষ্ট্রেচার বাহির করিয়া আহতকে হাসপাতালে আনিবার ব্যবস্থা করে, ঔষধাদি দিয়া আহতের প্রাথমিক সেবা সম্পাদন করে। প্যারাশুটখানি সশস্ত্র থাকে—অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে দলের প্রত্যেকের কাছে

শত্রুর গাড়ী ভাঙ্গা

থাকে রাইফেল, পিস্তল, ছুরি-ছোরা মায় জলের বাহন ক্যাম্বিশের নৌকা পর্য্যন্ত।

বোমার পরাজয়

আগুনে না দগ্ধ করিতে পারে, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-শিল্পীরা এমন মশলা তৈয়ারী করিয়াছেন। মশলা তরল; ছাদে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিয়া পরে পাটা টানিয়া গোটা ছাদে চারাইয়া দিতে হয়। বত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া সিমেণ্টের মত কঠিন ও সুদৃঢ় ও অবিচ্ছেদ আচ্ছাদনে উহা পরিণত হয়। ছাদে ইনসেণ্ডিয়ারি-বোমা পড়িলে সে প্রলেপের ফলে বোমা জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, ছাদের এতটুকু ক্ষতি করিতে পারে না। ঢালু ছাদে এ প্রলেপ যদি কোনো মতে আটকাইয়া জমাট করা যাইতে পারে,

ছাদে বোমা-বারী সিমেণ্টের প্রলেপ

অর্থাৎ ভারী বলিয়া পড়িয়া না যায়, তাহা হইলে ঢালু ছাদও বোমার দায়ে নিরাপদ থাকিবে।

মোটর-চালনার সঙ্কেত

যুদ্ধে সার-সার মোটর চলিয়াছে—কোনো গাড়ীতে চলিয়াছে ফৌজ, কোনো গাড়ীতে রসদ-পত্র, কোনো গাড়ীতে বা অস্ত্র-শস্ত্র। এ-সব

জড়ো হও

অ্যাটেন্‌শন্

এঞ্জিন ষ্টার্ট করো

গাড়ীতে চড়ো

কখন ষ্টার্ট করিতে পারো, জানাও

ষ্টার্ট করিতে প্রস্তুত
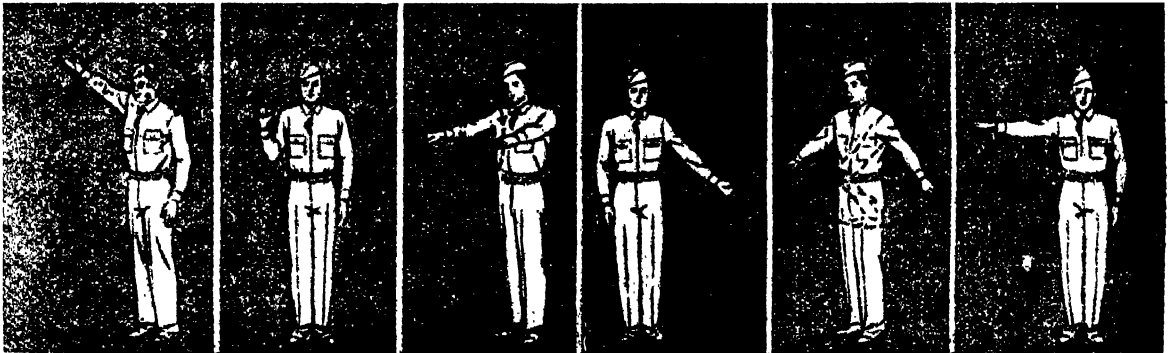
ফরোয়ার্ড মার্চ

স্পীড বাড়াও

এক সঙ্গে সব মোড় বাঁকো

স্পীড কমাও বা থামাও

এঞ্জিন বন্ধ করো

গাড়ী থেকে নামো

গাড়ী চালানো হইতেছে অধিনায়কের ইঙ্গিতে। এলো-পাতাড়ি না-তা ভাবে গাড়ী চালাইলে চলিবে না—চালানোর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থাকা চাই। এতগুলি গাড়ীতে ড্রাইভারের সংখ্যা সামান্য নয়—চীৎকার করিয়া বা ভেরীনাদ করিয়া অধিনায়ক এ-সব গাড়ীর ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ করিয়া দেন না—পথ নির্দেশ করা হয় বিচিত্র বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া সেই সঙ্কেত-দানে। বারো রকমের সঙ্কেতের পরিচয় পাইবেন উপরে ছাপা বারোখানি ছবিতে।

মোটর-গাড়ী তুলিয়া রাখিতে চান?

পেট্রোলের কষাকষির দুর্দ্দিনে দায়ে পড়িয়া যাঁরা নিজেদের মোটর-গাড়ী তুলিয়া রাখিতে চান, অর্থাৎ পথে চালু রাখিবেন না—তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত বিধিগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করেন, তাহা হইলে যত দিন বা যত মাস-বছর খুশী, গাড়ী তুলিয়া রাখুন, গাড়ীর দেহে, কল-কব্জায় বা টায়ারে-টিউবে এতটুকু অনিষ্ট ঘটিবে না এবং আবার যখন গাড়ী চালাইবার ইচ্ছা হইবে, গেরাজ হইতে বাহির করিয়া গাড়ী চালাইতে পারিবেন—মিস্ত্রী ডাকিয়া মেরামতীর হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না। প্রথমে গাড়ীখানি বেশ করিয়া ধোয়াইয়া মুছাইতে হইবে—তার পর অয়েল-গ্রীজ্ করানো। এঞ্জিনের তৈল যদি টাটকা হয়, ভালো; নচেৎ ও-তৈল ফেলিয়া দিয়া তাজা তৈল ভরিবেন। তার পর গাড়ীখানি আগাগোড়া মোম দিয়া পালিশ করানো চাই; পরে নিজের গেরাজে গাড়ী ভরিয়া 'ইগ-নিশন্-কী' অপসারিত করুন। গাড়ীর দ্বার-জানলার ফাঁকগুলি কাগজে ভরাট করিয়া দিবেন—দ্বার-জানলা

গাড়ী ধোওয়া

আঁটিয়া বন্ধ করিবেন। ব্যাটারি খুলিয়া তুলিয়া রাখা চাই—ব্যাটারি গাড়ীতে সংলগ্ন রাখিলে এসিডে এবং এসিডের বাষ্পে গাড়ীর ক্ষতি হইবে। সিলিণ্ডার-ওয়াল, ভালভ, মালভ-ষ্টেম, পিষ্টন—এগুলিকে ভালো করিয়া তৈলাক্ত রাখা চাই গাড়ীতে পেট্রোলের ফোঁটাও যেন না থাকে—থাকিলে বাষ্পাকারে তাহা উবিয়া যাইবে অথবা শুকাইয়া জমিয়া থাকিবে, তাহার ফলে যেখানে যত রন্ধ্র আছে, সেগুলি বুজিয়া যাইবে। প্লাগ্‌গুলি খুলিয়া রাখিবেন—তার পর চাকাগুলি যেন মাটী ছুঁইয়া না থাকে—গাড়ীখানিকে জ্যাকে তুলিয়া রাখিতে হইবে। গাড়ীর চাকাগুলি টায়ার-সমেত গাড়ী হইতে খুলিয়া ঠাণ্ডা মেঝের উপরে শোয়াইয়া রাখা উচিত—তাহা হইলে টায়ার ও টিউব ভালো থাকিবে। গ্রীষ্মকালে গেরাজে রৌদ্র আসিয়া গাড়ীতে যেন সে রৌদ্র না লাগে—সাবধান! সর্ব্বশেষে ধূলি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র গাড়ীখানিকে কাপড়ে আগাগোড়া ঢাকিয়া রাখিবেন। এই কয়টি নিয়ম যদি মানেন, তাহা হইলে গেরাজে তোলা গাড়ীর জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—গাড়ী অটুট-অক্ষত থাকিবে!

ব্ল্যাক-আউট ট্রেণ

রাত্রে হেড-লাইটের প্রদীপ্ত আলোর ছটা ছড়াইয়া ট্রেণ চলে। হেড-লাইটের ও-আলো আকাশ হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়; কাজেই বিমান-চারী শত্রুর পক্ষে বোমা ফেলিয়া যাত্রী ও মালপত্র সমেত রেলোয়ে-ট্রেণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া খুবই সহজ! এই বিপত্তি-মোচনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সাদার্ণ প্যাসিফিক-রেলো য়ে-সিষ্টেম কালিফোর্ণিয়া হইতে ওরগন ও নেভাদা পর্য্যন্ত লাইনে এঞ্জিনের হেড-লাইট, সব-পিছনের গাড়ীর লাল আলো, সিগনালের আলো প্রভৃতি এমন ভাবে আচ্ছাদন-যুক্ত করিয়াছেন যে, পথে আলোর অভাব ঘটে না, অথচ বোমার দায়ে নিশ্চিন্ত! প্রয়োজন-মত এঞ্জিনের ফায়ার-বক্স হইতে পর্দ্দা টানিয়া হেড-লাইটের আলো ঢাকা দেওয়া যায়। তার ফলে আলোর ছটা নিষ্প্রভ হয় এবং আলোর দিগন্ত-প্রসারী রশ্মিগুলি কৃষ্ণ ধূমে বিজড়িত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে এতটুকু বিচ্ছুরিত হইতে পারে না!
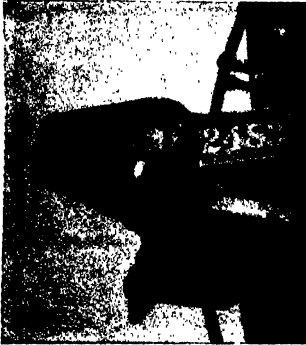
ঢাকা হেড-লাইট্

আকাশ-যুদ্ধের ছবি

প্লেনে-প্লেনে বিমান-পথে যুদ্ধের যে ছবি সিনেমায় দেখানো হয়, সে সব ছবি ফাঁকিবাজি নয়—সত্যকার যুদ্ধের ছবি। এ ছবি তুলিবার জন্য বিমান-ফৌজের দলে বিমান-ফটো-শিল্পীরাও থাকেন। তাঁরা থাকেন হারিকেন-ফাইটার প্লেনে। এ প্লেনগুলি যেন দুর্গস্বরূপ; অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত। এ প্লেনের পাখায় থাকে চলচ্চিত্র-ক্যামেরা। প্লেনের মধ্যে আসনে বসিয়া ক্যামেরাম্যান সুইচ টিপিয়া ক্যামেরাকে সচল-সক্রিয় রাখেন এবং ক্যামেরার লেন্সে যুদ্ধের সুদীর্ঘ ধারাবাহী ছবি ওঠে। ফটো তুলিবার সময় লেন্সের ছোট মুখটুকু ছাড়া ক্যামেরার সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে।

কামানের বুকে ক্যামেরা আঁটা

এ ছবি দেখিয়া শূন্যপথে বিপদের গুরুত্ব, প্লেনের ড্যামেজ প্রভৃতি বুঝিয়া বিমানফৌজের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারাদি চলে।

নবাবিষ্কৃত ভিটামিন-বী

গরুতে ঘাস খায়—সেই ঘাসে তার পুষ্টি; এবং ঘাসে পুষ্টি লাভ করিয়া গরু দেয় দুধ—সে দুধে আমাদের শরীর-পুষ্টি ও স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় দেখিয়া পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের দল বহু-কাল যাবৎ ঘাসের গুণাগুণ পরীক্ষান্তে পুষ্টিকর ভিটামিন 'বী'র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁরা বলেন, যে ভাবে ঘাস বা খড় গরুতে খায় তেমন করিয়া খাইলে মানুষের চলিবে না—মানুষের পুষ্টি-কল্পে খড় ও ঘাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ার পুষ্টিকর ও দেহ-রক্ষার উপযোগী করিতে হইবে। সে জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁরা 'জার্ম্ম-সিরাপ' তৈয়ারী করিয়াছেন। খড়-ঘাসে ক'কোঁটা জার্ম্ম-সিরাপ মিশাইয়া লইলে সে খড়-ঘাস মানুষ পরিপাক করিতে পারিবে এবং এই সিরাপে-ভিজানো খড় ঘাস হইবে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সিরাপে ভিজানো ঘাস-খড় খাইলে, বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, বৃদ্ধের দেহেও তরুণের শক্তি ফিরিয়া আসিবে! জার্ম্ম-সিরাপে সিক্ত ন'-নম্বর 'বী'-ভিটামিন—বোতলে ভরা—মার্কিন যুক্তরাজ্যে কিনিতে পাওয়া যায়।

খড়ে সিরাপ

দুর্ভিক্ষ দুর্মূল্যতা ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়

গত (কার্ত্তিক) মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয়া অধিবেশনের প্রারম্ভে ভারত সরকার পরিষদের একটি অতি সমীচীন প্রস্তাব আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এই যে, ভারতের সপারিষদ গভর্ণর জেনেরল কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক বিধানে দ্রব্য-মূল্যকে স্থিতিশীল করিবার প্রচেষ্টাকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিবেন ; কারণ, দ্রব্য-মূল্যের স্থিতিশীলতার উপরেই সমগ্র দেশের কল্যাণকর উন্নতি নির্ভর করে। ভারতের অর্থসচিব অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, the need of the Home Front has become extremely important to the internal economy of the country. অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে দেশাভ্যন্তরে অসামরিক জনসাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন—আহার্য্য ব্যবহার্য্যের দ্রুত, দৃঢ় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশের আভ্যন্তরীণ ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। দেশের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, যুদ্ধোপকরণাদির প্রচণ্ড প্রয়োজন সত্ত্বেও সে-সবের উৎপাদন কিছু খাটো করিয়াও বেসামরিক জন-সাধারণের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী জোগাইবার সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মানসিক দৃঢ়তা (Morale) অটুট রাখা একান্ত প্রয়োজন, এ-কথা অর্থ-সচিবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কখনও না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে চৈতন্যোদয়ও ভালো। ইহাতে কল্যাণ হইবে। আমরা পুনঃ পুনঃ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সহিত অজস্র অর্থ-স্ফীতি (Inflation) ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। দ্বিতীয়টির সমীচীন সুব্যবস্থা ব্যতীত প্রথমটির প্রশমন অসম্ভব। অর্থ-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন যে, the two are really two aspects of the same problem. অর্থাৎ দুইটি সমস্যা একই সমস্যার দুইটি ফাঁকড়া মাত্র। এক-সঙ্গে উভয়েরই সমঞ্জস্ সমাধান সম্ভব। অধুনা মন্দভাগ্য বাঙ্গালার নিদারুণ দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোকের তিলে-তিলে মৃত্যুর আঘাতে কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় ঘটিয়াছে এবং তাঁহারা অবশেষে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড অর্থ-স্ফীতির প্রশমন ও নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ এবং অবলম্বন করিতেছেন। অযথা অর্থ-স্ফীতির উদ্দাম গতিবেগকে মন্থর করিয়া অসামরিক জনসাধারণের আহার্য্য-ব্যবহার্য্য অধিকতররূপে উৎপাদন দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের মূল্য-বৃদ্ধি এবং দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধি লঘু করাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, যুদ্ধ-শিল্পের দ্রুত প্রসারণের ফলে অ-সামরিক জন-সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন-হ্রাসের সহিত অর্থসমষ্টির অযথা প্রসারণ আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক বিধানের ভিত্তি-ভূমিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। কঠোর অর্থ-নৈতিক নীতি-অনুযায়ী কর-বৃদ্ধি এবং ঋণ-গ্রহণ দ্বারা বাজার-প্রচলিত অতি প্রচুর অর্থের প্রকোপ, অর্থাৎ ক্রয়-শক্তি হইতে অতি অপ্রচুর স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত বেসামরিক দ্রব্যসম্ভারের পীড়ন, অর্থাৎ অযথা উচ্চ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় নিবারণ করিতে হয় ; এবং সেই সঙ্গে অ-সামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় ; অথবা তাহা অসম্ভব হইলে মূল্য-শাসন-নীতি অবলম্বন করিতে হয়। ভারতের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার কৃষি, শিল্প, নীতি, আবহাওয়া ও উর্ব্বরতা-বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময় বিশাল দেশে পণ্য-শাসন সুদুষ্কর। অথচ পণ্য-শাসন ব্যতীত মূল্য-শাসন এবং বিধিসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ দুর্ঘট। সম্প্রতি নয়া-দিল্লীতে আহূত নিখিল ভারতীয় খাদ্য-বৈঠকে এ সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির এই উদ্দেশ্যে সমবেত সম্মিলিত প্রচেষ্টা-হেতু ঐক্যবদ্ধ ভাবে কয়েকটি বিধি-বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণের তাহা সুবিদিত, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অযথা অর্থ-স্ফীতি এবং দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে এ দেশেও অর্থ-নীতিবিদ্গণের মধ্যে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে ; কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য কুফল সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। ইহা অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের মারফতে কাগজের মুদ্রা অজস্র বৃদ্ধি না করিয়া সরাসরি ভারতে ঋণ গ্রহণ করিলে, কিংবা ভারত হইতে ক্রীত যুদ্ধোপকরণের মূল্যস্বরূপ এ দেশে ক্রমবর্দ্ধনশীল কাগজের নোটের বিনিময়ে যে প্রচুর ষ্টার্লিং-সংস্থিতি বিলাতে মজুত হইতেছে, তদ্দ্বারা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া এ দেশে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক সম্পদ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে এ দেশবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত করিলে, এই বিপুল অর্থ-স্ফীতির প্রশমন এবং দ্রব্য-মূল্যের অযথা বৃদ্ধি অতি সহজেই খর্ব্ব করিতে পারা যায়। বে-সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যথাসম্ভব দ্রুত বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাপনীয়তা সহজ ও সুলভ করিলেও অর্থসঙ্কোচ দ্বারা মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু খাদ্যাভাব এখন চরম অবস্থায় উপনীত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্রগতি ও পরিণতির ফলে যুদ্ধের অন্তর্দ্দশা হইতে যে জগৎজোড়া মন্বন্তর ও মহামারীর নিদারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইবেন। সম্প্রতি বিলাতের ভূতপূর্ব্ব খাদ্য এবং বর্ত্তমানে পুনর্গঠন-মন্ত্রী লর্ড উল্টন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা জগৎজোড়া মন্বন্তরে দ্রুত প্রবিষ্ট হইতেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী অধিপতি ওয়ালেস্ও সতর্ক-বাণী প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে খাদ্যসমস্যাই হইবে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা। ঐ বৎসরের উৎপাদন পরবর্ত্তী বৎসরের প্রচণ্ড চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই এই সার্ব্বজনীন জগৎ-জোড়া খাদ্য-সঙ্কটের প্রতিবিধান-মূলক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন আমাদিগের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা-সমাধানের সমতুল। নাৎসী অত্যাচারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইব। এই অদূরবর্ত্তী অতি প্রচণ্ড সঙ্কটের প্রতি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তীক্ষ্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার তথা ভারতের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ইহা একটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ঘটনামাত্র নহে। এই অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য খাদ্যসঙ্কটকে যথাসম্ভব সহনীয় করিবার জন্য স্বাধীন ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশসমূহ যুদ্ধের পূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরাধীন

ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থার কল্পনাও করেন নাই। সুদূর সাগরপারে বসিয়া যুদ্ধের আকস্মিক পরিস্থিতির প্রশমন-কল্পে সামরিক প্রয়োজন-সাধনেই তাঁহারা মনোযোগী ছিলেন—সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, খানা-পিনার ব্যবস্থাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড যে অসামরিক জনসাধারণ, তাহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ফলে দুর্ভাগ্য ভারত কাগজের নোটের বিনিময়ে আহার্য্য-ব্যবহার্য্য কাঁচা ও পাকা মালের মজুত এবং প্রস্তুত-সম্ভাব্য সঙ্গতি হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে শত-সহস্র নরনারী ও শিশুসন্তানকে অকালে কালের করাল কবলে আহুতি দিতেছে। ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় বিষম বিপ্লবে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

এ সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ন্যায় একটি প্রচণ্ড ঘটনা আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্পর্কের যুদ্ধ-পূর্ব্ব-ভিত্তিকে বিপর্য্যস্ত করিবে। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থারও গুরু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতি এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি ও রীতি-নীতি অচিন্তনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের অনতি-পূর্ব্বে এমন কতকগুলি প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যাহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উনবিংশ শতকে পরিপুষ্ট ধারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। যে আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি-বন্ধনেরও উপর এই ধারার নির্ভর, তাহার ভিত্তি ছিল কতিপয় জটিল বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি বিধ্বস্ত হইলে নিখিল জগৎকে বহু পরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তি-মূলক প্রচেষ্টা-প্রণালীর মধ্য দিয়া এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির উপযুক্ত ও উপযোগী বিনিময়-হারের যোগ নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধও আমাদের নিমিত্ত নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে এবং যুদ্ধান্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষকেও এই পুঞ্জীভূত সমস্যার রহস্য ভেদ করিয়া যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক নব বিধানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইবে প্রধানতঃ দুইটি নৈমিত্তিক কারণে। প্রথম, বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রচলিত কাজ-কারবারের স্বাভাবিক ধারাকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে; বিভিন্ন দেশের বিনিময়-বাজারের অস্তিত্ব এখন অবলুপ্ত—তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি এখন নিশ্চল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে নিখিল জগতের উত্তমর্ণ অধমর্ণ সম্পর্কের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, নিখিল জগতের উৎপাদন-শক্তি নব পর্য্যায় স্থিতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ফলতঃ, এই দুইটি কারণে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক অঞ্চলে মৌলিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে ভারতের আর্থিক শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে,—আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতি এবং উভয়মুখী ইজারা-ঋণ-দায়ে ও কারকারবারে। ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ ফলে, পৌনঃপৌনিক বৈদেশিক অর্থ শোষণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য জমাখরচে আমরা যে উন্নত জমার অধিকারী, তাহারই সদ্ব্যবহারের সমস্যাই এখন আমাদের প্রবল। অধমর্ণের পরাধীন অবস্থা হইতে উত্তমর্ণের স্বাধীন পদবীতে আমরা আরূঢ়; তথাপি আমরা পরাধীন।

এখন স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আমাদের যুদ্ধোত্তর বৈদেশিক বাণিজ্য কিরূপ গতি-প্রকৃতি অবলম্বন করিবে, তাহা যে কেবল-মাত্র আমাদের অবলম্বিত আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করিবে, তাহা নহে; আন্তর্জ্জাতিক দায়-দায়িত্বের হিসাব-নিকাশ-নির্দ্ধারণের এবং আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বিধি-বিধানের সর্ব্বসম্মত বিলি-ব্যবস্থার উপরও নির্ভরশীল। মার্কিণের ইজারা-ঋণ কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একই প্রকার অথবা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা মার্কিণ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই নহে; যুদ্ধান্তে যুদ্ধঘটিত ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত অবশ্য-প্রয়োজনীয় কয়েক বৎসর পরে। কিন্তু মার্কিণ এতাবৎকাল যে সকল যুদ্ধোপ-করণ যোগাইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধোপকরণ দ্বারা ঋণ পরিশোধ-প্রত্যাশা বৃথা হইবে; বিশেষতঃ, যদি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিরস্ত্রকরণ (Disarmament) প্রস্তাব প্রবর্ত্তিত হয়। মার্কিণ যে অন্য প্রকার বণিজপণ্যে ঋণ পরিশোধ লইবে, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধান্তে মার্কিণ অধিকতর অবাধ-বাণিজ্য এবং শুল্ক-প্রশমন নীতির একান্ত পক্ষপাতী। যদি ইজারা-ঋণ সাহায্যের প্রতিশোধ পণ্যে লইতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধান্তে মার্কিণ অনতিবিলম্বে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত পণ্যপ্রবাহে নিমজ্জিত হইবে এবং সেই পণ্যরাশিকে সমীচীন ভাবে আয়ত্তান্তর্গত বণ্টন ও ব্যবস্থার শৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। এই নিমিত্ত মনে হয় যে, পরিশেষে ইজারা-ঋণ সাহায্যের পরিশোধ দাবী নীরবে পরিত্যক্ত হইবে। আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যৎ সংশয়-সঙ্কুল। ইতিমধ্যে বিলাতের আর্থিক পত্রিকাগুলিতে এই সংস্থিতিকে ভারতকে "বৃটেনের অকুণ্ঠিত দান" বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইতেছে! বস্তুতঃ, এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতি বৃটেনের সাহায্যার্থ প্রভূত ত্যাগ-স্বীকার পূর্ব্বক ভারত-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত মহার্ঘ্য বাণিজ্যদ্রব্য এবং পরিচর্য্যার পরিমিত মূল্য। বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং মিত্র জাতিবর্গের সুচারুরূপে যুদ্ধ পরিচালনার্থ ভারতের অকুণ্ঠিত সাহায্য। দুর্ভাগ্য-বশতঃ দরিদ্র ভারতের এই মহান্ স্বার্থত্যাগের যথার্থ মূল্য ও মহিমা বিলাতে সম্যক্‌রূপে সমাদৃত নহে। ভারতের অসামরিক জন-মণ্ডলীকে তাহাদের অত্যাবশ্যক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং জগতের মূল্যমান হইতে কম মূল্য অথবা আইন-শাসিত স্বল্পমূল্যে বিবিধ বস্তুজাত বৃটিশ ও মিত্রশক্তি সমূহের নিকট বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতি পুঞ্জীভূত হইতেছে। ইহা অতি কষ্টে অর্জ্জিত ভারতীয় সম্পদ্—কাহারও "খোস্ মেজাজে" প্রদত্ত দান নহে! দুঃখ-দৈন্য ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ভারতবাসীর অপরিসীম ত্যাগস্বীকারের পরিণতি!

দুঃখের বিষয়, বৃটিশ ও তদধীনস্থ ভারত সরকার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে কোন না কোন অছিলায় এই সংস্থিতি হইতে যথাসম্ভব একটি মোটা অঙ্ককে বাতিল করিয়া দেওয়া যায়; এবং অবশিষ্ট অংশকে আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ-সমন্বয়-প্রসূত আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা মার্কিণ অর্থ-স্থৈর্য্য বিধায়ক ভাণ্ডারে (American

Stabilisation fount), অথবা ঐরূপে কোন প্রতিষ্ঠানে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারা যায়। ইহা স্ফটিকের স্থায় স্বচ্ছ যে, বৃটেন ও ভারতের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য পরিণতির উপর এই সংস্থিতির ভবিষ্য-নিয়ন্ত্রণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই সংস্থিতি এখন সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ-কর্তৃত্বাধীনে। আমাদের অভিভাবক বৃটিশ কর্তৃপক্ষের একান্ত বাসনা, যাহাতে এই সংস্থিতির বিনিময়ে ভারতের সহিত বৃটেনের যুদ্ধোত্তর বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, অর্থাৎ যুদ্ধান্তে ভারতের শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং অস্মদ্-দেশে-দুর্লভ এমন বিবিধ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ দ্বারা ঐ অর্থসমষ্টি এখন যেখানে সঞ্চিত আছে সেইখানেই সক্রিয়রূপে স্থিতিশীল করা।

আর্জেণ্টাইন্ প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি দেশও ষ্টার্লিং-সংস্থিতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই সঞ্চিত অর্থে যে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য কিয়দংশে লাভবান হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। মূল সংস্থিতি শেষ হইলেই যে বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার-প্রতিপত্তির হানি ঘটিবে, তাহাও সম্ভব নহে। এই সকল সংস্থিতির কিয়দংশ ভক্ষ্য, ভোজ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর (Consumers goods) সরবরাহ দ্বারা বৃটেনের আয়ত্তীভূত হইবে। কিন্তু ইহার প্রভূতাংশ কলকারখানার অভাব পূরণ ও সম্প্রসারণার্থ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে। ইহার ফলে ভারতে যে পরিমাণে শিল্প-পরিচালন-সামর্থ্য ও তদুদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি এবং মাল-মসলা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে বিলাতী পণ্যের ক্ষেত্রও এ দেশে প্রসারিত হইবে। আমরা অবশ্য সকলেই জানি যে, শিল্পে-সমুন্নত জাতিমাত্রই শিল্পে-অনুন্নত, বিশেষতঃ অধীনস্থ দেশ সমূহে শিল্প-সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা এবং তাহার সার্থকতা ও সফলতা প্রীতির চক্ষে দেখে না। ইহা প্রবাদমাত্র নহে, পরন্তু অনাবিল সত্য যে, বিলাতের বয়ন-শিল্প বহু বার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল,—যদি মহাচীনের বিপুল জনসংখ্যার প্রত্যেককে তাহার জামার ঝুল আর এক ইঞ্চি বর্দ্ধিত করিয়া পরিবার প্রবৃত্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে ল্যাঙ্কাসায়ারে বেকার-সমস্যা চিরতরে বিদূরিত হইবে। কিন্তু এ কথা তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, যে মহাচীনে শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ দ্বারা অধিবাসীদিগের ক্রয়-শক্তিকে বর্দ্ধিত না করিলে, তাহারা তাহাদের জামার ঝুল আরও এক ইঞ্চি বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ নহে।

নিখিল-জগতের বিস্তৃত ব্যবসা-তন্ত্রজাল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিল্পে-সমুন্নত দেশ হইতেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ধারা প্রবাহিত হয় এবং এই বাণিজ্যের প্রকৃষ্টাংশ ঐ সকল দেশের মধ্যেই আদান-প্রদানে নিবদ্ধ; এবং তাহারাই পরস্পরের শ্রেষ্ঠ ক্রেতা। সমগ্র জগতে শিল্পের সম্প্রসারণ একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি অনিবার্য্য এবং ইহা ধীরে ধীরে প্রাথমিক উৎপাদক এবং শ্রমশিল্পে সম্পন্ন এই দুই শ্রেণীর দেশ সমূহের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থ-নৈতিক বিধানকে রূপান্তরিত করিতেছে। গত পঞ্চবিংশতি বর্ষে প্রতি দেশে স্ব স্ব এলাকার মধ্যে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রসারের প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব্ব-প্রচলিত উৎপাদনের দেশ কাল ও পাত্রগত ব্যতিক্রম হেতু শ্রম-শিল্পের সম্প্রসারণ দ্রুততর হইয়াছে। শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ সমূহের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-বিভাগের বর্ত্তমান রীতির প্রতি মমত্ব-বশতঃ তাহারা ইহার স্থায়িত্বের পক্ষপাতী; এবং ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমকেও তাহারা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থ-নৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমশিল্পোৎপাদন বিজ্ঞান-পদ্ধতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, কোন শিল্প-বিশেষে বিশেষ পারদর্শী নিপুণ শিল্পী এখন সমস্ত শ্রমিক ও কারিগর সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের শ্রমিক ও কারিকরের অপটুতাকে একটি স্থায়ী অপকৃষ্টতা মনে করিবারও কোন কারণ নাই। পরিকল্পনা-পরিপুষ্ট নূতন অর্থ-নৈতিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির (Technique) প্রভাবে কোন দেশই তাহার শিল্প প্রবর্দ্ধনহেতু দীর্ঘকালের নিমিত্ত বৈদেশিক মূলধনের প্রতি নির্ভরশীল নহে। যন্ত্রশিল্প-পরিচালন-শক্তির উৎকর্ষও পণ্য সরবরাহ কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন যাতায়াতের ব্যয়-তারতম্য এবং কৃত্রিম কাঁচা মালের (Synthetic raw materials) প্রবর্দ্ধিত ব্যবহার প্রভৃতি কয়েকটি কারণে শ্রমশিল্পোৎপাদনের বহু স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের বিষম ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে।

যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থায় প্রাথমিক উৎপাদক দেশে বহু মূল ও স্থূল শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষেও এই বিষয়ে কিছু উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সরকারের অকপট সহানুভূতি এবং অদূরদর্শী দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র-স্বার্থের প্রবল প্রতিকূলতার ফলে আমাদের যথার্থ শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠা, প্রবৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। এই যে হীন ক্ষুদ্র-চেতা গতিধারা, ইহা যে যুদ্ধান্তে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহারও কোন নিদর্শন নাই। তথাপি দুই যুদ্ধের অন্তবর্ত্তী কাল অপেক্ষা যুদ্ধান্তে যে বিবিধ শ্রমশিল্পের গুরু ও দ্রুত বিস্তার সংঘটিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই; এবং এই বিস্তারের ফলে সমগ্র জগতে যুদ্ধ-পূর্ব্ব উৎপাদন সমতার দ্রুত এবং বিষম বিপর্য্যয় ঘটিবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যেরও গতি-প্রকৃতি প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৈদেশিক বিনিময়-হারের জটিল সংস্থিতি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ নৈতিক-সম্পর্ক-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া নব অভ্যুদয়শীল অর্থ-নৈতিক অভিনব বিধানকে লালন ও পোষণ করিবার অধিকার ও সামর্থ্য হারাইবে।

এই নববিধান প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষ ও মহাচীন নিঃসন্দেহেই প্রবৃদ্ধ পরিমণ্ডলের অক্ষ-রেখার বহির্ভূত প্রান্তবর্ত্তী দুইটি অবিচলিত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইবে। নিখিল জগতের বিপুল বক্ষে শিল্প-সমৃদ্ধি অসম, অর্থাৎ বিষম ভাবে বিস্তৃত। ইউরোপ ও আমেরিকার অত্যুন্নত শিল্পে-সমৃদ্ধ দেশ সমূহের তুলনায় ভারত ও মহাচীন বিশৃঙ্খলতামূলক অত্যবনত ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক জগতে যেমন বায়ু-শূন্য আকাশ সম্ভব নহে, অর্থনৈতিক জগতেও তেমনি শিল্প-শূন্য স্থান সমঞ্জস নহে। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান যুদ্ধ-সম্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ঘটনা পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত-প্রসূত শক্তি প্রভাবে অসমঞ্জস্ শিল্প সংস্থানের সামঞ্জস্য ঘটিবে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য সহজে ঘটিবে না,—অনেক বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া সংঘটিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিপুল সংঘর্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া এই পরিণতি প্রগতি লাভ করিবে। ভারত-সচিব আমেরী সাহেব সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় এই সংঘাত-সংঘর্ষমূলক পরিবর্ত্তনের

ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বৃটেনকেও সস্মিত মুখে এই গুরু পরিবর্ত্তন মানিয়া লইতে হইবে। বয়ন-শিল্পের স্থায় কয়েকটি শিল্পে বিশিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি এরূপ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে যে, উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিক কৌশলের পরিপুষ্টির অবকাশ নাই। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে শিল্পে-অত্যুন্নত দেশ সমূহের যে বিশেষ সুবিধা ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইবে। তথাপি এমন কতকগুলি ক্ষেত্র থাকিবে, যেখানে উন্নতির উৎপাদন-কৌশলের পারিপাট্যে শিল্প-সমুন্নত দেশসমূহ আরও কিছু দিন তাহাদের কর্ম্ম-কুশলতা ও বৈজ্ঞানিক কূট কৌশলের ফলে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। এই পরিবর্ত্তনশীল যুগে শিল্প-নৈপুণ্যের কৃতিত্বই ভবিষ্যৎ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবে।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ভৌগোলিক সমাবেশ হেতু কাঁচা মালই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কৃত্রিম উপাদানের প্রবর্দ্ধিত উৎপাদনও তাহার সঙ্কোচ সাধিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রমশিল্পজ পণ্যের বিনিময়ে প্রাথমিক উৎপাদনের বিসর্জ্জন প্রথা তিরোহিত হইবে। যুদ্ধ-পূর্ব্বে শিল্পে-সমুন্নত দেশ সমূহকে ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরের বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বিশেষ বিশেষ শিল্পে এবং মূল ও স্থূল যন্ত্রপাতি প্রণয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই গুরু পরিবর্ত্তন আভ্যন্তরীণ অর্থ নৈতিক বিধানেও গুরু পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ সমীচীন হইবে। উচ্চস্তরের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ বিশেষ বিশেষ শিল্পে এবং মূল ও স্থূল যন্ত্রপাতি উৎপাদনে অভিনিবেশের ফলে যুদ্ধ-পূর্ব্বে শিল্পে-সমুন্নত দেশসমূহের অর্থ নৈতিক বিধানে উত্থান-পতনের আবর্ত্তনশীল চক্রগতির প্রভাব উত্তরোত্তর অধিকতররূপে অনুভূত হইবে। অধিকন্তু, শ্রমশিল্পে সমুন্নত ও প্রাথমিক উৎপাদক দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসায় সম্পর্কের পরিবর্ত্তন যুদ্ধ-পূর্ব্বে শিল্পে-সম্পন্ন দেশ-সমূহের প্রতিকূল হইবে। কারণ, প্রাথমিক উৎপাদনই হইতেছে ভিত্তি, যাহার উপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উৎপাদন নির্ভরশীল; এবং তাহাদের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের সহিত অবশ্যই একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক অথবা সামঞ্জস্য থাকিবে।

জগতের সকল জাতিই যদি শ্রমশিল্পোৎপাদনে উত্তরোত্তর অধিকতর মনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। এবং ইহাও সহজেই ধারণা করিতে পারা যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উৎপাদন অপেক্ষা প্রাথমিক উৎপাদনে অধিকতর লাভবান হওয়া সম্ভব। ফলে শিল্পে-সমুন্নত ও শিল্পে-অনুন্নত দেশ সমূহের বর্ত্তমান সম্বন্ধের সম্যক্ বিপর্য্যয় ঘটিবে। এতাবৎকাল প্রাথমিক উৎপাদক দেশ সমূহই পরিণত পণ্যমূলক ব্যবসা-বাণিজ্যের চক্রাবর্ত্তের আঘাত ও অপকার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। তাহারাই পদে পদে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। এখন যদি তাহাদের অবস্থার কিছু উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন শিল্পে-সমুন্নত দেশ সমূহের সেই পরিবর্ত্তনকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, এই পরিবর্ত্তনের ফল তাহাদের প্রতি নূতন অন্যায় আচরণের অভিঘাত নহে—প্রাথমিক উৎপাদক দেশ-সমূহের প্রতি তাহাদেরই পূর্ব্বকৃত পুঞ্জীভূত অন্যায় আচরণের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকার মাত্র!

যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিয়া যুদ্ধের গত চারি বৎসরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রসভার যুগ্ম অধিবেশনে তৎপ্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁহার বিদায়-সম্ভাষণে বলিয়াছিলেন,—"যখন আমরা স্মরণ করি যে, অতীতে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য প্রধানতঃ সাগর-পারের ঋণ পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইত; কিন্তু ভবিষ্যতে যে শুধু এই প্রয়োজনের হেতু বিদ্যমান থাকিবে না, তাহা নহে; পরন্তু, তাহার নিজের প্রাপ্য অর্থের নিমিত্ত তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আমদানী-পণ্য গ্রহণ করিতে হইবে; তখন আমরা বুঝিতে পারি, এই পরিবর্ত্তনের পরিণতি কত গূঢ়ার্থ-প্রকাশক!" নানা কারণে আমদানী বাণিজ্যের হ্রাস এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি, যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতকে অধমর্ণের পর্য্যায় হইতে উত্তমর্ণের পদবীতে উন্নীত করিয়াছে,—ইহাই বিদায়োন্মুখ বড়লাটের লক্ষ্যবস্তু ছিল; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের আপাতরম্য লক্ষ্যের অন্তরালে দুই একটি গভীর চিন্তার বিষয় বিদ্যমান। প্রথমতঃ ভারতের পক্ষে রপ্তানীর অতিরিক্ত আমদানী-পণ্যের প্রয়োজন হইবে—যদি যুদ্ধ একমাত্র বৃটেনের সহিত কারবারে আমাদের পুঞ্জীভূত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিনিময়ে বিলাতি পণ্য লইতে হয়; অথ বা, যদি ষ্টার্লিং সংস্থিতির নিঃশেষাঙ্কে ভারতকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ লইতে হয়;—ইহাই বোধ হয় লর্ড লিন্‌লিথগোর উচ্ছাসের অন্তর্লক্ষ্যের বিষয়। বৃটেন ব্যতীত অন্যান্য দেশের সহিত একই সর্ত্তে আমরা যদি কারকারবার পরিচালনা করিতে পারি, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে না; এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থা নির্ভর করিবে ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার উপর। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি বিদেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের এই সংস্থিতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধনের স্থায় উচ্চ সুদে লগ্নীকৃত দীর্ঘ মেয়াদী বাণিজ্য ঋণ নহে। উভয় সংস্থিতি আমাদের প্রচলিত মুদ্রাপ্রকরণের পৃষ্ঠপোষক (Backing of our currency) এবং নামে-মাত্র শতকরা এক অংশ সুদে বৃটিশ "ট্রেজারী বিলে" (সরকারী-খৎ) নিবদ্ধ। সাগরপারে নিযুক্ত বৃটিশ মূলধনের তুলনায় বৈদেশিক আয় হিসাবে ইহার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। এই নিমিত্ত আমদানী-পণ্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এই সংস্থিতির ব্যবহার, ইহার চিরতরে তিরোধানের কারণ হইবে; এবং আমাদের লাভের পরিমাণও প্রাপ্তব্য আমদানী-পণ্যের মূল্যে সীমায়িত হইবে। আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করিবার আছে। যুদ্ধান্তে ভারত যদি দ্রুতগতিতে অর্থ-নৈতিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণে মূল ও স্থূল যন্ত্রপাতি প্রভৃতির (capital equipment) মূল্য যোগাইতে আমাদিগকে পুনরায় অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত অধমর্ণের পর্য্যায়ে অবনমিত হইতে হইবে। কিরূপ পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমাদের প্রয়োজন হইবে, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি যুদ্ধান্তে ১০০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। উত্তমর্ণ জাতিগুলিও যুদ্ধাবসানে তাহাদের হিসাব-নিকাশ নির্দ্ধারণ করিতে কিছু সময় লইবে এবং তাহাদের

সমুদায় প্রাপ্য আদায় করিতে অন্ততঃ তিন-চারি বৎসর সময় লাগিবে। মোটের উপর রপ্তানী-বাণিজ্যের নিমিত্ত ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অধিক অর্থ প্রয়োজন হইবে না। যুদ্ধান্তে বৃটেনের উৎপাদন-শক্তি যুদ্ধ-পূর্ব্ব অপেক্ষা অন্ততঃ পক্ষে শতকরা পঁচিশ অংশ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এই অর্থের দেশান্তরণ বৃটেনের যুদ্ধ-পূর্ব্ব জীবনযাত্রার ধারা অপেক্ষা কোন প্রকারে ন্যূন হইবে না। এইরূপে তিন-চারি বৎসরে আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির পরিহারে কোন আপত্তি ঘটিবে না। কিন্তু এই অর্থকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত আটক রাখা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত-মুদ্রা সংক্রান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টিতে ইহার পরিহার কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এবংবিধ বিলম্বিত-প্রত্যাহারের অর্থ, স্বল্প মেয়াদী ঋণকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণে পরিবর্ত্তন। এই সংস্থিতি হইতে ১৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডকে আমাদের বিলাতী কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রাপ্য ভাবী-দায়ের নিমিত্ত এখনই একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী-ভাণ্ডারে পরিণত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু রক্ষক যেখানে ভক্ষক, সেখানে যুক্তি নিষ্ফল।

আমাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক জগতে আমাদের সমস্যার পরিমাণ কম নহে। যুদ্ধান্তে এইরূপ বহু আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে। এ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক বহু পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বহু বৈঠকেও আলোচনা আন্দোলন চলিয়াছে। যথার্থ ভারতের অপরিত্যজ্য স্বার্থের সংরক্ষণ হেতু আজি পর্য্যন্ত এই সকল আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতের কোন জাতীয় প্রতিনিধি স্থান পায় নাই। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে সরকারী কর্ম্মচারী আমলাতান্ত্রিক শাসকমণ্ডলীর উপদেশ অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অভিমতের উক্তি করিয়া জগতের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই সন্ধিক্ষণে ভারতে জাতীয় শাসনতন্ত্রের অভাব ভারতের পক্ষে নিতান্ত দুর্দৈব। ভারতবাসী এখনও জানে না যে, ভারতের তরফ হইতে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-ক্ষেত্রে কিরূপ বিধি-বিধান ও দায়-দায়িত্বের অঙ্গীকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিণে সম্প্রতি যে খাদ্য-বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিত্বের প্রহসন সর্ব্বজন-বিদিত। ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাসমন্বয় সম্পর্কে মিত্রশক্তি সংহতির বৈঠক আসন্ন। এই বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত ভারতের আমন্ত্রণ আসিয়াছে। এই বৈঠক হইবে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের বৈঠক। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সার থিওডোর গ্রেগরী এই বৈঠকে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। এখন শুনা যাইতেছে, খাদ্য-সংসদের সভাপতি মিঃ ভিগিরের অসুস্থতা হেতু সার থিওডোরকে তাঁহার কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইতেছে, সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান অর্থ-সচিব সার জেরেমি রেইসম্যান এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব লইবেন। এ দেশে বে-সরকারী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ বিশেষজ্ঞের অভাব নাই; কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সরকারের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ব্যতীত এ সকল সমস্যাসঙ্কুল ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক শাসকমণ্ডলীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কোথায়? এই বৈঠকেই আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। যুদ্ধোত্তর আর্থিক ও অর্থ-নৈতিক বিধান এবং যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্যের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতি এই বৈঠকেই বিবেচিত ও স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু জাতীয় ভারতের প্রকৃত স্বার্থ-সামর্থ্যের পরিচয় কে দিবে? স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতীত সে স্বাধীনতা কোথায়?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
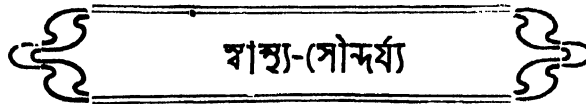
স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

মোহিনী

যাহা দেখিলে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়, ইংরেজীতে তাহাকে বলে 'চার্ম্মিং।' বাঙলায় 'চার্ম্মিং' বুঝাইতে 'মোহিনী' বা 'মোহনিয়া' কথাটি অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। 'মোহিনী' কথার অর্থ মুগ্ধ-কারিণী।

নারীর 'চার্ম্ম' বা মোহনিয়া-ভাব তাঁর বর্ণের জৌলুশে বা সারা দেহের সমঞ্জস গঠনে ও সুকুমার ছন্দেই শুধু নয়! এ চার্ম্ম বা 'মোহনিয়া'-ভাব দামী শাড়ী-ব্লাউশ বা জুয়েলারির ভারে পাওয়া যায় না। ছন্দোবদ্ধে গড়া দেহ এবং সে দেহে রূপের প্রভা ঝলমলে; অথচ চোখে বুদ্ধির শিখা নাই, এমন নারীও সর্ব্বজনের নয়ন-মন মুগ্ধ করিতে পারেন না! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, চার্ম্ম বা মোহনিয়া-ভাব সুস্থ দেহের সমঞ্জস ছন্দের সঙ্গে সুস্থ মনের ছন্দ মিশাইতে পারিলে তবেই মেলে। যে-নারী মোহিনী হইবেন, তাঁর দেহে-মনে জীবনের হিল্লোল সঞ্চারিত থাকিবে! মনের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের জঞ্জাল পুরিয়া রাখিলে চাঁপা-গোলাপের বর্ণ গায়ে ফুটাইয়া দেহকে ছন্দে বাঁধিয়া তুলিলেও চার্ম্ম ফুটিবে না! দেহের ছন্দের সঙ্গে মনের ছন্দকে মিলাইতে হইবে। মনকে সর্ব্বপ্রকার নীচতা ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা বা অসন্তোষের বিন্দু-বাষ্প যেন জমিতে না পারে! তবেই মনের স্বাস্থ্য থাকিবে অনাহত।

খাদ্য সম্বন্ধে বিচার-শক্তি জাগ্রত রাখিবেন—সময়ানুগ হইবেন। সংসারের অভাব-অভিযোগ প্রভৃতিতে বিচলিত হইয়া দুশ্চিন্তার বশীভূত হইবেন না—অর্থাৎ মনকে কোনরূপে ভারী বা পীড়িত না করিয়া ব্যায়াম সাধনা করিতে হইবে। যাঁদের চিন্তাশক্তি প্রখর নয়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত নয়,—মনকে তাঁহারা জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, নহিলে রূপে ও ব্যায়াম-বিধি-পালনেও 'চার্ম্ম' মিলিবে না! অর্থাৎ দেহে-মনে বল থাকা চাই। 'ননীর পুতুল' দেখিলে মানুষ 'আহা' বলে; সে আহার পিছনে আছে করুণা এবং অনুকম্পা! **Fine strong splendidly developed body with mental alertness and quick understanding**—সবল সুকুমার দেহ এবং চেতনা-দীপ্ত জাগ্রত মন—এ দু'য়ের সংমিশ্রণে নারী হন মোহিনী বা চার্ম্মিং!

'মোহিনী'-বেশে দেহে-মনে স্বাস্থ্য ও শক্তি রাখিতে চাহিলে বিশেষ কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি পালন করা চাই। সেই ব্যায়াম-বিধির কথা বলিতেছি! এ ব্যায়ামে দেহ সুছাঁদের হইবে, বর্ণে সুষমা ফুটিবে।

১। দুই পা একত্র সংলগ্ন করিয়া সিধা ভাবে দাঁড়ান। তার পর দুই হাত মাথার পিছনে পুট-বদ্ধ করিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে একবার বাঁয়ে হেলিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঘন-ঘন দুলাইবেন। তার পর ডাহিনে হেলিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দোলানো। কোমর হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত দেহের নিম্নাংশ যেন সিধা থাকে, না বাঁকে বা না নড়ে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এ ব্যায়াম পাঁচ মিনিট-কাল করা চাই।

১। ডাহিনে হেলিয়া

২। এবার চিৎ হইয়া শুইতে হইবে—শুইয়া তলপেটের উপর দুই হাত চাপিয়া রাখিবেন। রাখিয়া মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত দেহাংশ না নাড়িয়া একবার ডান পা পরের বার বাঁ পা ২নং ছবির ভঙ্গীতে তুলিবেন। যখন ডান পা ঊর্দ্ধে তুলিবেন, বাঁ পা তখন হাঁটুর কাছে দুমড়াইতে হইবে এবং গোড়ালি তুলিয়া বাঁ পায়ের আঙুলগুলি দিয়া ভূমি স্পর্শ করিবেন। বাঁ পা তুলিবার সময় ডান পায়ের সম্বন্ধে ঠিক এই ব্যবস্থা। পর্য্যায়ক্রমে দু'পা তোলা চাই বেশ দ্রুতভাবে। জোর দিয়া পা তুলিতে হইবে। এ ব্যায়ামও করিবেন পাঁচ মিনিট।
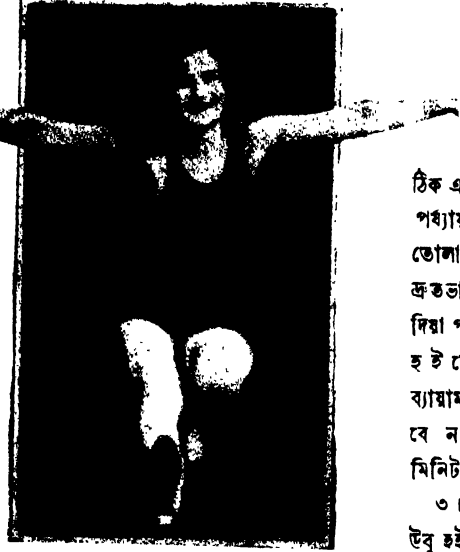
২। বাঁ পা মুড়িয়া ডান পা তোলা

দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত

৩। এবার উবু হইয়া বসুন। বসিয়া দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পা সুদৃঢ় রাখিয়া ডান পা সামনের দিকে সবলে নিক্ষেপের রীতিতে আগাইয়া ঠিক এই ছবির মত গোড়ালি দিয়া ভূমি ছুঁইতে হইবে। ছবির অনুরূপ অবস্থান ঘটিবামাত্র ডান পা সবলে এবং দ্রুত গুটাইয়া বাঁ পায়ের মত রাখিয়া ডান পা অগ্রসর করিয়া দিবেন। এ ব্যায়াম বেশ ক্ষিপ্র ভাবে করা চাই পাঁচ মিনিট।
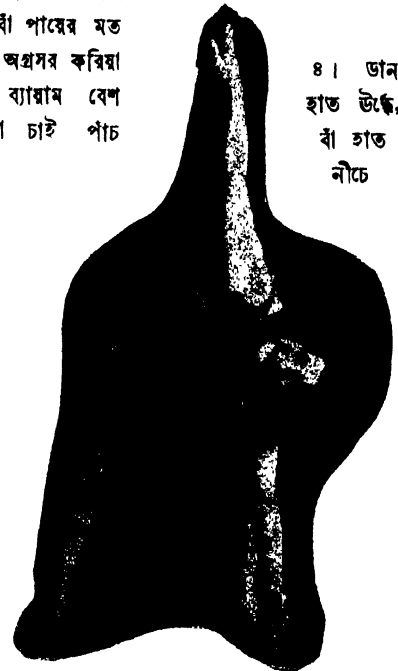
৪। এবার দু'পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে ডান হাত সিধা ঊর্দ্ধে তুলিয়া বাঁ হাত নামাইয়া বাঁ হাতের আঙুল দিয়া বাঁ পায়ের আঙুল স্পর্শ করিবেন। স্পর্শ ঘটিবামাত্র ক্ষিপ্র ভাবে সিধা দাঁড়াইয়া বাঁ হাত

৪। ডান হাত ঊর্দ্ধে, বাঁ হাত নীচে

তুলিয়া ডান হাত নামাইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ কথা—এ ব্যায়ামও পাঁচ মিনিট বেশ ক্ষিপ্র ভাবে করা চাই।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান। দু'পা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। এবার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকিয়া দুই হাতের আঙুল দিয়া দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করিবেন। স্পর্শ ঘটিবামাত্র ক্ষিপ্র ভাবে সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। তার পর আবার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত নোয়াইয়া দু'হাতের আঙুল দিয়া ঠিক এই ৫নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করিবেন। এ ব্যায়ামও বেশ ক্ষিপ্র ভাবে পাঁচ মিনিট করা চাই।

৫। ঝুঁকিয়া পায়ের আঙুল ছোঁওয়া

এ কয়টি ব্যায়ামে সারা দেহ অটুট সুকুমার ছন্দে বাঁধা থাকিবে—সঙ্গে সঙ্গে মনকে সুস্থ রাখিতে পারিলে "চাম্" ফুটিবে, চাঁপার রঙে গোলাপী আভা বিরাজ করিবে।

খাঁচা নয়!

আমাদের দেশে মেয়ে-পুরুষ সকলকে দেখি, খাঁচার মধ্যে বাস করছেন। পুরুষদের মধ্যে খাঁচার জীব সংখ্যায় অনেক কম; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে একশো জনের মধ্যে আশী জন খাঁচার মধ্যে বাস করে জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলছেন।

হেঁয়ালি নয়। কথাটা বুঝিয়ে বলি।

সকালে বিছানা ছেড়ে মেয়েরা উঠলেন—উঠেই তাঁদের হলো খাঁচার মধ্যে প্রবেশ। অর্থাৎ স্বামী ছেলেমেয়ে দাসী চাকর সকলের সব-রকম স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্ত আত্ম-সমর্পণ। যার মানে, সংসারের জাঁতা-কলে নিজেকে জুতে দেওয়া। এ থেকে ছুটী মিলবে সেই রাত্রে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে সকলের পরিপাটী পরিচর্য্যা সেরে শুতে যাবার সময়।

সংসারের কাজকর্ম্ম করবো না মেয়ে-জন্ম নিয়ে এমন কথা বলছি না। আমার এ কথার মানে, মেয়ে-জন্ম নিলেও 'দুর্লভ মানব-জন্ম' তো! কাজেই পৃথিবীর আর কোন দিকে চাইতে পাবো না, এ বা কি যুক্তি! সব বাড়ীর গৃহিণীরা হয়তো এমন নন্! কিন্তু বাঙালীর সংসারে একশো গৃহিণীর মধ্যে আশী-নব্বই জন অন্ততঃ উদয়াস্ত কাল সংসারের ঘানি ঘুরিয়েই মেয়ে-জন্ম নিঃশেষ করছেন, পৃথিবীর আলো-হাসির পরিচয় তাঁরা পান্ না—সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই!

পাশের বাড়ীর গৃহিণী মানদা দেবীকে নিত্য দেখি—ভোর হবার আগেই অন্ধকার থাকতে উঠে চাকরকে তাড়া দিচ্ছেন, ওরে উনুনে আগুন দে রে, চায়ের জল চড়বে! তার পর হবে বার্লি, ছেলেদের জন্ত মোহনভোগ, কর্ত্তার জন্ত টোষ্ট। চাকরকে তাড়া দিয়ে গৃহিণী বসলেন তরকারীর চ্যাঙারি নিয়ে। আপিস-স্কুলের তাড়া—সাড়ে আটটার মধ্যে ভাতের থালা ধরে দিতে হবে! তরকারী কোটার সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে তাড়া দিয়ে বাজারে পাঠানো; ওদিকে ছেলেদের সকালের খাওয়া শেষ হতে না হতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে স্নান করবে গরম জলে, কে ঠাণ্ডা জলে—তার তদ্বির! বাজার নিয়ে চাকর এলো ফিরে—তার সঙ্গে বসে মাছ-কোটানো। কে খাবে ল্যাজা, কে পাবে মুড়ো—ঠাকুরকে বুঝিয়ে সব ভাগ করে দিলেন! দেখতে দেখতে স্নান সেরে আসছে ছেলেরা, পরিশেষে কর্ত্তা—তাঁদের পরিচর্য্যা। তার পর একটু ফাঁক যদি মিললো, গৃহিণী স্নান সেরে নিলেন। স্নানের পর অনেক বাড়ীতে আছে ঠাকুর-ঘর—সে ঘরের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা গৃহিণীকে করতে হয়। তার পর নিজের পূজা-জপ সারা। এ সবে ঘড়ির কাঁটা চলতে চলতে হয়তো একটায় এসে দাঁড়াবে,—তখন হবে গৃহিণীর খাবার অবসর। খাওয়া চোকবামাত্র যদি কারো অসুখ-বিসুখ না থাকে, তাহলে কোনো বাড়ীর গৃহিণী হয়তো একটু গড়িয়ে নিলেন, কোনো গৃহিণী বা নভেল খুললেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্ত? বেলা তিনটে বাজবামাত্র স্কুল-ফেরত ছেলেমেয়ের জল-খাবারের ব্যবস্থা; সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা হয় আসন্ন—কর্ত্তার অভ্যর্থনা-পর্ব্ব! সেই সঙ্গে চাকরকে ডেকে উনুন ধরানো এবং রাত্রি-ভোজের ব্যবস্থা। কাজেই পৃথিবীর পানে তাকাবার সময় কোথায়? তার উপর দেখি, কোথাও যদি বা নিমন্ত্রণ-লাভ হয়, কিম্বা বিড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে যদি সিনেমা-থিয়েটার দেখার সৌভাগ্য ঘটে, তাও কি বহু গৃহিণী নিশ্চিন্ত মনে দেখতে পারেন? সিনেমার সীটে বসে বাড়ীর কথা ভাবছেন—চাকর উনুনে আগুন দিলে কি-না—ঠাকুর গুছিয়ে সব করতে পারবে তো—এমনি নানা চিন্তা! এর উপর যদি কারো অসুখ-বিসুখ হলো তো সৌভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে!

এমনি দৌড়ঝাঁপের মধ্যে গৃহিণীরা জীবন কাটাচ্ছেন! দেখে দুঃখ হয়। হায় রে দুর্লভ মানব-জন্ম! আমাদের দেশে চলিত কথা আছে—যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? তাই এ সম্বন্ধে বলতে চাই, সংসার সকলের আছে; এবং সংসার ছাড়া এত বড় পৃথিবীখানাও আছে! বড় পৃথিবীর কথা না ধরলেও আশে-পাশে অনেক-কিছু আছে—সে সবের পানে না চেয়ে শুধু ঐ আনাজের চুবড়ি আর কাটা মাছ ভাগ করার মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন? গুছিয়ে করতে পারলে সব দিকেই তাকাবার মত অবসর মেলে। এবং তা মেলাতে না পারলে মেয়ে-জন্মের সঙ্গে গো-জন্মের তফাৎ রইলো কোন্খানে?

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে দোষ দিই আমি পুরুষদের। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এত মত্ত যে, তোমাদের খিদমৎ খাটতে আর তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে আমরা দুর্লভ মনুষ্য-জন্মকে মিথ্যা করে ফেলছি,—তোমাদের গো এ দিকে লক্ষ্য নেই! জানি, তোমরা খেটে টাকা রোজগার করছো শুধু তোমাদের নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য সাধনের জন্ত নয়—আমাদেরও মুখ চেয়ে খাটছো! কিন্তু তোমাদের আছে অবসর—সে অবসরে তোমাদের আছে খেলা, গল্প, আমোদ—সে খেলায় সে আমোদে আমাদের যদি সঙ্গিনী করো, তাহলে তোমাদের আমোদের মহাভারত অশুদ্ধ হবে না,—অথচ আমরা বাঁচবো! সংসারকে তাহলে খাঁচা বলে মনে হবে না—সংসারকে আমরা আরো রমণীয় কমনীয় করে তুলতে পারবো। পারবে তোমরা পুরুষ-জাত আমাদের উপরে এটুকু মমতা করতে? দরদ করতে?

শ্রীইন্দিরা দেবী

[উপন্যাস]

এক

প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা। আসাম এবং মণিপুরের মাঝামাঝি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত যে উন্নত গিরিশ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো খাড়া আছে, তারই এক অধিত্যকায় খাটানো হয়েছিল ছোট-বড় তাঁবু।

লালা গিরিধারী ছিলেন গবর্ণমেণ্ট সার্ভে বিভাগে পদস্থ কর্ম্মচারী। সরকারী কাজে প্রায় তাঁকে এই পাহাড়-অঞ্চলে এসে একযোগে দশ-পনেরো দিন করে কাটাতে হতো। তখন তাঁর সঙ্গে আসতো কেরাণী, আর্দ্দালি, জমাদার, ঘোড়া, সহিস ছাড়া দু'-তিন জন চাকর; আর আসতেন দু'টি শিশু-কন্যাকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী বাই। প্রকৃতির উদার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের আধার এই গিরির মায়ায় সাবিত্রী বাই প্রতি বারই প্রায় স্বামীর সঙ্গে এদিকে চলে আসতেন যাতা-য়াতের এবং জীবন-যাত্রার বহু অসুবিধা সত্ত্বেও।

একে পাহাড়-অঞ্চল তার উপর সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা! পথ-ঘাট, যান-বাহন কোনো কিছুরই তখন সুব্যবস্থা ছিল না। কাজেই মিষ্টার গিরিধারীকে বেরুতে হতো সকল রকম সরঞ্জাম আর বহু লোকজন নিয়ে। তাঁরই পার্টির জন্য খাটানো হয়েছিল একখানা বড় আর তিনখানা ছোট তাঁবু পাহাড়েরই কোলে বাছাই-করা একটু ভালো জায়গায়।

কাজের জন্য রোজ তাঁকে খুব ভোরে বেরিয়ে যেতে হতো লোক-জন সঙ্গে নিয়ে। তিনি যেতেন ঘোড়ায় চেপে; কাঁধে থাকতো বন্দুক; এবং যখন ফিরতেন বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত!

স্বামী বেরিয়ে যাবার পরেই সাবিত্রী বাই শিশু-কন্যা দু'টিকে নিয়ে কাছেই ঝরণা-ধারার কাছে বসে একান্ত মনে দেখতেন সেই সবেগ স্রোতের মুখর উদ্‌ভ্রান্ত গতি আর তার সহস্র বীচি-রেখার উপর তরুণ রবির খেলার লীলা। ঝরণা-ধারা যেন তাঁর কানে-কানে বলে যেতো, মানুষের জীবন-ধারাও এমনি ভাবে অবিরাম ছুটে চলেছে কোটি কোটি লীলার ছন্দে-ছন্দে অনন্তের দিকে এবং এই যে উদয় আর অস্ত, আসা আর যাওয়া—এ হলো প্রকৃতির আসল ধর্ম্ম। এমনি চিন্তায় তাঁর মন শঙ্কাতুর হয়ে উঠতো—শিশুকন্যা দু'টিকে তিনি বুকের কাছে টেনে নিতেন। পরক্ষণেই আবার যখন তাঁর দৃষ্টি পড়তো ঐ ঝরণার পিছনে অদূরে সোনালি-আভায় রঞ্জিত তুঙ্গ গিরি-শিখরে, তখনই ঘুচে যেতো তাঁর মনের সব গ্লানি, ভয় আর দুর্ব্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে আবার যখন অজানা নানা পাখীর মধুর কূজন, কীট-পতঙ্গের বিচিত্র স্বরলহরী জাগতো, তখন তিনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়তেন।

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই পাহাড়-অঞ্চল যতই সমৃদ্ধ হোক সভ্য সমাজের লোকের বাসের পক্ষে মোটেই উপযোগী বা নিরাপদ নয়। গভীর বন-জঙ্গলে ভরা এই পাহাড়-প্রদেশের নানা স্থানে তখন বাস করতো নাগা আর কুকির দল। তারা ছিল যেমন বুনো তেমনি অসভ্য। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই ছিল অদ্ভুত। কোনো জায়গায় সমাজ গড়ে বহু দিন বাস করা তারা জানে না। পাহাড়ের সবটা জুড়েই ছিল তাদের পূর্ণ এবং অবাধ অধিকার,—এ জন্য সুবিধা-মত ক্রমাগত তারা থাকবার জায়গা বদল করতো। তাদের এই স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকারে কেউ কখনো বাধা দেয়নি এবং তাদের দলপতি বা রাজা নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলেই জানতো। বাহিরের কোনো হুমকি তখনো পর্য্যন্ত তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি। হিংস্র জানোয়ারের মতো পাহাড়ের সর্ব্বত্র তারা শিকার করে বেড়াতো। মানুষ খুন করে মুণ্ড সংগ্রহ করা কোনো কোনো সম্প্রদায় সকলের চেয়ে গৌরবের কাজ বলে গণ্য করতো।

মিষ্টার গিরিধারী সার্ভের কাজে নিযুক্ত হয়ে যে-সময় এই অঞ্চলে এসে অবস্থান করছিলেন, তখন এই অসভ্য লোকদের বস্তি তাঁর ক্যাম্পের পাঁচ-ছ' ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত ছিল; কিন্তু তিনি তা জানতেন না। মাত্র ছ'মাস তিনি কাছাড়-ডিভিশনে বদলি হয়ে এসেছেন। এদিকের পার্ব্বত্য-ভূভাগের বিশেষ কোনো তথ্য বা বিবরণ তখন তাঁর জানা ছিল না। সরকারী কাজ কি করে সুনিষ্পন্ন হতে পারবে, প্রথম ক'হপ্তা শুধু তার আলোচনা আর পরিকল্পনা নিয়েই তাঁকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আসল কাজ আরম্ভ হলো আরো কিছু দিন পরে।

* * * *

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ। ঘড়িতে দুটা বেজে গেছে। মিষ্টার গিরিধারী তখনও ক্যাম্পে ফেরেননি, সাবিত্রী বাই তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটের উপরে বসে উল আর কাঁটা নিয়ে একটা কম্ফর্টার বুনছিলেন, অদূরে বুনো আম গাছের ঘন পত্রাচ্ছাদন ভেদ করে বয়ে আসছিল ঝিল্লীর বিরামহীন ঝঙ্কার—পাহাড়-প্রদেশের নিঝুম নীরবতার প্রশান্তি বিমথিত করে। একটা খরগোশের ছানা নিয়ে শিশু কন্যা দু'টি নিকটেই তাঁবুর বাইরে খেলায় মত্ত ছিল এবং তাদের উপর নজর রাখছিল এক জন মণিপুরী চাকর অদূরে ছোট তাঁবুর সামনে একখানা পাথরের উপর আরাম করে বসে। এমন সময় সাত বছরের মেয়ে মীরা তাঁবুর মধ্যে ছুটে এসে ব্যস্ত ভাবে বললো—"এসে ভাখো মা, কেমন বড় একটা হাতী যাচ্ছে ঐ ঝরণার দিকে! কি বড়-বড় তার দাঁত!"

হাতের কাজ ফেলে সাবিত্রী বাই মীরার সঙ্গে তাঁবুর বাইরে

বেরিয়ে এলেন। এসে দেখেন, বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড হাতী মট্‌-মট্‌ করে গাছপালা ভেঙে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ঝরণার দিকে। ছোট মেয়ে কুসমিয়া একটু দূরে খেলা করছিলো। জংলি হাতীটা পাছে ছুটে এসে কোনো অনিষ্ট ঘটায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি এক-হাতে তাকে কোলে তুলে নিয়ে অপর হাতে মীরার ডান হাতখানা ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে ফের এসে ঢুকলেন তাঁবুর মধ্যে। মায়ের এ ভয় কেন বুঝতে না পেরে মীরা জিজ্ঞেস্ করলো—"হাতী দেখে অত ভয় পেলে কেন মা? হাতী কি মানুষ খায়?"

তিন বছরের শিশু কুসমিয়াকে বুকে চেপে ধরে মা উত্তর দিলেন,—"না মা, হাতী মানুষ খায় না, কোনো জীবজন্তুকেই খায় না।"

—তবে আর হাতীকে ভয় কিসের?

—মানুষ কি জানোয়ার না খেলেও হাতী রেগে গেলে মেরে ফেলতে পারে। এই জন্মই ওর কাছে যেতে নেই।

—মানুষ কাছে গেলেই বুঝি হাতী রাগ করে?

—তা নয়। কথা হচ্ছে, হাতীর বোঝবার ক্ষমতা খুব বেশী। হাতী যদি বুঝতে পারে কেউ তার কোনো অনিষ্ট করতে চায়, তাহলে আর রক্ষা নেই,—শুঁড় দিয়ে তাকে জড়িয়ে আছাড় দিয়েই হোক বা পায়ের তলায় ফেলে চাপ দিয়েই হোক, চোখের পলকে মুহূর্ত্তে মেরে ফেলবে।

—কিন্তু মা, আমরা তো ওর কোনো অনিষ্ট করতে চাইনি, তবু তোমার অত ভয় কেন?

—এ সব জংলি জানোয়ারকে কি বিশ্বাস আছে? তাই সাবধানে থাকাই ভালো।

—সার্কাসের হাতী তো দেখেছি মা খুব পোষ মানে। ছোট্ট মানুষের ইসারায় কত কি করে—নাচে, বাজনা বাজায় আরো কত রকমের খেলা করে। আমরা কি এই হাতীটাকে ধরে এনে ঐ রকম পোষ মানাতে পারি না?

—পাগল! আমরা কি এখানে সার্কাস খুলে বসেছি যে হাতী ধরে পোষ মানাবো?

—না মা, তা বল্‌চিনে। আমি বল্‌চি, ঐ রকম একটা বড় জানোয়ারের পিঠে চেপে বেড়াতে পারলে কি মজাই হয়।

—আচ্ছা, বাবুকে বল্‌বোখন, একটা পোষা হাতী জোগাড় করতে পারেন কি না দেখতে পাওয়া গেলে এক দিন সবাই মিলে হাতীর পিঠে চড়ে অনেক দূর বেড়িয়ে আস্‌বো।

মায়ের মুখে এ-সব কথা শুনে মীরার দেহ-মন আহ্লাদে নেচে উঠলো। মায়ের গলা জড়িয়ে তাঁর মুখে চুমো খেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে সে বললো,—তুমি মা কত ভালো মা আমাদের।

মেয়ের চিবুক ধরে মা মেয়েকে আদর করলেন। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সুন্দর আয়ত চোখ দু'টি মুদিত করে মীরা মায়ের বুকে মিশে রইলো।

এমন সময় মিষ্টার গিরিধারী খুব শ্রান্ত হয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন। ঘোড়ায় চেপে ঘোড়াকে খুব ছুটিয়ে নিয়ে আস্‌ছিলেন বলে তাঁর গায়ের খাকি সার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল, কপাল থেকেও ঘাম ঝরে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি কোল থেকে মেয়েদের নামিয়ে সাবিত্রী বাই স্বামীর কাঁধে ঝুলোনো বন্দুক খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন, তার পর একখানা হাত-পাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। সামনের চেয়ারে বসে রুমালে কপালের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে গিরিধারী বল্‌লেন—

এক-হপ্তা পরেই আমাদের এ ক্যাম্প তুলে পাহাড়ের আরো উপরে যেতে হবে। শুনতে পাই, ওদিকে অসভ্য নাগা-কুলিদের সব বস্তি আছে—আর এরা না কি এমন ভীষণ অসভ্য যে, মেয়ে-পুরুষ সবাই প্রায় উলঙ্গ থাকে। ওদের কাছাকাছি বাস করা মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ঠিক করেছি, দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমাদের কাছাড় পাঠিয়ে দেবো।

সাবিত্রী বাই হাসি মুখে বল্‌লেন,—অর্থাৎ কতকগুলো অসভ্য লোকের ভয়ে আমায় পালিয়ে যেতে হবে তোমাকে ফেলে! সে হবে না কিছুতেই। আচ্ছা, এখন সে কথা থাক,—আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে স্নানাহার করো, স্থির হও, তার পর সব পরামর্শ হবে।"

স্নানাহার শেষ করে বিশ্রামের জন্ম মিষ্টার গিরিধারী ক্যাম্প-খাটে সবে মাত্র বসেছেন, এমন সময় তাঁবুর মধ্যে ভীষণ অন্ধকার জমে উঠলো। কারণ বুঝতে না পেরে তিনি বাইরে এলেন। এসে দেখেন সারা আকাশ ভীষণ কালো মেঘে ভরে গেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে মেঘের এত বড় আয়োজন কি করে চলো, গিরিধারী তা ধারণা করতে পারলেন না। তাঁর আদেশে তখনই এক জন বেয়ারা এসে দু'টো হ্যারিকেন্ লণ্ঠন জেলে দিয়ে গেল।

নিমেষে চারি দিকে ভয়ের কেমন থম্‌থমে ভাব—কারো মুখে কথা নেই! বাতাসের ছোট নিশ্বাসটুকুও যেন হঠাৎ ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁবুর মধ্যে মিষ্টার গিরিধারী আর সাবিত্রী বাইএর দমবন্ধ হয়ে যাবার মতো হলো—দারুণ অস্বস্তি। কিন্তু এ অবস্থা বেশী ক্ষণ রইলো না। একটু পরেই আরম্ভ হলো প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা। প্রথমে বাতাসের ঝটকা বয়ে গেল তাঁবুর উপর দিয়ে; তার পরেই উঠলো গুরু-গম্ভীর সোঁ-সোঁ রব। সে শব্দ যেন বেরিয়ে আস্‌ছে চারি দিক্‌কার ঐ পাহাড়ের বিরাট্ দেহ ভেদ করে তার গোপন গহন অন্তস্তল থেকে। পরক্ষণেই এসে পড়লো প্রবল ঝড়—গাছপালা সব একেবারে দলিত মথিত করে। বাঁশ-ঝাড়ের লকলকে উঁচু মাথাগুলো পরস্পর জড়াজড়ি করে মাটীর বুকে প্রায় লুটিয়ে পড়তে লাগলো। গিরিধারী প্রতিক্ষণে আশঙ্কা করতে লাগলেন, এই প্রমত্ত ঝড় বুঝি তাঁবু-শুদ্ধ সবাইকে একদম উড়িয়ে নিয়ে যাবে! শিশু কন্যা দু'টি ভয়ে কাঠ হয়ে মাকে-বাবাকে জড়িয়ে ধরে এক একবার কেঁদে উঠছে! তাদের ভয় আরো বেড়ে উঠলো যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ঝলকের সঙ্গে গর্জ্জে উঠলো প্রচণ্ড বজ্র-নিনাদ। কত বড় বড় গাছ, কত কুটীর যে এই দারুণ ঝড়ে ভেঙ্গে ধ্বসে গেল তার ইয়ত্তা নেই। ঝড়ের এই প্রলয়-লীলা চল্‌লো প্রায় আধ ঘন্টা ধরে, সমান বেগে। অবশেষে প্রকৃতি খানিক শান্ত ভাব ধারণ করলো, কিন্তু বিরাম ঘটলো না। রাত্রে আহারের ব্যবস্থা হলো শুধু দুধ আর রুটি। এত ঝড়েও তাঁবুগুলো যে উড়ে যায়নি এইটুকুই সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। সারা রাত বৃষ্টি চললো—মাঝে মাঝে এক-একবার ঝড়ো হাওয়াও সবেগে ফুঁশে ওঠে! তাঁবুর মেঝের ওপর দিয়ে জল ধারা বয়ে চলেছে নদীর জোয়ার-স্রোতের মতো। মিষ্টার গিরিধারী এবং সাবিত্রী বাই অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে খাটে ব'সে

রইলেন,—শিশুরা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল—অবশেষে তাঁরাও তন্দ্রাভিভূত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

ভোরের দিকে হঠাৎ জেগে উঠে সাবিত্রী বাই "মীরা",—"মীরা" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। কিছু বুঝতে না পেরে গিরিধারী ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে? মীরাকে ডাকৃচো কেন?

ভয়ার্ত্ত স্বরে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে সাবিত্রী বাই বললেন,—মীরা তার খাটে নেই তো। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

—খুঁজে পাচ্ছো না! সে কি? কোথায় গেল? রাত্রে, বিশেষ এমন দুর্য্যোগের রাত—তাঁবুর বাইরে নিশ্চয় যেতে পারে না!

তবে সে কোথায়? মীরা, মীরা, মীরা! ওগো একবার তুমি বাইরে খুঁজে দ্যাখো গো!

মুহূর্ত্তে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। গিরিধারী তাঁর সমস্ত লোক-জনদের ডেকে জড়ো করলেন; লণ্ঠন নিয়ে মশাল নিয়ে সকলে চারি-দিকে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতে লাগলেন! কিন্তু মীরার কোনো সন্ধান মিললো না। সে যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। ভৌতিক ব্যাপার, না, কি! সকলের গায়ে কাঁটা দিলো। কেউ বা সন্দেহ করলো, রাতের দুর্য্যোগে বাঘ বা ভালুক এসে চুপি-চুপি তাঁবুর ভিতর ঢুকে তাকে হয়তো এমন ভাবে নিয়ে গেছে যে সে চেঁচাতেও পারেনি!

ভোরের আলো ফুটলে দেখা গেল, তাঁবুর ভিতরে মীরার খাটিয়া যে-দিক্‌টায় ছিল, সেদিক্‌কার পর্দ্দাখানা প্রায় তিন-হাত পরিমাণ খাড়া ভাবে কাটা! ঐ কাটা জায়গাটুকু ভালো করে দেখে বোঝা গেল, বাঘ- ভালুকের নখের আঁচড়ে এ কাটা হয়নি—হতে পারে না! তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও দেখা গেল, চারি দিকে তিন-চার ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন সন্ধানে কোথাও সদ্য-রক্তের দাগ বা মৃত শিশুর দেহাবশেষ কিংবা তার পরিচ্ছদের অতি-সামান্য অংশও পাওয়া গেল না।

শিশু কন্যার শোকে গিরিধারী এবং সাবিত্রী বাই অত্যন্ত অভি-ভূত হয়ে পড়লেন। সাবিত্রী বাইএর মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদে বনের পশু-পাখীরাও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল!

সাবিত্রী বাইএর ধারণা, কোনো হিংস্র পশুরই কাজ এ। পাহাড়ে-পর্ব্বতে কত রকমের জানোয়ার থাকতে পারে—মানুষ হয়তো তাদের খবর রাখে না! এমনি কোনো জানোয়ারের কবলে যদি মীরা পড়ে থাকে, তাহলে কি আর সে বেঁচে আছে? ফুলের মতো কোমল সেই দেহ নিষ্ঠুর জানোয়ারের···সে কথা মনে হতে সাবিত্রী বাই চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

গভীর শোকে অভিভূত হয়েও গিরিধারী মীরার অন্তর্ধানের ব্যাপার সম্বন্ধে ভাবলেন সম্পূর্ণ অন্য রকম। সমস্ত অবস্থা স্থির ভাবে বিবেচনা করে তাঁর মনে ধারণা সুদৃঢ় হলো, এ কাজ জানো-য়ারের হতে পারে না—নিশ্চয় কোনো দুষ্ট লোক এসে মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কে সে লোক?

তাঁর অধীনে কোনো লোক এমন কাজ করেনি—করতে পারে না; এ সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে কি পাহাড়ী নাগা-কুকিদের কেউ এ কাজ করেছে? গিরিধারী তা অসম্ভব মনে করতে পারলেন না। কিন্তু এই শিশুকে চুরি করায় কি তার স্বার্থ? তিনি শুনেছেন, এই বুনো অসভ্যদের মধ্যে কোনো কোনো দল নর-খাদক। তাই যদি হয়, তাহলে এই কচি শিশুকে···

সপ্তাহ-কাল অবিরাম সন্ধানেও যখন কোনো ফল হলো না, তখন তাঁর সন্দেহ হলো, মীরা যদি সত্যই নাগা-কুকিদের হাতে পড়ে থাকে এবং কৃপা-বশেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, তারা যদি তাকে প্রাণে না মেরে থাকে, তা হলে নিশ্চয় তাকে দূরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে! তিনি সংকল্প করলেন, মেয়ের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই এই পাহাড় অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যাবেন না এবং পাহাড়ের গভীরতম প্রদেশে গিয়ে মেয়ের সন্ধানে জীবনপাত করবেন। সেই সংকল্প-অনুসারে প্রথমেই তিনি চার মাসের ছুটির দরখাস্ত করলেন এবং ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলো। কিন্তু গোড়াতেই বিঘ্ন হলেন সাবিত্রী বাই! শোকে-দুঃখে তিনি একেবারে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়লেন। তাঁকে এ অবস্থায় ফেলে মেয়ের খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো গিরিধারীর পক্ষে সম্ভব হলো না। তার উপর তাঁকেই এখন ছোট মেয়ে কুসমিয়াকে দেখতে হয়। ছুটির চার মাসের মধ্যে নিজে কোথাও তিনি যেতে পারলেন না। আবার সরকারী কাজ করতে গেলে ঘরে বসে থাকা চলে না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি আরো চার মাসের ছুটি মঞ্জুর করালেন।

এতেও সমস্যা মিট্‌লো না। সরকারী তাঁবু ইত্যাদি ছেড়ে দিতে হলো। তাঁর জায়গায় অন্য লোক এসে কাজ করছেন। লোক-জন সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তখন তিনি একখানা কুটীর তৈরী করে শিশুকন্যা এবং রুগ্না স্ত্রীসহ নিজেই ঐ অঞ্চলের এক জায়গায় বাস করতে লাগলেন।

মীরার অন্তর্ধানের ছ'মাসের মধ্যে শোকে রোগে ভুগে দারুণ হতাশায় জর্জ্জরিত হ'য়ে সাবিত্রী বাই এক দিন সংসার থেকে চির বিদায় নিলেন। গিরিধারীও সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। এ ছাড়া তাঁর আর অন্য পথ ছিল না—অবশ্য স্বচ্ছন্দে তিনি তাঁর দেশে—(উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে) গিয়ে বাস করতে পারতেন। তাঁর পৈত্রিক জমিদারীর আয় ছিল ভালোই। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্ব-সংকল্পানুযায়ী এই পাহাড়-অঞ্চলে থেকে মীরার সন্ধানে জীবনপাত করবেন বলে এখানেই থাকবার জন্য একটু ভালো ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মেয়ের এবং পত্নীর শোকে হয়তো তিনি পাগল হয়ে যেতেন, যদি সান্ত্বনা দেবার জন্য কুসুমিয়া না থাকতো। মীরা প্রথম সন্তান বলে তার উপরই তাঁর টান ছিল খুব বেশী। সেই মীরার উদ্ধার না করে কিংবা তার প্রকৃত সন্ধান না পেয়ে এই পাহাড় অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবেন, এমন চিন্তা গিরিধারীর মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায়নি। কাজেই তিনি এইখানে রয়ে গেলেন এবং নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কুসমিয়াকে যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন, সেই ব্যবস্থায় মন দিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরেবতীমোহন সেন

সন্ধান
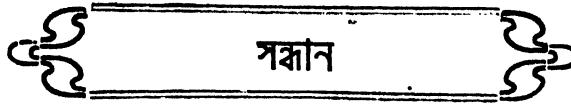
[গল্প]

দৈনিক কাগজ "আদিত্য"। 'আদিত্য'র সহকারী সম্পাদক রাসবিহারী।

শচীন রাসবিহারীর বন্ধু। শচীনের পয়সা আছে, গাড়ী আছে, আর আছে অখণ্ড অবসর। যখন যেমন খুশী,—কখনো মিটিং করিয়া বেড়ায়, কখনো বাহির হইয়া যায় দূরে রিলিফের কাজে। শচীন অমায়িক, বন্ধু-বৎসল। তার বাড়ীতে বন্ধুদের আমোদ-উৎসব লাগিয়াই আছে।

সেদিন রাসবিহারী আসিয়া ডাকিল—শচীন···

শচীন একখানা রাশ্যান্ নভেল খুলিয়া বসিয়াছিল, বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—বলো···

রাসবিহারী বলিল,—একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

—কি কাজ?

—ইন্ষ্টিটিউটে দুর্গতদের রিলিফের জন্য চ্যারিটি পার্ফর্ম্যান্স। মানে, ভ্যারাইটি-এন্টার্টেনমেণ্ট···তোমাকে যেতে হবে।

শচীন বলিল—কত টাকার টিকিট?

রাসবিহারী বলিল,—দাম দিয়ে টিকিট নিতে হবে না···কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট দেবো। আমার টিকিট···আমি যেতে পারবো না। আমার অন্য কাজ আছে···অথচ আমার হয়ে কারো যাওয়া চাই-ই!

কমপ্লিমেণ্টারী-টিকিটের এমন দায়! শচীন চাহিল রাসবিহারীর পানে···দু'চোখের দৃষ্টিতে একরাশ কৌতূহল।

রাসবিহারী বলিল,—আমাদের ঐ মুরারি···মেশে সে আমার রুম-মেট্। রেডিয়োর দু'-এক জন চাঁইকে বাগিয়ে সে ঐ রেডিয়োয় গানের আসরে ঢুকেছে। সে গাইবে এ-শোতে দু'খানা আধুনিক সঙ্গীত···নিজের লেখা গান। তার সম্বন্ধে 'আদিত্য' কাগজে একটু 'এ্যাপ্রেসিয়েটিভ' মন্তব্য ছাপতে হবে···যদি তার পাব্লিসিটি হয়, তাই আর কি!

শচীন হাসিল, বলিল,—ও-কাজ খুব ভালো হয় যদি কাণে তার গান না শোনো! না পড়ে' বইয়ের সমালোচনা যেমন লেখা যায়···

রাসবিহারী বলিল,—না, মানে, সমস্ত শোয়ের সমালোচনা করা চাই···তার মধ্যে মুরারির প্রোগ্রামের একটু স্পেশাল মেনশন্ করে ওর জয়-গান। কাজেই না দেখে না শুনে সমালোচনা লিখতে গেলে বিপদ হতে পারে!···আমি যেতে পারছি না। তোমার অবসর আছে···তাছাড়া তোমার ওপিনিয়নের উপর আমার যেমন বিশ্বাস···

শচীন বলিল,—কবে তোমার এ চ্যারিটি-শো?

রাসবিহারী বলিল—আজ সন্ধ্যা সাতটায়।

—আজ!

রাসবিহারী বলিল—তোমার অন্য কোনো এন্গেজমেণ্ট আছে না কি?

শচীন বলিল—না···তবে ভাবছিলুম, মিষ্টার রায়ের ওখানে একটু ঘুরে আসবো।

মৃদু হাস্যে রাসবিহারী বলিল—ও সত্যি, রায়-সাহেবের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের তারিখ ঠিক হলো?

শচীন বলিল—না।

—তোমার অসুবিধে হবে?

শচীন বলিল—না। তোমার শো কতক্ষণ চলবে?

রাসবিহারী বলিল—তা সেই রাত বারোটা পর্য্যন্ত। যেখানে যত আর্টিষ্ট আছে, সকলে মিলে কশরতি দেখাবে···এত বড় অপর্চুনিটি কেউ ছাড়বে, ভাবো? তোমাকে আমি প্রোগ্রাম পাঠিয়ে দেবো। আছে এক-কপি আমার কাছে। ওঃ, একগঙ্গা নাম একেবারে!

শচীন বলিল—তোমার যদি উপকার হয়, যাবো।

রাসবিহারী বলিল—মুরারিকে একটু হাতে রাখতে চাই। দেশ থেকে পাটালি-টাটালি এনে দ্যায়। গেল-বছর দু' নাগরি নোলেন গুড় দিয়েছিল, ফার্ষ্ট ক্লাশ!···এবারো গুড়ের নাগরির সময় আসন্ন··· এক-নাগরি তোমাকে দিয়ে যাবো, খেয়ে দেখো!

হাসিয়া শচীন বলিল—গুড়ের দরকার নেই আমার। তুমি বলছো, যাবো।

—এই নাও টিকিট···

কম্প্লিমেণ্টারী-টিকিট শচীনের হাতে দিয়া রাসবিহারী চলিয়া গেল।

যথাসময়ে ইনষ্টিটিউটের সামনে আসিয়া শচীন দেখে, তরুণ-তরুণীর কি প্রচণ্ড ভিড়!

ভিতরে কমপ্লিমেণ্টারি-সীটে বসিয়া শচীন প্রোগ্রাম খুলিল। চার-পাতা প্রোগ্রাম···শ'খানেক আর্টিষ্টের নাম ঠাশাঠাশি করিয়া ছাপা! প্রথমেই কন্সার্ট—মিউজিক-মাষ্টার বিরজিলাল সাহা সম্প্রদায়ের। শচীন শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! বিরজিলাল-সম্প্রদায়! রেডিয়োতে এ-দলের যে ঝন-ঝনাৎকার ওঠে···সে বিপর্য্যয় রবে বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায় হইয়া ওঠে! কিন্তু উপায় নাই! বন্ধুর তৃপ্তির জন্য যখন এ-ভার লইয়া আসিয়াছে···

সাড়ে সাতটায় পট তুলিয়া কন্সার্ট সুরু হইল! বিরজিলাল সম্প্রদায়ে লোক প্রায় ষাট জন। ষ্টেজে বসিয়াছে ষাট জন একেবারে ঠাশাঠাশি-ঘেঁষাঘেঁষি! তার উপর ছোট-বড় মাঝারি সাইজের এত রকমের জানা না-জানা বাজনা জড়ো করিয়াছে···দেখিলে মনে হয়, বোমা বা এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফটের স্প্লিণ্টার পড়িয়া পশুপক্ষী-সমেত গোটা একটা অরণ্যই ধ্বশিয়া রহিয়াছে। এ-সব বাজনায় সকলে মিলিয়া চকিতে যে বিপর্য্যয় আওয়াজ তুলিল, সে-রবে সকলের মনে আশ্বাস জাগিল এই যে, বম্বিংয়ের সময় কাণে তুলা ঠাশিয়া না দিলেও কাণের সঙ্গে প্রাণটা বাঁচিতে পারিবে···এ-কনসার্টে কাণের শব্দ-সহা ভ্যাকসিনেশন্ হইয়া গেল!

দুয়ের নম্বর প্রোগ্রাম—কুমারী অত্রি গুঁইয়ের ক্লাশিক সঙ্গীত। ষ্টেজের উপর বিশ্বম্ভর-মার্কা তানপুরা লইয়া বসিয়া আছেন অত্রি গুঁই···তানপুরার চেয়ে আরো বিশ্বম্ভর-আকারের দেহ! শচীন বসিয়াছিল সামনের সীটে। একালের ছেলে···মেয়েদের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম সম্বন্ধে খুব বেশী হুঁশিয়ার হইলেও অত্রি গুঁইয়ের বপু দেখিয়া তার মনে যে-ভাবের উদয় হইল, সে-ভাবকে আর যে-কোনো আখ্যাই দেওয়া হোক···নারী-জাতির পক্ষে সে-আখ্যাকে কোনো মতে সম্ভ্রমসূচক বলা

চলে না। পনেরো মিনিট ধরিয়া কুমারী অত্রি গুঁই কণ্ঠস্বর লইয়া যে-কশরতি দেখাইলেন তাহাতে বুঝা গেল, গান কাহাকে বলে সে-সম্বন্ধে কুমারীর যেমন আইডিয়া নাই, তেমনি কণ্ঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে-কণ্ঠও বিধাতা তাঁহাকে ইহ-জন্মে দিতে ভুলিয়াছেন! তার পর পাঁচ জন কুমারী মিলিয়া কোরাশ গাহিলেন। কোরাশে নিজের-নিজের কণ্ঠকে ঠেলিয়া উপরে তুলিবার আশ্চর্য্য কশরতি দেখিয়া সকলে দারুণ হট্টরোল তুলিয়া তারিফ জ্ঞাপন করিল। তার পর মুরারির আধুনিক সঙ্গীত। গাহিবার পূর্ব্বে গায়ক ঘোষণা করিলেন, গানগুলি তাঁহারই স্ব-রচিত! তার পর তিনি গান সুরু করিলেন। শচীন একাগ্র মনোযোগে শুনিল। কারণ এ গান সম্বন্ধে তাহাকে অভিমত দিতে হইবে!

মুরারি গাহিল

দুপাটি-বনে মাটী নেই,
পাটি পেতে বসে ছিল গো!
খাঁটী সোনার মতন রঙ্ পরিপাটী—
পাশে সোনার বাটি পড়ে ছিল গো।

তার পর দুপাটি-মাটী-পাটি-বাটির সঙ্গে মিল লাগাইয়া গানের লাইনে-লাইনে লাঠি ও চাঁটি ঠাশিয়া মুরারি যখন গান শেষ করিল, তখন শচীনের মন দিশাহারা হইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয় গানের অর্থ খুঁজিয়া আকুল! হঠাৎ পাশে কে-এক জন বলিল—গানের মানেটা কি হলো হে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়া এক বালক হাঁকিল—আধুনিক সঙ্গীতে মানে খুঁজছেন কি মশাই? এ শুধু লাগসৈ কথার মালা! হুঃ!

মুরারির গানের পর ঘোষণা হইল, মৃদঙ্গদুলালের বেণু-বীণার আরাব হইবার কথা ছিল—সে আরাব হইবে না। কারণ, মৃদঙ্গ-দুলালের পাব্লিশিটি বিশেষ ভাবে করা হয় নাই বলিয়া তিনি আসেন নাই। অগত্যা এবার বিখ্যাত শিল্পী মিস্ কদম্বমালার পিয়ানো। পিয়ানোর সামনে আসিয়া বসিলেন মিস্ কদম্বমালা সিং! আধ ঘণ্টা ধরিয়া পিয়ানোতে আঙুলের ঘা মারিয়া-মারিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন, হাজার-জন্ম সাধনা করিলেও তিনি পিয়ানো বাজাইতে পারিবেন না! পিয়ানো-যন্ত্রটির কোনো অপরাধ ছিল না। কারণ খুব-সেরা পিয়ানো আনিয়া দিলেও মিস্ কদম্বমালা অঙ্গুলি-পীড়নে সেটিকে এবং এই এক-বাড়ী দর্শককে সমান ভাবেই পীড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেন!

মহ্মিতার আমোল হইতে যে-লোকটি এ-সব অনুষ্ঠানে হাজির থাকিয়া শীষ দিয়া ঠাটা-টিটকারীর বচনে সমস্ত দর্শকের মনোভাব অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, সে-লোকটি এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে। সে বসিয়াছে গ্যালারিতে। তারস্বরে সে বলিল—যারা দুর্গত, তাদের দুর্গতি-মোচনের জন্ম আমাদের ডেকে এনে এ দুর্গতি ভোগ করানো কেন, বাপু? টিকিট না বেচে চাঁদা চেয়ে এ দুর্ভোগ আর নরক-যন্ত্রণা থেকে আমাদের রেহাই দিতে পারতে তো!

শো শেষ হইল রাত্রি প্রায় পৌনে বারোটায়। প্রচণ্ড কলরব তুলিয়া চেয়ার-বেঞ্চ ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া দর্শকের দল বাহির হইল!

ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে শচীনকে বেশ বেগ পাইতে হইল। যখন বাহির হইল, তখন ওদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। পথে ট্যাক্সি নাই। শুধু একরাশ রিক্শ ···কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনের অবসানে যেগুলা কোনো মতে টিঁকিয়া গিয়াছিল, তাদেরি বংশসম্ভূত! ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শচীন থাকে ভবানীপুরে। রিক্শয় চাপিয়া ভবানীপুর যাওয়া··· সময় লাগিবে পাক্কা দেড় ঘণ্টা! শীত পড়িয়াছে, তার উপর জ্যোৎস্না রাত্রি···ইন্ সাচ্ এ নাইট্ এ্যাজ্ দিস্···যদি সাইরেন বাজে!

ভাবিল, হাঁটিয়া কলেজ ষ্ট্রীট যাইবে যদি ট্যাক্সি মেলে!

দু' পা অগ্রসর হইয়াছে দেখে, এক তরুণী···একা তরুণীর গায়ে একটা পশমী স্কার্ফ জড়ানো, পায়ে ফিতা-বাঁধা শু! তরুণীর মুখে-চোখে উদ্বেগের ভাব!

শচীন থামিল। কুণ্ঠিত স্বরে কহিল—গাড়ী পাচ্ছেন না?

তরুণী চাহিল শচীনের পানে। চোখে···যাকে বলে ভয়-চকিতা হরিণীর দৃষ্টি!

তরুণী কহিল—না, পাচ্ছি না।

শচীন কহিল—পথে লোকজন নেই! আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারেন, আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি!

শচীনের পানে দু'চোখের দৃষ্টি তুলিয়া তরুণী কহিল—আমি এসেছিলুম গাড়ীতে। বাড়ীর গাড়ী। স্বামী ছিলেন সঙ্গে। তিনি ডাক্তার···তাঁর একটা কল ছিল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে সেখানে রোগী দেখতে গেছেন। কথা ছিল, সাড়ে দশটার মধ্যেই ফিরবেন। তার পর দু'জনে একসঙ্গে···।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তরুণী চুপ করিল···কথা শেষ হইল না।

শচীন বলিল—আপনার বাড়ী কোথায়?

তরুণী কহিল—বালিগঞ্জ···হিন্দুস্থান পার্ক।

বালিগঞ্জ! শচীন বলিল,—কেস্ হয়তো সিরিয়াস···রোগীর বাড়ী থেকে তাঁকে তাই ছাড়েনি!

তরুণী বলিল—আশ্চর্য্য নয়! তা যদি হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই! কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে···রাত্রে লরিগুলো যে ভাবে চালায়··· সেদিন একখানা দোতলা-বাসই তো লরির ধাক্কায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ভাবনার কথা! শচীনের গায়ে কাঁটা দিল। শচীন ভাবিল, যে দিন-কাল পড়িয়াছে, কিছুই আর বিচিত্র বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না! কিন্তু···

সে বলিল—তাঁর আসতে যদি দেরী হয়? এখানে একা পথে আপনার থাকা উচিত হতে পারে না!

তরুণী কোনো জবাব দিল না। কি ভাবিতেছিল···

কি কথা? শচীন বলিল—আমার বাড়ী ভবানীপুরে···ট্রাম বা বাস পাবো না! আমি ট্যাক্সি নেবো। তা···যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমার ট্যাক্সিতে করে আপনাকে যদি আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দি?

তরুণী একটা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—কিন্তু ট্যাক্সি কৈ?

শচীন বলিল—এখানে না পাই, হ্যারিসন রোডের মোড়ে গেলে চলতি-ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত হবে না।

তরুণী কোনো কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···নিস্পন্দ···যেন পাথরের মূর্ত্তি!

শচীন বলিল—একটু কষ্ট করে যদি তাহলে আসেন আমার সঙ্গে! হ্যারিসন রোডের মোড় কতটুকুন্ বা!

ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী কহিল—চলুন।

দশ-পনেরো মিনিট হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। শ্যামবাজারের দিক হইতে আসিতেছিল··· খালি ট্যাক্সি!

শচীন ডাকিল। ট্যাক্সি থামিল। বাঙ্গালী ড্রাইভার। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া শচীন বলিল তরুণীকে—উঠুন!

তরুণী উঠিল ট্যাক্সিতে। শচীন দ্বার বন্ধ করিয়া ড্রাইভারের পাশে উঠিতে যাইতেছিল, তরুণী বলিল—সে কি। না, না, তা হয় না! আপনি ভিতরে আসুন। বলিয়া নিজের হাতে দ্বার খুলিয়া সরিয়া এক কোণে ঘেঁষিয়া বসিল। শচীন একটু থমকিয়া থামিল; তার পর ভিতরে উঠিয়া তরুণীর পাশে বসিল। বসিয়া ড্রাইভারকে বলিল,—হিন্দুস্থান পার্ক···বালিগঞ্জ!

গাড়ী চলিল সোজা দক্ষিণ-মুখে।

গাড়ীতে কাহারো মুখে কথা নাই। শচীন বসিয়া আছে···তার মাথার মধ্যে রক্ত-স্রোতে চপল চঞ্চল বেগ! তরুণীও চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ শচীন তরুণীর পানে চাহিল। তরুণীর দু'চোখের দৃষ্টি তাহারি উপর নিবদ্ধ ছিল! চাহিবামাত্র শচীনের দৃষ্টির সহিত তরুণীর দৃষ্টি মিলিল। শচীনের মনে হইল, তরুণীর দৃষ্টিতে যেন হাসির মৃদু বিদ্যুৎ!

সে বিদ্যুৎটুকু বর্ষণ করিয়া তরুণী চকিতে চাহিল অন্য দিকে। তরুণীর চোখের এ বিদ্যুৎ আগুনের শিখার মতো শচীনের মনে বিঁধিল! মন আলোয় আলো!

শচীন বলিল—কোথায় তাঁর কল···জানেন?

তরুণী কহিল,—জানি। ভবানীপুর হরিশ মুখার্জী রোড।

শচীন বলিল—পথে যদি কোথাও ফোন পাই, খপর নেওয়া ভালো। মানে, তিনি যদি এখনো রোগীর বাড়ীতে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য আর ইনষ্টিটিউটে গিয়ে না কষ্ট পান্!

তরুণী যেন চেতনা পাইয়াছে, এমনি ভঙ্গীতে বলিল—খুব ভালো কথা বলেছেন! ফোন্ করে দেবো। নিরাপদে বাড়ী পৌঁছেচি ···তিনি যেন সোজা বাড়ী ফেরেন···ওদিকে আর না যান!

শচীন বলিল—গিয়ে সেখানে আপনাকে না পেলে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা হবে!

তরুণী বলিল,—নিশ্চয়!

শচীন বলিল—তাহলে এই ব্যবস্থাই করি।

পার্ক ষ্ট্রীট যেখানে সার্কুলার রোডে মিশিয়াছে, তার একটু এদিকে পেট্রোলের দোকান। দোকানের সামনে শচীন ট্যাক্সি দাঁড় করাইল। বলিল,—এখানে ফোন্ আছে, আমি জানি।

তরুণী বলিল,—দেখি।

তরুণী নামিল। হাতের ব্যাগ খুলিয়া পয়সা বাহির করিবে, শচীন বলিল—আমি দিচ্ছি ফোনের পয়সা।

—না—না—তা হয় না! সে কি! মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে তরুণী প্রতিবাদ তুলিল; তার পর হঠাৎ বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, এতখানি উপকার করছেন, এর উপর ফোনের তিন-আনা সাড়ে তিন-আনা পয়সা আমি দিয়ে আপনাকে ছোট করি কেন!

কথাটা শেষ করিয়া অধরে হাসির আলো ফুটাইয়া তরুণী লইল শচীনের হাত হইতে একটা সিকি; তার পর দোকানের ঘরে ঢুকিয়া ফোনের রিসিভার তুলিল।

শচীন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুণী ফোন্ করিল,—পী-কে নাইন-ফাইভ-ওয়ান···ইয়েস-ইয়েস-ইয়েস···ও···আচ্ছা···সোজা বাড়ীতে···হ্যাঁ···

ফোন করিয়া তরুণী আসিল বাহিরে; বলিল,——উনি বাড়ী চলে গেছেন। ফোন্ করতে গিয়ে ভেবেছিলুম···যদি থাকেন, আপনাকে বলবো রোগীর বাড়ীতে আমার গাড়ী আছে, সেইখানেই নামিয়ে দিয়ে যাবেন।···কিন্তু উনি আমাকে আনতে না গিয়ে চলে গেলেন যে! দশটার আগে চলে গেছেন!···এখন বারোটা!

তরুণীর মুখে উদ্বেগের মলিন ছায়া!

শচীন বলিল,—বাড়ী গেছেন?

শুষ্ক উদাস কণ্ঠে তরুণী বলিল,—হ্যাঁ।

শচীনের শিরায়-শিরায় রক্তস্রোত সহসা মন্থর হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ ফুটিল!

শচীন বলিল,—ইনষ্টিটিউটে না গিয়ে···

তরুণীর পানে চাহিয়া সে এ-কথা বলিল। ভাবিল, দুশ্চিন্তায় তরুণীর মূর্চ্ছা হইবে না তো? কিন্তু···

তরুণী বলিল—ভুলে বাড়ী চলে গেলেন?

তরুণীর ললাটে চিন্তার রেখা! কালো ভ্রূযুগে চিন্তার তরঙ্গ!

শচীনের মনে সংশয়ের মেঘোদয়···সে-মেঘ নিমেষে জমিয়া ঘন হইয়া উঠিল। ভুলিয়া বাড়ী গেছেন! স্বামী! মাতাল না কি?

তরুণীর মুখে আতঙ্কের ছায়া আরো নিবিড়!

শচীন বলিল—তাহলে?

তরুণী বলিল,—ওঁর শরীর আজ ভালো ছিল না···অসুখ বাড়লো কি?

তরুণীর কণ্ঠ কাঁপিল! তরুণী বলিল,—দয়া করে বাড়ীতেই তাহলে আমায় পৌঁছে দিন। আমার ভয় করছে। নিশ্চয় কোনো এ্যাকসিডেণ্ট···না হয় অসুখ বেড়েছে।

কথাটা বলিয়া তরুণী ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল, শচীনও নিঃশব্দে উঠিয়া পাশে বসিল।

গাড়ী ছুটিল পার্ক-সার্কাসের মধ্য দিয়া আমীর আলি এভেন্যু ধরিয়া দক্ষিণ দিকে।

হিন্দুস্থান রোড। তরুণী কহিল,—ঐ বাড়ী···তেতলা···ঐ বাঁ দিকে।

ফ্ল্যাট-বাড়ী। বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিল। তরুণী বলিল—আমি থাকি দোতলায়। কিন্তু সদরের দরজা খোলা দেখছি! আপনি চলে যাবেন না, একটু দাঁড়ান। যদি কোনো বিপদ ঘটে থাকে, আপনার সাহায্য দরকার হবে।

শচীন দাঁড়াইয়া রহিল···নীচে। দ্বার ঠেলিয়া তরুণী ভিতরে

ঢুকিল। একটু পরেই বাহিরে আসিয়া তরুণী ডাকিল শচীনকে··· কাছে আসিবার জন্য···হাতের ইঙ্গিতে।

শচীন পাশে আসিল, কহিল,—কি হয়েছে?

তরুণী বলিল—আপনি আসুন। আমার ভয় করছে। দরজা খোলা ছিল···চোর ঢুকেছে। দোতলায় উঠতে ছোট একটা ঘর। সে-ঘরে মানুষের পায়ের শব্দ পেলুম। বড্ড ভয় করছে···

শচীন বলিল,—চলুন···

নিঃশব্দ সতর্ক-পায়ে শচীন উঠিল দোতলায়···তরুণীর ইঙ্গিতে। সিঁড়ির উপরেই পাশে একটা ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া তরুণী কহিল—ঐ ঘর···

শচীন কহিল,—লাঠি আছে?

ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া অত্যন্ত ভীত কণ্ঠে তরুণী কহিল—চুপ!

হাত নাড়িয়া দাঁড়াইবার সঙ্কেত জানাইয়া তরুণী নিঃশব্দ-পায়ে দোতলার দালান হইতে একগাছা লাঠি আনিয়া দিল। তার পর বলিল—দোতলার ঘরগুলো আপনি দেখুন···তার আগে দাঁড়ান, আমি তেতলায় পালাই।

তেতলার সিঁড়িতে উঠিয়া তরুণী অদৃশ্য হইয়া গেল।

শচীন ঢুকিল দোতলার সেই ঘরে। ওদিককার ছোট খড়খড়ি খোলা। জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া ঘরে পড়িয়াছে। সে আলোয় শচীন দেখে, মেঝেয় বিছানা পাতা এবং বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে পূতনার মতো মূর্ত্তি এক দাসী।

শচীন ভাবিল, রহস্য না কি!

দোতলার দালানে আসিল। পাশাপাশি তিনখানা ঘর। বড় নয়। ঘরগুলার দ্বার খোলা। খোলা দ্বার দিয়া ঘরে ঢুকিল। প্রথম ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা আলমারী, একখানা খাট, খাটে বিছানা পাতা···বিছানা খালি। দু' নম্বর কামরায় ঢুকিল। এ ঘরে কতকগুলা ট্রাঙ্ক, একটা টেবিল, চারখানা চেয়ার; ওদিকে একটা আলনা···আলনায় ক'খানা শাড়ী, সেমিজ, পেটিকোট, দু'খানা ময়লা ধুতি, একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। তিন নম্বর কামরায় দেখে, একানে একখানা খাট···খাটে বিছানা পাতা···এক দিকে আলমারী··· একখানা কৌচ···মেঝেয় ছোট একখানা র‍্যাগ!···চোরের ছায়াও নাই!

শচীনের বিস্ময়ের সীমা নাই। কে এ তরুণী? কোথায় স্বামী? কোথায় বা আত্মীয়-স্বজন?

দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, তেতলায় যাইবে না কি?···জিজ্ঞাসা করিবে, একলা···বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যদি লোকের সাহায্য প্রয়োজন ছিল, সে-কথা সোজাসুজি খুলিয়া বলিলেই চলিত! তা নয়, এমন করিয়া···

দাঁড়াইয়া রহিল অনেকক্ষণ! তেতলার কোন্ ঘরে ঘড়ি ছিল, ঢং করিয়া একটা বাজিল। সঙ্গে-সঙ্গে আশপাশের অনেকগুলা বাড়ীর ঘড়িও ঢং করিয়া একটা বাজাইয়া সাড়া তুলিল।

শচীন ভাবিল, বেশ হইয়াছে! তরুণী দেখিয়া তার মনে যেমন খানিকটা মোহ জাগিয়াছিল, তেমনি···

ভাবিল, এই যে এত দিন এত লোক অন্ন আর আশ্রয়ের অভাবে পথে পড়িয়া আছে, তাদের কাহারো মুখ চাহিয়া এতটুকু দরদ জাগে নাই তো! দয়া করিয়া কাহাকেও তার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার কথা মনে উদয় হয় নাই! আর আজ নিশীথ-রাতে তরুণী দেখিয়া মায়া একেবারে উথলিয়া উঠিল! অত আতুর-অনাথিনী···পথে তাদেরো বিপদের আশঙ্কা এ-তরুণীর চেয়ে কম ছিল না!

চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তেতলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর কণ্ঠ! তরুণী বলিল—না, না, ও কি···চলে যাবেন না! এত-বড় উপকার করলেন, তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগ দিন আমায়!

কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া শচীন চাহিল তেতলার সিঁড়ির দিকে! দেখিল, তরুণী নামিয়া আসিতেছে···মুখে-চোখে হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি···হাতে চায়ের কেটলি।

শচীন যেন হাঁদা! তরুণী নামিয়া আসিল। বলিল,—আসুন··· বেশী কিছু নয়···শুধু এক পেয়ালা চা।

শচীন ভাবিল, স্বামীর এ্যাক্সিডেণ্ট, না, অসুখ···তার সংবাদ দিল না! সে-কথা ভুলিয়া গেছে না কি? রাগে মন তাতিয়া উঠিল।

বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—স্বামীর সন্ধান পেয়েছেন? না, তাঁর সন্ধান নেবার জন্য আমার সাহায্য দরকার হবে?

হাসিয়া তরুণী কহিল,—স্বামীর সন্ধান···তার মানে? কোথায় সন্ধান নেবো? কোন্ দেশে তিনি, জানি না তো!

—মানে?

উচ্চ হাস্য করিয়া তরুণী বলিল,—মানে, আমার বিয়ে হয়নি এখনো!

—তাহলে সে টেলিফোন?

হাসিয়া তরুণী কহিল,—সেটা স্রেফ ফাঁকি। ঘরে এসে বসুন। ভয় নেই···মনের গুঞ্জন-গান শোনাবো না···বসে শুধু এক পেয়ালা চা খাবেন। আমিও খাবো···আর সব কথা খুলে বলবো! এসে তাড়াতাড়ি উপর থেকে জল গরম করে আনলুম। ঠাকুরের কাজ এখনো চোকেনি।

তরুণীর ইঙ্গিতে বিমূঢ়ের মতো শচীন আসিয়া ঘরে বসিল। কেটলির মধ্যে চা ঢালিয়া তরুণী কহিল,—ব্যাপার শুনলে আপনি কক্ষনো রাগ করবেন না, এ আমি জোর করে বলতে পারি। মানে, রিলিফ-ওয়ার্কের জন্য আমাদের নারী-সমিতি থেকে একখানা বই বার করছি আমরা। সে-বইয়ের জন্য আমার উপর একটা গল্প লেখার ভার পড়েছে। তা গল্প চিরকাল পড়েই আসছি···লিখিনি কখনো। গল্পের জন্য প্লট কোথায় পাবো যে লিখবো! তাই যে-সব গল্প বেরুচ্ছে, সেই সব থেকে আকাশ-পাতাল ভেবে ঠিক করেছিলুম, একটা গল্প বানিয়ে কারো সাহায্যপ্রার্থী হয়ে যদি তাঁর গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফিরি···তার পর সেই সঙ্গে খানিকটা মন-গড়া ব্যাপার ঢুকিয়ে লিখতে পারবো না? তা পারলে বেশ নতুন-রকমের গল্প হবে। তাই···

শচীন ভাবিল, আশ্চর্য্য মেয়ে! কহিল,—কিন্তু আমার সঙ্গে যদি দেখা না হতো?

—একলা একখানা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চড়ে বাড়ী আসতুম! গল্পের প্লট পেতুম না।

শচীন কৌতুক বোধ করিল···মনের রাগ কোথায় মিলাইয়া

গেল! সে বলিল,—আর আমি যদি হতুম···ধরুন···যদি···মানে··· অর্থাৎ···হু···

যদি কি, কথাটা বাধিয়া যাইতেছিল।

তরুণী বুঝিল। কহিল.—কি? যদি দুশ্চরিত্র লোক হতেন?

শচীন কহিল,—হ্যাঁ।

তরুণী বলিল,—যুগ বদলে গেছে। এ যুদ্ধের যে ঢেউ আমাদের এখানে এসে লেগেছে, তাতে আমাদের মেয়েদের মন থেকে ভয় একেবারে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে!···পুরুষদের মধ্যেও অনেকের ভয় ভেঙ্গে গেছে আমাদের সম্বন্ধে! অনেকে বুঝেছেন, আমরাও পারি নিজেদের ভার বইতে! এত দিনকার পাঁচিলও এই সঙ্গে ভেঙ্গে গেছে···আমরা দেখছি চারি দিক আজ খোলা! ভয় করলেই ভয়! নাহলে মানে, মানুষকে এত দিন ভয় করে কেন যে বদ্ধ ঘরে বন্দী হয়ে বাস করেছি ভেবে আশ্চর্য্য হই!···তাছাড়া দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র লোক কি নেই? আছে। তাদের ভয় করি না। যে-সব লোক ভীরু কাপুরুষ, তারাই হয় দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্ত। আমরা যদি সাহস করে ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে চাই, তাহলে সে ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে সব দুর্বৃত্ত শায়েস্তা হয়।···ট্রামে-বাসে মানুষের সঙ্গে কত রকমের জানোয়ারও চলাফেরা করছে দেখি তো···তাদের মধ্যে কারা মানুষ, আর কারা জানোয়ার, তা আমরা দেখেই বুঝতে পারি! কিন্তু···না, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খান্।

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া আরো কথা হইল। শচীন শুনিল, তরুণী এবং তার বান্ধবীরা মিলিয়া নারী-সমিতি খুলিয়াছে··· সকলেই লেখাপড়া জানে···সকলে মিলিয়া সাহসের সাধনা করিতেছে। তরুণী বলিল, সময় যা পড়িয়াছে, অন্দরে দ্বার বন্ধ করিয়া মেয়েদের আর পড়িয়া থাকিলে চলিবে না···বাহিরে আসিতেই হইবে। বাহিরে দুঃশাসন-দুর্য্যোধন শকুনির দলকে শায়েস্তা করিয়া চলিতে হইবে। কি করিয়া···সে-বিদ্যাও সকলে জানে। তার উপর সঙ্গ এই দুর্গতদের সাহায্য···

সে-জন্য তারা যে-বই বাহির করিতেছে, জোর করিয়া সে-বই সকলকে গছাইয়া দিবে। বই গছাইয়া যে টাকা আদায় হইবে, তাহাতে যতখানি পারে দুর্গতদের দুর্গতি-মোচন করিবে!···এ বই বাহির হইবে সামনের বড়দিনে।

শচীন বলিল—আমার নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন দয়া করে। আপনাদের বই বেরুলে তার পাঁচখানা আমি নেবো।

তরুণী বলিল—বলুন আপনার নাম আর ঠিকানা।

তরুণী কাগজ আর ফাউণ্টেন্ পেন বাহির করিল।

শচীন বলিল,—লিখুন শচীন্দ্রলাল চ্যাটার্জ্জী···১২ নম্বর রাজারাম ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

তরুণীর ললাটে কুঞ্চিত রেখা! তরুণী বলিল—শচীন চ্যাটার্জ্জী? রাজারাম ষ্ট্রীট?

—হ্যাঁ।

তরুণী বলিল—বিজলীকে চেনেন? অভিলাষ রায়ের মেয়ে? রায় ষ্ট্রীটে থাকেন অভিলাষ বাবু!

শচীন বলিল—কেন বলুন তো?

হাসিয়া তরুণী বলিল,—বিজলীর সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা তো পাকা হয়ে আছে!

শচীন বলিল,—বিজলীকে আপনি চেনেন?

—চিনি না? বাঃ! সে হলো আমার মামাতো বোন। এ বাড়ীতে আছি আমি আর আমার ছোট ভাই হীরেন। হীরেন এম-এ পড়ছে···আর আমি দেবো বি-এ।

শচীন বলিল,—আপনার নাম?

তরুণী বলিল,—আমার নাম দীপ্তি।

—আপনিই দীপ্তি! বিজলী আপনার নামে পাগল! বাঃ! এখন লিখুন আপনার গল্প এই প্লট নিয়ে। চমৎকার হবে। এমন ডেভেলপমেণ্ট···আপনি কল্পনা করতেও পারতেন না!

দীপ্তি বলিল— যা বলেছেন! তবে গল্পে আমি একটু রঙ দেবো। লিখবো হীরোর···অর্থাৎ আপনার মনে বেশ একটু রঙের ছোপ্ লেগেছিল···জ্যোৎস্না রাত্রি···একাকিনী তরুণী···

শচীনের রগ-মাথা তাতিয়া উঠিল···কাণের ডগা লজ্জায় লাল! সে কোনো কথা বলিল না।

দীপ্তি বলিল—এতে লজ্জা কি! মিলটন সেকালে লিখে গেছেন, ম্যান্স ডিস্‌ওবিডিয়েন্স! একালের মিলটনরা লিখবেন ম্যান্স্ ফ্যাশিনেশন!

হাসিয়া শচীন বলিল— মাপ করবেন, তাহলে মনের অকপট সত্য কথাই বলি···আপনারা বাইরে এসে মিটিং করুন বা দুর্গতি-মোচনই করুন, ম্যান্‌কে যেদিন আপনারা ফ্যাশিনেট্ করতে পারবেন না, সেদিন হবে উমেন্যানের চরম দুর্ভাগ্য!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এ কি স্বপ্ন?

বঙ্গ-জননীর দ্বারে বৎসরান্তে এসেছে অঘ্রাণ
অঞ্জলি ভরিয়া তার আনিয়াছে স্বর্ণবর্ণ ধান

অফুরন্ত। ভাবিলাম উল্লসিত চিত্তে এইবার
ঘুচিল আমার কষ্ট, শূন্য জঠরেতে কিছু তার
পড়িবেই সুনিশ্চয়; হৈমন্তিক লক্ষ্মীর প্রসাদ
আমিও কিছুটা পাবো! একেবারে যাব নাকো বাদ।
অনাহার-শীর্ণ কর প্রসারি' রহিনু প্রত্যাশায়—
আনন্দ-আবেগে মোর চক্ষু দু'টি নিমীলিতপ্রায়।

কতক্ষণ কেটে গেল! চেয়ে দেখি সেই ধান্য হায়,
স্তূপে স্তূপে শোভিতেছে লক্ষ লক্ষ আড়তে-গোলায়।
মোর হস্ত শূন্য রিক্ত পূর্ব্ববৎ, শুধাইনু তারে—
হেমন্ত-লক্ষ্মীরে ডাকি, কোথায় মা? তুই যে আমারে
কিছু দিলি নাকো! এ কি, দেখি মোর সম্মুখেতে নাই
লক্ষ্মীর সে মূর্ত্তিখানি! শূন্য চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়াই।

মোহম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী

বাঙ্গালায় অন্নাভাব

"আপনাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার উৎপাদন-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হউন—নানারূপ খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করুন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার করুন; সবল হউন; পরিবর্দ্ধমান ঐক্যে অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করুন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তাহার সুফল লাভ করুন।"

দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালার অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়া কেন্দ্রী সরকারের অন্যতম সদস্য সার যোগেন্দ্র সিংহ ঢাকায় বেতার বক্তৃতায় বাঙ্গালীকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতি বাঙ্গালাকে প্রাচুর্য্যের উপকরণ প্রভূত পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ সেই উপকরণের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই—জীবনযাত্রা-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা কেন তাহার অধিবাসিগণের আহার যোগাইতে পারিবে না, এ প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। কেবল খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করিলেই হইবে না, পরন্তু ফল, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতিও উৎপন্ন করিতে হইবে।

সার যোগেন্দ্র সিংহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তিনি যে প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর বাঙ্গালার ইতিহাস—বিশেষ শাসন-পরিবর্ত্তন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ সে জন্য প্রয়োজন।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির জন্য বাঙ্গালীকেই দায়ী করা সঙ্গত হইবে না।

বাঙ্গালার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার বিবরণে বলা হইয়াছিল;—

"বৎসরের পর বৎসর জ্বর নীরবে তাহার (বিনাশ)-কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। মহামারী সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হয়—জ্বরে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। জ্বরে কেবল যে মৃত্যুহেতু লোকসংখ্যার হ্রাস হয়, তাহাই নহে; পরন্তু ইহা জীবিতদিগকে জীবন্মৃত করিয়া তাহাদিগের সামর্থ্য ও শক্তি ক্ষুণ্ণ করে এবং যেমন তাহার জীবনযাত্রার গতি বিশৃঙ্খল করে, তেমনই জাতির শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপই বাঙ্গালার দারিদ্র্যের ও অন্য নানা দুর্দ্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙ্গালীর উৎসাহের অভাবের কারণ সন্ধান করিলে ম্যালেরিয়া উপেক্ষা করা যায় না।"

বাঙ্গালার শাসক হইয়া আসিয়া লর্ড রোণাল্ডসে ম্যালেরিয়ার কারণ ও ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন, অনুসন্ধান-ফল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে ৪ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু কেবল মৃত্যু-সংখ্যা বিবেচনা করিলেই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার ফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না; কারণ, অন্ততঃ এক শত আক্রমণে একটি মৃত্যু ঘটে। সুতরাং বলা যায়, ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালায় লোক ২০ কোটি দিন রোগভোগ করে। ইহাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কি তাহা উপলব্ধি করা যায়।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন, ইহা প্রতিকারসাধ্য। ইটালীতে ইহার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব হয় নাই, ফরমোসায় ইহা আর লোকক্ষয় করিতে পারে না। যদি দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি "পতিত" না থাকে, ডোবায় জল পচিতে না পায়, মশকের দৌরাত্ম্য দূর হয়, লোক পর্য্যাপ্ত আহার পাইয়া সবল থাকে, তবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারিত হয়। বাঙ্গালায় সেই অবস্থাই ছিল—আজ আর নাই। ইহার জন্য বাঙ্গালীকে দায়ী করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

বাঙ্গালার যামিনী এখনও শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত, বাঙ্গালার দ্রুমদল এখনও ফুল্লকুসুমিত; কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচুর্য্যের উৎস আজ আর পূর্ব্ববৎ নাই—বাঙ্গালা আর সুজলা নহে। হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া নানা স্থানে খাল কাটিয়া গঙ্গার কল্যাণপ্রদ জল লইয়া ঊষরে উর্ব্বরতার সঞ্চার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালা যে বঞ্চিত হইয়াছে, সে দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই—এমন কি বাঙ্গালা নদীমাতৃক দেশ সুতরাং তথায় সেচের কোন প্রয়োজন নাই, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ধর্ম্মবিশ্বাসের মত করিয়া বাঙ্গালার বিদেশী শাসকগণ যে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাহার নদী-নালা পুষ্করিণী সবই নষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সার উইলিয়ম উইলকক্স মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলির অধিকাংশই খালরূপে খনিত হইয়া সেচের ও পানের জল প্রদান করিত এবং জলপথে মানুষের ও পণ্যের গতায়াতের সুবিধা করিয়া দিত। পঞ্জাবে খালের জলে মরুভূমি শস্যশ্যামল হইয়াছে—খালের জলে যে ১০ লক্ষ একর জমিতে ফশল ফলিতেছে তাহা—"উৎপাদক সেচকার্য্যে" অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় দশ বৎসরে বর্দ্ধিত রাজস্বে খালরক্ষার ব্যয় ও খালের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার সুদ আদায় হয়, সেই ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ। সেচের দ্বারা এই ভূমি শস্যপ্রসূ না হওয়া পর্য্যন্ত চারি সহস্র মাইল দীর্ঘ নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে লাভ হয় নাই—তাহাতে আবশ্যক পণ্য বাহিত হইত না। সুক্কুর সেচ ব্যবস্থায় সিন্ধু প্রদেশে সেচে সিক্ত জমি ২ শত ৮০ লক্ষ একর হইতে ৪ কোটি এক শতে পরিণত হইয়াছে। আর বাঙ্গালায় সেচের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ জন্য বাঙ্গালীকে দায়ী করা সঙ্গত নহে।

নদীর অবনতি ও সেই কারণে খালের অবনতির কারণ ঐরূপ। পুষ্করিণী ও বাঁধ সকল কেন সংস্কারাভাবে নষ্ট হইল ও হইতেছে? সে জন্য দেশের সম্পত্তি-বিভাগ-পদ্ধতি দায়ী। কিন্তু সে সকল যখন দেশের লোকের জন্য প্রয়োজন, তখন রাষ্ট্রের পক্ষে আইন করিয়া সে সকল গ্রামের লোকের জন্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। কোন পুষ্করিণী বা বাঁধ যখন আট বা দশ জনের সম্পত্তি হয়, তখন তাহার রক্ষা-কার্য্য উপেক্ষিত হওয়া অনিবার্য্য হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন বর্দ্ধিত হয়—হ্রাস পায় না। সেই জন্য সে সকল সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য দেখা দেয়। কিন্তু এ দেশে রাষ্ট্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহার সহিত দেশের লোকের যোগ কেবল শাসনে ও শোষণে। সেই জন্যই ঐ সকল রক্ষার দিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। এমন কি, জলযানবাহী জলপথেও যে স্থানে স্থানে বেড়া দিয়া—মৎস্য-সংগ্রহের জন্য—নদীপথের অনিষ্ট সাধন করা হয়, সে দিকও কেহ দৃষ্টি দেয় না! মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে "ডেভেলপমেণ্ট" ব্যবস্থার

কথা উঠিয়াছিল, তাহাতে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে যে আইনে সরকারের কোন স্বার্থ নাই, তাহা বিধিবদ্ধ হইলেও অধিকাংশ সময়ে "মৃত" বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। এ বিষয়েও তাহাই হইয়াছে।

এক দিকে সেচ-ব্যবস্থার অভাবে কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটিয়াছে, আর এক দিকে শিল্প-লোপহেতু কৃষি লোকের উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পলাশী যুদ্ধের অল্প দিন পরেও বাঙ্গালা কৃষিপ্রাণ ছিল না। তাহার মসলিন, রেশমী বস্ত্র, বর্ণবহুল কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি এশিয়ার ও য়ুরোপের নানা দেশে আদৃত ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর ভেরেলষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল পণ্য গুজরাটে, পঞ্জাবে (লাহোর), ইস্‌ফাজানে যাইত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেও ১৫ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সে ব্যবসা বিলুপ্ত! সার হেনরী কটন লিখিয়াছেন—যে সকল পরিবার পুরুষানুক্রমে সূতা প্রস্তুত করিয়া ও বস্ত্র বয়ন করিয়া সমৃদ্ধ ছিল, সে সকল দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়াছে; অনেকে শিল্পকেন্দ্র সহর ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছে। গ্রামে কৃষিই একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার লাভজনক দেশজ শিল্প নষ্ট হইয়াছে।

বয়নশিল্প, সূত্রশিল্প, রঞ্জনশিল্প, কাগজশিল্প—এ সবই জীবনী-শক্তিহীন হইয়াছে। সার জেমস কেয়ার্ড স্বীকার করিয়াছেন, ভারতে বৃটিশ শাসনে তন্তুবায় ও শিল্পীরা যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তত আর কেহ হয় নাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন-প্রসঙ্গে লর্ড রিপণ বলিয়াছিলেন:—

"ভারতবর্ষের অর্থনীতিক অবস্থার আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না যে, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। তাহাতে যেমন কৃষকেরও লাভ কম হয়, তেমনই পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায় এবং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।"

এই সঙ্গে বলা যায়, ইহাতে অজ্ঞতাও বর্দ্ধিত হয়। কারণ, পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা গিয়াছে, শিল্পীদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের তুলনায় অধিক।

দেশে যে সকল শিল্প অধিকাংশ লোকের জীবিকার্জ্জনের উপায় ছিল, সে সকলের উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা না করিয়া এ দেশের শাসন-ব্যবস্থা তাহাদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনের কারণ হইয়াছে। শিল্পীও কৃষক হইয়াছে। আর সেচের অভাবে যেমন অযত্নেও তেমনই কৃষিকার্য্যেও উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিয়াছে। সে জন্য আজ বাঙ্গালীকে দোষী করিলে তাহার প্রতি একান্তই অবিচার করা হইবে।

কৃষির অবনতি যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের কারণ, তাহা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বেণ্টলী প্রমাণ করিয়াছেন।

কৃষির উন্নতি সাধনেও সরকারের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য নহে।

"অধিক খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন কর"—আন্দোলনে বাঙ্গালায় কি পরিমাণ "পতিত" জমি "উঠিত" হইয়াছে? যে সকল স্থানে পাট চাষ বন্ধ করিয়া ধান্যের চাষ করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন অধিক হইলেও তাহা অর্থকরী কৃষির স্থান মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, পাট বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান অর্থাগমকরী কৃষি-কার্য্য—ইংরেজীতে যাহাকে "নগদ বা ক্যাশ ফসল" বলে তাহাই। যে জমি "পতিত" তাহা "পতিত" থাকিবার কারণ দূর না করিলে তাহাতে চাষ কখনই লাভজনক হইবে না—তাহাতে চাষ করিলেও তাহা আবার "পতিত" হইবে। সে জন্য সেচের সুব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহাই হয় নাই। এ বার দুর্ভিক্ষের সুযোগে সরকার দূরদৃষ্টি ও ইচ্ছা থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বাঙ্গালায় সেচ-ব্যবস্থার নানারূপ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা করেন নাই। দুর্ভিক্ষে লোক যাহাতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া না যায়—সমাজ-শৃঙ্খলা যাহাতে নষ্ট না হয়—লোক মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে জন্য জন-কল্যাণকর কায করাইয়া লোককে অন্নার্জ্জনের সুযোগ প্রদান যে সরকারের কর্ত্তব্য তাহা এ বার যেন কেহ মনেই করে নাই। যে অন্ধকারে মানুষ আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না—শাসক-গণের ও তাঁহাদিগের পরামর্শদাতা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যেন সেই অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে।

আমরা জানি, বিলাতে "অধিক খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদন কর" আন্দোলনে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বাঙ্গালায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু বাঙ্গালায় ব্যয়িত অর্থ যদি সুপ্রযুক্ত হইত, তাহা হইলেও লোক তাহার সুফল লক্ষ্য করিতে পারিত। তাহাই হয় নাই। আগ্রহের ও যোগ্যতার অভাব ব্যতীত ইহার আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়?

সার যোগেন্দ্র সিংহ যদি বাঙ্গালা সরকারকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যে প্ররোচিত করিতে পারেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, দেশের লোক তাহাদিগের কর্ত্তব্য সাগ্রহে পালন করিবে—কারণ, সেই কর্ত্তব্য তাহাদিগের স্বার্থসম্মত!

বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালার প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে না পারে, তবে তাহার যে সকল কারণ আছে, সে সকল প্রথমেই দূর করিতে হইবে।

বাঙ্গালা তাহার অধিবাসীদিগের আহার যোগাইতে পারে। কিন্তু সে জন্য তাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা কি তাহাকে প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবেন? লর্ড কার্জ্জন এ দেশে কৃষকের দারিদ্র্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে সমবায়-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা করিয়া বলিয়াছিলেন—সরকার লোকের জন্য তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিলেন, লোক তাহাদিগের কায করুক। কিন্তু ডেনমার্কে ও জার্ম্মাণীতে সমবায় প্রথায় দেশের লোকের—বিশেষ কৃষক সম্প্রদায়ের যে উন্নতি হইয়াছে, বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই। ইহার কারণ কি? সরকারের হস্তক্ষেপে—সরকারী কর্ম্ম-চারীদিগের ত্রুটিতে—সর্ব্বোপরি সরকারের শৈথিল্যে বাঙ্গালায় সম-বায় সমিতিগুলি ঋণের ভারে অসাফল্যের অতলে ডুবিতেছে। মহা-জনের দোষ ছিল—এখনও আছে; কিন্তু যাহারা মহাজন ছাড়িয়া সমবায় সমিতিতে গিয়াছিল, তাহারাই যে কেবল লোককে তাহা-দিগের দুর্দ্দশায় সেই কথা স্মরণ করাইতেছে:—

"চাষ-বাস ক'রে খেত আবদুল—
ছিল আবদুল ভাল;
জাহাজের খালাসী হয়ে আবদুল
দরিয়ায় ডুবে মল।"

তাহাই নহে; সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের শেষ সম্বলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সে জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা ত পরের কথা—সে জন্য দায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং তাহারা পেন্সন লইয়া যাইবার পরেও আবার—নানা অনির্দ্দেশ্য কারণে—সরকারী চাকরী করিতেছে।

সার যোগেন্দ্র সিংহ যদি বাঙ্গালায় রাষ্ট্রের ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিতেন, তবে কখনই ভুলিতে পারিতেন না, রাষ্ট্রের উপেক্ষায় বাঙ্গালায় আজ মৎস্যের অভাব; ফল বাহির হইতে আনিতে হয়—দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য; পক্ষীরও গবাদি পশুর মত দুর্দ্দশা। বাঙ্গালা নদীমাতৃক প্রদেশ—সমুদ্র ও সমুদ্রের খাঁড়ীতে যে মৎস্য সংগৃহীত হইতে পারে; খাঁড়ীতে, নদীতে, বাঁধে, পুষ্করিণীতে যে মৎস্যের চাষ হইতে পারে, তাহা কাহার দোষে হয় নাই? তিনি কি জানেন, বাঙ্গালা সরকার যখন ব্যয়বহুল শাসন-পদ্ধতির জন্য আয়ে ব্যয় সঙ্কুলানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে যে সকল বিভাগের বিলোপ সাধন করা হইয়াছে, মৎস্যের চাষ বিভাগ সে সকলের অন্যতম? বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালায় মাছের চাষ সম্বন্ধে কোন গবেষণা ও পরীক্ষা হয় নাই—মাছের চাষে সরকার কোনরূপ সাহায্য করেন নাই? অথচ ডাক্তার এসকক যথার্থই বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় মৎস্যের চাষে যাহা লাভ করা যায়, তাহা কল্পনাতীত—কিন্তু তাহা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত। মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে বড় পোনা সরকারী মৎস্যক্ষেত্র হইতে প্রদত্ত হয় তাহার সংখ্যা ২৫ কোটি—"ডিমের" ত কথাই নাই। তথায় সরকার নদীতে পোনা ছাড়িয়া দেন—লোক তাহার ফল সম্ভোগ করে। মৎস্য পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু মৎস্যের চাষে মাদ্রাজেও যাহা হইয়াছে বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই কেন? মৎস্য কেবল খাদ্যরূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে না; তাহা হইতে তৈল ও সারও পাওয়া যায়। মাছের চাষে বিলাতের আয় বার্ষিক ২৫ কোটি টাকা, জাপানের আয় ৫২ কোটি টাকা, ফ্রান্সের আয় ১২ কোটি টাকা, কানাডার আয় ১৬ কোটি টাকা।

আর যে বাঙ্গালায় ধান্যের ক্ষেত্রেও মাছের চাষ হইতে পারে, সেই বাঙ্গালায় মৎস্যের একান্ত অভাব!—

এ যেন সেই

"Water, water, everywhere
Not any drop to drink."

সার যোগেন্দ্র সিংহ পাখীর কথা বলিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, এ দেশে ডিম্বের জন্য বা মাংসের জন্য কুক্কুটের ও হংসের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হয় নাই। এ দেশের কোচিনে যে কুক্কুট আছে, তাহাই বিদেশীরা তাহাদিগের দেশে লইয়া যাইয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আহার্য্য দিয়া ও বাছাই করিয়া উন্নত শ্রেণীর করিয়াছে। আর যে কুক্কুট আজ বিদেশে "ব্রামা" নামে পরিচিত, তাহা এ দেশের চট্টগ্রামের কুক্কুট—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী স্থানে তাহার উদ্ভব বলিয়া তাহা ক্রমে "ব্রামায়" পরিণত হইয়াছে। চীনে কয়খানি করিয়া গ্রামের মধ্যে এক একটি ছোট কলে ডিম্বের সারাংশ শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করা হয় এবং তাহা প্রভূত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। সে জন্য অনেক চীনা পক্ষী পালন করে। এ দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালায় অন্ততঃ মুসলমানরা এই কার্য্য করিতে পারেন। কংগ্রেস যখন গঠনমূলক ও গ্রাম-সংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন হ্যালেট সার্কুলার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রী সরকার গ্রামসংস্কার ও গঠনমূলক কার্য্যের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের বাবদে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকায় বাঙ্গালায় বাঙ্গালী যে কোনরূপে উপকৃত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই।

বাঙ্গালায় দুগ্ধের জন্য যেমন কৃষিকার্য্যের জন্যও তেমনই গরুর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। নানা কারণে বাঙ্গালায় গোজাতির শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। সে বিষয়ে যে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, অবস্থা দেখিয়া তাহাও মনে হয় না। অথচ এ দেশে যে দুগ্ধের অভাব অত্যন্ত অধিক তাহা সরকার অস্বীকার করেন না। তাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে এ দেশে সৈনিকদিগের আহারের জন্য নিহত গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে করিবার কারণ আছে—দুগ্ধের অভাব যেমন কৃষিকার্য্যে অসুবিধাও তেমনই—এ কারণেও বর্দ্ধিত হইবে।

তাহার পরে ফলের কথা। যুক্তপ্রদেশের সরকার ফলের চাষ বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহাও হয় নাই। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়—মুর্শিদাবাদে শতাধিক জাতীয় আম্র, রামপালে অগ্নিশ্বর, দুগ্ধেশ্বর প্রভৃতি ও বৈদ্যবাটীতে উৎকৃষ্ট কদলী, নানা জিলায় আনারস ও পেঁপে যেরূপ ফলে, তাহাতে সেই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ফলের চাষ করিলে সহজেই সাফল্য লাভ করা যায়। তাহাতে যেমন নূতন ও লাভজনক ব্যবসার সৃষ্টি হয়, তেমনই আবার লোকের পক্ষে ফল সহজলভ্য হয়। কিন্তু ফলের চাষ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় সরকার কত উদাসীন তাহা রেলে ও ষ্টীমারে ফল প্রেরণের ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই ব্যবস্থায় পথেই প্রেরিত ফলের অনেকাংশ নষ্ট হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ফলের বর্দ্ধিত মূল্যে সেই ক্ষতি পূর্ণ করা হয়। কিরূপ ব্যবস্থায় ষ্টীমারে বিদেশ হইতে বিলাতে কদলী, আপেল, পেয়ারা, কমলা নেবু প্রভৃতি ফল আমদানী হইত তাহা যাঁহারা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ দেশে ফল আমদানীর দুরবস্থা দেখিলে ব্যথিত ও স্তম্ভিত হইবেন।

বাঙ্গালায় সহরের বাহির হইতে দুগ্ধ আমদানীর ব্যবস্থা যেমন মৎস্য আমদানীর ব্যবস্থাও তেমনই শোচনীয়—এমন কি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিতও নহে।

অথচ সরকারের বিভাগেরও অভাব নাই—বিভাগে ব্যয়েরও কার্পণ্য নাই।

সার যোগেন্দ্র সিংহ স্বয়ং পঞ্জাবে কৃষিকার্য্য করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং যে পদ্ধতিতে তাহা করিয়াছেন, তাহার সহিত বাঙ্গালার কৃষিকার্য্য তুলনা করিলেই কি তিনি বাঙ্গালার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিবেন না?

আমাদিগের বিশ্বাস, এ বার যুদ্ধের প্রয়োজনে যে অভিজ্ঞতা লব্ধ হইল, তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে আগ্রহ থাকিলে বাঙ্গালা সরকার যে সকল উপায় অবলম্বন করিবেন, সে সকলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবে।

বাঙ্গালার অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হয়। বাঙ্গালায় প্রথম ইংরেজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালায় শিল্প ও ব্যবসা বহু পরিমাণে বিদেশীর হস্তগত হইয়াছে। সেই জন্যও বাঙ্গালীকে তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করা প্রয়োজন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

মস্কৌ-সিদ্ধান্ত—

গত মাসাধিক কালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে।

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে ইডেন্-হাল্-মলোটভ বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। এই সিদ্ধান্তের সামরিক অংশ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, তাহা হয়ও নাই। তবে ইহা জানান হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের জন্য তিনটি শক্তির ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। মস্কৌয়ে স্থির হয় যে, তিনটি শক্তির সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে। ইটালী সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্যও কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আর, য়ুরোপে জার্ম্মাণী এবং প্রাচীতে জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয় সাধিত হইবার পূর্ব্বে অথবা তাহারা বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ পরিচালনের প্রতিশ্রুতিও মস্কৌয়ে দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত ঘোষণায় চীনও সম্মিলিত পক্ষের অন্য তিনটি শক্তির সহিত যোগদান করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, অত্যাচারী ফ্যাসিষ্ট নেতাদিগকে অত্যাচারিত দেশে প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে—ইহাও স্থির হইয়াছে।

মস্কৌ-সিদ্ধান্তে সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক বিজয় সুস্পষ্ট। ফ্যাসিজমের মূলোৎপাটিত হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর সহিত মধ্যপথে যাহাতে কোনরূপ মীমাংসা না হয়, তাহার জন্য সোভিয়েট রুশিয়া বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি চূর্ণ করা প্রয়োজন। জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি চূর্ণ হইলে তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে; ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও দিশাহারা হইবে। মস্কৌয়ে জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি চূর্ণ করিবার সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি সোভিয়েট রুশিয়া লাভ করিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মস্কৌয়ে এই সিদ্ধান্তও দৃঢ়তার সহিত ঘোষিত হইয়াছে যে, য়ুরোপ হইতে ফ্যাসিজমের পরিপূর্ণ উচ্ছেদই সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশ্য। ইটালী সম্পর্কিত ব্যবস্থায় এই ঘোষণার আন্তরিকতা কার্য্যতঃ প্রমাণিত হইয়াছে। অত্যাচারী ফ্যাসিষ্টদিগকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থায় মধ্যপথে জার্ম্মাণীর সহিত মীমাংসার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে। ইটালী সম্পর্কে মস্কৌ-সিদ্ধান্ত এই যে, যাহারা ফ্যাসিজমের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করিয়াছে, তাহারা শাসন-ব্যবস্থায় অথবা কোন গণ-প্রতিষ্ঠানে স্থান পাইবে না। স্বভাবতঃ ইটালী সম্পর্কিত ব্যবস্থাই অবশিষ্ট য়ুরোপের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আদর্শরূপে গৃহীত হইবে। জার্ম্মাণী ও তাহার অধিকৃত রাজ্যগুলিতে নাৎসীদিগের সহিত যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করে নাই, তাহারাই এই অঞ্চলের গণ-শক্তির প্রকৃত প্রতিনিধি। মস্কৌয়ে ইহাদিগকে শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থাই হইয়াছে। গণ-রাষ্ট্র রুশিয়া যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে এই গণ-শক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

মস্কৌয়ে মিঃ ইডেন্ ও মিঃ হাল্ পরোক্ষে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে রুশিয়ার যে সীমান্ত ছিল, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্ত যদি এই ভাবে পশ্চিম দিকে প্রসারিত থাকে, তাহা হইলে নাৎসী-ফ্যাসিষ্টদিগের পতনের পর সে-ই যে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, তাহা সুস্পষ্ট। বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রসঙ্গ মস্কৌয়ে উত্থাপন না করিয়া বৃটিশ ও মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব রুশিয়াকে এই ভাবে শক্তিশালী করিবার পরোক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফিন্ল্যাণ্ডের সঙ্গে এখনও আমেরিকার কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই; ল্যাট্ভিয়া ও এস্থোনিয়ার প্রাক্তন সরকারের দূত এখনও ওয়াশিংটনে মোতায়েন রহিয়াছেন; পোল্যাণ্ডের সরকার বৃটেনের আশ্রিত ও আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট। অথচ মস্কৌয়ে মিঃ কর্ডেল্ ও মিঃ ইডেন্ এই সকল রাষ্ট্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি লইতে চাহেন নাই।

এই ভাবে মস্কৌ-সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তথায় এক দিকে গণ-রাষ্ট্র রুশিয়াকে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অন্য দিকে সমগ্র য়ুরোপে প্রকৃত গণ-প্রতিনিধিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে, যুদ্ধোত্তর-কালে গণ-রাষ্ট্র রুশিয়ার প্রভাবাধীনে য়ুরোপে গণ-শক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে—ইহাই মস্কৌয়ের সিদ্ধান্ত।

তেহরাণ-সিদ্ধান্ত—

ডিসেম্বর মাসের প্রথমে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মিঃ চার্চ্চিল ও মার্শাল ষ্ট্যালিন ইরাণের রাজধানী তেহরাণে পাঁচ দিনব্যাপী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মস্কৌয়ে তিন জন পররাষ্ট্র-সচিব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে আরও রং ও পালিস লাগাইবার জন্যই তেহরাণে তিন জন রাষ্ট্রনায়কের এই প্রত্যক্ষ আলোচনা।

আলোচনান্তে তিন জন রাষ্ট্রনায়কের স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিচালনে এবং ভবিষ্যৎ শান্তির সময়ে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করিবেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ হইতে শত্রুর উদ্দেশ্যে প্রবল আঘাত করিবার জন্য সামরিক বিষয়েও পরিপূর্ণ সহযোগিতা চলিবে। এই লিপিতে সম্মিলিত পক্ষের আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট; তিন জন রাষ্ট্রনায়ক ঘোষণা করিয়াছেন—জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে জার্ম্মাণ সামরিক শক্তির বিনাশ কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

মস্কৌ-সম্মিলনীর পর তেহরাণ-সম্মিলনীতে জার্ম্মাণীর নিকট ইহা আরও সুস্পষ্ট হইল যে, সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক আদর্শের অনৈক্যে তাহার উপকৃত হইবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই।

কায়রোর সিদ্ধান্ত—

নভেম্বর মাসের শেষভাগে মিশরের রাজধানী কায়রোয় মার্শাল্ চিয়াং-কাই-সেক্ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রতীচ্য মিত্র প্রেসিডেণ্ট

রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিলের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনটি রাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমর-নায়কগণও প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধে সামরিক সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন।

কায়রো-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য—প্রাচ্য অঞ্চলে তিনটি শক্তির পরিপূর্ণ সামরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। এই সহযোগিতার অভাবে ইতঃপূর্ব্বে প্রাচ্য অঞ্চলে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। গত বৎসর চীনের অসম্মতিতেই টোকিওয় বোমা বর্ষিত হইয়াছিল; মার্কিণী সেনাপতিরা চীনের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া এই অদূরদর্শী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে জাপানের পাল্টা বিমান আক্রমণে কিনহোয়া বিমান-ঘাঁটীর দুষ্পূরণীয় ক্ষতি হয়। চীনের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী এই কিনহোয়া। এখানে ভূনিম্নে যে বিশাল বিমানঘাঁটী নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। জাপানে প্রত্যক্ষ আক্রমণ-পরিচালন সম্পর্কে এই বিমানঘাঁটীর গুরুত্ব অসাধারণ। মার্কিণ সেনাপতিদের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে এই বিমানঘাঁটী নির্ম্মাণে বিশেষ বাধা পড়িয়াছে। তাহার পর, গত বৎসর ফিল্ড মার্শাল (লর্ড) ওয়াভেল আরাকানে যে ব্যর্থ আক্রমণ-পরিচালন করেন, সে সম্পর্কেও চীনা সমর-নায়কদের সম্মতি ছিল না; তাঁহারা এইরূপ খণ্ড-আক্রমণ পরিচালনের বিরোধী ছিলেন।

কায়রো হইতে তিনটি শক্তি ঘোষণা করিয়াছেন—গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাপান যে সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছে, তাহাতে সে বঞ্চিত হইবে। এমন কি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত ফরমোসা হইতেও জাপান বহিষ্কৃত হইবে। কোরিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

এই ঘোষণা শ্রবণে প্রথমেই মনে হয়, হংকংএ প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বাসনা বৃটিশ সরকার এখনও ত্যাগ করেন নাই। অথচ এই হংকংএ বৃটিশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অহিফেন-যুদ্ধের কলঙ্কে লিপ্ত। সম্মিলিত পক্ষের এই ঘোষণা সম্পর্কে পরবর্ত্তী বক্তব্য—জাপানের নবাধিকৃত রাজ্যগুলি তাহার কবল হইতে মুক্ত হইবার পর কি দশা লাভ করিবে, তাহা এই ঘোষণায় স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এ বিষয়ে নীরবতায় এইরূপ ধারণা সৃষ্ট হইতে পারে যে, প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিয়া তথায় প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় কায়রো-সম্মিলন—

তেহরাণ হইতে ফিরিবার পথে মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পুনরায় কায়রোয় তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট ইনেউমু ও অন্যান্য তুর্কি রাজনীতিকদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই আলোচনা শেষ হইবার পর প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন বিষয়ে তুর্কি রাজনীতিকরা ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদের সহিত একমত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি পাঠে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, তুরস্ক অদূর ভবিষ্যতে সম্মিলিত পক্ষের সহিত সামরিক সহযোগিতা করিবে।

তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মেনেমেনজগুলু বলিয়াছেন যে, কায়রো-সম্মিলনীর পরও তুরস্কের পররাষ্ট্র-নীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; অর্থাৎ সে এখনও নিরপেক্ষ। বস্তুতঃ, তুরস্কের নিরপেক্ষতা ত্যাগের সময় এখনও আসে নাই। বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণীর বিপুল সমরায়োজন রহিয়াছে; ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতেও সে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তুর্কি রাজ্য এখনও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত। কাজেই, তুরস্ক এখন যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর প্রথম আঘাত তাহাকে সহিতেই হইবে। আর এই আঘাত করিবার শক্তি জার্ম্মাণীর এখনও লোপ পায় নাই।

তবে, তুরস্কের পক্ষে এখন সম্মিলিত পক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা স্বাভাবিক। যুদ্ধের গতি এখন নিঃসন্দেহে সম্মিলিত পক্ষের অনুকূল। কাজেই যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় তুরস্ক যাহাতে ন্যায়সঙ্গত দাবীতে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য এখন হইতেই তাহার প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তুরস্ককে যুদ্ধে লিপ্ত না করাইয়া তাহার নিষ্ক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন সম্মিলিত পক্ষের এখনও আছে। অদূর ভবিষ্যতে বল্কান্ আক্রমণের জন্য রুশিয়ার কৃষ্ণসাগরস্থিত নৌ-বাহিনীর দার্দানেলিজ অতিক্রমণের প্রয়োজন হইবে। এই বিষয়ে তুরস্কের অনুমতি প্রয়োজন। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার স্যালোনিকা আক্রমণ-কালেও তুরস্কের নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হইতে পারে। কায়রোয় এই সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক তুরস্ক আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু জার্ম্মাণীর পক্ষে এখন নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি করা সঙ্গত নহে। তাহার রণ-নীতি এখন প্রতিরোধ-মূলক; কাজেই তুরস্ক আক্রমণ করিয়া সম্মিলিত পক্ষের মধ্য-প্রাচীস্থিত সেনাবাহিনীর সহিত সে ইচ্ছা করিয়া সঙ্ঘর্ষ বাধাইবে কেন? তুরস্কের দিক্ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী যদি এই নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষ তাহাতে উপকৃত হইবে। ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; মধ্য-প্রাচীতে তাহাদের সমরায়োজন অল্প নয়। তুরস্ক যুদ্ধে লিপ্ত হইলে এই শক্তি লইয়া জার্ম্মাণীর সহিত প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ তাহারা লাভ করিবে।

রুশ-রণাঙ্গন—

শরৎ কালের অবসানে এবং শীতের প্রারম্ভে রুশ-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণের প্রাবল্য বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণী এই সময় প্রাণপণ শক্তিতে প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের শেষ প্রতিরোধ-ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণ সেনার প্রবল প্রতি-আক্রমণে সোভিয়েট বাহিনী কিয়েভের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিটোমীরে এবং উত্তর-পশ্চিমে কোরোষ্টেনে অধিক সময় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে নাই। তবে সম্প্রতি রুশ সেনার আক্রমণের প্রাবল্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; নীপার বাঁকের মধ্যে জ্যামেঙ্কা অধিকার করিয়া তাহারা ঐ অঞ্চলের নাৎসী সেনাবাহিনীকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। হোয়াইট রুশিয়াতেও মিনস্ক লক্ষ্য করিয়া তাহাদের আক্রমণ চলিতেছে। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেল-সংযোগ ঝলোবীন এবং তাহার উত্তরে রোগাচেভের নিকটে সোভিয়েট বাহিনী উপনীত হইয়াছে। ঝলোবীন অধিকৃত হইলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে মিনস্ক অভিমুখে রুশ সেনার পথ উন্মুক্ত হইবে। মিনস্কের উত্তর-পূর্ব্বে ওর্শার উপকণ্ঠেও রুশ সেনা পৌঁছিয়াছে। ঝলোবীন ও ওর্শা অধিকারের পর মিনস্ক

অভিমুখে বিশাল সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত হওয়া সম্ভব। ক্রিমিয়াতে রুশ সেনা কার্চ্চ নগরের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছিল ; তাহার পর তাহাদিগের আর কোন সাফল্যের কথা শ্রুত হয় নাই। জার্ম্মাণ-সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, রুশ-বাহিনী উত্তর দিক্ হইতেও ক্রিমিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইটালীয় রণক্ষেত্র—

ইটালীতে জেনারল মণ্টগোমারীর সেনাবাহিনী সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহারা সাংরো নদী এবং তাহারই ১০ মাইল উত্তরে মোরো নদী অতিক্রম করিয়াছে। জেনারল মণ্টগোমারীর দাবী—তাঁহার সৈন্য জার্ম্মাণীর শীতকালীন প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। পশ্চিম দিকে জেনারল মার্ক ক্লাকের সেনাবাহিনীও এই সময় সামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। তবে, এই সাফল্যের গুরুত্ব অধিক নহে।

ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ—

নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে জার্ম্মাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইটালী আত্মসমর্পণ করার পরই জার্ম্মাণী ডোডেকেনীজ দ্বীপমালার রোড্‌স্ ও কস্ অধিকার করে। তাহার পর, বৃটিশ সেনা লেরস্ এবং আরও দুই একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করে। ডোডেকেনীজের উত্তরে স্যামস্‌ও ইংরেজ সেনার অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণী এখন লেরস্, স্যামস্ এবং ঈজিয়ানের অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর এই সাফল্যের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

ঈজিয়ান্ সাগরের এই দ্বীপগুলি দার্দ্দানেলিজের চাবি-কাঠি ; গ্রীসে ও ক্রীটে আক্রমণ পরিচালনের পক্ষে উহারা গুরুত্বপূর্ণ পাদভূমি।

কলিকাতায় বোমা বর্ষণ—

গত ৫ই ডিসেম্বর সুদীর্ঘ এগার মাস পরে কলিকাতা অঞ্চলে পুনরায় বোমা বর্ষিত হইয়াছে। গত শীতকালের বিমান-আক্রমণ অপেক্ষা এই আক্রমণের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক ; লোকক্ষয়ের পরিমাণও বেশী। জাপানের আক্রমণ-শক্তি চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আত্মতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভুল এখন ভাঙ্গিয়াছে এবং কলিকাতার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যে অভেদ্য নহে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এবার প্রকাশ্য দিবালোকে জাপান তাহার বিধ্বংসী আক্রমণ চালাইয়াছিল।

অবশ্য জাপানের এই বিমান-আক্রমণ তাহার ভারত অভিযানের নিশ্চিত দ্যোতক নয়। সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের আয়োজন ব্যর্থ করিবার জন্যও পূর্ব্ব-ভারতের সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন স্থানগুলিতে আক্রমণ পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা জাপানের আছে। যত দিন বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মদেশ হইতে জাপান বিতাড়িত না হইবে, তত দিন কলিকাতা ও পূর্ব্ব-ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চলে বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে। এখন মধ্যে মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে শত্রুর বিমান-আক্রমণ চলিবে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ভারতবর্ষে জাপানের অভিযান চলিবার সম্ভাবনাই যে আর নাই, তাহা মনে করা উচিত নয়। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সদস্য সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রধান সেনাপতি জেনারল অচিন্‌লেকের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জাপান সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতায় একটি ভারতীয় বাহিনী গঠন করিয়াছে। এই ভারতীয় বাহিনীকে কৌশলে পূর্ব্ব-ভারতে প্রবেশ করাইয়া ঐ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টির জন্য জাপান প্রয়াসী হইতে পারে। তাহার এই প্রয়াস যদি সফল হয়, তাহা হইলে তখন জাপানের প্রকৃত অভিযান আরম্ভ হইতে পারে। পূর্ব্ব-ভারতে সুভাষচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করাইবার আশা হয় ত জাপান পোষণ করে। অধিকৃত অঞ্চলে এক জন তাঁবেদারকে প্রতিষ্ঠিত করা অক্ষশক্তির রণনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। অবশ্য জাপানের পক্ষে সমগ্র ভারত অধিকারের দুরাশা পোষণ না করাই সম্ভব। তবে ব্রহ্মের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী রণক্ষেত্র বাঙ্গালায় ও আসামে ঠেলিয়া আনিতে সচেষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে খুবই সম্ভব। ইহা তাহার প্রতিরোধমূলক যুদ্ধেরই অঙ্গ হইবে। বিশেষতঃ, ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা ভারত আক্রমণের সুবিধা সে লাভ করিয়াছে, ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের এক জন প্রাক্তন সভাপতিও তাহার তাঁবেদাররূপে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এ সুযোগ টোজো-কোম্পানী হয় ত ত্যাগ করিবেন না।

সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান-প্রচেষ্টা সম্পর্কে গত কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে যে অনুমান প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এখন ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিত বলা যায়—এই বৎসরও ব্রহ্ম-অভিযানের চেষ্টা মুলতুবী রহিল। মার্চ্চ মাসের পরে বর্ষার জন্য ব্রহ্মে আর যুদ্ধ চলে না। কাজেই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শীতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-অভিযান পরিকল্পনার কাগজপত্র লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দপ্তরজাত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য-রণাঙ্গন—

সম্প্রতি মার্কিনী সেনাবাহিনী গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে ক্যারোলিন্, মার্শাল্ প্রভৃতি জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের ঠিক পার্শ্বেই গিলবার্ট অবস্থিত। এই ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের সাহায্যেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। এই ঘাঁটী হইতেই সে অতর্কিতে পার্ল-হারবার আক্রমণ করিয়াছিল ; দক্ষিণে নিউ গিনিতে তাহার আক্রমণের জন্যও এই ঘাঁটী ব্যবহৃত হয় ; এখান হইতেই ফিলিপাইনে প্রবল আঘাত পড়ে। গত মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবার এবং সম্মিলিত পক্ষকে কিছু সাহায্যদানের মূল্যস্বরূপ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশিতে এই অধিকার লাভ করে।

গিলবার্ট অধিকার করিয়া মার্কিনী সেনা জাপানের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে ইহাকে সম্মিলিত পক্ষের প্রকৃত আক্রমণাত্মক তৎপরতা বলা যায়। ইতঃপূর্ব্বে নিউ গিনি ও সলোমন্‌সে তাহাদের প্রতিরোধমূলক তৎপরতাই চলিয়াছিল। মার্কিনী সমর-সচিব কর্ণেল নক্স গিলবার্ট আক্রমণের দুইটি প্রত্যক্ষ কারণের কথা বলিয়াছেন—(১) ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপানকে বিতাড়ন ; (২) দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনী সরবরাহ-সূত্র কয়েক শত মাইল সংক্ষেপ করা।

১২।১২।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার আলোচনায় অনেক নিন্দাজনক ব্যবস্থার পরিচয় প্রকট হইয়াছে। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাক্তার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আবদুল হালিম গজনভী ব্যবস্থা পরিষদে ও ডাক্তার শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু রাষ্ট্রীয় পরিষদে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই খাদ্য-সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার ফল নহে—মানুষের সৃষ্ট। এই যে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, ইহার জন্য ভারত-সচিব আমেরী প্রাকৃতিক উপদ্রবকে ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য সার সুলতান আমেদ যুদ্ধকে দায়ী করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মিষ্টার আমেরী প্রথমে বাঙ্গালায় মৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়া পরে—প্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন, আর সার সুলতান আমেদ জাপানকে "চাউল চোর" আখ্যা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকে যেমন বাঙ্গালায় চাউলের অভাবের জন্য দায়ী করা যায় না—তেমনই ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়াও সেই দুর্গতির প্রধান কারণ বলা যায় না। প্রকৃত কারণ—অমনোযোগ, অব্যবস্থা, অযোগ্যতা।

ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবল বাঙ্গালা সরকারই যে পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালার দুর্গতদিগের জন্য ক্রীত খাদ্য-শস্যে ও খাদ্য-দ্রব্যে প্রভূত লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু ভারত সরকারও লাভ করিতে বিরত হয়েন নাই। কেন্দ্রী সরকারের অর্থ-সদস্য বলিয়াছিলেন, কেন্দ্রী সরকার লাভ করেন নাই—লাভ করিয়াছেন, প্রমাণ হইলে এক টাকায় দশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। ভারত সরকারের লাভ প্রতিপন্ন হওয়ায় পঞ্জাবের সচিব সর্দ্দার বলদেও সিংহ বলিয়াছেন—অর্থ-সদস্য সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন কি?

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সরকার পক্ষ হইতেই স্বীকার করা হইয়াছে—লোক আস্থা হারাইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের ব্যবহারে লোক আস্থা হারাইয়াছে, তাহা বলা না হইলেও কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যখন বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব, তখন 'অভাব নাই' বলিয়া লোককে প্রতারিত করা, দুর্গতদিগের জন্য খাদ্য-দ্রব্য ক্রয়ে লাভ করা, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে পঙ্গপালের দলের মত চাকরীয়া লইয়া অর্থব্যয়—এ সকলের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আবার কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সরকারের মনোনীত সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে কোন সরকারের পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক। তিনি বলিয়াছেন:—

নিখিল ভারত মহিলা কন্‌ফারেন্সের কলিকাতা শাখার সাহায্য-দান কেন্দ্রের জন্য মধ্যপ্রদেশ হইতে এক মালগাড়ী বোঝাই সরু চাউল প্রেরিত হইয়াছিল। গত ২০শে নভেম্বর প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা রেলভাড়া দিয়া (এই চাউল দান এবং সেই জন্য ইহার ভাড়া সরকারের প্রদান করিবার কথা) চাউল আনিবার জন্য লরী প্রেরণ করেন। সে দিন ডিরেকটারের দর্শন পাওয়া যায় নাই। দিনের পর দিন ঘুরিয়া ৪ঠা নভেম্বর জানা যায়, চাউল শালিমার হইতে বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের (এজেন্টের) গুদামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ৮ই নভেম্বর তারিখে জানা যায় ভাড়া বাবদে প্রায় ৩ গুণ ভাড়া দাবী করা হয়। ৯ই নভেম্বর নগ টাকা লইতে অস্বীকার করা হয়। ১১ই নভেম্বর রামকৃষ্ণপুরে এজেন্ট এম, কে, আকবরের গুদামে যাইয়া মাল পাওয়া যায় বটে কিন্তু তখন সরু চাউল মোটা হইয়া গিয়াছে? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুদামের লোক এক পত্র দেখান—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ সরু চাউলের পরিবর্ত্তে মোটা চাউল দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এই সকল অভিযোগ এতই লজ্জাজনক যে, এই সকলের তদন্ত ও তদন্তে সকল অভিযোগ প্রতিপন্ন হইলে যাহারা দায়ী, তাহাদিগের সকলকে এমন দণ্ড প্রদান করা সঙ্গত যে, ভবিষ্যতে আর কেহ ঐরূপ অনাচার করিতে সাহস না করে।

কিন্তু এ বিষয়ে যে কোন তদন্ত হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গালার লোক জানিতে পারে নাই। যে চাউল বাঙ্গালার নিরন্নদিগকে অন্নদান জন্য দয়াদত্ত দান হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কেন শালিমার হইতে রামকৃষ্ণপুরে সরাইয়া ব্যয় (তথা এজেন্টের কমিশন?) বাড়ান হইল, কেন রেল ভাড়ার টাকার অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা লওয়া হইল, কেন চাউল দিতে কয় দিন বিলম্ব করিয়া সাহায্যদান কার্য্যে বাধা দেওয়া (এবং হয় ত সরু চাউল মোটা করিবার সুযোগও দেওয়া) হইল—এ সকল বিষয় কি ব্যক্ত করা হইবে? সর্ব্বোপরি কথা—এ কথা কি সত্য যে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ সরু চাউল লইয়া মোটা চাউল দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন?

বাঙ্গালায় যে সকল অধিবাসী অনাহারে মরে নাই, তাহাদিগের খাদ্য-সমস্যার সমাধান প্রকৃতির কৃপায় হইতেছিল—আমন ধান্যে প্রচুর ফলন হইয়াছে। কিন্তু এখনই সরকার কি করিবেন সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট কথা না বলায় এবং মধ্যে মধ্যে চাউল কিনিবার কথা বলায় লোকের যেটুকু আস্থার উদ্ভব হইতেছিল, তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

কলিকাতার ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের ভার কেন্দ্রী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন—সে বিষয়ে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ শোভার্থ মাত্র। আবার কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালার খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ৩ জন সামরিক কর্ম্মচারীকে দিয়া বাঙ্গালা সরকারের ক্ষমতা আরও সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই অবস্থায় আবার যেন দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয় এবং বাঙ্গালার লোক আবার অনাহারে মৃত্যুমুখগামী না হয়।

ক্যাম্পবেল স্কুল

ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট মিটাইতে না পারিয়া সরকার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ক্যাম্পবেল স্কুল বন্ধ করিলেন। যখন ঔষধ, সাবু প্রভৃতি পথ্য, এমন কি মিছরীও দুষ্প্রাপ্য তখন ডাক্তাররা কি লইয়া চিকিৎসা করিবেন? সুতরাং ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

শিক্ষায় সাফল্য

কাশিমবাজারের রাজা শ্রীযুত কমলারঞ্জন রায়ের কন্যা কুমারী দেবিকা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সসম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। দেবিকার

রাজকুমারী দেবিকা দেবী

বয়স মাত্র ১০ বৎসর। বিখ্যাত বাদক আঁখেলাল তাঁহার সেতার বাদ্যে "সঙ্গত" করিয়াছিলেন।

কুমারী বাণী ঘোষ এ বার মাত্র ১৪ বৎসর ৭ মাস বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ১০ বৎসর

কুমারী বাণী ঘোষ

৭ মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইনি ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন জে, এন, ঘোষের কন্যা।

ভারত-সচিবের উক্তি

বিলাতে ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরীকে কিছু বিব্রত হইতে হইতেছে—নানারূপ প্রশ্নে তাঁহার কাজের অপ্রীতিকর স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে :—

(১) তিনি বলিয়াছেন, পাইকারী জরিমানার হিসাব তিনি ৩১শে আগষ্টের পর আর পায়েন নাই। বোধ হয়, তিনি ভারতে রাজকর্মচারীদিগের অর্থাৎ নায়েব গোমস্তার উপর ভার দিয়া মনে করিয়াছেন, বিলাতের লোক ভারতের তুচ্ছ কথা জানিতে চাহিবে না। সে যাহাই হউক, ১ হাজার ৫ শত ৫৬ ক্ষেত্রে পাইকারী জরিমানার আদেশ হইয়াছে এবং গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে সাড়ে ৭৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। এত দিনে অবশ্য ১০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়া এক কোটি টাকা পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কে বলে ভারত দরিদ্র—স্বর্ণপ্রসূ নহে? বাঙ্গালায় দুর্গতদিগের জন্য খাদ্য ক্রয়ে লাভ অধিক হইয়াছে—না—পাইকারী জরিমানার পরিমাণ অধিক?

(২) জাহাজে মাল পাঠাইবার সুবিধা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে এক জাহাজ হুইস্কী মদ পাঠান হইয়াছে; কিন্তু যে কুইনাইনের অভাবে হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, সে কুইনাইন পাঠান হয় নাই। মিষ্টার আমেরী যেমন অসত্য কথা বলিয়াছিলেন—অনাহারে বাঙ্গালায় সপ্তাহে এক হাজার লোক মরিতেছে—তেমনই বলিয়াছেন, কুইনাইন ভারতে উৎপন্ন হয় এবং ভারতে কুইনাইনের অভাব নাই। অথচ বৎসরে এ দেশে বিদেশ হইতে ৩০ লক্ষ টাকার কুইনাইন আমদানী না করিলে প্রয়োজন পূর্ণ হয় না।

সম্প্রতি বিলাতে বার্ম্মিংহামে সভায় তাঁহাকে শ্রোতারা যে ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া পলাইতে ও পুলিশ ডাকিয়া সভাভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

বল-প্রয়োগ

যে সকল দুর্গত অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিয়া ভিক্ষা করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছিল, বাঙ্গালা সরকার সহসা তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে দূর করিতে উৎসাহী হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য "মৃদু" বলপ্রয়োগের অধিকারও তাঁহাদিগের আছে। কিন্তু যে বল প্রযুক্ত হয়, তাহা যে সর্ব্বত্র মৃদু নহে—বিশেষ স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে হস্তক্ষেপ যে কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না—তাহা বলিলেও সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ডাক্তার মুঞ্জে ঐ কার্য্যে যে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রে বিবৃত করিলে সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কর্ম্মচারীটি নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কেন তাহা হয়? আর দুর্গতদিগকে কলিকাতা হইতে বাহিরে যে সকল "আশ্রয়ে" পাঠান হয়, সে সকলের কোন কোনটি যে আশ্রয়ই নহে, তাহা মেজর পি, বর্দ্ধন—ডোমজুড়ের আশ্রয়ের বর্ণনায় দেখাইয়াছেন।

কলিকাতায় বোমা

প্রায় একাদশ মাস পরে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ আবার কতকগুলি জাপানী বিমান কলিকাতায় ও সহরতলীতে বোমা ফেলিয়া গিয়াছে। এবার বৈশিষ্ট্য—দিবালোকেই (বেলা ১১টা ২৭ মিনিটে) জাপানী বিমানগুলি কলিকাতায় উপনীত হয় এবং বোমা বর্ষণ করে।

হিন্দু সম্মিলন

গত ৫ই অগ্রহায়ণ নৈহাটীতে হিন্দু সম্মিলনে সভাপতিরূপে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি গঠন-মূলক কার্য্যের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা দেশবাসীকে গঠন-মূলক কার্য্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

সার জন হার্ব্বার্ট

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট অসুস্থ হইয়া ছুটী লইয়াছিলেন ও পরে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে নাই। গত ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শব বারাকপুরে লাটপ্রাসাদের সংলগ্ন স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

গত ২০শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা ভবানীপুরে তাঁহার বাসভবনে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনারায়ণ ইংরেজী সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্ম যেমন শিক্ষকতার জন্ম তেমনই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী না করিয়া আপনার মনোভাবের পরিচয় প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে দারুণ বেদনার কারণ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

ভবানী দেবী

হুগলীর প্রাক্তন উকীল-সরকার শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ভবানী দেবী পরিণত বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তিনি লোকের হিতসাধনে ও ধর্ম্মার্চ্চনায় কাল অতিবাহিত করিতেন। তিনি ৪টি সন্তানকে ও পুত্রবধূ ইন্দিরা দেবীকে অকালে হারাইয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের বিধানে অবিচলিত আস্থাহেতু শোকে কাতর হয়েন নাই। আমরা তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও দৌহিত্র জাষ্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানী দেবী

জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ মধুপুরে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ ৬৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি মার্কিণে ও বিলাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "ভিষগ-ভারতী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতায় প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও এটর্নী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭১ বৎসর বয়সে চন্দননগরে পরলোকগত হইয়াছেন। খগেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্র মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'রবীন্দ্র-কথা' তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক।

সুরাজমোহিনী দেবী

গত ৮ই অগ্রহায়ণ প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী সুরাজমোহিনী দেবী ৮১ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ?" —রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

ভাব

২

ভাবের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ স্বয়ং করিবার পর মহর্ষি এ বিষয়ে প্রাক্তন আচার্য্যগণের মতও সংগ্রহ-শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—

বিভাব-সমূহ-দ্বারা আহৃত যে অর্থ—অনুভাব-সমূহ-দ্বারা বোধগম্য হয় (বাচিক-আঙ্গিক-সাত্ত্বিক-অভিনয়াত্মক অনুভাব-দ্বারা ভাবিত হইয়া থাকে), তাহাকেই 'ভাব'-সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়া থাকে (১)।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বিভাব হইতেছে বিষয় (অর্থাৎ উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব—উহাই হেতু-স্বরূপ)। এই বিভাব-দ্বারা 'আহৃত' (অর্থাৎ নিষ্পাদিত)। অতএব, বিভাবাপেক্ষায় ইহা ভাবিত (অর্থাৎ কৃত উৎপাদিত) হইয়া থাকে। এক কথায় বিভাব—কারণ, ভাব-কার্য্য (২)।

এই কারিকা হইতে অনুভাবগুলিরও নিরূপণ করা হইয়াছে। অভিনবের মতে বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ই অনুভাব। এ প্রসঙ্গে তিনি মতান্তর উদ্ধৃত করিয়া বহু বিচার করিয়াছেন (৩)। অপর কাহারও কাহারও মতে—'বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়' পদটিতে বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে—বাগঙ্গসত্ত্বাদির অভিনয় যাহাতে বিদ্যমান। এরূপ অর্থ করিলে অভিনয়-সহিত ব্যভিচারি-ভাবগুলিও সংগৃহীত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে কারিকাটির শেষার্দ্ধের অর্থ দাঁড়ায়—স্বাভিনয়যুক্ত ব্যভিচারি-ভাব-সমূহ-দ্বারা যাহা ভাবিত (অর্থাৎ মিশ্রিত) হয়—তাহাই ভাব। ইহার ফলে ব্যভিচারি-ভাবগুলিরও ব্যভিচারি-ভাব সম্ভব হয়। যথা—নির্ব্বেদ একটি ব্যভিচারি-ভাব ; উহার আবার ব্যভিচারি-ভাব চিন্তা। শ্রম স্বয়ং ব্যভিচারী ; উহার ব্যভিচারী নির্ব্বেদ, ইত্যাদি। ব্যভিচারি-ভাবের যদি আবার ব্যভিচারী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যভিচারী স্থায়ীতে পর্য্যবসিত হইল—ইহাই বুঝিতে হইবে (৪)।

অভিনব বলেন—ইহা ঠিক নহে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বরং স্থায়ি-ভাব কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যভিচারীতে পর্য্যবসিত বা পরিণত হইতে পারে, কিন্তু ব্যভিচারী কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ব্যভিচারীগুলিরও যদি স্থায়ী হইবার যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগের আস্বাদে রসান্তরও হইতে পারিত। ব্যাপারটি এই—রস মূলতঃ আটটি, বা মতান্তরে নয়টি মাত্র। আর রস-মূলক স্থায়ীও আটটি বা নয়টি। ইহার আধিক্য সম্ভাবিত নহে। পক্ষান্তরে, ব্যভিচারী তেত্রিশটি। এই তেত্রিশটি ব্যভিচারীর যদি স্থায়িত্ব-লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক স্থায়ী হইতে এক একটি রস উৎপন্ন হইত। ফলে রসের সংখ্যা আট বা নয় মাত্র না হইয়া তেত্রিশই হইত। কিন্তু তাহা ত আর সম্ভব নহে। কিন্তু স্থায়ী

১। "অথ ব্যুৎপত্ত্যন্তরমপি দর্শয়িতুং প্রাক্তনীং চ ব্যুৎপত্তিং সংগ্রহীতুমাহ"—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৪৬।

"শ্লোকাশ্চাত্র—

বিভাবৈরাহৃতো যোঽর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ"॥১॥

—নাঃ শাঃ, ৭ম অঃ, পৃঃ ৩৪৬

২। "বিভাবো বিষয়স্তেন য আহৃতো নিষ্পাদিতস্তেন বিভাবাপেক্ষয়া ভাব্যতে ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ" —অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

৩। "অনুভাবানেভ্যো নিরূপয়তি বাগঙ্গেতি"

—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

৪। "অন্যে তু বাগঙ্গসত্ত্বান্তভিনয়া যেষামিতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানেন বহুব্রীহিণা স্বাভিনয়সংহিতা ব্যভিচারিণো গৃহীতাঃ; তৈরিতি ব্যভিচারিভিশ্চ ভাব্যতে মিশ্রীক্রিয়ত ইতি ব্যভিচারিণামপি চ ব্যভিচারিণো ভবন্তি। যথা নির্ব্বেদস্য চিন্তা, শ্রমস্য নির্ব্বেদ ইত্যাদি নিরূপয়ন্তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

যদি ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে এরূপ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ব্যভিচারীর সংখ্যানুসারে রস-সংখ্যার নিরূপণ হয় না। ব্যভিচারী তেত্রিশটির পরিবর্ত্তে আরও আট নয়টি যদি বাড়ে, তাহাতে রসের সংখ্যাও যে বাড়িবে—এরূপ কোন যুক্তি নাই। এ কারণে স্থায়ীর ব্যভিচারিত্ব সম্ভব—কিন্তু ব্যভিচারীর স্থায়িত্ব অসম্ভব (৫)।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—যেখানে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্যভিচারীরও অন্য ব্যভিচারী রহিয়াছে, সেখানে গতি কি হইবে? দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায়—মহাকবি কালিদাস-কৃত বিক্রমোর্ব্বশীয় ত্রোটকের নায়ক পুরূরবাঃ উর্ব্বশীর বিরহে উন্মাদগ্রস্ত। উন্মাদ ব্যভিচারী মাত্র, স্থায়ী নহে। কিন্তু এই উন্মাদেও তর্ক-চিন্তাদি দেখা যায়। সেগুলিও ব্যভিচারী। তাহারা ত স্থায়িভাবের ব্যভিচারী নহে—উন্মাদ-রূপ ব্যভিচারীরই ব্যভিচারী। এই আপত্তির উত্তরে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে—না, এই তর্ক-চিন্তাদি উন্মাদ-রূপ ব্যভিচারীর ব্যভিচারী নহে—পরন্তু রতি-স্থায়িভাবেরই ব্যভিচারী। রতি-স্থায়ীই এ স্থলে প্রধান—রাজতুল্য। উন্মাদ তাহারই মন্ত্রিস্থানীয়—রতি-স্থায়ীর উপরঞ্জক। অতএব, যেমন রাজভৃত্যেরা মন্ত্রিবরের আজ্ঞায় কর্ম্ম করিলেও তাহাদিগকে মন্ত্রি-ভৃত্য বলা চলে না—কারণ, মূলতঃ তাহারা রাজারই অধীন; ঠিক সেইরূপ এক্ষেত্রে তর্ক চিন্তাদি উন্মাদের ব্যভিচারী বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও মুখ্যতঃ তাহারা রতি-স্থায়ীরই ব্যভিচারী। (৬)

ভাবের এই যে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি শ্লোক-রূপে সংগৃহীত হইয়াছে—বিভাব-সমূহ-দ্বারা আহৃত যে অর্থ বাগঙ্গ সত্ত্বাভিনয়াত্মক অনুভাব-সমূহ-দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে—তাহাই 'ভাব'—ইহা লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কৃত—কবি-নটবর্গের শিক্ষার উপযোগী। মহর্ষির নিজ-কৃত প্রথম লক্ষণ ও প্রাক্তন দ্বিতীয় লক্ষণ এই উভয়বিধ ব্যুৎপত্তির সাহায্যে যে সাধারণ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে—সামাজিকগণের (অর্থাৎ—অভিনয়দর্শক-বৃন্দের) অভিপ্রায়ানুসারে মহর্ষি তাহারও সংগ্রহ করিয়াছেন—বাগঙ্গ-মুখরাগ-দ্বারা ও সত্ত্বাভিনয়-দ্বারা কবির অন্তর্গত ভাবকে ভাবিত করে বলিয়াই ইহার নাম 'ভাব' (৭)।

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এই কারিকাটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাগঙ্গ-মুখরাগাত্মক যে অভিনয় ও সত্ত্বরূপে যে অভিনয় (অর্থাৎ—সাত্ত্বিক অভিনয়) (৮)—সেই অভিনয় এস্থলে করণ-স্থানীয়। 'কবির অন্তর্গত ভাব' বলিতে বুঝাইতেছে—কবি-সাধারণের অন্তর্গত ভাব। তবে কবি-মাত্রের মধ্যেও বর্ণনা-নিপুণ কবিরই বিশেষ প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। বর্ণনা-নিপুণ যে কবি, তাঁহার যে অন্তর্গত ভাব—সে ভাব লৌকিক বিষয়-জাত নহে, পরন্তু, উহা তাঁহার অনাদি-প্রাক্তন-সংস্কার-প্রতিভানময়—দেশ-কালাদি ভেদের অভাব-বশতঃ সর্ব্বসাধারণের উহা আস্বাদযোগ্য। এইরূপ সর্ব্বসাধারণের আস্বাদযোগ্য ভাবকে ভাবিত করার নাম আস্বাদযোগ্য করিয়া তোলা। 'ভাব'-শব্দের অর্থ 'চিত্তবৃত্তি'। পূর্ব্বে যে সত্ত্বাভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে—সে 'সত্ত্ব'-শব্দের অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। সত্ত্বাভিনয় বলিতে বুঝা যায়—চিত্তের একাগ্রতা-জনিত কৃত্রিম অশ্রুবিসর্জ্জনাদি—উহা বাষ্পাদি-সাত্ত্বিক-ভাব-জনিত (৯) অবস্থার অনুকরণ। 'মুখরাগ' বলিতে বুঝায়—বিবর্ণতা। উহা সত্ত্বা-ভিনয়ের অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্যহেতু পুনরুক্ত হইয়াছে। কারণ,—বলা হইয়াছে—শাখা-অঙ্গ-উপাঙ্গ-সংযুক্ত বিশুদ্ধ অভিনয় করা হইলেও উহা মুখরাগ-বিহীন হইলে শোভান্বিত হয় না। অতএব, সকল প্রকার আঙ্গিক-সাত্ত্বিকাদি অভিনয়ের মধ্যে মুখরাগ বা বৈবর্ণ্যেরই প্রাধান্য। যতই আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্যাভিনয় করা হউক না কেন, সত্ত্বাভিনয়ের মধ্যে অশ্রুপাতাদির অভিনয়ও যতই করা যাউক না কেন—মুখরাগের অভাব থাকিলে সে অভিনয় প্রথম শ্রেণীর অভিনয়-রূপে পরিগণিত হইতে পারে না (১০)।

অতএব, মোটামুটি কারিকাটির অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে,—বাগঙ্গ-মুখরাগাত্মক ও সাত্ত্বিক অভিনয় দ্বারা বর্ণনা-নিপুণ কবির হৃদ্গত অনাদি-প্রাক্তন-সংস্কার-প্রতিভানময় ভাবকে যে চিত্তবৃত্তি সর্ব্বসাধারণের আস্বাদনযোগ্য করিয়া তুলে, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত হয়।

৫। "তচ্চাসৎ। স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি, নতু ব্যভি-চারিণাং স্থায়িতা। এবং হি সতি তদাস্বাদে রসান্তরমপি স্যাৎ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬। 'রসান্তর' বলিতে বুঝাইতেছে—শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত-(শান্তে)র অতিরিক্ত অন্য কতিপয় অভিনব রস।

৬। "যত্রাপি ব্যভিচারিণি ব্যভিচার্য্যন্তরং সম্ভাব্যতে তদ্ যথা পুরূরবস উন্মাদেঽপি তর্ক-চিন্তাদি তত্রাপি রতি-স্থায়িভাবস্যৈব ব্যভিচার্য্যন্তরযোগঃ। স কেবলমমাত্যস্থানীয়েনোন্মাদেন কৃতো-পরাগঃ। এতচ্চ যথা নবেন্দ্র ইত্যত্র বক্ষ্যামঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

৭। "এবং লোকানুসারেণ কবিনটশিক্ষোপযোগিনা ব্যুৎপত্ত্যন্তর-মভিধায় সামাজিকাভিপ্রায়েণ যো ব্যুৎপত্তিদ্বয়নিরূপিতোঽর্থঃ, তৎ-সংগ্রহায় শ্লোকদ্বয়মাহ—বাগঙ্গমুখরাগেণেতি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৬

"বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে। ২।"

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৭

৮। অভিনয় চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য (বেশ) ও সাত্ত্বিক।

৯। বাষ্প—অন্যতম সাত্ত্বিক ভাব—অশ্রুপাত। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু (বাষ্প), প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব।

১০। বাগঙ্গমুখরাগাত্মনাভিনয়েন সত্ত্বলক্ষণেন চাভিনয়েন কবেঃ সাধারণং (?) তদাপি বর্ণনানিপুণস্য যোঽন্তর্গতোঽনাদিপ্রাক্তন-সংস্কারপ্রতিভানময়ো ন তু লৌকিকবিষয়জঃ রাগাস্ত এব দেশকালাদি-ভেদাভাবাৎ সর্ব্বসাধারণীভাবেনাস্বাদযোগ্যস্তং ভাবয়ন্ আস্বাদযোগ্যী-কুর্ব্বন্ ভাবশ্চিত্তবৃত্তিলক্ষণ এবোচ্যতে। সত্ত্বং চিত্তৈকাগ্র্যং তজ্জনিতং চ কৃতকং বাষ্পাদিপ্রাপ্ত্যবস্থাত্মকং ব্যভিচারিপরাতিশয়প্রাপ্ত্যতি-শয়াত্মকং চেতি যথাযোগং মন্তব্যম্। তদন্তর্ভূতোঽপি বৈবর্ণ্যাত্মা মুখরাগঃ প্রাধান্যাৎ পুনরুক্তঃ, যদ্বক্ষ্যতি—

"শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তঃ কৃতোঽপ্যভিনয়ঃ শুভঃ।
মুখরাগবিহীনস্তু নৈব শোভান্বিতো ভবেৎ"। ইতি—

—অঃ ভাঃ, পৃ পৃঃ ৩৪৬-৪৭

অতঃপর শ্লোকে ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইয়াছে। যেহেতু, এই ভাবগুলি সামাজিকবৃন্দকে নানাভিনয়-সম্বন্ধ রসন-যোগ্য রস-সমূহ ভাবিত করে (অর্থাৎ বুঝাইয়া দেয়), সেই হেতু এই সকল ভাব নাট্যযোক্তৃগণ-কর্তৃক অবশ্য বিজ্ঞেয় (১১)।

অভিনবগুপ্ত-পাদের ব্যাখ্যা এইরূপ—এস্থলে 'ভাবিত করে'—এই ক্রিয়াপদটির অর্থ বোধগম্য করাইয়া দেয়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত করে। বুদ্ধার্থক-ক্রিয়া বলিয়া ইহা দ্বিকর্ম্মক। একটি কর্ম্ম—'রসসমূহ',—আর একটি 'এই সকল ব্যক্তিকে' (অর্থাৎ সামাজিক-বর্গকে—অভিনয়-দর্শকগণকে)। 'রসসমূহ'—এই পদের একটি বিশেষণ আছে—'নানাভিনয়-সম্বন্ধ'—নানারূপ অভিনয়যুক্ত। এস্থলে রস শব্দের অর্থ রসন-যোগ্য (১২) (অর্থাৎ আস্বাদনযোগ্য) চিত্তবৃত্তি-বিশেষ। ঐগুলিকে সামাজিকগণের বুদ্ধিগোচর করাইয়া দেয়। ঐ রসগুলি 'অভিনয়-সহিত'—ইহা বলায় বুঝাইতেছে যে, নানাপ্রকার অভিনয়কেও সামাজিকগণের বুদ্ধিগোচরে লইয়া আসে। তাহা হইলে মোটামুটি অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, ভাব-সমূহ রসন-যোগ্য রস-সমূহকে ও তৎসম্বন্ধ নানাবিধ অভিনয়কে দর্শকগণের বুদ্ধিগোচর করিয়া থাকে (১৩)।

অভিনব বলিতেছেন—এবংবিধ ভাবের স্বরূপ—অধিবাসনাত্মিকা ভাবনা। উহা রসন-যোগ্য রস-সমূহকে নিজ যোগ্যরূপে ভাবিত (অর্থাৎ বুদ্ধিগোচর) করে। স্থায়িভাবগুলি কিরূপে রসকে আস্বাদ-গোচর করে, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে অভিনব একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রতি-স্থায়ি-ভাব বস্তুতঃ নির্ব্বেদ-ব্যভিচারি-ভাবদ্বারা উপরঞ্জিত হইলেও যাহাতে ঔৎসুক্য-ব্যভিচারি-দ্বারা উপরক্ত বোধ হয়, সেই ভাবে অলৌকিক আস্বাদনের বিষয়ীভূত রসকে অধিবাসিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ—অভিনয়ে প্রদর্শিত হইতেছে যেন রতি-স্থায়িভাবের সহিত নির্ব্বেদ ব্যভিচারী মিলিত হইল। বস্তুতঃ, নির্ব্বেদ আসিয়া মিলিত হইলে রতি-স্থায়ীর নিবৃত্তি ঘটে ও ফলে রতি-স্থায়ি-জাত শৃঙ্গার-রসের নিষ্পত্তিই হইতে পারে না। এ কারণে, নির্ব্বেদোপরক্তা রতিও যাহাতে দর্শকের নিকট ঔৎসুক্যোপরক্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে—এরূপ ভাবেই অভিনয় কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর দর্শক-চিত্তে অলৌকিকাস্বাদন-গোচর শৃঙ্গার-রস নিষ্পন্ন হইতে কোন বাধা জন্মে না। দর্শক যদি নির্ব্বেদাভিনয়ের ঔৎসুক্যের আভাস পায়, তবেই তাহারও চিত্তগত লৌকিক রতি-বাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া অলৌকিক শৃঙ্গার রসের আস্বাদন করাইতে পারে। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে—অলৌকিক শৃঙ্গার-রস লৌকিক রতি-স্থায়িভাব-বাসনা-দ্বারা অনুবিদ্ধ। (১৪)

এইরূপে মহর্ষি 'ভাব' অর্থাৎ স্থায়িভাবের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিভাবানুভাবাদির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিভাবের নাম 'বিভাব' হইল কেন? উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—'বিভাব'-শব্দটি বিজ্ঞানার্থক। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত, হেতু—ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দ (১৫)।

এ প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বিচার করিয়াছেন—এই প্রকরণ হইতে ত বেশ বুঝা যায় যে, বিভাব-শব্দের অর্থ ভাবাত্মক চিত্তবৃত্তির উদ্ভব-হেতু বিষয়। তবে আবার উহার বিষয়ে এত বিচার কি নিমিত্ত? উত্তরে বলিয়াছেন—সত্য বটে যে, প্রকরণ-পর্য্যালোচনায় বিভাবের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তথাপি 'বিভাব'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ প্রদর্শন করা উচিত। এই কারণে উহা এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। অতএব, ঋতু-মাল্যাদি যে সকল বিষয় হইতে ভাব-রূপ চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেগুলিকে কেন বিভাব বলা হয়—তাহাই এস্থলে জিজ্ঞাস্য (১৬)। [অর্থাৎ—বিভাব হইতেছে ভাবের উদ্ভব-কারণ-ভূত বিষয়-সমূহ—এই অর্থের সহিত বিভাবের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থের (=হেতু) যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে—তাহাই প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে দেখান হইতেছে।]

ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ—বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়-বিশিষ্ট স্থায়ি-ব্যভিচারি-ভাব-সমূহ যাহা-দ্বারা বিভাবিত (অর্থাৎ বিজ্ঞাত) হয়, তাহাই বিভাব। 'বিভাবিত'-শব্দের অর্থই 'বিজ্ঞাত' (১৭)।

মূলে পদ আছে—'বাগঙ্গাভিনয়ঃ'। অভিনব উহাকে বহুব্রীহি সমাস করিয়াছেন। বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয় যাহাদিগের—সেই স্থায়ি-ব্যভিচারি-সমূহ ও তাহাদিগের অভিনয় (১৮)।

অভিনব বলিতেছেন—'বিভাব'-শব্দ যদি বিজ্ঞানার্থক হয়, তাহা হইলে বিভাবের প্রকরণলভ্য যে অর্থ—ঋতু-মাল্যাদি বিষয়—তাহার সহিত উহার ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের মিল কোথায়?—এই প্রশ্নের উত্তরই মহর্ষি দিয়াছেন—বাগাদি-অভিনয়-সহিত স্থায়ি ব্যভিচারি-

---

১১। "নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ" ॥৩॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৭

অথেতিকর্ত্তব্যতাং নিরূপয়িতুং শ্লোকমাহ—নানাভিনয়েতি"
—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৭

১২। রসন—রসনা, চর্ব্বণা, আস্বাদন—একার্থক।

১৩। "রসনযোগ্যান্ চিত্তবৃত্তিবিশেষান্ ভাবয়ন্তি বোধয়ন্তি বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রাপয়ন্তি। ইমান্ সামাজিকান্ ভাবয়ন্তি। বুদ্ধ্যর্থত্বাদ্ দ্বিকর্ম্মকঃ। অভিনয়সহিতান্ ইত্যভিনয়া অপি বুদ্ধিগোচরং নীয়ন্তে"
অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৭

১৪। "ইয়মেব চাসৌ অধিবাসনাত্মা ভাবনা তথা তথা রসান্ রসনযোগ্যান্ নিজেন যোগ্যেন রূপেণ ভাবয়ন্তি। যথা নির্ব্বেদোপরক্তা রতিরৌৎসুক্যোপরক্তেতি তথা রসান্ অলৌকিকাস্বাদবিষয়ান্ স্থায়িনোঽধিবাসয়ন্তি। লৌকিকরতিবাসনানুবিদ্ধো হি শৃঙ্গাররস ইত্যাদি বিভাবেনাহৃত ইত্যুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৭

১৫। "অথ বিভাব ইতি কস্মাৎ? উচ্যতে—বিভাবো নাম বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়ঃ"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৭

১৬। "তত্র যদ্যপি প্রকরণাচ্চিত্তবৃত্ত্যুদ্ভবহেতুর্বিষয়ো বিভাব-শব্দস্যার্থ ইতি জ্ঞাতং তথাপি তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তং জিজ্ঞাস্যমানস্তদেব প্রশ্নয়তি—বিভাব ইতীতি। তস্মাদৃতুমাল্যাদয়োঽত্র বিভাবশব্দেন কিমিতি ব্যপদিষ্টা ইতি ভাবঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৮

১৭। "বিভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয় ইতি বিভাবঃ। যথা বিভাবিতং বিজ্ঞাতমিত্যনর্থান্তরম্"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৭

১৮। "বাগাদয়োঽভিনয়া যেষাং স্থায়িব্যভিচারিণাং তে বাগাদ্যভিনয়সহিতাঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৮

ভাব-সমূহ যাহাদের দ্বারা বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহারাই বিভাব (১৯)।

এই প্রসঙ্গে অভিনব আরও বলিয়াছেন—অভিনয়ের হেতু নানাবিধ। যথা—হর্ষাদি হইতে হাসের অভিনয়; উত্তাপ-ধূম-রোগাদি হইতে অশ্রুপাতের অভিনয় কর্ত্তব্য। বিভাব হইতে স্থায়ি-ব্যভিচারি-সমূহ ঝটিতি বিজ্ঞাত হইয়া থাকে (২০)। এ কারণে বিভাবকে ভাবের হেতু বলা অসঙ্গত হয় না।

এ প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোকও মহর্ষি উদ্ধৃত করিয়াছেন—যেহেতু, বাগঙ্গাভিনয়াশ্রিত বহু অর্থ ইহা দ্বারা বিভাবিত (অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত) হয়, সে কারণে ইহা 'বিভাব' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে (২১)।

এ ক্ষেত্রে বহু অর্থ বলিতে বুঝাইতেছে বহু ভাব—স্থায়ী ও ব্যভিচারি-সমূহ।

বিভাবের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের পর মহর্ষি অনুভাবের ব্যুৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'অনুভাব' নাম হইল কেন? উত্তরে বলিয়াছেন—বাগাঙ্গসত্ত্বকৃত অভিনয় ইহা দ্বারা অনুভাবিত হইয়া থাকে।

বাগঙ্গসত্ত্ব-কৃত অভিনয়—ইহার অর্থ—বাগঙ্গসত্ত্ব-দ্বারা অভিনয় করা হয় যাহাদিগের, সেই স্থায়ি-ব্যভিচারি-ভাবসমূহ। এই সকল ভাব যাহা-দ্বারা অনু (অর্থাৎ—পশ্চাৎ) ভাবিত (অর্থাৎ জ্ঞাপিত) হয়, তাহাই অনুভাব (২২)।

তাহা হইলে বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে—বিভাব-দ্বারা ভাব বিভাবিত (অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাপিত) হয়, আর অনুভাব-দ্বারা ভাব অনুভাবিত (অর্থাৎ পশ্চাৎ জ্ঞাপিত) হইয়া থাকে। অর্থাৎ—এক কথায় বিভাব ভাবের প্রথম জ্ঞাপক; অনুভাব তাহার পর ভাবকে জ্ঞাপিত করে। মাল্যাদি বিষয় হইতে রতি-স্থায়িভাব প্রথম সূচিত হয়; এ কারণে ঐ সকল বিষয়—বিভাব-শব্দ বাচ্য। আর রতি-স্থায়িভাবের উদ্রেক হইলে কটাক্ষাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কটাক্ষাদি দর্শনেও রতি-স্থায়ীর অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। এই অনুমান-জ্ঞান রতি-স্থায়ীর উৎপত্তির পশ্চাদ্ভাবী—বিভাবের ন্যায় স্থায়ীর প্রাগ্ভাবী নহে। এ হেতু ইহার নাম হইয়াছে অনুভাব অর্থাৎ স্থায়ি-ভাবের পশ্চাদ্ভাবী ভাবান্তর। তাহা হইলে ক্রম দাঁড়াইতেছে এইরূপ—বিভাব—স্থায়িভাব—অনুভাব। মোটামুটি বলা চলে—বিভাব স্থায়িভাবের কারণ, আর অনুভাব স্থায়িভাবের কার্য্য।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি একটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—যেহেতু, ইহাতে বাগঙ্গাভিনয়-দ্বারা শাখাঙ্গোপাঙ্গ-সংযুক্ত অর্থ অনুভাবিত হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহা 'অনুভাব' নামে প্রসিদ্ধ (২৩)।

এইরূপে মহর্ষি বিভাবানুভাব সংযুক্ত ভাবের (অর্থাৎ স্থায়িভাবের) স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে বিভাবানুভাব-সংযুক্ত ভাব-সমূহের সাধারণ স্বরূপ ব্যুৎপত্তি-দ্বারা প্রদর্শনপূর্ব্বক উহাদিগের লক্ষণ ও নিদর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিয়াছেন—বিভাব ও অনুভাব লোকপ্রসিদ্ধ—লোক-স্বভাবানুগত। এ কারণে বৃথা বহুভাষণ নিবারণের উদ্দেশ্যে মহর্ষি তাহাদিগের লক্ষণ প্রদান করেন নাই (২৪)।

এ প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোকে বলা হইয়াছে—অনুভাব ও বিভাবসমূহ লোকস্বভাব হইতে সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ (অর্থাৎ—লৌকিক অনুভব-সিদ্ধ) ও লোকযাত্রার অনুগামী। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, তাঁহারা অভিনয় হইতেই উহাদিগের উপলব্ধি করিতে পারেন (২৫)।

মহর্ষির সিদ্ধান্তে দাঁড়াইতেছে এই যে—(ক) আটটি ভাব (অর্থাৎ স্থায়িভাব); (খ) তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাব; আর (গ) আটটি সাত্ত্বিক-ভাব।

অতএব মোট উনপঞ্চাশটি ভাব—কাব্য-রসের অভিব্যক্তির হেতু—ইহাই মনে রাখিতে হইবে।

এই সকল ভাব হইতেই সামান্য-গুণযোগে রস নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (২৬)। শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

১৯। "অত্রোত্তরং বিভাব্যন্ত ইত্যাদি। বাগাদয়োঽভিনয়া যেষাং স্থায়িব্যভিচারিণাং তে বাগাদ্যভিনয়সহিতা বিভাব্যন্তে বিশিষ্টতয়া জ্ঞায়ন্তে যৈস্তে বিভাবাঃ"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৮

২০। "অভিনয়ানামনেকহেতুকত্বম্। তদ্যথা—হর্ষাদিভ্যো হাসঃ ঘর্ম্মধূমরোগাদিভ্যো বাষ্পঃ, তদ্বাষ্পাৎ কিং প্রতীয়ন্তাং বিভাবাত্তু ঝটিত্যেব নিশ্চয়ঃ।"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৮

ইহার পর হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত "অভিনব-ভারতী"র অংশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া বরোদা সংস্করণে উহা প্রদত্ত হয় নাই। অগত্যা অবশিষ্টাংশের মূল ছায়াই প্রদত্ত হইবে।

২১। "অত্র শ্লোক:—
বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রয়াঃ।
অনেন যস্মাত্তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ" ॥ ৪ ॥
নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৮

(২২) "অথানুভাব ইতি কস্মাৎ? উচ্যতে। অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয় ইতি"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৮ ("যদয়মনুভাবয়তি নানার্থাভিনিষ্পন্নো বাগঙ্গসত্ত্বৈঃ কৃতোঽভিনয় ইতি—কাশীস, পৃঃ ৮০)

(২৩) "অত্র শ্লোক:—
বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ" ॥ ৫ ॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৮

শাখা, অঙ্কুর প্রভৃতি নৃত্য ও অভিনয়ের অঙ্গ। 'অঙ্গ' বলিতে বুঝায়—শিরঃ, হস্ত, বক্ষঃ, পার্শ্ব, কটি, পাদ ইত্যাদি ষড়্‌বিধ অঙ্গের আঙ্গিকাভিনয়। আর উপাঙ্গ—স্কন্ধ, দৃষ্টি, ভ্রূ, অক্ষিপুট, অক্ষিতারকা, কপোল, নাসিকা, হনু, অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক ইত্যাদি।

২৪। "তত্র বিভাবানুভাবৌ লোকপ্রসিদ্ধাবেব (লোকপ্রসিদ্ধৌ) লোকস্বভাবানুগতত্বাচ্চ তয়োর্লক্ষণং নোচ্যতেঽতিপ্রসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৯

২৫। "ভবতি চাত্র শ্লোক:—
লোকস্বভাবসংসিদ্ধা লোকযাত্রানুগামিনঃ।
অনুভাবা বিভাবাশ্চ জ্ঞেয়াস্ত্বভিনয়ে বুধৈঃ" ॥৬॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৯

২৬। "তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ব্যভিচারিণঃ অষ্টৌ সাত্ত্বিকা ইতি ত্রিভেদাঃ (ভেদাঃ)। এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশদ্ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। এভ্যশ্চ সামান্যগুণযোগেন রসা নিষ্পদ্যন্তে"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৪৯

সামান্যগুণযোগ—সামান্যরূপ যে গুণ, তাহার যোগ। সাধারণীকৃতি বা সাধারণী-করণ-রূপ যে গুণ, তাহার সংযোগে ভাব হইতে রস নিষ্পত্তি হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্য।

গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ক'জন জানিত, গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ কোথায়! যে-সব জাতি পৃথিবীর মানচিত্র ঘাঁটিয়া বেড়ায়, তাদের মধ্যেও অনেকে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের নাম শোনে নাই!

জাপান হঠাৎ যেদিন পার্ল হার্বারে হানা দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাঞ্চলে আবাথাং এবং

বিষুব-রেখায় বিস্তৃত গিলবার্ট দ্বীপ

মাকিন অধিকার করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাওয়া দ্বীপ হইতে লোক-জন সরাইতে লাগিল, তখন ওদিক্‌কার দ্বীপপুঞ্জের দিকে জগতের দৃষ্টি পড়িল। মাকিন অধিকার করিয়াই জাপানীরা হাওয়াই-অষ্ট্রেলিয়ার পথে চলন্ত জাহাজ ডুবাইবার উদ্দেশ্যে মার্কিনে সাগর-ঘাঁটী রচনায় উদ্যত হইল।

তার পর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারি তারিখে মার্কিন-নেভির শেল্ ও বোমাবর্ষণে মাকিন বিধ্বস্ত হইল, এবং এ সব দ্বীপে যত জাপানী জাহাজ; রেডিয়ো এবং বিমান-ঘাঁটী, খাদ্য ও পেট্রোলের ভাণ্ডার ছিল, মার্কিন নেভি ও মেরিনের আক্রমণে সেগুলি ধ্বংস লাভ করে। তখন বুঝা গেল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সানফ্রানসিশকো হইতে ৭০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ষোলটি দ্বীপ এ যুদ্ধে কতখানি সহায় হইতে পারে!

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যে দ্বীপগুলি জাপানের ম্যাণ্ডেটেড দ্বীপ বলিয়া খ্যাত, তাহারি পাশে গিলবার্টের অবস্থান। * এই ম্যাণ্ডেটেড দ্বীপ-পুঞ্জের কথা 'মাসিক বসুমতী'তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। ঐখান হইতেই তারা নির্ব্বিবাদে পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছিল; ঐখান হইতেই দক্ষিণে নিউ-গিনি আক্রমণ করে। মার্কিন ফৌজ আজ গিলবার্ট অধিকার করিয়া জাপানকে অনেকখানি কায়দা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মিত্রপক্ষের গিলবার্ট আক্রমণের কারণ ম্যাণ্ডেটেড দ্বীপপুঞ্জে জাপানী শক্তিকে খর্ব্ব এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনের রশদ-পত্র যোগানোর পথ নিরাপদ এবং সংক্ষিপ্ত করা।

গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা ষোলটি। এই ষোলটি দ্বীপের সমষ্টি-গত পরিমাণ ১৬০ মাইলেরও বেশী হইবে না; এবং কোনোটিই সমুদ্র-গর্ভ হইতে ১৫ ফুটের অধিক উঁচু নয়; প্রস্থে ১০ হইতে ৫০ মাইল মাত্র। দ্বীপগুলি ছোট-বড় প্রবাল-গিরিতে সমাচ্ছন্ন। দ্বীপের বুকে এত বেশী বালুকা যে, নারিকেল, তাল এবং তারো গাছ ছাড়া এ সব দ্বীপে উদ্ভিদের আর চিহ্ন দেখা যায় না।

প্রকৃতির শ্যামল সবুজের এতটুকু আভাস নাই, তবু এ দ্বীপ-গুলির শোভা-সুষমা অপরূপ! কোথাও আকারে বৈচিত্র্য, কোথাও বা বর্ণাঢ্যতা। আলো-ছায়ার রমণীয় বৈশিষ্ট্যে দ্বীপগুলি সভ্য সমাজের নয়ন-মন বিমুগ্ধ করে। বিখ্যাত লেখক রবার্ট ষ্টিভেনসন এ দ্বীপ-গুলির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—সমুদ্রের বাতাসে এখানকার জল-হাওয়া চমৎকার। দিনের প্রখর রৌদ্র-তাপের সহিত শীতল সমুদ্র-বাতাস মিলিয়া আছে।

আশপাশ

* এই দ্বীপগুলির সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৯ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ সব দ্বীপের অধিবাসীরা বলে, এখানে শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রথম পদার্পণ ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে। ঝড়ে নৌকা ভাঙ্গিয়া এক জন শ্বেতাঙ্গ নাবিক অচেতন অবস্থায় সমুদ্র-উপকূলে আসিয়া পড়িয়াছিল। তার আকৃতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে অধিবাসীরা বলে—লোকটি আকারে ছিল রাক্ষসের মত দীর্ঘ, কিন্তু দেহ কৃশ—টিকটিকির ন্যায়; মাথায় লাল রঙের কেশ এবং দাড়ি ছিল দ্বিধা-বিভিন্ন।

এ বর্ণনা হইতে অনুমান হয়, এই বিদেশীটি শ্বেতাঙ্গ; জাতে ককেশিয়ান; হয়তো স্প্যানিশ নাবিক।

তার পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ কবি বায়রনের পিতামহ ক্যাপটেন জন বায়রন এখানে আসিয়া জাহাজ হইতে নুকুনাউ দ্বীপটি দেখিতে পান। ক্যাপটেন বায়রন ছিলেন বৃটিশ নেভির কর্ম্মচারী। তাঁহার পরে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন গিলবার্ট এবং ক্যাপটেন মার্শাল উত্তরে-অবস্থিত দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেন; অবশিষ্ট দ্বীপগুলি আবিষ্কৃত হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে।

নারিকেলের চাষের জন্ত বিদেশী বণিকরা কায়েমী কোনো ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। দ্বীপের অধিবাসীরা জমির মালিক; বিদেশীকে তারা জমি বিক্রয় করে না। নিজের নিজের জমিতে তারা নারিকেল ফলায়। সে সব নারিকেল দেশী ব্যবসায়ীরা দাম দিয়া কেনে; কিনিয়া এ নারিকেল তারা বিক্রয় করে জাহাজী সদাগরদের কাছে। এমনি ভাবে এখান হইতে অষ্ট্রেলিয়ার নানা বন্দরে বছরে প্রায় চার হাজার টন ওজনের নারিকেলের শাঁস ও কোঁপল্ চালান যায়।

সমুদ্রের উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ হইতে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্ত বিধাতা যেন দ্বীপগুলির চার দিকে পাহাড়ের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছেন! এ প্রাচীরের একটি মাত্র দিক শুধু খোলা। সেই খোলা দিক দিয়া সাগরের জল প্রাচীরের আড়ালে ঢুকিয়া শান্ত লেগুনের সৃষ্টি করিয়াছে। লেগুনের তীরে তালীবন-শ্রেণী—দেখায় যেন চোখের পল্লব! প্রখর সূর্য্য-তাপে জলে বিচিত্র বর্ণদীপ্তি জাগে। তার কারণ, জলের নীচে মাটী খনিজ ধাতুতে আচ্ছন্ন। জল

বাসগৃহ

মুক্তা-সন্ধানী

গিলবার্ট-আবিষ্কৃত দ্বীপগুলির সহিত এলিস দ্বীপ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-অধিকার-ভুক্ত হয়; তার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এগুলি উপনিবেশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

শাসন-পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র সংস্থাপিত হয় ওশান দ্বীপপুঞ্জে। ওশান-দ্বীপপুঞ্জের নাওরু দ্বীপ ফসফেটের জন্ত বিশ্ব-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উপনিবেশের পরিচালনা-ভার রেসিডেন্ট-কমিশনারের উপর ন্যস্ত। এবং এই রেসিডেন্ট-কমিশনারের উপর-ওয়ালা হইলেন ফিজি দ্বীপের সুবা-প্রদেশে পশ্চিম প্রশান্ত জনপদের যে হাই কমিশনার আছেন, তিনি।

এই ষোলটি দ্বীপে প্রচুর নারিকেল জন্মায়। এ সব নারিকেলের শাঁস বাহির করিয়া দ্বীপের অধিবাসীরা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা সেই শাঁস হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী করে সাবান এবং গ্লিসারিণ।

যেখানে বেশী গভীর সেখানে তার বর্ণ গৈরিক—যেখানে অগভীর সেখানে জলের রঙ গোলাপী; জলের বুকে যেখানে পাহাড় সেখানে জলের রঙ হরিৎ; তীরের কাছে খুব অগভীর স্থানে জলের রঙ পান্নার মত সবুজ। এত ঘন সবুজ যে, সে-রঙে চোখে ঝলশানি লাগে! তালীবনের প্রাচুর্য্য-বশতঃ ভিতরের হাওয়া স্নিগ্ধ-শীতল।

উদ্ভিদের চিহ্ন না থাকিলেও দ্বীপগুলিতে বহু লোকের বাস। ষোলটি দ্বীপে লোকসংখ্যা আটাশ হাজারের উপর। ১৯৩৮-৪০ খৃষ্টাব্দে লোক-সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল যে, প্রায় দু'হাজার লোককে ফিনিক্স দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে গিলবার্টাজদের মধ্যে মৃত্যু-হারের চেয়ে জন্ম-হার অনেক বেশী।

গিলবার্টাজদের গায়ের রঙে পলিনোশিয়ানদের তামাটে রঙের সহিত মাইক্রোনেশিয়ানদের মিশ্ কালোর সমাবেশ ঘটিয়াছে। দু'জাতের মিশ্রণে গিলবার্টাজদের উদ্ভব। তবে গিলবার্টাজদের মুখে-চোখে

বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ্য হয়। পলিনেশিয়ান বা মাইক্রোনেশিয়ানদের মত গিলবার্টিজরা নির্ব্বোধ নয়। গিলবার্টিজদের রসবোধ আছে। তাদের মধ্যে মোটা লোক দেখা যায় না এবং সাহস ও শৌর্য্য গিলবার্টিজদের প্রকৃতিগত। তাদের দেখিলে শক্তিমান বলিয়া বুঝা যায়।

স্টীভেন্সন লিখিয়াছেন, সৌন্দর্য্যে গিলবার্টিজ রমণীদের সঙ্গে তাহিতি রমণীর তুলনা হয় না। গিলবার্টিজ রমণীর স্বভাব শান্ত এবং কোমল: তাদের গঠনে সৌন্দর্য্য আছে। এ জন্ম গিলবার্টিজ রমণীদের মোহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না!

গিলবার্টিজ-রমণীর অধরে শুভ্র সরল হাসি ফুলের বিকাশের মতই অনায়াস সহজ। সে হাসিতে শুভ্র দশন-পংক্তির বিকাশ সত্যই মনোরম।

সমুদ্র-তীর—মার্কিন

গায়ের বর্ণে মাধুরী-সুষমা রক্ষা করিবার জন্ম মেয়েরা পুরাকালে বহু যাতনা ভোগ করিত। মাসের পর মাস মেয়েরা বদ্ধ ঘরে বাস করিত, গায়ে একেবারে বাতাস ও রৌদ্রের তাপ লাগিতে দিত না! গায়ে নারিকেল তৈল মাখিয়া দিনে তিন বার করিয়া গাত্র মর্দ্দন করিত। বৃষ্টির জলে স্নান করিত। স্নানের পর নারিকেলের জল মাখিত অঙ্গকে কোমল রাখিবার জন্ম। এমনি ভাবে অঙ্গ-পরিচর্য্যা করিত দু'মাস নিষ্ঠাভরে,—তার পর বদ্ধ ঘরের বাহিরে আসিত দেহে শুভ্র বর্ণ-জ্যোতি লইয়া এবং গায়ের চর্ম্ম হইত নরম মাখনের মত।

পুরাকালে নীতি-রক্ষার আদর্শ ছিল উৎকট-রকম উগ্র। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেয়েরা দেহ অনাবৃত রাখিত; কোনো আচ্ছাদনে ঢাকিবার বিধি ছিল না। আচার-নীতি রক্ষা সম্বন্ধে সামাজিক শাসন ছিল অত্যন্ত কঠিন। নারী-নিগ্রহের অপরাধে অপরাধীকে তিলে-তিলে দগ্ধাইয়া মারা অথবা কাঠে সুদৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত হাঙরের ভক্ষ্য হইবে বলিয়া।

এখন চরিত্র-নীতির সে আদর্শ অনেকখানি শিথিল এবং ইংরেজ আইনে নারী-নিগ্রহ-অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত হইয়াছে। মেয়েদের অঙ্গে বিচিত্র বস্ত্রাবরণ উঠিয়াছে। সে আবরণের ফলে পুরুষের চোখে গিলবার্টিজ রমণীর রূপ-মাধুরী যেন আরো বাড়িয়াছে! মেয়েদের পোষাকে বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিপুল সমারোহ।

যে সব দ্বীপ সুদূর প্রান্তে অবস্থিত, সেখানে মেয়েরা এখনো পুরানো পোষাক পরে—ঘাসের তৈরী সেই মামুলি ঘাগরা। উপর-অঙ্গে কেহ সামান্ত একটু আবরণ টানিয়া দেয়—কেহ বা যৌবন-সমৃদ্ধি দেখাইতে বক্ষ অনাবৃত রাখে।

পুরুষদের মধ্যে বুড়ার দল এখনো পাতায় বোনা লুঙ্গি-প্যাটার্ণের আচ্ছাদন পরে। কোমরে আঁটে কোমরবন্ধ। স্ত্রীর মাথার কেশে রচা বন্ধনী। তরুণের দল রঙ-বেরঙের আচ্ছাদনে লজ্জা নিবারণ করে।

মাছ-ধরার আমোদ

লেগুনের তীরে তালীপুঞ্জের ছায়ায় সরল বাসভূমিগুলি দেখায় যেন ছবি! বাড়ী তৈয়ারী করিবার রীতিতেও চমৎকারিত্ব আছে। দীর্ঘ পথ চলিয়া গিয়াছে—পথের দু'ধারে বেশ খানিকটা ফাঁক রাখিয়া বাসগৃহ রচিত হয়। পথের ধারে খালি জমিতে গন্ধে-বর্ণে সমৃদ্ধ রঙ-বেরঙের ফুলের গাছ। ফুলের আদর গিলবার্টিজদের কাছে অপরিসীম। বাড়ীগুলি তাল বা নারিকেল পাতায় ছাওয়া—মানুষের মাথার সমান উঁচু—ঘরের সামনে উঁচু দাওয়া; দেওয়াল নাই। খুঁটা পোতা—খুঁটার গায়ে নারিকেল-পাতার ঝাঁপ গায়ে-গায়ে ঝলানো। ঝড় হইলে ঘরে বসিয়া সে-ঝড়ের দাপট হইতে আত্মরক্ষা করা যায় না। রাত্রে শুইবার সময় পাতার ঝাঁপগুলি তুলিয়া দেয়, ঘরে বাতাস আসিবে।

এ-সব ঘর তৈরী করিতে আয়োজনের বা ব্যয়ের ঘটা নাই। ছাউনির জন্ম তাল বা নারিকেলের পাতা; খুঁটার জন্ম তাল-নারিকেলের গাছ; পাতা চিরিয়া সেই চেরা পাতায় দড়ির বাঁধন

সম্পাদিত হয়। গিলবার্টিজরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করে। নোংরামি বা কদর্য্যতায় তাদের দারুণ বিরাগ। ইহাদের বাড়ীতে গেলে বেশ বুঝা যায়, স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি বেশ প্রখর। লোকজনের পরিচয় খুব সহজে মেলে। বিদেশী কেহ গিলবার্টিজদের মহল্লায় গেলে দেখিবেন, মেয়েরা কেশ প্রসাধন করিতেছে, ফুলের মালা গাঁথিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, ছেলেমেয়েদের স্নান করাইয়া দিতেছে নয়তো মাদুর-পাটি বুনিতেছে, অর্থাৎ ঘর-কর্ণার কাজে ব্যস্ত। পুরুষরা বসিয়া ধূমপান বা গল্প করিতেছে, না হয় জাল বুনিতেছে কিম্বা নৌকা লইয়া বাহির হইয়াছে। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের জীবন-যাত্রার প্রণালী যেমন সহজ এবং অনাড়ম্বর তেমনি তাহাতে লুকোচুরি নাই এক বিন্দু। মন যেমন খোলা, আচারেও তেমনি আড়ম্বর বা ফ্যাশনের কৃত্রিমতা নাই।

পুরাকালে পুরুষরা বহু-বিবাহ করিত—এখন একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণের রীতি সকলে মানিয়া চলে। পূর্ব্বে কোনো গৃহে পাঁচ-সাতটি কন্যা থাকিলে সব কন্যাগুলি ছিল বরের গ্রহণীয়া। কোনো কন্যার সহোদরা ভগ্নী না থাকিলে, তাকে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার পিতৃপক্ষীয়া যত ভগ্নী থাকিত, বরকে বিবাহ করিতে হইত সেই সব ভগ্নীকে! পুরুষ-মানুষ মারা গেলে মৃতের বিধবাগুলিকে বিবাহ করিত মৃতের ভ্রাতা। এক-বাড়ীর বিধবাকে অন্য-বাড়ীর পুরুষ বিবাহ করিতে পারিত না।

হাঙ্গরের দাঁত-বসানো লাঠি

বহু-বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পুরুষ যেন নিঃসন্তান না হয়! স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর ভগ্নী ভিন্ন স্বামীর সন্তানের মাতা হইবার যোগ্যতা অন্য কোন রমণীর থাকিতে পারে না তো! তেমনি স্বামী যদি মারা যায়, তা মরা ভাইয়ের স্ত্রীগুলির বন্ধ্যাত্ব-মোচনের জন্য ভাই ছাড়া অপরের যোগ্যতা থাকিতে পারে না!

এক জন গিলাবার্টিজকে এক জন ইংরেজ একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—এই তো তোমাদের এতটুকু ছোট দ্বীপ—গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা কত কঠিন,—এ অবস্থায় এক পাল ছেলেমেয়ে পালন করিতে কি করিয়া? এ প্রশ্নের জবাবে গিলাবার্টিজ বলিয়াছিল—আমাদের নৌকা ছিল মশায়, আর ছিল লড়াইয়ের জন্য দু'খানা করিয়া হাত! আমাদের ছোট দ্বীপের বাহিরে কি অন্য দেশ ছিল না? প্রয়োজন বুঝিলে যুদ্ধে সে দেশ জিতিয়া লইব।

গিলবার্টিজ দ্বীপে শিশু-হত্যা কোনো কালে ঘটে নাই। গিলবার্টিজদের বিশ্বাস—মানুষ লক্ষ্মী! ছেলেমেয়ে যত বাড়ে, সমৃদ্ধিও সেই অনুপাতে বাড়িবে। তার উপর সাহস ও শৌর্য্যের জন্য ও-অঞ্চলের অন্য দ্বীপবাসীরা গিলবার্টিজদের ভয় করিত যমের মত।

রমণী সন্তান-সম্ভবা হইলে তার যত্নের সীমা থাকে না। সর্ব্ব দুশ্চিন্তা ও বিপদ হইতে তাকে রক্ষা করিবার জন্য গিলবার্টিজ পুরুষরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে পারে। সন্তানবতী রমণীকে ভূতে পায় বলিয়া গিলবার্টিজদের বিশ্বাস; এ জন্য তার নখ, মাথার চুল, গায়ের গহনা—এগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। তার গায়ের জিনিষ পাইলে দুষমণে মন্ত্র পড়িয়া বহু অকল্যাণ সাধিতে

শূকর-মাংসের ভোজ

পারে, এ জন্য তার মাথার চুলে মন্ত্র-পড়া নারিকেল-পাতা গাঁথিয়া শুয়ুকের দাঁত মাদুলির মত গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; এবং প্রত্যহ নিয়ম করিয়া সূর্য্যোদয় কালে রক্ষা-কবচ মন্ত্র পড়িয়া তাকে শুনানো হয়। এ সময় তাকে যে সব খাদ্য দেওয়া হয়, সে সব খাদ্যে বেশী মিষ্ট বা বেশী তিক্ত কিছু থাকে না। প্রচুর নারিকেল ও ডাবের জল পান করানো এবং সিদ্ধ কাঁকড়া খাওয়ানো হয়। নারিকেল-জল এবং কাঁকড়া খাইলে প্রসবমাত্রে তার স্তনে প্রচুর দুগ্ধ হইবে। মাছ খাওয়ার সম্বন্ধে বিধি—যে সব মাছে বেশী কাঁটা, সে মাছ সন্তানবতী রমণীর খাওয়া নিষেধ। খাইলে সন্তানের মাথার চুল হইবে কাঁটার মত কড়া এবং খাড়া। তারা মাছ এবং হাঙ্গরের মাংস সন্তান-বতীর পক্ষে খুব উপকারী। তার কারণ, তারা মাছ এবং হাঙ্গর পরাক্রান্ত ও নির্ভীক। তারা মাছ এবং হাঙ্গরের মাংস খাইলে পেটের সন্তান হইবে তাদের মতই সাহসী এবং বিজয়ী বীর।

প্রতি গ্রামের ঠিক মাঝখানে সকলের মেলামেশা করিবার জন্য

...শু আটচালা আছে। এ আটচালায় সামাজিক আসর বসে। সামাজিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা হয়, বিচার হয়। এ আটচালার নাম মানিয়াবা। আমাদের দেশের সে-কালের চণ্ডীমণ্ডপ! এখানে বসে
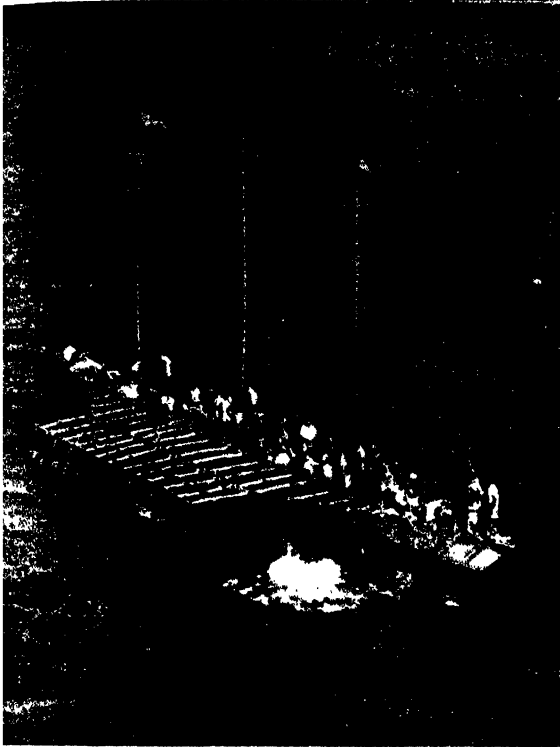
ডিঙ্গিতে মাচা-বাঁধা

সামাজিক মজলিস বা সভা, সকলের নাচ গানের আসর; তা ছাড়া এখানে সকল বিষয় লইয়া ঘোঁট-পাকানো হয়। এখানে বুড়ারা

মানিয়াবা (সমাজ-মণ্ডপ)

বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। মানিয়াবাকে সকলে পুণ্য-মন্দিরের মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। এখানে বসিয়া অকথা-কুকথা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, দ্বেষ-হিংসা করিবার জো নাই। এক একটি মানিয়াবা বা মণ্ডপ হয় লম্বে ১২০ ফুট, প্রস্থে ৮০ ফুট, উঁচুতেও ৬০ ফুটের কম নয়। প্রবেশ-পথ কিন্তু খুব নীচু—মাথা নীচু করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়।

আমাদের দেশে যেমন রাঢ়ী-বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ আছে এবং সে রাঢ়ী-বারেন্দ্রে যেমন বহু বিভিন্ন পর্য্যায়—এখানকার অধি-

ছুরিকা-নৃত্য

বাসীদেরও তেমনি বহু শ্রেণী আছে, গোত্রাদি-বিভাগ আছে। মানিয়াবার মধ্যে পাথরের উচ্চাসনে বসিবার অধিকার গোত্রাধি-

পাল-তোলা জেলে ডিঙ্গি—সূর্য্যাস্ত-কালে
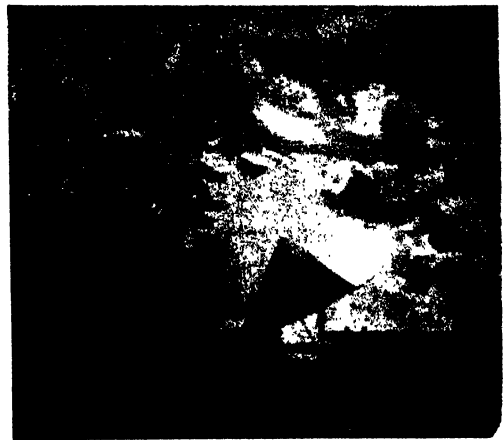
পতির। একটি শ্রেণীর নাম 'সূর্য্য'। বিদেশী শাসনাধিকারে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্য্যাদার পার্থক্য বাহিরে ঘুচিয়া গেলেও সামাজিক বা

পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে শ্রেণীর উৎকর্ষ হিসাবে যাহার যে মর্য্যাদা, সে মর্য্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উচ্চ শ্রেণীর অধিবাসীরা আজও পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলের অগ্রণী; তাঁরা বরণীয় আসন ভোগ করিতেছে। সারা বা সূর্য্যবংশীয়েরা এখানে সকলের উপরে। অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে সূর্য্যের

ঢাউশ-ঘুড়ি

উপাসক। উপাসনার মন্ত্র এইরূপ,—'হে সূর্য্যদেব, তোমার অধিষ্ঠান সুদৃঢ় হোক, প্রখর হোক! আকাশে তোমার যে তেজ, যে শক্তি দেখি, সেই তেজ, সেই শক্তিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করো। হে সূর্য্যদেব,

ঘাসের ঘাগরা-পরা নর্ত্তকী

আকাশে উদয় হইয়া আমাদের উপর তোমার প্রখর কিরণ বর্ষণ করো—তোমার কিরণে স্বাস্থ্য-সম্পদ্-সমৃদ্ধি আমাদের উপর অজস্র-ধারে বর্ষিত হোক।'

গিলবার্টিজদের মধ্যে ২৭টি বিভিন্ন শ্রেণী আছে—মানিয়াবায় প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তি প্রতিনিধি-স্বরূপ থাকে। অধিবাসীদের প্রত্যেককে মানিয়াবায় সদস্য-শ্রেণীভুক্ত থাকিতে হয়—থাকিলে লাভ এই যে, এক-দ্বীপের লোক বিনা-কপর্দ্দকেও যদি অন্য দ্বীপে যায়, তাহা হইলে সেখানে তার আশ্রয় বা আহার্য্যের এতটুকু অভাব ঘটে না।

এক জন মার্কিন সুধী গিলবার্ট দ্বীপে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন—এক দিন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। নদীর ঘাটে তরু-ছায়ায় দেখি একখানি ডিঙ্গি। ডিঙ্গিতে বসিয়া এক জন বৃদ্ধ কথা কহিতেছে এক নর-কঙ্কালের সহিত। কঙ্কালটির গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া তাকে কত সোহাগ-বাণী বলিতেছে! কথা শেষ হইলে বৃদ্ধকে প্রশ্ন

জেলে ডিঙ্গি (সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য)

করিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কঙ্কাল লইয়া ও কি করিতেছিলে? বুড়া বেশ সহজ কণ্ঠেই বলিল—আমার পিতামহের কঙ্কাল। পিতামহকে চোখে দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্ব্বে উনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কঙ্কালকে মনের কথা বলি।

বালিকা-বয়সে

মৃত আত্মীয়দের কঙ্কাল ইহারা সযত্নে রক্ষা করে। সে সব কঙ্কালকে তৈল মাখাইয়া স্নান করায়, তাদের সম্মুখে ভোজ্য-পানীয় নিবেদন করে। জীবিতের মতই মৃতের কঙ্কালও ইহাদিগের আদরের পাত্র। মৃতকে দেবতা বলে না। তারা দেবতার বন্ধু, মানুষের বন্ধু। মৃতের কঙ্কালকে আদর-যত্ন করিলে সে প্রসন্ন হইবে। সে দিবে স্বাস্থ্য, বৃষ্টি, সম্পদ্; প্রচুর মৎস্যে নদী ভরিয়া দিবে; তার পর মৃত্যু হইলে সমুদ্র-তীরে অপেক্ষা করিবে; মৃত জনকে সঙ্গে লইয়া দেবলোকে পৌঁছাইয়া দিবে।

শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রভাবে অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসার ঘটিয়াছে। সে জন্ম তরুণ সমাজে কঙ্কালের উপর মায়া এবং বিশ্বাসও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিথিল হইয়াছে।

গিলবার্টীজদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা এখন শতকরা ২৮। উত্তরাঞ্চলে যে সময় জাপানীরা গিলবার্ট আক্রমণ করে, তখন খৃষ্টীয় কাথলিক-মতাবলম্বিনী পঁচিশ জন গিলবার্টীজ মহিলা নার্সের কাজ করিতেছিলেন। তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

গিলবার্টীজরা মন্ত্র-তন্ত্রে এবং যাদু-বিদ্যায় বিশ্বাস করে। খাওয়া-পরা, স্নান, স্বপ্ন দেখা, মাছ ধরা, গাছে চড়া, নাচ, গল্প করা—সব বিষয়েই উহারা তুক-তাক মানিয়া চলে। আরোগ্য সৌভাগ্য কামনায় পুরানো তন্ত্র-মন্ত্র তুক-তাক মানিতে দ্বিধা বোধ করে না।

সৌভাগ্য কামনায় ছেলেমেয়েকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া পাথরের উপর পূর্ব্ব-মুখী তাহাদের বসায়; তার পর

সার সার ডিঙ্গি—বাচ্ খেলা

মাথায় পরাইয়া দেয় নারিকেল পাতার মুকুট এবং গায়ে বেশ জবজবে করিয়া নারিকেল তৈল মাখাইয়া দেয়; তার পর উদয়-সূর্য্যের পানে তাকাইয়া ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া মা-বাপ তিন বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে:—

'এই নারিকেল-পাতার মুকুট—এই নারিকেল তৈল—ইহাদের বলে রূপে-গুণে তুমি সকলের বরণীয় হও! যেখানে যত বড় বীর থাকুক, তাদের পরাজয় করিতে তোমার শক্তি দুর্জ্জয় হোক—তোমার খ্যাতি সকলের মুখে কীর্ত্তিত হোক! উচ্চ ভূমির উপর দিয়া তুমি চলিবে। তোমার বুকে হোক প্রদীপ্ত তেজ—মুখ হোক সুন্দর এবং অম্লান। প্রভাত-সূর্য্যের মত তোমার জীবন স্নিগ্ধ হোক, উজ্জ্বল হোক!' এমনি নানা অনুষ্ঠানের জন্ম নানা রকম মন্ত্র আছে।

গিলবার্টীজরা এ সব দ্বীপে কোথা হইতে আসিল, সে সম্বন্ধে গবেষণায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—আদি যুগে এ সব দ্বীপে কালো রঙের এক-জাতি লোকের বাস ছিল। তাদের কান ছিল বড় বড়, নাক ছিল চ্যাপটা,—তারা যাদুবিদ্যা লইয়া মত্ত থাকিত; তাদের দেবতা ছিল মাকড়শা এবং কূর্ম্ম। অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। অগ্নিকে পূজা করিত,—কিন্তু অগ্নিদগ্ধ বা অগ্নিপক্ব ভোজ্য গ্রহণ করিত না। এ জাতির নাম মাকড়শা।

মাকড়শা-জাতির পর এ দ্বীপে আসিল সমর-কুশল আর এক বীর নির্ভীক জাতি। নিজেদের তারা সাগর-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত। এ জাতি আসিয়াছিল বোয়েরা, হালসাহরা, ওয়াই দ্বীপ, দক্ষিণ সিলেবিশ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে। মাকড়শা-জাতির উচ্ছেদ ঘটিল না। তার কারণ, সাগর-বংশীয়েরা তাদের মেয়েদের লইয়া এ সব দ্বীপে আসে নাই—কাজেই তারা মাকড়শা-রমণীদের বিবাহ করিয়া সংসার পাতিল। তার ফলে যে সব সন্তানের জন্ম হইল, তাদের আকারে-প্রকারে নানা বৈসাদৃশ্যের সৃষ্টি হইল। এখান হইতে ১২০০ মাইল দূরে সামোয়া দ্বীপ। সেখান হইতে কয়েক

গাছের ভেলা

সহস্র সামোয়ান্ আসিয়া বাসা বাঁধিল গিলবার্ট, এলিশ, সাভাই এবং উপোলু দ্বীপগুলিতে; এবং বিবাহ-সূত্রে দ্বীপে-দ্বীপে বিচিত্র বংশ-ধারা প্রবাহিত হইল। এখানকার অধিবাসীরা বলে, তারা সামোয়ান্ বংশ-সম্ভূত। সাগরকে সকলে দেখে খেলার সাথী—সাগরে ভয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় এ জাতির নৈপুণ্য না কি অসাধারণ। আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বলিয়া দিতে পারে।

ইহাদের নৌকা বা ডিঙ্গির কারু-কৌশল দেখিলে বিস্ময় বোধ হয়। তাল-নারিকেলের তক্তা জুড়িয়া যে নৌকা বা ডিঙ্গি তৈয়ারী করে, তাহাতে পেরেক বা স্ক্রুপের নামগন্ধ নাই,—অথচ সাগরের দুরন্ত তরঙ্গে ডিঙ্গি নৌকার কোনো অনিষ্ট ঘটে না। নৌকায়-ডিঙ্গিতে পাল তুলিয়া সেই পাল চালনা করিয়া যে দিকে খুশী সবেগে ভাসিয়া চলে।

ঢাউশ-ঘুড়ি উড়ানো এবং সাগর-তরঙ্গ বহিয়া ডিঙ্গি চড়িয়া সদলে বাচ খেলা—গিলবার্টীজদের খুব আদরের স্পোর্টস বা খেলা।

গিলবার্টিজরা মাছ এবং শূকর-মাংস খাইতে ভালো বাসে। মাছ পায় অজস্র। কিন্তু মাছের চেয়ে তাদের কাছে অনেক বেশী মুখরোচক হাঙ্গরের মাংস। হাঙ্গর ধরিতে সাহস ও শক্তির প্রয়োজন —এ জন্য হাঙ্গর-মাংসের খাতির খুব বেশী। হাঙ্গর ধরিবার জন্য

গিলবার্টিজের বিরাম-সুখ

কাঠের যে মজবুত বঁড়শী তৈয়ারী করে, অতি-বড় দুরন্ত হাঙ্গরের সাধ্য থাকে না সে বঁড়শীর গ্রন্থি খুলিয়া পরিত্রাণ পাইবে।

সদলে সমুদ্রবক্ষে পাড়ি দিতে হইলে ডিঙ্গিতে কুলায় না। তখন দু'-চারিখানা ডিঙ্গি পাশাপাশি বাঁধিয়া ইহারা সেগুলির উপর প্রশস্ত মাচা বেশ কায়েমি করিয়া আঁটিয়া লয়; দুরন্ত ঢেউয়ে মাচা রক্ষা করা যায় না। তবে মাচা বাঁধিয়া লেগুনে বিচরণ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও উপভোগ্য।

মৃত্যুর পর স্বর্গবাস গিলবার্টিজ নর-নারীর চরম কাম্য। স্বর্গের পথে চলিতে মৃতের আত্মার ভুল না ঘটে, এ জন্য মৃত্যু ঘটিলে মৃতের দেহে পরিচয়পত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়। মাটীতে কবর দিবার সময় পা দু'টিকে পশ্চিম-মুখী করিয়া মৃতকে শোয়ানো হয়। তার কারণ, স্বর্গ হইতে দেব-দূতী আসিবামাত্র মৃত ব্যক্তি দেখিতে পাইবে। দূতী আসে পশ্চিম দিক্ হইতে। তাই মৃতকে পশ্চিম-মুখী রাখার বিধি। দূতী তার চঞ্চুতে মৃতকে ধরিয়া স্বর্গে লইয়া যায়। স্বর্গের দ্বারে বড় জাল খাটানো আছে। দূতী মৃতকে সেই জালে ফেলিয়া দেয়। দ্বারে আছে দ্বারী। দ্বারী তখন মৃতকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, জীবনে সে পুণ্য করিয়াছে, না পাপের বোঝা ভারী করিয়াছে! ব্যভিচার, বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া থাকিলে দ্বারী তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় নরকের গহ্বরে। নরকে অনন্ত কাল দাহ-যাতনা ভোগ করিবে। যারা পুণ্যাত্মা, তারা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া অনন্ত কাল শান্তি ভোগ করে।

গিলবার্টিজদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নাই। অনেকের ধারণা, তারা অসভ্য! সভ্যতার মাপ-কাঠিতে অসভ্য বলিলেও তাদের ছড়ায়
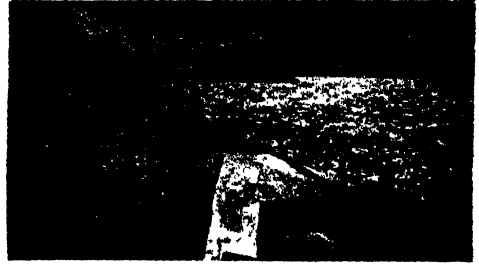
ফশ্‌ফেট্ লইয়া ওশান্ দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ

গানে যে কবিত্বের পরিচয় মেলে, সে-কবিত্ব সত্যই সাধন-দুর্লভ। কয়েকটি ছড়া-গানের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারি একটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ সন্দর্ভ শেষ করিব।

'রাত্রে বসে আছি সাগর-কূলে—তার কথায় মন আমার ভরে আছে! অন্ধকার ভরা পথে সে চলেছে, তার পা দু'খানি যেন ঐ আকাশের কালো মেঘের পিছনের আলো-ভরা চাঁদের মত! তার অনাবৃত কাঁধে রূপের আভা, রূপালি জ্যোৎস্নার মত সুন্দর! তার দু'খানি হাতের স্পন্দনে যেন হাজার হাজার নক্ষত্র ঠিকরে পড়ে! আমার পানে চোখ তুলে সে যখন চায়, কি লজ্জায় আমার চোখ বুজে আসে—তার পানে আমি চাইতে পারি না! অথচ আমার এই চোখে আকাশের জ্বলন্ত সূর্য্যের পানে আমি চেয়ে থাকি!'

যে-জাতের গানে এমন ভাব জাগে, সে-জাতকে অসভ্য বলিলে নিজেদের অসভ্যতা প্রকাশ পাইবে!

ভোর

নিশীথের তারাগুলি ধীরে ধীরে অপস্রিয়মান,
তরল আঁধারে স্তব্ধ অদ্ভুত কোমল আকাশ;
ঘুমন্ত পৃথিবীর কোনো কথা শুনি পেতে কাণ
ঠাণ্ডা বাতাসে যেন ভেসে আসে দূরে বুনো হাঁস।
বুনো হাঁস ডেকে যায় বনানীর প্রান্ত হতে আকাশের তীরে,
মাটি আজ কথা কয় এই ভোরে মৌন স্তব্ধতায়,
ঝিম্ ঝিম্ কোনো শব্দ শোনো তার, শোনো অতি ধীরে;
আকাশের রক্তে যেন তারাদের রক্ত মিশে যায়।
পৃথিবীর এই ক্ষণে জাগেনিকো মলিন স্বরূপ,
আধো ঘুমে শুনি যেন কার কথা মৌন-শেষ রাতে।
আকাশ বাতাস যেন সমস্ত মনে-প্রাণে চুপ,
তারাগুলো জলজ্বল চেয়ে থাকে বিস্ময়ের সাথে।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

৩

সাত-আট মাস পরের কথা।

আষাঢ়ের শেষ। উলুন্দীর বাবুদের বাড়ী মেনকার বিবাহের কথা পাকা। পাঁজি-পুঁথি দেখিয়া তাঁরা বিবাহের দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন ১৬ই শ্রাবণ। দু'পক্ষে আয়োজন স্বরু হইয়াছে। মাখন গাঙ্গুলি পণ করিয়াছেন, ঘটায় উলুন্দীকে হারাইবেন!

শিবহীন যজ্ঞ। বিন্দুমতী আসিলেন না। আসিবার জো নাই—পাঁচ জনে গণ্ডগোল তুলিয়া শুভ কাজ ভণ্ডুল করিয়া দিবে! মেজ ছেলে বলিয়াছিল—মা···মাখন গাঙ্গুলি জবাব দিয়াছিলেন,—না!

চৈত্র মাসে বুড়া শিবতলায় বিন্দুমতীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মেয়েরা চির দিন নীল-ষষ্ঠীর পূজা দিয়া আসে—এ বার তারা বিন্দুমতীকে এড়াইয়া পূজা দিয়াছে। সে জন্য বিন্দুমতীর ক্ষোভ নাই—তিনি একা গিয়া সংসারের কল্যাণে শিবের পায়ে পূজা-অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছেন।

বর-পক্ষের আশীর্ব্বাদ চুকিয়া গিয়াছে। চালশা হইতে মাখন গাঙ্গুলির সঙ্গে লোক গিয়াছিল আশী জন। তিন দিন পরে মেয়ে-আশীর্ব্বাদ। উলুন্দী হইতে পাকা দেখিতে একশো জন লোক আসিবে। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য মাখন গাঙ্গুলি ব্যবস্থা যা করিয়াছেন, পরেশ গাঙ্গুলিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, গ্রামের মান রক্ষা পাইবে বটে!

চালশার চট-কলে কুলির সর্দ্দারী করে নন্দ। তার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই! বিশ-পঁচিশ জন লোক লইয়া যে মণ্ডপ তৈয়ারী করিতেছে, তার কোথাও ত্রুটি নাই! কলিকাতার সঙ্গে নন্দর যোগ-সম্পর্ক আছে। সেখানকার কেতা-ফ্যাশনের খবর রাখে। সে বারে কলিকাতার এগজিবিশনে মণ্ডপ তৈয়ারী করিতে চালশা হইতে নন্দর ডাক পড়িয়াছিল—এ কাজে তার মাথা আছে। লেখাপড়া শেখে নাই। বাপ পাঠাইয়াছিল কলিকাতার আর্ট-স্কুলে ছবি আঁকা শিখিতে! কিছু দিন ছবি আঁকার কাজ শিখিয়া বখামিতে মজিয়াছিল,—তার পর বাপ মারা গেল। তখন ঘরে ফিরিয়া সংসারের চার্জ্জ লইয়া বসিয়াছে। বাপের ছিল কারবার, তার উপর হাড়-কৃপণ বাপ—দু'পয়সা রাখিয়া গিয়াছে। বাপের ব্যবসা নন্দ চালাইতে পারিল না, ব্যবসা ছাড়িয়া চটকলে কুলির সর্দ্দারী করিতেছে! বিবাহ হইয়াছিল। পাঁচ বছরের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে! স্ত্রীর সঙ্গে নন্দর সম্পর্ক প্রীতিমধুর ছিল না। আর বিবাহ করে নাই। কুলি খাটায়, মদ খায়, মাঝে মাঝে ষ্টেজ বাঁধিয়া সখের থিয়েটারের ব্যবস্থা করে। এমনি করিয়া তার দিন কাটে। বাড়ীতে আছে বুড়ী মা আর ছেলে কাঞ্চন।

সে দিন কলের ছুটি। মাখন গাঙ্গুলির বাড়ী মণ্ডপ তৈয়ারীর কাজে সারা দিন লোক খাটাইয়া নন্দ গিয়া মদের দোকানে ঢুকিয়াছিল। সেখানে প্রচুর মদ গিলিয়া যখন বাহির হইল, তখন কঠিন পৃথিবী উবিয়া যেন ধূম্রলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। সারা পৃথিবী এমন দুলিয়া উঠিল যে, নন্দ পগারের ধারে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল।

পড়িয়াছিল অনেকক্ষণ। পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পথের লোক তাকে তুলিয়া আনিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। তারা জানে, নন্দ এমন পড়িয়া থাকে, আবার নেশা কাটিলে উঠিয়া বাড়ী যায়। মদ খাইলে খানায়-ডোবায় পড়িয়া থাকা যে স্বাভাবিক, এ গ্রামের সকলে তাহা জানে।

এক জনের কিন্তু মমতা হইল। মিসনরীদের মেয়ে-স্কুলের হেড-মিষ্ট্রেশ মিস্ আলিস মিত্তির এ পথ ধরিয়া নদীর ঘাটে চলিয়াছিল···ও-পারে পাদরী সাহেবের গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণে।

পথের ধারে মানুষ পড়িয়া আছে বেহুঁশ হইয়া···জোৎস্নার আলো তার মুখে পড়িয়াছে···আলিস্ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মানুষটির পানে চাহিয়া দেখিল। আলোয় মুখের যে ভাব দেখা গেল, তাহাতে বুঝিল, লোকটি অসুস্থ! মদের গন্ধে বুঝিল, মাতাল!

মাতাল হইলেও মানুষ—এবং সে মানুষ এমন অসহায় বিপন্ন! মেয়ে-মানুষের প্রাণ! আলিস আসিয়া ডাকিল—শুনছেন?

কথাটা নন্দর কানে গেল—কিন্তু চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবে বা সাড়া দিবে, নন্দর এমন সামর্থ্য ছিল না।

আলিস বলিল,—আপনার বাড়ী কোথায়?

সাড়া মিলিল না। নন্দর দেহ শুধু একটু নড়িল!

আলিস বলিল—বাড়ী কোথায় বললে খপর দিতে পারি!

এবার কোনো মতে ঘাড় ফিরাইয়া নন্দ চোখ মেলিয়া চাহিল। মনে হইল, জ্যোৎস্না যেন জমাট বাঁধিয়া চোখের সামনে জড়ো হইয়াছে! কণ্ঠে অস্ফুট একটা স্বর জাগিল।

আলিস উঠিয়া দাঁড়াইল। চারি দিকে চাহিল। কোথাও কেহ নাই!···

ভাবিল, উপায়? লোকটাকে এমনি ফেলিয়া যদি চলিয়া যায়, কে জানে, যে-রকম অবস্থা···শেয়াল-কুকুরের উৎপাত আছে!

চকিতে মন স্থির করিয়া ফেলিল। ঠিক করিল, নিমন্ত্রণের আগে এ কাজ! অসহায় আর্ত্তকে রক্ষা!

দ্বিধা-সঙ্কোচ না করিয়া তখনি সে ঝুঁকিয়া নন্দর একখানা হাত ধরিল, বলিল—আমি ধরছি। আপনি ওঠবার চেষ্টা করুন!

বলিয়া হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সে আকর্ষণ করিল। নন্দ এবার চোখ মেলিয়া চাহিল। মনে হইল···

নেশার ঘোরে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল! দেখিতেছিল, কোথায় যেন গিয়াছে···কাঁটা-বন পার হইয়া দেহে কাটা-ছেঁড়া দাগ লইয়া···নূতন জায়গা! সেখানে শুধু ফুল আর ফুল···লাল নীল হলুদ রঙের ফুল···অজস্র ফুল! মুগ্ধ নয়নে সে যেন চাহিয়া সেই ফুলের শোভা দেখিতেছে···মস্ত একটা ফুটন্ত গোলাপ! সেই গোলাপের পাপড়িগুলা নিমেষে যেন গুচ্ছ বাঁধিল···তার পর ফুলের বুক হইতে উঠিয়া সামনে দাঁড়াইল এক অপ্সরী!

আলিসের পানে চাহিয়া রহিল। চোখে তার পলক পড়ে না! ভাবিতেছিল···

চোখে অর্থহীন উদাস দৃষ্টি। আলিস বলিল,—ওঠবার চেষ্টা করুন। আমি ধরছি···

আলিস বেশ জোরে তার হাত ধরিল। বলিল—উঠুন, দাঁড়ান···

কোনো মতে নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। পায়ে জোর নাই! কে যেন লাঠি মারিয়া পা দু'খানা ভাঙিয়া দিয়াছে!

আলিস বলিল—আপনার বাড়ী কোথায়?

নন্দ বলিল—কাছে।

—আপনার নাম?

নন্দ নাম বলিল।

নাম শুনিয়া আলিস চিনিল। দু'মাস পূর্ব্বে স্কুলে একটা ফাংশন হইয়া গিয়াছে···সে ফাংশনে স্কুলের প্রাঙ্গণ সাজানো হইয়াছিল; এবং যে-লোক সাজাইয়াছিল, শুনিয়াছিল, তার নাম নন্দ!

আলিস বলিল—আপনি ডেকরেটর নন্দ বাবু?

মাথা নাড়িয়া নন্দ জানাইল, তাই!

নন্দর পা টলিতেছিল। পড়িয়া যাইবার জো! আলিস তাকে ভালো করিয়া ধরিল। বলিল—আসুন আমার সঙ্গে। বাড়ী পৌঁছে দেবো।···কোন্ দিকে যেতে হবে?

বাতাসের ঘায়ে টুকরা মেঘ যেমন ছিঁড়িয়া ভাসিয়া যায়, নন্দর নেশার ঘোর তেমনি আলিসের দরদ-ভরা কথার ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল! আলিসের কথার উত্তরে নন্দ একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

সেই পথে খানিকটা চলিয়া আসিয়াছে, দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। এক তরুণ বয়সের রমণীর বাহু-লগ্ন নন্দ! এ দৃশ্য যেমন অপূর্ব্ব তেমনি অপ্রত্যাশিত। ভদ্রলোক দু'জন দাঁড়াইল।

এক জন বলিল—নন্দ না?

আর এক জন বলিল,—হ্যাঁ···

আলিস শুনিল।···তাদের দিকে চাহিয়া বলিল—এঁর বাড়ী জানেন?

তারা বলিল—মাখন গাঙ্গুলির বাগানের পরেই ওর বাড়ী!

এ-কথা বলিয়া তারা আর দাঁড়াইল না···চলিয়া গেল।

আলিস জানে মাখন গাঙ্গুলির বাগান। নন্দকে লইয়া সে চলিল নন্দর বাড়ীর দিকে।

বাড়ী মিলিল। নন্দকে তার মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া আলিস বলিল—আমি তাহলে আসি।

নন্দর মা বলিল—তুমি কে মা?

মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—আমি আপনাদের দেশের লোক নই। বিদেশী!

মা বলিল—তাই তুমি এমন ভালো মা···এত দয়া!

আলিস হাসিল। বলিল—পথের ধারে মানুষকে অমন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে মানুষ এটুকু যদি না করে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানো মিথ্যা।

নিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিল,—আজ পর্য্যন্ত গরীব-দুঃখীর পানে এমন করে কাকেও চাইতে দেখিনি মা। তা তুমি ···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মা আলিসকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিল। আলিসের পায়ে জুতা···হাতের আগাগোড়া ঢাকা জামা···মাথায় কাপড় নাই···শাড়ী যে-ভাবে পরিয়াছে···

আলিস বলিল—এখানে ঐ মেয়ে-স্কুল আছে না, আমি সেই স্কুলে চাকরি করি!

মা শুধু নির্ব্বাক্ নয়নে আলিসের পানে চাহিয়া রহিল। মুখে কথা ফুটিল না!

আলিস বলিল—ওঁকে শুইয়ে দিন গে, আমি আসি···কাজ আছে

এ কথা বলিয়া আলিস চলিয়া গেল। সদরে নন্দ আবার মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল···ডাকিল,—মা.···

৪

পরের দিন সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া নন্দ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। রাত্রিটা অচেতন ভাবে কাটিয়াছে।

বসিয়া অনেক কথা ভাবিতেছিল।

মা আসিয়া বলিল—গাঙ্গুলি-বাড়ী থেকে দু'বার লোক এসেছিল রে তোকে ডাকতে।

নন্দ সে কথার জবাব দিল না।

ছেলে কাঞ্চন আসিয়া বলিল—আমাকে লাটুর পয়সা দেবে বলেছিলে, বাবা···হুঁ, আজ আমার চাই!

নন্দ এ-কথারও জবাব দিল না।

কাঞ্চন আবার বলিল। আবার···আবার। বায়না তুলিল··· রাগিয়া খিঁচাইয়া নন্দ বলিল—ঠাকুমার কাছ থেকে নিগে যা ···আমাকে দিক্ করিসনে বলছি।

বাপের মূর্ত্তি দেখিয়া ছেলে গিয়া গোয়ালে ঠাকুমাকে ধরিল,—আমার লাটুর পয়সা, ঠাকুমা ···

নন্দ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আকাশ-পাতাল কি যে ভাবিতেছে ···

বাহিরে কালো ডাকিল—নন্দদা আছো?

বলিতে বলিতে সে ভিতরের উঠানে আসিল। নন্দকে দেখিয়া বলিল—এই যে, আছো। বাঃ! আমি ভাবলুম, বুঝি এখনো বে-এক্তিয়ার আছো···কাল যে-রকম গিলেছিলে ···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সে বলিল — বসে কেন? ওদিকে সালু-টালু সব ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। তুমি গিয়ে রং মিলিয়ে না দিলে কেউ ঝুলোতে পারছে না। বাবুরা তাড়া দিচ্ছে। বলছে, আজকের মধ্যে সব কাজ শেষ করে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

কে যেন কাহাকে বলিতেছে! নন্দ উদাস দৃষ্টিতে কালোর পানে চাহিয়া রহিল।

কালো তাকে ছুই একটা ধাক্কা দিল, বলিল—হলো কি? এঁ্যা···এমন ব্যোম ভোলানাথ হয়ে বসে আছো!

ঝাঁজালো স্বরে নন্দ বলিল—ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিসনে, বলছি কালো ···তুই যা!

কালো অবাক্! দু'চোখ বড় করিয়া কালো বলিল,—যাবো! তার মানে?

নন্দ বলিল—যাবি মানে, চলে যাবি!

কালো বলিল—আমি গেলে তো চলবে না। তোর উপর কাজের ভার। তাছাড়া হ্যাঁ, বাবুরা বলছিল, কলকাতা থেকে সেই যে নক্সওর ঝাড় বাতি এসেছে, ওটা মাঝখানে না বসিয়ে ক'নে যেখানে বসবে আশীর্ব্বাদের সময়, সেই যে মাচা তৈরী করেছিস, সেই মাচার মাথায় ঝুলোতে হবে!

নন্দ বলিল—তা যা না, গিয়ে বোলাগে।

—তুই যাবি নে ?

—না।

বিস্ময়ে কালোর মুখে খানিকক্ষণ কথা সরিল না। কালো বলিল—তুই না গেলে বুঝি দেবে কে? আমি ও-ভার নিতে পারবো না। বাপ্ রে, বাবু কি রকম খুঁতখুঁত করে!

নন্দ বলিল—যা বলেছি, সেই রকম করবি। তুই না পারিস্, মাস্তিককে আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি···সে সব ঠিক করে দেবে'খন! আমাকে মাপ কর্ কালো···আমার আজ কাজ করবার ইচ্ছা নেই!

—শরীর খারাপ ?

—হাঁ···হাঁ···এর পর ভালো বোধ করলে আমি যাবো।

—কিন্তু বাবু যখন বলবে ···

—জবাব দিবি, তার শরীর খারাপ। অসুখ হলেও গিয়ে খাটতে হবে,···সত্যি, আমি বাবুর খানা-বাড়ীর চাকর নই তো!

নন্দকে কালো এমন দেখে নাই! আজ এ-ভাব দেখিয়া ভাবিল, হয়তো কালিকার নেশার ফলে দেহে এখনো জুত্ পায় নাই!···কথা ব্যয় করিয়া ফল হইবে না···নন্দ কি রকম একরোখা, তা সে জানে। কাজেই আর কথা না বাড়াইয়া নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল! নন্দ তেমনি বসিয়া রহিল···চোখে সেই অর্থহীন উদাস দৃষ্টি!

মা আসিল। বলিল—বসে আছিস্! কালো এসেছিল না? গেলি নে তার সঙ্গে ?

নন্দ বলিল—না!

মা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিল,—মা···

মা ফিরিল।

নন্দ বলিল—সে মেয়ে-লোকটি পাদরীদের ঐ মেয়ে-ইস্কুলে চাকরি করে, বললে ?

মা বলিল—তাই বললে।

—হুঁ! বলিয়া নন্দ আবার চিন্তার গহনে ঢুকিল।

মা বলিল—চা খাবি ?

নন্দ বলিল—না। তার পর মায়ের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—কাল আমি নেশার ঝোঁকে বেলেল্লাপনা করেছিলুম?··· সেই মেয়ে-লোকটির সামনে ?

মা বলিল—বাড়ীতে কৈ···না। যে-কাণ্ড করো তুমি বাড়ী ফিরে···তার কিছু নয়···একেবারে যেন নিঝুমপানা!

নন্দ বলিল—ঠিক বলছো···কোনো হাঙ্গাম করিনি ?

মা বলিল—না রে, না।

বলিয়া মা গিয়া ভাঁড়ারে ঢুকিল। নন্দ বসিয়া রহিল।

বাড়ীর প্রাঙ্গণে সহসা যেন আলোর লহর···আলিস!

চমকিয়া নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—আপনি ভালো আছেন!

নন্দর মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া আলিসের পায়ের উপরে লুটাইয়া পড়ে! পারিল না। তার মুখে ভাষা ফুটিল না। সে নির্ব্বাক্···নিস্পন্দ!

আলিস বলিল—আপনার মা কোথায় ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হইল না। মা বাহিরে আসিল,—হাসি-মুখে কহিল—ও মা···তুমি!

আলিস বলিল—হাঁ। কাল রাত্রে আর ও-পার থেকে ফেরা হয়নি। আজ এই এখন ফিরছি। ভাবলুম, এই পথেই যাচ্ছি, এক বার খপর নিয়ে যাই!

মা বলিল—বসো মা, আসন এনে দি!

আলিস বলিল—না, না···কিছু দরকার নেই! আমি এখনি চলে যাবো। বসবার সময় নেই। ইস্কুল আছে।

মা বলিল—একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও মা। ঘরের তৈরী নারকোল-নাড়ু।

মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—এখন খেতে পারবো না। সকালে সেখান থেকে খেয়ে আসছি।

মায়ের মুখ মলিন হইল। মা বলিল—ভালো জিনিষ কত-কি খাও মা! আমার ঘরের সামান্য···

বাধা দিয়া আলিস বলিল,—না, না, তা নয়। আপনি দুঃখ করবেন না। বেশ, আমাকে আপনি দিন ঘরের তৈরী নারকোল-নাড়ু। বিকেলে জল-খাবার খাই···তখন খাবো।

মা খুব খুশী হইল। বলিল—তাহলে আনি, একটু অপেক্ষা করো।

মা গেল নাড়ু আনিতে। আলিস চারি দিকে চাহিল।

প্রাঙ্গণটি ছোট নয়···এক দিকে বাগান···টগর, অপরাজিতা, দোপাটী, করবী ফুলের গাছ···অজস্র ফুলে ভরিয়া আছে! আর এক দিকে নানা শাকসব্জী। প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মা ফিরিল কলাপাতার ঠোঙায় কু'টি নাড়ু লইয়া। হাসিয়া মা বলিল—কিসে করে যে দি, তাই এই ঠোঙায়···

আলিস বলিল,—কেন, কলাপাতার ঠোঙা তো খুব ভালো! বলিয়া মায়ের হাত হইতে নাড়ু লইল। বলিল—ফুলের উপর আপনার খুব মায়া, দেখছি!

মা বলিল—পূজো-আর্চ্চা করি। তাছাড়া নন্দর এক দিন সখ ছিল এ-সবের! ওর ছবি ভাখোনি, মা? ও যে কলকাতার ছবি-আঁকা ইস্কুলে ছবি আঁকা শিখতো।

আলিস চাহিল নন্দর দিকে, কহিল—আপনি ছবি আঁকেন ?

নন্দ বলিল—আঁকতুম। এখন আঁকি না।

আলিস বলিল—ছবি আঁকা ছেড়ে দেছেন ?

নন্দ বলিল—হু···

আলিস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল নন্দর পানে। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অন্যায়! আচ্ছা, আসি আমি। আর এক দিন আসবো। আপনার এখান থেকে দোপাটী ফুল নিয়ে যাবো। ইস্কুলে দোপাটীর চারা বসিয়েছিলুম এত···তা কোনটাই হলো না! এ ফুলে এত বাহার···আমার ভারী ভালো লাগে।

নন্দ বলিল—মাটী তাহলে খুব খারাপ। না হলে এ ফুলের জন্য গাছের খুব বেশী পরিচর্য্যা করতে হয় না। একটু ভালো মাটী হলেই ভালো গাছ হয়, ফুলও হয়।

আলিস বলিল—অত জানি না তো। একটা মালী আছে···সে যা করে, তাই।

নন্দ বলিল—এখনো সময় আছে। বলেন যদি তো আমি দিতে পারি দোপাটীর চারা। তবে মাটীটা দেখতে হবে।

—আসবেন এক দিন ? আমার ফুলের খুব সখ···ফুল এত ভালোবাসি। ফুলের বাগানে ফুল আছে···খুব সামান্য। আমি তো জানি না কি করলে ফুল ভালো হয়, গাছে তেজ বাড়ে।

নন্দ বলিল,—বেশ, আমি দেখে আসবো। দেবো আপনার বাগান ঠিক করে!

আলিস বলিল—আপনাকে তাহলে অনেক ধন্যবাদ দেবো।

সে দিন এই পর্য্যন্ত।

তার পর দুপুরে আহারাদি সারা হইলে নন্দর আর তর সহিল না! সে চলিল পাদরীদের মেয়ে-স্কুলে।···

আলিসের সঙ্গে দেখা হইল। জমি দেখা হইল···গাছ দেখা হইল। নন্দ বলিল—সার-মাটী মিশিয়ে এ-মাটীকে এমন করে দেবো যে গাছ যা হবে, আর সে সব গাছে ফুলও একেবারে অজস্র!···

নন্দ চলিয়া আসিতেছিল, আলিস বলিল,—একটা কথা···

নন্দ বলিল—বলুন···

আলিস বলিল—আপনার এত সব জানা আছে···মদ খান কেন ?

নন্দর মুখে যেন চাবুক পড়িল! নন্দ বলিল,—কেমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে!

—ছাড়া শক্ত ?

—না···আচ্ছা, মদ আর খাবো না।

সে দিন গাঙ্গুলি-বাড়ীতে পাকা দেখার সমারোহ। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিমন্ত্রণ হইয়াছে! বাড়ীতে নহবৎ বসিয়াছে··· গ্রামের লোক সকাল হইতে সেখানে গিয়া জুটিয়াছে।

মেয়েরা স্কুলে আসে নাই। ছুটী নাই। তারা আসে নাই উৎসব দেখিবার লোভে!

আলিসের কাজ নাই। একা···আলিস ভাবিল, ও-পারে মিসনারী-হোমে দু'-চারি জন বন্ধু-বান্ধব আছে···সেখানে ঘুরিয়া আসিবে। সে দিন দেখা হইয়াছিল···সকলে কত অনুরোধ করিল।

গাঙ্গুলিদের বাগানের সামনে দেখা নন্দর মায়ের সঙ্গে।

নন্দর মা বলিল—কোথায় যাচ্ছো মা ?

আলিস বলিল—স্কুল বন্ধ করতে হলো। কাজ নেই। তাই।··· আপনি নেমন্তন্ন-বাড়ী যাননি ? দেশের সকলে গেছে!···

কথা শেষ করিয়া আলিস মৃদু হাস্য করিল।

নন্দর মা বলিল—আমি যাবো না!

—কেন ?

নন্দর মা বলিল—তুমি তো এ গাঁয়ের মেয়ে নও মা···জানো না!···বাবুরা করছেন সব···কিন্তু ঐ সেই রামচন্দরের অশ্বমেধ যজ্ঞ! যজ্ঞের মূল সীতা দেবী···সেই সীতা দেবী বনবাসে।

আশ্চর্য্য কথা! আলিস বলিল—তার মানে ?

নন্দর মা তখন গাঙ্গুলি-পরিবারের ইতিহাস খুলিয়া বলিল। বাহির হইতে যাহা শুনিয়াছে, সেই শোনা কাহিনীর সঙ্গে নিজের অনুমান মিশাইয়া যে-কাহিনী সে বলিল, তার অপূর্ব্বতায় আলিসের বিস্ময়ের সীমা নাই!

নন্দর মা বলিল—কাজ নেই তো! আসবে মা ? এই বাগানে থাকেন ও-বাড়ীর লক্ষ্মী···ছোট বাচ্ছাটুকুকে নিয়ে।

আলিস বলিল,—চলুন···

বিন্দুমতীর সঙ্গে আলাপ হইল। অনেক কথা হইল···

আলিস বলিল—কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ে···আপনি যাবেন না···আপনার আশীর্ব্বাদের কত দাম!

বিন্দুমতী বলিলেন—সে আশীর্ব্বাদ সব সময়েই করছি মা। মায়ের জীবন তো ছেলে-মেয়েদের জীবনেই!

আলিস বলিল—তা বলে ওঁদের কর্ত্তব্য···

বিন্দুমতী বলিলেন—সমাজে পাঁচ জনকে নিয়ে চলতে হয়··· তারা যদি পাঁচ কথা বলে ? তাছাড়া যে-ঘরে বিয়ে হচ্ছে, ভয়ানক তাদের নিষ্ঠা।

আলিস বলিল—এর নাম নিষ্ঠা ? একে বলে···

কি বলে, সে-কথা মুখে বাহির হইল না। সে কথায় যদি উনি আঘাত পান ?···

বাহিরে কে ডাকিল—মা···

বিন্দুমতী চমকিয়া উঠিলেন! এ কণ্ঠ নিমেষে চিনিলেন! যার কথায় মন আজ ভরিয়া আছে···বলিলেন—মেনি!

—হ্যাঁ মা···

—কি রে ?

বিন্দুমতী উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে মেয়ে মেনকা; সঙ্গে পুরুত-ঠাকুর।

পুরুত-ঠাকুর বলিলেন—মাকে না প্রণাম করে গেলে শুভ কাজ নিখুঁৎ হবে না। আমি বোঝালুম···ওঁরা বুঝলেন। বাবু বললেন, বেশ, তাহলে এই বেলা যান, আপনি নিজে সঙ্গে যান! সেখানে কিছু মুখে না দেয়, দেখবেন। উলুন্দী থেকে ওরা আসবার আগেই আপনি তাহলে ঘুরে আসুন।

বিন্দুমতী শুনিলেন। শুনিয়া কাঠ হইয়া রহিলেন···কোনো কথা বলিলেন না।

পুরুত ডাকিলেন,—মাকে প্রণাম করো মেনকা-দিদি।

মেনকা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিন্দুমতী মেয়ের চিবুকে হাত দিয়া চক্ষু মুদিলেন।

মেনকা ডাকিল,—মা···মাকে জড়াইয়া ধরিল।

পুরুত বলিলেন,—আর নয় দিদি। এসো, আমরা যাই···

মাকে ছাড়িয়া মেনকা বলিল,—আসি মা।

মা ডাকিলেন—মা···

চক্ষু বাষ্প-জড়িত।

মেনকা চাহিল মায়ের পানে···মায়ের দুই চোখের কোণে অশ্রু!

পুরুত-ঠাকুর বলিলেন.—আসি মা।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়িল ঘরের দ্বারে। পড়িবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন! খৃষ্টানী মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারণী! চারি দিকে চাহিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন! মেনকা তাঁর পিছনে।

বিন্দুমতী যেন পাথর বনিয়া গিয়াছেন! আলিস সদ্য যে কাহিনী শুনিয়াছে. বুঝিল, বিন্দুমতীর জীবনটা তিলে-তিলে কি করিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে! তার মুখে কথা নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সহজিয়া সাধন

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সহজিয়া সাধকের রূপ, রস, রতি, প্রেম, রাগ, লীলা, বিলাস সমস্তই আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের ব্যাপার এবং আত্মাশক্তি কুণ্ডলিনীই এই সহজ সাধনার মূল আশ্রয়। যথা—

"সহজ ভজনে মূল সেই আত্মাশক্তি।"

—নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চণ্ডীদাস প্রেম সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়।
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোকধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ।
কায়মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেমধন।"

চণ্ডীদাসের প্রেমের যাজন অতীব নিগূঢ় এবং উহা রসস্বরূপ। এই প্রেমের যাজনে চণ্ডীদাস ইড়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবার সময় সাধন করিতে প্রাণবায়ুকে সংযমিত করিতে বলিতেছেন। কারণ, প্রাণবায়ুকে সংযমিত করিতে পারিলেই মন সংযমিত হয়। আর এই প্রাণসংযম পন্থাতেই চণ্ডীদাসের মতে ব্রজের নিত্যধন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় ও শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার (তন্ত্রমতে শিব ও শক্তির) যুগলকিশোররূপ ও সম্মিলন দেখা যায়। এই অবস্থা লাভ হইলে অর্থাৎ যাঁহার দেহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার (তন্ত্রমতে শিবরূপী পরমাত্মা ও শক্তিরূপা জীবশক্তি কুণ্ডলিনীর) নিত্য বিলাস হয়, তিনি "যেন জীয়ন্তে মরা" সদৃশ হন অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া থাকেন (১)। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই 'জীয়ন্তে মরা'র প্রসঙ্গ অনেক পদেও দেখা যায়। যথা—

"চণ্ডীদাসে বলে নবীন পীরিতে
জীয়ন্তে হইলাম মরা।"

অমৃতরসাবলী গ্রন্থেও এই 'জীয়ন্তে মরা'র প্রসঙ্গ আছে। যথা—

"রস গুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হলাম মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর বাহ্যে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা।"

নরোত্তম দাসও বলিতেছেন ;—

"পীরিতি তাহাতে পরস যাহাতে
সেই সে লইতে পারে।
সব পরিহরি গুরু বস্তু করি
যে জন জীয়ন্তে মরে।"

আমরা দেখিলাম যে, চণ্ডীদাসের 'প্রেমের যাজন' দেহতত্ত্বসাধনা; কোন মেয়ে মানুষ লইয়া সাধনা নহে। চণ্ডীদাসের রতিও দেহতত্ত্ব-সাধনারই বিষয়—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এই রতি যে স্ত্রীপুরুষের লৌকিক রতি নহে, তাহা চণ্ডীদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদাংশে বেশ বোঝা যায়। যথা—

"প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।"

চণ্ডীদাসের রাগের সাধনে 'দেহরতি'র স্থান নাই। তিনি বলিতেছেন ;—

"মানুষের (১) রতি সাধন পীরিতি
বসতি ব্রহ্মাণ্ড পার।"

এই রাগের সাধন দেহতত্ত্বসাধনা।

চণ্ডীদাসের রস মানসিক ভাববোধক কোন কিছু নহে, ইহা গতিশীল। চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি।"

বীজমন্ত্রের ভাবনায় এই রসের গতি হয় (২)। এই রসের গতিই তন্ত্রের কুণ্ডলিনী ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের রাধাশক্তি। মুকুন্দরামের ভৃঙ্গরত্নাবলী গ্রন্থে আছে ;—

"অতএব রসের রূপ রতি সে হইল।
রতিরূপ রাধা বলি গ্রন্থেতে লিখিল।"

এই কুণ্ডলিনী বা রাধা শক্তি চণ্ডীদাসের পদে 'প্রেম' নামেও অভিহিতা দৃষ্ট হন। যথা—

"আনন্দের আনন্দ সচ্চিদের বিন্দু
প্রেম উপজিল তায়।
অধঃ পদ্ম হতে কামের (কামবায়ুর) সহিতে
বাঁকা গতি চলি যায়।

প্রেম অর্থাৎ কুণ্ডলিনী কামবায়ুর সহিত বাঁকা গতিতে সহস্রারে চলিয়া যান। আনন্দভৈরব গ্রন্থে এই গতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"বাঁকা গতি চলন তার যেন বিদ্যুল্লতা।"

মুকুন্দরাম দাস এই গতিকে 'রাধা প্রেম' নাম দিয়াছেন। যথা—

"বামা বক্রগতি রাধা প্রেমের স্বভাব।"

—ভৃঙ্গরত্নাবলী।

এবং এই প্রেমের উৎপত্তি স্থল সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ;—

"সেই প্রেম উদ্ভব হয় নাভিপদ্ম হৈতে।"

পাতঞ্জলভাষ্যকার ভোজরাজও নাভিপদ্ম হইতে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলিয়াছেন। যথা—"নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্।" (সাধনপাদ, ৫০ সূত্র)।

মুকুন্দরাম এই বক্রগতি রাধাপ্রেমকে বামা বলিয়াছেন, কারণ,

১। "মৃতবত্তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।"

—নাদবিন্দু উপনিষদ্।

১। সহজ মানুষের।

২। রস=(রস্+অল্); রস্=গমন করা; রস=গমনশীল বস্তু।

এই রাধাপ্রেম বা কুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে বামাবর্ত্তে উত্থিতা হইয়া সহস্রারে গমন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন ;—

"সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

তন্ত্রে এই জন্যই কুণ্ডলিনীর এক নাম বামা। বৃহৎশ্রীক্রমে আছে ;—

"সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা।"

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া মস্তকস্থ সহস্রারে উঠিবার সময় মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্ত্তে পরিবেষ্টন এবং তচ্চক্রস্থ বর্ণ সকলকে নিজ অঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন; এবং সমাধি ভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে আসিবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে পরিবেষ্টন করিতে করিতে নিয়ে নামিয়া আসেন; কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ঐরূপে জনসাধারণে অপরিচিত বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইয়া সহস্রারে উঠাইয়া সমাধিমগ্ন হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, তাহাই বামাচার। স্বরূপ গোস্বামীও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রেমের গতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;— "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।" অর্থাৎ প্রেমের গতি অহিবৎ এবং তাহার স্বভাব কুটিল। মাধবদাস বলিয়াছেন ;—

"সর্পচক্রগমনস্তায় গতি সে প্রেমার।"

তন্ত্রে এই জন্যই কুণ্ডলিনীকে ভুজঙ্গী, কুটিলাঙ্গী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীরাধার সহস্র নামের মধ্যে শ্রীরাধার সর্পিণী, কুটিলা, বক্রেশ্বরী, বক্ররূপা প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের রাধা (জীবশক্তি) একই তত্ত্ব। তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার হইতে সহস্রারে যাইয়া শিবের সহিত বিলাস করেন। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে প্রেম বা রাধাশক্তি প্রেমসরোবর অর্থাৎ মূলাধার হইতে উত্থিতা হইয়া নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করেন। শিব বা কৃষ্ণ পরমাত্মা এবং কুণ্ডলিনী বা রাধা জীবাত্মা (জীবশক্তি)। নিত্যবৃন্দাবন বা সহস্রারে উভয়ের মিলন হয়; এবং ইহা সংঘটিত হয় সাধকের দেহমধ্যে। ইহাই সহজ পীরিতি সাধন, শৃঙ্গার সাধন, পরকীয়া সাধন, রাগ সাধন, লতা সাধন, প্রকৃতি সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা রাস নামেও অভিহিত হয়। শিবশক্তির সচ্চিদানন্দরূপ ঐক্যই রস নামে অভিহিত এবং তাহারই বিলাস রাস। বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের যে অংশে রাস বা রসাচারের বিবরণ দেওয়া আছে, তাহার নাম রাসশাস্ত্র বা রসশাস্ত্র। পরমশিব পরাশক্তির সহিত গোপনে যে লীলাসুখ ভোগ করেন, তাহারই নাম আধিদৈবিক আন্তর বা রহস্য রাস। বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থ আগমসারে রাধাকে আত্যাশক্তি বলা হইয়াছে। যথা—

"আপনি কহিলা রাধা আত্মাশকতি।"
"আত্মাশকতি রাধা কৃষ্ণ আদিপুরুষ।
এক ব্রহ্ম দুই রূপে করয়ে বিলাস।"

এইবার সহজ সাধন, পরকীয়া সাধন, শৃঙ্গার সাধন, রাগ সাধন, লতা সাধন, নায়িকা সাধন, কিশোরী সাধন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করা যাউক।

মুকুন্দরাম দাস বলিতেছেন—

"মস্তক ভিতরে নিত্যরূপ বৃন্দাবন।
তাহাতে বিরাজ করে সহজরতন॥"

অন্য আর এক স্থলে মুকুন্দরাম দাস বলিতেছেন—

"সহজ স্বভাব রূপ রাধিকা স্বরূপ রূপ
পরকীয়া রীত সহজেতে।
তবে তার যোগ হয় তবে ত তাহারে কয়
সাধিবে আপন কায়াতে॥

মস্তক ভিতরে নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) সহজরতন শ্রীকৃষ্ণ (তন্ত্রমতে পরম শিব) বিরাজ করেন। এই সহজরতন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকা বা জীবশক্তির (কুণ্ডলিনীর) যে পরকীয়া রতি বা বিলাস—ইহাই সহজিয়াগণের সহজ বা পরকীয়া সাধন। এই সাধন আপন কায়াতে সাধিতে হয় এবং এই সাধনায় মেয়েমানুষের কোন প্রয়োজন নাই।

চণ্ডীদাসও বলিতেছেন—

"দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে এই দেহ সার।
এই দেহ বিনে মন না ভাবিহ আর॥"

সহজিয়াগণের কোন কোন গ্রন্থে সাধনার দ্বিবিধ ক্রমের কথা আছে—(১) বাহ্যের করণ, (২) মনের করণ।

অমৃতরসাবলী গ্রন্থে আছে—

"বাহ্যের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো লিখাইলা।"

চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন"—মধ্যের দ্বাবিংশ।

বাহ্যের করণ অর্থে এখানে আচার অর্থাৎ শীলাদি সাধন বুঝিতে হইবে। 'বাহ্যের করণ' সম্বন্ধে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, এই বাহ্যের করণে বা বহিরঙ্গ সাধনায় তান্ত্রিকদের শক্তিগ্রহণের ন্যায় স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার বিধি দেওয়া হইয়াছে। 'মনের করণে' অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সহজ সাধনায় স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু যে অমৃতরসাবলী গ্রন্থে—

"বাহ্যের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো লিখাইলা।"

—পদটি আছে, সেই অমৃতরসাবলী গ্রন্থেই আছে—

"চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথে শিখাইলা করিয়া যতনে॥
সেই রঘুনাথ দাস তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
কৃপা আজ্ঞা পায়া গোসাঞি মুকুন্দে কহিলা॥
মুকুন্দদেব তবে গোস্বামীর আজ্ঞা পায়া।
সহজ বস্তু লিখিলেন সংস্কার করিয়া॥
সেই পুথি দয়া করি দিলেন আমারে।
সংস্কার বুঝিতে নারি ফিরায়া দিলাম তারে॥
তবে মুকুন্দদেব বুঝিয়া মোর মন।
পয়ার করিয়া তাহা করিলা লিখন॥
মোর হাতে কলম দিয়া লিখাইলা আপনি।
বাহ্যের করণ নহে মনের করণি (১)॥

১। "আত্মদর্শনে মনঃ এব করণম্"—গীতা, শাঙ্করভাষ্য।

বিবর্ত্তবিলাস নামক বৈষ্ণব গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"অন্তঃস্ফুট ধর্ম্ম এই, বহিঃস্ফুট নয়।"

উল্লিখিত অমৃতরসাবলী গ্রন্থে 'সহজ তত্ত্ব'কে "বাহ্যের করণ নহে মনের করণি।" বলিয়া মন্তব্য করার ঠিক পরেই দেহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"সহজ বস্তু সহজ প্রেম সহজ মানুষ হয়া।
লীলা করে গোপী সঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া।"

সেই সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে—

"ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।"
আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে (১)।
বাহ্যের ক্রিয়া বাহ্যে থাকুক মনের ক্রিয়া মনে।"

অন্যত্রও দৃষ্ট হয়—

"সার সাধ্য দেহ স্থাবর অধিকারী।
সাধিবে আশ্রয় তত্ত্ব কিবা পুরুষ নারী।"

উক্ত অমৃতরসাবলী নামক সহজিয়া গ্রন্থের শেষে উপসংহারে বলা হইয়াছে—

"বাহ্যে নাহি আচরিহ মনের করণ।
শ্রীচৈতন্যের মনের করণ জানে যেই জন।"

ইহা হইতেই আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি যে, সহজ সাধনা অন্তরঙ্গ গূঢ় দেহসাধন তত্ত্ব; বাহিরের কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া এই আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় সাধনার আচরণ অনুষ্ঠান করিতে হয় না। উক্ত অমৃতরসাবলী গ্রন্থে দেহমধ্যস্থ সরোবর, পদ্ম প্রভৃতিরও বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া ইহাই ধারণা হয় যে, শ্রীচৈতন্য, স্বরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ, মুকুন্দরাম প্রভৃতির পরকীয়া সাধনে কোন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয় নাই। এই সহজ বা পরকীয়া সাধন তাঁহাদের দেহমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণরাধিকা বা পুরুষপ্রকৃতির (তন্ত্রমতে শিবশক্তির) বিলাসলীলা। সহজ ভজনের মূল এই নরদেহ; আর এই 'মনের করণ' অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সাধনা বাহ্যে অর্থাৎ বাহিরে আচরণ করিতে হইবে না; ইহার আচরণ করিতে হইবে দেহমধ্যে। এই 'মনের করণ' কথা দ্বারা বুঝান যায় না; ইহা উপলব্ধি করিতে হয়। আনন্দভৈরব নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে;—

"বাহ্যে নাহি কহা যায় মনের করণ।"

বৈষ্ণব ভাব-সাধকগণ আবার এই পরকীয়া সাধনের অন্য আর এক প্রকার অর্থ করেন ও তদনুযায়ী আচরণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিসিদ্ধান্তের উপর প্রেম ও মধুর রসের উদ্ভাবনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রসময় (রসঃ বৈ সঃ); তাঁহার মতে "রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইত্যাদি—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দ আবির্ভাবরূপ মুক্তির প্রতি রসের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। রস বলিতে এ স্থলে শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতিকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, ঐ স্থায়িভাব যখন দেবাদি বিষয়ক হয়, তখন ব্যক্ত অর্থাৎ বিভাবাদি সহযোগে এক প্রকার আনন্দকর আস্বাদের উৎপাদক হইয়া শৃঙ্গার নাম ধারণ করে। রতি বলিতে অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই তিনি শ্রীভগবানে কান্তাভাব আসক্তি অর্পণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নায়ক, আমি নায়িকা; তিনি প্রেমময়, আমি তাঁহার প্রেমবিহ্বলা সেবিকা, এই ভাবের উদ্ভাবন পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। কান্তাভাব আসক্তি প্রবল হইলেই আত্মনিবেদন পূর্ণাঙ্গে সাধিত হয়। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কান্তাভাবেই হয়। ভক্তিসূত্রে "তথা চ ব্রজগোপিকানাং..." বলিয়া ব্রজবল্লবীদিগের কান্তাভাবের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বৈষ্ণব ভাব-সাধকগণের মতে পরকীয়া সাধন-তত্ত্ব। পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধা বা অন্য কোন ব্রজ-গোপিকার ভাবে কান্তাভাব অর্পণ করার নামই পরকীয়া সাধন।

কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবগণের মতে (তান্ত্রিকদের ন্যায়) দেহমধ্যে নিত্যবৃন্দাবনে অর্থাৎ সহস্রারে সহজরতন শ্রীকৃষ্ণের (তন্ত্রমতে শিবের) সহিত রাধা বা জীবশক্তির (কুণ্ডলিনীর) বিলাসলীলাই পরকীয়া সাধন। এবং এই সাধনাই সহজিয়াগণের 'মনের করণ'—ইহাই প্রকৃত সহজিয়া সাধনতত্ত্ব।

মুকুন্দরাম দাস বলিতেছেন;—

"পরকীয়া রতি সহজেতে।"

অর্থাৎ সহজে পরকীয়া রতি করিতে হইবে। এই সহজ কোথায় থাকেন? এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন;—

"মস্তক ভিতরে নিত্যরূপ বৃন্দাবন।
তাহাতে বিরাজ করে সহজরতন।"

সহজরতন শ্রীকৃষ্ণ মস্তক ভিতরে নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) অবস্থিতি করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন;—

"অক্ষয় সরোবরে এক উলটা কমল।
পরমাত্মা স্থিতি তাহা স্থান নিরমল।
উলটা কমলে সব স্থিতির নির্দ্ধার।
পাইবে সহজ বস্তু করিয়া বিচার।"

এই পরকীয়া রতি আপনার কায়া বা দেহেই সাধন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে মুকুন্দরাম দাস বলিতেছেন;—

"সহজ স্বভাব রূপ রাধিকা স্বরূপ রূপ
পরকীয়া রতি সহজেতে।
তবে তার যোগ হয় তবে ত তাহারে কয়
সাধিবে আপন কায়াতে।"

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে;—

"পঞ্চভূত পঞ্চজন দেহ ইথে হয়।
দেহের সাধন সহজ এই হেতু কয়।"

এই দেহে কামসরোবরে অর্থাৎ মূলাধারে রতি সাধনা করিলে সহজ বস্তু লাভ হয়। এই দেহমধ্যে গুপ্তচন্দ্রদেশে বা নিত্যবৃন্দাবনে অর্থাৎ সহস্রার চক্রে সহজের অনুভূতি হয়।

"নিত্যবৃন্দাবন নাম গুপ্তচন্দ্রপুর
অবিচ্ছিন্ন প্রেমাধার আনন্দের পুর।"

এখন এই পরকীয়া সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু আলোচনা করা যাউক। পরকীয়া সাধন সম্বন্ধে সাধারণের একটা ধারণা এই আছে যে, অপরের স্ত্রী বা কন্যা লইয়া এই সাধনা করিতে হয়। বৈষ্ণবগণেরও কেহ কেহ পরকীয়া সম্বন্ধে এইরূপই মত পোষণ করেন। পরকীয়া

১। উপনিষদের "আত্মানং বিদ্ধি" ও সক্রেটিশের "Know thyself" তুলনীয়।

শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" নামক এক বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"স্বামিকুলভয়ং ত্যক্ত্বা গুরূণামপি গৌরবম্।
পরভর্ত্তারতা যা সা পরকীয়েতি উচ্যতে।"

পরকীয়া শব্দের উল্লিখিত অর্থানুসারে পরকীয়া শব্দে কুলটাকে বুঝায়। এই পরকীয়া বা কুলটা সাধন কি? পরের কোন মেয়েকে লইয়াই কি এই সাধনা করিতে হয়? না, অন্য কিছু? নরোত্তম দাসের বস্তুতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কুলটার ধর্ম্ম যজে চৈতন্য গোসাঞী।"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই কুলটা ধর্ম্ম বা পরকীয়া সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈ, তিনি কোন পরস্ত্রীকে লইয়া এই সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তো কিছু জানা যায় না।

পরের কোন মেয়েকে লইয়া যে পরকীয়া সাধন নহে, এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পরিষ্কাররূপে বলিতেছেন—

"জগতে পর নাই সকলি স্বকীয়া।
তবে কেন তার সনে রস পরকীয়া॥
পরের মেয়ে বল্যা যার সনে করে লেহ।
আপন ইচ্ছাতে সে সমর্পয়ে দেহ॥
আপনই আপনই স্বাতে বটে আপনার রস।
তবে কেন তার সনে পরকীয়া রস॥"

জগতে কি নারী, কি পুরুষ সকলই তো প্রকৃতি; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ এবং তিনিই পরপদবাচ্য। তাঁহার শক্তিও পর-শক্তি নামে অভিহিতা। প্রকৃতি নরের সহিত প্রকৃতি নারীর পরকীয়া রসসাধন কিরূপে সম্ভবে?

"কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা।
কে কারে মানুষ করয়ে সেবা॥
প্রকৃতি বলিয়া বলায় জগত।
প্রকৃতি কি বস্তু না জান তত্ত্ব॥"—লোচন দাস।

কি নারী, কি পুরুষ, সকলের ভিতরেই তো রস বা রসস্বরূপা শক্তি রহিয়াছেন, তবে পরের অর্থাৎ অন্যের সহিত পরকীয়া করিবার কি প্রয়োজন? এখানে পরকীয়া সাধন ব্যাপারে দেহতত্ত্বেরই নির্দ্দেশ দিতেছেন। কৃষ্ণদাস আর এক স্থলে বলিতেছেন—

"কি নারী পুরুষ দু'এর ভিতরে আছে পর।
সে যখন উদয় তখন অস্থির কলেবর॥"

এখানে 'পর' শব্দের অর্থ 'অন্য' নহে, ইহা নিশ্চিত। 'পর' শব্দে এখানে দেহমধ্যস্থ রসস্বরূপা পরশক্তি কুণ্ডলিনীকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং অপরের স্ত্রী বা কন্যাকে লইয়া সাধন এখানে অর্থহীন প্রতিপন্ন হইতেছে। সাধকের দেহে যখন পরশক্তির জাগরণ হয়, তখন সাধকের দেহে বহুবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। শারদাতিলক নামক এক তন্ত্র গ্রন্থে কুলকুণ্ডলিনীকে পরশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস তাঁহার আগুতত্ত্ব গ্রন্থে স্বরূপ বস্তুকে পরকীয়া নামে অভিহিত করিতেছেন। যথা—

"স্বরূপ বস্তু যেতো তেতো পরকীয়া।
তেতো শুদ্ধ, আদি শুদ্ধ, পরম শুদ্ধ, অবেদ্য বস্তু।"

যাহা স্বরূপ বস্তু (শ্রীকৃষ্ণ), তাহাই পরকীয়া; স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন ব্যাপার নহে। উল্লিখিত অংশের ঠিক পরেই কৃষ্ণদাস পদ্ম-সাধন তত্ত্বের বিষয় অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

"স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নপুংসক আর।
এ তিন লিঙ্গেতে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রকুমার।

এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, কৃষ্ণদাসের পরকীয়া ব্যাপারে কোন স্ত্রীলোকের সংস্রব ছিল না। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

"পরকীয়া করিব বল্যা মোর মনে ছিল।
এক মহৎ কৃপা করি তাহা দেখাইল।
তাহার দর্শনে মোর ধন্দ ঘোর গেল।
কৃষ্ণদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।

এক মহৎ ব্যক্তি কৃষ্ণদাসকে পরকীয়ার প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনের ধন্দ বা সন্দেহ দূর হইয়াছিল। কৃষ্ণদাসের মত সাধক ব্যক্তিও পরকীয়া সম্বন্ধে যখন ধাঁধাঁয় পড়িয়া-ছিলেন, তখন 'অন্যে পরে কা কথা'। চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—

"সহজ পীরিতি সবাই কয়।
কেমন সহজ পীরিতি হয়।
যদি কেহ কেহ উছন কয়।
নারীতে পুরুষে পীরিতি নয়।"

অপর এক স্থলে নিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন—

"সামান্য প্রকৃতি প্রাকৃত সে রতি বেশ্যা মধ্যে তারে গণি।
প্রকৃতি লইয়া বিলাস করিয়া কে কোথা পেয়েছে মণি।"

মুকুন্দরাম তাঁহার আত্মসারস্বতকারিকা গ্রন্থে পরকীয়া সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

ক্লীং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বীজ; তিনি আনন্দ, চিন্ময় রসস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব। এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই পরকীয়া বলে। উক্ত গ্রন্থের অন্য আর এক স্থলে লিখিত আছে;—

"ক্লীং শ্রীং দুই বীজ শ্রেষ্ঠ সবাকার।
প্রকৃতি পুরুষরূপে করেন বিহার॥
দুই বীজে দুই মূর্ত্তি পুরুষ প্রকৃতি।
প্রকট হইয়া যজে সহজ পীরিতি॥
শ্রীনন্দনন্দন আর কৃত্তিকানন্দিনী।
আর অষ্ট বীজে অষ্ট সখি মূর্ত্তি মানি॥
এই দশ বীজে মূর্ত্তি স্বতঃসিদ্ধরূপে।
পরকীয়া রসাস্বাদ করে রাত্রি দিবে॥"

কৈ, এখানে সহজ পীরিতি বা পরকীয়া ব্যাপারে কোন মানবীর আভাষ তো পাওয়া যায় না। এইবার পরকীয়া শব্দের অর্থ লইয়া কিছু আলোচনা করা যাউক। পর শব্দের এক অর্থ অন্য; কিন্তু পর শব্দে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাও হয়। যথা—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ" (শ্রুতি)। এই জন্য ব্রহ্মের শক্তিকে (কুণ্ডলিনীকে) পরশক্তি বলা হয়। 'পর পদ' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'পরধ্যান' শব্দের অর্থ ঐশ্বরীয় ধ্যান বা সমাধি। যথা—

"কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং।
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য॥"
—মহানাটক।

"ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন।
যত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ॥"
—গরুড় পুরাণ।

সুতরাং আধ্যাত্মিক অর্থে পরকীয়া সাধনে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় বা পর-শক্তি (কুণ্ডলিনী) সম্বন্ধীয় সাধনই বুঝায়। অন্য অর্থেও পরকীয়া শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কুল অর্থাৎ মূলাধার ত্যাগ করিয়া রাধা বা কুণ্ডলিনী শক্তি অকুলে অর্থাৎ সহস্রারে যান বলিয়া রাধা কুলকলঙ্কিনী বা পরকীয়া। এবং এই কারণেই এই সাধনাকে পরকীয়া সাধন বলে। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

ছোটদের আসর

দিল্লী-পর্ব্ব

[গল্প]

পঞ্চানন-পর্ব্ব সমাপ্ত করে সলিল সেন এবং গগন গুপ্ত দিল্লী গিয়ে হাজির হলো। নয়া দিল্লীর কুইন ভিক্টোরিয়া রোড অঞ্চলে বহু গণ্যমান্য লোকের বাস। তাঁদের যেমন অর্থ তেমনি প্রতিপত্তি। সেই পাড়ার কাছে লিটন রোডে সেন অ্যাণ্ড গুপ্ত আড্ডা গাড়লো। বিরাট বাড়ী। প্রকাণ্ড গাড়ী। প্রাইভেট-গাড়ী ভাড়া করেছে। সলিল সেন এবং গগন গুপ্ত এখানে বাঙ্গালী নয়, রাজপুত। নাম শোভন সিং আর গর্জ্জন সিং। কাজ—চাল মেরে ঘুরে বেড়ানো। সলিল মিশুকে লোক। দেখতে দেখতে পাড়ায় আলাপ জমিয়ে ফেললে। গল্পের ছলে অনেক তথ্যও জোগাড় করলে। তার ফলে চার নম্বর বাড়ীর উপর তার দৃষ্টি এবং মন নিবদ্ধ হলো।

সে দিন রাত্রে খেতে খেতে সলিল বললে—চার নম্বর বাড়ীতে কে থাকে, জানো গগন? গগন তখন কাটলেট ভক্ষণে ব্যস্ত। সংক্ষেপে উত্তর দিলে—না! সলিল খাওয়া বন্ধ করে অধ্যাপনার সুরে আরম্ভ করলে—ঐ জন্যই তো আমাদের কিছু হয় না। অবজার-ভেশন নেই! চোখ-কাণ সর্ব্বদা খুলে রাখবে—মুখ কিন্তু থাকবে বন্ধ। ক'দিন পাড়ায় পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে তাস খেলায় হেরে অনেক জিনিষ আমি জানতে পেরেছি। ইচ্ছা করেই খেলায় হারি। তাস খেলায় হেরে যাওয়াটা বন্ধু জোটাবার পক্ষে খুব ভালো উপায়। প্রথমতঃ, হারলে লোকেরা বোকা মনে করে; তাই এমন অনেক কথা বলে, যা চালাক লোকের সামনে হয়তো বলতো না! দ্বিতীয়তঃ, যে হারে, লোকে তাকে হাতে রাখতে চায়, তার কাছ থেকে দু'পয়সা বাগাবার লোভে! অতএব তাস খেলায় সদা-সর্ব্বদা হারবার চেষ্টা করবে! গগন হেসে বললে—হেরে গিয়ে সান্ত্বনা হিসেবে কথাগুলো মন্দ শোনাচ্ছে না। শৃগাল দ্রাক্ষাফলকে টক্ বলেছিল!

সলিল বিরক্ত হয়ে বললে—তোমায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। যা বলছিলুম, শোনো। পাঁচ দিন ক্রমাগত হেরে হেরে কি জিতলুম, জানো? সংবাদ!

হো-হো করে হেসে গগন বললে—আঙুর গাছের পাতা! মন্দ কি! কিন্তু খাবার সময় এ সব কথা কেন?

—উদ্দেশ্য আছে হে!—সলিল উত্তর দিলে—সবটা বলছি। মন দিয়ে, শোনো। জানতে পারলুম, চার নম্বর বাড়ীতে থাকে দামোদর চোবে। লোকটা হীরের কারবারী। অগাধ পয়সা করেছে। কিছু দিন আগে কোন এক নেটিভ ষ্টেট থেকে এক হীরের নেকলেস এনেছে। সারা ইণ্ডিয়ায় সে নেকলেসের জুড়ী নেই! এবং সেই নেকলেসটি আছে তার শোবার ঘরের পাশের ঘরে—লোহার সিন্দুকে! এ কথা কেউ জানে না। চোবের এক বন্ধু আমায় এ কথা বলেছে। কাল খেলায় তার কাছে পঞ্চাশ টাকা হেরেছি!

অবাক হয়ে গগন প্রশ্ন করলে—এ সব কথার অর্থ? চুরি করতে চাও?

হাত তুলে বাধা দিয়ে সলিল বললে—ও নাম কোরো না উচ্চারণ! নেকলেসটা বাগাতে চাই।

—কি রকম করে? গগন প্রশ্ন করলে।

—ধীরে বন্ধু, ধীরে। সময়ে সবই জানতে পারবে। সলিল জবাব দিলে—আর একটা কথা বলি, শোনো। কাল রাত্রে দু'জন ছোকরা আমাদের এখানে খাবে।

—মানে? হেঁয়ালী ছেড়ে একটু বুঝিয়ে বলো। ছোকরা বন্ধু আবার কোত্থেকে জোটালে?

—হেলী রোডে ওয়াই, এম, সি, এতে আলাপ হয়েছে। ছেলে দু'টি ভাল। এক জনের নাম ডিক মর্টন আর এক জনের হ্যারি কার্টিস। তাদের স্পোর্টস্ ক্লাবে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি। আমাকে তারা ভয়ানক খাতির করে।

গগন বিরক্ত হয়ে বললে—কিছু বুঝতে পারছি না। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না।

—পাবে, বন্ধু পাবে। বলে সলিল নিম্ন স্বরে গগনকে অনেক কথাই বললে। শুনে গগন হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—ব্রাভো! তোমার বুদ্ধি আছে, বটে!

পরের দিন ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ ডিক মর্টন আর হ্যারি কার্টিস এসে উপস্থিত হলো। গগন গুপ্ত তাদের আদর-আপ্যায়ন করে এনে বসালে। পরিচয় দিলে, সে মিষ্টার শোভন সিং-এর সেক্রেটারী! শোভন সিং কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে গগন বললে—তিনি ঘরেই আছেন। সকাল থেকে মেজাজটা খারাপ। বিকেলে রিভলভার পরিষ্কার করছিলেন। মর্টন বিস্মিত হয়ে বললে—রিভলভার কেন? গগন বললে—জানি না। আপনারা বসুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

একটু পরেই গম্ভীর মুখে সলিল সেন ওরফে মিষ্টার শোভন সিং এসে ঘরে ঢুকলেন।

খেতে খেতে কার্টিস বললে—মিষ্টার সিং, আপনাকে আজ যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখছি! সলিল যেন জোর করে মুখে হাসি এনে বললে—না, না। মর্টন বললে—যেন কিছু ভাবছেন! যদি কৌতূহল ক্ষমা করেন, তবে প্রশ্ন করি কি এমন চিন্তা—যাতে আপনার সদা-হাস্যময় মুখ গাম্ভীর্য্যের মেঘে ঢাকা পড়েছে। কার্টিস বললে—আমাদের আপনি বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন। চিন্তার কিছু অংশ আমাদের দিন না! কথাবার্ত্তা হচ্ছিল অবশ্য ইংরেজীতেই।

সলিল বললে—শুনতে যখন চাইছেন, বলছি। কিন্তু শুনে কোন লাভ নেই। আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।

মর্টন ব্যগ্র ভাবে বললে—বলা যায় না। হয়তো আমরা কাজে লাগতেও পারি।

সলিল নিম্নস্বরে বললে—বেশ, বলছি। কিন্তু এ কথা কাউকে যেন বলবেন না! চার নম্বরের দামোদর চোবেকে চেনেন? বিপুল ধনী।

কার্টিস বললে—চিনি বলতে পারি না, তবে এক দিন তাঁর বাড়ী গেছলুম—স্পোর্টসের চাঁদা চাইতে। অতি কঞ্জুষ, একটি পয়সা দিলে না।

মর্টন বললে—শুনেছি, লোকটা একেবারেই মিশুকে নয়। অত্যন্ত দেমাকী।

সলিল বলিল—আপনারা তার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছেন, সবই ঠিক। কিন্তু তার আসল পরিচয় যদি শোনেন তো স্তম্ভিত হয়ে

যাবেন। তবে ও পাপ শীঘ্রই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, এই যা ভরসা!

চোখ কপালে তুলে কার্টিস বললে—মানে?

—মানে, আজ রাত্রে তাকে আমি কুকুরের মত গুলী করে মারবো। তাকে মারবো বলেই সন্ধান নিয়ে নিয়ে দিল্লী এসেছি। বহু দিন সে লুকি'য় গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু এইবার! সলিলের কথা আর এগুলো না। রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো! মর্টন প্রশ্ন করলে,—তার উপর আপনার এত রাগের কারণ?

—কারণ! সলিল গর্জ্জে উঠলো।—জানেন, সে আমার কত ক্ষতি করেছে! রাজপুতানায় সপ্তগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে। আমরা সেইখানকার বাসিন্দা, আর এই দামোদর চোবে ছিল আমাদের জমীদার। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের সব ঠিক হয়েছিল। মেয়েটির নাম ফুলকুমারী। দেখতে অপরূপ সুন্দরী। চোবের ইচ্ছা, তাকে বিবাহ করে। কিন্তু সে রাজপুতের মেয়ে। বেণের সঙ্গে বাপ-মা বিয়ে দেবে কেন? ফলে চোবে গুণ্ডা দিয়ে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। আমরা এবং ফুলকুমারীর বাড়ীর লোকেরা বাধা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারবো কেন? আমরা চার-পাঁচ জন, আর গুণ্ডারা ছিল দলে প্রায় শ'-খানেক। আমার বাবা, দাদা আর ভাবী-শ্বশুর গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারান। আমিও লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ি। মরে গেছি ভেবে তারা আমায় ফেলে রেখে চলে যায়! অনেক করে গ্রাম থেকে পালিয়ে সে-যাত্রা আমি প্রাণে রক্ষা পাই! সেই থেকে চোবেকে খুন করবো ঠিক করে রেখেছি। মধ্যে হতাশ হয়ে খুনের নেশা চাপা পড়েছিল। ভেবেছিলুম, হয়তো ফুলকুমারী বেঁচে নেই। কিন্তু কাল তাকে দেখেছি।

আগ্রহ-ভরা কণ্ঠে কার্টিস শুধোলে—কাকে দেখেছেন?

—ফুলকুমারীকে। দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজনন্দিনী। দৈত্যকে বধ করে তাকে আমি উদ্ধার করবো। এই দেখুন, সে জন্ত আমি প্রস্তুত! এই কথা বলে সলিল পকেট থেকে রিভলভার বার করে দেখালো। মর্টন বললে—আপনার রাগ অন্যায় নয়। কিন্তু বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে পুলিশকে খবর দিলে ভাল হয় না?

তাচ্ছিল্যভরে সলিল বললে—পুলিশ! কি বলছেন আপনি! আমরা রাজপুত! দোষীকে নিজের হাতে সাজা দেওয়া আমাদের ধর্ম্ম। তা ছাড়া ভুলে যাবেন না, ফুলকুমারী সেই দুর্বৃত্তের গৃহে বন্দিনী! কার্টিস বললে—এক কাজ করলে কি রকম হয়? যদি বিনা রক্ত-পাতে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায়?

—কি করে? সলিল প্রশ্ন করলে।

কার্টিস বললে—আমরা তিন জনে তার বাড়ীতে গিয়ে চুপি-চুপি ঢুকবো। শোবার ঘরে গিয়ে চোবেকে আমি আর মর্টন চেপে ধরে থাকবো। সেই ফাঁকে মেয়েটিকে আপনি উদ্ধার করে আনবেন।

মর্টন বললে—আমাদের গাড়ী চোবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। লোকে মনে করবে হয়তো কেউ দেখা করতে এসেছে; কিছু সন্দেহ করবে না। আপনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ীর হর্ণ বাজাবেন! তাহলেই আমরা বুঝবো, কাজ হাসিল। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবো।

উচ্ছসিত কণ্ঠে সলিল বললে—চমৎকার প্ল্যান। বা! আপনারা যে গরীবের দুঃখে এতখানি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন আর সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন, এর জন্ত অসংখ্য ধন্তবাদ! ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।

কার্টিস বললে—ধন্যবাদ কিসের! এ তো আমাদের কর্ত্তব্য এ ড্যামসেল ইন ডিসট্রেস। তার উপর আপনি আমাদের বন্ধু। তবে চলুন, আর দেরী নয়। বেশী রাত করলে লোকে সন্দেহ করতে পারে।

সলিল বললে,—উত্তম কথা। আপনারা এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।

বাড়ীর ভিতর গিয়ে সলিল গগনকে বললে—ভায়া, দিল্লীর কাজ শেষ হয়ে এল। তুমি এখনই জিনিষ-পত্তর স্যুটকেশে গুছিয়ে গাড়ী নিয়ে সোজা গাজিয়াবাদ চলে যাও। দু'খানা কলকাতার টিকিট করে রাখবে। ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট—বুঝলে?

গগন বিস্মিত হয়ে বললে—মানে?

সলিল ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলে—ট্রেনে মানে বলবো। আমি চললুম চার নম্বরে দামোদর চোবের বাড়ী। আমরা বেরুবামাত্র তুমি ষ্টার্ট করবে।

—আর তুমি?

—আমি গাজিয়াবাদে গিয়ে তোমায় মীট করবো।

বাইরের ঘরে এসে সলিল সেন ওরফে শোভন সিং বললে—তা হলে চলুন। আর দেরী নয়।

কার্টিস বললে—বটেই তো! কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ, বলুন।

—আপনার রিভলভারটা বাড়ীতে রেখে যান।

—রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে যাবো; কিন্তু ব্যবহার করবো না। অবশ্য একান্ত দরকার না হলে! বাধা দিয়ে মর্টন বললে—না মিষ্টার সিং, মোটেই ব্যবহার করবেন না। আমরা কথা দিচ্ছি, যতক্ষণ না আপনি বাড়ীর বাইরে এসে আমাদের গাড়ীর হর্ণ বাজাচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা চোবেকে ধরে রাখবো।

—বেশ, তবে আপনাদের কথাই রাখছি। এই বলে সলিল পকেট থেকে রিভলভার বার করে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলে। বাহিরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে নিঃসাড়ে সলিল সেন, ডিক মর্টন, হ্যারি কার্টিস দামোদর চোবের বাড়ীতে ঢুকলো। সৌভাগ্যক্রমে কোন চাকরের সঙ্গে দেখা হলো না। হলে কি হতো, বলা যায় না! মর্টন সোজা গিয়ে দামোদরের পেটের উপর চেপে বসলো আর কার্টিস তার মুখে বালিস চেপে ধরলে। সেই সুযোগে সলিল পাশের ঘরে বন্দিনী রাজনন্দিনীকে উদ্ধার করতে ঢুকলো। মর্টন আর কার্টিস দু'জনেই যুবা এবং জোয়ান, তবু চোবেকে ধরে রাখতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেল। পাশের ঘরে রাজনন্দিনী বন্দিনী অর্থাৎ হীরের নেকলেস সিন্দুকে বন্দী! সলিল সেনও কাঁচা ছেলে নয়। সঙ্গে এনেছিল আমেরিকার অতি-আধুনিক সব-খোল্ চাবী; তাছাড়া লোহা কাটবার একটি অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র। ক' মিনিটের চেষ্টার ফলে রাজনন্দিনী মুক্তি পেল।

একটু পরেই বাহিরে মোটর-হর্ণের আওয়াজ হলো। চোবেকে ছেড়ে তারা পালাতে যাচ্ছে, এমন সময় দু'জন চাকর এসে ঘরে

ঢুকলো। দামোদর চীৎকার করে উঠলো—ডাকাত! আমার মেরে ফেলছিল।

চাকর দু'টো তাদের ধরতে গেল। ধস্তাধস্তি আরম্ভ হলো। সেই ফাঁকে চোবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুলিসে টেলিফোন করলে। ওদিকে বাহিরে মোটর-ষ্টার্টের আওয়াজ!

চোবে আর দু'জন চাকরে মিলে মর্টন এবং কার্টিসকে আচ্ছা ঘা কতক দিয়ে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেললে। পাশের ঘরে গিয়ে চোবে চীৎকার করে উঠলো—হায়, হায়, সেফ্ ভাঙ্গা! নেকলেস গন্!

থানা কাছেই। পুলিশ-অফিসার এলো, সঙ্গে দু'জন কনষ্টেবল। ব্যাপার কি? চোবে সব কথা খুলে বললে—দু'জন ডাকাত তাকে চেপে ধরে রেখেছিল—সেই ফাঁকে তৃতীয় ডাকাত তার সেফ্ ভেঙ্গে নেকলেস্ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। চাকর দু'জন বললে—পাশের বাড়ীর চাকরের সঙ্গে গল্প করছিলুম—এমন সময় এক ভদ্রলোক বললেন, চার-নম্বরে বোধ হয় চোর ঢুকেছে! গোলমাল হচ্ছে শুনে আমরা ছুটে এলুম। এসে দেখি, এই ডাকাত দু'জন পালাবার চেষ্টা করছে।

সলিল সেন ওরফে শোভন সিং যা যা বলেছিল মর্টন আর কার্টিস সেই সব কথার পুনরাবৃত্তি করলে। হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, —বন্দিনী রাজনন্দিনী! বিপদগ্রস্তা অসহায়া নারী! ও-সব নভেলী ঢং চলবে না! আসল কথাটা বলে ফ্যালো চাঁদ! কার্টিস রেগে বললে—বিশ্বাস হচ্ছে না? পাশের ঘরেই মেয়েটি বন্দিনী অবস্থায় ছিলেন।

—বেশ, দেখা যাক! সকলে সেই ঘরে গেল। ভাঙ্গা সিন্দুক! বন্দিনী রাজনন্দিনী যে সে-ঘরে ছিলেন, তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না! ইন্সপেক্টর হাসলেন। মর্টন বললে—নীচে আমাদের গাড়ী রয়েছে।

বাধা দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন—তাই না কি!

সকলে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, আশে-পাশে কোথাও গাড়ীর চিহ্ন মাত্র নেই!

দমে গিয়ে কার্টিস বললে—পণ্ডিত মিষ্টার শোভন সিং-এর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে।

—যায় তো ভালই।

সকলে শোভন সিং-এর বাড়ী গেল। বাড়ী খালি। মিষ্টার শোভন সিং অথবা তাঁর সেক্রেটারী গর্জ্জন সিং কারো পাত্তা মিললো না।

ইন্সপেক্টর ব্যঙ্গভরে বললেন—এ ব্যবসা ছেড়ে রূপ-কথা লেখো। বেশ দু'পয়সা রোজগার হবে।

হঠাৎ যেন আলোর সন্ধান পেয়েছে, এই ভাবে মর্টন বলে উঠলো, —ঠিক হয়েছে! দেরাজে মিষ্টার সিংয়ের রিভলভার আছে। লাইসেন্স নম্বর থেকে সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তখন সত্য-মিথ্যা সব জানা যাবে।

ভালো! রিভলভার বার করা হলো। ইন্সপেক্টর রিভলভারটা নেড়ে চেড়ে ঈষৎ হেসে বললেন—অপূর্ব্ব মাথা! চমৎকার গল্প সাজিয়েছো! এটা তো খেলনা-পিস্তল!

কার্টিস আর মর্টনকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থানায় যেতে হলো। চোবে হায়-হায় করতে করতে বাড়ী ফিরে এলো। পুলিশ-অফিসারের আশ্বাস-বাণীতে ভাঙ্গা মন জোড়া লাগলো না। সমস্ত রাত হাজত-বাসের পর সকালে কার্টিস আর মর্টনের বাড়ীতে খবর পাঠানো হলো। তারা দু'জনেই ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে গেজেটেড অফিসারদের পুত্র।

সব কথা শুনে পুলিশ-অফিসার বুঝলেন, কোন ফন্দীবাজ লোক এদের বোকা বানিয়ে এদের সাহায্যেই কাজ উদ্ধার করেছে। এমন কি, কার্টিসের মোটর পর্য্যন্ত নিয়ে উধাও! কিন্তু কে সে? সন্ধান চলতে লাগলো। চোবে, কার্টিস, মর্টন তিন জনেই সেই দুর্বৃত্তকে ধরবার জন্ম পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

দু'জন ভদ্রলোক গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লী মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসলো। কামরায় অন্য কেউ নেই। ট্রেণ চলেছে। এক জন প্রশ্ন করলে,—তার পর?

আর এক জন কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে হীরের এক ছড়া দামী নেকলেশ বার করে দেখালো। এরা যে গগন গুপ্ত আর সলিল সেন—সে কথা বোধ হয় বলতে হবে না।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

পেশীর জোরে

ম্যাজিক দেখিয়া আমরা খুব আনন্দ পাই। জানি, ম্যাজিক স্রেফ ফাঁকি, তবু এ-ফাঁকিতে যে কৌশল, সেই কৌশলের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না! ম্যাজিকের কৌশল হয়তো রপ্ত করা খুব সহজ নয়! কিন্তু ম্যাজিকের মত আর এক-রকমের খেলা আছে—
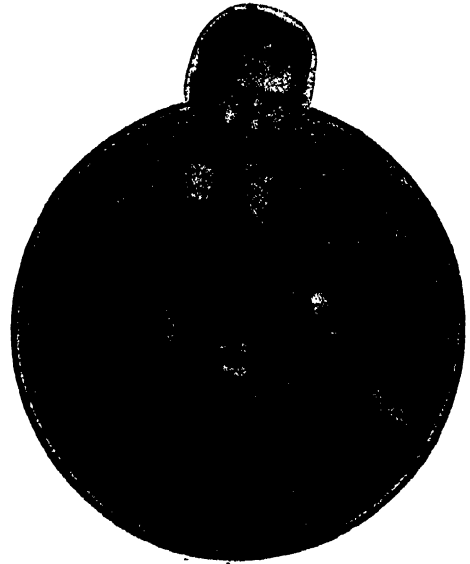
১। তিন বলের খেলা

জাগলারি (Jugglery)—সে খেলায় ফাঁকি নাই! জাগলারির সহিত ম্যাজিকের তুলনা চলে না। কারণ, জাগলারির কসরতি —ন হি বলহীনেন লভ্যঃ! সার্কাশে যাঁরা রিং, বার বা তারের খেলা দেখান, তাঁদের সে-খেলায় আমাদের শ্রদ্ধা জাগে; তার কারণ, রীতিমত জোয়ান ও সাহসী না হইলে সে-খেলা শেখা সকলের সাধ্যে কুলাইবে না! জাগলারি কিন্তু অত কঠিন নয়,—অথচ তাহাতে যে মজা, তোমরাও ও-কসরতি শিখিয়া মজা পাইবে।

জাগলারিতে সব চেয়ে যাঁরা কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, মার্কিণ-শিল্পী চার্লস কারার তাঁদের অন্যতম। জাগলারি শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি বলেন,—কিশোর বয়সে আমি এক কারখানায় কাজ করিতাম। হঠাৎ হইল চোখের ব্যাধি,—একটুতেই চোখে কেমন ক্লান্তি বোধ হয়। সব যেন ঝাপসা দেখি! বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তখন আমি জাগলারি অভ্যাস সুরু করি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, জাগলারিতে চোখের শিরা-উপশিরা শক্ত-সমর্থ হয়, সকল রকমের অস্বাস্থ্য হইতে মুক্ত থাকে এবং কোনো রকম চোখের ব্যাধি বা দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে পারে না।
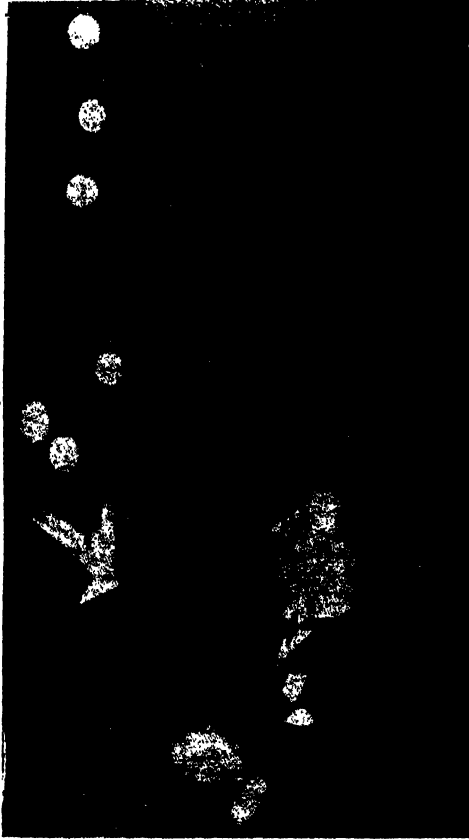
২। ছ'-সাতটি বল লইয়া লোফা

কয়েকটি খেলা শিখিবার যে পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি শক্ত নয়। তিনি বলেন, ছেলে-বয়সে একটু একাগ্রতা-অধ্যবসায়সহকারে অভ্যাস করিলে সকলেই এ কশরতিতে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবে।

এ খেলায় গোড়ার পর্ব্ব বল লোফা। কারার সাহেব বলেন, প্রথমে একটি বল লইয়া লোফা সুরু করো। বলের বদলে কমলা লেবুও লইতে পারো। প্রথমে একটি বল বা কমলা লেবু উপরে ছুড়িয়া তাহা লুফিয়া লইতে শেখো। ক'দিনের অভ্যাসেই লোফায় ত্রুটি ঘটিবে না। দু'হাতে লোফা অভ্যাস করিতে হইবে। তার পর লও দু'টি বল; একটি ডান হাতে, অপরটি বাঁ হাতে। ডান হাতের বলটি উপর-দিকে ছুড়িয়া দাও,—প্রথমে দু'ফুট উঁচুতে বল উঠিবে, মাপ-জোপ করিয়া এমন ভাবে ছোড়া অভ্যাস করিতে হইবে। ডান হাতের বল ছুড়িয়া দিয়াই বাঁ হাতের বলটি লইবে ডান হাতে—চোখের দৃষ্টি থাকিবে ছোড়া ঐ উপরের বলটির পানে।

৩। কাগজের ভাঁজ

যেমন দেখিবে, ছোড়া-বল নামিতে চায়, অমনি দ্বিতীয় বলটি ছুড়িয়া দিবে—এবং বাঁ হাতে প্রথম বলটি লুফিয়া ধরিতে হইবে। তার পর এমনি ভাবে বাঁ হাত হইতে ডান হাতে বল লইয়া ছোড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে দ্বিতীয় বল লুফিয়া লওয়া। বল লইয়া এই ছোড়া আর লোফা বার-বার অভ্যাস করিতে হইবে। ব্যায়াম-সাধনার মত, লেখাপড়া করার মত প্রতি-দিন নিয়ম করিয়া খানিক ক্ষণ অভ্যাস করা চাই। দু'টি বলের পালা বেশ সড়গড় হইলে তিনটি বল লইয়া অভ্যাস। তিনটি বল লইয়া খেলার সময় ডান হাতে থাকিবে যে-বল ছুড়িবে সেই বল—আর বাঁ হাতে অপর দু'টি বল। ডান হাতের বল ছুড়িয়া দিয়াই বাঁ হাত হইতে একটি বল চালান্ করিবে ডান হাতে—চালান করিবামাত্র সেটি ছোড়া—প্রথম বলটি বাঁ হাতে লুফিতে হইবে। তিনটি বল লইয়া লোফালুফি করিবার সময় পেশীর ক্রীড়া দ্রুততর হইবে। নিয়মিত অভ্যাসে এ খেলা অচিরে রপ্ত হইবে। তিন বলের পর ধাপে-ধাপে চার-পাঁচ-ছয় হইতে বহু বল লইয়া খেলা শেখা কঠিন হইবে না। তবে এ খেলায় কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে চাই একাগ্রতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা।
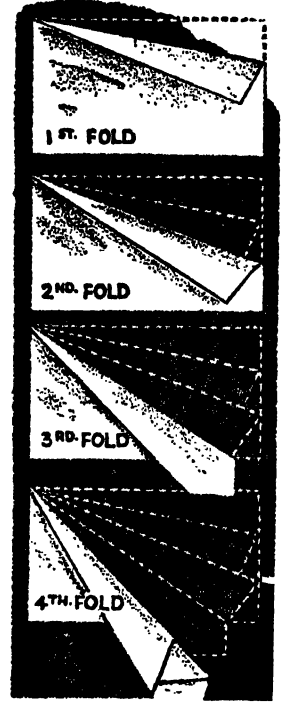
লোফা-লুফি "প্র্যাক্‌টিশে" বলের উঠিতে-নামিতে কতটুকু সময় লাগে, সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক অভিনিবেশ রাখা প্রয়োজন। কৃতিত্ব নির্ভর করিবে সময় সম্বন্ধে সতর্ক নিখুঁৎ ওজন-করা হিসাবের উপর।

তার পর প্লেট এবং ছড়ির খেলা। একখানি কাঠের তৈয়ারী প্লেট ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছড়ির ডগায় সেটি লুফিয়া লইতে হইবে। ছড়ির ডগায় পড়িবামাত্র ছড়ির ঘায়ে প্লেট ছুড়িয়া আবার শূন্যে তুলিবে এবং সে প্লেট লইবে ছড়ির ডগায়! অর্থাৎ হাতে করিয়া যেমন বল ছোড়া হয়—এ ক্ষেত্রে তেমনি ছড়ির ঘায়ে প্লেট ছুড়িয়া আবার ছড়ির ডগায় প্লেট লোফা চাই। এ খেলার জন্য চাই ছুঁচোলো-মুখ লোহার শিক এবং কাঠের প্লেট। প্লেটের মাঝখানে একটু ছিদ্রা করিয়া লইবে,—ছিদ্রার মধ্যে শিকের ঐ ছুঁচোলো মুখ লাগিবামাত্র সেখানে আঁটিয়া থাকিবে, সরিয়া পড়িয়া যাইবে না।

কারার সাহেবের আর কয়েকটি খেলার কথা বলি। তিনি বলেন, ধৈর্য্য এবং একাগ্রতাভরে অভ্যাস করিলে তোমরাও অনায়াসে এ-সব লোফালুফির খেলা শিখিবে।

প্রথম খেলা—সুদীর্ঘ কোণায় কাগজ পাকাইয়া কপাল বা পায়ের চেটোর উপর, নাকের ডগায় বা কাণে সরু কোণের দিকে ভর রাখিয়া ঐ পাকানো কাগজ ব্যালান্সে সিধা খাড়া রাখা।

এ খেলার জন্ম বড় একখানি খবরের কাগজ চাই। সে কাগজখানিকে একটু কৌশলে পাকাইতে হইবে। কৌশলের রীতি দেখিবে ৩নং ছবিতে। দীর্ঘ ভাবে কোণা করিয়া কাগজ পাকানো চাই। পাকাইবার পূর্ব্বে লবণ-গোলা জলে কাগজখানির যে-দিক্‌টা কোণা করিবে, সেই দিকটুকু মাত্র ডুবাইয়া পরে বেশ সন্তর্পণে ভিজা কাগজ শুকাইয়া লও—খুব সাবধানে শুকানো চাই, কাগজে টান বা ভাঁজ না পড়ে! শুকাইয়া গেলে নীচের এ অংশটুকুতে লবণ লাগিয়া থাকার জন্ম ভারী হইবে, এই ভারের জন্ম খাড়া রাখা কঠিন হইবে না। এ কাজে সাফল্য লাভ করিতে হইলে চাই ধৈর্য্য এবং একাগ্রতা। এমনি অভ্যাসে ছড়ি বা লাঠির ব্যালান্স রাখা কঠিন হইবে না।
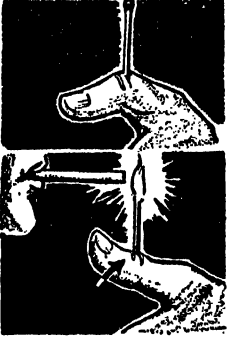
৪। উপরে—বুড়ো আঙুল নীচের দিকে বাঁকাইয়া; নীচে—খাঁজে-আটকানো কাঠি

আর-একটি ছোট খেলার কথা বলিয়া আজিকার মত শেষ করি। সে-খেলা—বুড়ো আঙুলের উপর দেশলাইয়ের জ্বলন্ত একটি কাঠি খাড়া রাখা। বুড়ো আঙুলটিকে নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া জ্বলন্ত কাঠির না-জ্বলা তলার দিকটা বুড়া আঙুলের মাঝামাঝি ধরিয়া রাখো। ৪নং ছবি ছাখো. বুড়া আঙুল কি ভাবে রাখিবে। এবার বুড়া আঙুলটি সিধা সরল করিবে—বুড়া আঙুলের উল্টা পিঠে যে-সব খাঁজ, সেই খাঁজের মধ্যে কাঠির তলাটুকু আটকাইয়া থাকিবে! আঙুল সিধা করিয়া কাঠিটিকে আর ধরিয়া রাখিবে না—এ-কথা বলা বাহুল্য।

এ সব খেলা যদি শিখিতে চাও, তাহা হইলে কারার সাহেবের উপদেশ ভুলিয়ো না। তিনি বলেন, গোড়ার দিকে বার-বার ভুল হইবে; হয়তো বল লুফিতে বা কাগজের ও কাঠির ব্যালান্স রাখিতে পারিবে না, কিম্বা গতি বা progress হইবে খুব ধীর মন্থর (slow)। মোদ্দা ধৈর্য্য করিয়া অভ্যাস যদি রাখিতে পারো, তাহা হইলে সাফল্য-লাভ সুনিশ্চিত।

ভুল

তোমাদের বয়সী ক'টি ছেলে সে দিন তাস নিয়ে 'টোয়েনটি-নাইন' খেলছিল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে বার-বার ভুল করে হেরে যাচ্ছিল। শেষে সে বলে উঠলো, আর আমি খেলবো না! কেবলি ভুল করছি! এ-কথা বলে খেলা ছেড়ে সে উঠে পড়তে চায়!

আমি তাদের খেলা দেখছিলুম। হেরো-ছেলেটির কথা শুনে বললুম—ও কি, ভুল হয়েছে বলে পালাবে? না, না, ভুল করতে করতেই মানুষ সব-কিছু শেখে। সে-শেখার কোথাও ফাঁকি থাকে না। যারা বারে-বারে ভুল করে, জেনো তাদের প্রাণ আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—while there are mistakes, there is life. যার প্রাণ আছে, সে মরে নেই; ভুল সে করবেই!

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ইংরেজী প্রবচনের ও-কথাটি খুব দামী কথা। অঙ্ক কষতে বসে ভুল করে অঙ্ক কষা যদি ছেড়ে দি, তাহলে জীবনে কোনো দিন কি আর অঙ্ক কষতে পারবো! ট্রানশ্লেসন বলো, বানান বলো,—ভুল আমরা করি। সে ভুলের জন্ম ট্রানশ্লেসন বা বানানের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দিলে কোনো কালে তা আর শেখা বা জানা হবে না। বার-বার ভুল করে' সে ভুলের সম্বন্ধে যদি চেতনা জাগে এবং সচেতন ভাবে ভুল শুধরে নিয়ে নতুন করে ট্রানশ্লেসন বা বানান যদি রপ্ত করি, তাহলে কোনোটাতেই আর ভবিষ্যতে ভুল হবে না!

কারো স্বভাব আছে—সকলকে অবিচল ভাবে বিশ্বাস করেন। এমনি সরল-বিশ্বাসী স্বভাবের জন্ম ভুল করে বার-বার যদি আমরা ঠকি, তাহলে সে ভুল শুধরে নিলে জীবনে ঠকবার আশঙ্কা থাকবে না আর।

মানুষের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে, নিজের কর্ত্তব্য-কাজে ভুল আমরা সকলেই করি। সে ভুল শুধরে নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না।

এ কালে সভ্যতার এক বিষময় ফল এই, আমরা ভুল করলে সে-ভুল চেপে যাই, মানতে চাই না; সে-ভুলের জন্ম লজ্জা বোধ করি—এতে ভুল শোধরাবার উপায় একেবারে লোপ পায়।

ভুল হোক্—এমন কথা বলি না। আমি বলি ভুল হওয়া স্বাভাবিক—to err is human—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। ভুলের জন্ম লজ্জা পাবার কারণ নেই। ভুলকে স্বীকার করে সে-ভুল সংশোধন করো। জীবনের সব কাজে সকল ব্যাপারে—পাছে ভুল হয়, লোকে হাসবে—এ কথা ভেবে যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো তাহলে জীবনে কোন-কিছু করতে পারবে না।

ইতিহাস মানুষের ভুলের কাহিনীতে ভরে আছে। কত লোক কত ভুল করেছিল বলেই তো পৃথিবীর নানা দিকে নানা পরিবর্ত্তন, সেই সঙ্গে নানা কল্যাণও সংসাধিত হয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখি, রাজা জনের ভুল, প্রথম চার্লসের ভুল, এবং এ সব ভুলের জন্ম ইংলণ্ড আজ কমনওয়েলথে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসেও তেমনি দেখি, মানুষের কত রকমের ভুলে ভারতবর্ষের চেহারাখানা গেছে বদলে!

তবু মানুষ এখনো ভুল করছে। এ ভুলের আর শেষ নেই। আজ পৃথিবীব্যাপী এই যে নরমেধ-যজ্ঞ চলেছে, এ যজ্ঞের মূলেও আছে ভুল! তার পর আমাদের বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে যে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারালো, এ দুর্ভিক্ষও ঘটেছে কত লোকের কত-রকম ভুলের জন্ম।

মানুষ চিরদিন ভুল করবে। তা বলে কিছু না করে চুপচাপ যদি সকলে বসে থাকি, তাহলে শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান গতিহারা হবে, মন্থর হবে। ভয় করো না। ভুল যদি করো, জেনো, সেই ভুলই হবে তোমার কৃতিত্ব-লাভের সোপান!

সব দিক্ দিয়া নূতন

[গল্প]

আশ্চর্য্য হইবার অবশ্য কিছু ছিল না। স্ত্রীবিয়োগের পর শতকরা নব্বই জনের মত পলাশও মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, তাহার শূন্য সংসার চিরদিনের জন্য শূন্য থাকিবে; এবং সে-কথায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই আড়ালে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যখন এক-এক করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, তখন সকলে পলাশের কথার গুরুত্ব অনুভব না করিয়া পারে নাই।

কিন্তু, হঠাৎ পাঁচ বৎসরের পর পলাশ যে-দিন নীতীশের বৈঠকখানায় বসিয়া চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকের সঙ্গে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিল যে, বিগত রবিবার গোধূলি-লগ্নে সে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিয়াছে, সে-দিন নীতীশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সানন্দে চীৎকার না করিয়া ছোটো করিয়া শুধু সে বলিল,—তার মানে?

সশব্দে হাসিয়া পলাশ বলিল,—এর আবার ভাষ্য দরকার আছে না কি? বিবাহ—বিবাহ। সকলেই যেমন করেচে, করচে এবং করবে! পাঁচ বৎসর পরে হঠাৎ আমার 'বদ্‌লে গেল মতটা' এইমাত্র।

নীতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চা খাইতে লাগিল। তার পর বলিল,—তা, অর্থাৎ, এতে আশ্চর্য্য হবার কি-ই বা আছে? তা বেশ করেচো। খাশা করেচো। তোমার মেয়েটি?

পলাশ বলিল,—সে এখনো তার মামার বাড়ীতেই আছে এবং থাক্‌বেও,—যত দিন পর্য্যন্ত না অপর পক্ষের সম্মতি পাচ্চি, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌বার।

নীতীশ বলিল,—তা বেশ। তোমার বয়স হোলো কত? চল্লিশ নিশ্চয় পার হয়েছে। রসো। চোখ বুজে আমি মনে-মনে তোমার নব বধূর কমনীয় মূর্ত্তিখানি কল্পনা করে'নি।

নীতীশ চোখ বুজিল। পলাশ তৎক্ষণে পাশের গড়-গড়ার নলটা মুখে তুলিয়া ছোট-ছোট টান্ দিতে লাগিল।

সে নিশ্চয় জানিত, তাহার নববধূকে কল্পনায় ধরিতে পারার ক্ষমতা নীতীশের একেবারেই হইবে না। নিজে সে দীর্ঘ দিন ওকালতি ব্যবসা করিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তা, পশার তার যতই কম হোক্! তবু নিজেরই যেন আশ্চর্য্য লাগে, যখন ভাবিতে বসে বি-এ পাশ-করা একটি আধুনিকা মেয়ে তাহার কণ্ঠে এত সহজে বরমাল্য দুলাইয়া দিল কি ভাবিয়া! এটুকু সে নিশ্চিত বুঝিয়াছে, সে নিজেও যেমন অতঃপর তাহার জীবনকে এমনি নিঃসঙ্গ ভাবে অতিবাহিত করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা লইয়া বসিয়াছিল, ঐ মেয়েটিও চিরকুমারী থাকিবার অনুরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি যে একটা বন্যা আসিল, দু'জনেরই মনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভাসাইয়া একাকার করিয়া দিল! ওকালতি তাহার কোনো দিনই ভাল করিয়া চলে নাই! এবং প্রথমা পত্নী চিরদিন কি যে নিদারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্পেষিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে কথা কোনো দিন সে ভুলিতে পারিবে না। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করিবার সব চেয়ে বড় কারণ যে, তাহার আর্থিক অবস্থা এ-কথা সে নিজে জানে, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকটেও অকপটে তাহা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

ও দিকে নন্দিতা শুধু যে গ্র্যাজুয়েট তাহাই নয়, মেয়ে-স্কুলে মাষ্টারী করিয়া সে নিজের জীবিকার্জ্জনের পথটা যথেষ্ট সুগম করিয়াছে। এ-হেন নন্দিতা কেন যে এক-কথায় পলাশকে পতিত্বে বরণ করিতে দ্বিধা করিল না, তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া পলাশ কল্পনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যেন তলাইয়া যায়! এক একবার সেই বহু-প্রচলিত কবি-বাণীও মনের কোণে উঁকি মারে,—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কখন্ ধরা পড়ে কে জানে!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তে নিজেরই লজ্জা রাখিবার সে যেন জায়গা পায় না!

পলাশ হাওড়ায় ওকালতি করে এবং রামকৃষ্ণপুরে ছোট একটি বাসা লইয়া সেখানে থাকে। নন্দিতা কিন্তু শ্রীরামপুর গার্লস্ স্কুলে টিচারি করে সেখানকার বোর্ডিংএ থাকিয়া। তাহার পাঁচ দিন ছুটীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগে সে দিন পলাশ বলিল,—তাহ'লে ওদিক্‌কার কি করবে ঠিক করলে?

নন্দিতা বলিল,—কোন্ দিক্‌কার? আমার চাক্‌রির? বাঃ, চাক্‌রি ছেড়ে মর্‌বো না কি শেষে?

কথাটা যেন পলাশের দৈন্যকে একটু বিশেষ করিয়া উস্‌কাইয়া দিয়াই বলা হইল, অন্ততঃ পলাশের তাই মনে হইল। কিন্তু এ-সব সামান্য কথাকে অগ্রাহ্য করার মত ধৈর্য্য এবং উদারতা দুই-ই তাহার আছে। সে বেশ সপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিল,—কথাটা অবশ্য ঠিকই। আমিও চাইনে যে, তুমি হুট্ করে' চাক্‌রি ছেড়ে দাও! কিন্তু শ্রীরামপুর যাতায়াতের—

নন্দিতা বলিল,—কেন, আমাকে তো সোমবারেই যেতে হবে। সেখানকার মেয়েদের হোষ্টেলে—

পলাশ কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। এবং অনেকক্ষণ পরে শুধু সংক্ষিপ্ত একটা প্রশ্ন করিল,—তাহ'লে হোষ্টেলেই থাক্‌বে ঠিক করেচ?

অত্যন্ত ক্ষীণ একটু লজ্জাকে তাড়াতাড়ি দূরে ঠেলিয়া নন্দিতা জবাব দিল,—তাছাড়া উপায় কি? এখান থেকে রোজ শ্রীরামপুর যাতায়াত করা, তাতে অনেক হাঙ্গাম!

পলাশ বলিল,—সে তো নিশ্চয়ই! রোজ একা ট্রেণে যাতায়াত করা!—সেও বড় বেশী দুঃসাহসিক!

নন্দিতা হাসিয়া বলিল,—ওদিক্ দিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। এ-যুগের মেয়েরা ওটাকে একেবারেই দুঃসাহসিক মনে করে না, অন্ততঃ আমি করি না। কিন্তু আমার পক্ষে রোজ যাওয়া-আসা ভারী অসুবিধার ব্যাপার। শুধু আমার পক্ষে কেন, সকলের পক্ষেই। আপনাকেও যদি ডেলী প্যাসেঞ্জারি করে' ওকালতি করতে হতো, সেটা খুব আরামের হতো না।

পলাশ সায় দিয়া বলিল,—নিশ্চয়।

রবিবার রাত্রে পলাশ আবার একবার কথাটা তুলিল।

—তাহ'লে তোমার যাওয়াই ঠিক ?

ফিকে আলোয় নন্দিতার মুখ চোখে পড়ে নাই। তবু মনে হইল, সে একটু চাপা হাসির সহিত বলিল,—আপনি বলেন তো, ছেড়ে দি চাক্‌রিটা।

পলাশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল—তোমায় খেতে-পরতে দেবার সঙ্গতি না থাক্‌লে বিয়ে করতুম না, এটা ঠিক। কিন্তু, সে-কথা নয়। তোমার স্বাধীনতায় আমি কোনো দিনই হস্তক্ষেপ করবো না, এ আমি মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেলেচি।

নন্দিতা বলিল,—আপনি বুঝি ভাবলেন, আমাকে খেতে-পরতে দেবার ক্ষমতাকে কটাক্ষ ক'রেই ও কথা বল্‌লুম আমি ? কি ভয়ঙ্কর সেন্টিমেণ্টাল্ !

পলাশ হাসিয়া বলিল,—সেন্টিমেণ্টাল যে আমি নই, এ-কথা বল্‌চিনে। কিন্তু রিয়ালিজ্‌মকেই আমি বেশী ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি ! আর আমি জানি, তুমি নিজেও রিয়ালিজ্‌মের পরম ভক্ত ! একটা জিনিষ থেকেই আমি তার অকাট্য প্রমাণ পেয়েচি !

—কি জিনিষ ?

—এই আমার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দেওয়া।

নন্দিতা হাসিয়া বলিল,—আপনার এ-ধরণের কথা এই নিয়ে অনেক বার শুন্‌লুম ! আপনি আমাকে কি যে ভেবেচেন, জানি না ! হয়, আপনার ছেলে-মানুষী সেন্টিমেণ্টে নিজেকে অহেতুক খাটো ক'রে দেখছেন, নয়তো ওকালতির জেরায় ফেলে অনেক কথা বার করতে চাইচেন। এর ভেতর কোন্‌টা সত্যি বলতে পারিনে।

—কোনোটাই সত্যি নয়। এ আমার মনের অত্যন্ত সরল উদ্দেশ্যহীন অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু একটা কথা তোমায় বল্‌বো ?

—বলুন !

—আমাকে 'আপনি' বলাটা ছাড়তে পারলে ভালো হয়। অত্যন্ত খাপ্‌ছাড়া লাগে ঐ কলেজী সম্ভ্রমের উক্তিগুলো !

নন্দিতা বলিল,—একটু সময় না দিলে ও-অভ্যাস যাবার নয়।

সময় দিবার খুব-বেশী প্রয়োজন ছিল, সে-কথা কিন্তু পলাশ স্বীকার করিতে রাজী হইল না। অথচ প্রতিবাদও করিল না। শুধু মনে-মনে বলিল, আজ যদি তার ঘা-খাওয়া প্রৌঢ়ত্বের কড়া পাহারা তার মনের মাঝে নিরন্তর সজাগ না থাকিত, তাহা হইলে এখনি—এই মুহূর্ত্তে ঐ 'আপনি' ঘুচাইয়া অতি নিকটত্বের মধুর সম্বোধনটুকু আদায় করিতে সে-ও পারিত। কিন্তু মন বলে, নেহাৎ ছেলে-মানুষী ওটা। তাছাড়া বয়সের এতখানি পার্থক্যকে নন্দিতা এত সহজে অস্বীকারই বা করিবে কেমন করিয়া ?

আসল কথাটা কিন্তু অমীমাংসিত রহিয়া গেল। সুতরাং সোমবার সকালের ট্রেণেই নন্দিতা শ্রীরামপুরে গেল। অবশ্য পলাশ তাহাকে একা যাইতে দিল না ! চাকরকে সে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। নন্দিতা আপত্তি করিল না।

কি-যেন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল তাহার জীবনে, এবং এখন হইতেই যেন নিজের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিবার সময় আসিয়াছে ; নন্দিতা চলিয়া গেলে ক্যাম্বিশের চেয়ারে হাত-পা গুটাইয়া শুইয়া গড়গড়ার নল মুখে লাগাইয়া পলাশের এই সব কথা মনে হইতেছিল ! বিবাহ সে ইতিপূর্ব্বেও এক বার করিয়াছিল। বহু দিন আগে হইলেও তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে !

সেই বারো-তেরো বছর বয়সের নোলক-পরা লাজুক মেয়েটি, চিম্‌টি কাটিলেও সাড়াশব্দ দেয় না, চোখে সেই ভয় চকিত দৃষ্টি ! সেই মাধবী ছিল পলাশের বৌ। আর নন্দিতা—সে ও ঐ একই আখ্যা লইয়া তাহার জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথচ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অবশ্য মনের ভিতর একটা উন্মাদনা জাগে। এ যেন সব দিক্ দিয়াই অপূর্ব্ব ! ইহার নূতনত্বের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়, এবং মনও যেন পরম উল্লাসভরে ভাসিয়া যাইতে চায় এই নূতনত্বের স্রোতে ! এক একবার অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত মনে হয়। আজই কোর্টের কাজ সারিয়া বরাবর শ্রীরামপুর চলিয়া গেলে কেমন হয় ? সঙ্গে সঙ্গে পকেট-টাইম্-টেবলখানা বাহির করিয়া দেখে। বেলা সাড়ে তিনটায় ব্যাণ্ডেল লোকালখানা সবচেয়ে সুবিধার। আবার সন্ধ্যা আটটায় ট্রেণে অনায়াসে ফিরিয়া আসা চলে। কিন্তু তখনি আবার নিজেকে সংবৃত করে। মনে পড়ে নন্দিতার টিপ্পনী, কি ভয়ঙ্কর সেন্টিমেণ্টাল্ ! নিজের মনেই সে বলে, সেন্টিমেণ্টকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া বিবাহ করার সার্থকতা কোথায়, নন্দিতার মত বিদুষী মেয়েরাই হয়তো তার জবাব দিতে পারে, সে নিজে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না !

দিন দশেক পরে হঠাৎ এক দিন নন্দিতা আসিয়া হাজির। পলাশ কোর্টে গিয়াছিল ; ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বাড়ীটার কেমন যেন নূতনতর চেহারা। ও পাশের যে ঘরখানা খালি পড়িয়া থাকিত, সেখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ঝাড়ামোছা হইয়াছে। মেঝেয় এম্‌ব্রয়ডারি-করা টেবলক্লথে ঢাকা একখানি বেতের টেবল্, তার উপর একটি সাদা লেটার-প্যাড ও পিতলের কাগজ-চাপা। পাশে একখানি ক্যাম্বিশের চেয়ার। বহু দিনের বন্ধ জানলাগুলা খোলা হইয়াছে এবং সেখানে রং-করা পর্দ্দা ঝুলিতেছে। বাড়ীতে কিন্তু চাকর রামধনি ছাড়া আর কেহই ছিল না। সে প্রভুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে শুধু জানাইল,—মা-জী এসেচেন।

নন্দিতা আসিয়াছে ? পলাশের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। কোথায় সে ? ইহার উত্তর রামধনি দিতে পারিল না। সুতরাং তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা ছাড়া পলাশের আর কিছু করিবার রহিল না।

রামধনি প্রশ্ন করিল, চায়ের জল চাপাইবে কি না ? পলাশ নিষেধ করিল ! অর্থাৎ নন্দিতা ফিরিয়া আসুক্, তার পর সে-সব ব্যবস্থা।

ঘণ্টা খানেক পরে নন্দিতা ফিরিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—হঠাৎ এসে পড়লুম এখানেই। সেখানকার চাক্‌রিটা সত্যই ছেড়ে দিলুম।

পলাশ বলিল,—সে দিন যে—

নন্দিতা হাসিয়া বলিল,—এখানে কিছু দিন হলো একটা দরখাস্ত করেছিলুম। হঠাৎ ওদের appointneent পেয়ে গেলুম। মাইনেও কিছু বাড়লো—আশী টাকা। সুতরাং—

পলাশ বলিল,—তা বেশ হয়েচে। সেখানেই গিয়েছিলে বুঝি ?

নন্দিতা বলিল,—হ্যাঁ। কাল জয়েনিং ডেট। যদিও রোজ কল্‌কাতা যাতায়াত কর্‌তে হবে, তা হ'লেও হোষ্টেলে থাকার চেয়ে এখানে থাকাই সুবিধা মনে হচ্ছে।

পলাশ নির্ব্বাক্ হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ-কথার অর্থ কি? সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—হোষ্টেলে থাক্‌তেই তোমার বেশী ভালো লাগে দেখ্‌চি!

নন্দিতা বলিল,—সত্যিই লাগে। কেন না, সেখানে আমাকে distrub কর্‌বার কিছু নেই। তবে আপনার এখানেও বেশ নিরিবিলি।

পলাশ বলিল,—কিন্তু, এটা যে তোমারই সংসার, এ-কথাকে যেন তুমি আমোল্ দিতেই চাইচো না! এ-সংসারের ভার তো তোমাকেই নিতে হবে এখন থেকে।

নন্দিতা যেন বেশ একটু মুস্কিলে পড়িয়া বলিল,—সে আমার পক্ষে কি ক'রে হ'য়ে উঠবে! দশটার আগেই আমাকে বেরুতে হবে। ফিরবো ছ'টায়।

পলাশ হাসিয়া বলিল,—সে-ব্যবস্থার ভার তোমারই ওপর। রান্নার ভার না-হয় রামধনির ওপর রইলো। কিন্তু—

নন্দিতা বলিল,—আবার 'কিন্তু' কি? দরকার হয়, একটা ছোট চাকর দেখে রাখলেই চল্‌বে। তার সব খরচ না-হয় আমিই দেবো।

ও-কথার কোন জবাব না দিয়া পলাশ বলিল,—তা সে যা-হয় করো। এ দিকে কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় বসে-বসে এখনো আমার চা খাওয়া হয়নি।

—কি মুস্কিল! আমি কিন্তু চা খেয়ে এসেচি! রামধনি আপনার চা করে দিক্!

—তার মানে, তুমি খাবে না?

—আচ্ছা, এক-কাপ বাড়তি চা খাওয়া এমন-কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়।

দিন-দুই কাটিয়া গেল। তাহার জীবনটায় যে আগা-গোড়া রঙ ফিরিয়া গিয়াছে, এ চেতনা পলাশ কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। নন্দিতার সহিত তাহার সত্যকার সম্বন্ধ যে কি, সে-কথা সে ভাবিয়া ঠিক ঠাহর করিতে পারে না। এই মাত্র কয়েক দিন আগে যে সংক্ষিপ্ত একটা অনুষ্ঠান সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফলে নন্দিতা তো কৈ এতটুকু বদলায় নাই। অথচ সে নিজেকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

রবিবার। নন্দিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—আচ্ছা, খরচপত্র সম্বন্ধে কি-রকম ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, আপনি মনে করেন?

পলাশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ও-সব ঝঞ্ঝাট আমি নিতে পারবো না, তা আগেই বলে রাখচি। আমার যেমন-যেমন আয় হবে, সবই আমি তোমার হাতে ফেলে দেবো। তাই নিয়ে তুমি যে-ভাবে ভালো বোঝো, সংসার চালাবে।

শঙ্কিত মুখে নন্দিতা বলিল,—ওরে বাবা! সে আমি পার্‌বো না, তা বলে রাখ্‌চি। আমার মতে ওদিক্ দিয়ে দু'জনেরই অটুট স্বাধীনতা বজায় রেখে চলা ভালো।

পলাশ বলিল,—তার মানে?

নন্দিতা বলিল,—আমার মনে হয়, সংসারের সমস্ত খরচের হিসাব করে' তার আধাআধি দু'জনে ভাগ করে' নিলে কারু কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না। অবিশ্যি নতুন চাকরটার মাইনের সব আমি নিজের

কথাটা পলাশের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। সে একটু খোঁচা দিয়া বলিল,—তাহ'লে বকুলকে যখন আমি নিয়ে আসবো, তখন তার জন্যেও একটা আলাদা হিসেব রাখ্‌তে হবে তো?

বকুল পলাশের মেয়ে।

নন্দিতা নিজেকে অপ্রতিভ হইবার এতটুকু অবকাশ দিল না। বলিল,—তখনকার ব্যবস্থার জন্য এখন থেকে মাথা ঘামাবার দরকার দেখ্‌চি নে। মোট কথা, টাকাকড়ির সম্বন্ধে এ ভাবের স্বাধীনতা না থাক্‌লে—

পলাশ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়া বলিল,—তা বেশ!

নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া পলাশ নিজেকে ধিক্কার দেয়। কেন সাধিয়া এ-বয়সে এই বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিতে গেল? এ-কি অশান্তি সে সখ্ করিয়া বহিয়া আনিল! সখ্ ছাড়া আর কিছুই নয়! প্রথমা পত্নীকে সে অনেক দিন কথায়-কথায় বলিয়াছে, যদি তুমি আজ লেখাপড়া জান্‌তে আর স্বাধীন ভাবে কিছু-কিছু উপার্জ্জন করতে পারতে, তাহলে কখনই আমাদের এত কষ্ট পেতে হতো না। তাই হঠাৎ এক দিন এক আত্মীয়ের মুখে নন্দিতার সহিত বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া সে তাহার ঐ অপূর্ণ আশাটুকুর সফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিবাহে এক কথায় সম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু এই ক'দিনেই নন্দিতার যে পরিচয় পাইতেছে, তাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। মাঝে-মাঝে কল্পনা করে, কোথায় যেন বহু দূর বিদেশের কোন্ হোষ্টেলে আসিয়া সে বাস করিতেছে এবং নন্দিতা—সে শুধু ঐ হোষ্টেলেরই পাশের ঘরের এক জন বোর্ডার!

সে-দিন কথায়-কথায় নন্দিতাকে বলিল,—আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারিনে মিসেস্ চৌধুরী, আমায় বিবাহ করে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সফল হলো!

'মিসেস্ চৌধুরী' ডাকটা সম্পূর্ণ নূতন! সুতরাং নন্দিতার একটু চমক্ লাগিবারই কথা। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল,—কেন?

পলাশ বলিল,—'কেন'র জবাব আমি দেবো না, দেবে তুমি। এক-একবার কল্পনা করি, তুমি বুঝি তোমার কোন্ এক পরমাত্মীয়ের নির্ম্মম খেয়ালমাত্রে ঠেল্‌তে না পেরে আমাকে বিবাহ করে এ ভাবে আত্মবলি দিয়েচ। কিন্তু তাও তো নয়। আবার মনে হয়, কোনো এক নিতান্ত অব্যক্ত কারণে বিবাহ-করাটা তোমার পক্ষে অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছিল। এই সে-দিন একখানা নভেলে পড়েছিলুম, নায়িকা যখন খবর পেলে বিবাহ না-করা পর্য্যন্ত কোন্ আত্মীয়ের উইলের একটা মোটা টাকা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়, তখন যাকে সাম্‌নে পেলে, তাকেই বিয়ে করে' বসলো!

নন্দিতা গম্ভীর হইয়া বলিল,—আপনার কল্পনার পিছু-পিছু ছোট্‌বার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই। তবে স্বামিত্বের অধিকার নিয়ে এইটুকু জেনে রাখ্‌তে পারেন, ও-রকম কোনো-কিছু কৈফিয়ৎই আমার বিবাহের পিছনে লুকিয়ে নেই।

কথাটাকে আর বাড়াইয়া লাভ নাই! কে জানে, কথায় কথায় কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে! এ মেয়েটি আগাগোড়া যেমন অপরিচিত ছিল, বিবাহ করার পরেও অপরিচয়ের সে ব্যবধান যেন আরো অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে! নিজেকে সে প্রশ্ন

করে, আজকালের যুগে স্বামি-স্ত্রী অনেকেই তো একসঙ্গে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতেছে বেশ সুশৃঙ্খলায়। তাহার কপালে সে-সুযোগ জুটিয়াও কিন্তু সফল হইল না কেন? কার ত্রুটী? তার? না নন্দিতার? নন্দিতারই। ঐ যে নন্দিতা সে-দিন মাসকাবারে তার নিজের মাহিনার টাকা হইতে সাবান, ব্রিলিয়ান্টাইন, শাম্পু প্রভৃতি একরাশ প্রসাধনের সামগ্রী কিনিয়া আনিল, বিশ্রী হয় নাই? নন্দিতা অনায়াসেই তাহাকে ফরমাস্ করিতে পারিত! কিন্তু,—

নাঃ, দোষ হয়তো আসলে তাহারই! ও-সব কথা হয়তো মুখ ফুটিয়া বলিতে শিক্ষিতা আধুনিকার মর্য্যাদায় বাধে। তাহারই উচিত, ও-সব জিনিষ না-চাহিতে জোগাইয়া যাওয়া! হায় রে, কি মিথ্যা মর্য্যাদা-জ্ঞান!

পরের দিন পলাশ কোর্টে গিয়া এক জন মক্কেলের নিকট হইতে একটা বিলের কিছু মোটা পেমেন্ট পাইয়া গেল। টাকাগুলা হাতে পাইয়াই বিদ্যুতের মত মাথায় একটা মৎলব জাগিল। এবং তাহার ফলে আজ সে বেশ বড় রকমের একটা পিচ্‌বোর্ডের বাক্স লইয়া বাড়ী ফিরিল।

নন্দিতা আগেই ফিরিয়াছিল। পলাশ বাক্সটা রাখিল নন্দিতার সামনে টেবিলের উপর। নন্দিতা বলিল,—কি এ?

—খুলে ভাখো না।

নন্দিতা খুলিয়া দেখিল, একখানি জম্‌কালো সিল্কের শাড়ী আর ব্লাউশ। সে অবাক্ হইয়া গেল।

বলিল,—এ-সব কেন, বলুন্ তো?

পলাশ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নন্দিতা কিন্তু হঠাৎ যেন অনেকখানি উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিল,—এ-সব নিছক্ বাজে খরচ আমি একেবারে পছন্দ করিনে। কাপড় আমার বাক্সে যা' আছে, আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর এই দুর্দ্দিনে কি না—

পলাশ কি-যে জবাব দিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। বাজে খরচ করিলে মাধবীও চটিয়া উঠিত, কিন্তু তার মধ্যে ছিল প্রাণ-ঢালা সহানুভূতি। এখানে একটা নিষ্প্রাণ পাষাণের সংঘাত মাত্র ছাড়া আর কিছুই নাই! একবার অনেকখানি অভিমান ফেনাইয়া ওঠে মনের মধ্যে। কিন্তু পাষাণীর কাছে অভিমানের মর্য্যাদা কোথায়? কোনো জবাব না দিয়া মুখে সেই সহাস্য ভাবটুকু বজায় রাখিয়াই সে পোষাক ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

রামধনি আসিয়া ঘরে চা ও জলখাবার দিয়া গেল নিত্যকার মত। গরম চায়ের চুমুকে গলা ভিজাইয়া লওয়া ছাড়া আর কিছুই তার গলায় নামিল না। সে ভাবিতেছিল, সত্যই তো, এতগুলো টাকা অনর্থক খরচ করা তার কোনো দিক্ দিয়াই সঙ্গত হয় নাই। বকুল চিঠি লিখিয়াছে, তাহার সব জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাছাড়া তার মাষ্টারের মাহিনা দু'মাসের জমিয়া গিয়াছে। রোজই সে টাকার জন্য তাগাদা করিতেছে। মনে পড়িতে লাগিল, জীবনে কখনো এত দামী সিল্কের শাড়ী সখ্ করিয়া মাধবীকে সে কিনিয়া দিতে পারে নাই, আর আজ এ-কি ছেলেমানুষী করিয়া বসিল! মর্ম্মান্তিক দুঃখে অপমানে পলাশের চোখ দু'টো জ্বালা করিতে লাগিল।

দিন দুই পরের কথা। মাসের পঁচিশ তারিখ পার হইয়া গেল। অথচ এখনো ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিতে না পারার জন্য বাড়ীওয়ালা সে দিন সকালে পলাশকে বেশ গোটাকতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গেল। এ ধরণের তাগাদা অবশ্য পলাশের অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। শুধু নন্দিতা পাছে কিছু মনে করে, এই ছিল তার যা-কিছু কুণ্ঠা। অতঃপর এ ভাবে টাকা বাকী পড়িলে আর চলিবে না, এবং ইঙ্গিতে বাড়ী ছাড়িয়া দিবার মৌখিক নোটীশ দিয়া বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলে পলাশ যেন খানিকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভিতরে আসিয়া নন্দিতার সহিত দু'-চারিটা কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে ও-প্রসঙ্গ কোন রকমে উত্থাপিত হইল না দেখিয়া পলাশ বেশ খুশীই হইল। মনে মনে তুলনা করিয়া বলিল,—মাধবী কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বামীর অপমানে কাঁদিয়া ফেলিত। কত দিন সে অনুরূপ পরিস্থিতিতে নিজের দেহ হইতে ছোটখাট অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়াছে, তাহাও মনে পড়িল। নন্দিতা কিন্তু ও-দিকে একেবারেই মাথা ঘামায় না। সে জানে, বাড়ীভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব পলাশের; সুতরাং ও-সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চা করিতে সে নারাজ।

কিন্তু পলাশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না—যখন ইহার সপ্তাহ-খানেক পরে বাড়ীওয়ালা আবার তাগাদায় আসিলে নন্দিতা রামধনির হাত দিয়া দু'মাসের ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিল। বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলে পলাশ ভিতরে আসিয়া বলিল,—ছি ছি, তুমি কেন টাকাগুলো দিতে গেলে বলো তো? আমি—

উত্তরে মৃদু হাসিয়া নন্দিতা বলিল,—ভুল করছেন! ও টাকা তো আমার নয়, আপনারই। সেই শাড়ী আর ব্লাউশটা সে-দিন আমার এক বন্ধু কিনে নিয়েছে। লোকসান করিনি। ঠিক আপনার কেনা-দামেই বিক্রী করেচি।

পলাশ নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। পর-মুহূর্ত্তেই লজ্জায় রাগে তার মুখ তাতিয়া উঠিল। বড় সখ করিয়া কিনিয়া-আনা কাপড়-জামার এ-পরিণতি সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

নন্দিতা বলিল,—ওদিক্ দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার দেয় টাকা আপনার টাকা থেকেই শোধ করা হয়েচে, আমার টাকা থেকে নয়। কাজেই আপনার মনে কোন রকম অপমান-বোধের পথ আমি রাখিনি।

অপমান-বোধ! কি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী এই নন্দিতার! ঐ শাড়ীখানা বিক্রয় না করিয়া সে যদি নিজে হইতে টাকাগুলা দিত, তাহাতে পলাশের কি-ই বা আপত্তি ছিল! রাগে, অপমানে পলাশের সারা দেহ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত সংসারের মাঝখানে আবার এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল। নন্দিতাকে কোন-কিছু না-জানাইয়া হঠাৎ কেন যে এত দিন পরে পলাশ বকুলকে এখানকার এই মমতালেশহীন পারিপার্শ্বিকতার মাঝে আনিয়া ফেলিল, তাহা সে-ই জানিত! নন্দিতা স্কুল হইতে ফিরিলে পলাশ বলিল,—এই আমার মেয়ে, বকুল। বকুল, তোর নতুন-মা।

নন্দিতা বকুলকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—তোমারই নাম বকুল? তুমি থাকতে পারবে এখানে? মন কেমন করবে না?

বকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না।

নন্দিতা তার মাথার কোঁকড়া চুলগুলি নাড়িতে-নাড়িতে

বলিল,—আমাকে মা বল্‌তে কষ্ট হয় যদি তো বল্‌বার দরকার নেই। তার চেয়ে 'মাসীমা' বলে' ডেকো। কেমন?

বকুল কিছু না বলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল। নন্দিতা সশব্দে হাসিয়া বলিল,—ভয় নেই, উনি রাগ করবেন না। আমি বল্‌চি, তুমি আমার 'মাসীমা' ব'লেই ডেকো।

বকুল এবার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পলাশের মন কিন্তু সম্মতি জানাইতে পারিল না। তাহার স্পষ্ট মনে হইল, নন্দিতা শুধু ঐ ইঙ্গিতটুকু দ্বারা তাহাকেই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু সে কোন রকমেই স্বীকার করিতে চায় না। তাহাকে 'মা' বলিতে বকুলের যত না আপত্তি, তার চেয়ে ঢের বেশী আপত্তি নন্দিতার নিজের পলাশকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার করিতে! কি অসহ্য দম্ভ স্ত্রীলোকের!

এ দিকে বকুল কিন্তু তার মাসীমার কাছে রীতিমত জমিয়া গিয়াছে। দিনরাত্রির বেশীক্ষণই সে নন্দিতার কাছে থাকে। তাহারই কাছে পড়াশুনা করে, মুখে-মুখে গান শেখে, সেলাই শেখে। সে-দিন সে তার বাবাকে বলিল,—কাল আমি মাসীমাদের ইস্কুলে ভর্ত্তি হবো বাবা। মাসীমা বলেচে।

পলাশ বলিল,—সত্যিই তুমি ওকে তোমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে' দেবে নন্দিতা? মাইনে কত?

নন্দিতা বলিল,—ফ্রি করা যেতে পারে—যদি না আপনার আপত্তি থাকে।

মাথা নাড়িয়া পলাশ বলিল,—না, ফ্রি করিয়ে কাজ নেই। মাইনে যা' লাগবে আমি দিতে পারবো।

বেশ একটু খোঁচা দিতে পাইয়া সে যেন মনে মনে আরাম বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু নন্দিতার হাসি-মুখ দেখিয়া খোঁচাটা যেন তেমন উপভোগ্য হইল না। নিত্য নূতন ছুতা খুঁজিতে লাগিল, কেমন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া এই শিক্ষাদর্পিত মেয়েটাকে অপ্রস্তুত এবং অপদস্থ করিতে পারা যায়! তাহাতেই যেন এখন তাহার পরম পরিতৃপ্তি!

কয়েক দিন পরে হঠাৎ সে-দিন কথায় কথায় সে বলিয়া বসিল,—আমার তো বকুলকে দেখবার শোনবার সময় নেই। তুমি যে-রকম ওকে দু'বেলা নিয়ে পড়াতে বসচো, তাতে ওর পড়াশোনার খুবই সুবিধে হবে, কিন্তু তোমার পরিশ্রম আর strain হচ্চে খুব বেশী। আমি তাই ঠিক করেচি, ওর টিউশনির খরচ—যেটা আমাকে বরাবর দিতে হচ্ছিল—সেটা তুমি আমার কাছে নিতে 'কিন্তু' করো না।

নন্দিতার মুখখানা মুহূর্ত্তে আরক্ত হইয়া উঠিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তা কেন নেবো না, বা-রে! আপনি দিতে পারবেন, আর আমি নিতে পারবো না! বাড়ীতে বসে'-বসে' একটা টিউশনি পেয়ে গেলুম, এ কি কম কথা!···কত দেবেন? পাঁচ?···দশ?···কুড়ি···?···পঁচিশ? আচ্ছা, সে যা হয় আপনি ঠিক করে' দেবেন। কেমন?···বকুল! ও বকুল!

মাথার দু'পাশের বেণী দুলাইয়া বকুল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি মাসীমা?

নন্দিতা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—উঁহু! মাসীমা বলবে না, গুরুমা বলবে। ঠিক বুঝতে পারবি নে মা।

কি একটা কাজের অজুহাতে পলাশ সেখান হইতে উঠিয়া গেল। মনে-মনে তার অপূর্ব্ব হিংস্র উল্লাস! না, ভুল হয় নাই তার, নন্দিতার হাসির পিছনে আষাঢ়ের ঘনঘটা তাহার চোখে ধরা পড়িতে বাকী ছিল না।

ধীরে ধীরে জানলার ধারে ইজিচেয়ারখানিতে গা ঢালিয়া পরম আরামে একটা চুরুট টানিতে টানিতে পলাশ ভাবিতে লাগিল, নন্দিতাকে আজও সে চিনিতে পারে নাই। হয়তো পারিবে না কোনো দিন! নাই বা পারিল! না হয় এমনি দুর্জ্ঞেয়ই সে থাকিয়া গেল তাহার কাছে। এই বিচিত্র সৃষ্টির মাঝখানে ক'জনই বা ক'জনকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে?

কিন্তু মুখে যাহা বলা যায়, মন তাহাতে সব সময় সায় দিতে চায় না। বিদ্রোহের সুর তুলিয়া মুখের যুক্তিকে সে ক্ষীণ করিয়া দেয়। পলাশের মনও ঠিক তেমনি বিদ্রোহের সুরে বলিতে লাগিল, কেনই বা নন্দিতা এমনি করিয়া তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য থাকিবে? তাহার মনের গভীর গুহাতলে কি যে রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে,—তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে নন্দিতার এত আগ্রহ কেন? পলাশ তাহা জানিতে চায়। নিশ্চয় তাহার জানিবার দাবী আছে। সে তার স্বামী। আধুনিক সভ্যতায় জীবন যতই জটিল হইয়া উঠুক, এ দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

পলাশ রীতিমত খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়া দিল। নিজের মনে ঠিক করিল, আধুনিকা শিক্ষিতা তরুণী—নিশ্চয় তাহার গোপন একটা ডাইরি আছে। সুতরাং সেটা হস্তগত করা দরকার। তাই তার অনুপস্থিতির সুযোগে সে তাহার বই খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করিয়া দিল। কিন্তু কোথাও কোনো ডাইরি মিলিল না। চাবিওয়ালা ডাকিয়া চুপি-চুপি সে নন্দিতার বাক্সের চাবি তৈরী করিয়া লইল এবং বাক্স-তোরঙ্গ খুলিয়া সমস্ত জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করিল। কিন্তু সব নিষ্ফল হইল।

ট্রাঙ্কের কাপড়-চোপড়ের ভিতর গোটা দুই নূতন ছোট ফ্রক্ পলাশকে বেশ একটু বিস্মিত করিয়া দিল। এ কার জামা? বকুলের জন্য কিনিয়াছিল না কি? নিশ্চয় তাই। অথচ পলাশকে সে কিছুই বলে নাই। কেন বলে নাই? বলিলে তবু সে সেই শাড়ীর প্রত্যাখানের খানিকটা শোধ তুলিতে পারিত। আঘাত দিবার এত বড় একটা সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া পলাশ অনেকখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িল। তখনই আবার সন্দেহ হইল, আসলে এ-জামা হয়তো বকুলের জন্যই নয়। বকুলের জন্য নন্দিতা এ-সব কিনিতে যাইবে কেন?

সে-দিন হঠাৎ নন্দিতা বলিল,—দেখুন, আমি ঠিক করেচি, রামধনিকে ডিস্‌মিস্ করতে হবে। আমার ঘর থেকে আজকাল এটা-ওটা অনেক জিনিষ হারাচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চি। তাছাড়া আমার বাক্স থেকে একটা দামী জিনিষ খুঁজে পাচ্চিনে।

পলাশ বিবর্ণ হইয়া উঠিল; বলিল,—কি জিনিষ? তাহ'লে রামধনি কি—

নন্দিতা জোর দিয়া বলিল,—নিশ্চয় সে। নাহলে আমি কিছু আমার নিজের জিনিষ চুরি কর্‌তে যাবো না, আপনিও যাবেন না। আমার জামা-কাপড়ের ভেতর একখানা দামী ফটো আমি খুঁজে

পাচ্চিনে। রূপোর ফ্রেমে-বাঁধা আমার এক বন্ধুর একখানি ফটো—কলেজের এক বন্ধুর!

নির্ব্বাক্ পলাশ স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নন্দিতা বলিল,—বিলেত যাবার আগে তিনি ঐ ফটোটি তুলিয়েছিলেন। তার এক-কপি আছে তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যার কাছে, আর একখানি আমাকে দিয়েছিলেন। সেই ফটোটা হারানো আমার পক্ষে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার, তা কেউ বুঝ্‌বে না! রামধনি নিশ্চয় ক্লস্ চাবি দিয়ে আমার বাক্স খোলে।

পলাশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল,—তা, কিন্তু···ওটা তোমার অমূলক সন্দেহ হতেও পারে তো!

—কখ্‌খনো তা পারে না। কেন না, বাক্স তোরঙ্গর চাবি সর্ব্বদা আমার কাছে থাকে। এ নিশ্চয় ঐ রামধনির কাজ। আমি তাকে কোনো মতেই ক্ষমা কর্‌বো না।

পলাশও একটু জোর দিয়া বলিল,—আমি কিন্তু এ-অভিযোগ বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌চিনে। রামধনি প্রায় পনেরো বছর আমার কাছে কাজ কর্‌চে, কখনো একটা পয়সা চুরি করেনি।

—তাহ'লে নিশ্চয় আমার ওপর তার আক্রোশ জন্মেচে, তা সে যে কারণেই হোক্।

—তারও কারণ দেখিনে। কিন্তু, আমি ভাবচি—

—কি?

—তোমার সেই বন্ধুর ফটো আরও একখানা আনিয়ে নেওয়া সহজ হতে পারে তো!

—অসম্ভব। বললুম তো, তিনি এখন গ্লাস্‌গোতে আছেন। সন্ধ্যার কাছেই ন'মাসে-ছ'মাসে এয়ার-মেলে একখানা হয়তো চিঠি আসে।

—তাহ'লে তাঁর স্ত্রীর কাছে যে ফটো আছে, তাই থেকে আর একখানি কাপি করিয়ে নেওয়াও তো চলে।

—অসম্ভব। এ অনুরোধ সন্ধ্যাকে আমি কিছুতেই করতে পারবো না। মরে গেলেও না।

বলিতে-বলিতে নন্দিতা হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিরক্তির সহিত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পলাশকে রাখিয়া গেল একটা ধোঁয়াটে কল্পনার আবর্ত্তের মধ্যে!

রূপার ফ্রেমে-বাঁধা ফটোখানা কেমন, এক দিনের জন্ত তার নজরে না পড়িলেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পলাশের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এবং ব্যাপারটার জটিলতায় সে যেন ক্রমশঃ জড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নন্দিতার খুঁজিয়া-না-পাওয়া ডাইরির প্রত্যেক পাতাখানি যেন আজ হঠাৎ তাহার চোখের সামনে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার গোপন কাহিনীগুলি লইয়া। এক দিক্ দিয়া খানাতল্লাসী তার রীতিমত সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। ফটোখানা তাহার হাতে না পড়িলেও যেমন করিয়া হোক্ সত্যই যে হারাইয়াছে, এ কথা সে নিজেই বার বার স্বীকার করিতে লাগিল। রাগের মুখে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নন্দিতার মনে হয়তো একটু অনুশোচনা দেখা দিবে! উৎফুল্ল হইয়া পলাশ মনে মনে বলিল,—এম্‌নিই তো হয়! কোথায় কি-ভাবে কেমন করিয়া যে অতি গোপনীয় বার্ত্তা এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা কে বলিতে কত বিচিত্র রহস্ত হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে, আইনজীবীর অভিজ্ঞতায় সে তাহা নিত্য দেখিতেছে!

নন্দিতাও নিজেকে কত দিন গোপন রাখিবে?

শ্রীমতী সন্ধ্যার ঠিকানা সংগ্রহ করা পলাশের পক্ষে কঠিন হইল না। নন্দিতার পুরানো খাতাপত্র খুঁজিতে খুঁজিতে সহজেই তাহা পাওয়া গেল। বহরমপুর! একটা শনিবারে গিয়া সোমবারেই ফিরিয়া আসা চলে! কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্রী দেখাইবে না? তাছাড়া সে ফটোর সন্ধানই বা কেমন করিয়া মিলিবে? মিলিলেও সেটা দেখিয়া পলাশের লাভ হইবে কতটুকু!

ক'দিন হইতে নন্দিতা যেন একটু বেশী মাত্রায় গম্ভীর। বকুলকে লইয়া পড়াশোনার ব্যাপারেও যেন একটু ঢিলা পড়িয়াছে। রামধনি সম্বন্ধে সে আর এক দিনও একটি কথাও বলে নাই।

হয়তো পলাশ প্রতিবাদ করায় ও-সম্বন্ধে কোনো কিছু গোলযোগের সৃষ্টি করা সে সমীচীন মনে করে নাই। এবং কিছুই করিতে না পারিয়া নিষ্ফলতার আক্রোশে নিজে সে এমনি স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

পলাশও কিন্তু সকল দিক্ ভাবিয়া নিজেকে সংযত করিয়াছে। বহরমপুরে ছুটিয়া যাওয়া নিছক্ পাগলামী। নন্দিতার সম্বন্ধে যতটুকু সে জানিয়াছে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সম্বন্ধে ঐটুকু ইতিহাসই তো যথেষ্ট! ইহার পরে আর নন্দিতাকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া পাওয়ার চেষ্টা করার মত বাতুলতা কি থাকিতে পারে? বরং আপনা হইতেই ব্যবধানকে ক্রমশঃ সুপরিসর করিয়া তোলা সঙ্গত।

ইহার কয়েক দিন পরে স্কুল হইতে ফিরিয়া নন্দিতা শুনিল, বকুলকে লইয়া পলাশ তাহার মামার বাড়ী গিয়াছে। ব্যাপারটা তখন তত কিছু বিস্ময়কর মনে হয় নাই, যতটা মনে হইল পরের দিন পলাশকে একা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া।

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করিল,—বকুল বুঝি আসতে চাইলে না?

ঢোক গিলিয়া পলাশ বলিল,—তা নয়। সে আসবার জন্তে খুবই কাঁদছিল। আমিই আনলুম না। সেখানে থাকাই তার পক্ষে ভালো ভেবে দেখলুম। আর এখানে এসে তোমাকেও সে বড় বেশী জ্বালাতন করছিল।

সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নন্দিতা বলিল,—সেই ভালো। তার দিদিমণির কাছে থাকাই সব দিক্ দিয়ে ভালো।

তার পর একটু নীরব থাকিয়া হাসিয়া আবার বলিল,—আমার টিউশনির টাকা ক'টা খোয়ালুম এই যা!

পলাশের নিকট হইতে ইহার কোনো প্রত্যুত্তরের আশা না করিয়াই সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নিজের মনেই পলাশ একটু হাসিল। নির্দ্দয় হিংস্র হাসি! এমনি করিয়াই সে প্রতিশোধ লইবে তিল-তিল করিয়া। যাহার সহিত তার নিজের কোনো সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তাহার কন্তারই বা কি সম্বন্ধ?

এই ভাবে আঘাত করিবার জন্ত পলাশ যখন নিত্য নূতন আয়ুধ সংগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক দিন অতর্কিত আক্রমণে নিজেই সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কোথায় গিয়াছে। তাহার লেখা একটু চিরকুট রামধনি পলাশের হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল,—বহরমপুর যাচ্ছি সন্ধ্যার কাছে। সম্ভবত: গ্রীষ্মের ছুটীটা সেইখানেই থাকবো।

পলাশ ঠিক বসিয়া না পড়িলেও তার বুকের ভিতরটা অনেকখানি বসিয়া গেল।

শেষে বহরমপুর গেল নন্দিতা! সন্ধ্যাদের বাড়ীতে! সন্ধ্যার উপর তার এমন কি আকর্ষণ! সত্যকার আকর্ষণ যার প্রতি, সে তো এখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে! আশ্চর্য্য, এ-যুগের মেয়েদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। না, সন্ধ্যা বলিয়া কোনো মেয়েই নাই? এবং যে আছে সে গ্লাসগোর পরিবর্ত্তে ঐ বহরমপুরেই বিরাজমান?···

আবার সেই নিঃসঙ্গ বিপত্নীকের জীবন! মনে মনে যদিও পলাশ বলে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোহাল ঢের ভালো, তবু মনে হয়, দুষ্টামীর মধ্যে একটু তবু প্রাণের চাঞ্চল্য আছে! কিন্তু এই নিরন্ধ্র শূন্যতার মাঝখানে শুধুই অর্থহীন স্পন্দহীন মৃত্যুহীনতা। নন্দিতাকে বিবাহ করার আগে এই ঘরের চারি দিকে তবু মাধবীর স্মৃতি সজাগ হইয়াছিল, আজ যেন সে-স্মৃতিও মরিয়া গিয়াছে! যাহা আছে, সে শুধু স্বেচ্ছাচারিতার গর্ব্বিত পদচিহ্ন! ঐ সব পদচিহ্ন মুছিয়া যাইতে যাইতে পলাশের জীবনধারার নিষ্প্রভ রেখাটুকুও হয়তো মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে!

দিন দশেক পরে।

একখানা চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে নন্দিতা চৌধুরীর নামে। রামধনি আনিয়া পলাশের হাতে দিল।

পলাশ দেখিল, চিঠিটা ঠিক নন্দিতার নামে নয়। নন্দিতারই লেখা একখানা চিঠি ডেড-লেটার অফিস্ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। চিঠিটা লেখা হইয়াছিল কুমারী সন্ধ্যারাণী মিত্রকে। পলাশ সেটাকে তাহার ড্রয়ারের ভিতরে পুরিয়া ড্রয়ার বন্ধ করিতেছিল, তখনি আবার কি ভাবিয়া খাম ছিঁড়িয়া অত্যন্ত সাগ্রহে পড়িতে বসিল।

নন্দিতা লিখিয়াছে।

"···আচ্ছা সন্ধ্যা, তোর খবর কি বল্ তো? আজ এক বৎসর হ'য়ে গেল, তোর কোনো সাড়াশব্দ নেই, ব্যাপার জানতে পারি কি? তোর রকম-সকম দেখে সন্দেহ হচ্চে, তুই বহরমপুরে আছিস্ কি না! আরও মনে হচ্চে, হয়তো তুই বিয়ে করেচিস্, এবং সেই অজ্ঞাত গোবেচারীটির ঘাড়ে চেপে কোথাও হয়তো উধাও হয়েচিস্!

"···আমার কিন্তু একটা বড়-রকম আশ্চর্য্য খবর তোকে দেবার আছে। সেটা হচ্চে এই যে, আমি বিয়ে করেচি। হ্যাঁ, অত্যন্ত অকস্মাৎ! তুই হয়তো শুনে লাফিয়ে উঠ্‌বি! কিন্তু আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই। আমি মনে-মনে জানতুম, বিয়ে যদি করতে হয়, এম্‌নিই কর্‌বো। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলুম আর কি! অর্থাৎ, যেখানে আমার স্বাতন্ত্র্যটুকু ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা নেই এতটুকু, কি ঐশ্বর্য্যের নিষ্পেষণে, কি পৌরুষের অত্যাচারে। আমি তো তোকে বলেছি কত দিন, বিয়ে যদি কর্‌তে হয়, তবে এম্‌নি এক জনকে কর্‌বো, যার কাছে আমাকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কোনো দিন দাঁড়াতে হবে না।

"তুই যদি কোনো দিন আসিস্ আমার এখানে, তাহ'লে দেখ্‌বি, কি চমৎকার আমরা আছি! তোরা যাকে প্রেম বলিস্, ও-সব ননসেন্স্ আমাদের এখানে এক বিন্দু খুঁজে পাবিনে। অথচ কেমন চমৎকার আমাদের দিন কাটচে। এ যেন আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনের মহাকাব্যখানির এক একটি পাতা উল্টে চলেচি, আর একটু একটু করে এ-ওকে চিনতে পারচি। একেবারেই একটি ছোট গীতি-কবিতার মতো তাকে নিঃশেষে মুখস্থ করে' ফেলার মতো মূঢ়তা জীবনে আর কিছু নেই। তাতে জীবনের পনেরো আনা হয়ে পড়ে stalemate।

"······তুই যদি সত্যি বিয়ে করে' থাকিস্, নিজের জীবনে আমার কথাগুলো মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করিস্!······"

চিঠিখানাকে টেবলের উপর ফেলিয়া পলাশ হঠাৎ গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। মনে হইল, সে-চিন্তার কোনো দিন শেষ হইবে না বুঝি!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল (বি-এল)

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

কণা পুণ্যও বৃহৎ মহৎ ভয় হতে করে ত্রাণ,
ক্ষীণ দীপ-শিখা আঁধারেতে দেয় সুপথের সন্ধান।
অমোঘ সে যেন দেবতার বর—
সুধার কণিকা—করে সে অমর,
মহৌষধির রেণু করে জীবে নবীন জীবন দান।
যাজ্ঞসেনীর অন্নের কণা কোথা এ শক্তি পায়?
বিশ্বতৃপ্ত, শিষ্য সহিত ফিরায় দুর্ব্বাসায়।
ঋষি অগস্ত্য ক্ষীণ-কলেবর
গণ্ডূষে শোষে বিপদ-সাগর
অতি প্রচণ্ড বিঘ্ন বিন্ধ্য লুটায় চরণ-ছায়।
স্বল্পপুণ্য, স্বল্পধর্ম্ম—সায়ক গাণ্ডীবীর,
ধ্বংস আনে সে ভীতির ভীষণ খাণ্ডব বনানীর।
শঙ্কা-সাগরে সেতু রচে সেই,
শক্তির তার সীমা যেন নেই,
মরুতে বহায় ভোগবতী-ধার তৃপ্ত ধরিত্রীর।

পুণ্য হউক যত সামান্য তবুও তাহারি ফলে
সুরঙ্গ যায় দেখা সঙ্কট জতুগৃহের তলে।
আধ পথে সেই বজ্র থামায়,
পতিতে বক্ষে ধরিয়া নামায়,
জ্বলনোন্মুখ ভবন ভিজায় সেই শান্তির জলে।
পুণ্যের মাঝে বিরাজে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর—
ঐশী শক্তি অতি-ভঙ্গুরে করে অবিনশ্বর।
ব্যাঘ্রের খর দংষ্ট্রা প্রখর,
পড়িতে পারে না—কি তেজ প্রখর!
সব উগ্রতা হারায় তাহার নিকটে ভয়ঙ্কর।
মহাজাতি মহাপতন হইতে তাতেই রক্ষা পায়;
প্রতিষ্ঠিত সে রাখে মহাবীরে নিজের মর্য্যাদায়।
রাষ্ট্র ধ্বংস-মুখ হতে বাঁচে,
কপোত-পক্ষ ঝলসে না আঁচে
নিশিত সায়ক ক্লান্ত মৃগের পাশ কাটাইয়া যায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৩৭

ঘুমাইয়া রত্না স্বপ্ন দেখিতেছিল, মুশৌরীর পাহাড়! সে যেন মুশৌরী গিয়াছে! প্রকৃতির কি বিচিত্র শোভা চারি দিকে! সজ্জিত একটি বাড়ীর সুরম্য শয়ন-কক্ষে স্প্রিংয়ের খাটে কোমল শয্যায় শুইয়া আছে! বয়-খানসামা, আয়া প্রভৃতি ঘুরিতেছে! নিমীলিত চোখের সামনে ইন্দ্রজালের মত যেন ভাসিয়া উঠিতেছে, গাড়ীর কামরা—প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সে। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই প্লাটফরমের সকলের উৎসুক নয়নের কৌতূহলভরা দৃষ্টি তাহাদের কামরায় নিবদ্ধ হইতেছে। কেল্‌নারের খানসামা ছুটিয়া আসিতেছে কি কি চাই, জানিবার জন্য। অনিল হাস্য পরিহাস করিতেছে! মিসেস্ গোস্বামী উপদেশ দিতেছেন এবং গোস্বামী সাহেব এক কোণে বসিয়া পাইপ মুখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ডুবিয়া আছেন।

ঘুমের ঘোরে রত্না দেখিতেছিল, অনিল তাহাকে লইয়া পাহাড়-পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! হঠাৎ এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল টুনুর ডাকে!

টুনু ডাকিতেছিল,—ও রত্নাদি, ওঠো, জ্যাঠাইমা যে ডাকছে। ঠাকুর দেখতে যাবে না?

ঘুমের মধ্যেও যে-হাতখানা ধরিয়া অনিল রত্নার সহিত কথা কহিতেছিল, টুনুর ধাক্কায় চোখ চাহিয়া রত্না দেখিল, সেই হাতখানাই টানিয়া টুনু অত্যাচার সুরু করিয়াছে।

বিরক্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, তুই বড় জ্বালাতন করিস্ টুনু! বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

টুনু অবাক হইয়া গেল! কহিল,—ও কি, আবার ফিরে শুলে কি রত্নাদি! ঠাকুর দেখতে যাবে কখন? ওই শোনো, পূজো-বাড়ীর বাজনা বাজছে।

হ্যাঁ, ছ'টো খ্যানর্খেনে কাঁসি আর ঢ্যাপঢেপে ঢোলের আওয়াজ শুনতে আমাকে এই সকালে উঠতে হবে! তুই যা!

অমলা কি কাজে দ্বারের কাছে আসিয়াছিলেন! কন্যাকে তখনও পাশ-বালিশ জড়াইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,—বাপ রে বাপ, এখনও ঘুম! এ যে বাদশাহী ঘুম রে!

মায়ের কথায় রত্নার রাগ হইল। কোন কথা না বলিয়া বিছানা ছাড়িয়া তক্তাপোষ হইতে নামিয়া পড়িল। দড়ির আন্‌লা হইতে গামছাখানা টানিয়া কাঁধে লইয়া বারান্দায় আসিল।

ভাঁড়ার-ঘর হইতে মা কহিলেন,—পুকুরে যেয়ো না, গোপাল জল তুলে রেখে গেছে, ঐখানে হাত-মুখ ধোও।

—না, দরকার নেই! আমি ঘাট থেকে একেবারে স্নান করে আসবো। তুমি তেল দাও।

মেয়ের অসন্তোষের কারণ মা বুঝিলেন. কোন সাড়া না দিয়া তেলের বাটিটা শুধু মেয়ের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সিক্ত বসনে আর্দ্র চুলের খোঁপাটা কুণ্ডলী করিয়া ঘাড়ের উপর জড়াইয়া রত্না যখন গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া পা দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে ভেজানো সদর খুলিয়া অনিল আসিয়া উঠানে প্রবেশ করিল; এবং রত্নাকে সে-বেশে দেখিয়া দ্রুতপদে যে-পথ দিয়া ঢুকিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই আবার বাহির হইয়া গেল।

রত্নাও ছুটিয়া মায়ের ঘরে ঢুকিয়া সেখান হইতে চেঁচাইয়া কহিল,—বাবাকে বলো মা, অনিল-দা বাবাকে ডাকচে।

—এ্যাঁ! বলিয়া হুঁকা-হাতে রমেশ বহির্বাটীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। একটা দরমার বেড়ায় এ-বাড়ীর সদর-অন্দরের ব্যবধান। গ্রামের মেয়েরা কোন দিনই নিজেদের অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবেন না বলিয়া সিক্ত বসনে ঘাটের পথে যাইতে তাঁহাদের লজ্জা নাই এবং তাহা দৃষ্টি-কটু ঠেকে না! কিন্তু সহরে-বর্দ্ধিত যে সভ্য মানুষটি গ্রাম্য রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আনাড়ী, এটুকু তাহার চোখে চরম নির্লজ্জতার মত দৃষ্টি-কটু লাগে।

পথে নিম-গাছের নীচে দাঁড়াইয়া অনিল ভাবিতেছিল, এমন করিয়া হয়তো ইহাদের গৃহে ঢোকা উচিত হয় নাই! পাঁচ জনে তাহার সম্বন্ধে বিশ্রী ধারণা করিয়া বসিবে। এমনি একটা লজ্জার মেঘ তাহার মনের আকাশকে কালো করিয়া দিল এবং সেই মেঘের গায়ে আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ক্ষণে ক্ষণে রত্নার সিক্ত বসন ভেদ করিয়া তনুর যে লাবণ্যচ্ছটা বিকশিত হইতেছিল, সেই লাবণ্য তাহার মনকে উচ্চকিত করিয়া তুলিল।

অনিলকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অন্বেষণে রমেশ সদর হইতে গলাটা রাস্তার দিকে বাহির করিতেই দেখিল, সাহেব-বেশী বন্ধু-পুত্র নিম-গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঘন-ঘন সিগারেটের ধূমে স্থানটাকে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে।

রমেশ আপনার অভ্যাস অনুযায়ী সম্ভাষণে ডাক দিলেন—এই যে বাবাজি! এসো এসো, অমন পরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি বাবা ঘরের ছেলে।

শিষ্টাচারের প্রতীক হইয়া অনিল হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটীতে ফেলিয়া জুতা দিয়া চাপিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল,—আজ্ঞে, আপনি বাড়ীতে ছিলেন কি না জানি না তো! বলিয়া অগ্রসর হইল।

—না বাবা, সকালে এমন সময়ে বাড়ী থেকে বেরুই না। বলিয়া অনিলকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাক দিয়া কহিলেন,—ওরে রত্না, তোর অনিল-দার জন্তে চা নিয়ে আয়! বলিয়া অনিলের পানে ফিরিয়া তিনি কহিলেন,—আমি মনে করেছিলুম, তুমি কালই ফিরে গেছ। আছো জানলে আজ তোমায় খাবার নিমন্ত্রণ করতুম বাবা।

অনিল হাসিল। কহিল—না, ওঁরা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বাবার মাসিমা বড্ড পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন! আজও ছাড়তে চাইছিলেন না! বলছিলেন, খাওয়া-দাওয়া করে যেয়ো! কিন্তু আমার আর থাকবার জো নেই।

—ওঃ, বড় গিন্নিমা! তিনি চমৎকার মানুষ! আমরা তাঁকে তো এ গাঁয়ের অন্নপূর্ণা জানি। জ্যোতি কাকাও সদাশিব ছিলেন। তবু তো বাবার মামার বাড়ীটা দেখা হলো! সে রাম না থাকলেও সেই অযোধ্যা তো! কি বলো বাবাজি?

—ঠিক! বলিয়া অনিল কহিল,—আবার যদি কখনো আসা হয় তো আপনাদের বকুলতলাটা বাঁধিয়ে দিয়ে যাবো।

রমেশ সাহ্লাদে কহিলেন,—বেশ! বেশ! পুরীতে যেমন সিদ্ধ বকুল! এ তোমার মত যোগ্য ছেলেরই কথা বাবা।

রত্না চা লইয়া আসিল। তার পরনে সাদাসিধা একখানা ডুরে সাড়ী! নিবিড় ঘন-কুন্তলদাম এলোমেলো হইয়া কপালে পিঠে হাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে চিরুণী পড়ে নাই! দুই ভ্রূর মধ্যে লাল একটি টিপ অর্কের মত শোভা পাইতেছে।

এই প্রসাধনবর্জ্জিত সরল মূর্ত্তি অনিলের চোখে বড় ভালো লাগিল! সৌন্দর্য্যকে শত রকমে বিকশিত করিয়া তুলিবার আয়াস-হীনতায় তন্বর লাবণ্য তাহার চোখে সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখার মত মধুর বোধ হইল।

আত্মবিস্মৃতের ন্যায় অনিল ক্ষণকাল রত্নার সেই রূপ-মাধুরীর পানে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল; মুখে কথা সরিল না! কাছে রমেশ বসিয়া আছেন, তাহাও যেন মনে রহিল না! এবং মনের এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সৌন্দর্য্যের চরণে অকপট স্তুতির মত হয়তো কোন কথা বাহির হইয়া পড়িত!

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে রত্না চা ও জলখাবারের রেকাব টেবলের উপর রাখিয়া কহিল,—কাল তোমার যাওয়া হয়নি অনিল-দা?

অনিলের হুঁস্ হইল, এ সহর বা তাহাদের সমাজ নয়। এমন ভাবে দেখায় সেখানে কেহ মাথা ঘামাইবে না। কিন্তু গ্রামের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার লোকজন এবং সভ্যতা-বোধ অন্য রকমের! এখানে আর্দ্র বসনে মেয়েরা পথে হাঁটিয়া গেলে অশোভন হয় না; কিন্তু কাহারো বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিমেষের জন্য তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকিলে হয়তো ইহাতে বিষম দোষ হয়। তাই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল,—ওরা ছেড়ে দিলে না! এখন যাচ্ছি। তাই একবার দেখা করতে এলুম! জবাব-দিহির মত কণ্ঠ!

ত্বরিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—এ তো আমাদের সৌভাগ্য বাবা! তোমার পায়ের ধুলো আমার বাড়ীতে পড়লো!

অনিল হাসিল। কহিল,—না, না, কি বলচেন! তবে আপনারা এই সকালে আসার দরুণ অত্যাচার ভাবলেন।

বিস্মিত রমেশ বিমূঢ় সুরে কহিলেন,—অত্যাচার!

সহাস্যে অনিল কহিল,—নয়? সকালে এতগুলো দিয়েছেন ব্রাহ্মণ-সন্তান হলেও বাস্তবিক আমি 'দামোদর' নই! আবার কিছু না খেলে আপনারা ক্ষুণ্ণ হবেন! হয়তো আমার উপর রাগ করে বসবেন! বলিয়া সে বক্র কটাক্ষে রত্নার পানে চাহিয়া দেখিল। অবনমিত মুখে মৃন্ময় প্রতিমার মত রত্না দাঁড়াইয়া আছে!

রমেশ কহিল,—না, না, এ তো যৎসামান্য!

দ্বিরুক্তি না করিয়া অনিল আহার্য্যগুলার সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং এ কাজ শেষ করিয়া রমেশকে অভিবাদন জানাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রত্নার দিকে চাহিয়া কহিল,—আসি রত্না।

কোন উত্তর না দিয়া রত্না নিঃশব্দে এক দিকে মাথা হেলাইল।

উঠানে পা দিয়া অনিল কহিল,—মুশৌরী গিয়ে তোমাকে চিঠি দেবো।

অনিলের পিছনে রত্না ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল, সে নীরব রহিল; সাড়া দিল না।

অনিলকে মোটরে তুলিয়া দিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া অমলার কাছে গিয়া বড়-গলায় কহিলেন,—দেখলে বড়বৌ, কেমন খাশা ছেলে! বড়-মানুষির এতটুকু অহঙ্কার নেই! কেমন বিনয়-নম্র! ওদের তো চুরুট খাওয়া লজ্জার নয়! তবু আমায় দেখে কি রকম করে ফেলে দিলে! একেই বলে, ভদ্র! যাদের বাড়ী যেমন, তেমনি ওরা চলতে জানে। সভ্য তো একেই বলে! বুঝলে?

বড় বধূ এ সকল কি, কতটুকু বুঝিলেন, বলা দুরূহ! তিনি শুধু বলিলেন,—রত্না কোথা গেলি রে?

আঙুলে অলকগুচ্ছ জড়াইতে জড়াইতে রত্না অন্যমনস্কের মত কি ভাবিতেছিল! হরিমতী আসিয়া তাহার পিঠে একটা ঠেলা দিয়া কহিল,—জ্যাঠাইমা ডাকচে যে! বলিয়া হাসিয়া কহিল,—বাবা, ওই সাহেব-সাজা মানুষটা তোমায় যেন দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল ভাই! কিন্তু খুব চমৎকার দেখতে, না রত্না-দি?

কোন উত্তর না দিয়া রত্না মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

৩৮

বাড়ীতে পা দিয়া হরিমতী কহিল,—রত্নাদির সেই সাহেব-সাজা লোককে দেখে এলুম, মা!

মণি তাহার সদ্য-পাওয়া নূতন ক্যামেরা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল! কহিল,—কাকে রে? মিষ্টার গোস্বামীকে তো?

প্রতিভা তরকারী কুটিতেছিলেন, কহিলেন,—তুই দেখলি কোথা থেকে?

—কেন, আজ যে জ্যাঠামশায়ের বাড়ী এসেছিল! রত্না-দি তাকে চা দিলে।

মা কহিল,—কেমন দেখতে?

মণি তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—খুব সুন্দর! একেবারে সাহেবদের মতো দেখতে।

হরিমতী অবজ্ঞা-সূচক কণ্ঠে কহিল,—সাহেবদের মত না হাতী! রঙটাই খালি ফর্শা। বাবা, রত্নাদির দিকে এমন করে চেয়ে ছিল, যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে!

মণির হাতে তখন রত্নার প্রদত্ত ক্যামেরা! মন তাহার খুশীতে ভরা! সতেজে ভগিনীর কথার প্রতিবাদ তুলিয়া সে কহিল,—না মা, দিদির সব মিথ্যে কথা! সব অমনি বাড়িয়ে বলে। চোখ তার খুব ভালো! রং একেবারে সাহেবদের মত।

হরিমতী তখনও কোন উপহার-দ্রব্য পায় নাই! মন প্রসন্ন নয়। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে কহিল—তোর যত খোসামুদে কথা! হ্যাঁ মা, ক্যাঁট-ক্যাঁট করে চেয়ে ছিল—আমি নিজে দেখেছি।

মণি রুখিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দেখেছিস্! বল দিকি গাড়ীখানা কি রকম? মোটর যখন খালের ওপারে দাঁড়ালো, আমি আর ভোলা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে।

হরিমতী কহিল,—তবেই দেখতে পেলি না কি? তাহার স্বরে এক-রাশ অবজ্ঞা।

মণি তপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—না! পেলুম না! তোর মত কপাটের আড়ালে আমরা অমন দেখি না! দস্তুরমত বুক ফুলিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম,—রত্নাদি তখন গোস্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বসে রয়েছে!

চমকিত কণ্ঠে প্রতিভা কহিল,—কি হয়েছিল?

মণি কহিল,—ওই যে গাড়ীটা যখন খালের ওখানে দাঁড়ালো, আমরা পদ্মপুকুরে যাচ্ছিলুম, গাড়ীটাকে দেখতে দাঁড়ালুম। গোস্বামী

তখন রত্নাদি'কে কি বলছিল। রত্নাদি' তার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে বসেছিল,—বিশ্বাস না হয় ভোলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো।

প্রতিভা নির্ব্বাক্।

ছেলে ভাবিল, মেয়ের কথাই মা বিশ্বাস করিতেছেন ; মণির কথায় প্রত্যয় হইতেছে না,—তাই সত্য প্রমাণ করিতে সে কহিল,—আচ্ছা, আমি ভোলাকে ডেকে আনচি—সে বললে হেড্ মাষ্টার-মশায়ের মেয়ের মত মুখ ! তখন সাহেব দরজা খুলে দিলে আর রত্নাদি' নেমে গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলো ! আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

প্রতিভা কহিলেন,—আচ্ছা, তোমরা চুপ করো। বলিয়া তিনি গৃহান্তরে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে উঠানের বেড়ার দরজা ঠেলিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া রত্না ডাক দিল,—কাকিমা কোথা গো ?

মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিভা কহিলেন,—এই যে মা, আয় !

রত্না আসিয়া প্রতিভাকে প্রণাম করিল। কহিল,—সকলকে সব দিয়েছি, হরিমতীকে কিছু দিইনি। ও ভাবছে, দিদি আমায় ফাঁকি দিলে !

সলজ্জ চোখে হরিমতী কহিল,—বাঃ, তাই বুঝি ?

কাকিমা হাসিলেন। কহিলেন,—তা বাছা, তুমি বড় বোন ! সোনের মত বোন !

রত্নার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। রত্না কহিল,—এই ছাখ্ হরিমতী, তোর জন্ম কি এনেছি। বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা শাড়ী বাহির করিল।

পলকে হরিমতীর আঁধার-মুখে শরতের সোনালী আলোর ঝলক আসিয়া পড়িল। শাড়ীখানার উপর মুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল,—এখানা কি শাড়ী, রত্নাদি' ? ভারী চমৎকার তো এই পাখীগুলো।

হাসিয়া রত্না কহিল,—পেণ্টিং সিল্কের সাড়ী ! রংটা বেশ হালকা আসমানী, তাই তোর জন্ম তুলে রেখেছিলুম।

—এ্যাঁ, এ কাপড় তুমি আমায় দেবে ? বিস্ফারিত নেত্রে হরিমতী চাহিয়া রহিল।

মণি, টুনু, পারুল সবাই কাপড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল ; মুগ্ধ নয়নে রঙিন পাখীগুলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

প্রতিভা কহিল,—অনেক টাকা দাম পড়ল বোধ হয় ?

রত্না কহিল,—কিনিনি কাকিমা। গোস্বামী সাহেবদের বাড়ীতে বিকেলে সব এমনি শাড়ী পরে ! মাসিমা আমাকে তাই ক'খানা পাঁচ রকমের শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। এখানা আমি একদম তুলে রেখেছিলুম, বাড়ী এসে হরিমতীকে দেবো বলে। আজ পরিস্, বুঝেছিস্ হরিমতী।

প্রতিভা কহিলেন,—এত দামী শাড়ী পূজোর সময় পরে পুরানো করতে হবে না, তুলে রাখি, বিয়ের সময় দেবো। পূজোর কাপড় তো কেনা হয়ে গেছে।

হাসিয়া রত্না কহিল,—না কাকিমা, অমন করে রেখো না, পরতে দিয়ো ! বিয়ের সময় ওকে আমি এর চেয়ে ভালো শাড়ী দেবো।

দুপুরবেলায় সকলে সাজিয়া-গুজিয়া দল বাঁধিয়া নন্দী-বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে গেল। জমিদারদের বাড়ী একটু দূরে, বিশেষতঃ সে ধনীর গৃহ ! গৃহস্থ-ঘরের বধূরা সব সময়ে যাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। নন্দী-গৃহিণী নিজে আসিয়া বাড়ী-বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া যান। পূজার ক'দিন প্রসাদ পাইবার জন্ম সকলকে বিশেষ অনুরোধ করেন। না গেলে খোঁজ করেন, ক্ষুণ্ণ হন।

পথে চলিতে চলিতে প্রতিভা ও অমলা দুই জায়ে সেই কথাই হইতেছিল,—মধুর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে ! আহা, বৌটি মরে গেল ! একটা ছেলে অবধি নেই। ঘর-দোর খাঁ-খাঁ করছে।

প্রতিভা কহিলেন,—কোন্ মেয়ের ভাগ্য খুললো তাখো ! মধুর ঘরে মা লক্ষী এখন উথলে উঠেছেন।

অমলা সায় দিলেন—তা ঠিক ! নন্দী-গিন্নীও ভারী অমায়িক, বউটিকে বড্ড ভালো বাসতো !

এমনি পাঁচ কথার আলোচনা করিতে করিতে সকলে পূজা-বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পদার্পণের সঙ্গে রত্নাকে লইয়া পূজাবাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যেন মহামায়া সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। এমনি বিস্ময়ে আনন্দে সকলে রত্নাকে ঘিরিয়া ধরিল। নন্দী-গৃহিণী নিজে আসিয়া রত্নার হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া পিঠ চাপড়াইলেন। আদর করিলেন। শেষে কহিলেন, এক দিন তোর গান শুনতে যাব। শুনছি, বাপের গুণ ষোল-আনা পেয়েছিস্। মধুকে তাই বলি,—রমেশ কি সুন্দর যাত্রা করতো ! মেয়েমানুষের মত কি মিষ্টি গলা,—কীর্ত্তন গাইত চমৎকার ঐ সুরেন অধিকারীর দলে। বোসজা কত রাগ করেছেন, মার-ধোর অবধি করেছেন ছাড়াতে পারেননি ! শেষে কলকাতায় পড়তে গিয়ে, সুরেন অধিকারী মরে গেল ! দল ভেঙ্গে গেল ; যাত্রার নেশাও ছাড়লে।

পূজাবাড়ী হইতে প্রসাদ পাইয়া ফিরিতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নের ছায়া-পাত হইল।

সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসিয়া চা খাইতে খাইতে রত্না কহিল,—পূজোবাড়ী যেমন উৎসবে ভরে থাকে, এমন আর কিছুতে থাকে না।

মেয়ের কথার সমর্থন করিয়া রমেশ কহিলেন,—তা বটে !

পেয়ালাতে একটা চুমুক দিয়া রত্না কহিল,—জানলে মা, কলকাতাতে আবার আজ-কাল সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার হিড়িক হয়েছে। সে ভারী ধুম ! আমি একজিবিসন্ সাজানো দেখে এসেছি, সে যা ভিড় হয় !

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া রমেশ কহিলেন,—আরে কিসে, আর কিসে ! সে হলো কলকাতা, আর এ তো ধান-জলা ! সমুদ্দর আর ডোবা !

অপ্রসন্ন মুখে অমলা কহিলেন,—ধান-জলা হলেও এ তো আমাদের। ওগো রত্নাকে নন্দী-গিন্নীর খুব মনে ধরেছে দেখলুম। কত আদর-আপ্যায়ন করলে, মা, মা করে কাছে বসালো ! আমায় ডেকে বল্লেন, তোমাকে আর দেনা-পাওনার কথা কি বলবো ভাই ? রত্নাকে আমায় দাও, তা হলে এই অভ্রাণের গোড়াতেই—

বাধা দিয়া তিক্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—মধু কি কলকাতাতে বাড়ী কিনেছে ?

অমলা থতমত খাইয়া গেলেন, ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, —নাই বা কিনলে ! পয়সার ওর অভাব কি ? বাড়ী, বাগান, পুকুর, দু'শো বিঘে ধান-জমি ! অত বড় চালের আড়ৎ— দুধের ব্যবসা ! মা তো ওইখানেই বিরাজ করছেন ! মধুর সে-বৌয়ের গায়ে দেখেছি, ষোল বছরে মারা গেল, কিন্তু একটি গা-ঠাসা গয়না ! কি সব ভারী ভারী ! যেন গিনি সোনার তাল !

অসহিষ্ণু কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—থামো থামো, তোমার মধুর ঐশ্বর্য্য আর কাণে শুন্‌তে চাই না! এইটুকু শুধু জেনে রেখো, আমার মেয়ে আড়ৎদারের বউ হ'তে জন্মায়নি, তা তার যত পয়সাই থাক। পাড়াগাঁয়ের সম্পত্তি আবার সম্পত্তি! আরে ছ্যা!

অমলার ভয়ানক রাগ হইল। এত বড় লোভনীয় সম্বন্ধকে এতখানি অবজ্ঞা! অথচ প্রতিমার কাছে যুক্তকরে অমলা এই সম্বন্ধের জন্তই মনে মনে প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন!

শ্লেষের সহিত অমলা কহিল,—বলি, অত ছ্যা-ছ্যা কিসের? তোমার তো তাও নেই!

—না থাক্, আমি ও চাই না! বলিয়া রমেশ উঠিয়া সদর্প পদ-নিক্ষেপে প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন!

মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টার মত রুদ্ধ নিশ্বাসে অমলা কহিলেন,—দেখো, ছোট বৌ যদি হরিমতীর সঙ্গে কথা তোলে, ঠাকুর-পো চেপে ধরলেই হবে! আর হরিমতী মেয়েও নিরেস নয়।

পত্নীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমেশ জবাব দিলেন,—হরিমতীর সঙ্গে হয়, জানবো, হরিমতীর বরাত ভালো! মধুর মত ঘর-বর পেলে! তা বলে আমার রত্নার পায়ের নখের যুগ্যিও ও নয়, এ স্পষ্ট বলে দিলুম।

মেয়ের বাপ হইয়া এত বড় দম্ভোক্তি অমলাকে নিমেষের জন্ত আড়ষ্ট করিয়া দিল! মুহূর্ত্ত-পরে জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে অমলা কহিল,—তা হলে তোমার মত নেই?

সুদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর হইল,—না! একশ' বার না! হাজার বার না! আরো শুন্‌তে চাও? রমেশের স্বর তপ্ত।

হাত জোড় করিয়া অমলা কহিল,—আমার ঘাট হয়েছে। বেশ বাবু, তোমার মেয়ের বিয়ে তুমি দিয়ো! আমি আজ থেকে কোন কথা কই তো ঝকমারী! কিন্তু আমিও দেখবো!

সগর্ব্ব হাস্তে রমেশ উত্তর করিলেন, —হ্যাঁ, দেখে নিয়ো।

৩৯

মৃগয়ার অভিযান শেষ হইল।

অমিয়র গুলীর আঘাতে যে ব্যাঘ্রপুঙ্গব ভবলীলা সম্বরণ করিল, সেই শার্দ্দূলপ্রবরের পিঠে বীর-দম্ভে একটা পা রাখিয়া অমিয় বন্দুক হাতে বিজয়-গর্ব্বে দাঁড়াইল; পাশে দাঁড়াইল হাস্তময়ী কল্পনা—শুভ্র মুক্তার মত কুন্দদন্ত বিকশিত—ডান হাতখানা অমিয়র কাঁধের উপর রাখিয়া! এবং তাহাদের ঘিরিয়া বাকী সঙ্গীরা দাঁড়াইল। সকলেরই হাতে আয়ুধ, মুখে উল্লাসের হাসি।

ফটো লওয়া হইল।

সুশীলের বাংলোয় ফিরিয়া অমিয় এক-কপি ফটো মায়ের নামে পাঠাইয়া দিল। সুশীলকে কহিল,—আজ আমি তলপি গুটোচ্ছি।

সুশীল কহিল,—আজই! বড্ড শীগ্‌গির হলো না।

অমিয় হাসিল। কহিল,—হ্যাঁ, যে দিন বলবো ওই কথাই হবে! বলিয়া কল্পনার পানে চাহিয়া কহিল,—কল্পনারও তো কলেজ খুলছে! তুমি ফিরছো কবে?

কল্পনা খবরের কাগজ পড়িতেছিল—তাহাতে শীকার-অভিযানের বিবৃতি বাহির হইয়াছে। কোন্ কোন্ রথীবৃন্দে দলটি গঠিত লেখা আছে এবং তাহাদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। নিজের নামটি পড়িয়া কল্পনা ভারী খুশী হইয়াছিল। অমিয়র প্রশ্নে মুখ ফিরাইয়া সে কহিল,—আমি? আমি কাল যাবো মনে করছি।

অমিয় হাসিল। কহিল,—এক-কপি কাগজ নিয়ে যাও, আর একখানা ফটো! বোর্ডিংয়ের মেয়েদের দেখাবে।

অমিয়র এ কথা কল্পনা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বলিয়া মনে করিল। শীকার-কাহিনীর বিবৃতি সে-ই কাগজে পাঠাইয়াছিল এবং মৃগয়া-অভিযানে তাহার বিশেষ কিছু সাফল্যও ছিল না। তাই অঙ্কুশের মত রহস্তটা তাহাকে বিঁধিল।

পাল্টা আক্রমণে পরিহাসের শোধটা ফিরাইয়া দিতে সহাস্তে সে কহিল,—হ্যাঁ, রত্নাকে দেখাবো না, এ প্রতিশ্রুতি হয়তো আমি দিতে পারি।

অমিয় চমকিত হইল। রত্নার ভাবপ্রবণ হৃদয়, সদা-অভিমানী চিত্ত, একটুতেই কতখানি আঘাত পায়, অমিয় তাহা জানে। এবং কল্পনার এই ফটোখানা রত্নাকে কি নিদারুণ মর্ম্মাহত করিবে তাহা অনুভূতির সঙ্গে অমিয় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। ছায়াবাজির মত নিমেষে অমিয়র মনে রত্নার হৃদয়ের ক্ষত-শোণিতাক্ত চেহারা সুস্পষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। রত্নার ব্যথিত অন্তরের যাতনা পলকে নিজের মনে সে অনুভব করিল। রত্নার চোখের জলের উৎস যে অমিয়রও বুকের মাঝে অশ্রু-নদীর সৃষ্টি করিয়া চলে! বড় ভয়ে অমিয় পলাইয়া আসিয়াছে! সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, সেই তরুণ বুকে যে ঝড় উঠিয়াছে, শ্রাবণের সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন এক দিন ধুইয়া মুছিয়া শরতের নির্ম্মল আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে! সে দিন সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিবে! অমিয় বোঝে, মানুষের যাহা কিছু কাম্য, তরুণ জীবনের যত কিছু আকাঙ্ক্ষা, কুমারীর যত কিছু লোভনীয়, সমস্তই সেই পরী-বালিকার সম্মুখে থরে-বিথরে সজ্জিত হইয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে! তাই অমিয়র মন রত্নার জন্ত সর্ব্বক্ষণ যাতনা বোধ করে।

হৃদয়ের নিভৃত গহনে যে ভালোবাসা এক দিন রত্নাকে কেন্দ্র করিয়া জাগিয়াছিল, সেই স্নেহ-মমতা-প্রীতিকে সে যত রকমেই গোপন করিয়া রাখুক, সে প্রীতিপ্রদের কল্যাণ-চিন্তায় হৃদয় কাতর হয়।

অমিয়কে হঠাৎ নীরব দেখিয়া কল্পনার মনটাও বিশেষ প্রফুল্ল রহিল না! একটা শুষ্ক হাস্তরেখা অধরে টানিয়া সে কহিল,—ভয় হচ্ছে রত্নার জন্ত,—না?

অমিয় কল্পনার মুখের পানে তাকাইল। সহজ সুরে কহিল,—হ্যাঁ।

সুশীল উঠিয়া ইভার খোঁজে গেল।

কল্পনার মনে কে যেন অঙ্গার চাপিয়া ধরিল! মনে সহসা এমনি জ্বালা! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিল,—ও! আমাদের অনুমান তাহলে ভুল নয়!

অমিয় উত্তর দিল,—না।

কল্পনাও আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। অন্ত কেহ হইলে, কথা ছিল না! কিন্তু অমিয়! সে যে এমন করিয়া একটা কথা সুস্পষ্ট স্বীকার করিবে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত! প্রচণ্ড বিস্ময়ে মানুষ নির্ব্বাক্ হইয়া থাকে! কল্পনা চুপ করিয়া রহিল।

অমিয়ও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পরে কহিল,—আমার একটা কথা রাখবে কল্পনা? কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

কল্পনা যেন হেঁয়ালীর মধ্যে পড়িয়াছে! অমিয় তাহাকে পরিহাস করিতেছে কি না, সে বুঝিতে পারিল না। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু কহিল,—কি?

অমিয় থামিল। একবার ইতস্ততঃ করিল। তার পর মিনতি-সুরে কহিল,—এ ফটো তুমি রত্নাকে কখনও দেখিয়ো না! অমিয়র স্বরে ব্যাকুলতা।

কল্পনা চমকিয়া উঠিল। আকাশের বিদ্যুৎ যেমন অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া বর্ষণ-সিক্ত ধরিত্রীর রূপটা নিমেষে দেখাইয়া দেয়, পলকে তেমনি কল্পনার চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল রত্নার প্রতি অমিয়র সুগভীর ভালোবাসা! সংশয়ের এতটুকু আব্রু আর কোথাও রহিল না।

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া শ্লেষের সহিত কল্পনা কহিল,—রত্না তা হলে আপনার কি করবে?

মন যখন অনুতাপে আচ্ছন্ন থাকে, অপরের ব্যঙ্গ বা ভর্ৎসনা তখন আর মনে বাজে না।

যন্ত্রচালিতের মত অমিয় কহিল,—আমার? না, আমার সে কিছুই করতে পারবে না! কিন্তু নিজের হয়তো সাংঘাতিক ক্ষতি করে বসবে! শূলের মত সেইটেই আমার ভয়ানক বাজবে। না কল্পনা, তোমরা পাঁচ জনে তার উপর অত্যাচার করো না।

ব্যঙ্গের হাসিতে কল্পনার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। সে কহিল,—রত্নাকে এতই যদি আপনার ভয়, তবে এমন করে ছবি তোলালেন কেন?

অমিয় নীরব রহিল। কল্পনা ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ছিল। শীকারের বিজয়-উল্লাসে মাতোয়ারা চিত্তে অমিয় কোন সঙ্কোচ বোধ করে নাই! এখনও কুণ্ঠা জাগিত না, যদি না রত্নার কথা দপ্ করিয়া স্মৃতিপথে উদিত হইত।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটিল। অবশেষে কল্পনা মুখ তুলিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—আপনি যার জন্য এতখানি উতলা, সে কিন্তু এর জন্য এতটুকুও ভাবিত নয়, জান্‌বেন। সে এখন এতটুকু ব্যাকুল হবে না! পুরূরবার জন্য সে এখন পাগল।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। এ প্রসঙ্গ আর যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কল্পনার মনের কুটিলতা তাহার চোখে এমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত মন কল্পনার প্রতি তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল।

অপরাহ্নের দিকে অমিয় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেখা দিল।

সুশীল ও ইভাকে সাদর বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল।

কল্পনা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না।

অমিয় কহিল,—কল্পনা কোথায়?

—ওই যে ঘরে। বলিয়া সুশীল ডাক দিল,—কল্পনা!

ইভা কহিল,—আচ্ছা নভেল্ পড়ার ঝোঁক!

ভ্রাতার আহ্বানে কল্পনা দর্শন দিল। অমিয়র পানে চাহিয়া কহিল—চললেন?

—হ্যাঁ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি!—বলিয়া বন্ধু-দম্পতির করমর্দ্দন করিয়া কল্পনার দিকে বাহু প্রসারিত করিল! এবং তাহার করপল্লব গ্রহণ করিয়া ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল,—মনে রেখো।

উহ্য অনুরোধটা একমাত্র কল্পনা ছাড়া আর কেহই বুঝিল না। প্রত্যুত্তরে ঔদাস্য সহকারে কল্পনা কহিল,—চেষ্টা করবো।

এ কথার সঠিক অর্থ কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না। সুশীল ও ইভার কাছে সবটাই হেঁয়ালীর মত ঠেকিল।

অমিয় চলিয়া গেল।

কল্পনাকে একা পাইয়া ইভা এক সময়ে কহিল,—তুই তো বরাবর অমিয়কে পছন্দ করতিস্! আমরা মনে করতুম, ভালোও বাসতিস্! হঠাৎ তবে অনিলের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক হোলো কেন?

মুখখানা বিকৃত করিয়া কল্পনা উত্তর দিল,—তার আমি কি জানি? তোমরাই জানো।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইভা কহিল,—তা অনিল খুব ভালো! ওকে পাওয়ার জন্য তপস্যা করতে হবে। রঙও তার অমিয়র চেয়ে ঢের বেশী ফর্শা। যেন ইংরেজের গায়ের রং! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আসবো বলে অমন করে কথা দিয়েও সে এলো না!

এ সব কথার উত্তর না দিয়া কল্পনা কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক'মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সে দিন নিজের বাংলোতে বসিয়া অমিয় চা খাইবার পর উঠি-উঠি করিতেছে, বেয়ারা আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

প্রয়োজন কি জানিতে চাহিতেই দ্বিতীয় দফা সেলামে সে হুজুরের কাছে ছুটীর দরখাস্ত পেশ করিল।

এই বেয়ারাটিকে না হইলে অমিয়কে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়!

ছুটী কি বাবদ এবং কত দিনের জন্য, অমিয় জানিতে চাহিল।

বিনীত কণ্ঠে ভৃত্য হুজুরের কাছে নিবেদন জানাইল,—সাদির সব ঠিক হইয়া গিয়াছে! পনেরো টাকা লইয়া বাপ তাহাকে যাইতে আদেশ করিয়াছে। অন্যথায় বাপুজীর বিশেষ গোসা হইবে।

অমিয় হাসিল। কহিল—আবার সাদি! এবার নিয়ে ক'বার হলো?

লজ্জিত ভৃত্য মাথা চুলকাইয়া নীরব রহিল।

একটু চিন্তা করিয়া অমিয় কহিল,—আচ্ছা, আমি রতনপুর যাবো, সেখানে সব গুছিয়ে দিয়ে নতুন চাপরাসীকে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে তালিম দিয়ে দিলে তবে ছুটী মঞ্জুর হবে!

আর এক দফা সেলাম দিয়া লছমন্ জানাইল, অপেক্ষা এখন সে দু'মাস করিতে পারে। কেবল সময় থাকিতে হুজুরের কর্ণ-গোচর করিল, পাছে পরে হুজুরের গোসা হয়!

অমিয় কোন উত্তর দিল না। শুধু মনে মনে একটুকু হাসিল। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবার অর্থ—হুজুরের নিকট হইতে পনেরো টাকা সংগ্রহ, তাহা সে জানিত।

ক্রমশঃ

শ্রীপুষ্পলতা দেবী

কৃপণ স্বামী

[গল্প]

সন্ধ্যায় তুলসী-তলায় সবে প্রদীপ দিতে গিয়াছি, সদরে স্বামীর সিংহনাদ! শুনিয়া হঠাৎ আমার হাত কাঁপিয়া আঙুলে সলিতার ছেঁকা লাগিয়া গেল।

বাহিরের হুঙ্কারে ভিতরের জ্বালায় কণ্ঠে প্রার্থনার বাণী আর উচ্চারণ হইল না। তাড়াতাড়ি প্রণাম সারিয়া ত্বরিত পদে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামী তখনো থামেন নাই। ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া তখনই নিবানো হয় নাই বলিয়া আমার উপর স্বামীর অনুযোগ-অভিযোগ বর্ষার বিপুল সলিল-ধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল।

বাপের পিছন হইতে ছেলে রাখাল বিজলী-বাতির সুইচ্ কটা টিপিয়া দিতেই সন্ধ্যার আব ছা-অন্ধকারে বাড়ী ভরিয়া গেল।

আমাকে নিকটে পাইয়া স্বামী বলিলেন, "তোমাকে শত সহস্র বার সাবধান করে দিয়েছি, অযথা আলো জেলে রেখো না। এ কি আজ আলো জ্বালিয়ে অপব্যয় করবার সময়? চারি দিকে দুর্ভিক্ষ, কুকুরের অধম হয়ে মানুষ পথে পথে ঘাস-পাতা খেয়ে মরছে, আর আমরা আলো জ্বেলে নবাবী করছি।"

তখনো আঙুলের জ্বালা কমে নাই, তাই মেজাজ নিতান্ত নরম ছিল না। গরম হইয়া উত্তর দিলাম, "এখন যেন অন্ধকারের যুগ এসেছে, আলো জ্বালানো বারণ হয়েছে! কিন্তু কোন কালে কোন লোক তোমার বাড়ীতে আলো দেখেছে, বলতে পারো? যারা খড়ের কুঁড়েয় গাছের তলায় থাকে, তারাও সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ দেখায়। তোমার মত কেপ্পণের হাড়ে সেটুকুও সয় না! আজ-কাল কথায় কথায় ঐ এক ছুতো দুর্ভিক্ষ মহামারী! তার জন্য তুমি কি করচো শুনি? একটা আধলা পয়সা কখনো কারো পেটে দেছ? না, দেবার প্রবৃত্তি আছে?"

যে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে নাই, প্রতিবাদ করে নাই, তার এমন কটু-ভাষণে স্বামী বোধ হয় বিস্মিত হইয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

উত্তর দিল রাখাল। আমার সামনে আসিয়া চাপা স্বরে চুপে চুপে কহিল, "বাবা সারা দিন খেটে-খুটে এলেন আর তুমি বাবাকে এ সব কি বল্‌ছো মা? ছি!"

বয়স্ক সন্তানের মুখের সামান্য 'ছিঃ' কথাটুকুতেই আমার মনে আঘাত লাগিল। লজ্জায় আমি মরিয়া গেলাম! কিন্তু মনের উত্তাপ মরিল না। স্বামীর কৃপণ-স্বভাবের শত অন্যায় অবিচারের স্মৃতি আমাকে বিচলিত বিমনা করিয়া তুলিল।

ধনীর প্রাসাদ হইতে আমি আসি নাই। দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে আমার জন্ম। শৈশব কিরূপে কাটিয়াছে মনে পড়ে না। যৌবনের প্রারম্ভে এখানে আসিয়াছি। তাহার পর কোথা দিয়া কেমন করিয়া সে প্রফুল্ল জীবন বহিয়া গিয়াছে জানি না। আজ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে উপনীত হইয়া ধিক্কার জাগিতেছে, এত দিন কি করিয়াছি? কৃপণের সংসারে বাঁধা বরাদ্দ ব্যবস্থা মানিয়া নীরবে নত শিরে এমন সোনার মনুষ্য-জন্ম বিফল করিয়াছি! কখনো মাথা তুলি নাই! অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় নাই। আজ পৃথিবীর সামনে দাঁড়াইয়া উপলব্ধি করিতেছি,—আমি কোথায় আছি! আমার স্থান কতটুকু!

বিশ্বের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। বিশ্ব আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে আজ ধরণীর ধূলার উপর। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, প্রাণ দাও, ভিক্ষা দাও! ক্ষুধিতের পীড়িতের সকরুণ আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন—এ দুর্দ্দিনে এক-মুঠা দূরের কথা, এক কণা দিবারও শক্তি আমার নাই! এ দুঃখ আমার বুকে কাঁটার মত অহরহ বিঁধিতেছে।

এত কাল স্বামীর বাসনা-কামনার সহিত আমার কামনা বাসনা সরু সুতার মত পাকে-পাকে জড়াইয়াছিল। আজ সে সুদৃঢ় পাক আলগা করিয়া দিতেছে কানের কাছে ঐ একই গুঞ্জন, একই ধ্বনি —"মা গো, খিদেয় প্রাণ যায় মা, একমুঠো ভাত দাও গো—একটু ফেন দাও।"

আমাদের তিনটি প্রাণীর সংসারে এক-বেলার ভাতে কতটুকুনই বা ফেন হয়? ভিটামিনের দোহাই দিয়া সেটুকুও স্বামী ভাতের সহিত উদরস্থ করেন। রাত্রে তিন জনের মাপের রুটী দুপুরেই করিয়া রাখা হয়। বাড়ীতে একটা ঠিকা ঝী ভিন্ন দাস-দাসীর বালাই নাই।

স্বামী ধনী নামে খ্যাত না হইলেও বিত্তহীন নন। মুষ্টিভিক্ষা দিবার সঙ্গতি আমাদের আছে; কিন্তু স্বামীর কৃপণ-স্বভাবের জন্য আমার দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। দীন-দরিদ্র অনেক দেখিয়াছি, নিঃস্বের সঙ্গেও অপরিচয় নাই, কিন্তু আমার স্বামীর মত এমন অমানুষ, হাড়-কৃপণ দেখা যায় না!

হাড়-কৃপণকে দেব-দেবীরাও সমীহ করেন, সেই জন্যই আমার একমাত্র সন্তান। সন্তান একটি হইলেও রাখাল ছেলে ভালো। লেখাপড়া শিখিয়াছে কিন্তু ঝাঁজ নাই। ধীর শান্ত প্রকৃতি। বাপের ছায়ার প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনির প্রতিধ্বনি! আড়তদার পিতার সুপুত্র দোকানদার হইয়াই আছে। সে-দোকান আবার তামাকের। লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জায় ঘৃণায় আমি মরিয়া যাই!

তামাকের এ কারবার পৈত্রিক। বহু কাল পূর্ব্বে স্বর্গগত শ্বশুর মহাশয় অভাবের তাড়নায় পল্লীর মায়া, দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন। ব্যবসার জন্য মূলধন আনিয়াছিলেন আধ সের দা'-কাটা তামাক। ইহার পরের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর।

কালীঘাটের দোকানখানি শ্বশুর মহাশয় নিজস্ব করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। আদিগঙ্গার ও-পারে চেতলায় বিঘাখানেক জমি-সমেত বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন আমার স্বামী। কীর্ত্তিমান্ বংশের একমাত্র বংশধর রাখাল আবার কি কীর্ত্তি স্থাপনা করিবে, কে জানে? যাই করুক, 'তামাক' 'আড়ত' আর 'দোকান' কথাগুলোতে আমার কাণ ঝাঁ-ঝাঁ করে—আমার লজ্জা হয়!

আরও বেশী লজ্জায় পড়িয়াছি রাখালের বিবাহ লইয়া। আমাদের প্রতিবেশী দূর-সম্পর্কের এক ভাসুর এত কাল পুলিসের টিকটিকি বিভাগে কাজ করিয়া পুত্র অনাথবন্ধুকে তাঁহার কাজে বসাইয়া সম্প্রতি অবকাশ লইয়াছেন। ভাসুরের সহিত আমার যোগাযোগ নাই। যোগ জায়ের সহিত। দিদি খুব প্রখরা—অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতে

চান না। আমার স্বামী—পুত্র দোকানদার—তাহা লইয়া কত কথাই দিদি শোনান্!

একটি ভালো ঘরের মেয়ের সঙ্গে রাখালের বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। দিদির ষড়যন্ত্রে সে মেয়েটি মাসখানেক হইল অনাথকেই নাথত্বে বরণ করিয়া দিদির ঘর আলো করিতেছে। তাহার পর হইতে মন আমার নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া আছে।

দিদি মহা-আড়ম্বরে ক'দিন হইতে দশটি করিয়া কাঙ্গালীভোজন করাইতেছেন। অথচ আমার মুষ্টি-ভিক্ষা দিবার অধিকার নাই। দিদিকে ঈর্ষা করি না। আমার দুঃখ হয়, পরিতাপ হয়।

নির্জ্জনে নিজের বেদনার ভারে তন্ময় হইয়া ছিলাম, কখন্ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি গভীরতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে জানিতে পারি নাই।

রাখালের ডাকে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল —"এখানে চুপ করে বোসে রয়েছ কেন, মা? আজ আমাদের খেতে দেবে না? বড্ড খিদে পেয়েছে, রাত দশটা বেজে গেছে।"

সচমকে উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেলাম।

নিত্য যাদের খাবার সময় ন'টার মধ্যে, আজ দশটাতেও তাদের খাইতে দিই নাই, এ লজ্জা আমার বুকে খচ-খচ করিতে লাগিল।

স্বামি-পুত্র পাশাপাশি আহারে বসিয়াছেন। পথে আর্ত্তনাদ সুরু হইল—"মা গো, খিদেয় মরে যাচ্ছি মা, তোর পায়ে ধরি মা, দু'টো খেতে দে মা।"

স্বামী নির্ব্বিবাদে রুটী চিবাইতে লাগিলেন। মানুষটি সত্যই অমানুষে পরিণত হইয়াছেন। কোন কিছুতেই ভাবান্তর নাই, বেদনাবোধ নাই। পিতার উপযুক্ত পুত্র হইলেও রাখালের বয়স অল্প, হৃদয়ের সহজাত কোমলতা সে এখনও হারাইয়া ফেলে নাই।

সামনের খাবার নাড়িতে নাড়িতে রাখাল সখেদে বলিল,— "জ্যাঠাইমা রোজ দশ-জনকে খেতে দিচ্ছেন, আসছে কিন্তু একশো। যাদের দিচ্ছেন, গোপনে দিলে—আশায় আশায় এতগুলো প্রাণী অনর্থক এসে বঞ্চনা-ভোগ করতো না।"

স্বামী কহিলেন, "সকলের কাঙ্গালী-ভোজনের যা বহর তাতে এক হাতা অখাদ্য-কুখাদ্য দিলেও পেটের জ্বালায় ওদের আসতেই হতো। গরীব-দুঃখীরা কি পেট পূরে খেতে জানে না? না, ভালো জিনিস খেতে পাবে না? আমি বলি বাপু, যাকে যতটুকু দিতে পারো ভাল করে দাও—যা-তা খাইয়ে মেরে ফেলা কেন?"

মনে করিয়াছিলাম ইহাদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিব না। যিনি মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কিসের বা যুক্তি-তর্ক? তবু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মনের জ্বালা মনে চাপিয়া শান্ত ভাবেই বলিলাম, ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া! যেখানে না খেয়ে হাজার হাজার লোক মরছে, সেখানে ভাল মন্দর বিচার চলে না। ভালো ক'জন দিতে পারে? কার কতটুকু সামর্থ্য? এখন সবার উচিত, যেমন করে হোক্ যে ক'টিকে পারে, বাঁচিয়ে রাখা। 'ওরা দশ জন লোক খাওয়াচ্ছে, আমরা যদি পাঁচ জনকে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম, তা হ'লে সকল কাজের বড় কাজ করা হতো।

"পাঁচ জনকে কেন? দেবে যদি ছ'মাসের জন্য হাজার জনকে দাও। কিন্তু জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করবে কে? বিলি-ব্যবস্থা হবে কাকে দিয়ে? এ-সব কাজে কাকেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ভিখিরীর ক্ষুদ-কুঁড়োয় যারা সিঁদ কাটে, তারা মানুষ নয়।"

"তারা অবশ্য মানুষ নয়, কিন্তু তাদের মধ্যেও সত্যিকারের মানুষ আছে। ইচ্ছা থাকলে আমার কাজের লোকের অভাব হয়? তোমরা দু'জন রয়েছো, কিন্তু থাক্‌লে কি হবে? ছ'মাসের জন্ত হাজার লোককে খেতে দেবার কথা ভাবলেও তোমায় হাটফেল হবে! অত শত বড় কথায় আমার কাজ নেই, দিনে পাঁচটি লোকের ব্যবস্থা তোমরা করে দাও। তোমরা দু'জনেই মনে করলে তা পারবে।"

"না, তা পারবো না। দোকান বন্ধ করে আমি তোমাদের কোন পুণ্য কাজ করতে চাইনে। রাখালকেও এক দণ্ডের জন্ত দোকান-ছাড়া হতে দেবো না। দোকান আমার লক্ষ্মী, সকল কাজের ওপরে।" বলিয়া স্বামী আহারান্তে উঠিয়া গেলেন।

রাখাল ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "আচ্ছা মা, আজ বাবাকে তুমি এত কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি তো কখনও এমন করোনি! জ্যাঠাইমা কাঙ্গালী খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ান! তাতে তোমার রাগ কিসের? যারা নিজেদের জয়ঢাক নিজেরা বাজায়, বাবা সে দলের নন। বাবা বলেন, দান ডান হাতে করলে বাঁ হাতকে তা জানতে দিতে নেই। বাবা গোপনে কত ভালো কাজ করেন, তুমি তো সে খবর রাখো না!"

বাধা দিয়া আমি বলিলমে, "আমার কোন নতুন খবরে আর দরকার নেই রাখাল। তোমার কাছ থেকে আজ আমি ওঁকে চিনতে চাই না। তোমার জন্মের ঢের আগে থেকেই আমার জানা চেনা হয়ে গেছে।"

নিরুত্তরে রাখাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

* * * *

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। এক ঘুমের পর জাগিয়া দেখি টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যার ক্ষীণ মেঘ-রেখা কখন্ গোটা আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু বারি-বর্ষণ সুরু করিয়াছে, টের পাই নাই। জানিতে পারিয়া আরামের সুখ-শয্যায় থাকিতে পারিলাম না। বাহিরে রাখালের জামা-কাপড় শুকাইতেছিল।

ধীরে ধীরে রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া বারান্দায় আসিলাম (পাশাপাশি তিনখানা ঘর। মাঝের খানিতে আমি থাকি। এক দিকে রাখাল, অন্ত দিকে স্বামী।

রাখালের ঘর নিস্তব্ধ। স্বামীর ঘরে মৃদু দীপালোক লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। রাত্রে অকারণ আলোর অপব্যয় স্বামীর স্বভাবের বাহিরে!

অকস্মাৎ আশঙ্কা হইল, অসুখ করে নাই তো?

পা টিপিয়া খড়খড়ির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ঘরের মধ্যে তাকাইলাম। না, অসুখ নয়। স্বামী বেশ সুস্থ শরীরে মেঝের মাদুরে বসিয়া একটি খেরোর তাকিয়ার খোলের মধ্যে কতকগুলি কাগজ পুরিতেছেন। ও-তাকিয়ার খোল কয়েক মাস পূর্ব্বে আমিই সেলাই করিয়াছি। তুলা চাহিলে স্বামী বলিয়াছিলেন, "এটা ব্যবহারের জন্ত নয়। জাপানী বোমার কল্যাণে যদি পলাইতে হয়, ইহাতে করিয়া সংস্থান কিছু লইয়া পলাইতে পারিব। বাক্স-পেঁটরার

লোকের সন্দেহ হইবে, লোভ হইবে। ইহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিবে না।"

সকৌতুকে আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি ত টাকাকড়ি কাছে রাখো না। যখের ধনে ব্যাঙ্ক লাল হয়ে যাবে। তোমার সার হবে শুধু বালিসের খোলে করে ঘটা বাটি বওয়া।"

ইহার পর এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় নাই। খেরোর খোলের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। খরচ-পত্রের টাকাকড়ি চিরকাল স্বামীর কাছে থাকে। তাঁহার কি আছে, আমি জানি না। জানিবার কৌতূহলও হয় নাই।

শ্বশুরের আমলের বৃহৎ শাল কাঠের একটা বাক্সে স্বামী সংসার খরচের টাকা রাখেন। বাক্সর চাবি তাঁর কোমরের সূতায় সুরক্ষিত আছে চিরকাল।

আরো খানিকটা সরিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। যে কাগজগুলিকে সাধারণ ভাবিয়াছিলাম সেগুলি সাধারণ নয়, নোটের তাড়া। গণনা বোধ হয় পূর্ব্বেই হইয়াছে, এখন দড়ি দিয়া বাঁধা তাড়া তাড়া নোট খোলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কত টাকার নোট, বুঝিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে তাকিয়ার শূন্য খোল পূর্ণ হইয়া বালিসের আকার ধারণ করিল। বালিসটা সযত্নে বাক্সে রাখিয়া স্বামী বাক্সর ডালা বন্ধ করিলেন। আমি আস্তে আস্তে নিজস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

আর ঘুম হইল না। মহানগরীর অন্ধকার রাজপথ হইতে আশ্রয়হারা, গৃহহারা শিশুদের সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনি অকাল-বর্ষার বারিসিক্ত মত্ত পবনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

আশা করিয়াছিলাম—সকালে স্বামী হয়তো পাঁচের পরিবর্ত্তে একটি লোকেরও ভাতের ব্যবস্থা করিবেন। গত রাত্রের অত কথার পর চক্ষু-লজ্জায় বাধিবে না? কিন্তু আমারই ভুল! আশা দুরাশা! চক্ষু যাহার থাকিয়াও নাই তাহার আবার চক্ষুলজ্জা! যাহার হৃদয় নাই, তাহার কাছে হৃদয়-বৃত্তির প্রত্যাশা বাতুলতা।

প্রতিদিনের মত তিনি মুখ-হাত ধুইয়া ছোলা-গুড় খাইয়া তালি দেওয়া খদ্দরের কোট গায়ে চাপাইলেন।

কুণ্ঠিত ভাবে কহিলাম, "একবার বাজার হয়ে তুমি দোকানে যাও। অনেক দিন মাছ আসে না, আজ একাদশী। তোমার তাড়া থাকলে রাখাল মাছ এনে দিয়ে যাক।"

স্বামী সহাস্যে উত্তর দিলেন, "রাখালকে ভোরেই দোকানে পাঠিয়েছি! আজ আমার বাজার করা পোষাবে না, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। ঢের কাজ। তাছাড়া কাজ না থাকলেও আমাদের মত মানুষ দু'-তিন টাকা সেরের মাছ খেতে পারে না। একাদশীতে মাছ খাওয়া ও একটা কুসংস্কার। মারাঠী-মাদ্রাজীদের মেয়েরা মাছ ছোঁয় না বলে তাদের স্বামীরা কি বেঁচে থাকে না? একাদশীতে নাই বা খেলে মাছ! কপাল ভরে সিঁদুর পরো, পায়ে আল্‌তা দাও। পান খেয়ে লাল পেড়ে শাড়ী পরে তোমার বাগানের শাক-তরকারী তুলে রান্না করো। বাড়ীতে আমার লক্ষীর ভাণ্ডার, আমি কিসের দুঃখে বাজারের ধার ধারবো!" বলিতে বলিতে তিনি পথে বাহির হইলেন।

ফিরিলেন পড়ন্ত দুপুরে। শ্রান্ত-ক্লান্ত রৌদ্র-দগ্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। যাহার অর্থ রাখিবার স্থান নাই, তাহার এত দুঃখ-কষ্ট কিসের জন্য? যে-অর্থে আহার্য্যের স্বাচ্ছন্দ্য নাই, বেশ-বাসে পারিপাট্য নাই, কাহারো একবিন্দু উপকারের সম্ভাবনা নাই; সে অর্থের কি দাম?

বারান্দায় তৈল মাখিতে বসিয়া স্বামী বলিলেন, "বড্ড বেলা হয়ে গেল, তোমাকে আজ অনর্থক কষ্ট দিলাম। এত দেরী হবে বুঝতে পারিনি, বুঝলে একেবারে দু'টো ভাতে-ভাত খেয়ে বেরিয়ে যেতাম।"

অশ্রদ্ধার মধ্যেও একটু মায়া হইল। বলিলাম, "ঘরে বসে আমার আবার কষ্ট কি? মেঘ-ভাঙ্গা রোদে তুমি ঘেমে নেয়ে এসেছ। গাড়ী-ঘোড়া দূরের কথা, একটা সামান্য ছাতা পর্য্যন্ত তোমার জোটে না! এত বেলা অবধি ছিলে কোথায়?

"ছিলাম কত জায়গায়। আসছি মহেশের ওখান থেকে। মহেশকে চিন্‌তে পারলে না? আমাদের গাঁয়ের মহেশ বোস্ গো, আমার বাল্যবন্ধু। মহেশ কাশীপুরে বাসা নিয়ে আছে। সে দিন দোকানে এসে আমাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল। বেচারা ভারী বিপাকে পড়েছে।"

"বিপাক কিসের? ওঁর অবস্থা তো ভালোই শুনেছিলাম? অনেক জোৎ-জমা আছে।"

"থাকলে কি হবে, চার মেয়ের বিয়েয় সব গেছে, তবু মেয়ে ফুরোয়নি। এখনো একটি বাকী। মেয়েরাই বড়, ছেলে দু'টো নেহাৎ বাচ্ছা। কাজেই কোন দিকে কিছু সুবিধা নেই। ছোট মেয়েটির জন্য মহেশ আমাকে ধরেছে।"

"ধরা মানে? মেয়ের বর জুটিয়ে দেওয়া? না, সাহায্য চাওয়া?"

"সাহায্য নয়। তার ইচ্ছা, মেয়েটিকে আমরা নিই। অর্থাৎ রাখালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। তা সে বলতে পারে। মহেশ হলো আমার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। গাঁয়ের লোক, সমাজের লোক আমি, আমার ওপর তার দাবী আছে।"

রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষ স্বরে কহিলাম, "তোমার ওপর তাঁর দাবী থাকতে পারে, রাখালের তাতে দায় নেই। আমার ঐ একটি ছেলে, যেখানে-সেখানে হা'ঘরের ঘরে তার বিয়ে আমি দিতে দেবো না।"

স্বামী ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন "এ তুমি কি বল্‌ছো? মহেশের অবস্থা এখন খারাপ হলেও সে হা'ঘরে নয়! ধন-সম্পদ বানের জল। বানের জলের মতই আসে যায়, তার কোনো দাম নেই, স্থিরতাও নেই। তাছাড়া এ দুর্দ্দিনে কার অবস্থা ভালো, বলতে পারো? তুমি জানো না যে 'উঠতি ঘরে মেয়ে দিতে হয়, আর পড়তি ঘরের মেয়ে নিতে হয়? আমার যা অবস্থা-ব্যবস্থা তাতে এ কালের ফ্যাশন-দুরন্ত সহরের মেয়েতে চলবে না। তোমাকেই অশান্তি ভোগ করতে হবে। আমি দোকানদার মানুষ, আমার ছেলেও দোকানী—সেটা মনে রেখে আমাকে সব করতে হবে। এই ধরো না, তুমি যদি আমার ঘরে না এসে ও-বাড়ীর বৌ-ঠাকুরুণ এ-ঘরে আসতেন, তা হলে আমার অবস্থা কি এমন দাঁড়াতো? আমার লক্ষীর সংসারে মূর্ত্তিমতী লক্ষীর পাশে আমি আর একটি ছোটখাট লক্ষীই আনতে চাই।"

নিদারুণ গুমোটের পর এক-ঝলক বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া যেন সহসা আমার মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। সমস্ত বিরাগ-বিরক্তি ছাপাইয়া স্বামীর মুখে ঐ 'মূর্ত্তিমতী লক্ষী' কথাটুকু আমার হৃদয় বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

"রঙের কথা রেখে এখন চান্ করতে যাও, আমি ভাত বাড়িগে।" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

ক'দিন পরে দ্বিপ্রহরে দিদি আসিয়া ডাকিলেন, "কোথায় লো বৌ, তামাকে গুড় মাখছিস্ না কি?"

ভাঁড়ারে পান সাজিতেছিলাম। সেখান হইতেই জবাব দিলাম, "এসো দিদি, বোসে পাণ খাও। বাড়ীতে তো তামাক আসে না, গুড় মাখবো কিসে?"

"আসেনি, আস্‌তে কতক্ষণ লা? স্বামি-পুত্তুরের পেশা থেকে তুই বা বাদ যাস্ কেন? আমি ভাই, আজ তোর কাছে বস্‌তে আসিনি। আমার বসবার সময় কোথায়? এই সব কাঙ্গালী খাওয়ানো চুকিয়ে হাত-পা এক করলাম। এখন এক বার কালীঘাটে যাবার ইচ্ছে। চ'না তোতে-আমাতে একটু ঘুরে আসি।"

বলিলাম, "আগে খবর দাওনি দিদি, এখনি খেয়ে উঠ্‌লাম। খেয়ে-দেয়ে মায়ের মন্দিরে পূজো দেবো কি ক'রে?"

"আমি মন্দিরে যাবো না লো। যাবো কাঙ্গালী ভোজন দেখ্‌তে। কোথাকার রাণী না মহারাণী ক'দিন হলো কাঙ্গালীদের খুব ভোজ দিচ্ছে যে। তুই বুঝি শুনিস্‌নি? ওমা, সে যে ঠাকুরপোর দোকানের পিছন-দিক্‌কার বড় মাঠে। এত বড় তোলপাড় কাণ্ড কারখানা—ঠাকুরপো তোকে বলেনি? হুঁঃ, তামাক নিয়েই মত্ত, কোন কিছুর কি খবর রাখে সে? পাড়ার সবাই দেখ্‌তে যাচ্ছে। বেলুড়ের সন্ন্যাসী এসে না কি তদ্বির-তদারক করছে। ভোজ হচ্ছে কালিয়া, পোলোয়া, দই, সন্দেশ, ভাত, মাছ—যে যত খেতে পারে।"

কাহাকেও কিছু দিতে পারি না, যাঁহারা দিতেছেন তাঁহাদের মহৎ কাজ দেখিতেও যেন সঙ্কোচ হয়! দ্বিধা হয়!

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "আজ তুমি যাও দিদি, আর এক দিন না হয় আমি তোমার সঙ্গে যাবো। দিন-সময় ভালো নয়, খালি বাড়ী রেখে"—

দিদি ধমকাইয়া উঠিলেন. "তোর আবার চোরের ভয়! চোর আসবে কিসের লোভে শুনি? সম্পত্তির মধ্যে তো তামাক, তাও ঘরে রাখিস্ না। ভয় বটে আমাদের। কোথায় রাখি সোণা-দানা, কোথায় রাখি শাড়ী, শাল, দোশালা! ঘর ক'খানায় তুই তালা দে, ঝী একটু বারান্দায় বসুক—চট্ করে আমরা ঘুরে আসবো। মোটর নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম,—অনাথ এক মাড়োয়ারীর মোটর ঠিকও করেছিল, তা পোড়া গাড়ীর এখনো দেখা নেই! কতক্ষণ আর বসে থাকবো? তাই বেরিয়ে পড়লাম। এখন না বেরুলে আমার সময় কোথায়! এক-আধটা লোক নয়, দশ দশ জন প্রাণীকে খেতে দেওয়া ত মুখের কথা নয় ভাই।"

সায় দিয়া বলিলাম, "সে তো ঠিক কথা দিদি। ঝীকে আমি বলি, সে একটু বসুক, আমরা হাঁটা-পায়ে এখনি ঘুরে আসবো।"

"হাঁটা-পায়ে মানে? আমি কি তোর মত হটর-হটর করে রাস্তায় হাঁটবো না কি? তোর কি, কে বা তোকে চেনে জানে? তোর মানই বা কি, সম্ভ্রমই বা কি! আমার তো তা নয়। মানী স্বামী—ছেলেরও মর্য্যাদা আছে। তোতে আমাতে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, রে। আমি চাকর পাঠিয়েছি রিক্সা ডেকে আনতে।"

"উনি কিন্তু রিক্সায় চাপা ভালোবাসেন না দিদি। বলেন শরীরে সামর্থ্য থাক্‌তে লোকের ঘাড়ে চড়বে কি? পায়ে হাঁটো।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া দিদি কহিলেন, "ঠাকুরপো ছাড়া এমন কথা আর কে বলবে বল্? পায়ে হাঁটলে পয়সা বাঁচে—তার পক্ষে ভালো বৈ কি। আমাদের কিন্তু তাতে অপমান।"

কথায় কথা না বাড়াইয়া ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিতে লাগিলাম।

*　　*　　*

আমাদের দোকানের পিছনেই বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে গিয়া যাহা দেখিলাম, সত্যই বিস্মিত হইলাম।

গঙ্গার কোল ঘেঁষিয়া অবারিত মাঠের উপর বিশাল চালা বাঁধা। এক দিকে রাশি রাশি মাটীর গেলাস, কলার পাতা; অপর দিকে মহোৎসবের বিপুল আয়োজন।

শত শত নিরন্ন আহারে বসিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকের দল পরিবেষণ করিতেছে। আমাদের পরিচিত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আনন্দ স্বামী প্রীতি-প্রসন্ন হাস্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

অনাহার-ক্লিষ্ট ক্ষুধায় পীড়িত দুঃখী-কাঙ্গালের শুষ্ক-ম্লান অধরে পরিতৃপ্তির আনন্দ লক্ষ্য করিয়া মনে পুলকের প্রবাহ বহিতে লাগিল। জানি না কে সে ভাগ্যবতী, যাঁহার উদার করুণার পুণ্যধারা গঙ্গার পবিত্র প্রবাহের মত সকলকে সঞ্জীবিত, পরিতৃপ্ত করিতেছে! অদৃশ্য পুণ্যময়ীর চরণে আমার মন লুটাইয়া পড়িল।

স্বামি-পুত্রের অগোচরে আসিয়াছিলাম, দিদির সঙ্গে গোপনেই আবার রিক্সার পর্দ্দার মধ্যে লুকাইলাম।

ফিরিবার সময় চোখে পড়িল আমার চক্ষুশূল তামাকের দোকানটি। সেখানে নিত্য-নিয়মিত বেচাকেনা চলিতেছে। রাখাল সামনের চৌকীতে বসিয়া আছে। কোণের নিরিবিলিতে মহেশ বসুকে লইয়া স্বামী গল্প করিতেছেন। দূর হইতেই লক্ষ্য করিলাম—স্বামীর চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, উৎসাহে প্রদীপ্ত। অনুমানে বুঝিলাম, রাখালের বিবাহের আলোচনা হইতেছে। মহেশ বসুর কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র স্বামীর আমূল পরিবর্ত্তন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। কোন কিছুতে আর বিরক্তি নাই, অসন্তোষ নাই। আমার অজানা কোন্ অমৃতসাগরে যেন উনি নিত্য অবগাহন করিতেছেন! শুধু উনি নন, রাখালের মুখেও অপরূপ আনন্দের আভা লক্ষ্য করিতেছি!

আমি বুঝিতে পারি না—নিঃস্ব মহেশ বসুর কন্যার মধ্যে ইহারা কি অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়াছে!

সন্তানের উপর মাতা-পিতার সমান অধিকার—যেখানে আমার আপত্তি, সে ক্ষেত্রে উহাদের উল্লাসের কারণ কি? কারণ যাহাই থাকুক না কেন, মনে মনে স্থির করিলাম, স্বামীর আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আর সন্দেহ-সংশয় রাখিব না। এত কাল যেমন নির্ব্বিবাদে প্রশান্ত চিত্তে স্বামীর সত্তায় নিজের সত্তা মিশাইয়া আসিয়াছি—ছেলের বিবাহ ব্যাপারে কেন নিজের সত্তাকে তুলিয়া ধরি? আমার অন্তরকে দুঃখ-ক্ষোভের লেশমাত্র যেন না স্পর্শ করে! স্বামি-পুত্রের সুখ-শান্তির সহিত আপনার সুখ-শান্তি সংযুক্ত না করিলে নিজের সুখ-শান্তি কিছুই থাকে না।

সন্ধ্যার পর স্বামী দোকান হইতে ফিরিলেন। আমাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "আজ মহেশ আবার এসে ধর্ণা দিয়েছিল। তাকে আমি তোমার দরবারে হাজির হতে বলেছি। কাল সকালে সে আসবে। তার জন্ম তোমার বাগানের রাঙা আলুর ঘণ্ট পানতুয়া করে রেখো আর গাছের নারকেলের চন্দ্রপুলি।"

বলিলাম, "সব করবো কিন্তু আমার কাছে আসবার তাঁর কি দরকার? যা করবার তুমিই করবে। পছন্দ হয়ে থাকে, বৌ আনো, বিয়ে দাও। সাত-পাঁচ নয় এক ছেলে! আমার সাধ ছিল ঘটা করে তার বিয়ে দেবো, ঘর-ভরা জিনিষপত্র নিয়ে বৌ আসবে। অনাথের বৌ যেমন এসেছে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সোনার গহনা নিয়ে, রাজ্যের জিনিস নিয়ে। তোমার বন্ধুর দুরবস্থা হলেও তোমার যথেষ্ট আছে তো—তুমি সব দিয়ে থুয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বৌ আনতে পারো।"

"আমার টাকা কোথায়? পরের টাকা পরে বেশী দেখে। একশো টাকা সোনার ভরি, এ দিনে কে সোনা কিনে লোকসান দেবে? আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসবে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে, গরীবের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে। পরের দেওয়া ঐশ্বর্য্যে গৌরব নেই, তাতে আমার লোভ হয় না। লোভ হয় খাঁটি মানুষের ওপর। মহেশের মত, তার স্ত্রীর মত ভালো মানুষ তুমি সারা মুলুকে খুঁজে পাবে না। তাদের মেয়ে কমলা বাপ-মায়ের শত গুণের এককণা গুণ নিয়েও যদি আমাদের ঘরে আসে, তাহলে আমি রাখালের সৌভাগ্য মনে করবো। আমাকে তোমার বিশ্বাস না হলে তুমি নিজে গিয়ে কমলাকে দেখে এসো। এ দিনে কত লোক কত ভালো কাজ করছে—তার সীমা পরিসীমা নেই। আমাদের মত সামান্য লোক কি করছে? কি করতে পারছে? সমাজের জন্ম স্বজাতির জন্ম যতটুকু উপকার করতে পারি, করা উচিত নয়?"

স্বামীর যুক্তি মিছা নয়। বিবাহ স্ব-সমাজ, স্বজাতি লইয়া। নিজেদের সমাজ নিজেরা না রাখিলে কে রাখিবে?

জবাব দিলাম, "কমলাকে আমি দেখতে চাইনে, দেখবার দরকার নেই। তোমার পছন্দতেই আমার পছন্দ।"

পরের দিন প্রভাতে মহেশ বসু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিত আমাদের বেশী বাক্যালাপ হইল না। কথার মধ্যে কথা হইল, সাত দিন পরে তাঁহার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ।

বিবাহে আড়ম্বর নাই, আয়োজন নাই। একে জাপানী বোমার বিভীষিকা, তাহার উপর হাড়-কৃপণের অপব্যয়ের আশঙ্কা! দুয়ে মিলিয়া সোনায় সোহাগা হইল। চৌদ্দ শাকের মধ্যে দিদি ওল পরামাণিক হইয়া অবিরত ফোড়ন দিতে লাগিলেন—"মাগো, এর নাম বিয়ে-বাড়ী, না, বিয়ে? না আছে কাক-পক্ষীর কলরোল, না আছে মেঠাই মণ্ডার ছিটে! এমন দিনে কি ছেলে-মেয়ের বিয়ে কেউ দেয় না? না, ক্রিয়াকাণ্ড করে না? হলোই বা আড়তদারের বাড়ী, তামাকের পুঁটলী-বাঁধা ছেলে, তবু বিয়ে তো। টাকা-পয়সা কারুর সঙ্গে যাবে না! আর কিছু না হোক, এই উপলক্ষে দু'টো ভিখারীকে ভাত দিয়েও ত মানুষ আখেরের কাজ করে!"

দিদির টীকা-টিপ্পনীর মধ্য দিয়া অবশেষে সাতটা দিন কাটিয়া গেল।

বিবাহ করিয়া নববধূ লইয়া রাখাল গৃহে ফিরিল।

বাহিরে সম্মতি দিলেও এ পর্য্যন্ত স্বামীর কোন কাজ আমি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি নাই। অতীতের সেই অপূর্ণ ব্যর্থ জীবনের বেদনা ছাপাইয়া আনন্দের তরঙ্গ আসিয়া আমাকে প্লাবিত করিল।

স্বামী সত্যই বলিয়াছেন, কমলাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা! কে ইহার নাম রাখিয়াছিল 'কমলা'? কমল-নয়নে, কমল-আননে এত কোমলতার সমাবেশ চোখে পড়ে না তো!

নববধূ দেখিয়া দিদি শুষ্ক-ম্লান মুখে কহিলেন,—"নতুন বৌয়ের ছিরিছাঁদটা মন্দ নয়। স্থাকা-স্থাকা চেহারাখানি!"

এত কালের পর সম্বন্ধে বড় জায়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, কহিলাম, "তুমি গুরুজন, আশীর্ব্বাদ করো দিদি, রাখালের ঐ তামাকের দোকানই অক্ষয় হয়ে থাকুক। তার পরে বৌমার লোহা হীরের হবে, শাঁখা মাণিক হবে।"

আনন্দ স্বামীকে লইয়া স্বামী বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। দু'জনের মাথায় ধান-দুর্ব্বা রাখিয়া আনন্দ স্বামী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক, জগতের কল্যাণে তোমাদের কল্যাণ মিশে থাকুক!"

আগ বাড়াইয়া দিদি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে দানছত্র খুলে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন বাবা, এর জন্ম টাকা দিচ্ছে কে? শুনেছিলাম, কোথাকার মহারাণী না কি আপনার হাতে অনেক টাকা দিয়েছেন! এত বড় কাজ করছেন, তবু নাম গোপন রেখেছেন কেন? তাঁর নামটা আমাকে বলবেন বাবা?"

"শুনতে চাইলে কেন বলবো না মা? নাম প্রকাশ করতে আমার কোন বাধা নেই। যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের ইচ্ছা ডান-হাতের দান বাঁ-হাত যেন জানতে না পারে। তবু আজ আনন্দের দিনে আমার উচিত বাঁ হাতকে জানানো। রাখালের মার ইচ্ছায় রাখালের বাবা এ যজ্ঞশালা খুলেছেন! সমস্ত খরচ ওঁরা দু'জনেই দিচ্ছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র।" বলিয়া আনন্দ স্বামী আমার দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিলেন।

দিদির মুখ নিমেষে পাংশু, বিবর্ণ! মুখে কথা নাই! নিষ্কম্প নিস্পন্দ মূর্ত্তি—যেন পাথর হইয়া গিয়াছেন!

আমি ভাবিতেছি, কতক্ষণে কোন্ সুযোগে আমার হাড়-কৃপণ অমানুষ স্বামীকে দেখিব! তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আমি ধন্ম হইব!

শ্রীগিরিবালা দেবী

ঢেঁকি ও কুলো

ঢেঁকিরে কহিল কুলো,—কি অবস্থা হায়,
পিশিতে পিশিতে তোর বুঝি প্রাণ যায়।

ঢেঁকি কহে,—মিথ্যা নয় হে অভাগা কুলো,
সারা দিন এই দুঃখ ঝাড়ো তুমি ধুলো।

শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

বীণাপাণি

বাঙ্গালায় বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতীর পূজা চিরদিন সর্ব্বজনপ্রিয়। ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষে প্রতি হিন্দু গৃহস্থের গৃহে দেবী ভারতীর অর্চনা নিয়মিত ভাবে নির্দ্ধারিত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মাত্রই স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী ঘটে, পটে, প্রতিমায় অথবা মস্যাধারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর ভক্ত অসংখ্য। শ্রীপঞ্চমীর দিনে পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি হইতে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গুণী ও জ্ঞানী, গুরু ও শিষ্য সকলেই আজীবন তাঁহার অর্চনা ও আরাধনা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হয়। অভাব, অনটন ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার নিমিত্ত অধুনা গৃহে গৃহে পূজার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; ব্যষ্টির কর্ত্তব্য সমষ্টি গ্রহণ করিয়াছে; অর্থাৎ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত গৃহ-পূজার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সর্ব্বজনীন পূজার প্রথা ও সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তন্ত্রশাসিত বাঙ্গালায় তান্ত্রিক অর্থাৎ শক্তিপূজাই প্রবল। আমরা মায়ের সন্তান; মাতৃভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমাদের নীতিশাস্ত্র বলে,—

ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পুনশ্চ :—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।

ইহাই আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বই আমাদের মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনার মূলমন্ত্র—আদিম নিদান। জন্মে ঈশ্বর আমাদের মা-ষষ্ঠী, রোগে মা-শীতলা, বিপদে মা-মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গমে দুর্গতিহারিণী দুর্গা, বিদ্যাভ্যাসে মা-সরস্বতী, ধনার্জ্জনে মা-লক্ষ্মী, পালনে মা-জগদ্ধাত্রী এবং সংহারে কালভয়নিবারণী কৈবল্যদায়িনী কালী।

মায়ের সরস্বতী মূর্ত্তিই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। দেবী ভারতীর উৎপত্তি ও লীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কতকগুলি কৌতুকপ্রদ, কতকগুলি বিস্ময়াবহ, কতকগুলি অসঙ্গত ও অসমঞ্জস। কিন্তু এই সকল কাহিনীর অন্তরালে যে মূলতত্ত্ব, তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

এই জগতে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক। যে যে বস্তু প্রাকৃতিক অর্থাৎ সৃষ্ট, সে সকলই নশ্বর। যাহার জ্ঞান, তপস্যা ভক্তি ও সেবাবলে মহামায়া প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না ও ঈশ্বররূপে খ্যাত হইয়াছেন, সেই সৃষ্টিকারণ, সত্যস্বরূপ, নিত্য সনাতন, স্বেচ্ছাময়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ পরমব্রহ্মই প্রকৃতির অতীত। তিনি নিরুপাধি, নিরাকার এবং ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে তৎপর। তাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সকলের পালন ও মৃত্যুঞ্জয় শিব সংহার করেন। তাঁহার প্রভাবে দুর্গা সকলের দুর্গতিনাশিনী, দেবী-লক্ষ্মী সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী এবং সরস্বতী সর্ব্ব বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাহা হউক, আদি সৃষ্টিতে দেবী মূল-প্রকৃতি হইতে সকলের জন্ম হয়, ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এক অদ্বিতীয় নিত্য সনাতন ব্রহ্ম বস্তুই সৃষ্টিকালে দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং প্রকৃতিই পুরুষকে নিমিত্ত করিয়া নিখিল কার্য্য সাধন করেন। সৃষ্টিকালে তিনি শ্রী, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি, বসা, মজ্জা, ত্বক্‌, দৃষ্টি, সত্যাসত্য বাক্য এবং পরা, মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি অসংখ্য নারীরূপিণী। তিনিই সর্ব্বরূপা। সৃষ্টিকালেই দ্বৈধভাব; কিন্তু প্রলয়ে তিনি পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন; কিংবা ক্লীবও নহেন; কেবল মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি সাধন করিয়া ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী নাম্নী সুরূপা, শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিতা, দিব্যালঙ্কারভূষিতা, ধরাসনোপবিষ্টা মহতী শক্তি; বিষ্ণুকে মনোরমা মহালক্ষ্মী নাম্নী সর্ব্বার্থদায়িনী মঙ্গলময়ী শক্তি এবং শিবকে মনোহারী মহাকালী গৌরী প্রদান করেন। প্রলয়ে তিরোভাব এবং সৃষ্টিতে আবির্ভাব—ইহাই কালচক্রের আবর্ত্তনে বিশ্বলীলা।

সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান —এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। সদ্ব্যক্তিদিগের কবিতারূপিণী এবং সুবুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতিদায়িনী—তিনি নানাপ্রকার সিদ্ধান্তভেদে অর্থের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাখ্যারূপিণী, বোধস্বরূপা, সকল সন্দেহ-ভঞ্জনকারিণী, বিচারকর্ত্রী, গ্রন্থপ্রণয়ন-কারিণী ও শক্তিস্বরূপিণী। তিনি সকল সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণরূপিণী। তিনি বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা এবং নিখিল বিশ্বের উপজীবিকা, তিনি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও তর্ককারিণী এবং অতি শান্তস্বভাবা ও শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা। তিনি হিম, চন্দন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্ম সন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্না। তিনি সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপা এবং সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞান অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া আলোকের সৃষ্টি করে। জ্ঞান শুভ্র জ্যোতিঃস্বরূপ। তাই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাগ্‌দেবী শুভ্রা।

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্।

তাঁহার সকলই শুভ্র।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।

অনেকেই হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবী-সরস্বতীর পূজা সংস্থাপন করেন। তাহার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁহার পূজা করেন। তৎপরে অনন্ত, ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ, দেবগণ, মনুগণ, নৃপসমূহ এবং মানবগণ সকলেই দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি বর্ষেই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ, মনুগণ, দেব, মুনীন্দ্র, মুমুক্ষু, যোগী, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং এমন কি রাক্ষসগণও কল্পে কল্পে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন।

এই পূজার সূচনা-মূলক ঘটনাটি একটু অদ্ভুত। আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি যে, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রকৃতির কলা-সম্ভূত। যে শিবা নিত্যা নির্গুণা, সতত সর্ব্বব্যাপিনী, বিকাররহিতা, জগতের আশ্রয়স্বরূপা এবং তুরীয় চৈতন্যরূপে অবস্থিতা, তাঁহারই সগুণাবস্থায়—সাত্ত্বিকী শক্তি মহালক্ষ্মী, রাজসী শক্তি সরস্বতী এবং

তামসী শক্তি মহাকালী। শক্তি বলিয়া ইঁহারা সকলেই স্ত্রী-মূর্ত্তি। জগতের উৎপত্তি, রক্ষণ ও সংহারার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সাহচর্য্যে ইঁহাদের পরিণতি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, দেবী-সরস্বতী—ধনধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী-লক্ষ্মীর সপত্নী। বস্তুতঃ, দেবী-সরস্বতী ব্রহ্মার ঘরণী। কিন্তু পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা—এই দেবীত্রয় নারায়ণেরও পত্নী। সকলেই মূল প্রকৃতির কলা-সম্ভূতা। কৃষ্ণের বামাংশ হইতে যেমন কমলার এবং দক্ষিণাংশ হইতে সন্ধ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার মুখ-কমল হইতে দেবী-সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ং কামরূপিণী দেবী কামবশে কামুকী হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিতে আদেশ করেন। প্রকৃতি হইতে পৃথক্, আদিভূত নির্গুণ ভগবান্ অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ বিষ্ণু। কিন্তু তিন ভার্য্যা, তিন পুত্র, তিন ভৃত্য এবং তিন বান্ধব সর্ব্বত্রই অশুভপ্রদ এবং বেদ-বিরুদ্ধ। ফলে, হরির প্রতি গঙ্গার অনুরাগাতিশয্য দেবী-লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন সরস্বতী গঙ্গার কেশ ধরিতে উদ্যত হইলে সতী লক্ষ্মী মধ্যস্থিতা হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। দেবী সরস্বতী কুপিতা হইয়া পদ্মাকে নদীরূপা হইতে অভি-সম্পাত করেন। গঙ্গাও সরস্বতীকে নদীরূপা হইবেন, এই প্রত্যভি-শাপ প্রদান করেন। সরস্বতীও গঙ্গাকে ঐরূপ শাপ দিলেন। পরস্পরের প্রতি এই শাপপ্রদানের ফলে ভারতে গঙ্গাবতী, সরস্বতী ও ভাগীরথী নদীত্রয়ের শুভ আবির্ভাব। তিন নদীই পতিতপাবনী। চতুর্ভুজ এই কলহে বিরত ও বিব্রত হইয়া আদেশ করিলেন, "অসহ্য-শীলে ভারতি, তুমি অংশরূপে ভারতে গমন করিয়া সপত্নীসহ কলহের ফল ভোগ কর এবং স্বয়ং ব্রহ্মার সহিত গমন করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হও। গঙ্গা, তুমিও শিব-সমীপে গমন কর এবং সুশীলা কমলা আমার গৃহে অবস্থান করুন।" সপত্নী-সম্পর্কে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ নাই। যখন এক ভার্য্যা থাকিলে প্রায় সুখী হওয়া যায় না, তখন বহু পত্নী থাকিলে যে কোনরূপেই সুখী হওয়া যায় না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, এই সপত্নী-কলহের ফলে ভারতবর্ষ ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিল। ভারতী অংশরূপে ভারতভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন এবং তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী নামে বিখ্যাত।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী সম্পর্কে আর একটি কৌতুককর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। মূল প্রকৃতি কৃষ্ণ শক্তি রাধার অংশসম্ভূতা বলিয়া তাঁহারা অনপত্যতা-দোষে দুষ্ট। কথিত আছে, পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাংশ পুরুষরূপে বাম-ভাগোৎপন্ন প্রকৃতিতে উপরত হইয়াছিলেন। ফলে, প্রকৃতি যথা-সময়ে একটি অণ্ড প্রসব করেন। দেবী সেই প্রসূত ডিম্ব দর্শনে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ঐ ডিম্ব সলিলে নিক্ষেপ করেন। ভগবান্ তাঁহার আচরণে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন,—"রে কোপশীলে, নিষ্ঠুর, যেহেতু তুমি অপত্য পরিত্যাগ করিলে, সেই হেতু তুমি অদ্যাবধি অপত্য-সুখে বঞ্চিত হইবে এবং সুরস্ত্রী সকলের মধ্যে যিনি তোমার অংশরূপা, তিনিও অপত্য-সুখে বঞ্চিত হইয়া নিত্য যৌবনা-বস্থায় থাকিবেন।" সুতরাং লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয় দেবীই অপত্যহীনা ও স্থিরযৌবনা। অতি সমীচীন ব্যবস্থা। নিজের সন্তান থাকিলে অন্যের সন্তানের প্রতি মমত্ব বুদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু জগতের বাক্শক্তি-সম্পন্ন প্রতি নর-নারী ও বাল-বৃদ্ধ যাঁহাদের সন্তান, তাঁহাদের পক্ষে আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি অতীব অসঙ্গত। সকলে-প্রতি তাঁহাদের সম-দৃষ্টি—সমান মমত্ব। স্বল্প কর্ম্ম, অথবা সাধনার ইতর-বিশেষে নীচ ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এবং চিত্ত ও বিত্ত লাভ করে। তার পর যাঁহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি ও পূজা করি, তাঁহাকে আমরা শুধু ঐশ্বর্য্যশালী নহে সৌন্দর্য্যশালীও দেখিতে কামনা করি। সকলেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহাই মনোরম ও মঙ্গলপ্রদ। এই হেতু লক্ষ্মী ও সরস্বতী অপত্যহীনা ও চির-যৌবনা। ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবীগণও তদ্রূপ।

পুরাণগুলি প্রধানতঃ লোকশিক্ষার নিমিত্ত লিখিত। ইহাতে লৌকিক, অলৌকিক, সম্ভব, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত নানাবিধ কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব ও অসমঞ্জস বলিয়া অনুমিত হয়, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মন লইয়া তাহার বিচার বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বল্প-শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত লোকদিগকে সৎপথে রাখিয়া সদাচার-পরায়ণ করিবার নিমিত্ত রূপক ও রহস্যপূর্ণ কাহিনীর ছলে সার সত্য প্রচারই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে তত্ত্ব রামচন্দ্রকে এবং অর্জ্জুনকে বুঝাইতে হইয়াছিল, তাহা সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষেও দুরূহ। এক সময় "কথকতাই" ছিল আমাদের দেশে যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতির ন্যায় লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ও অবলম্বন। যাহা হউক, এই সকল পুরাণ-বর্ণিত যথার্থ তত্ত্বের রূপক ও রহস্য-কথার অন্তরালে পরম সত্য ভাগবত-ধর্ম্মই সহজবোধ্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় নিত্য সনাতন ব্রহ্মবস্তু সৃষ্টি-কালে দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ-ভাগ পুরুষ ও বাম-ভাগ প্রকৃতি। যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি; যিনি প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। কেবল মতিভ্রম-বশতঃই ভেদ-জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই আত্মরূপই চিৎসম্বিৎ ও পরব্রহ্মাদি নামে বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা ও সনাতনী। তিনি স্বেচ্ছায় পুরুষার্থ সমুদয় নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। পরমাত্মরূপী পুরুষ কিছু করেন না; সাক্ষিরূপে দর্শন করেন মাত্র। এই নিখিল জগৎ তাঁহার দৃশ্য বস্তু। কার্য্য-কারণ-রূপিণী সেই প্রকৃতি এই দৃশ্য প্রপঞ্চের সৃষ্টিকারিণী বলিয়া জননী।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।—গীতা

তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজ শক্তি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতীকে প্রদান করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্বয়ংই এই সমুদয় কার্য্য করিতেছেন। তিনি একাকিনীই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নাটকের অভিনয় করিয়া সেই পরম-পুরুষের মনোরঞ্জন করেন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।—গীতা

পুরুষ সুখী হইলে প্রকৃতি নাটকের উপসংহার করেন। পুরুষ—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।—গীতা

কেবল লীলার জন্য এই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-কার্য্য চলিতেছে, যুগের পর যুগ—কল্পের পর কল্প।

আমাদের গর্ভধারিণী জননী যেমন আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়েন, অর্থাৎ জন্মে জন্মদাত্রী, পোষণে

পালয়িত্রী, শৈশবে শিক্ষয়িত্রী, যৌবনে শাসনকর্ত্রী, প্রৌঢ়ে অভয়দাত্রী, রোগে শুশ্রূষাকারিণী—প্রকৃতিরূপিণী মহামায়াও তদ্রূপ আমাদের জন্মে ষষ্ঠী দেবী, পালনে জগদ্ধাত্রী, শিক্ষাক্ষেত্রে সরস্বতী, অর্থার্জ্জনে লক্ষ্মী, দুর্গমে দুর্গতিহারিণী দুর্গা এবং অন্তিমে কালভয়-নিবারিণী কৈবল্য-দায়িনী কালী। পুরাণ প্রভৃতির রূপকাত্মক কাহিনীর অন্তরালে এই নিগূঢ় সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই দেবী-সরস্বতীর পূজা ব্যতীত কেহই পণ্ডিত হইতে পারে না। বাগ্‌দেবী ব্যতিরেকে বিধাতা বিশ্ব সৃজন করিতে পারিতেন না। বাক্ ব্যতীত বিদ্যা নাই; বিদ্যা ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব; জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি দুর্লভ। বেদে সরস্বতী দেবীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে তিনি শুক্লবর্ণা হাস্যযুক্তা, মনোহারিণী এবং কোটি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্না। তিনি বহ্নি-সদৃশ শুভ্র বস্ত্র-পরিধানা—তাঁহার হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং তিনি সারভূত রত্ননির্ম্মিত শ্রেষ্ঠভূষণে বিভূষিতা। জ্ঞান শুভ্র ও জ্যোতিঃস্বরূপ। তাই তিনি শুক্লবর্ণা; এবং সুস্বাদু শুক্লবর্ণ পক্ব ফল, সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধি শুক্ল চন্দন, নূতন শুক্ল বস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শুভ্রবর্ণ পুষ্পের মালা, শুক্ল হার এবং শুক্ল ভূষণ,—এই সমস্ত বেদ-নিরূপিত নৈবেদ্য।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপ-বশতঃ বিদ্যাশূন্য হইয়াছিলেন; বাগ্‌দেবীর উপাসনা করিয়া তিনি স্মৃতিশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার সরস্বতী-স্তব জগদ্বিখ্যাত :—

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেবং হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্।
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্য-প্রবোধিকাম্।
গ্রন্থকর্ত্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ।

এই স্তবেই বর্ণিত আছে যে, সনৎকুমার এক সময় ব্রহ্মাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর প্রদানে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া বাণীর স্তব করিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন। বসুন্ধরা এক সময় অনন্তকে অনুরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনিও বাগ্‌দেবীর স্তব করিয়া উত্তর দানে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যাস যখন মহর্ষি বাল্মীকিকে পুরাণ-সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন সরস্বতীর বর-মহিমায় মুনীশ্বর তাঁহার সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মহেন্দ্র সদাশিবকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করিলে মহাদেব বাগ্‌দেবীকে চিন্তা করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বৃহস্পতিকে শব্দ-শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দেবগুরু দেবী-সরস্বতীর ধ্যান করিয়া তাহার সুবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্যাসদেব বাগ্‌বাদিনীর প্রসাদ লাভ করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং বেদবিভাগ ও পুরাণাদি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুনীন্দ্রবর্গ—বাগধিদেবতার চিন্তা করিয়াই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য্য সমাধা করেন। সহস্রমুখ, পঞ্চমুখ এবং চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি সুরবর্গ, মুনিগণ, মনুবর্গ, দৈত্যকুল এবং মানবগণ সকলেই তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন। মহামূর্খ ও মেধাশূন্য ব্যক্তিও দেবীর প্রসাদে পণ্ডিত, মেধাবী ও সুকবি হইতে পারে। বস্তুতঃ, আন্তরিক অনুরাগের সহিত বিদ্যাভ্যাস ও বিদ্যাচর্চ্চা করিলে সকলেই বিদ্যার্জ্জন করিয়া জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারে। ইহাই নিগূঢ় তত্ত্ব।

দেবী সরস্বতীর পূজা-পদ্ধতি সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভ দিনে দেবীর পূজা করিতে হয়। তদুদ্দেশ্যে পূর্ব্ব-দিবসে সংযম করিয়া সেই দিন সংযত ভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হইবে; এবং স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া-সমাপনানন্তর ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা বিধেয়। চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত যথার্থ পূজা হয় না। অনেকে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঘটা করিয়া সরস্বতী পূজা করেন এবং অকৃতকার্য্য হইলেই বিষণ্ণ হয়েন। পূজার পশ্চাতে সাধনা চাই। সাধনার অর্থাৎ নিয়মিত পাঠাভ্যাসের ত্রুটিই অসাফল্যের কারণ হয়। সম্যক্ সাধনা ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধি সুলভ নহে। দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রের শুদ্ধি ব্যতীত পূজার ফল দুর্লভ। পূজকের চিত্তশুদ্ধির সহিত পূজার উপকরণাদি সাত্ত্বিক ভাবে অর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, পূজার ক্রিয়া বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন; এবং তৃতীয়তঃ মন্ত্রগুলি সত্ত্ব-গুণাবলম্বী পুরোহিত অথবা পূজারী কর্ত্তৃক বিশুদ্ধরূপে উচ্চারিত এবং হোম, ধ্যান, ধারণাদি প্রাণের সহিত নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। পূজায় অন্যায় ও অশুচির স্থান নাই। সকলই শুদ্ধ, শুচি ও সাত্ত্বিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। অকপট চিত্তে প্রযত্নশীল প্রচেষ্টাই সাধনায় সিদ্ধি-লাভের এক মাত্র উপায়।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কৃপানিধি নারায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে জাহ্নবী-তীরে বাল্মীকিকে দেবী-সরস্বতীকে আবাহনের মূলমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগু পুষ্কর তীর্থে অমাবস্যা তিথিতে শুক্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং মারীচ পূর্ণিমা তিথিতে দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন; ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। জরৎকারু মুনি ক্ষীরোদ-সাগরের সমীপে আস্তীক মুনিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পর্ব্বত-শৃঙ্গে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। শিব কণাদ ও গৌতমকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তদেব পাণিনিকে, ভরদ্বাজকে এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ চতুর্লক্ষ জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববিষয়ে বৃহস্পতি-তুল্য হয়। যে ব্যক্তি সরস্বতী-মন্ত্র এক মাস পর্য্যন্ত নিয়ত জপ করে, সে মহামূর্খ হইলেও বাগ্মী ও কবিকুলশ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহার নিগূঢ় অর্থ সাধনা; সর্ব্বান্তঃকরণে অকপট ও অতন্দ্রিত ভাবে বাণীসেবা; অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমে ক্লান্তিহীন বিদ্যাভ্যাস। দেবীর পূজায় বৈগুণ্য যেমন মারাত্মক, পাঠাভ্যাসে অবহেলা তেমনি সাংঘাতিক। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।' তপস্যায় সিদ্ধিলাভার্থ প্রয়োজন সংযম ও সাধনা; সাধনা ও সংযমই পরব্রহ্ম-স্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সনাতনী এবং সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী-সরস্বতীর কৃপা-লাভের একমাত্র উপায়। সেই গীর্গেবাগ ভারতী দেবীকে কোটি কোটি প্রণাম।

বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিক্রিয়া
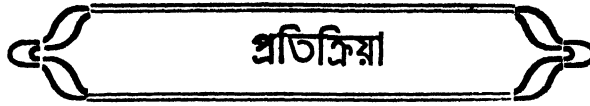
[গল্প]

১

কাক উড়ছে, চিল পড়ছে…নিত্য একটা-না-একটা কিছু লেগে আছে! বাড়ী যেন বারুদের কারখানা। এমন একটা দিন গেল না, যে দিন কোন গোলমাল না হয়ে বেশ শান্তিতে কাটলো!

উমানাথের সংসার খুব ছোট! সংসারে মানুষ বলতে তিনটি প্রাণীকে বোঝায়,—মা, স্ত্রী আর সে নিজে। আর যে আছে, তাকে এখনো মানুষের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না,—সেটি উমানাথের দু' বছর বয়সের শিশুপুত্র 'খোকা'। তথাপি ঐ ক'টি প্রাণীর মধ্যে মনের মিল একেবারে নেই। খুঁটি নাটা লেগেই আছে। পাড়ার লোক তাদের এ কচ্‌কচিতে অতিষ্ঠ।

ঝগড়া যা হয়, তা মা'তে আর স্ত্রীতে। মা চান, নিজের প্রাধান্ত বজায় রাখতে, আর স্ত্রী চান তাঁর সেই প্রাধান্তকে খর্ব্ব কোরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে—এই নিয়েই বিবাদ।…তবে উমানাথকে কখনো কারো পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। শান্তিপ্রিয় মানুষ—কলহ-বিবাদ বস্তুটাকে সে চিরদিন ভয় করে। তাই যখন দেখে, মার আর স্ত্রীর কলহের মাত্রা বেড়ে উঠছে, কলকণ্ঠের ঝঙ্কার বুঝি সপ্তম অতিক্রম করে এবং দু'পক্ষই তাকে মধ্যস্থ মানতে চায়, তখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বিবাহের পর থেকে আজ এই দীর্ঘ ছ'বছর তার এমনি করেই কাটছে। যেটা সে চায়, তা থেকেই ভগবান্ তাকে বঞ্চিত করেন, উমানাথ চেয়েছিল সংসারে একটু শান্তি, কিন্তু তার ভাগ্যে অশান্তির দক্ষযজ্ঞ!

এক এক সময় জীবনে দারুণ ধিক্কার জাগে। ভাবে, মরণই শ্রেয়ঃ! দিবা-রাত্র মা আর স্ত্রীর কলহ শুনে শুনে যেন পাগল হয়ে যাবে। অথচ কা'কেও বলবার জো নেই,—বললেই হিতে বিপরীত! মার পক্ষ নিয়ে কিছু বল্‌লে, স্ত্রী উগ্রচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরে বলবে,—বটে! মা'র হয়ে আমাকে এলে শাসন করতে! দোষ সব আমার? এক-চোখো কোথাকার! ওঁর মা যে আমায় দিন নেই, রাত নেই অকথা-কুকথা বোলে গাল দিচ্ছে, তা' বুঝি কাণে যায় না? আমি আজই তোমার বাড়ী থেকে চলে যাবো। কেন, আমার কি আর ঠাঁই নেই?…এর পরে আর কিছু বল্‌লে অনর্থের চূড়ান্ত! পায়ে মাথা খোঁড়া থেকে আরম্ভ কোরে ঐ জাতীয় অনেক কিছুই হবার সম্ভাবনা! কাজেই উমানাথকে চুপ কোরে থাকতে হয়। আবার যদি স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে মা'কে কিছু বলে, তাহলে মা তাকে স্ত্রৈণ আখ্যায় বিভূষিত কোরে অন্ন-জল ত্যাগ করবেন।

তার যেন শাঁখের করাত! কাজেই মায়ের আর স্ত্রীর এ অত্যাচার নীরবে তাকে সহ্য করতে হয়।

২

সে দিন তখনো সন্ধ্যা হয়নি—উমানাথ অফিস থেকে ফিরে সবেমাত্র নিজের ঘরে পা' দিয়েছে, কোথা থেকে ঝড়ের বেগে ঘরে এসে স্ত্রী শিবানী তার পাম্প'টোর উপর টিপ্ টিপ্ কোরে ক'বার মাথা খুঁড়ে ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলে উঠলো,—এর বিহিত করবে তো করো, নাহ'লে তোমার পায়ে আমি আজ মাথা খুঁড়ে মরবো! হয় তোমার মা এ বাড়ী থেকে যাবে, না হয় আমি! এমন কোরে পদে পদে অপমান সয়ে আমি থাকতে পারবো না।

সঙ্গে সঙ্গে ও-পক্ষের কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠলো,—ওলো, ও আবাগী! বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে সোয়ামীর কাছে নালিশ করতে গেছিস্? ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার!—কাঁদুনি গেয়ে আবার বলা হচ্ছে—চলে যাবো! বলি, যাবি কোথায়? বাপের চুলো কি আছে! মামার ভাতে মানুষ! বিয়ের পর মামারা একবার খোঁজও নেয় না। এই তো তোর যাবার চুলো! মুখে আগুন! ভিকিরীর মেয়ের আবার এত তম্বি কিসের?

আজকের ব্যাপার বেশ জোরালো!…উমানাথ হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যেমন এসেছিল, তেমনি আবার বেরিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে সে শুনলে,—'রণং দেহি' শব্দে মা আর স্ত্রী কোমর বাঁধছেন্!…

—অসহ্য!…সারা সন্ধ্যা এ-পথ ও-পথ ঘুরে বেড়িয়ে রাত প্রায় বারোটা নাগাদ উমানাথ ফিরলো। কি সে করবে কিছুই ভেবে পেলে না। অথচ একটা কিছু করা নিতান্ত প্রয়োজন। নির্বিকার হয়ে অশান্তি সহ্য করা চলে না আর! দিনের পর দিন যেন মাত্রা বেড়েই চলেছে। বোঝাতে গেলে কেউ বুঝবে না। দু'জনের মধ্যে এক জনও যদি একটু সহ্য কোরে চলে, তাহ'লে কতক রেহাই মেলে। কিন্তু তা হবে না। মা' যেমন বৌয়ের একটা কথা সইতে পারেন না, স্ত্রীও তেমনি। মাঝে থেকে প্রাণ যায় সে বেচারার।

সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম কোরে মানুষ বাড়ী ফেরে একটু শান্তির প্রত্যাশায়! তার ভাগ্যে কখনো তা মিললো না!—বাড়ী ফিরে তা'কে শুনতে হয়, স্ত্রীর নামে মায়ের নালিস, নয় মায়ের নামে স্ত্রীর অভিযোগ। নিত্য মানুষ কি করে সহ্য করবে? সহ্যেরও একটা সীমা আছে!

পাড়ার লোকে তারই দোষ দেয়। বলে, সে যদি একটু শক্ত হয়, কড়া হয়, তাহলে কি আর এমন ঝগড়া-ঝাটী রোজ রোজ সংসারে হতে পারে?…কিন্তু সে করবে কি? কড়া প্রথম প্রথম অনেক হয়েছিল, তা'তে সুফল ফললো কৈ? বরং তা'র ঐ কড়া হওয়ার ফলে ঝগড়ার আগুন আরও প্রখর তেজে জ্বলে উঠেছে!

একটি উপায় শুধু আছে, বিবাদের জঞ্জাল থেকে তাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। সে উপায় দু'জনকে পৃথক্ কোরে দেওয়া। তাই বা সম্ভব হয় কি কোরে? এক দিকে গর্ভধারিণী জননী আর এক দিকে সহধর্ম্মিণী,—কা'কে রেখে কা'কে পৃথক্ করবে?

মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে সে অসম্ভব রকম মাতৃভক্ত। আবার স্ত্রীর উপরেও ভালোবাসা অল্প নয়। কাজেই দু'জনের এক জনকেও কাছ-ছাড়া করা তা'র পক্ষে অসম্ভব!…তাহলে এখন উপায়?

এমনি নানা চিন্তায় সন্ধ্যাটা বাইরে-বাইরে কাটিয়ে গভীর রাত্রে উমানাথ বাড়ী ফিরে ক্লান্ত দেহ শয্যায় এলিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। আহারাদি আজ আর ভাগ্যে জুটলো না। অবশ্য

এমন অনাহারে প্রায় তা'র কাটে, একবেলা উপবাস তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সকালে কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই শুনলে, হৈ-হৈ ব্যাপার। বাড়ীতে ইতিমধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ বেধে গেছে!

ধীরে শয্যা ত্যাগ কোরে জামা গায়ে দিয়ে চুপি-সাড়ে সে বেরিয়ে যাবার জোগাড় করছে, এমন সময় রক্তাক্ত কলেবরে মা এসে উপস্থিত। ছেলের দুই হাত ধ'রে তিনি ক্রন্দনের উচ্চরোলে নালিশ রুজু করলেন, ভাখ, ভাখ, তোর বৌ আমার কি করেছে! তোর বৌয়ের হাতে প'ড়ে প'ড়ে আমি মার খাবো আর তুই ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বি। এর কোন বিহিত করবি না?

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই ক্ষিপ্তা মাতঙ্গিনীর মত দৃঢ় পদ-নিক্ষেপে শিবানী এসে কঠিন কণ্ঠে বোলে উঠলো,—থাক্, আর বেটার কাছে সাউথুড়ী করতে হবে না। নিজে যে ঝাঁটা মেরে আর একটু হলে আমার চোখ দুটো কাণা কোরে দিতে, সে কথা বলেছো? দুই রক্ত-আঁখি স্বামীর মুখে স্থাপন কোরে সে বল্লে,—তোমাকে এই বোলে দিলুম, তোমার ঐ দজ্জাল মায়ের সঙ্গে ঘর করা আমার পোষাবে না। হয় আমার ব্যবস্থা করো, নয় তোমার মায়ের ব্যবস্থা করো—এক-সঙ্গে দু'জনের থাকা চলবে না।

মা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্লেন,—সেই ভালো বাবা, আমায় তুই কাশী পাঠিয়ে দে। তোকে আর এ জ্বালাতন পোয়াতে হবে না! রোজ রোজ তোকে এমন বিরক্ত করতেও আমার ভালো লাগে না। আমায় কিছু দিস্ আর নাই দিস্, শুধু আমাকে পাঠিয়ে দে। সেখানে আমি অন্নপূর্ণার মন্দিরে বসে ভিক্ষে কোরে খাবো, সে-ও ভালো।

সজল নয়ন দু'টি অঞ্চলে ঘষে মুছে তিনি ভাঙ্গা-গলায় বল্লেন,—তোর মুখ চেয়ে সব স'য়ে এত দিন আমি সংসার আঁকড়ে পড়ে আছি। এখন বেশ বুঝছি বাবা, সংসারের সকল অশান্তির মূল আমি। আমায় তুই—

তিনি আর বলতে পারলেন না! কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।··· মায়ের সেই অশ্রু-কাতর মুখের পানে তাকিয়ে উমানাথ আজ ধৈর্য্য হারালো। প্রথমটা মনে হলো, স্ত্রীকে বেশ ঘা'-কতক বসিয়ে দেবে। কিন্তু বহু কষ্টে সে ইচ্ছা দমন কোরে সে ভাবলে, না, তাতে ঠিক শাসন হবে না। তার চেয়ে—

বহুক্ষণ নত মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সে কর্ত্তব্য চিন্তা করলো। তার পর হঠাৎ মুখ তুলে সে কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমারও তাহলে ঐ মত?

তার কথা বুঝতে না পেরে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে,—কি?

উমানাথ বল্লে,—মাকে আলাদা কোরে দেওয়াই তোমার ইচ্ছা?

শিবানী বল্লে,—হ্যাঁ। রোজ রোজ এ খিট্‌খিট্ সহ্য হয় না। আজই এর ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

উমানাথ বল্লে,—বেশ, তবে তাই হোক!···মায়ের দিকে ফিরে সে বল্লে,—তুমি তৈরী হয়ে নাও মা! আজই যেখানে হয় তোমায় রেখে আসবো।···কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়লো।···

উমানাথকে কেউ কখনো এমন উত্তেজিত হতে দেখেনি। তাই মা এবং স্ত্রী দু'জনেই একটু কেমন হকচকিয়ে গেলেন। দু'জনেই বিশেষ চিন্তিত হলেন, উমানাথের প্রকৃত রাগ কার উপর? নিজেকে ছেলের রাগের হেতু জ্ঞান কোরে মা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। আর স্ত্রী শিবানী মায়ের মত অতখানি ব্যাকুল না হলেও প্রথমটা একটু ভীত হয়ে পড়েছিল। তার পর নিজেকে ঠিক কোরে নিয়ে সে গজ-গজ করতে লাগল,—উঃ! রাগ হলো তো বড় বয়েই গেল। সত্যি কথা বলবো, তাতে আবার—হুঁঃ!

৩

বেলা যায়-যায়, উমানাথ বাড়ী ফিরলো।—সঙ্গে একখানা ঘোড়ার গাড়ী।

এসেই মাকে উদ্দেশ কোরে সে বল্লে—কৈ, এখনো চুপচাপ বসে আছ? কোনো গোছ করোনি? তোমাকে যে সমস্ত ঠিক কোরে গুছিয়ে থাকতে বোলে গেলুম!—যাক্‌গে, পরে আমি সব গুছিয়ে দেবো'খন। এখন নাও ওঠো, আর বসে থেকো না—বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

মা একবার কাতর নয়নে ছেলের পানে চাইলেন। বল্লেন,—বাবা!

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে উমানাথ রুক্ষ স্বরে বল্লে,—না, না, কোন ওজর আর শুনবো না।—বাড়ী ভাড়া কোরে এসেছি। যেতেই হবে। এ রকম অশান্তি রোজ রোজ আমার ভালো লাগে না। নাও, ওঠো!···আবার কি করছো? ও সব জিনিষপত্র আমি পরে ঠিক কোরে দেবো বল্লুম। এসো, আর দেরী নয়।

চোখের জল মুছতে মুছতে মা উঠলেন। একবার বাড়ীর চারি দিকে ব্যথিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠানে নামলেন। দালানের এক পাশে শিবানী তাঁর অবস্থা দেখে মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিল। তার পানে একবার চেয়ে বাষ্পজড়িত কণ্ঠে মা বল্লেন,—চল্লুম বৌমা!

শ্লেষ-মিশ্রিত স্বরে শিবানী বল্লেন,—তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

চোখের অগ্নি-দৃষ্টি একবার শিবানীর সারা অঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে মায়ের হাত ধরে উমানাথ গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো।

ক'মিনিটের মধ্যেই গাড়ী একটা ছোট বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে উমানাথ সেইখানে নেমে পড়লো।···

বাড়ীর সামনের দিকে যে অংশ সে ভাড়া নিয়েছে, সে অংশ অত্যন্ত ছোট। মাত্র দু'খানি ছোট ছোট ঘর—তবে সুবিধা এই যে সম্পূর্ণ পৃথক্।

দেখে মা একেবারে অবাক! ইতিমধ্যে ঘর-দ্বার সাজানো-গোছানো হয়ে গেছে। তিনি উমানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুই কখনই বা বাড়ী ভাড়া করলি, আর কখনই বা সব গোছ-গাছ করলি?···

উমানাথ জবাব দিলো না।

ব্যথিত অভিমানের স্বরে মা আবার বললেন,—আমাকে বিদেয় করবার মৎলব বুঝি আগে থেকেই কোরে রেখেছিলি!—আজ সুযোগ পেয়ে—

কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। অঞ্চলে অশ্রু মোচন কোরে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন!

উমানাথ এদিকে মন না দিয়ে ঘরের মধ্যে ক'টা জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

খানিকটা সময় কাটার পর মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—আর কি কি জিনিষ বাজার থেকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে মা ?

মা বল্লেন,—না, আমার আর কিছু দরকার নেই !

মায়ের বিমর্ষতা লক্ষ্য কোরে উমানাথ বল্লে,—বা রে ! তুমি চুপ কোরে এখনো বসে রইলে ! রান্না-বান্না করবে কখন্‌ ? রাত্তির যে অনেক হয়ে গেল !

মা বল্লেন,—আজ আর আমি রাঁধবো না ।

—"তার মানে ? কাল থেকে উপোস্ কোরে আছি, আমার ক্ষিদে পায় না ?

—তুই এখানে—মানে, আমার কাছে খাবি ?···বিস্ময়ের স্বরে কথা ক'টি বোলে মা তা'র পানে তাকালেন ।

উমানাথ বল্লে,—খাবো না ? তবে কোথায় আমি খাবো, শুনি ?

তার কথার ভাবার্থ সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে মা বল্লেন,—না তা নয়,—তবে···তা' খাবি বৈ কি, নিশ্চয় খাবি ! আমি সে কথা বল্‌ছি না । আমি বলছি—

তাঁ'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উমানাথ বল্লে,—তুমি ভেবেছিলে, বৌয়ের কাছে খাবো, না ?···কথার শেষে সে বালকের মত হো হো কোরে হেসে উঠলো ।

মা তাড়াতাড়ি উঠে রান্নার যোগাড় করতে গেলেন ।

৪

দিনের পর দিন যায়—উমানাথের কাণ্ড দেখে মায়ের মনে ভয় হলো । এমন হবে, তিনি কল্পনা করতে পারেননি ! কারণ, তাঁর সঙ্গে পুত্র ও বধূর কাছ থেকে পৃথক্ হবে, তা তিনি কেমন কোরে জানবেন !

দিন যায় । ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে মায়ের মনে আতঙ্ক বাড়ে । ছেলে যেন কেমন হ'য়ে গেছে ! না গৃহী, না সন্ন্যাসী !

মাকে এখানে আনার ক'দিন পরে সকালে শিবানীর সঙ্গে দেখা করতে সে বাড়ী গিয়েছিল । শিবানীর যাতে একলা থাকতে কোন অসুবিধে না হয়, সে জন্য রাত-দিনের একটি ঝী এবং অপরাপর কাজ করার জন্য একটা ছোক্‌রা চাকর সে বন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিল ।

প্রথম ক'দিন শিবানী স্বামীর উপর বেশ রাগ কোরেছিল । কেন না, প্রত্যহই দিনে-রাতে তার আশায় আশায় রান্না কোরে বসে থেকে থেকে শেষে তাকে নিরাশ হতে হয়েছে বোলে ।

এক দিন আর থাকতে না পেরে উমানাথকে সামনে পেয়ে সে রাগত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ব্যাপার কি বলো তো ? মায়ের কাছেই বরাবর তুমি থাকবে বোলে মনে কোরেছ ! সে দিন বল্লে, আন্‌কা জায়গায় মা'র অসুবিধে হবে, একটু ঠিক-ঠাক্ কোরে দিয়ে তার পর আসবে ! তা সে ঠিক-ঠাক্ এখনো হয়নি ? রোজ এদিকে আমি রান্না কোরে ফেলে দিচ্ছি !

উত্তরে উমানাথ বল্লে,—না, ঠিক-ঠাক্ সবই হয়ে গেছে । তবে কথা হচ্ছে, মাকে সেখানে একলা রেখে কি কোরে আমি আসি ?

শিবানী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো,—তার মানে ? তুমি বলতে চাও, আবার তাঁকে এখানে টেনে আনবে, আর আমি আবার জ্বলে মরবো ?—মোরে গেলেও আমি তা পারবো না !

—আরে রাম ! তেমন কথা কি বলতে পারি ! আমারও এখনি চলে আসবার ইচ্ছে, কিন্তু মা যে ছাড়তে চান না ! হাজার হলেও মা তো বটে !

—আহা, ব্যাটার ওপর দরদ দেখে বাঁচি না ! এদিকে জ্বালাতে কসুর করেননি । এখন আর ছেলে ছেড়ে থাকতে পারছেন না ! হুঁ ! ও-সব কথা রেখে দাও—আজ কিন্তু তোমার বাড়ী আসা চাই ।

কি যেন ভেবে উমানাথ বল্লে,—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—"এই ধরো আমি এখানে—মানে, তোমার কাছে রইলুম, আর মা'রও একলা থাকতে যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্য খোকাকে যদি মা'র কাছে রেখে আসি ?

কপালে চোখ তুলে শিবানী বল্লে,—ওমা, সে আবার হয় না কি ? খোকাকে তাঁর কাছে রাখতে গেলুম কেন ! আমিই বা খোকাকে ছেড়ে কি কোরে থাকব ?

একটু হেসে উমানাথ উত্তর দেয়,—তবেই তো শিবানী,—মা'ও ঠিক ঐ কথা বলেন । তোমার ছেলেটি তোমার কাছে যেমন—আমার মায়ের কাছে আমিও ঠিক তেমনি তো !

এ বাদানুবাদের পর সেই যে উমানাথ বাড়ী ছেড়েছে, আজ ছ'মাস হতে চল্লো, আর এ-মুখো হয়নি । অনেক রাগ, অভিমান, অনুযোগ-অভিযোগ, তার পরে অনুনয়-বিনয় মার্জ্জনা-ভিক্ষা অনেক-কিছু ইতিমধ্যে শিবানী কোরেছে, তবু উমানাথকে ফেরাতে পারেনি ।

শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে—আজ ক'দিন হলো, বাধ্য হয়ে তাকে শাশুড়ীর শরণ নিতে হ'য়েছে । এখন সে বেশ বুঝেছে, উমানাথ তাকে শাস্তি দেবার জন্যই এ উপায় অবলম্বন কোরেছে । আর তার এ শাস্তির যাতনা লাঘব করতে একমাত্র শাশুড়ী ছাড়া জগতে আর কেউ নেই !

পৃথক্ হওয়ার সাধ তা'র মিটে গেছে । স্বামীর জন্য সে এখন সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে প্রস্তুত । নারী হয়ে জন্ম নিয়ে যদি নারী-জীবনের চরম তৃপ্তি যে স্বামী, তারই সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিতা হয় সামান্য একটু শান্তির আশায়, তবে সে আরামে বা সুখে তার প্রয়োজন কি ? তেমন সুখ সে চায়নি । শুধু সে কেন, কোন নারীই বোধ হয় এমন কামনা করতে পারে না।··· সে যা চেয়েছিল, তা পায়নি । তার পরিবর্ত্তে যা পেল, সে-পাওয়ার বেদনা আর সহ্য করিতে পারে না !—নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে । তাই ভুলের বোঝা আর না বাড়িয়ে সে উঠে পড়ে লেগেছে তার ভ্রম সংশোধন করতে । প্রথমে পত্র দিয়ে, লোক পাঠিয়ে এবং শেষকালে ক'দিন থেকে নিজে এসে শাশুড়ীর পায়ে ধরে তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ।

শাশুড়ীর মনের অবস্থাও শোচনীয় । যদিও ছেলেকে কাছে পেয়েছেন, তবু মা হয়ে পুত্রের বৈরাগ্য চোখের উপর তিনি আর দেখতে পারছেন না । হয়তো কোন মা তা পারেন না !

ইত্যবসরে উমানাথকে বহু বার গৃহে ফেরার অনুরোধ তিনি করেছেন। উমানাথ কিন্তু অটল! সে বলে,—না, সেখানে গেলে আবার তো সেই অশান্তি! তার চেয়ে বেশ আছি।

শিবানীর বহু অনুনয়পূর্ণ পত্র ইতিপূর্ব্বে তার হস্তগত হয়েছিল এবং সশরীরে বহু বার শিবানী এসে ক্ষমা ভিক্ষা কোরে গৃহে ফেরবার মিনতি জানিয়েছে। কিন্তু সে অচল অটল! উপেক্ষার কঠিন কণ্ঠে বোলেছে,—"না, অসম্ভব! আবার তো সেই ঝগড়া! সে অশান্তির আগুনে আমি ঝাঁপ দিতে পারবো না। তাছাড়া তোমাদের তো এই ইচ্ছা ছিল! মা যেমন আলাদা হতে চেয়েছিলেন, তুমিও তেমনি! তবে এখন কি জন্য আবার কাঁদুনি গাইতে এসেছ? যা' কোরেছি, তা' আর বদলাতে পারে না।"

চোখের জলে প্রতি বার শিবানীকে ফিরতে হয়েছে!

মায়ের অশ্রুপূর্ণ অনুরোধে এত দিন সে কাণ দেয়নি। তার ইচ্ছা, মা এবং পত্নীর কলহ-রোগ যত দিন না সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, তত দিন এমনি কঠিন রুদ্র ভূমিকার অভিনয় সে করে যাবে।

কিন্তু তার সমস্ত কাঠিন্ত সে দিন ভেসে গেল, যে দিন অশ্রুসিক্ত নয়নে মা তার হাত ধরে বল্লেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করছি বাবা, কোন দিন আর বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করবো না। সে যাই বলুক, সব আমি সহ্য করবো। তুই বাড়ী ফিরে চ! বৌমার মুখের পানে আর চাওয়া যায় না। আমার কথা রাখ্, বাবা!

উমানাথ আর আপত্তি করতে পারলো না। তবু সে বল্লে,—তুমি তো বললে ঝগড়া করবো না! কিন্তু তোমার বৌ?

তার কথা শেষ হবার আগেই কোথা থেকে শিবানী এসে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্লে,—না গো না, আর আমি কক্‌খনো মায়ের উপর কোন কথা বলবো না—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি! তুমি বাড়ী ফিরে চলো।

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সংস্কৃতি

শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বেদবাহ্য যে অপূর্ব্ব সভ্যতা ভারতে ছিল, তীর্থগুলিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হওয়ায় তৈর্থিক বলে তা পরিচিত হ'ল।" ভারতের তীর্থগুলির সভ্যতা যে বেদবাহ্য, তাহার কোনও প্রমাণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাশী একটি প্রধান তীর্থ,—ইহা বেদচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে ব্রহ্মা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পুষ্কর তীর্থে এবং কুরুক্ষেত্রেও ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ কাঞ্চীও বেদ-চর্চ্চার কেন্দ্র; শ্রীরঙ্গমে রামানুজ বেদান্তমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সব কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তীর্থ-গুলিতে বৈদিক সভ্যতাই বিকশিত হইয়াছে। তীর্থের উল্লেখ ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০।৩১।৩ এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ ১৬।৪২এ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকেও ক্ষিতিমোহন বাবু অবৈদিক বলিয়াছেন। উপনিষদ্ শ্রাদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন, "দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং" (তৈত্তিরীয় ১।১১।২)। কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৭তে বলা হইয়াছে, যে শ্রাদ্ধে কঠোপনিষদ্ পাঠ করিলে অনন্ত ফল হয়। শ্রাদ্ধের সময় বৈদিক মন্ত্রে পিতৃগণকে আহ্বান করা হয়—যথা আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ইত্যাদি। রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে অনেক বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।*

ক্ষিতিমোহন বাবু লিখিয়াছেন, "দোল দুর্গোৎসব নানা পার্ব্বণ তো সবই অবৈদিক ব্যাপার।" দুর্গার অপর নাম উমা। কেনো-পনিষদে উমার উল্লেখ আছে; তিনি যে হিমালয়-কন্যা তাহাও বলা হইয়াছে—"বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং।" বিভিন্ন বেদের বহু-সংখ্যক মন্ত্র দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত হয় (দুর্গাপূজা পদ্ধতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এ ক্ষেত্রে দুর্গাপূজাকে অবৈদিক বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে বেদে যাহা বীজ আকারে আছে, পুরাণে তাহা পত্র-পুষ্পে বিকশিত হইয়াছে। এ জন্য মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ বুঝিতে হইবে—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—'বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না যায়। পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়।' (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ)। তীর্থ, শ্রাদ্ধ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায় বলিয়া এগুলিকে অবৈদিক বলা ঠিক হইবে না। বৈদিক ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই বেদজ্ঞ ঋষিগণ পুরাণে এই সকল অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়াছেন।

ক্ষিতিমোহন বাবু বলিয়াছেন, "ক্রমে ইন্দ্রের স্থান বিষ্ণু অধিকার করিলেন" (পৃঃ ১১)। তিনি মনে করেন যে, এই কারণেই বিষ্ণুকে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলা হয়। কিন্তু বেদে ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এই মন্ত্র ঋগ্বেদ ১।২২।২০, শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৬।৫ এবং সামবেদ ৮।২।৫।৪ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল সমগ্র ১৫৪ সূক্তটি বিষ্ণুর মহিমাব্যঞ্জক। ঋগ্বেদ ১।২২।১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। বিষ্ণুকে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিবার কারণ এই যে, তিনি বামন-অবতারে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষিতিমোহন বাবু লিখিয়াছেন, "শিব ছিলেন শূদ্রের দেবতা"; কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বেদে বহু স্থলে শিবের উল্লেখ আছে। ক্ষিতিমোহন বাবু নিজেই শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতার ৮টি শ্লোক, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ-সংহিতার ১১টি শ্লোক, কাঠক সংহিতার ১টি শ্লোক এবং অথর্ব্ববেদের কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ২২)। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার সমগ্র ষোড়শ

* ক্ষিতিমোহন বাবু বরাহ-পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, নিমি প্রথম শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বরাহ-পুরাণের ১৮৭।৭১ শ্লোকেই আছে যে, ব্রহ্মা নিমির পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

অধ্যায় (৬৬টি বাক্য) রুদ্রাধ্যায় নামে পরিচিত। এখানে মহাদেবকে নীলকণ্ঠ, রক্তবর্ণ, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, পিনাকধারী বলা হইয়াছে এবং বারংবার মহাদেবকে প্রণাম করা হইয়াছে।

ক্ষিতিমোহন বাবু লিখিয়াছেন, "প্রাচীন বেদ পুরাণে জাতি-ভেদের প্রতি আক্রমণ অনেক আছে।" কিন্তু বেদ পুরাণে জাতি-ভেদের সমর্থকও অনেক বাক্য আছে। সকল বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়াই ব্যাখ্যা করা সমীচীন। উভয় প্রকার বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতি-বিভাগ ব্যবস্থা ধর্ম্মপথের সহায়ক ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, কিন্তু জাতি-বিভাগ প্রথার ফলে যাহাতে অহঙ্কার, ঘৃণা বা অনৈক্যের সৃষ্টি না হয়, এ বিষয়েও সাবধান করা হইয়াছে। শাস্ত্রে কোথাও ইহা বলা হয় নাই যে, জাতিবিভাগ প্রথা রহিত করা উচিত, বা বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করা উচিত। গীতা ৩।২৪ শ্লোকে এবং ১।৪১ শ্লোকে বর্ণসঙ্করের নিন্দা আছে। গীতা ১৮। ৪৫, ৪৬, ৪৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ বর্ণ-বিহিত কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে; বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।১ শ্লোকেও এই কথা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০।৯০।১২ ঋকে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে; ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭ বাক্যে বলা হইয়াছে যে, যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে তাহারা উত্তম বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা মন্দ কর্ম্ম করে তাহারা অধম বর্ণে জন্মগ্রহণ করে।

বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে জাতিবিভাগের সমর্থন এত সুস্পষ্ট যে, গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রম বিভাগ একটি বৈদিক অনুষ্ঠান; ইহার দ্বারা ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষ লাভ করা যায়। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের পরিসমাপ্তি করিয়া রামানুজ বলিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে ঈশ্বর প্রীত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যে মন্দ প্রথা ইহা শাস্ত্রে কোথাও বলা হয় নাই। কিন্তু সকলের মধ্যেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান, আত্মার কোনও জাতি বা বর্ণ নাই, সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত—এইরূপ বাক্য শাস্ত্রে নানা স্থানে আছে। ক্ষিতিমোহন বাবু সেই প্রকার কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের সকল আচার্য্যই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে সম্মান করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও জাতি বিভাগ সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্ণসঙ্করের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস থাকিলেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই বিশ্বাস করেন। এ ক্ষেত্রে জাতি-বিভাগকে অনুদার বা মন্দ প্রথা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার পরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা প্রয়োজন না হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহায়ক ইহা ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩২ সূত্রে বলা হইয়াছে। ক্ষিতিমোহন বাবু যে লিখিয়াছেন, "জাতি-ভেদ একটি অনার্য্য সমাজ-ব্যবস্থা" (পৃঃ ৭০); ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি এই উক্তির সমর্থনে কোনও যুক্তি দেন নাই। ইহার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি তাহা আলোচনা করেন নাই।

ক্ষিতিমোহন বাবু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে রাজপুত্র রোহিতের গল্প উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাতে এগিয়ে চলাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। রাজপুত্র রোহিতের গল্পে সর্ব্বদা উত্তমশীলতার প্রশংসা করা হইয়াছে, আলস্যের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের নিয়ম সকল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এরূপ কোনও ইঙ্গিত নাই।

ক্ষিতিমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, বাহ্য আচার ত্যাগ করা উচিত, তাহা হইলে আমরা মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিদের সহিত মিলিত হইতে পারি। কিন্তু প্রকৃত মিল হইতেছে মনের মিল। বাহ্য আচার রক্ষা করিলেও মনের মিল হইতে কোনও বাধা নাই। একত্র আহার বিহার না করিলে যে মনের মিল হইবে না, এরূপ কোনও কথা নাই। বিধবা তাঁহার পুত্রের ছোঁয়া না খাইলেও পুত্রের সহিত মনের মিল থাকে। বাহ্য আচার ধর্ম্মের স্বরূপ না হইলেও ধর্ম্মের রক্ষক। এ জন্য মহাভারতে বলা হইয়াছে "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ।" বাহ্য আচারে দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনও ভেদ না থাকিলেও তাহাদের মনের মিল না হইতে পারে। ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা যে সকল সত্য নির্ণয় করিয়াছেন, মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে সেই সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সব ভূতে এক আত্মা বিরাজমান। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, সেই আত্মাকে দর্শন করিতে হইলে বাহ্য আচারের নিয়ম সকল পালন করিয়া আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি শুদ্ধ ও সংযত করিতে হইবে। উপনিষদই বলিয়াছেন, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। এই সকল কারণে মনে হয়, প্রামাণিক শাস্ত্রবিহিত আচার পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

হিন্দুর অনেক পূজা ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ক্ষিতিমোহন বাবু অবৈদিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)

দু'দিনের পান্থ

রিক্ত শাখায় জরার অট্টহাসি
পশ্চিমাকাশে ক্লান্ত পূরবী কাঁদে
গোধূলি-গোষ্ঠে বাজে না রাখালী বাঁশী
চকোর পড়ে না চাঁদিমার প্রেম-ফাঁদে।
তোমার তনুতে কোথা সে রূপের ছটা ?
কটাক্ষে আর নহি অলক্ষ্য বাণ!
ক্লান্ত অঙ্গে নাহি রূপায়ণ ঘটা,
শ্রীচরণে নাই অলক্তকের টান!

গাগরী কক্ষে আসো না যমুনা-তীরে—
কবরীতে আর দাও না কুসুম তুলি!
দুয়ারে আসিয়া বসন্ত যায় ফিরে
শুধু ম্লান হাসি অধরে ওঠে গো দুলি!
চেয়েছিলে মোরে প্রহরী তোমার দ্বারে—
আজো আমি জেগে সৈনিক রণ-ক্লান্ত!
জানি শেষ দিন বলে যাবে চুপি-সারে
ফিরে লও তব ভগ্ন প্রাসাদ—আমি দু'দিনের পান্থ!

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)

বিজ্ঞান-জগৎ

সমর-রথ

যুদ্ধে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কামানের গাড়ী যাহাতে নিরাপদে এবং অনায়াসে যাত্রা-সম্পাদনে সমর্থ হয়, এ জন্ম আমেরিকা চার রকমের গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। প্রথম, ঢালু পথে অনায়াসে উঠিতে নামিতে সমর্থ এবং ফৌজ বহিবার যোগ্য বড় বড় গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। দ্বিতীয়, পঙ্ক-কর্দ্দম ভাঙ্গিয়া চলিতে এতটুকু বাধা না ঘটে, এমন ভারী ভারী কামান-বাহী গাড়ী; হঠাৎ চক্রাকারে ঘুরিয়া ইচ্ছামত কামান দাগিতে পারে এমন সব কামান-গাড়ী; এবং চতুর্থ, দীঘি-নদী, খাল-বিলের বুক বহিয়া পাড়ি জমাইতে সমর্থ জলে-স্থলে সমান ভাবে চলিবার উপযোগী এমন কামান ও রসদ-বাহী গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে।

১। ঢালু-পথে ওঠা

২। কাদা ভাঙ্গিয়া চলা

৩। ঘুরিয়া কামান ছোড়া

৪। জলে চলে কামান গাড়ী

হৃদ্রোগ

হৃদ্রোগ বা হার্ট-ডিসিজ—সভ্য-সমাজে কালান্তক মূর্ত্তিতে আজ বিরাজ করিতেছে। এ রোগ এমন নিঃশব্দে মানুষের প্রাণ-শক্তিকে ক্ষয় করিয়া বসে যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনেকে এ রোগের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন না। এ রোগের উৎপত্তি বৈজ্ঞানিকেরা যতখানি ধরিতে পারিয়াছেন,—ভয়, উদ্বেগ, অতিরিক্ত মানসিক বা কায়িক শ্রম এবং বিবিধ ব্যাধির ফলে ঘটিয়া থাকে। প্রতিকার ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে মার্কিণ বিজ্ঞান-সভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বাল্যকাল হইতে নিয়মিত কিঞ্চিৎ ব্যায়াম-চর্চ্চা চাই। তার উপর চাই নিত্য দিন কর্ম্ম-অন্তে খানিকটা করিয়া বিশ্রাম—হাসি-গল্পে অবসর-যাপনা; ক্লান্তি ঘটিবামাত্র মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের কাজ ত্যাগ করিয়া রীতিমত বিশ্রাম; রোগ-ভোগের পর শরীর-মন যতদিন না অবসাদ ও ক্লান্তিমুক্ত হয়, তত দিন কাজ-কর্ম্মে পূর্ণ-নিবৃত্তি এবং তত কাল হালকা কাজ করা এবং বিশ্রাম; কায়িক পরিশ্রমের কাজ ত্যাগ করা উচিত। আহার যেন সর্ব্বদা পুষ্টিকর হয়। এ-সব দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। তাঁরা বলেন, নিষ্ঠাভরে এ কয়টি দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে হৃদ্রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আশা নিঃসংশয়।

নিবের পরমায়ু

ফাউনটেন-পেনের অবস্থা এখন সঙ্গীন; সে জন্ম দায়ে পড়িয়া অনেককে আবার মামুলি ষ্টীল-পেন্ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পেন্-হোল্ডারে যে নিব আঁটিয়া লিখিবেন, লেখার পর সে নিব যদি মুছিয়া রাখেন, তা হা হ ই লে কালির দো ষে নি ব খা রা প হইতে পারে না—একটি নিব বহু কাল কার্য্যক্ষম থাকে। নিব মুছিবার জন্ম ন্যাকড়া নয়, ব্লটিং কাগজ নয়—এক-টুকরা স্পঞ্জ সবচেয়ে উপযোগী। লেখার পরেই কালি-ডুবানো নিবটি সব সময় স্পঞ্জে ভালো করিয়া মুছিয়া লইবেন, তাহা হইলে নিবের পরমায়ু বাড়িবে; নিব ভালো থাকিবে; লিখিতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করিবেন না।

স্পঞ্জে নিবের কালি মোছা

অজর রবার

এ যুদ্ধে অস্ত্রোপকরণাদির জন্য আজ সব চেয়ে প্রয়োজন রবারের। গতিবেগই এ-যুদ্ধে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; ফৌজ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রশদপত্র পাঠাইতে ক্ষিপ্রগামী লক্ষ লক্ষ মোটর-গাড়ী চাই। এবং

গুলী মারিয়া টায়ার পরীক্ষা

সে-মোটর-গাড়ীকে নিরাপদ এবং তার গতিকে স্বচ্ছন্দ নিরুপদ্রব রাখিতে হইলে চাকার রবারকে এমন মজবুত করা প্রয়োজন যে, কাঁটা-খোঁচায় চাকা জখম হইবে না, কিম্বা কামান-বন্দুকের গুলীর ঘায়ে

পেট্রোল-ট্যাঙ্ক রবারে মোড়া হইতেছে

টায়ার ফাঁশিয়া যাইবে না। সমর-বিভাগের পরিচালনাধীনে আমেরিকায় রবারের খনিতে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রবারকে অদাহ্য এবং অভেদ্য করিয়া তোলা হইতেছে। এ রবারের টায়ার কামান-বন্দুকের গুলীতে এতটুকু মচকায় না বা জখম হয় না। তার উপর প্লেনের পেট্রোল-ট্যাঙ্ককে এ রবারের আচ্ছাদনে এমন ভাবে মুড়িয়া দেওয়া হইতেছে যে, বিপক্ষের কামান-বন্দুকের গোলা-গুলীতে ট্যাঙ্ক ফাটিবে না। গুলী-বারুদের আগুনে ট্যাঙ্ক ফাঁশিয়া পেট্রোলে আগুন লাগিয়া প্লেন পুড়িয়া ছাই হইবে, সে আশঙ্কাও সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।

বন্যার পরে

বন্যায় দেশ-ভুঁই ভাসিয়া যায় ডুবিয়া যায়; রেলের লাইন ও চলার পথের চিহ্ন থাকে না। জল-ধারায় অতি-বিস্তারে পথ বিচ্ছিন্ন

বন্যার জলে সেবা-তরণী

বিযুক্ত হয়। সে জন্য বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য-কল্পে খাদ্য-পানীয়াদি পাঠানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। তার ফলে বন্যার জলে পড়িয়াও যারা কোনো মতে প্রাণ-ধারণ করিয়া থাকে, অনাহারে তাদেরো মৃত্যু ঘটে। এ দুর্গতি মোচনের জন্য মার্কিণ যুদ্ধ-বিভাগ অতিকায় ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়াছে। এ ট্যাঙ্ক বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। ট্যাঙ্কে থাকে রশদ-পত্রাদির বিপুল সম্ভার—ঔষধ-পথ্যাদি এবং পোষাক-পরিচ্ছদাদির বোঝা। জলের বুক বহিয়া কাদা ভাঙিয়া এ ট্যাঙ্ক অনায়াসে দুর্গতদের সম্মুখীন হইতে পারে; তার ফলে তাদের বিপদ মোচন ও জীবন রক্ষা হয়।

অগ্নি-নির্ব্বাণ

ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগিলে জল ঢালিয়া সে-আগুন নিবাইতে হয়—এ রীতি সকল দেশে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে আগুন লাগার বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। তার উপর যুদ্ধের সময় নানা ভাবে আগুন লাগানোর নব ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পেট্রোলে বা পেট্রোল দিয়া আগুন লাগাইলে সে-আগুন জল ঢালিলে নিবে না; জল পাইলে আগুনের মাত্রা বাড়িয়া ওঠে। এ আগুন নিবাইবার জন্য মার্কিণ শিল্পীরা জল হইতে কুয়াশা-বাষ্পের সৃষ্টি করিয়া সেই

বাষ্প-যোগে আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা—হু'টি হোজ-পাইপে করিয়া এমন ভাবে জল নিক্ষেপ করা হয় যে, দুই

পেট্রোল-ট্যাঙ্কের আগুন নিবানো

পাইপে নিঃসৃত জলের হু'টি বিভিন্ন ধারায় সংঘর্ষ বাধে। এমনি ভাবে সবেগ-দু'ধারার সংঘর্ষে ঘন কুয়াশা-বাষ্প সঞ্চারিত হয় এবং সেই বাষ্প-যোগে অতি-দুরন্ত অগ্নি-লীলাও অচিরকালমধ্যে নির্ব্বাণ লাভ করে।

তুষার-দেশে প্যারাশুট-ফৌজ

শীতের দিনে রাশিয়ার পথ-ঘাট বরফে ঢাকিয়া থাকে। সব শীতের দেশেই তাই ঘটে। শীত বলিয়া বিপক্ষ-দল তো যুদ্ধে বিরাম দিবে না! এ জন্ত রাশিয়ার প্যারাশুট-ফৌজকে যে-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সে-শিক্ষায় তারা শীতের দিনে প্যারাশুট-অবলম্বনে প্লেন হইতে জমাট-বরফে ঢাকা মাটার বুকে নামিয়া ত্বরিতে অনায়াসে স্কাই-যোগে দীর্ঘ পথ অভিযান চালাইতে সমর্থ। বরফ-ঢাকা পথে প্লেন হইতে ফৌজ নামে; সঙ্গে সঙ্গে স্কাইগুলি ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ফৌজের দল নামিয়া নিমেষে সেই স্কাই লইয়া যাত্রা সুরু করে। স্কাইযোগে তাদের পক্ষে বরফে-ঢাকা ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করা আদৌ কঠিন হয় না। রাশিয়ার বে-সামরিক অধিবাসীরাও এখন এ বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছেন।

স্কাই-যোগে প্যারাশুট-ফৌজের অভিযান

ডুবো জাহাজের রক্ষা-কল্পে

আমেরিকা এক-জাতের বোট তৈয়ারী করিয়াছে; তার নাম 'ক্র্যাশ-বোট'। এ বোট বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। সমুদ্র-বক্ষে
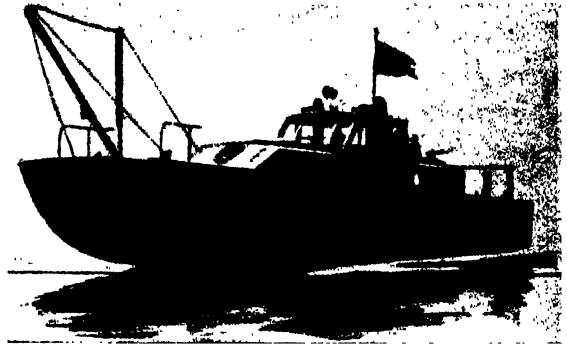
ক্র্যাশ-বোট

রণ-তরী-বিভাগের অঙ্গ-স্বরূপ বহু-সংখ্যক ক্র্যাশবোট রাখা হইয়াছে। কোথাও যদি প্লেন ভাঙ্গিয়া জলে পড়ে, কিম্বা কোনো সাবমেরিণের আঘাতে জাহাজ যদি জলমগ্ন হয়, বেতারে সে সংবাদ মিলিবামাত্র তিন মাইলের মধ্যে এই ক্র্যাশ-বোট গিয়া উপস্থিত হয়। ডুবো প্লেন বা জাহাজকে টেনে বাঁধিয়া তাকে টানিয়া আনা, জলমগ্ন যাত্রীদের সেবা-শুশ্রূষা করা—ক্র্যাশ-বোটে তাহার ব্যবস্থা আছে। এ বোট ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলে। প্রত্যেক ক্র্যাশ-বোটে প্রাথমিক শুশ্রূষার উপযোগী সকল সরঞ্জাম মজুত থাকে।

আমাদের দেহের ওজন

মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বহু গবেষণায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—বেঁটে খাটো গড়নের লোক মাথায় পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির চেয়ে দীর্ঘ নন—২৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁদের দেহের স্বাভাবিক ওজন হওয়া উচিত ১ মণ ৩০ সের হইতে ১ মণ ৩৫ সেরের মধ্যে। মাঝারি গড়ন এবং দৈর্ঘ্যে মাঝারি ছাঁদ এমন মানুষের ওজন ১ মণ ৩০ সের হইতে ২ মণের মধ্যে স্বাভাবিক। মাথায় বেশ দীর্ঘ, চ্যাটালো চওড়া গড়নের মানুষের ওজন ১ মণ ৩৭ সের হইতে ২ মণ ৫ সেরের মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক। এ ওজনের যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানে বুঝিবেন অস্বাভাবিক বৈষম্য ঘটিয়াছে।

চন্দ্র

কবিরা যুগ যুগ ধরে চন্দ্রের স্তুতি গান করে আসছেন। রাত্রে আলোর জন্য আকাশের দিকে চেয়ে নর-নারী চাঁদকে ধন্যবাদ দিচ্ছে চিরকাল। তাই জ্যোতিষীদের দৃষ্টিও সর্ব্বপ্রথম চন্দ্র-সূর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কাস চন্দ্রের কক্ষ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম বার করেন চন্দ্রের কক্ষ ecliptic-সঙ্গে প্রায় ৫ ডিগ্রী হেলে আছে। তখনকার দিনে আজকালিকার মত ভাল ভাল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়নি, এ সব তথ্য সে যুগে আবিষ্কার করা সত্যই বিস্ময়কর।

সূর্য্যের দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়েছিল গ্রহ আর গ্রহের দেহ থেকে জন্ম নেছে উপগ্রহ। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবী (গ্রহ)

চাঁদের স্বরূপ-মূর্ত্তি

আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে চন্দ্র (উপগ্রহ)। পৃথিবীর একটি চন্দ্র, কিন্তু কোন কোন গ্রহে একাধিক উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র আছে।*

প্রতিদিন চন্দ্রের রূপে আমরা বিভিন্নতা লক্ষ্য করি। আর সূর্য্যাস্তের ঠিক পরেই পশ্চিম আকাশে এক-ফালি চাঁদকে দেখি যেন ঘোমটার আড়াল থেকে নববধূর সলজ্জ চাহনি! আকাশ যদি পরিষ্কার এবং মেঘশূন্য থাকে, তাহলে চাঁদ-মুখের বাকী অংশটুকুও দেখা যায়। রাতের পর রাত ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিকে সরে যাচ্ছে—শেষে এক রাত্রে ঠিক যখন পশ্চিম গগনে সূর্য্য ডুবছে, দেখি পূর্ব্ব গগন থেকে চাঁদ উঠেছে—পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমার রাত্রি! পরের রাত্রে চাঁদ আবার দেরীতে ওঠে; ভোরের দিকে সূর্য্য ওঠবার পরেও সে আকাশে কিছুক্ষণ থাকছে—কিন্তু সূর্য্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ছায়া বিলীন হয়ে যায়।

চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সূর্য্যের আলোতেই তার আলো। চন্দ্রের যে অর্দ্ধাংশ আমাদের দিকে থাকে, আমরা সেই দিকটা দেখতে পাই। যদি পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে একই সরল রেখায় চন্দ্র অবস্থান করে, তা হলে অমাবস্যা হবে অর্থাৎ অন্ধকার-ভাগটা আমরা দেখবো; আর সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে যদি পৃথিবী থাকে তবে আলোকিত অংশ অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাব। অন্যান্য স্থানে থাকলে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা দেখব। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রের গায়ে অতি সামান্য লাল রঙের আলো দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সূর্য্যের আলোও পাচ্ছে না। এ আলো পায় পৃথিবীর প্রতিফলিত
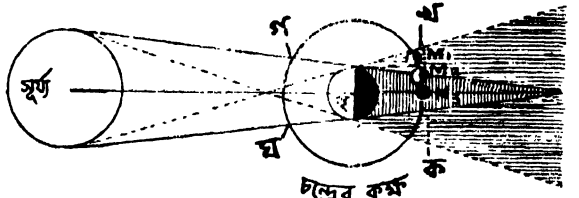
চন্দ্রের কক্ষ

আলো থেকে। চন্দ্রের এবং পৃথিবীর কক্ষ যদি সমভূমিস্থিত হতো, তবে প্রতি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ এবং প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হতো! কিন্তু তা হয় না। কারণ পৃথিবীর কক্ষের সঙ্গে চন্দ্রের কক্ষ ৫ ডিগ্রী হেলে আছে। কক্ষদ্বয় যে দু'টি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, তাদের নাম রাহু আর কেতু। আকাশের যে কোন বিন্দু থেকে আরম্ভ করে নিজের কক্ষে ঘুরে চন্দ্রের সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ই হলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার সত্যিকার সময়। কিন্তু আমরা দেখি, চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-সময় অর্থাৎ অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। এ পার্থক্যের কারণ চন্দ্র যেখান থেকে যাত্রা সুরু করে, প্রদক্ষিণ শেষ করে এসে (২৭ দিন ৮ ঘণ্টা পরে) পৃথিবীকে সে সেখানে পায় না। কারণ পৃথিবীর নিজস্ব গতি আছে এবং সে জন্য সে একটু এগিয়ে গেছে। তাই চন্দ্রকে আর একটু এগিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে পূর্ব্বেকার অবস্থায় উপস্থিত হতে হয়। রাহু ও কেতু অর্থাৎ চন্দ্র ও পৃথিবীর ছেদন-বিন্দু দু'টি সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য পিছু হটে বছরে ১৯.৩ ডিগ্রী। সেই জন্য রাহু অথবা কেতু থেকে মাস কিংবা বছর হিসেব করতে গেলে দিন-সংখ্যা কমে যায়। চন্দ্র অথবা পৃথিবী রাহু থেকে যাত্রা করে নিজ-কক্ষে ঘুরে রাহুর কাছে ফিরে আসছে। কিন্তু রাহু নিজস্থান ছেড়ে এগিয়ে গেল তাদের অভ্যর্থনা করতে, তাই তাদের যাত্রা-পথ গেল কমে। এই হিসাবে মাস হয় প্রায় ২৭ দিন ৫ ঘণ্টায়; আর বছর হয় ৩৪৬ দিন ১৪ ঘণ্টায়।

নিজ অক্ষের উপর পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকে ঘুরছে। একবার ঘুরতে সময় লাগছে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেঃ। এই

* যদি আকাশের বুক থেকে সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্র অদৃশ্য হয়ে যায়, আমাদের চোখে একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে; কিন্তু চাঁদ হারিয়ে গেলে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। জোয়ার-ভাটা হবে না, ডকের জাহাজ সমুদ্রে যেতে পারবে না, বাহিরের জাহাজ ডকে আসবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে। এত প্রভাব। কারণ, আমাদের নক্ষত্ররাজির তুলনায় চন্দ্র যে কত ক্ষুদ্র, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অথচ আমাদের জীবনে তার এত প্রয়োজন।

ঘোরাটা আমরা বুঝতে পারি না; তাই মনে হয়, আকাশস্থিত প্রত্যেক জিনিষই উল্টো দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। নক্ষত্রদের নিজস্ব গতি নেই; তাই আকাশের যে কোন স্থান থেকে যাত্রা সুরু করে পুনরায় সেইখানে ফিরে আসতে সময় লাগে ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেঃ। সূর্য্যের ও চন্দ্রের নিজস্ব গতি আছে; তাই তাদের এই সময় বিভিন্ন। সূর্য্যের লাগে ২৪ ঘণ্টা আর চন্দ্রের লাগে ২৪ ঘণ্টা ৫০ মিঃ ৩০ সেঃ। অতএব সৌর দিন অপেক্ষা চান্দ্র দিন ৫০ মিঃ ৩০ সেঃ দীর্ঘ। যে দিন চন্দ্র ও সূর্য্য একসঙ্গে উদয় হয়, সেই দিন দিনমানে চন্দ্র আকাশে থাকে কিন্তু তীব্র সূর্য্যালোকে তাকে দেখা যায় না। সেই দিন রাত্রেই অমাবস্যা হয়। যদি সেই দিন পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ হয়, তবে দিনমানেই পূর্ণচন্দ্র দেখা যা ; পরের দিন সূর্য্যোদয়ের প্রায় ৫০ মিঃ ৩০ সেঃ .র চন্দ্রের উদয় হবে এবং সূর্য্যাস্তের পর প্র ১ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ৪৫ সেঃ পরে চন্দ্র অস্ত যাবে। তাই প্রতিপদে ঠিক সন্ধ্যার সময় পশ্চিম গগনে ঐ সময়টুকুর জন্ম এক-ফালি চাঁদ দেখা যায়। পরদিন সূর্য্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৪১ মিঃ বাদে চাঁদ উঠবে এবং সূর্য্যাস্তের পর ২ ঘণ্টা ৩১ মিঃ ৩০ সেঃ অবধি দ্বিতীয়ার চাঁদ পশ্চিম গগনে দেখা যাবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ৪৫ সেঃ করে চাঁদকে বেশীক্ষণ দেখা যাবে। এই ভাবে সূর্য্যোদয় থেকে চন্দ্রোদয়ের সময় পেছিয়ে পেছিয়ে শেষে যখন ১২ ঘণ্টার ব্যবধান ঘটবে তখন ঠিক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গগনে চন্দ্রোদয় হবে—পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমা। আবার কমতে কমতে চন্দ্র একদিন রাত্রে আর উঠবেই না; সে দিন হবে অমাবস্যা। নিজ-কক্ষে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্রের সময় লাগে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। চন্দ্রের কক্ষকে ৩০ অংশে সমবিভক্ত করলে প্রতি অংশ ভ্রমণ করতে চন্দ্রের যা সময় লাগে তাকে বলে তিথি।

পৃথিবীর জলধারাকে চাঁদ আকর্ষণ করে; তার ফলে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি

চন্দ্রের ব্যাস ২১৬৩ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২০ মাইল। প্রায় ৪৯টা চন্দ্র মিললে পৃথিবীর সমান হয়। পৃথিবীস্থিত প্রত্যেক পদার্থের উপর পৃথিবীর যেমন আকর্ষণ আছে, যাকে আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ—চন্দ্রেরও সেইরূপ আকর্ষণী-শক্তি আছে, কিন্তু তার শক্তি পৃথিবীর ছ'ভাগের এক-ভাগ অর্থাৎ ছ'সেরের কোনও দ্রব্য স্প্রিং-ব্যালেন্স দিয়ে নিয়ে চন্দ্রের দেশে গিয়ে ওজন করলে তার ওজন দাঁড়াবে মাত্র এক সের! যে-লোক ৫ ফুট হাই জাম্প করতে পারে, চন্দ্রের দেশে গেলে সে লাফাবে ৩০ ফুট!
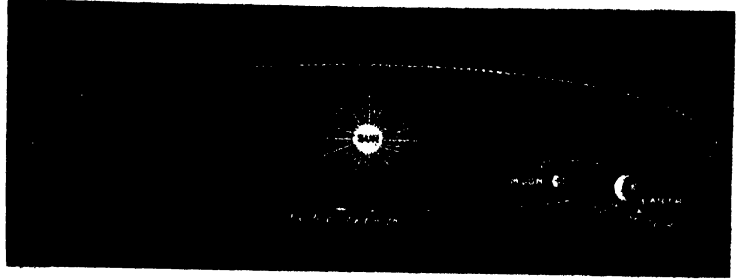
পৃথিবীর ও চন্দ্রের গতি-পথ

দূরবীণ দিয়ে দেখলে চন্দ্রের মুখমণ্ডল অত্যন্ত উঁচু-নীচু, ভাঙ্গাচোরা দেখায়। মনে হয়, উঁচু জায়গাগুলি পর্ব্বতশ্রেণী! উচ্চতা প্রায় ২০ হাজার ফুট! অনেক জায়গায় গভীর গর্ত্ত, যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে ফেটে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে! এক একটা মুখ ৫০ থেকে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত চওড়া। আগ্নেয়গিরিগুলি কিন্তু সব নিবে গেছে। কারণ চন্দ্রের দেশে জল অথবা বাতাস কিছুই নেই! সুতরাং জীবজন্তু গাছপালাও নেই। চন্দ্রকে ঘিরে বায়ুস্তর থাকলে চন্দ্রের ধারগুলি একটু ঝাপসা হতো। কিন্তু চন্দ্রের দিকে দেখলেই বোঝা যাবে তার ধারগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট; জল যা ছিল হয় তা বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, না হয় উত্তাপহীন চাপহীন চন্দ্রের দেশে বরফ হয়ে পড়ে আছে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই, সূর্য্যের আলোতেই তার আলো। প্রমাণ সূর্য্যের ও চন্দ্রের অনুরূপ বর্ণালী, পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বলতা সূর্য্যের ছ' লক্ষ ভাগের এক ভাগ। একটি ভারী মজার জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় চন্দ্রকে দেখলে সর্ব্বদা একই রকম মুখমণ্ডল দেখতে পাওয়া যাবে। সেই একই-রকম উঁচু নীচু একই পাহাড়, পর্ব্বত, নদী-নালা, আগ্নেয়গিরির বিরাট মুখ-গহ্বর। কোনও পার্থক্য নেই! অর্থাৎ আমরা কেবল চন্দ্রের এক-দিকটাই দেখতে পাই অপর দিকটা কোন দিন চোখে পড়ে না এবং পড়বেও না। তার কারণ, চন্দ্রের কক্ষ প্রদক্ষিণের ও অক্ষের উপর ঘোরার বেগ একই। ফলে চন্দ্রের মাত্র অর্দ্ধাংশ আমাদের দেখা উচিত। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষ বৃত্তাকার নয় বৃত্ত (eliptic) এবং পৃথিবী আছে নাভিতে (focus)। কেপলারের নিয়মানুসারে চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-বেগও সর্ব্বত্র সমান নয়। তাছাড়া পৃথিবী কখনও চন্দ্রের কক্ষের ভূমি থেকে উঁচুতে এবং কখনও নীচে থাকে। তাই আমরা অর্দ্ধাংশের চেয়ে একটু বেশী দেখতে পাই। চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করবার পক্ষে সব চেয়ে প্রশস্ত সময় অমাবস্যার পর ছয় থেকে দশ দিন পর্য্যন্ত। পূর্ণিমার রাত্রে যদিও কয়েক স্থান বেশ পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যের ঠিক সামনাসামনি থাকার জন্ম চন্দ্রস্থিত পদার্থের ছায়াপাত হয় না, তাই পর্ব্বত অথবা গুহার আন্দাজ মেলে না। চন্দ্রের তাপ ও চাপ অত্যন্ত কম, বায়ু ও জল নেই সে জন্ম সেখানে জীবন সম্ভবপর নয়। আজ অবধি কোন দূরবীক্ষণের সাহায্যে জীবের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

[উপন্যাস]

দুই

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রায় পনেরো বছর পরে এক দিন বৈকালে পাহাড়ের অগভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বন্দুক-হাতে এক যুবক একাকী খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলছিল যেন কোনো শিকারের পিছনে। রাইডিং ব্রীচেশ-পরা উজ্জ্বল গৌর-কান্তি সুগঠিত দেহ যুবককে সাহেব বলে মনে হতো যদি হ্যাটের পরিবর্ত্তে তার মাথায় ধবধবে সাদা কাপড়ের পাগড়ি না থাকতো। সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় গাছের মাথায় মাথায় সোনালি মুকুট পরিয়ে দিয়ে আকাশ-পথে তখন দ্রুত এগিয়ে মেঘলোকের দিকে এবং নীচে মলিন ছায়া-সম্পাতে দিবাবসানের অনেক পূর্ব্বেই সন্ধ্যার আভাস জাগিয়ে তুলেছে। অনতিদূরে পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ ক'রে বয়ে চলেছে একটি স্রোতস্বিনী —পাথরের বাধা লঙ্ঘন করে। শিকার অন্বেষণে যুবক সেই জল-ধারার দিকেই এগিয়ে চলেছিল,—তৃষ্ণার্ত্ত শিকারের সন্ধান ঐখানে মিলবে সেই সম্ভাবনায়!

অকস্মাৎ নারী-কণ্ঠের একটা উচ্চ আর্ত্তস্বর যুবককে চমকিত করে দিল। স্বর লক্ষ্য ক'রে চকিতে ডান দিকে তাকিয়ে যুবক দেখে, প্রায় একশো গজ দূরে এবং বিশ পঁচিশ গজ নীচে জঙ্গলের মধ্যে একটুখানি খোলা জায়গায় প্রকাণ্ড একটা ভালুক থাবা বাড়িয়ে এক পাহাড়িয়া রমণীকে সাপ্‌টে ধরবার উদ্যোগ করেছে, আর এই রমণী আত্মরক্ষার কোনো উপায় না দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে। চোখের নিমেষে যুবক হাতের বন্দুক তুলে ভালুক লক্ষ্য ক'রে গুলী করলো। সন্ধান অব্যর্থ। বিকট শব্দে ভালুক সেইখানেই বসে পড়লো এবং তার পর এক দিকে কাৎ হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। যুবক বুঝতে পারলো, পুনরায় আক্রমণ করবার শক্তি ভালুকের আর নেই। ঐ স্পন্দনই তার জীবনের শেষ স্পন্দন!

এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে যুবক তখনি ছুটে চললো ভয়ার্ত্ত সেই পাহাড়ীয়া রমণীর দিকে। সেখানে পৌছুবার সোজা পথ ছিল না,—যেতে হলো জঙ্গল অতিক্রম করে অনেকটা ঘুরে। সেখানে পৌঁছে যুবক প্রথমেই আহত ভালুকের কাছে গিয়ে দেখলো তার পশু-লীলা শেষ হয়েছে। রমণীর দিকে চেয়ে মণিপুরী ভাষায় যুবক বললো, "আর ভয় নেই। ভালুকটা মরেছে।"

রমণী তার ভাষা বুঝতে পেরেছে, মনে হলো না,—অবাক হয়ে সে যুবকের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলো। রমণী রূপসী; বয়স তরুণ। পোষাক নাগা বা কুকি মেয়েদের মতো। দেহের গড়ন, বর্ণ, মুখ-চোখের ভঙ্গিমা কিন্তু অন্য রকমের। পাহাড়ী অসভ্য জাতির ভাষা যুবকের জানা ছিল না, তাই সে মণিপুরী ভাষায় কথা বলেছিল; কিন্তু যখন বুঝলো, তরুণী তার কথা বোঝেনি, তখন ঐ কথাই সে হিন্দুস্থানীতে বললো। যুবতীর মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটলো। যুবকের কথা বুঝতে পেরেছে! ভাঙা হিন্দুস্থানীতে কোনো মতে সে তার কৃতজ্ঞতা জানালো,—যে-কথা মুখের ভাষায় ফুটলো না, চোখের ভাষায় তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ পেলো।

যুবতীর বয়স কুড়ি, বাইশ কি পঁচিশ, যুবক অনুমান করতে পারলো না; কিন্তু তার বিস্ময় বোধ হলো এ-বয়সের যুবতীকে এ রকম নির্জ্জন স্থানে দেখে। ভাবলো, হয়তো কাছে কোথাও তার বাড়ী। তাই ভেবে যুবক বললে, সে তাকে তার বাড়ী পৌঁছে দেবে। এ কথায় রমণী সভয়ে প্রতিবাদ জানালো, না, না। ভয়ের কারণ বুঝতে না পেরে যুবক অপ্রতিভ হলো। এমন সময় তিন জন পাহাড়ী মেয়ে হঠাৎ বনের ভিতর থেকে ছুটে সেখানে এসে হাজির হলো। যুবতী তখন তাদের দেখিয়ে অনেক কষ্টে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে যুবককে বললে, "এরা আমার সঙ্গের লোক, এদের সঙ্গে আমাকে এখনি চলে যেতে হবে।"

আর কিছু না বলে এবং এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে যুবতী তাদের সঙ্গে বনের পথে চলে গেল। যাবার সময় অদূরে বড় একটা পাথরের উপর থেকে তুলে নিয়ে গেল একটা ধনুক আর এক-গোছা তীর-ভরা বাঁশের একটা চোঙা। যেতে যেতে যুবতী ক'বার ফিরে দেখলো যুবক তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে তারই পথের দিকে চেয়ে। শেষে বনের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাদের চলে যাবার পরও যুবক অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। যুবক এখানকার ফরেষ্ট অফিসার। নাম প্রতাপ সিং। এখানকার পাহাড়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বন-বিভাগীয় আইন কাগজ-পত্রে প্রবর্ত্তিত হলেও পাহাড়ী নাগা-কুকিরা সে সব আইন-কানুনের ধার ধারতো না এবং তার মর্ম্মও বুঝতো না। তারা জানতো, এ পাহাড় তাদের জন্মভূমি; সুতরাং এখানে তাদের অবাধ অধিকার,—আর জানতো, তাদের রাজার হুকুমের চেয়ে বড় হুকুম আর কারো নেই!

এই অসভ্য পাহাড়ীয়া যাতে গবর্ণমেণ্টের আইন মেনে চলে, সেই উদ্দেশ্যে ফরেষ্টার প্রতাপ সিংকে এখানকার ফরেষ্ট আপিসে স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রতাপ সিং এখনও পর্য্যন্ত পাহাড়ীদের সঙ্গে কোনো রকম মিটমাট করে উঠতে পারেনি।

ভালুকের আক্রমণ থেকে প্রতাপ আজ যে যুবতীকে রক্ষা করলো, তার পোষাক নাগা মেয়েদের মতো হলেও সে যে বাস্তবিক নাগা বা অন্য কোনো পাহাড়ীয়া জাতির মেয়ে, এ সম্বন্ধে যুবকের মনে সংশয় রয়ে গেল। কারণ, অসভ্য অনার্য্য জাতের লোকদের দেহের

গড়নে যে বিশেষত্ব সর্ব্বত্র দেখা যায়, তার কোনোটিই এই যুবতীর দেহে নেই, অথচ সে বলে ঐ অসভ্যদের ভাষা, পরে তাদেরই পোষাক! তার নিরাভরণ অনাবৃতপ্রায় দেহে যে অপরূপ সুষমা, যে স্নিগ্ধ-কোমলতা প্রতাপের মনে হলো সভ্য-সমাজের মেয়েদের মধ্যেও সচরাচর তা দেখা যায় না। কে এ যুবতী? সারা পথ প্রতাপ ভেবেছে, কিন্তু মীমাংসা করতে পারেনি। তার কাছে ঐ যুবতী একান্ত রহস্যময়ী হয়ে রইলো।

প্রতাপের শিকার-প্রয়াস সে দিনের জন্য সেইখানেই শেষ হলো। সে যখন আপিসে ফিরলো, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে!

তখনকার দিনে ডাকের ব্যবস্থা আজ-কালের মতো নিয়মিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। সাত মাইল দূরের ডাক-আপিস থেকে হপ্তায় দু'দিন মাত্র এখানে ডাক বিলি হতো এবং সে ডাক আসতো বিকেলে। সরকারি চিঠি-পত্র না থাকলে ডাক-পিয়ন এ-দিকে আসতোই না। প্রাইভেট চিঠি কদাচিৎ আসতো এবং সেগুলি সরকারি ডাক-বিলির দিন ভিন্ন অন্য দিনে ত বিলি হতো না।

সেদিন আপিসে ফিরে প্রতাপ দেখলো, একখানা সরকারি চিঠি তার টেবিলের উপর পড়ে আছে। প্রতাপের অনুপস্থিতিতে চিঠি-পত্র খোলবার অধিকার অপরের ছিল না। কর্ম্মচারী-হিসাবে আপিসে তার অধীনে দু'জন হেড্-গার্ড এবং পাঁচ জন গার্ড ছিল। হেড-গার্ডের এক জন বাঙ্গালী। তার নাম উমাচরণ শর্ম্মা। অপর হেড-গার্ড এবং গার্ড পাঁচ জনের সবাই মণিপুরী। মণিপুরী হেড্-গার্ড লেখা-পড়ার কাজ করতে পারতো না, সে-কাজে উমাচরণই ছিল প্রতাপের প্রধান এবং একমাত্র সহায়। মণিপুরী হেড্-গার্ডের নাম জয়রাম সিং। প্রতাপ ছাড়া আর সকলের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কেউ বাস করতো না। এ রকম দুর্গম জঙ্গলে পরিবার নিয়ে বাস করায় অসুবিধা বিস্তর এবং বাস করতে যাওয়া তখনকার দিনে নিরাপদও ছিল না।

চিঠিখানা খুলে প্রতাপ দেখ্‌লো, উপরিওয়ালার কাছ থেকে জরুরি তাগিদ এসেছে—পাহাড়ী অসভ্যদের রাজার সঙ্গে বন-বিভাগের আইন প্রবর্ত্তন সম্পর্কিত গোলমাল তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলবার জন্য। ঐ সব অসভ্য জাতির বিরোধিতার ফলে গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট ক্ষতি হ'চ্ছে এবং সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখে কাজ করবার জন্যই যে তাকে সেখানে স্পেশাল অফিসার করে পাঠানো হয়েছে, চিঠিতে এ কথারও ইঙ্গিত ছিল।

উমাচরণের হাতে চিঠি দিয়ে প্রতাপ বললো—"এটি বোধ করি তিন নম্বর তাগিদ। আমরা যদি শীগ্‌গির কিছু করে উঠতে না পারি, তা হলে ভারী লজ্জার কথা হবে। তাতে আমার অযোগ্যতাই প্রকাশ পাবে। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, আমি এ কাজে সফল হতে পারবো, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারলাম না! কি জবাব দি, বলুন দেখি?"

উমাচরণ বললো, "জোর-জবরদস্তি করে আইন চালাতে গেলে শুধু বিভ্রাট এবং গোলমালের সৃষ্টি হবে। এই বুনো অসভ্যেরা আইন মানবে কি, গবর্ণমেন্টের শাসনই মানতে চায় না। ওদের বশে আনতে হবে কৌশলে—কতকগুলো সুবিধে দেখিয়ে। ভয় দেখিয়ে নয়।"

—"তা সত্য, কিন্তু ওদের বোঝাই কি করে? ওদের ভাষা জানে, ওদের বুঝোতে পারে এমন লোক পাওয়া যায় না? জয়রামকে কত বার বলেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ-রকম এক জন লোকেরও সে সন্ধান দিতে পারলো না। আর বিলম্ব করাও চলে না।"

—"গার্ড ভীমসিং খুব চালাক লোক, পাহাড়ীদের অনেকের সঙ্গে তার জানাশুনা আছে। সে যদি একবার চেষ্টা করে, দেখলে হয় না?"

—"বেশ, তা হলে কালই তাকে পাঠিয়ে দেবেন এক জন দো-ভাষী আনতে। একটা কথা, আমার ধারণা এবং শুনেছিলাম, নাগা-কুকিরা এখান থেকে কম পক্ষে কুড়ি মাইল দূরে থাকে; কিন্তু আজ ক'জন নাগা মেয়েকে দেখেছি মাত্র সাত-আট মাইল দূরে। তারা কি তাহলে এত কাছাকাছি আস্তানা পেতেছে?"

—"অসম্ভব নয়। এরা এক জায়গায় কখনো বেশী দিন থাকে না। এই সঙ্গে এদের রাজাও যদি এদিকে এসে থাকে, তাহলে ভালোই হয়েছে বলতে হবে। সহজেই তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করবার সুবিধে হবে।"

—"তাহলে ভীমসিং কালই যেন লোকের খোঁজে বেরিয়ে যায়।"

উমাচরণের সঙ্গে এই পরামর্শ করে প্রতাপ তার বাসায় চলে গেল এবং শিকারের পোষাক ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরের বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসলো। তার পর রাত্রির আহার সমাধা করলো সেইখানে বসে। নানা চিন্তায় মন খুব উদ্‌ভ্রান্ত। উপরিওয়ালার তাগিদে তার চিত্ত বিকল তা নয়। গার্ড ভীমসিং দোভাষীর সন্ধানে যাচ্ছে! কাজেই ও-চিন্তায় মন আকুল হলো না! মন আকুল সেই তার নাগা পোষাক-পরা সুন্দরীর চিন্তায়। বিছানায় শুয়েও বার-বার তার কথা মনে হতে লাগলো।

প্রথমেই মনে হলো, যুবতীর মাথার চুল আর হাঁটুর নীচেটুকু যেন সদ্য ভিজে বোধ হচ্ছিল। সে হয়তো সবে মাত্র তখন কাছে ঝরণার জলে স্নান করে উঠেছে। ভিজে কাপড় ছেড়েছিল কি না প্রতাপ তা লক্ষ্য করেনি। তার পর ভালুকটা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে আক্রমণ করবার জন্য থাবা বাড়িয়ে এগুচ্ছিল, সেখানে ভালুকের ঠিক পিছনেই ছিল একটা বড় পাথর—যার উপর থেকে যুবতী তীর-ধনুক তুলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রতাপ ভাবলো, তীর-ধনুক যদি ভালো করে চালাবার সামর্থ্য থাকতো তা হলে তা ব্যবহার না করে, সে চেঁচিয়ে উঠবে কেন? হয়তো সে-সুযোগ পায়নি—ভালুকটা এমন অতর্কিতে সামনে এসে পড়েছিল যে, ধনুকের কাছে সে যেতে পারেনি। মনে হয়, স্নান করবার সময় সে আত্মরক্ষার অস্ত্র কাছাকাছি ঐ বড় পাথরটার উপরে রেখেছিল। কিন্তু তার সঙ্গের অন্য পাহাড়ী মেয়েরা তখন কোথায় ছিল? তারা তাকে একেলা ফেলেই বা যায় কেন? প্রতাপ এ সব প্রশ্নের কোনো সমাধান করতে পারলো না। অনেক রাত পর্য্যন্ত ওদেরি কথা ভেবে ভেবে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লো।

প্রতাপের পিতা মণিপুর-রাজের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তাঁরই কাছে থেকে প্রতাপ মণিপুরী ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছে। হিন্দুস্থানী তার মাতৃভাষা। প্রতাপের পিতা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে মণিপুর রাজ্যে এসে মিলিটারী বিভাগে কাজ নিয়ে অবশেষে সেইখানেই স্থায়িভাবে বাস করছেন। প্রতাপও

মিলিটারী শিক্ষা পেয়েছে ; এবং ঠিক ছিল, সে মণিপুর ষ্টেটে কাজ করবে ! কিন্তু মণিপুরের রেসিডেণ্ট সাহেব তাকে মনোনীত করলেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ফরেষ্ট বিভাগে কাজের জন্ম। তাই স্পেশাল ফরেষ্ট অফিসার হয়ে মণিপুর এবং কাছাড়ের মাঝামাঝি এই পর্ব্বত অঞ্চলে তাকে আসতে হয়েছে।

তিন

আদেশ-মত পরদিনই ভীমসিং বেরিয়ে গেল দোভাষীর সন্ধানে। এক পাহাড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তার নাম মাংফু। আট মাইল দূরে এক বস্তিতে থাকতো এই মাফু। লোকটা আঙ্গমি নাগাদের উপশাখা সেমা-নাগা বংশের। কাছাড়ের উত্তরে যে পাহাড়ের সার, ফাঁকে ফাঁকে নানা জায়গায় বিভিন্ন বস্তিতে মিকির, লোটা, রেংমা, চক্রোমা, সেমা, কনিয়াক্, টুকোমি, শংটাম্, টংখুন, খেজুমা, কাচ্চা নাগা, নাম্‌সঙ্গিয়া প্রভৃতি নাগাদের বহু গোষ্ঠী স্বতন্ত্র দলে বাস করতো। তা ছাড়া কুকিদেরও কতকগুলো দলের আস্তানা ছিল এই পাহাড় অঞ্চলে।

মাংফুর খোঁজে এই সব বস্তিতে এসে ভীমসিং জানতে পারলো, পাহাড়ী অসভ্যদের সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট আইন প্রচলনের ব্যাপার নিয়ে। পাহাড়ের জঙ্গলে ইচ্ছামতো গাছ-পালা কাটবার যে পূর্ণ স্বাধীনতা তারা চিরকাল ভোগ করে আসছে, সে অধিকার আর থাকবে না, এমন অন্যায় আইন তারা মানবে না। গ্রামে গ্রামে বস্তিতে বস্তিতে এই নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলেছে এবং গভর্ণমেণ্টের এ আইন যাতে রদ হয়, তার জন্ম কি করা উচিত ঠিক করতে যত গ্রামের আর বস্তির পেহুমা, মাটাই ও গালিনরা (প্রধান) নিজেদের দলগত বিরোধের কথা ভুলে সব একত্র জড়ো হয়েছে নি-চি নামে এক জায়গায়। মাংফুও সেখানে গিয়েছে শুনে ভীমসিং ছদ্মবেশে নি-চির দিকে রওনা হলো। সে জায়গাটি ছিল পাহাড়েরই এক অধিত্যকায়। অদূরে বারাক নদী প্রবল বেগে বয়ে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাপের মতো বাঁকা গতিতে। ভীমসিং যখন সে জায়গার কাছাকাছি এলো, রাত্রি তখন এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

প্রায় এক ক্রোশ দূর থেকেই একটা সোরগোলের সাড়া ভীমসিং-এর কাণে পৌঁছুলো। সেই সোরগোল লক্ষ্য করে সে এলো এগিয়ে। মাদলের দুম্‌দাম্, জনতার কোলাহল মিলে এক অদ্ভুত কলরবের সৃষ্টি করেছে। সে জায়গার কাছাকাছি এসে একটা বড় গাছের আড়াল থেকে ভীমসিং দেখলো, প্রায় চার-পাঁচশো নাগা-কুকি জড়ো হয়েছে এবং তারা নিজের নিজের সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে মত্ত।

গাছের আড়াল থেকে ভিড় ঠেলে ব্যাপার দেখবার সুবিধা হচ্ছে না বলে ভীমসিং গাছের উপরে উঠে এমন এক জায়গায় বসলো যেখান থেকে সব প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। নাচ-গান, মদ, মুর্গী, বলি-বাজনা—এ সবের মধ্যে বুনোর দল যেন মাতোয়ারা!

ভীমসিং জানতো, এ উৎসবের উন্মাদনায় অসভ্যরা না করতে পারে এমন কাজ নেই! তাকে দেখতে পেলে ধরে নিয়ে গিয়ে হয় জলন্ত আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারবে, নয় তার মাথা কেটে নিয়ে সেই মুণ্ড-হাতে নৃত্য-ভঙ্গীতে নিজের বীরত্ব প্রচার করবে। নরহত্যা করে যে যত-বেশী মুণ্ড সংগ্রহ করতে পারে, এদের মধ্যে সে-পরিমাণে তার মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। এমন বীরত্ব দেখাবার লোকের অভাব নেই। যারা নরমুণ্ডের বাহুল্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাদের পোষাকে বিচিত্র ছটা! এ সব বীরের প্রসাদ লাভ মেয়েদের পরম কাম্য।

ভীমসিংয়ের সাহস হলো না এই প্রমত্ত ভিড়ে ঢুকে মাংফুকে খুঁজে বার করে। তা করতে গেলে নিজের প্রাণ যেতে পারে! ব্যাপার এমন দাঁড়াবে, তা সে ভাবতে পারেনি। এখান থেকে, এখন ফিরে যাওয়াও সহজ নয়। পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রে যত সব হিংস্র জানোয়ার বেরোয়—এ সময় বনে-জঙ্গলে চলায় আরো বিপদ। তাই সে স্থির করলো, গাছের উপরে বসেই বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবে এবং এদের উৎসব কি ভাবে শেষ হয় তাও দেখবে।

সার-সার মশালের আলোয় পাহাড়ের এদিকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে। মাদলের দুম্‌দাম্ শব্দে, উৎসব-মত্ত লোক-জনের নাচ-গান আর বিকট চিৎকারে পাহাড় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পেহুমা, মাটাই আর গালিনের দল এই সোরগোলের মধ্যেই একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিল আর তার মধ্যেই তাদের শলা-পরামর্শ চলছিল।

এর পর উৎসব-ক্ষেত্রেরই এক প্রান্তে আর একটা ব্যাপার হলো যা ভীমসিং ভালো করে দেখতে পায়নি। নাগাদের দু'টো বস্তির লোকদের মধ্যে ছিল ভয়ঙ্কর বিরোধ। সে বিরোধের ফলে ও-দুই বস্তির লোকেরা কাটাকাটি-খুনোখুনি করে নিজেদের জন-সংখ্যা দিন দিন ক্ষয় করে ফেলছিল। ইংরেজের জঙ্গল-আইনে বাধা দেবার জন্ম পাহাড়ের সব সম্প্রদায়ের লোকই যখন আজ একজোট, তখন নিজেদের এ বিরোধ এখন মিটিয়ে ফেলাই সঙ্গত, গ্রামের মাটাইরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। প্রচলিত রীতি-অনুসারে এমন বিরোধ-বিরতি সম্পর্কে একটা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অনুষ্ঠান করতে হয়। না হলে কেউ তা মেনে চলবে না। আজ এখনি সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলো ঐ দুই বস্তির লোকেরা।

প্রথমে মাটির উপর এক জায়গায় একখানা কলাপাতা বিছানো হলো, তার পর ঐ পাতার উপর রাখা হলো একটা মুরগীর ডিম, একটা বাঘের দাঁত, একটা মাটির ঢেলা, একটু লাল সুতো, একটু লাল রং, খানিকটা কালো সুতো, একটা বর্শা, একখানা দা, আর একটা বিছুটি-পাতা। কলাপাতার দু'পাশে মুখোমুখী হয়ে বসলো পরস্পর-বিরোধী দুই বস্তির দুই মাটাই (মাতব্বর) এবং তাদের পিছনে নিজের নিজের গ্রামের যত পুরুষ। তার পর মাতব্বরের নির্দ্দেশে প্রথম বস্তির এক জন লোক, তার পর অন্য বস্তির এক জন—এই ভাবে পর্য্যায়ক্রমে সকলে একে একে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো একই প্রণালীতে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যটির মর্ম্ম এই রকমের :—

"জঙ্গল আইনের গোলমাল না মিটে যাওয়া পর্য্যন্ত আজ থেকে আমি······বস্তির······দলের কারো সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি, খুনো-খুনি কিছু করবো না। যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তবে আমি যেন হাত-পা-মাথাহীন এই ডিমটির মতো সকল-প্রকার শক্তিশূন্য হ'য়ে যাই! এই দাঁতটা যে বাঘের, ঐ রকম একটা বাঘ যেন আমায় খেয়ে ফেলে ; মাটির এই ঢেলার মতো আমি যেন বর্ষার বৃষ্টিতে গলে যাই ; যুদ্ধক্ষেত্রে আমার দেহের সকল রক্ত যেন এই লাল টক্‌টকে সুতোর ধারায় বয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় ; আমি যেন এমন অন্ধ হয়ে

যাই যার ফলে সমস্ত পৃথিবী যেন আমার চোখে এই কালো রংএর সুতোর মতো কালো হয়ে যায় ; আমার দেহ যেন দা আর বর্শার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং বিছুটির চুলকুনিতে দারুণ যন্ত্রণায় যেন ছটফট করি !

অনুষ্ঠানের শেষে নাচ-গান এবং বিরাট ভোজ। পাহাড়ীরা সকলেই মদ খায় এবং তাদের মদ রাখার পাত্র বাঁশের চোঙা বা শুক্‌নো লাউ। সারা রাত উৎসবের পর ভোর হবার একটু আগে স্ত্রী-পুরুষ সকলে খোলা মাঠের যেখানে-সেখানে অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়তে তাদের মুহূর্ত্ত দেরি হলো না।

ভীমসিংও সারা রাত জেগে কাটিয়েছে গাছের উপর বসে, সুতরাং ঘুমে তার চোখও বুজে আসছিল, কিন্তু ঘুমোবার স্থান বা সুবিধা তার ছিল না। সে এসেছে মাংফুর সন্ধানে! তাকে বার করতেই হবে। তাই ভোর হতেই সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে ঘুমন্ত লোকদের কাছে গিয়ে খোঁজ করতে লাগলো। এ কাজ যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা সে জানতো। তবু সাহস করে নিঃশব্দে গিয়ে ঘুমন্ত লোকদের মুখ দেখে দেখে সে সন্ধান শুরু করলো।

কিছুক্ষণ পরে রোদ উঠলো। গাছের দীর্ঘ ছায়া ঘুমন্ত লোকদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রের আতপ থেকে রক্ষা করলো। শেষে ভীমসিং মাঠের এক নিভৃত প্রান্তে তার লোককে দেখতে পেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চিৎ হয়ে শুয়ে প্রশস্ত বুকের উপর দু' হাত রেখে প্রচণ্ড নাসিকা গর্জ্জনে সেখানটা সে কাঁপিয়ে তুলছিল। ভীমসিং দেখলো, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ-পালার পুনরাবৃত্তি দরকার। বুকের উপর থেকে একে-একে তার দু'টো হাত নামানো হলো তবু মাংফুর সচেতন হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না! নেশার প্রভাব তখনও পূর্ণ মাত্রায় তাকে আচ্ছন্ন রেখেছে। উপায়ান্তর না দেখে ভীমসিং মাংফুর মাথাটা বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে দিল ; তাতেও কোনো ফল হলো না। অবশেষে একটা গাছের পাতা পাকিয়ে সরু নলের মতো করে সেটা মাংফুর খাঁদা নাকের মোটা ছেঁদার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এতক্ষণে ভীমসিংয়ের চেষ্টা সফল হবার মতো হলো—মুখ বিকৃত করে মাংফু প্রকাণ্ড হাঁচি হেঁচে চোখ মেলে চাইলো। ভীমসিংকে দেখে যেন একটু চমকে উঠলো! ভীমসিং সভয়ে চাপা মৃদু কণ্ঠে বললে—"চমকো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। এখানে তা বলা চলবে না। উঠে আমার সঙ্গে ঐ জঙ্গলের পিছনে চলো, সেখানে বলবো।"

মাংফু কোনো আপত্তি না করে তখনই উঠে ভীমসিংয়ের পিছনে পিছনে চললো। একটু নিরিবিলি জায়গায় পৌছে মাংফুর হাতে দু'টো টাকা দিয়ে ভীমসিং বললো—"সরকার বাহাদুরের দেওয়া এই চক্‌চকে টাকা দিয়ে তুমি অনেক কিছু কিনতে পারবে। কিন্তু তোমরা এখানে সবাই মিলে ও কি করছিলে? তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান হয়েছি।"

টাকা পেয়ে খুশী হয়ে মাংফু বললো—"পেহুমা, মাটাইরা তুয়ার আইন চায় না! বলে, আমরা জংলি লোক—জঙ্গলের গাছ পালার মালিক আমরা। সে গাছ কেনে আমরা কাটতে পারিমু না? কাটতে গেলে কেনে আবার সরকারকে টাকা দিতে লাগবে? সরকারের এ জুলুম আমরা সইমু না। তুয়া আইন চালাবি তো আমরা লড়াই করিমু।"

—"আরে না, না, লড়াই করতে হবে কেন? সরকার কারো সঙ্গে লড়াই করতে চায় না। তোমাদের মাটাইরা আইন বোঝেনি। যাই হোক, তুমি এক কাজ করো—দু'-এক দিনের মধ্যে আমাদের আপিসে গিয়ে বাবুর সঙ্গে একটি বার দেখা করো। আইনের কথা বাবু তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন, তার পর তুমি তোমাদের রাজার কাছে গিয়ে সব জানাবে। এ কাজ করতে পারলে তোমার বহুৎ টাকা বখশিস্ মিলবে।"

—"আচ্ছা যাইমু, বাবুরে বলি দিবি, মাংফু কথা খিলাপ করে না—সে ঠিক যাবে।"

চার

ঝুলন মণিপুরীদের একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে নাচ-গান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান বেশ সমারোহে সম্পন্ন হয় এবং মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এ উৎসবে একেবারে মেতে ওঠে। পাহাড় অঞ্চলও অন্যথা হয় না। রাজকর্ম্মচারী হিসাবে প্রতাপ এই উপলক্ষে স্থানীয় এক মণিপুরী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হলো।

গৃহস্বামী তাকে সম্বর্দ্ধনা করে উৎসব-প্রাঙ্গণে এনে একখানা বেতের চেয়ারে বসালেন। দু'-তিনশো দর্শক, কিন্তু চেয়ার ছিল সাতখানা কি আটখানা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চেয়ারে এবং অপর লোক সব আসরের চারিধারে সতরঞ্চে বসেছিল। পাণ-গুয়া, আতর, আগর (অগুরু) দিয়ে গৃহস্বামী সমাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। আসরের উত্তরাংশে সুসজ্জিত দোলনায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যুগল-মূর্ত্তি মনোরম সুগন্ধি ফুলের আভরণে ভূষিত। ফুলের মতো সুন্দর দু'টি তরুণী দু'পাশে দাঁড়িয়ে সেই দোলনায় মৃদু মন্দ দোল দিচ্ছে। সামনের ঠাকুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাঁচ ফুট থেকে তিন ফুট পরিমাণ উঁচু প্রায় বিশ জন রমণী এবং বালিকা—সার দিয়ে বিচিত্র উজ্জ্বল বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে। তাদের সকলেরই হাত, গলা, বুক, কাণ আর কবরীতে ফুলের ভূষণ; কপোল আর ললাট চন্দন-চর্চ্চিত। পরণের শাড়ীগুলি তাদের নিজেদেরই হাতের তৈরি। সেগুলিতে ছোট-বড় বহু দর্পণ এমন কৌশলে সংলগ্ন তাদের প্রত্যেকটি থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে শত শত চন্দ্র-সূর্য্য।

মৃদঙ্গ, বেহালা, বাঁশী, মন্দিরা এবং অন্যান্য যন্ত্রালাপের সঙ্গে মেয়েদের নাচ আর গান আরম্ভ হলো। সাত বছরের থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের যুবতী মহিলা এ দলে। একই অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে একই ভাবে এতগুলি রমণীর নিখুঁত নৃত্য সত্যই দেখবার জিনিস।

প্রতাপের কাছে এ নাচ-গান নতুন নয়, তবু সে নাচ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। তিন চারটি গানের পর এ-দল আসর ছেড়ে বিশ্রামের জন্য অন্যত্র চলে গেল। তার পর এলো আর এক দল রমণী—তেমনি পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে। এরাও মধুর গানে-নাচে সকলকে মুগ্ধ করে দিল।

দ্বিতীয় দলের একটি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতাপ চমকে উঠলো! এ মেয়েটিকে মণিপুরী মেয়ে বলে মনে হয় না তো! বসন-ভূষণ অবিকল মণিপুরীদের মতো হলেও এর মুখের গড়ন সম্পূর্ণ অন্য রকমের! মণিপুরীদের চেহারার বৈশিষ্ট্য এ মেয়েটির কোথাও নেই!

অথচ প্রতাপের মনে হচ্ছিল, এ মুখের গড়ন তার খুবই পরিচিত। বহুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও প্রতাপ মনে করতে পারলো না ও-মুখ কার? কোথায় দেখেছে? একেই দেখেছে? না, এর মুখের মতো মুখ সে আর একটি মেয়েকে দেখেছে? এ মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, বয়স সতেরো-আঠারোর কম নয়। বেশ সুশ্রী চেহারা এবং অঙ্গ-দীপ্তি লাবণ্যে পরিপূর্ণ।

সুযোগ পাবামাত্র গৃহস্বামীকে এই বালিকার পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, প্রতাপের অনুমান ঠিক। এ বালিকা মণিপুরী নয়। এক ভদ্রলোক ছিলেন—লালা গিরিধারী; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস। এটি তাঁর কন্যা। মণিপুরী বস্তির এক প্রান্তে একখানা বাংলো তৈরী করে গিরিধারী বহু কাল সেখানে বাস করেন এবং তাঁর একমাত্র সন্তান কুসুমিয়া প্রতিবেশী মণিপুরীদের মত নাচ-গান শিখে তাদের মতো গড়ে উঠেছে। ঘরে তাঁত বসিয়ে কাপড়, গামছা, খেস বুননের কাজও শিখেছে! গৃহস্বামী আর বেশী কিছু বলতে পারলেন না; কারণ, তাঁকে তখনি অন্য কাজে যেতে হলো।

প্রতাপ বুঝতে পারলো না, এই মেয়েটির মুখের গড়ন তার পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে কেন! গিরিধারী বলে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় নেই! কে এ মেয়েটি?

রাত প্রায় বারোটায় প্রতাপ তার বাংলোয় ফিরলো। কুসুমিয়ার কথা ভুলতে পারলো না। ভাবলো, মিষ্টার গিরিধারী যখন কাছেই থাকেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ এক দিন হবেই। এবং খুব শীগ্‌গিরই একান্ত আকস্মিক ভাবে সুযোগ উপস্থিত হলো।

ঝুলন-উৎসবের চার-পাঁচ দিন পরে এক দিন সকালে প্রতাপ বন্দুক হাতে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে জঙ্গল-পথে বেড়াতে বেড়াতে এক ঝরণার কাছে এসে উপস্থিত হলো। ঠিক ঐ সময় বন-বিড়ালের তাড়া খেয়ে একটা খরগোস পালাতে পালাতে এসে পড়লো ঠিক তার পায়ের কাছে! প্রতাপ চট্ করে খরগোসটাকে ধরে ফেললো। খরগোসটা আর পালাবার চেষ্টা করলো না। ভাবে প্রতাপ বুঝতে পারলো এটি পোষা খরগোস। প্রতাপ তাকে আদর কোরে বুকে চেপে রাখলো। মুহূর্ত্ত পরেই ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো এক তরুণী। অকস্মাৎ ক'গজ দূরে অপরিচিত এক জন পুরুষকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পানে চেয়ে প্রতাপ চিনতে পারলো, তরুণী সেই ঝুলন-রাত্রির কুসুমিয়া। এবং খরগোসটা যে তারই বুঝতে বিলম্ব হলো না। প্রতাপ তখন এগিয়ে এসে বললো—"এই খরগোসটা বোধ হয় তোমার। পালাতে পালাতে আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছিল, ধরে ফেলেছি।"

খরগোস দেখে তরুণীর মুখ সম্মিত হয়ে উঠলো। তখনই হাত বাড়িয়ে খরগোসটাকে নিয়ে সে একেবারে বুকে চেপে ধরে বলে উঠলো, —পিয়ারি, মেরা পিয়ারি!" বার-কয়েক আদর করে প্রতাপের দিকে চেয়ে মেয়েটি বললো—"ভাগ্যিস আপনি সামনে এসে পড়েছিলেন, নইলে পিয়ারি আজ আর রক্ষা পেতো না। দু'দিন থেকে একটা বন-বিড়াল ওর পিছনে লেগেছে।"

—"খুব বেঁচে গেছে তাহলে। তুমি কাছেই কোথাও থাকো বুঝি?"

তরুণী সলজ্জ কণ্ঠে বললো—হাঁ, এই কাছেই আমাদের বাংলো। চলুন না আমার সঙ্গে। বাবা আপনাকে দেখে খুব খুশী হবেন।"

—তোমাকে সেদিন মণিপুরী পোষাকে ঝুলন-বাড়ীতে দেখেছিলাম। আজ দেখছি অন্য পোষাক। পশ্চিম-মুলুকে তোমাদের বাড়ী নিশ্চয়।

হুঁ। বাবার কাছে শুনেছি লক্ষ্ণৌয়ের ওদিকে আমাদের দেশ। আমি কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই এই পাহাড়ের দেশে বাবার সঙ্গে আছি।

—বেশ, চলো তোমাদের বাংলোতে। সেখানে আর কে আছেন?

পথ দেখিয়ে চলতে চলতে তরুণী উত্তর করলো—কে আবার থাকবে? বাবা আর আমি। আর থাকে দু'-তিন জন চাকর।

—কেন, তোমার মা? ভাই-বোন?

—না, সে সব কথা বাবার কাছে শুনবেন। আচ্ছা, আপনি কি পুলিশের লোক?

হেসে প্রতাপ বললো—না, আমি পুলিশের লোক নই। আমায় দেখে তোমার ভয় হচ্ছে না কি?

—না, ভয় হবে কেন? আমি পুলিশের লোককে ভয় করি না।

—তবে পুলিশের কথা তুললে যে?

—আপনার পরণে খাকি সার্ট, হাফ প্যাণ্ট, হাতে বন্দুক, মাথায় শোলার টুপি। তাই পুলিশ বলে মনে হয়েছিল।

ঈষৎ হেসে প্রতাপ বললো—না, আমি পুলিশ নই। আমি এখানকার স্পেশাল ফরেষ্টার।

—ফরেষ্টার মানে তো জংলি পুলিশ। তাহলে আমার ভুল হয়নি। বন-বিড়াল যেমন বিড়াল, জংলি-পুলিশও তেমনি পুলিশ বই কি!

—ফরেষ্টার শব্দটার এ রকম তর্জ্জমা তোমায় কে শিখিয়েছে?

—কেন, তর্জ্জমা ভুল হলো?

—ভুল নিশ্চয়, তবে লোকে যদি এই ভুল তর্জ্জমাই মেনে নেয় তাহলে আর উপায় কি? জঙ্গলের দেশে জংলি তর্জ্জমাই ঠিক।

—দেশশুদ্ধ লোক আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের সকলকে জঙ্গল-পুলিশ বলে জানে।

—আমিও যে তা জানিনে, তা নয়। কিন্তু ওটা যে ভুল, সেই কথাই তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম। যাক সে কথা। আচ্ছা, এই জঙ্গলের দেশে তুমি একা ঘুরে বেড়াও, ভয় করে না তোমার?

—আমি এই জঙ্গলেই মানুষ হয়েছি। ভয় আমার মোটে নেই। আপনাকে জংলি-পুলিশ বলেছি বলে যদি আপনার অপমান হয়ে থাকে, আমায় জংলি-মেয়ে বলে আপনি তার শোধ নিতে পারেন। বলেই সে হেসে ফেললো। সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলার সাহস দেখে অপরিচিতার সম্বন্ধে প্রতাপের কৌতূহল অনেকখানি বাড়লো। ঝুলন-রাতে একে দেখেছিল সম্পূর্ণ অন্য মূর্ত্তিতে। সেখানে তাকে চলতে হয়েছে মণিপুরী মেয়েদের অনুকরণ করে' কলের পুতুলের মতো, বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে তাল-মান-লয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশাসন মেনে! সে সময়কার হাসি, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে তার স্বাভাবিক মনোবৃত্তির

কোন সম্পর্ক ছিল না—সে ছিল তার নকল মূর্তি. আর এ তার স্বাভাবিক চেহারা! এই স্বাভাবিকতা ফুটে বেরুচ্ছিল তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়. মনের নির্ভীকতায় এবং অন্তরের স্নিগ্ধ সরলতায়। প্রতাপের আজও মনে হলো, এ চেহারা যেন তার পরিচিত! কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না. কোথায় কি অবস্থায় কখন্ সে এ চেহারা দেখেছে! তরুণীর কথার উত্তরে প্রতাপ বললো,—"তোমার কথায় আমি মোটেই অপমান বোধ করিনি, এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারো। লোকে যাদের জংলি-পুলিশ বলে জানে তুমিও যদি তাদের তাই বলো, তাতে অপমান বোধ করার কোনো কারণ থাকে না। কাজেই আমার শোধ নেবার কথা উঠতে পারে না। যাই হোক, তুমি যে নিজেকে জংলি-মেয়ে বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা করলে না এতেই প্রমাণ পাচ্ছি, সভ্যতায় 'জঙ্গলত্ব' ছাড়িয়ে তুমি অনেক ধাপ উপরের মানুষ। বাঃ, কি চমৎকার একখানা বাড়ী দেখা যাচ্ছে ঐ বাগানের মাঝখানে! ঐটেই তোমাদের বাংলো?

—হাঁ, পশ্চিম দিকের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে আছেন আমার বাবা।

ক'মিনিট পরেই দু'জন বাংলোতে এসে পৌছুলো। গিরিধারী পথের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি এখন পক্ককেশ দীর্ঘ-শ্মশ্রু বৃদ্ধ। মেয়ের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। কন্যা এসে ব্যস্ত ভাবে বল্লো,—"বাবা, পিয়ারি আজ গিয়েছিল আর একটু হলে,—বন-বিড়াল ওকে ঠিক ধরে নিয়ে যেতো! এই ভদ্র-লোক ভাগ্যে ওকে ধরেছিলেন, না হলে একে আর জ্যান্ত পাওয়া যেতো না। ইনি এখানকার স্পেশাল ফরেষ্টার। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ওঁকে নিয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধকে নমস্কার করে বিনীত ভাবে প্রতাপ বললো,—"আমার নাম প্রতাপ সিং। তিন মাস হলো আমি এখানে এসেছি। এখনও এখানকার ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকদের সবার সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গল—তার বুকে এমন চমৎকার বাংলো আছে—থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিল না! হঠাৎ আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই আপনার সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য ঘটলো।"

অতিথিকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে গিরিধারী বললেন,—"কুসুমিয়ার পিয়ারের পিয়ারিকে বুনো জানোয়ারের মুখ থেকে বাঁচিয়ে-ছেন, আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিন।"

—"এ তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য ধন্যবাদ কিসের?"

—"আপনার কাছে অতি তুচ্ছ হলেও আমরা এটাকে খুব বড় বলেই মনে করছি। এই খরগোসটা কুসুমিয়ার ভারী আদরের—ওর বিপদ হলে কুসুমিয়ার মনে খুবই আঘাত লাগতো।"

—"এতে আমার কৃতিত্ব নেই। বেচারা খরগোসটা ভয়ে পালাতে গিয়ে আমার পায়ের কাছে হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়লো, আমি তাকে তখনি ধরে ফেল্লাম। বুনো বেড়ালটাকে আমি দেখতে পাইনি। যাক্ সে কথা, আপনার মেয়ে যে তার খরগোস ফিরে পেয়ে খুসি হয়েছে, এতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।"

—"বেলা এখন প্রায় দুপুর হতে চলেছে, আপনার বোধ করি এখনও স্নানাহার হয়নি। আমাদেরও খাওয়া-দাওয়া হবে। আপনি দয়া করে আমাদের সঙ্গে বসে দু'টি খেয়ে নিলে খুশী হবো।"

প্রতাপ এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করতে পারলো না। হাত পা, মাথা ধুয়ে গিরিধারীর সঙ্গে আহারে বসলো। কুসুমিয়াও তাদের সঙ্গে বসলো। আহারের আয়োজন সামান্য হলেও গৃহস্বামী এবং তাঁর কন্যার অকৃত্রিম আন্তরিকতায় সেই সামান্য আয়োজনই প্রতাপের কাছে প্রাচুর্য্য এবং উপাদেয়তায় পরিপূর্ণ মনে হলো।

আহারের পর বারান্দায় বসে গিরিধারী তাঁর বনচারী জীবনের করুণ ইতিহাস সংক্ষেপে বললেন। বলবার সময় তাঁর দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। সেই মর্ম্মভেদী কাহিনী শোনাবার মতো লোক গিরিধারী বড় পেতেন না, তাই প্রতাপকে পেয়ে শুধু যে তিনি খুশী হয়েছিলেন তা নয়, তার কাছে দুঃখের কাহিনী বলবার সুযোগ পেয়ে তাঁর মনের গুরু ভার যেন অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে গেল। সব-শেষে তিনি বললেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, জানোয়ারে মীরাকে কখ্‌নো ধরে নিয়ে যায়নি, নিশ্চয় কোনো দুষ্ট লোক তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই দুষ্ট লোকের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতেই হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই জঙ্গলে বাস করছেন।

কাহিনী শুনে প্রতাপের মনে জেগে উঠলো নাগা-কুকির মতো পোষাক-পরা সেই যুবতীর কথা। সেই মেয়েটিই কি তবে গিরিধারীর কন্যা মীরা? অসম্ভব নয়। এতক্ষণে প্রতাপ বুঝতে পারলো কুসুমিয়াকে কেন তার পরিচিত বলে বোধ হয়েছিল। দু'জনের চেহারার তুলনা মনে হলো, পাহাড়ী পোষাক-পরা সুন্দরীর দেহ অসংস্কৃত হলেও তার রং কুসুমিয়ার চেয়ে ফরসা। কিন্তু সে যে মীরা, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত দু'জনের চেহারায় অনেক সময় আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হয়ে তরুণীর কথা সে গিরিধারীকে বলা উচিত হবে কি? এ রকম আশার কথা শুনলে নিশ্চয় তিনি খুব উৎসাহিত হবেন এবং বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল দেহ নিয়ে হয়তো এখনি তার সন্ধানের ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। এতখানি আশা আর উৎসাহ নিয়ে বেরিয়ে যদি দেখা যায় সে মীরা নয়, তা হলে গভীর নৈরাশ্যের আঘাত উনি সইতে পারবেন? এই সব ভেবে প্রতাপ সে-তরুণীর সম্বন্ধে গিরিধারীকে কিছুই বললো না, তবে মনে-মনে সংকল্প করলো, যদি সঠিক জানা যায়, সে-তরুণী অপহৃতা মীরা, তাহলে যেমন করে পারে তাকে নাগা-কুকিদের কবল থেকে উদ্ধার করে কন্যা-শোকাতুর পিতার হাতে এনে দেবে।

গিরিধারীর মতো কুসুমিয়াও এই অতিথিকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। হবার কথা। একমাত্র পিতা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে তার মেলা-মেশা করবার সুযোগ জীবনে মেলেনি। তার খেলার সাথী পশু—কুকুর, খরগোস, হরিণ আর গুটি কয়েক পায়রা, একটা কাকাতুয়া, একটা ময়না,—এ ছাড়া আধ মাইল দূরে মণিপুরী বস্তিতে ছিল ক'জন মণিপুরী মেয়ে—তাদের সঙ্গে সে নাচ-গান করতে ভালোবাসে।

বৃদ্ধ পিতা গিরিধারীই তার একমাত্র সাথী। ছোট হয়ে তার সঙ্গে তিনি খেলা করেন। এই মেয়েটিই তাঁর জীবনের একমাত্র বন্ধন। কুসুমিয়াকে তিনি যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষা দিতে ত্রুটি করেননি। তাঁরই সাহায্যে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান কুসুমিয়া লাভ করেছে এবং ইংরেজীতে সহজ ভাবে কথা বলতে এবং লিখতেও সে পারে।

অপরাহ্নে বিদায় নিয়ে প্রতাপ তার আপিসের দিকে রওনা হলো। গিরিধারী এবং কুসুমিয়া দু'জনেই তাকে বিশেষ ভাবে বার-বার অনুরোধ জানালেন, মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে এসে দু'-চার ঘণ্টা যেন কাটিয়ে যান। বাংলো থেকে প্রতাপের আপিস ছয়-সাত মাইল দূরে, সুতরাং তাঁদের সম্মিলিত উপরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি ছিল না।

ফেরবার পথে প্রতাপের শুধু মনে হচ্ছিল গিরিধারীর শোক-সন্তপ্ত জীবনের করুণ ইতিহাসের কথা, আর সেই সঙ্গে মনে জাগছিল পাহাড়ী পোষাক-পরা সেই তরুণীর স্নিগ্ধ মুখ! মীরা! তারো যদি এই নাম হয়, তাহলে সে যে গিরিধারীর নিরুদ্দিষ্ট কন্যা, তাতে সংশয় থাকতে পারে না। যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন তার বয়স ছিল সাত বছর! ও বয়সের অনেক কথাই তার মনে থাকবার সম্ভাবনা! বিশেষ নিজের নাম সে নিশ্চয় ভুলে যায়নি! প্রতাপ ভাবলো, এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে। [ক্রমশঃ

শ্রীরেবতীমোহন সেন

ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য

এই বার দেখা যাউক, এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য কি? ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—জীব জগৎ ঈশ্বর মুক্তি এবং তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়ে বেদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা। কারণ, এই ব্রহ্মসূত্র রচনার পূর্ব্বে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত প্রভৃতি যে সব দার্শনিক মতবাদ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে যথাযথ ভাবে বেদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ইহার কারণ, সর্বসাধারণ বুদ্ধির গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য উক্ত সাংখ্যাদি মতবাদের ভিত্তি কেবল বেদ বা উপনিষৎ ছিল না। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং যোগসিদ্ধ পুরুষের অনুভব প্রভৃতি প্রমাণগুলিও সেই সব মতবাদের ভিত্তি ছিল। কোন কোন স্থলে উক্ত মতবাদিগণের নিকট যোগিপ্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য বেদের প্রামাণ্য অপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত, কোন কোন স্থলে সমান বলিয়া গৃহীত হইত। বেদের প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রবল ইহা বিবেচিত হইত না। ইহার কারণ, বেদপ্রামাণ্যের প্রাধান্য উপলব্ধি করা সাধারণ বুদ্ধির বিষয় হয় না। মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি কতিপয় ঋষিসত্তম এই যোগিপ্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণাবলীকে অলৌকিক সর্ব্বকারণের কারণনির্ণয়ের পক্ষে সমর্থ মনে করিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল, জীবজগৎ এবং জগৎকারণের তত্ত্ব লৌকিক বস্তু হইতে পারে না। যাহা সকলের মূল কারণ, তাহাকে অলৌকিকত্ব না বলিলে চলে না।

ইহার একটি কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সকলের মূলকারণ নির্ণয় করিবেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজের কারণও নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কেহই নিজের কারণ নিজে নির্ণয় নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে করিতে পারেন না। যেহেতু, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণই থাকে, কার্য্যের পূর্ব্বে সেই কার্য্য কখনই থাকিতে পারে না। অতএব সকলের মূল-কারণ নির্ণয় কাহারও পক্ষে সম্ভবপরই হয় না।

যদি বলা যায়—অংশের ধর্ম্ম বা কার্য্যের ধর্ম্ম দেখিয়া অংশীর ধর্ম্ম বা কারণের ধর্ম্ম নির্ণয়রূপ অনুমান দ্বারা নিজে নিজের কারণ নির্ণয় করিবার, অথবা সর্ব্বকার্য্যের কারণ নির্ণয় করিবার প্রয়াস করিব, কিন্তু তাহাতে সম্ভাবনা মাত্রই সিদ্ধ হইবে, তাহাতে মূল কারণটি অদ্বৈত একটি বস্তুর স্বরূপ—এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার মধ্যে কোন একটি কার্য্য বস্তুর কারণ, অনুমান দ্বারা নির্ণেয় হইলেও সকলের মূল কারণ নির্ণয় কোনরূপেই অনুমানাদির দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণেও কার্য্যাতিরিক্ত ধর্ম্ম কিছু থাকে, এবং কার্য্যেও কারণাতিরিক্ত ধর্ম্ম কিছু থাকে, এজন্য কার্য্য দেখিয়া কারণের একদেশ মাত্র নির্ণয় হয়, সমগ্র নির্ণয় হয় না। তদ্রূপ অংশ দেখিয়া অংশীর নির্ণয়ও সমগ্র ভাবে হয় না। ইহাকেই অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় বলা হয়। এই কারণে অনুমান দ্বারা সকল কারণের কারণ নির্ণয় হয় না। এই কারণে অনুমান-প্রধান সাংখ্যমতে জগতের মূল কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি বলা হয়, এবং ন্যায়মতে পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল, জীবাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বহু বস্তুকে মূল কারণ বলা হয়। বৌদ্ধাদিমতেও কারণ বহুই বলা হয়। এইরূপ সর্বত্র মতভেদ ঘটিয়াছে।

ইহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, দেখা যায়, অর্থাৎ যাহা যাহার উপাদান কারণ হয়, যেমন ঘটের পক্ষে মৃত্তিকা উপাদান কারণ হয়, সেই উপাদান কারণের কোনরূপ বিকৃতি না হইলে কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। অতএব বিকৃত কার্য্যবস্তু দেখিয়া তাহার অবিকৃত কারণরূপের নির্ণয়ের সম্ভাবনাই নাই। দুগ্ধের জ্ঞানহীন ব্যক্তি দধিমাত্র দেখিয়া দুগ্ধ নির্ণয় করিতে পারে না। অতএব অনুমান দ্বারা সর্ব্বকারণের কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় না।

যদি বলা যায়, উপাদান কারণের স্বরূপের বিকৃতি না হইলেও তাহার ধর্ম্মবিশেষের বা অবস্থাবিশেষের বিকৃতি হইলেও কার্য্য উৎপন্ন হয়—বলা যায়। তাহাকেই উৎপত্তি বলা হইবে। কিন্তু তাহাও সঙ্গত কথা হয় না। কারণ, এরূপ স্বীকার করিলে ধর্ম্ম, ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে—ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে না। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে বলিয়া দেখা যায়, সেই ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মীর নিজের ধর্ম্মই নহে। যে ধর্ম্ম আগন্তুক বা আরোপিত বা কল্পিত, তাহাই তথাবিধ ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে বলিয়া দেখা যায়। অতএব ধর্ম্মমাত্রের বিকৃতির দ্বারা উৎপত্তি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। জলের উষ্ণতা-ধর্ম্ম চলিয়া গেলে জল বরফে পরিণত হয়, বরফ-রূপ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়—ইহাও বলা যায় না। কারণ, জলের উষ্ণতা তেজেরই ধর্ম্ম, তাহা জলের ধর্ম্মই নহে। উহা জলে আগন্তুক ধর্ম্ম বা আরোপিত ধর্ম্মই বলিতে হইবে। অতএব ধর্ম্ম বিকৃতির দ্বারা উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অবস্থা সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়। অবস্থাও ধর্ম্মবিশেষই বলা যায়। এইরূপ নানা

কারণে স্বীকার করিতে হয়, উপাদান কারণের স্বরূপের বিকৃতি না হইলে কার্য্যোৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না। উপাদান কারণের ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের বিকার দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। আর বিকৃতি মাত্র দেখিয়া প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব হয় না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আবার কারণের বিকৃতি ঘটিলে কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে কার্য্যের মধ্যে উপাদান কারণের থাকা আর সিদ্ধ হয় না। অথচ কার্য্যের মধ্যে উপাদান কারণের স্থিতি না হইলে কার্য্যই থাকিতে পারে না। যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, ঘটের মধ্যে না থাকিলে ঘটই থাকিতে পারে না; বস্ত্রের উপাদান কারণ তন্তু, বস্ত্রের মধ্যে না থাকিলে বস্ত্রই থাকিতে পারে না। এই কারণে কার্য্যমধ্যে উপাদান কারণের স্থিতি আবশ্যক। আবার পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাদান কারণের বিকৃতি না ঘটিলে কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। উপাদান কারণের ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের বিকৃতি কল্পনা করিলেও বাধা হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব উপাদান কারণের ধর্ম্ম বা অবস্থাবিশেষের বিকৃতি হয় বলিয়া কার্য্যোৎপন্ন হয়, ইহাও বলা চলে না। এইরূপে দেখা যাইতেছে, উপাদান কারণের বিকৃতি স্বীকার করিলেও অসঙ্গতি হয়, এবং উপাদান কারণের বিকৃতি অস্বীকার করিলেও অসঙ্গতি হয়।

এইরূপ নানা কারণে জীব ও জগতের কারণনির্ণয় লৌকিক বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর তজ্জন্য তাহাকে অলৌকিক বিষয়ের মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে। আর এই অলৌকিক বিষয়ের নির্ণয় অলৌকিক উপায়েই করিতে হইবে। লৌকিক উপায়ে তাহার নির্ণয় সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ, এই অলৌকিক উপায়ই বেদ। ঈশ্বরই এই বেদ জীবজগৎমধ্যে প্রচার করিয়াছেন, এই জন্যই জীবগণ তাহার সন্ধান পাইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া এই বেদ সর্ব্বদাই তাঁহার জ্ঞানে ভাসমান রহিয়াছে। এই জন্যই এই বেদকে অলৌকিক উপায়মধ্যে গণ্য করা হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া অপৌরুষেয় ঈশ্বরপ্রোক্ত অলৌকিক প্রমাণ বা উপায়স্বরূপে বেদকেই এই অলৌকিক সত্য-নির্ণয়ের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। আর তাহার ফলে তিনি বেদকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া মানিয়া প্রত্যক্ষ অনুমান ও যোগিপ্রত্যক্ষকে বেদের অধীন প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া অর্থাৎ বেদবিরোধী প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া এই বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন। এজন্য উপনিষৎ বা বেদান্তপ্রমাণকে শিরোধার্য্য করিয়া দার্শনিক সত্যনির্ণয় করাই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্যরূপ প্রমাণ বেদরূপ প্রমাণ হইতে প্রবল হইলেও অলৌকিক বিষয়ে তাহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত শ্রুতিপ্রমাণের সমকক্ষও হইতে পারে না। লৌকিক বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণকে অনুবাদক বলা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য বিষয়কে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করিলে সেই বর্ণনাকে অনুবাদক বলা হয়। এই কারণে অনুবাদককে প্রমাণমধ্যেই গণ্য করা হয় না। যেহেতু, যাহা লোকে চক্ষু কর্ণ দ্বারা নিজে নিজে জানিতে পারে, তাহাকে পরের মুখে শুনিয়া কে জানিতে চাহে? এই কারণে অনুবাদককে প্রমাণ বলা হয় না। এই কারণে অলৌকিক বিষয়ে বেদ প্রমাণে একমাত্র অবলম্বনীয়, ইহাই ব্যাসদেব স্থির করিলেন। আর তাহার ফলে ব্যাসদেব শ্রুতিপ্রমাণকে সর্ব্বোপরি করিয়া এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ রচনা করিলেন। এজন্য ইহাই ব্রহ্মসূত্ররচনার একটি উদ্দেশ্য বলা হয়।

যদি বলা হয়, বেদার্থনির্ণয়েও মতভেদ যখন বর্ত্তমান, তখন কেবল বেদার্থ অবলম্বনে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব বেদকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে?

ইহার উত্তর এই যে, বেদের অধিকসম্মত অর্থনির্ণয় সম্ভবপর হইতে পারে, সর্ববাদিসম্মত অর্থনির্ণয় সম্ভবপর না হইলেও অধিক-সম্মত অর্থনির্ণয় অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, তাহাই দেখাও যায়। আর সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেই বা অধিকসম্মত হইলেই যে সত্য হইবে, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। অজ্ঞের সংখ্যাই অধিক হয়, বিজ্ঞের সংখ্যাই অল্প হয়। কিন্তু তাহা যাহাই হউক, বেদের একবাক্যতার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুমানাদির অলৌকিক বিষয়ে একরূপতার সম্ভাবনাই নাই। অতএব বেদার্থের একবাক্যতার দ্বারা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা অসম্ভব হয় না। এজন্য বেদার্থে আপাততঃ মতভেদ দেখিয়া বেদার্থ হইতে সত্যনির্ণয় হইতে পারে না, একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ, বেদার্থনির্ণয়ে অধিকসম্মত উপায় মহর্ষি জৈমিনি এবং মহর্ষি বেদব্যাসই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ইহা অমান্য করিলে যজ্ঞাদি কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না। বেদপ্রদাতা ব্রহ্মাই বেদার্থানুযায়ী যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া জীবকে বেদার্থশিক্ষা এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে নিয়মের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মা বেদার্থ প্রকাশ করিয়া বেদার্থানুযায়ী যজ্ঞাদিকর্ম্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মই মহর্ষি জৈমিনি ও মহর্ষি বেদব্যাস আবিষ্কার বা অবলম্বন করিয়া বেদার্থনির্ণয়ের নিয়ম তাঁহাদের মীমাংসাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদার্থনির্ণয়ের এই নিয়ম অনুসরণ না করিয়া বেদার্থ করিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রম প্রভৃতি অন্যথা হইয়া যাইবে। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানই যথাযথ ভাবেই হইবে না। এবং যজ্ঞাদির ফললাভও হইবে না। যেমন ব্যাকরণের সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিলে পদ সিদ্ধই হইবে না, সুতরাং সিদ্ধপদ অনুসারে যেমন ব্যাকরণের সূত্রের অর্থ করা হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের অনুসারেই বেদার্থ করিতে হয়, অন্যথা করিলে যজ্ঞানুষ্ঠানই হইবে না, আর তজ্জন্য তাহার ফলও হইবে না। আর বেদবাক্যের অর্থ করিবার এই যে নিয়ম, তাহা যে কেবল বেদেই প্রযোজ্য হইবে, তাহা নহে, ইহা লৌকিক বাক্যের অর্থনির্ণয়েও প্রযোজ্য। এই জন্য এই নিয়মকে লোকবেদসাধারণ নিয়ম বলা হয়। ইহার কারণ, আমাদের যে ভাষা তাহা বেদের ভাষার অনুকরণ, বেদের ভাষা দেখিয়াই আমরা ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। এইজন্যই বেদের অর্থ-নির্ণয়ের যে নিয়ম তাহা লোকবেদসাধারণ নিয়ম হওয়াই আবশ্যক। ব্রহ্মার এই যে যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই যে বর্ণাত্মক ভাষার শব্দার্থ-নির্ণয় ইহাই শিষ্টাচারের মূল। এই কারণে শিষ্টাচার ও বেদার্থ অবিরোধী হয়। আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচারের দ্বারাই ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। আর তজ্জন্য শিষ্টাচারে বা বেদার্থে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে একের সাহায্যে অপরটিকে নিঃসন্দিগ্ধ করা হয়। শিষ্টাচারে কোন সন্দেহ বা ভ্রম জন্মিলে বেদার্থ বা স্মৃতি

তাহার সংশোধন করে, এবং বেদার্থে কোন সন্দেহ বা ভ্রম উপস্থিত হইলে শিষ্টাচার ও স্মৃতি তাহার নিবারণ করে। এই জন্যই "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিবে এবং যবাগূ পাক করিবে—এই বিধির স্থলে শিষ্টাচার অনুসারে অগ্রে অগ্নিহোত্র না করিয়া এবং পরে যবাগূ পাক না করিয়া অগ্রে যবাগূ পাক করিয়া পরে অগ্নিহোত্র হোম করা হয়। এই কারণেই যে শিষ্টাচার রহিয়াছে, অথচ বেদবিধান পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে তদ্‌বোধক বেদবিধি অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা। এই শিষ্ট বলিতে যাঁহারা বেদ অনুসারে সর্ব্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা। অতএব জৈমিনি ও ব্যাসদেব-আবিষ্কৃত যে বেদার্থনির্ণয়ের নিয়ম, তাহা শিষ্টাচার-পরীক্ষিত নিয়ম। তাহার অন্যথা করা হয় না। আর বেদার্থ-নির্ণয়ের এই নিয়ম থাকায় বেদার্থ সর্ববাদিসম্মতরূপে আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিতে মতভেদ অনপনেয় বলিয়া তাহার দ্বারা যাহা নিয়ম করা হয়, তাহাতে মতভেদের নিরাকরণ করা সম্ভবপরই হয় না। এই কথাই মহর্ষি বেদব্যাস "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদি ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ১ম সূত্রে বলিয়াছেন। ইহাতেই বলা হইয়াছে, কপিলের সহিত যখন মনুর মতভেদ দেখা যায়, তখন স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ বেদভিন্ন অন্য উপায়ে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা শ্রুত্যর্থের অন্যথা করা যায় না। এই কারণে বেদার্থের সর্ব্ববাদিসম্মত বা অধিকসম্মত অর্থ অবগত হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত বা অধিকসম্মত বিষয়ে উপনীত হইতে পারা যায় না। বস্তুতঃ, এই কারণেই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত শূন্যবাদে পরিণত হইয়াছে, অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদী হইয়াছে। কেহ বলেন,—বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান উভয়ই বিদ্যমান, কেহ বলেন—কেবল বিজ্ঞানই বিদ্যমান, কেহ বলেন—সকলই শূন্য, কিছুই বিদ্যমান নাই। বেদ না মানিয়া তাঁহারা বুদ্ধবাক্য দ্বারা বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা কিছুই সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। আর তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে একদল নিরুপাখ্য শূন্য তত্ত্বই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্য সকলে তাহার বিরোধী হইয়াছেন। কেহ বা সামঞ্জস্য করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন।

যদি বলা যায়, জীব ও জগতের মূল কারণকে অলৌকিক বলিব কেন? উহাকেও লৌকিক বস্তুই বলিব। যেহেতু, উপাদান কারণ বিকৃত না হইলে কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। আর জগৎ যে কার্য্য পদার্থ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সুতরাং জীব ও জগতের মূল কারণকে অবিকারী বস্তু বা অলৌকিক বস্তু বলাই ভ্রম। আর জীবজগতের মূল কারণ যদি অলৌকিক বস্তু না হয়, তবে তাহার নির্ণয় করিবার জন্য অলৌকিক উপায়স্বরূপ বেদের শরণ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাই বা কেন?

এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, জীব ও জগতের কারণকে অলৌকিক বস্তু নহে—ইহা বলিবার কোনও উপায় নাই। উহাকে অলৌকিক বস্তু বলিতেই হইবে। কারণ, প্রথমতঃ উপাদান কারণ বিকৃত না হইলে যেমন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ কার্য্যমধ্যে উপাদান কারণ অবিকৃত ভাবে না থাকিলেও কার্য্য বস্তু থাকিতে পারে না। যেমন মৃত্তিকার বিকার না হইলে ঘট উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ঘটমধ্যে মৃত্তিকা মৃত্তিকারূপে যদি না থাকে, তাহা হইলেও ঘট বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যাহা বিকৃত হয়, তাহা ত আর নিজ স্বরূপে থাকে না। যেমন দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি উৎপন্ন হইলে দুগ্ধ আর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তদ্রূপ, ধর্ম্ম যেমন ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকে না, উহাদিগকে অপৃথকই বলিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন না হইলেও ধর্ম্মী বস্তুর কার্য্যরূপতা সিদ্ধ হয় না। আর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তন হইবে না—ইহা বলিতে গেলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীকে পৃথক্‌ই বলিতে হয়, ধর্ম্মকে ধর্ম্মী ছাড়িয়া থাকিতেই হয়। এইরূপে কারণের বিকার এবং অবিকার উভয়ই স্বীকার করিতে হয় বলিয়া এবং ধর্ম্মের ধর্ম্মীকে ত্যাগ এবং অত্যাগ উভয়ই স্বীকার করিতে হয় বলিয়া এবং কারণের কার্য্যমধ্যে থাকা না থাকা উভয়ই স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ মধ্যে বিরোধই স্বীকার করিতে হয়। আর তজ্জন্য জীব ও জগতের মূল কারণকে আর লৌকিক বস্তু বলিতে পারা যায় না। উহাকে অলৌকিক বস্তুই বলিতে হয়। তাহার পর বিকারী বস্তুকে জীব ও জগতের কারণ বলিলে সমগ্র জগতের কারণের কথাই আর বলা হইবে না। বিকার ও কার্য্য একার্থক। যেহেতু, কারণ যদি বিকারী হয়, তাহা হইলে তাহাও কার্য্যপদবাচ্যই হয়। এ জন্য যাহা কারণ পদবাচ্য হয় তাহাকে আমরা নিত্য বলিতে বাধ্য হই। পক্ষান্তরে, নিত্যের বিকার সম্ভবই হয় না। সুতরাং এই সকল কারণেও সমগ্র জীব-জগতের মূল কারণকে অলৌকিকই বলিতে হয়।

আর অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় একই কথা। আর যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা বস্তু দেখা যায়, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেমন রজ্জুতে সর্প খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাও তদ্রূপ। এখন জীব ও জগতের কারণ যদি অলৌকিক বা অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বস্তুই হয়, তবে তাহার যে অধিষ্ঠান, অর্থাৎ মিথ্যা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে সত্য বস্তুই বলিতে হয়। মিথ্যা কখন সমান বা অধিক মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, মিথ্যার আশ্রয়ের মূলে সত্যই থাকে, অথবা অপেক্ষাকৃত সত্যই থাকে। সকল মিথ্যার মূলে পূর্ণ সত্য বস্তুই বর্ত্তমান থাকে। এই পূর্ণ সত্য বস্তুর কথাই বেদ বলিয়া দিয়াছেন। বেদ এই পূর্ণ অবিকারী সত্য বস্তুর সন্ধান না দিলে, ইহার সত্তার কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না। আমরা মিথ্যার আশ্রয় ও মিথ্যা বস্তুকে লইয়া অজ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিতই থাকিতাম। এই কারণেই এই সত্য বস্তুর নির্ণয় আমাদিগকে বেদ অবলম্বনেই করিতে হয়।

এই বেদ নিত্য শব্দরাশি, ইহা অভ্রান্ত, অনাদি এবং ঈশ্বরপ্রোক্ত মাত্র, অপৌরুষেয় বাক্য। ইহাই অলৌকিক বিষয় নির্ণয় করিবার অলৌকিক উপায়। এইরূপ বিচার করিয়াই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ হইতে মহর্ষি বেদব্যাস পর্য্যন্ত ঋষি মনীষিবৃন্দ বেদ অবলম্বনেই সেই চরম সত্য বস্তুর নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর সেই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস বেদার্থ মীমাংসামূলক এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদার্থের মীমাংসামুখে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থরচনার ইহাও একটি উদ্দেশ্য অথবা ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থরচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্ত এক সহস্র উপায় নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বমীমাংসা নামক দর্শন রচনা করিলে মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যের এই কার্য্যে বেদান্তার্থ বিচার সম্বন্ধে উক্ত উপায়সমূহ মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটী দেখিলেন এবং সেই ত্রুটী সংশোধনের নিমিত্ত স্বয়ং এই উত্তরমীমাংসা দর্শন রচনা করিলেন। বেদার্থনির্ণয়ের জন্ত বেদবাক্যের বলাবল বিচারের যে শ্রুতিলিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যা নামক ছয়টি প্রমাণ—মহর্ষি জৈমিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে 'সমাখ্যা' হইতে স্থান, স্থান হইতে প্রকরণ, প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতি প্রমাণকে বলবৎ প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাতেও যে স্থলবিশেষে অন্তথা হইয়া থাকে, তাহাই মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার উত্তর-মীমাংসামধ্যে প্রদর্শন করিলেন, এবং তদনুসারে বেদান্তবাক্যের অর্থ নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি জৈমিনি বেদান্তবাক্যের বিচার তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসায় করেন নাই; মহর্ষি বেদব্যাস তাহা তাঁহার উত্তর-মীমাংসায় করিলেন। এতদ্ব্যতীত এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থমধ্যে মহর্ষি জৈমিনির নাম করিয়াই মহর্ষি বেদব্যাস বহু সিদ্ধান্তের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় ব্রহ্ম-মীমাংসার পক্ষে যে সব ন্যূনতা ঘটিয়াছিল, তাহার সংশোধন করাই মহর্ষি বেদব্যাসের এই ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থরচনার অপর একটি উদ্দেশ্য।

এইরূপে গুরু-শিষ্যের যত্নে বেদার্থমীমাংসার একটা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সনাতন শিষ্টাচারসম্মত একটি উপায় লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে বেদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ মধ্যে নানা ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ করিয়াছিল, আর তাহার ফলে যাগ-যজ্ঞাদি যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইত না, আর তজ্জন্ত যাগ-যজ্ঞাদি জন্ত অভীষ্ট ফল লাভও ঘটিত না। বেদান্তের উপাসনাকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে নানা সংশয়, বিপর্য্যয় এবং তজ্জন্ত নানা মত মতান্তরের উদ্ভব হইতেছিল, তাহারও প্রতীকার হইল। এইরূপে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা সংস্কারসাধনই মহর্ষি বেদব্যাসের এই ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থরচনার একটি উদ্দেশ্য।

এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ রচনার এই উদ্দেশ্য না জানিয়া ইহার পাঠের ফল কি, এবং জানিয়া পাঠ করিবারই বা ফল কি? প্রথমতঃ, বেদের অলৌকিক বিষয়ে প্রামাণ্য, ইহা জানিয়া ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ হইতে একমাত্র অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপলব্ধ হইবে, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈতাদি কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হইতে পারিবে না। কারণ, তত্তন্মতে ব্রহ্ম বিষয়ে যোগি-প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সব প্রমাণ, দ্বৈতকেই অবগাহন করে, অদ্বৈতকে বুঝাইতে পারে না। এজন্ত তত্তন্মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ও অদ্বৈত বস্তু হইতেই পারে না। অর্থাৎ তত্তন্মতে ব্রহ্ম লৌকিক বিষয়মধ্যেই পরিগণিত হন, অলৌকিক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হন না। বেদ যদি দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতকে প্রতিপাদন করে, তবে বেদ অনুবাদক মধ্যেই গণ্য হইয়া যায়। অনুবাদক হইলে তাহার আর প্রামাণ্যই থাকে না। বেদের প্রামাণ্য যদি মানিতে হয় তাহা হইলে বেদের প্রতিপাদ্যকে অদ্বৈতই বলিতে হইবে। যাহা দেখা যায়, যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা দ্বৈতই হয়, তাহার সিদ্ধির জন্ত বেদের কি প্রয়োজন? এজন্ত বেদের প্রতিপাদ্য অলৌকিক অদ্বৈত বস্তু, আর তাহাই ব্রহ্মসূত্রেরও তাৎপর্য্য বলা হয়। আর এই কারণে উপাসনা মধ্যে অভেদে উপাসনারও স্থান হইয়া থাকে। অন্ত মতে অভেদ উপাসনার স্থান নাই। ব্রহ্মসূত্ররচনার ইহাই একটি উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, সূত্রার্থ নির্ণয়কালে ব্রহ্মসূত্র রচনার উদ্দেশ্যের জ্ঞান থাকিলে সূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে সুবিধা হয়। কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থমধ্যে এমন কতিপয় সূত্রও আছে, যাহাতে আপাততঃ দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতবাদ সমর্থিত হয়, মনে হয়; কিন্তু এমনও কতিপয় সূত্র আছে, যাহাতে অদ্বৈত মতই স্পষ্ট ভাবে প্রতীত হয়। এরূপ স্থলে অন্ত মতসমর্থক সূত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত মতানুকূলরূপে বুঝিতে সহায়তা হয়। তদ্রূপ যে সব সূত্রের অর্থ উভয় মতের অনুকূল হইতে পারে, তাহাদিগকে অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। শাব্দবোধে তাৎপর্য্য-জ্ঞান একটি হেতু। এ জন্ত ব্রহ্মসূত্রের রচনার উদ্দেশ্য জানা থাকিলে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি জানা হয়, আর সেই তাৎপর্য্য-জ্ঞান বলে ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এইরূপ নানা কারণে ব্রহ্মসূত্রের রচনার উদ্দেশ্যের জ্ঞান, ব্রহ্মসূত্রের পাঠে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে বহু বাধা হইয়া থাকে।

এই বার আমরা দেখিব, ব্রহ্মসূত্র-রচনার জন্ত কিরূপ কৌশল মহর্ষি ব্যাসদেব অবলম্বন করিয়াছেন।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

তবু

তরুণ ছিলেম; বুড়া হইনিকো আজো—
এ বয়সে দেখিলাম অন্তায়ের পীড়ন—

স্বাস্থ্য তার হলো পঙ্গু! অন্তায়ের জয়;
অধর্ম্ম কাড়িয়া লয় ধর্ম্মের আসন!
দেখেছি নগর-গ্রাম—জীবের আশ্রয়
বন্দুকে-সঙ্গীনে হলো জীর্ণ মরু প্রায়;
পথ চূর্ণ, ক্ষুদ্র কীট! বাঁচিল না সে-ও!
জাগ্রত বিধাতা সব দেখিতেছে, হায়!
দেখেছি সোনার ক্ষেত,—সবুজের বিভা—
গন্ধে-বর্ণে পৃথিবীর অপূর্ব্ব সুষমা!

ফল-ফুল ঝরে গেল,—আলো গেল মুছে!
কানন বিশুষ্ক হলো—শ্মশান-উপমা!
বিধাতা দেখিছে সব শত চক্ষু মেলি!
তবু মোরা রচি স্বপ্ন! মিলায় স্বপন!
প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে যারে ভালোবাসি,
আঘাতে সে ভেঙ্গে চূর্ণ করে প্রাণ-মন!
বিশ্ব তবু বেঁচে আছে! প্রীতি-হাসি-গান
এ বিশ্বের বুকে জাগে!...বিচিত্র বিধান!

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

গৌরগীতি সাহিত্য

শ্রীচৈতন্ত রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার—কখনও তিনি কৃষ্ণভাবে বিভাবিত—কখনও রাধাভাবে বিভাবিত! ব্রজলীলার প্রত্যেক অঙ্গটি শ্রীচৈতন্তের জীবনে প্রকটিত—তাঁহার দেহ-মনের রঙ্গমঞ্চে যেন সমগ্র ব্রজলীলাই অভিনীত হইয়াছে। ভক্ত কবিগণ তাই ব্রজলীলার অনুসরণে গৌর-লীলার পদ রচনা করিয়াছেন। এইগুলিই অনুরূপ ব্রজলীলার সহিত গীত হয় গৌরচন্দ্রিকারূপে। গৌরলীলার পদেও পদাবলীর মত রূপানুরাগ, বিরহ, মান, মিলনানন্দ ইত্যাদিও প্রকটিত হইয়াছে।

এখানে একটি উদাহরণ দিই—চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বরাগ প্রসঙ্গে লিখিলেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়॥

রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিলেন—

ত্বমুদবাসিতাম্নিজ্ঞামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসাশ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরী দৃশোর্দ্ধয়ং॥

নব-অনুরাগিণী শ্রীরাধার এই উন্মনস্কভাবের অনুকরণে গৌর-চন্দ্রিকা গীত লিখিত হইল—

আজ হাম কি পেখিনু নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বদন অবলম্ব।
পুন পুন গতায়ত করু ঘর পন্থ।
ক্ষণক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছলছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত বিকাশ।
পুলকমুকুলবর ভরু সব দেহ।
এ রাধামোহন কছু না পায়ল থেহ।

রাধার স্বয়ংদৌত্য বা অভিসারযাত্রার অনুসরণে রাধামোহন গৌরচন্দ্রিকায় লিখিলেন।

বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ বামপদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন অগোরই গজগতি চলু অনিবার।

গৌরাঙ্গের সহচরগণকে ব্রজের সখা-সখীর অবতার বলিয়া ঐ লীলার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। গদাধরকে রাধা কল্পনা করা হইয়াছে। এই ভাবে বহু পদ রচিত হইয়াছে। ভক্ত কবিগণ ইহাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। ব্রজগোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপে আত্ম-হারা হইয়া সংসার ধর্ম বিস্মৃত হইত—তাহাদের পাতিব্রত্য ধর্ম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত—নদীয়া নাগরীগণও যেন গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতেছে—এই ভাবে ভক্ত কবিরা বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া সত্য সত্যই নদীয়ার কুলবধূগণের সতীধর্ম বিচলিত হইত। ইহা কেবল কবিকল্পনা মাত্র। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথম উদ্দেশ্য গৌরাঙ্গের অলোকসামান্ত রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ব্রজলীলার অন্ধ অনুসৃতি।

কোন পুরুষের রূপবর্ণনা করিয়া কবিরা যখন কিছুতেই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতেন না—তখন তাঁহারা নারীগণের পক্ষ হইতে সেই রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখাইয়া রূপের অলোকসামান্ততার প্রতিপাদন করিতেন—ইহাই ছিল বঙ্গসাহিত্যের একটি মামুলী প্রথা। কবিরা দেখাইতেন, কাব্যের নায়কশ্রেণীর কোন রূপবান্ পুরুষ পথ দিয়া পদব্রজে, দোলায় বা রথে চলিয়া গেলে পথের দুই ধারের বাতায়ন-পথবর্ত্তিনী নাগরীরা সে রূপদর্শনে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে—মনে মনে রূপবান্ পুরুষকে যেন হৃদয়ে বরণ করিতেছে। এই বর্ণনায় যে কুলবধূদের সতীধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা হইতেছে—এ কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা কন্দর্পের প্রভাবকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতেন। ইহার মধ্যে সত্যও থাকিতে পারে—কিন্তু এরূপ নগ্ন সত্যকে কাব্যে স্থান দেওয়া অশোভন কি না তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না! এই প্রথাই পরে "পুরনারীদের পতিনিন্দা" নামক জঘন্ত পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল। গৌরলীলার পদরচনাতেও নারীগণের চিত্তচাঞ্চল্যের বর্ণনা একটা প্রথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া আধ্যাত্মিক সার্থকতাও কিছু আছে। প্রেমের ঠাকুরের প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল আপামর সাধারণ সকলেই। সে কথা বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্তের রূপ ও নদীয়া-নাগরীদের মুগ্ধতার রূপকাত্মক ভাষায়। ইহা যে রসসৃষ্টির কৌশলমাত্র, অনেক ভণিতায় তাহার ইঙ্গিত আছে। যেমন—

'নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে।'

কবিরাও নিজেরাই নাগরী। লোচন নিজেই বলিয়াছেন—রসিক ছাড়া এই তত্ত্ব কেহ বুঝিবে না।

কুল খোওয়াবি বাউরী হবি লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ।

এখানে কুলবতী সতীর অর্থ সংসারাশ্রমে আসক্ত শত সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধমতি। "রূপসাগরে সবই গেল ভেসে" এখানে রূপ-সাগরের অর্থ হরিপ্রেমের সাগর।

লোচনের অনেক পদে রহস্যময়ী ভাষায় লোকোত্তর ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত আছে—

আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো।
এ দেশে ত কবাট দিলে সে দেশ ত পাই।
বাহির গাঁয়ে কাজ নাই সই ভিতর গাঁয়ে যাই।
সাপের মণি বার করলে হারাই যদি মণি।
মণিহারা হলে তবে না বাঁচয়ে ফণী।
যতন ক'রে রতন রাখো বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকি দিতে হয়।
লোচন বলে ভাবিস কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর।

লোচন ভগবানের প্রতি ভক্তের আকুতির কথাও গোরাচাঁদ ও নদীয়া-নাগরীদের মারফতেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

নবদ্বীপ নাগরী আগরি গোরারসে
কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে !
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা-গোরা-গোরা।
গোরা রূপগুণ অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশা গোরা বিনা আর নাহি জানে।
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়।
যতন করিয়া গোরানাম লেখে তায়।
গোরোচনা হরিদ্রার পুত্তলি রচিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া।
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে দুনয়নে।
তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দুচরণে।
পীরিতি নৈবেদ্য তাতে বচন তাম্বুল
পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল।
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে।
কম্পন শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিকে।
অঙ্গ গন্ধ ধূপ-ধূনা রহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ পরশ রস মাগে।
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান শেল গেল।

শুধু তাহাই নয় গৌরাঙ্গের পক্ষ হইতে উদ্দীপনা-দানের কথাও আছে। নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে হেলিতে দুলিতে তিনি সুবোধ ছেলের মত যাতায়াত করেন না।*

১। অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে বরিখে কুসুমশর সাথে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাওব জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে।
২। হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে। কৈল ঠাঃঠারি কি রস রঙ্গে।
৩। রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মন দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয়।

এ সমস্তও রসসৃষ্টির কৌশল বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

ব্রজলীলার অনুকরণে গৌরলীলার পদে ননদী শাশুড়ীও আছে। তবে নদীয়ার ননদী ব্রজের ননদীর মত নয়, সেও মাঝে মাঝে বাউরী হয়। আর নদীয়ার শাশুড়ী ব্রজের শাশুড়ীর মত নিঠুরা নয়। নদীয়ায় যমুনার বদলে সুরধুনী আছে। নাগরীদের গাগরী-ভরণের সমস্যা দুই স্থলেই এক। ব্রজ ও নদীয়া দুই ঠাঁইয়ের নাগরীদের একই কথা।—কেবল কালার স্থলে গোরা আর কালো যমুনার স্থলে গোরা সুরধুনী।

কি খেনে দেখিনু গোরা　　নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল　　কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে।

ব্রজলীলায় যে রসের কথা কোকিলকূজিতকুঞ্জ-কুটীরের চিত্র দিয়া বলা হইয়াছে—এখানে স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া বলিতে হইয়াছে। স্বপ্নের দোহাই দিতে হইয়াছে—

যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে রয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখছি যেন বুকের উপর গোরা।

এই শ্রেণীর রচনায় কবিত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক পদে কবিত্ব ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

সখি, গৌর যদি হৈত পাখী
করিয়া যতন করিতু পালন　　হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি।
সখি, গৌর যদি হৈত ফুল,
পরিতাম তবে খোঁপার উপরে　　দুলিতু কাণেতে দুল।
সখি, গৌর যদি হৈত মোতি,
হার যে করিতু গলায় পরিতু　　শোভা যে হইত অতি।
সখি, গৌর যদি হৈত কালো,
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আঁখি　　শোভা যে হৈত ভালো।
সখি, গৌর যদি হৈত মধু,
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া　　মজিত কুলের বধূ।

মুরারি গুপ্তের—'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' ইত্যাদি একটি উৎকৃষ্ট পদ। এই পদের মধ্যে ব্রজ বা নদীয়া কোন ঠাঁইয়েরই উল্লেখ নাই। ভক্তিভূষণ মহাশয় ইহাকে গৌরলীলার পদ বলিয়াই ধরিয়াছেন। গুপ্ত কবির পরবর্তী পদেই কিন্তু আছে—

"গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ফেলিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কি না বুক।"

এই পদটিও সুন্দর।

---

* গৌরচন্দ্রের পক্ষ হইতে যে উদ্দীপনা ও প্রতিবোধনের কথা মাঝে মাঝে পদগুলিতে দেখা যায়, তাহা যে বাচ্যার্থে গ্রহণ করিতে হইবে না—তাহা নিম্নলিখিত অংশ হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

অলখিত লখি ও চাঁদমুখ। বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ।
তুরিতে মলিন কমল কলি। গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি।
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি। করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি।
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে। দিনকর তাপ দূরেতে যাবে।
এত কহি হাসি নয়ন কোণে। বারেক চাহিল আমার পানে।

মলিন চিৎকুমুদ হরিপ্রেমের চন্দ্রিকালোকে বিকশিত হইবে—সংসার-তাপ দূর হইবে—ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আশ্বাস বাণী ছাড়া আর কি ?

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, নদীয়া-নাগরীরা গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া নানা ভাবে প্রেম আবেদন জানাইত বটে—কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাহাতে সাড়া দিতেন না। এই উপেক্ষিত প্রণয়ের ব্যথাই লোচন, নরহরি, বাসু ঘোষের পদে কবিত্বের আশ্রয়। পরবর্তী সহজিয়ারা চৈতন্যে এই সাড়ার আরোপ করিয়া পদরচনা করিয়া ঐ কবিদের নামে চালাইয়া দিয়াছে। গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছে—ইহাতে গৌরাঙ্গের মর্য্যাদাহানি হইতেছে না, কিন্তু গৌরাঙ্গ নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহাদের মনে লালসার উদ্দীপন করিতেছেন—এ কথা বলিলে গৌরাঙ্গের চরিত্রের মর্য্যাদা থাকে না। ভক্ত কবিরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের উপাস্য পুরুষের এরূপ মর্য্যাদাহানি করিতে পারেন না। বাসু ঘোষের নামে প্রচলিত স্বপ্ন সম্ভোগের পদও সম্ভবতঃ জাল।

গৌরলীলা-বর্ণনায় বলরাম দাসও এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাস ও বলরামদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদ সঙ্কীর্ত্তনের প্রারম্ভে সর্ব্বত্রই গীত হয়।

গৌরলীলা বর্ণনায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি লোচনদাস। ইনি নদীয়া নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। এই ভাবের দীক্ষা ইনি গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট লাভ করেন। ইনি যে কেবল পদাবলী রচনায় নাগরী সাজিয়াছেন তাহা নয়, ইঁহার জীবনের সাধনাও ছিল নাগরীভাবের। ইঁহাকে 'ব্রজের বড়াই বুড়ী' বলা হইত। ইনি নিজে যে পুরুষ, সে কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিজে বৈষ্ণবসুলভ দীনতা-বশতঃ যাহাই বলুন, এক জন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পদরচনায় তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য একেবারে নিগূহিত করিয়াছেন। সে জন্য ইঁহার রচনা-পদ্ধতি কবিরাজ গোবিন্দ দাসের পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া খাঁটি মেয়েলি চলতি ভাষায় তিনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন, পুরুষের রচনা বলিয়া মনেই হইবে না। রচনার উপাদান উপকরণ উপমাদি অলঙ্কার ইনি ঘর গৃহস্থালী হইতে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সে জন্য বাটনাবাটা, দইপাতা, দধিমন্থন এবং রান্নাঘরের খুটিনাটি হইতে উপাদানাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই লিখিতে পারিয়াছেন—"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গান গাই ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।" অনেকে এই বিখ্যাত পদটিকে চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া ভুল করেন। "কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা। আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাসা গেল পাটা।"

লোচনের নাগরীভাবের সাধনায় আর একটি লাভ হইয়াছে। ব্রজবুলিতে তিনি পদরচনা করেন নাই, ব্রজবুলির ছন্দও তিনি গ্রহণ করেন নাই। খাঁটি বাংলা ভাষার যে ছড়ার ছন্দ বা ধামালী ছন্দ তখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায় নাই, নাগরী ও গ্রামবধূদের মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল—সেই ছন্দটি লোচনের রচনার মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

দৃষ্টান্ত—

চরণ-তলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়।
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে পড়ছে সখার গায়।
আমা পানে নয়ন কোণে চাইল সে একবার।
মনহরিণী বাঁধা গেল ভুরুর পাশে তার।
যদি বাঁধে বিনোদ ছাঁদে চাচর চিকণ চুল।
তবে সতী কুলবতী রাখতে নারে কুল।
যারে ডাকে নয়ন বাঁকে তার কি রহে মান।
যদি যাচে তায় কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ।
যদি হাসে কতই আসে রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন পরাণ ধন কে নিবি আয় ফিরে।
গলায় মালা বাহুর দোলা দিয়া চলে যায়।
কামের রতি ছেড়ে পতি ভজে গোরার পায়।
লোচন বলে ভাবিস্ কেন থাক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরা নাগর আটক করে ধর।

ধামালী ছন্দের সঙ্গে বাংলার খাঁটি চলতি ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। লোচন দাসই সর্ব্বপ্রথম বাংলার চলতি ভাষাকে কৌলীন্য দান করেন। তাঁহার নাগরীভাবের সাধনার ফলে বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিজস্ব ছন্দ ও নিজস্ব ভাষাকে সর্ব্বপ্রথম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত অলঙ্কারে মণ্ডিত ব্রজবুলির প্রাধান্যের যুগে পদরচনায় লোচন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছিলেন। লোচন, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ রাধামোহনের সগোত্র নহেন। চণ্ডীদাস, সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, নয়নানন্দ ইত্যাদির সগোত্র। চণ্ডীদাস ও লোচনদাসের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার নিজস্ব কাব্যের ভাব, ভাষা ও অলঙ্করণের ধারা মৈথিলী ধারার পাশে পাশে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, শ্রীধর, রাম বসু, হরুঠাকুর ও দাশু রায়ের রচনার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলায় নামিয়া আসিয়াছে।

গৌরলীলার পদ রচনায় লোচনের পর নরহরি ঠাকুরের নাম করা যাইতে পারে। লোচনের ভাষা পল্লীর ভাষা, নরহরির ভাষা পৌর ভাষা। দুই চলতি বাংলা। লোচনের ভাষার পক্ষে ধামালী ছন্দ উপযোগী হইয়াছে, নরহরির ভাষার পক্ষে লঘুত্রিপদী উপযোগী হইয়াছে। বাংলার নিজস্ব লঘু-ত্রিপদীর আদর্শরূপ আমরা নরহরির রচনায় পাই। নরহরির ভাষায় আমরা বাংলার ইডিয়ম (লক্ষ্যার্থক চলতিগং) ও প্রবাদ প্রবচনের মুহুর্মুহু সাক্ষাৎ পাই। যেমন—

"আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দূষিতে যায়।"
"চুপ করে থাক গোপনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কান।"
"নরহরি কয় তু বড় আঙ্গুলি ননদীর কিবা ভয়।
চোরের উপর বাটপাড়ি করি চোখে ধূলা দিতে হয়।"
নরহরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি।
"নরহরি কয় যে বল সে বল এ কথা কানে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে।"

নরহরি সরকারই নাগরীভাবের প্রবর্ত্তক। সেজন্য তাঁহার রচনায় নদীয়া-নাগরীদের প্রেমমুগ্ধতার কথা নানা রস-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। এই সকল রচনায় প্রভূত কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নারী-জীবনের এত খুটিনাটি পরিচয় কাহারও রচনায় নাই। বাঙ্গালী নারীজীবনে যে কত রসমাধুরীর অবকাশ ও অবসর আছে তাহা নরহরির পদগুলি হইতে জানা যায়।

নরহরি কবি হিসাবে বাসু ঘোষ, রায় শেখর ও লোচনদাসের গুরুস্থানীয়। নরহরি মধুমতী সখীর ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গের অঙ্গে চামর ঢুলাইতেন।

নরহরি ঠাকুরের পর বাসু ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রজলীলার কোন পদ লিখেন নাই।

ইনি সরকার ঠাকুরের সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। বাসু নিজেই বলিয়াছেন —"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে। পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হৈল মনে।" ইনিও নরহরির ভাবের ভাবুক ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।" বাসুদেব সুগায়ন ছিলেন। অতএব গীত বলিতে কণ্ঠসঙ্গীত ও পদরচনা দুইই বুঝাইতেছে। বলা বাহুল্য, রসগুরু নরহরির অনুকরণে বাসু ঘোষও নাগরীভাবের বহু পদ রচনা করিয়াছেন। সে গুলিতে নরহরির মত কলাকৌশল ও চাতুর্য্যের বৈচিত্র্য নাই। গৌরাঙ্গের বাল্য কৈশোরের লীলা বাসুর

প্রত্যক্ষ নয়— তিনি কল্পনার সাহায্যে সে লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। বাসু শ্রীক্ষেত্রলীলা ও গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের কথাও লিখিয়াছেন তিনি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহাতেও তিনি ভাবকল্প... সংযোগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন মধুর ভাবের সাধক; সে জন্য তিনি গৌর-গদাধর লীলা ও নদীয়া-নাগরী-ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। বাসুর নিমাই সন্ন্যাসের পদ মর্ম্মস্পর্শী।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরাঙ্গলীলার পদগুলিও চমৎকার। ইনি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের সগোত্র। ছন্দের ছটায় ও অলঙ্কারের ঘটায় ইঁহার পদগুলি ঝলমল। ইঁহার একটি পদ—

বিহরত সুরসরিৎতীর গৌর তরুণ বয়স থির
তড়িত কনক কুঙ্কুম মদমর্দ্দন তনু কাঁতি।
মদনকদন বদনচন্দ্র নিখিলতরুণী নয়ানফন্দ
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দকুসুম পাঁতি।
অঞ্জনঘন পুঞ্জ বরণ কুঞ্চিতকচ ধৈর্য্য হরণ
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম।
ভালতিলক ঝলকত অতি ভাঙভুজগ মঞ্জুল গতি
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রসসিঞ্চিত ছবিধাম।
কুণ্ডলশ্রুতি গণ্ডকলিত কণ্ঠহি বনমাল বলিত
বাহু বিপুল বলয়াকর কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবধূ কুল
ললিতকটি সুকৃশ কেশরী—গরব-খরবকারী।
ডগমগ ভুজ-জানু তরুণ অরুণাবলী কিরণ চরণ
কমল মধুর সৌরভ ভরে ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণাঘন ভুবন বিদিত প্রেম অমিঞা বরষত নিত
নরহরি মতি মন্দ কবহু পরশত নাহি থোর।

জগদানন্দ কয়েকটি গৌরলীলার পদ খাঁটি বাংলাতেও লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিতে শ্রীরাধার স্বপ্নে গৌর অবতারের পূর্ব্বসূচনা দেখাইয়াছেন। অদ্ভুত কল্পনা! স্বপ্ন দেখিয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন— 'গৌরাঙ্গ হরিল মোর মন।' এই বলিয়া শ্রীমতী মূর্চ্ছিত হইলেন। ব্রজবুলির পদগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ নানাপ্রকার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ছটায় প্রকাশিত হইয়াছে। নদীয়া-নাগরীভাবের পদও আছে—

সুরধুনী তটগত হরিণ নয়নী যত গুরুজন করইতে আঁধে।
কত কত গোপত্ত বরত কর অবিরত পড়ি তছু লোচন কাঁদে।
সুমরণে যাক নিখিল নীবি বন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে তাক থিরজ ধরু কো ধনী পড় কুলবতী কুলে লাজ।

জগদানন্দের সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার গৌরলীলার পদ। (আলিতি)

হোত মনহুঁ উলাস সুলছন বাম নিজভুজ উরজ ঘনঘন
ফুরই দুর সঞে প্রাণ পিউ কিয়ে অদূর আওল রে।

বিরহিণী নিজ অঙ্গে সুলক্ষণের সঞ্চার দেখিয়া কল্পনা করিতেছে,—প্রিয়তম নিশ্চয় আসিতেছে। সে কাছে আসিলে ঘোমটা দিয়া 'পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব'—কিছু বিরস হইয়া তাহাকে নানা দোষে দূষিব'—তার পর—

যব—পীনকুচ করকমলে পরশব, ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পূরব—
তখন চোখ বুজিয়া 'না না' বলিব এবং রস রাখিয়া রোষ করিব। এইরূপ মিলন-স্বপ্নের কল্পনা কবিতাটিতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সঞ্চার করিয়াছে।

জগদানন্দের কয়েকটি বিখ্যাত পদ—

১। করুণাবরুণ নয়ন অরুণারুণ তনু জনু তরুণ তমাল।
২। মৌলি মিলিত শিখিশিখণ্ড চল কুণ্ডল ললিত গণ্ড।

কীর্ত্তন-গানের আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সার্থকতা একাধিক। একটি সার্থকতা এই—রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে কোথাও ঐশ্বর্য্য আরোপিত হয় নাই—তাহাতে এই সঙ্গীতকে প্রাকৃত প্রণয়ের লালসামূলক সঙ্গীত মনে হইতে পারে। গৌরচন্দ্রিকা প্রথমে গীত হইয়া প্রথমতঃ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে—তার পর মূল রাগ-লীলা-সঙ্গীতকে একটা mystic interpretation দান করে। শ্রোতা শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তজীবনের লীলাবিশেষকেই বৃন্দাবন-লীলায় রূপে রসে পরিমূর্ত্ত বলিয়াই মনে করে। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের নিজস্ব কলা-গৌরব ও সুরের mystic appealও ইহার সঙ্গে কার্য্য করে। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে অভিনব লীলা করিয়াছেন—কীর্ত্তন গানের গৌরচন্দ্রিকায় অনুরূপ লীলা গানের দ্বারা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। ব্রজলীলার রস যিনি নিজের জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই ভাবে শ্রোতৃগণকে তন্ময় ও বিভাবিত করাও ইহার একটি উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিলে চেতোদর্পণ মার্জ্জিত হয়, তখন স্বচ্ছ নির্ম্মল চিত্তে ব্রজলীলার প্রকৃত স্বরূপটি প্রতিফলিত হইতে পারে। রায় রামানন্দের কথায় গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে এক বিন্দু কর্পূরের কাজ করে। এক বিন্দু কর্পূরে সমগ্র লীলার মাধুরী-সম্পুটই সুবাসিত হয়। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান যুগের লীলারস-কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া সংকীর্ত্তন কি করিয়া আরব্ধ হইবে?

ব্রজলীলার পদে যশোদার স্থান অনেকটুকু। গৌরলীলার পদেও শচীদেবীর বেদনা লইয়া অনেকগুলি পদ রচিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বড়ই করুণ ঘটনা—শ্যামের মথুরাযাত্রার চেয়ে কম করুণ নয়। কবিগণ কবিতার এমন রস-প্রেরণাটি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বাসু ঘোষ ও প্রেমদাস ইহার প্রধান কবি। বাসু ঘোষের শচীমাতার স্বপ্ন কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম চরণ— 'আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনী সই।' গৌরলীলায় রাধা ত শ্রীচৈতন্য নিজেই। গদাধর কতকটা রাধার স্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু গদাধরকে লইয়া ভাবাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, কবিত্বের স্ফুরণ হয় নাই। কবিত্ব-স্ফুরণের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। কয়েকটি পদে বিষ্ণুপ্রিয়ার খেদোক্তি চমৎকার বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। বাসু ঘোষ ইহাতেও গৌরাঙ্গের ভগবত্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

অক্রুর আছিল ভাল রাজবলে লৈয়া গেল,
রাখিল সে মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সংবাদ পায়,
ভারতী করিল দেশান্তরী।

কবি ব্যঞ্জনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনাকে রাধার বিচ্ছেদ-বেদনার চেয়ে অধিকতর শোকাবহ বলিয়াছেন।

লোচনদাস, ভুবনদাস ও শচীনন্দন দাস এই তিন জন কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন।

কবিত্বের দিক্ হইতে এই তিন কবির তিনটি পদের তুলনা সমগ্র গৌরাঙ্গ-সাহিত্যে নাই। লোচনদাসের পদটিতে বাস্তবতা পুরামাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। কবি গামছা, বসনের কোঁচা, সরু পৈতা ও ভোট-কম্বলের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দরদটুকু বাস্তব ভাবেই ফুটিয়াছে। নিজের কথাই তাঁহার বিশ কাহন হইয়া উঠে নাই—প্রিয়তমের জন্যই তাঁহার বেদনা দুর্বিষহ।

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ-তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা।
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা।

এই পদে আশ্বিনে অম্বিকা পূজার উল্লেখ আছে। একটি এমন পরম সত্য কথা আছে—যাহা অন্য কবি বলিতে সাহস করেন নাই।

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি।

পৃথিবীর পক্ষ হইতে ইহা বড় কথা নয়, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে ইহার চেয়ে বড় কথা কি আছে? শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সত্যের সাহায্যেই শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে আবেদন জানানো হইয়াছে।

"সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম্ম নয়!"

'সংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুমি দুর্দ্দান্ত সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসধর্ম্ম হরণ করিতেছ—তুমি মনে প্রাণে জান, সন্ন্যাসের চেয়ে নামকীর্ত্তন বড় ধর্ম্ম, তবে কি শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই তুমি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে?' শচীনন্দন দাসের পদটির চয়ন ও বয়ন ছন্দ-চাতুর্য্য, ভঙ্গীর মাধুর্য্য, পদলালিত্য ও বাক্য-বিন্যাসের পারিপাট্য গোবিন্দ দাসের ন্যায়ই অনবদ্য। তবে ইহা ব্রজলীলায় রাধার বারমাস্যারই সার্থক অনুসৃতি। একটি স্তবক এইরূপ—

ইহ—মাধবী পরবেশ। পিয়া—গেল কিয়ে দূর দেশ।
ইহ—বসন তনুসুখ ছোড়। অব—ধরল কৌপীন ডোর।
অব—ধরল কৌপীন ডোর অরুণহি বাস ছোড়ল চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে।
যো বুক পরিসর হেরি কামিনি পরশ রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর পতিত কোলে করি অবনি মূরছিত রোয়ই।

এই পদেও কারুণ্য ও হৃদয়াবেগ চমৎকার বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

ভুবনদাসের পদটি শচীনন্দন দাসের মতই অনবদ্য—অধিকতর করুণ বলিয়া মনে হয়। এই পদে প্রকৃতির বর্ণনা আরও চমৎকার এবং প্রকৃতির সহিত বিরহিণীর হৃদয়ের সংযোগ গভীরতর। ভুবনদাসের এই একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। একটি পদই ভুবনদাসকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি।

কয়েক পংক্তি যদৃচ্ছাক্রমে উৎকলন করি—

আওল ভাদর কো করু আদর বাদর তব হুঁ না যাত।
দাদুরি দাদুর রব শুনি বেরি বেরি অন্তরে বজর বিঘাত।
অন্তর গরগর পাঞ্জর জর জর ঝর ঝর লোচনবারি।
দুখকুল জলধি মগন অছু অন্তর তাকর দুখ কি নিবারি।
আওল আশ্বিন বিকশিত সব দিন থলজল পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লি কুসুম ভরে পরিমলে গন্ধিত শারদকাল।
বিধি বড় দারুণ অবিধি করয়ে পুন সরবস যাহে যোই দেই।
তাকর ঠামে লেই পুন পরিহরি পাপ করয়ে পুন সেই।
দুরগত পতিত দুখিত যত জিবচয় তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুন তাপ রাশি পরিপূরিয়া মোহে কাহে তেজল সোই।

লোচনের নামে আর একটি বারমাস্যা পাওয়া যায়। ইহাতে যে কবিত্ব আছে তাহাও লোচনেরই উপযুক্ত।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া আকাশে।
কে রাখে এ তরী পতি কাণ্ডারী বিদেশে।
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য।
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপায় বাঘিনী।
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী।
ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী দুলিবে কার কোলে।

গৌরপদাবলীর মধ্যে এমনি বহু রসাত্মক পদ আছে।

শ্রীকালিদাস রায়

আজি এই রাতে

আজিকে এ রাতে ঘুমায়ো না সখি, জাগিয়া থাকো!
আঁধার গগনে রূপালী তারার প্রদীপ জ্বলে,
ধরার কাজলে বাঁকা রেখা তব নয়নে আঁকো,
আজি জেগে থাকো তন্দ্রা-বিহীন আকাশ-তলে।

কেউ জেগে নেই আজি এই রাতে! তুমি ও আমি
দু'জনাতে বসে এই নিরালায় রাতের বুকে।
দিবস-মুখর ধরণীর বাণী গেছে যে থামি,
আকাশ ঘুমায় অলস-বিভোর মলিন মুখে।

ব্যবধান বত তোমার আমার মনের মাঝে,
আঁধার-কাজলে আজি সেই সব যাক গো মুছে!
হয়ে যাক্ আজ পুরানো স্মৃতি সে সকলি বাজে,
যাক্ জীবনের সকল দ্বন্দ্ব আজিকে ঘুচে।

বাতাসের বুকে পাতি মোরা কাণ এসো গো শুনি
আঁধারে লুকানো রজনী-বধূর গোপন গান,
বসে বসে ঐ আকাশ-বুকের প্রদীপ গুণি।
আর কিবা কাজ? কাজ-হারা দু'টি অলস প্রাণ।

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[স্মৃতিকথা]

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় আমার কালিদাসবর্ণিত দিলীপ-বর্ণনা মনে পড়ে : —

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।"
"প্রলম্বিত বাহু তাঁ'র, উরস বিশাল,
বৃষস্কন্ধ, কলেবর যেন দীর্ঘ শাল ;
নিজ কর্ম্মক্ষম দেহ করিয়া ধারণ
ক্ষাত্রধর্ম্ম অবতীর্ণ ধরায় যেমন।"

তাঁহার আকার তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার দীর্ঘ বাহুতে অত্যাচারীকে আঘাত ও দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে পারিতেন, স্কন্ধে বহু কার্য্যভার বহন করিতে পারিতেন, সেই উদার হৃদয়ে হীনতার স্থান ছিল না—উদারতায় তাহা পূর্ণ ছিল ; তিনি যেমন সমসাময়িক মনীষীদিগের মধ্যে "সুরতরুগণমাঝে পারিজাত প্রায়" বিরাজিত ছিলেন—তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও দৃঢ় ছিলেন। তিনি যেন নেতৃত্ব করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমি যখন প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁহার মুখে যৌবনের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যে ও কমনীয়তায় পরিণতিলাভ করিয়াছে। কারণ, সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কথা। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাম্য-গৃহ সোনাইএ (খিদিরপুরের নিকটে) ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় এটর্নী ছিলেন। উমেশচন্দ্র প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে (সে কালের গৌরমোহন আঢ্যের ইংরেজী স্কুলে) ও তাহার পরে কিছু দিন হিন্দু স্কুলে ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট পাঠে তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। ব্যবহারাজীব পিতা পুত্রকেও ব্যবহারাজীব করিবার আশায় তাঁহাকে এটর্নীর কায শিখিতে দেন ; কিন্তু সাফল্যলাভ করেন নাই। সেই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্বামিত্ব হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়া 'বেঙ্গলী' পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই পত্র ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত হয় এবং দীর্ঘকাল তাঁহার প্রচারবেদী ছিল। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র পুত্রকে তাঁহার বন্ধু গিরিশচন্দ্রের নিকটে সাংবাদিকের কার্য্যে শিক্ষানবীশ করিয়া দেন। উমেশচন্দ্র বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে সংবাদ বাছিতেন এবং সম্পাদকের নির্দ্দেশে সময়ে সময়ে দুই একটি নিবন্ধ লিখিতেন তিনি এক বার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, গিরিশ বাবু তখন বিখ্যাত ইংরেজী লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহার নির্দ্দেশ 'বেঙ্গলীতে' কিছু লিখিতে পাইলে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিতকার লিখিয়াছেন, উমেশচন্দ্র তখন "হাত-খরচ" হিসাবে মাসিক ২০ টাকা পাইতেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর জিজিভাই নামক পার্শীর বৃত্তি লাভ করিয়া উমেশচন্দ্র বিলাত-যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতা বহুবাজারের মতিলাল পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যারিষ্টার। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রথম ব্যারিষ্টার হইলেও তিনি ব্যবহারাজীবের কায করেন নাই ; কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিতীয়, তিনিও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে ব্যবহারাজীবের কায করেন নাই ; তৃতীয় মনোমোহন ঘোষ ; উমেশচন্দ্র চতুর্থ। বলা বাহুল্য, কলিকাতা হাইকোর্টে তখন শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টারদিগেরই প্রাধান্য—মনোমোহন ও উমেশচন্দ্র তাঁহাদিগের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া—
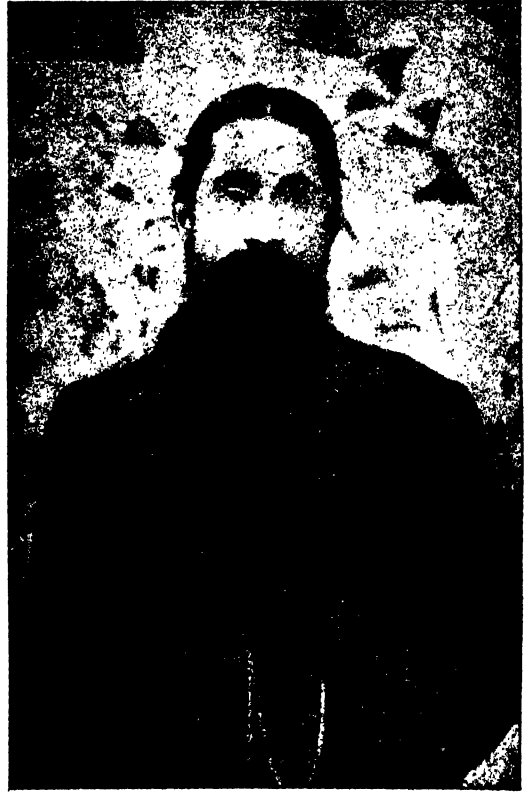
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার" মত কায করিতেছেন—এই ভাবেই লক্ষিত হইতেন। তখন কলিকাতা হাইকোর্টে ভারতীয় ব্যারিষ্টার-দিগকে "এশিয়া মাইনর" বলা হইত—এখন তাঁহারা "এশিয়া মেজর।" তখন কলিকাতা হাইকোর্টে খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিষ্টারের অভাব ছিল না। চার্লস গ্রিগরী পল, জন উডরফ, হামফ্রি পিউ ইভান্স, পিউ, গার্থ, "টাইগার" জ্যাকসন, ব্রানসন—এই সকল ব্যারিষ্টারের সহিত উমেশচন্দ্রকে প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল। তিনি যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের প্রথম বাঙ্গালী ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই সেই প্রতিযোগিতায় তাঁহার সাফল্য পরিমাপ করা যায়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন জাতীয় রাজনীতিক মহাসভা—কংগ্রেস স্থাপিত হয়, তখন

বিবেচনা ও বিচার করিয়া, উমেশচন্দ্রকেই তাহার সভাপতি করিবার উপযুক্ততম ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সেই অধিবেশন পুণায় হইবার কথা ছিল; কিন্তু ব্যাধিবিস্তারহেতু অধিবেশন-স্থান পুণা হইতে বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত করা হয়। পর-বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং সুধী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির ও দাদাভাই নৌরজী মূল সভাপতি হয়েন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। সেই অধিবেশনের স্থান "টিভলি গার্ডেনস।" উহা লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত—"বাগানবাড়ী।" ঐ গৃহ হইতে অদূরে যে পথ ভবানীপুরের দিকে প্রসারিত তাহার নাম ল্যান্সডাউন রোড এবং নামেই তাহার আধুনিকত্বের পরিচয় সপ্রকাশ; কারণ, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট হইয়া এ দেশে আইসেন নাই। ঐ অঞ্চলে তখন ধান্তের চাষও হইত এবং আমরা যখন অপরাহ্ণে কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন লক্ষ্য করিবার জন্য যাইতাম, সেই সময় এক দিন আমার কোন শ্রদ্ধেয়া আত্মীয়ার জন্য ধান গাছ আনিয়াছিলাম—তিনি তাহার পূর্ব্বে কখন ধান গাছ দেখেন নাই। মিষ্টার হিউম কংগ্রেসের অধিবেশনজন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন অপরাহ্ণে "টিভলি গার্ডেনসে" কংগ্রেসের কার্য্যালয়ে যাইতেন। তিনি উমেশচন্দ্রের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটস্থিত গৃহে ছিলেন। তাহার পরে সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি ইংরেজরাও সেই গৃহে অতিথি-সৎকার সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

আমি স্থির করিলাম, মিষ্টার হিউমের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে হইবে। এক দিন অপরাহ্ণে য়ুরোপীয় বেশ পরিধান করিয়া যাইবার আয়োজন করিলাম। তখনও মোটর গাড়ী হয় নাই—ট্রামও ঘোড়ায় টানিত—ধনীরা ব্রুহাম, ফীটন, পাল্কী গাড়ী প্রভৃতি, ডাক্তাররা ছোট গাড়ী (ইহাকে "পীল বক্স" বলা হইত) ও সাধারণ লোক ভাড়াটিয়া গাড়ী ব্যবহার করিতেন—সবই অশ্বযান। হেমচন্দ্রের "সাবাস হুজুক আজ আজব সহরে" কবিতায় আছে—

"কেহ চড়ে বুড়ি ফেটিন, কেহ অপীস জানে!
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগ্যে, কারো ঠনঠনে।"

ঠনঠনেয় একটি বড় ভাড়াটিয়া গাড়ীর আড্ডা ছিল বলিয়া ভাল ভাড়াটিয়া গাড়ীকে "ঠনঠনে" বলা হইত। আমি—এক জন বন্ধুসহ—একখানি "দশ কুকুরে" গাড়ী ভাড়া করিয়া উমেশচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইলাম। ভৃত্যকে "কার্ড" দিয়া বলিলাম, মিষ্টার হিউমের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী। ভৃত্য, কেন জানি না, "কার্ড" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে লইয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে বলিল। তিনি একতলে একটি কক্ষে বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—তিনি আমার দিকে চাহিলে—আমি ইংরেজীতে বলিলাম, তাঁহাকে বিরক্ত করা আমার অভিপ্রেত নহে—ভৃত্য ভুল করিয়াছে; সে জন্য আমি দুঃখিত। তিনি বাঙ্গালায় আমার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাহা ব্যক্ত করিলে মিষ্টার হিউমের নিকট আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে কিন্তু তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "চল, তোমাকে নিয়ে যাই। মিষ্টার হিউম বড় কড়া লোক। তুমি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে আসছ।" আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়া দ্বিতলে গমন করিলাম। তথায় মিষ্টার হিউম যে কক্ষে বসিয়া টেবলে নানাপ্রকার কাগজ লইয়া আপনি কি লিখিতেছিলেন তথায় উপনীত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট হইতে "স্বাক্ষর-সংগ্রহের" পুস্তকখানি লইয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলে, আমি তাঁহার স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি! মিষ্টার হিউম আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেণ্টিমেণ্টাল ইংরেজ মেয়েদের কাযের অনুসরণ কর কেন?" কিন্তু তিনি তখন লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন—সময় নষ্ট না করিয়া যথাস্থানে স্বাক্ষর দান করিয়া তাহা ব্লটিং কাগজে শুকাইয়া আমার হস্তে দিলেন। তিনি আবার লিখিতে লাগিলেন। তখনও "টাইপ-রাইটার" ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। মিষ্টার হিউমকে ধন্যবাদ দিয়া আমি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া সোপানশ্রেণীতে নামিতে নামিতে বলিলাম, তাঁহার স্বাক্ষর পাইব না? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত আমার স্বাক্ষর নিতে আস নাই।" আমি কুণ্ঠিত ভাবে কৈফিয়ৎ দিলাম, মিষ্টার হিউম চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার স্বাক্ষর লইতে আসিয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আর এক দিন এলে আমার স্বাক্ষর পা'বে। আসবে ত?" আমি বলিলাম, নিশ্চয় আসিব। তত্ক্ষণে আমরা নামিয়া আসিয়াছি। আমি যাইবার জন্য তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলে কিন্তু তিনি আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে যাইতে বলিলেন এবং তথায় আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া পুস্তকখানি চাহিয়া লইয়া তাহাতে যথাস্থানে আপনার স্বাক্ষর দিয়া সেখানি আমাকে দিয়া বলিলেন, "দেখ, একেই বলে—'মেঘ না চাইতে জল'। আর আসতে হবে না।" মিষ্টার হিউমের রূক্ষ ব্যবহারের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহ-স্নিগ্ধ ব্যবহারের স্মৃতি লইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

সে দিনের কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহার পরে—তিনি বিলাতে যাইয়া বাস ও প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী না করা পর্য্যন্ত—বহু বার তাঁহাকে দেখিয়াছি; তাঁহাকে হাইকোর্টে মামলা করিতে, কংগ্রেসে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়াছি এবং কংগ্রেসে, ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যত্র বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি। কোথাও তাঁহার বাক্যে বাহুল্য দেখি নাই—প্রায় কোথাও তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইতে দেখি নাই। সেই গাম্ভীর্য্য কেবল দুই বার বিভিন্ন কারণে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াছিলাম। যখন মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়, তখন বক্তৃতা করিতে করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের কক্ষের প্রাচীরে তোমাদিগের পরলোকগত হিতকামীদিগের আলেখ্য রক্ষাই যদি তোমাদিগের উদ্দেশ্য হয়—তবে এই কক্ষের প্রাচীর যেন দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ কাল আলেখ্যশূন্য থাকে।" আর এক বার তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়াছিলাম। সে বার বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় আসিলে সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল তাঁহাকে একখানি টেলিগ্রাম দিলেন। তাহা সার ফিরোজশা মেটার টেলিগ্রাম। তিনি কলিকাতায় আসিবেন।

অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহার জন্ত বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গৃহে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান তখন বিশেষ সমৃদ্ধ এবং সার আশুতোষ চৌধুরী তাহার সম্পাদক। মেটা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন—তাঁহার এসোসিয়েশনে থাকা কি সুবিধাজনক হইবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন—যেন মেঘমুক্ত আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইল। তিনি কাগজখানি তাল পাকাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমরা ব্যবস্থা করিব; তাহাতে যদি তাঁহার মনে সন্দেহ থাকে, তবে আমরা তাঁহার জন্ত কোন ব্যবস্থা করিব না। এক জন মাত্র স্বেচ্ছাসেবক হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিবে—তাঁহার জন্ত আমরা কোন ব্যবস্থা করিলাম না।" কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কারণ, বিচারক যেমন আসনে বসিলে জেরা করেন না—রায় দেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তেমনই তর্ক করিতেন না—নির্দ্দেশ দিতেন। তাঁহার উক্তি তাঁহার অসীম ক্ষমতার উৎস হইতে উদ্‌গত হইত। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল। সে বার মেটাকে নিজ-ব্যবস্থায় হোটেলে উঠিতে হইয়াছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিতেন না, তাঁহার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করা কেহই সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। আমি দেখিয়াছি, তাঁহার মতের বিরুদ্ধ অনেক প্রস্তাবের আলোচনা তাঁহার উপস্থিতিতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সমর্থনে অনেক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে বৎসর প্রবল ভূমিকম্প হয় (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) সেই বৎসর নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সে বার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি—মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাহার পূর্ব্ব-বৎসরের ব্যবস্থার পরে স্থির হইল—অধিবেশনের কার্য্য বাঙ্গালায় পরিচালিত হইবে। মহারাজা তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণের বাঙ্গালা অনুবাদই পাঠ করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিবার পরেই রবীন্দ্রনাথ তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেন। দ্বিতীয় দিন বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র আসিয়া যখন বলিলেন, প্রত্যেক প্রস্তাবে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে—ইংরেজদিগের অবগতির জন্ত—হইবে, তখন কেহই সেই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

নাটোরে সেই অধিবেশন-কালেই ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের অধিবাসীরা কম্পনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থল ত্যাগ করিতে লাগিলেন—বাহিরে জনতা "হরিবোল! হরিবোল!" উচ্চারণ করিতে লাগিল। উমেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, "সভার অধিবেশন চলিতেছে।" যতক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা সপ্রকাশ না হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি আসন ত্যাগ করেন নাই।

ভূমিকম্পের পরে যখন গৃহ ভূমিলুণ্ঠিত, ভূমি নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন, তখন সকলেই দূরস্থ স্বজনগণের বিষয় চিন্তা করিয়া বিমর্ষ ও আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র বিচলিত হয়েন নাই।

বিখ্যাত সাংবাদিক গার্ডিনার গ্লাডষ্টোনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার মূল অতীতে ছিল। উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে সে কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। জি, পরমেশ্বরণ পিলাই তাঁহার কথায় বলিয়াছেন—বেশে, অভ্যাসে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতিতে তিনি ইংরেজ; ভারতবর্ষ যেমন—ইংলণ্ডও তেমনই তাঁহার বাসভূমি। সে কথা সত্য। কিন্তু তিনি অন্তরে বাঙ্গালী—হিন্দু ছিলেন। যে স্থানেই তিনি আপনার পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানেই আপনাকে "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ" বলিয়াছেন। তিনি এক বার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন য়ুরোপীয় প্রথায় বেশ বাস আরম্ভ করেন, তখন মনে করিতে পারেন নাই, পিতৃপুরুষের সমাজে তাঁহাদিগের স্থান হইতে পারে। সমাজ যে ভাবে—যে উদারতা সহকারে তাহার বিদেশ হইতে প্রত্যাগত সন্তানদিগকে অঙ্কে লইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহারা কখনই সমাজ ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার কোন স্নেহভাজন বন্ধুর জামাতা যখন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন উমেশচন্দ্র বিলাতে বাস করিতেছেন। যুবক তাঁহার

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ উমেশচন্দ্র

সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি মরিতে বিলাতে আসিয়াছি বলিয়া আমার কথায় বিস্মিত হইও না। আমার উপদেশ—দেশে যাইয়া দেশী পাড়ায়, দেশী ভাবে বাস করিও। আমরা যখন ব্যারিষ্টার হই, তখন আমরা সংখ্যায় অল্প—উপার্জ্জন-পথ প্রশস্ত ছিল। এখন অবস্থা অন্যরূপ। পিতার সঞ্চিত অর্থ শিক্ষালাভে ব্যয় করিয়া দেশে ফিরিয়া ব্যয়সাধ্য ভাবে বাস করিলে অভাবহেতু অনেক অসঙ্গত কায করিতে প্রলুব্ধ হইবে। তাহা করিও না।" তিনি যত দিন কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার পিতৃগৃহে সামাজিক নিমন্ত্রণের সংবাদ তাঁহাকে দিতে হইত; তিনি "কর্ত্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা" বিবেচনা করিয়া "লৌকিকতার"—উপহারের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া সে জন্ত আবশ্যক অর্থ পাঠাইয়া দিতেন; যথা—ঢাকাই ধুতী-চাদর ও ৪ টাকার সন্দেশ, শান্তিপুরে শাড়ী ও ২ টাকার সন্দেশ—ইত্যাদি। তিনি য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত

হইবার পরে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ যখন তাঁহার ভ্রাতার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তখন কলিকাতায় সমাজের কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই সময় শোভাবাজার দেব-পরিবারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব সে সভায় যোগদান করায় তিনি তাঁহাদিগের সেই কায স্মরণ করিয়া এক পুত্রের নাম কমলকৃষ্ণ ও আর এক জনের কালীকৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, কমলকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগের জন্য আদালতে মামলা করিবেন জানিতে পারিয়া তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া বলেন, তাঁহার বিচারে যদি উভয়ের আস্থা থাকে, তবে তিনিই সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবেন। তিনি দিনের পর দিন ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগের ভূমি সম্পত্তি, গৃহ ও তৈজসপত্র সব দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া বলেন—তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। তিনি শেষে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা দেব-সেবায় প্রযুক্ত হইয়াছে। পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা-প্রদর্শন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

উমেশচন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। প্রথমে—অন্য গৃহে বাস আরম্ভ করিয়া তিনি প্রতিদিন মাতাকে দেখিতে আসিতেন। পরে—মা তাঁহাকে না বলিয়া পদব্রজে জগন্নাথ ধামে তীর্থযাত্রা করায়—অভিমানী পুত্র শনিবার ছুটীর দিন মাতৃ সকাশে যাপন করিতেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলা মানবচরিত্রের অনেক দৌর্ব্বল্য যেন বর্ণনার অণুবীক্ষণে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, সেই সকল দৌর্ব্বল্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল, তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা মনে করেন উমেশচন্দ্র ব্যবহারাজীবের কার্য্যে অসাধারণ সাফল্যলাভ করেন বলিয়া তিনি মামলার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। মামলায় বহু সমৃদ্ধ বাঙ্গালী-পরিবারের ধনক্ষয়ে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বার আমাদিগকে কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়া দুঃখ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

(১) হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় "অরিজিন্তাল জুরিস ডিকশান" ছাড়িয়া ভবানীপুরে বাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায় জ্যেষ্ঠ দক্ষিণ কলিকাতায় সার্কুলার রোডে "পার্শী বাগানে" (সেই গৃহ ভাঙ্গিয়া এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে) ভাড়া করিয়া অতর্কিত ভাবে তথায় মরিলে তাঁহার ভ্রাতারা যে সকল উইল তিনি করিয়া গিয়াছিলেন বলেন—তাঁহার বিধবা—ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল আনন্দচন্দ্র রায়ের ভগিনী—সে সকল অস্বীকার করায় বিশাল মামলার সৃষ্টি হয় এবং হাইকোর্টে অর্জ্জিত অর্থের অনেকাংশ হাইকোর্টেই ব্যয়িত হয়—যে স্থানে উৎপত্তি সেই স্থানেই লয় হয়।

(২) কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারের কিরূপ "রবরবা" ছিল, তাহা এখন অনেকে অনুমান করিতেও পারিবেন না। তাঁহাদিগের পরিবারের বালকগণ হিন্দু স্কুলে পড়িতে আসিত এবং গাড়ীর ঘোড়া রাখিবার জন্য কলিকাতায় জমি কিনিয়া আস্তাবল করায় বিষয় ভাগের সময় মামলা হাইকোর্টের "অরিজিন্তাল জুরিস ডিকশানে" পড়ায় প্রভূত অর্থব্যয় হয়।

নদীয়া জিলার কোন প্রসিদ্ধ পরিবারের দুই তরফের ভৃত্যদিগের মধ্যে ছাগ লইয়া কলহে প্রভুরাও যোগ দেওয়ায় পরিবারের ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয়।

তিনি মামলা মীমাংসার জন্য অনেক ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ইহাতেই তাঁহার প্রকৃতির মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার ব্যবহারে ও উক্তিতে বাহুল্য ছিল না—সংযম ছিল। কিন্তু তিনি যে ধৃষ্টতা সহ্য করিতেন না তাহা আমরা সার ফিরোজশা মেটার ব্যবহারে দেখিয়াছি। আর উত্তেজনার কারণ ঘটিলে তিনি কিরূপ ভাবে প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা কংগ্রেসেই দেখিয়াছি। তিনি ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকারের জন্য বিলাতে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাই তাঁহাদিগের মত ছিল। বিলাতে কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনার্থ পত্র ('ইণ্ডিয়া') প্রচারিত হইত—সমিতি ছিল—ইত্যাদি। সে সকল কাযে তিনি যত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তত, বোধ হয়, আর কোন ভারতীয় করেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিলাতে কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহকল্পে প্রতিনিধিদিগের প্রাবেশিক ১০ টাকা বাড়াইবার প্রস্তাবে আপত্তি হইবে জানিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সে আপত্তি আর উত্থাপিত হয় নাই। আমার মনে আছে, তাঁহার সেই বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার বন্ধু উমাকালী মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন, "উমেশ, তুমি তোমার পূর্ব্বকৃতকার্য্যও আজ অতিক্রম করিয়াছ।"

বাল্যকালে উমেশচন্দ্র "গোপাল অতি সুবোধ বালক" ছিলেন না। বোধ হয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত সংবাদপত্রে কায করিবার সময় তিনি প্রথম রাজনীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিলাতে যাইয়া তিনি সেই আকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট হয়েন এবং দাদাভাই নৌরোজীর সহিত একযোগে তথায় ভারতবর্ষের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের লোককে অবহিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেই চেষ্টা তিনি জীবনের সায়াহ্নে বিলাতবাসী হইয়াও করিয়াছিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি যখন ব্যবহারাজীবরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিচার বিষয়ে বর্দ্ধিত ক্ষমতা প্রদান জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, সেই ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিয়া দেশে জাতীয় জাগরণের তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হয়। সেই আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনার স্থান ইহা নহে। সেই আন্দোলনের তীব্রতার ও তিক্ততার পরিচয় আমরা হেমচন্দ্রের "নেভার—নেভার!" কবিতায় পাই—

"নেভার সে অপমান হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান— আমাদের জানানা।
বিবিজান! দেহে প্রাণ
কখনো তা হবে না।
হিপ্‌ হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে হ্যাট কোট বুট প'রে
সদা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে? নেভার নেভার!!"

বঙ্গবিভাগ যেমন স্বদেশী ও জাতীয় আন্দোলনের উপলক্ষ, ইলবার্ট বিলের আন্দোলন তেমনই জাতীয় আন্দোলনের উপলক্ষ। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় সমাজে রাজনীতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখিয়াছিলেন—"Home Rule for India ought

to be our cry." ব্লান্ট ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তকে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিয়া যে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, উমেশচন্দ্র তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। সেই আন্দোলনে যে জাতীয় ভাব বিকশিত হয়, তাহা কেন্দ্রীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস সৃষ্ট হয়। উমেশচন্দ্রই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি।

কংগ্রেসের জন্য স্বদেশে ও বৃটেনে স্বয়ং অকাতরে অর্থ, সামর্থ্য ও সময় ব্যয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। পিলাই লিখিয়াছেন—তিনি কংগ্রেসের জন্য বুদ্ধি ও অর্থ সংগ্রহও করিয়াছিলেন; তাঁহারই চেষ্টায় চার্লস ব্রাডল কংগ্রেসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় (দ্বারবঙ্গের) মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মীশ্বর নানারূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলেন। যে বার এলাহাবাদে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ), সে বার ছোটলাট সার অকল্যাণ্ড কলভিন যখন অধিবেশনের জন্য স্থান সংগ্রহে বাধা দিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিত অযোধ্যানাথ গোপনে লাউদার কাশল ভাড়া লইয়া তথায় অধিবেশন-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে পরবর্তী অধিবেশনের (১৮৯২ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বেই মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর ঐ গৃহ ক্রয় করিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনকালে প্রতিনিধিদিগকে সাদরে আহ্বান ও গৃহ তাঁহার অধিকারে আসিবার পর প্রথমেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়ায় আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তিনি একাধিক বার কংগ্রেসের অধিবেশনে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াও সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনে তিনি আসিয়াছিলেন। তখন কংগ্রেসের কার্য্য চলিতেছে—সহসা মণ্ডপে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, বাবু শালগ্রাম সিংহকে সঙ্গে লইয়া মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিনি মঞ্চে উঠিলেন। যে বক্তা তখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি আনন্দ-কোলাহল শেষ হইলে বক্তৃতা শেষ করিলেন। উমেশচন্দ্র তৎক্ষণ আসন ত্যাগ করেন নাই—বক্তৃতা শেষ হইলে উঠিয়া যাইয়া মহারাজাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। তাঁহার জন্যও তিনি নিয়মানুগ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেন নাই।

এইরূপ নিয়মানুগ ব্যবহার আমি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মিষ্টার রিসলী সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠকালে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন "ভারতের প্রাচীন সৌধ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আসিলেন। আপনার অভিভাষণ শেষ করিয়া মিষ্টার রিসলী বড়লাটকে অভ্যর্থনা করিলেন।

কংগ্রেসের জন্য উমেশচন্দ্র বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে নানা স্থানে বক্তৃতায় ভারতবাসীর অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে যেমন আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও তেমনই লোককে অবহিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সংগৃহীত হয় নাই; কেবল চুণীলাল লালুভাই পারেখ তাঁহার পুস্তকে (Eminent Indians on Indian Politics) কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিলাতে প্রকাশিত কংগ্রেসের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' তাঁহার অনেক বক্তৃতার ও রাজনীতিক কার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উমেশচন্দ্র অতীতের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বৃক্ষ যেমন মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করে, তেমনই অতীত হইতে কর্ত্তব্য-সন্ধান লইতেন। তিনি কংগ্রেসকে সর্ব্বতোভাবে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে সামাজিক ব্যাপারের সহিত রাজনীতিক ব্যাপার সম্বন্ধ-শূন্য রাখিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে সকল যে আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি সভা সমিতিতে সামাজিক ব্যাপারের আলোচনার সার্থকতা স্বীকার করিতেন না—সে সব যে সম্প্রদায়ের সেই সম্প্রদায়ই সে সকল সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে মতভেদের অবকাশ আছে, তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন।

তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—সকল দেশেই নানা পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তাহার যে সকল উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছিল, সে সকল আজ আর লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারে না। কালের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে। পিলাই তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেসকে যানের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ ও নর্টন দুই তেজঃপূর্ণ অশ্বযুক্ত;—সহিস বিপিনচন্দ্র পাল ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য:—আরোহীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট সালেম রামস্বামী মুদেলিয়ার ও পণ্ডিত অযোধ্যানাথ; আর অশ্বদ্বয়কে সংযতকারী যান-চালক—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই; অনেকে কংগ্রেসে আদর্শ ও কার্য্য-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বেই তিরোহিত হইয়াছেন।

আজ ভারতের যে জাতীয় আন্দোলন সমগ্র সভ্যজগতের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে ভিত্তির উপর স্বরাজ-সৌধ রচনার স্বপ্ন আমরা সফল করিতে চাহিতেছি, সেই ভিত্তি যাঁহাদিগের ত্যাগ, উদ্যম ও কার্য্য ব্যতীত রচিত হইতে পারিত না, উমেশচন্দ্র তাঁহাদিগের এমন জনমাত্র নহেন—তাঁহাদিগের পরিচালকদিগের এক জন। তাঁহার পরিচালনার গুরুত্ব অসাধারণ। আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাঁহাদিগের আরব্ধ কার্য্য করিবার সময় আমরা যেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য সম্মান—পূজা প্রদানে কুণ্ঠিত না হই। আমরা যদি তাহাতে কুণ্ঠিত হই, তবে আমরা পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রমই করিব। আমাদিগকে যেন মনে করিতে না হয়—

"......We are traitors to our sires
Smothering in their holy ashes Freedom's
new-lit altar-fires.
Shall we make their creed our jailors?
Shall we in our haste to slay
From the tomb of the old prophets steal
the funeral lamps away,
To light up the martyr fagots round
the prophets of to-day?"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সঞ্জীবনী

মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও দেখি আঠারো বছর বয়সে যেন চল্লিশ বছর বয়সের মত ঝিমাইতেছেন! কাহাকেও দেখি কোন মতে যেন প্রাণটুকু তাঁদের দেহে ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে! যাহাকে আমরা বলি সজীব ভাব,—সে সজীবতার লক্ষণ যেন কোথাও নাই। বহু সংসারে মেয়েরা ঘর-সংসারের কাজ করেন—যেন কলের পুতুল কাজ করিতেছে, কাজের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই! তার উপর আছে নানা রকমের অস্বাস্থ্য! বড় বড় রোগে এ অস্বাস্থ্য প্রকাশ পায় না। এ অস্বাস্থ্যের জন্ম আমোদ-প্রমোদেও তাঁদের রুচি থাকে না! তাঁরা বলেন, ভালো লাগে না।

এই ভালো না লাগাই রোগের লক্ষণ। এ ভালো না লাগার কারণ, দেহ-মনের গঠনে গোলযোগ। এ গোলযোগের ফলে অনেকের গড়ন 'খাঁটুরে' টাইপ্‌ থাকিয়া যায়।

দেহের গঠনে বৈষম্য ঘটিলে মনেও তার ছোঁয়াচ লাগে। দেহ যদি সত্য সুস্থ থাকে, তাহা হইলে দুঃখ-দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তার ভারে মন একেবারে অবসন্ন জীর্ণ হইতে পারে না। সে জন্ম বিশেষজ্ঞেরা বলেন, দেহকে ভালো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে মানসিক অবসাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। অস্বাস্থ্য-হেতু দেহ দুর্ব্বল হয়; দেহ দুর্ব্বল হইলে মন দুর্ব্বল হইবে। অথচ বাধা-বিপত্তি দুশ্চিন্তা-অবসাদ কাটাইয়া বাঁচিতে হইলে মনকে সতেজ সবল করা প্রয়োজন। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ— এ-কথা নিরর্থক নয়। এ কথার অর্থ—যতক্ষণ বাঁচিবেন, প্রাণটুকু যেন খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ আড়ষ্ট না থাকে—প্রাণকে রাখিতে হইবে হিল্লোলিত। Life is cruel to the weakling. অতএব দেহ-মনের দুর্ব্বলতা দূর করা চাই—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকাকে বাঁচা বলে না।

প্রাণে যার হিল্লোল নাই, ভালোবাসা স্নেহ মায়ার সুধা-রসে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। একটু রাত জাগিলে, দু'দণ্ড কথা কহিলে বা খাওয়ার বাঁধা-ধরা সময়ের একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে দেহকে ঠিক রাখিতে পারিব না,—ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর থাকিতে পারে না। আজ যে ডিসপেপসিয়ার এমন প্রাদুর্ভাব, ইহার একটি কারণ দেহের গঠন যথাযথরূপ নয় বলিয়া। গঠন-বৈষম্য হেতু লিভারের ক্রিয়া যথাযথরূপ হইতে পারে না; তাহারই ফলে আহার্য্য-পরিপাকে গোলযোগ এবং অজীর্ণতা প্রভৃতি নানা উপসর্গের সৃষ্টি।

এই অস্বাস্থ্য মোচন করিতে হইলে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করা উচিত। সেই ব্যায়াম-বিধির কথা বলিতেছি:

১। পায়ে-পায়ে সংলগ্ন করিয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান। তার পর দু'হাতে কোমরের দু'দিক ধরুন—ধরিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের ঊর্দ্ধ ভাগ ডান দিকে হেলাইবেন; (১নং ছবির মত) পরক্ষণে বাঁ দিকে হেলাইবেন। পর্য্যায়ক্রমে একবার ডাহিনে পরক্ষণে বাঁয়ে দেহের উপরার্দ্ধ হেলাইবেন—পাঁচ মিনিট কাল। কোমর হইতে পা অর্থাৎ নিম্ন-দেহ সিধা খাড়া রাখিবেন। এ-ব্যায়ামে লিভারে জড়তা থাকিবে না এবং পাকস্থলী ও দেহাভ্যন্তর-ভাগের স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে।

১। ডান দিকে হেলাইবেন

২। এবার দু' পা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দু'হাত দিয়া সামনের ভূমি স্পর্শ করুন—২নং ছবির ভঙ্গীতে। দুই করতল প্রসারিত রাখিবেন। এমনি করিয়া ঝুঁকিয়া থাকিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণিবেন; তার পর সিধা খাড়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া আবার সামনের দিকে ঝোঁকা। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে পাকস্থলী কোনো দিন অসুস্থ হইবে না এবং অজীর্ণ রোগের বাষ্পও দেহে আশ্রয় পাইবে না।
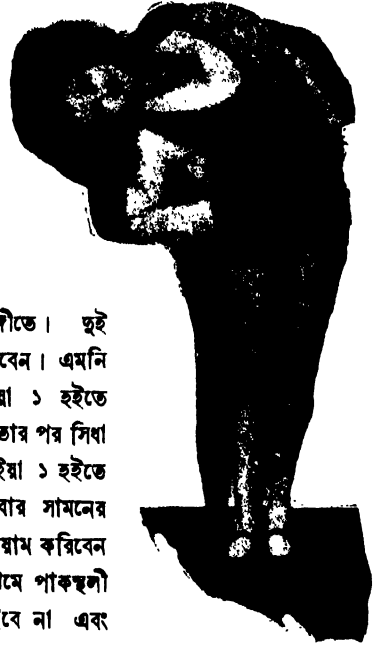
২। দু'হাতে সামনের ভূমি

৩। মেঝের সতরঞ্চি পাতিয়া চিৎ হইয়া শুইবেন। দুই পা এবং দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত রাখিবেন। তার পর দু'হাতে বেশ জোর করিয়া কোমর ধরিয়া ডান পা সিধা উর্দ্ধে তুলুন— সঙ্গে সঙ্গে মাথার দিকে বাঁ পা সোজা প্রসারিত করিয়া কাঁচির মত

ঐ ৩নং ছবির ভঙ্গীতে আনিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁ পা সবেগে সামনের দিকে প্রসারিত করুন। তার পর বাঁ পা ঊর্দ্ধে খাড়া তুলিয়া ডান পা মাথার দিকে এমনি কাঁচির ভঙ্গীতে আনিয়া সবেগে সামনের দিকে নিক্ষেপ। এ রীতিকে বলে কাঁচি কিক্। বেশ ক্ষিপ্র ভাবে এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট। প্রথমে কঠিন ঠেকিবে। তার পর অভ্যাসে ক্ষিপ্র হইবে। এ ব্যায়ামে সমস্ত দেহের গঠন হইবে সুকুমার—দেহের কোথাও ব্যাধির বিষ জমিতে পারিবে না।

৩। কাঁচি-কিক্

৪। এবার চাই একখানি চেয়ার। কাঠের চেয়ার হইলে কাঠের উপর একখানি কুশন চাপান্। চেয়ারের উপর ৪নং ছবির ভঙ্গীতে এ দিকে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া নীচে মেঝেয় মাথা রাখিবেন—হাত দু'খানির উপর মাথার ভর থাকিবে; ও দিকে হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত ঐ ৪নং ছবির মত হেলাইয়া দিন। তার পর ধীরে ধীরে চেয়ারে বসুন। বসিবার সময় পা দু'খানি ঝুলিয়া থাকিবে। চেয়ারে বসিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গুনুন। তার পর আবার দু'দিকে এমনি ভাবে মাথা ও পা হেলানো। এ-ব্যায়াম করা চাই সাত আট বার। এ-ব্যায়ামে তলপেট সুঠাম মেদহীন থাকিবে, দেহের গঠনে বৈকল্য ঘটিবে না; এবং পরিপাক-শক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকিবে।
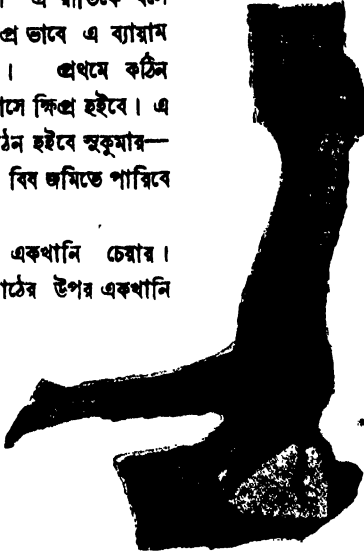
৫। এবার দু'হাতে মাথার ভর রাখিয়া মাথা হেলাইয়া চেয়ারে বসিয়া দুই পা প্রসারিত করিয়া দিন ৫নং ছবির ভঙ্গীতে। এমনি ভাবে বসিয়া দেহ দুলাইয়া ধীরে ধীরে দোল খাইতে হইবে প্রায় পাঁচ মিনিট। এ-ব্যায়ামে দেহের সমস্ত পেশী সবল থাকিবে এবং অঙ্গ-ছন্দ সুষমায় তরুণ থাকিবে।

৪। কোমর হইতে মাথা

৫। দু'পা প্রসারিত

সাম্য

সে দিন এক বিয়ে-বাড়ীতে মেয়ে-মজলিসে অনেক কথার মধ্যে একটা কথা উঠেছিল যে, মেয়ে-পুরুষে কোনো তফাৎ থাকবে না। অর্থাৎ সন্তান প্রসব করলেও মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমানে পাল্লা দিয়ে চলবে। পুরুষ পয়সা রোজগার করে—মেয়েরাও তাই করবে। পয়সার জন্ত স্বামি-পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার ফলে মেয়ে-জাত কোনো দিন মাথা তুলে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না! একটি পয়সার দরকার হলে স্বামি-পুত্রের কাছে হাত পাতা—লক্ষ কৈফিয়তী চেয়ে তাঁদের যদি দয়া হলো তো পয়সা মিললো, এ ভিখারীপনায় মেয়েদের মন মরে যাচ্ছে!

কথাটা খুব সত্য! সম্প্রতি দেশের এই দুর্দ্দশায় নিরন্ন নর-নারী বাড়ীর দোরে এসে যখন এক-মুষ্টি অন্নের জন্ত আর্ত্ত-নিবেদন তুলেছে, তখন তাদের এক মুঠো অন্ন দিতে না পেরে কত বাড়ীর গৃহিণী নিরালায় ঘরে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন—এমন ঘটনার কথা আমরা জানি! তার পর পুরুষরা যখন খুশী এটা-সেটা কিনছেন, বাজে কাজে পয়সা খরচ করছেন,—রেশে গিয়ে পয়সা নষ্ট করছেন। স্ত্রী-বেচারীদের গহনাও যে রেশের মাঠে ঘোড়ার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে আসছেন—তার বেলায় আমাদের দিক্ থেকে অনুযোগ তুলে কোনো কথা বলবার জো নেই!

এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিপদ-আপদে আমাদের মুখের পানে চেয়ে আমাদের শরণ নিতে পুরুষের বাধে না—আবার অসুখ-বিসুখে আমাদের উপরই পুরুষ যখন নির্ভর রাখে জীবন-মরণের বড় দায়ে, তখন আমাদের উপর কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী! এ বিশ্বাসটুকু সব সময়ে রাখতে পারো না কেন? বাজে দু'টো পয়সা যদি খরচ করতে চাই, তার জন্ত কেন তবে চাও কৈফিয়ৎ? সংসার পুরুষের একার সম্পত্তি নয়! পুরুষ ভাবে, সংসার যখন স্বচ্ছন্দে চলছে, তখন সে স্বাচ্ছন্দ্যের বিধাতা পুরুষই—একটু বিপর্য্যয় হলে খিঁচিয়ে পুরুষ মেয়েদের ধমক দেয়! ছেলে যদি ভালো হয়, পুরুষ বলবে, 'আমার ছেলে!' আর ছেলে যদি এগজামিনে ফেল করে কিম্বা কোনো রকম বেয়াড়া কিছু করে বসে, তাহলেই মেয়েদের করবে দায়ী-দোষী! ছোটখাট কত ব্যাপারে এমন কত বৈষম্য ঘটছে—এবং তা নিয়ে ঝগড়া-খিটিমিটিতে কত সংসারের শান্তি চির দিনের জন্ত বিনষ্ট হচ্ছে, একটু চোখ মেলে দেখলেই তা প্রত্যক্ষ হবে!
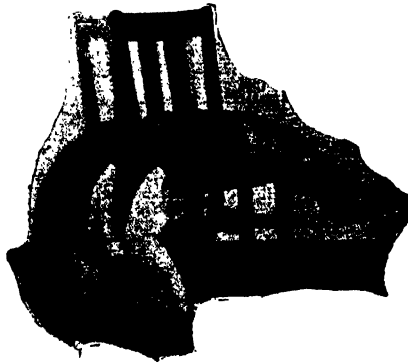
আমাদের কথা—বাইরে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাম্য আদায় করার আগে ঘরে এ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষ আমরা! আমরা চাই পয়সা-কড়ির সম্বন্ধে খানিকটা অধিকার! সংসারে বিনা-মাহিনার দাসী আমরা সত্যই নই! আমাদের কাছ থেকে কতখানি পাচ্ছো, সে সম্বন্ধে না হয় একটু বিবেচনা করো।

স্নেহ মায়া ভালোবাসা নয়,—দেনা-পাওনার দিক্ দিয়ে বিচার করো।

এ-কালের স্বামি-পুত্র যে নানা রকম "ইজ্‌ম্"এর নামে উন্মত্ত হয়ে সাম্য-প্রচার করছেন—সে সাম্য প্রতিষ্ঠা করো গৃহ-সংসারে! মা-বোন-মেয়ে এঁদের তুচ্ছ-তাচ্ছল্য না করে সম্মানে সম্ভ্রমে মর্য্যাদায় এঁদের সঙ্গে 'সাম্য' গড়ে তোলো! আমরা—যারা বি-এ এম-এ পাশ করিনি,—দুনিয়ার বিশেষ পরিচয় জানি না,—ঘরে থেকে তোমাদের স্বচ্ছন্দে রাখবার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছি সেই মান্ধাতার আমোল থেকে—তাদের মানুষ ভেবে,—তাদের মনের দিকে চেয়ে মানুষ বলে তোমাদের সঙ্গে এক-লেভেলে স্থান দাও। আমাদের ছেঁটে তোমাদের চলবে না। তোমাদের হেঁটে আমাদের চলবে না—এ কথা বুঝে আমাদের সঙ্গে সংসারে সাম্য গড়ো—সকলেরই তাতে লাভ হবে অনেকখানি! ঘর-সংসার আলোয় আলো হবে—উৎসাহে শক্তিতে সংসার প্রাণবন্ত হবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রুশ রণাঙ্গন—

পূর্ব্ব-য়ুরোপে পূর্ণ বিক্রমে রুশিয়ার শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। শীতের প্রারম্ভে—অর্থাৎ যখন প্রথম তুষারপাত আরম্ভ হয়, তখন রুশ ভূমি দুর্গম হইয়া পড়ে। এই জন্য নভেম্বর মাসে রুশ সেনার প্রতি-আক্রমণের গতি মন্থর হয়। এতদ্ব্যতীত, গত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে রুশ সেনার দ্রুত পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতিতে তাহাদের সরবরাহ-সূত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যও রুশ বাহিনীর পক্ষে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম-পরিচালনে অসুবিধা সৃষ্টি ঘটে।

এই সুযোগে জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রবল বেগে আক্রমণ চালান। কিয়েভ অঞ্চলে তাঁহাদের ৬ সপ্তাহব্যাপী আক্রমণ চলে; ঝিটোমীর ও কোরোষ্টেন্ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। তাহার পর রুশ সেনাপতি জেনারল ভতুতিন্ প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে পূর্ণ বিক্রমে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করেন। জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ম্যানষ্টিন ৬ সপ্তাহব্যাপী আক্রমণে যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, জেনারল ভতুতিনের ৬ দিনের পাল্টা আক্রমণে তাহা ব্যর্থ হয়। দেখিতে দেখিতে ঝিটোমীর, কোরোষ্টেন্, নভোগ্রাড-ভলিনস্কে প্রভৃতি সোভিয়েট বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয়; জানুয়ারী মাসের প্রথমে ওলেভস্ক ও করজেকের নিকট তাহারা পোল্ সীমান্ত অতিক্রম করে।

নভেম্বর মাসে রুশ সেনার প্রতি-আক্রমণে যখন শিথিলতা দেখা দেয়, তখন দক্ষিণে—নীপার বাঁকের মধ্যেও জার্ম্মাণদিগের আক্রমণের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন প্রত্যাঘাত আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি নীপার বাঁকের মধ্যে তাহারা কিরভো-গ্রাড্ অধিকার করিয়াছে। ইহার ফলে জার্ম্মাণ বাহিনী অতি সত্বর নীপার বাঁকের অবস্থান-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এদিকে পোল্ রাজ্যেও সোভিয়েট বাহিনী ৩৪ মাইল অগ্রসর হইয়া গুরুত্বপূর্ণ রেল-সংযোগ সার্ণি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। হোয়াইট্ রুশিয়া প্রদেশে ভাইটেবস্ক এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়াছে; ভাইটেবস্ক-পোলটস্ক রেলপথ এখন দ্বিখণ্ডিত, ভাইটেবস্ক-ওর্সা রাজপথ বিচ্ছিন্ন।

পোল্যাণ্ডের মধ্যে রুশ সেনার যে অভিযান প্রসারিত হইয়াছে, সমগ্র পূর্ব্ব-য়ুরোপের রণাঙ্গনে ইহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। এই অঞ্চলে রুশ সেনার অগ্রগতি যদি অপ্রতিহত থাকে, তাহা হইলে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যুদ্ধরত জার্ম্মাণদিগের পার্শ্বদেশ অরক্ষিত হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে ঐ সকল অঞ্চলে যুদ্ধরত জার্ম্মাণ সেনা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইবে।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে বিতর্ক—

রুশ সেনার পোল্ সীমান্ত অতিক্রমণে লণ্ডনস্থিত পোল্ সরকার অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—ইহাতে গভীর রাজনীতিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে; রুশিয়া যে পোল্ রিপাব্লিকের প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবে, সে বিষয়ে তাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

পোল্ সরকারের এই অশান্তির কারণ—রুশিয়ার সহিত তাঁহাদের কূটনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন; পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় রুশিয়া যে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। বিশেষতঃ, ইতঃপূর্ব্বে রুশিয়ায় পোলিস্ ইউনিয়ন ও একটি পোল্ বাহিনী গঠিত হইয়াছে; ইহাদিগকে রুশিয়া রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। তাহার পর, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর আক্রমণে পোল্যাণ্ড ধ্বংস হইবার সময় রুশিয়া ঐ রাজ্যের যে অংশ অধিকার করে, পোল্ সরকার তাহার শোক এখনও ভুলিতে পারেন নাই। পোল্ সরকারের এই অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় সহানুভূতি দেখাইবার লোকও জুটিয়াছে। তবে, লণ্ডনে বা ওয়াশিংটনে সরকারী ভাবে এই বিষয়ে কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা হয় নাই।

গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রুশিয়ার সহিত পোল্ সরকারের এক চুক্তি হইয়াছিল। এই চুক্তিতে উভয়ের শত্রু জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য পরস্পরের সহযোগিতার ব্যবস্থা হয়; রুশিয়া আশ্বাস দেয় যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পোল্-সোভিয়েট সীমান্তরেখাকে সে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিবে না। কিন্তু পোল্ সরকার রুশিয়ার সহিত তাঁহাদিগের এই মিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। গত যে মাসে জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিব গোয়েবেলস্ প্রচার করেন—রুশিয়া মিন্স্কে কয়েক সহস্র পোল্ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়াছিল; সম্প্রতি উহাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোল্ সরকার গোয়েবলসের এই "টোপ" গিলিয়া ফেলেন এবং রুশিয়াকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই আন্তর্জ্জাতিক রেড্-ক্রস্ সোসাইটীকে এই বিষয়ে

অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ জানান। স্বভাবতঃ রুশিয়া ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হয় এবং সে তখন পোল্ সরকারের সহিত কূটনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার সদস্যপদে কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সরকারই বৃটেনে আশ্রয় পাইয়াছে। এই সরকারের গুণ অশেষ। প্রথমতঃ,পোল্যাণ্ড নামে গণতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে তথায় পিল্‌সুডিস্কির সামরিক সহযোগী স্মীগ্‌লি রীজের এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল; মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁহারই অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন পোল্যাণ্ডে অত্যন্ত দারিদ্র্য ও অসন্তোষ ছিল; কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের দুঃখের অন্ত ছিল না। রুশিয়ায় বল্‌শেভিক্ বিপ্লব হইবার পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যখন রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে, তখন পিল্‌সুডিস্কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডও রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার ইউক্রেণ ও হোয়াইট্ রুশিয়া প্রদেশের কতকাংশ পোল্যাণ্ড অধিকার করিয়া লয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া তাহার ইউক্রেণ প্রদেশের হৃত অংশ (পোলিস্‌-ইউক্রেণ) এবং পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হোয়াইট রুশিয়ার অংশ (বীলো রুশিয়া) পুনরধিকার করিয়াছে। স্বভাবতঃ রুশিয়া ইহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে করে। ঐ দুইটি অঞ্চলের অধিবাসীকে সে পোল্ জমিদারদিগের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে জমি ও গৃহপালিত পশু প্রদান করিয়াছে, স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারও দিয়াছে। ইহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, রুশিয়ার সহিতই ইহাদের ঐতিহ্যগত যোগ রহিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার স্বজাতীয় অধিবাসীদিগের শান্তি ও সমৃদ্ধি ইহারা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

রুশ রাজ্যের অংশ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের অংশও পোল্যাণ্ড অন্যায় ভাবে কুক্ষিগত করিয়াছিল। সে লিথুনিয়ার ভিল্না কাড়িয়া লয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তখন পোল্যাণ্ড ঐ দুর্ভাগা রাজ্যেরও কতকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা চলে, তখন পোল্ সরকার ধুয়া তুলিয়াছিলেন যে, রুশ সেনাকে তাঁহারা পোল্ রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। অথচ, বৃটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে এই পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসের রক্ষার জন্যই রুশিয়ার আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিল। ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা ব্যর্থ হইবার একাধিক কারণ আছে; পোল্ সরকারের এই অসঙ্গত আচরণ সেই সকল কারণের অন্যতম। ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনার ব্যর্থতা বর্ত্তমান যুদ্ধের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণ। কাজেই, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য পোল্ সরকারের দায়িত্ব অল্প নহে.

লণ্ডনস্থিত পোল্ সরকারের সহিত রুশিয়া যে সীমান্ত সম্পর্কে আপোষ করিবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। পোলিস্ ইউক্রেণ ও বীলো রুশিয়াকে রুশিয়া তাহার নিজ রাজ্যের অংশ বলিয়াই মনে করে; সেই সম্পর্কে কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদে রুশিয়া কর্ণপাত করিবে না। আর, পোল্যাণ্ডের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কেও রুশিয়া সম্পূর্ণরূপে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মতামতের উপর নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ, রুশিয়ার পক্ষ হইতে ইতঃপূর্ব্বেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর অধিকৃত অঞ্চলের যে সকল সরকার এখন লণ্ডনে মজুত আছে, উহারা কখনও প্রতিনিধিস্থানীয় হইতে পারে না। রুশিয়ার সহিত পোল্-সরকারের কূটনীতিক সম্বন্ধ বজায় থাকিলেও যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ঐ সরকারের কথা বলিবার অধিকার রুশিয়া স্বীকার করিত না। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদিগের অধিকার সম্পর্কে সমর্থন খুঁজিবার জন্য আমেরিকায় যাইবেন। ইতঃপূর্ব্বেও পোল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে এবং ওয়াশিংটনের ওয়াল্ ষ্ট্রীটে বহু বার ধর্ণা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই; ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া মনে হয় না। মস্কৌ ও তেহরাণে রুশিয়ার দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। রুশিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে—প্রত্যেক অঞ্চলের জনমত অনুসারে তথাকার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, ইহাই আট্‌লাণ্টিক সনদের অর্থ। কথাটি যদি মনের মত না-ও হয়, তাহা হইলেও গণতন্ত্রের মুখোস-পরিহিত কোন রাজনীতিকের পক্ষে আটলাণ্টিক সনদের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

যুগোশ্লাভ-সমস্যা—

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে প্রমাণিত হইল—প্রাগযুদ্ধকালীন সরকার অচল। যুগোশ্লোভিয়া সম্পর্কেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে বল্‌কান জয় করিবার পরই জার্ম্মাণী রুশ-অভিযানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে থাকে। এই জন্য যুগোশ্লোভিয়ার প্রতিরোধ-কেন্দ্রগুলি তখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয় না। জার্ম্মাণী তখন যুগোশ্লাভ রাজ্যকে ইটালী, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়াকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐ রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করে। ইহারা কখনই যুগোশ্লোভিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের গরিলা যোদ্ধাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই।

এই গরিলা-প্রতিরোধ সম্বন্ধে প্রধানতঃ চেট্‌নিক্‌দিগের নামই পূর্ব্বে শ্রুত হইত। বৃটিশের আশ্রিত—বর্ত্তমানে কায়রোয় অবস্থিত যুগোশ্লাভ সরকারের সমর-সচিব মিহাইলোভিচ চেট্‌নিকদের নেতা। বহু পূর্ব্বে রুশিয়া মিহাইলোভিচের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। তখন এই আপত্তির প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই; মিহাইলোভিচের প্রকৃত রূপও যুগোশ্লাভ রাজ্যের বাহিরে কোন লোকে জানিতে পারে নাই। যুগোশ্লাভ সরকারের অন্যতম সদস্য মিহাইলোভিচ বরাবর বৃটিশের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিরোধী "পার্টিজ্যান" দলের নাম ইতঃপূর্ব্বে বিশেষ শ্রুত হয় নাই।

সম্প্রতি প্রকাশ পায়, এই "পার্টিজ্যান" দল ও তাহার কম্যুনিষ্ট নেতা টিটোই (প্রকৃত নাম জোসেফ ব্রজ) প্রকৃতপক্ষে যুগোশ্লাভিয়ার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। আর, মিহাইলোভিচের নেতৃত্বে যুগোশ্লোভিয়ায় সার্ব্বদিগের আন্দোলন চলিতেছে; মিহাইলোভিচ্ তথায় সার্ব্বদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। তিনি ফ্যাসিষ্টদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালন অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী তৎপরতাতেই অধিক ব্যস্ত। বর্ত্তমানে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বাধীনে ২॥ লক্ষ সৈন্য ১৫।১৬ ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। টিটোর দলে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই—সার্ব্ব, শ্লোভেন্, ক্রোট সকলেই তাঁহার দলভুক্ত; তবে সার্ব্বদিগের সংখ্যা কিছু কম। বর্ত্তমানে মিহাইলোভিচ অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন;

কয়েক সহস্র সার্ব্ব লইয়া তিনি সার্বিয়ার কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আর টিটোর সেনাবাহিনীর তৎপরতার ক্ষেত্র ডালমেসিয়ার উপকূল হইতে পূর্ব্ব বোসনিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত।

সম্প্রতি টিটোর নেতৃত্বাধীনে যুগোশ্লোভিয়া একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সরকার কায়রোস্থিত সরকারকে অস্বীকার করিয়াছেন। ইতোমধ্যে রুশিয়া ও বৃটেনের পক্ষ হইতে টিটো-সরকারের প্রধান কেন্দ্রে সামরিক মিশন প্রেরিত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় টিটোর প্রতিনিধিদিগের সহিত সম্মিলিত পক্ষের সামরিক প্রতিনিধিদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল। এই সম্মিলনে আলোচিত সামরিক প্রসঙ্গ অপ্রকাশিত থাকিলেও ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আসন্ন দ্বিতীয় রণাঙ্গনে সম্মিলিত পক্ষ কি ভাবে টিটোর দলের সহিত সহযোগিতা করিবেন, আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় উহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

যুগোশ্লোভিয়ায় টিটোর দলই এখন সম্মিলিত পক্ষের অধিক সাহায্য লাভ করিতেছেন; বল্‌কান্ অঞ্চলে যুদ্ধপরিচালন সম্পর্কে তাহাদিগের প্রতিনিধিদিগের সহিতই আলোচনা হইতেছে। ইহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বলকান্ অঞ্চলের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইবে। বাহির হইতে কেহ কোনরূপ ব্যবস্থা তথায় বলপূর্ব্বক চাপাইতে পারিবে না। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী টিটোর দলই হয়ত বল্‌কান সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব করিবে। যুগোশ্লোভিয়া রাজ্যটি বলকান অঞ্চলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কাজেই, এই রাজ্যের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী গণ-প্রতিনিধিরা প্রতিবেশী গ্রীস্, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর প্রতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

ইটালীয় রণাঙ্গন—

ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের গুরুত্বহীন সামরিক তৎপরতা চলিতেছে। তথায় ৮ম বাহিনী আদ্রিয়াতিকের উপকূলে অর্টোনা অধিকার করিয়া পেস্‌কারা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি পশ্চিম অঞ্চলে ৫ম বাহিনীর সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তাহারা সান্‌ভিটোর নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলষ্টেশন অধিকার করিয়াছে। তাহাদের লক্ষ্য রোমে যাইবার পথে ক্যাসিনো।

ইহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শীতকালে ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা আর বৃদ্ধি পাইবে না; শীতের কয়েকটি মাস তাঁহারা ইটালীতে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিবেন মাত্র। আগামী বসন্তকালে য়ুরোপে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনের জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আয়োজন চলিতেছে। ঐ সময় দক্ষিণ ইটালীর ঘাঁটীগুলি ব্যবহার করিয়া বলকানে আক্রমণ প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, জার্ম্মাণী এই সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ইতামধ্যে আদ্রিয়াতিকের কতকগুলি দ্বীপ হইতে যুগোশ্লোভিয়ার "পার্টিজ্যান" সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়াছে। ডালমেসিয়ার উপকূল অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল; তথায় সমুদ্রপথে অভিযাত্রী সেনাবাহিনী লইয়া যাওয়া দুষ্কর। তবে, দক্ষিণ ইটালী হইতে আল্‌বেনিয়ায় অভিযান চালান খুবই সম্ভব। সে যাহা হউক, ইটালী হইতে বল্‌কানে অভিযান প্রসারিত হইবার পর তখন একই সময়ে ইটালীতে, বল্‌কানে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রবল ভাবে আঘাত করিবার প্রয়াস হইবে বলিয়া মনে হয়। টিরানিয়ান্ সাগরের সার্দ্দিনিয়া ও কর্সিকা অধিকারে দক্ষিণ ফ্রান্সে আঘাতের ঘাঁটী সম্মিলিত পক্ষের লাভ হইয়াছে। তবে, এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য—ঈজিয়ান্ সাগরের ডোডোকানীজ দ্বীপপুঞ্জে অধিকার স্থাপনে অসামর্থ্য সম্মিলিত পক্ষের বল্‌কান্ অভিযানের পথে একটি বিঘ্ন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আয়োজন—

এত কাল পরে—ডিসেম্বর মাসে তেহরাণ সম্মিলনীর পর হইতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রকৃত আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। তেহরাণ সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত অনুসারে রুশ সেনাপতি মার্শাল ভরোশিলভ্ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কিত ব্যবস্থা তদারক করিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছেন। মার্কিণ সেনাপতি জেনারল আইসেনহাওয়ারকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের নেতৃত্বভার দেওয়া হইয়াছে; লণ্ডনে তাঁহার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনে বৃটিশ সৈন্য পরিচালনের ভার পাইয়াছেন জেনারল মণ্টগোমারী। পশ্চিম ও উত্তর য়ুরোপে অভিযান পরিচালনের প্রকৃত ঘাঁটী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ। তথায় সম্মিলিত পক্ষের বিরাট সমরায়োজন চলিয়াছে। আগামী বসন্তকালে যে সত্যই সম্মিলিত পক্ষের ব্যাপক অভিযান চালিত হইবে, লক্ষণ দেখিয়া তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না।

এই দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পূর্ব্বাভাসরূপে জার্ম্মাণীতে ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ দেখা যাইতেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টায় সম্মিলিত পক্ষের ৩ হাজার বিমান এই সকল অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে উত্তর ফ্রান্সে অভিযান-পরিচালনের ক্ষেত্রে —পাস দ্য ক্যালেতে এক দিন ১৩ শত বিমান আক্রমণ চালায়। এই বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সংবাদদাতা বলেন—বার্লিন ধ্বংস হইতেছে, রূঢ় চূর্ণ হইয়াছে, হাম্বুর্গ, ব্রেমেন্, ক্যাসেল এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট ধ্বংস-স্তূপে পরিণত।

কোন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ অভিযান-পরিচালনের পূর্ব্বে তথাকার প্রতিরোধ-কেন্দ্রগুলি বোমাবিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। প্রবল বোমাবর্ষণে প্রতিরোধ-কেন্দ্র যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সামরিক ও বেসামরিক অঞ্চলে যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তখন সুযোগ বুঝিয়া অভিযাত্রী বাহিনী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, অথবা সমুদ্রপথে আসিয়া অবতরণ করে। আক্রমণ-ঘাঁটী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে অভিযানের ক্ষেত্র পশ্চিম য়ুরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানবহরের এই আক্রমণ আসন্ন প্রত্যক্ষ অভিযানের পূর্ব্বাভাস মনে করা যাইতে পারে।

বেসামরিক জার্ম্মাণদিগের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিও এই বিমান-আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানবহরের এই আক্রমণ যদি তীব্রতার সহিত চলিতে থাকে, এই আক্রমণ প্রতিরোধে জার্ম্মাণীর বিমান-শক্তি যদি সত্যই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বেসামরিক জার্ম্মাণদিগের মনে উহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকরা মনে করেন—বেসামরিক জার্ম্মাণরা যখন রণক্ষেত্র হইতে ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক সংবাদ শ্রবণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের গৃহ ও জীবন রক্ষায় নাৎসী সরকারের অক্ষমতা প্রতিপন্ন হইবে, তখন তাহারা স্বভাবতঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে; নাৎসী সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদিগের সক্রিয় প্রতিবাদ দেখা দিবে।

সুদূর প্রাচী—

সম্মিলিত পক্ষের সেনা সম্প্রতি নিউবৃটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরাউই এবং গ্লাষ্টার অন্তরীপ অধিকার করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার

নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে নিউ বৃটেনের রাজধানী রবাউলই জাপানের বিশালতম ঘাঁটী। সম্মিলিত পক্ষ বর্ত্তমানে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখান হইতে রবাউলে প্রবল বিমান আক্রমণ চলিতে পারে; জাপানের সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করাও সহজসাধ্য। সম্প্রতি উত্তর নিউগিনিতে সাইদরে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

সম্পতি মার্কিণী নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন---জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপক নৌ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; এই নৌ-যুদ্ধেই চরম জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। বস্তুতঃ, নৌ-যুদ্ধই জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপে যে স্বীয় প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিতে চাহিবে, তাহাকে অপরাজেয় নৌ-শক্তির পরিচয় দিতে হইবে।

এই বৎসর শীতকালেও আরাকান্ অঞ্চলে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা কোন পক্ষেরই প্রত্যক্ষ অভিযান সম্পর্কিত তৎপরতা নহে।

পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে, এই শীতকালেই জাপান তাহার তত্ত্বাবধানে গঠিত ভারতীয় বাহিনীকে কৌশলে বাঙ্গালা ও আসামে প্রবেশ করাইয়া এই সকল অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জাপানের সেরূপ কোন তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। আর, এই সম্পর্কে যদি গুরুত্বহীন প্রয়াস হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সংবাদ সযত্নে গোপন রাখা হইতেছে। তবে, এই প্রয়াস যে সফল হয় নাই, তাহা বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রই বুঝিতেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন---১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালই জাপানের পক্ষে ব্রহ্ম-সীমান্তের রণাঙ্গনকে বাঙ্গালা ও আসামে প্রসারিত করিবার শেষ সুযোগ।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্রহ্ম অভিযানপ্রচেষ্টা সত্বর আরম্ভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। য়ুরোপের যুদ্ধ মিটিবার পর অথবা ঐ যুদ্ধ সাফল্যের সহিত কিছু দূর অগ্রসর হইলে তখন সম্মিলিত পক্ষ ভারত মহাসাগরে বিপুল নৌ-বহর সন্নিবেশ করিতে পারিবেন। উহা যত দিন সম্ভব না হইতেছে, তত দিন ব্রহ্ম-অভিযান মুলতুবী থাকিবে।

যদিও আরাকান সীমান্তের সঙ্ঘর্ষ কোন পক্ষেরই অভিযান সম্পর্কিত তৎপরতা নহে, তবুও সীমান্তের এই সঙ্ঘর্ষের কিছু গুরুত্ব আছে। সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষের সময় উভয় পক্ষ শত্রুর প্রকৃত শক্তি, তাহার প্রতিরোধের আয়োজন ও কৌশল জানিয়া লইতে প্রয়াসী হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ পাইলে সীমান্ত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ-ঘাঁটী হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। আরাকাম অঞ্চলের বর্ত্তমান সঙ্ঘর্ষের গুরুত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক নহে এবং উহা অন্য কিছুর পূর্ব্বাভাসও নহে।

১০।১।৪৪ শ্রীঅতুল দত্ত।

দাবী

মনে আমার সজাগ হয়ে বসো।
কেন আমায় এমন ক'রে দোষো!
যদিই কিছু ক'রে থাকি ভুল,
তাই ব'লে কি ফুটবে নাকো ফুল
সুবাসে তার আকুল বনতল
হবে না চঞ্চল?

ঝরেছে নয় শিশিরে সব পাতা,
ফাল্গুনে কি গড়তে পারে না তা'?
না হয় গেছে সুখের কলরব,
দুঃখ কেন হারাবে তা'র সব?
যা' আছে তা'র পুঁজি-পাটা বাকি
ফিরিয়ে দিবে না কি?

ভাগ্যে যদি থাকেই কোনো ত্রুটি
ব্যর্থ কি হায় এত ছোটাছুটি?
মিথ্যা হ'বে এত হাসি খেলা?
জানতো কে বা হঠাৎ যাবে বেলা,
আঁধার এসে ঢাকবে চারি ভিতে
ফিরবো মগ্ন-চিতে।

ঘরে ফিরে বলবো কি বা কাকে?
কোন্ সে ভোরে আঁধার থাকে-থাকে
বেরিয়েছিনু একলা শিশু আমি
ধরার বুকে, তোমায় খুঁজি স্বামী,
সন্ধ্যা হ'লো পেলেম নাকো দেখা—
ফিরতে হ'বে একা!

এবার আমি মানবো নাকো ভয়।
তাতে ক্ষতি হোক সে যত হয়!
বীরের মতো প্রাপ্য দাবী ক'রে,
উচ্চ শিরে অস্ত্র রবো ধরে,
তাতেও যদি না হয় নত হবো,
তোমায় ফিরে লবো।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

হিন্দু-মহাসভা

গত ৯ই পৌষ হইতে শিখদিগের মহাতীর্থ অমৃতসরে হিন্দু-মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ বার অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য :---

(১) হিন্দু-মহাসভার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইল এবং এই অধিবেশনে বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইবে, স্থির ছিল।

(২) এ বার অধিবেশন ও অধিবেশন-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীরাই সভাপতি ছিলেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি সাভারকার মহাশয় অসুস্থ হওয়ায় অমৃতসরে আসিতে বা অধিবেশনের জন্য কোন অভিভাষণ প্রেরণ করিতে পারেন নাই---কার্য্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদকেই অল্প সময়ের মধ্যে অভিভাষণ রচনা করিতে হইয়াছিল। সে সম্মানে শ্যামাপ্রসাদের অধিকার যে তাঁহার কার্য্যের ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষজনিত দুর্গতিতে তিনি যে কায করিয়াছেন, তাহা পঞ্জাবকে আকৃষ্ট করিয়া ভারতের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে হয়---

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

> "আপন ছেড়ে পরের মত
> ভাই ছেড়ে ভাই ক' দিন থাকে?"

জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনভার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি যে পূর্ব্বে কখন কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কায করেন নাই---বিশেষ তিনি যে বাঙ্গালায় মসলেম লীগ-প্রভাবিত প্রতিক্রিয়াশীল সচিবসঙ্ঘে সচিব ছিলেন, বোধ হয়, সেই সকল কথা স্মরণ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার দ্বিধায় বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা যে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নিখিল-ভারত হিন্দু প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

নিখিল-ভারত হিন্দু ছাত্র-সম্মিলনে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের ত্রুটি ও লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করেন। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ যে সমাজে---বিশেষ হিন্দু সমাজে---প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া তিনি পুনর্গঠন কার্য্যের যে পদ্ধতি উপস্থাপিত করেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান। সেই পুনর্গঠন ব্যতীত আবার সমাজ সবল হইবে না---দুর্গতির অবসান স্থায়ী হইবে না। সেই কার্য্যে তরুণগণের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্যম সুপ্রযুক্ত করিবার আহ্বান তাঁহার অভিভাষণে তূর্য্যনাদে ধ্বনিত হইয়াছিল।

সভাপতি শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত, সরল ও সবল। হিন্দু-মহাসভার প্রয়োজন, তাহার সাফল্য---এ সকল আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি সে সকল কথার আলোচনা করেন নাই এবং বলিয়াছেন---"যে প্রতিষ্ঠান সত্যের ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা লোকের মনে স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। আজ ভারতের যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে জাতীয় ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হিন্দু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু আমাদিগকে ঈর্ষা ও দলাদলি বর্জন করিতে হইবে। আজ হিন্দুজনগণকে সেই জাতীয় বিপদ কোথায়, তাহা বুঝাইয়া পরিচালিত করিতে হইবে। যদি হিন্দু-মহাসভা কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে অথবা যে সকল লোকের জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই---যাঁহারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থাকেন, সেইরূপ লোকের দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে হিন্দু-মহাসভা দেশে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না।"

জনগণের শক্তি যে অজেয় তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; সেই শক্তি সহজেই সুপ্রযুক্ত হইতে পারে এবং তাহা যদি ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহার দ্বারা অশেষ অকল্যাণ সাধিত হইতেও পারে। সেই জন্যই হস্তীকে ভারতের প্রতীক বলিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরেজ রাজনীতিক ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন :---

> "The huge mammal, India's symbol, is a docile beast, and may be ridden by a child. He is sensible, temparate, and easily attached. But ill-treatment he will not bear for ever, and when he is angered in earnest, his vast bulk alone makes him dangerous, and puts it beyond the strength of the strongest to guide him or control"

মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষের---হিন্দুস্থানের জনগণের মধ্যে হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ! সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদেশী রাজনীতিকের কৌশলে বা ভেদনীতিপরায়ণ বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদিগের ইচ্ছায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠতায় পরিণত হইতে পারে না। সে বিষয়ে সত্য গোপনে কুফল অনিবার্য্য হয়।

হিন্দু-মহাসভা সাম্প্রদায়িক হইলেও জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয়তাই তাহাকে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছে। যে দৌর্ব্বল্যপ্রণোদিত হইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সার আবদর রহিম আলিগড়ে মসলেম লীগের অধিবেশনে হিন্দু-মহাসভাকে মুসলমানদিগের রাজনীতিক অধিকারের শত্রু বলিয়া উগ্র ক্রোধে ভিত্তিহীন উক্তি করিয়াছিলেন, সে দৌর্ব্বল্য হিন্দু-মহাসভার নাই এবং হিন্দুমাত্রেরই আন্তরিক কামনা, সে দৌর্ব্বল্য যেন কখন হিন্দুকে অভিভূত না করে। কিন্তু অসঙ্গত আঘাত কেবল রোধ করাই নহে, পরন্তু আঘাতকারীকে ভূমিলুণ্ঠিত করিবার যে শক্তি তাহার আছে তাহা অনুশীলন দ্বারা বর্দ্ধিত ও সংযত করা তাহার অভিপ্রেত।

হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আরও কারণ আছে—তাহার দৃষ্টি ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ এবং সে ভারতবর্ষের বাহিরে কোন দিকে সাহায্যের সুযোগ সন্ধান করে না। ভারতবর্ষই তাহার সর্ব্বস্ব ; সে জানে —

"পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত,
ধূলিরূপে হেথা রয়েছে মিশ্রিত,
এই মাটী হ'তে হইবে উত্থিত
ভাবী কালে তা'র ভবিষ্য সন্তান।"

হিন্দুর সঙ্গত অধিকারে আঘাতের যে সম্ভাবনা সার আবদর রহিমের উল্লেখিত অভিভাষণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা তাহার পরে সত্যরূপে প্রকট হইয়াছে। ইংরেজ রাজনীতিকরা ভেদনীতির পরিচালনে নির্লজ্জ দৃঢ়তা দেখাইয়া যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে যে নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালায় কি হইয়াছে? যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ, সে সকল প্রদেশে মুসলমানদিগকে বিশেষ অধিকার অর্থাৎ "ওয়েটেজ" হিসাবে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগকে কেবল যে সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়া একদেশদর্শিতার পরিচয় প্রকট করা হইয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু বাঙ্গালায় য়ুরোপীয়রা (অর্থাৎ ইংরেজরা) সংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক অধিকার লাভ করিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে, আবার হিন্দুকে দুর্ব্বল করিবার জন্য "বর্ণহিন্দু" ও "তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়" দুই ভাগ করা হইয়াছে।

এই অবস্থায় হিন্দুর পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আর যাঁহারা তাহা চাহেন না তাঁহারা যে হিন্দু-মহাসভার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিবেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেই সম্প্রদায়ের দ্বারাই ভাগলপুরের অধিবেশনে হিন্দু মহাসভাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর এ বার মহাসভার সভাপতির অভিভাষণ ছল ধরিয়া বন্ধ করিয়া লাঠি প্রহারে ও ক্রন্দন গ্যাস ব্যবহারে উৎকট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটান হইয়াছিল। তাহার পরে সেই সংবাদ মিথ্যা বিবৃতির দ্বারা গোপন করিয়া—প্রকৃত সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করাও হইয়াছিল।

সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে প্রকৃত সংবাদ প্রেরণে নিষেধ জানাইয়া অমৃতসরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট "এসোসিয়েটেড প্রেসের" মারফতে মিথ্যা লিখিত বিবৃতি প্রচার করেন:—

"হিন্দু-মহাসভার শোভাযাত্রার জন্য যে ছাড় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সর্ত্ত ছিল, সরকারের সশস্ত্র চাকরীয়াদিগের পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরিয়া কেহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারিবেন না এবং অস্ত্রও লইয়া যাওয়া হইবে না। স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিকটে উপনীত হইয়া আমি দেখিতে পাই, অনেক স্বেচ্ছাসেবকের পোশাক সশস্ত্র চাকরীয়াদিগের পোশাকের অনুরূপ এবং কেহ কেহ অস্ত্রও লইয়াছিল। আমি সার গোকুলচাঁদ নারাং ও লালা কেশবচন্দ্র-প্রমুখ উদ্যোক্তৃগণকে ছাড়ের সর্ত্ত মানিতে বলি। মহাবীর দলের নেতা রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না ঘোষণা করেন, স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ পোশাক পরিয়াই শোভাযাত্রায় যাইবে। এই সংবাদ পাইয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় ছাড় বাতিল করেন। ইতোমধ্যে কিন্তু শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল এবং কাহারও কাহারও হস্তে উন্মুক্ত তরবার ছিল। যে ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রার কার্য্যে ছিলেন তিনি ছাড় বাতিল করার সংবাদ জানাইলে শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ ভাবে সরিয়া যায়।"

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের প্রতিনিধি বর্ণনা করেন—"পঞ্জাব সরকার হিন্দু মহাসভাকে বিষম লাঠি চার্জ্জ, গ্রেপ্তারের ভীতি প্রদর্শন ও শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গের আদেশ—'বড় দিনের' উপহার দিয়াছেন। এই উপহার সামগ্রীর মধ্যে 'ক্রন্দন গ্যাস' বোমাও ছিল।"

পঞ্জাব সরকারের সম্মতি লইয়া শোভাযাত্রার যে ছাড় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সহসা—শোভাযাত্রা আরম্ভ হইবার পরে অমৃতসরের রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা—বাতিল করা হয়। তাঁহারা "গ্যাস ছাড়িবার ব্যবস্থা, ২৫ জন বন্দুক লইয়া প্রস্তুত লোক, এক শত পুলিস, সওয়ার, প্রায় ১২ জন পুলিস কর্ম্মচারী এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হল গেটের বাহিরে প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন।"

যদিও শোভাযাত্রা আর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি লোককে লাঠি মারা হয় এবং যে হস্তিপৃষ্ঠে সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার গোকুলচাঁদ ছিলেন, তাহাকেও নাকি লাঠি মারা হইয়াছিল। তবে হস্তীকে ক্ষিপ্ত করিয়া আরও দুর্ঘটনা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাহা করা হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না।

এ সকল সংবাদ প্রচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

সার গোকুলচাঁদ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাতে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিলেও তাহা অসঙ্গত হয় না। কারণ, মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকদিগের খাঁকীবর্ণের জামা ব্যবহারে আপত্তি করিলে তাহা সকলকে বলিয়া দেওয়া হয় এবং সহর ম্যাজিষ্ট্রেট যখন আসিয়া শোভাযাত্রার ছাড় বাতিল করার সংবাদ জ্ঞাপন করেন তখন তাঁহাকে বলা হয়, সরকারের আদেশের প্রতিবাদে মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবকগণ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহা শুনিয়া যেন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা জানাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বা সহর-ম্যাজিষ্ট্রেট কি উত্তর দেন, তাহা জানিবার জন্য যখন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অপেক্ষা করিতেছিলেন তখন পুলিস আসিয়া শোভাযাত্রা ভাঙ্গিতে বলে।

লোক কাহার বিবৃতিতে আস্থাস্থাপন করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি সত্য হয়, তবে প্রায় ২ শত লোক কিরূপে আহত হইল?

সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, অমৃতসরের রাজকর্ম্মচারীরা শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন।

প্রয়াগের 'লীডার' বলিয়াছেন :---

সভাপতি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে শোভাযাত্রা আক্রমণের যে উল্লেখ করিয়াছিলেন অমৃতসর হইতে প্রেরিত সংবাদে তাহারও উল্লেখ ছিল না।

আজ এই ব্যাপারে অনেকেরই জালিয়ানওয়ালা বাগের ব্যাপার মনে পড়িবে। তখন রবীন্দ্রনাথ যে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "নিষেধ-রুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়া প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল।"

সভাপতি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৭শে ডিসেম্বর যে বিবৃতি প্রদান করেন এবং যাহা ৩০শের পূর্ব্বে কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই তাহার উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন :---

"আমি রাজকর্ম্মচারীদিগকে বলিতে চাহি, এই ভাবে তাঁহারা হিন্দু-মহাসভা দলিত করিতে পারেন না। এ বার যাহা ঘটিয়াছে তাহাতেই এ দেশে কোন নীতি শাসনকার্য্য প্রভাবিত করে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা কেবল হিন্দুদিগেরই অপমান নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের জনগণের আত্মসম্মানের অপমান। পঞ্জাবের হিন্দুরা তাঁহাদিগের নাগরিক ও রাজনীতিক অধিকার রক্ষার জন্য একযোগে তাঁহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মহাসভা প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।"

সে আজ অনেক দিনের কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বিনাবিচারে লালা লজপৎ রায়কে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন সেই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' পত্রে লিখিয়াছিলেন :---

"The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Punjab! Race of the Lion! show these men who would stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away a hundred Lajpats will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your war-cry Jai Hindusthan!"

সার মনোহরলাল পঞ্জাবের অন্যতম সচিব। তিনি অমৃতসরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আহতদিগকে দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, বলেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি পঞ্জাবের গভর্ণরকে এ বিষয় জানাইয়াছেন। তিনি সচিব হইলেও যাহা হইয়াছে, তাহা যদি বিলাতী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কথায় কি কোন কাষ হইবে?

অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়, এইরূপ কোন ব্যাপার করাচীতে মসলেম লীগের অধিবেশনের শোভাযাত্রায় ঘটে নাই।

হিন্দু-মহাসভা ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। সেই সমিতির কাযও শীঘ্রই শেষ হইবে। যদি সেই সমিতির রিপোর্ট এ দেশে নিষিদ্ধ-প্রচার না হয়, ভালই; যদি তাহা হয়, তবে কি তাহা অন্য দেশে প্রচারিত হইবে? ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি যদি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্ন হয়, তবে তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে?

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

গত ১৮ই পৌষ দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের গুরুত্ব এই যে, ইহাতে ভারতে বর্ষব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও পরীক্ষার ফল জানিতে পারা যায়। এ বার অধিবেশনে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বার অধিবেশন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কংগ্রেস রয়াল সোসাইটীর অধিবেশনে পরিণত হয় এবং তাহাতে (কংগ্রেসে নহে) মিষ্টার চার্চিচল, ফিল্ড মার্শাল স্মার্টস প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। রয়াল সোসাইটী বিলাতের প্রতিষ্ঠান এবং ইতঃপূর্ব্বে যেমন তাহার কোন অধিবেশন বিলাতের বাহিরে কোথাও হয় নাই, তেমনই ইহার দ্বার ভারতীয়দিগের পক্ষে মুক্ত করিতেও ভারতবাসীর সময় ও চেষ্টা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তবে যোগ্যতার দ্বারা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সে দ্বার মুক্ত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এ বার যে---সামরিক অবস্থাহেতু---ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রারম্ভে---(শেষে নহে) তাহাকে অস্থায়িভাবে রয়াল সোসাইটীতে পরিণত করা হইয়াছিল---তাহাতে আমাদিগের গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ নাই। কারণ, যুদ্ধের পরে আর এই ভাব যে থাকিবে, তাহা মনে হয় না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রয়াল সোসাইটীর জন্যই যে সাম্রাজ্যবাদী মিষ্টার চার্চিচল ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার বিরোধী এবং যে ফিল্ড মার্শাল স্মার্টসের দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী নাগরিকের সম্পূর্ণ অধিকারে বঞ্চিত তাঁহারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস যদি তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিতেন, তবে আমরা প্রীত হইতাম।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন প্রসঙ্গে লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন---

"বিজ্ঞানে ভারতের দান শান্তি ও উন্নতির পরিপোষক।" বোধ হয়, আজ য়ুরোপ ও মার্কিণ ইহা মনে করিতেছেন। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বিলাতের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার লয়েড জর্জ (১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী) জার্ম্মাণীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন---যুদ্ধে যদি জার্ম্মাণীর জয় হয়, তবে বৃটেন যে জার্ম্মাণীর অধীন হইবে সে জার্ম্মাণী বিজ্ঞানকে মানুষের সেবায় প্রযুক্ত করে নাই ---তাহাকে ধ্বংস ও মৃত্যুর রথে যুক্ত করিয়াছে---সে জার্ম্মাণী বাহুবল, অনাচার নির্ম্মমতার পক্ষপাতী। সে কথা সত্য, কিন্তু এ বার কি---কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উৎপাটিত করিবার জন্য---সমগ্র য়ুরোপ ও মার্কিণ সেই উপায়ই অবলম্বন করে নাই? তাহারাও আজ বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে---ধ্বংস ও মৃত্যুর কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-সাধনা যে সেরূপ কার্য্যে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহার কারণ যত দিন প্রতীচী বুঝিয়া তাহার অনুরাগী না হইবে, তত দিন তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না; তাহার শক্তি-সাধনা ব্যর্থ হইবে।

লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন---ভারতবর্ষ প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতমের অধিকারী। সে হয়ত নূতন বিজ্ঞানের অনুশীলন-প্রয়োজন কিছু বিলম্বে অনুভব করিয়াছে। তাহার মনোযোগ অধ্যাত্মরাজ্যে অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনবল, উপকরণসম্ভার যথেষ্ট---সে সকলের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, তাহাকেও নূতন বিজ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই বহু প্রথিতকীর্ত্তি বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি হইয়াছে---তাহার গর্ভে আরও

অনেক বৈজ্ঞানিক জন্মলাভ করিবেন। এখন যদি ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত নূতন বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন করিতে পারে, তবে তাহাতে তাহার অনেক লাভ অনিবার্য্য হইবে। গত ৩৫ বৎসরে ভারতবর্ষ এ দিকে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মুখে নূতন ও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। তাহাতে সমরান্ত পুনর্গঠনকার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে।

আমরা কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি—এ দেশে যখনই কোন কার্য্যে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এ দেশের বিদেশী সরকার এ দেশের বৈজ্ঞানিকদিগকে কার্য্যভার না দিয়া বিদেশ হইতে বৈজ্ঞানিক আনাইয়াছেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণ কেবল যে এ দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহাই নহে—তাঁহারা এ দেশের অর্থে এ দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার স্থায়ী ফলও এ দেশের লোক সম্ভোগের সুযোগে বঞ্চিত হয়। সে ক্ষতিও অল্প নহে।

যদি বর্ত্তমান যুদ্ধের পরে, যখন বিদেশী বৈজ্ঞানিক সুলভ হইবে, তখনও ভারত সরকার এ দেশের প্রতিভার আদর করেন, তবে যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের পরবশ্যতার দুঃখ যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, বোধ হয়, পূর্ব্বে কখন তেমন হয় নাই। খাদ্য সম্বন্ধেও ভারতের—কৃষিপ্রধান দেশের পরবশ্যতার পরিচয় আমরা অনশনে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুতে পাইয়াছি। সেই জন্য যেমন বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষি শাখায় ডাক্তার বলের ভারতে খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদন বিষয়ক অভিভাষণ, তেমনই এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু শাখায় মিষ্টার গান্ধীর অভিভাষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্ম ও মালয় জাপানের হস্তগত হওয়ায় ভারতবর্ষে চাউল, কাষ্ঠ, রবার, ও পেট্রলের অভাব প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে পেট্রল আছে—তাহার উৎপাদনে আবশ্যক মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই; ভারতবর্ষে রবার গাছের চাষ সহজসাধ্য; ভারতে কাষ্ঠের জন্য বন বিভাগের উন্নতি সাধনও হইতে পারে; ধান্যের চাষে ফলনবৃদ্ধি সহজে হয়। সে সকল বিষয়ে যে আবশ্যক মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই—বিজ্ঞানের সাহায্য যথাযথরূপে গৃহীত হয় নাই, সে জন্য কে দায়ী? এ দেশে কুইনাইনের জন্য সিনকোনা গাছের চাষ যে আবশ্যকরূপ হয় নাই, তাহার ফল আজ আমরা ভোগ করিতেছি। কেন এ দেশের সরকার চাউল, কাষ্ঠ ও পেট্রলের জন্য ব্রহ্মের উপর, রবারের জন্য ব্রহ্ম ও মালয়ের উপর; কুইনাইনের জন্য যাভার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন?

বিজ্ঞান এ দেশে যে সকল উন্নতির কারণ হইতে পারিত, সে সকল উন্নতি অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত হইয়াছে।

আজ আমরা জিজ্ঞাসা করি—অতীতের ভ্রম ও ত্রুটি ত্যাগ করিয়া কি বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে কায করা হইবে?

—

বাঙ্গালার স্বরূপ

আজ বিদেশে ও এ দেশে যে সকল বিদেশী শাসক ও রাজনীতিক বলিতেছেন, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের অবসান হইয়াছে, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাই তাঁহাদিগের সেরূপ উক্তির কারণ, কি তাহা রাজনীতিক কারণের উৎস হইতে উদগত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

বাঙ্গালার যে দুর্ভিক্ষের সংবাদ যত দিন সম্ভব পৃথিবীর নিকট হইতে গোপন রাখিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল, সেই দুর্ভিক্ষের অবসান ত হয়-ই নাই, অধিকন্তু দুর্দ্দশার নূতন কারণ উদ্ভূত হইয়াছে। যে সকল সামরিক কর্ম্মচারী বাঙ্গালায় সাহায্যদানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অন্যতম—মেজর জেনারল ডগলাস ষ্টুয়ার্ট গত ১১ই জানুয়ারী যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কয়টি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

(১) "দুর্ভিক্ষে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে গ্রামসমূহে লোকের জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কর্ম্মকার, সূত্রধর এবং আর যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের কার্য্যে রত থাকিত, তাহারা অনেক স্থানে মরিয়া গিয়াছে এবং সেই সকল শিল্পীর শূন্য স্থান পূর্ণ করা কষ্টকর।"

এই অবস্থা যখন আরম্ভ হয়, তখনই এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ তখন দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেই ব্যস্ত ছিলেন গুরুত্ব স্বীকার করা ত পরের কথা। ইতঃপূর্ব্বে লর্ড লরেন্স ও লর্ড নর্থব্রুক স্বীকার করিয়াছিলেন—লোক যাহাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং লর্ড কার্জনও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বড় লাট দুই জন—লোকের অনাহারে মৃত্যুর জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ব্যক্তিগত ভাবেও দায়ী করিয়াছিলেন। আর বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যত অযোগ্যতার পরিচয়ই কেন প্রদান করুন না—গভর্ণর ও বড়লাটও দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন না।

জেনারল ষ্টুয়ার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই পুনর্গঠনকার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে।

(২) "সমর বিভাগ এখন দেশীয় নৌকাগুলির সংস্কার সাধন করিয়া সেগুলি ব্যবহারযোগ্য করিতে সাহায্য করিতেছেন। আর ৬ সপ্তাহের মধ্যে সেরূপ শত শত নৌকা ব্যবহারযোগ্য করিয়া লোককে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।"

যে অকারণ আশঙ্কায় বাঙ্গালার গভর্ণর এই সকল নৌকা অপসারিত করিয়া দেশের কৃষি ও শিল্পের ব্যবস্থায় শোচনীয় বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিলেন, তাহা যে কল্পনা ব্যতীত বাস্তব ছিল না, তাহা আজ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যে অতিরিক্ত উৎসাহী কর্ম্মচারীরা নৌকা কাড়িয়া লইয়া পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাও জানা গিয়াছে। দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ কি আর কোথাও সম্ভব হইয়াছে? সে ক্ষতি কবে পূর্ণ হইবে?

(৩) (ক) "দক্ষিণ-বঙ্গে ১৭টি কেন্দ্রে হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। সে সকল রোগীতে পূর্ণ—অধিকাংশ রোগীই স্ত্রীলোক ও শিশু। লোক যেন এই প্রথম প্রকৃত চিকিৎসা লাভ করিতেছে।"

(খ) "৪০টি যাযাবর চিকিৎসালয়ে বহু লোক চিকিৎসিত হইতেছে। এই সকলের জন্য সর্ব্ববিধ যান ব্যবহার করিতে হইতেছে—ভারবাহী অশ্ব, বাইসাইকেল প্রভৃতি কোন যানই বাদ যাইতেছে না। এই সকল চিকিৎসা-কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়াপীড়িত।"

এই যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ ম্যালেরিয়ায় পীড়িত এবং বহু লোক কলেরায় মরিয়াছে ও মরিতেছে—ইহার জন্য কে দায়ী? যে দুর্ভিক্ষের কথায় মিষ্টার ডিগ্‌বী বলিয়াছিলেন, সেই দুর্ভিক্ষে ইংরেজ সরকার

সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সেই (১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ) দুর্ভিক্ষ লোককে আক্রমণ করিবারও পূর্ব্বে সরকার---দুর্ভিক্ষের পরে ব্যাধির বিস্তার-সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা অবলম্বন করাও প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, লোকের অন্নাভাব না হওয়ায় ব্যাধি-বিস্তার ঘটে নাই। আর এ বার আজও আবশ্যক ব্যবস্থা হইল না। এ যেন মানবের জীবন লইয়া খেলা করা হইতেছে।

জেনারল ষ্টুয়াট বলিয়াছেন :---

(১) "এখনও চিকিৎসাক্ষেত্রে করণীয় অনেক কায রহিয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে যত লোক ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হয়, এখন তাহার চারি বা পাচ গুণ লোক ম্যালেরিয়ায় কাতর। আমি যে গৃহেই গিয়াছি তথায়ই হয় কেহ কেহ ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে---নহেত কেহ কেহ ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত।------এখনও আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যাইতেছে না।"

(২) "কলেরা এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বসন্ত ব্যাপকরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু টিকা দিবার আবশ্যক দ্রব্যের অভাব।"

(৩) "কাপড় ও কম্বল এখন (এত দিনে) হাসপাতালে ও দুর্গতাশ্রয়ে পৌছিতেছে। কিন্তু আরও কাপড়ের ও কম্বলের প্রয়োজন।"

এ সকল কথা আমাদিগের নহে---সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সমর বিভাগের এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর।

সরকার যে সকল দুর্গতাশ্রয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে সকলেও তবে এত দিনে কাপড় ও কম্বল পৌছিতেছে! আর এখনও আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যাইতেছে না।

ইহার ফলে দুর্গত বাঙ্গালার দুর্গতি আরও কত বর্দ্ধিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর সার টমাস রাখারফোর্ড বলিয়াছিলেন, আমন ধান সংগৃহীত হইলেই বাঙ্গালার দুর্গতির অবসান হইবে, আর তিনি আশা করেন, জানুয়ারী মাসের শেষে চাউলের মূল্য ১০ টাকা মণ হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, আমন ধান সংগৃহীত হইলেও লোকের দুর্গতির অবসান হইল না এবং জানুয়ারী মাসের শেষে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। বাঙ্গালীর মৃত্যুতে বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা সমাধান করা কখনই কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না।

ইহার পরে যদি সচিবসঙ্ঘ আবার খাদ্য-শস্য লইয়া গত বারের মত অবস্থা ঘটান, তবে সত্যই বাঙ্গালীর মৃত্যুতে বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে।

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার সমাধান যে সুষ্ঠুভাবে হইতেছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ভারত সরকারের খাদ্য-সচিব বলিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার বাহির হইতে বাঙ্গালায় যে খাদ্য-শস্য ও খাদ্য-দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহা অতল গহ্বরে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পর কয়টি বিষয় উল্লেখযোগ্য :---

(১) বড়লাট স্বীকার করিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যা প্রাদেশিক ব্যাপার নহে।

(২) বাঙ্গালা সরকারকে তিনি "ঘর গুছাইতে" কয় মাস সময় দিয়াছিলেন। অর্থাৎ বাঙ্গালা সরকার তাহার মধ্যে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের অযোগ্য হস্ত হইতে বাঙ্গালার খাদ্যবিষয়ক কার্য্যভার কাড়িয়া লওয়া হইবে।

(৩) কলিকাতা ও শ্রমশিল্পকেন্দ্র অঞ্চলে খাদ্য-সরবরাহের ও খাদ্য-বণ্টনের ভার ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) ভারত সরকার কয় জন সামরিক কর্ম্মচারীকে বাঙ্গালায় খাদ্যবিষয়ক ও চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(৫) ভারত সরকার ভারত-শাসন আইনের ১২৬এ ধারা অনুসারে বাঙ্গালা সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কলিকাতায় "রেশনিং" ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) বাঙ্গালা সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারা কেবল সরকারী দোকানেই খাদ্য সরবরাহ করিবেন---সে ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া কেন্দ্রী সরকার বলিয়াছেন, যথাসম্ভব ব্যবসার স্বাভাবিক উপায় রক্ষা করিতে হইবে এবং শতকরা ৫৫খানি বেসরকারী দোকান ব্যবহার করিতে হইবে।

যখন কেন্দ্রী সরকারের ৬ষ্ঠ ও ৭ম নির্দ্দেশ প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছিলেন---কেন্দ্রী সরকার কার্য্য-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাহার পরে বাঙ্গালার সচিব-সমর্থক দলের ২ ব্যক্তি কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-সচিব সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলিয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যক্তিদ্বয়ের উক্তির মূল্য কি, তাহা আমরা জানি---সকলেই জানেন।

সে যাহাই হউক, দিল্লীতে চাউল সম্বন্ধে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কেবল মিষ্টার সুরাবর্দ্দীই উপস্থিত ছিলেন না, পরন্তু, খাজা সার নাজিমুদ্দীনও বিমানযোগে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় বোধ হয়, তাঁহাদিগের অবস্থাবোধ হইয়াছে। জানা যাইতেছে :---

"বাঙ্গালার সচিবরা কেন্দ্রী সরকারের সহিত আমন ধান সংগ্রহ সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা দিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বেই---আমন ধান্য সংগ্রহকার্য্যে কেন্দ্রী সরকারের লোককেও নিযুক্ত করিতে হইবে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় আমন ধান্য সংগ্রহের জন্য যে ৪ জন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ২ জন কেন্দ্রী সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। আর বাঙ্গালা সরকারকে খাদ্য-বণ্টন ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবসার যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিতে হইবে।"

বাঙ্গালা সরকার কিন্তু ইতোমধ্যেই এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হয়, "এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে?"---আপনার ক্ষমতা না বুঝিয়া কায করিলে এমনই হয়। খাদ্য-বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে হয়। ইতঃপূর্ব্বেই কেবল সরকারী দোকানে কলিকাতার খাদ্য-বণ্টনের যে ব্যবস্থা বাঙ্গালা সরকার করিয়াছিলেন, তাহা কেন্দ্রী সরকার বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এখন যে বাঙ্গালা সরকারের ব্যবস্থার আরও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

দিল্লী হইতে আসিয়া মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চাউলের ও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের সঙ্গতমূল্য কি হইবে, তাহা কেন্দ্রী সরকার নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

যদি তাহাই হয়, তবে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ কি করিবেন? তাঁহারা

কি কেবল কেন্দ্রী সরকারের নির্দ্দেশ পালন করিয়া বেতন সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইবেন?

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন—"যত দিন চাউলের মূল্য লইয়া ফাটকা চলিবে এবং সরকার চাউল ক্রয় করিবেন বলিয়া লোক মূল্য বৃদ্ধি করিবে, তত দিন সরকার চাউল কিনিবেন না। যখন মূল্যের চাঞ্চল্য না ঘটাইয়া চাউল ক্রয় করা যাইবে, কেবল তখনই সরকার চাউল কিনিবেন?"

কিন্তু জেনারল ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন:—

"গত ৭ সপ্তাহে বাঙ্গালায় সমর বিভাগ ১০ লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য স্থানান্তরিত করিয়াছেন।--------বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রভূত পরিমাণ চাউল সঞ্চিত করিতেছেন।"

যদি ইতোমধ্যেই ১০ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করা হইয়া থাকে, তবে, তাহা কি কেন্দ্রী সরকারের অনুমতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিয়া হইয়াছে? আজ যে—আমন ধানের চাউল বাজারে আসিতে না আসিতে আবার দাম বাড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে এবং কোন কোন স্থানে বাজার হইতে চাউল অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা কি সরকারের গত ৭ সপ্তাহে ১০ লক্ষ মণ চাউল ক্রয়ের অনিবার্য্য ফল নহে?

যদি এইরূপ চলে, তবে যে বাঙ্গালায় আবার তীব্রতম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আমরা কেন্দ্রী সরকারকে বলিব—বাঙ্গালায় সচিবসঙ্ঘ রাখা যদি রাজনীতিক কারণে তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন, তবে বেতন দিয়া সচিবদিগকে রাখা হউক—কিন্তু বাঙ্গালার খাদ্য-ব্যবস্থায় যেন তাঁহারা কেন্দ্রী সরকারের নির্দ্দেশানুসারেও—হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন। যদি গত অভিজ্ঞতার পরেও তাঁহাদিগকে সে কাযের ভার দেওয়া হয়, তবে—"ভগবান বাঙ্গালাকে রক্ষা করুন।"

সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মিলন

গত ২৫শে পৌষ মাদ্রাজে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। মাদ্রাজের প্রবীণ সাংবাদিক মিষ্টার জি, এ, নটেশন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতিনিধিদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবার পর পূর্ব্ব-বৎসরের সভাপতি শ্রীযত কস্তুরীরঙ্গ শ্রীনিবাসন বক্তৃতা দিয়া নূতন সভাপতি মিষ্টার সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভীকে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আহ্বান করেন।

মিষ্টার ব্রেলভী তাঁহার অভিভাষণে এ দেশে সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারের নীতির নিন্দা করিয়া—নিন্দার্হ অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন যে, গণতন্ত্র ব্যতীত কোথাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্ভুক্ত হইতে পারে না। আজ যে এ দেশে সংবাদপত্র বৃটেনের বা আমেরিকার সংবাদপত্রের মত স্বাধীনতা সম্ভোগ করে না, সরকারের প্রকৃতিই তাহার কারণ।

কোথাও কিছু দিনের জন্য সংবাদপত্র প্রচার নিষিদ্ধ করা, কোথাও প্রকাশের পূর্ব্বে প্রবন্ধ সরকারের কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইবার আদেশ প্রদান—এই সকলের উল্লেখ করিয়া মিষ্টার ব্রেলভী বলেন, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের মত দারুণ দুরবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না। অথচ সামরিক অবস্থার অজুহতে সেই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ বহু দিন প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

তিনি ইচ্ছা করিলে আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারিতেন। বোধ হয়, বাহুল্যবোধে তাহা করেন নাই।

সংবাদপত্রকে এ দেশে কিরূপ অবস্থায়—কত বিপদবরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা এ বার অমৃতসরে হিন্দু-মহাসভার সভাপতির শোভাযাত্রাভঙ্গেও পাইয়াছি। পঞ্জাবের সংবাদপত্রসমূহ—সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিষেধ পালন না করিয়া—শোভাযাত্রা ভঙ্গের প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই দেশের লোক প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি, সার সুলতান আমেদ কেন্দ্রী সরকারের সদস্যরূপে সংবাদপত্রসমূহকে বলিয়াছিলেন, তিনি সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষায় অবহিত থাকিবেন। তিনি কি ভাবে সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষায় অবহিত, তাহা অমৃতসরের ব্যাপারেই বুঝিতে পারা যায়। অমৃতসরে যে বা যে যে কর্ম্মচারী সত্য সংবাদগোপনের ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য দায়ী, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি সার সুলতান আমেদ তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বিবেচনা করেন? কারণ, তিনি বা তাঁহারা কেবল মিথ্যাই প্রচার করেন নাই—যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সার সুলতান আমেদকে মিথ্যাবাদী করিয়াছেন কি না, তাহাও নিশ্চয়ই বিবেচ্য বিষয়।

সংবাদপত্র জনগণের মুখপত্র। যে সরকার জনগণের অধিকার স্বীকারে আগ্রহশীল নহেন, সে সরকার সংবাদপত্রের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিবেন?

মানকুমারী বসু

কয় দিন লুপ্তচেতনা থাকিবার পরে গত ১০ই পৌষ মহিলা কবি মানকুমারী বসু লোকান্তরিতা হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। যে বংশে মধুসূদনের জন্ম হয় সাগরদাঁড়ীর সেই দত্ত-পরিবারে মানকুমারী ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্বন্ধে মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী—পিতৃব্য-পুত্রের কন্যা ছিলেন। তিনি একটি মাত্র সন্তান কন্যাকে লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যশঃ অর্জ্জন করেন। তাঁহার বহু কবিতা বিশেষ আদরলাভ করিয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় আকৃষ্ট হইয়া পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন তাঁহার প্রথম কবিতা-সংগ্রহ পুস্তকের সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কন্যাকেও হারাইয়াছিলেন এবং জামাতার গৃহে খুলনায় থাকিতেন। গত ২ বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার প্রাচীনপন্থী শেষ মহিলা কবির তিরোধান হইল।

পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি

ঢাকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার ঢাকাস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে ও পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

প্রভাবতী বসু

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সুনীলচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি সুপরিচিত পুত্রগণের জননী প্রভাবতী বসু গত ১২ই পৌষ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল স্বামী জানকীনাথ বসুর কর্মক্ষেত্র কটকে ছিলেন এবং যখনই অবসর

প্রভাবতী বসু

পাইতেন—পুরীধামে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন। পুরীতে জানকীনাথের গৃহ—জগন্নাথধাম হইতে প্রতিদিন নানা দেবালয়ে ও মঠে পুষ্প ও গোদুগ্ধ প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। আজ আমরা তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে তাঁহাদিগের মাতৃশোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। শরৎচন্দ্র আজ বন্দী। সরকার কি তাঁহাকে মাতৃশ্রাদ্ধের জন্যও আসিতে দিতে অসম্মত হইবেন?

সুধীর রায়

গত ১লা পৌষ ৫৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ জামাতা সুধীর রায় আদালতে একটি মামলা করিতে করিতে সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। বিচারক সুধীরঞ্জন দাশ তখনই মামলার শুনানী বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে আপনার খাস কামরায় লইয়া যাইবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন — অর্দ্ধ

সুধীর রায়

ঘণ্টার মধ্যেই সুধীরের মৃত্যু হয়। ছাত্রাবস্থায় সুধীর প্রতিভাবান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিছু দিন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনা করিবার পরে তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের প্রথমা কন্যা কল্যাণী অপর্ণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল এবং তিনি কল্যাণী অপর্ণার সহিত একযোগে কীর্ত্তন গানের একখানি পুস্তক সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্ত্তমান। আমরা সুধীরের মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

গোপেশ্বর পাল

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, খ্যাতনামা ভাস্কর গোপেশ্বর পাল গত ৯ই জানুয়ারী সন্ন্যাস রোগে অতর্কিতভাবে কৃষ্ণনগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর প্রসিদ্ধ ভাস্কর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া তাহা অনুশীলন দ্বারা তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি মৃন্ময় মূর্ত্তি রচনা হইতে ক্রমে প্রস্তরে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার সেন

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ সাহিত্যিক অশ্বিনীকুমার সেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি খুলনা সেনহাটীর বৈদ্য-পরিবারে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক পীতাম্বর সেন 'নাড়ীপ্রকাশ' ও পিতা বরদাচরণ 'বংশাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার পঠদ্দশা হইতেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং 'সন্তাবশতকের কবি', 'স্মৃতিপূজা' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। অশ্বিনীকুমার যে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' রচনায় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা সতীশ বাবু পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শক্তি ও শিব

মাঘ, ১৩৫০]

[শিল্পী—শ্রীনিশানাথ মজুমদার

২২শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৫০ | ৪র্থ সংখ্যা

নাটকের অভ্যন্তরে নাটক

আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প এবং তার মধ্যে আর একটি গল্প গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতিতে এই অদ্ভুত পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে চীনা বাক্সের সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন—একটি বাক্সের মধ্যে আর একটি বাক্স, তার মধ্যে আর একটি—এই ভাবে গল্প সাজাইবার পদ্ধতি অনেক স্থলে আমরা পাই।

এই রকমেরই আর একটি ধারা আমাদের কাব্য ও নাটকেও দেখা যায়। কাব্য বা নাটকের মধ্যে আর একটি কাব্যগীত বা নাটক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। দৃষ্টান্তটি বিলাতী হইলেও অনেকেরই সুপরিচিত। সেক্স্‌পীয়র হ্যামলেট নাটকের মধ্যে অতি সুকৌশলে আর একটি অভিনয় জুড়িয়া দিয়াছেন। রাজপুত্র হ্যামলেটের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথা তাঁহার মাতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ। তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। কিন্তু হ্যামলেটের সন্দেহান্দোলিত চিত্ত প্রমাণের জন্য পাগল হইয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র এক অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজমুকুট এবং রাণী এই উভয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারই সম্মুখে এই কৌশলময় অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইল। যে নাটক অভিনীত হইল তাহা এক রাজমহিষীর কলঙ্ক-কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। অভিনেতার দল প্রাসাদে আসিলে হ্যামলেট তাহাদিগের জন্য নূতন 'অংশ' যোজনা করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে রীতিমত অভিনয় শিখাইয়া দিলেন। পিতৃব্য রাজা ও রাণীর (হ্যামলেটের মাতা) সম্মুখে অভিনয় হইতে লাগিল। স্বকৃত পাপের জীবন্ত চিত্র অভিনয়-কৌশলে চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া উভয়েই আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজা বিচলিত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

Ophelia. The King rises.

Hamlet. What, frightened with false fires ?

King. Give me some light. Away.

অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই উঠিয়া পড়িলেন।

হ্যাম্‌লেটের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি যে অভ্রান্ত প্রমাণ চাহিতেছিলেন, অভিনয়ের ছল করিয়া তাহা পাইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এই যে নাটকের মধ্যে নাটক, কাব্যের [illegible]গাসে ইহা একটি অসাধারণ ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেও এইরূপ যোগাযোগের সুন্দর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। বাল্মীকি মুনির আশ্রমে লালিত কিশোর বালক লব ও কুশ যজ্ঞসভায় রামচরিত গান করিলেন। রাম স্বয়ং শ্রোতা, তাঁহারই চরিত্র অবলম্বনে মহর্ষি কর্ত্তৃক যে মহাকাব্য রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল, রামেরই যমজ আত্মজ কর্ত্তৃক তন্ত্রীলয়-সমন্বিত হইয়া তাঁহার রাজ-সভায় গীত হইল। গীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাব্য কি বিষয়ে, ইহার রচয়িতাই বা কে?

মুনির পালিত পুত্রদ্বয় কুশীলব উত্তর করিলেন :—

> বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্॥
> আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্। পঞ্চসর্গশতানি চ।
> কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥
> কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব।
> প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবৎ তাবৎ সর্ব্বস্য বর্ত্ততে॥
>
> রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৯৪তম সর্গ।

অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড সমেত সপ্তকাণ্ড কাব্য মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আপনার জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য।

অপূর্ব পরিবেশ। রাম রাজসভায় বসিয়া এক জন মহামনি কর্ত্তৃক উদ্‌গিরিত স্বকীয় জীবনাখ্যান নিজেরই পুত্রের মুখে শুনিতেছেন। তখনও তিনি জানেন না যে, লবকুশ তাঁহারই পুত্র। সভাসদেরা ভাবিতেছেন, আহা, ইহাদের যদি জটা না থাকিত, যদি বল্কল না থাকিত, তাহা হইলে এই গায়কেরা দেখিতে ঠিক রাঘবের মতই হইত।

জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ॥

এই রামায়ণ-গান যে শুধু গানের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা নহে; এই গানের ফলে কাব্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রামচন্দ্র ক্রমে কুশীলবের পরিচয় লাভ করিলেন এবং সীতা জীবিত আছেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনাইলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামায়ণ কাব্যের পরিণতির দিক্ দিয়া এই অন্তর্ভুক্ত রামচরিতের বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে।

এখানে 'রামায়ণ' গানের কথা বলা হইয়াছে, অভিনয়ের কথা নাই। কিন্তু খিল হরিবংশে আমরা রীতিমত অভিনয়ের সংবাদ পাইতেছি। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে একানব্বই অধ্যায়ে বজ্রনাভ দৈত্যের উপাখ্যান আছে। বজ্রনাভ দৈত্য ব্রহ্মার বরে দেবের অবধ্য হইয়াছিল। বজ্রপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সে বাস করিতে লাগিল এবং ইন্দ্রত্ব লাভে উদ্যত হইল। তখন ইন্দ্র বিচলিত হইয়া দ্বারকায় কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর উভয়ে বজ্রনাভ বধের উপায় চিন্তা করিয়া ভদ্র নামে এক জন প্রসিদ্ধ নটকে নিয়োজিত করিলেন এবং সুশিক্ষিত হংসীকে দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। হংসী বজ্রপুরের অন্তঃপুর-সরোবরে বিচরণ করিতে করিতে বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে দেখিতে পাইল। তখন সেই রূপলাবণ্যময়ী যুবতী কন্যার নিকট হংসী কন্দর্পস্বরূপ কৃষ্ণাত্মজ প্রদ্যুম্নের গুণগান করিল। কন্যা প্রভাবতীও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং হংসীকেই দৌত্যে বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বজ্রনাভ নৃপ হংসীর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও নানা গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া হংসীকে আমন্ত্রণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:

তত্ত্বং শুচিমুখি ব্রূহি কথাং যোগ্যতয়া বরে।
কিং ত্বয়া দৃষ্টমাশ্চর্য্যং জগত্যুত্তমপক্ষিণি॥

তুমি জগতে কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ? পক্ষী বলিল, আমি এক মুনি কর্ত্তৃক দত্তবর নট দেখিয়াছি। সে নট উত্তর কুরু কেতুমালা প্রভৃতি নানা স্থানে অভিনয় করিয়া অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নৃত্য-কৌশলে সে দেবতাদিগকেও বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। বজ্রনাভ তখন সেই নটের অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ ও ইন্দ্র সেই সংবাদ পাইয়া যদুবংশীয় বীরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহারা ভদ্র নটের নিকট রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্থির হইল, প্রদ্যুম্ন নায়ক হইবেন, শাম্ব হইবেন বিদূষক এবং পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ শ্রুতিধর (Prompter ?) রূপে গদ এবং আরও অনেক বীরকে পাঠানো হইল। বারমুখ্যা অর্থাৎ বেশ্যাও সেই সঙ্গে প্রেরিত হইল। নাটকাভিনয়ের জন্য সেকালে বেশ্যারও প্রয়োজন হইত, জানা গেল।

বজ্রনাভের সম্মুখে ইঁহারা রীতিমত রামায়ণ অভিনয় জুড়িয়া দিলেন।

রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতং।
জন্ম বিষ্ণোরমেয়স্য রাক্ষসেন্দ্র-বধেপ্সয়া॥ ৯৩ অধ্যায়

ইহার পূর্ব্বে রামযাত্রাভিনয়ের কথা কোথায়ও আছে কি না, আমার জানা নাই। কিন্তু হরিবংশের যুগ হইতে আর এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রামলীলা, রামযাত্রা প্রায় সেই একই ধারায় চলিয়া আসিতেছে। বজ্রনাভের পুরীতে যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে সুষির, অর্থাৎ বেণু আনক অর্থাৎ ঢাক, মুদ্রবীণা, মুরজ (মাদল), 'নতোদ্য' প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়াছিল। গান্ধার ও অন্যান্য গ্রাম এবং বসন্তাদি রাগে-গান হইয়াছিল, অভিনেতাদের বিশ্রামের জন্য প্রেক্ষাগৃহ ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং চিকের আড়ালে বসিয়া পুরমহিলারা অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন।

ছন্নে চান্তঃপুরং স্থাপ্য চক্ষুর্দৃশ্যে নরাধিপঃ।

ছন্নে অর্থাৎ 'জালজবনিকাপিহিতস্থানে'।

হরিবংশের এই ইঙ্গিত প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এক জন বঙ্গীয় কবি অনুসরণ করিয়াছিলেন। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' বজ্রনাভের বৃত্তান্ত আছে। কুলীন গ্রামের মালাধর বসু গুণরাজ খান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মালাধর যদিও প্রধানতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি যেখানে যাহা ভাল পাইয়াছেন তাহাই দিয়া তাঁহার কাব্য সাজাইয়াছিলেন। বজ্রনাভের উপাখ্যান ভাগবতে নাই। মালাধর হরিবংশ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই উপাখ্যানটি বিস্তৃত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকের ধারণা যে, মালাধর বসু সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তিনি লোকমুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিল লোক শুন মহাসুখে॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৩ পৃঃ

কিন্তু ইহার অর্থ এমন নয় যে, তিনি নিজে অনভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে তিনি স্বেচ্ছায় কিছু লেখেন নাই, পরন্তু পণ্ডিত লোকের উপদেশ লাভ করিয়াই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। মালাধর বজ্রনাভের ভবনে অভিনয় উপলক্ষ্য করিয়া গোটা রামায়ণখানা বিবৃত করিয়াছেন।

রাজা দিল আমন্ত্রণ নাচন নাচে রামায়ণ
অনুমতি দৈত্য সমাজে।
গোবিন্দ চরণ মন হৃদে করি সর্ব্বক্ষণ
ভণিলেন খান গুণরাজে॥

তাঁহার এই কাব্য হরিবংশের অনুসরণে রচিত হইলেও তিনি মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইহার পরে চৈতন্যলীলার মধ্যে আমরা এক অভিনয়ের বিবরণ পাইতেছি। চন্দ্রশেখর ভবনে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য লক্ষ্মীর আবেশে নৃত্য এবং রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিতচিত্তা রুক্মিণীর অভিনয় যিনি করিতেছেন, তিনিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সত্য আর অভিনয়—এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ এই একবারমাত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে॥ চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড

কেবল মহাপ্রভু নহেন, যাঁহারা অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা

সকলেই নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী 'কাচ কাচিতেছেন,' তাহাতে অভিনয় সত্য এবং সত্য অভিনয়ের সহিত স্থান পরিবর্তন করিয়াছিল। হরিদাস যিনি কৃষ্ণনাম বিতরণ জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, তিনি কোটাল সাজিয়া কৃষ্ণনামই প্রচার করিতেছেন :

হরিদাস বোলে "আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥" (চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড)

এ কি অভিনয়? না সাজিয়াও তিনি ত আজীবন এই কথা বলিয়াছেন।

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব বোলো কৃষ্ণনাম।
দন্ত করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড)

যে দিন বাইশ বাজারে তাঁহাকে রাজার লোক কোড়া প্রহারে জর্জরিত করিয়াছিল, সে দিনও ত তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর অভিনয় যে অত্যন্ত বাস্তব (Realistic) হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই :

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥ * (চৈঃ ভাঃ)

আমরা এতক্ষণ যে সকল অভিনয়ের প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে সপ্রমাণ হয় যে, এ দেশে অভিনয় বা নটবিদ্যা ব্যাপকরূপেই সুপরিজ্ঞাত ছিল। উপরিউক্ত উদাহরণ ব্যতীত আরও হয়ত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমি যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহা সেই বিশিষ্ট শিল্প যাহাতে একখানি কাব্য বা নাটকের মধ্যে আর একখানি নাটক বা কাব্য অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বেশীর ভাগ কাব্যের মধ্যেই নাটকের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ সকল কাব্য অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় উপরের বাক্সগুলি নাট্যভঙ্গীর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ বারে আমরা যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব, তাহাতে শুধু অর্থতঃ নহে স্বরূপতঃও নাটকই উপরের বাক্স এবং নাটক ভিতরের বাক্সও বটে। শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত ললিতমাধব নাটকের কথা বলিতেছি।

ললিতমাধবের ৪র্থ অঙ্কে অভিনেতারা আসিয়া কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত এবং তাঁহার ব্রজলীলা-সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শক-সভায় উপবিষ্ট। অক্রূর কর্ত্তৃক মথুরায় নীত হইবার পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধাবিরহে আকুল, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য এক অভিনয়ের আয়োজন করিলেন।

সঙ্গীতবিদ্যাবেধসং ভরতমভ্যর্থ্য কিঞ্চিদপূর্ব্বং রূপকং কারিতং তচ্চ দেবর্ষিতীর্থেন তুম্বুরুহস্তে প্রেষিতং, তুম্বুরুণা চ গন্ধর্ব্বানিদমধ্যাপিতম্।
—ললিতমাধব ৪র্থ অঙ্ক

অভিনয় আরম্ভ হইল। কৃষ্ণের ভূমিকায় যে আসিল, তাহাকে দেখিয়া উদ্ধব মধুমঙ্গল, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও মোহিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

উদীর্ণাদ্‌ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্তসমক্ষযন্মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সদ্যঃ সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ সারূপ্যমন্বিষ্যতি॥

আহা! এই নট আমার পরমাদ্ভুত মাধুর্য্য পরিমলবিশিষ্ট গোপলীলার দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে মুহুর্মুহু বিস্মাপিত করিতেছে। যে সারূপ্য অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকুতূহলে তরলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রজবধূর সারূপ্য অন্বেষণ করিতেছে—অর্থাৎ শ্রীরাধার মূর্ত্তি ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ।) এই নট কিরূপে আমারও মনোহারিণী রূপচন্দ্রিকা প্রকাশ করিল? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি নিজে অভিনয় করিতেছি বা দর্শকরূপে উপস্থিত আছি—সংশয় হইতেছে।

পরে শ্রীরাধা যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, তখন রাধাবিরহে উন্মনা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। সিংহাসনাদুত্থায় ভুজাভ্যাং গৃহীতুং পরিক্রামতি। তখন উদ্ধব তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। দেব, ইহা অভিনয় মাত্র।

কৃষ্ণের সম্মুখে কৃষ্ণের চরিত্র অভিনীত হইতেছে এবং সেই অভিনয়ের দ্বারা কৃষ্ণই প্রতারিত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা অভিনয়-সাফল্যের উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

প্রকৃত অভিনয়ের ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও ললিতমাধবের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে, যেখানে 'অভিনয়' বেশ একটু নূতনত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাকে অভিনয় বলা যায় না, কিন্তু ইহা অভিনয়ের মতই সরস। দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন, তখন সূর্য্যের আদেশে শ্রীরাধা ছদ্মনামে সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন স্যমন্তক মণির সন্ধানে গিয়াছেন। সখী বকুলা তাঁহাকে বলিতেছেন যে, সৌন্দর্য্যের অবতার দ্বারকানাথ নিশ্চয়ই তাঁহাকে অঙ্কলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিবেন। রাধা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, ব্রজরাজনন্দন-পদাম্ভোজ হইতে তাঁহার চিত্ত অন্য দিকে কখনই আকৃষ্ট হইবে না। কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল রাধার শোকাপনয়ন উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রের শিল্পীকে দিয়া এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া স্থাপন করা হইল। শ্রীরাধা সেই ইন্দ্রনীলমণিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাহাকেই মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণি উদ্ধার করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; তখন এক দিন মধুমঙ্গলের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে কাননাভ্যন্তরে এই 'জলধরশ্যামদ্যুতির্দেবতা' দেখিতে পাইলেন এবং ইহাও দেখিলেন যে, কোনও অনুরাগবতী এইমাত্র সেই মূর্ত্তির অর্চনা করিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ অন্য লোকের আগমনে সন্ত্রস্ত হইয়া সে রমণী অন্তরালে গিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং নিশ্চয়ই সে পনরায় লব্ধ হইয়া মূর্ত্তি সন্দর্শনে আসিবে। ইহা মনে করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মধুমঙ্গলের সহায়তায় সেই প্রস্তরমূর্ত্তি উঠাইয়া স্থানান্তরে রক্ষা করিলেন এবং নিজেই সেই মূর্ত্তির স্থলে অধরে ন্যস্তবেণু হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে শ্রীরাধার আবেশটি চমৎকারিত্বে অতুলনীয়। শ্রীরাধা এখন সেই জীবন্ত বিগ্রহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, হন্ত হন্ত। নির্ভরোৎকণ্ঠিতায়া মম মুগ্ধত্বং যৎ গোবিন্দস্য প্রতিমামেব গোবিন্দং মন্যে। আমি কি মুগ্ধ! গোবিন্দের প্রতিমা দেখিয়াই গোবিন্দ বলিয়া মানিলাম। গোবিন্দের মূর্ত্তি প্রস্তর-কঠিন ছিল, কিন্তু আজ এ কি হইল! সেই অঙ্গপরিমল, সেই নেত্রোৎসববিধায়িনী ঘনশ্যামকান্তি, প্রতিমার কি কথা কহিবার শক্তি হয়? কিন্তু সেই কর্ণরসায়নকারী বচনামৃত। আমার প্রেম ও কাতরতা দেখিয়া পাষাণ কি কোমল হইল?

হন্ত হন্ত সাহাবিজং ধন্যং গদা পড়িয়া। হায় হায় প্রতিমা যে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইল। এই বলিয়া রাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রতিমার (কৃষ্ণের) পাদমূলে পতিত হইলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, (এম-এ, অধ্যাপক, রায়বাহাদুর)

* এই 'কাচ' কথাটির প্রয়োগ এখন আর নাই। আমরা ভূমিকা, অংশ ইত্যাদি কত কথার আমদানী করিয়াছি; কিন্তু আমাদের নিজস্ব কথাটি ভুলিয়া গিয়াছি।—লেখক

(উপন্যাস)

পাঁচ

পাহাড়ের এক নিভৃত অংশে বেশ বড়ো নাগা-বস্তি। অল্প-পরিসর পথের দু' ধারে সার সার কাঠের বাড়ী। বাড়ীগুলো সবই প্রায় এক-ছাঁচের। মাটী থেকে চার পাঁচ ফুট উঁচুতে কাঠের মঞ্চ। তার আট-ন' ফুট উপরে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির আশ্রয়ে খোলা খড়ের চাল—কোনো ঘরে কুঁচি-বাঁশের, কোন ঘরে বা কাঠের ছাউনি। বস্তির মধ্যে সব চেয়ে বড়ো আর সুন্দর যে বাড়ীখানা সেইটিই হ'লো নাগাদের রাজার বাড়ী। রাজা লি-ওয়াঙএর দেহে অসুরের বল—তার বয়স প্রায় বত্রিশ। তাকে ভয় করে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই। অন্য সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাও লি-ওয়াঙের প্রভুত্ব অমান্য করবে এমন সাহস বা শক্তি তাদের নেই।

আগেকার পরিচ্ছেদে যে সময়ের বর্ণনা করা হ'য়েছে তার প্রায় পনোরো বছর আগে দুর্ব্বৃত্ত এক নাগা দস্যু ছ-সাত বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে চুরি ক'রে এনে লি-ওয়াঙকে উপহার দিয়েছিল তাকে খুসি করবার জন্য। সে লোকটা বড় রকমের কি অপরাধ ক'রে রাজার ভয়ে কিছু কাল পালিয়ে ছিল। দামী উপহার দিয়ে রাজার বিরাগ থেকে রক্ষা পাবার অভিপ্রায়ে সে ঐ শিশুকে চুরি ক'রে আনে। উপহার পেয়ে রাজা তাকে ক্ষমা করবে, এ বিষয়ে তার এতোটুকু সন্দেহ ছিল না। তখনকার দিনে অসভ্যদের মধ্যে এ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, মানুষ খুন করে তার মাংস খুনীর জমিতে ছড়িয়ে দিলে সেই জমিতে প্রচুর ফসল ফলে, তাছাড়া নরমুণ্ড সংগ্রহে মর্য্যাদা-লাভ হ'বে। ঐ শিশুর পরিণাম ঠিক তাই হ'তো রাণী এসে যদি মাঝখানে তাতে বাধা না দিত।

শিশুর সুন্দর মুখ দেখে রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো অতি সহজে কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের বদ্ধমূল সংস্কারের প্রভাব এতো প্রবল যে সহজে কেউ তা এড়াতে পারে না। লি-ওয়াঙের ক্ষণিকের দরদ-মাখা হাসি মুহূর্ত্তে নৃশংসতায় পরিণত হ'লো—শিশুকে হত্যা ক'রে তার মুণ্ড গলায় ধারণ করার গৌরব অর্জনের জন্য জাতিগত সংস্কার তাকে অলক্ষ্যে উত্তেজিত ক'রে তুললো। রাজা এক হাতে তরবারি ধ'রে অপর হাতে শিশুকে কাছে ডাকলেন। রাজার মুখের বিকট হাসি দেখে শিশুর প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হ'লো—সে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। শিশুর সেই আকুল আর্ত্তনাদ শুনে অন্তঃপুরে রাণীর প্রাণ কাতর হ'য়ে উঠ্‌লো। রাণী ছুটে সেখানে এলো। এসেই দেখলো, ভীষণ দৃশ্য। রাজার কোনো কাজে বাধা দেবার বা প্রতিবাদ করবার অধিকার কারো নেই। রাণীরও না। তবু এ ক্ষেত্রে রাণী চুপ ক'রে থাকতে পারলো না—রাজার পায়ের কাছে পড়ে রাজার দুই পা জড়িয়ে ধ'রে রাণী বলে উঠ্‌লো—না—না। রাজা বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—

"আঃ রাণী জুমেলা, মিপুই ইডা * তু কেনে আলি এখেনে? রাজার কাম রাজা করবে, ওতে তুরারে চাই না।"

রাণী কাতর অনুনয়ে শিশুর প্রাণ-ভিক্ষা চাইলো। বললো, তার একান্ত ইচ্ছা একে সেবা-দাসী ক'রে রাখবে। রাজা প্রথমে এ কথায় কানই দিল না। কিন্তু পরে রাণী যখন বুঝিয়ে বল্‌লে, এ রকম সুন্দর একটি মেয়ে রাজ-অন্তঃপুরে সেবা-দাসী হ'য়ে থাকলে তাতে রাজার গৌরব অনেক বেড়ে যাবে, তখন রাজা নরম হ'লো এবং রাণীর প্রস্তাবে সম্মতি দিল; কিন্তু একটি সর্ত্তে, সে সর্ত্ত এই—বালিকা যদি কখনও পালিয়ে যায়, তা'হলে ওর বদলে রাণীকে জীবন দিতে হবে রাজ্যের কল্যাণের জন্য।

এই নিষ্ঠুর সর্ত্তেই রাজী হ'য়ে রাণী জুমেলা বালিকাকে তার আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করলো—তার পর খুসী হ'য়ে তাকে বুকে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো অন্দরে। নাগাদের মধ্যে জুমেলার মতো মেয়ে দেখা যায় না। মাতৃত্বের আস্বাদে বঞ্চিত জুমেলার বুভুক্ষা ছিল অতৃপ্ত, তাই সে এই বালিকাকে দেখেই আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছিল। তাকে পেয়ে সে দিন তার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। লোকে যেন এ বালিকাকে তারই কন্যা মনে করে, এই উদ্দেশ্যে সে নিজের নামের অনুকরণে তার নাম রাখ্‌লো "ঝিমুলি"।

রাণী জুমেলা নিজের পেটের মেয়ের মতো ঝিমুলিকে পালন করতে লাগলো। অকৃত্রিম স্নেহ আদর পেয়ে ঝিমুলির মন থেকে তার শিশু-জীবনের অনেক স্মৃতিই ক্রমে মুছে গেল। নাগাদের সঙ্গে বাস করে অল্প দিনে সে কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে, চাল-চলনে বেশে-ভূষায় ঠিক তাদেরই মতো হ'য়ে পড়লো। পূর্ব্ব-জীবনের কিছুই আর তার রইলো না। তার নাম যে এক সময়ে "মীরা" ছিল, স্মৃতি থেকে তাও যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল।

নাগাদের পারিবারিক জীবন-যাত্রার সব কাজই সে শিখেছে। প্রথম কিছু দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব সে কেঁদেছিল মা-বাপ আর ছোট বোনটির কথা স্মরণ ক'রে। দুঃখের কথা রাণীমাকে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রেছে বহু দিন, কিন্তু তার ভাষা কেউ বোঝেনি। রাণী জুমেলা তার কাঁদো-কাঁদো ছল-ছল চোখ দেখ্‌লেই তাকে আদর ক'রে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতো। রাণীর এ আদরে সে শেষে এই অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকতে অভ্যস্ত হ'লো। এ আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাবার কল্পনাও তার মনে জাগেনি কখনো। শিশু-বয়সে সে ইচ্ছা যদি বা কখনো হ'য়ে থাকে, সে ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়েছে অরণ্যের দুর্গমতার কথা ভেবে। এগারো বারো বছর বয়সে সে যখন প্রথম জানতে পারলো, রাণীর দয়াতেই তার প্রাণ বেঁচেছে

* মিপুই ইডা — সুচরিতা লক্ষ্মী মেয়ে।

এবং সে পালিয়ে গেলে কিম্বা পালাবার চেষ্টা করলে রাণীর জীবন বিপন্ন হবে, তখন সে রাণীমার উপর আরো বেশী অনুরক্ত হ'য়ে পড়লো,—নাগাদের আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাবার চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও তার চিত্তকে আর উদ্বেলিত ক'রে না।

ঝিমুলিকে রাণীর সেবা-দাসী হিসাবে রাখা হ'লেও আসলে দাসী-বৃত্তির কিছুই তাকে করতে হ'তো না,—আবার রাজ-পরিবারের সম্মানও সে পেতো না। এ বিষয়ে ঝিমুলি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাণীমার আদেশ-উপদেশ-মতো সে চলতো। সে যে কখনো পালিয়ে যাবে না জুমেলা তা জানতো, তবু রাজার হুকুমে দু'-তিন জন নাগা দাসী তার পাহারায় থাকতো—যখনই সে বাড়ীর বাইরে কোথাও যেতো। তার ইচ্ছামতো চলা-ফেরায় কোনো রকম বাধা ছিল না, শুধু বাইরে যেতে হ'লেই দু'-তিনটি নাগা দাসী তার সঙ্গে যেতো। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে সে খুব ভালোবাসতো, বনের ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথতো, সময় সময় নানা রকম ফুলের আভরণ তৈরি ক'রে দেহের প্রসাধনে লাগাতো। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক বৃত্তিগুলো পারি-পার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যেও প্রকৃতির সহজাত শক্তিতে পরিপুষ্ট হ'তে লাগ্‌লো।

ছোট বয়সে মায়ের কাছে সে গান শিখেছিল এবং ঐ বয়সেই সে তার তান-লয় শুদ্ধ মধুর কণ্ঠস্বরে মাতা-পিতাকে বিমুগ্ধ করতো। পার্ব্বত্য জীবনেও সঙ্গীতের মাদকতা তাকে টেনে নিয়ে যেতো নাচ-গানের উৎসবে মজলিসে। নাগাদের নাচে গানে পটুতা অর্জন ক'রতে তার বেশী সময় লাগলো না। রাণী জুমেলার উৎসাহে সে নাগাদের সকল রকমের গান শিখলো, তার উপর বাঁশী বাজাতে শিখলো অতি চমৎকার। জুমেলাই তাকে বাঁশের বাঁশী সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিল। ঐ বাঁশীতে নাগাদের নাচের গান বাজিয়ে সে রাণীর মনোরঞ্জন ক'রতো; মাঝে মাঝে তার ছোট বয়সের শেখা হিন্দুস্থানী গানের সুরও তুলতো ঐ বাঁশীতে। রাণী বিমুগ্ধ হ'য়ে শুনতো। ঝিমুলির বাঁশীর গানের খ্যাতি নাগা-মহলে সর্ব্বত্র ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সম্পর্কে একটা আশ্চার্য্য ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঝিমুলির বয়স তখন পনেরো কি ষোল। এক দিন অপরাহ্নে বস্তির অনতিদূরে এক জঙ্গলের ধারে ব'সে সে একান্ত মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল। সে সময় একটা জংলি হাতী সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে গেল বাঁশীর সঙ্গীত শুনে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে এবং কিছুক্ষণ পরে চুপি চুপি চ'লে এলো ঝিমুলির ঠিক পিছনে। সঙ্গীত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থেকে সেই অতিকায় জানোয়ার অবশেষে তার শুঁড় দিয়ে ঝিমুলিকে অকস্মাৎ জড়িয়ে ধ'রে একেবারে তুলে বসালো তার কাঁধের উপরে। ঝিমুলি প্রথমটা খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখলো হাতী তার কোনো রকম অনিষ্ট করার পরিবর্ত্তে তাকে নিয়ে যেন আনন্দে বেড়াতে আরম্ভ ক'রেছে, তখন তার ভয় একদম দূর হ'য়ে গেল এবং একটু পরেই তার প্রচুর বিস্ময় এবং আনন্দ হ'লো দেখে যে হাতীটা তার ইঙ্গিত-মতো আদেশ পালনে মোটেই অনিচ্ছুক নয়। প্রকাণ্ড বড়ো একটা নাগেশ্বর ফুলের গাছের নীচ দিয়ে যাবার সময় ঝিমুলির ইঙ্গিতে হাতীটা খুব উঁচু ডাল থেকে অনেক-গুলো ফুল পেড়ে দিল। হাতীটা যে তার বাধ্য হ'য়ে পড়েছে, এই সব আচরণ থেকে বেশ বুঝতে পারা গেল। ঝিমুলি আরো বুঝ্‌তে পারলো, তার বাঁশীর সুরেই হাতী বশ হ'য়েছে। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে বেড়াবার পর ঝিমুলির ইঙ্গিতে হাতী তাকে কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল। সে তখন হাতীর বিশাল বপু দেখে ভীত নয়—এরই মধ্যে তার সাহস যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। হাতীকে আরো খুসি করবার অভিপ্রায়ে সে বাঁশীতে মুখ দিয়ে আবার একটা সুরের ঝঙ্কার তুললো, তার পর বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রলো। ঝিমুলির নাগা সহচরীরা তখন অদূরে একটা গাছের ছায়ায় ব'সে গল্প করছিল। জংলি হাতীর আচরণ দেখে তারা যে শুধু আশ্চর্য্য হ'য়েছিল তা নয়, তাদের বিশ্বাস হলো, ঝিমুলি নিশ্চয় এমন যাদু-মন্ত্র জানে যা দিয়ে সে বনের জানোয়ারকে অনায়াসে বশ ক'রতে পারে।

এ ঘটনার পর ঝিমুলি প্রায়ই সে জায়গায় গিয়ে বাঁশী বাজাতো এবং ঐ হাতীটাও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তার বাজনা শুনতো এবং অবশেষে ঝিমুলিকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে আবার এখানেই পৌঁচে দিয়ে যেতো। এই ভাবে কিছু দিন পরে ঝিমুলি আর ঐ হাতীর মধ্যে যেন নিশ্চিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'য়ে গেল। হাতীটা এর পর ও-অঞ্চল ছেড়ে আর দূরে যেতো না, কিংবা গেলেও অপরাহ্নে প্রতিদিনই সে এসে হাজির হ'তো বাঁশীর বাজনা শোনবার জন্য।

ঝিমুলির এই যাদু-শক্তির কথা রাণী জুমেলার কাণে প্রথম দিনই পৌঁচেছিল। অবশেষে রাজাও তা জানতে পারলো এবং ক্রমে নাগা-মহলে সর্ব্বত্র এ খবর প্রচারিত হলো। ঝিমলি তাদের সর্ব্ব প্রধান দেবতা "শিব্রাই"এর বিশেষ অনুগৃহীতা, এ সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ রইলো না।

ঝিমুলির আর একটি ভক্ত ছিল—এক উল্লু। হাতীর মতো এ জানোয়ারটাও ঝিমুলির ইঙ্গিতে কাজ করতে শিখেছিল—শুধু ইঙ্গিত নয়—বানরের মতো সে ঝিমুলির ভাষাও কনেকখানি বুঝতে পারতো। ঝিমুলির পিঠে চেপে সেও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে যেতো এবং অনুগত ভৃত্যের মতো তার আদেশ পালন করতো। এই দু'জন অনুরক্ত ভক্ত পেয়ে ঝিমুলির দিন আনন্দেই কাটছিল।

পাহাড়ে হাতীর কাঁধে চ'ড়ে বেড়ানো ছাড়াও ঝিমুলির আর একটা কাজ জুটেছিল, যাতে সে প্রচুর আনন্দ পেতো,—সেটা ধনুর্বিদ্যা শেখা। এক বৃদ্ধ পাহাড়ীর কাছে প্রতিদিন সে তীর ছোড়ার কৌশল শিক্ষা করতো। অসভ্য জাতিদের মধ্যে অতি আদিম কাল থেকেই তীর-ধনুকই ছিল প্রধান অস্ত্র। তা দিয়ে তারা আত্মরক্ষা করতো এবং শত্রুকে আক্রমণ করতো। সুতরাং তীর-চালনা শিক্ষা তাদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। এখানে যে সময়ের কথা বলচি, তখন নাগা আর কুকীরা তীর ও বর্শা দুই-ই ব্যবহার করতো। যুদ্ধ-বিগ্রহে এ দু'টি অস্ত্রই ছিল তাদের প্রধান সম্বল। আবার হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এই অস্ত্রের উপরই তারা নির্ভর করতো। ঝিমুলির বন-ভ্রমণে নিত্য নানা বিপদের আশঙ্কা ছিল। এ জন্য সে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষায় মন দিয়েছিল। ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সে লক্ষ্য-বেধ কৌশলে এমন নিপুণ হলো যে তার শিক্ষা-গুরুও তাতে বিস্মিত হ'য়ে গেল। এর পর ঝিমুলি বাইরে যাবার সময় তীর-ধনুক সঙ্গে নিতে কখনো ভুল করতো না; কিন্তু আক্রান্ত হবার পূর্ব্ব সম্ভাবনা না থাকলে শুধু জীব-হত্যার উদ্দেশ্যে সে কখনো তীর নিক্ষেপ করতো না। তীর দিয়ে

সে অনেক সময়ই সংগ্রহ করতো খুব উঁচু গাছের ফুল আর ফল এবং এতেই তার আনন্দ হ'তো অপরিসীম। অর্থাৎ নাগা-গৃহে তার বিশেষ কোনো দুঃখ ছিল না। তার স্বাস্থ্য ছিল ভাল এবং পরিশ্রম করতো বলে তার স্বাস্থ্য ছিল যেমন অটুট, তেমনি দেহের পরিপূর্ণতার সঙ্গে অঙ্গ-শ্রীও চমৎকার গড়ে উঠেছিল।

ঝিমলির জীবন-ধারায় বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকলেও তাতেই সে তৃপ্ত ছিল, কিন্তু তার এই এক-ঘেয়ে জীবন বেশি দিন একই ভাবে রইলো না। যেমন খুশী সর্বত্র সে বেড়িয়ে বেড়াতো অকুতোভয়ে,—রাজা এবং রাণীর অনুগৃহীতা ব'লে সকলে তাকে একটু সমীহও করতো। কিন্তু যৌবনোদয়ে পুর্ণিমার চাঁদের মতো স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপ নিয়ে সে যখন সমগ্র বন-প্রদেশ আলোকিত ক'রে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করতো তখন তার উপর পড়তো রাজার এক প্রধান কর্ম্মচারীর লোলুপ-দৃষ্টি। এ লোকটা ছিল রাজার প্রধান সেনা-নায়ক—নাম নান্দু।

নান্দুর বয়স পঁয়ত্রিশ—দেহে যেমন শক্তি, প্রকৃতিও তেমনি দুর্দ্ধর্ষ। রাজা ছাড়া আর কাকেও সে গ্রাহ্য করতো না। একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে ছিল যথেচ্ছাচারী। নানা কৌশলে সে ঝিমলির সঙ্গে গল্প করার সুযোগ বার করতো এবং সে সুযোগে তাকে তার ভালোবাসার কথা জানাতো নানা ভাবে। নান্দুর এ রকম ভাবভঙ্গী এবং আচরণে বিরক্ত হ'য়ে ঝিমলি তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতো কিন্তু সম্পূর্ণ এড়াতে পারতো না। উপায়ান্তর না দেখে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তীর-ধনুক ছাড়া সে একটা ছোরাও সব সময়ে সঙ্গে নিয়ে বেরুতো। নান্দুর আচরণের কথা রাজার কাছে ব'লে দেবে ব'লে ঝিমলি তাকে ভয় দেখিয়েছে। একমাত্র রাজার ভয়েই নান্দু বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেতো না। এখানকার পার্ব্বত্য-জীবনে এই একটি উপদ্রব ছাড়া আর কোনো উপদ্রব তার চিত্তের প্রশান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

ছয়

বসন্ত এলো বনে।

উপত্যকা-অধিত্যকা, গিরি-পর্ব্বত তরু-পত্রপল্লবের আভরণে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বন-বিহারিণী ঝিমলি বৈকালে খরস্রোতা এক নির্ঝরিণীর তীরে বড় আকারের একটা পাথরের উপর ব'সে গুন্ গুন্ ক'রে নিজের মনে গান গাইছিল—সেই সঙ্গে নীচে জলের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল তরঙ্গ-লীলা। সঙ্গিনী নাগা-রমণীরা একটা কাঠ-বিড়ালী ধ'রে কাছেই সেটার সঙ্গে খেলা করছিল। ঝিমলি যেখানে বসেছিল, তার অদূরে একটা পলাশ গাছ—গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ভারে পলাশের শাখাগুলো যেন নুয়ে প'ড়েছে। দূর থেকে গাছটিকে দেখাচ্ছিল যেন জলন্ত অগ্নিশিখা। ঝিমলি আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে, হঠাৎ উপর থেকে ঝ'রে পড়লো কতকগুলো পলাশ ফুল তার কোলের উপর। অবাক হ'য়ে উপরের দিকে চাইতেই সে দেখলো, যেখান থেকে ফুলগুলো ছিঁড়ে পড়েছে সেখানে একটা তীর বিঁধে আছে। সেখান থেকে চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই আবার একটা তীর এসে আর এক-গুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে তার গায়ের উপর ছড়িয়ে দিলে। তীর দু'টো যেন নির্ঝরিণীর ওপার থেকে এসেছে তা বুঝতে তার বিলম্ব হ'লো না। চকিতে সে সে দিকে তাকালো এবং বিস্ময়ানন্দে দেখলো, যে লোকটি তীর ছুড়েছে,—সে সেদিনকার সেই সুন্দর যুবক—ভালুকের আক্রমণ থেকে যে তাকে বাঁচিয়েছিল। যুবককে চিনতে পেরে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। ইচ্ছা হ'লো ওখানে ছুটে যায়! এ রকম চাঞ্চল্য তার কখনো আর হয়নি। নির্ঝরিণীর ক্ষুদ্র পরিসরটুকু মাত্র ব্যবধান। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে শুধু একদৃষ্টে চেয়ে রইলো ওপারের ঐ যুবকের দিকে। হঠাৎ সহচরীদের এক জন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "সরে যা ঝিমলি মস্ত বড়ো সাপ পিছনে।"

পিছনে সাপ। শোনবামাত্র ত্বরিতে এগুতে গিয়ে ঝিমলি পা পিছলে প'ড়ে গেল একেবারে নীচে নদীর জলে। সে সাঁতার জানে না, তার উপর স্রোত প্রখর। সেই খর-স্রোতে চুবন খেতে খেতে সে চললো ভেসে; সহচরীরা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, কিন্তু ঝিমলির উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না।

ঝিমলি জলে প'ড়ে গেছে দেখে প্রতাপ ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। আয়তনে ক্ষুদ্র হ'লেও নির্ঝরিণীর জলের গভীরতা এখানে খুব কম ছিল না এবং সেই অথই জলের প্রবল স্রোতে প্রায় নিমজ্জিত ঝিমলির সন্ধান পাওয়া সন্তরণপটু প্রতাপের পক্ষেও সহজ হলো না। যখন সন্ধান মিললো, তখন নিমজ্জিতাকে পিঠের উপর তুলে তীরে ওঠাতে বেশ বেগ পেতে হ'লো তাকে। ঝিমলি অজ্ঞান হয়ে গেছে। শুশ্রূষায় ঝিমলিকে সচেতন করে পতাপ তাকে শুইয়ে দিলে—দিয়ে প্রতাপ বসে রইলো ঝিমলির মাথার কাছে তারি পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে।

অকস্মাৎ পিছন দিক থেকে কে এসে প্রতাপকে দু'হাতে সাপটে ধরলো। প্রতাপ চমকে উঠলো। কে? লোকটা যে বেশ জোয়ান তাতে একটুকু সংশয় নেই। লোকটা প্রথম ধাক্কাতে প্রতাপকে ভূমিতে ফেলে দিয়েছিলো। তবু প্রতাপ আত্ম-সমর্পণ না ক'রে লোকটার মাথার চুল আঁকড়ে ধ'রে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। দেখলো, লোকটি নাগা। এর নাম নান্দু—নাগাদের সেনানায়ক। নাগার গায়ে জোর বেশী থাকলেও কস্তি-কৌশলে প্রতাপ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পটু, কিন্তু সদ্য-ডুবন্ত ঝিমলিকে উদ্ধার করে প্রতাপ হাঁফিয়ে প'ড়েছিল। তাই সে নান্দুর সঙ্গে বেশি ক্ষণ লড়াই করতে পারলো না। নান্দু প্রতাপের গলা চেপে ধ'রে দম আটকে তাকে মেরে ফেল্‌তে উদ্যত হ'লো।

শুয়ে শুয়ে ঝিমলি সবই দেখছিল। প্রতাপের অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন বুঝ্‌তে পেরে সে চেঁচিয়ে উঠলো—প্রতাপকে ছেড়ে দাও। কিন্তু নান্দু সে কথায় কাণ দিল না বরং প্রতাপের কণ্ঠে আরও চাপ দিতে লাগলো। ঝিমলি তখন তার দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ভূমি থেকে উঠে নান্দুর ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং পর-মুহূর্ত্তে কোমর থেকে ছোরা বার করে নান্দুর পিঠে সেই ছোরা উঁচিয়ে ধরলো,—ধরে বললো, সে যদি প্রতাপকে এখনি না ছেড়ে দেয় তাহলে ছোরার আঘাতে নান্দুকে সে হত্যা করবে। রাজা-রাণীর কাছে ঝিমলির কতখানি প্রতাপ নান্দু তা জানে এবং ঝিমলি যে এই ভয় দেখানোটা নিমেষে কার্য্যে পরিণত করতে পারে তা-ও সে জানে। কাজেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। প্রতাপের কণ্ঠ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো।

প্রতাপকে ছেড়ে নান্দু সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালো না। অসভ্য ভাষায় প্রতাপের উপর অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে সেখান থেকে চ'লে গেল।

আর একটু বিলম্ব হ'লে প্রতাপের শ্বাস রুদ্ধ হ'তো। ঝিমলির

সাহস এবং ক্ষিপ্রকারিতায় যে তার প্রাণ বেঁচেছে, সে কথার উল্লেখ ক'রে প্রতাপ ঝিমলিকে হিন্দুস্থানী ভাষায় ধন্যবাদ জানালো। ঝিমলিও প্রতাপকে ধন্যবাদ দিল নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে নদীতে ঝাঁপিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে ব'লে।

এ ব্যাপারে ঝিমলির সহৃদয়তা এবং অসাধারণ সাহসের পরিচয় পেয়ে প্রতাপ বিমুগ্ধ হ'লো। এমন হৃদয়বতী রমণী অসভ্য নিষ্ঠুর নাগাদের কাছে কেন, এবং কি ক'রে বাস করছে—প্রতাপ বুঝতে পারলো না। অসভ্যদের সঙ্গে তার জীবনের কোনো বন্ধন থাকতে পারে না। এদের মধ্য থেকে তাকে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন ভেবে প্রতাপ প্রস্তাব করলো, তাকে সভ্য সমাজে নিয়ে যাবে, সে যদি রাজী হয়। ঝিমলি প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝতে পারলো কিন্তু তাতে রাজী হ'তে পারলো না। হিন্দুস্থানীতে কোনো রকমে সে বুঝিয়ে বললো, নাগাদের ছেড়ে অন্য কোথাও সে যাবে না—যেতে পারবে না। তার পর খুব ব্যস্ত ভাবে কাতর কণ্ঠে প্রতাপকে বললো—শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান—না হলে ভারী বিপদ। প্রতাপের উত্তর দেওয়া হলো না। হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হ'লো সহচরী রমণীরা একান্ত ভয়-কাতর মুখে। ঝিমলি জলে ডুবে মারা গেলে রাণী জুমেলার হাতে তাদের নিষ্কৃতি থাকবে না,—এই ছিল তাদের ভয়ের কারণ। হঠাৎ এসে যখন দেখলো ঝিমলি শুধু জীবিত নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ, তখন তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

ঝিমলির আর সেখানে থাকবার প্রয়োজন ছিল না, সঙ্গিনীদের নিয়ে তখনি সে স্থান ত্যাগ করলো—প্রতাপের কাছে আনত মুখে বিদায় নিয়ে।

প্রতাপ আবার সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে অপর তীরে পৌঁছুলো। তার পর তীরে দাঁড়িয়ে ঝিমলির কথাই ভাবছিল—হঠাৎ একটা তীর এসে তার পায়ের কাছে পড়লো। তীরটা যে নাগাদেরই কেউ ছুড়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না। প্রতাপ ভাবতে লাগলো, যে শক্তিশালী নাগার সঙ্গে একটু আগে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেছে, যে তার শ্বাস-রোধ করে তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, সে-ই এ তীর-নিক্ষেপ করেছে নিশ্চয়। প্রতাপ অবিলম্বে বড় একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলো এবং সেই মুহূর্ত্তেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা তীর একসঙ্গে সেখানে এসে পড়লো বর্ষার ধারার মতো। গাছের আড়ালে আশ্রয় না নিলে কিছুতেই সে প্রাণ বাঁচাতে পারতো না। প্রতাপ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো নির্ব্বাক্—ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্য। তার পর আরো দু'-তিন বার ঐ রকম তীরের ধারা-বর্ষণ হ'লো—অবশেষে দেখা গেল, তীর-ধনুকধারী এক দল নাগা নদীর অপর তীরে বনানীর ভিতর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

এতক্ষণে প্রতাপ একটু ধীর ভাবে চিন্তা করবার অবকাশ পেল। তার মনে পড়লো, নাগা-রমণীরা মেয়েটিকে ঝিমলি ব'লে ডাকছিল—সুতরাং ওর নাম 'ঝিমলি'। আবার এই ঝিমলি নামটা জংলি মেয়েদেরই নামের মতো। তবে কি সত্যই ও জংলি মেয়ে? হয়তো তাই। না হলে নাগাদের ছেড়ে চ'লে আসতে চাইলো না কেন? অথচ প্রতাপের উপর তার প্রীতিমধুর ভাব, তাকে বাঁচাবার জন্য ছোরা উঁচিয়ে নাগাকে ভয় দেখিয়েছিল, এ কম দরদের কথা নয়। নাগাদের মেয়ের এ কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে হ'লো কুসুমিকার কথা এবং সেই সঙ্গে গিরিধারীর অপর কন্যা মীরার কথা। ঝিমলি সেই মীরা নয়তো? প্রশ্ন মনে হয়তো হাজার বার উঠেছে, কিন্তু মীরা নাম বদলে 'ঝিমলি' হ'তে যাবে কেন? এর কোনো সদুত্তর মিললো না। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রতাপ তার বাংলোয় পৌঁছলো।

বাংলোয় এসে শুনলো, আবার উপরওয়ালার তাগিদ এসেছে নাগাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসা ক'রে ফেলবার জন্য। প্রতাপ বিরক্ত মনে গার্ড ভীম সিংকে ডেকে মাংফুর খোঁজ নিতে বললো।

ভীম সিং জানালো, প্রতাপের আদেশ ও উপদেশ মতো মাংফু সেই যে আট দশ দিন আগে নাগা রাজার উদ্দেশে বেরিয়ে গেছে তার পর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এত দিন দেরীর কোনো কারণ বোঝা গেল না। রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে তিন-চার দিন পরেই তার ফেরবার কথা। মাংফুকে রাজা আটক ক'রে রাখলো না কি?

সাত

ঝিমলির উপর যে নাম্পুর লোলুপ-দৃষ্টি পড়েছে সে কথা ঝিমলি কাকেও বলেনি, শুধু রাণীকে জানিয়েছে পুরুষ-মানুষের নজর এড়িয়ে চলা তার পক্ষে ক্রমে কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কথাটা অবশেষে রাজার কানে গেল। রাজা ভাবলো, ঝিমলির তা হ'লে বিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো ঝিমলি নিজেই তার স্বামী নির্ব্বাচন করবে, না, রাজা নির্ব্বাচন ক'রে দেবে? রাজা লি-ওয়াঙ ভাবলেন ঝিমলি নাগাদের মেয়ে নয় কাজেই তার বিয়েতে নাগাদের রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন না করলেও দোষের হবে না। ভাবতে ব'সে লি-ওয়াঙের মাথায় চাপলো নতুন খেয়াল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নাগা-কুকিদের বিরোধ বাধবার সম্ভাবনা খুব বেশী। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য তার সেনা-সামন্ত সব সময়েই যাতে প্রস্তুত থাকে এবং প্রত্যেকে বীরত্ব দেখাবার সুযোগ যাতে পায়, তাই লি-ওয়াঙ স্থির করলো, ঝিমলির বিয়ে উপলক্ষ ক'রে রাজ্যের শক্তিশালী লোকদের এক-জায়গায় জড়ো করবে এবং তাদের শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়া হ'লো, দশ দিন পরে যে পূর্ণিমা রাত্রি, তার পরের দিন মাইগুম্পা গ্রামের মাঠে প্রথমতঃ বর্শা-নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা হবে। তার পর তীর-ধনুক দিয়ে লক্ষ্য-বেধ। কৌশলে যে সকলের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হবে পুরস্কারস্বরূপ সে পাবে রাজার আশ্রিতা ঝিমলিকে পত্নীরূপে।

রাজার এই প্রস্তাব আর ঘোষণার সংবাদ অচিরে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো,—ঝিমলি তা শুনলো। এ ব্যাপারে ঝিমলির নিজের কোনো মতামত আছে কি না সে সম্বন্ধে কারো মনে প্রশ্ন উঠলো না। উঠে থাকলেও রাজার প্রস্তাবে প্রশ্ন করার কিংবা তার অন্যথাচরণ করার মতো দুঃসাহস কারো ছিল না। ঝিমলি এ বিষয়ে একান্ত অসহায়। রাজার ব্যবস্থার প্রতিকূলতাচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে কাকেও সে কিছু বললো না, শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে রইলো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মাইগুম্পার মাঠে সহস্রাধিক নাগা তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে সমবেত হ'লো। সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত এবং আশায় উৎফুল্ল।

দর্শক এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা জায়গা নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। দর্শকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা। রাণী, উপরাণী এবং অন্যান্য স্ত্রী-পরিজনে পরিবৃত হ'য়ে লি-ওয়াঙ যথাসময়ে এসে

একটু উঁচু আসনে উপবেশন করলো। প্রধান মন্ত্রী এবং পারিষদ বসলো তাদের ডান পাশে। অপেক্ষাকৃত একটু নীচু আসনে বাঁ দিকের জমিতে তীরন্দাজ আর বর্শাধারী পরীক্ষার্থীর দল সার বেঁধে দাঁড়ালো।

নূতন বসনে ফুলের আভরণে ভূষিত অগুরু-চন্দনে চর্চিত ঝিম্‌লিকে বসতে দেওয়া হ'লো রাণীর পায়ের কাছে। অসভ্যদের পরিচ্ছদেও তার দেহের জ্যোতিঃ এই অসভ্য জন-সংঘের মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছিল মেঘের মধ্যে বিজলীর আভার মতো।

রাজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো উৎসবের বাজনা সমস্ত পাহাড়-প্রদেশ কাঁপিয়ে। পরীক্ষার্থী নাগাদের উৎসাহিত করবার জন্য রাজার আদেশে প্রথমেই আরম্ভ হ'লো দশ-বারো জন মিলে যুদ্ধের নাচ। এই নাচের জন্য এক দল যুবক যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হ'য়ে এসেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা নাচ চললো।

নাচের শেষে বর্শা-নিক্ষেপের পরীক্ষা। সকলের চেয়ে বেশী দূরে যে তার বর্শা ছুড়ে ফেলতে পারবে, সেই পাবে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান।

নাগাদের ব্যবহৃত বর্শা সাধারণ বর্শার মতো হলেও ধরবার স্থানটুকুর উপরের আর নীচের অংশে তারা লাল আর কালো ছাগলের রোঁয়ার গুচ্ছ চক্রাকারে পরিপাটী ক'রে বেঁধে রাখে।

একে একে প্রায় আড়াই শো লোক বর্শা ছোড়ার পরীক্ষা দিল। উল্লাসপূর্ণ চিৎকার ধ্বনির মধ্যে তুন্‌কা নামে এক যুবক সকলের শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত হ'লো। রাজা তাকে কাছে ডেকে সম্মান-পদবীতে ভূষিত করলো এবং একটা সুন্দর বর্শা উপহার দিল।

এর পর আরম্ভ হ'লো তীরন্দাজদের প্রতিযোগিতা। রাজার আসন থেকে অনুমান একশো হাত দূরে লম্বা ভাবে রাখা হয়েছিল সাত আট ফুট উঁচু এক হাত চওড়া একখানা তক্তা। ঐ তক্তার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের গোল ছিদ্র এবং ঐ ছিদ্রের বহির্ভাগে তার চতুর্গুণ ব্যাসের একটা কালো বৃত্ত-রেখা। তক্তার ঠিক পিছনে [illegible] বরাবর বেশ মোটা একটা কলাগাছ সোজা ভাবে মাটিতে পুঁতে [illegible] হয়েছিল।

পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্ব্বক্ষণে এক জন কর্ম্মচারী উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল, তক্তার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার পিছনের কলাগাছে তীর বিদ্ধ করাই হবে তীরন্দাজদের লক্ষ্য।

রাজার আসনের সামনে দশ হাত দূরে পরীক্ষার্থীর দাঁড়াবার স্থান নির্দ্দিষ্ট। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা সকলকে বুঝিয়ে দেবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে ধ্বনিত হলো চারটে বড় মাদল আর দু'টো কাঁসর একযোগে। তার পর রাজার ইঙ্গিতে ঐ বাজনা বন্ধ হ'লো।

একে একে প্রায় পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থী লক্ষ্য-বেধ কৌশলে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য উপস্থিত হলো। পরীক্ষা-শেষে দেখা গেল, সেনাপতি নান্দু সকলকে হারিয়ে দেছে,—তার তীর ছিদ্রের ঠিক কেন্দ্র-পথে না গেলেও ছিদ্রের পাশ দিয়ে গিয়ে কলাগাছ স্পর্শ ক'রেছে।

সেনাপতির সাফল্যে রাজার আনন্দ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাতে হ'লো তার ঈর্ষা। রাজার খ্যাতি ছিল বিচক্ষণ তীরন্দাজ বলে এবং প্রচুর দৈহিক শক্তি ও এই বিচক্ষণতার জন্যই তার এই উচ্চ রাজপদ। নান্দুকে সকলে পাছে রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ মনে করে, এই আশঙ্কায় রাজা তাকে পরাভব করবার ইচ্ছায় আসন ছেড়ে নান্দুর পাশে এসে দাঁড়ালো পরীক্ষা দেবার জন্য। তখনই রাজার হাতে তীর-ধনুক দেওয়া হ'লো। রাজার সফলতা দেখবার আশায় সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলো।

রাজার লক্ষ্য-বেধ নান্দুর মতই হ'লো, সুতরাং এতে শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা হ'লো না। তখন লক্ষ্যের তক্তা এবং কলাগাছ আরো দশ গজ দূরে পিছিয়ে দেওয়া হ'লো। এবার রাজার তীর পড়লো ছিদ্রের বাইরে—তার পরিধি রেখায় প্রায় দু'ইঞ্চি দূরে। নান্দু আবার তীর নিক্ষেপ করলো। তার তীরও ছিদ্রপথে গেল না, ছিদ্রের ঠিক প্রান্ত-ভাগে আটকে রইলো। তা হ'লেও নান্দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বলে প্রতিপন্ন হ'লো। রাজা ক্ষুণ্ণ মনে নিজের আসনে ফিরে এলো।

কাঁসর-দামামানাদে সেনাপতি নান্দুর জয় বিঘোষিত হলো। এর পর বাকি শুধু ঝিম্‌লির সম্প্রদান।

পরাজয়ের অবমাননা সত্ত্বেও রাজা কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত হ'য়ে ঝিম্‌লিকে নিকটে ডাকলো। সে কাছে এসে ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়াবা মাত্র রাজা বললো :—"তীরখেলায় নান্দুর জিত হয়েছে—তার গলায় মালা দিবি—সে হবে তুরার নাপ্‌ফু (স্বামী), তুই হবি তার কিমা (স্ত্রী)—তার ঘর করবি। যা তুই নান্দুর কাছে।"

বিজয়ী নান্দু অদূরে দাঁড়িয়ে ঝিমলির আগমন প্রতীক্ষা করছিল—প্রচুর গর্ব্বমিশ্রিত উল্লাসে তার মুখ পরিপূর্ণ। রাজার আদেশ অমান্য করবার মতো দুঃসাহস সেখানে কারো ছিল না। ঝিম্‌লিও জানতো, তা করলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঝিম্‌লি তবু নান্দুর দিকে অগ্রসর না হয়ে রাজার কাছে একটি কথা নিবেদন করার অনুমতি চাইলো। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রাজা ব'ললো,—"কি বল্‌বি বল্?"

ঝিম্‌লি তখন জানু পেতে বসে বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলো,—"মাপ করো রাজা,—নান্দু সকলের বড় ওস্তাদ আমি তা মানি না। রাজার হুকুম পেলে এই ঝিম্‌লিই তাকে হারিয়ে দেবে।"

রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লো—"পারবি হারাতে?"

—"পরখ ক'রে দ্যাখো, পারি কি না।"

ঝিম্‌লির কথায় রাজা মনে মনে খুসী হ'লো। নান্দুর কাছে হেরে রাজা খুবই লজ্জিত হ'য়েছিল। এখন ঝিম্‌লি যদি সত্যই নান্দুকে পরাভব ক'রতে পারে তা হ'লে তার লজ্জার পরিমাণ অনেকটা কমে। নান্দুর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। এই ভাবে মনের মধ্যে আলোচনা ক'রে রাজা ঝিম্‌লিকে বললো,—"আচ্ছা, সে তো ভালো কথা আছে। এখনই তার পরখ হবে। তুরার তীর-ধনু আনিয়ে নে।"

নান্দুকে সম্বোধন ক'রে রাজা বল্‌লো,—"নান্দু সকলের বড় ওস্তাদ, ঝিম্‌লি তা মানে না। ও বলে নান্দুকে ও হারিয়ে দেবে। বেশ, আবার পরখ হ'বে। আমার হুকুম।"

রাজার এ কথায় নান্দু প্রথমে একটু বিস্মিত হ'য়েছিল, পরক্ষণেই গম্ভীর ভাবে বললো :—"রাজার হুকুম মাথায় রইলো—একটা 'বুবুই' কাছে নান্দু হারবে না, তার ডেমাক এখুনি ভাঙি যাবে।"

ঝিম্‌লির এক সহচরী তীর-ধনুক এনে ঝিম্‌লির হাতে দিল। ধনুক হাতে ধীরপদে ঝিম্‌লি এগিয়ে গেল পরীক্ষা-স্থলে। সকলের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ঝিম্‌লির উপর। একটুও বিচলিত না হ'য়ে স্থির লক্ষ্যে ঝিম্‌লি তীর নিক্ষেপ ক'রলো। সকলে বিস্মিত হ'লো দেখে, সে তীর তক্তার ছিদ্রের ঠিক কেন্দ্রস্থল দিয়ে গিয়ে কলাগাছ বিদ্ধ ক'রেছে। চার দিকে উচ্চ রোল উঠে ঝিম্‌লির জয় ঘোষণা ক'রলো।

রাজার বিশেষ আদেশে নান্দু আবার ঐ লক্ষ্যবেধ করবার চেষ্টা ক'রলো কিন্তু কৃতকার্য্য হ'লো না।

রাজার সামনে গিয়ে ঝিমুলি আবার নিবেদন ক'রলো, রাজার হুকুম হ'লে সে আর একটা তীরের খেলা দেখাবে এবং সে খেলা যদি আর কেউ দেখাতে পারে তা হ'লে তার কাছে ঝিমুলি পরাজয় মানবে।

রাজা নিরাপত্তিতে অনুমতি দিল। ঝিমুলি তখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধ্ব আকাশের দিকে একটা তীর নিক্ষেপ ক'রলো। পর-ক্ষণেই তীর এসে পড়লো রাজার সামনে তিন গজ দূরে ঠিক খাড়া ভাবে ভূমিকে বিদ্ধ ক'রে। তার পর ঝিমুলি নিক্ষেপ ক'রলো দ্বিতীয় তীর—সেটাও উপরে আকাশের দিকে। তখন সকলের অপরিসীম বিস্ময় জন্মিয়ে সে দ্বিতীয় তীর প্রথম তীরের উপর প'ড়ে ঠিক সোজা বিঁধে রইলো। এর পর ঝিমুলির তৃতীয় তীরও যখন ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, তখন সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তীর নিক্ষেপে এমন কৌশলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার সাহস আর কারো হ'লো না। নান্দু বিরস মুখে সেখান থেকে স'রে পড়লো।

রাজা লি-ওয়াঙ খুশী মনে ঝিমুলির কৃতিত্বের প্রশংসা ক'রে বললো, "তীরন্দাজ হিসাবে ঝিমুলিই সকলের চেয়ে বড় ওস্তাদ—নান্দু তার কাছে হেরে গিয়েছে—সে আর ঝিমুলিকে পাবে না। ঝিমুলি নিজের ইচ্ছামতো 'নাপ্‌ফু' নির্বাচন ক'রে বিয়ে ক'রবে।"

অনুষ্ঠানটা এই ভাবেই শেষ হ'লো। এর পর তার রাজ্যের প্রধান প্রধান মার্টাই ও গালিদের যারা আজ উপস্থিত ছিল, রাজা লি-ওয়াঙ্ তাদের নিয়ে অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ ক'রতে বসলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

আজমীরের পথে

আবু পাহাড় হইতে আজমীরে। আবু রোড হইতে দিল্লীর পথে মাঝামাঝি আজমীর। দিল্লী হইতে বি, বি, সি, আই রেলওয়ের (মিটারগেজ) গাড়ীতে আজমীর পৌছিতে এগারো ঘণ্টা সময় লাগে। সুন্দর সহর। মাদার পর্ব্বত এবং বিখ্যাত তারাগড় পাহাড়ের মধ্যে সহরটি অবস্থিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চে আজমীরের অবস্থান। আজমীর সহরের সাধারণ দৃশ্য উপভোগ্য। আজমীরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ডাঃ আর, এইচ, আর্ভিন সাহেব(১) বলেন, গ্রীষ্মকালে আজমীরের গরম কয়েক দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী উঠিলেই বর্ষা নামে। সহরটি "চিত্রবৎ সুন্দর।" রাজপুতানায় এই ছড়াটি প্রচলিত আছে:—

সিয়ালো খাটু ভলো, উন্দালো আজমের।
নাগীনো নিতকা ভলো, সাবণ বীকানের॥

অনুবাদ:—মাড়োয়ারের খাটু স্থানটি শীতকালে ভাল, গরমে আজমীর ভাল, নাগর স্থানটি সারা বৎসর ভাল এবং বর্ষায় বিকানীর ভাল।

কেইন সাহেব(২) আজমীরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লিখেছিলেন:—"সহরটি প্রাচীন, শিল্পসম্পদে পূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ইমারত আজমীরে অবস্থিত। সহরটির চারি দিকে একটি প্রস্তর-প্রাচীর।" ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক আজমীর পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থে(৩) আজমীরের চত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। বর্ষাকালেই আজমীরের শোভা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। তখন চতুষ্পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতগুলি হরিৎ রঙে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। পাহাড়ের পশ্চাতে অসীম নীলাকাশ, পাদদেশে আনা সাগর, বিশলা হ্রদ ও ফয় সাগরের উচ্ছলিত জলরাশি, এবং অদূরে ক্যাস্কেড, আস্তেখ এবং বৈজনাথ জলপ্রপাতত্রয়ের মুহুর্মুহু গর্জ্জন এবং পার্বত্য নদীগুলির নিম্নমুখী প্রবাহ চক্ষু ও কর্ণের মোহ সৃষ্টি করে। আজমীরের গোলাপ ও চামেলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ষার সময় বনে জঙ্গলে ও উদ্যানে যখন শত শত গোলাপ ও সহস্র সহস্র চামেলি ফুটিয়া উঠে, তখন সহরের আবহাওয়া সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

মেয়ো কলেজ—আজমীর

এখানে হিন্দী ও মাড়োয়ারী ভাষাই প্রচলিত। নাতিদূরে রামসার পরগণার পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে লবণ তৈয়ারী হইত। সরকার তাহা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বন্ধ করিয়া দেন। আর্য্য সমাজের একটি বড় কেন্দ্র এই সহর; কারণ, এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর এখানে দেহত্যাগ করেন। আজমীরের সমৃদ্ধিযুগে এই ছড়াটি লোকমুখে শোনা যাইত:—

(১) Medical Topography of Ajmer by Dr. R. H. Irvine, P. 66.

(২) Picturesque India by Caine, P. 77.

(৩) "Letters from India" by Victor Jacquemont.

"আজমেরা কে মায়নে, চার চিজ সরনাম।
খ্বাজে সাহেবকী দরগাহ, কহিয়ে, পুষ্কর চো অমান।
মকরাণামে পত্থর নিকলে, সাঁভর লুণ কী খান।"

অনুবাদ:—আজমীর রাজ্যে চারিটি বস্তু প্রসিদ্ধ; খ্বাজা সাহেবের দরগা, মাকরাণে মার্বেল প্রস্তরের পাহাড় পুষ্কর তীর্থ এবং সম্ভরের লবণ-খনি।

আজমীরে আমি শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অতিথি হই। তিনি এই অঞ্চলে অনেক বৎসর চাকরী উপলক্ষে আছেন। তিনি ঢাকা জেলার লোক এবং এখানে আজমীর-মাড়োয়ারের চীফ্ কমিশনারে সেক্রেটারী। আজমীরে প্রায় দেড় শত ঘর বাঙ্গালী আছেন। সকলেই চাকুরীজীবী—কেহ ডাক্তার, কেহ উকিল ইত্যাদি। ১৫।২০টি পরিবার এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। ১৭।১৮
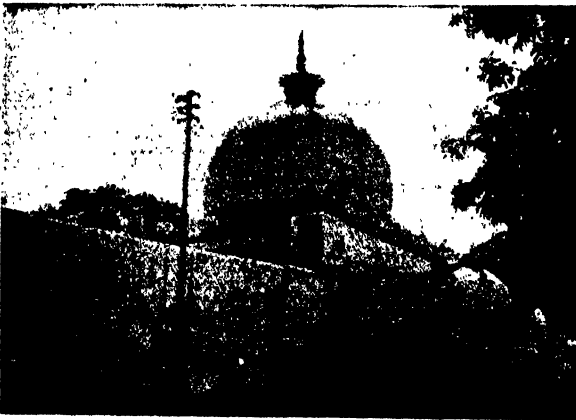
দর্গা খ্বাজা সাহেব—আজমীর

বৎসর যাবৎ একটি বাঙ্গালী ধর্মশালা এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে পুষ্কর তীর্থে এই ধর্মশালার একটি শাখা আছে। আজমীরের বাঙ্গালী ধর্মশালায় স্থানীয় বাঙ্গালীগণ চৈতন্যোৎসব, প্রতিমায় দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা করেন। নবাগত অতিথি বাঙ্গালীগণ এই ধর্মশালায় বিনা খরচে থাকিতে পান। একটি বাঙ্গালী স্কুল এবং একটি বাঙ্গালী ক্লাবও এখানে আছে। আজমীর হইতে ১৪ মাইল দূরে নসীরাবাদ নামক স্থানে একটি বাঙ্গালী কালীবাড়ী আছে। এখানে প্রতি বৎসর প্রতিমায় কালীপূজা হয়। মা কালীর পূজকও বাঙ্গালী। উক্ত কালীবাড়ী প্রাচীন এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই কালীবাড়ীগুলি। বাঙ্গালী যে যে স্থানে বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী হয়েছেন সেই সেই স্থানে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন কি সিমলা ও পেশোয়ারেও।

আজমীরের দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দ্দার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এই সহরের প্রধান নাগরিক। বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন ইনিই প্রবর্তন করান। সর্দা সাহেব আর্য্য সমাজের বিশিষ্ট নেতা এবং খ্যাতনামা গ্রন্থকার। তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত, সুলিখিত ও সুবৃহৎ একখানি গ্রন্থ (১) আমাকে উপহার দিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ দুইবার আজমীরে তাঁহার অতিথি হয়েছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, রাজস্থানের ইতিহাসের জ্ঞান রাজপুতের অপেক্ষা বাঙ্গালীর অধিক। পৃথ্বীরাজের সময় কয়েক জন বাঙ্গালী রাজপুতানায় বাসিন্দা হয়েছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখন গৌড়রাজপুত নামে পরিচিত। এই সকল বিষয় তিনি গল্প করিয়া বলিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমরা আনা সাগর দেখিতে যাই। সম্রাট পৃথ্বীরাজের পিতামহ রাজা আনাজী (বা অর্ণরাজ) ১১৫০ খৃঃ অব্দে এই হ্রদ নির্মাণ করেন। যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন ইহার পরিধি হয় ৮ মাইল। সাগরটি ১৫।২০ ফুট গভীর। সার টমাস্ রো ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আজমীরস্থ আনা সাগর দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং তাহার একটি মনোরম বর্ণনা লিখিয়াছেন। হ্রদটি নাগ পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই হ্রদের তীরে মার্বেল পাথরের বিশ্রামভবন ও ভ্রমণস্থান নির্মাণ করেন। সাগরের তীরে চীফ কমিশনারের অফিস ও নিবাস এবং একটি মহাবীর মন্দির। আনা সাগরের পার্শ্বেই জাহাঙ্গীর দৌলতাবাদ নামক অদ্যাপি বর্তমান প্রমোদকানন নির্মাণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, ভারতে গোলাপের আতর সর্বপ্রথম আজমীরেই তাঁহার রাজত্বকালে প্রস্তুত হয়। তাঁহার শাশুড়ী (সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের মাতা) সর্বপ্রথম গোলাপের আতর তৈয়ারী করেন।

আজমীর রাজপুতানার শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রধান সহর। এখানে একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজ, দুইটি গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, একটি মিশনারী হাই স্কুল, একটি ডি, এ, ভি, হাই স্কুল, একটি হণ্টার গার্লস কলেজ প্রভৃতি আছে। গবর্ণমেণ্ট কলেজে হালদার ও বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি-ধারী দুই জন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। তা ছাড়া বহু মিডিল স্কুল আজমীরে আছে। রাজকুমারগণের শিক্ষার জন্য যে কলেজ আছে তাহার নাম মেয়ো কলেজ। মেয়ো কলেজটি সহরের এক প্রান্তে মাদার পর্বতের পাদদেশে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে অবস্থিত। ভারতের ভাইসরয় লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২) কর্তৃক এই কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৭০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃঃ একটি মাত্র ছাত্র লইয়া কলেজটি আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই কলেজে ১৫০ ছাত্র এবং ইহা ভারতের পাঁচটি রাজকুমার কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাকে ভারতের 'ইটন' (Eton) বলা হয়। রাজপুতানার ষ্টেটসমূহের রাজকুমারগণ এই কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বিভিন্ন ষ্টেটের রাজকুমারগণের বাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ হোষ্টেল আছে। পোলো, টেনিস, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার জন্য মাঠ, ব্যায়ামাগার, স্বাস্থ্যনিবাস, হিন্দুমন্দির, স্কুল, কলেজ, অধ্যাপকগণের নিবাস প্রভৃতি বিশিষ্ট মেয়ো কলেজ ১৬৭ একর ভূমি ব্যাপিয়া বিরাজিত। অধ্যাপকগণের মধ্যে পাঁচ জন ইউরোপীয় এবং বিশ জন ভারতীয় আছেন। কলেজস্থিত জয়পুর হাউসে বন্দ্যো-পাধ্যায় উপাধিধারী জনৈক বাঙ্গালী শিক্ষক থাকেন। রাজপুতানার অনেক ষ্টেটের বর্তমান মহারাজা এই কলেজের ছাত্র। আজমীর সহরটি প্রত্যেক বৎসরেই বিস্তৃত হইতেছে। একটি নূতন বিস্তারের নাম—"আদর্শ নগর"। ষ্টেশন হইতে আদর্শ নগর প্রায় দুই আড়াই মাইল দূরে। এখানে কয়েক জন বাঙ্গালী গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। আদর্শ নগরের হাউসিং সোসাইটী রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য

(১) Ajmer: Historical and Descriptive by Diwan Bahadur Har Bilas Sarda.

এক খণ্ড ভুমি প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় বাঙ্গালীগণ এই ভুমিখণ্ডের উপর আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

তার পর আমরা আড়াই-দিনকা ঝোঁপরা" পরিদর্শন করি। জেনারল কানিংহাম বলেন, "প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই স্থানটির মূল্য অনেক।" কর্ণেল টড্ (১) বলেন, "এই গৃহটি হিন্দুশিল্পের উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন।" জেনারল কানিংহাম (ভারতের ডিরেক্টার জেনারল অব্ আর্কিওলজি) (২) বলেন, যে সূক্ষ্ম শিল্প, সুন্দর কারুকার্য্য ও শ্রমসাধ্য বৈচিত্র্য এই প্রাসাদে হিন্দু শিল্পিগণ দেখাইয়াছেন জগতে তাহা অতুলনীয়। পৃথিবীর মহত্তম প্রাসাদের সমকক্ষ এই ভগ্ন প্রাসাদটি।" ফার্গুসন সাহেবের (৩) মতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হিসাবে ঝোঁপরা বোধ হয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। ইহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের কাছে কাইরো বা পারস্যের কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। ইহার সহিত স্পেন বা সিরিয়ার কোন কারুকার্য্যের উপমা চলে না। ডাঃ ফিউরার (৪) বলেন, "সমগ্র দেওয়ালের বহির্দেশে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের যে রমণীয় বৈচিত্র্য লেশের (lace) সঙ্গেই তাহার তুলনা চলিতে পারে।" হিন্দু সম্রাট বিশালদেব কর্ত্তৃক ইহা নির্মিত হয়। মিঃ এ, এল, পি, টুকার (Tucker) (৫) বলেন, "ঝোঁপরার উঠান খনন করিয়া ১৯০২ খৃঃ একটি শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার শিল্পী হিন্দু; জৈন নহে।" কাউজেনস্ (Cousens) সাহেব (৬) বলেন, "ঝোঁপরার শিল্প নিঃসন্দেহে হিন্দু, জৈন নহে। দেওয়াল-গাত্রে মহাকালীর, শিব, পার্বতী ও কুবের প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর ভগ্নমূর্ত্তি এখনও দেখা যায়।" ভারতের প্রথম চৌহান সম্রাট বিশালদেব ১০৭৫ খৃঃ শিক্ষা মন্দিরের জন্য এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। হল-গৃহটি ২০০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৭৫ ফুট প্রস্থ। এই হলে সরস্বতীর একটি মন্দির ছিল। ১১৯২ খৃঃ আফগানিস্থানের অত্যাচারী সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরী যখন আজমীর আক্রমণ ও অধিকার করেন তখন তাঁহার আফগান সৈন্যরা এই প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ইহাকে একটি মসজিদে পরিণত করেন। প্রবাদ যে, আড়াই দিনে এই ঝোঁপরা নির্মিত হয়। এই জন্য ইহার নাম 'আড়াই দিনকা ঝোঁপরা'। ঝোঁফরার দেওয়াল-গাত্রে সংস্কৃত শিলালিপিতে আছে:—"শ্রীবিগ্রহরাজদেবেন কারিতমায়তনমিদং।" বিশালদেব এবং বিগ্রহরাজ একই ব্যক্তি। 'ললিত বিগ্রহরাজ নাটকে'র কিয়দংশ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় দেওয়ালে লিখিত ছিল। ডাঃ কীলহর্ণ (Dr. Keilhorn) (৭) এই সকল শিলালিপি সম্পাদনপূর্বক লিখিয়াছেন যে, "এই সকল শিলালিপিতে 'ললিত বিগ্রহরাজ নাটকের কিয়দংশ লিখিত আছে। মহাকবি সোমদেব কর্ত্তৃক এই নাটকটি আজমীরের মহারাজা বিগ্রহরাজদেবের সম্মানার্থে রচিত।" হরকেলী নাটকের একাংশও এই শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শিবমহিমা বর্ণনার উদ্দেশ্যে নাটকটি রাজা বিগ্রহরাজের রচিত। নাটকটি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' নাটকের অনুকরণ মাত্র। মুসলমান রাজাগণ পরে এই প্রাসাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উপর আরবী ও ফার্সী অক্ষরে মহম্মদের উপদেশ ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে মোগল আমলে কত মন্দির মসজিদে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই গৃহটি বর্ত্তমানে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা অজয়পাল আজমের সহর স্থাপন পূর্বক স্বীয় নামানুসারে এই সহরের নামকরণ করেন—অজয়মেরু। আজমের শব্দটি অজয়মেরু শব্দের অপভ্রংশ। রাজা অজয়পাল বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হন এবং শেষ জীবন আজমীরের সীমান্তে এক নিভৃত স্থানে অতিবাহিত করেন। এই স্থানে এখন একটি শিবমন্দির আছে।
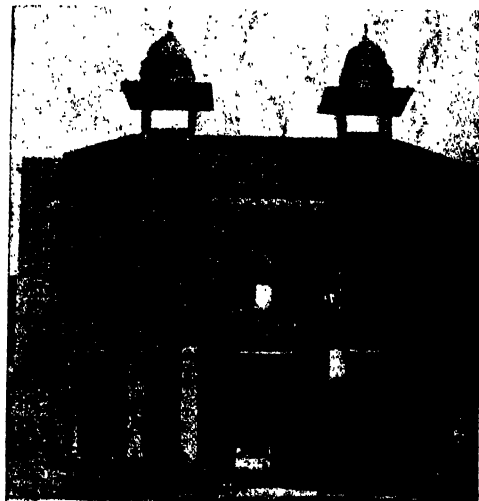
মোগল দুর্গের প্রধান ফটক—আজমীর

আজমীর মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ। মুসলমানগণ এই সহরকে আজমীর শরীফ বলিয়া থাকেন। আজমীরের দর্গা খাজা সাহেব মুসলমানদিগের তীর্থ। আমরা এ জায়গাটি দেখিতে গিয়াছিলাম। দর্গার প্রধান পুরোহিতের সহিত আলাপ হইল। দর্গার মধ্যে আরবী পড়িবার এক মাদ্রাসা আছে। দর্গায় হিন্দুদিগের প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু খৃষ্টানদের নাই। সুদূর ঢাকা জেলা হইতেও মুসলমানগণ আরবী অধ্যয়নার্থে এখানে আছেন। খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তী ১১৪৩ খৃঃ আফগানিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সৈন্যের সহিত ভারতে আসিয়া আজমীরে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানাদি ছিল। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই সমাধির উপর এই বিরাট দর্গা নির্মিত। মৈনুদ্দিন উন্নত সাধক ছিলেন। ১৫৭০ খৃঃ এই দর্গায় সম্রাট আকবর বৃহৎ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থানে বর্ত্তমান খাজা সাহেব উপদেশাদি দেন। আকবর এই দর্গা দর্শনে প্রায়ই আসিতেন। সাহজাহান এই দর্গার মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের একটি জুমা মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দেন। হায়দ্রাবাদের

(১) Annals and Antiquities of Rajasthan Vol. I, P. 778.

(২) Archeological Survey of India Vol. II. P. 2

(৩) History of Indian and Eastern Architecture by Fergusson. P. 518.

(৪) Archeological Survey Report (N.W.R.) by Dr. Fuhrer. for 1898.

(৫) Archeological Survey Report for 1902-3, P.81.

(৬) Archeological Survey Report, Western India, for 1900.

(৭) Indian Antiquary, Vol XX, P, 201.

নিজাম ১৯১৫ খৃঃ এই দর্গার বৃহৎ ৭৫ ফুট উচচ প্রধান ফটকটি নির্মাণ করেন। দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দা (১) বলেন যে, দর্গাস্থিত ছত্রী (গৃহ)গুলি হিন্দু ও জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত। গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিবার পর আমাদের মনে শান্ত পবিত্র ভাবের উদয় হইল, মনে হইল যেন কোন হিন্দু মন্দিরে আসিয়াছি। আড়াই-দিনকা-ঝোঁপরার ন্যায় এই দর্গারও বিচিত্র ইতিহাস আছে। দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দা তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে (২) বলেন যে, এই দর্গাস্থ সমাধির নিম্নে একটি শিবমন্দির আছে। দর্গা হইতে জায়গীরপ্রাপ্ত এক ব্রাহ্মণ-পরিবার পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরে সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে শিবের পূজা দিয়া আসেন। প্রবাদ, ব্রহ্মা
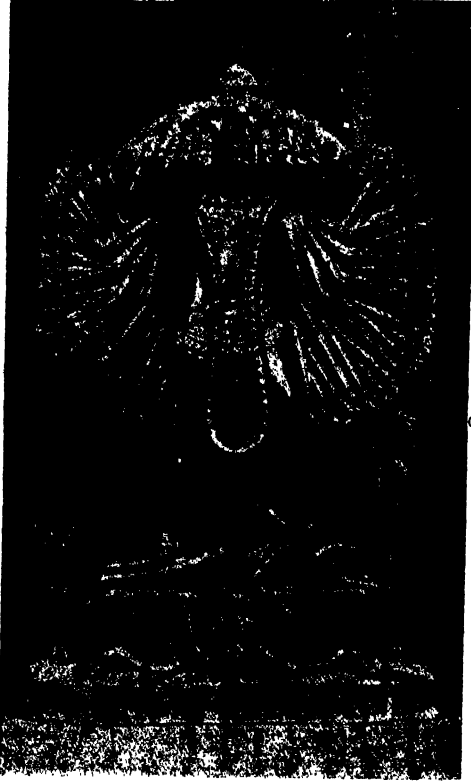
চুয়াল্প হস্ত ও দশ মস্তক-বিশিষ্ট কালীমূর্ত্তি

পুষ্কর তীর্থের চতুঃসীমানায় চারিটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন:— বৈজনাথ, অর্দ্ধচন্দ্রেশ্বর, অজগন্ধেশ্বর ও নন্দকেশ্বর। বৈজনাথ, নন্দকেশ্বর ও অজগন্ধেশ্বর এই শিবলিঙ্গ ও মন্দির অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্রেশ্বর মন্দিরের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এবং স্থানীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, অর্দ্ধচন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপরেই এই খাজা দর্গা নির্মিত। প্রবল জনশ্রুতি যে, ভগর্ভে চিস্তীর সমাধির নীচে এখনও শিবলিঙ্গ বিদ্যমান এবং মহাদেবের বরে না কি চিস্তী সাহেব সিদ্ধিলাভ করেন; তাই তিনি এই মন্দির ধ্বংস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আজমীরের মিউজিয়াম দেখিবার বস্তু। ইহার নাম রাজপুতানা মিউজিয়াম। ১৯০৮ খৃঃ ইহা স্থাপিত হয়। ১৯০২ খৃঃ তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড কার্জন যখন আজমীরে পদার্পণ করেন, তখনই তিনি এখানে মিউজিয়াম স্থাপনের হুকুম দিয়া যান এবং ১৯০৩ খৃঃ ভারতের ডিরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি তাহার প্ল্যান তৈয়ার করেন। রাজপুতানার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গৌরীশঙ্কর ওঝা এই মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটার নিযুক্ত হন। পণ্ডিত ওঝা তৎপূর্ব্বে উদয়পুর রাজ্যের মিউজিয়ামের কিউরেটার ছিলেন। আজমীরের মিউজিয়ামের বর্তমান কিউরেটার জনৈক বাঙ্গালী মিঃ ইউ, এন, ভট্টাচার্য্য এম-এ। ইনি সিন্ধু প্রদেশে মহেন্-জো-দারো এবং বাংলার মহাস্থানগড়ের খনন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মী-নারায়ণ

এবং হারাপ্পা, তক্ষশিলা প্রভৃতি মিউজিয়ামে কাজ করিতেন। ইনি শ্রীহট্টের লোক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইনি পণ্ডিত, বিনয়ী এবং অমায়িক। তিনি আজমীর মিউজিয়ামের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা মিউজিয়ামে গেলে তিনি সাদরে সব দেখাইলেন এবং রক্ষিত মূর্ত্তি এবং ছবিগুলি ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

আজমীরস্থিত রাজপুতানা মিউজিয়ামটি মোগল দুর্গ ও আকবর প্রাসাদে অবস্থিত। এই দুর্গ ও প্রাসাদ আকবর কর্ত্তৃক স্বীয় আবাসের জন্য ১৫৭২ খৃঃঅব্দে নির্মিত হয়। 'তাবাকটী আকবরী' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সম্রাট আকবর আগ্রা হইতে ফতেপুর সিক্রী হইয়া আজমীর আসেন এবং এই সহরের চতুর্দিকে একটি সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার এবং সহরের মধ্যস্থলে একটি প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দেন। এই দুর্গের প্রধান তোরণের ছবি ২৯১ পৃষ্ঠায়

(১) Ajmer : Historical and Descriptive P. 88.
(২) Ajmer : Historical and Descriptive P. 90.

দেখুন। এই তোরণের উপরের বালকনিতে প্রত্যহ প্রাতে সম্রাট জাহাঙ্গীর আসিয়া বসিতেন এবং প্রজাদের আবেদন শুনিতেন। জাহাঙ্গীর প্রজারঞ্জক ছিলেন—অতি দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁহাকে দুঃখ-অভিযোগের কথা জানাইতে পারিত এবং তিনি তাহা শুনিতেন। এই তোরণ ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। কারণ, এইখানে ইংলণ্ডের রাজা জেম্স (প্রথম)এ প্রথম রাজদূত সার টমার্স্ রোকে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সম্রাট জাহাঙ্গীর দর্শন দেন এবং রাজকীয় সম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই মিউজিয়ামে আর একটি বিচিত্র প্রস্তর-প্রতিমা দেখিলাম—চুয়ান্ন হাত ও দশ মস্তকযুক্ত এক কালীমূর্ত্তি। এরূপ মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত ভারতে কোথাও আর দেখা যায় নাই। কালীমূর্ত্তি নগ্ন শিবের বুকে দাঁড়াইয়া আছেন এবং শায়িত শিবমূর্ত্তি একটি পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিত। দেবীর গলায় হাঁটু-অবধি বিস্তৃত নরমুণ্ডমালা, প্রধান মুখে লোলজিহ্বা, চুয়ান্ন হাতে বিবিধ আয়ুধ; দশটি মস্তকের প্রধান মস্তকটি মানুষের, অবশিষ্ট

নুরজাহানের ছবি—আজমীর মিউজিয়াম

নয়টি মস্তক অশ্ব, হস্তী, শূকর, সিংহ, কুকুর, শৃগাল ও বানর প্রভৃতি পশুর। মূর্ত্তিটি কালো পাথরে তৈয়রী এবং যোধপুর ষ্টেটের আউয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে কালীর অষ্টাদশ হস্তের বর্ণনা আছে এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীকে সহস্রভুজা এবং অনন্তভুজাও বলা হইয়াছে। ১৮৫৩—৫৪ বা ১০৮এর অর্দ্ধেক ৫৪—এই ভাবে ৫৪ হাতের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই মূর্ত্তির সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। আর একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে দেখিলাম; লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি গরুড়ের উপরে উপবিষ্ট এবং মধ্যযুগের শেষভাগে প্রস্তুত। ইহা আজমীর জেলার বাঘেরা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। মূর্ত্তির বসিবার ভঙ্গী এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক মুদ্রা এবং শীল (seal) এই মিউজিয়ামে আছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একটি শীলে যোগাসনে উপবিষ্ট পশুপতির (শিবের) চিত্র আছে; শিবের চারি দিকে ব্যাঘ্র, হাতী মহিষাদি জন্তু আসীন।

কারণ, শিব 'পশূনাং পতিঃ।' কিউরেটার মহাশয় বলিলেন, শিবপূজা প্রাগৈতিহাসিক অর্থাৎ প্রাক্‌বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। আর একটি শীলের উপরে ব্রাহ্মণী বৃষ এবং বৃক্ষদেবতার চিত্র আছে।

মিউজিয়ামের চিত্র-গৃহে রাজপুতানার বিখ্যাত নৃপতিগণের, আকবরের, ফরুকসায়ারের, বীরবলের এবং অনেক মোগল সম্রাটের সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। তন্মধ্যে নুরজাহানের একটি প্রাচীন ছবি আছে। ১৯১১ খৃঃ দিল্লী দরবারের প্রাচীন চিত্র-প্রদর্শনীতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। নুরজাহানের পূর্ব্বনাম ছিল মেহের-উন্নিসা অর্থাৎ নারীকুলের সূর্য্য। ১৬১১ খৃঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবার পর তাঁহার নাম হইল নুরমহল্লা অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের জ্যোতিঃ। তৎপরে তাঁহার নামকরণ হইল নুরজাহান অর্থাৎ জগতের আলোক। নুরজাহান দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর মোগল সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। একটি পঞ্চমুখ শিবমূর্ত্তি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে: সূর্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই চারি দেবতার চারি মুখ শিবের চতুর্মুখ। আর পঞ্চম ও প্রধান মুখটি শিবের। একটি ঘরে

প্রস্তর-ক্ষোদিত সুন্দরী নারীর মস্তক

বহু প্রাচীন ও সুন্দর জৈনমূর্ত্তি আছে। তীর্থঙ্কর, গোমুখ যক্ষ এবং সরস্বতী প্রভৃতি নানা জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা গেল। প্রায় দুই সহস্র (স্বর্ণ; রৌপ্য, তাম্র ও অন্যান্য ধাতুর) মুদ্রা মিউজিয়ামে আছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশটি কার্ষাপণ(punch-marked) মুদ্রা রক্ষিত আছে। কালো পাথরে ক্ষোদিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর একটি নারীর মস্তক দেখিলাম। মূর্ত্তিটি আলোয়ার রাজ্যের রাজগড়ে প্রাপ্ত এবং মধ্যযুগে নির্ম্মিত। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর একটি শিলালিপি এখানে আছে। আজমীরের দক্ষিণ-পূর্বে ৩৬ মাইল দূরে বালির নিকটে ভিলোত মাতার মন্দিরে প্রাপ্ত এই বালি শিলালিপি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর (প্রাক্-অশোকযুগের) এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। আর একটি শিলালিপি আছে; তাহা শিলাদিত্যের এবং সামোলিতে প্রাপ্ত এবং সপ্তম শতাব্দীর। এই শিলালিপি হইতে ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেবার রাজবংশ পারস্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা অন্ততঃ দুই শতাব্দী প্রাচীন। আর একটি

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গের অন্তঃসন্ধান

দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিলাম ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবের সীমার সন্ধান। শিবপুরাণে আখ্যায়িকাটির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে একবার বিবাদ হয়: ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমি বড়'; বিষ্ণু বলিলেন, 'আমি বড়'। 'কে বড়?' এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শিবের নিকট উভয়ে প্রার্থনা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে এক অতলস্পর্শী এবং আকাশভেদী আলোকস্তম্ভ প্রকট হইল; ব্রহ্মা স্বীয় বাহন হংসে চড়িয়া আলোকস্তম্ভের উর্দ্ধসীমার সন্ধানে চলিলেন এবং বিষ্ণু স্বীয় বাহন বরাহে চড়িয়া স্তম্ভের নিম্নসীমার অন্ত খুঁজিতে যাত্রা করিলেন। উভয়ে ব্যর্থকাম হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শিবের মহিমা স্বীকার করিলেন। মিউজিয়ামে একটি লাইব্রেরী আছে। এ লাইব্রেরীতে রাজপুতানায় সংগৃহীত বহু প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষিত। মিউজিয়ামে আরও অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে।

আজমীরে প্রথম রেলওয়ে এবং ট্রেণ হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট। প্রায় দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন আজমীর সহরে অনেক কিছু দেখিবার ও জানিবার আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনুশীলন করিতে হইলে এই সকল পুরাতন সহরে গিয়া থাকিতে হয়। অতীত ভারত-গৌরব মানস চক্ষে তাহা হইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং ভারতেতিহাসের অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ চিত্র হৃদয়ে বিকশিত হইবে। ভারত-তত্ত্ব বুঝা খুব সহজ নয়। কোন গ্রন্থে ইহার নির্খুত চিত্র নাই। আসমুদ্র-হিমাচল এই মহাভারতের ভগ্ন মন্দিরে, জীর্ণ প্রস্তরে, শুষ্ক স্রোতস্বতীতে এবং নিভৃত গুহায় অব্যক্ত ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিখিত আছে। ধীর ভাবে সে পাঠ উদ্ধার করিতে হইবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্লীল ও অশ্লীল

যমুনায় নামি' ব্রজবালা করে স্নান,
বসন তাদের হরিলেন ভগবান্।
জলকেলি-শেষে তীরেতে উঠিল যবে
বসন না হেরি—কলরব করে সবে।
হাসে বসি' শ্যাম;—নগ্ন দেহের শোভা
কীর্ত্তিতে তাঁর হ'ল আরো মনোলোভা।
পুরাণে-শাস্ত্রে রচি' এরি স্তুতি-গাথা
অনুরাগে ভরি ভরায়ে গিয়াছে পাতা।
সে কাহিনী পড়ি রসিক-ভক্ত মজে;
কল্পনা-ভরে চলে যায় দূর ব্রজে।

দুঃশাসনও সে কুরুদের সভা-মাঝে
যাজ্ঞসেনীরে ফেলেছিল মহা লাজে।
বসন তাঁহার সভা-মাঝে নিল কাড়ি;
রক্ষা তাঁহারে করেন চক্রধারী।
পড়ি এ-কাহিনী লোকে ওঠে আরো রুষে,—
'কুল-পাংশুল' বলিয়া তাহারে দুষে!
যদিও উভয়ই বস্ত্র-হরণ বটে,
দুঃশাসনের নিন্দাই তবু রটে!

'ফাঁসি কাঠ' শুনিতে মন্দ অতি
নাহিকো কাহারো শ্রদ্ধা তাহার প্রতি!
নরঘাতকের সাজার যন্ত্র সে ত',
তাই তারে স্মরি শঙ্কা লোকের এত!
মানবের লাগি' প্রভু যীশু ভগবান্
সেই ফাঁসি-কাঠে দিলেন তাঁহার প্রাণ!
নিজের রুধিরে খৃষ্ট নিষ্কলুষ
হীন ফাঁসি-কাঠে করিয়া দিলেন ক্রুশ!
খৃষ্ট ভক্ত কাঁদে ক্রুশ নিয়ে বুকে;
'দাই হলি ক্রুশ'—বলিতে ভাসে যে সুখে!

অসুন্দরের হাতে যদি পড়ে শ্লীল
তখনি সে হায় হ'য়ে ওঠে অশ্লীল!
সুন্দর সে-ও কুৎসিত হয়ে ওঠে;
পদ্মেরও বুকে পঙ্ক-গন্ধ ছোটে!
সুন্দর যদি শ্লীল তারও করে হানি—
গৌরব তার কমে না একটুখানি।
স্পর্শে তাহার কালো রূপও হয় আলো;
তাই তার হাতে অশ্লীলতাও ভালো।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

ডাক্তার কালিদাস সরকার এ-পি-ডি

(গল্প)

তাহার নাম কালিদাস। তের বৎসর বয়সে তাহার পঠদ্দশায়, তস্য পিতা শ্যামাদাস তাহার পাঠের প্রতি ঘোর অমনোযোগ এবং সর্ব্ববিধ অপকর্ম্মের প্রতি তীব্র মনোযোগ দেখিয়া—যখন এক দিন তাহাকে একটু গুরু-রকম তিরস্কারের সঙ্গে একটু লঘু-রকম প্রহারের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিল, তখন সেই আপ্যায়নের ফলে মাতৃহীন কালিদাস দুঃখে এবং অভিমানে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী মাখনপুর গ্রামে আসিয়া মাতুল পঞ্চানন ঘোষের পোষ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর আঠারো বৎসর অতীত হইয়াছে। এই আঠারো বৎসরে জগতে অনেক কিছু ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। পৃথিবী ও চন্দ্রের ব্যবধান সাতাশ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছে; 'নব-জোভালাস্কী'র পরাধীন জাতিরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; সমগ্র অক্টারগনি প্রদেশ প্রবল ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; ভূমধ্যসাগরে 'গ্রেটো হারলিয়নস্' নামক নূতন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ১৩ বৎসর বয়স্ক কালিদাস ৩১ বৎসরের হইয়াছে এবং তাহার পিতা শ্যামাদাস চিরকালের জন্য শ্যামা মায়ের চরণাশ্রয় এবং মাতল পঞ্চানন পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে। আরও একটা বড় রকমের ব্যাপার ঘটিয়াছে। আঠারো বৎসর পূর্ব্বে, তাহার বাপের বাড়ীর গ্রামে ত বটেই, তাহার মামার বাড়ীর গ্রামের সকলেও তাহাকে 'কেলে' বলিয়া ডাকিত; কিন্তু এক্ষণে মামার সংসারে সে 'কালিদাস', গ্রামের সকলের কাছে—'কালী ডাক্তার', আর বালক এবং যুবক-মহলে—'এ, পি, ডি'।

প্রথম যখন কালিদাস মাতুলালয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার মামী এক দিন অনুচ্চ কণ্ঠে মামাকে বলিয়াছিল—"বলি হ্যাঁগা, নিজের রুগী পথ্য পায় না, এর ওপর ভাগনে এসে জুটলো: তোমার বুঝি পয়সা-কড়ি কিছু বেশী জমেচে।" সে সময় কালিদাস উঠানের পেয়ারা গাছের উপর ছিল; কথাটা তাহার কর্ণগোচর হয়। যে পেয়ারাটা খাইবার জন্য সে হাতে করিয়াছিল, তাহা খিড়কীর পাঁচীলের ওধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ডালের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিবার পর নিঃশব্দে গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং এক-পা এক-পা করিয়া ও-পাড়ার বেণী ডাক্তারের ডাক্তারখানায় চলিয়া গেল।

বেণী ডাক্তার তাহাকে খুব ভালবাসিত; বলিত—"ছেলেবেলায় আমি ঠিক তোরই মত দুষ্টু ছিলুম।" সে দিন কালিদাসের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া বেণী ডাক্তার কহিল—"কি হয়েচে রে কালী?" কালিদাস মামীর কথাগুলি বলিলে বেণী ডাক্তার কহিল—"কালী, তুই কিছু ভাবিসনি; তুই আমার এখানে এসে থাক্; খাবি-দাবি, আর আমার ডাক্তারখানায় কাজকর্ম্ম করবি।"

কালী জিজ্ঞাসা করিল—"কি কাজকর্ম্ম করবো?"

বেণী ডাক্তার কহিল—"আমার ডাক্তারখানা-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি; আলমারী, টেবিল সব ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার রাখবি।"

"তাই থাকবো। তবে রাতে মামার ওখানে গিয়েই শোব।"

"বেশ, তাই হবে।"

"আচ্ছা, একটু করে আমাকে ডাক্তারী শেখাতে পারবে?"

"এত কম বয়সে ডাক্তারীর কি বুঝবি? তবে চালাক-চতুর আছিস বটে। তা থাক্ আমার কাছে; শিখবি এখন।"

সুতরাং দু'-এক দিনের মধ্যেই কালিদাস বেণী ডাক্তারের ডাক্তারখানার কাজে লাগিয়া গেল। বছর আষ্টেক পরে, এক কলেরা রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া বেণী ডাক্তার নিজেই ঐ রোগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। তখন কালিদাসকে পনরায় মামার সংসারে আসিয়া সর্ব্বক্ষণের জন্য আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু এবার সে 'কেলো' বা 'কালী' হইয়া রহিল না; হইল কালিদাস ডাক্তার। বেণী ডাক্তারের কাছে আট বৎসর থাকার ফলে, তাহারই পরিত্যক্ত একটা সাবেক কালের কাঠের তৈরী এক-নলা 'ষ্টেথেসকোপ' ও ঔষধ মাড়িবার একখানা ভাঙ্গা 'পোর্সিলেন'য়ের প্লেট, একখানা বাঁট-ভাঙ্গা 'স্প্যাচুলা' প্রভৃতি যোগাড় করিয়া মামার চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে কালিদাস তাহার ডাক্তারখানা সাজাইয়া ফেলিল। কোথা হইতে একখানা পুরানো বাংলা মেটিরিয়া-মেডিকা ও আরও দুই-একখানা বই যোগাড় করিয়া লইতেও তাহার ত্রুটি হয় নাই।

তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসর কাল অপ্রতিহত গতিতে কালিদাস তাহার ডাক্তারী চালাইয়া আসিতেছে।

মাখনপুর গ্রামখানাকে ঘিরিয়া চতুর্দ্দিকে যে সাঁওতাল, দুলে, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি প্রভৃতির বাস, প্রধানতঃ তাহাদেরই মধ্যে কালিদাসের চিকিৎসা চলে। গয়লাপাড়া, কারিকরপাড়াতেও কিছু কিছু কাজ হয়। দু' আনা, দশ পয়সা, চার আনা তাহার এক শিশি ওষুধের দাম। ডাক্তারের ফী, যে যাহা দেয়, কালিদাসের তাহাই প্রাপ্য। কেহ চার আনা, কেহ ছয় আনা, কেহ বা আট আনা দেয়; আবার কেহ বা কিছুই দিতে পারে না। কালিদাস তাহার মক্কেলদের উদ্দেশে বলে—"এত কোরে যে বিদ্যে শিখলুম, তোরা তার মর্য্যাদাটা রাখিস।"

কালিদাসের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে যে মরিবার সে ত মরেই, যে না মরিবার সে-ও সকাল-সকাল ভব-পারাবারের পাড়ি জমাইয়া ফেলে। তবু মাখনপুরের সব লোক তাহাকে কালী ডাক্তার বলিয়াই ডাকে। ছেলে-ছোকরার দল তাহাকে আরও বেশী মর্য্যাদা দেয়। তাহারা বলে—"কালিদাস যেমন-তেমন ডাক্তার নয়—"আকাশ-পাতাল ডাক্তার" এবং ইহা হইতেই বালক এবং যুবক-মহলে কালিদাস 'এ, পি, ডি' বলিয়া সম্বর্দ্ধিত।

যে-কোন দিন সকালে পঞ্চু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া কালিদাসের ডাক্তারী দেখিলেই বেশ সহজেই বুঝা যায়, কালিদাস সত্যই আকাশ-পাতাল ডাক্তারই বটে।

"'অ বীরু, দেখি হাতটা একটু বাড়াও। ইস্!—'পাল্‌স্' যে একেবারে ভাইনাম্ গ্যালিশিয়া!—দেখি, বুকটা একবার দেখি।" কালিদাস তাহার সেই একনলা কাঠের ষ্টেথেস্কোপ্ বীরুর বুকে, পাঁজরে, পিঠে বসাইল; মাথার উপরেও একবার বসাইতে ছাড়িল না। তার পর জিভ দেখিল, চোখের কোল টানিয়া দেখিল। তার পর কহিল—"শোন্ বীরু, রোগটি একেবারে পাকা-পাকি জোরে ধরেচে।

পাকা-পাকি গোছের ওষধ না হোলে এ-রোগকে কাবু করা কঠিন। একটি মাস ওষুধ খেতে হবে, এই বোলে দিলুম।"

ছ' দাগ ঔষধ লইয়া বীরু কহিল—"কি দাম দিতে হবে, বলো।"

কানাই বাগ্‌দীর ছোট ছেলের পেট টিপিতে টিপিতে কালিদাস কহিল—"ও ওষুধের দাম হয় অনেক, তুই আর কি দিবি, গণ্ডা-আষ্টেক পয়সাই দে।"

চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বীরু কহিল—"আ—আ—ট্ আনা।"

"আট আনা ওর একটি দাগের দাম রে: তা, যা দিতে পারিস্, দে। ওরে বাপু, ওষুধের দাম ঠিকমত না দিলে কি আর রোগ সারে! তোদের ওষুধ দিয়ে আমার লাভ হয় কাঁচকলা! তবে বিদ্যেটা ভাল কোরে শিখেচি তাই............ও কানাইচন্দর, ছেলেটিকে যে মেরে ফেলে তবে এনেছিস বাবা! পেটে যে দেখচি, দিব্বি কাঁসর-ঘণ্টা গজিয়েচে।"

"জরটা যখন আসে ডাক্তারবাবু, তখন ওই কচি ছেলে একেবারে..."

"সব তাড়াবো এখন! কালী ডাক্তারের হাতে যখন পড়েচে, তখন জর-মশাইকে......তা পয়সা-কড়ি কি এনেছিস, দেখি।"

কানাই কোঁচার খুঁট হইতে একটা দুয়ানী বাহির করিয়া কালিদাসের হাতে দিতে গেলে, কালিদাস কহিল—"৴ আনা! তোদের নিয়ে আমি কি করি বল্ দেখি! রুগী দেখার ফী-ই যে দু'টো টাকা!—না, দু' আনাতে ওষুদ দিতে আমি পাবি না।"

কানাই নিরুপায় হইয়া কোঁচার খুঁট হইতে আর একটি দু'আনি বাহির করিয়া, চার আনা কালিদাসের হাতে দিল।

ঔষধ তৈয়ার করিতে করিতে কালিদাস বলিয়া যাইতে লাগিল—"পয়সা রোজগারের জন্যে তোদের ত চিকিৎসা করি না। এত কোরে বিদ্যেটা শিখেছি, তাই............আমার ওষুধের লাল-নীল-সবুজ রং দেখলেই রোগ বারো আনা কাবু হোয়ে পড়েন!... নিতাই, এই ছ' দাগ থাকলো। দু' দিনের। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে। ওষুধের রংটা একবার দেখছিস্ ত? যেন রক্তজবা! যা; —পরশু আবার শিশি নিয়ে আসবি। হ্যাঁ রে, হাঁসে ডিম্-টিম্ দিচ্চে না?...কি রে, ছিমন্ত, তোর বউ কেমন আছে? ও্ধ খাইয়েছিলি?"

"খাইয়েছিলুম, ডাক্তারবাবু; কিন্তু রোগ যে দিন দিন বেড়েই চলেচে। হিক্কা ছিল না, কাল থেকে আবার হিক্কাটা......

"আচ্ছা, বোস্ খানিক; ভাল কোরে বই 'কনসাট' করতে হবে।

"তোর কি খবর রে পেঁচো?"

"আজ্ঞে, কাল রাত্তির বেলাতেই সব শেষ হোয়ে গেল।"

বিরস-গম্ভীর বদনে কালিদাস কহিল—"রোগটা হোয়েছিল কঠিন। ধন্বন্তরি এলেও ও-রোগে কাউকে বাঁচাতে পারে না। মরে যে যাবে তা আমি জানতুম। তোরা ভয় পাবি বোলে আর বলিনি। 'ব্রেণ'-য়ের ব্রঙ্কাইটিস্। ও রোগে কেউ বাঁচে না।"

যাহা হউক, এইরূপ ব্রেণের ব্রঙ্কাইটিস্, চোখের লামবেগো, কাণের প্যালপিটেসান্ প্রভৃতির চিকিৎসা করিলেও এ, পি, ডি,—অর্থাৎ আকাশ-পাতাল ডাক্তার উপায় করে মন্দ নয়। মাস গেলে ৩০।৩৫ টাকা ত হয়ই; কোন কোন মাসে ৪০।৫০ টাকাও হয়। ইহা হইতে মামীর হাতে প্রতি মাসে তাহাকে খাই-খরচ ইত্যাদি বাবদ ২০টি করিয়া টাকা দিতে হয়। বাকী টাকায় তাহার কাপড়-চোপড়, হেন-তেন, এ-ও-তা—ইত্যাদির খরচ চলে এবং কিছু জমে।

কিন্তু সহসা একটা অঘটন ঘটিল। কালিদাসের দশ বৎসরের প্র্যাকটিশের প্রবল ধারা যেন কোন্ নৈসর্গিক কারণে একেবারে শুকাইয়া গেল। কি এক গুরুতর কারণে মাতুলানী এবং মামাতো ভাইরা তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং তিন দিন সময় দিয়া তাহাকে, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। ঠিক এই একই সময়ে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ভবানী ভট্‌চায্যি গাঁয়ের এক জন মাতব্বর বাসিন্দা। তাঁহার মেজ ছেলেটি মাঝে মাঝে কালিদাসের ডাক্তারখানায় আসিয়া গল্প-সল্প করিত। সে সে-দিন কহিল যে, রাত্রে তাহার ঘুম হয় না। কালিদাস তাহাকে কহিল—"আমি ওষুধ দেব এখন, শোবার আগে খেয়ে শুয়ো! ঘুম ত ছেলে মানুষ, ঘুমের বাবা হবে। কালিদাস ডাক্তারকে তোমরা পেয়েও চিনলে না তো!"—এই বলিয়া কি একটা ঔষধের পুরিয়া তাহাকে দিল। ভট্‌চায্যির মেজ ছেলের সেই ঔষধ সেবনের ফলে সত্য-সত্যই 'ঘুমের বাবা—' হইয়া গেল; অর্থাৎ এমন ঘুম হইল যে, সে-ঘুম আর ইহলোকে ভাঙ্গিল না। ভবানী ভটচায্যি কালিদাসের নামে "কেস্" আনিবার যোগাড় করিতে লাগিল। বাড়ীতে ও বাহিরে যখন এই রকম বিপদ একজোটে ঘনাইয়া আসিল, —অর্থাৎ আকাশ ও পাতাল যখন একই সময়ে তাহার মাথার দিক ও পায়ের দিক হইতে তাহাকে চাপিয়া মারিতে উদ্যত, তখন 'আকাশ-পাতাল' ডাক্তার কালিদাস এক দিন গভীর নিশীথে, তাহার দশ বৎসরের ডাক্তারখানা, ডাক্তারী, কুইনাইন, টিঞ্চার আইডিন, সোডি বাইকার্ব্ব, ডিজিটেলিস্, ষ্টেথেস্কোপ, স্প্যাচুলা, মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া চুপিচুপি মাতুলালয় হইতে অদৃশ্য হইল।

ইচ্ছামতীর তীরে হাসনাবাদ হইতে যে পাকা রাস্তাটি বসিরহাট হইয়া বরাবর কলিকাতা-অভিমুখে আসিয়াছে, তাহারই ধারে দেগঙ্গা গ্রামের বাহিরে, প্রকাণ্ড এক আম্রবৃক্ষের তলায় এক দিন অপরাহ্নে দুই জন পথিক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। এক জন কালিদাস, অপর জন—দেগঙ্গার এক কৃষক—হলধর পাড়ুই।

কালিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া হলধর কহিল—"তা তুমি যাও। সামনের ওই পথ ধরে বরাবর পোয়াটাক পথ গেলেই বাবুদের বাড়ী পাবা। পেল্লায় বাড়ী। বাবুরা লোকও খুব ভাল।"

"হ্যাঁ ভাই, বাবুদের মেজাজ কি রকম? খুব কড়া গোচের নয় ত?"

"বাবুরা এখানে দু' ঘর, বড় আর মেজ। ছোট এখানে থাকেন না। তুমি মেজ বাবুর কাছে যাও; সদাশিব লোক। যেমন দয়া, তেমনি দানধর্ম্ম। দেশের ত রাজাই উনি। আর যেমন-তেমন রাজা ন'ন; উনি আমাদের রাম-রাজা।"

হলধর হাটে যাইবে; চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসও উঠিয়া সামনের পথ ধরিয়া বাবুদের বাটীর উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

হেমন্তের নিস্তেজ সূর্য্য পশ্চিমে চলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। তাহারই ম্লান করস্পর্শে অদূরের আমন ধানের শীষগুলি স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। দূরের কোন কানন-বৃক্ষ হইতে একটা পাপিয়া 'চোখ গেল' বলিয়া তাহার ব্যথা এ বছরের মত শেষ বার বোধ হয় সকলকে জানাইতেছিল। অপ্রশস্ত পল্লীপথের পার্শ্বে একটা ঝাউ গাছের উপর দুইটা কাক সারা দিনের অভিযানান্তে ক্লান্ত হইয়া

নীরবে বসিয়াছিল। সেই ঝাউ গাছের তলা দিয়া খানিকটা পথ আসিতেই কালিদাস সম্মুখে রাজপ্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা দেখিতে পাইল। একখানি গো-যান যাইতেছিল। তাহার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ ভাই মিয়া সাহেব, এইটাই কি মল্লিকবাবুদের বাড়ী?" সে গরুর ল্যাজে একটা মোচড় দিয়া কহিল—"দেখতে পাচচ না, ফটকের ভেতর চেয়ারে বোসে মেজ বাবু ঐ গড়গড়া টানে?"

কালিদাস এক পা এক পা করিয়া প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল এবং মেজবাবুর সম্মুখে গিয়া জোড়-হাতে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া মেজবাবু কহিলেন—"কোথা থেকে আসচ?"

"অনেক দূর থেকে আসচি বাব। বাড়ী আমার বীরভুম জেলা—সদানন্দপুর।

"কি দরকার?"

"আমি বড় দুঃখী বাবা।" কালিদাসের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। "হাঁপের মত বুকের একটা অসুখে আজ দশ বছর ভুগচি। বড় যন্ত্রণা, বাবা। কত ওষুদ বিষদ খেয়েচি, কিছু হয়নি। তাই সকলের পরামর্শে বাবা তারকনাথের কাছে হত্যা দিতে গিয়েছিলুম ...সাত দিন......"

'ওষুধ কিছু পেয়েছ?"

"না বাবা। পাইনি, তবে পেয়েছিও বটে। সাত দিন 'হত্যা' দেবার পর বাবার 'আদেশ' হোল।" বাবার উদ্দেশ্যে কালিদাস জোড় হাতে মাথা স্পর্শ করিল। "এক জন স্ত্রীলোক ২৪ দিনের পর 'ওষুধ' পেলে। আর এক জন দেড় মাস পড়ে আছে, এখনো বাবার কৃপা হয়নি।"

"তোমার ওপর কি 'আদেশ' হোল?"—একমুখ সুগন্ধি ধোঁয় ছাড়িয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেজবাবু কালিদাসের দিকে চাহিলেন।

"আমার ওপর স্বপ্নে 'আদেশ' হোল—'যা, তুই ২৪ পরগণা জেলার দে-গঙ্গায় মেজবাবুর পাতের পেসাদ একুশ দিন খেগে যা, তোর রোগ সেরে যাবে। তাই বাবু, বড় আশা করে......"

"তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে, যুধিষ্ঠির পাল।"

অতঃপর সরল এবং ধর্ম্মপ্রাণ মেজকর্ত্তার দয়ায় আপাততঃ একুশ দিনের জন্য কালিদাস তাঁহার আশ্রয় লাভ করিল।

মাখনপুর ত্যাগ করিবার পর কালিদাস বীরখালির হাটে এক হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লয়। সেখানে কয়েক দিন কাটাইবার পরই সঙ্গে সামান্য যাহা কিছু পুঁজি ছিল, তাহা চুরি হইয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া সাত-আট দিন নানারূপ কষ্টের মধ্য দিয়া তাহাকে পথে পথে ঘুরিতে হয়। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সে দে-গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছিল। এই কয় দিনের দারুণ কষ্টে ও পথশ্রমে তাহার চেহারা তারকেশ্বরের 'হত্যা'-ফেরতের মতই হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে মেজবাবুর কাছে একুশ দিনের আশ্রয় পাইয়া, একুশ দিন পরে সে কি করিবে, তাহা ভাবিবার সময় পাইয়া অনেকখানি স্বস্তি লাভ করিল।

কালিদাস খায় দায়, বেশ মজায় দিন কাটায়। 'পেসাদ' উপলক্ষে মেজবাবুর ভোজনকক্ষ হইতে নিত্য দুই বেলা তাহার যে ভোজ্য আসে, তাহা এই ৩১ বৎসরের মধ্যে কখনো তাহার উদরে যাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু একটি একটি করিয়া দিন গত হয় আর ২১ হইতে একটি একটি করিয়া সংখ্যা কমিতে থাকে।

'আর ১২ দিন'...'আর ৯ দিন'...'আর ৭'...'আর ৬'... কালিদাস দিন গুণিয়া যায়।

আগের দিন একটু বৃষ্টি হইয়া শীতটা সে দিন বেশ পড়িয়াছিল। মেজবাবু একখানা কম্বল দিয়াছিলেন; দ্বিপ্রহরের আহারের পর সেখানা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া কালিদাস মনে মনে হিসাব কষিতেছিল...আর ৪ দিন। বড় জোর তার ওপর দু'-এক দিন ফাউ। তার পর...

"হ্যাঁ বাবা;, বোসে আছ? একটা কথা বলবো বাবা?"

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

"তুমি বড় ভাল লোক; লোকের মুখের দিকে দেখলেই ভাল মন্দ বোঝা যায়। আমায় একখানা চিঠি লিখে দেবে বাবা? বাড়ীর কাউকে দিয়ে লেখাব না। একটু গোপন কথা।"

বাবুদের বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখেই বৃদ্ধার ক্ষুদ্র বাড়ী। মধ্যবিত্তের সংসার। বৃদ্ধার এক নাতু-জামাই কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে দুই শত টাকা কর্জস্বরূপ লইয়াছিল। জামাইটি কলিকাতায় থাকে। ও-পাড়ার নিমাই ধাড়া সম্প্রতি কলিকাতায় গিয়াছিল। তাহাকে দিয়া নাতজামাই দিদি-শাশুড়ীকে খবর দিয়াছে যে, টাকা দুই শত তাহার যোগাড় হইয়াছে; যদি বৃদ্ধার মত হয়, তাহা হইলে সে উহা মণিঅর্ডার করিয়া বৃদ্ধার নামে পাঠাইয়া দেয়।

হাতে একখানা পোষ্টকার্ড লইয়া বৃদ্ধা মেজের একধারে বসিল; বলিল—"দাও না বাবা দু'কলম একটু লিখে। ভাবলুম, তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে দি, নইলে হয় ত হুট্ কোরে টাকাগুলো কবে ডাকে পাঠিয়ে দেবে। দিলে কি ঐ ভূতের দলের হাত থেকে সে টাকা আমি বাক্সয় তুলতে পারবো। অলপ্পেয়েরা সব তা হোলে গ্রাস কোরে ফেলবে। কি বলবো বাবা, একটু আমচুর আর কাসুন্দী হাঁড়ির ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলুম, তা পর্য্যন্ত কোন্ ফাঁকে বার কোরে নিয়ে গিলেচে।"

ঘরেই দোয়াত-কলম ছিল। কালিদাস বলিল—"বলুন মা, ক লিখবো।"

বৃদ্ধা বলিল—"লিখে দাও বাবা, টাকা তুমি এখন পাঠিও না। পোষ মাসে আমি কালীঘাটে 'পোষ-কালী' দেখতে যাব, সেই সময় আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবো। আর দুর্গার বিয়ের কোন ঠিক হোল কি না। আর সরোজিনীর অম্বলের অসুখটা কেমন আছে; 'বাণেশ্বরের' মাদুলী—তাকে পরানো হোয়েচে কি?"

কালিদাস লিখিতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল—"আর লিখে দাও বাবা, নেড়ু হাঁটিতে পারে কি না; ...হ্যাঁ, ভাল কথা, লিখে দাও যে—...তুমি নিমাইকে দিয়ে যে 'নামাবলী' পাঠিয়েছ, তা আমি পেয়েছি।——আর সবাইকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে।...আর কি। আর আমরা সবাই হেথা ভাল আছি।"

পত্রলেখা শেষ করিয়া কালিদাস তাহা বৃদ্ধাকে পড়িয়া শুনাইল। বৃদ্ধা কহিল—"ঠিক হোয়েচে বাবা। তুমি ভারি ভাল ছেলে। এমন না হোলে আর এমন হয়। তা দাও বাবা, বাক্সে ফেলে দিয়ে যাই।"

কালিদাস একটু হাসিয়া কহিল—"ঠিকানা লিখতে হবে যে; তা না হোলে চিঠি যাবে কেন। কি ঠিকানায় চিঠি যাবে বলুন।"

"ঠিকানা···তোমার গিয়ে···কোলকাতায় আমার নাত-জামাইয়ের কাছে যাবে। রাসবিহারী—পাবে।"

"আপনার নাত-জামাইয়ের পুরো নাম কি, তাই বলুন।"

"ঐ রাসবিহারীই তার পুরো নাম বাবা; তবে ডাক নাম তার ভান।"

"রাসবিহারী কি? তাঁর পদবী কি?"

"ওরা হোল গাঙ্গুলী। কালীঘাটে থাকে। ৪৬ নং বাড়ী।"

"কোন্ রাস্তায় থাকে? রাস্তাটার নাম কি?"

"ঐ ৪৬ নং বাড়ী আর কালীঘাট—এই দিলেই চিঠি যাবে। আমার নাত-জমাইকে ওখানকার সকলেই চেনে। আফিসের সাহেব-সুবো সবাই রাসবিহারীকে বড ভালবাসে। ওর······"

"শুনুন, রাস্তার নাম দিতে হবে। তা না হোলে শুধু কালীঘাট লিখলে যাবে না।"

"তবে দাঁড়াও বাবা, আমি ঠিকানার কাগজখানা নিয়ে আসি।" বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেল ও মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া এক টুকরা ভাঁজ-করা কাগজ কালিদাসের হাতে দিল। কালিদাস দেখিল, রাসবিহারী গাঙ্গুলী; ৪৬ নং কেওড়াতলা রোড; কালীঘাট।

যথাযথ ঠিকানা লিখিয়া দিয়া কালিদাস পোষ্টকার্ডখানা বৃদ্ধার হাতে দিল। বৃদ্ধা কালিদাসের সুখ ও আয়ুর সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চিঠি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাবুদের ফটকের গায়েই চিঠি ফেলিবার একটা বাক্স টাঙ্গানো ছিল। কালিদাসের ঘর হইতে উহা দেখা যায়। কালিদাস দেখিল, বৃদ্ধা চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

কালীঘাট—৪৬ নং কেওড়াতলা রোডস্থ বাটীর বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া দুইটি যুবকের কথোপকথন হইতেছিল।

কালিদাস কহিল—"রাত প্রায় ন'টা হোল, আমি উঠি তা হোলে।"

রাসবিহারী কহিল—"না না, উঠবেন কি। একটু চা খেয়ে যেতে হবে। দুর্গ্গা, শীগ্‌গীর নিয়ে এস।——তা হোলে—'নামাবলী'খানা পছন্দ হয়েচে, ভালো। শীতকাল বোলে একটু মোটা কাপড়েরই কিনেচি।"

"হ্যাঁ;—তাই তিনি বললেন। আর জানতে চেয়েচেন যে বাণেশ্বর—না কিসের মাদুলী ধারণ করানো হোয়েচে কি না।"

এক কাপ চা এবং চারিটি সন্দেশের ছোট একখানি রেকাবী কালিদাসের সামনে রাখিয়া দুর্গা জল আনিতে গেল।

রাসবিহারী কহিল—"ওঃ! বাণেশ্বরের মাদুলী, হ্যাঁ, বলবেন যে—মাদুলী ধারণ হোয়েচে।——নিন্ একটু মিষ্টিমুখ করুন, সত্য বাবু।"

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা কালিদাসকে মিষ্টিমুখ করিয়া চায়ের বাটিটা খালি করিতে হইল।

"প্রণাম। এবার আলাপ হ'ল, আবার যখন কোনকাতায় আসবো, এ-দিকে এলে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। প্রণাম।"

গোড়ায় এবং শেষে দুই দফা বিদায়ী-প্রণাম জানাইয়া কালিদাস ওরফে সত্য বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল এবং দ্রুতপদে ট্রাম-লাইনের দিকে অগ্রসর হইল।

উপরোক্ত ব্যাপারের একটু ব্যাখ্যা বা টীকার পয়োজন। কালিদাস বৃদ্ধার পত্রে আর সমস্ত কথা ঠিকই লিখিয়াছিল, কেবল টাকার কথাটা বৃদ্ধা যাহা বলিয়াছিল, সেইরূপ তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিল বটে, কিন্তু 'সুবোধ বালক'য়ের মত তাহাই লিখে নাই। তৎপরিবর্ত্তে সে লিখিয়াছিল যে, টাকাটা মণিঅর্ডার-যোগে যেন পাঠানো না হয়, তাহাতে অনর্থক দই টাকা আড়াই টাকা ফী যাইবে এবং টাকা আসিলেই তাহার ভতপ্রেত শ্যালকের দল সবটক্ গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এখান থেকে ২১ দিনের মধ্যে ও-পাড়ার সত্যচরণ কলিকাতায় যাইবে, তাহার হাতে যেন টাকাটা দেওয়া হয়, তাহা হইলেই নিরাপদে টাকাটা ···ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং এই-ইত্যাদি'র জেরস্বরূপ টাকাটা নিরাপদেই সত্যচরণ—ওরফে যুধিষ্ঠির—ওরফে কালিদাসের পকেট-জাত হইল।

ট্রাম হইতে কালিদাস শ্যামবাজারে যেখানটায় নামিল, সেখানে ফুট্‌পাতের উপর একখানি দোকানের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল—'যুধিষ্ঠির পুরকাইত ও সত্যচরণ সিম্‌লাই···সুলভে উৎকৃষ্ট পোষাক বিক্রেতা'। কালিদাসের দৃষ্টি সাইনবোর্ডখানার উপর পড়িতেই, তাহার মুখ হইতে অস্ফুট গানের সুরে বাহির হইল—"বাঃ রে!··· 'যুধিষ্ঠির' আর 'সত্যচরণ'! যে নাম লইয়া আজি তরিল এই অভাজন।" কালিদাস দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। মনে মনে স্থির করিল, এই দুশো টাকা থেকে অন্ততঃ গোটা-পাঁচেক টাকা এঁদের পুজো না দিলে অকৃতজ্ঞতা হ'বে। এঁদের নাম নিয়েই ২১ দিন প্রসাদলাভ আর তার সঙ্গে দু'টি শ' মুদ্রা দক্ষিণা লাভ।

দোকানদারদের মধ্যে এক জন কহিল—"কি চাই আপনার?"

কালিদাস এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া দেখিল, দাম-লেখা টিকিট-আঁটা যে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ এই 'সুলভে উৎকৃষ্ট পোষাক-বিক্রেতা'র দোকানে ইতস্ততঃ টাঙ্গানো রহিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, এখানে পনর টাকা মূল্যের জিনিস কিনিলেই পাঁচ টাকা ইঁহাদের পূজা দেওয়া হয়। সুতরাং দোকানদারের প্রশ্নে কালিদাস কহিল—"পনেরো টাকা দামের জিনিষ আমায় দিন।"

দোকানদার একটু বিস্মিত হইয়া কালিদাসের মুখের দিকে চাহিলে কালিদাস কহিল—"এক বস্ত্র এক জামা; সুতরাং ধুতি জোড়া দুই, জামা গোটা চার, গেঞ্জী···আর আর······

"ভালো সিল্কের ব্লাউজ আছে দেবো?"

"এখন নয়; আশীর্ব্বাদ করুন, শীগগীরই যেন নিতে পারি।"

দোকানদার মনে করিল, লোকটির বোধ হয় কিছু মাথা খারাপ, যাহা হউক, ধুতি, জামা, গেঞ্জি, রুমাল, মোজা ইত্যাদিতে ১৪৷/০ হইল; পুরা ১৫ টাকা হইল না। কালিদাস এক জোড়া গামছা লইয়া ১৪৷/০কে ১৫ টাকা করিয়া, দুইখানা দশটাকার নোট দোকানীর হাতে দিল। দোকানী তাহাকে পাঁচটা টাকা ও ক্যাশ-মেমো দিতে গেলে কালিদাস টাকা পাঁচটা হাতে লইয়া কহিল—"পুজো দিলুম, তার ক্যাশ-মেমো নিয়ে কি করব! বরঞ্চ একটু পেসাদ দিন। পেসাদ আর আপনারা কি দেবেন, একটা সিগারেট-টিগারেট যা হয় দিন।"

সমাদরের সহিত দোকানদার কালিদাসকে সিগারেট আনাইয়া দিল। কালিদাসও তাহা ধরাইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

দোকানদার এখন মনে ভাবিয়া লইল, লোকটার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ।

কালিদাস একটু-পথ অগ্রসর হইয়া বাঁদিকের একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটা অতি পুরাতন, ভগ্ন, তৃতীয় শ্রেণীর বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া; একটি চতুর্থ শ্রেণীর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া ডাকিল—"হরিপদ।"

কালিদাস আর হরিপদ বহু দিনের পরিচিত। মাখনপুরে হরিপদর শ্বশুরবাড়ী। হরিপদ 'মেস্'-য়ে থাকিয়া কোন্ আফিসে চাক্‌রী করে। কালিদাস এইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া হরিপদর সাহায্যে কালিদাস দুই-চারি জায়গায় কাজের চেষ্টা করিল। এক জায়গায় একটু আশাও পাইল। কিন্তু হঠাৎ এই সময়টায় কলিকাতায় একটা ওলট-পালটের প্রবল ঢেউ উঠিল। জাপানের বোমার ভয়ে কলিকাতাবাসী নিরীহ বাঙালীরা সহসা অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই মহানগরীর অবস্থা সেই রূপকথার রাক্ষসী-খাওয়া রাজ্যের মত হইল। হাতীশাল আছে, হাতী নাই; ঘোড়াশাল আছে, ঘোড়া নাই; পথ আছে, পথিক নাই; হাট আছে, বাজার আছে, ক্রেতা-বিক্রেতা নাই; ইন্দ্রপুরীতুল্য কলিকাতা-নগরী হঠাৎ যেন 'হার্টফেল' হইয়া বিগতপ্রাণ হইল। এ সময়ে নূতন নূতন বহু চাকরীর সৃষ্টি হইল। এবং ইচ্ছা করিলেই কালিদাস স্বল্পায়াসে যে-কোন একটি কাজে বহাল হইতে পারিত। কিন্তু হঠাৎ তাহার মতি অন্য দিকে গেল। বড় রাস্তার উপর সামান্য ভাড়ায় সে একখানা বড় ঘর পাইল। সেখানে সে সম্পূর্ণ নূতন এবং সময়োপযোগী একটি জিনিষের আফিস খুলিল। জিনিষটার নাম—'বোমা-বিকর্ষণী' বা বোমার যম' অর্থাৎ যাহার ছাদে টীনের কৌটার ন্যায় চারি দিকে আঁটা এই যন্ত্রটি স্থাপিত থাকিবে, তাহার বাড়ীতে বোমা পড়িবার ভয় থাকিবে না। মূল্য ৩৸৴০ আনা মাত্র।

প্রায় শ'খানেক টাকা ব্যয় করিয়া হ্যাণ্ডবিল এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দ্বারা কালিদাস 'বোমা-বিকর্ষণী'র অদ্ভুত ক্ষমতার কথা প্রচার করিল। ক্রেতাগণকে বুঝাইবার জন্য সে হ্যাণ্ডবিলে ছাপাইল:—

যোগবল। যোগবল!! যোগবল!!!

চমকিত হইবেন না।

অবিশ্বাস করিবেন না।

চুম্বক লৌহকে 'আকর্ষণ' করে; ইহা বিস্ময়ের হইলেও যেমন সত্য, আমার এই যন্ত্র বোমাকে 'বিকর্ষণী' করিবে ইহাও তদ্রূপ সত্য। সামান্য ৩৸৴০ আনা ব্যয় করিয়া দেখুন, আতঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন। ইহাকে বিজ্ঞান মনে করেন—করুন। দৈব মনে করেন—করুন। অলৌকিক যোগ-বল মনে করেন—করুন। কিন্তু ইহার শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না। আপনার ছাদে এই যন্ত্র স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। স্থাপনে কোন হাঙ্গামা নাই; শুধু লক্ষ্য রাখিবেন, ইহার নিকট শৃগাল না আসে। তাহা হইলে ইহার শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।'

...ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'বোমা-বিকর্ষণী' আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসকে সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া গেরুয়া পরিধান করিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ গুণ আছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর নাই। যে গুণ থাকায়, অন্যান্য প্রদেশবাসীরা রিক্ত হাতে ধূলি-পথে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দ্বারা পূর্ণহাতে স্বর্ণপথে আপন দেশে ফিরিয়া যায়; যে-গুণের অধিকারী হইয়া অধিকাংশ বাঙ্গালী ভগবৎ-কৃপা লাভের বাসনায়, সাক্ষাৎ ভগবানের শরণ না লইয়া পেশাদার দালালদের কাছে ছুটাছুটি করে; যে মহৎ গুণের তাড়নায় জটা, ভস্ম ও গেরুয়া দর্শনমাত্রই নির্বিচারে তাহাদের চিত্ত এবং বিত্ত সেইখানে লুটাইয়া দেয়; যে গুণে গৃহে অন্নবস্ত্রের ঘোরতর অভাব সত্ত্বেও, অনাহারে তাহাদের যৎসামান্য পুঁজি ভাঙ্গাইয়া অনাবশ্যক বিজাতীয় বিলাসকে বরণ করিয়া লয়—দেশের এবং দশের সেই মহৎ গুণেই কালিদাসের রক্তবস্ত্র-পরিহিত চেহারা এবং তাহার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার যোগবলে আবিষ্কৃত "বোমা-বিকর্ষণী" হু-হু করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। মাস-তিনেকের মধ্যে খরচ-খরচা বাদে তাহার হাতে প্রায় হাজার তিনেক টাকা জমিয়া গেল। তাহার কালো বরণ গৌর না হইলেও, উদরে ভুঁড়ির আবির্ভাব ঘটিল এবং 'যুধিষ্ঠির পুরকাইত ও সত্যচরণ সিম্‌লাই'য়ের দোকান হইতে ব্লাউস কিনিবার মত অনুকূল বায়ুও যেন তাহাকে ঘিরিয়া বহিতে লাগিল, এ-হেন সময়ে-------

এক দিন মধ্যরাত্রে এক বিকট হট্টগোল ও হৈচৈ শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার ঘরের বাহিরে বহুকণ্ঠে ভীষণ কোলাহল উঠিল—'বোমা! বোমা!' সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দরজায় প্রবল ধাক্কা—'বোমা! বোমা! সব গেল! সব গেল!' চকিতে কালিদাস লাফাইয়া উঠিল এবং আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিতেই আট দশ জন লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল এবং সকলে যেন আতঙ্কিত হইয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্ষের নিমেষে এ কাণ্ড ঘটিয়া গেল এবং চক্ষের নিমেষে কালিদাস উঠিয়া দেখিল যে-------------বলিতে সত্যই প্রাণে বাজে, বড় কষ্ট হয়; কিন্তু যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন না বলিলেও নয়--------চক্ষের নিমেষে কালিদাস উঠিয়া দেখিল যে, তাহার নূতন-কেনা শাল, আলোয়ান, গরম কোট ইত্যাদির সঙ্গে দুইটি বড় বড় স্যুট-কেস—যাহার একটির মধ্যে তাহার সম্প্রতি-উপার্জিত তিন হাজার টাকার নোট ছিল—তাহা উধাও হইয়া গিয়াছে! যে মাথার গুণে সে দে-গঙ্গায় মেজবাবুর আশ্রয়ে ২১ দিন রাজভোগ 'পেসাদ' পাইয়াছিল; যে মাথার গুণে সে সরল-প্রকৃতি বৃদ্ধার বহু কষ্টে সঞ্চিত দুই শত টাকা পকেটজাত করিয়াছিল; যে উর্বর মাথা হইতে ঠিক সময়োপযোগী 'বোমা-বিকর্ষণী' আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই মাথায় হাত দিয়া কালিদাস মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

* * * *

পাণ্ডবরা দ্বাদশ বৎসর পরে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছিল চৌদ্দ বৎসর পরে। কালিদাস

পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল আঠারো বৎসর পরে। পিত্রালয়ের 'আলয়' ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ও-পাড়ার নন্দীরা থাকিবার জন্য তাহাকে বাহিরের দিকের একখানা ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেইখানেই কালিদাস থাকে এবং নিজের হাতে দুটি পাক করিয়া খায়।

আঠারো বৎসর পরে গ্রামে আসিয়া কালিদাস দেখিল, গ্রামের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রামের মধ্যে রথ-তলায় আগে সোম-শুক্রবারে যে হাট বসিত, তাহা উঠিয়া গিয়া সেখানে প্রত্যহ এখন ছোট-খাট একটা বাজার বসিতেছে। সারখেলদের বড় দোকান উঠিয়া গিয়াছে; তার জায়গায় পঞ্চাননতলায় রক্ষিতদের তিনখানা দোকান পুরাদমে চলিতেছে। বাবুরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছিলেন; সম্প্রতি বোমার ভয়ে তাঁহারা আবার আসিয়াছেন। তাঁহাদের 'পারিজাত কানন'য়ের সিংহওয়ালা প্রকাণ্ড ফটক ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে।- ভিতরকার মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তিগুলি কতক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কতক তাঁহারা কলিকাতার বাটীতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। নাপিত-বৌ বিধবা হইয়াছে। ভতো কুমোরের বাবা ও খুড়া দু'জনেই গত হইয়াছে। মালীদের সাতকড়ির বিয়ে হইয়া দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে হইয়াছে। ও-পাড়ার রাঙ্গা পিসি মারা গিয়াছে। মোট কথা, এই আঠারো বৎসরের মধ্যে গ্রামের অনেক কিছু গিয়াছে এবং অনেক কিছু নূতন হইয়াছে। এই যাওয়া এবং হওয়ার মধ্যে কালিদাস একটি বিষয়ে বিশষ ভাবে লক্ষ্য করিল। সে বিষয়টি এই যে, গ্রামের ডাক্তার গোকুল রায় মারা গিয়াছেন এবং বাবুদের দূর-সম্পর্কীয় এক ভাগিনেয়—নগেন বাবু হাটতলায় ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া আজ আট বৎসর অত্যন্ত সুনামের সহিত ডাক্তারী করিতেছেন।

নগেন বাবু ভাল ডাক্তার, এম-বি পাশ। খুব অভিজ্ঞ চিকিৎসক। এ অঞ্চলে চারি দিকে তাঁহার ডাক। বিশেষতঃ বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে বহু লোক এ গামে আসায় তাঁহার কাজ খুব বাড়িয়াছে। কালিদাস কপর্দ্দকহীন অবস্থায় গ্রামে আসিয়া সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার পর এক দিন প্রাতঃকালে নগেন বাবুর ডাক্তারখানায় গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল। বহুক্ষণ কথোপকথনের পর নগেন বাবু কহিলেন—"বেশ, আপনি আমার ডিস্‌পেনসারীতে কাজ করিতে চান, করুন। আপনি কম্পাউণ্ডারী পাশ না হোলেও নিজে যখন ১০।১২ বছর ডাক্তারী কোরে এসেচেন, তখন আপনার দ্বারা আমার কাজ চলে যাবে। যে লোকটি এখন কাজ করচে, ওর বাড়ী বরিশাল। ও দেশে যেতে চাইছে। তা বেশ, আপনি তা হোলে থাকুন।"

কালিদাস ভক্তিভরে তার সরুতন্তু হাত দুটি দিয়া নগেন বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। নগেন বাবু কহিলেন—"সকালে সাতটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত ডিস্‌পেসারীতে কাজ কোরে তার পর বাকী দিন আপনার নিজের 'প্র্যাকটিস্' করতে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। ও যা মাইনে পেত, অর্থাৎ কুড়ি টাকা কোরে, আপনিও তাই পাবেন।"

কালিদাস অকূলে কূল পাইল এবং পরদিন হইতেই নগেন বাবুর ডিস্‌পেনসারীতে কাজে বাহাল হইল। নন্দাদের সেই ঘরে নিজেও কি কি ঔষধ-পত্র যোগাড় করিয়া ডাক্তারী সুরু করিয়া দিল। মনে মনে বলিল—"এই আমার আদি এবং অকৃত্রিম পেশা। এ কাজ কি আমার ছাড়া চলে।"

কাজ অল্পে অল্পে একটু আধটু চলিতে লাগিল। নগেন বাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন—"দু-একটা রুগী টুগী হচ্চে কালী বাবু?"

কালিদাস বিনীত ভাবে বলে—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে হচ্চে কিছু কিছু। বড় জাহাজকে আশ্রয় কোরে জালি বোট্ যখন বেঁধেছি, তখন-----------------" মুখের বাকী কথা বিনয়পূর্ণ মৃদু হাসির পশ্চাতে চাপা পড়ে।

যাহা হউক, ছয় মাসের মধ্যে কালিদাসের 'জালি বোট' আনন্দ-তরঙ্গে বেশ নাচিতে লাগিল। নন্দীরা একটা ভাঙ্গা আলমারী দিয়াছিল। বলিতে গেলে, গোড়ার দিকে তাহাতে ঔষধপত্র কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে তন্মধ্যে বহু প্রকার ঔষধ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর কালী ডাক্তার এই ছয় মাসে বেশ একটু জায়গা করিয়া লইয়াছে।

এক দিন এ-পি-ডি ডাক্তারের মাখনপুরের চিকিৎসার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল; আজ তাহার নিজগ্রামে চিকিৎসার কিছু পরিচয় না দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

রোগী বলে—"ডাক্তার বাবু, গায়ের বেদনাটা হঠাৎ যে বড় বেড়ে উঠ্‌লো!" কালিদাস বলে—"বাড়বে না? রোগের পিঠে মেরেচি চাবুক; বেদনা ত বাড়বেই। এ বার ঐ বেদনা নিয়ে রোগমশাইকে পালাতে হবে।" রোগের বদলে শেষ কালে রোগী হয় ত পলাইয়া যায়।

"কি হে হলধর, এক হপ্তা ত ওষুধ খেলে, কেমন বোধ হচেচ বল দেখি?"

"আজ্ঞে, অনেকটা ভাল। কাসিটা বন্ধ হোয়ে গেছে; শরীরে একটু বলও পেয়েচি।"

"পাবে বই কি বাবা। আমরা পাঁশ্‌-ফাঁস্ নই বটে, চোখে তোমার গিয়ে চশমা-অ'টাও নেই, তবে বিদ্যেটা একটু ভাল কোরেই আয়ত্ত কোরেছিলুম জানবে।--------- এই যে কুণ্ডুমশাই, নমস্কার, নমস্কার। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?"

কুণ্ডু মশাইয়ের স্ত্রীর রোজ জ্বর হয়; নগেন বাবু আজ সাত দিন দেখিতেছেন, কিন্তু জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। কুণ্ডু মশাই কাহলেন—জ্বরটা ত কিছুতেই বন্ধ হচেচ না, কালীবাবু; তাই ভাবলম যে ---------- আপনি একবার যদি------

"যাব? তা বেশ। দেখুন, বড় ডাক্তার পারলেন না, আমরা কি পারবো?" বলিয়া হি হি করিয়া কালিদাস যে হাসি হাসিল, তাহার অর্থ বুঝিতে উপস্থিত কাহারো বাধিল না।

সেই দিনই কুণ্ডু মশাইয়ের স্ত্রীকে দেখিয়া কালিদাস ঔষধ দিল এবং পরদিন বৈকালে কুণ্ডু মশাই আসিয়া জানাইলেন যে, চারি দাগ ঔষধ খাইয়া সে দিন আর জ্বর আসে নাই। সংবাদ শুনিয়া আলিদাস মুখে কিছু বলিল না, আগের দিনের সেই হি-হি-হাসি একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর পুনরায় ঔষধ দিবার জন্য তাঁহার হাত হইতে ঔষধের খালি শিশিটা লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। সেই সময়ে পাশের গামের বিনয় চক্রবর্ত্তী মশায়ের বড় ছেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কালী বাবু, ডাক্তার বাবুকে কি এখন পাওয়া যাবে?"

একবার আড়ে তাহার দিকে চাহিয়া কালিদাস কাহল—"ডিস্‌পেনসারীতে গিয়ে দেখুন।"

"সেখানে দেখেই আসচি। বাড়ীতেও খোঁজ নিলুম—নাইকো।"

"বড় বড় ডাক্তাররা কি এ সময় থাকেন? তাঁদের বিশখানা গ্রামে 'কল্', দু'শো পাঁচশো রোগী হাতে। আমরা ছোটখাটো ডাক্তার, সব সময়ই ঘাঁটি আগ্‌লে পোড়ে আছি। ঘরে বোসে রোগীর পর রোগী দেখতেই বেলা কাবার, তা বেরুবো কখন?"

"তিনি ফিরবেন কখন বলতে পারেন?"

"কেমন কোরে বলবো বলুন। আপনার সেই ছোট ভাইয়ের পেটের অসুখ ত? সকালে এসে ওষুধ নিয়ে গেছলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওষুধ ত রোজই নিয়ে যাচ্চি, কিন্তু পেটের অসুখ কিছুতেই সারচে না। আজকে খুব বেড়েছে।"

কুণ্ডু মশায়ের হাতে তাঁহার ঔষধের শিশিটা দিয়া কালিদাস কহিল —"খুব বেড়েচে? আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে ত এখন পাবেন না। তিনটে পরিয়া দিচ্চি, এর আর দাম দিতে হবে না; ছোট ডাক্তারের এই পুরিয়া তিনটে দু'ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দিয়ে দেখুন ত। দিয়ে কি ফল হয়, কালকে একবার দয়া কোরে জানাবেন।"

পরদিন খবর আসিল, ছেলেটির পেটের অসুখ খুবই নরম পড়িয়াছে। তাহার পর দিন-দুই তিনের মধ্যেই ছেলেটি আরোগ্য লাভ করিল।

এইরূপে দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে কালিদাসের ডাক্তারী বেশ জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এখন মাসে প্রায় দেড় শত দুই শত টাকা আয় দাঁড়াইল। নগেন বাবুর বহু ঘর ক্রমে ক্রমে কালিদাসের হস্তগত এবং নগেন বাবুর হস্তচ্যুত হইতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া 'হিমালয়' নড়িয়া উঠিলেন। নড়িয়া উঠিয়া নগেন বাবু বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—'ব্যাপার কি?'

* * *

প্রাতঃকালে নগেন বাবুর ডিস্‌পেনসারী ঘরে এক উৎসাহপূর্ণ সভা বসিয়াছে। সভায় বাবুরা আসিয়াছেন, গ্রামের এবং পাশের গ্রামের দু'-দশ জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন গ্রামের ছেলে-ছোকরার দল এবং বহু রোগী সভার মধ্যে সমাগত। কালিদাস, অদূরে একখানি লোহার চেয়ারে উপবিষ্ট। তাহার দিকে চাহিয়া নগেন বাবু কহিলেন— "আপনার উপর আমার সন্দেহ হ'বার পর থেকেই খুব বিশেষ ভাবে কাজের দিকে লক্ষ্য রাখি। আপনি এ পর্য্যন্ত যা কোরে এসেচেন, এ খুব 'সিরিয়াস্ অফেন্স'। এ রকম দুঃসাহসের কাজ মানুষে করতে পারে, তা ধারণার অতীত?"

বাবুদের ন'বাবু কহিলেন —"ওর নামে 'কেস্' এনে ওকে 'ক্রিমিন্যালি প্রোসিকিউট' করা হোক।"

একটি প্রবীণ ভদ্রলোক কহিলেন—"ধন্য সাহস বটে!"

ঘরের বাহিরেও বহু লোক জমিয়াছিল। এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর!" বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে লোকটি ছড়া কাটিয়া কহিল— "কালিদাস ডাক্তার।
একাদশ অবতার।
হদ্দমুদ্দ কেলেঙ্কারী।
ধন্য তার বাহাদুরী॥
—এক এক পয়সা।"

"কাণ্ডটা কি খুলেই বল না ছাই!"

"কাণ্ড—প্রকাণ্ড। কালিদাসের ষণ্ডামী। করেচে কি জানিস্? নগেন বাবু রোগীদের যে সব প্রেস্‌ক্রুপস্যান্ লিখে ওষুধের জন্যে ওর কাছে পাঠাতেন, ও তাতে ঠিক-ঠিক ওষধ না দিয়ে বাজে ওষুধ দিত। তাই ও ডিস্‌পেনসারীতে আশা অবধি নগেন বাবুর ওষুধে বড়-একটা কারো উপকার হোত না। তার পর ও নিজে নগেন বাবুর সেই আসল ওষুধ দিয়ে সেই রোগীকে সারিয়ে বাহাদুরী নিত।"

"বলিস কি রে!" বলিয়া লোকটি চোখ কপালে তুলিল।

"বাড়ী গিয়ে, চোখ কপালে তুলে মূর্চ্ছা যাস্। এখন কি বিচার হয় শোন্।"

নগেন বাবু কহিলেন—"শুনুন কালী বাবু, আপনাকে পুলিসের হাতে দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। যে রকম জঘন্য কাজ আপনি কোরেচেন——"

মেজবাবু কহিলেন—"তাকে পুলিসের হাতে দেবার আগে, মাথা নেড়া কোরে দিয়ে, আর নেড়া মাথায় পচা ঘোল ঢেলে - - - - - - -

ভীড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—"তার ওপর বেশ-কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে - - - - - - - - - - - - -"

কালিদাস জীবিত কি মৃত, চেতন কি অচেতন তাহা জানিবার উপায় ছিল না। ঘাড় হেঁট করিয়া, বিমর্ষ বদনে মেজের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

টেবিলের উপর ঔষধভরা একটা শিশি ছিল। এক জন ভদ্রলোক নগেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতে কি?"

ওষুধের শিশিটা হাতে লইয়া নগেন বাবু কহিলেন—"এটা কুইনিন্ মিক্সচার, আজই দিয়েচেন। আমার প্রেস্‌ক্রুপস্যানে আছে, আট 'ডোজ'য়ে ২৪ গ্রেণ কুইনিন্ কিন্তু - - - - - - - দয়া করে একটু চেখে দেখুন।"

ভদ্রলোক হাতের তালুতে একটু ঢালিয়া মুখে দিয়া কহিলেন— "এ যে নোন্‌তা-নোন্‌তা!"

"অর্থাৎ, প্রধান ওষুধ—কুইনিনটা দেন নিকো। ২৪ গ্রেণ-কুইনিন্—কি বিরাট তেঁতো হ'বার কথা। একেবারে কুইনিন বাদ দিয়ে কতকগুলো যা' তা' দিয়েছেন - - - - - - - - এই দেখুন; কি রকম পুকুর চুরী দেখুন। নিউমোনিয়া রোগী; প্রেস্‌ক্রুপস্যানে ছিল একটা পাউডার, তাতে প্রধান ওষুধ—'এম্, বি, ৬৯৩'; কিন্তু উনি দিয়েছেন—'সোডা বাইকার্ব।"

"বলেন কি? এই রকম সাংঘাতিক রোগ নিয়ে এই রকম খেলা?"

"খেলা ঠিক নয়। এ রকম যা' তা' ওষুধে ত রোগীর কোন উপকার হবে না। তার পর উনি চালাকী কোরে পটিয়ে-শটিয়ে নিজে আসল ওষুধ দিয়ে রোগীকে ভালো করবেন আর নাম নেবেন!"

"উঃ!"

"আরে, আজ ৩।৪ মাস ধরে' ত এই কাণ্ড চালিয়ে আসচেন। আমি ত মশাই ধাঁধা খেয়ে গিয়েছিলুম। রোগীকে ঠিকমত ভাল ভাল ওষুধ দিয়ে যাচ্চি, অথচ তা'তে কারো রোগ সারে না কেন! তার পর তক্কে তক্কে থেকে - - - - - - - - - - -

ন' বাবু কহিলেন—"পুলিসে 'হ্যাণ্ডওভার' করে দেওয়াই ঠিক। আপনি কি বলেন হরি বাবু?"

হরি বাবু বিজ্ঞ লোক; কহিলেন—"তাই দেওয়াই উচিত। তবে

কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যা'ক। কাল বড় কর্ত্তা কোলকাতা থেকে আসবেন। তিনি থেকে কাজটা হোলেই ভাল হয়।"

মেজ বাবু কহিলেন—"বড়দা এসে এ ব্যাপার শুন্‌লে পুলিসে দেবার আর দরকার হবে না; শঙ্কর মাছের চা্‌কের ঘা মেরেই ওর দফা রফা করে দেবেন।"

যাহা হউক, উপস্থিত সকলের পরামর্শে বড় বাবুর জন্য কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই স্থির হইল এবং সকলে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

* * *

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশীর রাত্রি। চারি দিকে বিকট অন্ধকার। রাত বোধ হয় দেড়টা কি দুইটা। চারি দিক নিস্তব্ধ—থম্‌-থম্‌ করিতেছে। নন্দীদের বা'র-বাড়ীর একটা গাছ হইতে বিকট শব্দ করিয়া একটা পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে কালিদাস এক চমকিত হইলেও, অতি সন্তর্পণে গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ছোট একটি স্যুট-কেস্‌। পেঁচাটা আবার সেইরূপ ডাকিয়া পক্ষতাড়না করিতে করিতে উড়িয়া গেল। সেই সূচীভেদ্য নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে গ্রাম্যপথ বাহিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

আঠারো বৎসর পূর্ব্বে পিতার তাড়নায় যেমন এক দিন কালিদাস গ্রামত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আজও সেইরূপ লোক-লাঞ্ছনায় চিরকালের জন্য সে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পশ্চিম মাঠের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরঙ্গনাথ ও বেঙ্কট ভট্ট

অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ দেশে বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে চমস ঋষি রাজর্ষি জনককে বলিতেছেন যে, "হে মহারাজ! দ্রাবিড়দেশে যে স্থানে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী কাবেরী এবং মহাপুণ্যা প্রতীচী নদী বিদ্যমান, সে স্থানে যাঁহারা তাহাদের জল পান করেন, সে স্থানের বহু লোক প্রায়শঃ নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন(১)।" শ্রীবৈষ্ণবেরা বলেন যে, দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিবার পরেই দক্ষিণদেশে সুবিখ্যাত আলোয়ারগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন রাখেন। আলোয়ারগণের পরবর্ত্তী কালে শ্রীল নাথমুণি, শ্রীল যামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রমুখ আচার্য্যগণের প্রাদুর্ভাবের ফলে দক্ষিণদেশে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুগঠিত হয়েন, তাহারা "শ্রীবৈষ্ণব" নামে পরিচিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীল রঙ্গনাথের মন্দিরই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তগণের আশ্রয়স্থল। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির যখন ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল, তখন সর্ব্বশেষ আলোয়ার তিরুম্পাই স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অত্যাচারী ধনবান্ ও ভূস্বামিগণের ধন লুণ্ঠন করিয়া এই মন্দির সুগঠিত ও প্রতিসংস্কৃত করেন। অনুমান হয়, ইহার পর হইতেই এই মন্দির দক্ষিণদেশের শ্রীবৈষ্ণবগণের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট এই বিরাট মন্দিরের মত মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্দিরে অতি বৃহৎ একবিংশতি হস্ত-পরিমিত অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীনারায়ণের মনোহর বিগ্রহ বর্ত্তমান। শ্রীবৈষ্ণবগণের ও অন্যান্য বিশ্বাসী ভক্তের নিকট ইনি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী ইঁহার পদসেবায় নিযুক্ত। শ্রীল যামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথদেবের অধিনায়কত্বে শ্রীসম্প্রদায়কে পরিচালন করিতেন।

অধুনা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী আবিষ্কারের পর প্রাচীন অনার্য্য দ্রাবিড় সভ্যতার সম্মান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের নিকট বাড়িতে পারে। কিন্তু ভারতের পাচীন অধিবাসীরাও কখনও দ্রাবিড় জাতিকে অনার্য্য মনে করিতেন না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের (Authropology) সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিয়া যেমন এক একটি অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দ্বিধাবোধ করেন না, ভারতবাসী প্রাচীন পণ্ডিতগণ কখনও সেরূপ হঠকারিতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, সাত্ততন্ত্র, পাঞ্চরাত্রাদি আগম, উপনিষদাবলী, ভক্তিসত্রাবলী ও রাণাদিতে যে ভক্তিসিদ্ধান্তমূলক উপাসনা পদ্ধতির পরিচয় পাপ্ত হওয়া যায়, দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণের মধ্যে এবং উত্তর ভারতের ঋষিগণের ও মহাত্মাদিগের মধ্যেও আমরা তাহারই বিকাশ দেখিতে পাই। যাহা হউক, আলোয়ারগণের জীবনীতে আমরা প্রেমভক্তিমূলক আচরণের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী কালে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনাতেই নিষ্ঠার সমধিক পরিচয় প্রদান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা শ্রীনারায়ণেরই অভিন্ন বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীরঙ্গনাথ অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বৈষ্ণবগণের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ভট্ট-পরিবারের একশাখা বেলগুণ্ডী বা বেলগুঁড়ী নামক শ্রীরঙ্গমের অনতিদূরস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন, এই গ্রামটিও কাবেরী তীরে অবস্থিত। ভট্ট-পরিবারের এই শাখার তিনটি ভ্রাতা ভক্তিসাধনায় ও শাস্ত্রজ্ঞানে প্রসিদ্ধি

(১) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১১।৫।৩৯-৪০)

লাভ করেন। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যমের নাম ত্রিমল্ল ভট্ট এবং তৃতীয় বা সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম প্রবোধানন্দ (২)। ইঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ পরম পণ্ডিত এবং সম্ভবতঃ ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশের শ্রীসম্প্রদায়ে ও প্রাচীন বৈষ্ণব বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের এইরূপ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সন্ন্যাসে শিখা-সূত্র ত্যাগ করিতে হয় না। পরবর্ত্তী কালে শ্রীশঙ্করাচার্য্য পবর্ত্তিত সন্ন্যাস-প্রথায় সন্ন্যাসীদিগের গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, তীর্থ, আশ্রম, সাগর ও সরস্বতী এই দশটি উপাধি গ্রহণের প্রথা দেখা যায়। এই সন্ন্যাসে একটি দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় এবং শিখা ও সূত্র ত্যাগ করিতে হয়। প্রবোধানন্দ দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের রীতি অনুসারে তথায় প্রচলিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩১ শকে শঙ্কর সম্প্রদায়ের এক-দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণে পুরুষোত্তম ধাম হইতে যাত্রা করেন। ১৪৩২ শকের বর্ষাকালেই তিনি শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অনেক-সময় বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কবিতে করিতে কখনও প্রেমাবেশে হাস্য, কখনও নৃত্য, কখনও ক্রন্দন করিতে করিতে তীর্থের পথ পরিক্রমণ করিতেছেন। নীলাচলের সার্ব্বভৌম-প্রমুখ ভক্তগণ অনেক বলিয়া কহিয়া নীলাচলে নবাগত কৃষ্ণদাস নামক এক জন ব্রাহ্মণ ভক্তকে শ্রীচৈতন্যদেবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বস্ত্র ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য মহাপ্রভুর সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার স্বচ্ছন্দাচরণের বিঘ্ন জন্মিবে এই জন্য কাহাকেও সঙ্গে আনিবেন না বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—

"কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার।
কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি, যাবে এইমাত্র।
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে?
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র-বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ?
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ—ধর নিবেদন।
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার—ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে।।"
—শ্রীচরিতামৃত, মধ্য, ৭ম।

শ্রীচৈতন্যদেব অগত্যা এই কৃষ্ণদাসকেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সঙ্গী করিলেন(৩)। প্রেমানন্দে বিভোর এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীকে দেখিয়া দক্ষিণদেশের বিশেষতঃ শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মগ্ন হইলেন। গৃহস্থ ভক্তগণ এই অপূর্ব্বদৃষ্ট প্রেমিক সন্ন্যাসীকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষাদান করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন এবং এই সন্ন্যাসীর দর্শনে ও স্পর্শনে শ্রীভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশে গমন করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের নিষ্ঠাময়ী শুদ্ধা ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে নহে, তিনি অন্যান্য স্থলেও—"শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে গোষ্ঠি অনুক্ষণ" করিতে লাগিলেন। অবশেষে—

কাবেরীতে স্নান করি—দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি—মানিল কৃতার্থ।।
প্রেমাবেশে কৈল বহু—গান-নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক মন।।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৯ম।

এই স্থানেই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীসম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গৃহস্থ বেঙ্কট ভট্টের সহিত দেখা হইল। দেখা হইবামাত্র ভট্টজী শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার পাদোদক সবংশে পান করিলেন। এই প্রকারে বেঙ্কট ভট্ট সবংশে শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময়ে বেঙ্কট ভট্ট ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ তিন জনেই শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে ছিলেন। তিন ভ্রাতাই প্রাণ ভরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং অশেষ সুকৃতিশালী বেঙ্কটের শিশুপুত্র গোপাল ভট্টও শ্রীচৈতন্যদেবকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও গোপালকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ভক্তিরত্নাকরে একটী প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

"বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবা নিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে।।"

অনুবাদ:—যিনি নিজালয়ে থাকিয়াই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই বেঙ্কটাত্মজ দ্বিজেন্দ্র শ্রীগোপাল ভট্টকে বন্দনা করিতেছি।

ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে যে প্রকারে শ্রীগোপাল ভট্ট মহা-প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে পরমানন্দে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোপাল শিশুকাল হইতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্যাদিতে

(২) প্রবোধানন্দ নামটি তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম অথবা প্রথম হইতেই তিনি ঐ নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। অনেকে প্রকাশানন্দকে 'প্রবোধানন্দ' করিয়াছেন, তাহার কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বাঙ্গালা ভক্তমালের ঐতিহাসিক প্রমাণ সুদৃঢ় নহে, মাত্র তাহাতেই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের প্রবোধানন্দরূপে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু চরিতামৃতকার এ সম্বন্ধে নীরব কেন?

(৩) অনেকে "গোবিন্দদাসের করচা" নামক একখানি অনৈতি-হাসিক ও ভুঁইফোঁড় পুস্তিকাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকাদি বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থের বিরোধী দেখিয়াও অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা-বশে উহাকে প্রামাণিক মনে করিয়া গোবিন্দদাসকে শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জন্যই এখানে এ কথাটির আলোচনা করিতে হইল।

যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে আচার্য্য করিয়া গড়িবেন এই জন্যই তাঁহার একান্ত অনুগত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে গোপালকে বিশেষ ভাবে ভক্তিশাস্ত্রাদি পড়াইতে আজ্ঞা করিলেন (৪)।

শ্রীল চৈতন্যদেবের একটী অশ্রুতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার প্রামাণিক জীবনচরিতকারগণের সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের মনে শ্রীকৃষ্ণনামের ও রূপের স্ফূর্ত্তি হইত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেও তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীচরিতামৃতকার বলিতেছেন যে, শ্রীবেঙ্কট ভট্টের ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে যখন তিনি তাঁহাদিগের ভবনে বর্ষার চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি প্রতিদিন কাবেরী-স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিতেন ও প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেন। ঐ সময়ে এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর কথা চারি দিকে প্রচারিত হওয়ায়—

"লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হইতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে।।
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার।।"

—চরিতামৃত, মধ্য, ৯ম।

তাহার পর ঐ দেবালয়ে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করিতেন। তিনি অশুদ্ধ ভাবে গীতা পাঠ করিলেও গীতা পাঠের সময় তাঁহার প্রবল অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না, মাত্র গুরুদেবের আজ্ঞায় প্রত্যহ গীতা পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, ততক্ষণ অর্জ্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গীতাপাঠে তোমারই প্রকৃত অধিকার হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যদেবের পদ ধরিয়া স্তব করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
'সেই কৃষ্ণ তুমি' হেন মোর মনে লয়।।"

—চৈঃ, চঃ, মধ্য, ৯ম।

শ্রীবেঙ্কট ভট্টের গৃহে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা ছিল। ভট্ট ভ্রাতৃগণ এরূপ নিষ্ঠাভরে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। শ্রীবেঙ্কট ভট্টের ভক্তি-পারিপাট্য দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এই জন্য অনেক সময়ে পরিহাসচ্ছলে তিনি তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব আলোচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্যভজনের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব খ্যাপন করিতেন। তাহা শুনিয়া ভট্টজী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপে অভেদ হইলেও রসের অধিষ্ঠানরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপেই রসের উৎকর্ষ বিদ্যমান—শ্রীবেঙ্কট ভট্ট ও তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধানন্দ এই শাস্ত্রীয় মহাসত্য অতি সৌভাগ্যবশেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। প্রবোধানন্দ শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাহার উপাসনা যে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা অপেক্ষাও গরীয়সী, এ কথা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীবেঙ্কট ভট্ট বলিতেছেন—

"ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।।
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি।।
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁহার কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন।।
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপগুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা।।
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি।।
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।।"

—চৈঃ চঃ, মধ্য, ৯ম।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিয়া দক্ষিণদেশের অন্যান্য স্থান ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি বেঙ্কট ভট্টের পরিবারস্থ সকলকে বিশেষতঃ সপুত্র বেঙ্কট ভট্টকে ও প্রবোধানন্দকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। বেঙ্কট ভট্ট ত' মহাপ্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া দিলেন। যশোদানন্দ তালুকদারের প্রকাশিত প্রেমবিলাসের অষ্টাদশ বিলাসে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থানকালে বেঙ্কট ভট্টকে গোপালের বিবাহ দিতে নিষেধ করেন এবং গোপালকে তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগের পর বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিয়া যান (৫)। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেব চলিয়া যাইবার পর গোপাল একমনে তাঁহার আদেশ পালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভাগবতাদি ঋষিশাস্ত্রে এবং শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীভাষ্যাদি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে পাণ্ডিত্যলাভ করিলেন। গোপাল অবসর সময়ে পিতামাতার ও গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরলস ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কয়েক বৎসর পরে গোপাল কৃতবিদ্য হইলে তাঁহার পিতৃব্য ও গুরু প্রবোধানন্দ শ্রীসম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

---

(৪) যাহারা কাশীধামস্থিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত প্রবোধানন্দকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে আগ্রহশীল, তাঁহারাই তাঁহার "সরস্বতী" উপাধিটি দশনামী সম্প্রদায়ের 'সরস্বতী' উপাধি বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর বলেন, তাঁহার বিদ্যা-বত্তার জন্যই—"সর্ব্বত্র হইল যাঁর সরস্বতী খ্যাতি।"

(৫) দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যৌবনপ্রাপ্তিমাত্রেই পুরুষের বিবাহ দেওয়া এক প্রকার বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। আচার্য্য রামানুজের ষোড়শ বর্ষ বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার মাতৃ-স্বসৃপুত্র গোবিন্দ ও অন্যান্য সকলেরও ঐ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের পদান্তিকে গমন করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রবোধানন্দ মায়াবাদী একদণ্ডী সন্ন্যাসী—দশনামী সম্প্রদায়ের সরস্বতী-শাখাভুক্ত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, 'সরস্বতী' তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপাধি—তাহার সন্ন্যাসের উপাধি নহে। তাহার সরস্বতী নাম দেখিয়াই, তাহাকে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অনুমান করা সঙ্গত নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি তাঁহার সন্ন্যাসের নামই প্রবোধানন্দ হয়, তবে তাঁহার পূর্ব্বের নাম কি ছিল? শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে, যদি পূর্ব্বাশ্রমের নাম ভগবৎস্মৃতির উদ্বোধক হয়, তবে নাম পরিবর্ত্তন না হইলেও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বাধা হয় না। হয় প্রবোধানন্দ অল্প বয়সেই—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণগমনের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পূর্ব্বনাম জানিতে পারা যায় না—অথবা তিনি নাম পরিবর্ত্তন না করিয়াই অধিক বয়সে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মনোহরদাসকৃত অনুরাগবল্লার বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে প্রবোধানন্দ অধিক বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণান্তিকে উপস্থিত হন, ইহা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের বহুস্থলেই সমুদ্রতীরে অর্থাৎ নীলাচলে সন্ন্যাসিবেশধারী শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্যই যে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন এই অনুমান স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল পুরীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সম্বরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার "শ্রীবৃন্দাবনশতকং" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে সমাদৃত শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থও এই সময়ে বিরচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তীর্থভ্রমণে ও শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধারমণের মন্দির স্থাপন করিয়া শ্রীরাধারমণের সেবা স্থাপন করিবার পর তাঁহার শিষ্য গোপীনাথ এই সেবার অধিকারী হন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল দামোদরলালজী এই সেবার উত্তরাধিকারী হন। এই দামোদরের বংশধরগণই বর্ত্তমানে শ্রীরাধারমণের সেবাইত এবং ইঁহারা অবাঙ্গালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী। এই বংশের গোস্বামিগণ পাণ্ডিত্যগৌরবেরও বিশেষরূপে অধিকারী। পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধুনা পরলোকগত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় শ্রীরাধারমণ-প্রাকট্য নামক একখানি হিন্দী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি ১৫৫৭ সম্বৎ (১৫০০ খৃঃ বা ১৪২২ শকাব্দ) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীজীর আবির্ভাবের বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে গমন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথে গমন করেন, তখন শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বয়স মাত্র একাদশ হইয়াছিল। শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ঐ বয়সেই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয়। ঐ সময়েই শ্রীগোপাল ভট্ট উপনীত হইয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবরূপে লাভ করেন (৬)।

শ্রীগোপাল ভট্টকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য হইতে হইবে এবং সম্প্রদায় রক্ষার জন্য গ্রন্থাদি লিখিতে হইবে এ কথা শ্রীচৈতন্যদেব জানিতেন এই জন্যই তিনি তাহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে তাঁহাকে যে ভাবে অধ্যয়নাদি করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া আসিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসদাচারের সম্বন্ধে শ্রীসম্প্রদায়ে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। আলোয়ারগণের তামিল গ্রন্থাবলী এবং নাথমনি, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, দেবরাজাচার্য্য, সুদর্শনাচার্য্য, লোকাচার্য্য ও বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক প্রমুখ আচার্য্যগণের সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী তখনও শ্রীসম্প্রদায়ে সগৌরবে বিরাজমান। উপযুক্ত আচার্য্য বরদগুরু, বরদনায়কসূরি-প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রভাবে তখন শ্রীরঙ্গম্ সমুজ্জ্বল। পক্ষান্তরে তখন প্রাচীন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীর পায় অদর্শন ঘটিয়াছে। কিন্তু মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে তখন বিচারমল্লতার ও পাণ্ডিত্যের অভাব হয় নাই। তথাপি শ্রীরঙ্গমে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের বা অদ্বৈতবাদী শঙ্কর সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও প্রভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীসম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থাদিতে সুপণ্ডিত করিয়াছিলেন। মনে হয়, যখন উত্তরকালে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ক্রান্ত, ব্যুৎক্রান্ত ও খাণ্ডত অবস্থায় ষট্সন্দর্ভগন্থের মূলরূপে কোন গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন এই পাণ্ডিত্যে তাহার সাহায্য হইয়াছিল। উত্তরকালে শ্রীজীবও যে শ্রীসম্প্রদায়ের ও মধ্বসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাবলিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বোধ হয়, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীও তাহাতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে অধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিবার পরেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরীধামে ও তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। বোধ হয় ইহার কিছু কাল পরেই গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতা-মাতার পরলোক হয়। পারলৌকিক ক্রিয়াদি সমাপ্তির পর সম্ভবতঃ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে (১৪৫২ শকে) বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী গৃহত্যাগ করিয়া পথে নানা তীর্থভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তীর্থভ্রমণ সময়ে তিনি গণ্ডকী নদী হইতে একটি শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিয়া উহা লইয়া ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৫৩ শকে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন।

ঐ সময়ে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

---

(৬) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যতগুলি পরিবার বা শাখা আছে, তাহার প্রত্যেক শাখারই আরম্ভ শ্রীচৈতন্যদেব হইতে; অথচ শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন এ কথা কোথাও স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, তিনিই সর্ব্বপরিবারের আদিপুরুষদিগকে অভীষ্টদেবরূপে দর্শনদান করিয়াছিলেন—এই জন্যই এইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি কাহাকেও দীক্ষাদান করেন নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীও ঐ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাদের পাপসম, সেই সমস্ত ভক্তচূড়ামণির সহিত শ্রীগোপাল ভট্টের এই প্রথম সমাগম। কিন্তু তাহারা যেন কত কালের চিরপরিচিত—তাঁহারা পরস্পরকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়াই চিনিলেন। অন্তরে প্রেমরসে ভরপর, বাহ্যে কঠোর কর্ত্তব্যের চিরনিষ্ঠ উপাসক শ্রীল সনাতন গোস্বামী যুবক গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে পরম স্নেহভরে বুকে টানিয়া লইয়া তাহাকে তাঁহার প্রভুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহকারী করিয়া লইলেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সংবাদ এবং তাঁহার জন্য তাঁহার নিজের ডোর-কৌপীন বহির্ব্বাস ও একখানি বসিবার কাষ্ঠাসন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবামাত্রই শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদত্ত এই আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। এই আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া গোপাল তাহার অভীষ্টদেবতাকে সেই আশীর্ব্বাদের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া আনন্দে ডুবিয়া গেলেন। অনেকেই এই আসন বা পীঠ এবং ডোর-কৌপীন বহির্ব্বাস প্রাপ্তির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে সব বিভিন্ন মত বা তর্কবিতর্কের মধ্যে না যাইয়াও এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, আসন বা পীঠ শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠার প্রতীক এবং কৌপীন বহির্ব্বাসাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্যের প্রতীক। এই হিসাবে শ্রীগোপাল ভট্টকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরিকররূপে এবং বহিরঙ্গ ভাবে আদর্শ ব্রহ্মচারিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ফলতঃ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী চিরদিন এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের "মনোভীষ্ট" পূর্ণ করিবার শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষাকালের অবসানেই তিনি শ্রীবিল্বমঙ্গল বা লীলাশুকের সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের একটি সংস্কৃত টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন(৭)। এই টীকাটির নাম শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। যদি এই টীকাটি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত হয়, তবে যেহেতু ইহার মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি নমস্কারাদি নাই এই জন্যই ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটাবস্থায় লিখিত বলিয়া মনে করা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেণুপ্রাপ্তির সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা" অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজগোপীগণ যেরূপ প্রীতি যেরূপ আকর্ষণের তন্ময়তা এবং রসের পারিপাট্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট শালগ্রাম-সেবা আরম্ভ করিলেও

(৭) শ্রীযুত বিমলবিহারী মজুমদার ঐ টীকাটি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই গোপাল ভট্ট পিতার নাম হরিবংশ ভট্ট ও পিতামহের নাম নৃসিংহ ভট্ট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণেও শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করেন নাই। এই সন্দেহ কোনক্রমে অমূলক মনে করা যায় না।

এই শালগ্রামকে শ্রীশ্রীরাধারমণ নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীসনাতনের ও শ্রীরূপের সঙ্গলাভে তাঁহার ব্রজের এই রসময় ভজনের আদর্শ আরও দৃঢ় হইল।

শ্রীল প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী উভয়ে দক্ষিণদেশের শ্রীবৈষ্ণবগণের নিষ্ঠাময়ী ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ জ্ঞানের আদর্শ এবং তদুপযোগী সিদ্ধান্ত তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন পুনর্গঠনের ব্যাপারে আচার্য্য বল্লভ ভট্টও বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা যত দিন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তত দিন তাঁহারা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সহিত মিলিত হইয়াই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অনুগত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে বল্লভ ভট্ট প্রয়াগ হইতে তাঁহার নিজগৃহ আড়েলে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে মর্য্যাদামার্গাবলম্বী বল্লভ ভট্ট পুরীধামে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোর গোপালের উপাসনার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুষ্টিমার্গের প্রচার করেন। আচার্য্য বল্লভ ভট্টের পরলোকান্তে তাঁহার পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরও শ্রীল দাস গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ভার প্রাপ্ত হন, এ কথাও শ্রীভক্তিরত্নাকরে বিবৃত আছে। কিন্তু যখন আওরঙ্গজেবের অত্যাচার উপলক্ষ করিয়া শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপাল উদয়পুরের সিহাড়গ্রামে (অধুনা নাথদ্বার নামে বিখ্যাত) চলিয়া গেলেন এবং বিঠ্ঠলেশ্বরও পরলোকগমন করিলেন, তখন বল্লভ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে নিজেদের গৌরব খ্যাপন করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ আচার্য্য গোস্বামিগণের বিরুদ্ধে নানারূপ বিদ্বেষমূলক গ্রন্থাদি প্রচারে নিযুক্ত হন। ঐরূপ একখানি হিন্দী গ্রন্থের নাম "গোস্বামী গোকুলনাথজীকৃত শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভুকী (শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যজী) নিজবার্ত্তা, ঘরুবার্ত্তা, তথা চৌরাশী বৈঠনকে চরিত্রাদি গদ্যপদ্যাত্মক বিবিধ বিষয়ালংকৃত চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা"। এই পুস্তকখানি ১৯৫৯ সংবতে বোম্বাইয়ের তত্ত্ববিবেচক মুদ্রালয়ে মুদ্রিত এবং বোম্বাইয়ের কাল্‌কাদেবীর শ্রীযুত এন, ডি, মহেকাকী কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগোপাল ভট্টের সম্বন্ধে একটি কাল্পনিক উপাখ্যান এই বৈঠকের চরিত্রের ৪র্থী বৈঠকে স্থান পাইয়াছে। এই উপাখ্যানে শ্রীল গোপাল ভট্টজী "গোপালদাস গৌড়ীয়া" নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই উপাখ্যানে বলা হইয়াছে—গোপালদাস নামে কৃষ্ণচৈতন্যের এক জন সেবক ছিলেন। তিনি কৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট কোন সেবা পাইবার প্রার্থনা করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে শ্রীশালগ্রামের সেবা প্রদান করেন। কিন্তু শালগ্রামকে মুকুটাদি অলঙ্কারে শোভিত করিয়া সেবা করিতে পারেন না বলিয়া গোপালদাসের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি চৈতন্যদেবের নিকট পুনরায় কোনও শ্রীবিগ্রহের সেবা পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব না কি স্বপ্নে জানাইলেন—"আমি ভগবদাজ্ঞাতেই ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া থাকি, আমার যাহা সামর্থ্য ছিল আমি তাহা তোমাকে দিয়াছি। শ্রীআচার্য্যজীই শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবা দিতে সমর্থ; অতএব তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।" অতঃপর গোপালদাস

আচার্য্যজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন—"অপর বিগ্রহের আবশ্যক নাই। তোমার ভাব যদি যথার্থ হয়, তবে ঐ শালগ্রামজী পৃষ্ঠদেশে থাকিয়াই বিগ্রহরূপে প্রকট হইবেন, কারণ, ঠাকুরজী সকল কার্য্য করিতে সমর্থ। অতএব তিনি তোমার অভিপ্রায়মত স্বরূপ পরিগ্রহ করিবেন।" গোপালদাস রাত্রিশেষেই দেখিতে পাইলেন যে, শালগ্রাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ঐ বিগ্রহের নাম হইল "শ্রীরাধা-রমণ"। অতঃপর গোপালদাস বল্লভ ভট্টের নিকট মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন—"তাহা এ জন্মে হইবে না, কারণ, তুমি এ জন্মে কৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্য হইয়াছ, পরে অন্য কোনও জন্মে আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ হইতে পারে। অতঃপর ঐ গোপালদাসের নাম হইল "গোপালনাগা"। অবশ্য পরজন্মে গোপালদাস বল্লভ ভট্টের কৃপা পাইয়াছিলেন কি না তাহার কোনও উল্লেখ এই পুস্তকে নাই —থাকিলেও বোধ হয় বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকিত না।

এখন ব্যাপারটি যে কিরূপ অনৈতিহাসিক ও অমূলক পরন্তু তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিলে চলে না। শ্রীল গোপাল ভট্ট মাত্র দশ বা একাদশ বৎসর বয়সে স্বগৃহে শ্রীরঙ্গমের সন্নিকটে চারি মাসকাল শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাহার পরে তাহার সহিত জীবনে আর শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় নাই। এই সময়ে বিশেষতঃ গোপাল ভট্টজীর এত অল্প বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব কোনও সেবা তাঁহাকে দিবেন এ কথা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না— এবং ঐরূপ কথা গোপাল ভট্টের কোনও জীবনীগ্রন্থে বা কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নিত্যধামগত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌমের "শ্রীরাধারমণ প্রাকট্য" গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীল গোপাল ভট্ট ১৫৮৮ সম্বতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন কিন্তু বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায় যে, আচার্য্য বল্লভ ভট্ট ১৫৩৫ সম্বতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ৫২ বৎসর ২ মাস ৭ দিন ধরাগামে থাকিয়া ১৫৮৭ সম্বতে আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। অতএব জীবনে শ্রীবল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীল গোপাল ভট্টজীর সাক্ষাৎই হয় নাই।

শ্রীরাধারমণের গোস্বামিগণের মতে ১৫৯৯ সম্বতে (১৫৪২ খৃঃ অব্দে) শালগ্রাম শিলা হইতে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হন, অতএব ঐ সময়ে যে কিছুতেই শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রকট দেহে বর্ত্তমান ছিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শ্রীরাধারমণ প্রাকট্যের সহিত বল্লভাচার্য্যের যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা নিতান্তই অনৈতিহাসিক ও অমূলক তাহা প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থানুসারে ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। বিশেষজ্ঞগণ তাঁহার চরিতগ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি শনিবারে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম সময় ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৫৫ শকে) ৩১শে আষাঢ় ৯ই জুলাই তারিখে রাত্রিকালে তাঁহার তিরোভাব-সময় স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ১৫৮৯ সম্বতে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। অতএব শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৫৮৮ সম্বতে শ্রীবৃন্দাবন আগমন করিলে তাহার পর-বৎসর ১৫৮৯ সম্বতে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। এই সময়ে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের সখ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াই জীবনের এই সর্ব্বপ্রধান শোক সম্বরণের শক্তি তিনি এই প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীনীলাচলে যখন নবদ্বীপচন্দ্র অস্তমিত হইলেন, তখন নীলাচলের ভক্তনক্ষত্রবৃন্দের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা একরূপ অবর্ণনীয় বলিলেই চলে। ইহার কিছু দিন পরেই মহাপ্রভুর অভিন্নহৃদয় স্বরূপ-দামোদর অন্তর্হিত হইলেন, তাহার পরেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নিত্যধামে গমন করিলেন। কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রীল দ্বিজ হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রমুখ মুখ্য ভক্তগণের অনেকেই শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে চলিয়া আসিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে হারাইয়া তাঁহার মর্ম্মভক্ত—যিনি রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ষোল বৎসর ধরিয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন—সেই ভক্তপবর রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী-প্রমুখ শ্রীচৈতন্যৈকজীবন ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতকথা বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলার কথা শুনিয়া ধন্য হইলেন। এই চরিত-কথাকেই কেন্দ্র করিয়া উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত মহাগ্রন্থের উদ্ভব হইয়াছিল।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয় শ্লোকেই বলিতেছেন যে, গোপাল ভট্ট নামক গ্রন্থকার (যাঁহার পরিচয় হইতেছে যে, তিনি শ্রীভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য) শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তুষ্টিসাধনের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস সঙ্কলন করিতেছেন। কিন্তু এই হরিভক্তিবিলাসের কোথাও শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীগোবিন্দের পূজার বিধান বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। পরন্তু গোপাল, মহাবরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, মৎস্য, কূর্ম্ম, মহাবিষ্ণু, লোকপাল-বিষ্ণু, চতুর্ভুজ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বামন, বুদ্ধ, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব, জামদগ্ন্যরাম, দাশরথি রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্ত্তিগঠনের ও পূজার বিধান থাকিলেও কোথাও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি-গঠনের বা পূজার কথা কিছুই নাই। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাই যদি শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সাধনার সাররূপে বিবেচিত হয়, তবে হরিভক্তিবিলাসের মধ্যে তাহার কথা না থাকিবার কারণ কি? এবং শ্রীগোপাল ভট্টের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামই বা রাধারমণ হইবার হেতু কি? এবং ঐ মূর্ত্তিই দ্বিভুজ মুরলীধররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন কেন?

শ্রীরাধারমণের সেবাইত গোস্বামীদিগের শিরোমণি পরম পণ্ডিত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম তাঁহার "শ্রীরাধারমণপ্রাকট্য" নামক হিন্দী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীল গোপাল ভট্ট গৃহত্যাগ করিয়া নানা তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক গণ্ডকী নদী হইতে একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি পরম নিষ্ঠাভরে এই শালগ্রামশিলার সেবা করিতেন। এক দিন কোনও ভক্ত আসিয়া ঠাকুরের জন্য কতকগুলি সুন্দর ও সুগঠিত মণিময় অলঙ্কার দান করিয়া যান, তখন গোপাল ভট্টজী এইগুলি পাইয়া মনে করিলেন— "আহা! আমার ঠাকুরজী যদি হস্তপদসমন্বিত বিগ্রহ হইতেন, তাহা হইলে এই সকল অলঙ্কারে তাঁহার শোভা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইত।" ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার ভক্তের মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তিনি রাত্রির মধ্যেই শালগ্রাম হইতে ত্রিভঙ্গ মুরলীধর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন। ভট্টজীও ভক্তপ্রদত্ত অলঙ্কারে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত

করিয়া আনন্দে কৃতার্থ হইলেন। শ্রীরাধারমণের পূজারীরা এখনও শ্রীরাধারমণের পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্ব শালগ্রামের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহা পূজারী ভিন্ন আর কাহারও দর্শনীয় নহে ইহা বলিয়া থাকেন। "ভক্তিরত্নাকর" ও "ভক্তমাল" প্রমুখ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থে এই উপাখ্যানের সমর্থন পাওয়া যায়(৮)। কিন্তু শ্রীরাধারমণ বিগ্রহের নামের মধ্যে "শ্রীরাধার" নাম থাকিলেও এবং মূর্ত্তি দ্বিভুজ মুরলীধর হইলেও এই শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীরাধিকার কোনও মূর্ত্তি সেবিত হন না। শ্রীরাধিকাজীর পরিবর্ত্তে তাঁহার একখানি মুকুট শ্রীবিগ্রহের স্থলে রক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে বস্ত্র ও "পীঠ বা আসন" পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পীঠ বা আসন পাঠাইবার উদ্দেশ্য শ্রীগোপাল ভট্টকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইঙ্গিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঐ ইঙ্গিতের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীল গোপাল ভট্টজীকে পশ্চিমদেশীয় দীক্ষাপ্রার্থীদিগের গুরুপদে স্থাপিত করেন। 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থের গ্রন্থকার মনোহর দাস স্পষ্টই বলিয়াছেন---

"গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়িয়া আসিলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র॥"(৯)

কিন্তু ব্যাবহারিক নিয়মের আতিশয্য পরমার্থ পথের অনেক সময়ে বাধক হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইতে দেখিতে পাই। তবে এ কথা ঠিক, যাঁহারা একেবারে বাঙ্গালা বুঝেন না---এমন গুরুর নিকট বাঙ্গালী শিষ্যের দীক্ষা লওয়ায় পরস্পরের ভাষা বুঝিবায় অসুবিধা হয়। এবং যাঁহারা হিন্দুস্থানী ভিন্ন জানেন না---তাঁহাদেরও বাঙ্গালী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার অসুবিধা ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বাঙ্গালী ভক্তদিগের বিশেষতঃ শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত মিশিয়া একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি হিন্দুস্থানী নহেন, তিনি শ্রীরঙ্গমের অধিবাসী---তামিলই তাঁহার মাতৃভাষা। শ্রীগোপাল ভট্ট তাৎকালিক বাঙ্গালা ভাষায় কি প্রকার পদাবলী রচনা করিয়াছেন, আমরা "পদকল্পতরু" হইতে তাহার একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি:---

"দেখরি সখি, কঙল নয়ন কুঞ্জমে বিরাজ হেঁ।
বামেতে কিশোরী গোরী, অলস অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যামে বয়ন চন্দ মন্দ মন্দ হাস হেঁ॥
অঙ্গে অঙ্গে বাহেঁ ভীড়, পুছত বাত অতি নিবিড়,
পেমতরঙ্গে চরকি পড়ত কঙল মধুপ সঙ্গহেঁ॥
সারী শুক পিকু করত গান, ভঙরা ভঙরী ধরত তান,
শুনি শুনি ধনি উঠি বৈঠত, চোর চপল জাতহেঁ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি, ভুলল মন আপহেঁ॥"

যাহা হউক, আমাদের মতে বাঙ্গালী, উড়িয়া, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমদেশীয় নির্ব্বিশেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর, শ্রীরূপ গোস্বামীর, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বহু শিষ্য হইয়াছিল। এই সকল শিষ্যের অনেকে দীক্ষার শিষ্য---অনেকে শিক্ষার শিষ্য। তাঁহাদের অনেকেরই এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। যত দূর পাওয়া যায়, তাহায় আলোচনা ইঁহাদের জীবনকথার শেষে করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। তবে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর এক জন বাঙ্গালী শিষ্যের কথার উল্লেখ না করিলে তাঁহার জীবনকথা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। এই শিষ্যরত্নের নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য। তিনি একাধারে যেমন আদর্শ ভক্ত গৃহী পণ্ডিত অন্য দিকে তেমনই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ভজনের আদর্শস্থানীয়। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেই তাৎকালিক শ্রীজীব প্রমুখ আচার্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট ইঁহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। পাণ্ডিত্যে সর্ব্বজনবরেণ্য, ভক্তিসাধনায় আপামরের নমস্য, গম্ভীর স্বভাব---এই শ্রীনিবাস আচার্য্য বঙ্গদেশে যেরূপ ভাবে গোস্বামিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার ও ভাবের বন্যা বহাইয়াছিলেন---তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, সহস্র সহস্র বিদ্বান পণ্ডিত ও ভক্তিমান সুধী ইঁহার শিষ্য হইয়া রাঢ় দেশকে ধন্য ও পবিত্র করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তীর্থ ভ্রমণের সময়ে হরিদ্বারের নিকটস্থ দেববননিবাসী গোপীনাথ নামক এক জন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। ইনি পরে শ্রীল গোপাল ভট্টজীর নিকট দীক্ষা করিলে ইঁহার উপর শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবার ভার অর্পিত হয়(১০)। চিরজীবন ভক্তি ও নিষ্ঠাভরে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা করিয়া পরিণত বয়সে ৮৫ বৎসর বয়সে শ্রীল গোপাল ভট্টজী গোস্বামী (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) ১৬০৩ শকাব্দে শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিনে তাঁহার চির-অভীপ্সিত ধামে গমন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

---

(৮) এই প্রচলিত প্রবাদানুসারে শ্রীশালগ্রাম হইতে "শ্রীরাধারমণ প্রাকট্য" ব্যতীত ও মনোহরদাসের অনুরাগবল্লীতে অন্যরূপ বৃত্তান্ত আছে। যথা---

"নিশ্চয়ও সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল।
বঝি গোসাঞি গৌড় হইতে বস্ত্র আনাইল॥
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ করি।
মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥
গোপাল ভট্ট গোসাঞির জানি অভিলাষ।
স্বহস্তে শ্রীরূপ গোসাঞি করিল প্রকাশ॥
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমণ নাম প্রকট করিল॥"

---অনুরাগবল্লী, পত্রিকা সংস্করণ, ১৪ পৃঃ

যাহারা অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই ঘটনাটিই যুক্তি ও প্রমাণসহ বলিয়া গৃহীত হইবার বাধা নাই, তবে শ্রীশালগ্রাম হইতে শ্রীবিগ্রহের প্রাকট্য যখন গৌড়ীয় ও বল্লভ---উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায় তখন মূল ব্যাপারটিকে নিতান্ত উপেক্ষা করা যায় না।

(৯) বলা বাহুল্য, এই রঘুনাথ---রঘুনাথ ভট্ট; ইঁহার শিষ্যবাহুল্যের কথা শুনা যায় না, তবে বঙ্গদেশে যে পরিবার "রূপ কবিরাজের পরিকর" বলিয়া পরিচিত, সেই পরিবারের গুরু-প্রণালীতে রঘুনাথ ভট্টের নাম দেখা যায়। তাহাও সন্দেহমুক্ত নহে।

(১০) গোপীনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা দামোদরকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া যান, এই দামোদরের বংশীয়েরা এখন শ্রীরাধারমণের সেবাইত গোস্বামী নামে পরিচিত।

বিজ্ঞান-জগৎ

ছদ্মাবরণ

পথে-ঘাটে ফৌজ এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি এখন এমন ভাবে রাখিতে হয় যে, বিমানচারী শত্রুর দল আকাশ-পথ হইতে যেন সে সবের চিহ্নও না বুঝিতে পারে---তাই এ যুদ্ধে মেঘনাদী রীতিকে নিখুঁত করিয়া
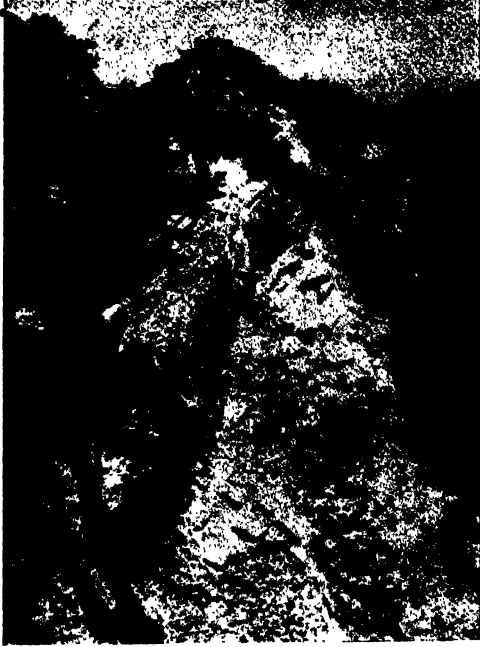
রবারের ছদ্মাবরণ

তোলা হইয়াছে। বৃটিশ সমর-বিভাগ ফৌজের যে ছদ্মাবরণ তৈয়ারী করিয়াছে, তাহা গায়ে আঁটিলে নড়া-চড়ায় এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না। ওজনে এ আবরণ পালকের মত হালকা; তার উপর খুব সহজে ও ত্বরিতে এ ছদ্মাবরণ গায়ে আঁটা চলে।

বম্বারের যম

সুইডিস শিল্পীরা যে য্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট কামান তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহা হইতে মিনিটে একশো কুড়িটি করিয়া গোলাবর্ষণ

মিনিটে ১২০ গুলী

হয়। আমেরিকা এই কামান লাখে লাখে তৈয়ারী করাইতেছে। এ কামান বম্বারের যম।

আগুনে বাঁচা

জল-বক্ষে টরপেডার আঘাতে জাহাজ ভাঙ্গিলে যাত্রীরা অগ্নি-ব্যূহ-চক্রে বিপর্য্যস্ত হন। এই অগ্নিব্যূহ ভেদ করিয়া আত্মরক্ষা এতকাল অসম্ভব ছিল; এখন সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে

পাথ্‌নাদার বেষ্টনী

য্যাসবেষ্টশের তৈয়ারী রক্ষা-বেষ্টনী রাখা হইতেছে। লাইফ-বোটের চারিদিকে এই বেষ্টনী আঁটিয়া সেই বোটে চড়িয়া অগ্নিব্যূহ ভেদ করায় এতটুকু বিঘ্ন ঘটে না---মানুষের বা বোটের গায়ে আগুনের আঁচ লাগে না।

স্বচ্ছ বোট

আমেরিকার এক ষ্টীমার কোম্পানী স্বচ্ছ নকল লুসাইত ধাতু দিয়া জলিবোট তৈয়ারী করিয়াছে। জলের রঙে রঙ মিশাইয়া এ বোট
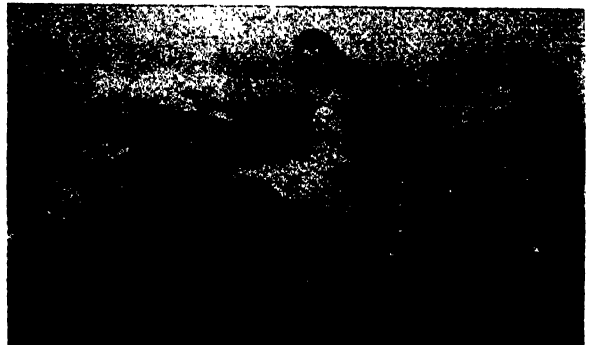
স্বচ্ছ তরণী

যখন জলে থাকে, তখন তীর হইতে বোটটিকে দেখা যায় না। বোটের হাল, দাঁড় প্রভৃতি সমস্তই স্বচ্ছ লসাইত নির্ম্মিত। বোটগুলি লাস্থ

আট ফুট, প্রস্থে আটচল্লিশ ইঞ্চি, ওজনে এক মণ আট সের এবং ডুবিতে জানে না। চার জন মানুষ এ বোটে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে।

কাগজের শয্যা

তুলার লেপ-তোষক কম্বল প্রভৃতিতে ক্রমে টান পড়িতেছে; এ জন্য কালিফোর্ণিয়ার এক বিচক্ষণ শিল্পী কাগজের শয্যা-আচ্ছাদনী তৈয়ারী করিয়াছেন। দু-পুরু মোটা কাগজ জুড়িয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই কাগজের ভিতর ও বাহিরের দিক জল ও শীত নিবারক করা হইতেছে; তার পর এই কাগজে যে ব্যাগ নির্ম্মিত হইতেছে,
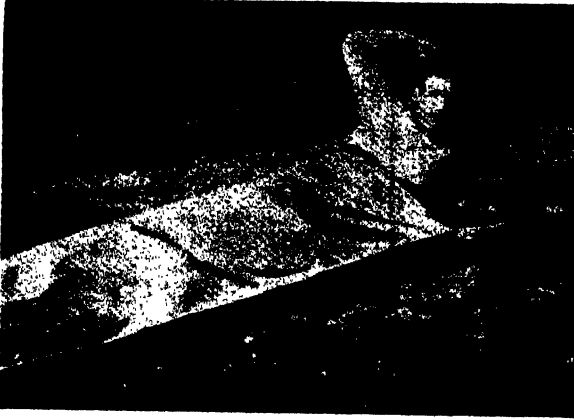
কাগজের শয্যা

সেগুলি লম্বে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফট। ব্যাগের এক দিক খোলা। এই খোলা দিক দিয়া ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়া গলার কাছে বোতাম আঁটিয়া দিয়া সুখ-শয়নে আরাম উপভোগ করুন। কাদায়, বৃষ্টির জলে বা তুষার-পাতে এ ব্যাগের এতটুকু ক্ষতি হইবে না। ত ছাড়া এ কাগজ কাচা চলে; এবং প্রয়োজন হইলে শীতে ও বর্ষায় ব্যাগের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া মাথা বাঁচানো যায়।

বিমান-পোত

অনায়াসে পরিচালনা করা যাইবে বলিয়া সুইজার্লাণ্ডের এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত ফেনিঞ্জার সম্প্রতি খুব হালকা ছোট সাইজের প্লেন তৈয়ারী
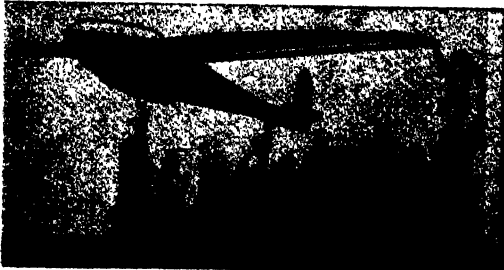
হালকা প্লেন

করিয়াছেন। এই প্লেনের ওজন এক মণ সাড়ে সাত সের মাত্র। পক্ষ দুখানি দৈর্ঘ্যে সাড়ে উনত্রিশ ফট। তিন জন লোক এই প্লেনকে ধরিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারে। এক জন ধরে মুখ, দ্বিতীয় জন ধরে পুচ্ছ এবং তৃতীয় জন ধরে পাখ্না। এই প্লেনকে আকাশে উড়াইয়া তুলিতে বেশী জায়গার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল এই প্লেন আকাশে পাড়ি জমাইয়া উড়িতে পারে।

অগ্নি-পিচকারী

শত্রুর ট্যাঙ্ক বা দুর্গ-আক্রমণের প্রতিরোধ-কল্পে মার্কিণ সমর-বিভাগ নূতন নূতন জাতের পিচ্‌কারী-অস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। এক জন মাত্র

অগ্নি-পিচকারী

লোক এ অস্ত্র সাহায্যে প্রচুর অগ্নিধারা বর্ষণে শত্রুর অস্ত্রাদির শক্তি খর্ব্ব করিতে পারে। এ পিচ্‌কারী-অস্ত্রটি ওজনে হালকা বলিয়া এক জন লোকের পক্ষে এটি বহন করিতে কষ্ট হয় না!

জলের বুকে আশ্রয়

জাহাজের যাত্রীদের জীবন-রক্ষাকল্পে ইংলিশ চ্যানেলে দু-চার মাইল অন্তর অসংখ্য ভাসা নীড় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অর্থাৎ লাল ও
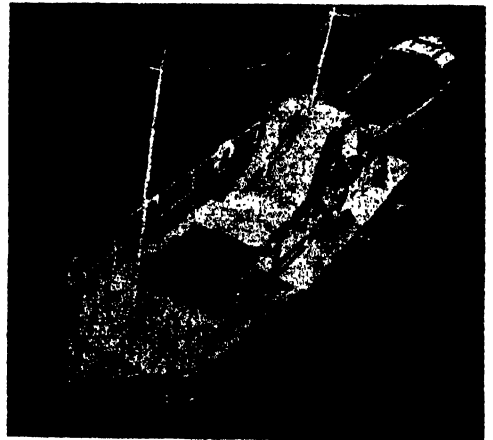
জলে বাসা

হরিদ্রা বর্ণে রঙানো অসংখ্য বোট। এগুলির নাম রেস্কুা-ষ্টেশন। বোটগুলি নোঙর-আঁটা—জলের কোল্ অবধি ষ্টিলের সিঁড়ি ফেলা। জাহাজ ডবি হইলে মানুষ ভাসিয়া এ বোটে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে। বোটে বাসের উপযোগী কামরা আছে; সেবা-শুশ্রূষা এবং

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা-কল্পে ডাক্তার, নার্স এবং ভৃত্য-পরিজনের অভাব নাই। তাহার উপর আছে বেতারে সংবাদ পাঠাইবার সুব্যবস্থা।

ফৌজের খানা-গাড়ী

রণে-বনে বিরাট বাহিনীর আহার্য্য যোগানো প্রচণ্ড সমস্যা! মার্কিণ সমর-বিভাগ রচিত চলন্ত খানা-গাড়ীর কল্যাণে এ সমস্যার সমাধান ঘটিয়াছে। ফৌজের সঙ্গে কামান, ট্যাঙ্ক, গোলা-বারুদের গাড়ীর সহিত চলে এই চলন্ত খানা-গাড়ী। এই খানা-গাড়ীর ওজন উনিশ টন। গাড়ীর সামনের দিকে আছে রন্ধনশালা পিছনে

সামনে রান্নাঘর ; পিছনে ভাঁড়ার

ভাঁড়ার। রন্ধনশালায় পাকের যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় এক মণ পনেরো সের ওজনের রুটী তৈয়ারী হয়---তরকারী-ব্যঞ্জন তৈয়ারীরও সুব্যবস্থা আছে।

আকাশে বাতি-ঘর

কুয়াশা, মেঘ বা ঘনঘোর অন্ধকারে বিমানপোত চালানো দারুণ বিপদ-সঙ্কুল---অজানা পাহাড়-পর্ব্বতে ধাক্কা খাইয়া বিমানপোত চূর্ণ
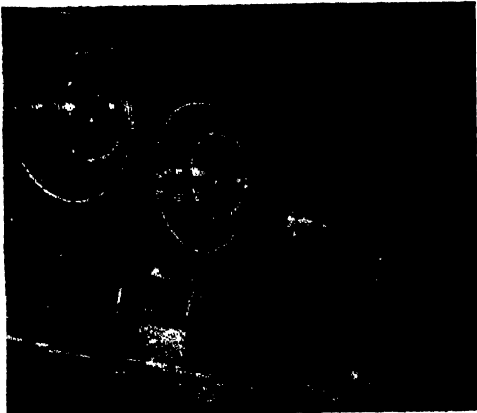
আকাশ-বাতি

হইবার আশঙ্কা সীমাহীন। এই বিঘ্ন বিমোচনের জন্য বিরাট বাতি তৈয়ারী হইয়াছে। এই বাতির দু'দিকে কাঁচ আঁটা। ছত্রিশ ইঞ্চি। বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই বাতি অবিরাম ঘোরে। তুঙ্গ গিরিপথে উচ্চ মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া সেই সব মঞ্চে এই বাতি ইতস্ততঃ আঁটা হইয়াছে। এক একটি বাতি হইতে যে আলোক-রশ্মি নিঃসৃত হয়, তাহার তেজ আঠারো লক্ষ বাতির আলোর অনুরূপ। চারি দিকে বিশ মাইল পর্য্যন্ত দিবালোকের মত সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়।

কাঠে কয়লায় ষ্টোভ জ্বলে

এদিকে কেরোসিন তৈল এবং মেথিলেটেড স্পিরিটের যেমন স্বচ্ছলতা নাই, ওদিকে তেমনি বিরাট বাহিনীর জন্য লক্ষ লক্ষ ষ্টোভ চাই। এই

নূতন ষ্টোভ

সমস্যা-মোচন-কল্পে নূতন এক জাতের ষ্টোভ তৈয়ারী হইয়াছে---সে ষ্টোভ কয়লা বা কাঠের জ্বালে জ্বলে; কেরোসিন বা স্পিরিটের তোয়াক্কা রাখে না।

জলের বুকে বন্ধু

প্লেন-যাত্রীর পক্ষে সমুদ্রবক্ষে পতন বহু ক্ষেত্রে অনিবার্য্য; এবং এ দুর্বিপাকে জীবন-রক্ষার জন্য প্যারাশুটের উপরেই নির্ভর রাখা চলে না। এজন্য বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স বিমান-ফৌজের জন্য বিশিষ্ট ছাঁদের পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিয়াছেন, ফৌজকে লাইফ্-জ্যাকেট পরিতে হয়। জ্যাকেটের সঙ্গে যে কোট এবং ট্রাউজার পরিতে হয়, তাহা পরিয়া জলের বুকে মানুষ নিরাপদে অবস্থান করিতে

প্যারাশুটির বোট

পারে---ডোবে না। প্রত্যেকের সঙ্গে ছোট সাইজের একখানি করিয়া রবার বোট থাকে, এই রবার বোটে বাতাস ভরিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(স্মৃতিকথা)

রঘুর বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন :—

"স হি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।
আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ॥"
উপযুক্ত দণ্ড দান করি' অপরাধে
সংকার গুণের মত করি' প্রদর্শন—
সকলের চিত্ত জয় করিলা অবাধে
নাতিশীত নাতি-উষ্ণ মলয় যেমন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাতিশীতোষ্ণ মলয় পবনের সহিত তুলনীয়। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার ও কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি উৎপন্ন করাইত।

যাঁহারা গুরুদাস বাবুকে জানিবার সুযোগ লাভ করেন নাই অথবা যাঁহারা তাঁহার জীবন-কথা বিস্তৃত ভাবে জানিবার অবসর পায়েন নাই, তাঁহাদিগের নিকট গুরুদাস বাবু তাঁহার সমসাময়িক সমাজে বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবেন। সেই বিস্ময় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—

"মানুষের সেবা করা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তিনি জীবনে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার দেশবাসীর ভালবাসা, স্নেহ, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রশংসা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ তাঁহার মত পুত্রের স্মৃতিতে পবিত্র হইয়াছে। তিনি তীক্ষ্ণধী ছাত্র, কোবিদ, শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহশীল, সাফল্যমণ্ডিত ব্যবহারাজীব ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক—এ সবই ছিলেন—কিন্তু তিনি এ সকল ব্যতীত আরও কিছু ছিলেন। কিন্তু আমি শ্রদ্ধা-সহকারে বলিতে পারি, যে মৃদুস্বভাব ও ধার্ম্মিক হিন্দুরূপে তিনি প্রতীচীর শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ লাভ করিয়াও দীর্ঘ জীবনে সর্ব্বদাই প্রাচীন হিন্দু আদর্শই অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু হিন্দুর আচারও পালন করিয়াছিলেন; সেই হিন্দুরূপেই আমি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্মরণ করি ও ভালবাসি। আমি যখনই সেই ক্ষীণকায় পুরুষকে স্মরণ করি, তখনই আমার মনে পড়ে, জননীর তুচ্ছ ইচ্ছাও তাঁহার পক্ষে অপার্থিব বিধি ছিল, বারিপাত বা করকাপাত কখন তাঁহাকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গায় স্নানে যাইতে বিরত করিতে পারে নাই, জনসমাগমতপ্ত বিচারালয়ে সমস্ত দিন বিশেষ শ্রমসাধ্য কায করিয়াও তিনি কখন গঙ্গোদক ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন নাই।"

লর্ড সিংহ বলিয়াছিলেন, তাঁহার এই প্রশংসায় হয়ত হিন্দুর সংস্কারগত বানপ্রস্থের ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি বিজ্ঞবর প্লেটোর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি তাহার দেশের ধর্ম্মমত অবজ্ঞার বিষয় করে, সে বিষম অপরাধী—তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত দণ্ড।" গুরুদাস বাবু সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাস) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ডায়মণ্ড-হারবারের নিকটবর্ত্তী বরুগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া চাকরী আরম্ভ করেন এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে—নারিকেলডাঙ্গায় ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র কার টেগোর কোম্পানীতে চাকরী করিতেন (১)। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়—তখন একমাত্র পুত্র গুরুদাসের বয়স ৩ বৎসরও হয় নাই। গৃহকর্ত্তার মৃত্যুতে পরিবারে অর্থকষ্ট দেখা দেয় এবং পুত্রশোকাতুরা মাণিকচন্দ্রের পত্নী কাশীধামে গমন করেন। গুরুদাসের মাতা সোণামণি শোভাবাজারবাসী রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়বাচস্পতির চতুর্থী কন্যা ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের প্রথমা কন্যা রামমণি স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। এক দিকে মাতামহের পরিবারের নিষ্ঠা জননীর প্রকৃতিগত—আর এক দিকে পিতা শিশুপুত্রকে অঙ্কে লইয়া প্রতিদিন গীতা পাঠ করিতেন। মানুষের শুদ্ধজ্ঞান ও মানব-প্রকৃতির ধাতুগত কামনা—হিন্দুর দর্শনের শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার—ইহাদিগের মধ্যে সমন্বয়-সাধন গীতায় যেরূপ হইয়াছে, সেরূপ, বোধ হয়, আর কোথাও হয় নাই। এক দিকে দারিদ্র্য-প্রভাবিত পরিবার, আর এক দিকে হিন্দু বিধবার শুচিতা-সম্পন্না জননীর পুত্রকে "মানুষ" করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ। এ সকল না বিবেচনা করিলে গুরুদাসের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়। গুরুদাস বাবুর সমসাময়িক আচার-শৈথিল্যের মধ্যে তাঁহার কঠোর আচারনিষ্ঠা যদি বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হয়, যদি তিনি বর্ত্তমান সময়েও স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্রাহ্মণেতর বংশোদ্ভব সন্ন্যাসীরও বেদান্ত ব্যাখ্যার অধিকারে সন্দেহ অনুভব করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার চিরাগত সংস্কারের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না (২)। সেই সংস্কারের স্ফটিক স্তম্ভে তিনি কখন হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মাতৃভক্তি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বামীর চিতায় তাঁহার সহগামিনী হিন্দু নারীর ভগিনী গুরুদাস-জননী তাঁহার একমাত্র সন্তানকে তাঁহার পূতাচারের ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার পরিবেষ্টনে "মানুষ" করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে ভ্রাতার গৃহে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; আপনার কাছে—স্বামীর ভিটায় রাখিয়া—অন্য-প্রভাব-মুক্ত করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে "মানুষ" করা জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এক দিন গুরুদাস স্কুল হইতে আসিলে তাঁহার পুস্তকের মধ্যে অপর কোন ছাত্রের একটি ক্ষুদ্র শ্লেট

(১) দ্বারকানাথ ঠাকুর এই কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। "বেলগেছিয়া ভিলা"—তাঁহার প্রসিদ্ধ বাগানবাড়ী ছিল। তিনি স্বয়ং রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন না এবং ঐ বাগানে অনেক সময় বিদেশীদিগের আমন্ত্রণ হইত। তাহার স্মৃতি তৎকাল-রচিত একটি ব্যঙ্গপূর্ণ গানে পাওয়া যায় :—

"বেলগেছের বাগানে কাঁটা-চামচের ঠুনঠুনী;
ও সব আমরা গরিব আমরা কি জানি?
জানেন কার ঠাকুর কোম্পানী।"

(২) কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধি-প্রণোদিত উদারতার পরিচয়েরও অভাব নাই। আমরা জানি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার হইয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ফেলো মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাতৃশ্রাদ্ধে জলপাত্র দিয়াছিলেন।

পেন্সিল দেখিতে পাইয়া মাতা পুত্রের কেশ ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার অনবধানতার জন্য পুনঃ পুনঃ গৃহ-পার্শ্বস্থ ডোবার জলে চুবাইয়াছিলেন। আবার ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩) তাঁহাকে ওকালতী পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে বলিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে অপর ছাত্রদিগকে পরাভূত করিবার বাসনা মনে পোষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—লোভ বর্জ্জনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব-পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু দিন কলিকাতায় অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া গুরুদাস বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক হইয়া যায়েন এবং তথায় ওকালতীতে খ্যাতি লাভ করেন।

বহরমপুরে বাসকালের প্রভাব গুরুদাস বাবুকে নানা ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কারণ, তখন বহরমপুর মনীষার অন্যতম লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন তাঁহার উকীল সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে (প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাসের পিতা) মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন বিখ্যাত এবং উভয়েই সাহিত্যানুরাগী; আবার তখন তথায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট, কোবিদ লালবিহারী দে কলেজে অধ্যাপক; ডাক্তার রামদাস সেন বহরমপুরের অধিবাসী; গঙ্গাচরণ সরকারও রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার পুত্র অক্ষয়চন্দ্র উকীল; দীনবন্ধু মিত্র তখন কার্য্যব্যপদেশে সময় সময় তথায় যাইতেন; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের তখন ছাত্রাবস্থা কেবল শেষ হইয়াছে। বহরমপুরে এই মনীষার পরিবেষ্টনে 'বঙ্গদর্শনের' পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই পরিবেষ্টনে যে সাহিত্যিক আলোচনার ব্যবস্থা হইত তাহা একান্তই স্বাভাবিক। যে সকল প্রতিষ্ঠানে তাঁহারা সম্মিলিত হইতেন সে সকলের একটিতে গুরুদাস বাবু ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কারের গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঐ সমিতিতে মতি-বাবু বৈকুণ্ঠ বাবু প্রভৃতিও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন এবং গুরুদাস বাবুই ঐ সমিতির কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বহরমপুরে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা গুরুদাস বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম। তখন তিনি বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী—সংস্কৃতানুগ ভাষার অধিক অনুরাগী। বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—তখন "বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহারের ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।" আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে বাঙ্গালা ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ক্রোধে উদ্বেলিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘৃণায় বিকুঞ্চিত, লজ্জায় বিকুষ্ঠিত, দুঃখে বিগলিত সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম ভাষায় পরিণত হয় নাই। তখন এক দিন অপরাহ্ণে ভ্রমণকালে বন্ধুদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা লইয়া আলোচনা হয়। গুরুদাস বাবু সাধু ভাষার প্রতি অনুরাগে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতাবলম্বী ছিলেন। সন্ধ্যায় ভ্রমণ-শেষে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাজারের মধ্যে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সহসা গুরুদাস বাবুকে বলিলেন, "দেখুন, এই বিপণীশ্রেণী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে!" কথোপকথনে সহসা বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করায় গুরুদাস বাবু বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলে বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমি কেন ভাষা সরল করিতে চাহি, তাহা এখন বুঝিলেন?" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে তাঁহার গৃহের দিকে চলিয়া যাইলেন। কেন তিনি ভাষা বহুজনবোধ্য করিতে চাহেন, তাহা তিনি ঐ ভাবে ব্যক্ত করিলেন। তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য শোক-প্রকাশার্থ

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আহূত সভায় গুরুদাস বাবুর বক্তৃতায় আমরা দেখিতে পাই। তিনি বলেন :—

"বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি সত্য আবিষ্কার ও তাহাদিগের পরীক্ষা করেন—ভাষা ও সাহিত্য যদি লোকপ্রিয় করিতে হয়, তবে কেবল কমনীয় ও 'সাধু' হইলেই হইবে না—সরল ও ভাব-প্রকাশক্ষম হওয়া প্রয়োজন, আর কেবল অনুবাদে কোন সাহিত্য সাহিত্য নাম লাভের উপযুক্ত হয় না।"

তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষমতায় আস্থাবান্ হইয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ('সাধনা'—চৈত্র

---

(৩) ইনি পাইকপাড়ার ও কাঁদীর জমিদার সিংহ-পরিবারের সম্পত্তির ম্যানেজার ছিলেন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজা প্রতাপচন্দ্র 'ষ্টেটসম্যান' পত্রকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিলে ঐ পত্রের হিসাব বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন।

"আমার কথানুসারে (কলিকাতা) বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কএকজন সভ্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই। কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে, তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভাসমিতির কার্য্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"

মাতৃভাষা সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর আন্তরিক মতের পরিচয় যে ঘটনায় পাইয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে এক সভায় গুরুদাস বাবু 'কথকতা' ও "কথকদিগের" বিষয় ইংরেজীতে বুঝাইতেছিলেন, লালমোহন ঘোষ তথায় উপস্থিত ছিলেন—তাঁহার মুখভাবে গুরুদাস বাবুর মনে হয়, ইংরেজীতে স্বীয় ভাব বুঝাইবার চেষ্টা লালমোহন ঘোষের মনঃপূত হইতেছে না। তিনি "কথকতার" প্রশংসা করিয়া বলেন—"কথকতা" বাঙ্গালায় হয়—ইহা বাঙ্গালীর জন্য। আমরা বাঙ্গালী ইংরেজী শিখি—কায চালাইবার জন্য—ইংরেজী শিক্ষায় আমাদিগের তাহার অধিক মনোযোগ দানের প্রয়োজন নাই; বিদেশী ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি কায চালাইবার ও সেই ভাষায় রচিত রচনা বুঝিবার মত প্রয়োজন তাহার অধিক মনোযোগদানের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল।

গুরুদাস বাবুর স্বভাবজ বিনয় অনুশীলনফলে এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহা কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। বহু দিন দুর্গোৎসবের সময় সংবাদপত্রে বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা রঙ্গ-ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করার যে প্রথা ("সালতামামী") চলিয়াছে, তাহার আরম্ভ ১১০০ খৃষ্টাব্দে। তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও আমি প্রতিবেশী। তিনি তখন তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক শশিভূষণ সরকারের সহযোগে 'প্রতিবাসী'-পত্র পরিচালিত করিতেছেন—আমার চেষ্টায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সেই পত্রে যোগ দিয়াছেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর স্থির হইল পরদিন শ্যাম বাবুর গৃহে আহার করিয়া আমরা পূজার সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিব। ১৯শে মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়—অপরাহ্ণে বর্ষণ-বেগ বৃদ্ধি পায়। ক্রমে পথে জল স্রোতঃ বহিতে থাকে এবং সে রাত্রিতে শ্যাম বাবু ও সুরেশ বাবুর পক্ষে আর স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই—আমার গৃহে আমরা ৩ জন সেই রাত্রিতেই পূজার সংখ্যা 'প্রতিবাসীর' "কাপী" লিখিয়া ফেলি। সুরেশ বাবু "সালতামামী" লিখেন। গুরুদাস বাবুর গৃহে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অঙ্কের আদর্শ খর্ব্ব করিতে আগ্রহশীল ছিলেন, তাহা অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ শ্যাম বাবুর ও শশিভূষণ বাবুর মনোমত ছিল না। সেই সকলের উল্লেখ করিয়া সুরেশ বাবু বর্ণনায় গুরুদাস বাবুর বিনয়-বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন :—

> "বিনয়ে বেতসলতা, দেব গুরুদাস,
> জগদ্ধাত্রী বহু দূর, সুপ্ত হাইকোর্ট;
> যাও তবে মধুপুরে কোশাকোশী করে—
> ফিরি অঙ্ক-শাস্ত্র, দেব, ক'র নিরাকার।"

কিন্তু এই বিনয় কখন সত্য, ন্যায় ও মতের নিকট মস্তক নত করিত না। বিচারকরূপে গুরুদাস তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আসানসোলে সংঘটিত রাজবালা বৈষ্ণবীর মামলায় (সাম্রাজ্ঞী বনাম জন বার্টলেট) তাঁহার রায়ে যেমন আমরা তাহার পরিচয় পাই, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে তাঁহার স্বতন্ত্র মন্তব্যে তাহা সপ্রকাশ। সে সকলই সুবিদিত। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ—কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া—বৃটেনের কলেজের মত ছাত্রাবাস-সম্বলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ বসু সে প্রস্তাবের সমর্থন করেন। এক দিন কোন স্থানে যখন ভূপেন্দ্র বাবুর সহিত গুরুদাস বাবুর সাক্ষাৎ হয়, তখন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। গুরুদাস বাবু বলিলেন, তিনি ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না যে, কোন ছাত্রাবাসের কর্ম্মচারী তাঁহার তুলনায় তাঁহার পুত্রের উপযুক্ত অভিভাবক হইতে পারেন। এ দেশ বিলাত নহে; আমাদিগের সমাজ অন্যরূপ—আমাদিগের সামাজিক ব্যবস্থার সহিত পারিবারিক পরিবেষ্টনেরই সামঞ্জস্য আছে; আমাদিগের পারিবারিক আদর্শ স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের আদর্শের পরিপন্থী। এই সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়া তিনি বলেন, "হিন্দু হোষ্টেলের" পরিচালকরূপে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু যুবক প্রলোভন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। শেষে গুরুদাস বাবু একটু উত্তেজিত ভাবেই ভূপেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলেন, "ভূপেন বাবু, এখনও ভেবে দেখুন। আমাদের ছেলেদের বিদেশী আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টায় তা'দের সর্ব্বনাশ করতে সহায় হ'বেন না। আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি।"

যে পুত্র মাতার পূত প্রভাবে প্রভাবিত গৃহে—মাতার নিকট "মানুষ" হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহারই উপযুক্ত কথা।

গুরুদাস বাবু বিরোধ ভাল বাসিতেন না। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের এক সভায় আমি রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী'র আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করি। সে সভার গুরুদাস বাবু সভাপতি ছিলেন। ঐ প্রবন্ধ 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পরে এক দিন রবীন্দ্রনাথ বাবু ইনষ্টিটিউটের পরিচালকদিগকে এক পত্র লিখেন—বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি ছিলেন, তখন তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) তথায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অরক্ষিত অনুরোধ স্মরণ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠানের সভায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিবেন। তখন তাঁহার পত্রের উদ্দেশ্য বুঝা যায় নাই। সভায় কবিতা পাঠের পূর্ব্বে তিনি ভূমিকায় বলেন, ঐ সভার মঞ্চ হইতেই কয় দিন পূর্ব্বে এক তরুণ লেখক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার বয়সের অল্পতার উল্লেখ করিয়া বলেন—"কাঁচা বাঁশে বাঁশী হয়; কিন্তু লাঠী হয় না,"—"বঙ্গালি হইলে বিনয়

প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু বল্গাগুলি না হইলে রাস ধরা যায় না।"—"জন্মিবামাত্র কাকা হওয়া যায়, কিন্তু জ্যেঠা হওয়া যায় না"—ইত্যাদি। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ কয় জন ইহাতে সভা ত্যাগ করেন। আমি মঞ্চের উপরে ছিলাম, আমি উঠিতে উদ্যত হইলে সভাপতি গুরুদাস বাবু আমাকে নিবারণ করেন এবং কবিতা-পাঠ শেষ হইলে বলেন, "আজ আপনিই রবীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ততম পাত্র; সে কায আপনাকেই করিতে হইবে।" আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি। সভা-ভঙ্গের পরে আশুতোষ চৌধুরী যখন আমাকে বলেন, "রবির ফোড়ায় ঘা দিয়াছ!" এবং আমি বলি, "জানিতাম না—রবি বাবুর সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া"—তখন গুরুদাস বাবু আমাকে বলেন—"আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে—সাত দিন এ বিষয়ে কিছু লিখিবেন না।" তিনি মনে করিয়াছিলেন, সাত দিনে সে দিনের বিক্ষুব্ধ অবস্থার অবসান হইবে—বিরোধের তীব্রতা সময়ের প্রভাবে হ্রাস পাইবে।

আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার পর উভয় পক্ষে যে বাদানুবাদ—আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ হয়, তাহাতে মনে করা যায়—অনুরোধ কথায় রক্ষিত হইলেও কাযে রক্ষিত হয় নাই; আলফ্রেড লায়ালের 'ওল্ড পিণ্ডারীর' কথার মত হইয়াছিল—তাহাকে তুলার বীজ দিলে—"I sowed the cotton he gave me, but first I boiled the seed."

তিনি সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ বিনয়ী ছিলেন—সহজে কাহারও মনে অকারণে বেদনা দিতে চাহিতেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি যে তাহা করিতেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। কোন প্রৌঢ় অধ্যাপক বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিতে আগ্রহহেতু অন্যান্য লোকের মত গুরুদাস বাবুরও উপদেশ লইবার চেষ্টা করেন। গুরুদাস বাবু তাঁহার সন্তান-সংখ্যা জানিতে চাহেন এবং তাঁহার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা আছে জানিয়া বিরক্তিসহকারে বলেন, "আপনি যখন আবার বিবাহ করিতে চাহেন, তখন বুঝিতে হইবে আপনার ধাতুতে সন্ন্যাসের উপকরণ নাই।"

আমি যখন গুরুদাস বাবুকে নিকটস্থ হইয়া জানিবার সুযোগ লাভ করি, তখন তিনি বহরমপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতীতে যশঃ অর্জ্জন করিয়া হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। তখন প্রধানতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় তরুণদিগের কল্যাণ-কল্পে "সোসাইটী ফর দি হায়ার ট্রেণিং অব ইয়ংমেন" প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাহা বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন, ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট প্রমুখ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাবধি গুরুদাস বাবুর সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হয়। আমি তাহার সদস্য। দেশের ছাত্র-সমাজের কল্যাণে তিনি সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন। তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার। তাঁহার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—কোন ভারতীয় ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হয়েন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁকে বা ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারকে ভাইস-চান্সেলার করিবার কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি যে বার প্রথম ভাইস-চান্সেলার হয়েন, সে বার আমরা "কনভোকেশন" দেখিতে গিয়াছিলাম—মনে আছে, তিনি রক্তবর্ণ গাউন পরিধান করিয়া আসিয়া সেনেট হাউসের সোপানের উপরে দণ্ডায়মান হইলেন; চান্সেলার লর্ড ল্যান্সডাউন অশ্বারোহী রক্ষিদল পরিবেষ্টিত চারি ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া অবতরণ করিলে গুরুদাস বাবু বিনীত ভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্ত্তির পার্শ্ব দিয়া "হলে" লইয়া যাইলেন।

তিন বৎসর ভাইস-চান্সেলার থাকিয়া, গুরুদাস বাবু স্বেচ্ছায় সে পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার ভাইস-চান্সেলারের অভিভাষণত্রয় পাঠ করিলে গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে এ দেশে শিক্ষার ক্রম-পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়। তিনি যত দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন, তত দিন তাহার কার্য্যে যথাসম্ভব মনোযোগ ও সময় অকাতরে দিতেন। তাহা তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচায়ক ছিল।

সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান তিনি জীবনের নানা বিভাগে নানা কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টের জজরূপে তিনি আপনার পুত্র বা জামাতাকে কখন তাঁহার নিকট কোন মোকদ্দমায় ওকালতী করিতে দিতেন না। তখন তাঁহার জামাতা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উকীলরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন; গুরুদাস বাবুর নিষেধে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইত। কিন্তু গুরুদাস বাবু মতে অবিচলিত ছিলেন। তিনি জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বহু দিন পরে এক দিন আমরা যখন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতেছিলাম, তখন শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু তাঁহাকে বলেন, তিনি জজরূপে কিছু অতি-সাবধান ছিলেন। গুরুদাস বাবু তাঁহার উক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রকুমার বলেন, একটি মোকদ্দমায় এক পক্ষ মন্মথ বাবুকে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন—মামলার শুনানী গুরুদাস বাবু যে এজলাসে বসেন তাহাতে হইবে জানিয়া মন্মথ বাবু মামলাটি হস্তান্তরিত করিয়া নরেন্দ্রকুমারকে দিয়াছিলেন—তথাপি—গুরুদাস বাবু—মন্মথ বাবু প্রথমে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া—তাহা অন্য এজলাসে দিতে বলেন। শুনিয়া গুরুদাস বাবু উত্তর দেন, "আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করি নাই—আপনি এক ঘরে মামলা না করিয়া অপর ঘরে গিয়াছিলেন। কিন্তু এক পক্ষের মনে যদি সন্দেহের কারণ ঘটিত, মন্মথকে উকীল নিযুক্ত করায় মামলার বিচারে বিভ্রাট ঘটিয়াছে!" তিনি বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ জজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, তাঁহার ব্যারিষ্টার [illegible]
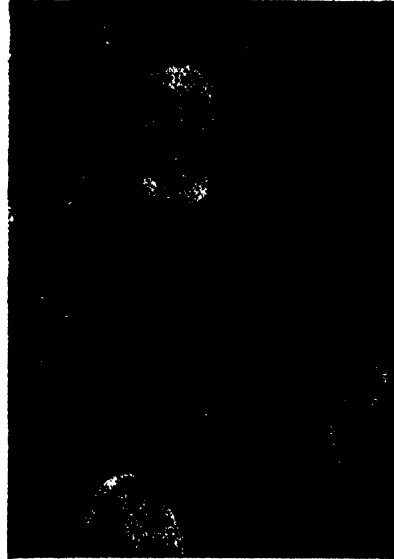
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

করিতেন। কোন মোকর্দ্দমায় জামাতা তাঁহার মক্কেলের পক্ষে যে সুবিধা চাহেন, জজ তাহা দিলে অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার তাহাতে আপত্তি করেন। তাহাতে জজ বলেন, তিনি ত ব্যারিষ্টারদিগকে সেরূপ সুযোগ সর্ব্বদাই দিয়া থাকেন! আপত্তিকারী ব্যারিষ্টার তাহাতে বলেন—"বিশেষ আমার বন্ধু—অপর পক্ষের ব্যারিষ্টারকে।" শুনিয়া জজ বলেন, তিনি মামলা অন্য এজলাসে বিচারার্থ পাঠাইবেন—ব্যারিষ্টার ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশের পর তিনি আর মামলার বিচার করিতে পারেন না। গুরুদাস বাবু বলেন, মামলায় এক পক্ষের জয় ও আর এক পক্ষের পরাজয় হয়—যাহাতে পরাজিত পক্ষ কোনরূপে সন্দেহ করিতে না পারেন যে, মোকর্দ্দমায় তিনি সুবিচার পাইলেন না—সে বিষয়ে সতর্ক হওয়াই বিচারকের কর্ত্তব্য।

এই নিষ্ঠাই তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই হাইকোর্টের জজের পদত্যাগ করার কারণ। তিনি যখন জজ হইয়াছিলেন, তখন ঐ বয়সে পদত্যাগের নিয়ম ছিল না—কাযেই তিনি ইচ্ছা করিলে যত দিন ইচ্ছা ঐ পদে থাকিতে পারিতেন এবং যখন তিনি পদত্যাগ করেন, তখনও তিনি বিচারকের কার্য্যের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে যে নিয়মে হাইকোর্টের বিচারকগণ যত দিন ইচ্ছা চাকরী করিতে পারিতেন, তাহার অপব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে হইয়াছিল। কোন কোন (ইংরেজ) বিচারক এত অপটু হইয়াছিলেন যে, এজলাসেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এক জনের সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি যখন এজলাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস একটি মামলায় জবাব দিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, জজ ঘুমাইতেছেন। তিনি মামলায় জয়ের জন্য যে যুক্তির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছিলেন, তাহা জজকে শুনাইবার জন্য তিনি স্বর একটু উচ্চ করিলেন। জজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতেছেন কেন?" নিয়মের অপব্যবহারপথ রুদ্ধ করিবার জন্য বড়লাট লর্ড কার্জ্জন নিয়ম করেন, বয়স ৬০ পূর্ণ হইলে হাইকোর্টের জজকে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। সে নিয়ম গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তাহা পালন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পরে তিনি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি তিনি লক্ষ্য ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য যখন স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ দেশে প্রচলিত যে শিক্ষাকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "যন্ত্রবদ্ধ" বলিয়াছিলেন এবং সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার যাহা কেরাণী প্রস্তুত করিবার জন্য কল্পিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর যে শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনতা ছাত্রদিগের সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিবার জন্য প্রচারিত "কার্লাইল সার্কুলারে" প্রকাশ হয়—সেই শিক্ষার স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়, তখন গুরুদাস বাবু "জাতীয় শিক্ষা পরিষদে" যোগ দিতে আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাহার বহু পূর্ব্বে তিনি প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অনুমোদিত একাধিক অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে যাহাকে "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা" বলিয়াছেন, তাহা গুরুদাস বাবুর সকল কার্য্য বৈশিষ্ট্যপ্রভাবিত করিয়াছিল। বাক্যে, ব্যবহারে, বেশে, বাসে, ব্যয়ে তিনি সর্ব্বতোভাবে সংযমী ছিলেন—বাহুল্য বর্জ্জন করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইত না। তিনি গৃহে খড়মই পাদুকারূপে ব্যবহার করিতেন—বেশে বাহুল্য ভালবাসিতেন না। তিনি প্রাচীন-পন্থী হিন্দু গৃহস্থের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দান করিতেন—কিন্তু যে দান সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে সে দান তাঁহার জীবনে লোক লক্ষ্য করে না, তিনি গোপনে—পাত্র বিবেচনা করিয়া—অনেক ক্ষুদ্র দান করিয়া গিয়াছেন—সে সকলের সমষ্টি অল্প নহে।

গুরুদাস বাবু যে পুত্রদিগের পিতার অভিভাবকত্বে শিক্ষালাভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি স্বীয় পুত্রদিগের সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পুত্রদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। তাঁহার মধ্যম পুত্র ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সরকারের ব্যবস্থা পরিষদ বিভাগে চাকরী করিতেন। সেই পদে তাঁহার অসাধারণ সম্ভ্রম ও আদর ছিল। সেই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট কোন কোন বিষয়ে সরকারী মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, "ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎকৃষ্ট আইন-জ্ঞানও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে নাই।" তিনি কিছু দিন ভারত সরকারে চাকরী করিবার পরেই গুরুদাস বাবু তাঁহাকে নিকটে আনিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িতে অস্বীকার করেন। শেষে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ অনুরোধে সার উইলিয়ম তাঁহাকে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেন। শরৎ বাবু চাকরীর সময় বেতনের টাকা পিতার নিকটে পাঠাইয়া দিতেন; পিতা তাঁহার যে ব্যয় সঙ্গত মনে করিতেন, সেই টাকা তাঁহাকে পাঠাইতেন—অবশিষ্ট টাকা পুত্রের নামে সঞ্চয় করিতেন। শরৎ বাবু সফরের ব্যয়জন্য যে টাকা পাইতেন, তাহা মিতব্যয়ী পিতার মিতব্যয়ী পুত্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল। কিন্তু গুরুদাস বাবু পুত্রের ব্যয়াতিরিক্ত টাকা তাঁহার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন; কাযেই শরৎ বাবু সে টাকা দান করিতেন—গৃহে আনিতেন না। তিনি পুত্রদিগকে তাঁহার গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র পরিবার প্রাতে মূল গৃহে সমবেত হইতেন—মধ্যাহ্নের পর যে যাহার গৃহে যাইতেন। ইহাতে পিতামাতাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে স্ব স্ব স্বতন্ত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হারাণচন্দ্রের পিতৃভক্তি পিতার মাতৃভক্তির মত ছিল।

গুরুদাস বাবু কার্য্যের উদ্যম ভালবাসিতেন—সংঘর্ষের তাপ চাহিতেন না।

তিনি স্বভাবতঃ ও সংস্কারহেতু জাতীয়তাবাদী ছিলেন; তবে তাঁহার জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনীতিতে তিনি যে জাতীয়তাবাদে—দেশাত্মবোধের অনুরাগী ছিলেন, তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। যে বৎসর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনে অস্ত্র আইনের প্রতিবাদ-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং হাইকোর্টের জজ হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে স্বদেশী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে, তাহার প্রথমাবস্থায়ই "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রদায়ের সভ্যগণ প্রতি রবিবার

প্রাতে কলিকাতার এক এক পল্লীতে দক্ষিণাচরণ সেনের সুরে "বন্দে মাতরম্" গান করিতে বাহির হইতেন। গুরুদাস বাবু "বন্দে মাতরম্‌কে" মন্ত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেন। যে দিন সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতে গমন করেন, সে দিনের কথা আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তখন আমি সম্প্রদায়ের অন্যতর সম্পাদক। আমরা গুরুদাস বাবুর গৃহদ্বারে উপনীত হইলে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সাদরে আমাদিগকে গৃহে লইলেন—সভ্যগণ গৃহ-সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর কূলে উপবেশন করিলেন। সঙ্গীতটি শুনিয়া গুরুদাস বাবু আমাকে ডাকিলেন এবং একান্তে যাইয়া আমার হস্তে সম্প্রদায়ের ভাণ্ডারের জন্য ৫০ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "এখন মনে হয়, আরও কিছু দিন চাকরী করিলে দেশের কাযে অধিক অর্থ-সাহায্য করিতে পারিতাম। দেশের কাযও অনেক—কাযে অর্থের প্রয়োজনও অনেক।" অর্থ-সংগ্রহ করা সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেকে অর্থ দিতেন—তাহাতে তাঁতশালা প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পরে সমস্ত অর্থ নিবেদিতা বিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এডিশন বলিয়াছেন, প্রতিভার অল্প ভাগই প্রেরণা—অধিকাংশ সাধনা অর্থাৎ পরিশ্রম। গুরুদাস বাবু ইহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যে জীবনে যে কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছেন, সুব্যবস্থা ও সাধনাই তাহার প্রধান কারণ। তিনি সকল বিষয়ে নিয়মানুগ ভাবে কায করিতেন। কোন কায তিনি ফেলিয়া রাখিতেন না—কোন কায উপেক্ষণীয় মনে করিতেন না। হিসাব রক্ষা তিনি প্রয়োজন মনে করিতেন; এমন কি, মৃত্যু আসন্ন জানিয়া যখন তিনি—যে গঙ্গাস্নানে পদব্রজে যাইতেন সেই গঙ্গাতীরস্থ নিজ ভবনে গঙ্গাবাসে—"তীরস্থ" হইয়াছিলেন, তখনও আপনার শেষ পেন্সনের 'বিলে' স্বাক্ষর দিয়া সে কায শেষ করিয়াছিলেন। তিনি যত সভা-সমিতি-সম্মিলনে যোগ দিতেন, তত অল্প লোকই দিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি সময়ে সব করিতেন—"ঘড়ি ধরিয়া" কায করিতেন। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন—যে ব্যক্তির কায যত অধিক, তাঁহার সময় তত অধিক। গুরুদাস বাবু অনেক কায করিতেন, কিন্তু সবই ব্যবস্থানুযায়ী করিতেন বলিয়া সময়ের অভাব অনুভব করেন নাই। গল্প আছে, এক দিন প্রাতে তিনি যখন মক্কেল-পরিবেষ্টিত হইয়া কায করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, প্রতিবেশীর গৃহে তরুণী প্রসূতির প্রসূতের সে দিন "ষষ্ঠীপূজা"—পুরোহিতের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে—প্রসূতি প্রভাত হইতে একবিন্দু জল পান করিতে পারে নাই। তিনি যাইয়া পূজা সারিয়া আসুন। মা বলিলেন, "আহা, কচি পোয়াতী—ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে।" পুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া মক্কেলদিগকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া যাইয়া পূজা সারিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি সকল বিষয়ে সংযমী ছিলেন এবং কখন মতবিরুদ্ধ কায করিতেন না। কোন অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিবেন স্থির করিলে তিনি স্বাক্ষরদানের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের অর্থ প্রদান করিতেন। এক বার ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে কোন অনুষ্ঠানে তাঁহার স্বাক্ষরিত সাহায্যের টাকার জন্য তাঁহার নিকট "বিল" যাইলে তিনি বিস্মিত হইয়া ইনষ্টিটিউটের কার্য্যালয়ে আসিয়া ঐ টাকা দিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি সহি করেছি অথচ তখনই টাকা দিই নাই? এ ভুল ত আমার আগে কখন হয় নাই!" আমার মনে আছে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী দুর্ভিক্ষে দুর্গতদিগকে সাহায্য প্রদান-ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা টাউন হলে, বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের সভাপতিত্বে যে সভা হয় সেই সভা শেষ হইলে যে স্থানে চাঁদার খাতা ছিল—জনতার মধ্য দিয়া কোনরূপে অগ্রসর হইয়া গুরুদাস বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া খাতায় স্বাক্ষর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চাঁদার টাকা দিয়া—"দেওয়া হইল" লিখিয়াছিলেন। সে দানের পরিমাণ যেমনই কেন হউক না, তাহা প্রদানের তৎপরতা দাতার আন্তরিকতার ও পূর্ব্বেই বিষয়টি বিবেচনার পরিচায়ক।

একাধিক বার বিলাতে যাইবার আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুর মতের আদর করিয়া গিয়াছেন। হাই-কোর্টে তিনি যেমন গঙ্গোদক ব্যতীত আর কিছুই পান করিতেন না, ট্রেণে ভ্রমণে প্রয়োজন হইলে তিনি তেমনই দুগ্ধ ব্যতীত কিছু পান করিতেন না। তাঁহার সেই স্বধর্ম্মানুমোদিত আচারে নিষ্ঠার জন্য তিনি অনেকের শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই তাঁহার পরিকল্পিত "স্বদেশী সমাজে" নেতৃত্ব করিতে বলিয়াছিলেন।
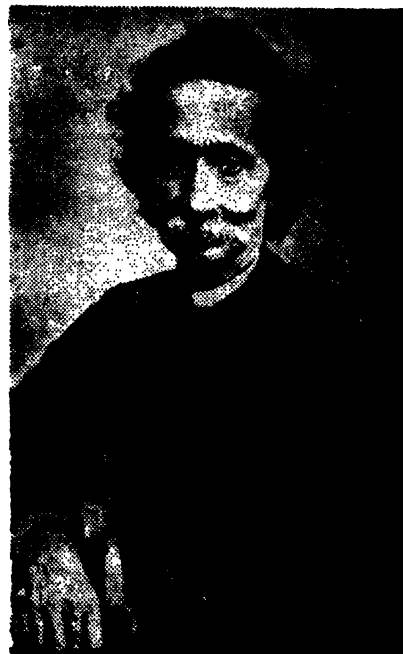
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বার্দ্ধক্যে

গুরুদাস বাবুর প্রসঙ্গে আজ আমি একটি ঘটনা উল্লেখের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে চান্সেলার লর্ড কার্জ্জন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—সত্য প্রতীচীর অধিবাসিগণের গুণ অর্থাৎ প্রাতীচ্যেরাই সত্যের আদর করে—প্রাচ্যের লোক মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী—ইত্যাদি। সভাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহের প্রবেশ গৃহে অনেকে যখন সমবেত হইয়া এই অপমানকর উক্তি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের আলোচনা করিতেছিলেন, * তখন ভগিনী নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্জ্জনের 'Problems of the Far East' পুস্তক কাহার কাছে আছে?" গুরুদাস বাবু বলিলেন, তাঁহার গৃহে উহা আছে। সেই পুস্তকে কার্জ্জন লিখিয়াছেন—

* পরে কলিকাতার টাউন হলে সভায় সার রাসবিহারী ঘোষ এই উক্তির উপযুক্ত উত্তর দেন।

কোরিয়ায় যাইয়া—সে দেশে তরুণরা সম্মান পায় না বলিয়া তিনি আপনার বয়স সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন; আর তিনি রাজ-পরিবারস্থ নহেন শুনিয়া সে দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ত্তার মুখে তাচ্ছীল্য ভাব দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বুঝায়, তিনি রাজ-পরিবারে বিবাহ করিবেন। ভগিনী নিবেদিতাকে আপনার বাড়ীতে সঙ্গে লইয়া যাইয়া গুরুদাস বাবু ঐ পুস্তক দিলেন—তিনি আবশ্যক অংশ গুরুদাস বাবুকে দেখাইলেন এবং গুরুদাস বাবুর সেই ব্রুহাম গাড়ীতেই পুস্তকখানি লইয়া আসিলেন। পরদিন 'অমৃত বাজার পত্রিকায়'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জ্জনের ধৃষ্ট উক্তি ও কোরিয়ায় তাঁহার নিজ মিথ্যা-কথন ও মিথ্যাচরণ সম্বন্ধে স্বীয় সগর্ব্ব উক্তি পাশা-পাশি প্রকাশিত হইল। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক গার্ডিনার এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"India was dissolved in laughter. It almost forgave the insult for the sake of the jest."

লর্ড কার্জ্জন আর কখন এমন বিব্রত ও অপমানিত হয়েন নাই। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন; আর গুরুদাস বাবুর পুস্তক-সংগ্রহ সে বিষয়ে তাঁহাকে আবশ্যক সাহায্য দিয়াছিল। ঐ স্মরণীয় ঘটনা সম্পর্কে এই দুই জনের কায অনেকের অজ্ঞাত বলিয়াই আজ বিশেষ ভাবে ঐ ঘটনার ইতিহাস বিবৃত করিলাম।

প্রথম জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে য়ুরোপে যাইয়া আমি যখন আমার সহযাত্রী সম্পাদকদিগের সহিত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে যাই, তখন সার আর্ণেষ্ট ট্রিভেলিয়ান তথায় ছিলেন। তিনি তাহার বহু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে ছিলেন। আমি বাঙ্গালী—কলিকাতা হইতে গিয়াছিলাম সেই জন্য আমার সহিত বাঙ্গালার কথা আলোচনা করিবার অভিপ্রায় লইয়া তিনি আমাদিগের সম্বর্দ্ধনা-সম্মিলনে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার দুই জন লোককে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—প্রথম, এটর্নী নিমাইচাঁদ বসু, দ্বিতীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নিমাই বাবুই এটর্নীরূপে তাঁহাকে প্রথম মামলায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; গুরুদাস বাবুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আমি নিমাই বাবুকে তাঁহার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। প্রত্যাবর্ত্তনপথে সিংহলে কলম্বো সহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া আমি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলাম।

তাঁহার মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে তাঁহার জীবনের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন ছিল।

তিনি জানিতেন—মৃত্যুতে ভয় নাই—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

তিনি আপনার শ্রাদ্ধের সকল ব্যবস্থাও করিয়া গঙ্গাবাসে যাইয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'দৈনিক বসুমতীতে' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন :—

"গুরুদাস বৈতরণীর তীরে উপনীত হইয়াও বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন—মৃত্যু ভয়াবহ নহে; তিনি "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" এপার হইতে ওপারে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আপনার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন; পুত্রপৌত্র-দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইয়া, পিতৃপথচারী উপযুক্ত সুপুত্রগণের মুখে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' শুনিতে শুনিতে জাহ্নবী-গর্ভে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। হিন্দুর পক্ষে এমন মৃত্যু স্পৃহণীয়।"

তিনি কখন ভগবানকে বিস্মৃত হয়েন নাই—তাই মৃত্যুকে বন্ধু-রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

"Greatness and goodness are not means,
but ends!
Hath he not always treasures,
always friends,
The good great man? Three treasures,—
love and light,
And calm thoughts, regular as infant's
breath;
And three firm friends, more sure than
day and night,—
Himself, his Maker and the angel
Death."

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জোনাকি

উড়ে বসে গাছটিতে ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাকি
আকাশে তারার মত অত যায় গোণা কি?
জেলে শত মণি-দীপ কে দাঁড়ায়ে আছে রে?
কাহারে ঘেরিয়া ওই পরীদল নাচে রে?
আলো-কণা প্রাণ পেয়ে ওখানে কি করিছে?
গোপনে কি আলোকের মৌচাক গড়িছে?
উঠে নামে সুরগুলি বীণকারে ঘেরিয়া
শত আঁখি পুলকিত বাহিতে হেরিয়া।

ভাব ও কি আসে যায় ভাবুকের বুকে রে?
পুণ্যের শত জ্যোতি সাধকের মুখে রে।
দূর যুগে হোথা ছিল এক সাথে যাহারা
নিশিতে আবার আসি মিলিতেছে তাহারা।
ভুলিতে কি পারে তারা যারা ভালবাসে রে?
গত জনমের সব সুহৃদেরা আসে রে।
টিপ দেয় কবিতারা যেন কবি-ভালেতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি চুমা দেয় গালেতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মরু-তৃষা

(উপন্যাস)

৪০

আই-এ পরীক্ষায় রত্না কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। এ শুভ সংবাদ রমেশ পাড়ায় প্রচার করিয়া ফিরিলেন। ইচ্ছা, গ্রামের পাঁচ জন মাতব্বর মিলিয়া রত্নার এই কৃতিত্বের জন্য তাহাকে একটা অভিনন্দন প্রদান করুক। তাহাদের চাঁদার অর্দ্ধেকের উপর রমেশ একাই না হয় বহন করিবে। অবশ্য স্বার্থ তাহার কিছু নাই; কন্যা তাহার বিদুষী। কলিকাতার সমাজের মুকুটমণি। কিন্তু এটা স্ত্রী-শিক্ষার যুগ। দেশের আরও পাঁচটা মেয়ের যদি উৎসাহ জাগে। রত্নার মত না হোক, অর্থাৎ রত্নার সমকক্ষ কেহ হোক, রমেশ তাহা পছন্দ করে না; তবে লেখাপড়া শিখিবে তো। নারী-শিক্ষার প্রচার এমনি করিয়াই সমাজে করিতে হয়।

স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ও থার্ড মাষ্টারকে দলে ভিড়াইয়া রমেশ একটি ছোট সভা ডাকিয়া এমনিতর একটা আবেদন জানাইলেন। একটা কমিটী গঠনেরও ব্যবস্থা হইল।

বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে কহিলেন,---দেখ্‌লে, দেশময় একটা সাড়া পড়ে গেছে। রত্নার নামে আজ গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল। হুঃ! এ কি সহজ কথা। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ নিলে, আই-এ-তেও নিলে -- তার নামে হরিশ বড্‌ড না পাঁচ কথা বলেছিল। আরে সে হলো ক্ষণজন্মা, সরস্বতী, আমার ঘরে এসেছে। তাকে তোরা কি চিনবি? ছোটবৌ না তার নামে দশখানা বলেছিল। এবার সে দেখলে তো। মেয়েকে তো কখনো আসতে লিখবো না। সত্যপ্রসাদকে লিখে দেবো, ছুটীটা সে যেন তোমার কাছে কাটায়। তার কলেজে ভর্ত্তি হবার ব্যবস্থাও তুমি করে দেবে।

অমলা এ সকল কথার কোন উত্তরই দিলেন না। মেয়ের এতখানি প্রশংসা কাণে শুনিলেও মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিল না। মুখের চেহারায় বরং ম্লানিমা দেখা গেল।

এবার মেয়েকে বোর্ডিংয়ে থাকিবার জন্য স্বামি-স্ত্রীর তর্ক তুমুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। তার কারণ, ছোটবৌ একটা সাংঘাতিক কথা অমলার কাণে তুলিয়াছিল।

এখন শুধু মনে হইল, হয়তো স্বামীর কথাই সত্য। ছোট বধূ হয়তো হিংসা করিয়াই মেয়ের নামে মিথ্যা রটনা করিয়াছে। না হইলে দুই মাসের উপর গোস্বামি-দম্পতি তাহাকে কন্যার মত কাছে রাখিয়াছেন।

বাৎসল্য দুর্ব্বল মন স্নেহাস্পদের অন্যায়কে এমনি যুক্তি-বিচারেই লঘু করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চায়। বিশেষ মায়ের মন।

প্রতিভা এক দিন বড়-জাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,---একটা কথা বলবো বলবো মনে করি দিদি, কিন্তু বলতে পারি না। কিছু যদি মনে না করো তো বলি।

একটু অবাক হইয়াই অমলা কহিলেন,---কি কথা, ছোটবৌ।

চারি দিকে চাহিয়া ঢোঁক গিলিয়া ছোটবৌ বলিল,---আমরা গেরস্ত মানুষ দিদি, ওসব কি আমাদের ভালো দেখায়---চোখে কেমন ঠেকে।

ঈষৎ বিচলিত হইয়া অমলা কহিলেন,---কেন রে, কি হয়েছে?

বড়-জার আর একটু গা ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রতিভা কহিল,---কথাটা কাণে এলো,---হাজার হোক, রত্না তো পেটের মেয়ের মতই, হরিমতী আর রত্না কি আলাদা। আমার হরিমতী যদি একটা অন্যায় করে তুমি বলবে না ভাই।

মাথা পাতিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে অমলা কহিলেন,---সে তো নিশ্চয়। ওরা এখন ছেলেমানুষ, কতটুকু বা বুদ্ধি। আমরাই তো ওদের রক্ষক; ওদের ভালো-মন্দর জন্য দায়ী।

সায় দিয়া প্রতিভা কহিল,---তুমিই বলো দিদি, দেওর তোমার একেবারে রেগে মার-মুখী আমার ওপর। বলে, ও-সব কথায় তুমি থাকবে না, জানো, রত্না কত দিয়েছে তোমার ছেলেমেয়েদের। আচ্ছা, তোমাকেই জিজ্ঞেস করি দিদি, আমরা মেয়েমানুষ; এ সব কথা কি আমরা চেপে রাখতে পারি, না তা রাখা উচিত? আর দেওয়াতে কি কারু মুখ চাপা থাকে? কি বলো?

অমলার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। কি কথা বলিবার জন্য ছোট বধূ এত ভণিতা করিতেছে?

অমলার কণ্ঠ-তালু সব যেন শুকাইয়া মুখের ভিতরটা মরুভূমি হইয়া গেল। ছোটবৌয়ের দিকে তিনি কেবল চাহিয়াই রহিলেন।

চাপা-গলায় ছোট বধূ কহিল,---বড় ঠাকুরের কাণে যেন না ওঠে। তুমি ওই গোস্বামী সাহেবদের সঙ্গে রত্নাকে মিশতে দিয়ো না।

ব্যাকুল কণ্ঠে অমলা কহিলেন,---কেন, কি হয়েছে? তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতেছিল।

প্রতিভা কহিল,---তবে বলি শোন---কথাটা হলো ইয়ে---বুঝেছো কি না, যাকে বলে, ভাব,---ভালোবাসা---মাখামাখি।

ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া অমলা ছোট-জায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ছোট বধূ বড়-জায়ের বাহুমূলে একটা চিমটি কাটিয়া মুচকী হাসিল। কহিল,---আমিও অমনি অবাক হয়েছিলুম বড়দি! বলিয়া কহিল,---এটা তো সত্যি, আগুনের কাছে ঘী থাকলে সেটাকে গলতেই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না; দু'জনের সোমত্ত বয়স, সুন্দর, আই-বুড়ো। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। ওদের কি দোষ। কথায় বলে, যে বয়সের যা ধর্ম্ম।

বিমূঢ়ার মত অমলা চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া একটা শব্দও বাহির হইল না।

প্রতিভা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,---এ কি আর বুঝতে বাকী থাকে, টান্ না হলে কেউ সঙ্গে করে আনে? ছাড়তে মন চায় না; তাই অত আদর, অত জিনিষ কিনে দেওয়া। কথায় বলে, মন না মতি। পাপ-পুণ্যির জ্ঞান কি ত থাকে। ছেলেমানুষ, সংসারের কোন ঘা তো খায়নি---কিসে কি হয় জানেও না।

ছোট বধূ থামিলেন। কিন্তু তাঁহার সদুপদেশমালায় অমলার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর যেন ভূমিকম্প হইতেছিল। প্রতিভা তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে যেন কোন অন্ধ-কূপের ধারে লইয়া যাইতেছে। অমলার এখনি তাহাতে নিমজ্জন ঘটিবে; কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

অমলার ব্যথিত চোখ, পাংশু মুখ প্রতিভার মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দের সঞ্চার করিল। মন যেন নিভৃতে তৃপ্তি পাইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে শুনিয়া আসিতেছে, পরের মেয়ের হাজার স্তুতি! তার তুলনায় প্রতিভার ছেলেমেয়েরা কত হীন! আজ তাহার সমতার দিন আসিয়াছে—পাল্লা বুঝি বা এবার তাহার দিকে ঝুঁকিবে। কে ভালো কে মন্দ, তাহার একটা বুঝাপড়ার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। এ সুযোগ কি উপেক্ষা করা যায়?

মৃদু সহানুভূতি-মাখানো কণ্ঠে প্রতিভা কহিল,—তা দিদি, আমিও শুনে প্রথমে অমনি আঁৎকে উঠেছিলুম। মণি যখন বল্লে, দিদি ওই গোঁসাই সাহেবের বুকে মাথা রেখে মোটর গাড়ীতে বসেছিল না, আর সাহেব তাকে কি বলছিল।

মূর্চ্ছাতুর যেমন সম্বিতের প্রথম উন্মেষে কথা কয়, তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে অমলা কহিল,—কখন?

ওই যে গো। খালের কাছে যখন গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, দু'জনে সামনের দিকেই বসেছিল। মণি বল্লে,—ওদের দেখে না কি রঙ্গা গিয়ে গাড়ীর ভিতরে বসলো। মণি তো ছেলেমানুষ, অত বোঝে না। ভোলা ডাগর হয়েছে! সে বল্লে,—হেড্ মাষ্টারের মেয়ের মত না? বুঝছো না, সারা পথ দু'জনে পাশাপাশি বসে এসেছে। কি বলেছে, কি করেছে, কে জানে,—আর ভোলাও কি বাড়ী গিয়ে মার কাছে গল্প করেনি ভাবো? তাই তো তাঁতি-গিন্নী বল্লে,—

দেখবো কত শুনবো কত আর, বেঁচে যদি থাকি,
কায়েতের মেয়ের মাথায় বামুনে ধরবে ছাতি।

নিষ্পলক নেত্রে জড় পুতুলের মত চাহিয়া অমলা বসিয়া রহিলেন। কি প্রতিবাদ করিবেন, কি বলিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবেন? তিনি যে নিজের চোখে দেখিয়াছেন, রঙ্গার হাত ধরিয়া অনিল তাকে গাড়ী হইতে নামাইল। স্বামীকে এইটুকু বলিতেই উত্তপ্ত স্বরে তিনি জবাব দিয়াছেন, ওটা হলো মহিলা-সম্মান। সভ্য সমাজের রীতিই ওই; ওদের পুরুষরা মেয়েদের সম্মান করে বলেই লক্ষ্মী আজ ওদের ঘরে অচঞ্চল। আর আমরা করি না,—অলক্ষ্মীর দশা আমাদের। তোমাদের ছোট মন কি না—সব জিনিষের খালি কদর্থ করো।

স্বামী এখন কি বলিয়া, কি করিয়া দেশশুদ্ধ লোকের মুখে চাপা দিবেন। ভোলা হয়তো মায়ের কাছে সবই বলিয়াছে, এবং তাঁতি-গিন্নী তাহাই বাড়াইয়া সাজাইয়া শতখানা করিয়া গ্রামময় টিট্‌কারি তুলিবে।

হঠাৎ অমলার মনে হইল,—এত বড় কলঙ্ক রটিবার পূর্ব্বে যেন রঙ্গার মৃত্যু ঘটে। তখনি চমকিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ষাট। ষাট।

মৃত্যু-শোকই প্রবল নয়। পৃথিবীতে মাই শুধু সন্তানের মৃত্যু কামনা করিতে পারে। সন্তানের চরম দুর্গতির দুঃখ, বিষাক্ত অজগরের নিশ্বাসের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবার পূর্ব্বে গর্ভধারিণী শুধু বলিতে পারে, মৃত্যু ঘটুক। মায়ের চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষিণী বিশ্বে আর কেহ নাই।

রাত্রে স্বামীর পায়ের উপর অমলা উপুড় হইয়া পড়িল। ওগো, তোমার পায়ে ধরি, আমার একটা কথা রাখো।

ব্যস্তসমস্ত রমেশ দুই হাতে পত্নীকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন—কেন কি হয়েছে?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—মেয়েকে আর পড়িয়ো না।

বিস্ময় কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—মানে?

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে অমলা কহিলেন,—নিন্দেয় যে দেশ ভরে গেল। তুমি ওর বিয়ে দাও।

তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া রমেশ কহিলেন,—কেন, কে কি বলেছে শুনি?

কথাটা ঘুরাইয়া অমলা কহিলেন,—আমরা 'জেলেডিঙি', কাজ কি আমাদের জাহাজের সঙ্গে টক্কর দিয়ে।

গভীর অবজ্ঞাভরে রমেশ কহিলেন,—ওঃ, সেই পুরোনো কাসুন্দ। কিন্তু বড়-বৌ, কাকে পুজো করে ওকে পেয়েছিলে,—সে কথা মনে আছে?

ভীত কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—সবাই বলছে,—তাই।

ভর্ৎসনার সুরে রমেশ কহিলেন,—ফের সবাই। আবার লক্ষ্মী-ছাড়া ঐ পাড়া-পড়সীর কথা।

থতমত খাইয়া অমলা বলিলেন,—কিন্তু ছোটবৌ যে বল্লে,—রঙ্গা আর ভালো নেই।

রমেশ তড়াক করিয়া খাট হইতে নামিলেন, কহিলেন,—বলেছে? হু, তাকে দেখে নেবো।

অমলা ছুটিয়া গেল। স্বামী দ্বারের খিল খুলিবার পূর্ব্বেই সে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল।

অগ্নিচক্ষে পত্নীর পানে চাহিয়া রমেশ কহিলেন,—ছেড়ে দাও, আমি ছোট-বৌয়ের কারচুপী, সয়তানী ভাঙ্গবো।

অমলা কহিল,—চুপ। চুপ। তুমি না ভাসুর। এত রাত্রে ভায়ের বাড়ী যাবে হল্লা করতে? লোকে যে মুখে চুণ-কালি দেবে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—তা বলে সয়ে থাকবো? সে ছোটলোক আমার মেয়ের নামে যা তা রটাবে? নেমকহারাম বেইমান, বাবার জন্মে দেখেছে,—রঙ্গা ওর ছেলেমেয়েদের যে-সব জিনিষ দিয়েছে?

অমলা আকুল হইয়া স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া কহিলেন,—পাগল না কি?

জীবনে এমন ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, ভ্রাতৃবধূর উদ্দেশে এমন কটূক্তি রমেশ কখনো করেন নাই। কন্যার কুৎসা রটনায় আজ ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিয়াছে। সভয়ে তাহাই বুঝিয়া অমলা কহিলেন,—তা আমি বুঝেছি, ওরা মিথ্যে বলছে। কিন্তু তবু দরকার কি?

একটু শান্ত হইয়া রমেশ কহিলেন,—তাই বলো। আমি তো তোমায় একশো বার বলেছি বড়-বৌ, রঙ্গার হিংসেতে সব জ্বলে মরে। যখন আমি যাত্রা করতুম, কি কথাই না তখন সকলে বলেছিল আমার নামে। বলো, আমার গা ছুঁয়ে বলো।

অমলা কহিলেন,—হ্যাঁ, ও-বাড়ীর মেজ-দি বলেছিল বটে, রমেশ ঠাকুরপো মদ খায়—সুরেশ অধিকারীর সঙ্গে।

রমেশ উৎসাহিত সুরে কহিলেন,—শুধু? বাবাকে অবধি বলেছিল,—রমেশটা মাতাল, জুয়াড়ি—লাঠির বাড়ি মেরে বাবা আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। এক মাস আমি বিছানায় পড়ে। কিন্তু তুমিই বলো, কখনো আমি নেশা-ভাঙ কিছু করেছি? না, খারাপ ছিলুম?

অমলা কহিলেন,---হ্যাঁ, পরে ধরা পড়্‌লো,---সুরেন অধিকারীকে জব্দ করতে।

পতীর দিকে চাহিয়া রমেশ কহিলেন,---তবে? ভুক্তভোগীই বঝতে পারে। আমি এক আঁচড়ে ওদের মনের কথা বুঝি।

স্বামীর কথা অমলাও বঝিল। লজ্জায় সে রত্নার নিকট কোন কথাই পাড়িতে পারিল না। আভাসে ইঙ্গিতেও না। মেয়ে কত ব্যথা পাইবে।

পরীক্ষার পর অমলা যখন কন্যাকে দেশে আনিবার কথা বলিল,---রমেশ উত্তর দিলেন,---বাপ, এই শত্রুপুরীতে আনছি না! ব্যবস্থা আগেই করেছি। সত্যকে চিঠি দিয়েছি; রত্না তার ওখানেই থাকবে।

৪১

মধু নন্দীর সহিত হরিমতীর বিবাহের পাকাপাকি হইয়া আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

পতিভা কহিল,---বাঁচা গেল, বড়দি! আই ড়ো মেয়ে ঘরে রাখা আর কালসাপ গলায় ঝুলিয়ে রাখা! বাবা! গায়ে কাঁটা দিতে থাকে।

হরিশ কহিল,---তুমি বৌদি অমন করে মধুর মাকে না ধরলে হতো না।

রমেশ উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতার কথা কানে গিয়াছিল, সহাস্যে কহিলেন,---আরে, সে যে আমার রত্নার টাঁক করেছিল। বামনের চাঁদ ধরবার সাধ! কি বলো? বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া কহিলেন;---এই হোল, যোগ্যে যোগ্য!

ছোট-বধূ পূর্ব্বাহ্ণেই ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গিয়াছিল। হরিশের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। সে কহিল,---হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা।

অমলা দেবরের ক্ষুণ্ণতার অর্থ বুঝিলেন। কথাটা চাপা দিয়া কহিলেন,---হারছড়া খুব ভারি, ভরি ষোল সোণার কম নয়।

হরিশের মুখ প্রসন্ন হইল। কহিল,---সোণার দাম তো আজকাল জানো---আশীর্ব্বাদে দিলে।

মণি জ্যেষ্ঠ-তাতকে ধরিল,---জ্যাঠামণি, রত্নাদিকে নিয়ে এসো! রত্নাদি এলে খুব আমোদ হবে।

অসঙ্কোচে মাথা নাড়িয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া রমেশ জবাব দিলেন,---সে কি করে হবে? তার আসা অসম্ভব।

হরিশ কহিল,--বাড়ীর বড় মেয়ে! আমার পথম কাজ, এক সপ্তাহও যদি---

রমেশ তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট উত্তর দান করিলেন;---বাড়ীর কাজ ব'লে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। কলেজে এখন সে ভর্ত্তি হবে; বি-এ ক্লাশ হলো।

---তা বটে। বলিয়া হরিশ চুপ করিয়া রহিল।

মণিকে দিয়া প্রতিভা ভাসুরকে বলাইল,---হরিমতীর ইচ্ছে, দিদি এসে কাপড়-চোপড় পছন্দ করে। আর সে জানে-শোনেও বেশী।

রমেশ সায় দিয়া কহিলেন,---তা জানে; বুঝছো না ছোটবৌমা, সহরের সব বড় ঘরেই ও মেশে। তারা সব বিলেত-ফেরতের দল।

মণি কহিল,---মা তাই বলছে; রত্নাদি তিন দিনের জন্যেও একবার আসুক।

আহ্লাদের স্বরে রমেশ কহিলেন,---না, না, ছোটবৌমা, তোমরা ভারী ফ্যাসাদে পড়বে; তার পছন্দ-মত জিনিষ তো তোমরা কিনতে পারবে না। আর আড়ৎদারের ঘরে এত ফ্যাশানেরই বা দরকার কি? যা দেবে পছন্দ হবে।

প্রতিভা গিয়া বড়জাকে কহিল,---বড়দি, তোমাকে আর কি বলবো,---রত্নার বিয়ে আর হরিমতীর বিয়ে আলাদা ভেবো না,---দেখাশোনা সব করো গিয়ে।

অমলা রন্ধন ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। স্বামীর কথাগুলা কানে গিয়াছিল। এখন বাহির হইয়া কহিলেন,---নিশ্চয় যাবো! অত করে তোমায় বলতে হবে কেন ছোটবৌ? যে ভাগ্যবতী, সেই জামায়ের মুখ, নাতির মুখ দেখতে পাবে।

বিবাহের দিন বাহিরে কন্যা-কর্ত্তা হইয়া রমেশ ঘুরিতে লাগিলেন এবং নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে জানাইয়া দিলেন,---তাঁহার বিদুষী কন্যা আই-এতে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে।

ছান্‌লাতলায় হরিমতীর বরকে বরণ করিতে অমলা নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মনে জাগিল, রত্না হরিমতীর চেয়ে দু বছরের বড়! একটা মেয়ে! তবু বাড়ীর এত বড় একটা শুভ কাজে সে দূরে রহিল! অন্তরে ব্যথার মোচড় দিল।

বাসর-ঘরে রমেশ একবার দেখা দিলেন। কন্যা-জামাতার পানে চাহিয়া কহিলেন,---বাঃ, দিব্যি মানিয়েছে; যেন হর-পার্ব্বতী। তা দ্যাখো বাবা মধু, তোমার শালী যদি থাকতো- এই আমার মেয়ে রত্না, তাহলে উর্ব্বশীর নাচটা তোমাকে দেখাতে বলতুম। বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবে কি না; তাই আসতে পাল্লে না। কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছে। ম্যাট্রিকেও পেয়েছিল।

মধু নীরব রহিল।

রমেশ পারুলের দিকে চাহিলেন। কহিলেন,---তা পারুল, কি করবি মা, তোরা যেমন পারিস আমোদ কর। এই বেশ! বলিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি ফিরিয়া গেলেন।

মধুকে অমলার ভারী ভাল লাগিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষ! বয়স তিরিশ---তা হোক! বিনম্র আচরণ; কথাগুলা মিষ্ট, সহানুভূতি মাখানো। শ্বশুরবাড়ীর হীন অবস্থার জন্য সে এতটকু ক্ষুণ্ণ নয়।

অমলা মনে মনে শতবার ভাবিল,---রত্নার চেয়ে কোন অংশেই মধু নীরেস হইত না! বিদ্যার জাহাজ হইলেই কি সব সার্থক হয়?

বিবাহ চুকিয়া গেল। বর-বধূ গৃহে গমন করিল। অমলা নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এক সময়ে কহিলেন,---আমার বড় ভয় হয়,--'অতি বড় সুন্দরী' শ্রীমতী কত দুঃখ পেয়েছেন। সীতার দুঃখে প্রাণ গলে যায়! কি জানি, রত্না---বলিয়া তিনি থামিলেন।

বিরক্ত স্বরে রমেশ জবাব করিলেন,---দেখ বড়বৌ,---অমন করে মেয়েটার অমঙ্গল টেনে এনো না।

চমকিয়া অমলা কহিলেন,---বালাই! আমি তো সারাক্ষণ দেবতাকে ডাকচি, তার শুভবুদ্ধি হোক! তার কল্যাণ হোক! বলিতে বলিতে একরাশ অশ্রু চক্ষু-পল্লব হইতে ঝরিয়া পড়িল।

বোধ করি, প্রতিভার কথাগুলাই রহিয়া রহিয়া মাতৃ-হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে। কে জানে---

বিহ্বলের মত রমেশ পত্নীর মুখপানে কয়েক দণ্ড তাকাইয়া

রহিলেন,---অকস্মাৎ তাঁহার মনে এই প্রথম একটা অভাব গুমরিয়া উঠিল ; আচম্বিতে মনে হইল, আজ যদি রত্নার বিয়ে হইত।

সহসা কণ্ঠস্বর নামাইয়া রমেশ কহিলেন,--রত্নাকে বিয়েতে আনলুম না বলে তুমি কাঁদচ বড়বৌ। কিন্তু রত্না হরিমতীর চেয়ে বড়, যদি তার মনে দুঃখ হয় তার বিয়ে হলো না বলে, সেটা ভাবো।

যুক্তি দিয়া কথা কাটা যায় না। অমলা কহিল,---কিন্তু রত্নার তুমি বিয়ে দিতে পারতে তো।

অন্যমনস্ক ভাবে রমেশ উত্তর দিলেন,---হু ! কাল থেকে তাই ভাবচি - দেখি সত্যকে বলে,---যদি একটা---

কথাটা শেষ না করিয়াই রমেশ উঠিয়া গেলেন।

৫২

পত্নীর পানে চাহিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---'বল্টুর চিঠি।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---কি লিখেছে ?

---দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনও কমেনি : তাই রত্নাকে নিয়ে যেতে পাল্লেন না। আমাকে অনুরোধ করেছে, রত্নাকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিতে! টাকা-কড়ি অবশ্য সে-ই পাঠাবে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---রত্না রয়েছে। কলেজে না হয় ভর্ত্তি করে দিলুম। কিন্তু ভাবি, রমেশ বাবু মেয়েকে এ ভাবে তৈরী কচ্ছেন কেন? এর অর্থ কি?

স্ত্রীর পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী ঈষৎ হাস্য করিলেন। কহিলেন,---এতো সোজা কথা। এমন সুন্দরী মেয়ে---সে আভাসও দিয়েছেন। তা ছাড়া এটাও তো স্বীকার করতে হবে, রত্নার প্রতিভা যথেষ্ট।

অন্যমনস্ক ভাবে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---তা আছে, এই নাচলে, গাইলে, থিয়েটার করলে, আবার পরীক্ষায় পাশ হোল কি রকম। অমিয় ওকে গাড়ী চালানো শেখাতে নিয়ে গিয়ে আমাকে তাই বলছিল। কিন্তু---

---কিন্তু কি লীলা ?

মৃদু হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---বুদ্ধিটি ওর কি রকম, ও যেন কিছু সইতে পারে না! কেউ ওকে জিতে যাবে, এ ভাবতে গেলেই ওর যেন মাথা খারাপ হয়। সময় সময় আমার কাছে ভয়ানক আব্দারে হয়, আবার কখনো দেখি, মন-মরার মত চুপ করে বসে আছে। চোখ দু'টি ছল ছল-করছে। তখন মায়া হয়, কাছে টেনে নিই।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---বাপ-মায়ের একটি মেয়ে কি না, আদরে মানুষ হয়েছে। আর বল্টুরও মেজাজ ছিল ওই ধরণের। বড্ড ঝোঁকের মানুষ ছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---থাকগে ও কথা। ভাবছিলুম---কল্পনার মাকে বলি,---আই-এ তো মেয়ে পাশ কল্লে, আর অত অপেক্ষা কত্তে আমার ভাল লাগছে না।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---তুমি ভাবো, কল্পনা কখনো বি-এ পাশ করতে পারবে? ওই আই-এটি টেনে-টুনে যা হয়েছে, যথেষ্ট।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---তা হোক, মেয়েটি বেশ। আমার সব কাজে ডান হাতের মত দাঁড়াতে পারে। কোন কিছু পরামর্শ করে ওর সঙ্গে তৃপ্তি পাই

গোস্বামী সাহেব অল্প হাস্য করিলেন। কহিলেন,---তা ঠিক। এ দিকে খুব চালাক চতুর। সব দিকে হুঁসিয়ার।

গোস্বামি-দম্পতি যখন এমনি বাক্যালাপে নিমগ্ন ছিলেন,---সেই সময় ড্রইংরুমে বসিয়া রত্না নিবিষ্ট মনে পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতেছিল,---

সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে,
কে তারে বাঁধল অকারণে?

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---ও কথা ছাড়ো। যা হবার নয়, তা নিয়ে আপশোষ অকারণ। শুধু মন খারাপ করা।

রত্না গাহিতেছিল,---

গতি-রাগের সে ছিল গান
আলো-ছায়ার সে ছিল প্রাণ
আকাশকে সে চম্‌কে দিত বনে।।

গোস্বামী সাহেব পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন,---রত্না যেন নিজের ছবি আঁকছে।

মিসেস্ গোস্বামী হাসিলেন। সুরের ছায়া তাঁহার চোখে-মুখে পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ মনে হইল, রত্না বড় মধুর---বড় সুন্দর! সকলের সঙ্গে থাকিয়াও সাধারণের মাপকাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না।

গোস্বামী সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া পত্নীর কৌচে গিয়া বসিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন,---কি ভাবচো ?

স্বামীর গায়ের উপর হেলিয়া পত্নী কহিলেন,---এমন কিছু না। অমিয়র জন্য মনটা কেমন করে। অভিমান করে সে চলে গেল।

গোস্বামী সাহেব নীরব রহিলেন। সে দিনের ঘটনা,---পত্নীর সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি! অমিয়র আঁধার-করা মুখচ্ছবি নিমেষে স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। সে দিন তিনি নির্ব্বাক্ ছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। পত্নী কঠিন অভিযোগ তুলিয়াছিল, এমন সন্দেহের অবকাশই বা অমিয় কেন দিয়াছিল। সেইটাই ছিল গোস্বামী সাহেবের বিরক্তির কারণ। তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শুনিবামাত্র মনটা তাঁহার বিকল হইল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,---অনিলের বিয়ে আমি দেবো। সে সময় প্রশ্ন উঠ্‌বে, অমিয় কেন বিয়ে কর্ল্লে না ?

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---তুমি বলে দেবে, প্রশ্নটা তাকে করতে।

---কিন্তু তাতে কি আমাদের গৌরব বাড়বে? না মুখ উজ্জ্বল হবে ?

মাথা চুলকাইয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---তা ঠিক বলতে পারি না। তবে উত্তর দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।

মিসেস গোস্বামী উঠিয়া বসিলেন,---স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন,---তুমি যদি অমিয়কে ধরো---

সবিস্ময়ে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,---আমি কি ধরবো।

মিসেস্ গোস্বামী উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,---তুমি তাকে বিয়ে করতে বলো। রাজী না হয়, কারণ বলুক।

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—ও বাবা, হাকিমের কাছে কৈফিয়ৎ তলব! না, অতটা পেরে উঠব না। আমি হলুম কৌঁশুলি।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি অমন করে কথা এড়াতে চেয়ো না—তা হবে না। অমিয় তোমার ছেলে; সে তোমার কথা শুনতে বাধ্য।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—কারুর প্রিন্সিপ্‌লের উপর আমি কোনো কথা কইতে রাজি নই।

৪২

গোস্বামী-দম্পতি যখন এইরূপ কথাবার্তায় তন্ময়, তখন অন্য কক্ষে অপর দুটি নর-নারীর জীবনে কেমন করিয়া প্রলয়ের কালরাত্রি সমুপস্থিত হইল, উপমা-রহিত সেই দুঃসহতা ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাতের মত দুটি মানবকে দিকভ্রষ্ট বিভ্রান্ত করিয়া কক্ষচ্যুত করিল, তাহাদের বহু দূরে খেদাইয়া দিল, এবার সে-কাহিনী বলি।

ঘটনা এই,—আজ সারাদিন রত্না-উন্মনা ছিল! গোস্বামি-প্রাসাদে আজ তাহার শেষ রাত্রি, কাল কলেজ খুলিবে। এখানকার হর্ষ-বিষাদ এইখানে ফেলিয়া কাল হইতে সে নূতন করিয়া লেখা-পড়ায় মন দিবে। তাহার পরীক্ষার কৃতিত্বে পিতা আনন্দিত, মাতা পুলকিত। গোস্বামি-দম্পতিও তাই। অনিলও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। তবু যেন রত্নার এ আনন্দ তাল-কাটা গানের মত ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে; কেবলই মনে হয়, তাহার এত শ্রম সকলই ব্যর্থ! যদি এই কৃতিত্বের গৌরবে কোন নয়ন-কোণ হইতে আনন্দ ঝরিত, অধর-পুটে অতি-সামান্য একটু প্রশংসার বাণী নিঃসৃত হইত, তবে অমূল্য সম্পদের মত সমগ্র জীবনে তাহা বিরাজমান রহিত। কিন্তু সেই সুদূর-প্রবাসী কি—

ভয়ে রত্না সে চিন্তার মুখ রোধ করে। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে কলসীর মধ্যে আবদ্ধ করার মত হৃদয়ের গোপন গুহায় নিহিত বাসনাকে মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সে সংবৃত করিয়া ফেলে।

গোস্বামি-দম্পতি লাইব্রেরী-ঘরে; অনিল ক্লাবে, সন্ধ্যাটা রত্নার যেন কোন মতে কাটিতে চাহিতেছিল না। বিমনা মন লইয়া সে আসিয়া বসিল ড্রইংরুমে, পিয়ানোর সম্মুখে।

বাজনা খুলিতেই সহসা অতীতের কথা মনের দ্বারে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পিয়ানো শিক্ষা সে অনিলের কাছে লাভ করিয়াছে। অনিল হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যে এর মধ্যে আমার চেয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠছ রত্না! ছুটীতে আসিয়া রত্না তখন অনুক্ষণ পিয়ানো লইয়া সময় কাটাইত। গোস্বামী সাহেব তাহার বাজনা শুনিয়া বহু প্রশংসা করিতেন। আর এক জন, সে গীতমুগ্ধ কুরঙ্গের মত আবিষ্ট থাকিত।

রত্নার মনে পড়িল—যে ক'দিন অমিয় ছিল, প্রত্যেক দিন সে রত্নার বাজনা শুনিত। এমন মুগ্ধ নিবিষ্ট শ্রোতা পাইয়া রত্নাও সমস্ত অন্তর ঢালিয়া নিত্য সুরের জাল রচনা করিত। আর গৃহে যেন তখন আনন্দের ঝর্ণা বহিত।

প্রবাস-প্রত্যাগত সেই মানুষটির কাছে কত লোক আসিত কত রকমের অভিলাষ, প্রয়োজন, সংবাদ লইয়া দেখা-শোনা করিতে। সমস্ত গৃহ যেন অমিয়র জন্য গম্‌গম্ করিত।

অমিয় পিয়ানো বাজাইতে জানিত না। অথচ এত অল্প দিনে রত্না এমন করিয়া এ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছে জানিয়া মাঝে মাঝে কনিষ্ঠের নিকট শিক্ষানবিশী করিত। কখন রত্নাকে ডাকিয়া বলিত, অনিল বলেছে, তোমার চেয়ে আমাকে ভাল করে শেখাবে। দেখবে, তখন আমার বাজনায় তমি অবাক হবে।

রত্না একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রীড্‌গুলাতে তাহার চম্পক-পেলব অঙ্গুলির তাড়না দিয়া সুরের ঝঙ্কার তুলিল।

মন আজ কেবলই অবসাদে ঝিমাইয়া পড়িতেছিল। মধ্যাহ্নে মায়ের চিঠি আসিয়াছিল,—মা হরিমতীর বিবাহের কথা লিখিয়াছে। কাকিমা, কাকামণির বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা মত করেন নাই। উপসংহারে লিখিয়াছেন,—মানুষ সংসার করিবার জন্যই পুত্র-কন্যা কামনা করে। তা ছোট-বৌয়ের বরাত ভালো,; তাহার সে আকাঙ্ক্ষা সার্থক হইবে। মধু ছেলেটিও বেশ! চমৎকার আচার-ব্যবহার! জামাই করিতে আনন্দ। নিরভিমানী—অমায়িক।

রত্না হিসাব করিয়া দেখিল,—আজ হরিমতীর ফুলশয্যা—বসনে-ভূষণে তাহাকে কেমন মানাইল, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। চন্দন-চিত্রিত সরস-রাঙা মুখে নিশ্চয় শুধু হাসি খেলিতেছে। মধুর সুখ্যাতিতে গৃহ যখন মুখর, তখন নিশ্চয় হরিমতী নিজেকে খব সৌভাগ্যবতী ভাবিতেছে। গর্ব্বও বোধ করিতেছে। পিতার পত্রে অবগত হইল, বিবাহে মধু পণ গ্রহণ করে নাই। নিজেই সমস্ত অলঙ্কার-বস্ত্র দিয়াছে! হরিশ খব খশী।

রত্না ভাবিল,—যে ব্যক্তি পিতাকে এত বড় দুশ্চিন্তা হইতে অব্যা-হতি দান করে, মন তাহার প্রতি আপনিই শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। মধুর বদান্যতায় হরিমতী মুগ্ধা। নিজেকে সে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী ভাবিয়া পুলকিত। অথচ এই মধুকেই রত্না প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,—মাথার সেই ছোট ছোট চুল কাটা হইতে গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ের চটী—সব মিলাইয়া দেখিলে হাসি পায়। মনে হয়, একটা উদ্‌বুক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোমরে টাকার ছোট থলিটি পর্য্যন্ত কৌতুক উৎস জাগায়। রত্নার কাছে এই মধু কত তুচ্ছ! মধুর মা রত্নাকেই চাহিয়াছিল,—মাও তাই চাহিয়াছিলেন। রক্ষা করিয়াছে পিতা। মন চকিতে মধুর পাশে অমিয়কে দাঁড় করাইল। চমকিয়া উঠিল। কাহার সঙ্গে কাহার তুলনা করিতেছে? সহসা মনে হইল,—অনিল! হরিমতী তো তাহাকে দেখিয়াছে। রত্নাকে বলিয়াছে নিজেই স্বীকার করিয়াছে,—কত সুন্দর অনিল! ভগবানের দেওয়া চোখ যাহার আছে, সেই অনিলের মনোহর মূর্ত্তির প্রশংসা করিবে।

রত্না ভাবিতে লাগিল নিজের কথা—অনিলের কথা—অনেক কথা। ভাবনার ভারে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইবে। তাড়াতাড়ি সে পিয়ানোর ঝঙ্কার তুলিল—সুরের রাজ্যে গিয়া এ ভাবনার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া।

ক্লাব হইতে অনিল গৃহে ফিরিল। পিয়ানোর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নিজের ঘরে না গিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। সে অনেক বার রত্নার গান শুনিয়াছে; কিন্তু অবাধ জলপ্রপাতের ন্যায় ঝরিয়া পড়া সুরলহরী এ যেন অশ্রুত স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত তাহার কাণে ঠেকিল। একেবারে পাশের কৌচটায় গিয়া সে বসিল।

অনিলকে দেখিয়া গান থামাইয়া রত্না কহিল,—এই ফিরছো?

—হ্যা! না, না, তমি থেমো না, গেয়ে যাও! বলিয়া সে কৌচের উপর হেলিয়া পড়িল।

রত্না গাহিতেছিল,—

কবে তুমি আসবে বলে,
আমি রইব না বসে
আমি চলব বাহিরে॥
শুক্‌নো ফলের পাতাগুলি পড়্‌তেছে ঝরে,
আর সময় নাহি রে॥
বাতাস দিল দোল দিল দোল,
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল—ও তুই খোল,
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে,
আর সময় নাহি রে।
আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী,
গগন পারাপারে খেয়া একলা চালায় বসি,
ও সে একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাই বা জানা নাই,
ও তোর মনের মানা নাই, ও তোর নাই,
সবার সাথে চলবি রাতে
সামনে চাহি রে,
আর সময় নাহি রে॥

অনিলের চোখে-মুখে অনির্ব্বচনীয় ঔদাস্যের ছাপ আসিয়া পড়িল। রত্নার মুখের পানে চাহিয়া সে আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল।

গান শেষ হইল। পিয়ানোর রীড্‌গুলার উপর দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে রত্না কহিল,—কি ভাবচো?

রত্নার পানে চাহিয়া অনিল শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রত্না কহিল,—ক্লাব থেকে ফিরতে এত দেরী যে আজ? ব্রীজের কম্‌পিটিশন চল্‌ছে বুঝি?

অনিল কহিল,—হ্যাঁ।

—কল্পনা তোমায় ফোন করছিল। সেখানে কেন যাওনি—বল্লে, ছবির কথা তোমায় বলতে বলেছে।

অনিল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল,—সকালে গেছলুম, বলেছিলুম তো ছবি কাল পাবে—তব ফোন্ কচ্ছিল?

রত্না কহিল,—কি ছবি? সে অত তাগাদা কচ্ছে—তাকে নিয়ে তুমি বুঝি ফটো তুলেছ? রত্নার অধরে মৃদু হাসি।

অনিল কহিল,—আমার ফটো নয়। তুমি দেখনি, ওদের শীকারের গ্রুপ।

রত্না কহিল,—কই না, আমি তো দেখিনি।

অনিল কহিল,—দেখোনি? তা তো জানতুম না। কল্পনা তারখানা এনলার্জ করতে আমায় দিয়েছিল,—এসেছে। আচ্ছা, আনুচি তোমায় দেখাচ্ছি। বলিয়া অনিল উঠিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমিয়দের মৃগয়া অভিযানের আলোকচিত্র হাতে লইয়া অনিল ফিরিল। টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল,—বাঘটা মস্ত বড়। এখন আপশোষ হচ্ছে যাইনি বলে।

রত্না ফটোর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দুই চোখ যেন টর্চ লাইটের মত প্রদীপ্ত হইয়া আলোকচিত্রের উপর পড়িতে লাগিল। সমস্ত মুখ কেমন কঠিন হইয়া উঠিল।

নির্নিমেষ নেত্রে রত্না দেখিতেছিল,—শীকার উল্লাসে অমিয়র প্রদীপ্ত মুখ, তাহারই গা ঘেঁসিয়া কাঁধে হাত দিয়া হাস্যমুখী কল্পনা দাঁড়াইয়া আছে। এবং তাহাদের দু'পাশে অপরিচিত বিজয়ীবৃন্দের সামনে মৃত বাঘ।

রত্নার মুখ নীল হইয়া উঠিল। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম্ করিতে লাগিল। একটা তীব্র বিদ্বেষ! প্রচণ্ড ঈর্ষা! শিরায় শিরায় যেন অগ্নিপ্রবাহ বহিতে লাগিল। হত্যার পূর্ব্বে মানুষের যে ক্রোধ গর্জ্জিয়া ওঠে, তেমনি ভীষণ ক্ষিপ্ততায় অন্তর যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কল্পনা! কল্পনা! সর্ব্বত্র এই কল্পনার বিজয়-কেতন উড়িতেছে। সমুদয়ের উপর যেন কল্পনার নাম অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

রত্নার মনে হইল, তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এমনি বিবর্ণ মুখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি তুলিয়া সে অনিলের দিকে চাহিল।

অনিল চমকিয়া উঠিল। রত্নার পাংশু-পাণ্ডুর মুখ—শোণিত-রাগহীন অধরপুট!

ত্বরিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—কি হলো?

রত্না কোন কথা কহিতে পারিল না। কাঠ হইয়া রহিল।

অনিল ব্যস্ত ভাবে রত্নার কাঁধে হাত রাখিয়া বিচলিত স্বরে কহিল—কি হলো রত্না? ও কি? তুমি কাঁদছ না কি? কি হয়েছে?

বহু দিন পূর্ব্বেকার কথা দপ্ করিয়া রত্নার স্মৃতিপথে ভাসিল। গোস্বামি-গৃহে তখন নূতন যাতায়াত করিত,—অনিল লইয়া যাইত বলিয়া কল্পনা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। সেই অভিমানে রত্না কাঁদিয়াছিল, কিন্তু মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহার সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কল্পনা ঈর্ষায় কাতর—অনিলকে দেখিয়া হিংসায় সে জ্বলিয়া মরে! তাই দুঃখের মধ্যেও সুখ ছিল। কিন্তু আজ কল্পনা বিজয়িনী—আর রত্না?

একটি উচ্ছ্বসিত কান্না রত্নার কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিল। নিমেষে সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভালো মন্দ বোধ লুপ্ত হইল; হঠাৎ সে ঝাঁপাইয়া অনিলের বুকের উপর পড়িয়া দু'হাতে অনিলের কণ্ঠ ধরিয়া পাংশু ওষ্ঠাধর অনিলের দিকে তুলিয়া ধরিল।

কেন এমন করিল,—ইহাতে কল্পনার উপর কি প্রতিশোধ লওয়া হইবে, বিকৃত মস্তিষ্কের মত কিছুই সে নির্ণয় করিতে পারিল না। টাইফয়েডের রোগী যেমন বিকারের ঘোরে কি করিতেছে, প্রলাপে কি বলিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারে না, উষ্ণ মস্তিষ্কের একটা ঝোঁক তাহাকে চাপিয়া ধরে—রত্নার মানসিক অবস্থা ঠিক তেমনি।

পলকে অনিলের শিরায় যেন তপ্ত রক্তস্রোত বহিল। নিজেকে সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইল। এমনি নিবিড় স্পর্শ—তাহার মনে হইল, সে যেন যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কামনা করিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ দুর্জ্জয় বাসনা তাহার বিবেক ভদ্রতা-বোধ সব লুপ্ত করিয়া মস্তিষ্কে আগুন জ্বালিয়া দিল। নিজের তপ্ত তৃষিত ওষ্ঠাধর রত্নার সেই শবের মত শোণিতলেশহীন মুখে স্থাপিত করিল।

কোন দিন যাহা হয় নাই—ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো হইতে পারিত না—এমনি একটি ক্ষণ, একটি মাত্র মুহূর্ত্ত, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাহার কালি সমগ্র জীবনে লেপিয়া যায়, মুছিবার জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়। সেই পলকপাতের ক্ষণে দুটি নর-নারী কি জটিলতার আবর্ত্তে ডুবিল, কি দুরূহ অবস্থার যে সৃষ্টি করিল,—দু'জনে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চেতন।

কল্পনার জ্বালা-ভরা কণ্ঠের ব্যঙ্গোক্তিতে চেতনা ফিরিল। কল্পনা কহিল,---চমৎকার। একেবারে সিনেমা-ষ্টুডিয়ো।

তড়িৎস্পর্শের মত রত্না নিজেকে অনিলের বাহুমুক্ত করিয়া ঠিকরাইয়া এক পাশে সরিয়া গেল। অনিল বিমূঢ়ের মত কল্পনার পানে চাহিল।

কল্পনা যে সেই মুহূর্ত্তে ঘরে পা দিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দরজার নিকটে কার্পেটে দাঁড়াইয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।

অগ্নিচক্ষে চাহিয়া অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল,---এই রাসলীলার জন্যই বোধ করি মিষ্টার গোস্বামী শীকার-পার্টিতে যেতে পাল্লেন না। এই জরুরী কাজ ছিল এখানে, না? কল্পনার অধরপুটে শ্লেষের হাসি।

রত্না মাথা তুলিতে পারিল না। নতমুখে সে টেবলের কোণে নিঃশব্দে চেয়ারে বসিয়া রহিল।

মুখ তুলিল অনিল। ধীর কণ্ঠে কহিল,---যদি আমি সে জবাব-দিহি না করি?

বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল,---নিশ্চয় করবে না---জবাব-দিহির যদি কিছু না থাকে! কিন্তু মিষ্টার গোস্বামী, আমি জানতুম, এটা শ্রীবৃন্দাবন নয়। অবশ্য আপনি হলেন গোঁসাইজী।

অনিলের সুগোর মুখ নিমেষে রাঙা হইল। নিগূঢ় ক্রোধে ভিতরটা আগুনে পোড়া লোহার মত তপ্ত হইয়া উঠিল। কষ্টে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরেই সে কহিল,---মিস চ্যাটার্জির মনের সংশয় চলো তো। এবার আর বিবেচনার অসুবিধা হবে না বোধ করি।

তিক্ত কণ্ঠে কল্পনা প্রত্যুত্তর করিল,---না, তা হবে না। এবং সেটা যথাযথ স্থানে, যথাভাবেই হবে। বলিয়া কল্পনা রত্নার দিকে চাহিয়া কুটিল হাস্যে কহিল,---অসময়ে এসে বিঘ্ন উৎপাদন কল্লুম রত্না, আমায় মাপ করো। বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রত্না এতক্ষণ পাষাণ-প্রতিমার মত নিস্পন্দ বসিয়াছিল; তাহার বুদ্ধি জাড়ষ্ট, ক্ষণেকের জন্য সব অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় ক্রোধ লইয়া কল্পনা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল,---সেই দণ্ডে যেন লুপ্ত সম্বিত ফিরিয়া আসিল। পলকে বৃহ্মাণ্ড দর্শনের ন্যায় এক লহমায় তাহার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল,---নিজের নিদারুণ লজ্জাস্কর ছবি। অতি-রুষ্ট কল্পনা এই মুহূর্ত্তে গিয়া গোস্বামি-দম্পতির গোচরীভূত করিবে এমন একটা জঘন্য কুৎসা---যাহা অতিরঞ্জন ও অসত্য হইলেও স্খালন করিতে রত্না কোন মতেই পারিবে না। এবং মিসেস গোস্বামীর ক্রোধের কথা ভাবিতে তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

আততায়ীর হাতে নিস্কৃতি পাইতে মানুষ পলায়নে যেমন সমস্ত বন্ধুর পথই সহজ বোধে ছুটিয়া যায়, সেখানকার প্রতি পদবিক্ষেপে মৃত্যু-যন্ত্রণা সে যেমন মনে আনিতে পারে না, কেবল সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া খুঁজিতে থাকে অবরুদ্ধ প্রাণের মুক্তি, সে মুক্তির বিভীষিকা তখন তাহাকে চঞ্চল করে না, তেমনি করিয়া রত্না উঠিয়া অনিলের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আকুল ক্রন্দনে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,---তুমি যেমন করে পারো, আমায় এই দণ্ডে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! আমি ওদের সামনে বেরুতে পারবো না!

হতভম্বের মত অনিল কহিল,---কি বলছো রত্না?

---না, না, কোন কথা নয়! তুমি যেমন করে পার, আমাকে ঢেকে ফেলো! ওগো তোমার পায়ে পড়ি! না হয় আমায় বন্দুকের গুলীতে মেরে ফেল।

অনিল এতক্ষণ পাষাণ-ক্ষোদিতের মত স্তব্ধ হইয়া রত্নার ক্রন্দন-বিবশা মূর্ত্তির পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়াছিল। সহসা রত্নার শেষ কথায় সুপ্ত আগ্নেয়-গিরির ঘুমভাঙার ন্যায় আকস্মিক প্রবল উত্তেজনায় জাগিয়া উঠিল।

অনিল কহিল,---তাই হবে রত্না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

সনেট

তবু মনে হয় আর লাগে নাক ভালো,
ফিরে যাই, মনে হয় কোনো নিরালায়,
ফিরে যাই শূন্যতায়! এ দিনের আলো
বড় তীব্র, বড় মিথ্যা উন্মত্ত নেশায়।
অমানুষী প্রবৃত্তির ঘৃণ্য পদতলে
আত্মাহুতি দিয়ে যত দাম্ভিক প্রবর,
ভরেছে পৃথিবী শুধু ব্যর্থ কোলাহলে,
খুঁড়েছে মাটিতে নিজ প্রশস্ত কবর।
সব মিথ্যা ভেঙে পড়ে অমোঘ বিধানে,
ইতিহাস সাক্ষ্য রবে ঘৃণ্য দুষ্কৃতির,
আজ শুধু মিথ্যাচার তীব্র বাণ হানে,
সুতীব্র মরণ-বাণে পৃথিবী অস্থির!
কীট সম এ জীবন হয় ধূলিসাৎ,
তবু তবু ক্ষীণ আশা জেগেছে হঠাৎ!

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

উপেক্ষিত

দূর হতে দেখি মোরা নভস্পর্শী সৌধের কিরীট
কারুকার্য্যে মুগ্ধ হই, কিন্তু তার অগণিত ইট---
ভিত্তির সহায় যারা, উন্নতির যথার্থ আশ্রয়,
তারা আমাদের কাছে অবজ্ঞাত অনাখ্যাত রয়।
নাবিকেরা জলধিতে শত শত দ্বীপ প্রবালের
হেরে নিত্য, কিন্তু জানে নাক তারা তাহার জন্মের
ইতিবৃত্ত, কত না প্রবালকীট আপনার প্রাণ
বিসর্জ্জিয়া তাহাদের বারি-শীর্ষে দানিল উত্থান।
দিগ্বিজয়ীর স্তুতি মুক্ত কণ্ঠে মোরা সবে গাহি
শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ের অক্ষয় আসনে দিই স্থান---
আর যারা সৈন্যদল অসীম বীরত্বে দিল প্রাণ
রণক্ষেত্রে অকুণ্ঠিত, তাহাদের পানে নাহি চাহি।
তাই হয়, সর্ব্ব-অগ্রে চোখে পড়ে প্রদীপের আলো---
তৈলের কে খোঁজ রাখে প্রাণ-রস যে তার জোগালো!

মোহাম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড

উত্তর-পশ্চিমে আটলাণ্টিকের বুকে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপটি আমেরিকার তোরণ-স্বরূপ। কানাডা এবং মার্কিণ যুক্তরাজ্যের মাঝখানে যে আটটি প্রদেশ ইজারা গ্রহণ করিয়াছে, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড তাদের অন্যতম। এ দ্বীপটি বৃটিশের অধিকারভুক্ত। যুদ্ধের দায়ে মার্কিণ রাষ্ট্র এ দ্বীপটিকে ইজারা লইয়াছে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড
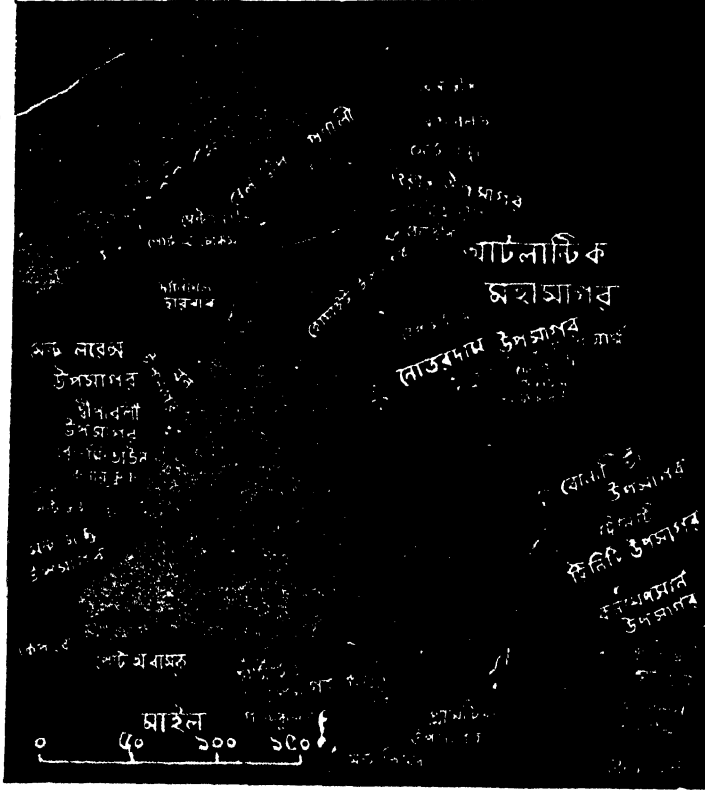
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের বন্দরগুলির অবস্থান নিরাপদ; তার উপর পূর্ব্বাঞ্চলে কস-ক্যাপ নামে যে বন্দর, সে বন্দরে বৃটিশের বিমান-ঘাঁটী বেশ মজবুত। এই সব বন্দর ব্যাপিয়া মার্কিণ বিমান-পোতগুলি চব্বিশ ঘণ্টাকাল অবিরাম আটলাণ্টিকের পাহারা-দারী করিতেছে।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পর্য্যটক জন কাবট সর্ব্বপ্রথম নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। বৃটিশ কমন্-ওয়েল্থ-গুলির মধ্যে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। এখানে কাঠ এবং বিবিধ খনিজ ধাতুর প্রাচুর্য্যের সীমা নাই। নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ড আকারে আয়ার্ল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক বড়—অথচ এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ২৯৫০০০ মাত্র। সর্ব্বোত্তর অংশ ছাড়া অন্য সব জায়গায় জল-বাতাস ভালো—না বেশী গ্রীষ্মের তাপ, না বেশী শীতের দৌরাত্ম্য সহিতে হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ছিল পরাপরি রকমে বৃটিশ কমন্ওয়েল্থ,—তার পর অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ বৃটেনের সঙ্গে সর্ত্ত হইয়াছে, বৃটেন হইতে

সেণ্ট লরেন্স নদী; এ নদী আসিয়া নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের পশ্চিমে সেণ্ট লরেন্স সাগরের বুকে মিশিয়াছে। সেণ্ট লরেন্স নদীর উত্তর তীরে কানাডার প্রসিদ্ধ তিনটি বন্দর—কুইবেক, মন্ট্রিল এবং অটোয়া; দক্ষিণ তীরে মার্কিণ যুক্তরাজ্য। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া সেণ্ট লরেন্স সাগরের মূল্য অপরিসীম।

আজ আমেরিকা হইতে রসদপত্র ও ফৌজ প্রভৃতি পাঠানো চলিতেছে এই সেণ্ট লরেন্স সাগর বহিয়া নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের কোল ঘেঁষিয়া। এ কাজটুকুকে নিরাপদ করিবার জন্য নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণে যে সেণ্ট জন্স্ দ্বীপ, সেই দ্বীপে মার্কিণ রাষ্ট্র দুর্দ্ধর্ষ সমরঘাঁটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইটিই আটলাণ্টিকের গায়ে মার্কিণের প্রথম সমর-ঘাঁটী। গ্রেট বৃটেনের কাছ হইতে মার্কিণ রাষ্ট্র শত্রু-প্রতিরোধকল্পে

আটলাণ্টিক সাগর-বক্ষ

লবণ-মাখানো কড্ মাছ রৌদ্রে শুকানো হয়
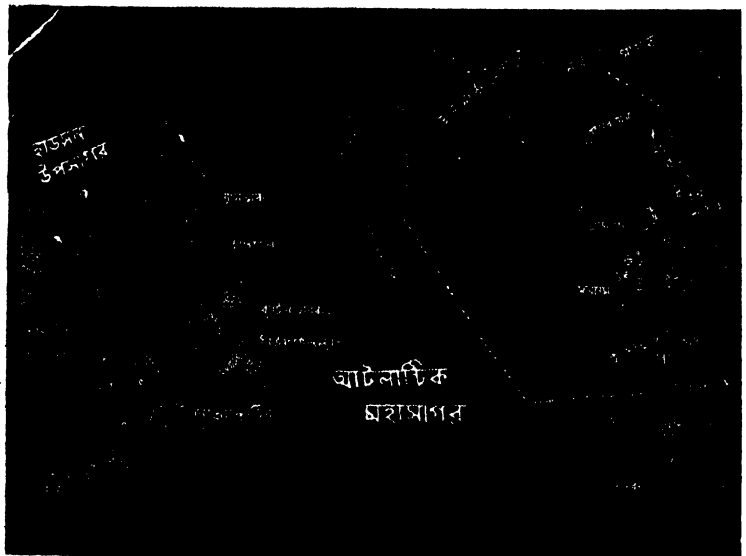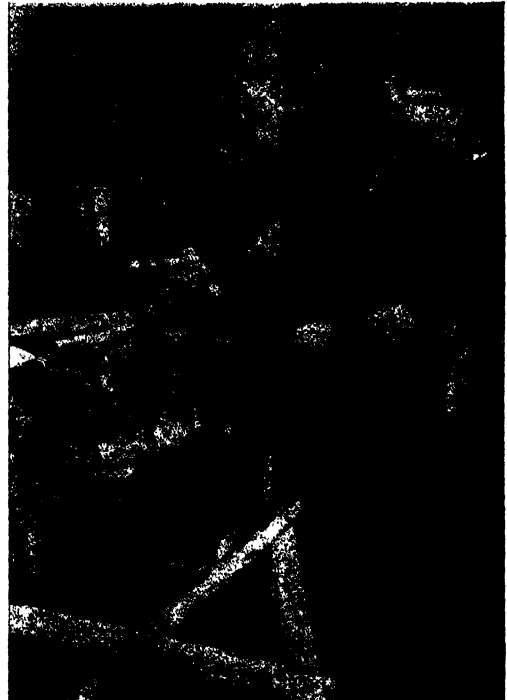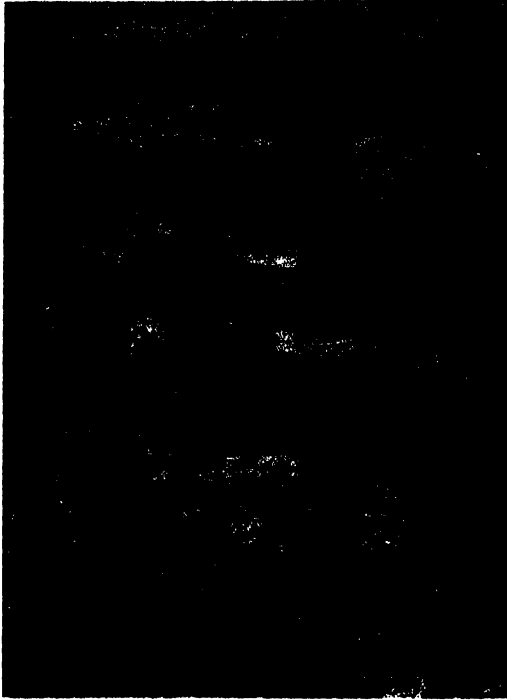
পিপার মধ্যে মাছের মুড়া—মুড়ির খায়ে মুড়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে

নিযুক্ত এক জন গবর্ণর আসিয়া নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিবেন। এখনো পর্য্যন্ত সেই সর্ত্ত বাহাল আছে।

খনিজ ধাতসমৃদ্ধ দ্বীপ হইলেও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কড্ মাছের ব্যবসায়ে—তার উপর ক'বৎসর যাবৎ আমেরিকা হইতে য়ুরোপে বিমান-যাত্রার সহায়তা-কল্পে নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ড হইয়াছে প্রধানতম ষ্টেশন। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড-মারফৎ বিমানপোতে গ্রীনল্যাণ্ড ৮৮০ মাইল, আইসল্যাণ্ড ১৬৮০, গ্লাসগো ২০৫০, আজোর্স দ্বীপ ১৩৫০ মাইল মাত্র।

কাগজের জন্য জড়ো-করা কাঠ

কড্-মাছ-চালানের ষ্টিমার

বিদেশী সেনার প্রমোদ-সঙ্গিনী

তুষার-গিরি
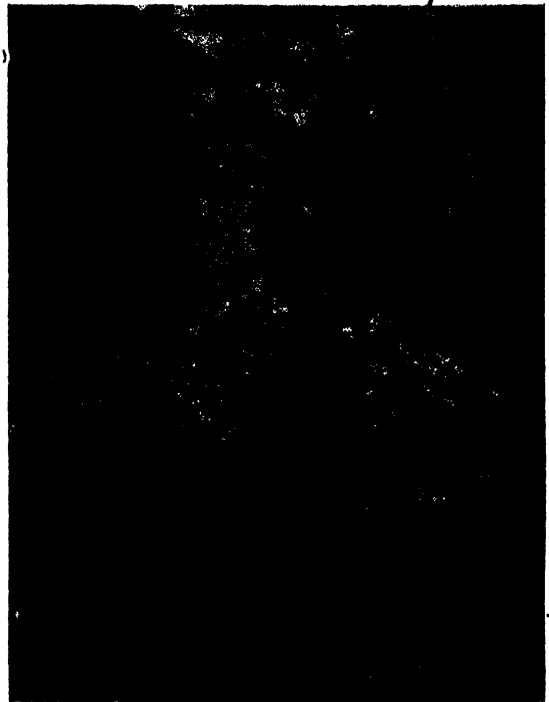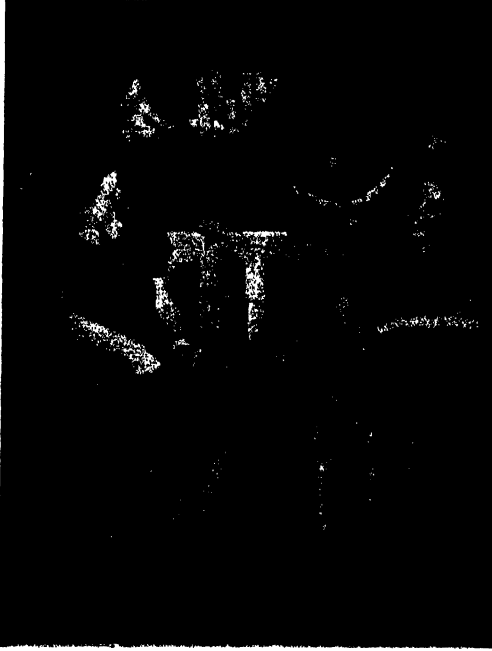
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের চারি দিকে সাগর-জলে কড-মাছ মেলে অফরন্ত পরিমাণে। কডের প্রাচুর্য্যহেতু নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের অধিবাসীরা

বাড়ার গৃহিণী

[মা]ছ বলিলে বোঝে শুধু এই কড। অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য [যা]-কিছু, তা এই কড লইয়া।
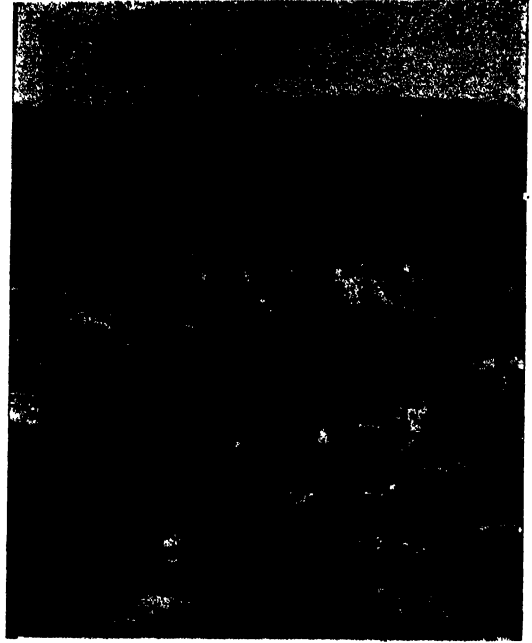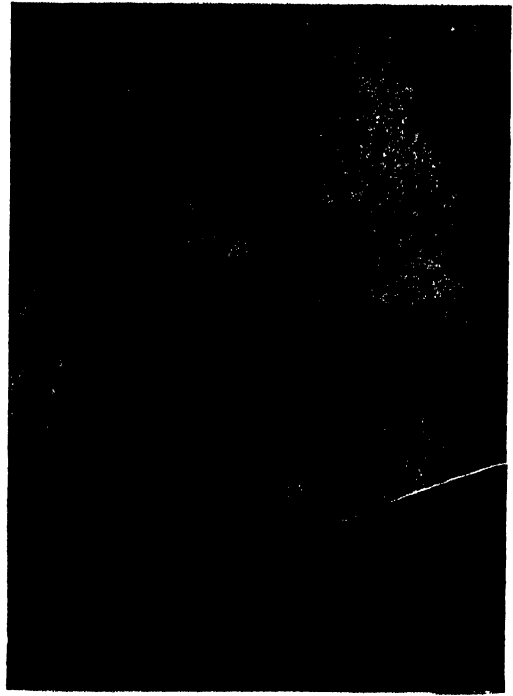
এবার যদ্ধের হাঙ্গামায় অধিবাসীদের বিপক্ষ-পতিরোধে সমর্থ করা হইতেছে। কড মাছের ব্যবসা ছাড়া আর একটি বড় ব্যবসা

সমুদ্র-কূল হইতে জমির সার-সংগ্রহ

গড়িয়া উঠিয়াছে---কর্ণার ব্রুক এবং গ্রাণ্ড ফল্‌শে কাগজের মিল-প্রতিষ্ঠায়। কাঠ হইতে এ দুটি মিলে অজস্র পরিমাণ কাগজ তৈয়ারী
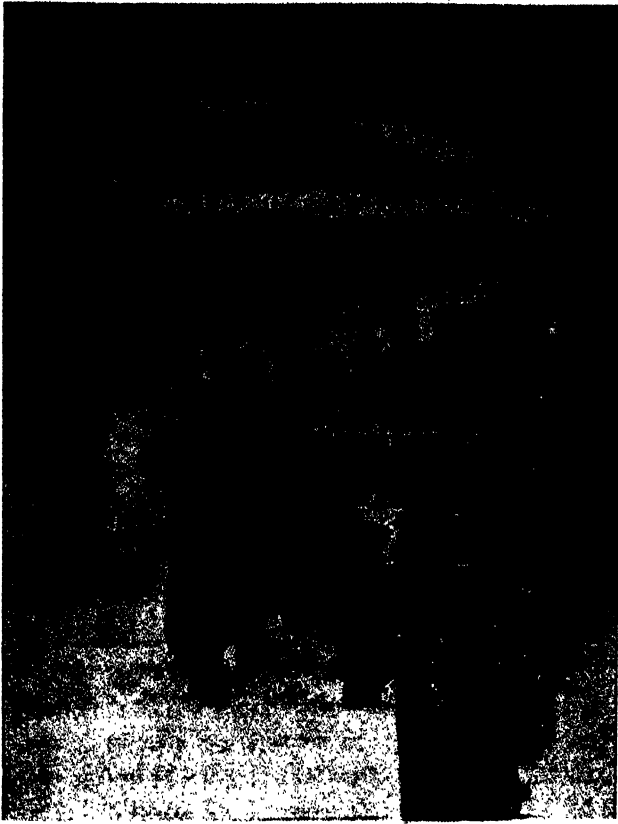
কানাডা-বাহিনার প্যারেড
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের সম্মুখে

কড-মাছ-ধরা জাল
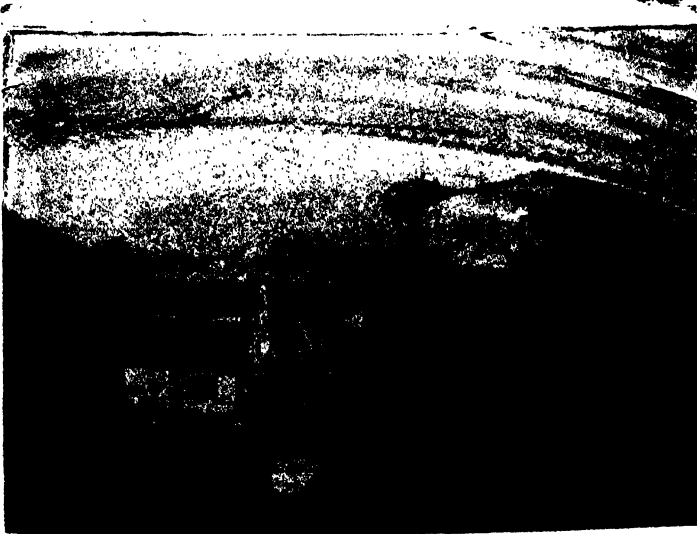
দেশী বাসগৃহ—পাহাড়ের গায়ে

হইতেছে। তাছাড়া বুচানে আছে সীসা এবং জিঙ্কের কারখানা; এবং বেল দ্বীপে আছে লোহার বিরাট খনি।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড গিরিসঙ্কুল দ্বীপ—এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক বাস করে সমুদ্র-উপকূল-ভাগে। দ্বীপটির সর্ব্বত্র এত অন্তরীপ, উপসাগর, যোজক-প্রণালী ফোর্ড এবং ছোটখাট দ্বীপ আছে—দ্বীপের সংখ্যা অযুত—যে, এক জায়গা হইতে অপর-জায়গায় যাইতে নৌকা ও ডিঙ্গিই একমাত্র বাহন। পাহাড়ের প্রাচুর্য্য-হেতু নদীর বুকে পাড়ি জমানোতে এ্যাড-ভেঞ্চার ঘটে সংখ্যাতীত।

আদি যুগে এখানকার মাছ ধরিতে নানা দেশীয় বণিকের শুভাগমন ঘটিত। ইংরেজ, ফরাসী, স্পানিশ, পোর্টুগীজের সংখ্যা ছিল সমধিক। এত জাতির আগমনের ফলে নাম-না-জানা প্রদেশগুলিকে সকলে নিজেদের খেয়াল মত নামে প্রখ্যাত করিয়া গিয়াছে। কয়েকটি জায়গায় বিচিত্র নাম বেশ উপভোগ্য। যেমন—হার্ট স কন্টেণ্ট (মনের আরাম) —গুড্ল্ কাম্ বাই (কুচিৎ-কখনো আসা); বাট্স্ আর্ম (বাহু); গো-এ্যা-ডাউন (আমাকে চর্ব্ব করো) ফর্চুন্ (সৌভাগ্য); কাম্ বাই চান্স (হঠাৎ আসা) প্রভৃতি।

১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে ইংরেজ গবর্ণর ছিলেন জন মেশন। মেশন কবি। তিনিই প্রথমে দ্বীপটির সর্ব্বত্র ঘুরিয়া

বরফ-জমা সাগর-বক্ষে শীল-মাছ-ধরা জাহাজ

সে জন্য সকলে সমুদ্র-তীর ঘেঁষিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। অসংখ্য পাহাড় আছে বলিয়া পাশাপাশি বাসের সুবিধা ঘটে নাই---বিচ্ছিন্ন ভাবে সকলে বাস করিতেছে। তাহার ফলে এ দ্বীপে পল্লী বা গ্রাম দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পতিবেশীর সহিত প্রীতিসদ্ভাব নাই।---প্রায়ই
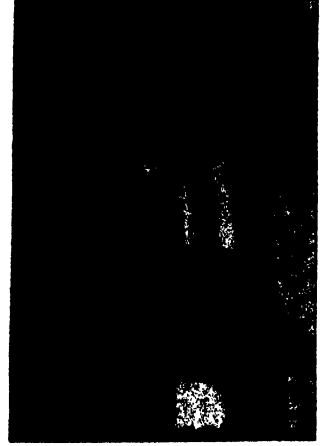
এ দ্বীপের কুকুর

অধিবাসীদের মধ্যে মাছ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডার সীমা নাই---চরি এবং খুনোখুনির সে-কালে তাই বিরাম ছিল না। এখন বৃটিশ গবর্ণরের শাসনাধীনে চরি, খুনোখনির মাত্রা কমিয়াছে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের প্রথম নিখুঁৎ মানচিত্র পস্তুত করেন। দ্বীপটি ছিল তাঁর প্রাণাভিরাম ---কিন্তু তাঁর বিলাসিনী পত্নী লণ্ডনের আমোদ-প্রমোদের জন্য এমন অধীর হইয়া উঠিলেন যে, স্ত্রীর আবদারে তিনি চাকরী ছাড়িয়া লণ্ডনে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া তিনি নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডকে ভুলিতে পারেন নাই। এ দ্বীপের উদ্দেশে কবিতা লিখিয়াছিলেন:

তোমরা---যারা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে বাস করো, জানো কি কত জন্মের সৌভাগ্যে ও দ্বীপে তোমরা জন্মিয়াছ। তোমাদের কাণে সমুদ্র গান শুনাইতেছে---পাহাড়ে পর্ব্বতে কি মাধুরী তোমরা দেখিতেছ! তোমাদের জীবনে জটিলতা নাই, দ্বন্দ্ব নাই। তোমরাই জগতে সুখী। এ কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাঠুরিয়া

১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু ইংরেজ ব্যবসায়ী বাণিজ্য করিতে আসিয়া এ দ্বীপে বসতি স্থাপনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা আসিয়া এখানে কৃষির পুনর্বর্তন করেন, পশুপালনে মনঃসংযোগ করেন। ইহার পূর্ব্বে এখানে চাষের ব্যবস্থা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা নির্ভর করিতেছে মাছের উপর---

যে ক'ঘর ইংরেজ-পরিবার বাস করে, গোরু, ছাগল, ভেড়া, মুর্গী পভৃতির অধিকার সম্বন্ধে তারা বেশ হুঁশিয়ার। আদিম পরিবারে গোরু, ছাগল পভৃতির স্বত্ব এখনো সাব্যস্ত হয় নাই। গোরু, ছাগল প্রভৃতি ইতঃস্ততঃ ধরিয়া বেড়ায়---যে পায়,, সে তার প্রয়োজন মত তাহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

অধিবাসীরা ঘর বাঁধে পাহাড়ের গায়ে—পাথর কুড়াইয়া জড়ো করিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া দেওয়াল এবং ছাদ রচিত হয়—দেবদারু কাঠ কাটিয়া সেই কাঠে কোনো মতে জানালা-দ্বার গড়িয়া তোলে। এখানে ফুল ফোটে অজস্র জাতের—অধিবাসীরা ফুলের আদর করে। বাড়ীর সঙ্গে অনেকে ছোটখাট বাগান তৈয়ারী করে।
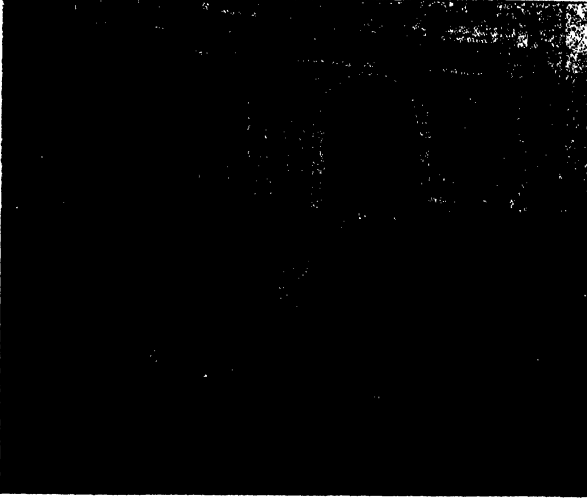
বগী-গাড়ী

দু-তিন বছর পূর্ব্বে এক জন মার্কিণ পর্য্যটক নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দেখিয়া আসিয়া দ্বীপটির যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন :

দক্ষিণাঞ্চলে বেবুল্‌স। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সবই প্রায় আইরিশ। শুনিলাম, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে হাজার হাজার আইরিশ-পরিবার

নৌকার মাছ এই ক্রেনে উঠিবে
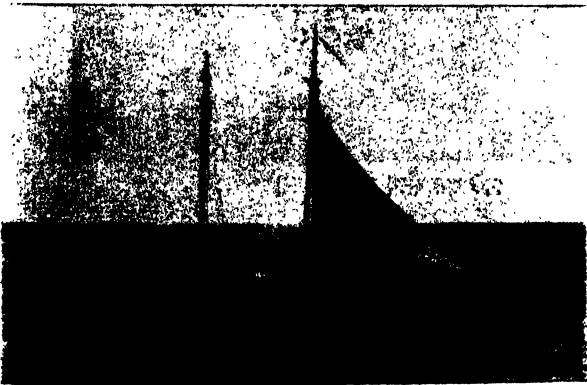
আসিয়া নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে বসতি স্থাপনা করে। তাহারা অনেকখানি জমি অধিকারভুক্ত করে। এ সব জমিতে তারা চাষ সুরু করে—আলু, গাজর, বাঁধা কপি, বীট এবং ধান—এগুলির ফসল তাহাদের যত্নেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ-সব ফসল ফলে যেমন প্রচুর, তেমনি স্বাদেও চমৎকার। তবে জমি সর্ব্বত্র উর্ব্বর নয়। এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানে তৃণগুল্মের চিহ্ন নাই। সে সব গামের নর-নারীর নির্ভর মাছের উপর। কড মাছ বেচিয়া, বাঁধা দিয়া তারা আহার্য্যাদি সংগ্রহ করে। যার ভাগ্যে বেশী মাছ মেলে না, অনশনে তার দিন কাটে।

শীতের দিনে বরফে দেশ ঢাকিয়া যায়—সে জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ রাখিতে হয়। এ সময়টায় সকলকে নির্ভর রাখিতে হয় গ্রীষ্মে ধরা কড মাছের উপর। মাছ ধরিয়া শুকাইয়া মাছে মশলা

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড-গামী মার্কিণ ফৌজ
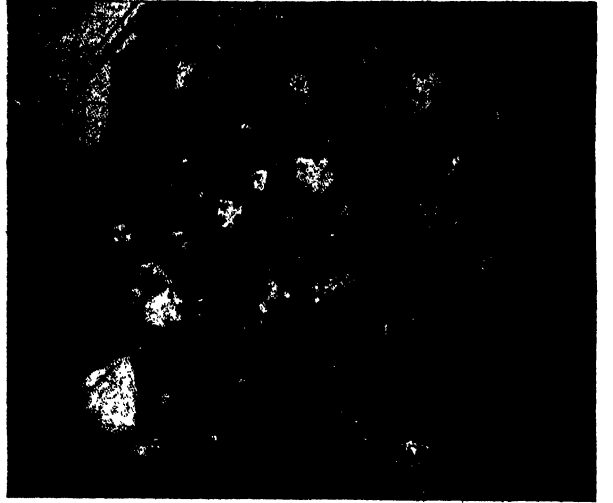
মাখিয়া রাখা হয়—মশলা-মাখানো সেই শুঁটকি কড মাছ শীতের দিনে প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। তবে শীতের দিনে খরগোশ ও কুক্কুট-জাতীয় পক্ষী (grouse) প্রচুর মেলে—সে মাংসে উদরপূর্ত্তি করিতে হয়।

সার-সার মাছ-ধরা নৌকা

অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য—ভাত নয়, রুটি নয়—মাছ। তার সঙ্গে রুটি এবং কখনো মেলে মাখন, শূকর-মাংস, এবং যে-সব জায়গায় আলু, বীট প্রভৃতির ফসল ফলে, সেই সব ফসল। কয়লার দাম অনেক বেশী—এত বেশী যে খুব ধনীর ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে কয়লার কথা কেহ কল্পনা করে না। শীতের দিনে রান্না-ঘরটিতে আসিয়া সকলে আশ্রয় লয়।

যে মাসে সামন মাছ ধরিবার জন্য প্রচণ্ড সাড়া জাগে। সামন-মাছ ধরিবার জন্য যে-জাল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। জালগুলি হয় খুব লম্বা—জলে প্রায় বিশ ফুট নীচে পর্য্যন্ত এ জাল দিয়া

পড়ে। এবং সমগ্র দ্বীপে মে-মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত যে-পরিমাণ সামন-মাছ ধরা হয়, তার ওজন দাঁড়ায় প্রায় বাষট্টি হাজার পাঁচশো মণ। মাছ যেমন ধরা হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-মাছ বরফে ঢাকিয়া বৃটেনে, কানাডায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চালান দেওয়া হয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে কড মাছের পাদর্ভাব। ব্যবসায়ীর দল আহার, নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্রি কড মাছ ধরায় ব্যাপৃত থাকে। এ ব্যাপারে তখন সমারোহ বাধে। আমাদের দেশে যেমন কোনো বছর ইলিশ মাছ প্রচুর মেলে, কোনো বছর বা ইলিশ মেলে কম, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে তেমনি কোনো কোনো বছর কড-মাছ মেলে কম। তেমন ঘটিলে ব্যবসায়ী মহলে কান্নাকাটি পড়ে। কড মাছকে ইহারা বলে লক্ষ্মী।

কড-মাছ ধরিবার জাল সামনের জালের মত নয়। এ জালগুলি হয় লম্বে ৯০ ফুট, উচ্চতায় ৮০ ফুট—চারি দিক তারের জাল দিয়া বেড়ার মত ঘিরিয়া সেই ঘেরের মধ্যে এ জাল আটকাইয়া দেওয়া হয়। তাড়া দিলে লাফ দিয়া বড় বড় কড মাছ ঐ ঘেরা-জালে আসিয়া পড়ে—পড়িবামাত্র বন্দী হয়। কূল হইতে প্রায় ২৫০ ফুট পর্য্যন্ত সাগরের বুকে এ জাল ফেলা হয়। মাছ তাড়াইবার জন্য সাত-দাঁড়ের নৌকা বহিয়া বহু লোক সাগরবক্ষে পাড়ি দিতে বাহির হয়। এক একটি ঘেরা-জালে মাছ ওঠে প্রায় ১০০।১২৫ মণ ওজনের।

কড-মাছ ধরা জাল তৈয়ারী করিতে খরচ পড়ে প্রায় দু-তিনশো টাকা। জালের দড়ি ধীবরেরা ঘরে বসিয়া তৈরী করে। দড়ি খুব মজবুত। নির্ম্মাণে বেশ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। জাল ফেলা হয় দিনে দু'বার। প্রথম ক্ষেপ ফেলা হয় খুব ভোরে, দ্বিতীয় ক্ষেপ ঠিক সূর্য্যাস্ত-কালে। এখন এ যুগে মোটর-বোটে চড়িয়া ব্যবসায়ীরা গিয়া জাল হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনে।

মাছ আনিয়া সে-মাছের রীতিমত পরিচর্য্যা চলে। প্রথমে মাছগুলিকে ভাল জলে ধুইয়া সাফ করা হয়, তার পর আঁশ ও ছাল ছাড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে মাছের মাথা কাটিয়া ফেলা। মাথা কাটিবার পর মাঝখানকার দীর্ঘ কাঁটা ছাড়ানো হয়। তার পর আর একবার ভালো জলে মাছগুলাকে ধুইয়া তাহাদের গায়ে লবণ মাখাইয়া ডাঁই করিয়া সংরক্ষিত হয়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সমুদ্রতীরে আসিলে দেখা যাইবে চারি দিকে স্তূপাকার মাছ জড়ো করা রহিয়াছে। রৌদ্রে মাছ শুষ্ক হইলে প্যাক করিয়া দেশবিদেশে সে সব মাছ চালান যায়।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের বিরাটদেহী কুকুর সৌখীন-সমাজের আদরের জীব। এ কুকুর মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অনুচর। প্রভুর জন্য নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড-জাতের কুকুর প্রাণের মায়া রাখে না—পালিত পশু-পক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যেও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের পটুতা অসাধারণ। এ কুকুরের পূর্ব্বপুরুষ ছিল পিরেনিস্-পর্ব্বতবাসী 'শীপ্-ডগ'—সেখান হইতে প্রাচীন বাস্ক জাতীয় ধীবরের দল না কি এ-কুকরকে সর্ব্বপ্রথম নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে আনিয়াছিল। এ দ্বীপের জল-বাতাসে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের প্রকৃতিতে অনেকখানি বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হইয়াছে।

এখানে পেট্রোলের অসদ্ভাব—সে জন্য বগী-গাড়ীর সমধিক

সেণ্ট জন দ্বীপে কড-মাছ ধরা
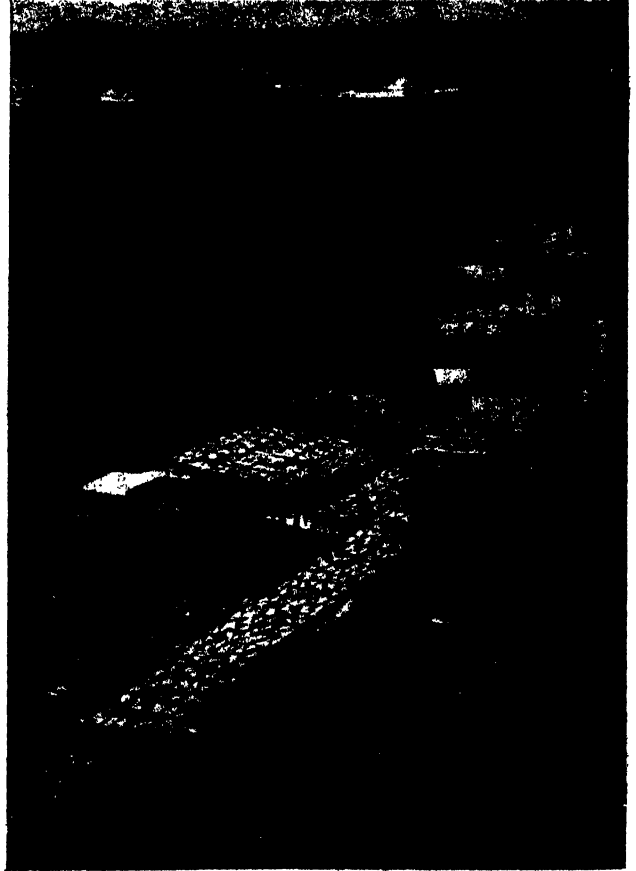
প্রচলন এ যুগে এখনো সমধিক। সম্প্রতি যুদ্ধের এ দুর্যোগে দেশের আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। ক্যানাডিয়ান এবং মার্কিণ ফৌজের ভিড়ে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড আজ পরিপূর্ণ। দেশের নরনারী সে ফৌজের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিতেছে—সমরায়োজনে তারাও আজ যথাশক্তি সহযোগিতা সম্পাদন করিতেছে। এত যুগের ব্যবসায় সম্পর্কে যে মিলন ঘটে নাই, আজ বিপত্তি-মোচনের প্রয়াস সে মিলনকে যেমন নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে, অর্থসমৃদ্ধির দিকেও সেই সঙ্গে দেশের নরনারীর চেতনা জাগাইয়াছে। সে চেতনার ফলে যুদ্ধোত্তরকালে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সভ্য জগতের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইবে, এমন আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

গা ভলা

কথামালায় গল্প আছে, ঘোড়া এক দিন সখেদে মন্তব্য করিয়াছিল, আমার দলন-মলন খুবই চলে, আহারের মাত্রাটা যদি সেই রকম পাইতাম, তাহা হইলে চেহারায় শুধু ছাঁদ খুলিত না, গায়ে জোর পাইতাম বিলক্ষণ। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া কথাটা খুবই সত্য। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আহারে-বিহারে সংযম এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততখানি প্রয়োজন অঙ্গের দলন-মলনের। এ যাবৎ ব্যায়াম-সম্বন্ধে আমরা যে সব বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছি, সে সব ব্যবস্থায় মেদক্ষয় বা বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গঠন পরিপূর্ণ হয়; আজ আমরা দলন-মলনের সম্বন্ধে যে কথা বলিতেছি, সে দলন-মলনে মুখ-চোখ, গ্রীবাদেশ, কাঁধ, বুক---এ সবের গঠন হইবে পরিপুষ্ট নিটোল---কোথাও টোল-টাল বা খোল-খাল থাকিবে না। দলন-মলনে গায়ের চামড়া থাকিবে মসৃণ কোমল এবং বর্ণদীপ্ত।
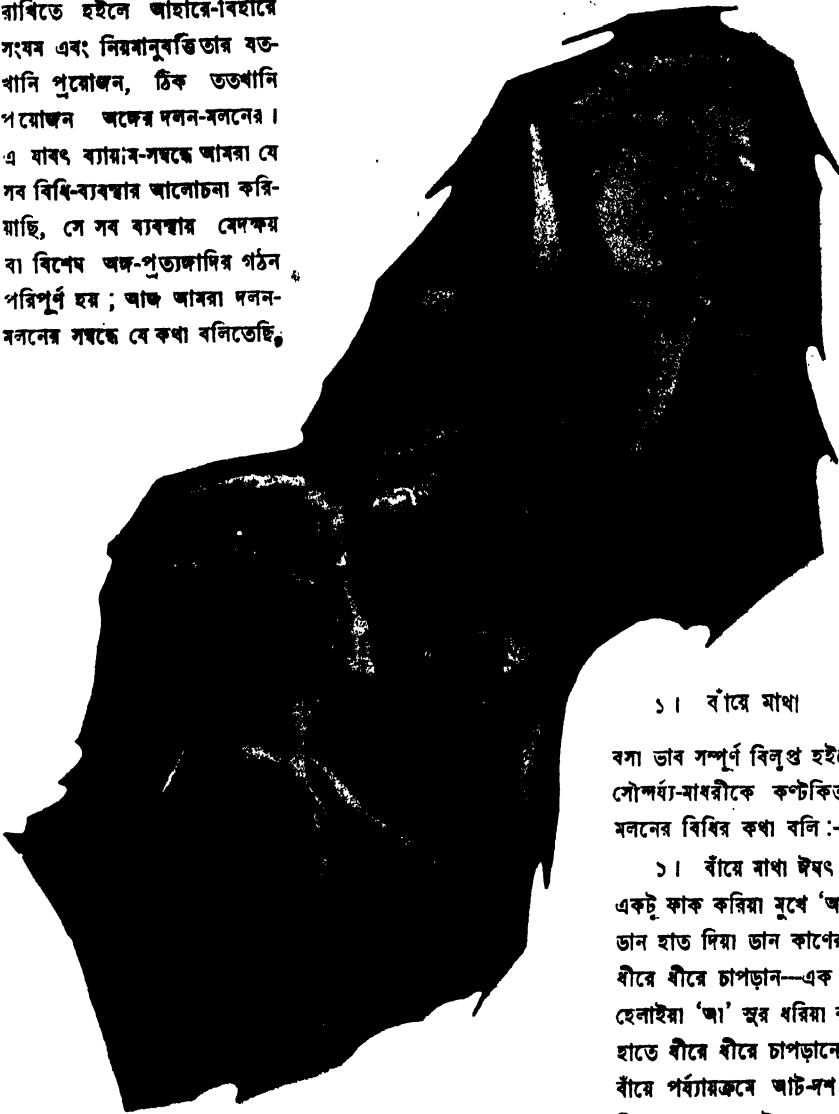
গায়ের চামড়া জানিবেন স্বাস্থ্যের দর্পণ। (It reflects the condition of the system.) স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে গায়ের বর্ণে দীপ্তি এবং শ্রী ফুটিবে---অস্বাস্থ্যে গায়ের বর্ণে মলিন ছায়াপাত ঘটে। সৌন্দর্য্য-সুষমায় যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা। আমাদের দেহে অজস্র লোমকূপ---সেগুলি দিয়া দেহাভ্যন্তর-ভাগে নির্ম্মল বাতাস গিয়া ঢোকে এবং দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ ঘর্ম্মধারায় বিনির্গত হয়। বাহিরের ধূলায়-ময়লায় এ লোমকূপ আবদ্ধ থাকিলে ভিতরকার ক্লেদাদি যেমন বহির্গত হইবার পথ পায় না, দেহ মধ্যে তেমনি বাহিরের নির্ম্মল বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ঘটিলে রূপসীর চম্পক-বর্ণ মলিন হইবে---স্বাস্থ্যহানিবশতঃ নানা রোগ-উপসর্গের সঞ্চার হইবে। এ জন্য নিত্য স্নান প্রয়োজন।

গাত্র-মর্দ্দনে দেহে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ অব্যাহত থাকে; নিত্য গাত্র-মর্দ্দন করিলে দেহের রক্ত- চলাচল-ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হইবে এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে সৌন্দর্য্যশ্রীতে বঞ্চিত হইবেন না---এ-কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রত্যেকটি অঙ্গের দলন-মলন প্রয়োজন। নিত্য-নিয়মিত অঙ্গ-মর্দ্দনে দেহ পরিপূর্ণ ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে---ঘাড়ে কাঁধে কোথাও টোল বা চিপি-চাপা থাকিবে না---দেহের কোল-কুঁজা বা চোখের কোল-বসা ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে। গায়ে তিল-আঁচিল বা ব্রণ জন্মিয়া সৌন্দর্য্য-মাধুরীকে কণ্টকিত করিবে না। নিত্য-নিয়মিত দলন-মলনের বিধির কথা বলি :---

১। বাঁয়ে মাথা

২। মুখ সরান

১। বাঁয়ে মাথা ঈষৎ হেলাইয়া ১ নং ছবির ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটি একটু ফাক করিয়া মুখে 'আ' বলিয়া অবিরাম সুর ধরুন---সেই সঙ্গে ডান হাত দিয়া ডান কাণের উপর হইতে চিবুকের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে চাপড়ান---এক মিনিট-কাল। তার পর ডান দিকে মাথা হেলাইয়া 'আ' সুর ধরিয়া বাঁ কাণ হইতে চিবুকের প্রান্ত পর্য্যন্ত বাঁ হাতে ধীরে ধীরে চাপড়ানো---এক মিনিট। এমনি ভাবে ডাহিনে-বাঁয়ে পর্য্যায়ক্রমে আট-দশ বার চাপড়াইতে হইবে। এ ব্যায়ামে চিবুকের গড়ন হইবে সুকুমার এবং পরন্ত।

২। কনুইয়ের কাছে বাঁ হাত দুমড়াইয়া আঙুলগুলিকে ২ নং ছবির ভঙ্গীতে অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া ধরুন। ঘাড় সিধা থাকিবে। আঙুলগুলির ডগায় সঙ্গে চিবুক এক-লেভেলে রাখিয়া সমগ্র মুখখানিকে ধীরে ধীরে আঙুলের দিক হইতে পিছন দিকে সরাইবেন---যত দূর সরাইতে পারেন। পরক্ষণে মুখ আবার আঙুলের দিকে আগাইয়া আনিতে হইবে। হাত ও আঙুলগুলি নড়িবে না---আঙুলগুলিকে এমন স্থির অবিচল রাখার উদ্দেশ্য---মুখ সরানোর মাপ নিখুঁত এবং ঘাড় সিধা থাকিবে। এ ব্যায়ামে ঘাড়ের

গড়ন সুকুমার এবং ঘাড় সবল থাকিবে। মুখ নিটোল কোমল হইবে।

৩। দুই হাত দিয়া দুই চোখ ঢাকুন। ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাতের দুই অঙ্গুষ্ঠ থাকিবে ভ্রূর নীচে নাকের উপর-প্রান্ত চাপিয়া---অন্য আঙুলগুলি দিয়া ভ্রূ-ভাগ চাপিবেন---বেশ জোরে ভ্রূ চাপিয়া চক্ষু-গোলক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারি দিকে ট্যারচা-চোখে চাহিবেন। পাঁচ মিনিট এ ব্যায়াম করা চাই। এ-ব্যায়ামে 'বসা' চোখ নিখুঁত হইবে---চোখের কোল উঠিবে---চোখ দুটি হইবে শ্রীসম্পন্ন।

৪। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যম অঙ্গুলি দিয়া ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে উপরের ঠোঁট ধরিয়া মাঝের দিকে টানিয়া ধীরে ধীরে চাপুন। নাসিকার নীচে উপর-ঠোঁটের দুই প্রান্ত এ-চাপে যেন রীতিমত বর্দ্ধিত হয়। এমনি ভাবে ঠোঁট টানিয়া চাপ দিবেন পায় পাঁচ মিনিট---বিরামবিহীন ভাবে। এ-ব্যায়ামে ঠোঁট পাৎলা ও সুশ্রী থাকিবে।

৩। দু'চোখে আঙুল

৫। এ বার ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে তর্জনী দিয়া উপরের ঠোঁট বেশ জোরে চাপিয়া ধরুন, তার পর বাঁশীতে ফুঁ দিবার পদ্ধতিতে ঠোঁট চাপিয়া দুই গাল ফুলাইবেন। গাল ফুলাইয়া তার পর ঠোঁটে আঙুল চাপিয়া রাখিয়াই ধীরে ধীরে মুখের মধ্যকার বাতাস ফুঁ দিয়া মুখ-নিঃসৃত করুন। এ-ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৪। ঠোঁট টানিয়া

৫। ঠোঁটে আঙুল চাপিয়া

এ-ব্যায়ামে দুই গাল নিটোল সুকুমার হইবে।

লৌকিকতা

মজুমদার-গৃহিণী বলছিলেন,---মাঘ মাস এলো, তার পর ফাল্গুন,---ক'জন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী বিয়ের ধুম,---একেবারে শিউরে রয়েছি। সেকালে বিয়ে-পৈতে-ভাতের নিমন্ত্রণে লৌকিকতার যে-মাত্রা বরাদ্দ ছিল, তা দিতে গায়ে লাগতো না। গায়ে-হলুদের তত্ত্বে একখান ধুতি কিম্বা শাড়ী, সেই সঙ্গে বড়-জোর দু' টাকার খাবার,---দিতে যেমন গায়ে লাগতো না---তেমনি যেখানে দেওয়া হতো, সেখানেও এ দেওয়ার আদর ছিল। এখন পনেরো-ষোল টাকার ধুতি-শাড়ীতে লৌকিকতা সারতে গেলে মান-মর্য্যাদা নষ্ট হয়। নেমন্তন্ন গিয়ে মনে হয় যেন চোর হয়ে আছি। আত্মীয়-বন্ধুর ছেলেমেয়ের বিয়ে হচ্ছে শুনলে এখন আনন্দের চেয়ে আতঙ্ক হয়---সত্যি।

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। সেদিন দেখলুম, এক বান্ধবীর মেয়ের বিয়েয় নেমন্তন্ন গিয়ে—ভদ্র সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-ঘর,—ধনী বন্ধু এবং কটম্বেরা ত্রিশ-বত্রিশ টাকা থেকে সুরু করে' একশো-দেড়শো টাকা দামের কাণের দুল, পেণ্ডাণ্ট, ব্রোশপিন—এমনি নানান্ জিনিষ দিলেন। দেবার পর তাঁদের মুখে স্নেহাস্পদকে জিনিষ দেবার আনন্দের বদলে দানের যে অহঙ্কার-ভাব ফুটতে দেখেছি, তা ভোলবার নয়। আমি সামান্য মানুষ—পনেরো টাকা দামের একখানি শাড়ী দিয়েছিলুম—মহার্ঘ্য দানের পাশে আমার দেওয়া শাড়ীখানি নিজের দীনতায় মলিন হয়ে পড়ে ছিল। দামী উপহারের মধ্য থেকে সেখানা কেউ নেড়ে দেখলেন না।

দানের মাত্রা বুঝে নিমন্ত্রিতাদের আদর-অভ্যর্থনায় যে অনেকখানি তফাৎ করা হয়, সেইটেই সব চেয়ে আক্ষেপের কথা। ও-বিয়েয় যিনি মুক্তোর আংটি দিয়েছিলেন, আমাকে সামান্য শাড়ী দিতে দেখে তিনি আমার সঙ্গে ভালো করে মিশলেনই না। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা।

মনে দুঃখ হয়নি তত, যত হয়েছিল লজ্জাবোধ। ধনের অহঙ্কারে হৃদয়কে যাঁরা হারিয়ে বসেন, দিতে-পারায় যে সত্যকার আনন্দ, সে আনন্দ কি তাঁরা পান।

পেতে পারেন না। কারণ মুক্তোর আংটি দেবার পর তিনি যদি দেখেন, আর এক জন দিলেন মুক্তোর মানতাসা, তাহলে তাঁর মনে রিষের বাতি না জ্বলে থাকতে পারে না!

বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে এই বণিকবৃত্তি দিনে-দিনে যে-রকম প্রসার লাভ করছে, তা দেখে ভয় হয়,—ছেলেমেয়ের বিবাহ-সংবাদ দিলে আত্মীয়-বন্ধুরা আর খুশী হতে পারবেন না। ট্যাঁকে টান পড়লে মনকে প্রসন্ন রাখা কঠিন এবং অপ্রসন্ন মন নিয়ে শুভানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া খুব যে বাঞ্ছনীয়,—এ-কথা বোধ হয় কেউ স্বীকার করবেন না।

এ-সব অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-পত্রের তলায় ছোট ফুটনোটিক অক্ষরে অনেকে জানান্ দেন, "লৌকিকতা-গ্রহণে অক্ষম"। এ ফুটনোটে বিনয়ের চেয়ে অহঙ্কারই বেশী প্রকাশ পায়—তা ঐ লৌকিকতা-গ্রহণের অক্ষমতা যতখানি বিনীত ভাষা-বন্ধেই বেঁধে দিন না কেন। স্নেহাস্পদদের বিয়ে-পৈতের কাজে মন সামর্থ্যমত কিছু দিতে চায়—আপনা থেকে। কাজেই মনের সে-বাসনার উপর ও-নিষেধ—ঘাড় ধরে বার করে দেওয়ার মত অপমানজনক!

আমার কথা, নিষেধ নয়, তবে লৌকিকতা রক্ষা-ব্যাপারে বড়মানুষির অহঙ্কার না প্রকাশ পায়, এ জন্য মামলি-প্রথায় সেই ধুতী শাড়ীর পনঃপ্রবর্ত্তন উচিত। দামী উপঢৌকন যাঁরা দিতে চান, তাঁরা সে-উপঢৌকন না হয় নেপথ্যান্তরালে দেবেন। নেপথ্যের এ দান গ্রহীতা শিরোধার্য্য করবেন, নিশ্চয়—এবং এ-দানে স্নেহ ও অর্থ-সামর্থ্যও প্রবল রকমে প্রচার হবে—মাঝে থেকে লাভ হবে আমাদের মতো গৃহস্থদের—নিমন্ত্রণের আসরে স্নেহপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কম-দামী উপঢৌকনের লজ্জা-সঙ্কোচ থেকে আমরা রক্ষা পাবো।

শ্রীইন্দিরা দেবী

বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে ধুতিশাড়ী দিবার যে সনাতন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, সে প্রথায় সার্থকতা ছিল। বিবাহের পরে গামের মেয়ে অন্য গ্রামে বধূ হইয়া চলিয়া যাইবে—তাহার জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে লৌকিকতা-দানে যে স্নেহ প্রকাশ পাইত, সে স্নেহ অমূল্য—সে স্নেহের স্মৃতি অমূল্য। দানের অহমিকা আজ সেই সরল-সহজ স্নেহের আসন অধিকার করিয়া বসিতেছে, কাজেই লৌকিকতা আজ নিগ্রহের সামিল—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বসুমতী-সম্পাদক।

অদৃষ্ট দেবতা

শতাব্দীর পারাবারে আশার তরণী-হারা বিপ্রলব্ধ নর,
অদৃষ্ট-দেবতা!
আকাশে মুমূর্ষু রবি, হতাশ্বাস চারি দিকে, উর্ম্মিদল গর্জ্জে নিরন্তর।
দৃষ্টির নেপথ্যে কোথা রহস্যেরা রচিতেছে ঘূর্ণাবর্ত্ত কুটিল মন্থর!
বিমানের হানাহানি, কুয়াশায় শুভ চিন্তা বিভীষিকাময়,
শঙ্খচিল ওড়ে আর সাম্প্রতিক পৃথিবীর রক্তাক্ত হৃদয়।
বোমার গর্জ্জন-ধ্বনি, ত্রাস গণি যুগতটে স্তম্ভিত গোধূলি,
অদৃষ্ট-দেবতা!

অবলুপ্ত আলো-রেখা, জন্ম-সূচনার বুকে অন্তর্হিত বীজ-বিন্দুগুলি;
জীবন-ধারার গতি মৃত্তিকার বহ্নি-গর্ভে মরণের চলাচল ভুলি।
সমুদ্রের নীড় হতে এলো যত দল বেঁধে মারাত্মক প্রাণী,
অবশ চেতন ক্লান্ত মানবেরে দেয় ব্যথা তীক্ষ্ণ পুচ্ছ হানি'।
পাগল বাতাসে দোলে ঘরছাড়া বৈরাগীর প্রেম-ভরা গান,
অদৃষ্টদেবতা!
শোণিতের স্রোত ছোটে, দুর্ভাগ্যের আবর্ত্তনে বনস্পতি হারায়েছে প্রাণ,
বিধাতার মহাকাব্য মরেছে কি? বিহ্বলিত প্রশ্ন ওঠে,—নাহি সমাধান।

পাঞ্চজন্য বাজে কই! মরণের চক্রব্যূহে জন্ম-দন্ত নাচে,
অস্পষ্ট কথিকা সম অতীতের কীর্ত্তি-কথা ভূমণ্ডলে রাজে।
রুদ্রে নৃত্য মত্ত কাল, দানবের প্রমাথন, প্রেতের প্রার্থন,
অদৃষ্টদেবতা!
নৈস্ত্রিংশিক সম এসে প্রহরেরা কেড়ে নেয় নিখিলের রক্ত-ছ্যাঁচা ধন,
পর্ব্বত-প্রমাণ যত বিফলতা, যত বাধা নৈর্ব্যক্তিক,—এই কি প্রাক্তন?
অতিক্রান্ত হবো কবে ভগ্নবেণী চণ্ডালের ষড়যন্ত্র হতে!
নিয়ে চলো অনাগত শতাব্দীর প্রেম-শান্তি-পুণ্য-পুষ্প-পথে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্রোত বহে যায়

(উপন্যাস)

৫

সন্ধ্যার পর গাঙ্গুলি-বাড়ীতে পাকা দেখার বিরাট সমারোহ। গ্রামের লোক ঝাঁটাইয়া গিয়া সেখানকার মাটী কামড়াইয়া পড়িয়াছে।

তিন-চারখানা নৌকায় বর-পক্ষীয়েরা আসিয়াছে প্রায় ষাট জন,—এখনো জন ত্রিশেক লোকের আসিবার কথা ট্রেণে। গাঙ্গুলি-বাড়ীর বাহির-মহলে রাত্রি-বাসের জন্য শয্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কলরব-কোলাহলে তিন-মহল বাড়ী একেবারে গম্‌গম্ করিতেছে!

গাঙ্গুলি-বাড়ীর পিছনে ফলের বাগান,—বাগানের পর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর অপর-তীরে একতলা জীর্ণ একখানি বাড়ী। এ-বাড়ীতে বাস করেন গাঙ্গুলি-বাড়ীর পুরোহিত কেশব ভট্টাচার্য্য। কেশবের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। দু'বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছিল,—পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েদের কে দেখিবে? তাই দায়ে পড়িয়া কেশব ঠাকুর এক ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়া শূন্য সংসারকে ভরাট করিয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়ার নাম কদম্বলতা।

কদম্বলতা এই গ্রামের মেয়ে। মাখন গাঙ্গুলির জ্ঞাতি পরেশ গাঙ্গুলির বাড়ীর পাশে কদম্বলতার পিতা অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর বাস। অবিনাশ কলিকাতায় কোন অফিসে চাকরি করে। চাল্‌শা হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা কঠিন,—অবিনাশ তাই কলিকাতায় থাকে। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর দুটি ছেলেকে পড়ায়,—পড়ানোর বদলে ভদ্রলোক অবিনাশকে গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন; এবং দু'বেলা দুটি অন্ন দিতেও ভদ্রলোক কার্পণ্য করেন নাই! অবিনাশ মাহিনা পায় চল্লিশটি টাকা—ঘাড়ে চার-চারটি মেয়ে। কদম্বলতা সবার বড়···ষোল বছর বয়সেও তাকে পাত্রস্থ করিতে না পারায় অবিনাশের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এমন সময় কেশব ঠাকুরের সংসার শূন্য হইল, অমনি···

পরেশের গৃহে কদম্বলতার যাতায়াত ছিল—অহরহ! পরেশের স্ত্রী যশোদার ফাই-ফরমাশ খাটিত! পরেশের স্ত্রী ডাকিতেন—কদম! যেখানে থাকুক, কদম সে-ডাকে ছুটিয়া আসিত! যশোদা বলিতেন—আমার মাথায় পাকা চুল তুলে দে না মা···মাথার কুটকুটনিতে জ্বলে মলুম! কদম অমনি যশোদার মাথার পাকা চুল তুলিতে বসিত! যশোদার গা-হাত-পা টিপিয়া দেওয়া···মাথায় খইল মাখাইয়া সোডা মাখাইয়া মাথা শাম্পু করিয়া দেওয়া···এ-সব কাজে কদমের কখনো ত্রুটি ছিল না! এ বাড়ীতে ভালো কিছু খাবার তৈরী হইলে কদমকে তার অংশ দিতে যশোদারও কখনো ভুল হইত না! এমনি সেবায়-পরিচর্য্যায় এ বাড়ীর সঙ্গে কদমের প্রাণের সংযোগ বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল!

রাত্রি প্রায় আটটা···কেশব ঠাকুরের ছেলেমেয়েরা মাখন গাঙ্গুলির বাড়ী নিমন্ত্রণ গিয়াছে···বাড়ীতে আছে কদম একা! রূপসী ষোড়শী স্ত্রীকে কাজের বাড়ীর ভিড়ে লইয়া যাইতে কেশব ঠাকুরের ভয় করে। পাঁচটা ছেলে-ছোকরা আছে···তার উপর কদম এই গ্রামের মেয়ে বলিয়া সকলের সঙ্গে জানাশুনা···এবং কদমের যে-রকম মিশুক-স্বভাব···

কেশবের গৃহের উঠানে একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। উঠানে রকমারি ফুলের গাছগুলা ফুলে ভরিয়া আছে। ও-বাড়ীর নহবতের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া হারিকেন জ্বালিয়া হারিকেনের সামনে উবু হইয়া শুইয়া কদম পড়িতেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাস। এ বই সে আনিয়াছে যশোদার কাছ হইতে। যশোদার নভেল পড়িবার সখ প্রচুর। যশোদার কাছ হইতে কদম প্রত্যহ একখানা করিয়া নভেল আনে; আনিয়া এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলে।

কদম পড়িতেছিল···পুকুর-ঘাট হইতে ফিরিয়া চন্দ্রশেখরের ব্যবস্থা মতো চন্দ্রশেখরের অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া রাখিয়া শৈবলিনী ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে···খোলা জানলা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া শৈবলিনীর মুখে পড়িয়াছে···তার সুষুপ্তি-সুস্থির মুখের সুন্দর কান্তি দেখিয়া চন্দ্রশেখর ভাবিতেছিল···সেই জায়গাটা!

···চন্দ্রশেখর ভাবিতেছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই! কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই!···

এই পর্য্যন্ত পড়িবামাত্র বুকখানা কেমন দুলিয়া উঠিল! বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া সে চাহিল আকাশের পানে। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিয়াছে···দূরে একটা পাখী গাহিতেছিল—চোখ গেল! চোখ গেল!

কোথা হইতে একরাশ নিশ্বাস বুকে জমিল! নিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিল! উঠিয়া দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া দু'চোখের উদাস দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ করিয়া···

ভাবিল, এ শৈবলিনী যেন তাহারি ছায়া! সে নিজে কত স্বপ্ন দেখিত! হাসি-গান-আলোর স্বপ্ন! ভালোবাসা···সে ভালোবাসার কি ছবিই না মনে আঁকিত! ভাবিত, বিবাহ হইলে স্বামীর আদর-সোহাগে···

বিবাহ হইয়াছে! স্বামীর যে-ছবি মনে আঁকিত, তার সঙ্গে কেশব ঠাকুরের আকাশ-পাতাল তফাৎ! ভালোবাসার কি জানে তার স্বামী এই কেশব ঠাকুর? স্বামীর গৃহে রান্নাবান্না করা···ছেলেমেয়ে দেখা···স্বামীর আনা নৈবেদ্যের পুঁটলি খুলিয়া চাল-চিনি-ফলমূল বাছিয়া তুলিয়া রাখা···ইহা করিয়াই দিন কাটিতেছে! আকাশে যখনি জ্যোৎস্না দেখিয়াছে, তখনি মনে হইয়াছে ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া কপালে রাঙা একটি সিঁদূরের টিপ···ফর্সা শাড়ী পরিয়া সাজিবে! মনের আবেগে সাজিয়াছে! সাজিয়া মনে হইয়াছে, কার জন্য এ সাজ? নিশ্বাস ফেলিয়া তখনি সে-সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছে! কত বার ভাবিয়াছে, বিবাহ ফিরিবার নয়···পুরাণে-গল্পে পড়িয়াছে বুড়া শিবকে বিবাহ করিলেও পার্ব্বতীর মনের কোনো সাধ অপূর্ণ থাকে নাই! সেও কেশব ঠাকুরকে লইয়া নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে! কিন্তু হায় রে, এ কি পুরাণের সেই শিব ঠাকুর! মাটীর আর পাথরের ঠাকুর পূজা করিয়া করিয়া কেশবের ভিতর-বাহির সব পাথর আর মাটী

হইয়া গিয়াছে! লোকে তাকে রূপসী বলে···কিন্তু নিজের স্বামী? কোনো দিন কদমের মুখের পানে মুগ্ধ আবেগে চাহিয়া দেখিল না! একটি নিমেষের জন্ম তাকে বলিল না, কদম তুমি রূপসী!

নিশ্বাস ফেলিয়া এই কথাই কদম ভাবিতেছিল। মনে হইতেছিল, তার নিশ্বাসের বাষ্পে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন কালি হইয়া গেছে!

হঠাৎ দু'খানা হাত তার দু' চোখ চাপিয়া ধরিল। সবলে মাথা নাড়িয়া দুই হাত দিয়া সে-হাত টানিয়া সরাইয়া কদম ফিরিয়া দেখে, অখিল!

অখিল পরেশ গাঙ্গুলির বড় ছেলে···কলিকাতায় বি-এ পড়ে।

কদম বলিল—তুমি!

হাসিয়া অখিল বলিল—হ্যাঁ, আমি।

কদম বলিল—কলকাতা থেকে এলে কবে?

অখিল বলিল—আজ এসেছি···বড়-বাড়ীর নেমন্তন্নে।

কদম বলিল—নেমন্তন্ন না রেখে এখানে যে?

মৃদু হাস্যে অখিল বলিল—নেমন্তন্ন-বাড়ীতে গিয়েছিলুম। কেশব ঠাকুরকে দেখলুম মুড়লী করছেন—গাঙ্গুলি-বংশের ইতিহাস বলছেন। ওঃ! অন্দরে গেলুম—তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখলুম··· শুধু তোমাকে দেখলুম না। তোমার মেয়ে ক্ষেন্তিকে বললুম, তোর ছোটমা আসেনি ক্ষেন্তি? তাতে সে জবাব দিলে, না! আমি বললুম, কেন আসেনি রে? তাতে বললে—বা রে, সবাই এলে বাড়ী দেখবে কে?···তখন মনে করলুম তুমি কেমন বাড়ী চৌকি দিচ্ছ, একবার এসে দেখে যাই!···তাই মানে,···

দু'চোখে হাসির দীপ্তি···কদম বলিল—এসে কি দেখলে?

অখিল বলিল—এসে দেখলুম, চৌকিদারী করছো, না, ছাই! খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছো যেন নাটকের নায়িকা!···ভাবে একেবারে বিভোর!···কি ভাবছিলে?

কদম একটা নিশ্বাস ফেলিল···নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া মাদুরে আসিয়া বসিল।

অখিলও সঙ্গে সঙ্গে মাদুরে বসিল। মাদুরে বই পড়িয়া আছে। সেখানা হাতে লইয়া দেখিল—চন্দ্রশেখর উপন্যাস। বলিল—নভেল পড়া হচ্ছিল?

—হ্যাঁ। বলিয়া কদম দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল। বুকের মধ্যে অশ্রুর উৎস কি জানি, কি কারণে খুলিয়া গিয়াছিল···সে অশ্রুর কণা পাছে চোখের কোণে আসিয়া উদয় হয়, অখিল দেখিয়া ফেলিবে··· এই জন্মই সে আরো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

বইয়ের যেখানটা কদম পড়িতেছিল, সে পাতা মোড়া ছিল। সে পাতায় চোখ বুলাইয়া অখিল পড়িল ক'টা মাত্র লাইন—শৈবলিনীর কথা ভাবিয়া চন্দ্রশেখরের মনোবেদনার কথা···বলিল—এত বই থাকতে হঠাৎ চন্দ্রশেখর পড়া হচ্ছিল যে?

মুখ তুলিয়া সতেজ কণ্ঠে কদম বলিল—থাকাথাকি কি···এ বই-খানা আজ বিকেলে গিয়ে মাসিমার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। 'স্বর্ণলতা' ফিরিয়ে দিয়ে মাসিমাকে বললুম, একখানা বই দাও মাসিমা। এ বইখানা ছিল মাসিমার ট্রাঙ্কের উপরে···মাসিমা বললে, এইটে নিয়ে যা। বই আমি অত বেছে পড়ি না, মশাই যে, এ বই বেছে এনেছি, বলছেন!

এত কথার প্রয়োজন হয়তো ছিল না। কথাগুলা বলিয়া কদম তাহা বুঝিল। কিন্তু কথা বলা হইয়া গেছে···এখন আর বিচার করিয়া লাভ নাই!

অখিল কোনো জবাব দিল না···অবিচল নেত্রে চাহিয়া রহিল কদমের পানে···অনেকক্ষণ। তার পর বলিল—'চন্দ্রশেখর' থিয়েটার এবার দেখেছি কলকাতায় গিয়ে কদম···দেখে তোমার কথা বার-বার মনে হয়েছিল।

মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কদম বলিল—থিয়েটার দেখে আমার কথা মনে হলো কেন, শুনি?

অখিল বলিল—মনে হচ্ছিল, তোমারো যেন ঐ শৈবলিনীর অবস্থা! বুড়ো কেশব ঠাকুরের পুজোর জোগাড় করা আর তার একপাল ছেলেমেয়েকে রেঁধে খাওয়ানো—এ ছাড়া কি-বা আর তোমার কাজ?

কদমের বুকের মধ্যে কাঁটার যে-বেদনা অহরহ খচ্-খচ করিতেছে, অখিল যেন পা দিয়া সেই জায়গাটা জোরে মাড়াইয়া দিয়াছে—আর্ত্ত বেদনায় বুক যেন ফাটিয়া চৌচির হইবে! কোনো মতে নিজেকে শান্ত সম্বৃত করিয়া কমল বলিল—এ ছাড়া গেরস্তর ঘরের বৌয়ের আর কি কাজ আছে, বলো?

—কাজ, আছে কদম···বলিয়া অখিল অন্য দিকে মুখ ফিরাইল—কথাটা খুলিয়া বলিতে পারিল না!

কদম বলিল,—কি কাজ, বলো?

অখিল আবার চাহিল কদমের পানে, বলিল—বলবো?

তার মুখে দু' চোখের দৃষ্টি দৃঢ়-নিবদ্ধ রাখিয়া কদম বলিল—বলো।

অখিল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কদমের পানে···অনেকক্ষণ··· কোথা দিয়া কি বলিয়া কথাটা সুরু করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে-কথার সঙ্গে নিজের কথা এতখানি জড়াইয়া আছে। কলেজের পাঠ্য কাব্যে-নাটকে যে সব কথা পড়িতেছে···গল্প-উপন্যাস, কবিতা-নাটকের যে সব কথা মনের বহু গোপন দ্বার খুলিয়া দিয়া মনের অতি-গোপন বাসনা-কামনা-সাধ-আশাকে কিশলয়দলের মতো ফুটাইয় তুলিতেছে···সে সব কথায় তার মনে কদম কি অপরূপ মূর্ত্তিতে জাগিয়া দেখা দেয়! কি রঙ মনে লাগে!

নিরুত্তর অখিলের একাগ্র দৃষ্টি তীক্ষ্ণ তীরের মতো কদমের মনে বিঁধিল। তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা ফুটিয়া উঠিল। কোনো মতে কদম বলিল—বলো···আমার পানে অমন করে চেয়ে আছো যে?

গাঢ় কণ্ঠে অখিল বলিল—তোমাকে দেখছি।

—যাও···বলিয়া সলজ্জে কদম অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

অখিল বলিল—রাগ করো না···তুমি জানো আমি কবিতা লিখছি

কদম মুখ ফিরাইল···দু' চোখে কৌতুক ভরিয়া বলিল—সত্যি, হয়েছো

—কবি হইনি···তবে কবিতা লিখছি!

—শুনবে? বলিয়া পকেট হইতে অখিল বাহির করিল কবিতা-লেখা একতাড়া কাগজ!

পড়া হইল না। সদরে সাড়া জাগিল—কোথায় গো?

কেশব ঠাকুরের কণ্ঠ! এ কণ্ঠ শুনিবামাত্র অখিল ঠিকরাইয়া গিয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। কদম উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেশব ঠাকুর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল···হাতে বড় একটা চ্যাঙারি।

কেশব ঠাকুর বলিল—তোমার খাবার এনেছি। লুচি আছে··· ঘী-ভাত আছে···ছোলার ডাল, বেগুন-ভাজা, মাছের কালিয়া, চাটনি, দই, ছানার পায়েস, পাঁপর আর মিষ্টি···নাও, ধরো।

কদম নিঃশব্দে চ্যাঙারি লইল।

কেশব ঠাকুর বলিল—আমি যাই। তুমি খেয়ে নাও··· মিথ্যে দেরী করো না। আমাদের ফিরতে রাত হবে। গান-বাজনা আছে, তাছাড়া বিদেয় না নিয়ে তো আসতে পারবো না— ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গেই আসবে'খন!···কথাগুলা এক নিশ্বাসে বলিয়া কেশব ঠাকুর হাত ধুইল···হাত ধুইয়া গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে তখনি বাহির হইয়া গেল।

কেশব ঠাকুর চলিয়া গেলে অখিল দাওয়ায় আসিয়া দেখা দিল। বলিল—খাবার বয়ে দিয়ে গেল!

কদম বলিল,—হ্যাঁ। দেখছো কত ভালোবাসা···রূপসী স্ত্রী উপোসী থাকে পাছে···বলিয়া মৃদু হাস্যে কদম চ্যাঙারি নামাইল।

অখিল বলিল—বেশ, খেতে বসো। তুমি খাও, আর আমি তোমাকে আমার লেখা কবিতা শোনাই। কেমন?

কদম বলিল—তোমার খাওয়া হয়েছে?

অখিল বলিল—আমি বাড়ী গিয়ে খাবো।

—না···না···অনেক খাবার আছে। খেয়ে দু'জনেরই পেট ভরবে। দু'খানা থালা আনি। তুমিও খেয়ে নাও···তার পর শুনলে তো, ওদের ফিরতে রাত হবে···খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি কবিতা পড়বে আর আমি বসে বসে শুনবো। না হলে একলাটি থাকবো কি করে? ভয় করবে না বুঝি আমার?

৬

খাওয়া-দাওয়ার পর অখিল পড়িতেছিল তার লেখা কবিতা। লিখিয়াছে,

> হৃদয়-কানন হতে জড়ো করিয়াছি আমি
> রাশি রাশি ফুল!
> কোথা হৃদয়ের দেবী? এ ফুলে করিব পূজা
> চরণ রাতুল!

এমনি ধরণের বহু কবিতা!

কদমের মন্দ লাগিতেছিল না···পড়ার মধ্যে দুম্ করিয়া সে প্রশ্ন করিল—একটা কথা সত্যি বলবে?

অখিল বলিল—কি কথা?

কদম বলিল—আচ্ছা, এ সব যে লিখেছো—কাকেও উদ্দেশ করে'? না, পাঁচটা কবিতা পড়ে তারি নকল করেছো?

অখিলের কণ্ঠ যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিল! সে উত্তর দিতে পারিল না।

কদম বলিল—বলো···

কোনো মতে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া অখিল বলিল,—নকল করে' লেখা নয়।

কদম বলিল—কাকে উদ্দেশ করে' লেখা, শুনি?

অখিল বলিল—সত্যি কথা বলবো?

—নিশ্চয় বলবে।

—তুমি রাগ করবে না?

কদমের আশ্চর্য্য লাগিল! বলিল,—আমি কেন রাগ করতে যাবো? বা রে!

এ কথায় অখিলের আগ্রহ যেন চমকিয়া উঠিল! অখিল চট করিয়া কোনো জবাব দিতে পারিল না। তাকে নিরুত্তর দেখিয়া কদম বলিল—বলো, চুপ করে' রইলে কেন?

অস্ফুট মৃদু-কণ্ঠে অখিল বলিল,—তোমাকে উদ্দেশ করে' লিখেছি।

—আমাকে! দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কদম হাসিয়া একেবারে যেন গড়াইয়া পড়িল!

অখিল বলিল—হাসলে যে?

কদম বলিল—তুমি হাসালে আর আমি হাসবো না? আমাকে উদ্দেশ করে এ সব লেখবার মানে?

অখিলের বুকের মধ্যে কারা যেন চীৎকার করিয়া উঠিল! তারা বলিল, বলিয়া ফ্যাল্···লজ্জা করিসনে। তাদের প্ররোচনায় অখিল বলিল—মানে, তোমাকে আমি ভালোবাসি!

কদম তাহা বোঝে। বুঝিলেও ভাবে নাই, অখিল এ কথা এমন করিয়া বলিয়া বসিবে!···এ কথার কি-বা দাম? সে বলিল—মানুষকে ভালোবাসলেই বুঝি তাকে উদ্দেশ করে' পদ্য লিখতে হয়? এই যে তুমি তোমার বাবাকে ভালোবাসো, মাকে ভালোবাসো, তাঁদের নামে পদ্য লিখেছো?

অখিলের মাথার রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল! অখিল বলিল— মা-বাবাকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসা নয়!

—তবে কি রকম ভালোবাসা?···কদমের দু' চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক!

সে ঝিলিক অখিল লক্ষ্য করিল। মাদুরের উপর সামনে পড়িয়া আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস! দুম্ করিয়া বলিয়া বসিল— চন্দ্রশেখর পড়ছো···আর এ-কথাটা বুঝতে পারলে না?

কদমের দৃষ্টিতে কৌতুকের সহিত অনেকখানি দুষ্টামি···কদম বলিল—না! দাও তুমি বুঝিয়ে।

জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া কদমের মুখে পড়িয়াছে···সে জ্যোৎস্নায় কদমের কমনীয় কান্তি ফুটিয়াছে···তার উপর পাখীটা তখনো গাহিতেছিল, চোখ গেল!—অখিলের মনের মধ্যে যেন জোয়ার বহিতেছিল!

অখিল বলিল—তুমি বলতে চাও, বুড়ো কেশব ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তুমি সুখী হয়েছো? শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসতে পারেনি! বাসতে পারে না! সে ভালোবাসতো প্রতাপকে।

কদম একাগ্র মনে এ কথা শুনিল। মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিয়া গেল···নিশ্বাসের একটা দমকা বেগ! পরক্ষণে মনকে শান্ত করিয়া কদম বলিল—আমার তো প্রতাপ নেই!

—নেই? মিছে কথা! বলিয়া কদমের ডান হাতখানা টানিয়া তার মণিবন্ধে পুরানো একটা কাটা দাগ দেখাইয়া সে বলিল—এ দাগ কিসের কদম?···তুমি ভুলতে পারো কিন্তু আমি ভুলিনি। বলো, এ কাটা দাগ কি করে হয়েছিল?

মনে পড়িল, অখিলের সঙ্গে ছেলেবেলায় আম লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে অখিল আঁকশির খোঁচা মারিয়াছিল। কদম কোনো উত্তর দিল না—ধীরে ধীরে অখিলের হাতের বন্ধন হইতে নিজের হাত টানিয়া সরাইয়া লইল।

অখিল যেন প্রমত্ত! বলিল—বলো। না বললে আমি···

মুখ ফিরাইয়া কদম বলিল—না বললে তুমি কি···বলো?··· কি করবে? আত্মহত্যা?

অখিল বলিল—আত্মহত্যা নয়।

—তবে? হাসিয়ো না অখিলদা, পাগলামি করো না! আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি আর এক জনের স্ত্রী···এ সব কথা আমাকে বলতে নেই! কেউ এখন আমাকে ভালোবাসার কথা বললে আমার সে-কথা শুনতে নেই! শুনলে পাপ হয়!

—পাপ-পুণ্য তুমি মানো?

—মানি বৈ কি! ভট্টাচার্য্যি পুরুতের বৌ···পাপ-পুণ্য না মানলে তোমরা নৈবিদ্যি দক্ষিণা দেবে কেন? তা ছাড়া মরে গেলে নরকে বাস করতে হবে যে এর পরে!

অখিল কি জবাব দিতে যাইতেছিল, জবাব দেওয়া হইল না··· সদরে কে করাঘাত করিল!

—ওরা ফিরলো না কি? বলিয়া লাফ দিয়া অখিল গিয়া ঘরে ঢুকিল! কদম উঠিয়া গিয়া সদরের দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বারে করাঘাত করিতেছিল সরস্বতী···মাখন গাঙ্গুলির বিধবা বোন। তার সঙ্গে আছে লণ্ঠন -হাতে গাঙ্গুলি-বাড়ীর দাসী মতির মা এবং বামুন ঠাকুর।

সরস্বতী বলিল,—তুই যে বড় নেমন্তন্ন যাসনি কদম?

কদম বলিল—আর সবাই গেছে···বাড়ীতে কে থাকবে?

সরস্বতী বলিল,—কেশব ঠাকুরের ভীমরতি হয়েছে! তোকে বাড়ী পাহারা দেবার জন্ত বিয়ে করেছে?

কদম বলিল—আমার জন্ত খাবার এনে দিয়ে গেছেন।

সরস্বতী বলিল—সে আমি জানি···তাই অত আগ্রহ! আমাকে গিয়ে বললে, দাও তো সরোদি তোমার ভাজের জন্ত খাবার। সে বাড়ীতে রয়েছে···রান্না করতে বারণ করে দিয়ে এসেছি। শুনে আমি যাচ্ছেতাই কতকগুলা বকলুম। বললুম, এখানে এত আমোদ-আহ্লাদ···ছেলে বয়স···সে-বেচারী কতখানি আমোদ পেতো! তা খেয়েছিস?

কদম বলিল—খেয়েছি।

সরস্বতী বলিল—তাহলে আয় আমার সঙ্গে··· একা-একা থাকতে হবে না। আমি যাচ্ছি বৌ-ঠাকরুণের কাছে···বাগানে। তাকে খাইয়ে আসবো!···এঁরা সব নিয়মকর্ম্ম করছেন···আমার মনটা কিন্তু পড়ে আছে বাগানে বৌ-ঠাকরুণের কাছে! আয় আমার সঙ্গে···একটু কথা কয়ে বাঁচবি!···

কদম চট্ করিয়া কোনো জবাব দিতে পারিল না।

সরস্বতী বলিল—বাড়ীর দোরে চাবি দে। দিয়ে আয়। দেরী করিস নে!···ওরা যদি এর-মধ্যে আসে তো দোরে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমন বেয়াক্কেলে, তেমনি একটু সাজা পাক্। আয় কদম। কি-বা ভাবছিস? ভয় নেই! আমার সঙ্গে যাবি। বৌ-ঠাকরুণও দেখলে খুশী হবে।

নিরুপায়! কদম বলিল—আসছি পিসিমা। তুমি ভিতরে আসবে না?

সরস্বতী বলিল,—না। তুই চট্ করে আয়···আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

কদম ভিতরে আসিল। ঘরের মধ্যে অখিল···সদরে সরস্বতী··· সদরে চাবি দিয়া গেলে অখিল বাহির হইবে কি করিয়া?

ঘরে ঢুকিয়া মৃদু কণ্ঠে অখিলকে সে সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া অখিল বলিল—খিড়কীর দিকে একটা দরজা আছে না?

কদম বলিল—সে দরজায় তালা-চাবি লাগানো···আবার সে তালার চাবি তোমাদের ভট্টাচায্যি মশাইয়ের কাছে···

অখিলের চোখের সামনে মাটী ফাটিয়া যেন আগুনের সাগর ফুঁশিয়া উঠিল! অখিল বলিল—তাহলে আমি?

কদম বলিল—চুরি করে পরের বৌয়ের কাছে ভালোবাসা জানাতে এসেছিলে অখিলদা, পাপ করেছো···তার সাজা ভোগ করতে হবে না?

কথাটা বলিয়া কদম হাসিল।

অখিলের আপোদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। অখিল বলিল—কি যে দাঁত বার করে হাস কদম···সত্যি, আমার ভালো লাগে না!

হাসিয়া কদম বলিল—এতক্ষণ তো বেশ ভালো লাগছিল। তা ভয় নেই, ঘরে চাবি দেবো। তুমি দাওয়ায় এসো···ওরা সদরে আছে, দেখতে পাবে না। সদরে আমি সত্যি তালা দেবো না—ভাব দেখাবো, যেন চাবি দিচ্ছি···ভিতর থেকে নাড়া দিলে তালা খুলে যাবে··· অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে। সদরের তালার চাবিটা বরং তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তালায় চাবি দিয়ে দরজার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে রেখে যেয়ো···সকলের চোখ এড়িয়ে সে-চাবি নিয়ে আমি সদর খুলে বাড়ী ঢুকতে পারবো'খন ···বুঝলে!

বেশী বুঝিবার মতো মনের অবস্থা নয়। অখিলের মাথার উপর যেন খাঁড়া দুলিতেছে। এমন উদ্বেগ!···ব্যূহ-প্রবেশ করিয়াছে— এখন এ ব্যূহ হইতে বিনির্গত হইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়!

সে ঘরের বাহিরে আসিল। কদম ঘরে তালা লাগাইল; তার পর দড়ি হইতে সদরের তালার চাবিটা খুলিয়া অখিলের হাতে দিয়া বলিল সদরের কড়ায় শুধু আটকানো থাকবে···চাবি দিয়ে বন্ধ করে যেতে ভুলো না···বুঝলে। না হলে অনর্থপাত হবে। তোমাদের ভট্টাচায্যি মশাই রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হবেন।

বাহির হইতে সরস্বতী ডাকিল—কদম···

—যাই পিসিমা···বলিয়া কৌতুক-ভরে কদম আর একবার চাহিল অখিলের পানে···দাওয়ার কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া অখিল কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

কণ্ঠ মৃদু করিয়া সহাস ভঙ্গীতে কদম বলিল—আর এক সময়ে এসে তোমার বাকী পদ্যগুলো শুনিয়ে যেয়ো অখিলদা···ভুলো না। জানো তো, পদ্য-নাটক-উপন্তাস এ সব পড়তে আমি কত ভালোবাসি!

পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো দুই চোখ মেলিয়া অখিল দাঁড়াইয়া রহিল···নিঃশব্দে তেমনি কাঠের মতো! হাসিতে হাসিতে কদম চলিল সদরের দিকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিবাদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মায়াণ্ড মায়া, পঞ্চকঞ্চুক, পুরুষ

পরমেশ্বরের যে শক্তি অচিদ্রূপ শূন্যাদিতে (সুষুপ্তি, প্রলয় এবং অভাবসমাধির প্রমেয়ে) জ্ঞাতৃতার অভিমান প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দেয় এবং ভাবসমূহ চিন্ময়স্বরূপ হওয়াতে স্বরূপান্তর্গত হইলেও তৎপ্রতি ভেদাভিমান জন্মাইয়া দিয়া সর্ব্বথা স্বরূপের তিরোধান করিয়া থাকে, সেই বিমোহিনী শক্তিই মায়া নামে আখ্যাত (১)। শূন্য; বুদ্ধি এবং শরীরাদি জড়পদার্থে আত্মবুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপ আত্মাতে জড়তার বুদ্ধি—এই উভয় প্রকার বিপর্য্যাসই মায়াশক্তির কার্য্য। প্রথমতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় পভৃতি ভেদের অবভাসন এবং তৎপর ভিন্ন জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে পরস্পরাধ্যাস—এতদুভয়ই মায়াশক্তির কার্য্য। পরস্পরাধ্যাসরূপ ব্যাপারের প্রয়োজিকা—এই হেতু মায়াশক্তি সর্ব্বথা শাঙ্কর বেদান্তের মায়ার তুল্য; কিন্তু তৎস্থলে মায়া তুচ্ছ এবং সদসদভ্যামনির্ব্বচনীয়া। শৈবদর্শনে মায়া পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তিরই স্বরূপতিরোধানব্যাপার। ইহা তুচ্ছ নহে—সতী, অতএব বস্তুভুত,এবং পরমেশ্বরের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন। আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে এ স্থলে এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করিব না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আলোচ্যদর্শনেও পরস্পরাধ্যাস মায়াশক্তির কার্য্য, কিন্তু অচিদ্রূপে অবভাসিত শূন্যাদি যদি আত্মরূপে অবভাত হয়, তাহা হইলে তো শূন্যাদির চিদ্রূপতাপ্রাপ্তি হওয়ায় বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য্যেরই বিকাশ হইল; ঐশ্বর্য্যাভিব্যক্তি শুদ্ধবিদ্যার কার্য্য ; অতএব উহা মায়াকার্য্য কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলা হয়—উহা শূন্যাদির ঐশ্বর্য্যরূপেই পরিগণিত হইতে পারিত, যদি 'অহম্' এইরূপ অভিনিবেশবশতঃ শূন্যাদির মেয়তা পরিত্যক্ত হইত। আত্মা মায়াশক্তির অধীন হইয়া শূন্যাদিতে প্রমাতৃতার অর্পণ করিলেও শূন্যাদি মেয়ভুত থাকিয়াই মাতা হইয়া থাকে ; কারণ, যাহা মীয়মান অর্থাৎ পরিমিত তাহাই মেয়। পরিমিতত্ব হেতুই শূন্যাদির মেয়ান্তর হইতে ভেদও সিদ্ধ হয় ; নতুবা, আত্মা-অনাত্মার বিভাগাভাববশতঃ পরস্পরাধ্যাস সিদ্ধই হইত না। অপরিমিত চিদ্রূপ শিবদশায় তাদৃশ অধ্যাসের সম্ভাবনাই নাই(২)। মায়ার প্রধান কার্য্য অপূর্ণম্মন্যতাবোধের উৎপাদন। শূন্যাদিতে 'অহম্'-ভাবেরপরিমিততাই কালাদি পঞ্চকঞ্চুক নামে অভিহিত। কঞ্চুক অর্থ পোষাক। নট যেমন তত্তৎপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তত্তৎ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শিবই এই সকল কালাদি কঞ্চুকে আবৃত হইয়া জীব সাজিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত কাল, বিদ্যা, কলা, রাগ এবং নিয়তি—এই পাঁচটিকে পঞ্চকঞ্চুক বলা হয়। মায়াশক্তিরূপ এক তিরোধানশক্তিরই এই পাঁচটি বৃত্তিবিশেষ। এই পঞ্চবৃত্তি এবং তাহাদের অধিকরণ মায়া—ইহারা একত্র মিলিত হইয়া ষট্‌কঞ্চুক নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে কাল অক্রমশিবদশায় ক্র""র সৃষ্টিপূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রমাতাতে লব্ধপ্রসর হয়—এই নিমিত্তই প্রমাতা—'আমি কৃশ ছিলাম, এখন স্থূল হইয়াছি এবং পরে স্থূলতর হইব'—এইরূপে আত্মাকে কালিকক্রমযুক্ত দেহরূপে পরামর্শ করিয়া থাকে এবং পরে সেই দেহের সহচর প্রমেয়েও ভুতাদিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। বিদ্যারূপ মায়াবৃত্তি—কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব বা অল্পজ্ঞতার উন্মীলনশীলা এবং উহাই বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত ভাবরাশিকে পৃথক্ করিয়া বিবেচন করাইয়া থাকে—এই নিমিত্তই প্রমাতাতে 'আমি নীল জানিতেছি, পীতজ্ঞান আমাতে নাই' এতাদৃশ বিবেচন বুদ্ধি হইয়া থাকে। কলানামক মায়াবৃত্তি কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্বের অবভাসিকা। ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে প্রমাতাতে কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্বের বুদ্ধি হইয়া থাকে—যথা 'অমুক আমার কার্য্য, অমুক নহে' ইত্যাদি। কিঞ্চিত্ তুল্য হইলেও 'অমুকই আমার কার্য্য, অমুক নহে' এবম্বিধ যে পক্ষপাত—তাহাই দেহাদি প্রমাতৃভাবে এবং প্রমেয়ে রাগতত্ত্ব। এই বিশেষপক্ষেই কেন পক্ষপাত হইয়া থাকে তন্মূলে যে মায়াবৃত্তির ব্যাপার আছে তাহাই নিয়তিতত্ত্ব। নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া একতরপক্ষে অনুরক্ত হইলে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বের ভান হইয়া থাকে। কদাচিৎ ইহাদের ভিন্নবিষয়তাও দৃষ্ট হইয়া থাকে—যথা একত্র অনুরক্ত হইলেও নিয়তিশক্তিবশে পুরুষ অন্যত্র ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

এইরূপে ষট্‌কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া শিবই স্বরূপগোপন পূর্ব্বক সংসারী সাজিয়া থাকেন। এতদবস্থায় ভিন্নরূপে জ্ঞাত প্রাকৃতিক সুখদুঃখের ভোক্তা সেই প্রমাতাকেই পুরুষ বলা হইয়া থাকে। এই পুরুষ মায়াপাশে বদ্ধ এবং মায়াদ্বারাই পালিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে পশুও বলা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়া সঙ্কোচ অবভাসিত করিয়া অপূর্ণম্মন্যতা-বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। অপূর্ণম্মন্যতার অবধি অণপর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পরিমাণের পর আর সঙ্কোচের সম্ভব হয় না। 'অহং'কে আশ্রয় করিয়াই প্রমাতৃত্ব আত্মলাভ করে, সেই জন্যই পশু বা পুরুষকে অণুও বলা হইয়া থাকে।

এক্ষণে মায়াশক্তি এবং মায়াতত্ত্বের ভেদ জানা আবশ্যক। যে চিদ্রূপা শক্তিদ্বারা পশুপতি বা শিব স্বাত্মগোপন করিয়া 'অণু'ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শিবের সেই স্বাতন্ত্র্য শক্তিই মায়াশক্তি এবং ইহাই অণুর বন্ধয়িত্রী ; আর মায়াশক্তির যাহা কার্য্য অর্থাৎ মায়াশক্তি দ্বারা জড়রূপে অবভাসিত বলিয়া জড়, এবং যাহা ভেদ-জগতের মূল উপাদান কারণ—তাহাই তত্ত্বরূপা মায়া। সংক্ষেপতঃ সঙ্কোচরূপ জড়তার অবভাসকারিণী পরমেশ্বরশক্তিই শক্তিরূপা মায়া এবং জড়রূপে অবভাত, ভেদজগতের মূল উপাদান কারণই তত্ত্বরূপা মায়া (৩)। এইরূপে কলাদি ধরান্ত তত্ত্বগ্রামেরও শক্তি এবং তত্ত্বভেদে দ্বিরূপতা বঝিতে হইবে।

---

(১) মায়াশক্তিঃ পুনরচিদ্রূপে শূন্যাদৌ পমাতৃতাভিমানং প্ররূঢং দদতী ভাবানপি চিন্ময়ান্ ভেদেনাভিমানয়ন্তী সর্ব্বথৈব স্বরূপং তিরোধত্তে আবৃণুতে বিমোহিনী সা—(প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ৩।১।৭)।

(২) স্যাদৈশ্বর্য্যধর্ম্মযোগঃ শূন্যাদেঃ, যদি অহমিত্যভিনিবিশ্যমানোঽপি মেয়তাং জহ্যাৎ, মেয়ং হি মীয়মানত্বাদেব পরিমিতমিতি তাদৃশাদেব মেয়ান্তরাদুপপন ব্যতিরেকম্—নত্বেবং চিদ্রূপম-পরিমিতত্বাৎ—(প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী—৩।১।৯)।

(৩) নিত্যং সৃজ্যমানবস্তুগতস্য রূপস্য জড়ত্বাভাসয়িষ্যমাণত্বাৎ জড়ং, সকলকার্য্যব্যাপনাদিরূপত্বাচ্চ ব্যাপকং মায়াখ্যং তত্ত্বম্ উপাদানকারণং ; তদবভাসকারিণী চ পরমেশ্বরস্য মায়া নাম-শক্তিস্তত্তোঽন্যৈব—তন্ত্রসার ৮ম আহ্নিক।

মায়াশক্তি বন্ধয়িত্রী, মায়াতত্ত্ব বন্ধন। এই বন্ধন ত্রিধা পরিকল্পিত হইয়া আণব, মায়ীয় এবং কার্ম্ম এই ত্রিবিধ মলনামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপূর্ণম্মন্যতারূপ যে পরিস্পন্দ, যাহা অকর্ম্মক অভিলাষমাত্র অর্থাৎ যে অভিলাষের কোন স্ফুট বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং যাহা পুরুষের ভবিষ্যৎ অবচ্ছেদযোগ্যতাস্বরূপ অর্থাৎ যে মল পুরুষের অণুভাব প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাই 'আণব' মল (৪) ইহারই অপর নাম লোলিকা, অবিদ্যা, আবরণ, নীহার ইত্যাদি। মল কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে; কারণ, এখনই বলা হইল, উহা পুরুষের অবচ্ছেদযোগ্যতা। অতএব উহা পুরুষতত্ত্বেরই অন্তর্গত। আণব মলের স্বরূপ দ্বিধা—বোধের অস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্যের অবোধতা (৫)। পূর্ব্বে যে রাগতত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা সকর্ম্মক অভিলাষ, মল অকর্ম্মক অভিলাষ—ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। দ্বিপ্রকার আণব মলদ্বারা স্বরূপের সঙ্কোচ হইলে স্বরূপেরই একাংশ অস্বরূপবত্তাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'অস্বরূপবৎ'—এরূপ বলার কারণ, শিব কখনও স্বরূপচ্যুত হন না; কারণ, প্রকাশই শিবের স্বভাব; আর প্রকাশের বাহিরে কোন পদার্থই সত্তালাভ করে না—ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। সঙ্কোচ শিবের ইচ্ছাপরিগৃহীত, অতএব সঙ্কুচিতপ্রকাশ অণুর বাহিরে যে প্রকাশাংশস্বরূপ বাহ্যরূপে আভাসিত হইল, তাহারও মূলে বস্তুতঃ শিবেচ্ছাই বর্ত্তমান। যাহা হউক, এইবারে অখণ্ড প্রকাশস্বরূপে ভেদের প্রতিষ্ঠা হইল। এই ভেদজ্ঞানই অণুর দ্বিতীয় প্রকার বন্ধন—ইহারই অপর নাম মায়ামল। ইহা একটি সংজ্ঞামাত্র, বস্তুতঃ, ত্রিবিধ মলই মায়াকার্য্য বলিয়া মায়ীয়। আণবমল বশতঃ অণুতে অপূর্ণম্মন্যতাবোধ লব্ধপ্রসর হইয়াছে, ঐ মল নির্বিষয় অভিলাষমাত্রস্বরূপ হওয়াতে অণুতে তৃপ্তির নিমিত্ত অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত রহিয়াছে অথচ নিজের ভিতরে তৃপ্তির সামগ্রী নাই—এই নিমিত্ত স্ববাহ্য প্রমেয়ের সহিতই এই সময় তাহার আদানপ্রদান করিতে হয়—এই আদানপ্রদানই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের অভ্যুদয় হইলেই সেই কর্ম্মনিমিত্ত ফলভাগীও অণুই স্বয়ং হইয়া থাকে। অতএব, এইবারে 'অণু' ভোক্তাও সাজিয়া পড়িলেন। এই ভোক্তা 'অণু'কেই তন্ত্রশাস্ত্রে পুরুষ বলা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, মলত্রয় একই মায়ার বিভিন্ন ব্যাপার বশতঃ এক দিকে যেমন প্রকাশের অণুভাবপ্রাপ্তির কারণ, পক্ষান্তরে তেমনি বিবিধ প্রকারে অণুচৈতন্যের বন্ধনেরও কারণ। মলত্রয়স্বভাব, মোহময়, ভেদৈকপ্রাণ বলিয়া যাবতীয় প্রমাতৃবর্গের বন্ধরূপ শক্ত্যণ্ডের নিম্নে পুরুষতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহই একত্রে মায়াণ্ড নামে উক্ত হইয়া থাকে (৬)।

প্রকৃত্যণ্ড এবং পৃথিব্যণ্ডরূপ অণ্ডদ্বয়, এই মায়াণ্ডেরই অন্তর্গত। মায়া ব্যাপারদ্বারা কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট পুরুষ ভোক্তৃপদে পৃথগ্রূপে অধিরূঢ় হইলে তাহার ভোগাদিনিষ্পাদনার্থ কিঞ্চিত্ত্ব-বিশিষ্ট ভোগ্যের আবশ্যক; অতএব, মায়াতত্ত্বের পরেই প্রকৃতিতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতঃপর প্রকৃতিতত্ত্বের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রকৃত্যণ্ড—প্রকৃতি হইতে জল পর্য্যন্ত তত্ত্বগ্রাম

শক্ত্যাদিরিত্যপ্রাপ্ত কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ভেদপ্রমাতা ভোক্তা পুরুষের নিকট অত্যন্ত বিবিক্ত কিঞ্চিত্ত্বমাত্রবিশেষণবিশিষ্ট ভোগ্যরূপে অবভাত মেয়ই প্রকৃতি। মায়া স্বয়ংই তাদৃশাবস্থাপন্ন প্রমাতার ক্রমবিশেষে মেয়পদে অধিরূঢ় হইয়া তৎকর্ত্তৃক ঐরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথম ঐ প্রমেয় এক অখণ্ডতত্ত্বরূপেই প্রকাশিত হয়, তাহাতে কার্য্যকারণাদির বিভাগ থাকে না। অতঃপর তত্ত্বেশের ঈক্ষণদ্বারা ক্ষোভিত গুণতত্ত্ব হইতে কার্য্যকারণাদি প্রাকৃত পদার্থের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতির আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রমাতৃপ্রমেয়ের বিভাগ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, প্রমাতা এবং প্রমেয়ে যথাক্রমে ভোক্তৃভাব এবং ভোগ্যভাবের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ের বিভাগকে পূর্ণ বলা যায় না। এইক্ষণে ভোক্তারূপে প্রমাতৃপদ এবং ভোগ্যরূপে প্রমেয়পদ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িল। কালাদি প্রমেয় হইলেও উহারা প্রমাতৃশক্তিস্বভাব বশতঃ প্রমাতাতেই লগ্ন; অতএব, প্রমেয়মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। বস্তুতঃ, এই স্থলীয় প্রমাতা স্বয়ংও পরম্পরাধ্যাসহেতু প্রমেয়মধ্যেই বিন্যস্ত। ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুরুষের ভোগ্যরূপা এই প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোময়ী হইলেও সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির ন্যায় গুণাভিন্না এবং গুণসাম্যাবস্থামাত্র নহে (৭)। পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার শাস্ত্রদীপিকায় সাংখ্যীয় প্রকৃতিখণ্ডনে সর্ব্বতঃ পরিণাম অথবা দৈশিক পরিণাম ইত্যাদি বিকল্প উত্থাপন করিয়া যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তান্ত্রিকগণও এস্থলে তাদৃশ যুক্তিই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ফল কথা, ইঁহাদের ভোক্তা পুরুষের নিকট ভোগ্য, ইদংরূপে প্রতিভাত ক্রিয়াশক্তিই প্রকৃতি এবং ঐ প্রকৃতির প্রখ্যা, প্রবৃত্তি এবং স্থিতিরূপ ধর্ম্মত্রয়ই যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ নামে অভিহিত। এতদ্বিষয়ক বিস্তার তন্ত্রালোক, তন্ত্রসার প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। ভোগ্যরূপা প্রকৃতি হইতেই ভোগের সাধন ত্রয়োদশবিধ করণের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন—এই তিন অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহারাই ত্রয়োদশবিধ করণ। তন্মধ্যে বুদ্ধি সামান্যতঃ অধ্যবসায়রূপা; ইহাতেই পুরুষের প্রকাশ এবং বিষয় প্রতিবিম্ব অর্পণ করিয়া থাকে। অতঃপর যদ্দ্বারা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত, বেদ্যসম্পর্কে কলুষিত, অতএব অনাত্মা পুরুষপ্রকাশে আত্মাভিমান হইয়া থাকে, সেই অহঙ্কারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়, অতএব বেদক বা জ্ঞাতা পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বন বশতঃ পুরুষ প্রকাশেও কিঞ্চিৎ বেদ্যতা সংক্রামিত হয়, অতএব ঐ প্রকাশবেদ্যসম্পর্কদুষ্ট এই জন্য ইহা অনাত্মা, অহঙ্কার অর্থ কৃত্রিম অহম্। অনাত্মায় আত্মাধ্যাসই—'অহম্'এর কৃত্রিমতা। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সঙ্কল্পাদির কারণ মন আবির্ভূত

(৪) তত্র লোলিকাহপূর্ণম্মন্যতারূপঃ পরিস্পন্দঃ অকর্ম্মকমভিলাষমাত্রমেব ভবিষ্যদবচ্ছেদযোগ্যতেতি ন মলঃ পুংসত্ত্বাত্তরম্।

(৫) (স্বাতন্ত্র্যহানির্বোধস্য স্বাতন্ত্র্যস্যাপ্যবোধতা, দ্বিধাণবমলমিদম—প্রত্যভিজ্ঞাসূত্র—৩।২।৪)

(৬) মলত্রয়স্বভাবং মোহময়ং ভেদৈকপ্রাণতয়া সর্ব্বপ্রমাতৃণাং বন্ধরূপং পুংস্তত্ত্বপর্য্যন্তভদং মায়াখ্যমণ্ডম—(পরমার্থসারটীকা, ৪র্থ কারিকা)।

(৭) সত্ত্বরজস্তমসাং যৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যং রূপম্ অজাজিভাগো যত্র ন উপলভ্যতে সা মূলকারণং প্রকৃতিঃ—(পরমার্থসারটীকা ১৯ কারিকা)।

হইয়া থাকে এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতেই শব্দাদির অধ্যবসায়রূপা বুদ্ধিতত্ত্বের উপযোগী পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতেই কর্ম্মোপযোগী পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাংখ্যের ন্যায় এই মতেও ইন্দ্রিয়গুলি আহঙ্কারিক, ভৌতিক নহে। গ্রহণ-বর্জনরূপ ব্যাপারদ্বয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য। তন্মধ্যে বহির্বিষয়ক গ্রহণবর্জন পাণি, পাদ, এবং পায়ুর কার্য্য। অন্তঃস্থিত প্রাণে যদ্দ্বারা ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহাই বাগিন্দ্রিয়। হেয়োপাদেয়ের ক্ষোভপ্রশান্তি পূর্ব্বক বিশ্রান্তির অর্থাৎ আনন্দের উপযোগী কর্ম্মেন্দ্রিয়ই উপস্থ। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদেহব্যাপী, অতএব ছিন্নহস্ত পুরুষ বাহুদ্বারা কি গ্রহণ করিলে অথবা বাহুদ্বারা গমনকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও বস্তুতঃ পাণি এবং পাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আদান এবং গমনব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে অগ্রহস্তাদিতে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য তত্তৎস্থলেই ইন্দ্রিয়গণ তত্তৎ স্ফুট, পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে অহঙ্কার হইতেই তন্মাত্রাদি দশ কার্য্য পদার্থেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্মাত্রগুলি ভোগ্য; অতএব ভোক্তৃ অংশের আচ্ছাদক বলিয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতেই পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্ষোভাত্মক শব্দাদিবিশেষের যে পর্ব্ববর্ত্তী এক অক্ষোভাত্মক এবং অবিশেষাত্মক সামান্য—তাহাই শব্দাদিতন্মাত্র। ক্ষুভিত শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের ব্যাপার অবকাশদান। পরাশক্তিরূপ মূলস্পন্দের অনন্ত অবান্তর স্পন্দবিশেষরূপ শব্দেই যাবতীয় বাচ্য অধ্যস্ত। অতএব স্বয়ং শব্দ যেমন বাচ্যাধ্যাসের অবকাশসহ, তেমনি স্বকার্য্য আকাশই সকল পদার্থের অবকাশদাতা। স্পর্শতন্মাত্র ক্ষুভিত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়। উহাতে যে শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা আকাশের সহিত বায়ুর বিরহাভাব বশতঃ। এইরূপে রূপতন্মাত্র হইতে তেজের, রসতন্মাত্র হইতে জলের, এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বকলাপের মধ্যে উর্দ্ধোর্দ্ধ গুণ তত্ত্বব্যাপক, এবং নিকৃষ্টগুণ তত্ত্বব্যাপ্য। যাহা ব্যতীত গুণান্তর উপপন্ন হয় না তাহাই উৎকৃষ্ট গুণ। এইরূপে পৃথিবীতত্ত্ব শিবতত্ত্ব হইতে জলতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বগ্রামদ্বারা ব্যাপ্ত, জলতত্ত্ব তেজদ্বারা ইত্যাদি জানিতে হইবে। প্রকৃতি হইতে কার্য্য এবং করণাদির আবির্ভাব প্রায় সাংখ্যীয় প্রকরণের অনুরূপ। অবশ্য কোন কোন স্থলে প্রতিপাদনের তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বগ্রামই একত্রে প্রকৃত্যণ্ড নামে অভিহিত। পৃথিব্যণ্ড প্রকৃত্যণ্ডেরই ব্যাপ্য অণ্ড। নিম্নে সংক্ষেপতঃ পৃথিব্যণ্ডের সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

পৃথিব্যণ্ড—পৃথিবীতত্ত্ব

প্রকৃত্যণ্ডের অন্তর্গত পৃথিবীতত্ত্বই অন্তিম পৃথিব্যণ্ড। আমাদের পুরাণাদিবর্ণিত চতুর্দ্দশভুবন পৃথিব্যণ্ডেরই অন্তর্গত। ইহা নিম্নে কালাগ্নিভুবন, এবং উর্দ্ধে বীরভদ্রভুবন পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পাতাল, নরক, মেরু, ব্রহ্মচক্রাদি সমস্তই পৃথিবীতত্ত্বের অভ্যন্তরে। ব্রহ্মা এই অণ্ডের অধিপতি—এই নিমিত্ত ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডগুলিও আবার সংখ্যায় অনন্ত। অবশ্য পুরাণেও ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্যতার কথা বলা আছে যথা— ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং ইত্যাদি।

প্রমাতৃভেদ

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের প্রত্যেকটি আশ্রয় করিয়া তত্তৎ তত্ত্বময় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভুবন, ভোগসামগ্রী এবং নানাবিধ ভোক্তৃবর্গ রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রত্যেক ভুবন, ভুবনাধিপতি, ভুবনবৈচিত্র্য এবং ভবনস্থ প্রমাতৃবর্গ সম্বন্ধে অতি বিস্মত আলোচনা রহিয়াছে। বিস্তারভয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল না। প্রয়োজন বোধে এস্থলে প্রমাতৃভেদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পরমেশ্বরের স্বরূপপ্রকাশে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, অতএব সর্ব্বভাবে প্রকাশরূপে কিম্বা অপ্রকাশরূপে, তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। স্বরূপপ্রকাশের, তারতম্য অনুসারে উহা সপ্তধা কল্পিত হইয়া থাকে, যথা— সর্ব্বথা অপ্রকাশরূপে প্রকাশ (১) সর্ব্বথা প্রকাশস্বরূপে প্রকাশ (২) ভাগশঃ প্রকাশরূপে প্রকাশ, তন্মধ্যে আবার সকল ভাবের ব্যতিরেকতঃ প্রকাশ (৩) সকল ভাবের অব্যতিরেকতঃ প্রকাশ (৪) কতিপয় ভাবের ব্যতিরেকতঃ প্রকাশ (৫) কতিপয় ভাবের অব্যতিরেকতঃ প্রকাশ (৬) এবং পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণরূপে প্রকাশ (৭)। এই প্রকাশবৈচিত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন (৮)।

উহারাই সপ্তপ্রকার প্রমাতা। তন্মধ্যে প্রথমটি জড়োল্লাস এবং অন্তিমটি পরমশিবদশা। মধ্যবর্ত্তী প্রকারপঞ্চকই যথাক্রমে শিব, পশু, মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর এবং বিজ্ঞানাকল প্রমাতা নামে কথিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানাকল প্রমাতৃগণ সাংখ্যীয় মুক্তপুরুষকল্প। ইহারা—প্রকৃতি, এমন কি মায়া পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথচ শুদ্ধ বিদ্যার সাক্ষাৎকার পান নাই। সেই জন্যই বিজ্ঞানাকল প্রমাতৃগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকিলেও তাহাদের সেই ভেদের বোধ থাকে না। ইহাই আগমিকগণ বলিয়া থাকেন। বাহুল্যভয়ে ইহাদের বিস্তারও এস্থলে প্রদত্ত হইল না। ভবিষ্যতে প্রমাতৃভেদ সম্বন্ধেই স্বতন্ত্র আলোচনার ইচ্ছা রহিল। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ তন্ত্রালোক, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের বহু আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আমরা আভাসবাদ এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই প্রকৃত প্রবন্ধ শেষ করিয়া ফেলিব।

আভাসবাদ

অদ্বৈত তান্ত্রিকাচার্য্যগণ যে দার্শনিক দৃষ্টি দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি এবং স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাকেই আভাসবাদ বলে। ইহা বিবর্ত্তবাদের তুল্য হইলেও সর্ব্বথা অভিন্ন নহে। উভয়বাদেই দর্পণনগরের দৃষ্টান্ত-দ্বারা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গতি দেখান হইয়া থাকে। এই অংশে আভাস-বাদ বিবর্ত্তবাদ সজাতীয়। আভাসবাদ ব্যাখ্যাইতে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—যেমন নির্ম্মলদর্পণে নগর, গ্রাম, পুর, পাকারাদি প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণান্তর্গতরূপে

---

(৮) স ঈশ্বরস্বভাব আত্মা প্রকাশতে তাবৎ। তত্র চ অস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ইতি ন কেনচিদ্ বপুষা ন প্রকাশতে, তত্র অপ্রকাশাত্মনাপি প্রকাশতে, প্রকাশাত্মনাপি। তত্রাপি প্রকাশাত্মনি সর্ব্বথা প্রকাশাত্মনা প্রকাশো ভাগশো বা, ভাগশঃ প্রকাশনে সর্ব্বস্য ব্যতিরেকেণ অব্যতিরেকেণ বা, কতিপয়স্য ব্যতিরেকেণ অব্যতিরেকেণ বা, উক্ত প্রকারপূর্ণতয়া বা, তদমী সপ্তপ্রকারাঃ—(প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ১।১।৩)

দর্পণাভেদেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে; কিন্তু, তথাপি প্রত্যেক পতিবি স্বলক্ষণ হইয়া পরস্পর বিভক্তরূপেও স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বরে প্রতিবিম্বিত এই বিশ্ব তদভিন্ন হইলেও নানারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। দর্পণ ভাবরাশি পৃথগ্‌রূপে অবভাসিত হইলেও সে স্থলে দর্পণ ভিন্ন কিছুই উপলব্ধ হয় না। কিন্তু দর্পণসামরস্যে স্থিত হইয়াও জগৎ ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। এই দর্পণ প্রতিবিম্ব হইয়াও তদুত্তীর্ণস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, কারণ, শুধু তন্ময় হইলে দর্পণের স্বরূপাপহানি হইত এবং তাহা হইলে 'ইহা দর্পণ নহে, কিন্তু নগরাদি' এইরূপই সকলের প্রতীতি হইত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কাহারও হয় না। তদ্রূপ পরমেশ্বরে নিখিলভাবরাশি প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্তে আভাসিত হইলেও তাঁহার তন্ময়তা ব্যতিরেকে তদুত্তীর্ণতাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। দর্পণকে প্রতিবিম্ববিশিষ্টও বলা যায় না; কারণ, ইহা ঘটদর্পণ, ইহা পটদর্পণ ---এইরূপ দর্পণস্বরূপহানির বোধ দর্পণে কাহারও হয় না। এইরূপে পরপ্রকাশেও দেশ, কাল এবং আকারাদি সমগ্র ভাব আভাসিত হইলেও ঐ সকল আভাসদ্বারা প্রকাশকে বিশিষ্ট বলা যায় না। দেশ, কাল আকারাদির প্রকাশরূপতা কখনও চ্যুত হয় না---কারণ, প্রকাশরূপতার হানি হইলে কাহারও স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে অনেক বার বলা হইয়াছে---তাহাও এই স্থলে স্মর্ত্তব্য। দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃষ্টান্ত হইতে আভাসের বৈলক্ষণ্য এই যে---দর্পণে বাহ্য হস্ত্যাদিই প্রতি-বিম্বরূপে অভিমত হইয়া প্রকাশ পায়, উহারা দর্পণের স্বনির্ম্মিত নহে, অতএব দর্পণের হস্তীতে 'ইহা হস্তী' এইরূপ নিশ্চয় ভ্রান্তি। প্রকাশ স্বেচ্ছায় স্বাত্মভিত্তিতে অভেদে ভাবরাশির পরামর্শপূর্ব্বক সংবিদ্রূপ উপাদানেই বিশ্ব আভাসিত করিয়া থাকে। এই বিশ্বের আভাসই পরমেশ্বরের নির্ম্মাতৃতা। অতএব পরামর্শই প্রকাশের জড়দর্পণ-প্রকাশাদি হইতে বৈলক্ষণ্যসাধক মুখ্যরূপ। ইহাই অভিনবগুপ্ত তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞা-বিবৃতিবিমর্শিনীতেও বলিয়াছেন---

> অন্তর্বিভাতি সকলং জগদাত্মনীহ
> যদ্বৎ বিচিত্ররচনা মুকুরান্তরালে।
> বোধঃ পুনর্নিজবিমর্শনসারযুক্ত্যা
> বিশ্বং পরামৃশতি নো মুকুরস্তথা তু॥

সাধন---শক্তিপাত

পরমেশ্বর স্বয়ংই স্বকীয় মায়াশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া জীব সাজিয়াছেন; অতএব, নিরোধশক্তির অধিকার সমাপ্ত না হইলে জীবের মুক্তির আশা নাই। জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন সাধনাই অবলম্বন করুক না, যত দিন সে মায়ারাজ্যের অন্তর্গত, তত দিন তাহার সাধনজন্য জ্ঞানাদি সমস্তই মায়ারাজ্যেরই উপকারক হইবে। অদ্বৈতজ্ঞান তাহাদ্বারা কখনও লভ্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তান্ত্রিকা-চার্য্যগণ বলেন, মুক্তি ভগবদনুগ্রহসাপেক্ষ। পরমেশ্বর শক্তিমান্, তিনি যেমন নিগ্রহশক্তির আশ্রয়, তেমনই আবার অনুগ্রহশক্তিরও তিনিই আশ্রয়। পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, জীবে তাহার অনুগ্রহশক্তির পতন আবশ্যক। ইহাই পারিভাষিক শক্তিপাতশব্দে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর পরস্বতন্ত্র; অতএব, ঐ শক্তিপাতে কোন নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা, না থাকিলেও সাধারণতঃ কর্ম্মসাম্য, মলপাক প্রভৃতি নিমিত্ত আশ্রয় করিয়াই শক্তিপাত সংঘটিত হইয়া থাকে, এরূপ বলা হয়। শক্তিপাত হইলে তৎপর দীক্ষাদির অনন্তর সাধক অধিকারানুসারে শাম্ভবাদি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন; এবং পরিশেষে "আমি পূর্ণ" এই প্রকার স্বরূপ---

প্রত্যভিজ্ঞা

দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া যান। প্রসঙ্গতঃ প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেই কাশ্মীর-শৈবদর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনও বলা হইয়া থাকে। প্রত্যভিজ্ঞা-অর্থ---স্বাত্মাভিমুখ প্রকাশ (প্রতি-প্রতীপ, অভিজ্ঞা-প্রকাশ) অর্থাৎ অতীতে যাহা জ্ঞানগোচর হইয়াছে, পুনরায় তাহার বর্ত্তমানজ্ঞান-গোচরতার অনুসন্ধান। আত্মাবভাস কখনও অননুভূতপূর্ব্ব হয় না; কারণ, সর্ব্বথা আত্মা অবিচ্ছিন্নপ্রকাশ, কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বকীয় শক্তিদ্বারাই বিচ্ছিন্নের ন্যায় যেন বিকল্পিত হইয়া থাকেন। শক্তিপাত সিদ্ধ হইলে আগমানুমানাদি দ্বারা পূর্ণশক্তিস্বভাব পরমেশ্বর বিদিত হইলে আত্মাভিমুখ প্রতিসন্ধান দ্বারা 'আমিই সেই পূর্ণস্বভাব' এইরূপ জ্ঞান উদিত হয়---সেই জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা। উৎপলাচার্য্য প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সুন্দর এক উদাহরণ দিয়াছেন। কোন নায়কের গুণ শ্রবণবশতঃ অনুরাগবতী কোন কামিনী যেরূপ সেই নায়কের পরমকাম্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অহর্নিশ অবশহৃদয়ে কালযাপন করে এবং দূতীপ্রেষণ, মদনলেখ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নায়কের নিকট তাহার প্রেম নিবেদন করিয়া পাঠায় এবং তৎপর নায়ক অভিমুখীভূত হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেও তৎপ্রতি সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিতে নায়িকার পূর্ণ মনোরথ হয় না---তেমনি পরমেশ্বর সতত প্রকাশমান হইলেও তদীয় প্রকাশ জীবের পূর্ণতাসাধন করিতে পারে না; কারণ, সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি অপ্রতিহতশক্তিস্বরূপ পারমেশ্বর্য্যযোগে পরামৃষ্ট হয় না—অতএব ভাসমান ঘটাদিতুল্যই আবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত নায়কই যদি দূতীবচনদ্বারা অথবা তাহার তত্তৎ বিশেষ উৎকর্ষ সন্দর্শনে সেই বাঞ্ছিতনায়করূপে নায়িকাদ্বারা পরামৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নায়কই অপূর্ব্ব আনন্দরসে নায়িকার হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ গুরুবচনদ্বারা অথবা জ্ঞানক্রিয়ালক্ষণ শক্তির অভিজ্ঞান দ্বারা জীবের স্বাত্মাতেই পারমেশ্বর্য্যের আমর্শন হইলে, তৎক্ষণাৎই জীব পূর্ণতারূপ জীবন্মুক্তিপদে আরূঢ় হয়। ঐ পরামর্শের অভ্যাসেও বিভূতিলাভ হইয়া থাকে; অতএব, পর, অপর---উভয়বিধ সিদ্ধিই প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। 'আমি পূর্ণ' এই বোধই প্রত্যভিজ্ঞার পরম ফল; অতএব, উহাই তন্ত্রশাস্ত্রে মুক্তিরূপ পরসিদ্ধি নামে আখ্যাত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে অনেকগুলি তত্ত্বের পরিচয় দিতে হইয়াছে। অতএব বিষয়-গাম্ভীর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া কোন তত্ত্বেরই বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় সুযোগ হইলে আমরা ভবিষ্যতে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় লইয়া এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব আশা রহিল। প্রকাশের স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রত্যেক দর্শনেই বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দৃষ্টিরই বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয় দর্শনেও Conscious, unconscious, Subconscious, Self Conscious ইত্যাদি বিষয় লইয়া বহু গবেষণা করা হইয়াছে। Self Consciousnessই আমাদের আলোচ্য দর্শনের স্বাতন্ত্র্যশক্তি বা প্রকাশের দ্বারা বিমর্শরূপ মহাবিশ্রান্তি। এই মহাবিশ্রান্তি পদের বিমর্শপূর্ব্বক আজ এই স্থানেই আমরা শিবাদ্বৈতদর্শনের আলোচনা শেষ করিতেছি:---

> বিশ্বাত্মিকাং তদুত্তীর্ণাং হৃদয়ং পরমেশিতুঃ।
> পরাদিশক্তিরূপেণ স্ফুরন্তীং সংবিদং নুমঃ।

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ (এম-এ, শাস্ত্রী)

একান্নবর্ত্তী

(চিত্র)

দরদালান-ঘেরা চক্‌মেলানো বাড়ী।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো উঠোন ঘিরে চওড়া বারান্দা, তার গায়ে লাগানো ঘরের সার।

কর্ত্তারা সাত ভাই,---সকলেই জীবিত। তাঁদের ত্রিশ জন ছেলে, চব্বিশ জন মেয়ে, তদনুরূপ পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী। ছেলে-মেয়ে গুণে এ বাড়ীতে খাওয়ানো নিয়ম। তাদের হাতে একটা ক'রে পরিচয়-ফলক থাকলে ভাল হয়।

সংসারের মোটা খরচগুলি হয় বাড়ী-ভাড়া থেকে। চাল, ডাল আসে সুন্দরবনের আবাদ জমি থেকে ; ছেলেদের পড়া-শোনার খরচ হয় কর্ত্তাদের নিজেদের তবিল থেকে। ছুটির দিনে বেলা ন'টা-দশটার সময় বাড়ীতে ভীষণ গণ্ডগোল, জোরে-জোরে পা ফেলার শব্দ বাড়ীর স্বাভাবিক দৈনিক হৈচৈকে ছাপিয়ে ওঠে। ঝি-চাকররা তাদের কাজের ফাঁকে একবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে তাকিয়ে মুচকি হেসে ইসারায় এক জন আর এক জনকে বলে, 'বাধলো।' প্রতিবেশিনীরা খড়খড়ির পাখি তুলে, কেউ বা চুল শুকোবার ছলে কৌতুক-ভরে এ বাড়ীর দিকে তাকায়। অনেকে আবার লজ্জার মাথা একেবারে খেয়ে ভালো মানুষ সেজে এ বাড়ীর বৌ-ঝিদের ডেকে গণ্ডগোলের সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এ বাড়ীতে অনাহূত আত্মীয়-কুটুম্বের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। সে জন্য ছেলে থেকে বুড়ো পর্য্যন্ত কারো কোন কৌতূহল নেই। এলে---বেশ, থাকো। যাবে---যাও। কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

মেজো কর্ত্তা রেঙ্গুনে কাঠের কারবার করতেন। সে-দেশের বহু টাকা এ-দেশে এনেছেন। সম্প্রতি সেই কারবারকে ইহজন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে একবস্ত্রে এরোপ্লেনে চ'ড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চ'লে এসেছেন। বর্ত্তমান যুগের পরিবর্ত্তনের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তিনিই এ পর্য্যন্ত বাড়ীর সব ছেলেদের পড়ার বেশীর ভাগ খরচ; অক্ষম উকীল সেজো ভাইয়ের মেয়েদের, অকারণে বাড়ীতে বসে থাকা বড় ভাইয়ের মেয়েদের বিয়ের খরচ ; এবং মুদি, কাপড়ের দোকানের, খাবারের দোকানের মোটা বিলের সম্পূর্ণ বাকি হিসাব শোধ করেছেন। এখন তিনি নিজের পরিবার নিয়ে শশব্যস্ত। নিজে বাতে প্রায় শয্যা-গত। কারবার যাওয়ার দরুণ মনে দারুণ অশান্তি। কিন্তু এ সংসারের খরচ কিছু কমেনি। তিনি বলেন,---আমি তো ছেলেদের মানুষ ক'রে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম, এখন যারা নতুন রোজগারী হ'য়েছে, তারা আবার ছোটদের তুলে ধরুক। আমাকে তোমরা ছুটি দাও। কিন্তু নূতন রোজগারীরা এবং তাদের মাতাপিতারা এ প্রস্তাবে বিরক্ত। তাঁরা বলেন, এ ওঁর অন্যায়-অবিচারের কথা। এই নিয়ে গণ্ডগোল হয়।

সকালে এ বাড়ীতে বড় বড় ঠোঙায় করে খাবার আসা নিয়ম। সংসারের ঝি ঘরে-ঘরে ঘুরে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে, কার জন্য কি খাবার আনবে? জন-প্রতি চার পয়সার খাবার বরাদ্দ। ফরমাস চলে---তেলে ভাজা, ঘিয়ে ভাজা। তার পর আছে, যার যার নিজের পয়সায় নিজের ঝি দিয়ে খাবার আনা।

সম্প্রতি এ বাড়ীতে কর্ত্তাদের ছোট-ভগিনী শ্যামাসুন্দরী এসেছেন। তার বড় ছেলে মুঙ্গেরে ডাক্তার। তিনি তার কাছেই থাকেন। ছোট ছেলে অমল বিলেত থেকে খুব বড় একটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, শীঘ্র দু'-এক দিনের মধ্যে সেও পশ্চিমে একটা চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছে। সংবাদ পেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে শ্যামাসুন্দরী এখানে এসেছেন।

অমল তার শ্বশুর-বাড়ীতে উঠেছে। শ্যামাসুন্দরী অমলকে বলে দিয়েছেন---বৌমা খোকাকে নিয়ে কাল আসিস্।

অমল তার শ্বশুরের ক্যাডিল্যাক্-কারে চড়ে এ বাড়ীর গেটের কাছে এলো। বাড়ীর দরজায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মিনার্ভা, ইভিবেকার প্রভৃতি ছ'খানা গাড়ী। সবগুলিই এ বাড়ীর গাড়ী। কে এলো ব'লে ছেলে-মেয়েদের ছুটে আসা এ বাড়ীতে নিয়ম নেই। শ্যামাসুন্দরী শুধু নীচে এসে পুত্রবধূ সুনন্দার হাত ধরে পৌত্র সুমনকে কোলে নিয়ে দোতলায় তাঁর ঘরের যে দালান, সেই দালানে তাদের এনে বসালেন। তাদের পানে কেউ এক চোখে তাকালো, কেউ বা তাকালো না। যে যার নিজের কাজ নিয়ে মত্ত।

বড় কর্ত্তার স্ত্রী এ বাড়ীর গৃহিণী। তিনি গম্ভীর, স্বল্পভাষিণী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না নারী। শ্যামাসুন্দরী সুনন্দাকে বল্লেন,---ইনি তোমার বড় মামী-শাশুড়ী, প্রণাম করো। সুনন্দা তাকে প্রণাম করলে তিনি মৃদু হেসে সুনন্দার চিবুক স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করলেন ; তার পর তাকে সামান্য দুটি কথা জিজ্ঞাসা করে সুমনকে আদর করে ব্যস্তভাবে নিজের কাজে চলে গেলেন।

এমনি ক'রে শ্যামাসুন্দরী এ বাড়ীর গৃহিণী, বধূদের সঙ্গে সুনন্দার পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রণাম ক'রে ক'রে সুনন্দার কপালে দুটো সিং গজাবার উপক্রম হ'লো।

ঘণ্টা পড়লো বাড়ীর ছোট ছেলেদের জল খাওয়ার। ছোটরা কলরব করতে করতে এসে ওই দালানের এক ধার জুড়ে বসে পড়লো। চারখানা ক'রে পরোটা, কমড়োর ছক্কা, আর গুড়। মেজ কর্ত্তার বড় ছেলের বৌ তার ছেলে-মেয়েদের পাতে খানকয়েক গরম কচুরী, বড় বড় লেডিক্যানি দিয়ে গেল। বড় কর্ত্তার ছোট ছেলের বৌ, ন' ছেলের বৌ তাদের ছেলে-মেয়েদের পাতে গরম লুচি, আলুর দম, ছানার গজা ত্বরিত গতিতে দিয়ে চলে গেল। সেজ কর্ত্তার মাতৃহীন নাতিরা একবার শুধু তাদের পাতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের খাবার খেয়ে যেতে লাগলো। ছোট কর্ত্তার স্ত্রী তাঁর ছেলেদের পাতের কাছে ক'বাটি গরম দুধ রেখে চলে গেলেন। ন' কর্ত্তার গৃহিণী তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতিদের হাতে গোটাকয়েক টফি, বিস্কুট, লজেঞ্জ দিয়ে গেলেন। আর যারা কিছু পেলো না, তাদের মধ্যে এ জন্য কোন রকম অশান্তির লক্ষণ দেখা গেল না। তারা অম্লান বদনে তাদের খাবার খেয়ে যেতে লাগলো।

শ্যামাসুন্দরী বল্লেন, "তুমি তো আমার বাপের বাড়ীতে কখনো আসোনি বৌমা, এসো, ঘুরে সব দেখাই।"

এমন সময় একটি বর্ষীয়সী রমণী---ইনি এ বাড়ীর মেজো গিন্নী---এক-গাল হেসে মুখে জর্দ্দা পুরতে পুরতে বল্লেন,---"ছোট ঠাকুরঝি, থিয়েটারে যাবে?"

"না মেজ বৌঠাকরুণ, আমার যাওয়া হবে না। আমার অমলের বৌ এসেছে। এই দেখো, কেমন হয়েছে?"

—"বৌ তোমার খাসা হয়েছে; রং যেন মেমেদের মতো। তা তোমার ছেলে হ'লো গে বিলেত-ফেরত। দু'-দিনে বৌকে কস্তাদুরস্ত মেম সাহেব বানিয়ে ফেলবে'খন।"

"কেন, তোমার মেজ ছেলে রথীনও তো বিলেত গেছে, মেজ বৌঠাকরুণ। ছেলে অবিশ্যি তোমার সাহেব হয়েছে, কিন্তু কৈ, বৌকে পেরেছো মেলেচ্ছ করতে? জুতোটি পর্য্যন্ত পায়ে দেয় না।"

"তা যা বলেছো, ঠাকরঝি। উত্তরা আমার ভারী নিষ্ঠেবতী। বৌয়ের মাথায় যেমন ঘোমটা, তেমনি বিচার-আচার। শুধু গঙ্গাজল আর গোবর নিয়েই থাকে। সে তো আমার কাছে বর্ম্মায় বেশী দিন থাকেনি, এখানে দিদির কাছেই থাকে। দিদিকে তো জানো, কি পয়-পরিষ্কার বিচারে-আচারে লোক। কারো হাতে খান না। খান শুধু উত্তরার হাতে। ঐ জন্য বাড়ীতে উত্তরা হ'লো দিদির সব চেয়ে আদরের বৌ। নিজের ছেলের বৌদের দিদি অত ভালোবসেন না। এই তো উত্তরা। এই দ্যাখো বৌমা, আমার রথীনের বৌ।"

এ বৌটিকে সুনন্দা একটু আগে দেখেছে, সামান্য একটু পরিচয় হয়েছে। উত্তরা কিন্তু সুনন্দার দিকে না তাকিয়েই চলে গেল। মাথায় তার একটুখানি ঘোমটা, গায়ে শুধু সেমিজ, তার উপর সাদাসিধে ভাবে কাপড় পরা। সুনন্দা বুঝিল, বৌটি মোটেই আলাপী নয়। না হ'লে তারই বয়সী হবে উত্তরা।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—"বুঝলে বৌঠাকরুণ, তোমাদের বাড়ী-ঘর দেখাচ্ছি তোমার বৌমাকে।"

"দেখাও তাই। যে বাড়ী, তিলাদ্ধ জায়গা নেই। মানষগুলোকে যেন কইমাছ জিইয়ে রেখেছে। বর্ম্মা থেকে ফিরে এসে আমার তো দম্ আট্‌কে আসে। এতটুকু বাড়ীতে থাকা অভ্যাস নেই।"

"বাড়ী মেজ বৌঠাক্‌রুণ তোমাদের ছোট নয়, বাঘট্টি খানা ঘর। তবে পরিবার খুব বড় হয়েছে, এর মধ্যে আর ধরে না।"

মেজ গিন্নী ফিস্ ফিস্ করে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে ননদিনীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে কি কতকগুলো কথা বল্লেন। শ্যামাসুন্দরীও ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে নিম্ন স্বরে দু'-চারটে কথা ব'লে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কথাগুলি অতি-পুরাতন—যা নিয়ে ছুটির দিনে বাড়ীতে গণ্ডগোল বাধে। অথাৎ মেজো কর্ত্তা পর্ব্বের মত টাকা দিতে পারেন না। তিনি বলেন, পার্টিসান হোক। না হয়, খরচ কমাও। কোনোটাই কিন্তু হয় না।

শ্যামাসুন্দরী প্রথমে মেজ কর্তার ঘরে সুনন্দাকে নিয়ে গেলেন। চারতলার চারখানা ঘর নিয়ে তিনি থাকেন। বারান্দার কোণে ছোট একটি ঘর। সেটিতে গ্যাস বসানো। তার পাশে আর একটি ঘরে বড় ডাইনিং টেব্‌ল আর চেয়ার পাতা। জালের মীটসেফ আছে। এখানে মেজ গিন্নী নিজের স্বামি-পুত্রের অভিরুচি-মত রান্না করেন, টেব্‌লে খাওয়া হয়। তার জন্য ভিন্ন একটি পাচক আছে। ঘরজোড়া কার্পেট পাতা। মেহগিনি কাঠের সেকালের প্যাটার্ণের বড় বড় জোড়া খাট। পেন্টিং-করা দেওয়ালের কোলে বড় বড় আলমারি, কার্পেটের উপর গোটা দুই ইজি-চেয়ার, খান দুই সোফা। বিছানার ধারে রূপার গড়গড়া। মেজ কর্ত্তা বিছানায় শুয়ে। কর্ত্তার ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। বাঁ পায়ে 'বিটালাল' মালিশ চলছে। দুটি জোয়ান চাকর পা দপদপে দুলে যাচ্ছে। ঘরের জানলা-দরজা সব প্রায় বন্ধ। বিটালালের দুর্গন্ধে ঘর আমোদিত। বধু-ভাজ নিয়ে শ্যামাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করতে মেজ কর্ত্তা বলে উঠ্‌লেন, উহু হু। বাবা।

কেউ তাতে কিচ্ছু বল্লে না। সুনন্দা চম্‌কে ভীত করুণ নেত্রে সেই দিকে চাইলো। মেজ কর্ত্তা মুখ বিকৃত করে বল্লেন, "কে রে? শ্যামা? কি চাস?"

শ্যামাসুন্দরী যথাসম্ভব মৃদু কণ্ঠে বল্লেন, "এই অমলের বৌ এসেছে। তাই তোমায় দেখাতে নিয়ে এলুম।"

মেজ কর্ত্তা তাঁর বিকৃত কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক পর্দ্দায় এনে বল্লেন, "কৈ, কাছে নিয়ে আয়। হেরো, আমার চশমা দে।" চশমা চোখে দিয়ে সুনন্দাকে দেখে তিনি বল্লেন, "বসো, বসো। কি আর দেখবে মা? যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসে এখন বাতে পড়ে আছি। যেতে যদি মা বর্ম্মায়, হ্যাঁ, বলতে বটে, এক জন মামাশ্বশুর বটে। যা রোজগার ক'রেছি, সবই ঢেলেছি এই সংসারে। এখন কেউ আমায় চেনে না। অথচ আমার ছিঁড়ে খাবার ইচ্ছেটা ষোল আনাই। সব আছে। আহা হা, একটু আস্তে আস্তে ডল্ বাবা। উঃ, গেছি রে গেছি। তোমার নামটি কি মা?"

সুনন্দা মৃদু স্বরে বললে, "সুনন্দা।"

—"হুঁ। নামটি তোমার বেশ সুন্দর। মেজ বৌ, তোমার বিকেলের জলখাবারের আজ কি প্রোগ্রাম? বৌমাকে একটা নতন কিছু খাওয়াও। শ্যামা, বৌমা আমার কাছেই খাবার খাবেন। বুঝলি?"

বড় কর্ত্তা ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বধূ নিয়ে শ্যামাসুন্দরী সে ঘরে আসতে প্রফুল্ল হয়ে তিনি বল্লেন,—এই যে, শ্যামা এসেছিস্। এই দেখ দিখি, আবার কি কাণ্ড।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁর মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে তাকালেন। "অমন ক'রে তাকিয়ে রইলি কেন? এদিকে কি বিপদ হ'লো বল্ দেখি?"

শ্যামাসুন্দরী অবাক। বড় কর্ত্তা বলতে লাগলেন,—"মেজ রাণী যে পিভি-কাউন্সিলে আপীল করলেন। তাঁরাও বলেছেন, যদি প্রমাণ করতে পারো, কমার কখন্ মরেছেন, তা-হলেই হ'লো, ব্যাস। আর তাদের সাক্ষি-সাবুদ কিছু চাইনে। ওইতেই হার জিত। বল্ দেখি, প্রিভি কাউন্সিল কি ফ্যাসাদ বাধালো। কুমার দিব্যি বে-থা ক'রে ঘর-সংসারী হ'লো, তাকে আবার বিবাগী ক'রে ছাড়বে। এই যুদ্ধের বাজারে বেচারী কোথায় যায়, বল দেখি? চল্লিশ টাকা চালের মোণ। রাস্তায় তো পা বাড়াবার বো নেই কাঙালীর জ্বালায়। কমার কি শেষে—"

শ্যামাসুন্দরী চিন্তান্বিত ভাবে বললেন,—তাইতো। কমার এখন যায় কোথা? কি বিপদ ঘটালো বিলেতের আপীল।"

উত্তেজিত ভাবে বড় কর্ত্তা বললেন, "বিপদ অমনি ঘটালেই হ'ল কি না। হুঁ। চালাকী না কি? পান্নালাল জজ এমনি বিচার করে রায় লিখেছেন, তার আর কোথাও ফাঁক নেই। মামলার স—ব কাগজ আমার কাছে আছে, দেখ না পড়ে। হরে—"

শ্যামাসুন্দরী বল্লেন, "থাক্ দাদা, তোমার গোছানো কাগজ আবার অগোছালো করবে। তুমি যখন বলছো—"

"আহা, এই পড়েই দেখ্, দেখবি ঘটনাটা যেন এ্যাডভেঞ্চার।"

শ্যামাসুন্দরী আগ্রহভরে বল্লেন—"তাই না কি?"

এই ভাওয়াল মামলার কাগজগুলি তিনি তাঁর বড় দাদার কাছে বহু বার পড়েছেন, তবু তিনি এ সম্বন্ধে ওঁকে উৎসাহ জানান।—"এই দ্যাখো ব দা, আমার অমলের বৌ। তোমাকে দেখাতে নিয়ে এলুম।"

বড় কর্ত্তা এ পর্য্যন্ত সুনন্দার দিকে তাকাননি, তাকে লক্ষ্যও করেননি। সুনন্দাকে দেখে অসহায় ভাবে ভীত কণ্ঠে বল্লেন, —"তা আমি কি করবো? তোমার বড় বৌঠাকরুণ কোথায়? তাকে দেখাও না।"

"তিনি দেখেচেন, তোমাকে দেখাতে এলুম।"

"ওঃ।" বড় কর্ত্তা যে বেশ একটু অসোয়াস্তি বোধ করছেন, সুনন্দা বুঝতে পারলো।

এ পাশের ঘরে তখন চলেছে যুদ্ধ নিয়ে তর্ক। সেজ কর্ত্তা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, আর বাড়ীর মাস্‌তুতো শালা, পিস্‌তুতো মামার ছেলেদের আড্ডা চল্‌ছে তাঁর কাছে। এক জন দাঁড়িয়ে উঠে মুখখানাকে যথাসম্ভব বীভৎস ক'রে টেবলে ঘন ঘন মুষ্ট্যাঘাত করে জানাচ্ছে, এ যুদ্ধের নেতাদের বোকামীর পরিচয়! হিটলারের বদ্ধির দ্রব, তোজোর মোটে তেজ নাই, চার্চিল এক জন ভাগ্যবন্ত।

শ্যামাসুন্দরী সুনন্দাকে নিয়ে সে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এটা আমার সেজ ভাইয়ের ঘর। ও আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট।"

বক্তার মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সেজ কর্ত্তা বললেন, "কে? ছোট্‌দি? ওঃ! এটি কে?"

"এ আমার অমলের বৌ।"

"ওঃ! অমল আজকাল কি করে?"

—সে বিলেত থেকে একাউণ্টেন্টসিপ পাস ক'রে—"

"ওঃ! তা বেশ, তা বেশ।"

সেজ গিন্নী একটি সোফায় বসে পান খাচ্ছিলেন, বল্লেন, "বসবে ছোট্‌দি?"

"না ভাই, বসবো না। বৌমাকে তোমাদের বাড়ী-ঘর দেখাচ্ছি।"

বারান্দার মোড় ফিরে বাঁ পাশের ঘরটি যেন নিষ্কম্প। সে ঘরের আবহাওয়া যেন আড়ষ্ট। শ্যামাসুন্দরী সুনন্দাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে নিজে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে গেলেন। ঘরের জানলা-দরজায় নীল পরদা। ঘরের মধ্যে ধূপের মৃদু গন্ধ। বাইরে থেকে সুনন্দা দেখলো, ঘরে খাটের উপর রোগী। দু'-জন স্ত্রীলোক তার পরিচর্য্যা করছেন। তাঁদের মুখ উদ্বেগে মলিন। শ্যামাসুন্দরী ফিরে এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে সুনন্দাকে বল্লেন, "আমার বড়দার নাতি! বড় মেয়ের ছেলে, তার বড্ড ব্যামো"—ব'লে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দোতলার যে ঘরটিতে তারা এলেন, সেটি মেছো-হাটার চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। প্রকাণ্ড ঘর। এটি ছোট কর্ত্তার আড্ডা ঘর। ঘরে তার বন্ধু-বান্ধব। বাড়ীর অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের ভিড় ঘর জুড়ে ফরাশ পাতা। ঘরের মাঝখানে বসে তাসখেলা চলছে। ছেলে-মেয়ের দল অত্যন্ত কৌতুকভরে দেখছে আর টিপ্পনি কাটছে। ছোটবাবু যে সময় হেরেছেন, এমন সময় শ্যামাসুন্দরী সুনন্দাকে নিয়ে ঘরে এলেন। ভুরু কুঁচকে ছোট কর্ত্তা বললেন,—"তোমরা কি চাও?"

শ্যামাসুন্দরী হেসে বললেন, "কিছু চাইনে রে। আমার অমলের বৌকে তোমাদের বাড়ী-ঘর দেখাচ্ছি।"

ছোট কর্ত্তা তাঁর তাস দেখতে দেখতে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "দেখানো হলো তো? এখন যাও। আমার সব মাটি ক'রে দিলে।"

তার পাশের দুটি ঘরে চলেছে সঙ্গীত-সাধনা। একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। তাদের বাঁয়া-তবলা হারমোনিয়াম, তারের বাজনা, বেয়াড়া সুরে সকলের কানে তালা ধরিয়ে দেয়। যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে। খুব গর্ব্বভরে সেই দুটি ঘর দেখিয়ে শ্যামাসুন্দরী বললেন, "দাদারা গান-বাজনা খুব ভালবাসেন কি না, তাই ছেলে-মেয়েদের যত্ন ক'রে শেখাচ্ছেন। এটি কোনো দিন বাদ যাবে না।"

সুনন্দা অবাক হয়ে ওই দিকে তাকালো।—ঠিক এই ঘরের উপরের ঘরেই সেই রুগ্ন ছেলেটি থাকে। এদের একটুও বিবেচনা নেই? আশ্চর্য্য!

কোথা থেকে একটি কিশোর বালক এসে সুনন্দাকে বল্লে, "আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হবেন? সামান্য চাঁদা, মাত্র দু-টাকা। হোন না।"

শ্যামাসুন্দরী সেই ছেলেটিকে বল্লেন, "তুই বলতো এ কে?

"তা অত-শত জানিনে। উনি যখন রয়েছেন এই বাড়ীতে, তখন আমাদের বাড়ীর কেউ নিশ্চয়।"

এমন সময় উত্তরা এলো। সুনন্দার দিকে একবার চেয়ে সেই ছেলেটিকে সে বল্লে, "দেখো তো, কোথা থেকে এক ভদ্রলোক নীচেয় এসেছেন, শুনছি। খোঁজ নাও তো।" ব'লে সে একবার সুনন্দার দিকে চেয়ে চলে গেল।

খাবার দালানে সুনন্দাকে বসিয়ে শ্যামাসুন্দরী একটি চাকরকে ডেকে তার হাতে কি গুঁজে দিয়ে চুপ চুপি কি যেন বললেন। চাকরটি তাঁর কথায় ঘাড় নেড়ে সুনন্দার দিকে একবার চেয়ে চলে গেল। বাড়ীর রাঁধনী বাণীর মা একখানা রেকাবীতে খানকয়েক পরোটা একটু তরকারী, দুটি মিষ্টি এনে সুনন্দাকে খেতে দিল। ব্যস্ত ভাবে ঘুরতে ঘুরতে বড় গিন্নী মৃদু কণ্ঠে সুনন্দাকে বললেন, "ছি, ফেলো না,—সব কুড়িয়ে খাও। খোকা দুধ খায় তো? চুমুক দিয়ে খেতে পারে? বেশ লক্ষ্মী ছেলে তো। তুমি নিশ্চয় চা খাও—কেমন?"

মৃদু স্বরে সুনন্দা বল্লে, "খাই, তবে দরকার নেই।"

একটু পরে একটি বৌ একটি কাপে ক'রে চা এনে সুনন্দার পাতের কাছে রাখলো। সুনন্দার ইচ্ছা হলো এদের সঙ্গে ভাব করে, কিন্তু এ বাড়ীর বৌ বা মেয়েরা কেউ যেন মিশতে চায় না। অথচ দূর থেকে যে সুনন্দাকে তারা লক্ষ্য করছে তা সে বুঝতে পারে। তার চোখে চোখ পড়লে ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আবার তারা এক জন আর এক জনার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গোপন হাসি হেসে কি যেন বলে। একটি মেয়ে এসে বল্লে, "ছোট পিসীমা কোথায়? বাবা বলছেন, কে যেন এসেছেন, তাঁকে বাবার কাছে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।" সুনন্দা দেখলে, এই মেয়েটি মেজ মামাশ্বশুরের।

. . . . . .

খেয়ে এসে সুনন্দা দেখলে, শ্যামাসুন্দরীর কাছে তার বাবা কিশোরী-নাথ বসে গল্প করচেন।

"—তুমি কতক্ষণ এসেছো বাবা ?"

"সে কথা আর ব'লো না মা। কোর্ট-ফেরতাই এলুম। ভাবলুম, বাড়ী গেলে আবার এত দূর আসা সহজ হবে না। তা মা, এসে নীচেয় বসে আছি.তো বসেই আছি,—কত চাকর, কত ছেলেকে বললাম বাড়ীর ভেতর খবর দাও, আমি এসেছি। তা কেউ গ্রাহ্য করে না। অথচ আমার দু-পাশের দু-ঘরে চলছে একঘেয়ে ক্যারম, 'বাগাটেল' খেলা। অন্য ঘরে চলছে কিলুষ্টারদের মহিমার গল্প। কে আমার কথা শোনে ? ভাবলাম, দূর ছাই—চলে যাই। এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে একটি ছেলে গিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে এলো।"

পশ্চিমের কোন সহরে সুনন্দাকে নিয়ে অমল এসেছে। বেশ সুন্দর জায়গা, কিন্তু বা লী-বর্জিত। অন্যান্য অফিসাররা সব ওই দেশী। তবে শিক্ষিত লোক, কাজেই সভ্য। তাঁদের স্ত্রীরা বেশ সুন্দর ইংরেজি বলেন। সুনন্দাও ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলেও কি জানি, কথা বলে সুনন্দার সুখ হয় না। অমল তাকে একটা ক্লাবে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়েছে। সুনন্দা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ গল্প, নাটক, নভেল, মাসিকপত্র পড়ে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে অমলকে বলে, —"কবে যে বাংলা দেশে যাবো। প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। মাছের ঝোল, ভাত, আর বাংলা কথা ছাড়া বাঙ্গালীর পক্ষে বেঁচে থাকা সে কি কষ্টের, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি।" "অমল বলে, "আমি ভাব্‌ছি, যুদ্ধ থাম্‌লে তোমায় নিয়ে বিলেত যাবো।"

দু'দিন ধরে সুমনের জ্বর। ডাক্তার সব খোট্টা। তাদের চিকিৎসা মোটেই ওদের পছন্দ হয় না।

—"চলো ওকে নিয়ে কলকাতা চলে যাই।"

"তুমি যদি একলা পারো যেতে, তা'হলে চাপ্‌রাশী সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। আমার ছুটি পাওয়া শক্ত।"

বাইরে একখানা গাড়ী দাঁড়ালো। একটু পরেই বেয়ারা এসে একখানা কার্ড দিলে। অমল উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে বল্লে, "এস রথীনদা। এ কি, বৌদিও যে। হঠাৎ ?"

রথীন হেসে বল্লে, "আমার চাইতে উত্তরারই এখানে আসবার আগ্রহ বেশী। কি বলো উত্তরা ?"

পায়ে হাই-হিলের জুতো, নূতন ষ্টাইলে কাপড় পরা, মাথা নিরাভরণ—উত্তরার দিকে সুনন্দা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো।

সলজ্জ হেসে উত্তরা বল্লে,—"আস্‌তে চাওয়াটা তো আশ্চর্য্য নয়। ও কি, খোকার অসুখ না কি ? আহা হা। জ্বর ? কত ?" সহানভূতিভরে উত্তরা সুমনের গায়ে হাত দিল। "—কে দেখ্‌ছে ? ডাক্তার ক্ষেত্রি ? রাম। খোট্টাগুলো আবার ডাক্তার না কি ? আমি আজ ক' মাস আছি এ দেশে, মানে এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে —মিটিঙ্গ। সেখানকার হাসপাতালে উনি ডাক্তার। হ্যাঁ, শোনোনি ?— একেবারে পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থান। ওঁর মুখে শুন্‌লাম, অমল কুরূপো টিহিরিটে এসেছেন। আজ ওঁকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে এলুম। তা ওঁকে দিয়ে চিকিৎসা করাবো ?"

অমল সুনন্দা একসঙ্গে ব'লে উঠলো—"সে কথা আর বলতে। তবে এত দূর থেকে রোজ আসা —সে যে বড় কষ্ট।"

"আরে রাখো তোমার কষ্ট। ভারি তো ত্রিশ মাইল পথ। উনি ঠিক আস্‌বেন।"—তার পর রথীনকে বল্লে, "দেখো, খোকার যে ক'দিন অসুখ না সারে, আমি এইখানেই থাকবো, বুঝ্‌লে।" রথীন অমলকে বল্লে, —"দেখ্‌লে অমল, পাছে আমি খোকার চিকিৎসা করতে রোজ না আসি তোমার বৌদি আমার লাগাম ধরে রাখলেন, বুঝলে ?" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

উত্তরার শুশ্রূষায় রথীনের চিকিৎসায় খোকা দু'দিনেই সুস্থ হ'য়ে উঠলো। সুনন্দা দেখলে, উত্তরা চমৎকার মিশুক মেয়ে। সুমনের অসুখ থাকা সত্ত্বেও তার দিনগুলি উত্তরার সাহচর্য্যে বেশ সুন্দর ভাবেই কাটলো।

সুনন্দা বল্লে, "তুমি এত মানুষ ভালোবাস দিদি ?"

উত্তরা আদর ক'রে সুনন্দার গাল দু'টি টিপে বল্লে, "আমি চিরদিনই এমনি রে। যদি বর্ম্মায় যেতিস্, দেখতিস্ মা-ও লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে কত ভালবাসেন। সেখানে সন্ধ্যে হ'লে বাড়ীতে চা আর পান তৈরি ক'রে শেষ ক'র্‌তে পারতুম না।"

যাবার সময় উত্তরা সুনন্দাকে তার বাড়ী যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ কর্‌লে এবং যা যখন প্রয়োজন হবে, অবশ্য অবশ্য তাকে জানাতে বলে গেল।

সুনন্দার ঠাকুর নেই, চাকর দরকার, উত্তরা পাঠায়। ভাল, ঘি কোথাও পাওয়া যায় না, উত্তরা পাঠায়। অমল ঠাট্টা ক'রে বলে, "তোমার ঘরে নূণ তেল আছে তো সুনন্দা ? না, উত্তরা বৌদির সাপ্লাই অফিসে জানাবো ?"

"যাও যাও, ঠাট্টা ক রো না। এই বিদেশে কার এমন আপন জন থাকে, বলো তো ? কি চমৎকার লোক। আমাদের দেখ্‌তে রোজ এই ত্রিশ মাইল পথ আসেন। এবার কলকাতায় ওঁদের বাড়ী গেলে আর মস্কিলে পড়তে হ'বে না। উত্তরাদি' আছেন। উনিই সবার সঙ্গে খুব ভাব করিয়ে দেবেন।"

"অর্থাৎ রথীনদা যে এত মিশুক, আমি আগে কখনো ভাবিনি। আমি বোধ হয় বলতে পারি গুণে, এখানে আসবার আগে ওঁর সঙ্গে আমার কটা কথা হয়েছে।'

ছুটিতে অমল সুনন্দাকে নিয়ে কলকাতা এসেছে। রথীনও ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে।

শ্যামাসুন্দরী এসেছেন। তিনি এবার অমলের সঙ্গে অমলের কার্য্যস্থলে যাবেন। সুনন্দা, অমল এলো এ বাড়ীতে। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বাড়ীর একটি বৌকে বললে, "উত্তরাদির ঘরটা কোথায় একটু দেখিয়ে দিন না।"

উত্তরার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে, "উত্তরাদি'।"

চার দিকের বৌয়েরা মেয়েরা তার কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসলো। সুনন্দার এইরকম ভাবে উত্তরাকে ডাকা তাদের কাছে যেন বাড়ীর নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কিছুক্ষণ পরে দরজার পর্দ্দা একটু সরিয়ে গলা বার ক'রে একটু বিরক্তির স্বরে উত্তরা বল্লে, "কে ? সুনন্দা ? আচ্ছা, তুমি নীচেয় বোসোগে, আমি যাচ্ছি।"

সুনন্দা অবাক হ'য়ে একট অপমান বোধে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচেয় চলে গেল সেই দালানের কোণে শ্যামাসুন্দরীর

কাছে। উত্তরা তার সামনে দিয়ে ব্যস্ত-ভাবে ক'বার আনা-গোনা করলে কিন্তু সুনন্দার দিকে চেয়েও দেখ্‌লো না।

রথীন তার ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো, অমল সহাস্যে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "কি খবর রথীনদা ?"

রথীন কাগজ থেকে মুখ না তুলে নীরস কণ্ঠে বল্লে—"খবর আবার কি ? অর্থ চিন্তা। দ্যাখো, বাড়ীভাড়া থেকেই তো এ পর্যন্ত খোরাকি খরচ চলে এসেছে। এবার শুন্‌ছি মেজকর্তা টাকা দেওয়া কমিয়ে নতুন আইন করছেন,—মাথা-পিছু দশ টাকা। কেন ? বিনা-ফিতে আমি বাড়ীর সকলের চিকিৎসা করি, আবার খোরাকীর খরচ আমি দেবো কেন ? আমি সাফ বলে দিয়েছি, পারবো না।" এমন সময় সংসারের ঝি 'মুক্তি' দুধ নিয়ে এসে অমলের ঝি ক্ষেন্তিকে ডাকলো, "কই লো ক্ষেন্তি, দুধ মেপে নে না।" ক্ষেন্তি একটি গেলাস নিয়ে দুধ মেপে নিল। রথীন তার খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে দুধের মাপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌লো। দুধ মাপ হ'য়ে গেলে পুনরায় কাগজ পড়তে লাগ্‌লো।

উত্তরা ঘরে এসে বল্লে, "তোমার সামনে দুধ মেপে দিয়েছে তো ?"

"হু। দিলে তো।"

"ঠিক দিয়েছে ? কম দেয়নি ?"

"ঠিকই তো দিল মনে হলো।"

"না, হয়েছে কি, আজ মেজদির ঘরে মুক্তি এক গেলাস দুধ বেশী দিয়েছে শুনছি—সেই জন্যেই বলছি আমাদের দুধ কম দেয়নি তো ?"

"তা মুক্তিকে চারটে পয়সা বেশী দিলেই তো সে এক গেলাস দুধ দেয়।"

"দ্যাখো, বারান্দার এই কোণটা ঘিরে একটা বাথরুম ক'রে দাও না। রোজ সাবান বার করছি আর রোজ হারাচ্ছে।"

রথীন একমনে কাগজ পড়তে লাগ্‌লো, অমলের সঙ্গে সে কিংবা উত্তরা একটি কথাও বল্লে না।

অমল কিছুক্ষণ বসে উঠে চলে গেল।

অমল সুনন্দাকে নিয়ে ফিরে এসেছে। এখানে এসে সে আর রথীনের কাছে যায়নি। রথীনের ব্যবহারে বড়ই আঘাত পেয়েছে। সুনন্দাকে বলে, "কি, যাবে না কি তোমার উত্তরাদি'র কাছে ?"

সুনন্দা জবাব দেয়, "না, না, ও সব বড় লোকের বাড়ী যাওয়া আমার ধাতে সয় না।"

বাইরে হঠাৎ মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। সুনন্দা, অমল দু'জনে দু'জনের দিকে অবাক হ'য়ে তাকালো। পরক্ষণেই রথীন আর উত্তরা হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করলো। হাসতে হাসতে রথীন বল্লে, "কি অমল, চিনতে পারছো ? এক মাস এসেছো, এর মধ্যে এক দিনও যাওনি। চলো, আজ তোমাদের আমাদের ওখানে যেতেই হবে।"

সুনন্দা, অমল দু'জনেই কি বলতে যাচ্ছিল, অমল বাধা দিয়ে বল্লে, "কোনো আপত্তি শুনবো না। পেট্রোল নেই, তা জানি। আমি এই এক মাস ধরে পেট্রল কিনে জমিয়েছি একটু একটু ক'রে, তোমাদের নিয়ে যাবো বলে। চলো, তোমাদের যেতেই হবে। হ্যাঁ, দেখো, তোমাদের জন্য উত্তরা ঝুনো নারকেল, আর সোণামুগের ডাল এনেছে। কে তাকে বাংলা দেশ থেকে এনে দিয়েছে।"

অমলের মনে পড়লো রথীনের খোরাকী বাবদ সেই দশ টাকার জন্য শোকের কথা।

রথীনের বাংলোয় খাওয়ার টেবুলে গল্প বেশ জমে উঠেছে। কাঁটা-চামচ দিয়ে ফাউল কাটলেট খেতে খেতে উত্তরা বল্লে, "সুনন্দার বড় কষ্ট হচ্ছে। আরে খাও। তুমি এ সব খাও বলেই যেন শুনেছিলুম।"

সুনন্দা লজ্জিত ভাবে বল্লে, "বিয়ের পর এ সব আর খাইনে। আমার শাশুড়ী এ সব খাওয়া পছন্দ করেন না। তিনি যদি শোনেন, আমি এ সব খাই, তা'হলে আমার হাতে তিনি জলটুকুও আর খাবেন না। কিন্তু আমি যে শুনেছিলুম, আপনি খুব নিষ্ঠাবতী—হিন্দুর আচার-বিচার মেনে চলেন।"

উত্তরা সজোরে হেসে উঠলো। বললো—"জানো নন্দা, ও সব অভিনয় করতে হয়।'

অমল বল্লে, "সে কথা সত্যি বৌদি। অভিনয়টা আপনারা খুব ভালই করতে পারেন। আপনাদের কলকাতার বাড়ী গেলে তো আপনারা আমাদের চিন্‌তেও পারেন না।"

রথীন হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। "তা যা বলেছো অমল। ওই বাড়ীটার কেমন ছোঁয়াচে রোগ আছে, ওখানে গেলেই যেন আমরা কেমন হ'য়ে যাই।" ব'লে সে হাসতে লাগলো।

শ্রী উৎপলাসনা দেবী।

ধূপের সুরভি

ধূপের সুরভি মিলায় অন্ধকারে
নির্ব্বাক্ হয়ে জেগে রয় শত তারা—
ঝরা কুসুমেরে রিক্ত শাখারা ডাকে
সূর্য্যমুখীরা মৌন দৃষ্টিহারা।
তুমি চেয়ে রও অপলক বিস্ময়ে
মন ছুটে যায় তেপান্তরের পথে—
কথা কেঁদে মরে বদ্ধ ওষ্ঠাধরে
সুর ভেসে যায় মুক্ত ব্যথার রথে।

দেহ ঘিরে নাচে ধু ধু সাহারার ক্ষুধা
অঙ্গ ঝিমায় নিষ্ফল আক্রোশে—
জ্বলে হলো সারা বক্ষের তলে চিতা—
শ্রাবণের ধারা নামে নয়নের পাশে।
কভু ওঠে ডেকে ঘন অমানিশা ভেদি
বিরহী ডাহুক হারানো সঙ্গীটিরে—
তবু অকরুণ গভীর স্বপনমগ্ন।
ধূপের সুরভি মিলায় অন্ধকারে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)

ছোটদের আসর

আগ্রা-পর্ব্ব

হু হু করে টু ডাউন চলেছে। একখানা কার্ষ্ট ক্লাস কামরায় ব'সে দু'জন লোক কথা কইছে। এক জনের নাম সলিল সেন, অপরের নাম গগন গুপ্ত। দিল্লী-পর্ব্ব সাঙ্গ করে এরা চলেছে--কোথায়? তা এরা নিজেরাই জানে না।

গগন বললে---"কাজ তো হাসিল হ'ল, কিন্তু হজম করা যাবে না। এ নেকলেস বিক্রী করবার উপায় নেই।"

সলিল উত্তর দিলে---"তা নেই জানি, কিন্তু এত খরচপত্তর ক'রে খালি হাতে ফেরা যায় না। খুব কম করে ধরলেও নেকলেসটার দাম হাজার কুড়ির বেশী হবে।"

গগন বিরস বদনে বললে---"ট্যাকশালে তো কোটি কোটি টাকা থাকে, তাতে তোমার আমার কি? এ নেকলেস যদি বিক্রীই না করতে পারা যায়, তবে থাকা না থাকা দুই-ই সমান।"

সলিল হেসে বললে---"আরে ভায়া, আগে থেকেই নিরাশ হয়ে পড়ছ কেন? ভাগ্য বিশ্বাস কর?"

"তা করি। কিন্তু ভাগ্যের জোরে হীরের নেকলেস কুড়ি হাজার টাকার রূপান্তরিত হয় না। এর চেয়ে নগদ হাজার দশেক টাকা পেলে কাজ হতো।"

"তা হতো স্বীকার করি, কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন সে চিন্তা বৃথা। আমাদের উপর এখন ভাগ্যদেবী প্রসন্ন। কিছু বরাত আর কিছু বুদ্ধি দিয়ে যুতসই রকম একটা মিকশ্চার করলে অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং মন খারাপ না করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। সুবিধা এবং সুযোগ একটা না একটা মিলবেই। ফর্নাথিং ভেবে কোন লাভ নেই।" এই বলে সলিল হাসতে লাগল। গগন কিন্তু মুখটা ব্যাজার ক'রে বসে রইল। এ হাসিতে যোগ দিতে পারল না।

টুণ্ডলায় গাড়ী দাঁড়াতেই সলিল বলে উঠল---"এইখানেই আপাততঃ নামা যাক্।"

গগন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে---"এইখানে? টিকিট তো কলকাতা পর্য্যন্ত করেছি।"

সলিল হেসে বললে---"তাতে টুণ্ডলায় নামতে কোন বাধা হয় না।"

বিরক্ত হয়ে গগন বললে---"তা হয় না জানি, কিন্তু দিল্লীর এত কাছে নামা ভাল হবে?"

সলিল জবাব দিলে---"নিশ্চয়ই হবে। কলকাতা পর্য্যন্ত টিকিট করে কেউ হঠাৎ টুণ্ডলায় নামে না। যদি কেউ আমাদের সন্দেহ করে সন্ধান করবার চেষ্টা করে তবে সোজা কলকাতায় যাবে। তা ছাড়া এত দূরে যখন এলুম, আগ্রাটা ঘুরে আসা যাক্। কি বল?"

উভয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল। গাড়ী গন্তব্য পথে চলে গেল। দু'জনে কার্ষ্ট ক্লাসের ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসল। আগ্রার গাড়ী আসতে তখনও প্রায় চার ঘণ্টা বাকী। গগন গিয়ে আগ্রার দু'খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে আনল।

কিছু পরে দু'জন লোক সেই ঘরে ঢুকল। তাদের পাশে দু'টো চেয়ারে বসে আগন্তুকরা গল্প করতে লাগল। সলিল চোখ বুজে ঘুমোবার ভাণ করে এক-মনে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগল। গগন ততক্ষণে নাক ডাকিয়ে ঘুম লাগাচ্ছে।

এক জন বললে---"আগ্রা সহরে এতগুলো ভাল ভাল জহরী থাকতে আলিগড় থেকে আমাদের ডেকে পাঠাবার প্রয়োজন কি?"

আর এক জন উত্তর দিলে---"কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তাঁকে চিনিও না। হঠাৎ আমাদের কার্ম্মের উপর এত দরদ কেন? নিশ্চয় কিছু গলদ আছে।"

প্রথম ব্যক্তি বললে---"এমনও হ'তে পারে হয়ত খুব রইস্ লোক। আগ্রায় সকলেই তাঁকে চেনে। তাঁর ভেতরে-ভেতরে টাকার টানা-টানি যাচ্ছে। কিছু গহনা বিক্রী করতে চান। আগ্রার লোকের কাছে তা করা সম্ভব নয়। তাহলে তাঁর পোজিশন খেলো হবে। তাই আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলে---"নিজে আলিগড়ে গিয়ে এ কাজ করলেই তা ভাল হতো। তা হলে কাজটা খুব গোপনে হ'ত। লোক-জানাজানির কোন সম্ভাবনা থাকতো না।"

প্রথম লোকটি বললে---"তা বটে। লোকটির নাম কি যেন বলেছিলে, ভুলে গেলুম।"

দ্বিতীয় লোকটি জবাব দিলে---"কপূরচাঁদ।"

লোক দু'টি চুপ করবার কিছুক্ষণ পরে সলিল আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে চোখ খুলল, যেন এক ঘুমের পর জেগেছে। তার পর একটু একটু করে লোক দু'টির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে। এ-কথা সে-কথার পর সলিল তাদের জিজ্ঞেস করলে, "আপনারা চা খাবেন?"

বেণের জাত। পরের পয়সায় বিষ খেতেও আপত্তি নেই। সানন্দে চা খেতে রাজী হ'ল। সুটকেস খুলে মণিব্যাগ নিয়ে সলিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সলিল ফিরে এল। সঙ্গে রেলওয়ে রেস্তঁরার এক বয়। হাতে ট্রেতে সজ্জিত চায়ের সরঞ্জাম। সলিল গগনকে চা খেতে ডাকলো। আলিগড়-বাসী দু'জন বললে---"আমরা হাত-মুখ ধুয়ে আসি। আপনি চা প্রস্তুত করুন।" তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সলিল নিজের আর গগনের জন্য দু'কাপ চা ঢেলে নিলে। তার পর পকেট থেকে একটা শিশি বার করে শিশি থেকে খানিকটা সাদা গুঁড়ো চায়ের কেটলীর মধ্যে ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়তে লাগল। বন্ধুরা আসতে হেসে বললে---"চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে ঢালতে পারিনি। তৈরী করব না কি?

তারা হেসে উত্তর দিলে---"করুন। আমরা প্রস্তুত।"

খোস গল্প করতে করতে চা-পর্ব্ব চুকল। বেয়ারা এসে চায়ের ট্রে আর দাম নিয়ে চলে গেল। ঘড়ি দেখে সলিল বললে---"এখনও ট্রেণ আসতে ঘণ্টা দুয়েক দেরী। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে।"

"নব-পরিচিত বন্ধুদ্বয় বললে---"আমাদেরও ভারী ঘুম পেয়েছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে ট্রেণ না মিস করতে হয়।"

সলিল বললে---"আরে না, সে ভয় নেই। আমার বন্ধু তো অনেক-ক্ষণ ঘুমিয়েছে। সে এখন জেগে থাকবে। ট্রেণ-টাইমের ঠিক আধ ঘণ্টা আগে আমাদের ডেকে দেবে।"

অতঃপর তিন জনে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করল। গগন একলা চুপ করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

কতক্ষণ গগন এই ভাবে থাকবার পর হঠাৎ চমকে উঠল। কে যেন ডাকলে---"গগন।"

সকলেই তো ঘুমুচ্ছে। ঘরে অন্য কোন লোক নেই। তবে? গগনের গা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগল। সে ভয় ক্ষণিকের। কারণ, পর-মুহূর্তেই সলিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে-চোখে ঘুমের কোন চিহ্ন নেই। বিস্মিত হয়ে গগন প্রশ্ন করলে---"তুমি ঘুমোওনি?"

সলিল হেসে উত্তর দিলে---"না। কিন্তু এরা ঘুমোচ্ছে। একটু নাড়া দিয়ে দ্যাখো না।"

"যদি উঠে প্রশ্ন করেন নাড়া দিচ্ছিলে কেন, তখন কি জবাব দেবো?"

"আমি বলছি, উঠবে না। আর যদি উঠে পড়ে, তখন প্রশ্নের জবাব তোমায় দিতে হবে না, আমি দেব।"

গগন ভয়ে-ভয়ে প্রথমে ধীরে তার পর জোরে নাড়া দিল, কিন্তু দু'জনের কারুরই ঘুম ভাঙ্গল না। আশ্চর্য্য হয়ে সলিলকে প্রশ্ন করলে---"ব্যাপার কি বল ত'?"

সলিল একগাল হেসে পকেট থেকে একটা খালি শিশি বার-করে বললে---"এই।"

গগন অবাক্ হয়ে এক বার শিশির দিকে আর এক বার সলিলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে---"কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল একটা খালি শিশি দেখছি।"

সলিল হেসে জবাব দিলে---"এতে ঘুমের ওষুধ ছিল। খুব তীব্র এক ডোজে প্রায় বারো ঘণ্টা গভীর নিদ্রা হয়। আমি আগে আমাদের দু'জনের চা ঢেলে নিয়ে যখন ওরা মুখ ধুতে গেল সেই সময় কেটলীতে সমস্ত ওষুধটা ঢেলে দিয়ে খুব ভাল করে মিশিয়ে দিয়েছিলুম। বাপধনরা এখন কম করে উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা এমন ঘুম ঘুমোবে যে, স্বয়ং ব্রহ্মার সাধ্য নেই সে ঘুম ভাঙ্গান। অতএব এরা ট্রেণ মিস করবেই।"

"তাতে আমাদের লাভ?"

"লাভ বিস্তর, কিন্তু ঠিক যে কি, তা এখনো পর্য্যন্ত আমিও জানি না। ভবিষ্যতে আমাদের কি করতে হবে সে পরামর্শ ট্রেণে হবে। এখন এদের সুটকেশ খুলে দু'জনে বেশ-পরিবর্ত্তন করবো।"

যথাসময়ে আগ্রাগামী ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাসে দু'জন হিন্দুস্থানী লোক উঠে বসল। বলা বাহুল্য, এক জন সলিল সেন আর এক জন গগন গুপ্ত। কামরায় অপর কোন যাত্রী ছিল না। দু'জনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে ঠিক করলে সলিল যেখানেই যাক গগন তাকে দূরে থেকে অনুসরণ করবে। ইঙ্গিত না পেলে নিজে থেকে গগন কোন কাজ করবে না।

আগ্রা ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ট্রেণ ঢুকতেই সলিল মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। সোফারের উর্দ্দিপরা এক জন লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বললে ---"আপনি আলিগড় থেকে আসছেন?"

সলিল মৃদু হাস্য সহকারে উত্তর দিল---"হ্যাঁ। কপুরচাঁদ বাবুর লোক আসবার কথা ছিল---"

তাড়াতাড়ি এক লম্বা সেলাম ঠুকে সোফার বললে---"আসুন। কর্ত্তাবাবু আপনার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, শরীর অসুস্থ বলে তিনি নিজে আসতে পারলেন না।" সোফারের সঙ্গে সলিল গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। প্যাকার্ড গাড়ী।

কপুরচাঁদ লোকটার পয়সা এবং সখ আছে। গাড়ী চললো। গগন সলিলকে ঠিক ফলো করে যাচ্ছে। সলিল যেই গাড়ীতে উঠল, গগন অমনি একটি ট্যাক্সিতে উঠে বললে---"সামনের গাড়ীর পিছু পিছু চল। আমি পুলিসের লোক। কোন রকম গোলমাল কোরো না।"

ট্যাক্সিওয়ালা সেলাম জানিয়ে বললে---"না হুজুর।" ট্যাক্সি প্যাকার্ডের পিছু পিছু চলল।

ট্রাঙ্ক রোড ছাড়িয়ে দয়াল-বাগের কাছাকাছি গিয়ে প্যাকার্ড এক বিরাট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করল। পল্লীটা নির্জন। একটু দূরে গাছতলায় গগন ট্যাক্সি দাঁড় করাতে বললে। ড্রাইভারের হাতে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বললে---"তুমি এইখানেই অপেক্ষা কর। আরও বখ্‌শিশ পাবে।"

ড্রাইভার সেলাম ঠুকে বললে---"জী হুজুর।"

সিগারেট টানতে টানতে অট্টালিকার সামনে গগন পায়চারি করতে লাগল।

প্যাকার্ড গিয়ে অট্টালিকার পোর্টিকোতে দাঁড়াতেই এক জন উর্দ্দিপরা চাকর এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। ড্রইং-রুম থেকে এক প্রৌঢ় ও একটি যুবতী বেরিয়ে এল। সলিল গাড়ী থেকে নামতেই প্রৌঢ় বললে---"এই যে আসুন রাজা বাহাদর, সব ভাল তো?"

সলিলের উপস্থিত বুদ্ধির কোন দিনই অভাব ছিল না। এক মুহূর্ত্তেই সলিল সেন রাজা বাহাদর বনে গেল। হাসিমুখে বল্লে---আজ্ঞে হ্যাঁ। সব এক রকম ভাল। তবে যুদ্ধের বাজার, বুঝছেন তো?"

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে প্রৌঢ় উত্তর দিলে---"বিলক্ষণ। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এটি আমার মেয়ে দময়ন্তী, আর ইনি হলেন রাজা বাহাদর অফ কলসী-ঘটিপুর।"

সলিল রাজা বাহাদরের উপযুক্ত যুতসই দু'-চারটে কথা বলে মেয়েটিকে নমস্কার করলে। মেয়েটি প্রতি-নমস্কার করে বললে---"আমি ভেবেছিলুম, সোফার হয় ত' চিনতে পারবে না। আগে কখনও আপনাকে আমি দেখিনি।"

তাড়াতাড়ি কপুরচাঁদ বললে---"আমিও আপনার চেহারা প্রায় ভুলে গিছলুম। সেই কত দিন আগে বিলেতে দেখা হয়েছিল। মনে পড়ছে?"

সলিল বললে---"বটেই তো। বহু দিনের কথা।"

ততক্ষণে তারা ড্রইং-রুমে গিয়ে বসেছে।

দময়ন্তী বললে---"বাবার কাছে আপনার প্রাসাদের অনেক বর্ণনা আর সুখ্যাতি শুনেছি।"

সলিল হেসে বললে---"কপুরচাঁদ বাবু একটু বাড়িয়ে বলেছেন, প্রাসাদটি আমার বড় সখের। ইটালী থেকে মার্ব্বল আর কারিগর আনিয়ে তৈরী করিয়েছি। দেশ-বিদেশের রকমারী ফুলগাছ এনে বাগানটিকে সাজিয়েছি। একটা পুকুর তৈরী করেছি, সেখানে জলের মধ্যে আলো জ্বলে। আর কত রকম যোড়া---আপনারা এক বার যাবেন। না দেখলে ঠিক আইডিয়া হবে না।"

কপুরচাঁদ বাবু মেয়েকে বললে---"মা, তুমি গিয়ে কাপড়-জামা পরে নাও। বলবন্ত সিংএর আসবার সময় হ'ল।" দময়ন্তীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মাথা নীচু করে ধীর পদবিক্ষেপে সে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল। কপুরচাঁদ হেসে সলিলের পিঠ চাপড়ে বললে—"সাবাস ভায়া। উপস্থিত বুদ্ধি আছে বটে। যে রকম করে কথা কইছিলেন, কার সাধ্য বোঝে, আপনার প্রাসাদ নেই কি আপনি রাজা বাহাদুর ন'ন। আমারই মনে হচ্ছিল সত্যি বুঝি কলসী ঘটিপুর নামে কোন জায়গা আছে।"

সলিল হেসে উত্তর দিলে—"আপনার মেহেরবাণী।" মনে মনে ভাবলে, সবই যখন মিথ্যা, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ঘোরালো।

কপুরচাঁদ বললে—"আপনার বন্ধু এলেন না?"

সলিল উত্তর দিলে—"একটা কাজে আটকে গেছে। বোধ হয় পরের ট্রেণে আসবে।"

কপুরচাদ চারি ধারে একবার চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললে—"এ বার কাজের কথা হোক। আমার মেয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে শেঠ যোগেন্দ্র সিংএর ছেলে বলবন্ত সিংএর বিবাহের কথা পাকা হয়েছে। ওদের অগাধ পয়সা। অবশ্য আমিও খরচ করবো। কিন্তু ওদের মত আমার অবস্থা এখন নয়। যুদ্ধের জন্য বিলক্ষণ লোকসান হয়েছে। আমার কাছে খুব দামী এক ছড়া হীরের নেকলেস আছে। বিবাহে সেটা ওদের যৌতুক দেব। আপনাকে দেখাচ্ছি।" এই বলে পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য চামড়ার কেস বার করে দেখালেন। অপূর্ব্ব নেকলেস! সলিল মুগ্ধ-বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইল।

কপুরচাঁদ জিজ্ঞেস করলে—"কি রকম দেখছেন?"

সলিল উত্তর দিল—"চমৎকার! অপূর্ব্ব।"

কপুরচাঁদ হেসে বললে—"ঠিক তাই। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র দুটো হীরে আসল, বাকী সব ইমিটেশন। বিলেত থেকে ম্যাচ করিয়ে তৈরী করিয়েছি। কিন্তু জহুরী পরখ করে দেখলে নকল ধরে ফেলবে।"

"তাহলে বিয়েতে কি করে দেবেন? পরে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে।"

"সেইখানেই তো আপনার সাহায্য দরকার। নেকলেসটি যেন আপনার। আপনি যেন অর্থাভাবে বিক্রয় করছেন। আমি সেটা কিনব। মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দেব। পরে যদি ধরা পড়ে যে হীরেগুলো নকল, বলব আপনি আমায় ঠকিয়েছেন। পরে টাকা ফেরত দেবেন।"

"তার পর আমার অবস্থা?"

"আপনি তো অলীক রাজা বাহাদুর। কলসীঘটিপর বলে কোন মুলুকই নেই। সুতরাং আপনাকে ধরবে কে? পারিশ্রমিক হিসেবে আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এ কথা কখনও প্রকাশ করবেন না। অবশ্য প্রকাশ করে দিলে ক্ষতি আপনারই। আমি বলবো আপনি মিথ্যা কথা বলে আমায় ঠকিয়েছেন।"

"আমি ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু বলব না। টাকাটা কি এখন দেবেন?"

"বেশ। নেকলেসটাও কাছে রাখুন।"

কপুরচাঁদ পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার করে সলিলের হাতে দিলে। সলিল টাকা ও নেকলেস পকেটে পুরে ফেললে। এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে বলবন্ত সিং এসেছেন। একটু পরেই আগন্তুক ড্রইংরুমে এসে ঢুকল।

কপুরচাঁদ পরিচয় করিয়ে দিল। খোস গল্প চলতে লাগল। রাজা বাহাদুর নিজের রাজ্যের কত গল্প বললে। দময়ন্তী এসে খবর দিলে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া বেশ ভাল ভাবেই চুকল। অ্যাডভেঞ্চার, শিকার কত রকম গল্প হ'ল। আহারান্তে কপুরচাঁদ বললে—"এ বার বলবন্তকে নেকলেসটা দেখান। ওর আর দময়ন্তীর যদি পছন্দ হয় তা হলে ওটা আমি ওদের বিবাহে যৌতুক দেবো। আমার তো দেখাই আছে।"

"নিশ্চয়ই।" বলে কেসশুদ্ধ চোখের নেকলেসটা সলিল বলবন্তের হাতে দিল। বলবন্ত জানলার কাছে গিয়ে ভাল করে নেকলেসটা পরীক্ষা করে বললে—"অপূর্ব্ব। এ রকম ভাল ম্যাচ করা হীরের নেকলেস খুব কম দেখা যায়। একেবারে ফার্ষ্ট-গ্রেড।"

দময়ন্তীও হার দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে। কপুরচাঁদ সলিলের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে—"রাজা বাহাদুর আপনি সত্যই নেকলেসটা বিক্রী করবেন?"

সলিল বিষণ্ন মুখে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। করতে হবে। যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা লোকসান গেছে। এ দিকে ষ্টেটের আয় পড়ে গেছে। কিছু টাকা আমার অবিলম্বে দরকার। নইলে এ জিনিষ মানুষ বিক্রী করে।"

"কত দাম?"

"দাম তো এক সময়ে অনেক ছিল। কিন্তু দায়ে পড়ে বিক্রী করলে তো পুরো দাম পাওয়া যায় না। হাজার কুড়ির কমে বিক্রী করতে পারব না। বাজারে হয় তো আরও বেশী দাম পেতুম, কিন্তু লোক-জানাজানি হয়ে গেলে আমার পোজিশনটা খেলো হয়ে যাবে। তাই গোপনে বিক্রী করতে চাই। বলবন্ত বাবু কি বলেন? দামটা অন্যায্য বলেছি?"

বলবন্ত সিং উত্তর দিলে—"আজ্ঞে না, আমার মনে হয় দামটা খুব ন্যায্য এবং সস্তাই বলেছেন। ইট ইজ এ বারগেন।"

কপুরচাঁদ হেসে বললে—"তবে এই দামেই কিনব। রাজা বাহাদুর, আপনাকে চেক দিলে চলবে?"

সলিল একটু মাথা চুলকে বললে—"তা চলবে না কেন, তবে কিছু নগদ টাকা পেলে সুবিধা হ'ত। আপনি রইস লোক। ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন।"

"আচ্ছা, দেখছি।" বলে কপুরচাঁদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সলিল বলবন্তকে বললে—"আপনার এখন তাড়া নেই তো?"

বলবন্ত প্রশ্ন করলে—"কেন বলুন তো?"

সলিল হেসে বললে—"তা হলে এই রৌদ্রে বাড়ী না গিয়ে একটু ব্রীজ খেলতে পারতেন। আমার ট্রেণ সেই বিকেলে।"

বলবন্তর তাস খেলায় ভয়ানক নেশা। সে সাগ্রহে সম্মত হ'ল। বললে—"দময়ন্তীও ভাল ব্রীজ খেলে। সুতরাং চার জন যখন হয়েছি, খেলা যেতে পারে।"

কপুরচাঁদ ততক্ষণে ফিরে এসেছে। হাতে এক তাড়া নোট। বললেন—"সব টাকা এখন দিতে পারলুম না। হাজার পনেরো এখন নিন। বাকী পাঁচ হাজার পরে দেব।"

সলিল নোটের তাড়া পকেটে পুরে এক গাল হেসে বললে—

"আপনার কাছে থাকা যা আমার কাছে থাকাও তাই। নেকলেসটা আপনার মেয়ের কাছে থাক।"

কপূরচাঁদ বলে—"বেশ।"

দময়ন্তী নেকলেসটা নিজের কাছে টেনে নিল।

বলবন্ত সিং তাস খেলার কথা বলতে কপূরচাঁদ সানন্দে সম্মতি জানালে। রাজা বাহাদুরকে তাহলে নজরে রাখতে পারবে। সলিল বললে—"আপনারা যদি কিছু না মনে করেন, আমি ট্রেণের কাপড়-জামা ছেড়ে আসি।"

বলবন্ত সিং উত্তর দিলে—"নিশ্চয়। একটু আরাম করে না বসলে খেলা জমে না।"

সলিল নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলে গেল কাপড় ছাড়তে। কপূরচাঁদ বাবু আনন্দিত মনে তাস ভাঁজতে লাগলেন। ব্যাপারটা চমৎকার ভাবে চকে গেল। লোকটার ড্রামাটিক সেন্স আছে বলতে হবে।

পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, রাজা বাহাদুরের দেখা নেই। ব্যাপার কি? এক জন চাকরকে খোঁজ করতে পাঠানো হ'ল। এসে বললে—"দরজা বন্ধ।" কপূরচাঁদের বুকটা ধড়াস করে উঠল। বলবন্ত সিং বললে—"হার্ট খারাপ নয় তো?"

কপূরচাঁদ যেন একটু থাতস্থ হলেন। "তা হতে পারে। এক বার দেখা যাক।" সকলে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ। একটু জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরে কেউ নেই। পাশেই বাথরুম, তাও খালি। টেবিলে ছোট একটি সুটকেশ, তাতে রাজা বাহাদুর যে কাপড়-জামা পরেছিলেন, সেইগুলি রয়েছে। কপূরচাঁদ বাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এ যে চোরের মায়ের অবস্থা। কাঁদবার উপায় নেই।

গগন সিগারেট মুখে পায়চারী করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে চার ঘণ্টা কেটেছে। মনে মনে সলিলের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করছে। এমন সময়ে দেখলে, একটি লোক বাগানের পাশে দিয়ে ছোট একটা ফটক খুলে বার হ'ল। গগন তাড়াতাড়ি সেখানে এসে দেখে, আগন্তুক সলিল সেন। বিনা বাক্য-ব্যয়ে দু'জনে ট্যাক্সিতে চেপে বসল। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোর্ট ষ্টেশন।

হু হু করে জয়পুরগামী ট্রেণ চলেছে। একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় কেবল দু'জন যাত্রী। সলিল সেন ও গগন গুপ্ত। গগন প্রশ্ন করলে—"তার পর?"

সলিল সে কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করলে।

গগন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"হারটা বিক্রী করেছ?"

চোখের বহুমূল্য হীরের নেকলেসটা পকেট থেকে বার করে সলিল হেসে বললে—"হারটা আছে। এটা ফাউ।"

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

মুদ্রা-বৈচিত্র্য

জিনিষ কিনিয়া আমরা সে-সব জিনিষের দাম দিই,—টাকায়-আধুলিতে-সিকিতে-পয়সায় বা নোটে। এ দামের সৃষ্টি হইয়াছে বিনিময়-প্রথার উপর। অর্থাৎ আমার আছে চাউল; তোমার আছে তুলা। কাপড় বুনিবার জন্ত আমি চাই তুলা, আহারের জন্ত তুমি চাও চাউল। আমি তোমাকে চাউল দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তোমার কাছ হইতে তুলা লইলাম। তোমার চাউলের অভাব এবং আমার তুলার অভাব মিটিল—জীবন-যাত্রা স্বচ্ছন্দ হইল।

এমনি বিনিময়-প্রথা হইতেই মুদ্রার প্রবর্ত্তন। মুদ্রা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস শুনিলে চমৎকৃত হইবে। সে-কথা আর এক দিন বলিব। আজ তোমাদের মুদ্রার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিতে চাই।

কুকুরের দাঁত
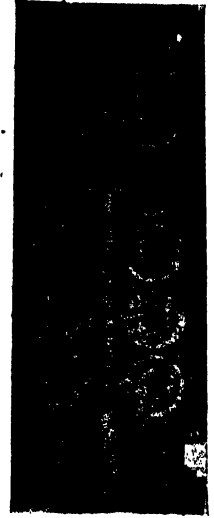
মাটাতে খোদা ফুলগাছ

এখন সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে-দেশে যে বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছে, সে-সম্পর্ক জটিল হইবে না বলিয়া সকল দেশের শাসন-পরিচালকেরা মিলিয়া যুক্তি করিয়া বিভিন্ন-দেশে-প্রচলিত মুদ্রাদির দাম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে চলে টাকা-আনা-পয়সা, বৃটেনে চলে পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স; আমেরিকায় চলে ডলার-সেণ্ট; জাপানে ইয়েন। সকলে মিলিয়া এ-সব মুদ্রার বিনিময়-হার বা দাম কষিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন—যেমন এক-শিলিংয়ের দাম এখন এক টাকা! সভ্য-জগতের এ-সব মুদ্রা সোনা-রূপা-তামা প্রভৃতি ধাতু হইতে সমান-ওজনে-মাপে রাজার মুখ বা ষ্টেটের সঙ্কেতসমেত তৈয়ারী হইতেছে—সে-সব মুদ্রার প্রত্যেকটিতে মুদ্রার নাম ও দাম খোদা থাকে। ইহাতে মুদ্রার বাজার বুঝিতে দেশী-বিদেশী কাহাকেও এতটুকু বেগ পাইতে হয় না!
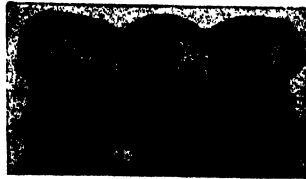
লবণের চাঙ্গড়

কিন্তু টাঁকশালের তৈয়ারী এ সব সভ্য মুদ্রা ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশে এত রকমের জিনিষকে মুদ্রা-স্বরূপ ব্যবহার করা হইত,—আজও হয়—যে সে-কথা তোমাদের কাছে শুধু চমৎকার লাগিবে না, সে-কথায় তোমরা তাজ্জব হইবে!

আমাদের দেশে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শুধু পল্লীগ্রামে নয়, কলিকাতা-সহরেও আমরা দেখিয়াছি, নানা পণ্যের দাম দেওয়া হইত কড়িতে। যে-কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলা হয়, সেই কড়ি! এখনো এ-কড়ির প্রচলন বাঙলা দেশে আছে কি না জানি না।

সাউথ-শীর বুকে যে-অসংখ্য দ্বীপ, সে-দ্বীপে গুচ্ছ-বাঁধা পাখীর পালক এখনো মুদ্রা-স্বরূপ প্রচলিত আছে। তবলকী, কার্টরিজের খালি খোল, কড়ি, ঝিনুক—প্রাচীন এথিয়োপিয়ায় মুদ্রা-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। মাটীর গায়ে ফুলন্ত গাছ খুদিয়া সেই খোদা-গাছের ফুল মুদ্রা-স্বরূপ আজো মলয় দ্বীপে ব্যবহৃত হয়। মধ্য-আফ্রিকায় গুচ্ছ-বাঁধা হাতীর ল্যাজের কেশ মুদ্রা-রূপে হাটে-বাজারে চলিতেছে। নিউ-গিনিতে কুকুরের দাঁত ছিল প্রধান মুদ্রা। য়ুরোপীয় সদাগরের দল জাল দাঁত চালাইয়া সেখানকার মাল-বিক্রেতাদের ঠকাইত বলিয়া ত্রিশ-চল্লিশ বছর মাত্র সে-মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়াছে; তবে দেশী-বাজারে কুকুরের আসল দাঁতের দাম এখনো কমে নাই।
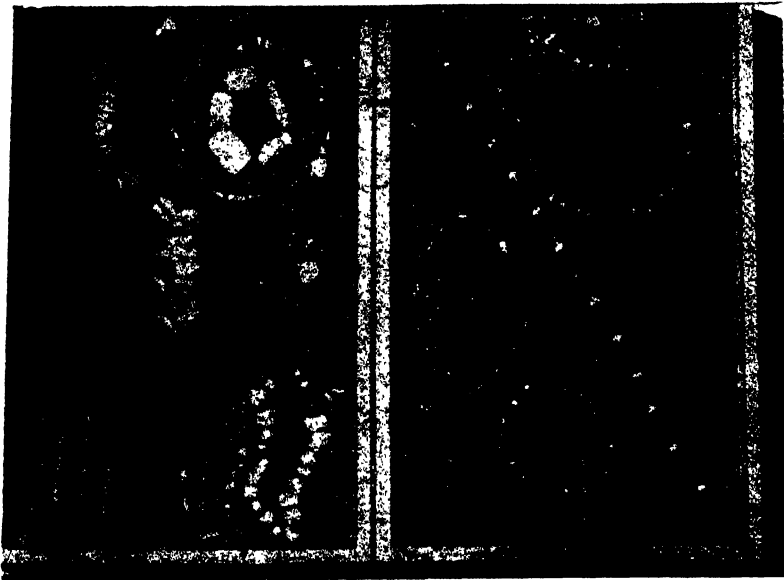
কড়ি, কার্টরিজের খোল, ঝিনুক

প্রাচীন এথিয়োপিয়ায় লবণের চাঙড় বহু কাল উচ্চ-মূল্যের মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল। সাইপ্রাস-দ্বীপে তামার টুকরা; দক্ষিণ-আমেরিকায় তামাক-পাতা; উত্তর-আমেরিকায় বীভারের চামড়া; এবং সাউথ-শী-অঞ্চলে নুড়ি-পাথর ছিল বিনিময়-মুদ্রা। ত্রিশ-ইঞ্চি লম্বা প্রকাণ্ড পাথর—ওজনে দেড় মণ—সে-পাথর দিয়া লোকে কিনিতে পারিত একটি স্ত্রী; একখানি নৌকা; কিম্বা দশ হাজার নারিকেল। পাখীর পালখে-জড়ানো বেল্ট ভানিকোরো দ্বীপ আজিকার সভ্য-জগতের একশো-টাকা দামের নোটের সমান।

সোনা-রূপা-তামা-নোটের কোনো বালাই তখন ছিল না। সভ্য-সমাজ সোনা-রূপা-তামার দাম বুঝিয়াছে—তার ফলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস-শৃঙ্খলা বাড়িয়াছে, সন্দেহ নাই! কিন্তু পাখীর পালক, কুকুরের দাঁত—এমনি তুচ্ছ বস্তুকে মানুষ যখন মুদ্রা বলিয়া বরণ করিয়াছিল, তখনকার দিনে মামলা-মকর্দ্দমা বা বিবর-বিবের স্বাদ জানিত না বলিয়া মানুষ যে সহজ-শান্তি ভোগ করিত, সভ্য-সমাজ সে সহজ-শান্তি পাইয়াছে কি?

মত-বিরোধ

তোমরা সেই পুরোনো গল্পটি জানো নিশ্চয়—সেই সূর্য্য এবং বাতাসের ঝগড়ার গল্প? দুজনে এক দিন তর্ক হলো, কার শক্তি বেশী? সূর্য্যের? না, বাতাসের? কি করে মীমাংসা হবে? পথে চলেছিল জামাজোড়া-গায়ে এক জন পথিক। স্থির হলো, পথিকের ঐ জামা-জোড়া যে তার গা থেকে খোলাতে পারবে, তারি শক্তি বেশী—সাব্যস্ত হবে। প্রথমে বাতাস নামলো শক্তি-পরীক্ষায়। হু-হু বেগ বাড়িয়ে বাতাস দুরন্ত গর্জ্জনে যে-কাণ্ড বাধালো, তার ফলে পথিক-বেচারী জামা-কাপড় আরো ভালো করে গায়ে জড়িয়ে শীতে কুঁকড়ি-শুঁকড়ি হলো! প্রচণ্ড গর্জ্জন-তোলা ঝড়ের দাপট নিয়েও বাতাস

হাতীর ল্যাজের গুচি

পারলো না পথিকের গা থেকে তার জামা-জোড়া খুলতে! তার পর সূর্য্যের পালা। সূর্য্য কোনো দৌরাত্ম্য প্রকাশ করলো না—ধীরে ধীরে নিজের কিরণজাল বিস্তার করে' পথিকের উপর মেলে ধরলো! রৌদ্র-তাপ পেয়ে আরাম উপলব্ধি ক'রে পথিক তার গায়ের জামাজোড়া খুলে সূর্য্য-কিরণ উপভোগ করতে বসলো! বাতাসের হলো হার; সূর্য্যের হলো জিত!

এ গল্পটি কেন বললুম, খুলে বলি। অনেকে অহঙ্কার প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের মতামত সুদৃঢ় যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত,—অপরের ভ্রান্ত মতামতকে তাঁরা তর্কের জোরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন! অর্থাৎ এঁদের বিশ্বাস, এঁরা যা বলেন যা করেন, তাই শুধু ঠিক! অপরের কাজ বা কথা—ভুলে ভরা! অপরকে তাঁরা মানতে নারাজ! এঁরা যদি বলেন, প্রাতঃস্নান ভালো নয়, অপরে যদি বলে ভালো,—তাহলে অপরের সে-কথা তাঁরা মানবেন না! শুধু মানবেন না, নয়; অসহিষ্ণু ভাবে অপরের বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করতে কোমর বাঁধবেন—অর্থাৎ অপরে তাঁদের মতামত শিরোধার্য্য করুক!

তর্কে কণ্ঠ খুব উঁচু করলে বা লাঠি তুললে অপরে এঁদের মতকে শিরোধার্য্য করবেন, এ-কথা মনে করায় মূঢ়তা প্রকাশ পায়! আমি

বললুম, মোহনবাগানের চেয়ে ফুটবল-খেলায় বড় কেউ নেই! তুমি বললে, ইষ্ট বেঙ্গল সবার সেরা দল! ম্যাচে কে হেরেছে বা জিতেছে—তাই শুধু শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়! এবং তোমাকে আমার মত গ্রহণ করাতে না পারলে তোমার সঙ্গে কলহ করবো বা তোমাকে বলবো বোকা—খেলার কিছু বোঝো না,—এ রকম মনোভাবে মনের জীবনী-লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

মতামত নিয়েই জীবন নয়। আমার মত যদি কেউ গ্রহণ না করে, অমনি তার মাথায় গদা মারবো—এ নীতিতে নিজের মত যত নিখুঁৎ নির্ভুল হোক, সে মতকে অপরের গ্রহণীয় করা যায় না। সে-চেষ্টায় ঐ বাতাসের মত পরাজয় সার হবে।

এ জন্য বলতে চাই, অপরের মতকে সহ্য করতে শেখো; অপরের মতের সঙ্গে নিজের মত না মিললে অসহিষ্ণু হয়ে কলহ-তর্ক করায় অসৌজন্য এবং অভদ্রতা প্রকাশ পাবে। তোমার মত যদি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে-মতের হাতুড়ি বানিয়ে কাকেও পিটতে যেয়ো না। সত্য-প্রচার করতে হলে চাই সহিষ্ণুতা, শান্ত ধীর মেজাজ এবং মত-প্রকাশে ও অপরের মত-বিচারে সৌজন্য ও শিষ্টাচার! তাহলে লাভ হবে এই, সত্য-প্রচারে সমর্থ হবে এবং চেঁচিয়ে গলাবাজি-তর্ক করে শত্রু-সৃষ্টি করবে না।

আসল কথা, যত-বড় জ্ঞানী হও, সত্য-সন্ধানী হও,—ব্যবহারে যদি ভদ্রতা রক্ষা করতে না পারো, বিদ্যাবুদ্ধি হবে পণ্ড।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রুশ-রণাঙ্গন —

এই বৎসর সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন অভিযান সমগ্র জগৎকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে। দ্বিসহস্র মাইল রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী অতুলনীয় বিক্রমের পরিচয় দিতেছে। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল জার্ম্মাণ সমর-যন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাত সহিবার পরও সোভিয়েট রুশিয়া যে এইরূপ শক্তির পরিচয় দিতে পারিবে, তাহা কেহ কল্পনাও করে নাই।

মধ্য-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ বাহিনীকে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে বিতাড়িত করিবার পরই সোভিয়েট বাহিনী উত্তর-রণাঙ্গনে মনঃসংযোগ করে। তথায় লেনিনগ্রাড এখন সম্পূর্ণরূপে অবরোধমুক্ত; অতঃপর রুশ সেনা এস্থোনিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে দক্ষিণ-রণাঙ্গনে রুশ সেনার তৎপরতা সাময়িক ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে অবহিত হইয়া নীপার বাঁকের অভ্যন্তরে আড়াই লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্যকে তাহারা নিষ্ক্রিয় করিয়াছে; ১ লক্ষ ২০ হাজার জার্ম্মাণ সেনা ধ্বংসের সম্মুখীন। এখন একই সময়ে কৃষ্ণ সাগরের তীর হইতে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে।

সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর পরে লেনিনগ্রাডের অবরোধমুক্তি সোভিয়েট বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রুশিয়ার জার্ম্মাণীর অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ হইবার তিন মাস পরেই লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ হয়। ঐ সময় জার্ম্মাণ সেনা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে লেনিনগ্রাডকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিয়া ফেলে; ফিনিস সৈন্য মুরমানস্কের সহিত লেনিনগ্রাডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। এই সময় মার্শাল ভরোশিলভের নির্দ্দেশে লেনিনগ্রাডের প্রত্যেক গৃহ দুর্গে পরিণত হয়, প্রত্যেক রাস্তায় প্রতিরোধ-বেষ্টনী রচিত হয়। বহির্জ্জগতের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইলেও লেনিনগ্রাড-বাসী তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতার নামাঙ্কিত নগরটি রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সেনানায়ক তাহাদিগের এই দৃঢ়তার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। কিন্তু লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ হইলেও উহার বহির্ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। জার্ম্মাণ বিমানবহরের অবিরাম আক্রমণে লেনিনগ্রাডের বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সরবরাহের প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়, জল-সরবরাহ বন্ধ হয়, বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইতে থাকে। তবু লেনিনগ্রাড-রক্ষী বীরদিগের দৃঢ়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গত বৎসর (১৯৪৩) জানুয়ারী মাসে যখন অপরিসর পথে লেনিন-গ্রাডের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন সমগ্র বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে শ্রবণ করিয়াছিল যে, ১৬ মাস সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ থাকিবার সময় তথায় কোন কোন সমরোপকরণ উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিক হার অতিক্রম করে!

গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে রুশ সেনাপতি জেনারল গভোরভ্ ঘোষণা করিয়াছিলেন, লেনিনগ্রাড সম্পূর্ণরূপে অবরোধমুক্ত। লেনিন-গ্রাডের অবরোধমুক্তির সর্ব্বপ্রধান সামরিক সুবিধা এই যে, অতঃপর রুশিয়ার বাল্টিক নৌবাহিনী সক্রিয় হইতে পারিবে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের তীর ধরিয়া রুশ সেনা যখন পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইবে, তখন এই নৌবাহিনী তাহাদিগের সহায় হইতে পারিবে। ইহা ব্যতীত, লেনিনগ্রাডকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া রুশ সেনাপতিগণ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অভিমুখে অভিযান পরিচালনের অভূতপূর্ব্ব সুবিধা লাভ করিয়াছেন।

রুশ-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর তৎপরতা এখন নিম্নলিখিত-রূপ—উত্তরাঞ্চলে—লেনিনগ্রাডের দক্ষিণে বিশাল রেলওয়ে জংশন নভোগ্রোড, অধিকারের পর সোভিয়েট বাহিনী লুগা অধিকারের জন্য সচেষ্ট। লুগার উত্তরে ও পূর্ব্বে সমস্ত অঞ্চল রুশ সেনার অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। এস্থোনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নার্ভার এখন রুশ সেনা আঘাত করিতেছে। হোয়াইট রুশিয়ার ভাইটেব্স্ক প্রায় পরিবেষ্টিত হইলেও জার্ম্মাণরা এখনও তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পোল্যাণ্ডের ৩০ মাইল অভ্যন্তরে রভনো এবং তাহার ৪০ মাইল পশ্চিমে লাক্ রুশ সেনার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। নীপার বাঁকের

অভ্যন্তরে নিকোপোলের নিকটে একটি বিশাল জার্ম্মাণ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ তাহাদিগের পরাজয়ের নিশ্চিত দ্যোতক নহে। জনৈক বিশিষ্ট সমরনায়ক বলিয়াছেন—শত্রুর দেশে অধিকার-বিস্তার যুদ্ধের ফল, উহার লক্ষ্য নহে। জার্ম্মাণী যখন রুশিয়ায় তড়িৎগতিতে অগ্রসর হয়, তখন যুদ্ধের এই "ফল" দেখিয়াই জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রকৃত "লক্ষ্য" শত্রুর সামরিক শক্তির বিনাশ; এই লক্ষ্যে জার্ম্মাণী পৌঁছিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে নাৎসী সেনার অপসরণ-কালেও এই কথা কতক পরিমাণে সত্য। জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ এখন যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগের সেনাবাহিনী বাঁচাইয়াই পশ্চাদপসরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সমরযন্ত্রে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিতেছে না।

তবে, সমগ্র ভাবে জার্ম্মাণীর সমর-কৌশল লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত পরাজয় কোথায়, তাহা উপলব্ধ হইবে। জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ বুঝিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্যাপক আক্রমণ তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই জন্য এখন তাঁহারা রুশ-রণাঙ্গনের প্রতিরোধমূলক যুদ্ধকে স্থিতিশীল (stabilise) করিতে চাহিতেছেন। নীপার নদীর তীরে, প্রিপেট্ জলাভূমির নিকট, উত্তরে নভোগ্রোড অঞ্চলে প্রবল ভাবে যুদ্ধ চালাইয়া জার্ম্মাণী তাহার এই উদ্দেশ্য সফল করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। সোভিয়েট বাহিনীর আঘাত ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে; রণক্ষেত্র ক্রমেই পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে। রণক্ষেত্র অচল রাখিয়া স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক সংগ্রাম পরিচালনে এই অসামর্থ্যই জার্ম্মাণীর প্রকৃত পরাজয়। পূর্ব্ব-রণাঙ্গন ক্রমেই জার্ম্মাণীর গৃহ-প্রাঙ্গনের নিকটে আসিতেছে, ওদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্যাপক অভিযানের সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

ইহা ব্যতীত, রুশ সেনা স্থানে স্থানে তাহাদিগের স্বদেশের সীমান্ত অতিক্রম করায় এবং অন্য সর্ব্বত্র তাহারা পূর্ব্ব-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সমগ্র য়ুরোপে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে। কেবল পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লেভিয়া ও গ্রীসে নহে—জার্ম্মাণীর তাঁবেদার হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায়ও ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বত্র জনসাধারণ ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহী হইবে এবং তাহাদিগের জার্ম্মাণ-বিরোধী তৎপরতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ইহাও পরোক্ষে জার্ম্মাণীর পরাজয়।

রুশ-পোল্ সমস্যা—

সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের সহিত বৃটেনে আশ্রিত পোলিস্ গভর্ণমেন্টের বিরোধের অবসান হয় নাই; প্রসঙ্গটি আপাততঃ চাপা পড়িয়াছে মাত্র। সোভিয়েট সরকারের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছিল যে, তাঁহারা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সীমান্তকে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করেন না; ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন যে রুশ-পোল্ সীমান্ত নির্দ্ধারণ করেন, তাহা মানিয়া লইতে তাঁহারা প্রস্তুত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সীমান্তরেখা পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার দক্ষিণতম বিন্দু হইতে প্রসারিত; পক্ষান্তরে "কার্জ্জন"লাইন লিথুনিয়ার দক্ষিণতম সীমান্ত হইতে বিস্তৃত। পরে, ব্রেষ্ট-লিটভস্কের পশ্চিম দিকে এই দুইটি সীমান্ত-রেখা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সীমান্ত ত্যাগ করিয়া "কার্জ্জন লাইনে" সরিয়া আসিতে হইলে রুশিয়াকে বীলষ্টক্ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে হইত; লিথুনিয়া ও পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার দক্ষিণে প্রায় ৫ শত বর্গ-মাইল স্থানও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের এই উদার প্রস্তাবে পোলিস্ গভর্ণমেন্ট সম্মত হন নাই। তাঁহারা প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে বিরত হইয়া সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের সহিত কূটনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পোলিস্ গভর্ণমেন্টের সহিত সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন; তাহারা এই গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে স্বভাবতঃই অস্বীকার করিয়াছেন। পরে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রুশ-পোল বিরোধে মধ্যস্থতা করিবার আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। রুশ সরকার সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল—সীমান্ত সম্পর্কে রুশিয়ার দাবী মস্কৌ এবং তেহরাণ সম্মিলনে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু রুশ-পোল্ দ্বন্দ্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে মনে হয়, মস্কৌয়ে ও তেহরাণে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় নাই। রুশিয়ার দৃঢ়তা দেখিয়া এখন সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে—লণ্ডনস্থিত পোলিস্ সরকারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া পোল্যাণ্ডে গণ-প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে কৃতনিশ্চয়। ইতোমধ্যে রুশ-ভূমিতে "ইউনিয়ন্ অব্ পোলিস প্যাট্রিয়ট্‌স" নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, উহাই ভবিষ্যৎ পোলিশ সরকারের ভিত্তি-প্রস্তর। এই ইউনিয়নের সমর্থক পোলিশ সেনা এখন পোল্যাণ্ডে রুশ সৈন্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইহারা সমগ্র জার্ম্মাণ-বিরোধী পোলদিগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিবে। কাজেই, যুদ্ধোত্তর কালে লণ্ডনস্থিত পোলিশ গভর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের কোনরূপ সমর্থন লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

অভিনব জনরব—

গত জানুয়ারী মাসে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা'র কায়রোস্থিত সংবাদদাতা জানান—সম্প্রতি দুই জন বিশিষ্ট বৃটিশ রাজনীতিকের সহিত জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব রিবেনট্রপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সংবাদটি 'প্রাভ্‌দা'য় প্রকাশিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ পরাজয় অথবা বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে তাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিবেন না। মস্কৌয়ে ও তেহরাণে এই বিষয়ে পুনরায় দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছিল। অথচ, এই সময় 'প্রাভদা'র ন্যায় প্রভাবশালী পত্রিকায় এই অভিনব জনরব! বৃটিশের পররাষ্ট্রীয় দপ্তর হইতে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এইরূপ কোন আলোচনা হয় নাই।

ইতঃপূর্ব্বে মার্কিণী সাংবাদিকগণ বহু বার বহু প্রকার আজগুবি কথা প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে কেহ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। কিন্তু পত্রিকা হিসাবে 'প্রাভদা'র গুরুত্ব অসাধারণ; ইহাকে রুশিয়ার অর্দ্ধ সরকারী মুখপত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। এই পত্রিকায় এইরূপ অভিনব জনরব প্রকাশিত হইলে তাহাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

'প্রাভদা' এই বিষয়ে কোনরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন নাই। তাঁহার নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত রিপোর্ট তাঁহারা যেরূপ নির্লিপ্ত

ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই বৃটিশ পররাষ্ট্রীয় বিভাগের প্রতিবাদও নির্লিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃটিশ পররাষ্ট্রীয় বিভাগের প্রতিবাদের পর এই সংবাদ ভিত্তিহীন বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু 'প্রাভদা'য় এই গুরুত্বপূর্ণ জনরব প্রকাশিত হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হইল যে, রুশ-বৃটিশ মিলন পাকা নহে; বৃটিশ রাজনীতিকদের পক্ষে জার্ম্মাণীর সহিত মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে সম্ভব, ইহা রুশিয়া—অন্ততঃ রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি অবিশ্বাস করে না। বৃটিশ রাজনীতিকদের জার্ম্মাণ-বিরোধী প্রতিশ্রুতি তাহাদিগের এই সন্দেহের মেঘ দূর করিতে পারে নাই।

রুশ-শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রুশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ১৬টি রিপাবলিক, স্বতন্ত্র সেনা-বাহিনী রাখিতে পারিবে এবং স্বতন্ত্র ভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে। রুশিয়ার এই সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে; ইউক্রেণে এক জন পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

রুশিয়ার এই অভিনব ব্যবস্থার রহস্যোদ্‌ঘাটন অত্যন্ত দুষ্কর। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকগণ এই বিষয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি নানারূপ সম্ভব এবং অসম্ভব মন্তব্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'প্রাভ্‌দা' মন্তব্য করিয়াছেন—সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রিপাবলিকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিতে পারে না। সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতাকালে মঃ মলোটভ্‌ বলেন—এই নব-ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

'প্রাভদা'র মন্তব্য অথবা মঃ মলোটভের বক্তৃতায় সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা দুষ্কর। তবে, ইহা সত্য—এই ব্যবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তি যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নিশ্চিত জানিয়াই রুশ কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রুশিয়ার রিপাবলিকগুলি সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত তাহাদের পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা নাই, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই, স্বার্থোদ্ভূত অবিশ্বাস ও সন্দেহও নাই। কাজেই, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইলেই ইহারা বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে না। বরং বৃহত্তর কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া ইহারা আরও দৃঢ় ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবে মনে করাই সঙ্গত।

রুশিয়ার এই নব-ব্যবস্থায় মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী বিভিন্ন দেশে সোভিয়েট প্রথা প্রসারিত হইবে বলিয়া রুশ কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবেই আশা করিতেছেন। এই প্রথা যত প্রসারিত হইবে, ততই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারা বিশাল যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠনের সুযোগ সৃষ্ট হইবে। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ঐতিহ্যগত যোগ নাই, তাহাদিগকে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের অধীনে আবদ্ধ করিতে হইলে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রকে প্রচুর স্বাধীনতা প্রদান করা প্রয়োজন। হোয়াইট রুশিয়া ও ইউক্রেণ এক সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছু ক্ষুণ্ণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র; ইহারা যদি সোভিয়েট সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে স্বতঃই উহাদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানের প্রয়োজন ঘটিবে। এই ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করিলে মনে হয় —সোভিয়েট-বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের সুদূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য লইয়াই রুশ শাসনতন্ত্রে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই ব্যবস্থার পর এখন য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে তাহারা সহজেই পূর্ব্বাঞ্চলের সোভিয়েট সংযুক্ত রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইতে পারিবে; ইহাতে তাহাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা জাতিগত অহমিকা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। ভবিষ্যতে জগতের অন্যান্য প্রান্ত সম্পর্কেও এই কথা প্রযুজ্য।

ইটালীয় রণাঙ্গন—

ইটালীয় রণাঙ্গনে সম্প্রতি সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহারা রোমের দক্ষিণে নেটুনোর নিকট নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ অবতরণ করাইয়াছেন। জেনারল ম্যাক্ ক্লার্কের অধীন পঞ্চম বাহিনী গারিগ্‌লিয়ানো নদী অতিক্রম করিয়া যে স্থানে উপনীত হইয়াছিল, তথা হইতে সম্মিলিত পক্ষের নূতন অবতরণ-ক্ষেত্রের দূরত্ব ৫৭ মাইল।

ইটালীর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব এখন অপ্রতিহত। কাজেই, এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া দ্রুত ইটালীয় যুদ্ধ শেষ করিতে সচেষ্ট হওয়া তাহাদিগের উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেন এত দিন এই বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বুঝা দুষ্কর।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে নেটুনোর নিকট অবতীর্ণ সেনাবাহিনী রোমের সহিত দক্ষিণ অঞ্চলের রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। দক্ষিণে পঞ্চম বাহিনীও ক্যাসিনো অধিকারের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে; উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে সম্মিলিত পক্ষের সেনা ক্যাসিনোয় প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ক্যাসিনোর উপকণ্ঠে এবং ক্যাসিনোর বিভিন্ন রাস্তায় প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে।

জার্ম্মাণ সেনাপতি কেসারলিং এখন নেটুনো অঞ্চলে প্রবল্য ভাবে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন; ক্যাসিনো অঞ্চলেও জার্ম্মাণদিগের প্রত্যাঘাত অত্যন্ত প্রবল। বর্ত্তমানে রোমের দক্ষিণে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতেই রোমের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। রোম হস্তচ্যুত হইলে সমগ্র ইটালীর সামরিক অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে, ইটালীর ফ্যাসিষ্ট নিয়ন্ত্রাধীন অংশে উহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। কাজেই, জার্ম্মাণ সেনাপতিরা নেটুনো অঞ্চলে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবেন বলিয়াই মনে হয়।

সুদূর প্রাচী—

প্রাচ্য অঞ্চলে মার্কিণী সেনাপতিদের এক নূতন রণকৌশল ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মার্শালসে মার্কিণী সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। গত নভেম্বর মাসে গিল্‌বার্টস্ অঞ্চলে মার্কিণী সেনা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সম্প্রতি তথা হইতে মার্শালসে আক্রমণ প্রসারিত হইয়াছে। ওদিকে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণী সৈন্য বহু পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; গত জুলাই মাসে জাপান এই দ্বীপগুলি

হইতে বিতাড়িত হয়। আলিউসিয়ান্ অঞ্চল হইতে জাপানের উত্তরে অবস্থিত কিউরাইল্ দ্বীপমালায় ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি কিউরাইলের অন্তর্গত প্যারামুসিরো দ্বীপে মার্কিণী নৌবহর সর্ব্বপ্রথম গোলাবর্ষণ করিয়াছে।

উত্তরে আলিউসিয়ান হইতে কিউরাইলের প্রতি মনোযোগ এবং দক্ষিণে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের প্রতি আঘাতে মনে হয়, জাপানী দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে সাঁড়াশী আক্রমণ পরিচালনাই মার্কিণী সমরনায়কদের উদ্দেশ্য। অবশ্য, এই সাঁড়াশীর দুই বাহুকে এখনও বহু বিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তবে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ যে ঐ অঞ্চলের অগণিত দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অর্ব্বাচীনোচিত প্রচেষ্টা নহে, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধে মার্কিণী সমরনায়কদের জাপানকে পঙ্গু করিবার সুরচিত পরিকল্পনা সত্যই আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই ঘাঁটী জাপান ব্যবহার করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে মার্কিণী সমরনায়কগণ যদি এই ম্যাণ্ডেটেড দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমেরিকাও অতি সত্বর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবল হইয়া উঠিবে। মার্শালসের পর উহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ক্যারোলিন্ দ্বীপপুঞ্জে যদি মার্কিণী সেনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে ফিলিপাইনস্ পুনরধিকার সহজ হইবে। জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সহিত মালয়, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সংযোগসূত্রও তখন বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইবে। মার্কিণী সেনার দক্ষিণ-চীনে অবতরণের সম্ভাবনাও ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ক্যারোলিন্সের ট্রুক-ঘাঁটী জাপানের "পার্ল হারবার" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

জাপানের বিরুদ্ধে এই যে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত হইতেছে, ইহা ব্যর্থ করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবিলম্বে তাহাকে প্রবল নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সেই নৌযুদ্ধে জাপান যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে জাপানের চরম পরাজয় নিকটবর্ত্তী হইবে; তখন জাপানের গৃহ-প্রাঙ্গন অভিমুখে মার্কিণী সৈন্যের অগ্রগতি নিবারণের শক্তি তাহার আর থাকিবে না। আর, জাপান যদি সেই নৌযুদ্ধে মার্কিণী নৌবহরকে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মার্কিণী সেনাপতিদিগকে আবার অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ব্রহ্ম-সীমান্তে—

গত বৎসর শীতকালে সম্মিলিত পক্ষ যেমন ব্রহ্মের পশ্চিম সীমান্তে তৎপর হইয়াছিলেন, এই বৎসর শীতকালেও তাঁহারা সেইরূপ তৎপর হইয়াছেন। এ বার কেবল আরাকান্ অঞ্চলেই তাহাদের তৎপরতা নিবদ্ধ নহে—উত্তরে হুকং উপত্যকায়, মধ্য অঞ্চলে চিন্দুইন্ উপত্যকায় এবং আরাকানে তাঁহাদের তৎপরতা চলিতেছে। কিন্তু প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ প্রবল। গত বৎসর আরাকানে জাপান বিনা প্রতিরোধেই মংড ও বুথিডং ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এ বার মংড ত্যাগ করিলেও বুথিডং রক্ষার জন্য জাপান বিশেষ তৎপর। সম্প্রতি বুথিডংএর উত্তরে টংবাজার জাপান অধিকার করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের সীমান্তে বর্ত্তমানে যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, ইহা গুরুত্বহীন সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষ মাত্র—সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের আভাস ইহা নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম—এই বৎসর ব্রহ্ম-অভিযানের কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের সেই অনুমানই সত্যে পরিণত হইল। শীত উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম-অভিযান এখনও সুদূরবর্ত্তী।

সম্প্রতি উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে এবং সিংহলে জাপানের পর্য্যবেক্ষণমূলক বিমান আক্রমণ চালিত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানের উল্লেখযোগ্য ঘাঁটী। সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম ও মালয় অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই আন্দামান তাঁহাদের হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের পূর্ব্ব উপকূল এবং সিংহলই আন্দামানে অভিযান-পরিচালনের উপযুক্ত স্থান। কাজেই, জাপানের পক্ষে সম্মিলিত পক্ষের এই আক্রমণ-ঘাঁটীতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা স্বাভাবিক।

৮।২।৪৪

শ্রীঅতুল দত্ত

তোমারে কখন্ চাই

সুখের যা কিছু উপাদান একে একে হয় যবে শেষ—
আশার আলেয়া নিবে যায়, আঁধারের হয় সমাবেশ!
জীবনের পথে সন্ধ্যা ঘনাইয়া নামে, চলে নাকো আর দৃষ্টি—
তখনই তোমারে হয় প্রয়োজন, তোমারে করি গো দৃষ্টি।

রিক্ত হস্ত, সিক্ত নয়ন—মুক্তির আশে ফিরি
শত প্রলোভন, শত আবাহন তখনো রয়েছে ঘিরি—
যত কিছু পাওয়া হারিয়ে যাওয়ার ভয় জাগে ক্ষণে ক্ষণে
আর না হারাই, গড়ি রূপ তাই কল্পনা-ভরা মনে।

শ্রান্ত মনের সান্ত্বনা তুমি, শান্তি তাপিত প্রাণে,
স্মরণে তোমার কত আনন্দ, কত সুখ তব ধ্যানে!
সারা জীবনের অসফলতার তিক্ত অভিজ্ঞান—
অচেনা রাজ্য তবু করে সুরু উদ্দেশে অভিযান।

কাছে পাওয়া বুঝি সহিবে না মোর, তাই দূরে দূরে রাখি!
অসীম বলিয়া সান্ত্বনা মানি, রাখি না পটেতে আঁকি!
রূপহীন তুমি, সীমাহীন তুমি, অপরূপও বলে জানি—
রূপের পিয়াসা তাই জাগে মনে, দেখা কি দেবে না স্বামী?

শ্রীনবগোপাল সিংহ

ভাব

(৩)

অষ্ট স্থায়িভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাব ও অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাব---কাব্য-রসের অভিব্যক্তির হেতু এই একোনপঞ্চাশৎ ভাব। এই সকল ভাব হইতে সাধারণীকরণ-প্রক্রিয়া-দ্বারা রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ---ইহাই মহর্ষির অভিমত। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন---

যে বিষয়টি হৃদ্য (হৃদয়-সংবাদী), তদ্বিষয়ক ভাব রসের উদ্ভব-হেতু। অগ্নি-দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ ব্যাপ্ত হইবার ন্যায় ঐ ভাব-দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ১।

অতঃপর মহর্ষি একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে---যদি কাব্যার্থ-সংশ্রিত বিভাবানুভাব-ব্যঞ্জিত একোনপঞ্চাশৎ ভাব হইতেই সামান্য-গুণ-যোগে রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে---ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আর এ কথা বলা হয় কেন যে---স্থায়ি-ভাবসমূহই রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে? প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে,---কেবল স্থায়ি-ভাবগুলি হইতেই ত আর রসোদ্ভব হয় না, হয় বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযুক্ত স্থায়ি-ভাব হইতে। এরূপ অবস্থায় কেবল স্থায়ি-ভাব রসে পরিণত হয়---এরূপ কথা বলার পক্ষে যুক্তি কোথায়? কারণ, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী, সাত্ত্বিক ও স্থায়ী---এ সকলের মিশ্রণ যখন রসোৎপত্তির হেতু, তখন ইহাদিগের যে কোন এক শ্রেণীর ভাবকে রস-কারণ বলা সঙ্গত হয় না; এক শ্রেণীর ভাবকে (যথা---স্থায়ীকে) রস-হেতু বলিলে অন্য শ্রেণীর ভাবগুলিকেও (যথা---বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক) রস-হেতু কেন বলা চলিতে পারে না, তদ্বিষয়ে ত কোন যুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ বৈষম্য বা তারতম্যের হেতু কি ২?

ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন---দেখ, মানুষে মানুষে অনেক বিষয়ে সাম্য আছে। প্রত্যেক মানুষই মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই মনুষ্য-লক্ষণ সমান। আবার প্রত্যেক মনুষ্যেরই হস্ত-পাদ-উদরাদি শরীরাবয়ব সমভাবে বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিরও সাম্যও মানুষে ও মানুষে থাকেই। তথাপি সকল মানবই সমান নহেন---কেহ বড় কেহ ছোট। পুরুষগণ সমান মনুষ্য-লক্ষণ-বিশিষ্ট তুল্য পাণি-পাদোদর-শরীর-ধারী, সমানাঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত হইলেও উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুল-শীল-বিদ্যা-কর্ম্ম-শিল্পাদিতে বৈচক্ষণ্য-বশতঃ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর অপরে (দেহাদি-সাম্য-সত্ত্বেও) অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি বলিয়া উক্ত রাজগণের অনুচর-রূপে গণ্য হন ৩। ঠিক এইরূপ---'বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাবসহ স্থায়ি-ভাবে আশ্রিত হইয়া থাকে। বহু ভাবের (বিভাবানুভাব-ব্যভিচারীর) আশ্রয় বলিয়া স্থায়ি-ভাবগুলি স্বামি-স্থানীয়। আর অন্য ভাবগুলি গুণভূত (অর্থাৎ---গৌণ)। আবার ব্যভিচারি-ভাবগুলি গৌণভাবে এই সকল ভাবকে আশ্রয় করে বলিয়া উহাদিগকে পরিজন-রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে ৪। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যথা,---নরেন্দ্রের বহুজন-পরিবার থাকিলেও কেবল তিনিই 'নরেন্দ্র' নাম লাভ করেন; তিনি ছাড়া আর কেহ---তা তিনি অতি মহান্ হইলেও---'রাজ'-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না;---ঠিক সেইরূপ বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-পরিবৃত স্থায়ি-ভাবই 'রস'-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে, কিন্তু উহার পরিবার-স্থানীয় বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-ভাবগুলি পারে না ৫। এ প্রসঙ্গে একটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহর্ষি বিষয়টির উপসংহার করিয়াছেন---

যেমন নরগণের মধ্যে নৃপতি---যেমন শিষ্যগণের মধ্যে গুরু, সেইরূপ এ ক্ষেত্রে সকল ভাবের মধ্যে স্থায়িভাবই মহান্ ৬।

ইহার পর মহর্ষি ভাবগুলির সাধারণ-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে স্থায়ি-ভাবগুলির লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থায়িভাবগুলির মধ্যে প্রথম 'রতি'। রতি প্রমোদাত্মিকা---আমোদাত্মক ভাব। ঋতু-মাল্য-অনুলেপন (চন্দন-গন্ধাদি)---আভরণ-ভোজন (প্রিয়জন)-শ্রেষ্ঠভবন ও অপ্রতিকূল (অর্থাৎ অনুকূল) অনুভূতি ইত্যাদি বিভাব হইতে রতি সমুৎপন্ন হয়। স্মিত বদন, মধুর কথন, ভ্রূক্ষেপ, কটাক্ষ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা রতির অভিনয় কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সংগ্রহ-শ্লোক নিম্নলিখিত-রূপ:---

অভীষ্ট-বিষয়-প্রাপ্তিতে রতি সমুৎপন্ন হয়। ইহা সৌম্যভাব বলিয়া বাঙ্মাধুর্য্য ও (সুকুমার) অঙ্গ চেষ্টা-দ্বারা অভিনেয় ৭।

---

(১) "অত্র (ভবতি চাত্র) শ্লোকঃ---

যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।

শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা"॥

---নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সং), পৃঃ ৩৪৯

(২) "যদি কাব্যার্থসংশ্রিতৈ (যদান্যোন্যার্থসংশ্রিতৈ)-বিভাবানুভাবব্যঞ্জিতৈরেকোনপঞ্চাশদ্ভাবৈঃ সামান্যগুণযোগেনাভিনিষ্পদ্যন্তে রসাস্তৎ কথং স্থায়িন এব (কথমিদানীমেতে স্থায়িনোঽষ্টৌ) ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি?" ---নাঃ শাঃ, বরোদা সং, পৃঃ ৩৫০

(৩) এই অংশের পাঠ এত অশুদ্ধ ও নানারূপ পাঠান্তর-কণ্টকিত যে, মোটামুটি অর্থবোধ হইলেও সর্ব্বাংশের পরিশুদ্ধ যোজনা অতি দুষ্ট। বরোদা ও কাশী সংস্করণ মিলাইয়া নিম্নের পাঠ দেওয়া হইল। "উচ্যতে (এবমেতদিতি। কস্মাৎ?)---যথাহি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ (সমানাঃ) সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গা (সমানপ্রত্যঙ্গা) রাজত্বমাপ্নুবন্তি, তত্রৈব চান্যেঽল্পবুদ্ধয়স্তেষামনুচরা ভবন্তি"।---নাঃ শাঃ, (বরোদা) পৃঃ ৩৫০ (কাশী পৃঃ ৮০---৮১)।

(৪) "তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাঃ স্থায়িনো ভাবাঃ তদ্বৎ স্থানীয়পরুষগুণভূতা (?) অন্যে ভাবাস্তান্ গুণতয়াশ্রয়ন্তে (স্থায়িভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি) পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ"---নাঃ শাঃ (বরোদা), পৃঃ ৩৫০।

"তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তীত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাশ্চ স্থায়িনো ভাবাঃ। তদ্বৎ স্থায়িনি বপুষি গুণীভূতা অন্যে ভাবাঃ। তান গুণবত্তয়াশ্রয়ন্তে পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ"---নাঃ শাঃ (কাশী), পৃঃ ৮১।

(৫) "অত্রাহ কো দৃষ্টান্ত ইতি?---যথা নরেন্দ্রো বহুজন-পরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভতে, নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ। (বহুষু গচ্ছৎসু কশ্চিৎ ক্বচিৎ পৃচ্ছতি---কোঽয়মিতি? স চ তমাহ রাজেত্যেব।) তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়িভাবো রস-নাম লভতে"---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫০।

(৬) "যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাঞ্চ যথা গুরুঃ।

এবং হি সর্ব্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ" ॥৮॥

---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫১

(৭) "রতির্নাম প্রমোদাত্মিকা (আমোদাত্মকো ভাবঃ,---কাশী সং) ঋতুমাল্যানুলেপনাভরণভোজনবরভবনা (প্রিয়জনবরভবনা---কাশী) নুভবনাপ্রাতিকূল্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ স্মিতবদন (বচন---কাশী)-মধুরকথন (বচন---কাশী)-ভ্রূক্ষেপ-কটাক্ষাদিভি-

দ্বিতীয় স্থায়ি-ভাব 'হাস'। পরচেষ্টার অনুকরণ, কুহক, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, পৌরোভাগ্য, মূর্খতা ইত্যাদি বিভাব হইতে হাসের উদ্ভব। পূর্ব্বোক্ত হসিতাদি দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে সংগ্রহ-শ্লোক---

পরচেষ্টানুকরণ হইতে হাস সমুৎপন্ন হয়। স্মিতহাস, অতিহসিত ইত্যাদি দ্বারা পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উহা অভিনেয় ৮।

তৃতীয় স্থায়ী 'শোক'। ইষ্টজনের বিয়োগ, বিভব-নাশ, বধ, বন্ধন, দুঃখানুভব ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। অশ্রুপাত, পরিদেবন, বিলাপ, বৈবর্ণ্য, স্বরভেদ, স্রস্তগাত্রতা, ভূমিপতন, সস্বন রোদন, আক্রন্দন, বিচেষ্টন, দীর্ঘনিশ্বাস, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মরণ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য। 'রুদিত' সাধারণতঃ তিন প্রকার---(১) আনন্দজ, (২) আর্ত্তিজ ও (৩) ঈর্ষ্যাসমুদ্ভুত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি আর্য্যা-শ্লোক সংগ্রহরূপে মহর্ষি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আনন্দ-ঈর্ষ্যা-আর্ত্তি-জনিত ত্রিবিধ রুদিত---বুধগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা জ্ঞেয়। বিভাব-গতি অনুসারে উহার অভিনয়-যোগ বলা যাইতেছে।

(কোন আনন্দকর বিষয়ের) অনুস্মরণের ফলে কপোলদেশ যাহাতে হর্ষোৎফুল্ল হয় ও অপাঙ্গ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে, গাত্রে স্পষ্ট রোমাঞ্চ দেখা দেয়, তাহাকে 'আনন্দ-সম্ভূত' রোদন বলে। (পাঠান্তরে---কপোল হর্ষোৎফুল্ল, অনুস্মরণ-বিশিষ্ট, অশ্রু সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত ও তৎসহ বাক্য বিন্যাস, রোমাঞ্চিত গণ্ডদেশ---আনন্দজ রোদনের লক্ষণ। ৯।

যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অশ্রুমোচন হয়, যে রোদনের শব্দ আছে, যাহাতে গাত্র-গতি-চেষ্টা অস্বস্থ, যাহাতে ভূমি-পতন-দ্বারা বিলাপ করা হয়, তাহাই 'আর্ত্তিজ' রোদন ১০।

যাহাতে ওষ্ঠ ও কপোল দেশ প্রস্ফুরিত হয়, শিরঃকম্প-নিশ্বাসাদি দেখা যায়। যাহা ভ্রূকুটী কটাক্ষ কুটিল, তাহাই ঈর্ষ্যাকৃত রোদন। উহা সাধারণতঃ স্ত্রীগণেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১১।

কৃত্রিম শোক (কোন) কারণ-সাপেক্ষ, প্রায় আয়াস-চিহ্ন-সংযুক্ত ও বীর-রসের অন্তর্ভুক্ত (অথবা পাঠান্তরে---বীর-রসের পরবর্ত্তী কালে সঞ্চারিত) হইয়া থাকে ১২।

ব্যসন-সম্ভূত এই শোক স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতি; অর্থাৎ স্বভাবতঃ স্ত্রী ও নীচ পাত্রে শোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তম ও মধ্যম পাত্রে ইহা দৃষ্ট হইলেও ধৈর্য্য-দ্বারা তাঁহারা শোকের অভিনয় করেন; পক্ষান্তরে, নীচপাত্রে রোদন-দ্বারাই শোকের অভিনয় (বা অভিব্যক্তি) হইয়া থাকে ১৩।

চতুর্থ স্থায়িভাব---ক্রোধ ১৪। আধর্ষণ, আক্রোশন, কলহ, বিবাদ,

ইষ্টার্থবিষয়প্রাপ্ত্যা রতিঃ সমুপজায়তে।
সৌম্যত্বাদভিনেয়াসৌ (সা) বাঙ্মাধুর্য্যাঙ্গচেষ্টিতৈঃ" ॥৯॥
----নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫১

(৮) "হাসো নাম পরচেষ্টানুকরণকুহকাসম্বদ্ধপ্রলাপপৌরোভাগ্য-মৌর্খ্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে (সৌখ্যাদিভিরনুভাবৈরুৎপদ্যতে ?---কাশী সং)। তমভিনয়েৎ পূর্ব্বোক্তৈর্হসিতাদিভিরনুভাবৈঃ। ভবতি চাত্র শ্লোক :---
পরচেষ্টানুকরণাদ্ধাসঃ সমুপজায়তে।
স্মিতহাসাতিহসিতৈরভিনেয়ঃ স পণ্ডিতৈঃ" ॥১০॥
---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫১---৫২

কুহক---"কক্ষগ্রীবাদিস্পর্শনং বিস্মাপনবিধিপ্রসিদ্ধং বালানাম্" (অভিনবভারতী---পৃঃ ৩১৪); কাতুকুতু দেওয়া। পৌরোভাগ্য---দোষদর্শন, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অসৎকর্ম্ম। স্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত, অতিহসিত---হাস্য-রস বর্ণনাবসরে সবিস্তরে বলা হইয়াছে (মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য)।

(৯) "শোকো নাম ইষ্টজনবিয়োগবিভবনাশবধবন্ধ-দুঃখানুভবনাদিভি-র্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাস্রুপাতপরিদেবিতবিলপিতবৈবর্ণ্য-স্বর-ভেদস্রস্তগাত্রতাভূমিপতনসস্বনরুদিতাক্রন্দিত (বিচেষ্টিত)-দীর্ঘনিশ্বসিত-জড়তোন্মাদ-মোহমরণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। রুদিতমত্র ত্রিবিধং---আনন্দজমার্ত্তিজমীর্ষ্যাসমুদ্ভবঞ্চেতি। ভবন্তি চাত্রার্য্যাঃ---
(আনন্দের্ষ্যার্ত্তিকৃতং ত্রিবিধং রুদিতং সদা বুধৈর্জ্ঞেয়ম্।
তস্য ত্বভিনয়যোগান্ বিভাবগতিতঃ প্রবক্ষ্যামি ॥)
হর্ষোৎফুল্লকপোলং সানুস্মরণাদপাঙ্গবিসৃতাস্রম্।
রোমাঞ্চগাত্রমনিভৃতমানন্দসমুদ্ভবং ভবতি" ॥১১॥
---নাঃ শাঃ (বরোদা), পৃঃ ৩৫২
(হর্ষোৎফুল্লকপোলং সানুস্মরণঞ্চ বাগনিভৃতাস্রম্।
রোমাঞ্চিতগণ্ডং রোদনমানন্দজং ভবতি" ॥---কাশী সং পৃঃ ৮২)

অস্র---অশ্রু। পরিদেবন---অনুশোচনা, অনুতাপপূর্ব্বক রোদন। বিলাপ---শোকবাক্য, উচ্চারণপূর্ব্বক রোদন। স্বরভেদ---স্বরভঙ্গ। আক্রন্দন---নাম ধরিয়া ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্বরে ক্রন্দন। বিচেষ্টন---মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া। জড়তা স্তম্ভ। মোহ---মূর্চ্ছা। অপাঙ্গ---চক্ষুর বাহিরের কোণ, রগের কাছ। অনিভৃত---অগুপ্ত, স্পষ্ট।

(১০) "পর্য্যাপ্তবিমুক্তাস্রং সস্বনমস্বস্থগাত্রগতিচেষ্টম্।
ভূমিনিপাতনিবর্ত্তিতবিলপিত (নিপাতিত-চেষ্টিতবিলপিত)
মিত্যার্ত্তিজং ভবতি" ॥১২॥---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫২

(১১) "প্রস্ফুরিতো (তৌ)ষ্ঠকপোলং সশিরঃকম্পং তথা সনিশ্বাসম্।
ভ্রূকুটিকটাক্ষকুটিলং স্ত্রীণামীর্ষ্যাকৃতং ভবতি" ॥১৩॥
---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৩

(১২) এই আর্য্যাটি বরোদা-সংস্করণের মূল পাঠে প্রদত্ত হয় নাই ---পাদ-টীকায় ধৃত হইয়াছে। কাশী সংস্করণে উহা পঠিত হইয়াছে---
"কারণমপে (বে)ক্ষমাণঃ প্রায়েণায়াসলিঙ্গসংযুক্তঃ।
বীররসান্তর-(রসোত্তর)-চারী কার্য্যঃ কৃতকো ভবতি শোকঃ ॥"
(ভবেচ্ছোকঃ)" ॥১৪॥ কাশী সং, পৃঃ ৮২

(১৩) "স্ত্রীনীচপ্রকৃতিষ্বেষ (প্রকৃতিঃ হোষ) শোকো ব্যসনসম্ভবঃ।
ধৈর্য্যেণোত্তমমধ্যানাং নীচানাং রুদিতেন চ" ॥১৫॥
---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৩

ব্যসন---কামজ ও ক্রোধজ দুই শ্রেণীর ব্যসন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কামজ ব্যসন দশটি---মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা (সকলকার্য্যবিঘাতিনী), পরিবাদ (পরোক্ষে পরদোষ কথন), স্ত্রীসম্ভোগ, মদ (উন্মত্ততা ---মদ্যপানজনিত), তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশেষ অনুরক্তি---একত্রে তিনটি ব্যসন), ও বৃথাভ্রমণ। ক্রোধজ ব্যসন আটটি---পৈশুন্য (অজ্ঞাতদোষাবিষ্করণ), সাহস (সাধুপুরুষকে নিগ্রহ), দ্রোহ (গুপ্তঘাতন), ঈর্ষ্যা (পরগুণে অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (পরগুণে দোষাবিষ্করণ), অর্থদূষণ (অর্থাপহরণ, দেয় অর্থ না দেওয়া), বাক্‌পারুষ্য (আক্রোশন), দণ্ডপারুষ্য (তাড়ন)। এ স্থলে ব্যসন অর্থ বিপৎ। (মনু ৭।৪৭---৪৮) দ্রষ্টব্য।

(১৪) "ক্রোধো নাম আধর্ষণাক্রুষ্টকলহবিবাদপ্রতিকূলাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। অস্য বিকৃষ্টনাসাপুটোদ্বৃত্তনয়নসন্দষ্টৌষ্ঠপুটগণ্ডস্ফুরণা-দিভিরনভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ" (তমভিনয়েদুৎফুল্লনাসাপুটোদ্বৃত্ত-নয়নসন্দষ্টৌষ্ঠপটগণ্ডস্ফুরণাদিভিরনুভাবৈঃ---কাশী সং, পৃঃ ৮২)---নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৩।

প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিভাব হইতে ক্রোধ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বিকৃষ্ট নাসাপুট, উদবৃত্ত নয়ন, সন্দষ্টৌষ্ঠপুট, গণ্ডস্ফুরণ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

ক্রোধ পঞ্চবিধ—(১) রিপু-জনিত, (২) গুরু-সম্ভূত, (৩) প্রণয়ি-সম্ভূত, (৪) ভৃত্যজ, ও (৫) কৃতক (কৃত্রিম) ১৫।

কয়েকটি আর্য্যা-সংগ্রহ-শ্লোকে মহর্ষি ইহাদের প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভ্রূকুটীকুটিল উৎকট মুখ, সন্দষ্ট ওষ্ঠপুট, এক হস্ত-দ্বারা অপর হস্ত স্পর্শ, ক্রুদ্ধ ভাব, স্বকীয় বাহুর প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি লক্ষণ সহ—শত্রুর প্রতি অবাধ রোষ প্রকাশ করিবে। (পাঠান্তর—বাহ্বাস্ফোট সহকারে; বাহু, মস্তক ও বক্ষ: স্পর্শপূর্ব্বক অবাধে শত্রুর প্রতি কোপ করিবে) ১৬।

কিঞ্চিৎ অধোমুখ-দৃষ্টি, সাশ্রুনেত্র, স্বেদাপমার্জ্জন-পরতা, অব্যক্ত উদ্ধত চেষ্টা—(এই সকল লক্ষণ সহ) (ঈষৎ) বিনয়-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া গুরুর প্রতি রোষ প্রদর্শন করিবে ১৭।

প্রকৃষ্ট বিচার অতি অল্প পরিমাণে করিয়া—অপাঙ্গ-বিক্ষেপ-দ্বারা অশ্রুমোচন-পূর্ব্বক—ভ্রূকুটী সহকারে স্ফুরিতোষ্ঠ-দ্বারা প্রণয়যুক্তা প্রিয়ার প্রতি রোষ প্রকাশ করিবে ১৮।

পরিজনবর্গের প্রতি রোষ—তর্জ্জন, ভর্ৎসনা, অক্ষি-বিস্তার ও বিবিধ প্রকার বিপ্রেক্ষণ সহ অভিনেয়। উহাতে অবশ্য ক্রূরতা থাকিবে না।
(পাঠান্তরে—'ক্রূরতা থাকিবে না'—এ অংশ নাই। অন্য পাঠে—ক্রূরভাবাপন্ন অক্ষিতারকা সহিত—এরূপ অর্থও পাওয়া যায়।) ১৯

কোন কারণ দর্শনে (অথবা কারণকে অপেক্ষা করিয়া) প্রায় আয়াস চিহ্ন-সংযুক্ত, বীর-রসান্তর-চারী (অথবা —উভয়-রস-মধ্যবর্ত্তী) কৃত্রিম কোপ উদ্ভূত হইয়া থাকে ২০।

পঞ্চম স্থায়ি-ভাব উৎসাহ। উহা উত্তম-প্রকৃতিক, অর্থাৎ—উত্তম-প্রকৃতি নায়ক ইহার আশ্রয়। অবিষাদ, শক্তি, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, ত্যাগ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎসাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-ত্যাগ-বৈশারদ্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২১। এ প্রসঙ্গে মহর্ষি একটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অসম্মোহাদি (বিভাব)-দ্বারা ব্যক্ত, ব্যবসায়-নয়াত্মক উৎসাহ অপ্রমাদ-উত্থানাদি-দ্বারা অভিনেয় ২২।

ষষ্ঠ স্থায়িভাব ভয়। ইহা গুরু-নৃপাদির নিকট কৃত অপরাধ, শ্বাপদ, শূন্যভবন, বন, পর্ব্বত, গহন-গজ-সর্পাদি-দর্শন, ভর্ৎসনা, কান্তার, দুর্দ্দিন, নিশা, অন্ধকার, উলুক-নিশাচরাদির রব-শ্রবণ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কম্পমান কর-চরণ, কম্পিত হৃদয়, স্তব্ধভাব, মুখশোষ, জিহ্বা-পরিলেহন, ঘর্ম্ম, বেপথু, ত্রাস, পরিত্রাণের অন্বেষণ, ধাবন, উৎক্রোশ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২৩।

---

(১৫) "রিপুজো গুরুজশ্চৈব প্রণয়িপ্রভবস্তথা।
ভৃত্যজঃ কৃতকশ্চৈব ক্রোধঃ পঞ্চবিধস্তথা" ॥২৪॥
—না: শা:, পৃ: ৩৫৩ (কাশী সং—এ শ্লোক নাই)।

(১৬) ভ্রূকুটীকুটিলোৎকটমুখসন্দষ্টৌ (ষ্টো)ষ্ঠঃ স্পৃশন্ করেণ করম্।
ক্রুদ্ধঃ স্বভুজপ্রেক্ষী (স্বভুজাক্ষেপী) শত্রৌ নির্যন্ত্রণং রুষ্যেৎ॥"
(স্পৃষ্টভুজশিরবক্ষাঃ শত্রোর্বিনিয়ন্ত্রণং কুপ্যেৎ—কাশী) স্বভুজাক্ষেপী—বাহ্বাস্ফোট করিয়া। নির্যন্ত্রণং—যাহাতে যন্ত্রণ (সংযম) নাই—অবাধে—ক্রি-বিণ। বিনিযন্ত্রণং—বিগত হইয়াছে নিয়ন্ত্রণ (সংযতভাব) যাহা হইতে। বিনিয়ন্ত্রণং ও নির্যন্ত্রণং—একার্থক।

(১৭) কিঞ্চিদবাঙ্মুখদৃষ্টিঃ সাস্রঃ স্বেদাপমার্জ্জনপরশ্চ।
অব্যক্তোলণচেষ্টো গুরৌ বিনয়যন্ত্রিতো রুষ্যেৎ" ॥২৭॥
(———কিঞ্চিৎস্বেদাপমার্জ্জনপরশ্চ।
———গুরোর্বিনিয়ন্ত্রণং রুষ্যেৎ ॥১৭॥—কাশী)

বরোদার পাঠের অর্থ—গুরুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিতে হইলে কিছু পরিমাণে বিনয়-সংযত হইয়া রোষের প্রকাশ করা উচিত। পক্ষান্তরে, কাশীর পাঠের অর্থ—গুরুর প্রতিও অবাধে রোষ প্রকাশ করা যাইতে পারে। বরোদার পাঠটি অপেক্ষাকৃত সমীচীন বোধ হয়—কারণ অতি স্পষ্ট—গুরুর প্রতি বিনয়-সংযত ক্রোধ-প্রকাশই সঙ্গত।

উল্বণ—মহার্হ, উদ্ধত, বীর বা রৌদ্র রসের অনুকূল ভাব।

(১৮) "অল্পতরপ্রবিচারো বিকিরন্নশ্রূণ্যপাঙ্গবিক্ষেপৈঃ।
সভ্রূকুটীস্ফুরিতৌষ্ঠঃ প্রণয়োপগতাং (প্রণয়াভিগতাং)
প্রিয়াং রুষ্যেৎ" ॥২৮॥
—না শা:, পৃ: ৩৫৪

(১৯) "অথ পরিজনে তু রোষস্তর্জ্জননির্ভর্ৎসনাক্ষিবিস্তারৈঃ।
বিপ্রেক্ষণৈশ্চ বিবিধৈরভিনেয়ঃ ক্রূরতারহিতঃ
(ক্রূরতারক্তিতঃ)"।
(বিপ্রেক্ষণৈশ্চ বিবিধৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ—কাশী)
—না: শা:, প: ৩৫৪

বিপ্রেক্ষণ—বিরুদ্ধভাবে দৃষ্টিপাত।

(২০) "কারণমবে(পে)ক্ষমাণঃ প্রায়েণায়াসলিঙ্গসংযুক্তঃ।
বীররসান্তরচারী (উভয়রসান্তরচারী—কাশী)
কার্য্যঃ কৃতকো ভবতি কোপঃ" (ভবেদ্রোষঃ—কাশী) ॥৩০
—না: শা:, পৃ: ৩৫৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে—দ্বাদশ-সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত 'কৃতক-শোক'—লক্ষণের সহিত এই কৃতক-কোপ-লক্ষণের অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

(২১) "উৎসাহো নাম উত্তমপ্রকৃতিঃ। স চাবিষাদশক্তিধৈর্য্য-শৌর্য্য-(ত্যাগাদিভিঃ) বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্থৈর্য্যধৈর্য্যত্যাগ-বৈশারদ্যাদিভিঃ (ধৈর্য্যত্যাগারম্ভবৈশারদ্যাদিভিঃ—কাশী) অনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ" —না: শা:, পৃ: ৩৫৪

(২২) "অসম্মোহাদিভির্ব্যক্তো ব্যবসায়নয়াত্মকঃ।
উৎসাহস্ত্বভিনেয়ঃ স্যাদপ্রমাদোত্থিতাদিভিঃ ॥
উৎসাহস্ত্বভিনেয়োঽসাবপ্রমাদক্রিয়াদিভিঃ—কাশী)
—না: শা:, পৃ: ৩৫৪

(২৩) "ভয়ং নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকং গুরুরাজাপরাধশ্বাপদশূন্যাগারাটবীপর্ব্বতগহনগজাহিদর্শননির্ভর্ৎসনকান্তারদুর্দ্দিননিশান্ধকারোলকনক্তঞ্চরারাবশ্রবণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে (……রাজাপরাধ-শূন্যাগারাটবীপর্য্যটন-পর্ব্বতদর্শন-নির্ভর্ৎসনদুর্দ্দিননিশান্ধ…বিভাবৈরুৎপদ্যতে)। তস্য প্রকম্পিতকরচরণহৃদয়কম্পনস্তম্ভ মুখশোষজিহ্বা-পরিলেহনস্বেদবেপথুত্রাসপরিত্রাণান্বেষণধাবনোৎক্রুষ্টাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ (…প্রবেপিত—মুখশোষণজিহ্বাপরিলেহনস্বেদবেপথুপরিলাভান্বেষণ……) প্রযোক্তব্যঃ"—না: শা:, পৃ: ৩৫৪-৫৫

অটবী—বন। গহন—দুর্গম প্রদেশ, বন, গুহা ইত্যাদি। কান্তার—নির্জ্জন বৃহৎ বন, দুর্গম পথ বা গর্ত্ত। দুর্দ্দিন—মেঘাচ্ছন্ন দিবস। উলক—পেঁচা। নক্তঞ্চর—নিশাচর পশু পক্ষী বা রাক্ষসাদি। প্রবেপিত—প্রকম্পিত। স্তম্ভ—শরীরের স্তব্ধীভূত ভাব। মুখশোষ(ণ)—মুখ শুকাইয়া যাওয়া। জিহ্বা-পরিলেহ(ন)

এই প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোক তিনটি ও একটি আর্য্যা মহর্ষি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

গুরু ও রাজার নিকট অপরাধ-বশতঃ, রৌদ্র প্রাণিগণের দর্শনহেতু ও ঘোর (শব্দ) শ্রবণের ফলে মোহবশে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। (অর্থাৎ —এইগুলি বিভাব)।

গাত্র-কম্পন, বিত্রাস, বক্তশোষ, সম্ভ্রম, বিস্ফারিত নয়ন ইত্যাদি দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য। (অর্থাৎ—এইগুলি অনুভাব)।

প্রাণিগণ-কৃত বিত্রাসনের ফলে নরগণের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিসৃষ্ট অঙ্গ ও অক্ষিনিমেষ-দ্বারা নর্ত্তক-কর্ত্তৃক উহা অভিনেয়। (ইহার প্রথমার্দ্ধে বিভাব ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনুভাব উল্লিখিত হইয়াছে)।

কর-চরণ-হৃদয়-কম্প, মুখশোষ, মুখলেহন, স্তম্ভ, সম্ভ্রমভাবযুক্ত বদন, বেপথু, সন্ত্রাস ইত্যাদি দ্বারা ভয়ের অভিনয় হইয়া থাকে। (এই-গুলি অনুভাব) ২৪।

সপ্তম স্থায়িভাব জুগুপ্সা। ইহা স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতিক। অহৃদ্য (বস্তু বা জীবের) দর্শন-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিভাব হইতে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কোচন, নিষ্ঠীবন, মুখ-বিকূণন, হৃল্লেখ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় ২৫।

এ প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোক—নাসা-প্রচ্ছাদন, গাত্রসঙ্কোচ, উদ্বেগ ও হৃল্লেখ দ্বারা জুগুপ্সার নির্দ্দেশ (অর্থাৎ অভিনয়) করা কর্ত্তব্য ২৬।

অষ্টম স্থায়িভাব বিস্ময়। মায়া, ইন্দ্রজাল, মানুষ-কর্ম্মের অতিক্রম-কারী কর্ম্ম, চিত্র-পুস্ত-শিল্প-বিদ্যাদির আতিশয্য ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। নয়ন-বিস্তার, অনিমেষ প্রেক্ষণ, ভ্রূক্ষেপ, রোমহর্ষ, শিরঃকম্প, সাধুবাদ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২৭।

এ প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোক—কর্ম্মের আতিশয্য হইতে সমুৎপন্ন বিস্ময় হর্ষ-সম্ভূত। উহার সিদ্ধি করিতে হইলে প্রহর্ষ-পুলকাদি-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২৮।

এই আটটি স্থায়িভাব—ইহারাই রস-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। অতঃপর ব্যভিচারি-ভাবের প্রসঙ্গ। উহা বারান্তরে আলোচ্য।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

—মুখ শুকাইয়া যাইলে জিহ্বা দ্বারা মুখ (ওষ্ঠাধর) চাটা। স্বেদ—ঘর্ম্ম। বেপথু—কম্প। উৎক্রোশ—উচ্চ চীৎকার। সম্ভ্রম—ত্বরা।

(২৪) "গুরুরাজাপরাধেন রৌদ্রাণাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
শ্রবণাদপি ঘোরাণাং ভয়ং মোহেন জায়তে ॥৩৪॥
গাত্রকম্পন (গাত্রাদিকম্প)-বিত্রাসৈর্বক্ত্রশোষণসম্ভ্রমৈঃ।
বিস্ফারিতেক্ষণৈঃ কার্য্যমভিনেয়ক্রিয়াগুণৈঃ ॥৩৫॥
সত্ত্বিত্রাসনোদ্ভূতং (তত্র বিত্রাসনোদ্ভূতং)
ভয়মুৎপদ্যতে নৃণাম্।
সস্তাঙ্গাক্ষিনিমেষৈস্তদভিনেয়ং তু (—নিমেষৈশ্চ ব্যভি-
নেয়স্তু) নর্ত্তকৈঃ ॥৩৬॥

অত্রার্য্যা ভবতি—

করচরণহৃদয়কম্পৈর্মুখশোষণবদনলেহনস্তম্ভৈঃ।
সম্ভ্রান্তবদনবেপথুসন্ত্রাসকৃতৈরভিনয়োঽস্য ॥৩৭॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৫

কাশী সংস্করণের পাঠ অত্যন্ত ভিন্ন—

"করচরণহৃদয়কম্পৈঃ স্তম্ভনজিহ্বোপলেহমুখশোষৈঃ।
স্রস্তস্রবিষণ্ণগাত্রৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ" ॥২৫॥
—পৃঃ ৮৩

(২৫) "জুগুপ্সা নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকা। সা চাহৃদ্যদর্শনশ্রবণ-পরিকীর্ত্তনাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গসঙ্কোচ-নিষ্ঠীবনমুখবিকূণন (মুখবিঘূর্ণন—কাশী) হৃল্লেখাদিভিরনু-ভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ" —নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৫

অহৃদ্য—যাহা হৃদ্য অর্থাৎ হৃদয়প্রিয় নহে—অপ্রিয়। নিষ্ঠীবন—থুথু ফেলা, কফ-নিরসন (অভিনব)। মুখবিকূণন—মুখসঙ্কোচ; বিকূণন—সঙ্কোচন (অভিনব)—contortion (Mukherje) হৃল্লেখ—হৃৎপীড়া, হৃৎকম্প, palpitation of the heart, heart-ache (Apte).

(২৬) "নাসাপ্রচ্ছাদনেনেহ (দনেনাপি) গাত্রসঙ্কোচনেন চ।
উদ্বেজনৈঃ সহৃল্লেখৈর্জুগুপ্সামভিনির্দ্দিশেৎ" ॥৪০॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৬

উদ্বেজন—উদ্বেগ অথবা গাত্রকম্পন; উদ্বেজন—গাত্রোদ্ধুনন (অভিনব); উদ্ধনন—কম্পন।

(২৭) "বিস্ময়ো নাম মায়েন্দ্রজালমানুষ্যকর্ম্মাতিশয়চিত্রপুস্ত-শিল্পবিদ্যাশয়াদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে) —মানুষকর্ম্মাতিশয়বিচিত্র-বপস্তচিছল্পাতিশয়াদ্যৈর্বিভাবৈরুৎপদ্যতে)। তস্য নয়নবিস্তারানি-মেষপ্রেক্ষিতভ্রূক্ষেপরোমহর্ষণ (স্বেদ—কাশী) শিরঃকম্পসাধুবাদাদি-ভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ"—
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৬

মায়া—রূপ-পরিবর্ত্তনাদি। ইন্দ্রজাল—মন্ত্র-দ্রব্যগুণাদির যোগে অসম্ভব বস্তু প্রদর্শন (অভিনব)। চিত্র—ছবি, অথবা বিচিত্র। পুস্ত—নেপথ্যাভিনয় চতুর্ব্বিধ—(১) পুস্ত, (২) অলঙ্কার, (৩) অঙ্গ-রচনা ও (৪) সঞ্জীব। নাট্যে শৈল-যান বিমান-চর্ম্ম-বর্ম্ম-ধ্বজ-বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি যাহা কিছু দেখান হয়, তাহাই 'পুস্ত'—

"শৈলযানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মধ্বজা নগাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে নাট্যে হি স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ'॥

(কাশী সং, নাঃ শাঃ ২৩।৯)। পুস্ত ত্রিবিধ—(১) সন্ধিম, (২) ব্যাজিম ও (৩) চেষ্টিম (কাশী সং ২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৫৪)

(২৮) "কর্ম্মাতিশয়নির্বৃত্তো বিস্ময়ো হর্ষসম্ভবঃ।
সিদ্ধিস্থানে ত্বসৌ সাধ্যঃ প্রহর্ষপুলকাদিভিঃ ॥
(হর্ষাশ্রুপুলকাদিভিঃ)" ॥ নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৫

আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা

সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, মিষ্টার টাটা, শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলা, সার আরদেশীর দালাল, সার শ্রীরাম, মিষ্টার কস্তুরভাই লালভাই, মিষ্টার শ্রফ ও মিষ্টার মাথাই—এই কয় জন শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞ-রচিত ভারতের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা প্রকাশ এ মাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

এ দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও লোকের দারিদ্র্য-জনিত দুঃখ নিবারিত না হইলে দেশের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সে দিনও বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের কথায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছিলেন—দেশের লোক সর্ব্বদাই যেরূপ অল্প আহারে জীবন যাপন করে, তাহাতে দুর্ভিক্ষে লোকের খাদ্য হ্রাস করিবার উপায় নাই। এ কথা নূতন নহে। কোন কোন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী স্বীকার করিয়াছেন—দেশের অনেক লোকই পূর্ণাহারে বঞ্চিত।

এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলিয়াছিলেন —এ দেশের কোটি কোটি লোক অপূর্ণাহারে অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করে—জীবনে তাহাদিগের কোন আনন্দ কোন আকর্ষণ নাই; তাহারা জন্মিয়াছে বলিয়া যত দিন মৃত্যু না আসে তত দিন বাঁচিয়া থাকে।

এই যে জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত লোক ইহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন অবশ্যই রাষ্ট্রের অর্থাৎ সরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু এ দেশের রাষ্ট্র দেশবাসীর অভিপ্রায়ে শাসিত নহে। লর্ড কার্জ্জন সামন্ত রাজ্যে বিদেশীদিগের শোষণের নিন্দা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই বলিয়াছিলেন—ভারতে বৃটিশ শাসনের দুই দিক—শাসন ও শোষণ। সরকার শাসন ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা শোষণ করেন।

যে সকল দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল, সে সকল কিরূপে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করে, আমরা আজ তাহার দুইটি মাত্র উদাহরণ দিব। উভয় উদাহরণই গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে বৃটেনের ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যয়ের পরবর্ত্তী পরিকল্পনার।—

(১) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন, তাহার সমর্থনে তিনি বলেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধ হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত বিলাতের সরকার বেকারদিগের জন্য ১৫ লক্ষ ৩ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আর্থিক উন্নতি হয় নাই। সেই জন্য তিনি স্বাস্থ্য-নীতিসম্মত গৃহনির্ম্মাণে ও কৃষির উন্নতি সাধনে অর্থ প্রযুক্ত করিয়া, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া নানারূপে বিলাতের লোকের আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

(২) ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মার্কিণে আর্থিক উন্নতির যে পরিকল্পনা করা হয়, তাহাতে ২৫ বৎসরে ৩১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল।

অবশ্য অর্থ রাষ্ট্র হইতেই ব্যয়িত হইবে—এই মতের ভিত্তির উপর পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনাদ্বয় রচিত হইয়াছিল।

এ দেশে সরকার সে কায করিতে অগ্রসর হন নাই। সেই জন্য দেশের লোকের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যে অবহিত হইয়া দেশের লোকের দ্বারা এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল অর্থের দিক হইতেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই—মানুষের প্রয়োজন ও উন্নতি বিবেচনা করিয়া রচিত হইয়াছে।

মানুষের খাদ্যের, বস্ত্রের, শিক্ষার ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির যে আদর্শ এই পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বাহুল্য নাই—তাহা প্রয়োজনানুসারে পরিকল্পিত।—

(১) পরিকল্পনায় যে খাদ্যের প্রয়োজন স্থির করা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক লোক ২ হাজার ৮ শত "কেলরিস" (খাদ্য-শক্তি) পাইতে পারিবে। যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্যের হিসাবে তাহাতে প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ৬৫ টাকা হওয়া প্রয়োজন।

(২) বর্ত্তমানে লোক ১৬ গজের অধিক বস্ত্র পায় না। পরিকল্পনায় প্রত্যেকের জন্য ৩০ গজ কাপড় ধরা হইয়াছে।

(৩) প্রত্যেকের জন্য এক শত বর্গ-ফিট আশ্রয় প্রয়োজন ধরা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, পল্লীগ্রামে ও সহরে পানীয় জল-সরবরাহের ও স্বাস্থ্য-রক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে ডাক্তারখানা, সহরে হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদন এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রে যক্ষা, কর্কট রোগ, কুষ্ঠ রোগ, যৌন ব্যাধি প্রভৃতির চিকিৎসাগার স্থাপিত করিতে হইবে।

জাপানে শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল—কোন গ্রামে নিরক্ষর পরিবার এবং কোন পরিবারে নিরক্ষর লোক থাকিবে না। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—১০ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন নিরক্ষর লোক দেশে থাকিবে না।

পরিকল্পিত উন্নতির পর প্রত্যেকের আয় ৭৪ টাকা হওয়া প্রয়োজন।

প্রতি ৫ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ হিসাবে বর্দ্ধিত হইবে ধরিলে ১৫ বৎসরে আয় দ্বিগুণ করিতে বর্ত্তমান জাতীয় আয় ৩ গুণ করিতে হইবে।

সেই আয়-বৃদ্ধির উপায়ও এই পরিকল্পনায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহাতে দেশের লোক খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে, কৃষি-কার্য্যে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিল্পের মধ্যে যে সকল শিল্পকে "মূল শিল্প" বলা হয়, সেই সকলের উন্নতি দ্রুত সাধন করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ১০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে:—

শিল্পের জন্য	...	৪ হাজার ৪ শত ৮০ কোটি টাকা
কৃষির জন্য	...	১ হাজার ২ শত ৪০ কোটি টাকা
পথের জন্য	...	৯ শত ৪০ কোটি টাকা
শিক্ষার জন্য	...	৪ শত ৯০ কোটি টাকা
স্বাস্থ্যের জন্য	...	সাড়ে ৪ শত কোটি টাকা
গৃহনির্ম্মাণের জন্য	...	২ হাজার ২ শত কোটি টাকা
বিবিধ হিসাবে	...	২ হাজার ২ শত কোটি টাকা।

বলা বাহুল্য, কার্য্যের গুরুত্ব ও বিরাটত্ব বিবেচনা করিলে এই ব্যয় অধিক বলা যায় না।

পরিকল্পনা-রচনাকারীরা বিস্তৃত হিসাব—ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ও কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যয়-তালিকা প্রদান করেন নাই। কারণ, তাঁহাদিগের এই পরিকল্পনা প্রধানতঃ লোকের আলোচনা ও সমালোচনার জন্য। আলোচনায় ও সমালোচনায় যে ইহার ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সমগ্র পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ভাবে বিবেচনা করিয়া কায করিতে হইবে।

পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা হইয়াছে—ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যুদ্ধের পরে এ দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আর্থিক ব্যাপারে সেই সরকারের কায করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। আরও ধরা হইয়াছে—অর্থনীতিক ব্যাপারে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ও অখণ্ড বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

ইহা হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশে স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকাই—সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের হতভাগ্য অধিবাসিগণের অভাবে ও অপচয়ে দুঃখ, দারিদ্র্য দুর্দ্দশা ও দুর্ভিক্ষ ভোগের কারণ।

এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যে দেশের লোকের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগ প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। যত দিন দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন বিদেশী শাসকগণ এই কার্য্যে রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি ও সামর্থ্য প্রযুক্ত করিবেন কি না, তাহা বলা যায় না। অতীতের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আশার অধিক অবকাশ প্রদান করে না। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিলেও দেশের লোকের সম্পূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন পাইলে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। তবে সে জন্য দেশবাসীকে ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আবার আশঙ্কা

অস্থায়িরূপে বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সার টমাস রাথারফোর্ড দুইটি কথা বলিয়াছিলেন :—

(১) জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় চাউলের মূল্য ১০ টাকা মণ হইবে;

(২) আমন ধান সংগৃহীত হইলেই বাঙ্গালার দুঃখ দূর হইবে।

দুঃখের বিষয়, সেই দুই কথার একটিও সত্য হয় নাই। তিনি অপূর্ণ আশা লইয়া মিষ্টার কেসীকে কার্য্যভার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার অবস্থা মেজর-জেনারল ষ্টুয়ার্ট, গত ১১ই জানুয়ারী, নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

(১) দুর্ভিক্ষ ও তাহার পরবর্ত্তী ফলে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রামের সমাজে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি গার্হস্থ্য ব্যাপারের শিল্পীরা অনেক স্থলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের শূন্য স্থান পূর্ণ করা দুষ্কর।

(২) সমর বিভাগ দক্ষিণ-বঙ্গে ১৭টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া পীড়িতদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। ৪০টি যাযাবর চিকিৎসাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ ৩০ হাজারেরও অধিক লোক এই সকলের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে—রোগীদিগের ১ লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। প্রতি গৃহে ম্যালেরিয়ায় লোক মরিয়াছে বা শয্যাগত রহিয়াছে।

(৩) কুইনাইনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কলেরা এখন কমিয়াছে, কিন্তু বসন্ত দেখা দিয়াছে।

এই শোচনীয় অবস্থার সহিত আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়—সমগ্র ভারতে যে প্রায় এক কোটি গবাদি পশু নিহত করা হইয়াছে, বাঙ্গালায় তাহার ভাগ অনুল্লেখযোগ্য নহে। লোকের অভাবে ও গৃহপালিত পশুর অভাবে কৃষিকার্য্যে বিশেষ অসুবিধা অনিবার্য্য। দুগ্ধের অভাব যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলা বাহুল্য।

বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রের দিল্লীস্থ প্রতিনিধি লিখিয়াছেন—

যদিও এবার আমন ধান্যের ফশলে অসাধারণ অধিক ফলন হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালার অপূর্ণাহার-দুর্ব্বল—ব্যাধি-জর্জ্জরিত জনগণের আবার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা হইতেছে। এবার দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ হইবে। কয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে আশা করা গিয়াছিল, বিপদের অবসান হইয়াছে, সে আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত বার যে সকল কারণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এ বার সেই সকল কারণই সপ্রকাশ হইতেছে—লোকের আস্থার অভাব ঘটিয়াছে, যে ব্যবসার পথে খাদ্য-শস্য লোকের নিকট আসিত সে পথ বন্ধ করা হইয়াছে। যে সকল দুর্গতকে কলিকাতা হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহারা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছে—গ্রামে তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায় নাই। বাঙ্গালা সরকার যে ৪টি "এজেণ্ট"—ধান্য ও চাউল ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবসার বাজারে সুপরিচিত হইলেও চাউলের ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ।

বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই বিবৃতির প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিবৃতিতেও বহু ত্রুটি সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে।

সচিবরা কলিকাতার ও বাঙ্গালার সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে বাদ দিয়া যে ৪ জন "এজেণ্ট" নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মেসার্স শ ওয়ালেস কোম্পানী বিদেশী, মেসার্স দৌলৎরাম রাউৎমল মাড়বারী এবং সরকারই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পরে আর চাউলের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন না।

অবশিষ্ট—

(১) মেসার্স ইস্পাহানী কোম্পানী

(২) ভাগ্যকুলের রায়গণ

মেসার্স ইস্পাহানী কোম্পানীর পক্ষে মীর্জ্জা আবদুল ওহাবার গত বৎসর ১৮ই জুন হইতে ১৮ই আগষ্ট ২ মাসের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ লঙ্ঘন করিয়া—বে-আইনী ভাবে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার চাউল কিনিয়া মজুদ করায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও এক হাজার টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে। মজুদ চাউল বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হইয়াছে। সে বলিয়াছিল, সে বাঙ্গালার দুর্গতদিগের জন্য চাউল ক্রয় করিয়াছিল। বিচারক বলিয়াছেন, সে লাভের জন্য তাহা করিয়াছিল এবং সেই জন্য বিশেষ ভাবে দণ্ডার্হ। এই চাউল সে মেসার্স ইস্পাহানীর জন্য কিনিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে সরকার কোন বিবৃতি প্রচার করেন নাই।

ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায়-পরিবার যে বড় ব্যবসায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রচার-সচিব যে বলিয়াছেন, তাঁহারা ৬১৭ বৎসর পূর্ব্বেও চাউল-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। তাঁহারা অন্ততঃ ২০ বৎসর সে ব্যবসা করেন নাই। এই মিথ্যা ইচ্ছাকৃত কি না, কে বলিবে?

'নিউজ ক্রনিকল' সচিবদিগের বিবৃতি উপেক্ষণীয় ধরিয়া লইয়াছেন।

ও দিকে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব বলিয়াছেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ৫ মাসে দুর্ভিক্ষে ও রোগে অতিরিক্ত মৃত্যুসংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করে নাই। তাঁহার হিসাব নির্ভরযোগ্য নহে—কারণ, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন—নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় নাই। এ দেশের লোকের বিশ্বাস, মৃত্যুসংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু যদি তাহা ১০ লক্ষই হয়, তথাপি—এই মৃত্যুর জন্য কি সচিবসঙ্ঘ, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন হার্বার্ট, লর্ড লিনলিথগোর সরকার ও বৃটিশ সরকার দায়ী নহেন?

'নিউজ ক্রনিকল' যে আশঙ্কার কথা বলিয়াছেন, তাহা যাহাতে সত্যে পরিণত হইতে না পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গত বার যে সচিবরা খাদ্য-দ্রব্যের অভাব জানিয়াও যে অভাব নাই বলিয়া মিথ্যায় লোককে ও কেন্দ্রী সরকারকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন এবং সে জন্য লজ্জানুভবও করেন নাই, যদি সেই সচিবরা আবার সতর্ক হইতে বাধ্য না হয়েন, তবে বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালার বিপদ যে এখনও ঘুচে নাই, তাহা কোন কোন ইংরেজ ও বহু ভারতীয় বলিয়াছেন। এই ভারতীয়দিগের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত দুর্ভিক্ষ যে মানুষের সৃষ্ট তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এবার বাঙ্গালায় আমন ধানের ফলন ভাল হইয়াছে এবং কলিকাতা ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের ভার কেন্দ্রী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। কাযেই এবার মানুষের ত্রুটি না হইলে বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব হইতে পারে না। যাহাতে মানুষ ত্রুটি করিতে না পারে, তাহাই করিতে হইবে।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বাঙ্গালা সরকারকে "ঘর গুছাইবার" জন্য কয় মাস সময় দিয়াছিলেন। তিনি কি দেখিতেছেন, বাঙ্গালা সরকার সে কায করিতেছেন? ইতোমধ্যে যে অস্থায়ী গভর্ণর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের স্থিতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন? নূতন গভর্ণর মিষ্টার কেসী এ দেশের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহার আবশ্যক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে বিলম্ব হইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অবস্থা প্রতীকারাতীত হইতে যে পারে না, তাহা নহে। সুতরাং কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে এখনই বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন।

সচিবসঙ্ঘের গত বারের কার্য্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করা সঙ্গত কি না, তাহা বুঝিতে হইবে।

বিশেষ লর্ড ওয়াভেল ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরীর মত অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন—খাদ্য-সমস্যা প্রাদেশিক সরকারের ব্যাপার নহে; তাহা কেন্দ্রী সরকারের কায। সুতরাং বাঙ্গালায় যাহাতে আবার খাদ্য-দ্রব্যের অভাব নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত সচিব-সঙ্ঘের কার্য্যফলে আবার দুর্ভিক্ষ না ঘটে, তাহা সময় থাকিতে করা কর্ত্তব্য।

অমৃতসরে শোভাযাত্রা ভঙ্গ

গত ২৫শে ডিসেম্বর অমৃতসরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির শোভাযাত্রা ভঙ্গের বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য

সার টেকচাঁদ (লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ)
মিষ্টার গঙ্গারাম সেন (অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ)
মিষ্টার বদরী দাস (লাহোর হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব)

এই ৩ জনে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণ গত ১৯শে জানুয়ারী স্বাক্ষরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সদস্যত্রয় আবশ্যক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে:—

(১) শোভাযাত্রায় পুলিস প্রদত্ত ছাড়ের কোন সর্ত্ত কোনরূপে ভঙ্গ করা হয় নাই

(২) ছাড় বাতিল করিবার কোন কারণ ছিল না

(৩) ছাড় বাতিল করার সংবাদ যথাযথ ভাবে শোভাযাত্রাকারী-দিগকে জানান হয় নাই

(৪) শোভাযাত্রাকারীদিগকে চলিয়া যাইবার যথেষ্ট সময় না দিয়াই লাঠিচালনা করা হইয়াছিল

(৫) সরকার পক্ষের কর্ম্মচারীদিগের বলপ্রয়োগের কোন কারণ ছিল না

রিপোর্টে বলা হইয়াছে—

"শোভাযাত্রা আইনসঙ্গত অনুমতি লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল। শোভাযাত্রা প্রায় ৪৫ মিনিট কাল শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবে অগ্রসর হয়। তাঁহাদিগের কোন কার্য্যে কোনরূপ বে-আইনী কায করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পায় নাই। যদি ছাড় বাতিল করার আদেশ যথাযথ ভাবে শোভাযাত্রাকারীদিগকে জানান হইত, তবে যে তাঁহারা শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলিয়া যাইতেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু পুলিস শোভাযাত্রা ঘটনাস্থলে উপনীত হইবামাত্রই অবাধে লাঠি-চালনা করিতে থাকে। তখনও যে প্রহৃত ব্যক্তিরা কোনরূপ বাধা দেন নাই, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"কেবল যে শোভাযাত্রাকারীরাই প্রহৃত হইয়াছিলেন, তাহাও নহে—অনেক দর্শক প্রহৃত হইয়াছিলেন এবং স্থানত্যাগকারীদিগের মধ্যেও কোন কোন লোককে পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে অনুসরণ করিয়া প্রহার করা হয়। শোভাযাত্রা হইতে দূরে যে সকল দর্শক ছিলেন, তাঁহারাও যে আহত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।

"এই সকল ঘটনার পরে যে সরকারী বিবৃতিতে বলপ্রয়োগের কোন উল্লেখ নাই, পরন্তু বলা হইয়াছে, শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলিয়া যায়—ইহা বিস্ময়কর।"

কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পঞ্জাবী ব্যাপারের পরেও কি আমাদিগের বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে?

আমরা শুনিতেছি, পঞ্জাব সরকার স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমিতির রিপোর্ট অবজ্ঞা করিবেন; কারণ, ইহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিলে রাজকর্ম্মচারীদিগের কথায় অবিশ্বাস করিতে হয়। ঐ সকল রাজকর্ম্মচারী লাঠি-চালনা অস্বীকার করিয়াছেন।

অথচ প্রহৃত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে লইতেও হইয়াছিল এবং সার মনোহরলাল সে দিন অমৃতসরে উপস্থিত থাকায় কয় জন

আহতকেও দেখিয়াছিলেন। তিনি না কি ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে বিষয়টি জানাইয়াছেন। তিনি বড়লাটকে কি পঞ্জাবের গভর্ণরকে বিষয়টি জানাইয়াছিলেন, তাহা তিনি বলেন নাই—আমরাও জানি না। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? যদি তাহার কথা অনায় সে অবজ্ঞাত হয় এবং অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের অস্বীকৃতিই স্বীকৃত হয়, তবে তাহার পরেও তিনি পদত্যাগে বিরত থাকিবেন?

সমিতির রিপোর্ট এ দেশে ভারতবাসী কিরূপ ব্যবহার লাভ করে, তাহার নিদর্শনে নূতন প্রমাণ যোগ করিল।

নূতন নূতন আইন

যে সময়ে বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষজনিত সর্ব্বনাশের ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, সেই সময়ে তাহাকে সুস্থ ও স্বস্থ হইবার অবকাশ না দিয়া বাঙ্গালার প্রতিক্রিয়াপন্থী সচিবসঙ্ঘ নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের ভোটের মাহাত্ম্যে নূতন বিক্রয়-কর আইন ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অপ্রীতিকর বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করা হইতেছে। যে সচিবসঙ্ঘ আপনাদিগের চাকরী বজায় রাখিবার উদগ্র চেষ্টায় সচিবসংখ্যা বৃদ্ধি, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ, নূতন নূতন পদ সৃষ্টি প্রভৃতিতে—পঙ্গপাল যেমন শস্যক্ষেত্র শস্যহীন করে তেমনই—বাঙ্গালার রাজস্ব শেষ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা অর্থাভাবের দোহাই দিয়া এই করবৃদ্ধি সমর্থন করিয়াছেন। যিনি অপব্যয়ের অনিবার্য্য ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই অর্থ-সচিব অর্থাভাবের কথাই বলিয়াছেন। যদি কেবল ধনীর ব্যবহার্য্য বিলাস দ্রব্যের উপর কর বর্দ্ধিত করা হইত এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের অবশ্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য করমুক্ত করা হইত, তবে তাহাতে কাহারও আপত্তির সঙ্গত কারণ থাকিত না। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। এমন কি, যে বস্ত্র দরিদ্রগণ ব্যবহার করেন, তাহা কিরূপে কর হইতে অব্যাহতিলাভ করিবে, সে সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা প্রকাশ করা হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহা বলা দুষ্কর। কারণ, যখন অর্থের প্রয়োজন তখন ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার মধ্যস্থ সূক্ষ্ম সীমারেখা যে সহজেই অতিক্রান্ত হইতে পারে, তাহা মনে করা অসঙ্গত বলা যায় না।

যে সময়ে লোকের করভার লঘু করিয়া তাহাতে পুনর্গঠনে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান করা সঙ্গত ও প্রয়োজন, সেই সময়ে যে কর দরিদ্রকেও বহন করিতে হইবে, তাহা প্রতিষ্ঠিত বা বর্দ্ধিত করা যে নির্ম্মমতার পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য ব্যতীত আর কি বলা যায়?

এই নির্ম্মমতার ঘৃণ্য ভাব এই কারণে আরও সুস্পষ্ট হয় যে, সচিব-সঙ্ঘ ব্যয়সঙ্কোচের কোন চেষ্টা করেন নাই। স্বার্থ যাহারা পদমর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধানুভব করে না, তাহাদিগের কার্য্যে দেশবাসী কিরূপে উপকার লাভের আশা করিতে পারে?

ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটি ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই দুইটির রিপোর্ট পাঠ করিলেও—পরিবর্ত্তিত অবস্থায়—বাঙ্গালা সরকার উপকৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি বা দীক্ষাও বোধ হয়, তাঁহাদিগের নাই।

এখন দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালার গভর্ণর এই করবৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন কি?

ইহার পরে আমরা আরও দুইখানি আইন-প্রণয়নের চেষ্টার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল;

(২) কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর স্থাপন জন্য কল্পিত বিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের ধ্বংসকর ব্যবস্থার আলোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি। এই বিধি বিধিবদ্ধ হইলে যে বাঙ্গালায় শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় কেন্দ্রী সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, কোন মতভেদাত্মক ব্যবস্থা যুদ্ধকালে করা হইবে না। তাহাই যে রাজনীতিকোচিত নির্দ্ধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ সে বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন না এবং দেশের ও বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে—যখন বাঙ্গালা এক দিকে জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত আর এক দিকে দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষান্ত রোগে জর্জ্জরিত এবং হয়ত আবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবে, সেই সময়ে পুনর্গঠন কার্য্য হইতে লোকের আবশ্যক মনোযোগ ছিন্ন করিয়া মতভেদাত্মক কার্য্যে বিবাদের ও বিতর্কের সৃষ্টি করা যে কত অসঙ্গত, তাহা যে বলিয়া দিতে হয়, ইহাই দুঃখের বিষয়। এই বিলের বিচার জন্য যে সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহা নিয়মানুগরূপে গঠিত হয় নাই বলিয়া সচিববিরোধী দলের কোন সদস্য তাহাতে যোগ দেন নাই। কেবল সেই কারণেও যে সিলেক্ট কমিটী পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। যে আইনের ফলে সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে—এই সময়ে ও এই অবস্থায় তাহা বিচার্য্য নহে।

কৃষিজ আয়ের উপর কর স্থাপন যে বর্ত্তমান সময়ে একাধিক কারণে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। আবার শুনিতেছি, যে সকল চা-বাগানের মূলধন বিলাতী মুদ্রায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে সকলের আয় এই কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। ইহা কি সত্য? তবে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত ক্ষতির পরে—যখন এই কৃষিপ্রাণ প্রদেশে কৃষিজ আয় হইতেই পুনর্গঠন করিতে হইবে, তখন সে আয়ের উপর কর-স্থাপন সুবিবেচনার কায নহে, তাহাতে আবার এই কর-স্থাপনের ফলে যে যুদ্ধোদ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। লর্ড ওয়াভেল গত জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে কেন তৎকালীন জঙ্গীলাট সরকারের এইরূপ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং কেন সে প্রস্তাব তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভায় ত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সে বার ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয় নাই—এবার যে প্রদেশ সত্য সত্যই "তোপের মুখে" সেই প্রদেশে কৃষিজ আয়ের উপর কর স্থাপন শত্রুপক্ষের উপকারী হইতে পারে কি না, তাহাও কি সচিবসঙ্ঘ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই? তাঁহারা যদি সে বিষয় বিবেচনা না করেন, তবে যে বড়লাটের ও বাঙ্গালার গভর্ণরের তাহা বিবেচনা করিয়া এই আইন বন্ধ করা প্রয়োজন, তাহা বলা আমরা কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করি। অবিমৃশ্যকারিতার ফল যে ভয়াবহ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কায করিতে হইবে।

আমন ধান্য ক্রয়

বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে—যদি আবার দুর্ভিক্ষ ঘটে, সেই জন্য "সাবধানের বিনাশ নাই" বলিয়া—আমন ধান্য ক্রয় করা হইতেছে। এই ব্যাপারে যে কোটি কোটি টাকা "হাতফের" হইতেছে ও হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য—যে সকল জিলায় খাদ্য-শস্যের অভাব আছে, যে সকল জিলায় অধিক খাদ্য-শস্য আছে, সে সকল জিলা হইতে উহা আনিয়া অভাব দূর করা। এই ব্যবস্থায় প্রথম জিজ্ঞাস্য—কোথায় অভাব আর কোথায় প্রাচুর্য্য, তাহা কে স্থির করিল? এই প্রশ্নের উত্তর—সরকার। কিন্তু সরকার যদি ক্ষেত্র দেখিয়া ফশলের পরিমাণ স্থির করিতে পারেন, তবে আবার ভারত-সচিবকে কেন বলিতে হয়, এ দেশে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যারও নির্ভর-যোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না? যে মেজর-জেনারল উড কিছু দিন খাদ্য-বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বেতন লইয়াছেন, তিনি কলিকাতায় এক দিন বলিয়াছিলেন, এ দেশে ফশলের হিসাব বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ, চৌকীদার দেখিয়া আসিয়া যে "কয় আনা" ফশল হইবে বলে—ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাই নিজ বিবেচনা মত হিসাবভুক্ত করেন। সেরূপ হিসাব নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। সেই জন্য মনে হয়—সরকার যে হিসাবে নির্ভর করিয়া কোন্ জিলা প্রাচুর্য্যপূর্ণ আর কোন্ জিলা অভাবগ্রস্ত স্থির করিয়া ধান্য ও চাউল স্থানান্তরিত করিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহাই ত্রুটিপূর্ণ থাকিতে পারে।

তাহার পর কথা—সরকার যদি বৎসর বৎসর সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখেন, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহা না হইলে বর্ত্তমান বৎসরে সহসা এই ব্যবস্থায় লোকের মনে আবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট হইবে—তাহা কখনই সরকারের অভিপ্রেত নহে।

ক্রয় সম্বন্ধেও "ঢাক! ঢাক!" ভাব ত্যক্ত হইতেছে না। যখন বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব বলিয়াছেন, সরকার—বাজারে যাহাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—অল্প অল্প ধান্য ক্রয় করিতেছেন, তখন (১১ই জানুয়ারী তারিখে) মেজর-জেনারল ইুয়ার্ট বলিয়াছেন—

"গত ৭ সপ্তাহে সমর বিভাগ ১০ লক্ষ মণেরও অধিক খাদ্য-শস্য স্থানান্তরিত করিয়াছে; সে কাযে আমাদিগের যানসমূহ আড়াই লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে।"

১১ই জানুয়ারী পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ সপ্তাহ বলিলে ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগ বুঝায়। তিনি যে ১০ লক্ষাধিক মণ খাদ্য-শস্য স্থানান্তরিত করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কত আমন ধান্যের হিসাব আছে?

এই আমন ধান্য ক্রয়ের জন্যই "এজেন্ট" নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রধান-সচিবকে পুরোভাগে রাখিয়া বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব বলিয়াছেন—সাবধান, আমন ধান্য ক্রয়ের ব্যবস্থায় বাধা দিবার চেষ্টা সরকার সহ্য করিবেন না! অর্থাৎ সে কায করিলে ভারতরক্ষা নিয়মের প্রয়োগ করা হইবে।

কিন্তু তথাপি যেরূপ অনাচারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা প্রয়োজন মনে করিয়া কেহ কেহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কোন সদস্য যখন যশোহর জিলার কোন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করেন—বহু বস্তাবন্দী ধান রেল-ষ্টেশনে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া বিকৃত হইতেছে, তখন বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব এতই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে—অশিষ্ট উক্তি করিয়া স্বভাবের পরিচয় দিতেও দ্বিধানুভব করেন নাই।

তাহার পরে ব্যাপারটি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"সম্প্রতি আমি বরিশাল এক্সপ্রেসে ভ্রমণকালে দেখিতে পাই যে, সরকার-নিযুক্ত এজেন্টগণ মফস্বল হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া যথাস্থানে প্রেরণের জন্য বিভিন্ন রেল-ষ্টেশনে জমা করিয়াছেন। খুলনা লাইনের * * * ষ্টেশনে লক্ষ লক্ষ বস্তা ধান্য স্যাঁতসেতে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতেও রক্ষার জন্য কোন আবরণ নাই। ইন্দুরেরা মহানন্দে ভোজ-উৎসবে মাতিয়াছে। যে চাউলের অভাবে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়াছে এবং এখনও লক্ষ লক্ষ লোক যে জন্য বিপন্ন, সেই চাউলের এই অবস্থা সত্যই ক্লেশ-দায়ক।"

ব্যবস্থা পরিষদে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, (কেন্দ্রী সরকারের অধীন) রেল বিভাগ আবশ্যক মালগাড়ী দিতে না পারায় ঐ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং এখন সেই ধান্য বিক্রয়ের চেষ্টা করিলেও ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না।

যে দেশের লোক অনাহারে মরিতেছে, সে দেশে লোকের খাদ্য-দ্রব্য ব্যবস্থার অভাবে এই ভাবে নষ্ট করার এই কৈফিয়ৎই কি সন্তোষ-জনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? কবে—কোন্ ষ্টেশনে কয়খানি মালগাড়ী পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির না করিয়া এই ভাবে ধান্য আনিয়া নষ্ট করা কি অপরাধ নহে? আর এই ধান্য বিকৃত হইবার পরে, ইহার চাউলই ত লোককে দেওয়া হইবে? তাহাতে কেবল যে পুষ্টিকর কিছুই থাকিবে না, তাহা নহে; পরন্তু তাহা আহারে নানারূপ রোগের উৎপত্তি অনিবার্য্যই হইবে। তাহাও কি বিবেচনা করিয়া কায করা হয় নাই?

কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন কোন স্থানেও যে সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্যের ঐ অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহাও অপ্রকাশ নাই।

ইহার পরে কি বলা হইবে, লোকের আস্থা উৎপাদন জন্যই এ কায করা হইয়াছে ও হইতেছে? লোক বুঝিবে যখন এত চাউল নষ্ট করা যায়, তখন ভাণ্ডারে চাউলের অভাব কল্পনাও করা সঙ্গত নহে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বাঙ্গালা ও বৃহত্তর বাঙ্গালায় এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন এ বার দিল্লীতে হইবে। আগামী ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন এই একবিংশতিতম অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে। প্রধান কর্ম্ম-সচিব শ্রীযুত দেবেশ-চন্দ্র দাশ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বাঙ্গালীদিগকে অধিবেশনে যোগদানের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের মনীষিগণ মূল সভাপতি ও সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও প্রবাসী বাঙ্গালী বিভাগের শাখা সভাপতি হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।"

তিনি লিখিতেছেন:—

দিল্লীতে যদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কোন পরিচিত অধিবাসী থাকেন, তবে তাঁহার নাম ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণে তিনি ইচ্ছুক কি না, তাহা জানাইলে অভ্যর্থনা সমিতি (১নং ওল্ড মিল রোড, নিউ দিল্লী) বাধিত হইবেন। যাঁহারা কোন বন্ধু বা স্বজনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না, অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবস্থা করিবেন। স্থানাভাবহেতু ও বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ছুটী না থাকায় উভয়বিধ বন্দোবস্তের আয়োজন করা হইয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন—

"এই সম্মেলন বাঙ্গালীর সংহতি ও উন্নতি-কল্পে মহামিলনের ক্ষেত্র।" যদি কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অনিবার্য্য কারণে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে অধিবেশনে পাঠ জন্য প্রবন্ধ পাঠাইলে অভ্যর্থনা সমিতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন। "সম্মেলন যদি আকারে সঙ্কুচিত হয়, তথাপি তাহার সাহিত্য-গৌরব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা।"

আমরা আশা করি, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন প্রত্যেক বাঙ্গালীর সহযোগ ও সহায়তা লাভ করিবে। বর্ত্তমানে সংবাদপত্রের সাহিত্য যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন কি না, তাহা আমরা বিবেচ্য বলিয়া মনে করি।

কলিকাতায় "রেশানিং"

অবশেষে গত ১৭ই মাঘ কলিকাতায় সরকারের খাদ্য-দ্রব্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঈশপের উপকথার রাখাল বালক পুনঃ পুনঃ পালে বাঘ পড়া সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া চীৎকার করিত বলিয়া যেমন শেষে সত্য সত্যই বাঘ পড়িলে তাহার চীৎকারে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তেমনই বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে যে ভাবে কেবলই বলিয়া আসিয়াছিলেন—ঐরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আসন্ন, তাহাতে যখন কেন্দ্রী সরকারের আদেশে শেষে ১৭ই মাঘ সত্য সত্যই কলিকাতায় "রেশানিং" প্রবর্ত্তিত হইল, তখন যদি অনেক নাগরিক তাহা সত্য মনে করিয়া আপনাদিগের "রেশান কার্ড" রেজেষ্টারী না করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

এই কার্ড রেজেষ্টারী না হওয়ার জন্য সরকারের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাও অল্প দায়ী নহে। কারণ, দেখা গিয়াছে—সরকারী কর্ম্মচারীরা কতক কার্ড লিখেন নাই; কতক লোক কার্ড পায় নাই; কতক লোক কার্ড পাইলেও তাহা "রেজেষ্টারী" করিবার দোকান পায় নাই! অথচ খাদ্য বিভাগে যত চাকরীয়া জুটান হইয়াছে—সমর বিভাগ ব্যতীত আর কোন বিভাগে তত চাকরীয়া নাই।

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের জন্য খাদ্য-দ্রব্য বাঙ্গালার বাহির হইতে দিবার ভার কেন্দ্রী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং বলা যায়, এই অঞ্চলে "রেশানিং" ব্যাপারে বাঙ্গালার সচিবরা কেন্দ্রী সরকারের আজ্ঞাবহ হিসাবে কায করিতেছেন; কেন্দ্রী সরকারও প্রভুরূপে আজ্ঞা দিতে কার্পণ্য করেন নাই; তাঁহারা ভারত-শাসন আইনের ১২৬এ ধারা অনুসারে বাঙ্গালা সরকারকে "রেশানিং" প্রবর্ত্তনের তারিখ, বেসরকারী দোকান বর্জ্জনের বিরোধী নীতি প্রভৃতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ দানে বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পদত্যাগ করেন নাই। তবে তিনি সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন—তাঁহার পরিকল্পনা কেন্দ্রী সরকারের নির্দ্দেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার প্রধান-সচিব চাউল ভাল নহে বলায় বলিয়াছেন—বাহির হইতে উহা আসিতেছে বলিয়াই উহা ভাল নহে। এই সকল উক্তিতে বুঝা যায়, বাঙ্গালার সচিবরা আপনারা সুব্যবস্থা করিতে না পারিলেও কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিবের আশা ছিল, তিনি কলিকাতায় দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বেসরকারী দোকানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কেবল সরকারী দোকানেই খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি দোকানের জন্য ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন—লোক নিয়োগেও তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার ব্যবসার সাধারণ গতি রুদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায় কতকগুলি বেসরকারী দোকানে "ছাড়" দিতে হইয়াছে। তাহাতে সচিব-সমর্থক দলের দুই ধুরন্ধর কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-সচিবকে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক বলিয়া তাঁহার অপসারণ চাহিয়া বিবৃতি প্রচারও করেন :—

> "Once the joys sent a message
> Unto the eagle's nest;
> 'Now yield thee up thine eyrie
> Unto the carrion kite."

সে যাহাই হউক, আমরা জানি, কতকগুলি ঘর ভাড়া লওয়া হইলেও ব্যবহৃত হইল না। তাহাতে অর্থের অপব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে। যাহাদিগকে চাকরী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলেই বেতন পাইতেছে কি কতকগুলিকে বাহুল্য বোধে বিদায় করা হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সচিব এখন ঠেকিয়া বুঝিয়াছেন, যে সংখ্যক দোকানে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সরবরাহ অসম্ভব। তাই তিনি বেসরকারী দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধি না করিয়া বা বেসরকারী দোকানে দেড় হাজারের অধিক সংখ্যক কার্ড রেজেষ্টারী করিতেও না দিয়া সরকারী দোকানে যথেচ্ছ কার্ড রেজেষ্টারী করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে লোকের অসুবিধা অনিবার্য্য। আর ইহাতে কেন্দ্রী সরকারের নির্দ্দেশ ও অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার চেষ্টা আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

লোকের অসুবিধার কথা ব্যতীত এ সম্বন্ধে আরও কথা আছে। সচিব বলিয়াছিলেন—

(১) তিনি হিন্দুর দেবদেবীর নৈবেদ্য ও ভোগের জন্য চাউল বরাদ্দ করিবেন না।

(২) তিনি হিন্দু বিধবাদিগের জন্য আতপ চাউল দিবার ব্যবস্থা করিবেন না।

অথচ হিন্দুর দেবদেবীর নৈবেদ্য ও ভোগ হিন্দুর ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ত্তব্য এবং হিন্দু বিধবাদিগের আতপ ব্যতীত অন্য চাউলের অন্ন গ্রহণ আচার-বিরুদ্ধ।

কাজেই সচিবের এই কার্য্য হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত

আচারে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার ফল কিরূপ অপ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া—প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা যাঁহার দায়িত্ব সেই বাঙ্গালার গভর্ণরের অথবা বড়লাটের সচিবের এই ব্যবস্থা "কর্ম্মনাশা জলে" নিক্ষেপ করার প্রয়োজন অনেকে তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সচিবসঙ্ঘ এ বিষয়ে নতমস্তক হইয়াছেন।

খাদ্য-বিভাগে যে শত শত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া হইতেছে, তাহাও বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই। অন্যান্য দিকেও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার প্রয়োজন যে নাই, তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গালার কোন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা (আলোকিত করিয়া নহে) —যাহাকে 'ডার্কনেশ ভিসিবল' বলে—ভাষার ত্রুটিতে ও যুক্তির অসারতায় তাহাই করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারী লেখক বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—এই বার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী মুদী প্রস্তুত করা হইতেছে—সরকারের "কিয়া হাতকি তারিফ!" তিনি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অতিক্রম করিয়া কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে—যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা মানুষের খাদ্যোপযোগী কি না? আমরা কোন কোন নমুনা দেখিয়া বুঝিয়াছি, সব মাল মানুষের খাদ্যোপযোগী নহে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের ব্যবস্থায় যে পচা চাউল "কণ্ট্রোল" দোকানে দেওয়া হইয়াছিল, বাঙ্গালার নানা স্থানে—বিশেষ কলিকাতায় বেরিবেরির ব্যাপক আবির্ভাব কি তাহারই ফল বলা যায় না? উপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া যদি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রদান করা না হয়, তবে তাহাতে যে বহু লোকের প্রাণনাশ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হয়—সরকারী দোকানে ও বেসরকারী দোকানে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রদান করা হইতেছে কি না?

কেন্দ্রী সরকার কলিকাতা ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের জন্য যে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতেছেন, তাহা উপযুক্ত ভাবে রক্ষা না করায় বিকৃত হইতেছে কি না?

আমরা কেন্দ্রী সরকারকে অনুরোধ করি—তাঁহারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া, কলিকাতা ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বণ্টনের ভারও গ্রহণ করুন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ব্যয়সঙ্কোচও সম্ভব হইবে—ব্যবস্থার এবং অপ্রীতিকর ও নিন্দার্হ ত্রুটিরও প্রতীকার হইবে।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ

মেদিনীপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক ও "পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সমাচার"-সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি স্বর্গীয় প্রমথনাথ করণের সহযোগে 'বন্দে মাতরম্ ভিক্ষু সম্প্রদায়' গঠন করিয়া ঐ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। জমিদারের সন্তান মণীন্দ্রনাথ স্বদেশী কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমগ্র কাঁথি মহকুমার মধ্যে তাঁহাদের আন্দোলন সম্ভবতঃ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। মণীন্দ্র বাবু 'আরতি', 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ', 'স্মৃতির দান', 'পল্লী-কবি রসিকচন্দ্র' 'সাধক কবি পুরন্দর' প্রভৃতি বহু পুস্তক লিখিয়াছেন এবং 'নব্য ভারত' 'বিচিত্রা' 'প্রবাসী' 'নীহার' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার' সম্পাদনা এবং 'হিজলী সাহিত্য সমিতি' ও 'মীর্জাপুর সাহিত্য সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির নিদর্শন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্যও ছিলেন। বাঙ্গালার নিপীড়িত জাতিদিগকে লইয়া তিনি 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ' নামে এক জাতীয়তাবাদী প্রগতিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

পরলোকে মহেশ ভট্টাচার্য্য

২৭শে মাঘ বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাশীধামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হরসুন্দরী ধর্ম্মশালাতে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ১ শত বৎসরে বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সাহিত্যে নব জাগরণের সঙ্গে ব্যবসায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও যে জাগরণ হয়, তাহার প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে মহেশচন্দ্র অন্যতম ছিলেন। এ যুগের অন্যান্য বাণিজ্য-প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় তাঁহারও প্রাথমিক জীবন অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতা পণ্ডিত ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত ত্রিপুরা জিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ১২।১৩ বৎসর বয়সেই মহেশচন্দ্রকে অপরের গৃহে রান্না করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। দৈন্যের তাড়নায় তাঁহাকে ২১ বৎসর বয়সেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিতে হয়। কলিকাতায় ৭ বৎসর অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে ১২৯৬ সালে কলেজ ষ্ট্রীটে এক হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকান খোলেন। ক্রমে এই দোকান বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং মাত্র কলিকাতায় নহে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালার বাহিরে নানা স্থানে শাখা-ঔষধালয় স্থাপিত হয়।

বদান্যতার জন্য মহেশচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার স্থাপিত কুমিল্লার ঈশ্বর-পাঠশালা, কাশীধামে হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা, সর্ব্বোপরি তাঁহার ঔষধালয়গুলিই তাঁহার মহাপ্রাণতার পরিচয় নহে, তাঁহার অকুণ্ঠ নীরব দান দেশের সকল সাধু ও সৎ-প্রচেষ্টাকে সর্ব্বদাই সমৃদ্ধ করিয়াছে। মহেশচন্দ্র যে প্রকৃত দেশভক্ত আদর্শবাদী বাঙ্গালী হিন্দু ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই পরিস্ফুট ছিল। জাতির মেরুদণ্ডস্থানীয় এরূপ মহাজনের বিয়োগে আমরা প্রকৃতই শোকার্ত্ত হইয়াছি। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুত হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
[illegible] 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জন্ম—১৭ই মাঘ, ১৩২৬] রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [মৃত্যু—১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫০

"কূল ছেড়ে যে ফুলের মত ভাসে অকূলে
তারে আমার প্রাণের কানাই ভাষে গোকুলে।"

অশ্রু-অর্ঘ্য

"অন্য কোনও বিশেষ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রের ডাক পড়িল—ইহা মনে করিয়া তাহার আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করি।"

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমাদের পরম স্নেহ-ভাজন শ্রীমান্ রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগে আমি প্রাণে মর্ম্মান্তিক আঘাত অনুভব করিতেছি। এই সৌম্যদর্শন শিষ্টস্বভাব, উন্নতহৃদয়, অমায়িক প্রতিভাবান্ যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক উচ্চ আশা পোষণ করিতাম। বাল্যকাল হইতেই তাহাতে বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিয়া আনন্দ হইত। ভবিষ্যতে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির এক-জন আদর্শ কর্ম্মী হইবার যোগ্যতা তাহার ছিল।

শুনিয়াছি, রামচন্দ্রের জন্ম-সংবাদ পাইয়া কাশীতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ তিলভাণ্ডেশ্বরে নিজব্যয়ে সারারাত্রি ব্যাণ্ড বাজাই-য়াছিলেন। অন্নপ্রাশনের সময় পুরীধাম হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী "রামচন্দ্র" নাম নির্দ্দেশ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। উপনয়নের পর পূজনীয় শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের লীলা-সহচর সন্ন্যাসী ভক্তগণের এরূপ ভালবাসা ও সমাদর লাভ সৌভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবান্ তাহার পরলোকগত আত্মাকে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর গতির পথে লইয়া যান ইহাই প্রার্থনা করি।

স্বামী বিরজানন্দ

* * *

রাম আপনাদের ও আমাদের ছেড়ে কি করে চলে গেল বলুন ত? সে যে বাবু ও মা-মণিগত-প্রাণ ছিল। সে তার অন্তরের স্নেহ ও ভাল-বাসার কথা সব খুলে আমাকে বলত। আমি তার ভিতরের কথা জানি। তাই মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, অমন ছেলে কাহারও হয় না। কি স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেমে আবদ্ধ করেছিল!

স্বামী গম্ভীরানন্দ

রামুর সর্ব্ব বিষয়ের কৃতিত্বে আমরা বড়ই আশা করিয়াছিলাম, রামু সগৌরবে পিতা, পিতামহের নাম রক্ষা করিবে এবং দেশে গণ্য-মান্য-বরেণ্য হইবে। কিন্তু হায়! সে অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়া সকলকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইবে ইহা স্বপ্নাতীত!

স্বামী দিব্যানন্দ

* * *

শ্রীমান্ রামের মত কৃতী ও গুণবান্ পুত্রের শোক নিশ্চয় তোমাদের সকলকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। তিনিই তোমাদের দিয়াছিলেন, আবার তিনিই উহাকে লইলেন! সে ঈশ্বরের জিনিষ।

স্বামী মহিমানন্দ

* * *

রামচন্দ্র এক সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ছাত্র ছিল। আমি তার মেধা, প্রতিভা, ভদ্রতা, নম্রতায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাদের এই ছাত্র ভবিষ্যতে দেশকে উজ্জ্বল করবে তার কৃতিত্বের দ্বারা। এমন মানব-পুষ্পটি এমনি ভাবে অকালে বৃন্তচ্যুত হল, এতে তাকে যারা জানত, সকলেই দুঃখিত হবে। আমি তার শিক্ষক ছিলাম, সত্যি তার প্রয়াণ-সংবাদে অন্তরে দুঃখ ও ক্লেশ অনুভব করছি। এমন প্রতিভা, এমন মনস্বিতা, এমন সুন্দর, সহজ, এমন নমনীয় পুত্র হারিয়ে পিতার কি অবস্থা, তা ভাবতেও কষ্ট হয়। রামচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গে গতি হউক। যে জগজ্জ্যোতির উপাসনা সে করত, তাতেই সম্বদ্ধ হয়ে তার তৃপ্তি হউক।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার

* * *

আমার ছাত্র রামচন্দ্রের বিয়োগে চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারিতেছি না। রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে যদি আমার জীবনটা যেত!

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী দেবশর্ম্মা

* * *

আমাদের প্রিয়রত্ন সতীশ বাবুর প্রাণাধিক রামচন্দ্র না কি চলে গেছে! প্রাণ কেবল হায় হায় করে উঠছে! এর কি সান্ত্বনা আছে? যে দিক দিয়েই ভাবছি blind laneএ উপস্থিত করে দিচ্ছে। জীবনব্যাপী মর্ম্মদাহ, হৃৎপিণ্ড মন্থন! ভাষা আর কোন্ আশা দেবে?

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

স্তম্ভিত হয়েছি। ভগবান্ নিজের প্রিয় রত্নকে দান করেও আবার ফিরিয়ে নিলেন। আমিও ভুক্তভোগী। ঈশ্বর সহ্য করবার শক্তি দিন, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রামচন্দ্রকে অতি বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি। কত দিন তাহার জন্মোৎসবে আনন্দ করিয়াছি। আজ তাহার অকস্মাৎ তিরোধানে দিশাহারার ন্যায় বোধ করিতেছি। এমনটি কেন হইল, তাহা ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। এত আশা-ভরসা, সমস্ত ব্যর্থ করিয়া রামচন্দ্র চলিয়া গেলেন. এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। বাল্যকালে যে বিকাশোন্মুখ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, পরিপূর্ণ যৌবনে তাহার প্রদীপ্ত পরিণতি দেখিবার আনন্দ লাভ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিতে তাহাকে দেখিয়াছি, মাসিক-পত্রের সম্পাদকরূপে তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি, নূতন লেখকের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে তাহা জাগাইয়া তুলিবার অদম্য উৎসাহ তাহার মধ্যে দেখিয়াছি, পিতৃ-পিতামহ হইতে প্রাপ্ত সাহিত্য-সাধনায় নিরলস আগ্রহ দেখিয়াছি। এই সকল দেখিয়া যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করিতেছিলাম, তাহা এমন করিয়া ব্যর্থতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, ভাবি নাই। নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ, সরলতার মূর্ত্তি 'রাম বাবু'কে আজ ঝাপ্সা চোখে দিগ্‌দিগন্তের কুহেলিকাচ্ছন্ন সীমায় চিত্ত খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, রামচন্দ্র ইহজগতে নাই! আবার নূতন জীবনের অমৃত-ধারায় সিক্ত হইয়া আমাদের—আমাদের বন্ধু সতীশচন্দ্রের—স্নেহের দুলাল কবে আসিবেন, কে বলিবে?

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

* * *

রামচন্দ্রের শিক্ষা, সৌজন্য ও সুবিবেচনার প্রতি আমার প্রগাঢ় আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। কে জানিত, রামচন্দ্র এত অল্প আয়ু লইয়া বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় ক্ষণিকের নিমিত্ত আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া অতীন্দ্রিয় লোকে মহাপ্রয়াণ করিবে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

রামচন্দ্রের সহকর্ম্মী, সহপাঠী ও সুহৃদ্‌গণই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানিতেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন—

সুহৃদ্বর রামচন্দ্রের অকাল-প্রয়াণে আমরা যে আঘাত পেলাম তাহার প্রলেপ নাই। আমাদের মধ্য হ'তে যে এরূপ এক অলৌকিক প্রতিভার তিরোভাব ঘটিবে তা ক্ষণেকের জন্য কল্পনা করিতে পারি নাই। আমাদের এইটুকুই সান্ত্বনা যে, এই অল্প-পরিসর জীবনে তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা নাই এবং তা' কালে বহুর দৃষ্টান্ত-স্থল হবে। এরূপ এক প্রতিভা যদি আরও কিছু দিন থাকত তা হ'লে আমরা অনেক কিছুই পেতাম। 'কিশলয়'কে কেন্দ্র করে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল, আজ বার-বার তাঁর সেই মধুর সাহচর্য্যের দিন-গুলির কথা মনে পড়ছে।

স্নেহভাজন রামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে

নির্মেঘ নীলাম্বর হইতে অশনি-পতনের ন্যায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম-স্নেহভাজন রামচন্দ্রের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের নিদারুণ দুঃসংবাদ গত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ণে আসিয়া পৌছিল, তখন এ অতর্কিত আঘাতের তীব্রতা অন্তরকে প্রথমে ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তব্ধপ্রায় করিয়া দিয়াছিল। রামচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ যদিও কয়েক দিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, তথাপি রামচন্দ্র যে নাই—এ কথা বিশ্বাস করিতে মন বার-বার বিমুখ হইতেছিল। সেই প্রিয়দর্শন, উৎসাহ-চঞ্চল, সদা হাস্যোজ্জ্বল-বদন, বিনয়-মধুর-প্রকৃতি যুবক রামচন্দ্র আজ আর ইহলোকে নাই—আপাত-দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় বটে; কিন্তু হায়! রূঢ় সত্য কল্পনা হইতেও শতগুণে বিচিত্র! অতি বড় অসম্ভবকেও উহা সম্ভব করিয়া তুলে। যাহা কোন দিন দুঃস্বপ্নেও কল্পনার অযোগ্য ছিল, নিয়তির নির্ম্মম বিধানে আজ তাহা কঠোর বাস্তবতায় পরিণত!

চিরদিন যাহাকে 'শ্রীমান্' ভিন্ন অন্য নামে সম্বোধন করি নাই, এখন হইতে তাহার নাম শ্রী-বিহীন-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—এ ভাব প্রকাশ করিতেও লেখনী আজ মুহুর্মুহুঃ কম্পিত ও চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অন্তর শত বিদ্রোহ করিলেও অতীতকে আর ফিরাইতে পারিবে না—ইহাই বিধিলিপি!

আশৈশব রামচন্দ্রকে জানিবার সুযোগ ছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত আমার প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয় আজ হইতে নয় বৎসর পূর্ব্বে—তাহার কৈশোর ছাত্র-জীবনে। রামচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সদ্যঃ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। দুই-তিন দিন উক্ত শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে করিতে লক্ষ্য করিলাম যে ছেলেটি ঈষৎ চঞ্চল ও বিশেষ-রূপ অন্যমনস্ক। আরও দুই-তিন দিন পরে হঠাৎ এক দিন দেখি—রামচন্দ্র গভীর একাগ্রতার সহিত একখানি পুস্তক পাঠে নিরত। সদা চঞ্চল-প্রকৃতির ছাত্রকে সহসা পাঠে তন্ময় দেখিয়া মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল—খুব সম্ভবতঃ রামচন্দ্র পাঠ্যপুস্তকে নিবিষ্টচিত্ত নহে—উপন্যাস-জাতীয় কোন অপাঠ্য পুস্তক তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে! 'দেখি, কি বই' বলিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইতেই ঈষৎ লজ্জিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামচন্দ্র পুস্তক-খানি আমার হাতে দিল। দেখিলাম, গ্রন্থখানি মহাকবি শেক্স্‌পীয়রের একখানি অতি দুরূহ নাটক—'কিং লীয়ার'! আমি সংস্কৃত-কাব্য পড়াইতেছি, আর আমার অধ্যাপনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক জন ছাত্র প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই পড়িতেছে শেক্স্‌পীয়রের নাটক—এরূপ ব্যাপারে অধ্যাপকের ক্রোধোদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্রোধের পরিবর্ত্তে আমার মনে কৌতূহল জন্মিল অধিকতর। প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর এক জন ছাত্র—সদ্যঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—শেক্স্‌পীয়রের কিং লীয়ার পড়িতেছে! কেবল পড়িতেছে না, পড়িয়া নিশ্চয়ই রসগ্রহণ করিতেছে, নতুবা পাঠে অতদূর তন্ময় হইবে কেন! ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইল। একটু হাসিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—'এ বই পড়ে তুমি বেশ বুঝ্‌তে পারছ'? রামচন্দ্র এতক্ষণ অপরাধীর ন্যায় মাথা হেঁট করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। আমার প্রশ্নে মাথা না তুলিয়াই অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল—'সব না বুঝ্‌লেও মোটামুটি বুঝ্‌তে পারি'। তখন আমারও অন্তরে দুষ্ট-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—'আচ্ছা, কোথায় পড়ছিলে দেখি'? রামচন্দ্র স্থানটি দেখাইয়া দিল—রাজা লীয়ারের উন্মত্তাবস্থার একটি দৃশ্য। আমি তখন গম্ভীর ভাবে রামচন্দ্রকে বলিলাম—'ঐ স্থানের যে কোন একটি সম্পূর্ণ বাক্য তুমি বোর্ডে খড়ি দিয়া প্রথমে লেখ ও তার পর বাক্যটির সংস্কৃতে অনুবাদ করে লিখে দেখাও—তুমি কেমন বুঝেছ'। রামচন্দ্র ক্ষণিক ইতস্ততঃ করিল। তার পর আমার আদেশ নির্ভয়ে পালন করিল। সেদিন রামচন্দ্র যে প্রকার অনুবাদ করিয়াছিল—তাহা প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর ছাত্রমাত্রেরই পক্ষে অসাধ্য—যে-কোন বি-এ-অনার্স ছাত্রের পক্ষেও

উহা গৌরব-জনক। ঐ ঘটনায় রামচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম। আর ঐ দিন হইতেই রামচন্দ্রের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। উহার পর আর কোন দিন রামচন্দ্রকে আমার ক্লাসে আমি অমনোযোগী দেখি নাই।

ইহার পর আমি স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করি। এই সময় প্রায় তিন বৎসর কাল রামচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। পরে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে রামচন্দ্র আমারই বিশিষ্ট বিভাগে ('ডি' গ্রুপে—বেদান্ত-বিভাগে) ছাত্ররূপে প্রবেশ করে। ইহার মধ্যে রামচন্দ্র আই-এ পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছিল আর উক্ত পরীক্ষায় সংস্কৃতে ও গণিতে তাহারই সর্ব্বোত্তমত্ব ঘটে। বি-এ পড়িবার সময় রামচন্দ্র বহু দিন গণিতে অনার্স অধ্যয়নের পরে উহা ছাড়িয়া দিয়া নূতন করিয়া সংস্কৃতে অনার্স লয়। এ কারণে উহার ফল আশানুরূপ হইবে না বলিয়া অনেকের মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে রামচন্দ্র সকল বিষয়ের অনার্স ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা লাভ করিয়া 'ঈশান স্কলারশিপ' প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। এম-এ পরীক্ষার ঠিক পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের একটি সহোদরা টাইফয়েড-রোগে দেহত্যাগ করে। তাহার শোকে কাতর হইয়া রামচন্দ্র পরীক্ষা দিবে না—স্থির করিয়াছিল। পরিশেষে আমার ও অন্যান্য শিক্ষক-বর্গের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে সে পরীক্ষার্থ অগ্রসর হয়। কিন্তু এ পরীক্ষায় তাহাকে আরও নানা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ফলে ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তনে রাম-চন্দ্রকে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে হইয়াছিল। নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে রামচন্দ্র প্রথম হইতে না পারিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক-বৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের যথার্থ যোগ্যতা একমাত্র রামচন্দ্রেরই ছিল—তবে যে ছাত্রটি প্রথম হইয়াছিল সে কেবল কাক-তালীয়-ন্যায়ে।

পরীক্ষার সুফল মাত্র দেখিয়াই রামচন্দ্রের যোগ্যতা নিরূপণ করিতে যাইলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের মত প্রোজ্জ্বল-প্রতিভা, ধারণাবতী মেধা ও কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি আমি অতি অল্প ছাত্রেরই দেখিয়াছি। দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার কালে উত্তম-মধ্যম-অধম বহু শ্রেণীর বহু ছাত্রের নানারূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু রামচন্দ্রের মত কৃতী ক্ষুরধার-বুদ্ধিমান্ ছাত্র আর একটির অধিক দেখি নাই। যাহার সহিত রামচন্দ্রের তুলনা হইতে পারিত, সেই প্রীতিভাজন দেবীপ্রসাদ গুপ্তও আজ লোকান্তরে। দেবীপ্রসাদও বি-এ সংস্কৃত অনার্সে ঈশান স্কলারশিপ্ পাইয়াছিল। ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ-কালে সেও চলিয়া গিয়াছে! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! যে দুইটি তীক্ষ্ণধী প্রতিভাবান্ ছাত্রের অধ্যাপক-রূপে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিতাম, তাহারা উভয়েই আজ কালগ্রাসে! জানি না—ইহাদিগের ন্যায় নানা গুণবান্ ধীমান্ ছাত্র আবার কখনও পাইব কি না!

ছাত্র-দশা-সমাপ্তির পরেও রামচন্দ্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই—বরং যেন আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল—আজ তাহাই গভীরতর মনোব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। 'রবিবাসরীয় বসুমতী'র স্তম্ভে রামচন্দ্রেরই আগ্রহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। অবশ্য কাগজের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সে প্রয়াস বহু দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু সুযোগ ও অবসর পাইলেই 'বসুমতী'র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও উচ্চ-শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশের নানারূপ পরিকল্পনা লইয়া বহুদিন বহুক্ষণ ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত আলোচনা হইয়াছে। সে সকল আলোচনা আজ স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল—ইহাই নিয়তির নিষ্ঠুরতম পরিহাস!

অবশ্য রামচন্দ্র যাহাদিগের নিতান্ত আপনার—সেই রামচন্দ্রের বৃদ্ধা শোকাতুরা পিতামহী—রোগজীর্ণা সন্তান-হারা জননী—কর্ম্মক্লান্ত রোগ-শোক-কাতর প্রৌঢ় পিতা—পতি-বিয়োগ-বিধুরা একান্ত অসহায়া বালিকা পত্নী—বোধহীনা পিতৃহারা শিশুকন্যা—ইঁহাদিগের তুলনায় আমাদিগের শোক কতটুকু! ইঁহাদিগের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিপূরণ ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও সম্ভব নহে। ইঁহাদিগের শোকে সান্ত্বনা ও শান্তি দিবার শক্তি—এক সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যতীত আর কাহারও নাই! তথাপি আমরা যখন ভাবি—ইহার পর 'বসুমতী'র ভবিষ্যৎ কি হইবে—তখনই একটা গভীর শোকচ্ছায়ায় সমগ্র অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও জাতীয়-স্বার্থ-সংরক্ষণে বদ্ধ-পরিকর হইয়া 'বসুমতী' পত্রিকা এ যাবৎকাল অদম্য উৎসাহে বহু বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। মনে বড় আশা ছিল—রণ-শ্রান্ত বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সেনানীগণ যখন শান্তি-কামনায় অবসর গ্রহণ করিবেন, তখন নবোৎসাহে এ তরুণ সেনাপতি তাঁহাদিগের উর্দ্ধোত্তোলিত পতাকা বহন করিয়া তাঁহাদিগের ঐ প্রদর্শিত পথে জয়যাত্রার প্রারম্ভ করিবেন। কিন্তু হায়! নির্দ্দয় বিধাতা সে আশা অঙ্কুরেই সমূলে নির্ম্মূল করিলেন। এ হেতু মনে হয়—রামচন্দ্রের তিরোভাব কেবল ব্যক্তিগত দুঃখের কারণ নহে—ইহা জাতির দুরদৃষ্ট! তাই আজ বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—ধ্বংসই যদি তোমার অভি-প্রেত ছিল, তবে এ আশার নব-কিশলয় উদ্গত হইতে দিয়াছিলে কেন?—আর তোমার এ বালকোচিত ক্রীড়ার উদ্দেশ্যই বা কি, প্রভু, তাহা তুমি জান—

"অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা"॥

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পত্র

কুনুর,
৯ই মার্চ্চ, ১৯৪৪, বৃহস্পতিবার।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সংবাদপত্রে নিদারুণ খবর পেয়ে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলাম। শ্রীমান্ রামচন্দ্রের জীবন-দীপ এত শীগ্‌গির নির্ব্বাপিত হবে বা হতে পারে—এ রকম দুঃস্বপ্ন মনে কখনো স্থান পায়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, পিতা-মাতার কৃতী সন্তান যে পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে, পরন্তু তার বিস্তার সাধন করবে—এই আশা বরাবরই পোষণ করেছিলাম। কিন্তু ৺পরমপিতার নিদারুণ বিধি সে আশাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল! কিশলয় কৈশোরে শুকিয়ে গেল!

তিন বছর পূর্ব্বে আপনাদের সুখে সুখী হয়েছিলাম, আজ আপনাদের দুঃখে দুঃখী। সমবেদনা জানান বা সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই। ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান, তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কায়মনোবাক্যে ৺মা বিশ্বজননীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের শক্তি ও শান্তি দান করুন। ইতি আপনার শোকসন্তপ্ত বন্ধু
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

'সা তু-স্মৃতি'

সে আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা। আমার ছাত্র ৺রামচন্দ্র (আমার লেখনীমুখে শ্রীমান্ রামচন্দ্রই কেবল বাহির হ'তে চাচ্ছে ও বহু কষ্টে এই তার নূতন বিশেষণ লিখতে হ'ল) এই 'সা তু স্মৃতি'তে এক দিন প্রাতে আমাকে এক অনুযোগ জানাতে হাজির হয়েছে। সেবার সে I. A. পরীক্ষা দিয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জান' একটা শুভ সংবাদ (সে ঐ পরীক্ষায় সংস্কৃতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল) শ্রীযুত সতীশ বাবুকে পূর্ব্বদিন জানানো হয় তারই জের এই ঘটনা। তা'র পুরুষোচিত সরল ভাবে কৃতজ্ঞতা জানান'র পর সে আমাকে বললে—I am not going to take up Sanskrit for my B.A. even if what you say is true. আমি দুঃখিত হলুম, কিন্তু বিস্মিত হলুম না। আমাদের অনেক কৃতী ছাত্র আমাদের উপেক্ষিত বিষয়ের প্রতি শুধু কথায় নয়, কাজেও এই ভাব দেখিয়েছে, এখনও দেখাচ্ছে। সামান্য তর্কের ভণিতা ক'রে তাকে বিদায় দিলুম এই বলে, 'সে কথা পরে হবে।' এ ঘটনার সাত মাস পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে Professors' roomএর দরজায় আমাকে নমস্কার ক'রে ৺রামচন্দ্র তার সবল উচ্ছল কণ্ঠে জানায়, Sir, you have won! দেখবেন আপনি যেন শত্রুতা করবেন না। ৺রামচন্দ্র Mathematics Honours ছয় মাস যাবৎ প'ড়ছিল—সংস্কৃত pass subject হিসাবেও নেয়নি, কাশীধামে পিতার জীবন-সঙ্কট পীড়া দেখিয়া রামচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছাপূরণের জন্য বি-এতে সংস্কৃত অনার্স নিতে ইচ্ছুক হয়। প্রথমে আমি চমকে উঠলাম—তবে পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার সূত্র সঞ্চয় ক'রে আমার মনে হল এ একেবারে অসম্ভাব্য নয়। রাজসাহীতে আমাদের এক জন প্রিয় মুসলমান ছাত্র (সম্ভবতঃ এখন সে বাঙ্গালা সরকারের Executive Serviceএ নিযুক্ত) এইরূপ ক'রে সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়। আমি তাকেও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানালাম। যথাসময়ে সে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করল এবং সেই বছরের Eshan Scholar হ'ল। এখানে স্নেহের আতিশয্যে আমি অত্যুক্তি করছি না যদি আমি বলি আমার শিক্ষক-জীবনের শেষ ভাগের ছাত্রদের মধ্যে সে অনন্যসাধারণ আর আমার ছাত্রদের মধ্যে তা'র মত মেধাবী, লক্ষ্যনিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ছাত্র বিরল।
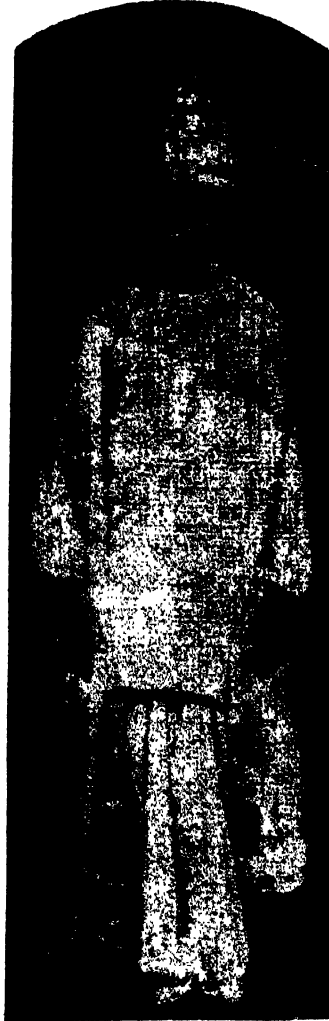
ইংরেজী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পূজার ছুটীতে আমি কাশীতে ছিলুম, শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও সে সময় সেখানে। এক দিন সন্ধ্যায় ৺রামচন্দ্র ও আমি নব প্রতিষ্ঠিত ভারত-মাতা মন্দির দে'খে দশাশ্বমেধের দিকে নানা প্রসঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছি। 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ' এই শ্রুতিবাক্যটি অভ্রান্ত সত্য, এই কথা নিয়ে আলোচনা চলছিল—সকলেই নিজের পরিমাণে কর্ত্তব্যের শেষ ক'রে শত বৎসর বেঁচে থাকে। গোধোলিয়া মোড়ের কাছে ডান দিকে আমার জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামের ও আমাদের বংশের শিষ্য জমিদার পঞ্চানন বাবুদের অধিকারের একখানি ভাড়াটিয়া

বাড়ী দেখাইয়া তার সহিত সংশ্লিষ্ট আমার জীবনের এক ভৃগুসংহিতাপ্রোক্ত স্বস্ত্যয়নের বিবরণ আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে আমি ৺রামচন্দ্রকে জানাই যে, অল্পজীবী হয়েও মানুষ দীর্ঘকাল স্মরণীয় হতে পারে। ৺রামচন্দ্র সহজ ভাবে আমাকে বললে, 'এই ত জগতের নিয়ম। দেখবেন আমিও অল্প দিনে···' কথাটা তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিই। আজ বিধাতার নিষ্ঠুর শাসনে সে-দিনের প্রতি-কথাটি আমার মনে জেগে উঠছে। সে 'শুধু মুখোজ্জ্বলকারী' ছাত্র হবে না, সে সাহিত্যিক হবে, সে artist হবে, businessএও সে অল্প সময়ে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করবে—'That is my mission' বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন এক হাসি হাসলো যা শুধু তাতেই শোভা পেত। এই precocity ও কর্ম্মতৎপরতা —যা সময়ে সময়ে চলচ্চিত্ততা ব'লে প্রতিভাত হ'ত— তার সহজাত ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-ধারার আমূল পরিবর্ত্তন, বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও ছাপাখানার সংস্কার-সাধন এমন কত বিষয় নিয়ে তাকে গভীর ভাবে কথা কইতে শুনেছি যাকে সাধা-রণ প্রাকৃত লোক অনধিকার-চর্চ্চা অথবা 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' ব'লে নিন্দা করে থাকে। অথচ এর প্রত্যেক বিষয়েই সে প্রায় up-to-date খবর রাখবার জন্য কাগজ-পত্র ঘেঁটে সংবাদ সংগ্রহ করত।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার কলিকাতার আশ্রয়-স্থানের মোড়ে মোটর-চাপা পড়িয়া দীর্ঘ দশ মাস হাসপাতালে ও নিজ বাড়ীতে শয্যাশায়ী ছিলাম। ৺রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখতে আসত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও তাঁহার কর্ম্মচারীর সহিত একাধিক বার দেখতে আসেন ও বলেন, ৺রামচন্দ্র আপনার কথা কেবলই বলে। সেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এই বিপদের শেষ দিকে আমি নিজে হতাশ, অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হ'য়ে থাক্‌তুম। এক দিন অনুযোগ বা মৃদু তিরস্কার ছলে সে আমাকে ব'লে উঠলো, 'Sir, আপনি জীবনে কত নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন বলে থাকেন—এ একটা শরীরের সাময়িক ব্যাধি, এতে চঞ্চল হন কেন? Will-force apply করুন, আপনি খাড়া হয়ে উঠবেন। ডাক্তারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও নিজ পরিজনের আশ্বাস উপদেশ আমার শরীরে-মনে ততটা বলসঞ্চার করেনি, যতটা তা'র অভয় আশ্বাস! এ-কদিন হাসপাতালে extension দিয়ে পা বাঁধা—নড়ন-চড়নের কোন উপায় নাই —Hardyর একখানা novel ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় ৺রামচন্দ্র আসিয়া হাজির। Sir আপনি ত সেরে-ই উঠেছেন, আর কি? সেদিন হেম বাবুকে (তাহার M. A. classএ সতীর্থ ও আমাদের বাড়ীর ছাত্র, পরে M. A. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে) বলছিলাম, আপনাকে একবার পড়াইতে দিলেই আপনি সেরে উঠ্‌বেন। কথাটি প্রাণে লাগিয়াছিল। চঞ্চল কর্ম্মরত উৎসাহ-সম্পন্ন যুবা তাহার পরিচয় ও প্রকৃতি-গত দৃষ্টির বলে কি আশ্বাস ও কর্ম্মপ্রবাহের আবহাওয়া সৃষ্টি করত! সেদিন তাহার বিবাহের আনন্দোৎসবে পঙ্গু অবস্থায় তাহার পূজনীয় শ্বশুর ও তাহার আত্মীয়দের নিকট (ইঁহারা আমার উত্তরপাড়া ও কলিকাতার বড় আত্মীয় ছাত্র) তাহার স্নেহোজ্জ্বল প্রকৃতি, উদ্বেল প্রতিভা-ধারা ও অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকারিতার কথা বল্‌তে বল্‌তে এত আত্মহারা হয়েছিলুম যে সেই আমাকে জানায়, 'Sir রাত্রি হয়েছে, আপনার সন্ধান করছে, দেখুন ত!'

আজ সে আমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে অমৃত-লোকে অনন্ত সত্যের সন্ধানে তার দীপ্ত ফুল্লপ্রকৃতি নিয়ে বিচরণ করছে। সে শুধু স্মৃতি—আর কিছু নয়! তার আত্মীয়-স্বজন—বিশেষতঃ বৃদ্ধা জরাজীর্ণা পিতামহী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শোকবিকল জনক-জননী, বালিকা পত্নী—ইঁহাদের কি বলে সান্ত্বনা দিব? কবির কথায় শুধু এই ভরসার দিকে তাকাইতে পারি যে, তাহার পরিচিত ও তাহার সহিত সম্পর্কিত অগণিত দেশবাসীর হৃদয় দিয়ে এ বেদনার ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছে, যদি তাহাতেও তাঁদের শোকের লাঘব হয়। দার্শনিকের দৃষ্টিতে 'কে কার, কার তুমি!'

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
ভবানন্তানি যাতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্॥

প্রায় বিশ বৎসর আগে শোকের তাড়নে এক দিন ৺কাশীধামে আমাদের বহুমানভাজন, এখন পরলোকগত, নবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কথা-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটার উল্লেখ করি। তাঁহার নয় বৎসর বয়স্ক' একমাত্র কন্যা (যে ঐ বয়সে তার পিতার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করে পরুষ পুরুষমূর্ত্তিতে দেখা দিতে বড়ই পছন্দ করত) ইহা অল্পক্ষণে শিখিয়া লয়। এই কন্যাটি (৺বাসন্তী) ৺কাশীধামের বিশিষ্ট মনীষিগণের নিকট (শ্রীযুক্ত মদন-মোহন মালব্য, পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি তাহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন) বড় আদরের ধন ছিল। ইহার মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই বালিকা স্নেহময় তদ্গত-প্রাণ পিতাকে ফাঁকি দিয়ে পরলোকে চলে যায়। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুকে এইরূপ নিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে—তিনি ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর—অধিক বলা ধৃষ্টতা হইতে পারে। করুণাময় তাঁহার অনন্ত করুণায় তাঁহাকে এ বিপৎ সহ্য করিবার শক্তি দিন।

শ্রীভগবচ্চরণে কাতর আর্ত্তি নিবেদন করিয়া বলি—

অশক্তে মোহসংসক্তে সোঽসৌ ন্যাসত্বয়াহিতঃ।
গৃহীতো ভগবন্! সোঽস্য সার্থকোঽস্তু বিধিস্তব॥

আর বহু হৃদয়ের স্নেহনিধান, এই কয়েক দিন পূর্ব্বেও আমাদের পরমবাধ্য ৺রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলিব—জানি না, কর্ম্মের বন্ধনে তোমাকে মরলোকে আসিতে হইবে কি না। যদি আসিতে হয়, 'অজস্রমন্থু ধীমংশ্চ মৈবং কুরু পিতৄন্ প্রতি।'

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (এম, এ)

রামচন্দ্র

ছাপার অক্ষরে লেখা দেখে আসছি চিরকাল—"দীপ-নির্ব্বাণ"…"ইন্দ্রপাত"! এ দুটি কথা কতখানি মর্ম্মান্তিক, পুত্রপ্রতিম রামচন্দ্রের অকাল-বিদায়ে 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে'র পানে চেয়ে আজ তা উপলব্ধি করছি! বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের চূড়া আজ ভেঙ্গে গেছে!

সদা-হাসিভরা-মুখ সৌম্য প্রিয়দর্শন কিশোর রামচন্দ্র—কৃতী পিতার আশা-ভরসা—এই অল্প বয়সে তাঁর যে অসাধারণ ধী আর কর্ম্মশক্তি প্রত্যক্ষ করেছি, যে নিরহঙ্কার অমায়িক প্রকৃতি—তাঁর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনার আভাস উপলব্ধি করে বিমুগ্ধ হয়েছি—এখন শুধু বসে বসে ভাবছি, সব মিথ্যা হয়ে গেল!

ক'বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। কলেজে তখনো রামচন্দ্রের পড়াশুনা চলেছে—যেমন-তেমন করে পাঠ্যগ্রন্থ মুখস্থ করে কোনো মতে এগজামিন পাশ করা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে রামচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও কৃতী বলে খ্যাতি অর্জ্জন করে-ছিলেন—কলেজে পড়তে পড়তে তিনি বার করলেন 'কিশলয়' মাসিক পত্র। তাঁর পড়াশুনা ছিল খুব ব্যাপক-রকমের; সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন—সব বিষয়ে ছিল সমান অনুরাগ! মনের মতো লেখা মিলতো না,—রামচন্দ্র স্ব-নামে এবং নানা ছদ্ম নামে কিশলয়ের জন্য গল্প প্রবন্ধ কবিতা সমালোচনা—সব-কিছু লিখতেন। সে সব লেখায় রস ছিল,—সে সব লেখা পাণ্ডিত্যের কাঁটায়-খোঁচায় জর্জ্জরিত হতো না। লেখাগুলি ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এবং লেখার ষ্টাইল ছিল সহজ এবং সুবোধ্য!

এম-এ পাশ করে তিনি নামলেন 'বসুমতীর' সেবার কাজে। ধনাঢ্য কৃতী পিতার তৈরী মণি-মুক্তার পালঙ্কে শুয়ে রামচন্দ্র যদি 'লোটাস-ইটার' সেজে কল্পনা-বিলাসে মত্ত থাকতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অনুযোগ তোলার কারণ ঘটতো না। কিন্তু সে আলস্য-বিলাস-মোহের বিন্দুবাষ্প তাঁর মনের কোণে স্থান পেতো না! বিলাসিতা-বাবুয়ানা তাঁর কখনো দেখিনি। লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের একমাত্র-পুত্র—বংশ-তিলক—এ-যুগের কিশোর রামচন্দ্র—তাঁর বেশ-ভুষা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। গায়ে হাতকাটা টুইল সার্ট, পায়ে চটি জুতো—এই সহজ বেশেই তাঁকে দেখেছি চিরদিন! বিনয়, কাজে তন্ময়তা এবং এ্যারিষ্টোক্রাট্ মন—ছিল রামচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য!

এম-এ পাশ করে তিনি 'দৈনিক বসুমতীর' সেবার খানিকটা ভার নিলেন। দৈনিকের প্রসার বাড়িয়ে তিনি তাতে সাহিত্য-রসের সমাবেশ করলেন; ছোটদের আসর খুলে নূতন প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কত বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। বিরুদ্ধ মতবাদে দেখেছি মুখে সহজ নম্র হাসি এবং মিষ্ট ভাষা নিয়ে যুক্তি অবতারণা করেছেন কি সহিষ্ণু ভাবে—শান্ত বিনীত ভঙ্গীতে! আর দেখেছি অফিসে তাঁর আশ্চর্য্য পাংচুয়ালিটি,—প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে অসাধারণ অভিনিবেশ এবং মনো-যোগিতা!

দৈনিকের শ্রীসৌষ্ঠব-সমৃদ্ধি কতখানি তিনি বাড়িয়ে তুলেছিলেন—কাগজ-রেশনিংয়ের নব ব্যবস্থার ঠিক আগে ক'মাসের 'দৈনিক বসুমতীর' পাতা খুললে সে পরিচয় পাওয়া যাবে।

তার পর কাগজের রেশনিংয়ের ফলে দৈনিকের কলেবর সঙ্কুচিত করতে হলো—রামচন্দ্র অধীর অস্থির মনে নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সন্ধান করতে লাগলেন! "নতুন কিছু গড়ে তুলবো নিজের হাতে"—এই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য!

'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'। রামচন্দ্র পেলেন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র। নিজের চেষ্টায় অসাধারণ পরিশ্রম করে তিনি খুললেন নূতন ছাপাখানা—উৎপলা প্রেস। সে-প্রেসের মারফৎ কত নব-নব পরিকল্পনাকে রূপে-রসে জাগিয়ে তুলবেন, তারি সাধনায় রামচন্দ্র তন্ময় ছিলেন। বার-বার আব্দার করে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন,—"আমার নতুন ছাপাখানা দেখতে চলুন দাদা, এক দিন। কি সব করছি আমি!"—তাঁর সাদর আগ্রহ আমন্ত্রণে উৎপলা প্রেস দেখতে গিয়েছিলুম। নিজে সব

যন্ত্রপাতি দেখাতে লাগলেন—মনের কত কল্পনাকে ব্যঞ্জিত করে তুলবেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাকে বলতে লাগলেন। টানা-টানা দুটি চোখে উৎসাহের কি দীপ্তি দেখেছিলুম! বললেন—এই সামনের বোশেখ মাস থেকে 'কিশলয়' কাগজখানিকে নতুন রূপে নতুন ছন্দে আবার বার করবো। খাটিয়ে অনেক লেখা আদায় করবো।

কে জানতো, বালকের এ সাধ, এ কল্পনা—নিষ্ঠুর মৃত্যু এমন করে ছিঁড়ে চুরমার করে দেবে! সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরো আশা-ভরসা বিলীন হয়ে যাবে!

দার্শনিকরা বড় বড় কথা বলে গেছেন Thy will be done—কিম্বা whom the Gods love die young—এ-সব কথায় মন প্রবোধ মানে না! মন বলে, হোন্ তাঁরা দেবতা—আমরা তুচ্ছ মানুষ—আমরা আমাদের প্রিয়-জনকে যতখানি ভালোবাসি, তেমন ভালোবাসতে পারেন না দেবতারা!

কিন্তু এ অনুযোগ কার কাছে?···

বন্ধু সতীশ বাবু—সতীশ বাবুর বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী—রামচন্দ্রের জননী—বালিকা-বধূ ঝর্ণা—আর কচি কিশলয়ের মতো ছোট্ট মেয়েটি—মনে হচ্ছে, এঁরা যেন শ্মশানে বসে আছেন! মৌন নিশ্চেতন পাথর হয়ে গেছেন! এঁদের বলবার মতো কথা শাস্ত্রে নেই, পুরাণে নেই, কোথাও নেই! কি করে কি নিয়ে এঁরা থাকবেন?

তবু মানুষ আমরা—মরণের আগুন বুকে নিয়েও আর পাঁচ জনের জন্য আমাদের থাকতে হয়! তাই এঁদের বলি কবির কথায়—

* * * He is not dead, he doth n t sleep!
He hath awakened frcm the dream of life.
'Tis we, who, lost in stormy visions, keep
With phantoms an unprofitable strife.

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

———

সে ছিল ভাবী কালের উত্তরসাধক

রামচন্দ্র মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসতেন। স্নেহাস্পদ বন্ধু-পুত্র হিসাবেই শুধু নয়, তাঁর সুগভীর সাহিত্য-প্রীতিই তাঁকে আমাদের প্রতি যেন একটু বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সুস্থ সবল দীর্ঘাবয়ব প্রিয়দর্শন এই ছেলেটির সহজ সুকুমার প্রকৃতি, নম্র শিষ্ট ব্যবহার, সুষ্ঠু সুভদ্র আচরণ এবং সহাস্য প্রফুল্ল আলাপনে আমরা একান্ত প্রীত হতেম। 'কিশলয়' পত্রিকার কিশোর সম্পাদকরূপে সে নিজের কাগজের জন্য কখনো কখনো আমাদের রচনা আদায় করে নিয়ে যেত। তাকে কোনও অজুহাত দেখিয়ে 'না' বলা চলত না। সে আপনার মধুর অমায়িকতার গুণে মানুষকে এমনই আপনার করে নিতে পারতো যে তাকে ভালো না বেসে কারুর উপায় ছিল না। 'কিশলয়' পত্রিকার পরিচালনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের সঙ্গে একাধিক বার আলোচনা করে দেখেছি, সেই তরুণ সম্পাদকের অন্তর্নিহিত ধ্যান ও কল্পনা ছিল অগ্রবর্তী কালের অনুগামী, কিন্তু সে মনে করত তার পত্রিকাখানি ছিল তার আদর্শের দিক থেকে অনেকটা পশ্চাৎপদ, এ জন্য তার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সম্ভবতঃ সেই জন্যই যৌবনের পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার 'কিশলয়' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই অল্প বয়সেই বুদ্ধিমান্ যুবক বুঝতে পেরেছিল যে এ ধরণের একখানি কাগজ নিয়ে দেশের অল্পশিক্ষিত ও অনুন্নত পাঠক সম্প্রদায়ের হয়ত মনোরঞ্জন করা চলে, কিন্তু প্রগতিশীল সমাজের উৎকর্ষ রুচি ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া-মণ্ডিত দরবারে সম্মানের আসন পাওয়া অসম্ভব।

রামচন্দ্রের মধ্যে ছিল বিংশ শতাব্দীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালোপযোগী সম্প্রসারিত মন, যা সনাতন ঐতিহ্যের বাধাকে অস্বীকার করে সমসাময়িকতার পুরোভাগে নিজেকে স্থাপন করে অগ্রগামী ভাবী কালের দিকে বলিষ্ঠ চরণক্ষেপে এগিয়ে চলতে চায়। এই আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা-বশে জীবনের যাত্রাপথে সে কঠিন সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হ'তেও দ্বিধা বোধ করেনি। বাংলা দেশের 'প্রিণ্টিং ও পাবলিশিং' ব্যবসায়কে সে বহু দিনের আচরিত জীর্ণ সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে মুক্ত করে প্রসর উদার এক নবোদ্ভাবিত পথে পরিচালিত করবার সুদৃঢ় সংকল্প করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য এই লক্ষ্মীমন্ত যুবা যখন তার মনের সেই উচ্চ সংকল্পকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য সবিশেষ আয়োজনে ব্যস্ত, ঠিক সেই অমূল্য মুহূর্তে মহাকালের অকরুণ আহ্বানে সে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে চলে গেল।

রামচন্দ্রের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ হারালো তার এমন এক জন ভাবী কালেয় উৎসাহী তরুণ কর্মীকে যার বৈজ্ঞানিক রুচি ও পুরোবর্তী মানসিক গতি দেশের গতানুগতিক সাহিত্য-প্রকাশের ধারাকে এক প্রাণবন্ত নবীন পথে প্রবর্তিত করতে চেয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সের একটি তরুণের মনের যে অসামান্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয় আমরা পেয়েছিলেম তাকে অসাধারণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। বন্ধুপুত্র রামচন্দ্র আপনার স্নিগ্ধ অনুরক্তির গুণে অনায়াসেই আমাদের অপত্যস্নেহ অধিকার করে নিয়েছিল, সে হয়ে উঠেছিল আমাদের সন্তানস্থানীয়। তার এই স্বল্প জীবনের সকল উৎসবে টেনে নিয়ে গেছে সে আমাদের বার-বার। গিয়েছি তার জন্মদিনের আসরে, গিয়েছি তার শুভ উপনয়ন-পর্ব্বে, গিয়েছি তার বিবাহ-বাসরে, গিয়েছি তাদের শারদীয়

পূজামণ্ডপে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের একটা সহজ আত্মীয়তার সুন্দর বন্ধন। বহুগুণালঙ্কৃত এই সন্তান শুধু যে তার পিতামাতার, তার বংশের, তার আত্মীয়-স্বজনের গৌরব ছিল তা নয়। দীর্ঘজীবী হলে সে যে একদা তার জন্মভূমির গৌরব বাড়াতে পারতো, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। তাই রামচন্দ্রের এই অকাল-বিয়োগ শুধু যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সর্ব্বনাশ বলেই মনে হচ্ছে তা নয়, তার এই অসময়ে চলে যাওয়া যে দেশেরও এক অপূরণীয় ক্ষতি, এই কথাটাই আজ বেশী করে আমাদের মনকে বেদনাতুর করে তুলছে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব ; শ্রীরাধারাণী দেবী

শ্রীরামচন্দ্র

তিনি আসিয়াছিলেন—ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দরবারের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহাকে "কাযে পাঠাতে চান না—কাছে রাখতেই চান"। শ্রীরামচন্দ্র বলিতেন—"আমার প্রাণ চায় একটু বিকাশ, একটু সাড়া। আবির্ভাব—এর সার্থকতা সিদ্ধি নয়। কবিগুরুর সাধনার মত বিফল বাসনাই এর চরম সার্থকতা!"

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার কোন্ সহচর তাঁহার অজ্ঞাতে অসমাপ্ত সাধনা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন—ফিরিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সহচরগণ তাঁহার আবির্ভাবে কি আভাস পাইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন, কেন তাঁহারা "রামচন্দ্র" নামকরণ করিয়া কেনই বা তাঁহাকে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কেনই বা তাঁহার প্রতি জন্মতিথি-দিবসে সন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত এবং বাঙ্গালার বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ সৎগ্রন্থরাজি উপহার দিতেন (এই সকল গ্রন্থ এবং বিশ্বের নানা ভাষার অমূল্য গ্রন্থাবলীতে শ্রীরামচন্দ্রের বিরাট গ্রন্থাগার সুসজ্জিত) তাহা না জানিলেও শ্রীরামচন্দ্রের আকস্মিক দীপ্তি-বিকাশে এবং আকস্মিক তিরোভাবে তাঁহার 'মিশনে'র পরিচয় যে না পাওয়া যায়, এমন নয়। রামচন্দ্র বলিতেন,—"রামকেষ্ট যুগের ত্যাগের অংশ শেষ হয়েছে—এবার ত্যাগীর ভোগের অংশ।" আসিয়াছিলেন ভোগ করিতে—আসিয়াছিলেন দেখিতে, শক্তিতে সম্পন্ন হইলে তবেই ভোগের অধিকার জন্মায়। তাঁর ফিলজফি—"জোর করেই বলছি, পৃথিবীতে মানুষের সেরা সম্পদ হচ্ছে রূপ। চান্ এই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময়ী বিপুল ধরণী ভোগ করতে?—না, জগৎ মায়া অনিত্য বলে বনে গিয়ে চোখ বুজে বসে থাকতে?"

এই যৌবনাদর্শ প্রতিপন্ন করিতে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়াছিলেন। অতীতকে তিনি ঘৃণা করিতেন না মোটেই—শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাচীন ও চিরাচরিত রীতিতে মানুষ হইলেও তাঁহার প্রতিভা পুরাতন আধার উপচাইয়া পড়িত। বাল্যে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী প্রসন্নকুমার সরকারের কাছে শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দু স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে তিনি প্রবিষ্ট হন। হিন্দু স্কুলের রক্ষণশীল আভিজাত্যের পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াই প্রতি ক্লাশে প্রতি বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৯ম স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা দিয়া গণিত, সংস্কৃত এবং ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম হইয়া মূল পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। বি-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান স্কলারশিপ ও সুবর্ণ পদক লাভ করেন।

এম-এ পরীক্ষায় বেদান্তে প্রথম হইয়া কোন অধ্যাপকের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এতগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক শ্রীরামচন্দ্র অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে সেই সব মেডেলে বড় মালা গাঁথিয়া সেই মালা দিয়া তাঁহার বিবাহে (ফাল্গুন, ১৩৪৭) নববধূকে আশীর্ব্বাদ করা হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও শ্রীরামচন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় অবসর-কালে সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও যন্ত্রালাপ সাধনা করেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে যে "শ্রদ্ধাঞ্জলি" নিবেদন করেন (মাসিক বসুমতী, ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা) তাহাতে রামচন্দ্রের সাহিত্য-রস-বোধের ও গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় মিলিবে।

রামচন্দ্র বলিতেন, নূতন প্রাণকে পুরাতন প্রাচীর রুদ্ধ রাখিতে পারে না। শিশুকাল হইতেই তিনি ছিলেন নূতনের সন্ধানী—তাঁহার ভাষায় "Seeker of ever new truth." বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানের পিপাসা! সত্যানুসন্ধান করিতে কত যন্ত্র ও ঘড়ি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়াছেন! বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাড়ীর গণ্ডী অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে ছিল জলন্ত আবেগ। শৈশবে তাঁহার এই চঞ্চল প্রাণশক্তি "দস্যিপনায়" ও দুষ্টামীতে এক দিকে যেমন লক্ষ্মণ ও ফেলুর মাকে ব্যতিব্যস্ত করিত, তেমনি পুরুষোচিত নানা ক্রীড়ায় এ প্রাণশক্তি প্রকাশ পাইত। অচল বিগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকিতে চান্ নাই—কোনো দিন নয়। বলিতেন, "গতি নেই যার, প্রাণ নেই তার।" বাল্যে যেমন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যৌবনে তেমনি নিজে মোটর চালনা করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ

স্থানসমূহ দেখিয়া আসেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "বাঁচবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার প্রেরণায় খোকন-মণিও বিদ্রোহ করে। এর ফলে যুদ্ধ চলে। শেষে এই 'মানার মার' খেয়ে খেয়ে টগবগে টাটু খোকা বেতো ঘোড়ার মত ঝিমিয়ে পড়ে, কিছুতেই কেমন আর তার গা থাকে না। বাপ-মা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবেন, যাক, দস্যিটা এবারে ঠাণ্ডা হয়েছে। দস্যি ওদিকে কোণ-ঠাসা হয়ে নতুন যুদ্ধের জন্য শক্তি সংগ্রহ করে—মতলব খোঁজে।"

সব-কিছু জানিতে আগ্রহ ছিল অসীম। অতি অল্প বয়সেই দেশের অবস্থা বুঝিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক দিকে যেমন শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি নূতন অবস্থা-সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানকে নিজ-উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করিতে গৃহে বিরাট ল্যাবরেটরি ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও গ্রন্থাদি আনাইয়া সর্ব্বদা অনুশীলন-রত থাকিতেন। অতি আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ধনসাম্য-বাদের প্রসারকেই জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রসাধনের জন্য নানা শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের কল্পনায় রামচন্দ্র বিভোর থাকিতেন।

মুদ্রণ-শিল্পকে আধুনিক করিয়া তুলিতে,—রোটারী, মনো-টাইপ, লাইনো টাইপ যন্ত্রাদিকে বঙ্গ ভাষার প্রকৃষ্ট বাহন করা যায় কি করিয়া, অপরের সাহায্য না লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সম্বন্ধে নব নব ব্যবস্থা করেন। সে-সাধনার কাহিনী বাঙ্গালার মুদ্রণ তথা সংবাদ-বিজ্ঞান-শিল্পে চিরস্মরণীয় থাকিবে। Dry flong তৈয়ারী, তাস তৈয়ারী, কুটীর-শিল্প-রীতিতে কাগজ তৈয়ারী, Lead alloys প্রস্তুত সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থাই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাহার উপর সিনেমার ফিল্ম, রঙিন ফটো, voice recording সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা-অনুশীলনের সীমা ছিল না।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের মত বিরাট মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার পাইয়া তিনি অতি অল্প সময়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালার ব্যবসায়ী-মহলে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র-মহল তাঁহার পরিচালনা-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালার সাময়িক পত্রগুলির চিত্র-বিচিত্র মুদ্রণ, মৌলক ও সম্পাদকীয় features-এর সৌষ্ঠব কত সুন্দর হইতে পারে, ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত 'কিশলয়' পত্রিকায় চার বৎসরের চেষ্টায় তাহা দেখাইয়াছেন। মুদ্রণ-শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্য রামচন্দ্র সম্প্রতি যে ভাবে 'উৎপলা প্রেস' স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময় ও গৌরবের বিষয়।

দৈনিক বসুমতী, সাপ্তাহিক বসুমতী এবং মাসিক বসুমতীর পরিচালনায় শ্রীরামচন্দ্র অনুভব করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ সাংবাদিকদেরও প্রতিনিধি নন,—যাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সাময়িক পত্র—সেই জনসাধারণ তথা পাঠকদেরও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নন। তিনি বলিতেন, "আমাদের পরিচালক সম্পাদকরা রাজনীতিক নেতার মতই ডিকটেটর!"

তাই বাংলার সাংবাদিকতায় তিনি নূতন অবস্থা-সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন এবং "কিশলয়" পত্রিকাকে "বাংলা পত্রিকার Laboratory" করিয়া experiment-এর পর experiment করেন। সুলেখক হইলেও নাম-জাহিরের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি বলিতেন, "নাম-করা লেখকদের ছাই-পাঁশ লেখা নিয়ে এখনকার মাসিক পত্রগুলির মধ্যে ছেঁড়াছেঁড়ির বিরাম নেই। পত্রিকার ভীড়ে সাহিত্যিকরা চাপা পড়ে যান।" তাই তিনি সর্ব্বদা reader-interest সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবার মূলমন্ত্র ছিল আনন্দ-বিতরণ। তিনি বলিতেন, "আনন্দ যেখানে অবারিত, জীবন সেখানে পরিপূর্ণ। * * * হাল্কা সাহিত্য, যা পড়ে একটু খুশী হওয়া যায়, পরলোকের চিন্তা না ভেবেও বেঁচে থাকা যায়, সে ধরণের সাহিত্য বাংলা পত্রিকায় বিরল হয়ে পড়েছে। সবাই চিরন্তন সাহিত্য রচনা করতে চান! বাঁধিয়ে রেখে পেপার-ওয়েট, জামার ইস্ত্রী, নাতির হাতেখড়ির দপ্তর—তস্য পুত্রের দুধ-গরমের উপকরণ—সবই একত্রে সারলে চলবে কেন? পড়ে একটু খুশী হয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিন—আমরা ধন্য হবো।" শ্রীরামচন্দ্র এ জন্য যে তরুণ সাহিত্যিক দল গড়ে তুলছিলেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ তাঁরা সমাপ্ত করবেন কি না, কে জানে!

আনন্দ দিতে গিয়ে যেখানে অসুন্দরের সেবা, সেখানে ছিল রামচন্দ্রের দারুণ বিরাগ। তাঁহার লেখা চিত্রাভিনয়ের সমালোচনা বাঙ্গালায় সত্যই অনন্য-সাধারণ ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র এ যুগের আদর্শ যুবক ছিলেন। তাঁহার নিয়মিত গুপ্ত দানে মাত্র সহকর্ম্মী ও বন্ধুরা নন, বহু অপরিচিত অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন হইয়াছে। অমন স্বচ্ছ, সরল, সবল ও উদার মনের তরুণ সত্যই বিরল। স্নেহময় পিতার তিনি ছিলেন সর্ব্বস্ব—রাম-গত-প্রাণা মা-মণির ছিলেন দুলাল। তাঁহার যত বিক্রম, দাপট, জ্ঞান-বুদ্ধির যত ঐশ্বর্য্য মা-মণির কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। ভগিনীদের তিনি ছিলেন আনন্দ-সঙ্গী। আর অঞ্জলি দেবীকে তিনি

পাইয়াছিলেন যোগ্য কর্ম্মসঙ্গিনী। সর্ব্বদাই বলিতেন,—মায়ের আসন মাথায়—স্ত্রীর আসন বুকে—আর বোনরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই অভিন্ন! ডলি আর রুবি বলিতে পাগল হইতেন! ক' বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয়া ভগিনী কুমারী প্রীতি (বেথুন কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন) যে দারুণ টাইফয়েড রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন, এবার সেই কাল-ব্যাধিই শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-পুষ্পটিকে দলিত দগ্ধ করিয়া দিল! ভগিনীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শুনিতেছি, একটি টাইফয়েড হাসপাতাল স্থাপনের আয়োজন হইতেছে।

রামচন্দ্রের জীবন-পুষ্পটির পাপড়িতে-পাপড়িতে দেশের কত আশা কত কথা, কত কল্পনাই ছিল,—সে-সব ঝরিয়া গেল!

সত্যই ঝরিয়া গিয়াছে—এতখানি প্রাণ-শক্তি? এমন বিকচোম্মুখী প্রতিভা?

মন বলে, না! কবিগুরু বলিয়া গিয়াছেন,—এ জগতে কিছুই মরে না!—কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই!

সত্যই চিন্ময় প্রাণের মৃত্যু নাই! আমাদের প্রাণে, আমাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র চিরদিন জীবিত থাকিবেন! তাঁহার প্রাণশক্তি, তাঁহার কর্ম্মোদ্দীপনা দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে প্রাণ-দীপ্ত রাখিবে—জীবন্ত রাখিবে! এবং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদের শ্রীরামচন্দ্র নব নব জীবনে নব নব জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার কল্পিত ব্রত সাধন করিবেন—এই বাঙ্গালা দেশে—যেখানে নিজের কল্পনাকে তিনি রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন "নবো নবো ভবসি জায়মানো"—এ বিশ্বাস আমাদের আছে! এবং এই বিশ্বাসেই আমাদের পরম সান্ত্বনা।

শ্রীতারানাথ রায়, এম-এ

রাম-প্রয়াণে তর্পণাঞ্জলি

১

গুণবানথ কান্ত-চেষ্টিতো
বিবশঃ কালবশাদ্ দিবং গতঃ।
বিহিতং ননু বৈশসং পরং
বিধিনা হন্ত কৃতান্তমূর্ত্তিনা॥

২

প্রিয়বস্তু মৃতস্য তর্পণং
তদিদং চেতসি সাধু চিন্তয়ন্।
সুরবাচমভীষ্টরূপিকাং
কৃতচেতা ভুবি দাতুমাদরাৎ॥

৩

স্বঃস্থঃ প্রযাতু সততং স ভবান্ প্রহর্ষং
স্বস্থা ভবন্তু চ জনা ইহ বান্ধবাস্তাঃ।
পুণ্যাং যশশ্চরতু লোকে জনপ্রগীত-

৪

বিধের্বিধানে বিধিরপ্যনীশঃ
রামঃ স্বয়ং দাশরথির্মহীশঃ।
বিহায় সাম্রাজ্যসুখং বনান্তং
গতোঽত্র লোকে বত কিং বিধেয়ম্॥

তদুক্তং রামোক্তং মহাজনপাদৈঃ কবিভিঃ—
"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

অহো! সর্ব্বগুণের আকর কোমল স্বভাব রামচন্দ্র কালবশে অকালে স্বর্গগমন করিয়াছে। হায়! বিধি আজ কৃতান্ত মূর্ত্তিতে তাহাকে হরণ করিয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক শোককারণ সঙ্ঘটিত করিয়াছেন।১

প্রিয়বস্তু সম্মুখে উপস্থিত ও প্রদান করিয়া পরলোকগত ব্যক্তির প্রিয় করিতে হয়—ইহাই সনাতন শাস্ত্ররীতি। শাস্ত্রের সেই সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ে অনুধাবন করিয়া সংস্কৃত বাক্যে সংস্কৃতপ্রিয় স্বর্গত রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য যত্ন করিলাম।২

হে রামচন্দ্র! তুমি বিবিধ বিদ্যায় বিজ্ঞ সর্ব্বগুণের আধার; তোমাকে অধিক বলিবার কি আছে? তুমি হৃষ্টান্তঃকরণে সতত স্বর্গ-পুরে বাস কর; তোমার বান্ধবগণ শোকে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যে বাস করুন। অপর সকলে তোমার পবিত্র যশ ও জনানুরাগের অনুকরণ করিয়া তোমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হউন।৩

যিনি বিধিপ্রণেতা, বিধিলঙ্ঘন তাঁহার পক্ষেও অসাধ্য। দশরথতনয় যুবরাজ স্বয়ং রামচন্দ্রও সাম্রাজ্যসুখ উপেক্ষা করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। হায়, সেই নিয়তি সম্বন্ধে প্রতিবিধেয় লোকের কিছুই নাই।৪

সংসারে আসিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন ব্যক্তি কত উত্তম কার্য্যের কল্পনা মনে মনে রচনা করিয়া থাকে। কিন্তু অপূর্ণবাসনার অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিতে হইলে তাহার সেই অপূর্ণতার জন্য অস্বস্তি আসা স্বাভাবিক। অন্যের কথা কি, রামচন্দ্রেরও সেই ভাবোদয়ের সম্ভাবনা অতীতদর্শী কবিগণ করিয়াছিলেন।

বনগমন কালে রামের খেদোক্তি মহামনা কবিগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম—রাজা হইব, তাহা দূর হইতেও দূরে গমন করিয়াছে! যাহা কখন মনে ভাবি নাই—বনে যাইব, তাহা আসিয়া অতি নিকটে উপস্থিত হইল! ভাবিয়াছিলাম—রাত্রি প্রভাত হইলে আমি ভূতলে সার্ব্বভৌম নৃপতি হইব; কিন্তু সেই আমি এখন জটাধারী তপস্বীর বেশে বনগমন করিতেছি।

কাল ছিল

"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে
আজ কাছে নাই,
নিতান্ত সামান্ত এ কি, নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে
কত আছে, কত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু
হেন বজ্রাঘাত ?"

* * *

অভাগা হৃদয়গুলি ফিরে কত অলি-গলি
স্বগোত্র খুঁজিয়া নাহি পায়।
কবে কোন্ ভুলগনে স্বগোত্র বলিয়া মনে
পেয়েছিল কখন কাহায়,
তারি কথা মনে পড়ে নিশীথে নয়ন ঝরে,
জানে তাহা শুধু উপাধান,
আর জানে সে নিঠুর এ গোলকধাঁধাপুর
যাহার খেলার উপাদান।
সে যবে হারায়ে যায় বালুকণিকার প্রায়
সংসারের বিজন বেলায় ;
ফিরে ফিরে ডাকি তারে খুঁজে ফিরি দ্বারে-দ্বারে
কাটে দিন হতাশে হেলায়।
ঝরে অশ্রু অনিবার দিন-রাত একাকার
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নিভে গেছে।
তারো পরে বেঁচে থাকা জীবন জিয়ায়ে রাখা
বিড়ম্বনা কি-বা আর আছে !

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

স্মরণে

পরিচয়সেতু ছিন্ন ভক্ত হে বন্ধু পরবাসী—
অন্তরে তব রবে আঁকা জানি রূপ-ছবি ধরণীর।
কান্তাকাশে শুনি যেন কাঁদে তোমার বিরহ-বাঁশী—
তুমি অম্লান নন্দনলোকে প্রশান্ত চির-বীর।
পারিজাতমালা কণ্ঠে তোমার জানি না দুলিছে কি না!
হেথা আঁখিজলে মালা গাঁথা রয় তব স্মরণের পলে।
হৃদয়ের তলে বাজে পলে পলে ব্যথার মৌন বীণা—
ভাবি, এসেছিলে গগনের তারা নিমেষ খেলার ছলে!
খেলা হ'ল শেষ খেলিতে নিমেষ আবার যাত্রা শুরু—
জন্ম-মরণ দু'পারে তোমার হে বীর অমর তুমি—
মুক্ত তোমারে বাঁধিতে পারেনি ছলনার মায়া-তরু—
পারের যাত্রী পথ চলে হেথা তোমার স্মৃতিরে চুমি।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

প্রেসিডেন্সী জেল হইতে রাজনীতিক কারণে বন্দী নেতা ও কর্ম্মিবৃন্দও বিচলিত।

আপনার পরিবার ঠাকুরের আশ্রিত, মহাপুরুষদের কত কৃপা আপনাদের উপর।...আপনার পুত্র-বিয়োগে দেশের ও দেশের সংবাদপত্রের বিশেষতঃ কি অপরিসীম ক্ষতি হইল! ঠাকুরের ছেলেকে ঠাকুরই লইয়া গেলেন। তাঁর কি ইচ্ছা, এই ভাবি।

শ্রীমাখনলাল সেন

* * *

অমন ছেলে দেখিনি!—রূপে, গুণে, স্বভাবে, ভদ্রতায় বুদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে, অমায়িকতায় এবং জ্ঞানে।

জানি, রামচন্দ্র যায়নি। যারা আপনার ধন তারা যায় না। আরো যেন কাছে বুকের মধ্যে আসে। আত্মার যোগই আসল।

ডাক্তার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

* * *

সাংবাদিক-মহল

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এ কৃতিত্ব অপেক্ষা মধুর চরিত্রই তাঁহাকে অগণিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদিগের প্রিয় করিয়াছিল। তাঁহারা এই দরদী বন্ধু হারাইলেন। ছাত্রাবস্থাতেই কিশোরদের জন্য যে চমৎকার মাসিক পত্র তিনি পরিচালন করেন তাহাতে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর কয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বসুমতী সংবাদপত্র এবং সর্ব্বজনপরিচিত বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কার্য্য পরিচালন করেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সমূহ ক্ষতি হইল। ভগবান যাহাকে ভালবাসেন, সে তরুণ বয়সেই দেহত্যাগ করে।

—অমৃতবাজার পত্রিকা

* * *

রামচন্দ্র বহু গুণের অধিকারী, উচ্চশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ছিলেন। এই যুবক-বয়সে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে উত্তর-কালে তিনি গৌরবমণ্ডিত জীবনের ইতিহাস রাখিয়া যাইবেন, এমন আশা ছিল।

—যুগান্তর

* * *

শ্রীমান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু সংবাদে আমরা মর্মাহত হইয়াছি। শ্রীমান্ রামচন্দ্র কেবল কৃতী ছাত্র হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সহজ সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্যানুরাগ ইতিমধ্যেই তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছিল। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

মনোমোহন ঘোষ

(স্মৃতিকথা)

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমিচ্ছতি॥"

লোকোত্তর ব্যক্তিগণের বজ্র অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুম অপেক্ষাও কোমল চিত্তবৃত্তি কে বুঝিতে পারে?

মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কার্য্যের আলোচনা করিলে ভবভূতির ঐ প্রসিদ্ধ উক্তি মনে হয়। কারণ, তিনি অত্যাচারীর ও অনাচারীর দণ্ড-বিধানে যেমন অকাতরে ত্যাগ স্বীকার করিতেন, তেমনই অত্যাচার-জর্জ্জরিত পীড়িতের উদ্ধার-সাধনে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ ঢাকা জিলার কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবার পূর্ব্বে যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহা আজ পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রাম পদ্মার গ্রাসে পতিত হইবার পূর্ব্বে—প্রাকৃতিক উপদ্রবে নহে, মানুষের উপদ্রবে—ঘোষ-পরিবারকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোপালকৃষ্ণ তাঁহাদিগের এক জনের সহিত এক কায়স্থ-কন্যার গর্ভজাত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলে পুত্রদ্বয় ইদিলপুর পরগণার জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।* সেই ব্যাপার লইয়া গোপালকৃষ্ণের লোকের সহিত ইদিলপুর পরগণার জমিদারের লোকের খণ্ডযুদ্ধ হয়। গোপালকৃষ্ণের লোক পরাভূত হয় বটে, কিন্তু তিনি ঘোষদিগের গৃহ ভূমিসাৎ ও সম্পত্তি অধিকার করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় পৈত্রিক গ্রাম ত্যাগ করিয়া ঢাকার নিকটে নূতন স্থানে আসিয়া বাস করেন। বোধ হয়, প্রবল গোপালকৃষ্ণের অত্যাচারে ঘোষ-পরিবারে অত্যাচারীর প্রতি যে ঘৃণার উদ্ভব করিয়াছিল, তাহাই মনোমোহন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। আয়ার্লণ্ডের অত্যাচারপীড়িত শ্রমিকদিগের সমর্থনে প্রসিদ্ধ আইরিশ সাহিত্যিক "এই" ধনিকদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন —

"The children will be taught to curse you. The infant being moulded in the womb will have breathed into its starved body the vitality of hate."

অর্থাৎ শিশুরা তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতে শিক্ষা পাইবে; গর্ভস্থ শিশুর দেহেও ঘৃণার শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

নূতন বাসস্থানে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মনোমোহনের পিতা রামলোচনের জন্ম হয় এবং তথায় রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন প্রসূত হয়েন।

রামলোচন নিজ চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা করেন এবং বৃটিশ সরকার যখন ভারতীয়দিগকে বিচার বিভাগে নিযুক্ত করেন, তখন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যাহারা প্রথম সদর আমীন ("সদরওয়ালা"—অর্থাৎ সাব জজ) নিযুক্ত হয়েন, রামলোচন তাঁহাদিগের অন্যতম। চাকরী ব্যপদেশে তিনি কৃষ্ণনগরে আসিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং কৃষ্ণনগরেই মনোমোহন শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তাহার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন বটে, কিন্তু এক বৎসর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন।

পিতা—রামলোচন ঘোষ

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে পঠদ্দশায় কলিকাতায় আসিয়া তিনি পাক্ষিক পত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরার' প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি বাল্যাবধি উৎপীড়িতের সহায় ছিলেন এবং পঠদ্দশায় কৃষ্ণনগর হইতে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে নীলকরদিগের অনাচার সম্বন্ধে পত্র লিখিতেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হস্তান্তরিত হওয়ায় তিনি কয় জন সহকর্ম্মীর সহিত জনগণের অভাব ও অভিযোগ প্রকাশ জন্য 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র প্রবর্তিত করেন।

মনোমোহনের বিলাত যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁহার পিতা রামলোচনের রামমোহন রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার ও

* পূর্ব্ববঙ্গে সেকালে ধনীদিগের গৃহে স্থায়িভাবে দাসী রক্ষার যে প্রথা ছিল তাহা ক্রীতদাস রক্ষার প্রথারই নামান্তর। সেই কুপ্রথার ফলে যে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটিত, তাহারই দৃষ্টান্ত এই ঘটনায় পাওয়া যায়। মনোমোহন যে তাঁহার সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে ঐ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী-চালন করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, সেই সময় পর্য্যন্ত (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) ঐ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে নাই।

উভয়ের মতের মিলনের উল্লেখ করিতে হয়। মনোমোহনের পিতা যখন কৃষ্ণনগরে সদর আমীন, তখন আমার পিতামহ তারিণীপ্রসাদ ঘোষ তথায় উকীল সরকার। তারিণীপ্রসাদ তথায় রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। কাযেই অনেক বিষয়ে রামলোচনের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল। কিন্তু তাহাতে উভয়ের বন্ধুত্বে ব্যাঘাত ঘটে নাই। মনোমোহন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা লালমোহন তাঁহাদিগের পিতৃবন্ধুর গৃহে পুত্রের মত আদর পাইতেন। মনোমোহনকে বিলাতে প্রেরণে তারিণীপ্রসাদ আপত্তি করেন এবং তিনি এক বার এক সম্মিলনে আমাকে দেখাইয়া বলেন, "আজ ইনি আমার মতের সমর্থন করিতেছেন; কিন্তু এক দিন ইঁহার পিতামহের জন্যই আমার বিলাত যাত্রা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।"

পিতার অনিচ্ছা থাকিলে মনোমোহনের বিলাতে যাওয়া হইত না। তখনও তাঁহার পরিবারে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি, মনোমোহন যখন বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রামলোচনের পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর কন্যাগণ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; এমন কি, গৃহের পাচক ব্রাহ্মণও চাকরী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

পিতার মত পুত্রে প্রতিফলিত ও পুত্রকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মনোমোহন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহারই ব্যবস্থায় তাঁহার মাতুলপুত্রী ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিকে (ফিরোজশা মেটা) ধন্যবাদ দেন। কংগ্রেসের মঞ্চে তাহার পূর্ব্বে কোন মহিলার কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় নাই। ডাক্তার এনী বেশাণ্ট সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"A symbol that India's freedom would uplift Indian's Womanhood." সেই বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে বিচলিতধৈর্য্য হয়েন। আমার মনে আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মনোমোহন তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া তাঁহার স্কন্ধে করতল অর্পিত করিয়া তাঁহাকে সাহস দেন।

রামমোহন রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতাহেতু তাঁহার পিতা সামাজিক ব্যাপারে যে মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা বিলাতে শিক্ষিত ও বিলাতী সমাজের সহিত পরিচিত মনোমোহনে সমধিক পুষ্ট হইয়াছিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তিনি কলিকাতায় বেথুন সোসাইটীর এক সভায় "বাঙ্গালার সমাজে ইংরেজী শিক্ষার ফল" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যদি মতভেদের

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মনোমোহন

অবকাশ থাকিয়া থাকে, তথাপি এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি সত্যকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহার ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল পরে তিনি বিলাতে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে "গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালার

সামাজিক উন্নতি” সম্বন্ধে আর এক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহা বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়। এক দিকে যেমন ‘ইংলিসম্যান’ (কলিকাতা) ও ‘চ্যাম্পিয়ন’ (বোম্বাই) তাঁহার মতের সমর্থন করেন, অপর দিকে তেমনই ‘ইণ্ডিয়ান নেশান’ (কলিকাতা) ও ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ (কলিকাতা) তাহার প্রতিবাদ করেন; আর মাদ্রাজে ‘হিন্দু’ পত্রে কেশব পিলাই থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহা আক্রমণ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ বৎসরে বাঙ্গালার সমাজে, বিশেষ হিন্দু সমাজে, যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না বটে, কিন্তু মনোমোহন সে সকল উন্নতির পরিচায়ক বলায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিরা—সেই পরিবর্ত্তনের প্রভাব নষ্ট করিতে না পারিলেও—সে সকল অবনতিদ্যোতক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তখন দেশে “হিন্দু পুনরুত্থান” নামে পরিচিত আন্দোলন প্রকট হইয়াছে। বাঙ্গালায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুর আচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সেই ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া জ্বালাময়ী ও উত্তেজনাপ্রদ বক্তৃতা করিতেছেন। সেই আন্দোলন যে রাজনীতিক কারণের উৎস হইতে উদ্গত ভাবে পুষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মনোমোহন সেই উৎসের সন্ধান দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন. প্রাচীন সভ্যতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নামে ইংরেজ জাতির ও ইংরেজী সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হইতেছে। তিনি স্বয়ং মনে করিতেন, ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠতা ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজন। সে বিশ্বাস সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি তাঁহার মতের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাও রাজনীতি সমাজনীতি এ সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত আর বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আচারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মনোমোহন যে আচার-নিষ্ঠার নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। কারণ, তিনি ‘হিন্দু’ পত্রে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন :—

“পরলোকগত মুথুস্বামী আয়ারের মত লোকের বিদ্যা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার মতের উদারতা আমি আমার স্বদেশবাসীদিগের অনুকরণযোগ্য বলিয়া মনে করি। আমাদিগের সমাজে যে মুথুস্বামী আয়ারের বা আমার প্রসিদ্ধ বন্ধু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোক অধিক নাই, তাহা আমি বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। ইঁহারা হিন্দুর আচারে কঠোর নিষ্ঠা ও জীবনযাত্রার প্রাচীন পথে অনুরাগ প্রকট করিলেও যে কোন দেশের বা জাতির পক্ষে গৌরবের কারণ।” *

মনোমোহন ঘোষের পত্নী

মনোমোহন যে আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মের বা সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার কার্য্যে ও উক্তিতে পাইয়া থাকি।

* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি মহেশচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর উল্লেখ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—ব্যবহারের সরলতা ও জীবনের পবিত্রতা স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর স্বভাবজ গুণ।

মনোমোহন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরীক্ষায় প্রাচ্য ভাষায় রক্ষার সংখ্যাপরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি কারণেই তাহা হয়। তিনি সেই ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করিয়া পুস্তিকা প্রচার করেন। তখনই তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"যে শিক্ষায় আমরা য়ুরোপীয়দিগের সব ক্রটি লাভ করিব আর দেশের প্রতি সহানুভূতি ও আমাদিগের সম্বন্ধে বর্ত্তব্য-জ্ঞানের চিহ্ন পর্য্যন্ত হারাইব, সেই মিথ্যা শিক্ষা অত্যন্ত দোষের কারণ। যে শিক্ষায় আমরা হিন্দু নামের এবং যে ভাষা ও সভ্যতা তাহার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাইব তাহা ভয়াবহ। আমার মনে হয়, ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইতোমধ্যেই আমরা আমাদিগের উন্নতির জন্য দেশবাসীর সহিত যে সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন তাহাতে বঞ্চিত হইতেছি এবং যে সকল বন্ধন আমাদিগকে দেশের সহিত বদ্ধ করিবে সে সকল শিথিল হইতেছে।"

তিনি যে কখন এই মত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করা সঙ্গত নহে।

তাঁহার জাতীয় ভাবের ও দেশাত্মবোধের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতে ব্যারিষ্টারী শিক্ষা-কালে তিনি চোগা ব্যবহার বর্জ্জন করেন নাই এবং তাহাও কলিকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিষ্টার-দিগের পক্ষে তাঁহাকে "লাইব্রেরীতে" প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করার অন্যতম কারণ। শেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহাকে বলেন, যখন ইংরেজদিগের সহিতই কায করিতে হইবে, তখন কার্য্যক্ষেত্রে তাহা-দিগের বেশ ব্যবহারে আপত্তি না করিলেও হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক (রাজনীতিক) সম্মিলন কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কয় বৎসর তাহার অধিবেশন হয় নাই। পূর্ব্বে কলিকাতায়ই তাহার অধিবেশন হইত। প্রাদেশিক অভাব-অভিযোগ প্রভৃতির আলোচনার জন্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আমন্ত্রণে সে বার বহরমপুরে —আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে যাযাবররূপে পুনর্গঠিত সম্মিলনের অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন কৃষ্ণনগরে। সে বার গুরুপ্রসাদ সেন সভাপতি, মনোমোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই অধিবেশনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের অধিবেশনে সম্পাদকের কায করিতেছিলেন, ব্যক্তিগত ব্যাপারে দৌর্ব্বল্যহেতু কয় জন ব্রাহ্ম তাঁহাকে পদচ্যুত না করিলে অধিবেশনে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়া তার করেন। 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ তাঁহাদিগের কার্য্যের নিন্দা করেন। পরে 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত "রুচি বিকার" নামক কবিতার জন্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁহার নামে মানহানির মামলা উপস্থাপিত করেন এবং তাহাতে কাব্যবিশারদ হাই কোর্টের বিচারে দণ্ডিত হয়েন। সেই অধিবেশনে মনোমোহন নিয়ম করেন, প্রত্যেক প্রস্তাবে অন্ততঃ এক জন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি বলেন, দেশের জনগণ আমাদিগের সমর্থক, ইহা না বুঝিলে ইংরেজ শাসকরা কিছুতেই আমাদিগের রাজনীতিক অধিকার বিস্তৃত করিবেন না। পরবৎসর নাটোরে অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঐ ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করিয়া কেবল বাঙ্গালায় সম্মিলনের কার্য্য পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

কৃষ্ণনগরের সেই অধিবেশনেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়।

তখনও কৃষ্ণনগরের প্রান্ত দিয়া রেলপথ যায় নাই— কৃষ্ণনগরে যাইতে হইলে বগুলায় ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে হইত। বগুলা ষ্টেশনের নাম-ফলকে লিখিত ছিল Bagoola for Krishnagar বগুলা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে চূর্ণী নদীর কূলে উপনীত হইয়া খেয়া নৌকায় নদী পার হইয়া পরপারে হাঁসখালিতে যাইতে হইত। হাঁসখালির স্মৃতি এখন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতায়' রক্ষিত হইতেছে। হাঁসখালি হইতে আবার ঘোড়ার গাড়ী লইয়া কৃষ্ণনগরে উপনীত হইতে হইত। তখন মিষ্টার হেউড নামক ইংরেজ মনোমোহনের খাস মুন্সী অর্থাৎ সেক্রেটারী। ইঁহার সহিত তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং ইনি পরে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শ—বণিক সভার সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৯শে জুন প্রতিনিধিরা কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন। সে দিন মিষ্টার হেউড আমাদিগের সহযাত্রী ছিলেন। ২০শে জুন বারিপাত হইলেও রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে সভায় বহু লোক-সমাগম হয়। সেই দিন সন্ধ্যায় মনোমোহন তাঁহার গৃহে প্রতিনিধিদিগকে ও মহারাজা প্রমুখ বহু স্থানীয় লোককে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন বলিলেন, বৃষ্টির জন্য অনেকের কৃষ্ণনগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার অসুবিধা হইল তখন আমি—যাঁহারা পূর্ব্বে সে সকল দেখেন নাই তাঁহাদিগেরই অসুবিধা হইল বলায় তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাঁহার পিতৃবন্ধুর পৌত্র জানিয়া আমাকে স্নেহগদগদভাবে বক্ষে টানিয়া লইলেন। মনোমোহন এক জন যুবককে আলিঙ্গন দিতেছেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গুরুপ্রসাদ সেন, মতীলাল ঘোষ মনোমোহনের নিকটে আসিলেন। মনোমোহন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ইহার পিতামহ আমার পিতৃবন্ধু, ইহার পিতা আমার ভ্রাতারই মত ছিল—দেখুন, কি দুষ্ট ছেলে, এক বার আমার সঙ্গে দেখা করে না!" তিনি আমাকে বলিলেন, আমি

যেন কলিকাতায় ফিরিয়া প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করি—আমাদিগের পুরাতন কর্ম্মচারী ভক্তরাম বিশ্বাসের মৃত্যুর পর হইতে তিনি আর আমাদিগের সংবাদ পায়েন না। তিনি আবার বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই যেতাম, তোমার ঠাকুরমা'র কোলে বসে ছেলেরই মত খাবার খেতাম।" আমি যখন বলিলাম, আমার পিতামহী জীবিতা তখন তিনি বলিলেন, "তিনি বেঁচে আছেন! আমি তাঁ'কে দেখতে যা'ব।" কিন্তু পরক্ষণেই আমার পিতার কথা স্মরণ করিয়া অভিভূত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু গিরীন্দ্র বেঁচে নাই, আমি কোন্ মুখে তাঁ'র কাছে যা'ব? তুমি তাঁ'কে ব'ল, তাঁ'র মনু তাঁ'কে প্রণাম জানিয়েছে।"

বার্দ্ধক্যে মনোমোহন

প্রৌঢ় মনোমোহন

তাঁহার স্নেহশীল চিত্ত যেন কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেই অতীতে উপনীত হইয়াছিল। তাহা অসাধারণ স্নেহেই সম্ভব।

লালমোহন ঘোষ অধিবেশনের প্রথম দিন আসিতে পারেন নাই—দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া অধিবেশনে উপনীত হয়েন এবং বেত্রাঘাতদণ্ড সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি যখন উপস্থিত হয়েন তখন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছিলেন। পরদিন (২২শে জুন) প্রাতে সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হয়; অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগরের ছাত্রগণ মনোমোহনের সভাপতিত্বে এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানপত্র প্রদান করেন। তাহার পরে জনসভায় প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবার পর লালমোহন ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তাহার পূর্ব্বে রাজনীতিক ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছিল—মনোমোহন তাহার অবসান ঘটাইবার জন্যও তাঁহাকে অধিবেশনে আসিতে বলিয়াছিলেন। লালমোহন বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়া বলেন—তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যে বাধাদান করা হইয়াছিল, তাহা "an attempt to filch from the victor's brow his laurel crown" সে কথা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনই মনোমোহন ভ্রাতাকে আমার উপস্থিতির কথা বলিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া আমি তাঁহার নির্দ্দেশে কয় বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; যখনই গিয়াছি, তাঁহার স্নেহ-পরিচয় লাভ করিয়া আসিয়াছি। সভা-সমিতিতেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু বিলম্বে লব্ধ তাঁহার সেই স্নেহ অধিক দিন সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর অতর্কিত ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মনোমোহন অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন। কৃষ্ণনগর তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তখন তথায় যাইবার পথ আরামপ্রদ না হইলেও যখনই পারিতেন, তথায় যাইতেন। তিনি তথায় তাঁহার পিতার গৃহ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই গৃহে তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণকে অতিথিসৎকার করিয়া প্রীতি লাভ করিতেন—হাইকোর্টের চীফ-জাষ্টিস সার কোমার পেথরামও তথায় তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া যখন বিশ্রাম লাভের আশায় মনোমোহনের কৃষ্ণনগরস্থ ভবনে ছিলেন তখন একটি ব্যাপারে মনোমোহনের বন্ধুবাৎসল্যে ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে বিরোধ ঘটে। এণ্টনী প্যাট্রিক ম্যাকডনেল (পরে লর্ড ম্যাক ডনেল) তখন নদীয়া জিলার মেহেরপুর মহকুমার হাকিম। তিনি কোন নীচ জাতীয়া নারীর সম্বন্ধে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েন। নদীয়ার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বেল ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত করিয়া তাহা "ধামা চাপা" দেন এবং হতভাগিনীকে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় জমিদার

ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত হতভাগিনীর অভিযোগ সত্য বলিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মনোমোহনকে তাহার পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অভিযুক্ত ইংরেজ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন বলিয়া মনোমোহন তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা না করিয়া উমেশচন্দ্রকে তাহা করিতে বলেন এবং উমেশচন্দ্রের মামলা পরিচালন-ফলে অভাগিনী নিরপরাধ প্রতিপন্ন হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিষ্টারগণ মনোমোহনের ব্যবসায়ে প্রবেশপথে নানা বাধা স্থাপিত করিলেও তাহার প্রবেশ ও উন্নতি রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি এমন ভাবে জেরা করিতেন যে, একটি মামলায় এক জন ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য হইয়া নানা পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিয়া আদালতেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে নগেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ ২৫ জন ছাত্র বারয়ারীতে যাত্রার সময় হাততালি দিয়া যাত্রা ভাঙ্গায় ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হয়। তাহারা যে কোন দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছিল, তাহাও মনে হয় না। কিন্তু জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট টেলার ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর র‍্যামজের জিদে তাহারা গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছিত হয়। সে দিন পুলিসের অকারণ তৎপরতা ও ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা আমার মনে আছে। মনোমোহন সেই মামলায় ছাত্রদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার জেরায় গাত্রে মূত্র নিক্ষেপের কথায় সাক্ষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুর্দশা তখন বহু লোকের হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। কিন্তু জেরায় টেলারের ও মেজর র‍্যামজের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা উপভোগ্য। উভয়ের দম্ভ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং অপমানিত হইয়া কৃষ্ণনগর ত্যাগকালে মেজর র‍্যামজে চূর্ণী নদীর জলে জুতা ধৌত করিয়া বলিয়াছিলেন—তিনি কৃষ্ণনগরের ধূলাও লইবেন না। সে ধূলায় তাঁহার ভয় হইয়াছিল। সেই মামলার বিবরণের ভূমিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, অনেক দিন পরে পুলিস কমিশনের রিপোর্টেও তাহা স্বীকৃত হয়। ভূমিকায় দেখান হয় :—

"Police Officers and Magistrates often combine to set at defiance law and discretion in order to secure the conviction of the accused or to harass persons who have done nothing to make them amenable to the criminal laws of the country."

মনোমোহন অন্যায়রূপে অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি সে সকলের মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিব :—

(১) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার দায়রা জজ জুরীর সাহায্যে স্বীয় কন্যা নেকজানের হত্যাপরাধে মুলুকচাঁদ চৌকীদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তাহার কন্যা গোলকমণি [illegible], সে তাহার পিতাকে নেকজানকে হত্যা করিতে দেখিয়াছিল এবং তাহার স্ত্রীও কন্যার সাক্ষ্য সমর্থন করে। স্থানীয় কয় জন উকীল আদালতে বর্ণিত ঘটনা অসম্ভব মনে করিয়া মনোমোহনকে মোকর্দ্দমার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া হাইকোর্টে মুলুকচাঁদের পক্ষে আবেদন করেন। হাইকোর্ট মামলার পুনর্বিচারের নির্দ্দেশ দিলে ২৪ পরগণায় আবার বিচার হয়। মনোমোহনের জেরায় পুলিসের সাজান মিথ্যা সাক্ষ্য ফুৎকারে জলবিম্বের মত ফাটিয়া যায় এবং মুলুকচাঁদ বেকশুর খালাস পায়। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন বৎসরে দুই বার তাহার রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত—যেন সে তীর্থ-দর্শনে আসিত।

এই মামলার বিবরণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় পার্লামেণ্টের সভ্য ডাক্তার ডবলিউ, এ, হাণ্টার লিখিয়াছিলেন—

"The miscarriage of justice was due to the corruption of the police and their determination to support a wrong opinion by tutoring a child in falsehoods to swear away its father's life."

(২) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট হাওড়ার উপকণ্ঠে বাকশাড়া গ্রামে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নিহত হইলে তাহার হত্যাকারী বলিয়া ঐ গ্রামের শ্যামাচরণ পাল অভিযুক্ত হয়। পুলিস শ্যামাচরণের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাইতে ত্রুটি করে নাই। শেষে শ্যামাচরণ হত্যাপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হয়। নিম্ন আদালতে অর্থাভাবে কোন ব্যবহারাজীব তাহার পক্ষাবলম্বন করিতে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। শ্যামাচরণের পত্নী মনোমোহনের নাম শুনিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসে এক দিন প্রাতে তিনি মনোমোহনের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। মনোমোহনের মধ্যমা কন্যা তখন বালিকা। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তিনি যখন খেলা করিতেছিলেন, তখন এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি মনোমোহনের কন্যা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে—আপনার স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য মনোমোহনকে বলিতে বলেন। তাঁহার কাতরতায় ব্যথিতা বালিকা যাইয়া যখন পিতাকে বলিতেছিলেন, তিনি এক জন স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছেন—তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে, তখন শ্যামাচরণের পত্নী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনোমোহনের পদপ্রান্তে পতিত হয়েন। মনোমোহন মামলার কথা শুনিয়া এক জন জুনিয়ার ব্যারিষ্টারকে শ্যামাচরণের পক্ষাবলম্বন করিতে দেন এবং তাঁহার নিকট সব শুনিয়া শেষে আপনি বিনা-পারিশ্রমিকে মামলা করিতে সম্মত হয়েন ও বাকশাড়ায় যাইয়া ঘটনাস্থল দেখিয়া আসেন। পুলিস বালক হইতে প্রৌঢ় নানা বয়সের সাক্ষী শিখাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু মনোমোহনের জেরায় মিথ্যার লূতাতন্তুজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং শ্যামাচরণ মুক্তি পাইল। পুলিস নিষ্ফল ক্রোধে তাহার বন্দুকের ছাড় বাতিল করাইয়া দেয়।

শ্যামাচরণ মুক্ত হইলে মনোমোহন কন্যাকে সেই সংবাদ দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আবার যেন কাহারও কথা শুনিয়া দুঃখ পাইও না।"

এই মামলার বিবরণও পুস্তকাকারে বিলাতে প্রকাশিত হয় এবং পুস্তকের ভূমিকায় কুমারী এলিজা অর্ম্ম ইংরেজের যে সকল কর্ম্মচারী বালক-বালিকাকে ভয় দেখাইয়া বা অত্যাচার করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করে তাহাদিগের কঠোর দণ্ডের প্রয়োজনের কথা বলিয়া মন্তব্য করেন:—

"It is bad enough if private individuals, moved by personal antipathy or greed, concoct accusations and suborn witnesses, but it is far more serious when the conspirators are armed with official authority."

মুলুকচাঁদের মামলায় ও শ্যামাচরণ পালের মামলায় মনোমোহন যেমন পুলিসের ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর মামলায় ও জামালপুর মেলা মামলায় তেমনই স্বাধিকারপ্রমত্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের উদ্ধত অনাচারে কশাঘাত করিয়াছিলেন। মেলাঘটিত মামলায় বিভাগীয় কমিশনার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট একযোগে সরকারী জমিতে জনসাধারণের যে মেলা বসিত তাহা সরকারী মেলা ভাবিয়া লোকের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিবার কার্য্যে প্রকারান্তরে সহায় হইয়াছিলেন। নিরপরাধ ব্যক্তিরা রাজকর্ম্মচারীদিগের কোপে পতিত হইয়া দণ্ডিতও হইয়াছিলেন। ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত এই ব্যাপারের ফলে বাঙ্গালা সরকার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট যে রেজলিউশন প্রচার করেন, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ারের সম্বন্ধে লিখিত হয়:—

"The Lieutenant-Governor......considers action like that taken by Mr. Glazier to be mischievous. It is manifestly impossible to expect native gentlemen to co-operate with a Government officer in voluntary works of public utility if they knew that they are liable to be overridden and thrust aside as the Mela Committee has been in the present case."

ইহাও স্বীকৃত হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের এইরূপ ব্যবহারে স্বাধীন লোকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ব্যবধান সংঘটন অনিবার্য্য।

আর এই মামলায় অবিচারের অভিযোগে বাঙ্গালা সরকার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট অক্ষয়কুমার বসুকে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতায় বঞ্চিত করিয়া সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সর্ব্বনিম্নে স্থাপিত করেন।

লোকনাথপুরের মামলা, বুদ্ধগয়া মন্দির সম্বন্ধীয় মামলা, লালচাঁদ চৌধুরীর মামলা প্রভৃতিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যবহারাজীবের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করা বাহুল্য। তিনি নানা মামলার ফলে পুলিসের ও মফঃস্বলে অনাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নানা ফৌজদারী মামলার আলোচনা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, এ দেশে দাওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে থাকিলে—অভিযোগকারী ম্যাজিষ্ট্রেটই বিচারক থাকিলে অনাচার-সম্ভাবনা দূর হইতে পারে না। তিনি সেই জন্য ক্ষমতা পৃথক্ করিবার জন্য আন্দোলন করেন। এ বিষয়ে তাঁহার পুস্তিকাদ্বয় উপকরণের গৌরবে ও যুক্তির প্রাবল্যে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে মিষ্টার জাষ্টিস্ ট্রেভেলিয়ান তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'এশিয়াটিক কোয়ার্টারলী রিভিউ' পত্রে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন। কৃষ্ণনগরে সার চার্লসের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া বলেন, তিনি প্রবন্ধের যুক্তি চূর্ণ করিবেন। কিন্তু তখনই উত্তর দিতে বসিবার পূর্ব্বেই তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন (১৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

বাল্যাবধি তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে দেশের লোকের অধিকার-বৃদ্ধির কার্য্যে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এ দেশে বিভিন্ন সভার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও অভিযোগ ব্যক্ত করিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বিলাতে গমন করেন এবং তথায় ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার-বৃদ্ধির প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নারায়ণ চন্দ্রাবরকর (বোম্বাই) ও সালেম রামস্বামী মুদেলিয়ার (মাদ্রাজ) তাঁহার সহিত একযোগে কায করিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিলাতে গমনের উদ্দেশ্য যে বিলাতের রক্ষণশীল রাজনীতিকদলের আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—যে লর্ড সলসবেরী আইরিশদিগকে বর্ব্বর বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ও সহকর্মী তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড র‍্যানডল্‌ফ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় বলেন, তাঁহারা উদারনীতিক দলের আমন্ত্রণে বার্ম্মিংহামে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিত্রয়কে "বাঙ্গালী বাবু" বলিয়া হাস্যোদ্দীপক ভুল করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিত্রয় সে সম্বন্ধে ২৩শে নভেম্বর বার্ম্মিংহামের 'ডেলী পোষ্ট' পত্রে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লর্ড র‍্যানডল্‌ফের অজ্ঞতার ও ধৃষ্টতার পূর্ণ পরিচয় প্রকট হইয়াছিল। বার্ম্মিংহামে জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এ দেশে লোকের প্রতি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহানুভূতির অভাব, রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা, সামরিক বিভাগে উচ্চ পদে ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার অস্বীকৃতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এ দেশে ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র ও ইংরেজরা অনেকে যে—প্রতিনিধিদিগের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীকে পুনরায় বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণে বিরত থাকিতে "অযাচিত সুপরামর্শ" দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তাঁহারা ঐরূপ প্রতিনিধি প্রেরণে শঙ্কানুভব করিয়াছিলেন—পাছে বিলাতের লোক এ দেশে বৃটিশ শাসকদিগের ত্রুটি জানিতে পারেন।

মনোমোহন বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী বোম্বাই সহরে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বলেন, প্রতিনিধিরা যে কাযের সূচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা যে অত্যন্ত সফল হয় নাই, তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; পরন্তু, সেই কাযে যে সাফল্য-লাভ হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনি যে সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যতম নেতা ছিলেন, তখন বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয় মনোভাব প্রবল হয় নাই। মনোমোহন ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিক-দিগের বিশ্বাস, ঐ সময়ে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ক্যান্টনমেণ্ট বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অন্যতম, ফিরোজশা মেটার উক্তিতে প্রকাশ পায়—

"It is safer to rest upon the ultimate sense of justice and righteousness of the whole English people which in the end always asserts its nobility."

তাহার পরে সে বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—

"আমাদিগের চেষ্টার ইহাই যে আরম্ভ, তাহা আমা-দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। কংগ্রেসের এই বার্ষিক অধিবেশন সমগ্র ভারতবর্ষে যে বিশাল ও বিস্ময়কর জাতীয় জাগরণ দেখা যাইতেছে তাহারই বহির্বিকাশ।"

মনোমোহন আশাবাদী ছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা কখন পরাভূত হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি হিন্দুর সেই বিশ্বাসে অবিচলিত ছিলেন—"ধর্ম্মের জয় হয়—অধর্ম্মের ক্ষয় অনিবার্য্য।" তিনি ভারত-বাসীর রাজনীতিক অধিকারলাভ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাহা লাভ করিবেন—হয়ত পথে বিঘ্ন থাকিবে—কিন্তু পথ অতিক্রান্ত হইবে এবং জয়যাত্রা সফল হইবে।

মনোমোহনের বন্ধুবাৎসল্যের উল্লেখ পূর্ব্বেই করি-য়াছি। মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ;
কিন্তু গ্রহপ্রায় ধরাতে আসিয়া
জলিয়া হইলা শেষ।
ছিলে উদাসীন গেলে উদাসীন
জয়মাল্য শিরে পরি'।
অনাথ দু'টিরে কা'র কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি'?
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে
অনাথপালক তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া ল'বে।
হ'বে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে
পূরিবে তোমার আশা।
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা?"

হোমরের সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে :—

"Seven wealthy towns contend for Homer dead
Through which the living Homer begged his bread"

মধুসূদনের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে—তাঁহার কবিযশ অম্লান প্রতিপন্ন হইবার পরে—বহু ধনী তাঁহার বন্ধুত্বের গর্ব্ব করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মধুসূদন যখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তাঁহারা সে বন্ধুত্বের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। তখন তিনি শুশ্রূষাকারিণী-দিগকে দৈনিক একটি টাকা দিতে পারিলে সুখী হইবেন বলিলে মনোমোহনই প্রতিদিন সে টাকা দিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পর মনোমোহনই অনাথপালকরূপে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় তাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ পাইয়াছিল।

মনোমোহন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন—পৃথিবীতে কোন শক্তি প্রকৃত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে পারে না—উন্নতির রথ অগ্রসর হইবেই।

সেই বিশ্বাসে তিনি দেশবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—

"New occasions teach new duties;
Time makes ancient good uncouth;
They must upward still and onward,
who would keep abreast of Truth;
So before us gleam her camp-fires!
We ourselves must Pilgrims be;
Launch our Mayflower and steer boldly
through the desperate winter sea,
Nor attempt the Future's portal
with the Past's blood-rusted key."

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মরু-তৃষা

(উপন্যাস)

৪৩

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে-ব্যাপার কেহ ভাবিতে পারে নাই, অসম্ভবের চেয়েও যাহা অসম্ভব ছিল—এক নিমেষে ভোজবাজির মত তাহাই ঘটিয়া গেল। মিথ্যা সত্যের মুখোশ আঁটিয়া প্রকাশ পাইল।

এমনি হয়! অনন্ত-প্রবহমান কাল-স্রোতের বুকে একটি নিমেষ এমনি কঠোর মূর্ত্তিতে উদিত হয়! তাহার বুকে মানুষের ভালো-মন্দ শিলালিপির মত যুগ-যুগ ধরিয়া ভবিষ্যতের বিচারে গৌরব কিংবা গ্লানি অর্জ্জন করে।

রত্নাকে লইয়া অনিল যখন নিজের মোটরে উঠিল, তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চপলার পলক-বিকাশের মত একটি কথা মনে জাগিল। রহস্যচ্ছলে এক দিন সে বলিয়াছিল, "চলো, নিরুদ্দেশে পাড়ি দিই"। আজ সেই পরিহাসকে অদৃশ্য দেবতা এমন নিদারুণ সত্য করিয়া তুলিবেন, কে ভাবিয়াছিল!

অনিলের গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিতেছিল। আঁধার রাত্রে পথের নিশানা আলোগুলাকে পিছনে ফেলিতে ফেলিতে রেল-লাইনের চিহ্ন দেখিয়া অনিল গাড়ী চালাইতেছিল। রত্না আজ গাড়ী চালাইবার জন্ত উৎপাত করে নাই! পিছনের আসনে আচ্ছন্নের মত বসিয়া আছে—হঠাৎ দু'পাশের নিবিড় অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল,—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নিস্পৃহ কণ্ঠে অনিল উত্তর দিল,—অজানার দেশে।

রত্না নীরব রহিল। জড়তায় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শূন্যে দৃষ্টি মেলিয়া বিমূঢ়ের মত সে সীমাহীন অন্ধকার-রাশির পানে চাহিয়া রহিল। দু'জনের কেহই চিন্তা করিতে পারিল না, যে-গৃহ তাহারা এইমাত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, দুর্য্যোগ-ভরা তিমির-রাত্রে অশনি-পাতের মত সেখানে কি বিভ্রাটের সৃষ্টি হইতেছে!

কল্পনার অবমানিত চিত্তে প্রচণ্ড রাগ তাহাকে যেন হত্যার নেশায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল!

বিনা প্রশ্নে সে যখন চঞ্চল চরণে গোস্বামী সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন তাহার দীপ্ত-দৃষ্টি ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া স্বামি-স্ত্রী এক সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে?

পাগলের মত ক্ষিপ্ত চরণে কল্পনা গোস্বামী সাহেবের কাছে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া রুদ্ধ শ্বাসে কহিল,—আমি,—আমি শুধু আপনার কাছে নালিশ জানাতে এসেছি।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কল্পনার রোষাগ্নি-রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—কি হয়েছে? বসো! বসো! বলিয়া কল্পনার হাত ধরিয়া নিজের পাশে তিনি তাহাকে বসাইলেন।

কল্পনা হাঁপাইতেছিল। অনিলের আচরণ তাহাকে মর্ম্মাহত নয়, [illegible] মত লাঞ্ছিত করিয়াছিল। সে আঘাত সে-ও ফিরাইয়া দিবে, এই নিদারুণ সঙ্কল্প লইয়া এ-ঘরে পা দিয়াছিল। নতুবা গোস্বামী-[illegible] সকল সৌহার্দ্দ সে উল্লঙ্ঘন করিবে! কল্পনার কাছে কৃত [illegible] যদি ক্ষমা চাহিত, লজ্জা প্রকাশ করিত, [illegible] অনুনয় করিত, তাহা হইলে সে এতখানি উগ্র হইত না। অনিলকে চরম দণ্ড দিতে হয়তো এ বদ্ধপরিকর হইত না! কিন্তু অনিল তার কিছুই করে নাই, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহারে কল্পনাকে অবহেলা করিয়াছে, যেন অতি নগণ্য তুচ্ছ সে! কল্পনা আজ তাহারই বোঝাপড়া করিবে।

মিসেস্ গোস্বামী বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন—সত্যি, ব্যাপার কি কল্পনা?

কল্পনা কহিল,—ব্যাপার! মাসিমা আপনি রত্নাকে ডেকে, মিষ্টার গোস্বামীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—শুনুন, তারা কি বলে!

বিমূঢ় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কি বলছো এ? তোমার হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বলো।

সে কণ্ঠস্বরে কল্পনা এতটুকু দমিল না। সমান সাহসে সে কহিল,—আমি হেঁয়ালি বলিনি, মাসিমা। স্পষ্ট কথাই আমি বলছি। আমার কথার দায়িত্ব আমি বুঝি—এইমাত্র আমি ড্রইং-রুম থেকে আসচি—সেখানকার মানুষ দু'টি ভুলে গেছে যে, এটা সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের বাড়ী!

গোস্বামী সাহেবের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

মিসেস্ গোস্বামী বিরক্তিভরে কহিলেন,—অনিল কিরেছে? তাঁহার কণ্ঠস্বর তিক্ত।

কল্পনার মনের মধ্যে তখন বোলতা-কামড়ানোর মত [illegible] জ্বালা ধরিয়াছে! ঈষৎ শ্লেষের সহিত সে কহিল,—[illegible]। আমি তাদের বিভোর ভাবে ব্যাঘাত করে অনর্থ করে এসেছি!

গোস্বামী সাহেবের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—কি বলছো কল্পনা! কার সম্বন্ধে বলছো? জানো, রত্নার অভিভাবক আমি! সে আমার বন্ধুর মেয়ে।

সপ্রতিভ কণ্ঠে কল্পনা উত্তর দিল,—খুব ভালো জানি! আরও বেশী জানি মিষ্টার গোস্বামীর আমি বাক্‌দত্তা। স্বচক্ষে আমি দেখে এসেছি তাদের আচরণ!

গোস্বামী সাহেব হাঁক দিলেন,—বয়—

বয় আসিয়া ফরমাস অপেক্ষায় দাঁড়াইল।

গোস্বামী সাহেব জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—ছোট সাহেব, বোস মিসিবাবা।

—বাহার গিয়া হুজুর।

গোস্বামী সাহেব যেন বোমার মত ফাটিয়া গেলেন! কহিলেন,—দোনো বাহার গিয়া?

বয় জানাইল,—জী।

গোস্বামী সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—কোন্ গাড়ী লিয়া? কিধার গিয়া?

—নেহি জানতা সাব! ছোটা সাহেব-কো গাড়ী লিয়া।

—কোথায় গিয়া?

—নেহি সাব।

মিসেস্ গোস্বামী পুতুলের মত চাহিয়াছিলেন। [illegible] হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। শুধু [illegible] কথা তাঁহার [illegible] আসিয়া সমস্ত [illegible]

তুলিতেছিল। বলিবার কহিবার সবই যেন তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে। বিসর্পিত অন্ধকার লইয়া কি কাল-রাত্রি আসিল! ক্ষণপূর্ব্বে তিনি ইহার বিন্দুমাত্র আভাস পান নাই! স্বামীর দিকে হেলিয়া জীবন-অপরাহ্নের সুখচিত্র আঁকিতে বিভোর ছিলেন। কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল রত্নার সুমিষ্ট কণ্ঠের সুরলহরী।

গোস্বামী সাহেব পত্নীর পাণ্ডুর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন,—যাওয়ার অর্থ আমি কি বুঝবো? পালানো? সুগভীর ঘৃণায় কাহারো নাম অবধি তিনি উচ্চারণ করিলেন না।

মিসেস্ গোস্বামী কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না।

পত্নীর চোখের দিকে চাহিয়া তীব্র শ্লেষে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—কথাটা এখনো তুমি বিশ্বাস করছো না? না করবারই কথা! তুমি তার মা।

স্বামীর এই কঠিন বিদ্রূপে মিসেস্ গোস্বামী উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সব কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন, শুধু মা বলিয়াই পুত্র সে-সব কথার প্রতিবাদ তোলে নাই, স্বামীও নিরুত্তর ছিলেন। সাংঘাতিক অভিযোগে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। পত্নীর অসহিষ্ণু মূর্ত্তির পানে শুধু তাকাইয়া বলিয়াছিলেন,—দেখো, কথাগুলো যেন রত্নার কাণে না ওঠে।

এই একটি কথায় যেন গোস্বামী সাহেব তাঁহার সব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন! এমনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। মাতা ও পুত্রের বিরোধ মনোমালিন্যের কোন উদ্দেশও তিনি রাখেন নাই। সেই তিনিই আজ বোমা-বিস্ফোরণের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছেন। মহারুদ্র যেন জটাজাল ছিন্ন করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন।

মিসেস্ গোস্বামী ভয়ে আতঙ্কে পলকে যেন পাথর হইয়া গেলেন।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বুঝেছি লীলা, কিছু বলা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে! আর সে কি ব্যবস্থা, তাও আমি জানি!

গোস্বামী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস্ গোস্বামী চকিত স্বরে কহিলেন,—কি করবে?

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—এখন করবার বিশেষ কিছু নেই! এইটুকু শুধু করবো, যাতে তারা দূরে না পালাতে পারে।

আকুল কণ্ঠে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—অর্থাৎ?

শ্লেষ-জড়িত হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—পুলিশের সাহায্য নেবো!

ব্যাকুল হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—পুলিশ! পুলিশ কি করবে?

দৃঢ় কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—করবে। পুলিশকে আমি এখনি ফোন্ করবো। তার গাড়ীর নম্বর দিয়ে বলবো দু'জনকে এ্যারেষ্ট করতে।

গোস্বামী সাহেব পাশের ঘরে গিয়া ফোনের রিসিভার ধরিলেন। মিসেস্ গোস্বামী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—করছো কি! চারি দিকে ঢী-ঢী পড়ে যাবে। উঁচু মাথা হেঁট হবে!

কটু কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তবে কি করতে বলো তুমি?

মিনতিতে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি তো জানো না, তারা সত্যি পালিয়েছে কি না।

ব্যঙ্গ-হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তাই না কি? তাহলে তোমার পরামর্শ?

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—পরামর্শ নয়। তারা যদি এখনি ফিরে আসে? হয়তো অনিল—

প্রদীপ্ত কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তার নাম করো না আমার সামনে! ক্রোধে গোস্বামী সাহেবের ললাটের শিরাগুলো স্ফীত হইয়া উঠিল।

কঠোর কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—ফিরে আসে, নিজের হাতে তাকে গুলী করে মারবো কুকুরের মত। তার পর ফাঁশি যাবো! মানুষের কাছে মাথা নীচু করে থাকার দায় থেকে মুক্তি পাবো।

মিসেস্ গোস্বামী জ্বলিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—ছেলেকেই শুধু দোষ দিয়ো না! তোমার বন্ধুর মেয়ে—তার বুঝি দোষ নেই? কি সাপই তুমি ঘরে এনেছিলে!

গোস্বামী সাহেব হতবাক্ হইয়া ক্ষণকাল পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন,—তোমার যোগ্য উত্তর বটে! গরীব গৃহস্থঘরের একটা মেয়েকে তোমার হাতে মানুষ হতে দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, হাতে দিয়েছি, আমি নিশ্চিন্ত। তার চমৎকার পরিণাম হলো! ছি-ছি লীলা, তুমি এমন কথা বলবে, এ আমি স্বপ্নে ভাবিনি!

মন্ত্রাভিভূত ভুজঙ্গিনী যেমন উদ্যত ফণা মাটীতে লুটাইয়া দেয়, লজ্জায় ধিক্কারে মিসেস্ গোস্বামী তেমনি ভাবে মাথা নীচু করিলেন,—কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না।

মা হইয়া গর্ভে যাহাকে ধরিয়াছেন, নিজের লাঞ্ছনার মধ্যেও সেই স্নেহনিধিকে শত বাহু-বিস্তারে বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিতে তিনি বাধ্য। রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই! সেখানে বিবেক নাই, ক্ষমা নাই, অধর্ম্ম নাই! বুঝি ভগবানের বিচারও নাই! আছে শুধু মায়ের বুকের উদ্বেলিত স্নেহ! সেই অক্ষয় কবচে স্নেহনিধিকে আবরিত করা মাতৃ-ধর্ম্ম! মায়ের চোখে বিশ্ব-সংসারের মান-অপমান তখন তুচ্ছ!

এতখানি ভৎর্সনার পর মিসেস্ গোস্বামী কথা কহিলেন, এবং সে কথা ভীরু অনুনয় নয়! কহিলেন,—বিচার পরে করো। কিন্তু পুলিশকে কিছু জানাতে দেবো না!

শ্লেষ-বিজড়িত স্বরে গোস্বামী সাহেব কহিলেন;—কি করবে?

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এমন করে তো সে উপায় পাওয়া যায় না। এতে শুধু দু'টো অবুঝ প্রাণীর অনিষ্ট ছাড়া—আর কিছু হবে না।

তবে কি এখন চুপ করে থাকতে হবে?

—হ্যাঁ, তাই। তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক জন মেয়ে তোমার হাতে রেখে গেছে; তোমার এ উত্তেজনা সেখানে কি সঙ্কটের সৃষ্টি করবে, সে দিক্‌টাও ভাবা উচিত।

গোস্বামী সাহেব উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন স্ত্রীর পানে।

—এ কি, তুমি এত ঘামচো? কাঁপচো যে,—শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো। কল্পনা—কল্পনা, ফ্যানের রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দাও।

স্বামীর হাত ধরিয়া মিসেস্ গোস্বামী ত্বরিতে তাহাকে কাছে ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া দিলেন।

ফ্যানের রেগুলেটার বাড়াইয়া কল্পনা কহিল—নার্ভস শক। ডাক্তারকে ফোন করি, মাসিমা।

৪৪

লছমন্ দু'মাসের বেশী ছুটী ভোগ করিতেছে। অমিয়কেও ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। সে দিন সকালে নূতন বেয়ারাকে ডাকিয়া অমিয় কহিল,—রামদীন, লছমনকো কহো, তিন রোজকা অন্দর কাম নেহি উঠানে নোকরী ছুট যায়েগা। বলিয়া সে আদালতের পোষাক পরিতে লাগিল।

সে দিন একটা নারী-হরণের মকর্দ্দমার রায় দিবার কথা ছিল। সারা রাত ধরিয়া অমিয় সেই মকর্দ্দমার কথা চিন্তা করিয়াছে। মনে মনে যত বার আলোচনা করিয়াছে, মন তত বারই সায় দিয়া বলিয়াছে, কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থায় যদি এ দুষ্কৃতি নিবারণ করা না হয়, তবে এ মহাপাপ দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাইবে! মানুষের এই বর্ব্বরতা কঠিনতম শাস্তির দ্বারাই সমাজ হইতে দমিত—দূরীকৃত করা উচিত।

সরকারে তাহার সুনাম আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-রূপে অমিয়র মনের কোণে নূতন একটা দ্বিধা জাগিতেছিল। মন বলিতেছিল, জীবনটা কেবল মানুষকে দণ্ড দিতেই কাটিল! যে দিন সর্ব্বনিয়ন্তার কাছে তাহার নিজের বিচারের দিন আসিবে, সে দিন অমিয়র বুকের গোপন ভালোবাসা, অন্তরের সুগভীর পিপাসা, চিত্তের একান্ত লুকানো বাসনা তো সেই সর্ব্বদ্রষ্টার দৃষ্টির অগোচর থাকিবে না! কায়িক নয়; শুধু মানসিক বলিয়া তিনি কি মনুষ্য-জীবনের এই অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবেন?

রত্নার মুখ মনে ফুটিয়া উঠিল। অমিয় ভাবিল, এত দিনে রত্না হয়তো তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। অমিয় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু বুকের বেদনা তবু ভারী হইয়া উঠিল।

অপরাহ্ণে কোর্ট হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে সে লাইব্রেরী-গৃহে প্রবেশ করিল। ক্লাবে যাইতে ইচ্ছা হইল না। ফাল্গুনের পুষ্প-সুরভিত সন্ধ্যা মনে কেমন উদাসতা বহিয়া আনিতেছিল। উন্মনা চিত্তের বিনোদনের জন্য সে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে বসিল।

ক'দিন ধরিয়া মনে করিতেছিল, নূতন একখানা বই লিখিবে। এক ফিল্‌ম-ডিরেক্টর বন্ধু ক'খানা পত্রে জোর তাগিদ দিয়া সিনেমার জন্য বই চাহিয়াছে। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী নাটকের সে অভিনয় দেখিয়াছে; দেখিয়া গ্রন্থকারের সৃজনী-প্রতিভা বুঝিয়া বলিয়াছিল, হাকিমী গণ্ডীর বেড়ায় এত বড় প্রতিভা সে নষ্ট হইতে দিবে না।

পুস্তক-রচনায় অমিয় মনোনিবেশ করিল। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া সরিয়া আজই মধ্যাহ্নে মকর্দ্দমার যে রায় দিয়াছে, মন সেই রায়ের মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইল।

পাঁচ জনে মিলিয়া কঠিন অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের দুষ্কৃতির তারতম্য এবং অপরাধের গুরুত্ব হিসাব করিয়া তিন জন অপরাধীকে দুই বৎসর, দুই জন সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবাকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া আসিয়াছে। অমিয়র আক্রোশ খুব বেশী হইয়াছিল, সেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবকদ্বয়ের উপর।

ঘটনা—অভাবগ্রস্ত গৃহের সুন্দরী তরুণীকে অর্থের বিনিময়ে তিন জন নীচ ব্যক্তির সাহায্যে চুরি করিয়া আনিয়া প্রলোভনে তাহাকে বিপথগামিনী করা।

রায়ে অমিয় মন্তব্য করিয়াছিল,—যাহারা ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্র সংসর্গে বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্জ্জনে ধনী গৃহের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাহারা যখন গোপনে এত বড় দুষ্কৃতি করে, এত বড় ষড়যন্ত্র-জাল সৃষ্টি করে, নিরীহ অবলার সর্ব্বনাশ-সাধনে মত্ত হয়, তখন বহু বারের দাগী চোর-ডাকাত বা খুনি-আসামীও নীচাশয়তায় তাহাদের সমতুল্য হয় না। সেই জন্যই এই অপরাধীদের পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত ক্ষমা-প্রার্থনা মঞ্জুর করা অসম্ভব! এ স্থলে ক্ষমা করার অর্থ আত্মছলনা! এই সব অপরাধীর সমুচিত শাস্তি প্রয়োজন।

অমিয় এখন তাহার বিচার-বুদ্ধির সমর্থন করিল। সম্পদ বিভব-সম্মানে লালিত ভাবিয়া বিচার করিতে বসিয়া করুণা প্রদর্শন চরম অবিচার! সেই সুদর্শন-মূর্ত্তি দু'টির পানে চাহিয়া চিত্তকে কোমল করিলে বিশ্ব-বিচারকের কাছে সে অপরাধী হইত।

খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া অমিয় তার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের উপর মন দিল।

সকালের ডাকে-আসা চিঠি বেহারা আনিয়া টেবলের উপর রাখিল। জানাইল, দিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে।

—উল্লুককা মাফিক্ কাম্ কিয়া! বলিয়া অমিয় পত্র তুলিয়া লইল।

খামের উপর মায়ের হস্তাক্ষর। ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিল। এবার চলিয়া আসিবার পর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, মা তাহাকে একখানাও চিঠি লেখেন নাই। যে ক'খানা চিঠি সে বাড়ী হইতে পাইয়াছে, তাহার কতকগুলা পিতার লেখা, বাকী সহোদরের।

অমিয় চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। অক্ষরগুলা দৃষ্টিপথে যেন কালো সাপের মত বিসর্পিত হইয়া রহিল।

চশ্‌মা খুলিয়া ভালো করিয়া মুছিয়া আবার চোখে আঁটিয়া অমিয় পত্রখানা আবার পাঠ করিল। কিন্তু সেই একই ভাষা,—একটি সাংঘাতিক অর্থ প্রকাশ করিতেছে! কোন মতেই আর তাহার বদল হয় না!

মা লিখিয়াছেন,—কালসাপিনী রত্না তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল—দুধ-কলা দিয়া তাহাকে তিনি পুষিয়াছিলেন; অনিল সেই ভুজঙ্গিনীর সহিত অন্তর্হিত! কাহারো উদ্দেশ নাই!

মায়ের পত্রে অমিয় আরও জানিল,—পিতার ব্লাড্‌প্রেসার সেই কাল-রাত্রিতে অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়! এখন তিনি শয্যাশায়ী। চিকিৎসা চলিতেছে। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে কল্পনাই শুধু কাণ্ডারীর মত তাঁহার সকল কাজে সহায়তা করিতেছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাহারও কাছে তিনি নিজের কথা বলিতে পারেন না। কল্পনা বলে, অনিলকে আহ্বান করিয়া খবরের কাগজে একটি নোটিশ দেওয়া হোক! কিন্তু তাহা সমীচীন হইবে কি না? উচিত কি না? অমিয়র কাছে তিনি পরামর্শ চাহিয়াছেন।

চিঠি শেষ করিয়া অমিয় কিছুক্ষণ নিশ্চল রহিল।

অনিলের এমন দুর্ম্মতি? এ যে কল্পনাতীত! অনিল আবেগ-প্রিয়, চপল, সবই অমিয় জানে, তবু সে যে ভদ্র, তাহাতে অমিয়র

এতটুকু সংশয় ছিল না। আজ বিচার-আসনে বসিয়া অমিয় যে দুরাচারদের শাস্তি দিয়াছে, নিজের ভাই তাহাদের চেয়ে কোন অংশে এতটুকু কম নয়—এ যেন অমিয় কোন মতে আর বলিতে পারে না!

অমিয়র মনে হইল,—বুকে যেন জ্বলন্ত শূল বিঁধিয়াছে!

খানসামাকে অমিয় জানাইয়া দিল, আজ ডিনারে বসিবে না।

সকাল সকাল শয়ন-কক্ষে আসিয়া আলো নিবাইয়া অমিয় শুইয়া পড়িল।

বিনিদ্র রজনী! পিতামাতার বেদনাভরা মূর্ত্তি তার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। অনিলের অধঃপতন ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মত মনে বিদ্ধ হইয়া মনকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট যে আর একটি প্রাণী আছে, তাহার মুখচ্ছবি, তাহার নামটুকু পর্য্যন্ত সে আর স্মরণে আনিতেছিল না! অথচ আজ সকালে ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে রত্নার মুখখানি শুধু স্মৃতিপথে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইয়া অমিয়কে আনমনা করিতেছিল। যে মোহপাশ হইতে মুক্তি পাইতে গৃহের সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, অতীতের সেই সুখময় দিনটিকে কবে কেমন করিয়া আবার ফিরিয়া পাইবে! সেখানে নিদাঘ-মধ্যাহ্নের জ্বালা নাই, শ্রাবণের কাজলা-মেঘ নাই, শরতের অম্লান আলোকোজ্জ্বল দিনের মত যাহার অন্তর-বাহির আলোকময়!

কিন্তু অকস্মাৎ কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা লইয়া রুদ্র যেন তাণ্ডবে মাতিয়া ধূম্রধূসর জটার তাড়নে দিক্‌বিদিক্‌ আঁধার করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সারা রাত্রি ধরিয়া অমিয়র মাথায় চিন্তার ঝড় বহিয়া চলিল। অস্থির চিত্তে বিছানায় কেবলই এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। রাত্রি-শেষে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় উষ্ণ মস্তিষ্কে শীতলতার স্পর্শ লাগিতেই বিমুখ চিত্তে সহসা রত্নার কথা জাগিয়া উঠিল। সেই প্রথম দিনের দেখা সলজ্জ রক্তিম মুখ, লজ্জানত দৃষ্টি লইয়া মনে দপ্‌ করিয়া ভাসিয়া উঠিল, মনে জাগিল,—শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের আশ্রয়ে, স্নেহচ্ছায়ায় পিতা তাহার গভীর বিশ্বাসে কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন—সে কন্যার এই পরিণাম! তীব্র আলোক-দ্যুতিতে কাহার না চোখ ঝলসাইয়া যায়? জীবনে যে ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখে নাই, তরুণ যৌবন যখন মনে ভোগের স্পৃহা জাগাইয়া তোলে, সে সময় কে এমন দৃঢ়চেতা আছে যে, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে পদস্খলিত হয় না? হয়তো এমন করিয়া সে গড়াইয়া পড়িত না,—যদি অমিয়র তরফ হইতে এতটুকু তাহার বাঁধন থাকিত! অমিয় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া—না, থাক সে কথা।

প্রত্যুষে নিত্যকার মত অমিয় বেড়াইতে বাহির হইল। এবং সকালে ফিরিয়া যখন চায়ের টেবলের সম্মুখে বসিল তখন অকস্মাৎ সমস্ত তিক্ত চিন্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া মন প্রসন্ন হইল।

লছমন্ আসিয়া সেলাম জানাইয়া নত মস্তকে মনিবকে অভিবাদন করিল।

মানুষের শত ভাবনার মধ্যেও ব্যবহারিক জগতের এই দিকটা মানুষ কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষ নিজের প্রয়োজনগুলা পরের সাহায্য ব্যতীত কোন মতেই মিটাইতে পারে না! জন্ম হইতে যাহাদের এ অভ্যাস অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া আছে, সেই পরমুখাপেক্ষী দলের নিকট যাহারা সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ অভাব মিটাইয়া সামান্য কাজে অনুক্ষণ শৃঙ্খলা আনিয়া দেয়, তাহারা যে কতখানি প্রিয় হয়, চিত্ত তাহাদের অভাবে যেমন বিরক্তি বোধ করে সম্মুখে পাইলে তেমনি উৎফুল্ল হয়।

সস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল,—ঘরমে আচ্ছি হ্যায়? সাদিওদি হো গিয়া?

হাঁ জী। বলিয়া লছমন্ কহিল,—ছোট সাহেবকো সাদি বি হো চুকা হুজুর?

ভৃত্যের কথাটি মনিব অবধারণ করিতে না পারিয়া বিস্মিত নেত্রে তার পানে তাকাইল। এবং প্রশ্ন করিয়া পরিচয়ে যাহা জানিল,—তাহার মর্ম্ম।

রায়পুরে লছমন্ তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। সেখানে সরকারের ডাক-বাংলার চাপরাশী তাহার নূতন সম্বন্ধী! তাহার অসুস্থতা-হেতু নূতন ভগ্নীপতি শ্যালকের তল্লাসীতে গিয়া ছোট সাহেব এবং বোম্ মিসিবাবাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া অমিয় সব কথা শুনিল। এবং নিজের যাহা জানিবার খুঁটানাটী প্রশ্নে তাহাও একে একে জানিয়া লইল।

আদালতের পোষাক পরিয়া একখানা টেলিগ্রাম লইয়া অমিয় মাকে টেলিগ্রাম করিল—চিন্তার কারণ নাই, তাহারা আমার কাছে আছে। শীঘ্র দেখা করিব।

মোটরে উঠিয়া অমিয় সোফারকে আদেশ করিল,—ষ্টেশন!

৪৫

সারা দিন যে-বৃষ্টি টিপ্‌টিপ্ করিয়া দিনের আলোকে পাণ্ডুর করিয়া রাখিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারকে অসময়ে গাঢ়তর করিয়া সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর বুকে চাপিতে সে নামিয়া আসিল।

রুদ্ধ-বাতায়ন কক্ষে বসিয়া দু'টি নর-নারীর চোখে বাহিরের এই দুর্য্যোগের চেয়ে হৃদয়ের দুর্জ্জয়তা যেন অনেক বেশী করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল।

রত্না কহিল,—যদি আমায় বিয়ে করবে না তো এত দূরে আমায় নিয়ে এলে কেন?

রত্নার দুই চোখে অশ্রু উপছাইয়া পড়িল। কিন্তু আজ তাহার চোখের জলে অনিল আর্দ্র হইল না! স্থির চক্ষে রত্নার পানে চাহিয়া সে অবিচল রহিল।

অনিল কহিল,—আমি তোমায় বিয়ে করবো, এমন আশা দিয়ে আনিনি তো। কোন রকমে প্রলুব্ধ করেও তোমায় আনিনি! তুমিই পালাতে চেয়েছিলে, মুক্তি চেয়েছিলে রত্না!

এমনি হয়! এমনি করিয়াই মন কঠিন নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। মন যখন বিবেকের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিতে থাকে, তখন সে ক্রমে এমনি কঠিন হইয়া ওঠে।

তাহা না হইলে, এই বান্ধবহীন নির্জ্জন প্রবাসে নিভৃত একটি কক্ষে নিশীথ রাত্রে মুখোমুখী দু'টি নর-নারী বসিয়া পরস্পরের দোষ-গুণ বিচারে বসিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝাভরা তিমির রাত্রে অভিশাপগ্রস্তের মত উভয়ের চিত্তই জ্বালা-ভরা দুঃখময়। সত্য ও সুস্পষ্ট উত্তরে একটা কঠিন শক্তি নিহিত থাকে; এক কথায় প্রকৃত চেহারা চোখের উপর উদ্ঘাটিত হয়!

অনিলের উত্তরে রত্নার বুকের মধ্যে রক্তের স্রোত নিমেষে হিম

হইয়া গেল। অবিবাহিত একত্র জীবন-যাপনের কদর্য্য মূর্ত্তি আর কোথাও যেন এতটুকু আব্রু দিয়া নিজেকে গোপন রাখিল না! পাংশু মুখে নির্ব্বোধের মত ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া অনিলের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—কি বলছো তুমি?

অনিল কহিল,—কিছু মিথ্যে বলিনি রত্না। তোমাকে বিবাহ করা নানা কারণে আমার পক্ষে অসম্ভব! আমাদের বর্ণ, সামাজিকতা এক নয়। আমার বাপ-মা,—কথা শেষ না করিয়া অনিল থামিল।

কিন্তু বর্শার সুতীক্ষ্ণ কঠিন ফলা যাহার মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হয়, মৃত্যু-যাতনা সেই কাতর মুখেই সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করে। নির্নিমেষ নয়নে অনিল সেই শোণিত-লেশহীন পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুমি ভাবচো, আমি নির্দ্দয়—আমি নিষ্ঠুর?

অকস্মাৎ রত্না গর্জ্জিয়া উঠিল। কহিল,—তার চেয়ে ঢের বেশী—তুমি আমায় হত্যা অবধি করতে পারো। এমনি নিষ্ঠুর! এমনি রাক্ষস! তোমায় এখন আমি ভাবচি—

অনিল শিহরিয়া উঠিল। রত্নার মুখে এমন তীব্র ভৎসনা, মর্ম্মান্তিক তিরস্কার কোন মুহূর্ত্তেই সে আশা করে নাই। বুকে দুর্জ্জয় ক্রোধ তরঙ্গিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িল।

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া অনিল কহিল,—আমি তোমায় হত্যা করতে পারি, এই কথা তুমি বলছো!

দৃঢ় কণ্ঠে রত্না কহিল,—হ্যাঁ, বলছি—মানুষকে বিষ খাইয়ে মারা, গুলী করে মারা, তারই নাম শুধু হত্যা নয়! এই তিল-তিল করে মারা, এ কি মরণ নয়? না, যে মারে, সে খুনী নয়? তুমি তোমার সমাজ, তোমার বাপ-মা,—কিন্তু আমারও সেটা আছে, তুমি ভুলে যাচ্ছো! বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় রত্না টেবলের উপর মুখ রাখিল।

অনিল স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার দৃপ্ত দৃষ্টি রত্নার পানে তুলিয়া সকরুণ হইয়া উঠিল। এবং এক সময়ে আসন ছাড়িয়া রত্নার কাছে গিয়া তাহার মাথা তুলিতে গেল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া রত্না মুখ তুলিল। তীব্র স্বরে কহিল,—না, না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না।

আহতের মত অনিল দু'পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। শ্লেষের সহিত কহিল,—তোমায় ছুঁলে তোমার জাত যাবে! সে জ্ঞান তোমার আছে?

অনিলের বিদ্রূপে রত্না অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পাইল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল! সত্যই ধর্ম্ম বলিতে স্ত্রীলোকের সব চেয়ে যাহা শ্লাঘার বিষয় আদরের সামগ্রী, পুরুষের কাছে যাহা শ্রদ্ধার বস্তু! নারীর সেই সেই সবচেয়ে বড় দিক্‌টার কথা রত্না কোন দিনই ভাবিতে শেখে নাই! তাই অনায়াসে এত বড় আঘাত অপরে তাহাকে দিতে পারিল। মুখে ও-কথা বাধিল না। অথচ শুধু নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই না সেই মানুষকে অনুরোধ নয়, মিনতি করিয়াছিল,—তাহাকে বিবাহ করিতে।

বাহিরে ঝনঝনা কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া গেল। রাত্রির মত্ততা যেন সীমাহীন হইয়া বিশ্ব প্লাবিত করিতে চাহিল!

রত্না নিথর! নিস্পন্দ! তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ, থামিয়া গিয়াছে।

অনিল ডাকিল,—রত্না—

রত্না চাহিয়া দেখিল।

অনিল কহিল,—চলো, আরো দূর-দূরান্তে আমরা চলে যাই—সেখানে গিয়ে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবো।

রত্না কহিল,—আরো দূরে? সে নির্ব্বান্ধব রাজ্য কোথায়? যেখানে আমাকে নির্ব্বাসন দিয়ে সুনাম নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, তোমাকে মুক্তি দেবো। এখন শুতে যাও! বলিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে, মর্ম্মদাহে মানুষ যত উগ্র হইয়া উঠুক তবু স্বভাব-কোমল অন্তর ধীরে ধীরে অশ্রুজলে ভরিয়া যায়! আপনার সমস্ত ক্ষতি ভুলিয়া, বিমুখতা ভুলিয়া মর্ম্মান্তিক কাতরতায় বিহ্বল হইয়া পড়ে, অন্তরে মমতা জাগে।

অনিল ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। রত্না তাহাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিল; দু'দণ্ড ভাবিতে অবসর দিল না। তাহার পর সে অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অনিলের মনের গোপন কোণে যে কলুষিত বাসনা পিপাসাতুর হইয়া উঠিল, হঠাৎ নৈরাশ্যে সে মর্ম্মাহত হইল। রত্না যেন অনিলের কাছে দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মত ফুটিয়া উঠিল। এবং যতই সে তাহার মর্ম্ম অবধারণের চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই সে উপলব্ধি করিল, ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে রত্না তাহার সহিত পলাইয়া আসিল। অনিলের জন্য রত্নার মনে এক ফোঁটা ভালোবাসা নাই। চায় না সে অনিলকে। তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া যে-মানুষটি রহিয়াছে, তাহারই উপর প্রচণ্ড অভিমানে সে এমন একটা ভয়ানক ভুল করিয়া বসিয়াছে। এবং এই যে বিবাহের প্রস্তাব—এ শুধু একটা সুনাম রক্ষার বাসনা! নহিলে অনিলের উপর রত্নার এতটুকু স্পৃহা নাই।

মানুষ যখন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে একবিন্দু ভালোবাসা তাহার জন্য কোথাও সঞ্চিত নাই,—তখন সে-ও কঠিন হইয়া ওঠে, নিক্তির মাপে বুঝিয়া লয় আপনার স্বার্থ। সেই জন্যই রত্নাকে বিবাহ করা অনিলের পক্ষে অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব!

কিন্তু তবু সেই রত্নার এ যে কত-বড় মর্ম্মান্তিক ভুলের অনুতাপ-অশ্রু, এটুকু বুঝিয়া অনিলের চিত্ত বিগলিত হইল।

স্নিগ্ধ স্বরে সে ডাকিল,—রত্না, আমরা দু'জনেই ভুল করেছি। কিন্তু—

মুখ তুলিয়া ঘৃণিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—থাক! তোমার দেওয়া কোন মীমাংসার পথই আমি গ্রহণ করবো না।

রত্নার এই অবজ্ঞা তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ন্যায় অনিলকে নিপীড়িত করিল, মর্ম্মাহত করিল! অকস্মাৎ বুকের মধ্যে রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। শ্লেষমিশ্রিত হাস্যে সে কহিল,—তাই না কি? আমি এত তুচ্ছ? কিন্তু আমার মাথায় এ আগুন কে জ্বেলে দিয়েছিল? রত্না তুমি!

রত্না অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল।

উদ্দীপ্ত স্বরে অনিল বলিতে লাগিল—স্বীকার করি তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ভালোও বাসতুম। কিন্তু প্রকাশ করতুম না! প্রকাশ করতে সাহস করিনি! কিন্তু আমি কি দেখিনি, আর এক জনকে দেখে তুমি কি-রকম

বিহ্বল হয়েছিলে! তাকে পাবার জন্তে কি তোমার সাধনা! আমি বুঝতে পারতুম, দাদার জন্ত দিনে দিনে তুমি অধীর হয়ে উঠছ। তাই আস্তে আস্তে তোমাদের মাঝখান থেকে সরে যাচ্ছিলুম। পরস্পরকে তোমরা ভালোবেসেছ, বুঝেছিলুম। সরেও যাচ্ছিলুম, কিন্তু শেষে দাদাই তোমার জন্তে চলে গেল। কিন্তু তুমি? নিজে শান্ত হতে পারলে না, ঢুকলে অলকের আহ্বানে থিয়েটার করতে। তাতেও বাধা দিইনি! তার পর এই বুকে তুমিই না এক দিন মাথা রেখে কেঁদেছিলে! এর মধ্যে ভুলে যাচ্ছ! আমার পায়ের উপর পড়েই তুমি মুক্তি চেয়েছিলে, কৈ, সে দিন তো ভাবোনি, আমি তোমায় হত্যাও করতে পারি। এত ঘৃণিত আমি! এত নীচ! আজ আমার উপর চাপাচ্ছ যে কলঙ্ক, এ সব সত্য?

রত্নার মুখে একটা স্বরও বাহির হইল না। পাষাণ-প্রতিমার মত সে শুধু বসিয়া রহিল।

অনিল কহিল,—তোমার পথ এখনও খোলা আছে! তুমি ফিরতে পারবে। কিন্তু আমি? আমার বাবাকে আমি চিনি,—হয় আমাকে জেলে যেতে হবে, না হয় আত্মহত্যা! কিন্তু মুখে চুণকালি মেখে জেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু আমার ঢের বাঞ্ছনীয়।

চমকিয়া রত্না কহিল,—মৃত্যু!

দৃঢ় স্বরে অনিল কহিল,—হ্যাঁ, মৃত্যু! এক দিন শীকার করে আনন্দ পেতুম। এখন সেই হাত দিয়ে গুলী চালাবো নিজের এই বুকে। এই বুকেই তুমি মাথা রেখেছিলে! সে দিন তো এত শুচি-অশুচির জ্ঞান ছিল না! বলিয়া বিদ্রূপের হাস্যে অনিল কহিল,—শীকার ধরতে চেয়েছিলে,—না?

রত্না চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল,—অনিল দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—না রত্না, আর তোমায় কটু কথা বলবো না। আমিও পাগল হয়ে গেছি! আমার অবস্থাটাও এক বার ভেবে দেখো।

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আমি শুতে চললুম। তুমি ভালো করে ভিতর থেকে দোর বন্ধ করে দাও। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অনিল কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

ভাবের মানুষ

শ্রমিক বণিক অনেক আছে, ধনিকেরও অভাব নাহি,
কাজের লোকে দেশ ভরেছে! অকেজো লোক এখন চাহি।
ভাবুক প্রেমিক অলস বটে—
দেবার কিছু নাই নিকটে,
পণ্য-বিহীন সে সদাগর বেড়ায় রঙিন বজ্‌রা বাহি।

আকাশ ঘিরে সোহাগ ছড়ায় কাজ তো শুধু স্বপন বোনা!
নদীর স্রোতে ভাসিয়ে সে দেয় মন্দাকিনীর মীনের পোনা।
চাঁদের সুধা নিত্য কাড়ে,
কল্পদ্রুমের ফল সে পাড়ে,
ধরাকে দেয় পাগল করে নূতনতর কি গান গাহি।

করে নাকো কিছুই তারা, কিন্তু তারা করায় সবি!
খেয়ালী গায় ধ্রুপদ খেয়াল আঁকে গিরি-গুহায় ছবি।
জাত্‌কে করে মনের মত—
অলঙ্কৃত সমুন্নত
ধরাকে দেয় ভঙ্গী নব—বাদশাহ নয়, খেয়াল-সাহী।

ভাবোন্মাদের গোষ্ঠী তারা—সোনার কাঠি তাদের হাতে।
ভুবনকে দেয় রঙিন করে সেই প্রতিভার আলোক-পাতে।
তারাই ভগবানের পানে
পতনশীল এই ধরায় টানে,
তাঁর করুণা নামিয়ে আনে অকেজো সেই সম্প্রদায়ই!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বপ্ন ও বিস্মৃতি

বসন্তের রাত্রি যেন পথ-ভোলা মৌমাছি উৎসুক,
এখনি আসিল কাছে এই দণ্ডে কোথা যাবে উড়ে!
কাজ যদি নাহি থাকে, বসো কাছে, ফিরায়ো না মুখ—
আমি কথা, তুমি গান, প্রাণ দাও মোর বীণা-সুরে।

একখানি ছবি যেন এই সন্ধ্যা নীলাভ আকাশ—
প্রচ্ছন্ন অরণ্য-বাঁকে নদীপ্রান্তে ঢালু বালুচর;
মেঘেরা বলাকা গাঁথি উড়ে যায় যেন বুনো হাঁস,
ওই শোনো, কথা কয় অরণ্যের পল্লব-মর্মর।

তুমি-আমি দু'টি তীর, প্রেম যেন নদী-জল-স্রোত—
সংকীর্ণ সীমার মাঝে স্বপ্ন দেখি সাগর-মোহনা;
সেখানে হৃদয় মেশে, মিশিয়াছে অনন্ত জগৎ,
তুমি-আমি ক্ষণস্থায়ী, এ মুহূর্ত্ত তবু ভুলিব না!

আকাশে উঠেছে চাঁদ, স্বপ্নময়ী বকুল-বীথিকা,
চলো যাই এই বেলা কুড়াইব শিথিল কুসুম;
যে ফুল গাঁথিনু আজ কাল ভোরে শুকাবে মালিকা,
প্রেমের সমাধি কাল, আজ চোখে আনিয়ো না ঘুম।

বসন্তের রাত্রি যেন পথ-ভোলা মৌমাছি-চঞ্চল—
হাসির আড়ালে আনে বিদায়ের ম্লান অশ্রু-জল।

শ্রীকরুণাময় বসু

গীতায় সাধনক্রম

গীতার আঠারটি অধ্যায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে (প্রথম ষট্‌ক) কর্ম্মের কথাই বেশী আছে। দ্বিতীয় ছয়টি অধ্যায়ে (দ্বিতীয় ষট্‌ক) ভক্তির কথা এবং তৃতীয় ছয়টি অধ্যায়ে (তৃতীয় ষট্‌ক) জ্ঞানের কথা। প্রথমে কর্ম্ম, তাহার পর ভক্তি, তাহার পর জ্ঞান। ইহাই জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্রম। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনা প্রভূত সঞ্চয় আছে এরূপ অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই একেবারে ভক্তি বা জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি কর্ম্মকে তুচ্ছ মনে করেন এবং একেবারে ভক্তি বা জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এ জন্য ভগবান বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

—গীতা ৩।৪

"কর্ম্ম না করিলেই যে জ্ঞানলাভ করা যায় ইহা যথার্থ নহে। কেবলমাত্র কর্ম্ম পরিত্যাগের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।"

"কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" —গীতা ৩।৮

"কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ"।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

—গীতা ৩।১৭

"যে ব্যক্তির আত্মা ব্যতিরিক্ত কোনও বহির্বিষয়ে আসক্তি নাই, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, কেবলমাত্র এইরূপ ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।"

আত্মা ব্যতীত কোনও বাহ্য বিষয় চাহেন না, এরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি জগতে বিরল। প্রায় সকল ব্যক্তিরই বাহ্য বস্তুর প্রতি অল্প বা বেশী আকাঙ্ক্ষা আছে। এ জন্য প্রায় সকল ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্ম করা প্রয়োজন।

সংসারে যদিও আমরা সর্ব্বদাই সুখের আশা পোষণ করি, তথাপি সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণই অধিক। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সংসারে সুখের আশা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে নানা প্রকার দুঃখভোগ অপরিহার্য্য।

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্"

—গীতা ১৩।৮

জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখের কথা সর্ব্বদা অনুশীলন করিলে চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, বৈরাগ্য না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিলে চিত্ত মলিন হয়। মলিন চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় না।

গীতায় ভগবান সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছেন,—

"অনিত্যং অসুখং লোকং" —গীতা ৯।৩৩

এই সংসার অনিত্য এবং দুঃখময়।

"দুঃখালয়মশাশ্বতং" —গীতা ৮।১৫

সংসার দুঃখের আলয়, কারণ, সংসার অনিত্য। সংসারে আসিলেই দুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করা প্রয়োজন। একমাত্র ঈশ্বরলাভ করিতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করা যায়।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

—গীতা ৮।১৫

"মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিয়া পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং দুঃখপূর্ণ ও অনিত্য সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।"

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার উপায় তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা জানা।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

কেবলমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, মোক্ষলাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাহা জানা অতিশয় দুরূহ। বাক্য তাঁহার পরিচয় দিতে পারে না, মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না। তিনি "অবাঙ্মনসগোচর"। ঈশ্বর অনন্ত। আমাদের বুদ্ধি ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নাই যে, অনন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে। ঈশ্বর যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদিগকে দেন তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপা হয়, তখন তিনি আমাদিগকে এরূপ শক্তি প্রদান করেন, যাহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। আমরা যদি সংকল্প করি যে, সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিব, তাহা হইলেও পদে পদে তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকি। কারণ, সংসারের সুখ-দুঃখে মগ্ন হইয়া তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই। আমরা যে সংসারের সুখ-দুঃখে বিচলিত হই, তাহার কারণ—আমাদের চিত্ত কাম-ক্রোধে পরিপূর্ণ। কাম এবং ক্রোধ মানব-চিত্তের মলিনতা। কাম-ক্রোধ দূর করিয়া চিত্ত নির্ম্মল না করিতে পারিলে হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হওয়া সম্ভব নহে। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দূর করিয়া চিত্ত নির্ম্মল করিবার উপায় কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন নিহিত আছে—(১) কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম করা উচিত এবং (২) কি ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত। কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, এ বিষয়ে গীতার নির্দ্দেশ এই যে,—যে কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাহা করা উচিত নহে।

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। গীতা ১৬।২৪

"কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।"

আমাদের মনে হইতে পারে যে, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, ইহা আমরা বিবেক (conscience) বা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারি। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। অনেক সময় যে-কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা

অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, আমাদের সকলের ই চিত্ত অল্লাধিক পরিমাণে রাগদ্বেষ দ্বারা অভিভূত এবং সে কারণে কখনও কখনও আমরা বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। শাস্ত্র শব্দের অর্থ বেদ এবং বেদমূলক ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ যথা—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানব কর্ত্তৃক রচিত নহে, তপস্যাপরায়ণ ঋষিদের চিত্তে বেদ সকল ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা মানব কর্ত্তৃক রচিত তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে। যাহা ঈশ্বর-প্রণীত অথবা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে না, অতএব শাস্ত্র অভ্রান্ত। এবং সে জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার পক্ষে শাস্ত্রই প্রমাণ।

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলে ইহজীবনে এবং মৃত্যুর পর সুখ প্রাপ্তি হয় ইহা সত্য। কিন্তু কর্ম্মযোগে যে ভাবে কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মের ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব —গীতা ২।৩৮

"হে অর্জ্জুন! সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সকলই সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর।"

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
—গীতা ২।৪৭

"তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে, কর্ম্মফলে অধিকার নাই।"

কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। সৎ-কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে বলিয়া সৎকর্ম্ম করা হইবে না, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হইবে। শাস্ত্র এই সকল কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, অতএব এই সকল কর্ম্ম করা আমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হইবে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
—গীতা ৩।১৯

অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যিনি কর্ম্মযোগী, তিনি নিজকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, আত্মার দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। অজ্ঞান হেতু আমরা দেহ-মন-বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি এবং নিজকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ —গীতা ৩।২৭

প্রকৃতির গুণ সকল দ্বারা কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হয়। অহঙ্কারের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে আমরা নিজদিগকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করি।"

আমি কর্ত্তা, এই বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত কামক্রোধহীন এবং নির্ম্মল হয়, সেই নির্ম্মলচিত্তে সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভজন করা সম্ভব হয়।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥
যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
—গীতা ৭।২৭-২৮

ইচ্ছা এবং দ্বেষ হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সকল প্রাণীর জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাহাদের পাপ দূর হয়, তাহারা অজ্ঞানমুক্ত হইয়া এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করে।

অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তিলাভ হয়। ভক্তির দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহা ভগবান্ ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যথা—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
—গীতা ৭।১৩-১৪

অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎ সমাচ্ছন্ন। এই সকল ভাবের ঊর্দ্ধে আমি অবস্থান করি; জীব এই সকল ভাবের দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আমাকে জানিতে পারে না। এই সকল গুণময় ভাবই আমার মায়াশক্তি, এই মায়াকে অতিক্রম করা অতি দুরূহ; যাহারা কেবল আমাকে ভজনা করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব গীতায় এইরূপ সাধন-ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—প্রথমে কর্ম্ম, তাহার পর ভক্তি, তাহার পর জ্ঞান। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অনাসক্ত এবং নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে নিরন্তর ঈশ্বর-ভজনা করা সম্ভব হয়, নিরন্তর ঈশ্বর-ভজনা করিলে ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে সংসারের সুখ-দুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ, এই সকল সুখ-দুঃখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অসার বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরেই তন্ময় হইয়া ইহজীবন অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)

গুণমুগ্ধ

ছাতায় মানুষ বাঁচায় আপন মাথা
উপকার তার অন্তরে রয় গাঁথা।

স্বীকার করিয়া লয় সবে তার দেনা
কালো বলে তাই করে নাকো কভু ঘৃণা।

যে-সরসী দেয় সুরভিত শতদল—
কেহ দেখে কভু তার পঙ্কিল জল?

মোহম্মদ নওলকিশোর যোগরাবী

সিদ্ধাই ও শ্রীরামকৃষ্ণ

"মা দেখালেন সিদ্ধাই আর বিষ্ঠা এক।" এই সিদ্ধাই অণিমা লঘিমা প্রাপ্ত্যাদি অষ্টবিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য নামে পরিচিত।

প্রত্যেক কর্ম্মের সাধন-সমাপ্তি যেমন তার পুরস্কার প্রদান করে, কর্ত্তার অভিলাষ সাফল্যমণ্ডিত করে,—সাধন—ভগবদারাধনার সুদীর্ঘ পথে সাধককৃত যত্নাঞ্জিত শ্রমও সেইরূপ তাঁহাকে ধারাবাহিকরূপে ঐ অষ্টবিভূতি-রূপ অমূল্য পুরস্কার-প্রদানে জয়যুক্ত করিয়া থাকে। এটি কর্ম্মের ধারা বা নিয়ম (Law of action)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "সাধু কখনও সিদ্ধাই চাইবে না, সিদ্ধাই মুক্তিপথের অন্তরায়।" গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

—সহস্র সহস্র মনুষ্যমধ্যে কেহ বা পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান-লাভে যত্ন করেন। আবার প্রযত্নকারিগণেরও সহস্র সহস্রের মধ্যে কেহ বা প্রাক্তন-পুণ্যবশে পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ হন।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পরিচ্ছদ এই শরীর-ধারণে অনেক কিছু বাসনা-কামনা—অহঙ্কারাদি ষড়্‌রিপু বহির্মিত্র অন্তঃশত্রুরূপে বাস করছে;—এদের প্রলোভন-কটাক্ষ এড়ানো বড় বড় যোগীদের পক্ষেও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে;—তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

সাধারণতঃ দেখা যায়, সিদ্ধাইকেই অনেকে যথাসর্ব্বস্ব (The highest goal of human life) জেনে তা লাভ করবার জন্য প্রাণপাত কঠোর সাধনা ও তল্লাভে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। যদিও শ্রীভগবানের পরিচ্ছদে "আত্মজ্ঞান" লাভ করবার বাসনায় প্রাথমিক সাধনমার্গে নিয়মতন্ত্রের শাসনে সাধক সুশৃঙ্খল ভাবে ছুটতে থাকে, তথাপি তার মধ্য হ'তেই একটা-আধটা বাসনা বুদ্‌বুদের মত ভেসে ওঠে বলে—'দূর ছাই, এত সাধন-ভজন করছি, কিন্তু বুঝলাম না উন্নতির কোন প্রত্যক্ষতা!' এবং এই ইচ্ছা বা প্রাণের অভাব অনুভবই ক্রমশঃ তাকে সিদ্ধাইয়ের প্রলোভনে বিমুগ্ধ করে—যা তাঁর যত্নাঞ্জিত—আকাঙ্ক্ষিত না হলেও আপনা আপনি এসে পড়ে চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে।

কিন্তু শ্রীভগবান এইখানেই নিষেধ-বাণী উচ্চারণ করছেন:—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"

'—হে তত্ত্বজ্ঞানার্থি! কর্ম্ম কর—জ্ঞান-লাভার্থ প্রযত্ন কর, আমার উন্নতি হল কি অবনতি হ'ল এ হিসাব তোমাকে করতে হবে না। তুমি কর্ম্মী—দাতা নও; বিচারক নও! সর্ব্বপ্রকার ফলের আশা পরিত্যাগ কর, যেহেতু, কৃপণেরাই ফল চায়। ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন কর্ম্মে যাদের প্রবৃত্তি নাই, তারা বন্ধনে পতিত হয়, কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসারে তারা যাওয়া-আসাই করে। সুতরাং ফল বন্ধনের হেতুবোধে তাতে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।'—তার পরই আবার চিন্তাশীল ফলার্থকাঙ্ক্ষী সাধককে তিনি বিশেষ করে ফলের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে বলছেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

—পরমেশ্বরে যুক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করে সাধনাদি—অথবা সমস্তই ঈশ্বরের অর্চ্চনা (Work is worship) বোধে কর্ম্ম কর। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে পরমাত্মাতে যুক্ত থাকার নাম 'যোগ'। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানের অর্থই হচ্ছে—সিদ্ধিকে তুচ্ছজ্ঞান করে সিদ্ধির পার—শ্রীশ্রীঠাকুর যাকে বলতেন 'মণিমুক্তার খনি—সেই শাশ্বত শান্তি আত্মজ্ঞান প্রবাহের দিকে অগ্রসর হওয়া।' শ্রীশ্রীঠাকুরের এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে—এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটত, তাতেই সে খুশী ছিল। এক জন তাকে বললে আরও এগিয়ে যেতে, তাতে সে ক্রমশঃ এগিয়ে এগিয়ে চন্দনবন-তাম্র-স্বর্ণ ইত্যাদির খনি পেয়ে ভারি সন্তুষ্ট হলো। কিন্তু তাকে যে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছিল, সে এগুনো তার থামলো না, আরও এগিয়ে মণি-মুক্তা-হীরকাদির খনি পেলে; তখন অনেক মণিমুক্তা নিয়ে মনের আনন্দে দেশে ফিরে মহাধনশালী হয়ে গেল।

এই মণিমুক্তার দেশে যাবার পথে অনেক কিছু প্রলোভনের বস্তু আছে, পথিককে যা সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারে। ভুক্তভোগী সাধক রামপ্রসাদ তাই 'আপন মনে উদার সুরে' গেয়েছিলেন—"কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচ্‌দুয়ারে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি হচ্ছে ঐ কাচ "মণি।" তাই ও-সব পেয়ে সাধকের আত্মপ্রসাদ এলে সে আর চিন্তামণি (পরমাত্মাকে) লাভ করতে পারে না;—সে জন্য বার বার তিনি বলে গেছেন, "সাধু, সাবধান!"

ধর্ম্মের পথ খুবই পিচ্ছিল, বাধাবিঘ্ন-প্রলোভন যথেষ্ট আছে এ পথে। স্থিরলক্ষ্য সাধক যদি সর্ব্বপ্রলোভনরূপ পিচ্ছিলতা একটির পর একটি কাটিয়ে সেই আত্ম-সিংহদ্বারে আঘাত (knock) দিতে পারেন, তবেই তিনি বুঝবেন, ধর্ম্ম কত সুগম! কতখানি সুফলদায়ী! যদিও সত্য যে—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

—এতে বিফলতা বা বিঘ্ন নাই। কারণ, সত্যলাভার্থে কৃতকর্ম্মে (অর্থাৎ ধর্ম্মের) বাধাবিঘ্ন অসম্ভব, এবং এই ধর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহাভয় (সংসার) হতে পরিত্রাণ করে;—তথাপি শান্তশিষ্ট বালকের মত ঐ 'স্বল্পমপ্যস্য'তে সন্তুষ্ট থাকা কোন মতে সমীচীন নয়। অষ্টসিদ্ধ্যাদি-লাভে শক্তিশালী সাধক জড়জগতে প্রত্যেক বস্তুর উপর (এমন কি অণু-পরমাণুর উপরও) প্রভাব বিস্তার ক'রে সাধারণ অসুবিধা—পার্থিব দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন সত্য, কিন্তু তা নিত্য নয়—নশ্বর! কারণ, বেদান্তাদি শাস্ত্র আমাদের পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে—জ্ঞান যা মানুষের চরমলভ্য, তা লাভ না করলে জন্ম-মৃত্যুর দারুণ কবল হতে নিষ্কৃতি-লাভ অসম্ভব; "ন সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেহপি"—ব্রহ্মার কোটি-কল্পেও জীবের মুক্তি নাই। এবং দেবতাগণও এ হ'তে বাদ যান না। যেহেতু, তাঁরা লীলাশীল, সুতরাং অবিনাশী নন।

তাই শ্রুতি বল্‌ছেন—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"—সুতরাং বোঝা গেল, দেবতারাও বন্ধনভয়শূন্য নন ; তাঁদেরও এক দিন ভয়শূন্য হ'তে হবে, তবেই মুক্তি সম্ভব, অন্যথা অসম্ভব। সুতরাং আত্মজ্ঞানই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং তার জন্যই কর্ম্মসাগরের মধ্যে প্রলোভনের তরঙ্গ একটির পর একটি কাটিয়ে পরপারে সেই শান্তি-রাজ্যে পৌঁছুবার প্রযত্ন প্রশংসনীয়। নচেৎ শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, "মণি-ভ্রমে কাচখণ্ডে আদর কর্‌লে ফলে কিছুই হবে না।"

সিদ্ধি আর সিদ্ধাই এক কথা নয়। সিদ্ধি অর্থে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন —"সিদ্ধি কেমন জানিস্? যেমন বেগুন আলু সিদ্ধ। বেগুন আলু সিদ্ধ হলে যেমন নরম হয়ে যায়, যে ঠিক জ্ঞানী—পরমহংস, তাঁর স্বভাবও হয় সেরূপ।" সিদ্ধাই নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানচ্যুত সাধকের তিনি উপমা দিয়েছেন দরকচা বেগুনের সঙ্গে। তাই তাঁর সন্তানদের মধ্যে কা'রও যদি ঐরূপ শক্তির স্ফুরণ তিনি দেখ্‌তেন, তবে তাকে ও-সবের দিকে মন দিতে নিষেধ কর্‌তেন।

এক বার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর ধ্যানাবস্থায় দূরশ্রবণাদি বিভূতি সকল প্রকাশ পেতে থাকে। শুনে স্বামিজীকে তিনি বল্লেন, "ওরে! ও-সব বিভূতিস্ফুরণ ভাল নয় ; কালে ওতেই মন পড়ে যাবে। ও-সব অনিত্য—ভগবান-লাভের পথে বিঘ্ন বলে জানবি,—সত্য বস্তু একমাত্র ভগবান্। কিছু দিনের জন্য তুই ধ্যান বন্ধ রাখ্ * * ।"

কেবল যে তিনি নিষেধ করেই ক্ষান্ত হতেন তা নয়। অনেকের ও-শক্তি নষ্ট করে তাঁদের পথচ্যুতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইঁদেরের গৌরী পণ্ডিত এবং পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের সিদ্ধাই-বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন ; অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর তাঁদেরও সিদ্ধাইগুলি নষ্ট করে জীবনের মহাভ্রমান্ধকারে নূতন আলোকপাত করেছিলেন। তিনি বলতেন—"মা তাদের সব শক্তি (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর টেনে দিলেন।" শ্রীমৎ স্বামিজীকেও তিনি এক বার পরীক্ষার মানসে যোগৈশ্বর্য্যাদি দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু স্বামিজী তাতে জিজ্ঞাসা করেন—"ও সকলের দ্বারা ভগবান লাভ হয় কি না?" তার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলেছিলেন, —'না, ও-সবে ভগবান্ লাভ হয় না, তবে প্রতিপত্তি মান-যশাদি পার্থিব সুখ যথেষ্ট হয়। ভগবানকে পেতে হলে ঐশ্বর্য্যাদি (সিদ্ধাই প্রভৃতি) থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু পরীক্ষকই ছিলেন না, তাঁকেও অনেক সময় পরীক্ষার্থিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। এক বার তাঁর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় বল্লেন, "মামা, এত সব সাধু-সন্ত আসে, তাদের কত কি শক্তি,—তুমি এত দিন সাধনা কর্‌ছ, তোমার কিন্তু কোন শক্তিই হলো না! তুমি মাকে বলো না—কিছু শক্তি দিতে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন—'মা আমার ও-সবে মন উঠ্‌তে দেন না যে। তবে তুই যখন বল্‌ছিস্, তখন এক বার বলে দেখ্‌বো।' শিশু-প্রকৃতি ঠাকুর তখন শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরে গিয়ে করজোড়ে জানালেন, "মা, হৃদু বলে, আমার কিছু শক্তি-টক্তি হোক। তা তোমার যা ইচ্ছা মা। তাই করো, আমি কিছু জানি না।" * * * পরে শ্রীযুত হৃদয় এ সম্বন্ধে এক দিন জিজ্ঞাসা কর্‌লে শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মত রেগে বলেছিলেন—'দূর্ শালা! মা আমায় দেখালেন—সিদ্ধাই টিদ্ধাই ও সব বিষ্ঠা।'

তিনি বল্‌তেন, ভগবানে মন গেলে ও সব সিদ্ধাই-টিদ্ধাই তুচ্ছ হয়ে যায়, মন তখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আরোহণ করে, ভগবানই তখন মনের একমাত্র লক্ষ্য হন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের 'এক চড়ে হাতী মারা' ও 'পায়ে হেঁটে নদী পারে'র গল্প যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বুঝবেন—তিনি সিদ্ধাইকে কত' উচ্চাসন প্রদান করেছেন,—সিদ্ধাইয়ের তিনি মূল্য দিয়েছিলেন 'আধ পয়সা' মাত্র! বিভূতি যাঁর—তাঁকেই তিনি লাভ কর্‌তে বলেছেন। সূর্য্যের সপ্তরঙ্ বা রশ্মি দর্শনে মুগ্ধ না হয়ে—যাঁর রশ্মি বা সপ্তরঙ্, তাঁকেই তিনি একমাত্র প্রাপ্তব্য বলে নির্দ্দেশ করে গেছেন। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু' এই ছিল তাঁর বাণী। তিনি বল্‌তেন—"বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'লে কারও অপেক্ষা না রেখে সটান বাবুর কামরায় ঢুকে পড়ো। তার পর আলাপ-পরিচয় করে এসে বাগান-ইমারৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দেখতে পার। * * * কালীদর্শন কর্‌বে ত জো-সো করে ভিড় ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ কর, দর্শনান্তে দোকান পাঠ সব দেখতে পারো" ইত্যাদি। ভগবান্ লাভ করে তার পর ঐ সব বিভূতির প্রসঙ্গ কর্‌তে বল্‌তেন ঠাকুর। অথবা বল্‌তেন, ভগবান-লাভের পর ও-সব তুচ্ছ জ্ঞান হয়ে যায়।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে যে, সিদ্ধাই সম্পন্ন হলে ভগবানই লাভ অসম্ভব কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব, যেহেতু, উহা সাধকের অতি উচ্চাবস্থা— next to the throne of Savation—বললেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং শাস্ত্র বা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার কোন মূল্য নাই। তদুত্তরে কিন্তু আমরা বলি—না, দাতার কাছে প্রার্থী কখনও দু'টি বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকার দাবী কর্‌তে পারেন না। তা ছাড়া সিদ্ধাই ও জ্ঞান (বা মুক্তি) পরস্পর-বিরোধী,—যেহেতু, একটি সকাম সাধনা-প্রাপ্ত, অপরটি নিষ্কাম সাধনাপ্রাপ্ত,—একটিতে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বাসনা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং অপরটিতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে থাকে। শ্রুতিবাক্যে ও বিচার-বুদ্ধিতে উহারা পরস্পর-বিরোধী অনুভূত হয়। 'দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা যায় প্রার্থনীয় একটি বা ততোধিক বস্তুও দাতার নিকট থেকে পাওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষদর্শন ; কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তা' বলা চলে না। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই আমাদের বলে দিচ্ছে, একটির অধিক যেখানে প্রার্থনা, সেখানে অদ্বৈতের লেশমাত্র থাকে না ; তা দৃষ্ট এবং স্পষ্টতঃ দ্বৈত। দ্বৈত সংসার-ভয়-নিরসনের অধিকারী নয়, পরন্তু, সর্ব্বভয়ই এতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে। অদ্বৈতই একমাত্র দ্বন্দ্বাতীত ও সর্ব্বভয়ের বিনাশক। অদ্বৈতই বন্ধন-মুক্তির অসি-স্বরূপ, এই হলো বেদান্তের স্পষ্ট বাণী। যেখানে অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন সাধক প্রতিপত্তি বিস্তারে— 'আমি-শক্তিসম্পন্ন' এই অহঙ্কার পোষণ করে, সেখানে তার্কিক মতই এ-মত খণ্ডনে পক্ষপাতিত্ব দেখান, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি সেখানে থাকবেই এবং এইখানেই নিজেকে তিনি ব্রহ্ম থেকে যে ভিন্ন প্রতিপন্ন করে থাকেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে,—এ কথা নিশ্চয়। তা ছাড়া সিদ্ধিসম্পন্ন মানব কখনও নির্গুণ ব্রহ্মে উপনীত হতে পারে না যেহেতু, তিনি গুণযুক্ত বা শক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং অদ্বৈত জ্ঞান, যাবে প্রকৃত 'মুক্তি' বলা যায়, তা লাভ কর্‌তে হলে দু'নৌকায় পা দিলে চলবে না, অথবা বিচার-বুদ্ধি বলে সেই নৌকাটিতেই পার হ'তে হবে

যা শান্তিধামের যথার্থ খেয়া, অন্যথা শ্রীশ্রীঠাকুরের গল্প "উল্টা বুঝিলু রামের' দশায় পড়্‌তে হয়। *

তৃতীয়তঃ, যদি আমরা দার্শনিক ক্ষেত্র থেকে নেমে এসে সাধারণ ব্যাবহারিক দৃষ্টান্তের দিকে লক্ষ্য করি, দেখবো—মা তাঁর সন্তানগুলি কাকেও লাটিম, কাকেও পুতুল, কাকেও মিষ্টান্নাদি দিয়ে ভুলিয়ে রেখে স্বকার্য্যে রত থাকেন, চেয়েও দেখেন না তখন। হয়ত কেউ কাঁদ্‌লো, একটু চঞ্চল হলেন, তাকে আবার একটি খেল্‌না দিলেন। সব চুপ; আবার স্বকার্য্যে রত হলেন। কিন্তু আবার যখন কাঁদলো সন্তান, আবার একটি জিনিষ দিয়ে ভোলান,—অপেক্ষা করেন তিনি সে পর্য্যন্ত, যতক্ষণ সন্তান শান্ত থাকে,—যতক্ষণ না সন্তান সমস্ত ছেড়ে মাত্র তাঁর জন্যই অধীর হয়। ভোলাবার অনেক পরীক্ষা সত্ত্বেও যখন দেখেন—সন্তান একমাত্র তাঁকে পেলেই নিশ্চিন্ত হয়, অপর কোন দ্রব্য চায় না, তখনি তিনি পরাজিত হন ও সন্তানকে কোলে নিয়ে শান্ত করেন। হে অবিশ্বাসী মানব, বিচার-বুদ্ধি—জ্ঞান-পথকেও যদি কূটতর্ক বলে পরিত্যাগ কর, তবে ঐ সর্ব্বত্যাগী মাতৃকামী সন্তানের মত হ'তে চেষ্টা কর, তবেই মাতৃ-অঙ্কে শান্তি-লাভে সমর্থ হবে, অন্যথা "বিন্দু আশা, ভবসিন্ধু তারিতে অক্ষম। নিষ্কামী-ই ধাত্রী মাত্র তার।"

আজ-কাল অনেকের ধারণা কিন্তু অন্য রকম। তাঁরা চান্‌ একটা কিছু দেখ্‌তে সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে। মরা বাঁচানো—অসুখ সারানো—জলে হাঁটা—আকাশে ওড়া—অপরের মনোভাব অবগত হওয়া প্রভৃতি অনেক কিছু সিদ্ধাই তাঁরা সাধুর মধ্যে দেখ্‌তে চান্‌ এবং সাধু মহাত্মা বলতে তাঁরা ঐ সকলের আদর্শই বোঝেন। —কিন্তু তা হ'লেই বা সাধু-সন্ন্যাসীর পরিত্রাণ কোথায়? অবিশ্বাসী মন কি তাতেই শান্ত হয়? কখনই না। হয়ত এই পর্য্যন্ত একটা মাতব্বরি অভিমত (wise opinion) প্রকাশ করে থাকেন—'আরে হাঃ, ও আর কি ভারি কথা, ও-সব দেখা আছে ঢের।' অথবা 'একটা জোচ্চোরের সর্দ্দার,' এ অভিমত প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু হে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব, তুমিই যা বোঝো বা ভাব যথার্থ বলে, তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য, তারই বা প্রমাণ কি? হয়ত তোমার কাছে যা মূল্যবান, অপরের কাছে তা হাস্যাস্পদ ও মূল্যহীন। শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধাই সর্ব্বস্ব নয়, সিদ্ধিই (ব্রহ্মজ্ঞানই) সর্ব্বস্ব।

শ্রীভগবান সাধক অর্জ্জুনকে বলেছেন—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"—"যারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনকারী, সে সকল ভক্তকে আমি "তত্ত্বজ্ঞান" প্রদান করি, যদ্দারা তারা আমাকে (আত্মস্বরূপ) প্রাপ্ত হয়।" * * * সুতরাং ভগবানকে (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) লাভ করতে হ'লে 'সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য'—সিদ্ধাই * প্রভৃতির দারুণ প্রলোভন পরিত্যাগ করে তাঁতেই আমাদের মনকে নিবিষ্ট করতে হবে সম্পূর্ণরূপে, তবেই সাধনায় সিদ্ধি (জ্ঞান) লাভ সুনিশ্চিত।

ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য

তবে ইহা সত্য যে, সিদ্ধাইসম্পন্ন সাধক প্রলুব্ধবৃত্তি-জন্য একেবারে অধোগতি প্রাপ্ত হন না; যেহেতু, কৃতকর্ম্মের ফল তাঁতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, মাত্র স্রোতের মুখে একটি আবরণ তুল্য তাহার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে রাখে। পরন্তু Evolution theory মান্‌তে গেলে পরে (লোভ রূপ রূপ ভ্রম-নিরসনে) বা পরজন্মে তিনি যেখানে গিয়ে প্রতিরুদ্ধ হয়েছিলেন সেখান থেকেই আবার চেষ্টা আরম্ভ করেন ও তার Plane উচ্চ বলে শীঘ্রই শান্তির অধিকারী হতে পারেন

* তবে যে অন্যান্য অবতার যেমন শ্রীচৈতন্য, শ্রীশঙ্কর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মধ্যে অল্পবিস্তর বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তা শুধু লোক-কল্যাণের জন্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের সহায়করূপে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁদের জীবনের তা লক্ষ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অবতারেরা ঈশ্বর-কোটীর অন্তর্গত—ভগবানেরই বিশেষাংশ-বিশেষ, সুতরাং তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

গান

কবে তোমায় ডেকেছিলাম আমি পড়ে কি আজ মনে?
বৈশাখী ঝড় স্তব্ধ ক'রে গেছে ফাগুন-আলাপনে।
আজও তোমার সকল কাজের মাঝে
পুরোনো সুর নতুন হ'য়ে বাজে
অঝোর ধারে ঝরাও তব আঁখি
শুধুই অকারণে।
তোমার বনে ফুটলো কত ফুল ফাগুনী-সন্ধ্যাতে,
বাতাস-বাসে হয় বুঝি আকুল রজনী-গন্ধাতে।
দিলেম আঘাত মিছে গরব-ভরে,
কি পেয়েছি জানি না তার তরে,
আমারই পথ হারিয়ে গেল প্রিয়,
তুষার-ঢাকা বনে।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

ভালোবাসো তাই

তুমি ভালোবাসো নীল—তাই পরি আমি মেঘ-নীল শাড়ী, এ তনু ঘিরে—
তোমার অধরে মৃদু হাসি ফোটে বিজলী খেলে এ অধর-তীরে!
সাগরের জল ভালোবাসো তুমি অতল-গভীর কালোয় মাখা,
বেঁধেছি সাগর এ দুই নয়নে—ঘন-কালো প্রেম-কাজল আঁকা!
ভালোবাসো তুমি স্নিগ্ধ-ধবল মৃদু-সুবাসিত কামিনী ফুলে—
অনাবিল প্রেমে শুভ্র এ তনু সুরভিত করি' ধরেছি তুলে!
ভালোবাসো জানি, আরো ভালোবাসো মুখর মুখের নীরব ভাষা,
এ দু'টি পেলব নয়নের কোণে নিতুই যা' করে যাওয়া ও আসা!
ছন্দে গমনে কাঁকনের ধ্বনি মরমে অধীর স্বপন বোনে,
মধুর প্রেমের সুধার পরশ পাও না শুধুই অধর-কোণে'
তাই বুঝি তব লুব্ধ নয়ন আমার অধরে কি যেন খোঁজে—
দেখিতে কি তাহা পাওনি এখনো হৃদয়ে লুকানো রয়েছে ও যে!

বীণা রায়

অত্রি

(গল্প)

আজ চার বৎসর অত্রি বি-এ পাশ করিয়াছে। গিরিশ কিন্তু এখনও তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারেন নাই। যত দিন যাইতেছে, জ্ঞান-দৃষ্টিতে গিরিশ দেখিতেছেন, ঐ বি-এ ডিগ্রীটাই যেন বিবাহের বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়াছে।

কিন্তু কনভোকেসনের গাউন আঁটিয়া খোঁপার উপর ক্যাপ চড়াইয়া অত্রি যে দিন বি-এ ডিগ্রী-হাতে গৃহে ফিরিয়াছিল, সে দিন গিরিশের মনে হইয়াছিল, কন্যা যেন রাজ্য জয় করিয়া ফিরিয়াছে। সানন্দে দুহিতার সেই অপরূপ বেশের ফটো তুলাইয়া এনলার্জ করাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে তিনি টাঙাইয়া রাখিলেন।

অপর্ণা এক বার বলিয়াছিল,—বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে মেয়ের ছবি টাঙানো হলো—লোকে কি বলবে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গিরিশ কহিলেন, যে মেয়ে গাউন প'রে ডিগ্রী আনে, তার ছবি বৈঠকখানায় টাঙালে দোষের হয় না! বরং গৌরব হয়।

অপর্ণা আর কোনো কথা বলিলেন না।

ঘটক-ঘটকী আসিল। গিরিশ কন্যার ছবির দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিতেন,—এই আমার মেয়ের ছবি দেখে যাও—এর যোগ্য বর চাই।

কালী ঘটক সহরের যত বনিয়াদী বড়-ঘরে কাজ করে। সকলকার নাড়ী-নক্ষত্রের সে পরিচয় জানে, তাহার উপর সে ছিল মুখ-ফোঁড় মানুষ। সে কহিল,—পাত্তর সব রকমই হাতে আছে গিরিশ বাবু, বলি, খরচ-পত্তর করবেন কেমন?

গিরিশ মাথা চুলকাইলেন। কহিলেন,—চাটুয্যে, শুধু হাতে মেয়ে পার হয় কখনো শুনিনি, খরচ-পত্তর করবো বই কি।

—বেশ! বেশ! তা হলেই হলো। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছেলেটি, বয়স আটাশ, দু'শো করে মাইনে পাচ্ছে—দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, বাড়ী রয়েছে।

একটা ব্যাঙ্কের চাকুরেকে মেয়ে দিতে গিরিশের মন সরিল না। কহিল,—আরো ভালো পাত্র দেখুন!

—আছে বৈ কি। স্যার মিত্তিরের ছোট ছেলে—কালী চাটুয্যের হাতে আবার পাত্র নেই! কিন্তু তারা কি আপনার মত ঘরে—বুঝছেন না?

—ছেলেটি কি করে?

—পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ।

—ব্যারিষ্টার! বেশ! বেশ! চেষ্টা দেখ! গিরিশের স্বরে আনন্দ!

—বলছেন, দেখবো, কিন্তু ভরসা রাখি না। তবে নারায়ণের নাম করে চেষ্টা দেখবো। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। আপনি মেয়ে দেখাবার চেষ্টা করুন। ভালো কথা, ওখানে যদি হয়, অবশ্য ভবিতব্য। আপনার কৃতিত্ব গুণে আমি দু'শো টাকা দেবো ঘটক-বিদায়।

—হ্যাঁ; সে তো আপনাকে দিতেই হবে। আমি তো চুনো-পুঁটিদের কাজ করি না। রুই-কাৎলা নিয়ে আমার কারবার। আজ তবে উঠি! বলিয়া বিদায়ের মুখে কালী ঘটক বলিয়া গেল, চেষ্টার ত্রুটি হবে না! মেয়ে দেখিয়ে দেয়াবোই, তার পর আপনার কপাল!

গিরিশ গাড়ী-ভাড়ার টাকাটা কালীর হাতে গুঁজিয়া দিলেন এবং সে প্রস্থান করিতেই কালবিলম্ব না করিয়া অন্দরে আসিয়া হাঁক দিলেন,—কোথা গো?

'গো' তখন দুধের কড়া সামলাইতেছেন। কহিলেন,—কান দু'টো খোলা আছে—বলো।

—আরে সব তাতেই বেজার! একটা শুভ সংবাদ নিয়ে এলুম।

দুধশুদ্ধ কড়া মাটীতে নামাইয়া অপর্ণা কহিলেন,—কি সংবাদ? শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইল।

গিরিশ কহিলেন,—মনের মত রুই-কাৎলা পেয়েছি।

তাঁহার মুখে হাসি। কহিলেন,—হুঁ! মেয়েকে কেন লেখাপড়া শেখাচ্ছিলুম বুঝলে তো!

—কি রকম সম্বন্ধ?

—আরে, স্যার মিত্তিরের ছোট ছেলে।

সন্দিগ্ধ স্বরে অপর্ণা কহিলেন,—ঢের টাকা চাইবে তো?

—চায়, ভিটে বাঁধা দিয়ে দেবো টাকা।

অপর্ণা আঁতকাইয়া উঠিলেন। মুখ কালি করিয়া কহিলেন,—সে কি গো? তোমার তো একটি মেয়ে নয়। আর পাঁচটা কাচ্ছা-বাচ্ছা রয়েছে। মাথা গোঁজবার ঠাঁই—

—বাজে বকো না! শুভ কাজের গোড়াতেই শিউরে উঠছো—যত অলক্ষণ!

* * * *

মুখ চুণ করিয়া গিরিশ কহিলেন,—সবই কপাল। না, হলো না।

—চাটুয্যে কি বললে? অপর্ণার স্বরে একরাশ হতাশা।

—কি আর বলবে? বললে, গিরিশ বাবু ঢের বুঝিয়েছিলুম। যা কখনো করিনি, আপনার জন্যে তা অবধি করলুম,—স্যার মিত্তিরের পায়ে অবধি ধরেছি। তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, বিয়ে আমি করবো না তো চাটুয্যে, করবে আমার ছেলে। ওর যেখানে পছন্দ হবে—আমি কি করবো, বলুন?

বিস্মিত কণ্ঠে অপর্ণা কহিলেন,—তাই যদি, তবে ছোঁড়া-তিনটে অত করে মেয়ে দেখলে কেন—গেরস্থ ঘরে যদি বিয়ে না করবে! তবে অমন করে গাইয়ে, বাজিয়ে, বাঁধা চুল খুলিয়ে দেখবার দরকার? পাত্র নিজে এসে আবার দেখে গেল। চা খেলে, কথা কইলে, এ আবার কেমন ভদ্রতা, কি রকম সভ্যতার ফ্যাসান! আমি বলি কর্ত্তা বুঝি মত দিচ্ছে না, ঠাকুরকে কত মানত করছি যে কর্ত্তার মত করে দাও ঠাকুর!

'কর্ত্তা তাই খুলে বলে দিলে। আমরা মনে-মনে তাকেই দোষী ভেবেছিলুম। সে দেখিয়ে দিলে, আপত্তি কাদের।

অত্রির কাণে এ কথা আসিয়া পৌঁছিল। স্যার মিত্তিরদের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল বলিয়া পিতার মুখে যে ক্ষোভের ছায়া পড়িল, জননীর মুখে যে বিষণ্ণতা ফুটিল—সমস্তই সে দেখিল। ক'দিন ধরিয়া সেও আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিতেছিল। মনের মধ্যে সুখের হিল্লোল বহিতেছিল!

ব্যারিষ্টার সাহেব স্বয়ং যে দিন নিজের মোটরে চড়িয়া অত্রিকে দেখিতে আসিলেন, সে দিন সেই কান্তিমান সহাস্য-আনন যুবকের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে কেমন উল্লাস জাগিয়াছিল। চিত্তে ফাগুন-দিনের উতলা বাতাস বহিয়া মনকে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চকিত করিয়া ফেলিতেছিল।

সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শনতত্ত্ব, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ—এক হইতে অন্যে লইয়া বহু রকমের ন্যাকড়া বাহির করিয়া গিরিশের সহিত দুই ঘণ্টা ধরিয়া তিনি গল্প করিলেন। সে আলোচনার কথাবার্ত্তায় অত্রিও যোগ দিয়াছিল। একটি প্রত্যয় জাগিয়াছিল, বিবাহ নিশ্চিত হইবে।

কিন্তু বাতাসে ধ্বসিয়া-পড়া তাসের বাড়ীর মত আশার সাত-তলা বাড়ী এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইল।

*   *   *   *

হারাণ ঘটক সম্বন্ধ আনিল। এঞ্জিনীয়ার পাত্র। মাহিনা তিনশো টাকা।

শুনিয়া অপর্ণা কহিলেন,—মন্দ কি! হয় যাতে চেষ্টা দেখ।

নিস্পৃহ কণ্ঠে গিরিশ কহিলেন,—কিন্তু খোঁজ পেলুম, ওই ছেলেটির আয়ের উপরই সমস্ত সংসার নির্ভর কচ্ছে।

—তা হোক। দিব্যি সম্বন্ধ। অমন মোটা মাইনে।

হারাণ কহিল,—আরে মশাই. সংসার নির্ভর কচ্ছে, ও-কথা ছেড়ে দিন। আপনার কন্যা তো সেকেলের খুকীটি নয়। উনি হলেন শিক্ষিতা মহিলা। স্বামী চাইলে উনি রাজী হবেন কেন? তখন দেখবেন, পরের বোঝা বইতে কে রাজী হয়! এখন বিয়ে হয়নি, একা মানুষ, আলাদা কথা।

কথার যুক্তি আছে! গিরিশ কহিলেন,—তা বটে।

অত্রি আবার ক'নে সাজিয়া দেখা দিল। পাত্রের পিতা গণৎকার সঙ্গে লইয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন কন্যার রূপ; দৈবজ্ঞ দেখিলেন লক্ষণ আদি।

হাত, পা, কপাল, করতল, কেশ সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। উঠিবার সময় তাঁহারা কহিলেন,—কোষ্ঠী?

গিরিশ কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিলেন।

দিন কয়েক পরে এক দিন হারাণ আসিয়া বলিল,—সব ঠিক হইয়াছে। ফাগুনেই তারা শুভ কাজ সারিতে চায়। দেনা-পাওনার কথাটা চুকাইয়া ফেলা হোক্।

গিরিশ প্রশ্ন করিলেন,—কত দিতে হবে?

—বলেছি তো আপনাকে। বলিয়া হারাণ হাতের পাঞ্জাটাকে তুলিয়া ধরিল।

—পাঁচ হাজার! আচ্ছা, তাতে আমার আপত্তি নেই।

মাথা নাড়িয়া সানন্দে হারাণ উত্তর দিল,—না থাকবারই কথা। আমার দু'শো টাকা বিদায়টি অমনি!

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গিরিশ কহিলেন,—দু'শো টাকা দিতে হবে?

—বাঃ! আপনিই তো সে প্রতিশ্রুতি বরাবর দিয়ে আসছেন।

—কিন্তু এও তো বলেছিলুম, ভাল সম্বন্ধ হলে।

চক্ষু বড় [illegible] করিয়া হারাণ কহিল,—কি রকম! এটা কি মন্দ? না, মন্দ হলে আপনি মেয়ে দিতেন! কেবল একটা ফাঁকির কথা [illegible] বলছেন, গিরিশ বাবু।

—সে-তর্ক হচ্ছে না! আচ্ছা, যখন মুখ দিয়ে কথা বার করেছিলুম, দেবো তোমায় দু'শো টাকা।

খুশী-ভরা কণ্ঠে হারাণ কহিল,—আর একটি কথা ওরা বলেছেন,—আশীর্ব্বাদের দিন সবটা দিয়ে দেবেন।

—কি সব দিয়ে দেবো?

—আজ্ঞে টাকাটা! ওরা বল্লে,—এই পাত্রের পিতা আর কি! তা কথা ভালো! আমিও ভেবে দেখেছি।

—কি ভালো, শুনি।

—বিরক্ত হচ্ছেন কেন মশাই? ভালো কথাই তো! [illegible] বাবু ভারী সদাশয় ব্যক্তি, বল্লেন—হারাণ, সেকাল হলে ছেলের বিয়েতে একটি কড়িও নিতুম না। আমার প্রপিতামহের নিষেধ ছিল। কিন্তু যা দিন-কাল, বুঝছো তো—কিন্তু তা বলে কন্যার বাপ হয়েছেন বলে সে-ভদ্রলোক চোরের দায়ে ধরা পড়েননি। দু'শো পাঁচশো যা বেশী পড়বে আমিই দেবো। তিনি মাত্র গুণে পাঁচটি হাজার আশীর্ব্বাদের দিন আমায় দিয়ে দেবেন। ল্যাঠা চুকে যাবে। কোন ঝক্কি নেই। আমার ঘরের বৌ—আমার লক্ষ্মী—আমিই তাকে সব দেবো।

মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া গিরিশ কহিলেন.—মানে, পাঁচ হাজারই ওঁরা নগদ নেবেন? আর সেটি পাকা দেখার দিন?

হারাণ হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।—আহা, ওরা নিচ্ছে কোথায়! বুঝছেন না, এ তো আপনার প্রতি মহত্বই দেখানো হচ্ছে। ওরা আপনি মেয়ে দিচ্ছেন—আবার কেনা-কাটার ঝঞ্ঝাট। অত [illegible] কাজ কি! দিন ফেলে, বুঝুক ওরা—হ্যাঁ, এ বাবা গিরিশ বোস সাচ্চা মানুষ।

—সমস্ত টাকাটাই ওদের হাতে নগদ তুলে দেবো?

—ওই তো বল্লুম,—ওঁরা বড় সরল মানুষ। কাউকে দুঃখ দিতে চান না। মানে, খুব পুরানো ঘর কি না।

—কিন্তু এতখানি সুখ আমার সহ্য হচ্ছে না। পাঁচ হাজার নগদ? অসম্ভব।

হারাণ শাসাইল,—বিয়ে ভেঙ্গে যাবে গিরিশ বাবু। রায়েদের মেয়ের সঙ্গে ঝুলোঝুলি চলছে।

—বেশ, সেইখানেই করুক। আমি সম্বন্ধ কেটে দিলুম।

ভিতরে আসিতেই অপর্ণা কহিলেন,—সব ঠিক হলো?

—না। ভেঙ্গে দিয়ে এসেছি।

হতভম্বের মত অপর্ণা চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণ-পরে কহিলেন,—সে কি?

—এই রকম। তারা পাঁচ হাজারের সবটা নগদ চায়।

—তাই না হয় দিতে। তুমি যখন দিতে রাজি।

—দিতে রাজি! কিন্তু ও-ভাবে নয়। আমি বুঝেছি, ওরা চামার।

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া অত্রি কথাগুলা শুনিল। [illegible] হইল, বাহির হইয়া বলে,—বাবা ঠিক করিয়াছে। সত্যই ওরা চামার। কিন্তু বি-এ ডিগ্রীধারিণী হোক আর মনের মধ্যে ক্রোধে টগ্‌, বগ্‌, করিয়াই ফুটিতে থাকুক, বাঙ্গালী-পুরুষের [illegible] কন্যা।

ভাষ্য কথা কহিলেও ঔদ্ধত্যের পরিচয় প্রকাশ পায়।" পাঁচ জনে তাহাকে অপরাধিনী করে।

* * * *

দিন কখনও সময়-অসময় বুঝিয়া দু'দণ্ড থামিয়া থাকে না। কাজেই বছরগুলা স্বচ্ছন্দে আসে যায়। কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকে না।

গোটা চার বৎসর কাটিয়া গেল।

অত্রির বিবাহের জোটপাট কোথাও হইল না। বরং কথা রটিয়া গেল,—গিরিশ ভারী বদ্‌মেজাজী, অহঙ্কারী! তাহার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া কাহারও সুখ হইবে না।

অপর্ণা মুখ চুণ করিয়া থাকে। গিরিশ ম্রিয়মাণ! অপর্ণার ভাই-ঝি, বোন-ঝি, দেবরের মেয়ে যে যেখানে অত্রির সমবয়সী ছিল, তাহাদের শুধু বিবাহ নয়, কাহারো পুত্র ইস্কুল যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারও মেয়ে গান শিখিতেছে। অত্রির পানে চাহিয়া সকলে অবাক! সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে,—অত্রির বর কি ভগবান্ গড়িতে ভুলিয়াছে?

অপর্ণা কখনও মৌন থাকেন। কখনও তিক্ত সুরে সাড়া দেন, আশ্চর্য্য নয়! বুড়া বিধাতার হয়তো ভীমরতি ধরিয়াছিল।

সে দিন কথা-প্রসঙ্গ গিরিশ কহিলেন,—তোমাদের পাঁচ জনের কথা শুনে ভুল করলুম! সেই তো বেকারের মত বসে আছে, যদি এম-এ'টা পড়তে দিতুম, পাশ করে এত দিনে কোন্ কালে বেরিয়ে আসতো।

অপর্ণা কহিলেন,—খুব হয়েছে। এক বি-এ পাশের ঠেলা সামলাতে পাচ্ছি না, আবার এম-এ! তখন যদি পনেরো-ষোলতে পার করে দিতুম, তাহলে আজ এত ভাবনায় পড়তে হতো না! সে দিন "মনের কথার" ভাগ্নে বল্লে,—মাসিমা, আপনার মেয়ে কোন্ বছর পাশ করে বেরিয়েছে? আমি বল্লুম—অত আমি বুঝিনি! সোজা বছরটা চলেছে—আগে বুঝলে বলতুম, মনে নেই। সে চার বছর শুনে চোখ কপালে তুলে বল্লে,—বাই জোভ—চার বছর আগে বি-এ পাশ করেছে! এখনও বে-থা দিতে পারেননি! ভারী দুঃখের বিষয়। ওর বোন বল্লে—সাতাশ, আটাশ বছর বয়স হয়ে গেল।

শেষে এক দিন অত্রির সম্বন্ধ আনিল এক ঘটকী। পিতা এক জমিদার ষ্টেটের ম্যানেজার ছিল। পাত্রের লোহার দোকান! বর্ত্তমানে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে! নূতন বাড়ী করিয়াছে। তবে পাত্রটি দ্বিতীয় পক্ষ।

গিরিশের মনের সে দৃঢ়তা আর নাই। কাজেই মুখে সে আস্ফালনও নাই! কর্ত্তা-কর্ত্তা এবার অপর্ণা। অপর্ণা কহিলেন, —ওই ভালো। আমার মেয়েও ডাগর! ছেলেপুলে আছে তো কি হয়েছে?

ঘাগী ঘটকী কহিল,—এখন তার উঠতি-মুখ বৌদি, ধুলো সোনা হচ্ছে।

দুশ্চি ন্তে অপর্ণা কহিলেন,—পাঁচ-সাতটা পাশ তো সেই ভাতের জন্যে! সেই ভাতের জোগাড় যে করতে পেরেছে, পাশ-করার চেয়ে সে ভালো।

এমনি করিয়া হইল সমস্যার সমাধান।

গিরিশ পূর্ব্ব হইতে মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। অত্রি বুঝিয়াছিল, বোবার শত্রু নেই।

ঘটকী আরো জানাইল,—ওরা ডাগর মেয়েই খুঁজছে বৌদি।

বরের বন্ধু আসিয়া অত্রিকে দেখিয়া গেল। মেয়ে পছন্দ হইল। তাহারা বয়স্থা খুঁজিতেছে। সংসার গছাইয়া দিতে হইবে!"

শুভ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

গল্পে নূতনত্ব কিছু নাই। যাহা সকল বাঙালী গৃহস্থ-সংসারে হয়,—অত্রির তাহাই হইয়াছে। কিন্তু অত্রির জীবনে উঠিয়াছে একটি ঝড়।

পাঁচটি সন্তানের পিতা, বিপত্নীক মনোজকে দেখিয়া অত্রির হঠাৎ মনে হইল, কি আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া 'কালিদাস'-পত্নী স্বামীকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের মর্ম্মান্তিক জ্বালা অত্রি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল!

অত্রি দেখিল, স্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স এগার বছর—মাষ্টার আছে—কিন্তু অক্ষর-পরিচয় এখনও ভালো করিয়া হয় নাই।

মাষ্টারকে অত্রি জবাব দিল।

নূতন মনিব যাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিল, তাহার মন মনিবের প্রতি প্রসন্ন থাকে না। বিদায়-প্রাক্কালে মাষ্টার মৃদু কণ্ঠে ছাত্র-ছাত্রী দু'টিকে বুঝাইয়া দিয়া গেল, তাহাদের পিতা গোল্লায় গিয়াছে! সৎ-মা বলিয়াই মাষ্টার বিদায় হইল। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। অবোধ দু'টো জানিয়া রাখুক, একমাত্র তাহাদের যে হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল, সে চলিয়া গেল।

আট বছরের মেয়ে সুকুমারী প্রথম ভাগের সহিত সম্বন্ধ না রাখিলেও সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকা ওস্তাদ। হাত-মুখ নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সে কহিল,—মাকে আমি খুব শোনাবো মাষ্টার মশাই। হুঁ, দু'শো কথা।

এই সান্ত্বনাটুকু লইয়াই মাষ্টার বিদায় লইল।

মায়ের কাছে আসিয়া সুকুমারী কহিল,—হ্যাঁ নতুন মা, তুমি যে মাষ্টার মশাইকে তাড়ালে, দাদা পড়বে কার কাছে? দাদা তা হলে পড়বে না?

এতটুকু মেয়ের মুখে এমন পাকামীর কথায় অত্রি মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল। অত্রি কহিল,—না।

—না! তুমি না বল্লেই তো হবে না।

অত্রি মুখ তুলিল। গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—কেন হবে না?

—ইস্, কেন হবে? তুমি তো সৎ-মা।

অত্রি বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

ঠাকুমাদের মুখে অত্রি উপমা শুনিত, সতীনের চেয়ে সতীনের কাঁটা জ্বালা দেয় বেশী। দপ্ করিয়া সেই কথাটা এখন মনে পড়িল। বুক উজাড় করিয়া অপত্যস্নেহ ঢালিয়া দাও! মায়ের দায়িত্ব লইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে কত দুঃখ-কষ্ট নিঃশব্দে সহ্য করো, তবু তুমি বিমাতা! আট বছরের এতটুকু মেয়ে—গলার সমস্ত শিরা ফুলাইয়া উই-চিংড়ির মত তীক্ষ্ণ রবে ঝগড়া করিতে আসিল—নিজেদের হিস্যা বুঝিয়া লইতে! মনে খুব বিশ্বাস, বিমাতা অনিষ্টকারিণী। কিন্তু এই ভালো-মন্দ ইষ্ট-অনিষ্টের জ্ঞান কতটুকুই বা ইহাদের আছে?

তাই কন্যাকে সব উপদেশে বুঝাইতে বা শাসন করিতে গিয়া কলহ করিতে—দু'টোর কোনটাতেই তাহার প্রবৃত্তি জাগিল না।

চঞ্চল কিন্তু ভারি খুশী হইল। খুশী-ভরা কণ্ঠে কহিল,—বেশ করেছো মা, সুকুর কথা শুনো না, মাষ্টার-মশাইকে জবাব দিয়েছো! বলিয়া থামিয়া কহিল,—আচ্ছা মা, কার কাছে পড়বো?

—আমার কাছে।

সন্ধ্যায় অত্রি ছেলেকে পড়াইতে বসিল।

মনোজ দোকান হইতে ফিরিল। বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া কহিল,—ওর মাষ্টার?

অত্রি উত্তর দিল,—বিদেয় করে দিয়েছি।

—মানে?

—মানে, এগারো বছরের ছেলে, এখনও ভালো করে না পারে লিখতে, না পারে পড়তে, অক্ষর-পরিচয়ই ঠিক হয়নি।

—ওঃ! বলিয়া মনোজ চুপ করিল। মুখে উত্তর আসিয়াছিল,—ওর বাবারই কি হয়েছে?

* * * *

তিনটা বছরের মধ্যে সংসারের হাওয়া যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

সুকুমারীর ডেঁপোমী ঘুচিয়াছে। মায়ের কাছে বসিয়া সে এখন লেখাপড়া, সেলাই বোনা, গান-বাজনা সমস্তই শিক্ষা করে। খেলার নামে দেখা দিয়াছে—বালিকা-সুলভ আমোদ-ক্রীড়া! চঞ্চলেরও মা-সরস্বতীর সহিত দস্তুর মত সম্বন্ধ হইয়াছে।

প্রাইজের বই আনিয়া মায়ের হাতে তুলিয়া দিল। হাসি মুখে কহিল,—ভাগ্যিস্ তুমি আমায় পড়াতে আরম্ভ করলে মা! বলিয়া মায়ের পদধূলি লইল। তার ভারী স্ফূর্ত্তি! পড়া-শোনায় যে কতখানি আনন্দ আছে, আজ সেই স্বাদ সে প্রথম পাইল। মন তাহার মাতোয়ারা, চিত্ত দিলখোস! অত্রি যেন তাহার চক্ষে মা-সরস্বতীর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু পুত্র-কন্যাদের নিকট এতখানি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পাইয়াও অত্রির মনের শূন্যতা যেন ঘোচে না! মনোজকে তাহার আদৌ ভালো লাগে না। হিঁদুর সংসার! তাই! নতুবা যতখানি পারে, মনোজকে সে এড়াইয়া চলে। মনোজের সে দিকে লক্ষ্য নাই! এ সকল সে গ্রাহ্যও করে না।

দোকানের মালপত্র কেনা-বেচা, টাকার জমা-খরচ, হিসাব-নিকাশ লইয়াই সে ব্যস্ত! এবং তাহার বাহিরে যা কিছু, সে তাহার চক্ষে যেন কিছুই পড়ে না! এক জন যোগ্য কর্ত্রীর হাতে সে সমস্ত সঁপিয়া দিয়াছে, ব্যস্! সকল ভাবনা অবসানে পরম নিশ্চিন্তে সে থাকিত।

মনোজ একখানি বাড়ী কিনিল। নিজেদের বাস্তভিটার ঠিক পাশে। এবং এই নূতন বাড়ীতে যারা ভাড়াটিয়া আসিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া অত্রির ছেলেমেয়েরা 'থ' হইয়া গেল।

বাবুটি কোন অফিসে শ'দেড়েক টাকার বেতনে কর্ম্ম করেন। কিন্তু গৃহে তাহার সমস্ত আধুনিকতার সরঞ্জাম বিদ্যমান। অলওয়েভ সেট, গ্রামোফোন, পিয়ানো, টেবল, চেয়ার, সোফা, কৌচ! এবং বাবুটি আসিয়াই টেলিফোন আনাইলেন। আলো-পাখা তো আছেই।

চঞ্চল কহিল,—ওরা খুব বড় লোক না মা?

অত্রি উত্তর করিল,—কি জানি!

সুকুমারী কহিল,—বাবাকে একটা রেডিও কিনতে বলো না মা!

চঞ্চল কহিল,—একটা টেলিফোন্।

অত্রি প্রশ্ন করিল,—কেন?

চঞ্চল কহিল,—বা, অম্বুজ বাবুদের রয়েছে—ওরা আমাদের ভাড়াটে, আর আমাদের নেই!

অত্রি একটু হাসিল। উত্তর দিল,—না চঞ্চল, অন্যের আছে বলেই তুমি চাইবে না! তোমার দরকার হলে তুমি সব করো।

পুত্র-কন্যা নীরব রহিল। কিন্তু কথাটা যে তাহাদের মনঃপূত হয় নাই, অত্রি তাহা বুঝিল।

অম্বুজ বাবুর পত্নী মৃদুলা অত্রির সহিত আলাপ করিতে আসিল। সুদর্শনা, সুবেশা তরুণী! অত্রির চেয়ে বছর খানেকের ছোট। পরিচয়ে জানিল, মৃদুলা গ্রাজুয়েট। এবং অম্বুজ বাবু—মিষ্টার অম্বুজ সরকার। তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টারি পাশটাই কেবল করিতে পারেন নাই।

অত্রি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—মৃদুলার সাজ-সজ্জায় আগাগোড়া ধনী-গৃহের ছাপ। অত্রির বেশভূষা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের বধূর মত।

ক'দিন আনাগোনার পর সে দিন জানলা হইতে মৃদুলা ডাক দিল,—অত্রি-দি! অত্রি-দি!

অত্রি আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া কহিল,—কি?

—আজ সিনেমায় চলুন। শনিবার।

অত্রি উত্তর দিল,—আমি সিনেমায় যাই না।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মৃদুলা কপোলে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কহিল,—অবাক করলেন অত্রি-দি! সিনেমা যান না!

—না ভাই, আমার ভালো লাগে না।

—আচ্ছা, আজ ভালো লাগবে। চলুন, একখানা ইংরিজি বই দেখে আসবেন। আচ্ছা অত্রি-দি, সিনেমা না দেখে আপনি বেঁচে রয়েছেন কি করে? আমি হ'লে মরে যেতুম। প্রতি শনিবার আমার বায়োস্কোপ দেখা চাই।

অত্রি মৃদু হাসিল। কহিল,—না দেখে বেঁচে রয়েছি তো!

—না, না, আপনার ও হাসি শুনবো না! আপনাকে যেতেই হবে! না অত্রি-দি, মাথার দিব্যি! যাবেন! যাবেন। বলুন, যাবেন?

মৃদুলার পীড়াপীড়িতে অত্রি সিনেমা যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু কিসে যাইবে? ট্যাক্সি না ভাড়া গাড়ী?

মৃদুলা বলিল,—আমার জন্য মোটর আসবে।

—তোমার মোটর? অত্রি অবাক্ হইয়া চাহিল।

সলজ্জ হাস্যে মৃদুলা কহিল,—মানে, এঁর এক বন্ধু! আবার গাড়ী-ভাড়া দেবো মিছিমিছি?

—সে কি ঠিক হবে?

—খুব হবে অত্রি-দি! একটু ইকনমিক, বুঝুন।

মৃদুলা বি-এতে ইকনমিক্স লইয়াছিল। কিন্তু অত্রি কোন দিন গল্প করে নাই,—বলে না সে গ্রাজুয়েট মহিলা।

অত্রি কোন মতেই পরের মোটরে বায়োস্কোপে যাইতে সম্মত হইল না। এবং ইকনমিক বুঝিয়া মৃদুলা শেষে রিক্সা-গাড়ী আনাইল, তাহাতে উঠিতে অত্রির আপত্তি নাই।

* * * *

—ইনি মিষ্টার মিত্তির, অত্রি-দি।

অত্রি বুঝিতে পারিল না।

মৃদুলা কহিল,—মিষ্টার সরকারের ফাষ্ট ফ্রেণ্ড।

মিষ্টার মিত্র হাত তুলিয়া অত্রিকে নমস্কার করিল।

অত্রি মানুষটাকে চিনিতে পারিল। তাহার মুখ গম্ভীর হইল।

মিষ্টার মিত্র উপযাচক হইয়া অত্রিকে শুনাইয়া মৃদুলাকে কহিল,—মিসেস্ মিত্র আসতে পারলেন না বলে আপনি রাগ করবেন না। তিনি ভারী দুঃখিত না আসতে পেরে—হঠাৎ তাঁর মাথা ধরলো—হ্যাঁ, আমায় এক-রকম বকুনী দিয়েই পাঠালেন। বল্লেন,—না, যাও, কথা দেওয়া রয়েছে।

তার পর চলিল উভয়ের হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-রহস্য।

অত্রি নির্ব্বাক্।

বার-কয়েক মিষ্টার মিত্র অত্রির সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

অত্রি ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ছবি দেখা শেষ হইল। সিনেমা-গৃহে আলো জ্বলিল। ফিরিবার জন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। মিত্র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন,—তাহার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতে। তিনি উভয়কে নামাইয়া দিয়া যাইবেন।

মৃদুলা চাহিল অত্রির পানে। কহিল,—যখন অত করে বলছেন—

অত্রি অসম্মত। অনিচ্ছুক।

মিষ্টার মিত্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন,—মিসেস্ মিত্র এলে ছাড়তেন না। তিনি ভারি ক্ষুব্ধ হতেন ইত্যাদি—

মৃদুলা অত্রির কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—ওঁর সামনে ট্রামে বাসে উঠতে পারবো না। অথবা ট্যাক্সি-ভাড়া অনেক পড়বে। কেমন কি অত্রি-দি?

অগত্যা অত্রি সম্মত হইল।

মিত্রের সুবৃহৎ কারে অত্রি ও মৃদুলা স্ব স্ব ভবনে ফিরিল। আগে তিনি অত্রিকে নামাইয়া পরে মৃদুলাকে নামাইতে গেলেন।

মনোজ দোকান হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতেছিল, অত্রির বেশভূষা দেখিয়া কহিল,—বায়োস্কোপ দেখতে গেছলে?

সংক্ষেপে উত্তর হইল, হ্যাঁ।

উভয় পক্ষের কথা চুকিয়া গেল।

রাত্রে চঞ্চল কহিল,—কি বই দেখে এলে মা? গল্প বলো আমাকে।

মনোজ কহিল,—বলো না গো, আমিও একটু শুনি।

সুকুমারী কহিল,—বাংলা বই? না ইংরিজি বই মা?

—ইংরিজি বই।

—কি নাম?

—"উয়োম্যান"।

মনোজ কহিল,—চলো, সব খেতে যাই।

সিনেমার গল্প আর হইল না।

ইদানীং মৃদুলা আর তেমন আসে না। অত্রি দেখিতে পায়, দামী জমকালো শাড়ী পরিয়া মিত্রের সেই সুবৃহৎ মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যায়। মাঝে মাঝে মৃদুলার স্বামীও সঙ্গে যায়।

সে দিন মৃদুলাকে দেখিতে পাইয়া অত্রি জিজ্ঞাসা করিল,—অত যাও কোথায়?

থতমত খাইয়া মৃদুলা কহিল,—এই—এই—আমি—মানে, বড্ড ভারি ব্যামো থেকে উঠেছি, ডাক্তার ফাঁকা হাওয়া খেতে বলেছেন। তাই মিষ্টার মিত্র—

—ও:! বলিয়া অত্রি নীরব হইয়া গেল।

* * * *

ক'দিন অত্রির সহিত মৃদুলার সাক্ষাৎ নাই।

নূতন বছরের হালখাতার জন্য মনোজ মহা ব্যস্ত। সম্বৎসর যাহাদের সহিত ব্যবসা করিল, তাহাদের সকলকেই আদর-আপ্যায়ন করিতে হইবে! ব্যবসা তাহার ফলাও হইয়াছে।

মুটের মাথায় ঝাঁকা-ঝাঁকা বাজার আসিতেছে। গণেশ-পূজার সামগ্রী আসিতেছে। অত্রি ভাঁড়ারে বসিয়া ফর্দ্দ মিলাইয়া সে সব তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত। দু'টি চাকর ফরমাস খাটিতেছে।

চঞ্চল ছুটিয়া আসিল। ডাক দিল,—মা, মা। চোখে-মুখে ভয়ানক উত্তেজনা!

পশ্চাতে আসিল সুকুমারী। পিছন হইতে সে কহিল,—না মা, আমি বলবো। আমি আগে দেখেছি দাদা।

ছেলে-মেয়েদের দিকে চাহিয়া সহাস্যে অত্রি কহিল,—কি রে, কি বোলছিস্?

দু'জনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—জানো মা, আমাদের তেরো নম্বর বাড়ীর মিসেস্ সরকারকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল।

চমকাইয়া অত্রি কহিল,—সে কি রে?

—হ্যাঁ, মা। আমরা সবাই দেখলুম, কত পুলিস এসেছিল।

অবাক্ হইয়া অত্রি কহিল,—অমুজ বাবু?

—না, না, মিষ্টার সরকারকে নয়! মিসেস্ সরকারকে শুধু।

বিমূঢ় কণ্ঠে অত্রি কহিল,—কখন্ নিয়ে গেল?

—এই সকালে। কোথায় কি খুন হয়েছে, বাবা বল্লে,—

অত্রি স্বামীর নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইল। বালিগঞ্জ "মার্ডার কেসে" মৃদুলা ও মিষ্টার মিত্র না কি বিজড়িত! শুনিয়া অত্রি স্তম্ভিত!

* * * *

সংবাদপত্র-পাঠে অত্রি ক্রমে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইল। ঘটনাটি পড়িয়া কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত রহিল।

স্ত্রীলোকের এত বড় সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়ায় এই প্রিয়দর্শন মিষ্টার মিত্র! উঃ, শেষে খুন অবধি করিয়াছে! আর মৃদুলা কি-এ এ-সব ব্যাপারে তাহার সহকারিণী! কলেজের ছাত্রী—এ কি তার হীন লজ্জাকর মৃত্যু! শিক্ষার উপর এই সম্প্রদায় কি নিবিড় কালিমা লেপন করিতেছে! ভদ্রতার মুখোস পরিয়া সমাজে এই সব নরপিশাচ মানুষের কি সর্ব্বনাশই না করিয়া বেড়াইতেছে!

মনোজ কহিল,—কি করবে ওরা, বলো? ব্যাচারার দোষ কি! মৃদুলা ছিল এক কেরাণীর মেয়ে। বাপ লেখা-পড়া শেখালো আই, সি, এস জামাই ধরবার জন্যে। কিন্তু একটি আই, সি, এস-এর পিছনে তিনশো কুমারী মেয়ে লেগে আছে।—তাদের মায়েরা পর্য্যন্ত! তাকে পাওয়া যেন ডার্ব্বির প্রাইজ পাওয়া! আর অমুজ বাবু? ও ব্যাচারার দোষ কি? বিলেতে সাত-সাতটি বছর

বাস করেছিল। কিন্তু বরাত এমন—তিন বার ব্যারিষ্টারীতে ফেল হলো। দেশে ফিরতে হলো। কিন্তু মেজাজ রয়ে গেল সেই রকম। চালাতে হবে তো! মানে, তাই ভাগে কারবার।

শুনিয়া অত্রি বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

* * * *

সে দিন বছরের শেষ। গাজনের মহাদেবের পূজা। পাড়ার শিবতলায় অত্রি পূজা পাঠাইয়া দিল। কেন দিল, কেহ জানিল না।

পয়লা বৈশাখ প্রত্যুষে স্নান সারিয়া মনোজ ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়াছে। দেখে, তাহার নিত্যপূজার বাণলিঙ্গকে দখল করিয়া অত্রি আজ পূজায় বসিয়াছে। ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র তাম্র-পুষ্পপাত্রে থরে-বিথরে ন্যস্ত। ধূপের সৌরভে কক্ষ সুবাসিত!

মনোজ হতভম্ব হইয়া গেল। এ অদৃষ্ট ব্যাপার!

বাণলিঙ্গটিকে মনোজই পূজা করে। যখন মনোজের মা বাঁচিয়া ছিলেন, তিনি করিতেন। অত্রিকে কেহ কখন এই দেবতাটির মাথায় এক গণ্ডূষ জল ঢালিতে বা প্রণাম করিতে দেখে নাই! ইহা লইয়া মনোজ কখনও অভিযোগ তোলে না।

কিন্তু এখন অবাক হইয়া মনোজ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল,—এ কি?

অত্রির পূজা শেষ হইয়াছিল। হাতের ইসারায় সে স্বামীকে দাঁড়াইতে বলিল।

মনোজ স্থাণুর মত নিশ্চল।

গলবস্ত্র হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিয়া অত্রি স্বামীকে প্রণাম করিল।

সহাস্যে মনোজ কহিল,—কি আশীর্ব্বাদ করবো? জন্মান্তরে যেন বিদ্বান্ স্বামী পাও! তোমার যোগ্য।

ত্বরিত কণ্ঠে অত্রি কহিল,—না, না, তোমাকেই যেন পাই জন্ম-জন্ম।

—মাটী করেছে! আবার মহাবীরের সাধ?

—না গো না, তুমি মহাবীর নও! তুমি আমার মহাদেব!

—এ যে দস্তুর মত হেঁয়ালী! জানো তো আমি মুখ্যু মানুষ।

—তুমি আমায় ক্ষমা করো! আমার সব দর্প আজ চূর্ণ হয়েছে।

বিস্ফারিত নেত্রে মনোজ তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অত্রি কহিল,—ঠাকুমা আমাকে চার বছর শিবপূজা করিয়েছিলেন। তার পর পাশ করে আমি কলেজে ঢুকলুম। তবু শিবরাত্রির উপোসটা করতুম। অনেক বড় বড় ঘর থেকে আমার সম্বন্ধ আসতো। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত ক্রমেই ক্ষয় ধরলো।

মনোজ হাসিয়া কহিল,—শেষে অমাবস্যার রাত্রির মত আমি গ্রাস কল্লুম!

অত্রি কহিল,—হাঁ, তাই আমার মনে হতো। কর্ত্তব্য-বোধে তোমাদের সংসারে খেটেছি। এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি! কিন্তু মন কখনও প্রসন্ন হয়নি! ভালোও লাগেনি।

মনোজ কহিল,—তবু স্বামী গুরুজন। অত-বড় আশীর্ব্বাদটা করলুম, ফেরৎ দিলে, নিতে হয়।

অত্রি কহিল,—না! ও আশীর্ব্বাদ নয়, অভিসম্পাত। ওই মিষ্টার মিত্র—যে আজ জেলে, ওরই সঙ্গে আমার প্রথম সম্বন্ধ এসেছিল। তখন ওর বাবা স্যার মিত্র বেঁচে ছিলেন। কত রকম করে ওরা আমায় ক'নে দেখেছিল। শেষে মিষ্টার মিত্র নিজে আমায় দেখতে এলো, আমার সঙ্গে আলাপ করতে, আমায় দেখতে! আমারও খুব ইচ্ছে হয়েছিল, ওর সঙ্গে যেন বিয়ে হয়! শিব-ঠাকুরকে নিত্য প্রণাম করতুম! বাবা ভিটে অবধি বাঁধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন—অমন দুর্লভ পাত্রের হাতে কন্যা দিতে। হ্যাঁ, এক রকম দুর্লভই বটে! তার পর শেষে তারা খেদিয়ে দিলে। অত-বড় লোক আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে পারবেন না! এক জজের মেয়েকে বিয়ে করলে। আশা চুরমার হয়ে যেতে শিবঠাকুরের নাম আর উচ্চারণ করতুম না। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর আমার পূজা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাকে নিষ্ফল করতে দেননি।

মনোজ কহিল,—না, তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। মুখে তাহার তৃপ্তির হাসি।

অত্রি কহিল,—মিষ্টার মিত্রের স্বরূপ চিনলুম মৃদুলার সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে! আমায় বিয়ে করতে পারলে না, কিন্তু সে দিন আমার মনস্তুষ্টি করতে ওর কি ব্যগ্রতা! কি বিনয়-ব্যবহার! শেষে ওর মোটরেই বাড়ী ফিরলুম। বুঝলুম, মৃদুলা কি? তার পর ওদের দু'জনের পরিণাম! উঃ, আমি কি বাঁচা বেঁচেই গেছি! সত্যি বলো তুমি, ঠাকুর আমায় রক্ষা করেছেন কি না?

রহস্যের স্বরে মনোজ কহিল,—সে তুমিই জানো।

দৃঢ় স্বরে অত্রি কহিল,—হ্যাঁ, জানি। তাই এত বছর পরে আবার ফুল, চন্দন, গঙ্গাজল, বেলপাতা নিয়ে বসেছি—দেবতার তুষ্টি সাধন করতে। এই বোশেখ মাসেই ঠাকুমা আমাকে প্রথম পূজা করিয়েছিলেন। আশুতোষ! আমায় আশুতোষ স্বামী দিয়েছেন!

মৃদু হাস্যে মনোজ কহিল,—তবে নেমে এসো অন্নপূর্ণা, ভোজের বামুনরা এসেছে। বলিয়া মনোজ নামিয়া গেল।

মনোজের কেনা নূতন রেডিও-সেট্ খুলিয়া মহানন্দে চঞ্চল আর সুকুমারী গান শুনিতেছিল,—

"এসো হে বৈশাখ এসো,
তাপস-নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা
দূর হয়ে যাক, এসো।
যার ভুলে যাওয়া গীতি
যার ফেলে আসা স্মৃতি,
যার অশ্রু-বাষ্প
সুদূরে মিলায়ে যাক, এসো।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

অতিকায় পতঙ্গ

স্থলচর প্রাণি-সমাজে হাতী এবং জলচর জীব-সমাজে স্পার্ম-হোয়েল তিমি আকারে সকলের চেয়ে বড়। হাতী যত বড় হয়, হঠাৎ যদি তাহার চতুর্গুণ বড় হইয়া ওঠে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইবে! কারণ, ওরূপ অতি-প্রকাণ্ড প্রাণীর অস্থি-পঞ্জরের পক্ষে পাহাড়-পরিমাণ মেদ-ভার বহন করা শেষ পর্য্যন্ত অসাধ্য হইবে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রচণ্ড বেগ সহিতে না পারিয়া সেই প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড-তুল্য প্রাণী সহসা এক দিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে। প্রত্যেক উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীর শরীর কঙ্কাল-রূপ কঠিন কাঠামো আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে। এই কঙ্কাল বা অস্থি-পঞ্জরের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম বা চূণ (ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেট)। এইরূপ উপাদানে নির্ম্মিত পদার্থের বহন বা সহন-শক্তির একটা সীমা আছে। মেদ-ভার বহিবার ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বেগ সহিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া প্রকৃতি দেবী প্রত্যেকটি প্রকাণ্ড প্রাণীর শরীর-বৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই ভার বহিবার ও বেগ সহিবার শক্তি স্থলচর অপেক্ষা জলচর বিশেষ সমুদ্রবাসী প্রাণীর অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। বারিধি-বক্ষ-বিহারী প্রাণীদের পক্ষে বারিধির সুদূর-প্রসারিত সুগভীর বারিরাশি এরূপ আশ্রয় ও সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বেগ তাহাদের দেহের উপর সেরূপ প্রচণ্ড প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারে না। এ জন্য যে-সব প্রাণী সমুদ্রের অসীম সলিলরাশিতে বাস করে, তাহারাই পৃথিবীর প্রাণিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড।

বিরাট্ জীবজগতের এক দিকে তিমি, হাতী প্রভৃতি বৃহত্তম প্রাণী, অন্য দিকে তেমনি আছে অতি সূক্ষ্ম-শরীর আণুবীক্ষণিক জীববৃন্দ। অণুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষিত এই সকল লক্ষ-লক্ষ সূক্ষ্মদেহ প্রাণীকে কয়েকটি পদার্থের কণা বা অণুর সমষ্টি বলা চলে। সেই অণুর সংখ্যার স্বল্পাধিক্যে কোনটি ছোট কোনটি একটু বড়। পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম প্রাণী স্পার্মহোয়েল এবং চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম প্রাণিপুঞ্জ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন একটি স্থান কীট-পতঙ্গ আখ্যাধারী জীবগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহারা যেমন উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর ন্যায় বৃহৎ দেহ দাবী করিতে পারে না, তেমনই আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতার স্তরেও ইহাদিগকে নামিতে হয় না।

কীট-পতঙ্গরা কত বড় হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হয়। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রাণীদের দেহ অভ্যন্তরস্থ অস্থি-পঞ্জরকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কীট-পতঙ্গদিগের দেহের ভিতর কোন অস্থিপঞ্জর বিদ্যমান নাই। ইহাদের দেহের বহিরাবরণ কঙ্কালের কাজ করিতেছে। কঠিন পদার্থে প্রস্তুত এই বর্ম্মবৎ আবরণকে অবলম্বন করিয়া কীট-পতঙ্গদিগের দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের দেহের পেশী ও ঝিল্লিসমূহ এই সুদৃঢ় বহিরাবরণের সহিত সংযুক্ত। এই কঠিন আবরণের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে কোন কীট-পতঙ্গের পক্ষে সেই আবরণকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর হইয়া পড়া সম্ভব হয় না। বৃহত্তর হইতে হইলে সেই আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আবরণ ধারণ করিতে হয়। এই জন্যই বাড়িয়া উঠিবার সময়ে অধিকাংশ কীটপতঙ্গদিগকে দেহের বহিরাবরণ বার বার বদলাইতে হয়। উপরকার বর্ম্মাকার চর্ম্ম বা খোলস না ছাড়িয়া কোন কীট-পতঙ্গই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রজাপতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে শুঁয়া পোকাকে বার বার খোলশ ছাড়িতে হয়। অবশ্য এমন একটা অবস্থা আসে, কীট বা পতঙ্গ যখন বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছায়।

শুধু আকৃতিগত নয়, কীট-পতঙ্গদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও তাহাদের আকার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। প্রত্যেক প্রাণীর শরীর প্রকৃতি কর্ত্তৃক আহার্য্য আহরণের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট। প্রজাপতিরা বৃক্ষমাত্রেই বসে কিন্তু সর্ব্বত্র ডিম পাড়ে না। যে বৃক্ষে শূককীটরা জীবন ধারণ করিবে, ডিম পাড়িবার জন্য সেই বৃক্ষ ইহারা বাছিয়া লয়। অন্যান্য অধিকাংশ কীট-পতঙ্গের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। তাহাদের জীবন, তাহাদের দেহের ক্রম-বিকাশ কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়মের উপর নির্ভর করিতেছে। এ নিয়মে ব্যতিক্রম নাই। যাহারা বৃক্ষের পত্রের উপর জন্মিয়া সেই পত্র কুরিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিবে, সেই পত্র অপেক্ষা তাহাদের দেহ বড় হইলে উহাকে আশ্রয় এবং ভক্ষ্য উভয়-রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে না। কীট-পতঙ্গের জীবনযাত্রা-প্রণালী এমন যে, আকার বৃহৎ হইলে সেইরূপ প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব। আকার ক্ষুদ্র হইলে পারিপার্শ্বিকের সহিত মিশিয়া আত্মরক্ষা যেমন সহজ, আকার বৃহৎ হইলে তেমন হইতে পারে না। ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে আত্মগোপন, আত্মবিলোপসাধন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

আকারে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের সহিত প্রতিযোগিতা কীট-পতঙ্গের পক্ষে সম্ভব নয় বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি কীট-পতঙ্গ আছে যাহাদিগকে (অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় কীট-পতঙ্গদের তুলনায় অতিকায়-আখ্যায় অভিহিত করিলে অন্যায় হয় না) আমরা সুদূর অতীতের অতিকায় প্রাণীদের প্রস্তরাস্থি প্রাচীন প্রস্তর-স্তরসমূহে দেখিতে পাই। অতীতের অতিকায় পতঙ্গদিগের বহু নিদর্শন আমরা প্রাচীন শিলাস্তরে পাইয়াছি। ড্রাগন ফ্লাই (সপক্ষ সর্প-মক্ষিকা) নামে এক প্রকার মক্ষিকাই পতঙ্গগণের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত। যেমন অতীতে অতিকায় হাতী ছিল, তেমনই ড্রাগন ফ্লাইদিগের এক প্রকার অতিকায় পূর্ব্বপুরুষও পৃথিবীর বক্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিদ্যমান ছিল। আদিম অরণ্যানীর বুকে স্রোতস্বিনী ও অন্যান্য জলাশয়ের উপরে বা তীরে তাহারা উড়িয়া বেড়াইত। ঐ সকল অতিকায় পতঙ্গদিগের পাখার আকার 'কার্ব্বনিফেরাস এজ' বা অঙ্গার-যুগের প্রস্তর-স্তরসমূহের বক্ষে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ভূগর্ভ হইতে যে সকল পাথুরে-কয়লা আমরা পাইতেছি, তাহাদের অধিকাংশ অঙ্গার-যুগের অরণ্যসমূহের পরিণতি। অঙ্গার-যুগের লাইমষ্টোন জাতীয় প্রস্তরের গায়ে ঐ সকল অতিকায় পতঙ্গের পক্ষের আকৃতি বেশ সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। স্থানে স্থানে তাহাদের সমগ্র শরীরের আকৃতি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

ঐ সকল অতিকায় পতঙ্গের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তাহারা 'মেগানেউরা মার্নিয়াই' আখ্যায় অভিহিত। ইহাদের প্রসারিত পাখার আকার দু' ফুটের কম ছিল না। এখন আমরা যে সব ড্রাগন ফ্লাই দেখি, অতীতের ঐ সকল অতিকায় মক্ষিকার

আকারও প্রায় সেইরূপ ছিল। পণ্ডিতদিগের অনুমান, ঐ অতিকায় মক্ষিকারাই এখনকার ড্রাগন-ফ্লাই আখ্যায় অভিহিত পতঙ্গদিগের পূর্ব্বপুরুষ। এখনকার এই জাতীয় মক্ষিকাদের কেহই পিতৃপুরুষদিগের স্থায় অতিকায় না হইলেও এমন কতকগুলি ড্রাগন-ফ্লাই এখনও দেখা যায়—যাহারা সাধারণ মক্ষিকার তুলনায় অতিকায়। এখনকার অধিকাংশ ড্রাগন-ফ্লাই 'এজেনাস এলান্স' শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কতকগুলির পাখার আয়তন প্রায় ছয় ইঞ্চি। বর্ত্তমানে আমরা এক জাতীয় ড্রাগন-ফ্লাই দেখিতে পাই, যাহাদের গায়ে চিত্তাকর্ষক বিচিত্র বহু রেখা বিরাজিত। এই রেখাগুলির বর্ণ সাধারণতঃ কালো বা হলুদ রঙের। হলুদ রঙের পরিবর্ত্তে নীল বা সবুজ রঙের রেখাও দেখা যায়। এই সকল চিত্তাকর্ষক বিচিত্র-পক্ষ বিচিত্রকায় বৃহৎ পতঙ্গ সময়ে সময়ে সবেগে ও সশব্দে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পক্ষের স্পন্দন এই শব্দের কারণ। ইহাদের আকস্মিক প্রবেশে বালক-বালিকা বা শিশুরা ভয়চকিত হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। এই সকল অতিকায় পতঙ্গ সাধারণতঃ আলোক-শিখা বা প্রজ্বলিত দীপবর্ত্তিকার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আসে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার পর যখন ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়া ওঠে, তখনই ইহাদের আকস্মিক আবির্ভাবের সম্ভাবনা সমধিক।

আকৃতি ভীতিজনক এবং আখ্যা 'সপক্ষ সর্পমক্ষিকা' হইলেও ড্রাগন-ফ্লাই আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। যে সকল ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ শিকার করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে, শুধু উহারাই ইহাদের বধ্য। জলা জায়গা এই সকল অতিকায় পতঙ্গের জন্ম ও কর্ম্মভূমি। পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, ইহারা শিকার ধরিবার জন্য কতকগুলি জলাশয় বাছিয়া লয়। দেখিলে মনে হয়, এক একটি নির্দ্দিষ্ট জলাশয় বা জলা জায়গার উপর যেন ইহাদের শিকার করিবার বংশগত অধিকার জন্মিয়াছে। দিনের পর দিন সেই নির্ব্বাচিত জায়গাটিতে পোকা-মাকড় শিকার করিয়া ইহারা জীবন রক্ষা করে। ইহাদের দেহ এই কাজ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাদের শিকার করিবার বা ভক্ষ্য প্রাণী ধরিবার প্রণালী বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। ভক্ষ্য কীটটিকে ধরিবার পর পক্ষের উপর রাখিয়া অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত ইহারা উড়িয়া যায় এবং এমন ভাবে বার বার দিক্ পরিবর্ত্তন করে যে, ইহাদের শিকারসহ উড়িবার কৌশল দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। দূর অতীতের ড্রাগন-ফ্লাইদিগের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের ঐ জাতীয় পতঙ্গগণ অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র। যাহাদের প্রসারিত পক্ষের আকার (পক্ষের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত) প্রায় দুই ফিট হইত, তাহাদের দেহের আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা আমরা কল্পনার সাহায্যে অনুমান করিয়া লইতে পারি।

শুধু পতঙ্গই নয়; অন্যান্য কতিপয় প্রাণীও অতীতের অতিকায় পিতৃপুরুষদিগের তুলনায় আকারে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সত্য যুগের মানুষ শুধু অধিক দীর্ঘায়ু নয়, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়ও ছিল। ব্রেজিলের নিবিড় বনানীসমূহের বক্ষে শ্লথ ও আর্ম্মাডিলো প্রভৃতি যে সকল বিচিত্রকায় ও বিচিত্র-স্বভাব প্রাণী আমরা দেখিতে পাই, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ অঞ্চলে উহাদিগের অপেক্ষা বহু গুণ বৃহত্তর ঐ জাতীয় জীব দৃষ্ট হইত। সেই সকল অতিকায় শ্লথ ও আর্ম্মাডিলোর প্রস্তরাস্থি ব্রেজিলের অরণ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের নদ-নদীতে যে সকল দীর্ঘ-নাসা কুমীর বা ঘড়িয়াল দেখা যায়, তাহাদের কোন-কোনটি ২০ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ৫০ ফিট দীর্ঘ করালকায় কুম্ভীরকুলের তুলনায় তাহারা কিছুই নয়। শিবালিকের শিলাস্তরসমূহের বক্ষে ঐরূপ কুমীরের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতরা এই অতিকায় সরীসৃপদিগকে 'ব্রোণ্টোসাউরাস' নাম দিয়াছেন। এ যুগের কোন সরীসৃপই আকারে ইহাদিগের সমান নয়।

প্রত্যেক প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষরা বর্ত্তমান বংশধরদিগের অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল—ইহা সত্য নয়। এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহারা পিতৃপুরুষ অপেক্ষা ক্রমশঃ বৃহত্তর হইয়াছে। একালের অশ্ব দূর অতীতের অশ্বজাতীয় প্রাণীর চেয়ে বৃহত্তর, সে বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। প্রাচীন প্রস্তর-স্তরে অশ্বজাতীয় প্রাণীদের যে সকল অবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অশ্বজাতীয় পশু নেকড়ে বাঘের চেয়ে আকারে উচ্চ ছিল না। 'ম্যামথ' নামক অতিকায় হাতী অতীতে ছিল বটে, কিন্তু এখনকার ভারতীয় হাতী আকারে প্রায় অতীতের অতিকায় হাতীর অনুরূপ। এ যুগের 'গ্রেট স্পার্ম হোয়েল' নামক তিমির মত প্রকাণ্ডকায় প্রাণী কোন কালেই (জলে বা স্থলে) পৃথিবীতে ছিল না।

পৃথিবীতে যত অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট কৌতুকজনক প্রাণী আছে, ফ্যাসমিদ নামক এক প্রকার অতিকায় পতঙ্গ তাহাদের সবার সেরা। ফ্যাসমিদদিগকে সাধারণতঃ কাঠি-পোকা ও পাতা-পোকা বলা হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদদের মতে প্রাণিজগতের ভিতর শ্রেণী-বৈচিত্র্যে ইহারা অতুলনীয়। এই জাতীয় কতিপয় পতঙ্গকে দেখিলে দীর্ঘ তৃণখণ্ড বলিয়া মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মাঠের সবুজ তৃণরাজির উপর এইরূপ পতঙ্গ আমরা প্রায় দেখিতে পাই। দূর হইতে ইহাদিগকে সবুজ ঘাসের অংশ-বিশেষ বলিয়া মনে হয়। শুষ্ক তৃণখণ্ড বা শীর্ণ কাঠির ন্যায় পতঙ্গদিগকেই কাঠি-পোকা বা ষ্টিক্-ইন্‌সেক্ট বলা হয়। এই জাতীয় কতকগুলি পতঙ্গকে ঠিক গাছের পাতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ইহাদিগকেই লিফ্-ইন্‌সেক্ট বা পাতাপোকা বলা হয়। পাতার সহিত পাতা-পোকাগুলির সাদৃশ্য এমন বিস্ময়কর যে, সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা না করিলে পতঙ্গ বলিয়া বুঝা যায় না। এমন কি, গাছের পাতায় যে সকল শিরা-উপশিরার ন্যায় চিহ্ন থাকে, ইহাদের দেহেও সেইরূপ চিহ্ন দেখা যায়।

ফ্যাসমিদগণের পূর্ব্বপুরুষরা ড্রাগন-মক্ষিকাদের পিতৃপুরুষের মত অতিকায় ছিল বলিয়া জানা যায়। প্যালেজোয়িক যুগের অন্যান্য প্রধান প্রস্তরগুলিতে ফ্যাসমিদদিগের অতিকায় পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল অবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কয়েকটি পতঙ্গের নিদর্শন দেখা যায়, যাহাদের দেহের দৈর্ঘ্য ২৫ হইতে ৫০ সেণ্টিমীটর পর্য্যন্ত হইত। ইহাদিগকেই বর্ত্তমানের কাঠি-পোকাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করা হয়। 'টর্কোদিস ভার্জেন্স' আখ্যায় অভিহিত যে অতিকায় পতঙ্গ-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে দেখা যায়, পণ্ডিতদিগের মতে তাহারাই এখনকার কাঠিপোকার বৃহত্তম প্রতিনিধি। ইহাদের মস্তক হইতে উদরের প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ ইঞ্চি। ইহাদের দেহের আকৃতি ও বর্ণ গাছের শুষ্ক

সরু-সরু শাখার অনুরূপ। শুষ্ক তৃণপত্রের মত লম্বা-লম্বা পাগুলি সেই সাদৃশ্যকে অধিকতর বিস্ময়কর করিয়া তুলিয়াছে। কাঠি-পোকার যে চিত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল, উহারা তাহার চেয়ে বহুগুণ বৃহত্তর, এ-কথা কেহ ভুলিবেন না। পেন্সিল ও রুলের সাহায্যে কাগজের উপর ১৮ ইঞ্চি পরিমাপ স্থির করিয়া লইয়া তদনুযায়ী এই পোকার আকৃতি আঁকিয়া লইলে আমরা ইহাদের আকারের অনেকটা ধারণা করিতে পারিব। সাধারণ পেন্সিল যেরূপ মোটা, প্রস্থে ইহাদের দেহ ঠিক তাহার দ্বিগুণ। এই অতিকায় পতঙ্গদিগের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-জাতি আকারে বৃহত্তর এবং স্থূলতর ও দুর্দান্তরও বটে। জলা আবহাওয়াবিশিষ্ট আসাম এবং দক্ষিণাপথের বর্ষা-বারি-সিক্ত অরণ্যানীগুলি প্রকাণ্ডকায় কাঠিপোকাদের বাসস্থলী। শুষ্ক আবহাওয়া ইহাদের জীবন-যাত্রার অনুকূল নয়।

এক প্রকার অতিকায় কাঠিপোকাকে নিউগিনি দ্বীপের আদি-বাসী বলা চলে। ইহারা 'ইউরিক্যানথাস' আখ্যায় অভিহিত। আখ্যার অর্থ মোটা কাঁটাবিশিষ্ট। ইহাদের পা এক প্রকার কণ্টকাকার অংশে পূর্ণ বলিয়া এই নাম। এই জাতীয় কীট দৈর্ঘ্যে এক ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়। কণ্টকাকীর্ণ দেহ বলিয়া ইহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নাড়া-চাড়া করা দরকার। নিউগিনি-দ্বীপবাসী এই পতঙ্গদিগের এক-প্রকার জাতি দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল দ্বীপেও দেখা যায়।
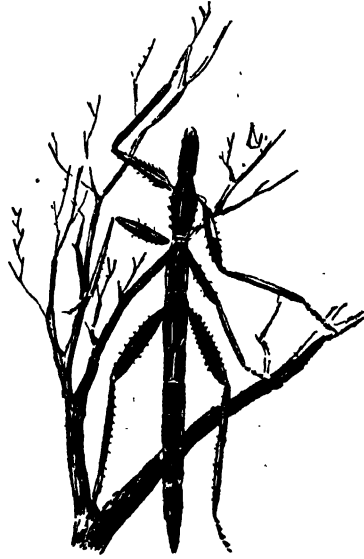
দুই প্রকার গুবরে পোকা—
(১) ও-ওন্টোলাবিস ক্রেভেসো
(২) নিয়োলুকানাস লামা

কাঠি-পোকা

মান্টি বা প্রার্থনাকারী কীট কাঠি-পোকার মত বিচিত্রকায় ও কৌতুকোদ্দীপক। নানা প্রকারের মান্টি দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় অতিকায় পতঙ্গ ভারতবর্ষে প্রায় দেখা যায়। সময়ে সময়ে দীপশিখার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই শ্রেণীর পতঙ্গের কোন একটি আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং তারযন্ত্রের সুরের মত এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। ইহাদের সরু ও লম্বা পায়ের কণ্টকাকীর্ণ ধারালো অংশগুলির জন্য কৌতূহলী বালক-বালিকার দল ইহা-দিগকে 'নাপিত' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। কোন-কোন পণ্ডিতের মতে ওয়েষ্টউড আবিষ্কৃত 'হিয়েরোডুলা' নামক মান্টিরাই ভারতবর্ষবাসী এই জাতীয় পতঙ্গের মধ্যে বৃহত্তম। ইহারাই এ দেশে সর্ব্বাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সবুজ বর্ণবিশিষ্ট পতঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ইঞ্চি। লম্বা ও নরম বুকের উপর অবস্থিত ইতস্ততঃ-সঞ্চালিত মুখটির আকার অত্যন্ত খর্ব্ব বা খাটো। গাছের পাতার মত আকার-বিশিষ্ট নরম পেটটি প্রশস্ত ও পাতলা রেশমী পাখার ভিতর লুকাইয়া আছে বলিলে ভুল হইবে না। সামনের কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পা দু'টিকে বিস্তৃত হাতের মত মনে হয়। মনে হয়, যেন হাত দু'টি বাড়াইয়া প্রার্থনায় রত রহিয়াছে! এই জন্যই ইহাদিগকে প্রার্থনাকারী কীট বা প্রার্থনাকারী মান্টি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই প্রার্থনার ভঙ্গী নিছক ভণ্ডামী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা-মাকড়কে শিকার করিবার জন্যই ইহারা (মৎস্যাভিলাষী পরম ধার্ম্মিক বকের মত) এইরূপ ভঙ্গীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্থানে নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে। শিকার ধরিবার জন্যই পুরোবর্ত্তী পা দু'টিকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে প্রসারিত করে, সন্দেহ নাই। পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া শরীরের সম্মু-খাংশটিকে সোজা করিয়া তুলিয়া যখন ইহারা ভক্ষ্য প্রাণীর প্রতীক্ষায় এইরূপ অদ্ভুত ভঙ্গীতে অবস্থান করে, তখন মনে হয়, শিকার ধরিবার দক্ষতায় ইহারা হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে এই পতঙ্গরা বোধ হয় সিংহ ও শার্দ্দূলকেও অতিক্রম করিয়াছে। শিকার করিবার সময় ইহারা ইহাদের ছোট বা খাটো মাথাটিকে এমন ভাবে এদিক-ওদিক সঞ্চালিত করে যে, বুঝা যায় সকল দিকেই ইহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক। নিকটে ছোট একটি কীট বসিয়া আছে দেখিলে ইহারা তৎক্ষণাৎ শরীরকে শক্ত বা কঠিন করিয়া মাথাটিকে দৃঢ় ভাবে তুলিয়া ধরে এবং পুরোভাগের প্রসারিত বাহু সদৃশ পা দু'টিকে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিয়া মার্জ্জারের মূষিক ধরার ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়া অব্যর্থ সন্ধানে সেই পোকাটিকে আক্রমণ করে। মান্টির কণ্টকাকীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলিঙ্গনে পোকার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া ওঠে। পরে অতিকায় পতঙ্গ ছোট পোকাটিকে মুখে পুরিয়া সাগ্রহে গলাধঃকরণ করে। বোম্বাইএর প্রাণিতত্ত্ব-সম্পর্কীয় সমিতির পত্রিকায় একটি মান্টির বিস্ময়কর শক্তির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পত্রিকায় বর্ণিত ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করিতেছি।

এক প্রকাণ্ড মান্টি বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। পরে একটি (পান বার্ড জাতীয়) পক্ষী ঐ বৃক্ষশাখার নিকটে আসিয়া উড়িতে থাকে। পতঙ্গটি পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় অথবা অন্য কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া তাহার শরীরের সম্মুখাংশের দ্বারা পক্ষীটিকে এমন প্রচণ্ড আঘাত করে যে, সে আঘাতে পক্ষীর মস্তকের লোমচর্ম্মাদি উৎপাটিত হয়। উক্ত প্রাণিতত্ত্ব-সম্পর্কীয় সমিতির

সংগ্রহশালায় ঐ আঘাতকারী অতিকায় পতঙ্গম এবং আহত ও নিহত পক্ষীর শরীর সংরক্ষিত রহিয়াছে।

এক প্রকার দীর্ঘ-দেহ গঙ্গা-ফড়িংকে অতিকায় পতঙ্গমের পর্য্যায়-ভুক্ত করা চলে। ইহাদের মধ্যে আকারে যাহারা বৃহত্তম, তাহারা পক্ষহীন বলিয়া ধাতুগত অর্থের দিক্ দিয়া পতঙ্গম-আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদের লাফাইবার শক্তি উড়িবার শক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে পতঙ্গমের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহারা দেখিতে কদাকার। নিউজীল্যাণ্ডবাসী 'ওয়েট আপুঙ্গা' নামক অতিকায় পতঙ্গদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ইহাদের সূত্রাকার শুঁড় ও কদাকার পা'গুলি ধরিলে এই জাতীয় এক-একটি পতঙ্গমের দৈর্ঘ্য ১৪ বা ১৫ ইঞ্চির কম হইবে না; অথচ শুঁড় ও পা বাদ দিলে মস্তক-সমেত খাস শরীরটির পরিমাপ আড়াই ইঞ্চির অধিক নয়। দেহ পক্ষবিহীন ও ভারি হইলেও ইহারা লাফাইয়া উচ্চ বৃক্ষসমূহের উচ্চতম শাখায় অনায়াসে উঠিতে পারে।

ভেরয়া নামক পতঙ্গমদিগের আকৃতিও বিচিত্র। প্রাণিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা এই অদ্ভুত কীটদিগকে গঙ্গা-ফড়িং না ঝিঁঝি পোকা কোন্ পতঙ্গের

গঙ্গাফড়িং ও ঝিঁঝিঁ পোকার সমন্বয়স্বরূপ বিকটকায় পতঙ্গম
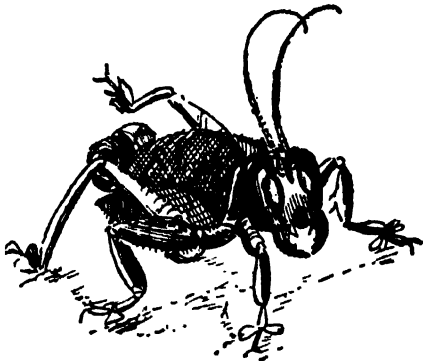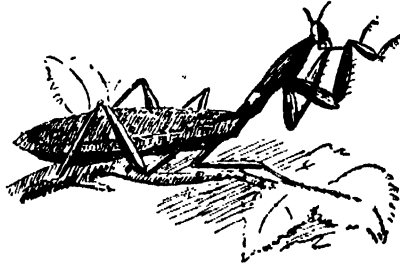
শ্রেণী বা পর্য্যায়ে ধরিবেন, এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে গঙ্গা-ফড়িং ও ঝিঁঝি পোকা—উভয়ের বৈশিষ্ট্যই দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গঙ্গা-ফড়িং ও ঝিঁঝি পোকার সমন্বয়স্বরূপ এই করাল ও কদর্য্য পতঙ্গমকে "শিজোড্যাকটিলাস মনষ্ট্রুয়োসাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। নামটির প্রথমাংশের দ্বারা বিভক্ত অঙ্গুলি বুঝাইতেছে এবং দ্বিতীয়াংশের অর্থ রাক্ষুসে। নামের প্রথমাংশে বুঝায় ইহাদের পায়ের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা। ইহাদের ভীতিজনক মুখাকৃতি দেখিলে নামের শেষাংশটির সার্থকতা বুঝা যায়। দৃঢ় ও কদর্য্য পাগুলি এবং ঈষৎ বক্র ইতস্ততঃ সঞ্চালনশীল সূত্রবৎ শুণ্ড বা শৃঙ্গ ইহাদের আকৃতির বীভৎসতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। দেহ অপেক্ষা পক্ষ বহুগুণ বৃহত্তর বলিয়া পক্ষের প্রান্তভাগ শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগে অদ্ভুত ভঙ্গীতে গুটান রহিয়াছে। ভেরয়ারা বালুকা-বহুল আলগা মাটিতে বাস করে। সাধারণতঃ নদীতীরেই ইহাদিগকে দেখা যায়। নদীর বালুকা-রাশিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে ইহারা অবস্থান করে। ইহাদের পদতলের আকৃতি অদ্ভুত। সাধারণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া ইহাদের পদতল এক প্রকার অসাধারণ সমতল বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই প্রসারিত অংশের জন্য ইহাদের পক্ষে বালুকার উপর দিয়া বিচরণে কোন অসুবিধা বোধ করিতে হয় না। ইহারা মাংসাশী জীব। ইহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে শস্যহানি হয় সত্য, কিন্তু ইহারা শস্য খাইয়া নষ্ট করে না, শস্যক্ষেত্রে গর্ত্ত করিবার সময় ইহাদের দ্বারা শস্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। ভারতে বহু ব্যবধানে বিরাজিত বিভিন্ন প্রদেশে ইহাদের অবস্থান আমাদের বিস্ময় জন্মাইতে পারে। বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে এই জাতীয় পতঙ্গম দেখিয়াছি। ত্রিহুত হইতে বহু দূরবর্ত্তী আসামেও ইহাদের দর্শন মেলে। কোথায় সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব এবং কোথায় মাদ্রাজ প্রদেশের বেলারি; কিন্তু আমরা উভয় অঞ্চলেই ইহাদিগকে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি।

শ্যামবর্ণ অতিকায় মার্ণ্টি

ইউরিকানথাস

এক প্রকার পতঙ্গকে ক্লিওপট্রা বা বীট্‌ল বলা হয়। আমরা ইহাদিগকে গুবরে-পোকা বলি। ইহাদের কতিপয় শ্রেণীকে অতিকায় পতঙ্গমের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। অতিকায় গুবরে-পোকাদের অধিকাংশ 'ডাইনাষ্টাইডিস' নামক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের কতকগুলিকে বর্ত্তমানের বৃহত্তম পতঙ্গম বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হইবে না। এই সকল অতিকায় গুবরে-পোকার মস্তকের ও পশ্চাদ্ভাগের শৃঙ্গাকার অংশগুলিকে একান্ত অসাধারণ বলা চলে। এই শৃঙ্গবৎ প্রত্যঙ্গগুলির কার্য্যকারিতা কি, তাহা বলা সহজ নয়। ইহারা পরস্পর সংগ্রাম করিবার সময় এই প্রত্যঙ্গগুলিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে না। পুরুষ-পতঙ্গদের দেহেই শৃঙ্গবৎ প্রত্যঙ্গগুলি দৃষ্ট হয়। ব্যারণ ভন-হিউজেল জাভাবাসী এই শ্রেণীর গুবরে-পোকার কথা বলিবার সময় জানাইয়াছেন যে, সময়ে সময়ে পুরুষ-পতঙ্গ স্ত্রী-পতঙ্গদিগকে এই সকল শৃঙ্গের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। তবে এই জাতীয় সকল পুরুষ-পতঙ্গের এই প্রত্যঙ্গগুলি এইরূপ ব্যবহারের উপযোগী নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হার্কিউলিস বীট্‌ল্ নামক পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী অতিকায় গুবরে-পোকাদের পুরুষজাতির দেহের দৈর্ঘ্য পাঁচ ইঞ্চির চেয়েও বেশী। ইহাদের লাটিন নাম 'ডাইনাষ্টিস হার্কিউলিস'। 'এলিফাণ্ট বীট্‌ল' (মেগালো সোমা এলিফাস) আখ্যায় গুবরে-পোকারাও আকারে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তাহাদের শৃঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই জাতীয় গুবরে-পোকার এক প্রকার জাতি ভারতবর্ষে দেখা যায়। ইহাদিগকে রাইনসীরস বীট্‌ল বা গণ্ডার গুবরে-পোকা নাম দেওয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে ইহারা রাত্রিকালে

গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। আর এক প্রকার অতিকায় গুবরে-পোকা আছে, তার নাম গোলিয়াথ বীটল। ইহারা পশ্চিম-আফ্রিকায় 'গ্যাবং' অঞ্চলে থাকে। এই প্রকাণ্ডকায় কীটটি আয়তনে প্রায় মানুষের বদ্ধমুষ্টির অনুরূপ। স্ক্যারাব বীটল নামক গুবরে-পোকাদের দৌলতে গুবরে-পোকা নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে। ইহারা গোময়খণ্ডকে গোলক বা বলের আকারে পরিণত করিয়া ক্রীড়কের দ্বারা ফুটবল গড়াইয়া লইয়া যাইবার প্রক্রিয়ায় উহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। ইহারা এই গোময়খণ্ডকে অবশেষে মাটীর নীচে প্রোথিত করে। ইহাও সত্য যে, এই সকল কীট প্রত্যেক গোময়খণ্ডে একটি করিয়া ডিম পাড়ে। ইহাতে এই হয় যে, প্রত্যেক কীট-শিশু জন্মিয়াই মুখের সামনে আহার্য্য পায়। গোময়বহনকারী এই সকল কীট প্রকৃতির প্রেরণায় পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করে। ইহারা যে শুধু ভূমির আবর্জ্জনা দূর করে তাহা নয়, পড়িয়া থাকিলে শুকাইয়া যাহা নষ্ট হইত সেই মূল্যবান সারকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। পরে বর্ষার বারি-ধারার সহিত মিশিয়া সেই সার আমাদের ক্ষেত্র-সমূহের উর্ব্বরতা বাড়াইয়া তোলে। সাধারণ স্কারাব-বীটলরা আকারে তেমন বৃহৎ নয়, কিন্তু গ্রেট স্ক্যারাব-বীটল নামক কীটগণকে অতিকায় পতঙ্গমের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে।

বাটারফ্লাই বা খাস প্রজাপতিদের মধ্যে প্যাপিলস বা চড়াই-পুচ্ছ শ্রেণীর পতঙ্গমরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। চড়াই-পুচ্ছদের ভিতর 'অরিণ থো পেট্রা' বা 'পক্ষীর ন্যায় পক্ষ-বিশিষ্ট' আখ্যায় অভিহিত সম্প্রদায়ের প্রজাপতিরা একান্ত মনোরম। ইহাদের পাখা এত বড় যে, উড়িবার সময় পাখী বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর ভারতবাসী অতিকায় পতঙ্গম-দিগের মধ্যে 'ট্রয়িডিস হেলেনা' বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত। ইহারা দাক্ষিণাত্যে, সিংহলে, আসামে ও ব্রহ্মে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মথদিগের মধ্যে 'গ্রেট আটলাস মথ'কে এই শ্রেণীর ভারতবাসী পতঙ্গদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বলিয়া মনে করা হয়। এই চিত্তাকর্ষক চিত্রিতকায় বিচিত্র পতঙ্গম ভারতবর্ষের শ্যামকান্তি কান্তার-কুন্তলা শৈলমালা সমূহে দেখা যায়। এমন চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য অন্য কোন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গমের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াবাসী 'হার্কিউলিস মথ' ভারতবাসী 'আটলাস মথ'দিগের জ্ঞাতি, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হার্কিউলিস মথ অতি প্রকাণ্ড পতঙ্গম। যখন পক্ষ ও পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া কোন বৃক্ষে ইহারা বসিয়া থাকে, তখন এই জাতীয় এক একটি পতঙ্গ প্রায় ৭২ বর্গ-ইঞ্চি স্থান অধিকার করে।

বাগ্ বা ছারপোকা জাতীয় কীটদিগের মধ্যেও কয়েকটি অতিকায় সম্প্রদায় আছে। পক্ষধর এক প্রকার জলচর অতিকায় ছারপোকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে 'জায়াণ্ট ওয়াটার-বাগ' বা রাক্ষুসে জল-ছারপোকা বলা হয়। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'বেলস্টোমা'। একটি পূর্ণবয়স্ক রাক্ষুসে জল-ছারপোকার দেহের দৈর্ঘ্য পাঁচ ইঞ্চির কিছু কম। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহাদের প্রসারিত পাখার মাপ প্রায় সাত ইঞ্চি। ইহারা হিংস্র এবং মাংসাশী। সামনের শক্তিশালী পায়ের সাহায্যে ইহারা ভক্ষ্য প্রাণীকে আক্রমণ ও অধিকার করিবার পর মুখের চঞ্চু-সদৃশ প্রত্যঙ্গটিকে তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং সাধারণ ছারপোকার শোণিত-শোষণের প্রণালীতেই তাহার শরীরের সমস্ত রস শোষণ করিয়া লয়। ভারত-বর্ষে এই জাতীয় দুই শ্রেণীর কীট দৃষ্ট হয়। দু'টিই অতিকায়। ইহাদের বর্ণ ফিকে বাদামী এবং শরীরের আকৃতি সমতল বা চ্যাপটা। বর্ষার রাত্রে আলোকশিখার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই পক্ষধর অতিকায় ছারপোকাদের একটি বা দুইটি দীপাকৃষ্ট অন্যান্য কীটের সহিত যদি আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করে, তবে তাহাতে বিস্ময় থাকিতে পারে না। আরণ্য ও সজল আবহাওয়াবিশিষ্ট প্রদেশেই এই সব অতিকায় কীট সমধিক দেখা যায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

মন্বন্তর

দুর্ভিক্ষে পীড়িত সর্ব্ব দেশ,
ক্ষুধায় ক্ষয়িষ্ণু তনু পথ-পাশে পতিত অশেষ।

পথ নহে! মানুষ গিয়েছে মরে—শুধু মৃত মানব-কঙ্কাল
পথে-ঘাটে পড়ে আছে আজি এই তের শ' পঞ্চাশ সাল।
শুধু রক্ত-মাংস-হীন
নরদেহ; বক্ষ-পুট নিশ্বাস-বিহীন;
দিন দিন অন্নহীন
দিন দিন আয়ু ক্ষীণ;
পলে পলে পচে-গলে পড়ে তনু-তল।
মানুষের মর্ম্মে বসি নাচে মৃত্যু করি কোলাহল!
বিশাল বিপুল এক শ্মশানের ভয়ঙ্কর রূপ—
বহ্নি-ভস্ম গৃহসেম কালো দানবের মত দাঁড়ায়ে নিশ্চুপ;
মহা-মৃত্যু মহা-অন্ধকার,
স্তিমিত ভয়ার্ত্ত রবে চারি দিক্ করে হাহাকার।

মহা-মন্বন্তর
নিশ্চিহ্ন করেছে হায় বঙ্গ-বংশধর!
মানুষ যে আর নাই,
মানব আবাসে বন্য শৃগাল কুক্কুর এসে নিয়েছে রে ঠাঁই!
জন-শূন্য সব ঘর-বাড়ী,
বিষাক্ত বাতাস শুধু গৃহদ্বারে কেঁদে মরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি;
শুধু মৃত নর-গন্ধ চারি দিক্ হতে ভেসে আসে।
অরণ্য-আবাসে
পড়ে থাকে মৃত পশু-দেহ-ভ্রষ্ট কঙ্কাল অশেষ,
তেমনি হয়েছে বঙ্গদেশ—
ক্ষুধা মৃত্যু মানবের কঙ্কালের অরণ্য-সদন;
নিবে গেছে জীব-শিখা; জ্বলে শুধু করাল নয়ন!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম, এ)

(উপন্যাস)

আট

গিরিধারীর আমন্ত্রণে প্রতাপ তাঁর বাংলোয় ক'বার ঘুরে গেছে। এই অরণ্য প্রদেশে বৃদ্ধ এক-রকম নিঃসঙ্গ বাস করছিলেন। প্রতাপের সঙ্গে পরিচয় হতে এবং তার মধুর ব্যবহারে আর অকৃত্রিম সহানুভূতিতে খুশী হয়ে গিরিধারী তার সঙ্গলাভের জন্য একান্ত উৎসুক থাকতেন। তিনি বলে রেখেছিলেন, সুবিধা পেলেই প্রতাপ যেন নিঃসঙ্কোচে যে কোন সময় এসে তাঁর সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। বৃদ্ধের অনুরোধ প্রতাপ উপেক্ষা করতে পারেনি।

কুসুমিয়ার জীবনও ছিল নিঃসঙ্গ। মণিপুরী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও বাপের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছে, তাতে তার মন যে-স্তরে গড়ে উঠেছে, ঠিক সেই স্তরের কোনো নর-নারীর সাক্ষাৎ-লাভ তার ভাগ্যে ঘটেনি প্রতাপের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পর্য্যন্ত। সুতরাং যে-মুহূর্তে প্রতাপ হঠাৎ এসে তার সম্মুখে আবির্ভূত হলো তার আদর্শের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব নিয়ে, সেই মুহূর্তেই কুসুমিয়া সে-ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলো। দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সময়ই প্রতাপকে তার মনে হলো যেন আপন-জন! প্রতাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তার এতটুকু সঙ্কোচ রইলো না।

কুসুমিয়ার যা-কিছু প্রিয় জিনিষ সেখানে ছিল, একে একে সব সে দেখালো প্রতাপকে। এমন কি, যে গাছ বা যে ফুল তার নিজের ভালো লাগে সেগুলোও একটি একটি ক'রে তাকে দেখিয়ে তাদের গুণগ্রাম ব্যাখ্যা বাদ রাখলো না। ফুল, লতা, পাতা, পাখী, জানোয়ার সকলের উপরেই কুসুমিয়ার দরদ ছিল। প্রতাপের প্রকৃতিও এ সবের বিরোধী নয়। কাজেই কুসুমিয়া যে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতাপের ভক্ত আর অনুরক্ত হয়ে উঠবে, এতে বিস্ময়ের কারণ নেই।

সে দিন অপরাহ্নে প্রতাপের সঙ্গে গিরিধারীর নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কুসুমিয়া অদূরে তাঁতের সামনে বসে একটা খেসের চাদর বুনছিল আর গুন্-গুন ক'রে একটা গানের সুর ভাঁজছিল।

গিরিধারী বলছিলেন,—সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে আমরা আশ্চর্য্য হই সে বৈচিত্র্যের রহস্য বুঝতে পারি না ব'লে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিই উদ্দেশ্য-বিহীন নয়।

প্রতাপ বললো,—আপনার কথা হয়তো সত্য, কিন্তু আমরা তা বুঝবো কি ক'রে?

—বিধাতার করুণায় যদি গভীর বিশ্বাস থাকে তা হ'লেই এ সত্য উপলব্ধি করা সহজ হয়।

—বুঝতে পারলাম না, বরং এমন সব সৃষ্টি দেখা যায়—যাতে সৃষ্টিকর্ত্তার করুণাময়ত্বেই সংশয় জন্মায়।

—স্থূল-দৃষ্টিতে তা হওয়া সম্ভব। ভগবান্ যেমন জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ব্যাধি হ'লে আমরা তাঁর তৈরী প্রকৃতি থেকেই প্রতিকার অর্থাৎ ঔষধ সংগ্রহ করে থাকি। জীবন আর মৃত্যু, আলো আর অন্ধকার যেমন পাশাপাশি অবস্থান করে, ব্যাধি আর তার প্রতিকারও যে তেমনি খুব নিকট ভাবে অবস্থিত, তা বিশ্বাস করা যেতে পারে। পশু-পাখীরাও মানুষের মতো ব্যারাম-পীড়ার অধীন। তারা প্রকৃতি-দত্ত শক্তিতে নিজেরাই প্রকৃতি থেকে ঔষধ সংগ্রহ ক'রে রোগ-মুক্ত হয়। এ কল্পনা নয়, খুব সত্য কথা।

—কিন্তু মানুষ তা পারে না কেন? মানুষও তো ভগবানেরই সৃষ্ট জীব।

—ভগবান তাকে অন্য ভাবে অন্য উদ্দেশ্যে গড়েছেন—মানুষ সত্তাহীন কলের পুতুল নয়। ভগবান তাকে বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার-শক্তি দিয়েছেন! জীবজগতে মানুষ সকলের চেয়ে বড়! মনে হয় যেন ঐ সব শক্তির সদ্ব্যবহার ক'রে সে ক্রমোন্নতির পথে চ'লে অবশেষে সকল শক্তির আধার ভগবানে লীন হ'তে পারবে। জীবন-ধারণের জন্য মানুষকে চলতে হবে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে, এই হলো ভগবানের ইচ্ছা। এই সংগ্রামের মধ্যে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয়।

এই আলোচনার মধ্যে কুসুমিয়া তার তাঁত বন্ধ ক'রে এসে বললে,—বাবা, আজ আর তাঁতের কাজ করবো না। ফরেষ্টার বাবুর জন্য একটু চা এনে দেবো কি?

—হাঁ মা, নিয়ে এসো। চায়ের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—কথা বলতে আরম্ভ করলে আমার আর অন্য কোনো কথা মনে থাকে না। হয়তো আমার বয়সের দোষ। আর একটা কাজ করো মা, আলনা থেকে এণ্ডির চাদরখানা এনে আমার পায়ের দিকটা ঢেকে দাও তো। তার পর প্রতাপের দিকে চেয়ে বললেন,—কুসুমিয়া প্রায় রোজই এমন সময় আমার জন্য চা তৈরি করে। অতিথিকে চা দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারলে ওর ভারী আনন্দ হয়, কিন্তু এই পাহাড়ের দেশে অতিথি মেলে না তো, সে জন্য আমিই অতিথি সেজে ওর 'চা'এর সদ্ব্যবহার করি। আজ সত্যিকারের অতিথি মিলেছে, আজ তার আনন্দ নিশ্চয় অনেক বেশী। এই জন্যই বোধ হয় আজ ও তাঁতের কাজে মন দিতে পারেনি। ও বেশ বুনতে শিখেছে। আমার বিছানা-ঢাকা ঐ যে খেস্‌টা, ওটা ওরই হাতের তৈরি।

এণ্ডির চাদর এনে কুসুমিয়া তার বাবার কথার শেষাংশ শুনতে পেল।

গিরিধারীর বিছানার দিকে তাকিয়ে খেস্‌টা দেখে প্রতাপ বললো—বেশ সুন্দর হয়েছে তো—পাকা হাতের কাজ ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রশংসা শুনে কুসুমিয়ার মুখ আনন্দমিশ্রিত হাসি ও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সে বললো,—আপনি যে জিনিষের এত সুখ্যাতি করছেন, এ দেশের ছোট ছোট মেয়েরাও তার চাইতে ঢের ভালো জিনিষ তৈরি করে।

একটু হেসে প্রতাপ মন্তব্য করলো,—সুতরাং তোমার হাতের কাজ মোটেই ভালো নয় এইটেই প্রতিপন্ন হলো,—কেমন ?

—পাহাড়ী মেয়েরাই এ সব কাজ ভালো পারে, আমি তাই শুধু বলেছি।

—আমার কথার মানে হলো, এত কাল পাহাড়ে বাস করে আর পাহাড়ীদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, ভাষা শিখে তুমিও পাহাড়ী মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নও।

—আপনার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। যাক্, এখন চা নিয়ে আসি। তার পর আপনাকে একটা নতুন জিনিষ দেখিয়ে একেবারে অবাক্ ক'রে দেবো।

—তাই না কি ? নতুন জিনিষ শুনি ?

—এখন বলচি না, বলেই কুসুমিয়া চ'লে গেল রান্না-ঘরের দিকে।

গিরিধারী তখন প্রতাপকে সম্বোধন ক'রে বললেন—কুসুমিয়া তোমাকে যে জিনিষ দেখিয়ে অবাক্ ক'রে দেবে বলচে সেটা আমি আগে থেকে বলবো না—বললে ও ভারী অভিমান করবে।

শান্ত ভাবে হাসি-মুখে প্রতাপ বললো,—তা হ'লে তা বলবার প্রয়োজন নেই। বিশেষ একটু পরে নিজের চোখেই যখন দেখতে পাবো।

—আসল কথা কি জানো, কুসুমিয়ার মুখে একটু হাসি কি আনন্দ দেখতে পেলে আমার এই কঠোর শোকাতুর জীবনে আমি আনন্দ পাই। জানি না, ওর অদৃষ্টে কি আছে! একান্ত স্বার্থপরের মতো সভ্য সমাজের বহু দূরে এই পাহাড় অঞ্চলে আমার কাছে রেখে ওর উপর খুবই অন্যায় করছি কি-না,—এ প্রশ্ন আমার মনে প্রায় এখন জাগে।

—কিন্তু আপনি তো ওর শিক্ষা সম্বন্ধে রীতিমত যত্ন নিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত যতটা দেখেছি তাতে মনে হয়, সভ্য সমাজেও ওর মতো মেয়ে খুব বেশী মিলবে না।

—সমাজে বাস করার ফলে মানুষের যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা জন্মায়, যে সব নিয়ম অনুশাসন মেনে তাকে চলতে হয়, তেমন শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা ওর হয়নি। ফলে, এক দিকে যেমন সমাজের দুর্নীতির ছোঁয়াচ থেকে ও মুক্ত, তেমনি অন্য দিকে সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে ওর একেবারে কোনো জ্ঞানই নেই। কত দিন ভেবেছি, ওকে কোনো সহরে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেবো ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা ক'রে উঠতে পারিনি। তার কারণ, ওকে দূরে রাখলে আমার মনে হয় আমি একটা দিনও বাঁচবো না!

—আপনি দুঃখ করবেন না। সভ্য সমাজের গণ্ডীর বাইরে থেকেও আপনার কাছে ও যে শিক্ষা পেয়েছে এবং যে ভাবে নিজের স্বভাব গড়ে তুলেছে, তাতে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। ও জীবনে কখনো অসুখী হবে না।

একটা কাঠের ট্রের উপর তিন পেয়ালা চা এবং তিন খানা রেকাবিতে কিছু খাবার নিয়ে কুসুমিয়া এসে বারান্দার টেবিলের উপর রাখলো, তার পর তিন দিকে তিনখানা বেতের চেয়ার সাজিয়ে গিরিধারী এবং প্রতাপকে সেখানে সে আহ্বান করলো।

অপরাহ্ণের অস্তগ্র রোদের সোনালি আভায় বারান্দার প্রান্ত তখন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সেই আভা প্রতিবিম্বিত হলো কুসুমিয়ার মুখে—যখন সে তার আসনের কাছে দাঁড়িয়ে চা এবং খাবার পরিবেষণে ব্যস্ত। কুসুমিয়ার সেই আভা-দীপ্ত মুখ প্রতাপের স্মৃতি-পথে টেনে আনলো তেমনি সুন্দর, তেমনি মধুর আর একখানি মুখ! সে মুখের উচ্চারিত বিদায়-বাণীতে যে গভীর আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়েছিল, প্রতাপের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো সেই ছবি এবং কাণে ধ্বনিত হ'তে লাগলো তার সেই কথাগুলি! প্রতাপ যেন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল। তার মনে এ প্রশ্নও জাগলো, ঝিম্‌লিই কি মীরা? যদি তাই হয়, তবে নাগাদের দল ছেড়ে চলে আস্‌তে চাইলো না কেন? প্রশ্নের উত্তর কোন দিক্ দিয়েই প্রতাপ খুঁজে পেলে না। গিরিধারীর কাছে প্রতাপ মীরার প্রসঙ্গ মোটেই তুলতো না তাঁর মনের দিক্ চেয়ে। সেই শোচনীয় প্রসঙ্গে তিনি স্বভাবতঃ অন্তরে আঘাত অনুভব করতেন। এত বৎসরের চেষ্টাতেও তিনি তার সন্ধান পাননি, এ কি কম দুঃখের কথা! প্রতাপ যদি নিশ্চয় করে জানতে পারতো ঝিম্‌লিই সেই হারানো মীরা, তা হলে এ শুভ সংবাদ দিয়ে বৃদ্ধকে উৎফুল্ল করতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতো না। শুধু অনুমান ব'লে তাঁকে নিরর্থক উত্তেজিত করা অসমীচীন-বোধে প্রতাপ মনের যাবতীয় প্রশ্ন এবং সন্দেহ মনের মধ্যে চেপে রেখে চা-পানে মন দিল।

চা জিনিষটা ঐ দিনে একেবারে নতুন। গিরিধারী 'চা'এর একটা ইতিহাস শুনিয়ে অবশেষে বললেন,—"এই 'চা'র ব্যবহার কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, এ-কথা বেশ জোর ক'রেই বলা যেতে পারে। আমার যৌবনের উৎসাহ যদি এখনও তেমনি থাকতো তা হ'লে আমি হয়তো এর চাষ ক'রেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিতাম।

এ কথায় সায় দিয়ে প্রতাপ বললো,—আমারও বিশ্বাস, 'চা'এর cultivation নিশ্চয়ই খুব লাভজনক ব্যবসা হ'য়ে দাঁড়াবে। আমার এ চাকরিতে অসভ্য পাহাড়ীদের নিয়ে যে গোলমালের ব্যাপার ক্রমে বেড়ে উঠছে তার মীমাংসা ক'রে উঠতে পারলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'চা'এর cultivationএ আমি মন দেবো, ভাবছি।

—ভালো আইডিয়া! দেশের ছেলেরা যদি চাকরির মোহ ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে তারই সেবায় আত্মনিয়োগ করতো, তা হ'লে দেশের দুর্গতি অনেকখানি দূর হ'তো।

গিরিধারীর মনের এই দিক্‌কার পরিচয় পেয়ে প্রতাপ তাঁর প্রতি আরো অধিক শ্রদ্ধান্বিত হলো। নাগা-কুকিদের সঙ্গে গোলমালের কথা শুনে গিরিধারী বললেন ;—গোলমালটা কি ভাবে মেটাতে চাও ?

—নাগা রাজার কাছে লোক পাঠিয়েছি, ফরেষ্ট আইনের বিধানগুলো তাকে বুঝিয়ে বলবার জন্ম।

—তুমি মনে করো, এই অসভ্য লোকেরা সে সব বুঝতে চাইবে বা তা মেনে চলবে ?

—না করলে বৃটিশ-শক্তির কাছে তাদের লাঞ্ছিত হ'তে হবে, এ ভয় ওদের নিশ্চয়ই আছে।

—বৃটিশ-শক্তির পরিচয় ওরা এখনো পায়নি। ওরা মনে করে, ওদের তীর-ধনুক আর বর্শার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না এবং এই অফুরন্ত পাহাড়ের কোলে চিরকাল ওরা নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে।

কুসুমিয়া বললে,—বৃটিশ-শক্তির সঙ্গে এক বার সংঘর্ষ হলে ওদের এ ভুল ভাঙবে—তার আগে নয়!

প্রতাপ বললো,—আমি চাই যাতে এই সংঘর্ষ না ঘটে অথচ আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়।

মাথা নেড়ে কুসুমিয়া বললো,—আমার মনে হয় না, আপনার আশা পূর্ণ হবে। অসভ্যদের মনের পরিচয় আপনার বোধ হয় তেমন জানা নেই। ওদের জয় করতে হ'লে চাই ভূতের ভয়, নয় গুঁতোর ভয়! আপনার আলোচনা এখন থাক—চলুন, আপনাকে একটা জ্যান্ত ভূত দেখাই,—আসুন আমার সঙ্গে।

—জ্যান্ত ভূত! তার মানে?

কুসুমিয়ার অধরে মৃদু হাসি। সে আর কিছু না বলে প্রচুর উৎসাহে প্রতাপের হাত ধ'রে তাকে এক-রকম টেনে নিয়ে চললো বাংলোর পিছন দিকে।

বাংলোর পিছনে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জমি,—মাঝখানে বড় একটা সমতল ক্ষেত; তার বুকে সবুজ ঘাসের মসৃণ গালিচা এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো বিচিত্র বর্ণের অনেক পাহাড়ী ফুলের গাছ। ক্ষেতের চারি দিক্ ঘিরে একটি অনতিপ্রসর পথ—পথ এবং বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় প্রায় তিন দিক জুড়ে শাক-সবজির বাগান,—এক কোণে বাঁশের একটা ছোট ঝাড়। প্রতাপকে নিয়ে কুসুমিয়া গেল সেই বাঁশঝাড়ের সামনে বাঁশের তৈরি একটা খোঁয়াড়ের কাছে। সেখানে এসে কুসুমিয়া থামলো দেখে প্রতাপ বলে উঠলো,—তোমার জ্যান্ত ভূত এই বাঁশ-ঝাড়ে বুঝি বাসা বেঁধেছে?

-এ আর মনের ভূত নয়, একেবারে খাঁটি বনের ভূত! কাজেই এখানে এই বাঁশ-বন ছাড়া কোথায় আর বেচারা নীড় বাঁধবে, বলুন?

—তা তো বুঝলাম! কিন্তু তার চেহারাটা তো এখনো মালুম হ'লো না! কিছু মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে হবে না কি? তা হলে সুরু করে দাও।

—সে তো করতেই হবে, কিন্তু আপনি যেন আবার ভুলে 'রাম'-নাম জপ্‌তে সুরু না করেন, তা হলে সে পালিয়ে যাবে।

এ কথা বলে কুসুমিয়া হাসতে হাসতে দু'হাতে বার-কয়েক তালি দিয়ে 'শিম্পু' 'শিম্পু' বলে জোরে ডাকলো।

প্রতাপকে সম্পূর্ণ-বিস্মিত ক'রে বাঁশঝাড়ের ওদিককার এক অদৃশ্যপ্রায় গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো অদ্ভুত জীব—জলচর কি স্থলচর, মাছ কি পশু নির্ণয় করা কঠিন। রুই মাছের ছালের মতো ছালে আচ্ছাদিত তার দেহ লাঙ্গুল-সমেত প্রায় তিন ফুট লম্বা—চারটি পা এবং শব্দহীন মুখখানা নেউলের মুখের মতো!

প্রতাপ অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললো,—এ একটা জ্যান্ত ভূতই বটে! নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই এ রকম জীবের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস হতো না। সত্যি, তুমি আমায় অবাক ক'রেছ এই জানোয়ার দেখিয়ে। কিন্তু একে পাওয়া গেল কোথায়? পশু না মাছ, তাও তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—এই পাহাড়ের এক জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে এক জন মণিপুরী একে ধ'রে ফেলে, তার পর এখানে এনে বাবাকে দেখায়। লোকটাকে দু'টো টাকা বখসিস্ দিয়ে জানোয়ারটাকে বাবা আমার জন্য রাখেন। এ দেশে এ জাতের জানোয়ারকে লোকে বলে 'বন-রুই'। খুব সম্ভব, এর সর্ব্বাঙ্গে মাছের আঁশের মতো আঁশ রয়েছে আর জল ছেড়ে বনে বাস করে, এই জন্য এদের নাম হয়েছে বোধ হয় 'বন-রুই'।

—নামকরণটা অসঙ্গত হয়নি। শুধু পিঠের দিকটা দেখলে একে রুই মাছ বলে ভুল হ'তে পারে।

—বাবা বলেন, আসলে এটা এক-জাতের **Ant-eater** (পিপীলিকাভুক্ জীব)—ল্যাটিন নাম **Manis Pentadactyla.**

—ওর শিম্পু নামটা বোধ করি তুমি দিয়েছ! ও তো দেখছি খুব অল্প সময়েই তোমার বশ হয়েছে।

—আমি ভূত-পোষা মন্ত্র জানি কি না, তাই ওকে সহজে বশ করতে পেরেছি। এ কথা বলে কুসুমিয়া এক-গাল হেসে শিম্পুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল খোঁয়াড়ের মধ্যে তাকে আদর করবার জন্য। প্রতাপের আশঙ্কা হলো জানোয়ারটা হয়তো কুসুমিয়ার হাত কামড়ে দেবে! তাই সে কুসুমিয়ার বাড়ানো হাতখানা টেনে রাখবার উদ্দেশ্যে নিজের ডান হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলো,—থামো, থামো, হাত বাড়িও না—এ সব জংলি জানোয়ারকে অত বিশ্বাস করতে নেই।

কুসুমিয়া হাসতে হাসতে উত্তর দিল,—জংলি মেয়ের সঙ্গে জংলি জানোয়ারের ভাব থাকতে পারে, সেটা ভুলে যাবেন না। তা ছাড়া শিম্পু আমার মন্ত্রের বশ! সে আমার কোন অনিষ্ট করবে না।

সত্যই কুসুমিয়ার কোমল হাতের স্নেহ-স্পর্শ-লাভের আশায় শিম্পু ঠিক পোষা বেরালের মতো কাছে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কুসুমিয়া তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,—দেখলেন তো আমার মন্ত্রের গুণ! তার পর প্রতাপের দিকে চেয়েই সে ভয়ে-বিস্ময়ে বলে উঠলো,—এ কি! আপনার পোষাকে রক্তের দাগ কেন?

—রক্তের দাগ! বলো কি, কোথায়?

—ঐ যে বাঁ দিকে হাঁটুর কাছে।

—তাই তো, এ তো দেখ্‌ছি টাট্‌কা রক্ত! কোত্থেকে এলো বুঝ্‌তে তো পাচ্ছি না।

সেই মুহূর্ত্তেই কুসুমিয়ার চোখ পড়লো প্রতাপের বাঁ হাতে এবং সে দেখলো, সে জায়গাটা রক্তে একেবারে লাল হয়ে আছে; আর সেখান থেকে টপ্ টপ্ ক'রে রক্ত পড়ছে। তখনই সে ঐ হাতটা ধরে ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো:—কি সর্ব্বনাশ! আপনার এই হাতের তলাটাই যে কেটে গেছে, আর ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আপনি দেখছি টের পাননি। ও মা, কি হবে!

প্রতাপ তখন ক্ষত স্থান দেখে একটু চম্‌কে উঠে বললো,—এই খোঁয়াড়ের বেড়ার মুলী বাঁশের উপর আমার বাঁ হাতের চাপ বোধ করি একটু বেশি জোরে পড়েছিল, তাইতে বাঁশ ফেটে হাতের তলা একটু কেটে গেছে। এতে তুমি অত ভয় পাচ্ছো কেন? আমাদের

এ রকম কত কি হয়। কাটা জায়গাটা আমি এই ডান হাতে চেপে রাখলাম, আর রক্ত পড়বে না। চলো, এখন বাংলোয় ফিরে যাই, তোমার বাবার কাছে নিশ্চয় একটু টিংচার আওডিন পাওয়া যাবে।

কুসুমিয়া কোনো জবাব না দিয়ে প্রতাপকে এক রকম টেনে নিয়ে চললো বাংলোর দিকে। তার চোখ জলভারাক্রান্ত, মুখ কাঁদো-কাঁদো। যেন সে ভয়ানক একটা অপরাধ ক'রে বসেছে! প্রতাপ তা লক্ষ্য ক'রে কুসুমিয়ার মনকে একটু হাল্‌কা করার উদ্দেশে হাসতে হাসতে বললো,—হাতে সামান্য একটুখানি আঁচড় লেগেছে, এর জন্য তোমার চোখে দেখছি বন্যার আবির্ভাব,—আর একটু বেশি হলে সে স্রোতে তুমি হয়তো ভেসে যেতে।

—আপনি হাসচেন, কিন্তু বুঝতে পাচ্ছেন না হাতের কতখানি কেটে গেছে। আমি আপনাকে এখানে নিয়ে না এলে আপনার হাতের এ দুরবস্থা কখখনো হতো না।"

—অতএব এর জন্য তুমিই দায়ী এবং অপরাধ সম্পূর্ণ তোমার! আর আমি যে বেকুবের মতো গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চেপে বাঁশটা ভেঙে দিলাম তাতে আমার অপরাধ হলো না? চমৎকার যুক্তি তোমার।

—অত যুক্তি-টুক্তি আমি বুঝি না। দোষ যারই হোক, ব্যথা তো পেলেন আপনি। এই ব্যথা নিয়ে আপনি হয়তো ক'দিন কোনো কাজ-কর্ম্ম করতে পারবেন না।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেচারির চোখ দু'টি আবার সজল হয়ে উঠলো; গলার স্বরেও যেন বেদনার সুর ধ্বনিত হলো। কুসুমিয়ার চোখের ভাব প্রতাপ লক্ষ্য করতে পারলো না, কিন্তু তার কণ্ঠের করুণ সুর স্পষ্ট অনুভব করলো। এই বালিকার হৃদয় যে একান্ত স্নেহশীল এবং পরদুঃখকাতর, প্রতাপের কাছে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো বিশেষ ভাবে।

একটু পরেই তারা বাংলোতে পৌঁছুলো। বারান্দায় পা দিয়েই গিরিধারীকে সামনে দেখতে পেয়ে কুসুমিয়া ব্যস্ত ভাবে বললো,—এই দ্যাখো বাবা, ফরেষ্টার বাবুর হাত কি রকম ভয়ানক কেটে গেছে। উনি বল্লেন, একটু টিংচার আওডিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে। এখনও রক্ত বন্ধ হয়নি। বন-কুইএর থোঁয়াড়ের বাঁশটা হঠাৎ ফেটে হাতের তলা কেটে গেছে। তুমি যদি এ জায়গাটা একটু চেপে ধরে রাখো, আমি তা'হলে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পারি।

এ কথা শুনে গিরিধারী এগিয়ে এসে প্রতাপের হাত ধরতে গেলেন। প্রতাপ তাঁকে বাধা দিয়ে নিজেই নিজের হাত চেপে রাখলো।

গিরিধারী তখন কুসুমিয়াকে বললেন,—তাড়াতাড়ি বিশল্যকরণীর কটা পাতা আর এক টুক্‌রো কাপড় নিয়ে এসো মা। টিংচার আওডিনের চাইতে বিশল্যকরণী বেশি কাজ দেবে।

—আশ্চর্য্য! বিশল্যকরণীর কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম—যাই, এখনি নিয়ে আসচি। ব'লে কুসুমিয়া ছুটে গেল বাংলোর পূব ধারের বারান্দার দিকে।

গিরিধারী প্রতাপের হাতটা ভালো রকম পরীক্ষা ক'রে বললেন, —প্রায় দু'ইঞ্চি কেটেছে। কাটা সামান্য নয়। এই ঘা আর রক্ত দেখে কুসুমিয়া যে বিচলিত হয়েছে, তাতে আশ্চর্য্য বোধ করছি না, কিন্তু ওকে যে ওষুধ আনতে বলেছি সে পাতা দিলে কাটা ঘা-ও এক দিনে জুড়ে যাবে, কোন রকম যাতনা থাকবে না।

প্রতাপ জিজ্ঞেস্ করলো,—আপনার এ ওষুধ কি রামায়ণের সেই বিশল্যকরণী?

সেই বিশল্যকরণী! আমাদের এ দেশের বনে-জঙ্গলে এ রকম কত অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ পড়ে আছে, কে তার খোঁজ রাখে!

কুসুমিয়া তখনি দশ-বারোটা বিশল্যকরণীর পাতা এবং ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে হাজির হলো। পাতাগুলো দু'হাতে বেশ করে রগড়ে গিরিধারী ক্ষত স্থানের উপর তার রস ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-পড়া বন্ধ হলো। তার পর তিনি সেই রগ্‌ড়ানো পাতাগুলো ক্ষত স্থানের উপর বেঁধে দিলেন।

প্রতাপ কোনো রকম জ্বালা-যন্ত্রণা বা বেদনা অনুভব করলো না। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায় দেখে প্রতাপ বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলো! বিদায় কালে কুসুমিয়ার ছল-ছল চোখ আবার সজল হ'য়ে উঠলো! সে যেন তখনো নিজেকেই অপরাধিনী মনে করে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল। প্রতাপের আহত হাত ধরে সে শুধু বললো,—আজ আপনার আপিসে ফিরে যেতে খুব কষ্ট হবে, একটু রাতও হবে—খুব সাবধানে পথ চলবেন।

প্রতাপ স্নেহের সুরে উত্তর দিলো,—মিছিমিছি মন খারাপ করছো। এই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতেই ঘোড়ার রাশ ধ'রে আমি দিব্বি যেতে পারবো, কোনো কষ্ট হবে না। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের এই ওষুধের গুণে হাত যেন এরই মধ্যে ভালো হ'য়ে গেছে। সত্যি বলচি, একটুও অসুবিধা বোধ করছি না।

অদূরে প্রতাপের ঘোড়া প্রস্তুত ছিল। সেই ঘোড়ায় বাংলো থেকে বেরিয়ে কিছু দূর এসে প্রতাপ এক বার পিছনে তাকিয়ে দেখলো, কুসুমিয়া তখনও বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক-দৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। এই বালিকা যে প্রতাপের হাত কেটে যাওয়ায় প্রকৃত ব্যথিত হয়েছে এবং সে জন্য নিজেকে দোষী মনে করে কষ্ট পাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু শুধু তাই? যে-মুহূর্ত্তে প্রতাপ দৃষ্টির আড়াল হলো, কুসুমিয়ার মনে হলো যেন বিরাট একটা শূন্যতা এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে! এ রকম অবস্থা তার আর কখনো হয়নি। সে তখনি সেখানে বসে পড়লো।

প্রতাপ ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে ক্ষণে-ক্ষণে তার মনে প্রতিবিম্বিত দেখতে পাচ্ছিল কুসুমিয়ার সেই করুণ মূর্ত্তি—সেই সজল চোখ! প্রতাপের মনে হলো, বালিকা যেন স্নিগ্ধ আকর্ষণে তাকে তার দিকে টেনে নিচ্ছে! আবার সেই মুহূর্ত্তেই তার স্মৃতিপথে জেগে উঠলো আর একখানি মুখ—বন্য অসভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও যার সুষমা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কিছু দিন আগে প্রতিভাত হয়েছিল তার সামনে! নাগা-বেশিনী ঝিমলি এক দিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল নর-রাক্ষস নান্দুর কবল থেকে। নিষ্ঠুর নাগাদের আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি চ'লে যাবার জন্য ঝিমলি সে দিন প্রতাপকে কি কাতর অনুনয় না করেছিল! প্রতাপ তা ভুলতে পারেনি। রহস্যময়ী ঝিমলি প্রতাপের হৃদয়ের যে স্থান অধিকার করে রয়েছে, কুসুমিয়া এখনও সেখানে পৌঁছুতে পারেনি!

নয়

বেলা তখন ঠিক দুপুর। মধ্য-গগন থেকে সূর্য্যের উগ্র রশ্মি পাহাড়ের বুকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতাপ তার আপিস-ঘরের দোর-জানালা সব খুলে দিয়ে লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত। নাগা-রাজার কাছে মাংফুকে পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিনিধিরূপে সেই কত দিন আগে, আজও সে ফিরে এলো না—কোনো সংবাদও পাঠালো না! লোকটা যেন একেবারে উবে গেছে। প্রতাপ এর কোনো হেতু নির্ণয় করতে পারলো না। নাগাদের রাজা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন না মানতে পারে, কিন্তু মাংফুর ফিরে না-আসার ব্যাপারটা প্রতাপের কাছে ভালো বোধ হলো না,—শঙ্কাজনক মনে হতে লাগলো। রাজা কি তাকে ধরে আটক করে রেখেছে কিংবা তার উপর কোনো রকম জুলুম অত্যাচার আরম্ভ করেছে? সংশয়ে দুশ্চিন্তায় প্রতাপ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ছিল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আপিস-ঘর থেকে বেরুবে ভেবে বাইরের দিকে চেয়েই প্রতাপ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, অদূরে প্রায় তিন-চার শো নাগা তার আপিস-বাড়ীর চার দিক্ ঘেরাও করে ফেলেছে। কোনো সদুদ্দেশ্য নিয়ে যে তারা এ কাজ করেছে প্রতাপ তা মনে করতে পারলো না। আপিস-ঘরের কোণে তার হাতের খব কাছেই ছিল গুলী-ভরা দো-নলা বন্দুক। কিন্তু এই একটি মাত্র বন্দুক নিয়ে প্রতাপ একা এত লোকের সঙ্গে পেরে উঠবে কি? কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক জন মাত্র হেডগার্ড এবং এক জন গার্ড সে দিন আপিস-বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিল তাদের নিজেদের ঘরে। বাকী লোকজন সরকারি কাজে দূরে বেরিয়ে গিয়েছে। প্রতাপ ভাবলো, গার্ডদের ডাকবে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ দু'জন জোয়ান চেহারার নাগা আপিস-ঘরে ঢুকে মিশ্র-আসামী ভাষায় প্রতাপকে সম্বোধন করে বললো;—বাবু, দু'টা পয়সা দে, নদী পার হবো।

আপিসের কাছ দিয়েই একটা পার্ব্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছিল,—তার অপর পার থেকে আরম্ভ করে যে গভীর অরণ্য পাহাড়-প্রদেশের সুদূরে বিস্তৃত, তারই বিভিন্ন স্থানে নাগাদের বসতি। প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল অসভ্যদের রাজার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে গবর্ণমেণ্টের আইন প্রচলন করবে, সুতরাং তাদের সঙ্গে সকল প্রকার বিরোধ এড়াবার অভিপ্রায়ে বন্দুক ব্যবহার না করে আগন্তুক নাগা দু'জনকে তাদের প্রার্থিত খেয়ার পয়সা দেওয়াই সে সঙ্গত মনে করলো। এতটুকু বিরক্তি বা আপত্তির ভাব না দেখিয়ে প্রতাপ চেয়ার থেকে উঠে ক্যাশ্-বাক্স খুলে পয়সা দেবার জন্য এগিয়ে গেল সেই বাক্সের দিকে, কিন্তু তাকে বাক্স খুলতে হলো না। অকস্মাৎ দুই বিশাল হাত তার হাত দু'খানা সজোরে চেপে ধরলো এবং তাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে পলকের মধ্যে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। প্রতাপ চেঁচাতে যাচ্ছিল কিন্তু চেঁচাতে পারলো না, নাগারা তার মুখ চেপে ধ'রে তাকে মাটীর উপর সটান শুইয়ে দিল। সেই মুহূর্ত্তে বন্যার স্রোতের মতো ছুটে এলো নাগার দল তীর আর বর্শা হাতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে। প্রতাপের আশঙ্কা হলো, সেখানে সেই মুহূর্ত্তেই বুঝি তার দেহ তীরে-বর্শায় বিদ্ধ হয়ে মাটীতে লোটাবে! কিন্তু তা হলো না। নাগারা তার হাত-পা বেঁধে তাকে একটা মজবুত বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে চললো—মুখে বিকট জয়ধ্বনি!

প্রতাপের হেড্গার্ড আর গার্ড তাকে রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারলো না! কারণ, প্রতাপকে যে-সময় বেঁধে ফেলা হয়, ঠিক সেই সময়েই অপর ক'জন নাগা গার্ডদের ঘরে ঢুকে তাদেরও বাঁধে এবং হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় তাদের সেইখানে রেখে চলে যায়। সে অবস্থায় পড়ে থেকেই তারা দেখলো, নাগারা প্রতাপকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের আশঙ্কা হলো, প্রতাপকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে—গার্ডদেরও মেরে ফেলবে। ভয়ে আধ-মরা হয়ে তারা ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সেইখানেই পড়ে রইলো।

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় ফিরে এলো অনুপস্থিত গার্ডের দল। এসে অন্য গার্ডদের দুরবস্থা দেখে তারা চম্‌কে উঠলো! তাদের বন্ধন-মুক্ত করে যখন শুনলো, নাগারা প্রতাপকে বেঁধে নিয়ে গেছে, তখন ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। বিদ্রোহী নাগারা যে-কোনো মুহূর্ত্তে আবার সদলবলে এসে অনায়াসে তাদের হত্যা ক'রে যেতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

হেডগার্ড উমাচরণের পরামর্শ-মতো তখনই ভীম সিংএর মারফৎ দূরবর্ত্তী তার আপিসে দু'খানা টেলিগ্রাম পাঠানো হলো—একখানা ফরেষ্ট-রেঞ্জারের নামে, অপরখানা সুরমা-ভ্যালির ডেপুটি-কমিশনরের নামে।

গার্ডদল তার পর প্রতাপের সন্ধানে তৎপর হলো; কিন্তু এই ক'জন মাত্র লোকের সাহস হলো না—নাগা-পল্লীর দিকে গিয়ে প্রতাপের সন্ধান করে কিংবা তার উদ্ধারের চেষ্টা করে!

দশ

মন্ত্রী, পারিষদবর্গ এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিয়ে রাজা লি-ওয়াঙ্ দরবারে বসেছে রাজবাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। প্রাঙ্গণের চারি দিকে সশস্ত্র নাগা সৈনিক পাহারাদারী করছে। একটা বড় মশালের আলোয় প্রাঙ্গণ-ভূমি আলো হয়ে আছে। মাদলের উপর মৃদু আঘাতের ধ্বনি সকলের মনে জাগিয়ে তুলছে সুগভীর উন্মাদনা। একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপারেই যে আজ দরবার ডাকা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ ছিল না। রাজার ব্যক্তিগত মত প্রবল হলেও জরুরি ব্যাপার মাত্রেই রাজা পারিষদদের নিয়ে আলোচনা ক'রে তাদের পরামর্শ নিয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। সাধারণতঃ রাজার মতের সঙ্গে পারিষদদের মতের বিরোধ ঘটে না।

দরবারে প্রায় একশো লোক জড়ো হয়েছে। পারিষদবর্গের দিকে তাকিয়ে রাজা যখন দেখলো তাদের মধ্যে কোনো প্রধান ব্যক্তি অনুপস্থিত নেই, তখন তার ডান দিকে উপবিষ্ট মন্ত্রীর কানে কি একটা কথা বললো। মন্ত্রীর ইঙ্গিতে তখনই যম-দূতের মতো চেহারার দু'জন লোক দরবার থেকে বেরিয়ে গেল এবং ক' মিনিট পরেই ফিরে এলো পিঠের দিকে দু'খানা হাত বাঁধা এক সুদর্শন যুবক বন্দীকে নিয়ে। চারি দিক্ থেকে তুমুল ভাবে ধ্বনিত হতে লাগলো প্রতিহিংসামূলক বিকট চিৎকার এবং আস্ফালন, যেন মুহূর্ত্তে তারা যুবককে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে খেয়ে ফেলবার জন্য ব্যাকুল! প্রত্যেকের চোখ থেকে ঠিক্‌রে পড়ছিল বিদ্বেষের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। যুবক বন্দী প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করছিল, এখনি বুঝি শত্রুর তীর বা বর্শার আঘাতে তার দেহ ভূলুণ্ঠিত হবে!

উত্তেজনা ক্রমে ভীষণতর হয়ে উঠছে দেখে রাজা দাঁড়িয়ে সকলকে

শান্ত হবার জন্য আদেশ করলো। মুহূর্ত্তে কোলাহল গেল থেমে। রাজার আদেশকে এ অসভ্যেরা দেবতার আদেশ বলে মানে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে যুবক-বন্দী রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মৃত্যুর আদেশ শোনবার প্রতীক্ষায়।

নাগা ভাষায় রাজা ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে এর পর যা বললো, তার মর্ম্ম:—এই কয়েদীকে আমরা ধ'রে এনেছি, যেহেতু সে ইংরেজ রাজার কর্ম্মচারী হিসাবে আমাদের রাজ্যে ইংরেজের জংলি আইন চালাতে চায়। ইংরেজের আইন আমরা চাই না এবং মানি না। জোর-জবরদস্তি ক'রে তারা আইন চালাতে চেষ্টা করলে আমরা চুপ করে ঘরে বসে থাকবো আর সে আইন মেনে চলবো? আমাদের দেহে শক্তি নেই? মনে জোর নেই? আমি জানতে চাই, আমাদের আর আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের চিরকালের বাসভূমি এই পাহাড়—যার উপর আমাদের চিরকালের অধিকার, সে অধিকার ছেড়ে দিয়ে আমরা ইংরেজের অধীন হবো? না, এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবো? আমরা এমন কাপুরুষ?

চারি দিক্ থেকে উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—কখ্খনো না। যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেবো তবু অধীনতা মানবো না।

—বেশ কথা, আমরা যুদ্ধই করবো, দেশ ছাড়বো না! এখন এই যে কুত্তাকে ধ'রে আনা হয়েছে, এর সম্বন্ধে কি করা উচিত?

সমস্বরে ক'জন চেঁচিয়ে বললো,—এখনি ওর মুণ্ডুটা কেটে রাজবাড়ীতে ঝুলিয়ে রাখা হোক।

সেনাপতি নাম্দু তখন সকলকে থামিয়ে জোর গলায় বললো—ইংরেজের এই জংলি পুলিশ আমাদের শত্রু, মরণই এর একমাত্র শাস্তি। রাজার হুকুম হলে এখনই এই বর্শা দিয়ে ওকে শেষ করে ফেলতে পারি।—ব'লেই সে বর্শাটা ধরলো বন্দীর বুক লক্ষ্য করে।

বাধা দিয়ে রাজা বললো,—থামো নাম্দু, থামো। এই কুত্তাকে মারবার জন্য তোমার মতো শক্তিমান্ সেনাপতির দরকার হবে না, বিশেষ ও যখন আমাদের বন্দী। ওকে আমরা মেরে ফেলেছি জান্তে পারলে এখনই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে আসবে। আর যদি ওকে না মেরে শুধু বন্দী করে রাখি, তা হলে একে খালাস করবার জন্য ইংরেজ আমাদের সঙ্গে রফা করতে চাইবে। আমার মনে হয়, ইংরেজ কি করতে চায়, আগে তা দেখা ভালো। যদি তারা কোনো রকম রফা করতে রাজি না হয়, তখন যুদ্ধ তো করবোই। আগে দেখা যাক, কি করে তারা।

রাজার এ কথার প্রতিবাদ করতে কারো সাহস হলো না। সকলেই এ কথায় সায় দিল। রাজা তখন আদেশ করলো যুবককে আপাততঃ বন্দি-শালায় রাখা হোক্।

একটা মানুষকে হত্যা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলেও সভাসদ এবং কর্ম্মচারীরা রাজার আদেশ-পালনে তৎপর হলো। মন্ত্রীর ইঙ্গিতে যে দু'জন লোক প্রতাপকে দরবারে হাজির করেছিল, তারাই আবার তাকে দরবার থেকে বাইরে নিয়ে গেল। এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশি মর্ম্মাহত এবং নিরাশ হলো সেনাপতি নাম্দু। তার হিংস্র মন একান্ত উৎসুক হয়েছিল প্রতাপের মুণ্ডহীন দেহ দেখবার আশায়। রাজা কেন যে এমন মজার ব্যাপারে বাধা দিল, নাম্দু তা বুঝ্তে পারলো না।

রাজা আবার বললো,—আমরা নাগা-জাত বীরের জাত,—লড়াইকে আমরা ডরাই না। যখন দরকার হবে জান্ দিয়ে লড়াই করবো! তার আগে আমরা চাই ইংরেজকে জব্দ করতে এই জংলি পুলিশটাকে আট্‌কে রেখে। ওকে মেরে ফেল্লে মিটমাট তো হবেই না, বিনা-লড়াইয়ে জব্দ করাও চলবে না।

রাজার প্রত্যেকটি কথার সমর্থন করে মন্ত্রীও ছোট-খাটো বক্তৃতায় রাজার কথা সকলকে বুঝিয়ে বললো। কোনো দিক্ থেকে প্রতিবাদ উঠলো না। কাজেই দরবারের কাজ তখনই শেষ হলো।

দরবারে যে সব কথা বা বক্তৃতা হয়েছিল, প্রতাপ তার একটি বর্ণ বুঝতে পারেনি, কারণ, নাগা-ভাষা সে জানতো না।

বন্দী প্রতাপকে নিয়ে রাখা হলো ছোট একটা কারাগৃহে কড়া পাহারায়। তার উপর কোনো দুর্ব্ব্যবহার করা হতো না, কিন্তু আহারের যে ব্যবস্থা হলো তার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কুকুর, শেয়াল, হরিণ, মেষ বা সাপের মাংস—যখন যা জুটতো, তা-ই আসতো তার আহারের জন্য। নিরামিষভোজী প্রতাপ এ সব স্পর্শ করতো না, কাজেই তাকে থাকতে হতো সম্পূর্ণ অনাহারে। দু'দিন পরে রক্ষীরা যখন এ অবস্থা বুঝতে পারলো তখন ফল-মূলের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু তাতেও তার অসুবিধা দূর হলো না, কারণ, তার জন্য বনের যে সব বন্য ফল আসতো, সেগুলোর বেশির ভাগই থাকতো কাঁচা আর শক্ত, কাজেই আহারের অনুপযোগী। প্রাণ-ধারণের জন্য প্রতাপকে শেষে বাধ্য হয়ে সেই সব ফলই চিবুতে হতো। তার শয্যার উপকরণ ছিল গাছের শুকনো পাতা; পানের জন্য জল দেওয়া হতো বাঁশের চোঙায়—তবে জল ছিল পরিষ্কার—খুব সম্ভব ঝরণার জল।

এ অবস্থায় প্রতাপের ক'দিন কেটে গেল। কি উদ্দেশ্যে নাগারা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রতাপ অনুমান করতে পারলো না। কারা-জীবন তার দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো। না পারে সে কারো সঙ্গে কথা বলতে, না বোঝে কারো কথা! নিজের কোন অসুবিধার কথাও যে জানাবে তাও পারে না—নাগাদের ভাষা জানে না বলে। এই মূক-জীবনের আনুসঙ্গিক কষ্ট এবং অসুবিধার উপর র'য়েছে তার অনিশ্চিত ভাগ্যের চিন্তা। এখানে এসে কেউ যে এই দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে, এ আশা ছিল না। তবে এ বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তার এই বিপন্ন অবস্থার খাঁটি সংবাদ জানতে পারলে কখনোই চুপ করে থাকবে না, তার উদ্ধারের চেষ্টা করবে। কিন্তু সে কত দিনে? তত দিন তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে কি? নাগারা হয়তো তাকে পাহাড়ের এমন কোনো নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রাখবে, যেখান থেকে তাকে খুঁজে বার করাই অসম্ভব হবে। এ-সব দুশ্চিন্তায় তার দিন কাটতে লাগলো অনিদ্রা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন

রণ-সাজের আর এক দিক

যে-সব সেনা যুদ্ধ করিতে যায়, তাদের জন্য চাই বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণাদি রক্ষা-আবরণ! কিন্তু সম্মুখ-সমরে না গিয়া আশেপাশে যারা অন্য কাজ করিতেছে —যেমন নার্শ, পাহারাদার প্রভৃতি, সাধারণ পোষাক পরিয়া কাজ করিতে তাদের বহু বিপত্তির আশঙ্কা। সমর-মঞ্চের পাশে নেপথ্যের অন্তরালে কাজ করেন নার্শ, রক্ষী, প্রহরী এবং প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরা। ইঁহাদের এমন বেশভূষা প্রয়োজন, যাহাতে রৌদ্র-শীত নিবারিত হইবে—বৃষ্টি-তুষার-বর্ষণে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটিবে না,—সর্ব্বোপরি বেশভূষা দেখিয়া শত্রুপক্ষ তাঁদের নিশানা পাইবে না! এ জন্য বিভিন্ন বিভাগের জন্য নব নব পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইয়াছে। নার্শদের জন্য তৈয়ারী হইয়াছে পুরু আলপাকার লাইনিং দিয়া পশমী কোট-জ্যাকেট এবং মাথা ও অঙ্গ-আবরণের জন্য আচ্ছাদনী। মাথা এবং অঙ্গ-আচ্ছাদনীটি শালের মত পিঠে পড়িয়া থাকে—প্রয়োজন হইলে ফিতা টানিবামাত্র টাইট করিয়া আঁটা চলে। পথে বাহির হইবার সময় নার্শরা গায়ে চড়ান ওয়াটার-প্রুফ পপলিনের ওভার-কোট। এ কোট গায়ে থাকিলে আইসল্যাণ্ডের শীতেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইবে না!

নার্শের অঙ্গাবরণ

সমরোৎসবে মেয়েরাও আজ ... এ কর্ম্মশালা—অফিসের টেবল ... লোহা সীশা, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে ... কাজ করা! হাতুড়ির আঘাতে কোথা ... —তপ্ত লোহা ছুটিতেছে—মুখে-চোখে যদি ... আসিয়া লাগে, তাহা হইলে বিপদের সীমা না ... মোচনের জন্য নকল-ধাতু দিয়া কাচের মত স্বচ্ছ, ... ও অদাহ্য মুখাবরণ তৈয়ারী হইয়াছে। কাঠ কাচ বা ধাতুর কুঁচি বা আগুন ছিটকাইয়া মুখে পড়িলে এ মুখাবরণের দৌলতে এতটুকু আঁচ লাগিবে না! কাজের সময় মুখের উপর এ আবরণ আঁটিয়া দিন—অবসর-কালে আংটা খুলিয়া মাথায় রাখুন টুপির মত! যদি চোখে চশমা কিম্বা নাসাগ্রে বিষাক্ত বাষ্পরোধী নাসাবন্ধ থাকে, সে জন্য এ আবরণ আঁটায় এতটুকু বাধা বা অসুবিধা ঘটিবে না! আবরণ খুবই হালকা—ওজনে তিন আউন্স মাত্র!
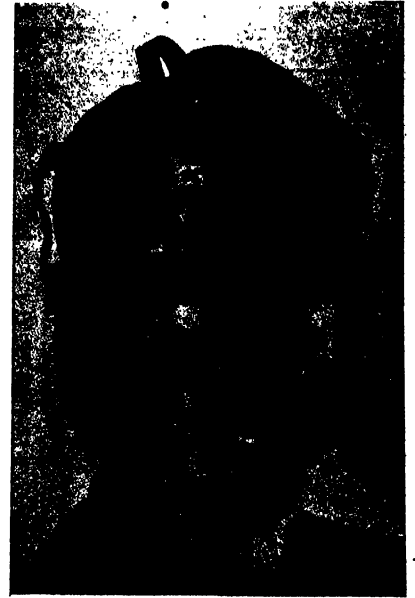
পথের ওভারকোট

মুখ-ঢাকা

মাকড়শার সূতা

যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী যে-সব রেঞ্জ-ফাইণ্ডার ও টেলিস্কোপ বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলির জন্য মাকড়শার সূতার উপযোগিতার তুলনা নাই। এ-সূতা যেমন মিহি, তেমনই মজবুত; তার উপর এ-সূতার স্থিতিস্থাপকতারও সীমা নাই। সমর-বিভাগে তাই মাকড়শার আদর অত্যধিক। এক ফুট মাকড়শার সূতার রীলের দাম এখন প্রায় পঁচিশ

বোমার কোষ্ঠী-বিচার

আমেরিকার 'উড়ন-দুর্গ' নির্ম্মিত হইবার পর হইতে ব্রিটিশ ও মার্কিণ সমরনীতিকরা মিলিয়া বোমা-নিক্ষেপের সার্থকতার সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। সে গবেষণার ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ভোরের দিকে লক্ষ্যস্থানের অনধিক উপর হইতে হালকা-

ভোরের দিকে
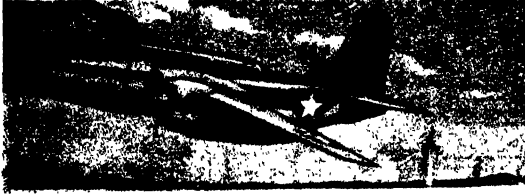
বোমা ফেলিলে ফল-লাভ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না ; বৈকালে সূর্য্য-তাপে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ঘুচিলে ৩৫০০০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে উড়ন-দুর্গ অনায়াসে বোমা ফেলিয়া প্রলয়-লীলা-সাধনে সমর্থ হইবে ; দিনের আলোয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ডবল-এঞ্জিনযুক্ত

দিনের আলোয়

বমার ; এবং রাত্রে ব্রিটিশ ল্যাঙ্কাষ্টার, ষ্টার্লিং এবং হালিফাক্স বমারই শুধু প্রলয়-সাধনে সমর্থ হয়। দিন-ক্ষণ দেখিয়া এবং বিভিন্ন বমারের
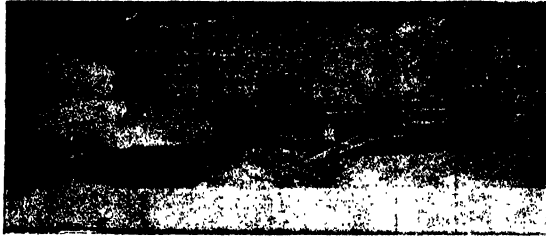
বৈকালে

শক্তি-সামর্থ্য বিচার করিয়া বিশেষজ্ঞেরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতিকায় ট্রাক-ট্রেলার

বড় বড় কামান, অজস্র গোলাগুলি এবং ফৌজের সরঞ্জাম-পত্রাদি বহিতে ১৬০।১৭৫ ফুট উঁচু চব্বিশ-চাকাওয়ালা অতিকায় ট্রাক তৈয়ারী হইয়াছে। প্রশান্ত-মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম কূলে বিশাল ঘন জঙ্গলে এই ট্রাকে করিয়া নানা সরঞ্জাম বহিয়া লইয়া গিয়া পাহাড়ে-বনে বিরাট সমর-ঘাঁটী বিরচিত হইতেছে। এ ট্রাকের নাম মাউণ্ট রেইনিয়ার। এ গাড়ীতে দেড় হাজার মণ ওজনের মালপত্র অনায়াসে বহন করা চলে। মাল নামাইয়া ফিরিবার সময় কব্‌জা খুলিয়া গাড়ীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ; এবং ভাগ করিয়া চাকাগুলিকে

ট্রাক-ট্রেলার (ফিরতি পথে)
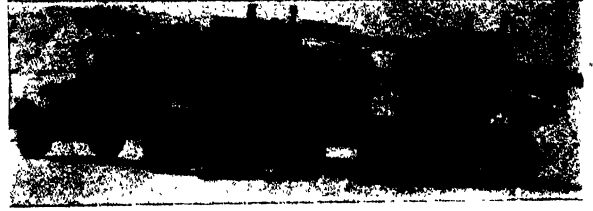
ঘাড়াঘাড়ি রাখা চলে। তার ফলে অল্প-পরিসর পথে বা গুহা-পথে গাড়ীর চলা বন্ধ হয় না।

রঙ শুকাও

যুদ্ধের জন্য নিত্য হাজার হাজার ট্যাঙ্ক তৈয়ারী হইতেছে। সে সব ট্যাঙ্কে রঙ করা প্রয়োজন। রঙ করার পর সে-রঙ কাঁচা থাকে—কাজেই
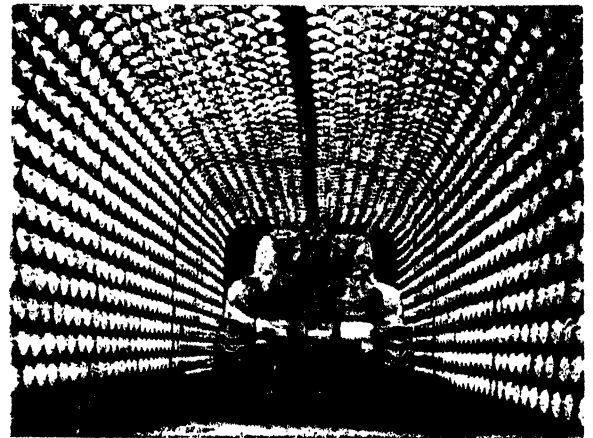
রঙ শুকাইবার টানেল্

রঙ শুকাইয়া লইতে হয়। কিন্তু হাজার হাজার ট্যাঙ্কে রঙ লাগাইয়া তাদের সে রঙ শুকাইতে কত দিন সময় লাগিবে—তার উপর রঙ-করা ট্যাঙ্ক শুকাইতে কতখানি জায়গা জোড়া থাকিবে ! খালি থাকিলে সে-জায়গায় আরো হাজার হাজার ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করা চলিবে ! অতএব ট্যাঙ্ক রঙ করা হইলে সে-রঙ সহজে শুষ্ক করা যায় কি করিয়া ? এ প্রশ্ন মনে জাগিলে সমর-বৈজ্ঞানিকেরা করিলেন মস্তিষ্ক-চালনা ; এবং মস্তিষ্ক-চালনায় তাঁরা তৈয়ারী করিয়াছেন রঙ শুকাইবার টানেল ! এ-টানেলের ছাদে ও দু'-পাশে শত-শত বৈদ্যুতিক বাতি আঁটা আছে। এ বাতিগুলি জ্বালিয়া দিয়া টানেলের মধ্যে একখানি করিয়া রঙ-করা ট্যাঙ্ককে চার-মিনিট কাল সামনে-পিছনে চালানো হয়—বাতির তেজে ট্যাঙ্কের রঙ নিমেষে শুকাইয়া যায়। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক-একটি টানেলে সাড়ে-তিনশো চার-শো করিয়া ট্যাঙ্কের রঙ শুকানো হইতেছে !

হাউই-বোমা

এ যুদ্ধে যে-সব নব নব বর্ম্মাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, 'রকেট্-ওয়েপন্' শ্রেণীর অগ্রণী। যে-রীতিতে হাউই বাজি ছোড়া হয়, সেই

রীতিতে নীচে হইতে আকাশ-পথ লক্ষ্য করিয়া এই রকেট্-বোমা নিক্ষেপ করিতে হইবে। রাশিয়া, গ্রেট-বৃটেন এবং জার্ম্মানি,—এ তিন শক্তি রকেট-বোমার জোরে অনেকখানি সুফল লাভ করিতেছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বৃটেন সর্ব্বপ্রথম 'আকাশে জাল পাতিয়া' নিম্ন-মার্গগামী বিপক্ষ প্লেনকে ফাঁদে ফেলিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়; তাহার কিছু কাল পরেই এই রকেট-বোমার সৃষ্টি। বিপক্ষের বমার বা প্লেন দেখিবামাত্র তাগ করিয়া মৃত্তিকা-বক্ষ হইতে রকেট-বোমা ছোড়া হয়। ছুড়িবামাত্র বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বাহির এবং বোমাও বিদ্যুৎগতিতে শূন্যে উঠিয়া লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়। চার-রকমের রকেট-বোমার সাহায্যে রাশিয়া এ যুদ্ধে সম্প্রতি অসাধ্য সাধন করিতেছে! রকেট অস্ত্রের আশু উপযোগিতা আরো এই যে, অকর্ম্মণ্য বা জীর্ণ হইয়া দুর্গম প্রদেশে যদি কোনো প্লেন পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে রকেট-অস্ত্রযোগে সে-প্লেনকে ঠেলিয়া অনায়াসে আকাশে উড়াইয়া তোলা যায়।

এক দফায় ৩০টি করিয়া শেল্ ছোটে (রাশিয়ান্ বমার)

জার্ম্মান্ বমার

সমরাঙ্গনে স্বাচ্ছন্দ্য

আমরা ভাবি, সেনারা যুদ্ধে বাহির হইয়া কোথায় বনে-পর্ব্বতে জলায়-জঙ্গলে থাকিবে—রোগের দৌরাত্ম্যে, মশা-মাছির উৎপাতে বেচারাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ ঘটিবে! কিন্তু এ যুগের যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক-সাধনার অন্ত নাই। অস্ত্র-রচনায় যেমন নব নব উদ্ভাবনী-শক্তির বিকাশ দেখিতেছি, সেনাদের সর্ব্ব-প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ব্যবস্থার দিকেও তেমনি কর্ত্তৃপক্ষের সুগভীর লক্ষ্য! বনে-জঙ্গলে রাত্রে আস্তানা মিলিবে না—এ জন্য দোল্‌নার সুব্যবস্থা হইয়াছে! গাছের ডালে দোলনা খাটাইয়া নেটের ব্যাগে ঢুকিয়া রাত্রি-যাপন। মশা-মাছি সাপ-বিছা—কাহারো সাধ্য নাই, হুল্ ফুটাইবে! তার উপর আছে নীচু-পায়া ক্যাম্প-খাট। সে খাটে সুদীর্ঘ আবরণ খাটাইয়া শয়নে নিরাপদ-স্বচ্ছন্দ-সুখে বিরাম-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না! ফৌজের ব্যারাকে-হাসপাতালে এই ধরণের খাট-বিছানা ও মশারির চমৎকার ব্যবস্থা। এ বিছানা নিমেষে খাটানো যায় এবং গুটাইয়া রাখা চলে।

ক্যাম্প-খাট

মাটীর বুকে শয্যা

ফৌজের দোল্‌না

বন্ধু অ্যামোনিয়া

ষ্টোভ বা উনানের আগুনে অথবা কেরোসিন-ল্যাম্পের বা বাতির আগুনে কাপড়-চোপড় জ্বলিয়া মৃত্যু আদৌ বিচিত্র নয়! এমন ঘটনা

স্থতি-কাপড় ভিজানো

চামড়ার জিনিষে ব্রাশ ঘষা

কত ঘরেই না ঘটিয়াছে! বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন—কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর-লেপ-তোষক—এগুলিতে যদি নবাবিষ্কৃত এ্যামোনিয়াম্-সাল্‌ফেমেট লাগান, তাহা হইলে আগুনে জ্বলিবার ভয় থাকিবে না। ছেলেমেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে এ রীতি অবলম্বন গৃহস্থমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্থতির কাপড়-চোপড় অর্থাৎ যে-সব কাপড় জামা মোজা চাদর প্রভৃতি জলে কাচা চলে, সেগুলি সর্ব্বাগ্রে জলে কাচিয়া সাফ করিতে হইবে—ছেঁড়া-ফুটা সেলাই করিয়া
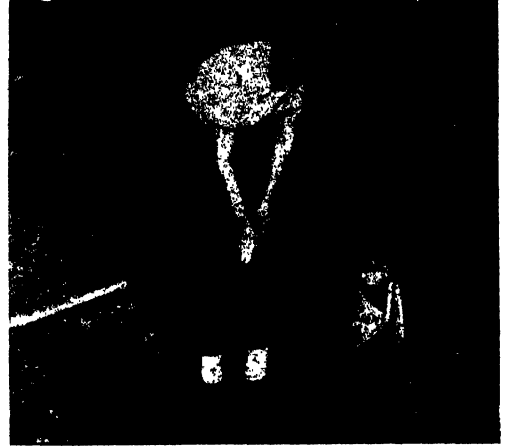
গালিচায় পিচ্‌কারী-ধারা

জুড়িতে হইবে; তার পর এ্যামোনিয়াম-সালফেমেট দ্রাবকে বেশ করিয়া ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবেন। লইলে সেগুলি আগুনে অদাহ্য হইবে! চামড়ার জিনিষ বা পশমী কাপড়-চোপড় হুকে খাটাইয়া তাহাতে এ্যামোনিয়ম-সালফেমেট-দ্রাবকে-ভিজানো ব্রাশ ভালো করিয়া ঘষিতে হইবে—র‍্যাগ, সতরঞ্চ, কার্পেট প্রভৃতি পাতিয়া পিচকারী-ধারায় সে-গুলির সর্ব্বত্র এই দ্রাবক ছিটাইয়া ভিজাইবেন। দ্রাবকে সিক্ত কাপড়-চোপড় কার্পেট প্রভৃতি বাতাসে মেলিয়া শুকাইয়া লইবেন।

মিতা

যে-ছলনা তুমি করেছ আমায়, মনে পড়ে মোর মিতা!
কাছেতে ডাকিলে দূরেতে গিয়েছ হইয়া অপরিচিতা!
কেঁদেছিনু যবে হাসিয়াছ তুমি সুখের স্বপ্নালোকে!
আলেয়ারে হেরি ছুটেছিনু আমি মোহ ছিল মাখা চোখে!
বুঝিয়াছি আজ ওগো মোর প্রিয়া, নহ তুমি মরীচিকা!
অভিমান-ভরে রেখেছিলে ঢেকে অনাবিল প্রেম-শিখা।
আমারে লুকায়ে পড়িয়াছ রাতে প্রেমের কবিতাখানি!
আঁচলে ঢাকিয়া রেখেছ আমার অঙ্কিত ছবিখানি।
মুখেতে হাসিয়া বুকেতে কেঁদেছ অশ্রুতে হিয়া ভরা!
নিবিড় মিলনে বাঁধিবে বলিয়া দাওনিকো তুমি ধরা।

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

ভালো বাসিয়াছি ধরণীরে

নয়নে আমার তীব্র ক্ষুধার জ্বালা;
কোনখানে তার ত্যাগের চিহ্ন নাই!
অমৃত ও বিষে আমার জীবন-মালা—
এই ধরণীর সব কিছু মোর চাই।
ধরণীরে আমি ভালোবাসিয়াছি, নহে তা অলীক স্বপ্ন!
মর জগতের নর-নারী-শিশু—লোক ধূলিমাখা নগ্ন—
চাহি ধরিবারে চাপিয়া বক্ষে;
চাহি না মুক্তি; চাহি না মোক্ষে;
মাটীর গাগরী প্রিয়ার কক্ষে—সে আমার লাগে ভালো!
তারকা জ্বলুক সন্ধ্যা-গগনে—হেথা তব দীপ জ্বালো।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এমএ)

সহজিয়া সাধন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তন্ত্রশাস্ত্রের কুণ্ডলিনী ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের রাধা যে অভিন্ন, এ সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাঁহাকে শ্রীরাধার শতনাম ও সহস্রনাম মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে বলি। শ্রীরাধার সহস্রনামের মধ্যে শ্রীরাধার সর্পিণী, বক্রেশ্বরী, বক্ররূপা, কৌলিনী, ক্ষেত্রবাসিনী, বামদেবী, লতা, প্রেমরূপা, রতিরূপা, সর্ব্বজীবেশ্বরী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। কাম-সরোবর বা মূলাধার হইতে তাঁহার (রাধা-শক্তির) সর্পবৎ গতি হয় বলিয়া তাঁহাকে সর্পিণী বলা হইয়াছে। বক্র ভাবে গতি হওয়ার জন্য তাঁহার নাম বক্রেশ্বরী, বক্ররূপা। ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভূমিচক্রে বা মূলাধারে বাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষেত্রবাসিনী। বামাবর্ত্তে গতি হওয়ার জন্য তিনি বামদেবী। লতার স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার এক নাম লতা। বৈষ্ণবশাস্ত্রের লতা-সাধন এই শ্রীরাধাশক্তির (কুণ্ডলিনীর) সাধনা। কোন মেয়ে মানুষকে শক্তি গ্রহণ করিয়া এই সাধনা নহে। এই লতাসাধন সম্বন্ধে পরে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে। তিনি প্রেমরূপা, রতিরূপা প্রভৃতি রসশাস্ত্রোক্ত নামেও অভিহিতা দৃষ্ট হন। সকল জীবের মধ্যে প্রাণস্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজীবেশ্বরী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, প্রকৃতিখণ্ডে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হইয়াছে (১)। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া, প্রিয়তমা। দেবী-ভাগবতেও শ্রীরাধাকে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। রাধাতন্ত্রে শ্রীরাধাকে মহামায়ার অংশস্বরূপা "রক্তবিদ্যুল্লতাকৃতি পদ্মগন্ধসমন্বিতা" মোহিনী-রূপধারিণী সখিগণবেষ্টিতা সহস্রদলপদ্মমধ্যস্থা দেবী পদ্মিনী নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই পদ্মিনীই ব্রজে গিয়া রাধানামে খ্যাত হইবেন। এই বিদ্যুল্লতাকারা দেবী রক্তবিদ্যুৎপ্রভা ধারণ করিতেন বলিয়া সর্ব্বলোকে তিনি রাধিকা নামে প্রখ্যাত হন। যথা ;—

"রক্তবিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে।
তস্মাত্তু রাধিকা নাম সর্ব্বলোকেষু গীয়তে।"
(রাধাতন্ত্র, ৭ম পটল)

রাধাশক্তির বর্ণ যে বিদ্যুতের মত এবং আকার লতার মত, তাহা বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীর বহু স্থানে পাওয়া যায়।

যথা ;—

"বাঁকা গতি চলন তার যেন বিদ্যুল্লতা।"
"বিজুরী নিন্দি বরণ তাহার
কুটিল স্বভাব তার।"

শাক্ততন্ত্রেও কুণ্ডলিনীর বিদ্যুতের স্থায় বর্ণের কথা ও সর্পের স্থায় কুটিল আকারের উল্লেখ আছে। রাধাতন্ত্রে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে যে, শ্রীরাধাই মহামায়া জগদ্ধাত্রী এবং উক্ত গ্রন্থে রাধার তিন রূপের কথা বলা হইয়াছে। এই তিন রূপের মধ্যে বৃকভানুগৃহ-স্থিতা রাধাই কৃত্রিমা, আর অযোনিসম্ভবা পদ্মিনীই পরাক্ষরা (পরা-শক্তি)। শাক্ততান্ত্রিকেরা যেরূপ শিবের (পরম পুরুষের) বক্ষে কালীর (কুণ্ডলিনীরূপা জীবশক্তির) কথা বলেন এবং তদনুযায়ী রূপের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ স্থূল উপাসনার জন্য শিবকালী মূর্ত্তির কল্পনা করেন, বৈষ্ণবেরাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের (পরম পুরুষের) সহিত তাঁহার প্রাণস্বরূপা প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাকে (জীবশক্তিকে) স্থূলরূপে উপাসনার জন্য তাঁহাদের যুগল-মিলন রূপ কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উভয় ধর্ম্মমতেরই মূল ভিত্তি। এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সাধন বিষয়েও উভয় ধর্ম্মমতে মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই; অথচ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কি বিবাদই না রহিয়া গিয়াছে!

বৈষ্ণবশাস্ত্রের স্থানে স্থানে রাধাশক্তিকে (কুণ্ডলিনীকে) 'চৈত্যরূপা' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। যথা ;—

"অনুভবে চৈত্যরূপা স্ফূর্ত্তি হয় যার।
কাম ধ্বংস হৈয়া তার প্রেমের সঞ্চার।"
(গৌরীদাস)

চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন ;—

"কামের স্বরূপ নাহিক ইহাতে
রাগের স্বরূপে রয়।
একান্ত করিঞা প্রকৃতি হইঞা
মানুষ জন্মাবেশ হয়।
নিষ্কামী হইঞা রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতিশূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে।

* * *

রাগের সাধন প্রেম রতি গুণ
দেহ রতি নাহি রবে।
পুন ইহা হঞে অন্য অন্য মনে
তবে সে নাহিক পাবে।
চৈত্যরূপার নিগূঢ়করণ
এই সে কহিলাম সার।
চণ্ডীদাসে কয় কামানুগা নয়
যেন সে করাত ধার।

চৈত্যরূপা চৈতন্যস্বরূপিণী রাধাশক্তি বা কুণ্ডলিনীরই অন্য একটি নাম।

"চেতন চৈতন্যরূপা শ্রীরাধার নাম।"
(ভৃঙ্গরত্নাবলী)

অপর স্থলে—

"সেই সে শ্রীমতী চৈত্য রূপেতে
এ কথা গোপনে থুবে।"

১। উপনিষদেও বলা হইয়াছে ;—"এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণঃ প্রাণাৎ মনঃ প্রজায়তে।" আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বামীর সম্বন্ধেও চণ্ডীদাস কহিতেছেন—

কহে চণ্ডীদাস চৈত্যরূপার
রাগের উদয় হয়।
রজকিনী মোর রাগ অনুগত
হৃদি মাঝে সদা রয়।"

অমৃতরসাবলী গ্রন্থে আছে ;—

"চৈতন্যচন্দ্রের গুণ কে পারে বর্ণিতে।
চেতন করান তারে চৈত্যরূপেতে।"

যেমন রাধাকে চৈত্যরূপা বলা হয়, তেমনি কুলকুণ্ডলিনীকেও চৈত্যরূপা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে—

'স্বাধিষ্ঠানহংসপ্রিয়াং প্রিয়করীং বেদান্তবিদ্যাপ্রদাং
নিত্যং মোক্ষহিতায় যোগবপুষা চৈতন্যরূপাং ভজে।"

গুরুকৃপাতেই এই চেতনা লাভ করা যায়। গুরু শক্তিসঞ্চার করিয়া শিষ্যকে এই চেতনা দান করেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের ব্যবস্থাও দেখা যায়। এ সম্বন্ধে মুকুন্দরাম দাস তাঁহার ভৃঙ্গরত্নাবলী গ্রন্থের উপসংহারে বলিতেছেন ;—

"শ্রীকবিরাজ মহাশয় করি তাঁর কৃপাশ্রয়
তাঁর শক্তি হইল সঞ্চার।
সেই শক্তির সঞ্চার বর্ণন করিয়া তাঁর
আমি অতি মূর্খ এক জন।"

মুকুন্দরাম দাস তাঁর ভৃঙ্গরত্নাবলী গ্রন্থে জীবশক্তি কুণ্ডলিনীকে ভৃঙ্গ বা ভ্রমর আখ্যাও দিয়াছেন। যথা ;—

"হৃদয় ভিতরে সব পদ্মের সায়র।
জীবরূপী ভৃঙ্গ তায় ফিরে নিরন্তর।"

চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন ;—

"সুমেরু উপরে (১) ভ্রমর পশিল (২)
এ কথা বুঝিবে কে।"
"কোন বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম
ভ্রমরা পশিছে তায়।"

রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নানা স্থানে নানারূপ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে ;—

"রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রী চ সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা।"

'রা' শব্দে এবং 'ধা' শব্দে নির্ব্বাণমুক্তি। তিনি ভক্তবৃন্দকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন বলিয়া রাধা নামে অভিহিতা হন। কেহ বলেন, শ্রীরাধা নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) নিজপ্রিয়কে (পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) রমণোৎসুক (বিলাসকামী) জানিয়া কুল (মূলাধার) পরিত্যাগ করিয়া অকুলে (সহস্রারে) ধাবমানা হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি রাধা নামে খ্যাত। কুল (মূলাধার) ত্যাগ করিয়া অকুলে (সহস্রারে) গমন করেন বলিয়া শ্রীরাধাকে কুলকলঙ্কিনী বা কুলটা বলা হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে এই কুল ও অকুলের কথা সুন্দররূপে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা ;—

"অকুলং শিবভাবশ্চ কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
কুলকুলানুসন্ধানা নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে।"
(কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭ উল্লাস)

অন্যত্রও দৃষ্ট হয় ;—

"কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিরকুলং তু মহেশ্বরঃ।"

কেহ আবার বলেন, 'রা' এই শব্দ উচ্চারণমাত্রে মুক্তিপদপ্রাপ্ত এবং 'ধা' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে হরির পদে ধাবমান হয়, এই জন্যই তাঁহাকে রাধা বলে। কেহ আবার বলেন ;—"আধারবাসিনীত্বাৎ রাধা।" আধারে অর্থাৎ মূলাধারে বাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাধা। রাধা শব্দের ধাতুগত অর্থ—রাধ্নোতি সাধয়তি কার্য্যাণীতি রাধ—অচ্—টাপ্। যিনি কার্য্যসাধন করেন অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—গীতার প্রতিপাদ্য কি? তদুত্তরে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"গীতা শব্দের অক্ষর উল্টাইলে যাহা হয়, তাহাই।"—অর্থাৎ তাগী বা ত্যাগী। ইহা শুনিয়া প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি এক জনকে রাধা শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে সে বলিয়াছিল—রাধা শব্দের অক্ষর উল্টাইলে যাহা হয়, তাহাই—অর্থাৎ রাধা শব্দের অর্থ ধারা। প্রতাপ মজুমদার মহাশয় এই অর্থ লইয়া রহস্য করিলেও রাধা ধারাই বটে। লাবণ্যামৃতধারা, তারুণ্যামৃতধারা, কারুণ্যামৃতধারা—প্রভৃতি ধারার কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে এবং এ সমস্ত রাধা-শক্তিরই অভিব্যক্তি ভেদ মাত্র।

কামসরোবর বা মূলাধার হইতে রাধাশক্তি ধারার মতই সহস্রারে যান। এই জন্য এই শক্তিকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'বাঁকা নদী', 'স্রোত' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বকে বস্তু নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে।"
"সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে।"

সাধকের দেহমধ্যস্থ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বকে বস্তু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই সহজ সাধন বা পরকীয়া সাধন। এই সাধনা শৃঙ্গার-সাধন নামেও অভিহিত দেখা যায়। আদ্যসারস্বত-কারিকায় আছে ;—

"শৃঙ্গার সাধনে যার হয় নিষ্ঠা মনে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখে নিত্য বৃন্দাবনে।

সংসারস্থিত শ্রীকৃষ্ণ (তন্ত্রমতে পরমশিব) কামসরোবরস্থি (মূলাধারস্থিত) পরাশক্তি রাধার (কুণ্ডলিনীর) সহিত বিলা[illegible] করেন বলিয়া এই দেহতত্ত্ব সাধনাকে শৃঙ্গার সাধনা বলে। [illegible] তন্ত্রেও এই সাধনাকে 'শৃঙ্গার' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। সুমেরু উপরে—সহস্রার পদ্মে।
২। ভ্রমর—জীবশক্তি।

বৃহৎ শ্রীক্রমে বর্ণিত আছে :—

"বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা।
ইচ্ছাদানসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।"

অমরকোষকার শৃঙ্গারকে শুচি এবং উজ্জ্বল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই শৃঙ্গার বা পরকীয়া রস 'উজ্জ্বলাখ্য রস' নামেও অভিহিত। মুকুন্দদাস বলিতেছেন ;—

"উজ্জ্বল পরকীয়া রসে বিশুদ্ধ প্রকৃতি।"

আনন্দলহরীর টীকাকার অচ্যুতানন্দ বলিতেছেন ;—

"শৃঙ্গাররসস্য রজোগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্।" শৃঙ্গাররস রজোগুণ-প্রধান বলিয়া লালবর্ণ। এই জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণানুরাগের বর্ণকে লাল বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা শক্তি (কুণ্ডলিনী) কৃষ্ণানুরাগস্বরূপা, শৃঙ্গাররসস্বরূপা। এই জন্য রাধাতন্ত্রে রাধাকে "রক্তবিদ্যুৎপ্রভা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাক্ততন্ত্রেও 'শৃঙ্গাররসোল্লাসা' কুণ্ডলিনীকে 'লাক্ষারসোপমা' বলা হইয়াছে এবং পরমশিব হইতে তিনি যে লাক্ষাভ (লাক্ষার মত লালবর্ণ) পরমামৃত পান করেন, তাহাও বলা হইয়াছে।

শাক্ততন্ত্রেও কুণ্ডলিনী শক্তি 'রস' বলিয়া অভিহিত দৃষ্ট হন। যথা ;—

"নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং সুধীঃ
(ষট্চক্র)

স্ত্রীলোকের রজের ন্যায় উজ্জ্বল লালবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া কুণ্ডলিনীর এক নাম রজবতী। রমণ (শৃঙ্গার) উৎসুকা বলিয়া এই শক্তি রামিণী নামে কথিতা। শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশতনাম মধ্যে শ্রীরাধার রামিণী নামও পাওয়া যায়। যথা ;—

"রমণী রামিণী গোপী বৃন্দাবনবিলাসিনী।
নানারঙ্গবিচিত্রাঙ্গী নানাসুখময়ী সদা।"

চণ্ডীদাসও তাঁহার সাধন-পদাবলীতে এই শক্তিকে রামিণী নামেই অভিহিত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রামিণী সম্বন্ধে পরে বিশেষ আলোচনা করা হইবে।

উল্লিখিত পদটিতে শ্রীরাধাকে 'বিচিত্রাঙ্গী' বলা হইয়াছে। রাধা-তন্ত্রে রাধিকার যে ধ্যান আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বর্ণ প্রহরে প্রহরে পরিবর্ত্তনশীল। যথা ;—

"পীতরূপা কদাচিৎ সা কদাচিৎ কৃষ্ণরূপা।
বহুরূপময়ী রাধা প্রহরে প্রহরে।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত কুণ্ডলিনীর ধ্যানে কুণ্ডলিনীকেও 'বিচিত্রবসনান্বিতা' বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রসবিকার আধ্যাত্মিক রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্রকার রাধিকার শ্যাম ও পীতবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা শ্রীরাধার বর্ণ সম্বন্ধে জানিয়াছিলাম যে, তিনি 'রক্তবিদ্যুৎপ্রভা'। এই বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়ার কারণ এই যে, রাধাশক্তি (কুণ্ডলিনী) সাধনার অবস্থাভেদে সাধকের নিকট বিভিন্ন বর্ণময়ী বলিয়া অনুভূত হন। রাধিকার সহস্রনামের মধ্যে—'[illegible]' 'বংশীনাদবিভূষণা' প্রভৃতি নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, ইনি বংশীনাদের ন্যায় শব্দময়ী। চণ্ডীদাসের পদেও আছে ;—

"হ্রীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজিকর।"
"এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর।"
"দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত ভুবনে বেকত
সখীর সঙ্গিনী সে।"

এই "বাঁশী জিনি তার স্বর" তন্ত্রোক্ত অনাহতধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শক্তি জাগ্রতা হইলে সাধক সময় সময় এই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পান। এই অনাহত ধ্বনির জন্য রাধাশক্তিকে (কুণ্ডলিনীকে) শাস্ত্রে নাদরূপা বা ধ্বনিবিগ্রহবতীও বলা হয় (১)।

ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে ;—শ্রীকৃষ্ণ মুখাম্বুজে শব্দব্রহ্মময় বেণু-বাদন করিতেন। শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণ আকাশ হইতে রাধা-ধ্বনিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শৃঙ্গার-সাধনকে রতিসাধনও বলে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

"কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি।"

নায়িকা-সাধন ও রতি-সাধন একই সাধনার বিভিন্ন নাম।

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়(২)।
সে কালে রমণ(৩) অতিনিত্য করণ
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ রতির গঠন
তখন দেখিতে পাবে। ইত্যাদি

উল্লিখিত পদে 'রতির গঠন'কে 'মেঘের বরণ' 'জলদ বরণ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই রতি রাধাশক্তি বা কুণ্ডলিনী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধার শ্যামবর্ণেরও বর্ণনা পাওয়া যায় ; এখানেও রতিকে 'মেঘের বরণ' বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে; এই রতি মানব-মানবীর রতি নহে ; ইহা অতীন্দ্রিয়, অন্তরঙ্গ সাধনার ধন।

১। "শ্রূয়তে প্রথমাভ্যাসে নাদো নানাবিধো মহান্।"
"অন্তে তু কিঙ্কিণীবংশবীণাভ্রমরনিস্বনঃ।
ইতি নানাবিধা নাদাঃ শ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ।"

২। "কাষ্ঠবৎ জায়তে দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্।"
(নাদবিন্দু উপনিষদ্)
"দেহ ভবতি কাষ্ঠবৎ"

৩। আধ্যাত্মিক রমণ। (মেরুতন্ত্র)

নরোত্তম দাস রতি সম্বন্ধে তাঁহার একটি পদে লিখিয়াছেন—

"অধোগতি না ধায় রতি উর্দ্ধ গতি ধায়।
যে শরীরের রতি সেই শরীরে রয়।"

এই রতি (কুণ্ডলিনী) উর্দ্ধগতিতে ধাইয়া যায় এবং যে শরীরের রতি, সেই শরীরেই রহে। এই রতির জন্য অন্য কোন শরীরের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের পদে প্রেমের আকৃতির কথা আছে। যথা—

"প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মূরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়।"

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, চণ্ডীদাসের প্রেম—

"অধঃপদ্ম হ'তে কামের সহিতে
বাঁকা গতি চলি যায়।"

সুতরাং নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাসের রতি ও প্রেমের সাধনা তন্ত্রের কুণ্ডলিনী সাধনা ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে।

চণ্ডীদাসের পদের মধ্যে যে সকল অনুভূতির কথা পাওয়া যায়, তাহার সহিত শাক্ততন্ত্রের অনুভূতির কথা সমূহের সম্পূর্ণ মিল আছে। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

"যে জন চতুর সুমেরু শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে হাতীরে বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে।"

অর্থাৎ যে চতুর ব্যক্তি সূতায় (কুণ্ডলিনীর) দ্বারা সুমেরু শিখর (সহস্রার চক্র) গাঁথিতে পারেন এবং মূলাধারে যে ঐরাবত ইন্দ্রদেবতাকে পৃষ্ঠে লইয়া আছে, সেই ঐরাবতকে মাকসার অর্থাৎ লূতাতন্তু সদৃশা অতি সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীর দ্বারা বাঁধিতে পারেন, তাঁহারই এই অতীন্দ্রিয় রস মিলিয়া থাকে।

হরিদাসের একটি পদে আমরা পাই "খেপার কথায় হাতী পড়ে মাকড়সার ফান্দে।"

লালন ফকিরও বলিয়াছেন—

"মাকড়ার আঁশে হস্তী বাঁধা।"

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

"বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে।"

তিনটি দুয়ার অর্থে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামে তিনটি প্রাণবহা নাড়ী। ইড়া, পিঙ্গলা ত্যাগ করিয়া সাধক মধ্য নাড়ী সুষুম্না-পথে প্রাণবায়ুকে চালিত করিবেন, ইহাই উক্ত পদের অভিপ্রায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

ইংরেজি সাহিত্যের সহিত আজকালকার রসজ্ঞ-পাঠকগণের ঘনিষ্ঠ ভাবে এবং বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইংরেজির মারফতে মোটামুটি পরিচয় আছে। স্বতঃই তাঁহাদের মনে বিশ্বসাহিত্যের সহিত বঙ্গসাহিত্যের তুলনার ইচ্ছা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধিতে বিশেষ উল্লসিত বা উৎফুল্ল হন না, বঙ্গসাহিত্যের অবদানকে যথেষ্ট মনে করেন না।

বিশ্বসাহিত্যের কথা বাদ দিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের সহিত বঙ্গসাহিত্যের তুলনা করিলে আমাদের গৌরব অনুভবেরই কথা। আর্য্যাবর্ত্তের সকল প্রদেশের সাহিত্য চেষ্টার আদর্শ এখন বঙ্গসাহিত্য। বঙ্গসাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাষা আজ সমৃদ্ধ হইতেছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের তুলনা করিলে বঙ্গসাহিত্যের যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা-বিস্তারের পর রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ্যাবির্ভাব পর্য্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি উন্নতির দিকে কি না, সে বিষয়ে সুধীগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন—বঙ্গসাহিত্য ক্রমে জাতীয় আদর্শের জীবনাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইতেছে—জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সহিত ইহা প্রাণ-শক্তি হারাইতেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণে ইহা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট। আতশবাজির মত ইহা জ্বলন্ত হইলেও জীবন্ত নয়—আতশবাজির যে পরিণাম—ইহারও সেই পরিণাম হইবে। গত শতাব্দীর সাহিত্য-ভগীরথগণ কঠোর তপস্যায় যে ভাবগঙ্গার অবতারণ করিয়াছিলেন তাহা বিপথে চালিত হইয়া শ্মশানময় দেশের ভস্মপুঞ্জ সঞ্জীবিত করিতে পারিল না। তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মাভিব্যক্তির কঠোর সাধনা ব্যর্থ হইতে চলিল।

আর এক দল সমালোচক বলেন—"ইহা নিতান্ত Pessimist বা cynic-এর কথা। জাতির লাভালাভের হিসাবে সাহিত্যের বিচার হয় না। বিশ্বমনের সহিত আমাদের মনের সংযোগ হইয়াছে—তড়াগের সহিত নদীধারার সংযোগের মত। বিশ্বজনীন আদর্শে সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় [illegible] লাভ করিয়াছে। যেমন জাতীয় জীবন, সাহিত্যও তদনুরূপ [illegible]

অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য কিছু নাই। সামঞ্জস্য যখন বর্ত্তমান, তখন জীবনের সহিত সাহিত্যের সংযোগ নাই, এ কথা বলা চলে না। গত শতাব্দীর সাহিত্যগুরুগণ যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহার চরম বর্ণ ফলিয়াছে—রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সঞ্জাত সাহিত্যের মূল্য মর্য্যাদাও অল্প নহে—তাহাও ক্রমোন্নতিরই ফল।

বর্ত্তমান যুগের বহু সাহিত্যিকের সাহিত্য-চেষ্টার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিযোগ এই—

এটা যেন অসংযম, ঔদ্ধত্য, অপ্রকৃতিস্থতা, আতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্যে রসসৃষ্টির উপাদান উপকরণের পরিসর ও পরিমাণ ঢের বাড়িয়াছে। কিন্তু সংগঠনী-শক্তির মধ্যে এমন একটা অসংযত উগ্রতা ও ব্যগ্রতা আছে যাহার জন্য এ যুগের অধিকাংশ সৃষ্টিতে কোন-না-কোন উপাদান উপকরণ মাত্রামর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিতেছে। কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা অনুশাসন মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি বা ধৈর্য্য যেন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। লেখক হইবার জন্য যে একটা সারস্বত সাধনা করিতে হয়—ইহারও যে একটা উদ্যোগপর্ব্ব আছে—এ যুগের বহু লেখক তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। গ্রন্থকার হইবার জন্য ও রচনা-প্রচারের জন্য এরূপ অসঙ্গত উদ্ধত ব্যগ্রতা পূর্ব্বে কখনও ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্র আশ্রমপদের ন্যায়—এখানে বিনীত বেশে সসঙ্কোচে প্রবেশ করিবার কথা। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের আদর্শ কেহই অনুসরণ করিতেছেন না। 'মূর্ত্ত তপোভঙ্গ' মত্ত গজের মত এ যুগের অনেক সাহিত্যিক সাহিত্যের আশ্রমে প্রবেশ করেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের সংখ্যা এত বেশি পূর্ব্বে কখনও ছিল না। বিষয়ান্তরের অভাবে উন্মত্ততা যেন আজ সাহিত্যকেই আক্রমণ করিতেছে। শালীনতা, শোভন রুচিসংযত শৃঙ্খলা, নম্রতা, প্রশান্ত-মাধুর্য্য, ও শুচিশ্রী যে আর্টের প্রধান ধর্ম্ম—এ যুগের বহু সাহিত্যিক তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন।

লেখকরা স্বীকার না করিলেও কেহ কেহ বলেন—এটা একটা Experimental Stage ও age. এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা সাহিত্যকে জীবনের সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না—প্রচুর প্রয়াস ও গবেষণার ফল বলিয়া মনে করেন। আর তাহাই যদি হয়—Experimenterএর ধৈর্য্য, অধ্যবসায় সঙ্কোচ ও একনিষ্ঠ সাধনাই বা কই? Experiment পরিণত ও সাফল্যমণ্ডিত হইবার আগে Studioর বাহিরেই বা আসে কেন?

এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক সাহিত্যগুরুগণের সাহিত্যসৃষ্টির গূঢ় রহস্যের সন্ধান না লইয়া তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলিকেই অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা লোকে অনুসরণ করে—অনুসারকদের অপচারের জন্য তাঁহারা আংশিক ভাবে দায়ী। —অন্ততঃ দায়ী এই হিসাবে যে, ইহারা যে পথে কিছু দূর আগাইয়া থামিয়া সহজ মর্য্যাদাবোধে আত্মসংবরণ করিয়াছেন—অনুবর্ত্তিগণ তাহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছেন। অনুসারকগণ ভাবিলেন—যে তাঁহাদের সাহিত্য-চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে, চরম সীমা পর্য্যন্ত লাগাইলে তাঁহাদের সাহিত্য-চেষ্টা বুঝি চরমোৎকর্ষ লাভ এই ভাবে পথের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনুবর্ত্তিগণ ভুল করিতেছেন। পথিপ্রদর্শক বলিয়া সাহিত্যগুরুগণকেই অনেকে দায়ী করিতেছেন।

এই সকল বিভিন্ন মতামত আলোচনা করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যে যে অপচারগুলি সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, এ নিবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব। যাঁহাদের রচনা সর্ব্বপ্রকার অপচার, আতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত তাঁহাদের রচনা আমার আলোচ্য নয়।

বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলে যে কথা-সাহিত্যের ধারার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাই পরিণতি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দীক্ষা তরুণ রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় ও চোখের বালিতে। বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত ধারা চোখের বালির মধ্য দিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্রের রচনায় পর্য্যবসান লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এ দেশে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ভাবরহস্য-ঘন ও গীতি-কবিতার রসে পরিপূর্ণ। প্রভাতকুমার তাঁহার প্রথম শিষ্য হইলেও তাঁহার গল্পে মুখ্য ভাবে গীতি-কবিতার ভাবরসের ছায়াপাত হয় নাই। তাঁহার গল্পে আমাদের সামাজিক, পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের অথবা প্রাকৃতিক জগতের কোন গভীর রহস্যই স্থান পায় নাই। তাঁহার গল্প অবিমিশ্র গল্প—কথকজন-সুলভ কৌতুকরসে হৃদ্য লঘুতরল রচনা।

ভারতী ও প্রবাসী নামক দুইখানি সাহিত্য-পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়—ইঁহারাই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের অনুকারক। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ছিলেন ইঁহাদের অগ্রণী। ইঁহারা আপন আপন শক্তি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের রসাদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের রচনায় ছোট গল্পের প্রভাবও সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইঁহারা আমাদের জাতীয় সংসারে বিষয়-বস্তুর অভাব অনুভব করিতেন—সে জন্য বিদেশী কথা-সাহিত্য হইতে বিষয়-বস্তু ও আখ্যানাংশ গ্রহণ করিতেন। ইঁহারা উপন্যাসও লিখিতেন। বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করিয়া ইঁহাদের সকলেরই প্রভাব অল্প-বিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যের অনেক লেখক সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রের অনুকারক। শরৎচন্দ্রের প্রদত্ত formই fill up করিয়া চলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অনেক রচনা সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট তাঁহারা কথাসাহিত্যে নূতন রীতি, নূতন ভঙ্গী, নূতন প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যে অনুভূতি, চিন্তা, বা টেকনিকের বৈচিত্র্য ততটা দৃষ্ট হয় না,—যতটা দৃষ্ট হয় বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য।

বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বর্ত্তমান যুগের কোন কোন লেখক আপনাদের জন্ম, সমাজ ও তাহার স্বাভাবিক আবেষ্টনী ত্যাগ করিয়া অপরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, এবং সংবাদপত্র-ও-পুস্তকাদির-মারফত পরিচিত সমাজ হইতে রচনার উপজীব্য ও উপাদান গ্রহণ করিতেছেন। তাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলি সত্য ও জীবন্ত উঠিতেছে না। উদাহরণ স্বরূপ—বিজাতীয় আদর্শে গঠিত নাগরিক সমাজ লইয়া যে কথাসাহিত্য রচিত হইয়াছে—তাহা জীবনহীন, তেমনি অসত্য। ঐ সমাজের লোকদের চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, গূঢ় বেদনা ও প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত লেখক ও পাঠক কাহারও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। বাসনায় চর্ব্ব্যমান হইয়া ভাব

আস্বাদ্যমানতার সৃষ্টি করে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন উপায়ই নাই। লেখক দূর হইতে লোলুপ দৃষ্টিতে উহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কেলি-কৌতুকময় বাহিরের জীবনলীলা দেখিয়া থাকেন। ঐ প্রকার জীবনযাত্রার প্রতি প্রচ্ছন্ন লুব্ধতা এবং অপ্রাপ্তির ক্ষুব্ধতা লেখকের মনে একটা কল্পমায়ার সৃষ্টি করে। ঐ কল্পমায়াকে রূপদান করিয়া লেখক লুব্ধতার চরিতার্থতা সাধন করেন বলিয়া মনে হয়।

একটা শক্তিহীন পঙ্গু কৃচ্ছ্রশাসিত লোলুপতার কল্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন কখনও সাহিত্য হইয়া উঠে না। আবার কোন কোন লেখক বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য নগরের বস্তি, পতিতালয়, সুরা-বিপণি, কুলী-মুটে-মজুর-চাষী-নেয়ে ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রা ও গৃহসংসার হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিতেছেন। এই সকল অবজ্ঞাত নিম্নস্তরের লোকদের জীবনে বৈচিত্র্য আছে এবং এই বৈচিত্র্য লইয়া সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না তাহা নয়। তবে এই শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার সংবাদ ও প্রাণের গূঢ় বার্ত্তা ভাল করিয়া জানা চাই—তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা স্বীকার করিবার মত উদারতা ও মহাপ্রাণতা থাকা চাই—তাহাদের জীবনের প্রতি গভীর দরদ থাকা চাই তাহাদের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সহৃদয় ও সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা চাই। আর জানা চাই তাহাদের জীবনের কতটুকু আর্টের বিষয়ীভূত হইতে পারে। অবিকল নির্লিপ্ত চিত্র দিতে পারিলেই সাহিত্য হইয়া উঠিবে না। প্রাকৃত সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক নয়, সত্য হইলেও যাহা কিছু বীভৎস, ঘৃণাজনক ও কদর্য্য, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না—অন্তরাত্মা যাহাতে জুগুপ্সায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে অথবা বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে তাহা রসসৃষ্টি করিতে পারে না। সাহিত্যের উপকরণই যদি চিত্তকে রসবিমুখ ও রচনাকে রসপ্রতিকূল করিয়া তুলে তাহা হইলে রসসৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব?

ইউরোপীয় সাহিত্যে slum-life-এর চিত্র যথেষ্ট আছে—কিন্তু তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরতন্ত্র ব্যক্তি-নিরপেক্ষ চিত্র হিসাবে নয়—জাতীয় কল্যাণসাধনের ও মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠার উচ্চাদর্শের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ। যেখানে তাহা হয় নাই—সেখানে সৎসাহিত্যও হয় নাই। তাহার অনুকরণ ভ্রান্তি মাত্র। যে অর্হবোধ, যে শ্রেয়োবোধ, যে Pragmatic আদর্শ ভিক্তর হিউগো বা গোর্কির এই শ্রেণীর রচনাকে উচ্চ সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডেগাসের চিত্রগুলিকে উৎকৃষ্ট আর্ট করিয়া তুলিয়াছে—তাহা এ দেশের সাহিত্যিকগণের কই?

যেখানে উচ্চতর লক্ষ্যাদর্শ নাই, যেখানে সান্ত্বনা বা আশ্বাসের বাণী নাই—'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের রচয়িতার মত প্রাণের দরদ নাই—সমাধান বা প্রতিকারের ইঙ্গিতও নাই—সেখানে এই পতিত অধম অবজ্ঞাত জীবনের ভুলভ্রান্তি, পাপতাপ, ও হীনতা উপভোগ করাই হয় এবং সে সমস্তকে উপভোগ্য করিয়া তোলার চেষ্টাই সূচিত হয়। এরূপ হৃদয়হীনতা—এই পাপপঙ্কচারী কল্পনার বিলাস কখনও সাহিত্য হইয়া উঠে না।

মানবের দুঃখ-দুর্ব্বলতায় বেদনা-বোধ মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ সন্দেহ নাই—কিন্তু সে বেদনা সাহিত্যের মারফতেই প্রথম পাইবার কথা নয়। সাহিত্যে মানবজীবনের পাপ-তাপ উপকরণ উপাদান মাত্র—রসানন্দ-সৃষ্টিই তাহার উদ্দেশ্য। লেখকের সহানুভূতি ও রসানন্দ সৃষ্টির কৌশলই উপভোগ্য—পাপতাপই উপভোগ্য নয়। ভাবতান্ত্রিক লেখক পাপ-তাপের বাস্তবতা হরণ করিয়া তাহাকে বিশ্বজনীন ভাবলোকে পর্য্যবসান দান করেন। ঘৃণা জুগুপ্সা সঞ্চারণের জন্য অঙ্কিত পাপচিত্র যেমন সাহিত্য হইয়া উঠে না—প্রচুর অশ্রুপাতের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত অতিকারুণ্যের চিত্রও তেমনি সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করে। সে ক্ষেত্রে লেখকের রসসৃষ্টির প্রয়াসই ব্যর্থ হয়—চোখের লোনা জলে সকল রসই বিকৃত হইয়া যায়।

যুগে যুগে দেশে দেশে যৌন আকর্ষণ সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য, কিন্তু সাহিত্যে এই আকর্ষণের একটা সীমা আছে। মানুষকে মানুষ রাখিয়াই সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হইবে, সময়ে সময়ে সে পশু হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু পশু লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি চলে না, আমি সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম—সুন্দর অসুন্দরের কথা ত সাহিত্য-বিচারে ছাড়া যায় না। সাহিত্যে যৌন অনুরাগের কথা ততটুকুই চলিতে পারে—যতটুকু কামনার স্নায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া রসলোকে আরোহণ করিতে সমর্থ। কামকেলির কথা যদি ঐ স্নায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়াই পর্য্যবসান লাভ করে—তবে সাহিত্য হয় না। কামানন্দ কখনও রসানন্দ হইতে পারে না। উহা সম্পূর্ণ দৈহিক—রক্ত-মাংসের ব্যাপার।

অনেক লেখক মনে করেন—স্বকীয় কামার্ত্তির বাঙ্ময় রূপ দিয়া রসোল্লাসের সৃষ্টি করিলাম—অন্ততঃ ভাবেন—একটা অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়া convention ভাঙ্গিয়া একটা পরম সত্যের বিবৃতি করিলাম—সত্যের অকুণ্ঠিত অনাবৃত রূপ দেখিয়া লোকে আনন্দই পাইবে। সুন্দরের আবেষ্টনীর মধ্যে কামেরও স্থান আছে—কিন্তু তাহার বাহিরে কাম সুন্দর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষের ন্যায়ই বীভৎস।

উচ্চতর ভাবব্যঞ্জনা বা গভীরতর রসপরিণতির জন্য সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়লালসা উপায়, উপকরণ বা অঙ্গস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়লালসাকে প্রাধান্য দিয়া মধ্য-পথে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহারই লীলা-কেলির লোভাতুর বর্ণনা যতই কৌশলময় হউক সৎসাহিত্য নয়। অকারণ কামকেলির বর্ণনা বিদ্যাপতিই করুন আর ভারতচন্দ্রই করুন, সাহিত্যের গ্লানি ছাড়া আর কিছু নয়। বর্ত্তমান সাহিত্যের বহু লেখক এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া অবলুণ্ঠিত কামলালসার বিবৃতি ও বিশ্লেষণকে সাহিত্য মনে করিতেছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে কামকেলি-বর্ণনার অভাব নাই। বর্ত্তমান যুগের লেখকগণ এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য হইতে দীক্ষালাভ করেন নাই। দেশের রুচি-বিগর্হিত সাহিত্যের ধারা মাইকেল-বঙ্কিমের আবির্ভাবের পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এ যুগের লেখকগণ উহা পাইয়াছেন বিদেশ হইতে। টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রাঁস ইত্যাদি সাহিত্যরথীদের আদর্শ ইঁহারা গ্রহণ করেন নাই—জোলা, ব্যালজাক; মোপাসাঁ পড়িয়াই ইঁহারা সাহস পাইয়াছেন এবং ফ্রয়েড ফুরেল, ক্র্যাফ্টএবিং, হ্যাভলক এলিস ইত্যাদি যৌন বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থ ইঁহাদিগকে উপাদান যোগাইয়াছে। জানি না, প্রাচীন সাহিত্য বাৎস্যায়নের কামসূত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল কি না, বর্ত্তমান যুগের বহু র যে বিলাতি যৌন বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ে সন্দেহ বিলাতি যৌন বিজ্ঞানে Pathological abnormality

জন্য complexএর বিবৃতি প্রসঙ্গে যে সকল যৌন অপ্রকৃতিস্থতা ও অস্বাভাবিকতা, অগম্যা-সংসর্গ ও বিকৃত যৌনবৈচিত্র্যের প্রকরণ আছে—সেই সমস্ত বঙ্গসাহিত্যকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। যুগ যুগ হইতে সামাজিক, পারিবারিক ও দাম্পত্য-বন্ধনের যে শুচি সুন্দর আদর্শ বাঙ্গালীর চিত্তগঠন করিয়া আসিয়াছে, অকারণে তাহার প্রসন্নতা, স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি যে সাহিত্যের স্থূল হস্তাবলেপে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এ জাতি যতই অধঃপতিত হউক, কখনও সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না।

যৌন আকর্ষণের পথে রবীন্দ্রনাথ সামান্ত দূর আগাইয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র আরও কিছু দূর আগাইয়া বীভৎসের সাক্ষাৎ পাইয়া ফিরিয়াছিলেন—বর্ত্তমান যুগের কোন কোন লেখক পথের শেষ পর্য্যন্ত গিয়া একেবারে নরকে নামিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই আকর্ষণের কথা বা রিরংসার কথা যেখানে আছে সেখানে এতই সংযত, মার্জিত ও অলঙ্কৃত ভাষার প্রয়োগ আছে যে, অশ্লীল হইতে পায় নাই। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন লেখকের অবল্গিত গ্রাম্য নিরাভরণ ভাষায় কামের কথা একেবারে শুঙ্কারঞ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা অস্বাভাবিক, যাহা অসত্য তাহার দ্বারা সাহিত্য হয় না—তাই বলিয়া সত্য ও স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া অবিকল নির্লিপ্ত বিবৃতি চিত্রণ বা বর্ণহীন বর্ণনাকেই সাহিত্য মনে করিতে হইবে—ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। তাহা হইলে Photography একটা বড় আর্ট হইত এবং খবরের কাগজের রিপোর্টগুলিও সাহিত্য হইত।

মানবজীবনে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা যাহা সত্য ও স্বাভাবিক শিল্পীর ভাবকল্পনায় তাহা একত্র মিলিত হইয়া অভিনব সংযোগ-সংস্থিতি ও রূপ লাভ করে। সত্যের এই রূপও যেমন সত্য তেমনি স্বাভাবিক। ইহার অভিব্যক্তিই সাহিত্য। শিল্পীর সৃজনীশক্তি খণ্ড খণ্ড সত্যানুভূতিকে নির্ব্বাচন করিয়া এবং এক সূত্রে গাঁথিয়া যাহা সৃষ্টি করে, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। বিধাতার সৃষ্টির সহিত ইহার মিল হইতেও পারে—না-ও হইতে পারে। অবিকল মিল কোথাও হয় না। শিল্পীর প্রাণভাণ্ডার হইতে ইহা প্রাণশক্তি লাভ করে—বিধাতার সৃষ্টির চেয়ে ইহা ঢের, বেশি প্রাণবন্ত। শিল্পী বিধাতার সৃষ্টির Reproducer মাত্র নয়।

যে সাহিত্য উৎকট Realismএর দোহাই দিয়া Photographyর মর্য্যাদা দাবি করে—তাহার রচয়িতা যুগধর্ম্মপরিচালিত যন্ত্রবিশেষ। যেখানে চিত্র শিল্পীর মনের বর্ণে অভিরঞ্জিত সেখানে আর photography বলিব না বটে, কিন্তু তাহাতে বর্ণের বিন্যাস-সামঞ্জস্য, স্নিগ্ধতা, সৌকুমার্য্য, উজ্জ্বলতা, শুচিতা ও সজীবতা আছে কি না তাহা অবশ্যই দেখিব।

মানবজীবন, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন্ত সত্যের সহিত যেখানে শিল্পীর সাক্ষাৎ মর্ম্মপরিচয় সেখানেই লেখকের মনের বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া চিত্রে জীবন সঞ্চার করে। আর যেখানে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় রচনার অনুকৃতি, পুস্তকাদির মধ্য দিয়া যেখানে পরোক্ষ পরিচিতি এবং বিক্ষিপ্ত Imageryর নির্বিচার গুন্ফন সেখানে মনের বর্ণও প্রতিফলিত হয় না। জীবন্ত আর্ট হয় না, photographyও হয় না। শরৎচন্দ্রের সেই সাক্ষাৎ মর্ম্ম পরিচয় ছিল এবং তাঁহার মনের বর্ণ গাঢ় উজ্জ্বল ও সজীব, আর বর্ণবিন্যাসের সামঞ্জস্যবোধ ছিল তাঁহার তাই তাঁহার রচনা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছে।

বর্ত্তমান কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অভাব নাই। এই বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য কোন গূঢ়তর বা গভীরতর রসানুকূল উদ্দেশ্যের অঙ্গ বা উপকরণস্বরূপ না হইলে ইহাও photographyর মত জীবনহীন। কেবল মাত্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকেই অনেকে সাহিত্য বলিয়া চালাইতেছেন।

কেবল Psychological নয়—কেহ কেহ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া Pathological Analysisও করিতেছেন এবং এই বিশ্লেষণকেই সাহিত্য সৃষ্টি মনে করিতেছেন। অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র লইয়া সংসাহিত্য সৃষ্টি অত্যন্ত দুরূহ। ডষ্টয়ভস্কির প্রতিভা কয় জনের আছে? ইউরোপে এ চেষ্টা যথেষ্টই হইয়াছে—নাটকে এ চেষ্টা যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে কথাসাহিত্যে ততটা নয়। ইউরোপীয় লেখকগণ মুখ্য চরিত্রের পরিস্ফূর্ত্তির সহায়করূপে গৌণ ভাবে অথবা ট্রাজেডির ক্রম-পরিণতির অঙ্গস্বরূপ সাধারণতঃ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—Pathological Analysisকেই মুখ্য করিয়া তোলেন নাই।

বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যকে এক দিকে যেমন অপরাধতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব ইত্যাদি নানা তত্ত্ব আক্রমণ করিতেছে, অন্য দিকে তেমনি নাটকীয় বক্তৃতা, গীতিকাব্যাত্মক ভাবাকুলতা, প্রাবন্ধিকতা, সাংবাদিকতা ইত্যাদিও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অবিমিশ্র কথা-সাহিত্য বড়ই দুর্ল্লভ। নাটকীয়তা পাত্র-পাত্রীকে অযথা বাচাল করিয়া তুলিতেছে এবং পরিবেষ্টনীর আশ্রয় হরণ করিতেছে। প্রাবন্ধিকতা কথাসাহিত্যের কান্তাসম্মিত ভঙ্গীটিকে বিদূরিত করিতেছে—এবং অযথা বিদ্যাপ্রকাশের পরিসর বাড়াইতেছে। ইহার ফলে অনেক অংশ নীরস প্রবন্ধের রূপ ধরিতেছে। সাংবাদিকতা বর্ণনাগুলিকে রিপোর্টের মত করিয়া তুলিতেছে এবং অনেক অংশকে propagandaয় পরিণত করিতেছে। Lyrical Elementএর প্রতিপত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে রসানুকূল হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে cheap sentimentalityতে পরিণত হইয়াছে, আবেগোচ্ছ্বাস অস্বাভাবিকতারই সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নাটকীয় ভঙ্গী কাব্য ও খাঁটি গল্পের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পে যে গীতিকাব্য ও গল্পের মধুর মিলন ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যে তাহা ক্বচিৎ দেখা যায়। যে গভীর বাস্তব অনুভূতির সংযত ভাবাবেগ শরৎচন্দ্রের রচনাকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে—তাহাও তাঁহার অনুসারকদের মধ্যে দুই-চারি জনের রচনায় দেখা যায়। কথা-সাহিত্যকে চিন্তাগর্ভ উচ্চ সাহিত্যে পরিণত ও ভাবসমৃদ্ধ করিতে হইলে তাহার মূলে একটা জীবন বা জগতের গূঢ়তত্ত্ব (Philosophy) থাকা চাই। তাহাও যদি না থাকে, মাঝে মাঝে তত্ত্ব-সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ ও মীমাংসা সমাধানের চেষ্টা বা ইঙ্গিত থাকিলেও চলে। অবশ্য এ সকলের সহিত রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাহা যেন রসসৃষ্টির পরিপন্থী না হয়—অর্ব্বুদের মত তাহা রচনার শরীরে জাগিয়া না উঠে। ভাবুক শিল্পী ঐ সকল কথা নিজের জবানিতে প্রকাশ করেন—অথবা এমন একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেন—যাহার মুখে ঐ সকল কথা অশোভন বা অসমঞ্জস হয় না। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ লেখক ইহা এড়াইয়া চলেন। তাঁহারা পাত্র-পাত্রীর মুখে তাহাদের প্রাকৃত জীবনের কথা বসাইয়া অর্দ্ধনাটকীয় ভঙ্গীতে গল্প উপন্যাস খাড়া করেন। ইহাতে দোষের কিছু নাই।

শুধু সাহিত্য রচনাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য—অন্য কোন উচ্চাভিলাষ তাঁহাদের নাই।

কেহ কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হন। বলা বাহুল্য,—ইঁহারা কেহই সত্যদ্রষ্টা নহেন—এই সৃষ্টি ও জীবনের গূঢ় রহস্যের সন্ধান ইঁহাদের জানা নাই। ইঁহারা বিদেশী গ্রন্থাদি পড়িয়া যে বিদ্যা অর্জ্জন করেন, তাহাকেই ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা বলিয়া মনে করেন। স্থানে অস্থানে সেই বিদ্যার পরিচয় দিয়া ইঁহারা একাধারে artist ও thinker হইতে চান। এই বিদ্যা রচনার অঙ্গীভূত হইয়া রসসৃষ্টির সহায়তা করে না। অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার মনে চমক-লাগানো ছাড়া ইহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কোন কোন প্রবীণ লেখকও এই ভুল করিয়াছেন।

গভীর চিন্তাশীলতার অভাবেও কথাসাহিত্য হইতে পারে, কিন্তু যথাযোগ্য অবলম্বন ও পরিবেষ্টনীর অভাবে ইহা প্রাণবান হইয়া উঠে না। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ উপন্যাস রচনায় ঘটনা-সংঘাত ও বৈচিত্র্যের বিশেষ আদর নাই। ঘটনা-বৈচিত্র্য পাঠকের কল্পনাকে সক্রিয় ও কৌতূহলী করিয়া তুলে। ঘটনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে নব নব পরিবেষ্টনীর বিকাশে কল্পনা কুতুকিনী হইয়া উঠে। এ যুগের সাহিত্য হইতে দুই-ই বিদায় লইতেছে। Story element ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। Psychological analysis, অকারণ প্রাণহীন বর্ণনা ও বিবৃতি, বাগ্‌বিলাস ও বাচালতা ক্রমে যত বাড়িয়া যাইতেছে, কথাসাহিত্যে সুগঠিত বৈচিত্র্যময় প্লটের ততই অভাব হইতেছে। চিত্রকলায় যাহাকে Boneless figure বলে—তাহারই আধিক্য ঘটিতেছে। অস্থিকঙ্কালের দৃঢ়তা, সুসমঞ্জস বিন্যাস ও বৈচিত্র্যই যে সকল সংগঠনের সৌষম্য, প্রাণবত্তা ও সুস্বাস্থ্যের প্রধান আশ্রয় তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? অনেক লেখক প্লট বা আবেষ্টনী সৃষ্টির একেবারে ধার না ধারিয়া পাত্রপাত্রীর কথোপকথনেই কর্ত্তব্য সমাধা করেন। তাঁহাদের রচনায় কল্পনা কোথাও আশ্রয় পায় না—অবলম্বন বা আশ্রয়ের অভাবে কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা স্মৃতিকেও সহায়তা করে না—চিত্রপাত দূরে থাকুক, চিত্তে রেখাপাতও করে না। যেটুকু দাগ পড়ে তাহা সমুদ্রবেলায় অঙ্কিত রেখার মত মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়। পাঠশেষের পর একটা চরিত্রের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকে না—কতকগুলি মুখের কথা মিলিয়া একটা কলরবের সৃষ্টি করে—কলরবের আর কি স্মৃতি থাকিবে?

অশ্রু এ দেশে বড়ই সুলভ। বাঙ্গালী জাতির মত অশ্রুবর্ষী জাতি আর নাই। সাধারণ বাঙ্গালী অশ্রুপাতের পরিমাপেই সাহিত্যের বিচার করে। এ যুগের কোন কোন লেখক বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতা ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাসাহিত্যে দুঃখক্লেশ, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, অন্নকষ্ট, ক্ষুধা শোক দারিদ্র্যের চরম শোকাবহ চিত্র দেখা যায়। এইরূপ Lachrymose গল্প উপন্যাসেরই আদর বেশী। এইগুলি যে কেন রসোত্তীর্ণ হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই দরিদ্র বুভুক্ষু দেশে যৌন-লালসার পরেই ভোজন-লোলুপতার ঠাঁই! স্থূল দেহধর্ম্ম হইলেও এই লোলুপতারও সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান হইতে পারে। বর্ত্তমান সাহিত্যে দৈন্যের সহিত মিশ্রিত এই লোলুপতা লইয়া বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। এই ব্যাপারে নুট হামসুনের প্রভাব হয়ত আছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে অথবা পৌরাণিক নাট্যকাব্যে মৃত্যুর দ্বারা Tragedy দেখানো হইয়া থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপন্যাসে ব্রতভঙ্গে, স্বপ্নভঙ্গে বা হৃদয়ভঙ্গেই Tragedy ঘটাইতে হয়। অনেক লেখকই দেখি, ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া যমদণ্ডের দ্বারাই Tragedy ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, ইহা ছাড়া যথেষ্ট অশ্রুপাতন সম্ভব হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটি সমস্যা লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—শরৎচন্দ্রের রচনায় সেইগুলি ছাড়া বহু অপ্রত্যাশিত সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে সেইগুলির সহিত এমন সব নূতন নূতন কাল্পনিক সমস্যা দেখা যাইতেছে যাহা বাঙ্গালী-জীবনে কোন দিন ছিল না—এখনও নাই—কোন দিন জাগিবে কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য জীবনের সহিত আমাদের জীবনের কোন মিলই নাই—তাহাদের জীবনের সমস্যা আমাদের সাহিত্যে অমূলক, অসত্য। যাহার কোন মূলই নাই—তাহাতে জীবনসঞ্চার হইতে পারে না। তাই এ সাহিত্য যেমন নির্জ্জীব—তেমনি অসত্য।

বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রধান সমস্যা যৌন-সমস্যা। দেহে-মনে জীর্ণ অধঃপতিত লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর জীবনে সমস্যার অভাব নাই। সে সকল সমস্যার কথা বর্ত্তমান সাহিত্যে নাই তাহা নয়, বরং অতিরিক্ত মাত্রাতেই আছে—কিন্তু সবই যেন যৌন-সমস্যার পরিপোষক হিসাবে, অথবা অন্য সব সমস্যার সহিত যৌন-সমস্যা ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। জীবন-মরণের সমস্যার সঙ্গে যৌন-সমস্যার অনুশীলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসাভাসেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে! আর এক কথা—আমরা নানা সমস্যার ব্যূহের মধ্যেই বাস করিতেছি—সংবাদপত্র ও বিলাতী পুস্তকাদিতেও প্রত্যহ নানা সমস্যারই সাক্ষাৎ পাই। আমাদের সাহিত্যেও যদি শুধু সেই সমস্যাগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়—তবে আমরা জুড়াই কোথায়? স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি কোথায়? সাহিত্যের অনুশীলনকে আর A means of escape from the ills of life বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই।

দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠকে propaganda সাহিত্য বলা হয়। পল্লীসমাজ ও পণ্ডিত মশাইকেও কেহ কেহ এই আখ্যা দেন। এ কথা সত্য হইলেও এই propagandaর মধ্যে জাতীয় কল্যাণই লক্ষ্য—ইহার মূলে আছে গভীর হৃদয়বত্তা ও দেশপ্রাণতা। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন লেখকের রচনায় যে propaganda চালান হইতেছে—তাহার মূলে আছে সত্যের নামে কালাপাহাড়ী বুদ্ধি। ইহাতে জাতির ইহ-পরকালের কোন কল্যাণই হইবে না। যে সত্যের নামে এই propaganda, সে সত্যের সম্মানও ইহা রাখে না—এই কালাপাহাড়ী বুদ্ধি সত্যনারায়ণ বা সাহিত্যসরস্বতী কাহারও মর্য্যাদা রাখে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারীজাতির মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া এ সাহিত্য নারীত্বের যে অবমাননা করিয়াছে, অবিচারক সমাজও তাহা কোন দিন করে নাই।

এ যুগের লেখকগণ বিষয়বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য আকাশ-পাতাল খুঁজিয়াছেন - যাহা কখনও আর্টের বিষয়ীভূত হইতে পারে না—তাহা লইয়াও সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সমগ্র জাতীয় জীবনের সহিত যাহার গভীর সংযোগ এমন ইঁহারা একখানি গ্রন্থও রচনা করেন নাই।

অতিমানুষিক চরিত্র, কি জড়শক্তির সহিত আত্মিক কি সত্যের সহিত স্বপ্নের, কি জীবনমৃত্যুর সহিত

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসংস্কারের সহিত বিশ্বজনীন মানবধর্ম্মের সংঘর্ষ, কি এক জন কর্ম্মবীরের বৈচিত্র্যময় জীবন, কি জাতির জীবন-মরণের সমস্যা, কি দেশের একটা ঘটনাঘন দশা-বিপর্য্যয়—এই সমস্ত লইয়া এ যুগে কোন উপন্যাসই রচিত হয় নাই। দেশের অতীত ইতিহাস অবলম্বনে যে এক শ্রেণীর কথাসাহিত্য রচিত হইতেছিল তাহাও আর হয় না। এ যুগের কথাসাহিত্য লঘু সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। এ যুগের উপন্যাস রচনা ছোট গল্পকে টানিয়া বুনিয়া বড় করা। এ সাহিত্য লঘু সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই, অথচ ইহাতে Wit ও Humourএর একান্ত অভাব। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের রচনায় ও ইঁহাদের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনাতেও যথেষ্ট Wit ও Humour আছে। Wit Humour যে কথা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, এ যুগের অধিকাংশ লেখক তাহা মনে করেন না। কথকতার প্রফুল্ল মধুর কৌতুকময় temperamentও ইঁহাদের নাই। শুধু তাহাই নয়, গল্পকথক ও শ্রোতার মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা, আত্মীয় ভাব ও প্রীতি-বন্ধন থাকিবার কথা, তাহাও ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্ট করিতে পারেন না। Vitalityর অভাবেই হউক আর টেকনিকের ত্রুটিতেই হউক, পাঠককে ইঁহারা কোলের কাছে টানিয়া লইতে পারেন না।

মাসিকপত্রের প্রয়োজনে ও অর্দ্ধ শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার চাহিদায় এ দেশে ছোট গল্পের বন্যা আসিয়াছে। আনারসের রস যেমনই হউক, আনারসের কাঁটা-বনে সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেলে প্রাঙ্গণের তুলসী গাছটি পর্য্যন্ত মরিয়া যায় এবং বাড়ী সাপের আড্ডা হয়। ছোট গল্পের অতিরিক্ত প্রসারে দেশের সাহিত্য-সংসারের সেই দশাই হইয়াছে।

ছোট গল্প রচনা এখন Journalisimএর অন্তর্গত। সাময়িক পত্রের খোরাক যোগাইতেই গল্পগুলির সৃষ্টি। সংবাদপত্রের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় রাশীকৃত ছোট গল্পের জীবন ক্ষণস্থায়ী। ছোট গল্প না হইলে মাসিক-সাহিত্যযাত্রা অচল—অথচ যে পদে চলিতে হইবে সেই ছোট গল্প সে পদে শ্লীপদের সঞ্চার করিতেছে।

রাশি রাশি ছোট গল্পের মধ্যে তুই-চারি জন লেখকের কয়েকটি ছোট গল্প এ যুগের একমাত্র সম্বল। যাঁহারা উৎকৃষ্ট ছোট গল্প লিখিয়াছেন—তাঁহাদেরও অধিকাংশ রচনা বিশেষতঃ উপন্যাসগুলি স্থায়ী সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করে নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমি বর্ত্তমান যুগের লেখকদের কাছে অযথা অতিরিক্ত প্রত্যাশা করিয়া না পাইয়া দোষারোপ করিতেছি। আমি বর্ত্তমান যুগের লেখকদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা, রসাদর্শ, বিশ্বধর্ম্ম, বিশ্বমানবতা, ভাবুকতা, চিন্তাশীলতা কিছুই প্রত্যাশা করি নাই। বাস্তবের সহিত যে সাক্ষাৎ পরিচয়, যে গাঢ় গভীর অনুভূতি ও দরদ, ভাষারীতির যে স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দতা শরৎচন্দ্রের রচনাকে সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে—বর্ত্তমান যুগে কয় জনের রচনায় তাহা আছে ?

জাতি ব্যক্তিবিশেষের রসজীবনের মধ্য দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করে,—তাহাই জাতীয় সাহিত্য। ব্যক্তি তাঁহার নিজস্ব প্রতিভায় তাহাকে রস-রূপ ও বৈশিষ্ট্য দান করেন। জাতি এই সাহিত্যকে সঙ্গে সঙ্গে বরণ করিয়া প্রমাণ করে—ইহা তাহারই প্রাণের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এই হিসাবে জাতীয় সাহিত্য। যে সাহিত্যস্রষ্টার মধ্য দিয়া জাতি আত্মপ্রকাশ করে—তাহার ব্যক্তিত্ব যদি দেশকালপাত্রাতীত হয়—তবে তাঁহার দ্বারা এমন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে যাহা জাতির রসজীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। এ সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য না হইলেও জাতি ধীরে ধীরে তাহাকে নিজস্ব করিয়া লয়। এইরূপ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আমি প্রত্যাশা করিতেছি না—কিন্তু জাতি তাঁহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে এ প্রত্যাশা ত করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ লেখকের সহিত জাতীয় জীবনের গভীর সংযোগ নাই। জাতির প্রাণের বার্ত্তাকে তাঁহারা সাহিত্যে রূপ দিতেছেন না—বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়া আপন আপন খোসখেয়াল ও কল্পনাবিলাসকে সাহিত্য বলিয়া চালাইতেছেন। আমার এই অভিযোগ কতটা সত্য তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

উপসংহারে এ কথাও বলি—সাহিত্যের যতগুলি শাখা আছে, তন্মধ্যে অন্যান্য শাখার তুলনায় একমাত্র কথাসাহিত্যের শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের পর কিছু কিছু সুরভি কুসুম ও রসাল ফলের আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে তুই-চারি জন শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে—আমার অভিযোগ তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু রাশি-রাশি কথাসাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের রচনা মুষ্টিমেয়,—আশশেওড়ার বনে কুন্দলতা এবং বিশ্বসাহিত্যের বিচারে তাহা নগণ্য। কেবল বঙ্গসাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে সেগুলি আমাদের নৈরাশ্য দূর করিয়া আশ্বস্ত করে। তাঁহারা সর্ব্বজনসমাদৃত—তাঁহাদের নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। দেশের লোক তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভা স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করে নাই। এ যুগের পাঠকদের রসবোধ পূর্ব্বের চেয়ে প্রখরতর, তাহারা আর ভুল করিয়া অযোগ্য লেখকের অসার রচনাকে সৎসাহিত্য বলিয়া মনে করে না।

শ্রীকালিদাস রায়।

মর্ত্ত্য আমার ভালো

স্বর্গ আমি চাই না প্রিয়, মর্ত্ত্য আমার ভালো!
হেথায় তবু দেখতে পাবো তোমার আঁখির আলো!
মিলিয়ে তোমার হাতে-হাতে
চলবো পথে সাথে-সাথে
মুছিয়ে দেবে তুমি আমার তুঃখ-ব্যথার কালো।
স্বর্গ আমার রহুক দূরে, মর্ত্ত্য বাসি ভালো।

স্বর্গ আমার দূরে থাকুক স্বপ্ন-লোকের পুরে—
মর্ত্ত্যে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ো তোমার বীণার সুরে।
পরশ তোমার মধুর করে'
চিত্ত আমার দিয়ো ভরে'—
অন্ধকারের তলে প্রিয়, তোমার প্রদীপ জ্বালো!
স্বর্গ আমার রহুক দূরে, মর্ত্ত্য বাসি ভালো।

শ্রীরীণা ভট্টাচার্য্য

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

দেহের ডৌল

দেহের কাঠামো বা ঠাট বা গড়ন নির্ভর করে প্রথমতঃ বংশানুক্রমিক কাঠামোর উপর। তার পর আমরা যে যেমন কাজ করি, সেই কাজের নিত্য-ধারায় কাঠামোর গঠনে অনুরূপ ভাঙ্গা-গড়া চলে। কাঠামোকে অর্থাৎ ঠাটকে ব্যায়াম-সাধনায় সম্পূর্ণ মনের মতন করিয়া গড়া যায়—এ কথা কাণে বিচিত্র ঠেকিলেও মিথ্যা বা অত্যুক্তি নয়।

একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইলে আমাদের দেহের গঠনে আর কোনো পরিবর্ত্তন হয় না—এমনি একটা কথা প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞেরা এ কথার উপর আদৌ আস্থা রাখেন না। তাঁরা বলেন, আহারে-বিহারে নিয়ম মানিয়া চলিলে এবং সেই সঙ্গে যোগ্য ব্যায়াম-সাধনা করিলে সকল বয়সেই আমাদের দেহকে খানিকটা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা যায়।

বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে হাড়ের গড়নে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না; তবে বিশেষ ব্যায়াম-সাধনায় পেশী প্রভৃতির স্বাস্থ্য ভালো করিতে পারিলে বেয়াড়া ছাঁদের দেহও সুকুমার হইবে। অর্থাৎ যাঁদের কনুই দেখায় হাড়ের খোঁচার মত—নাকে, ঘাড়ে হাড়ের ঝিঁক বাহির হইয়া থাকে, বা হাত-পায়ের আঙুল-গুলোকে দেখায় কাঠির মত—মানে, দেহে গোলালো (rounded shape) ছাঁদের অভাব—দেখিলে মনে হয়, কাঠি বা বাঁখারি দিয়া দেহ গড়া,—যোগ্য ব্যায়াম-সাধনায় তাঁদের দেহ সুগোল ছাঁদে পরিপুষ্ট হইবে। কনুইয়ের কাছে খোঁচা দেখাইবে না—দেহের যেখানে যে বাঁক, সেগুলি হইবে পুরন্ত; সঙ্গে সঙ্গে সুঠাম শ্রীতে অঙ্গ ভরিয়া উঠিবে। গায়ে যাঁদের 'মাষ' নাই,—পেশীগুলায় সামঞ্জস্য নাই—মেদের বিশৃঙ্খল-বিন্যাসে দেহ ঢিলা-ঢালা, শ্রীহীন—এ ব্যায়ামে সে-সব বিকৃতি ঘুচিয়া তাঁদের দেহ সুডৌল হইবে।

হাঁটু, কনুই—এগুলা যে ঝিঁকের মত উঠিয়া থাকে, সে শুধু কাঠামোর দোষে। কাঠামো বেয়াড়া হইলেও তার উপর মেদ-মাংস যদি সুসমঞ্জস্ ভাবে থাকে, তাহা হইলে মানুষকে কদর্য্য বা অসুন্দরে কুৎসিত' দেখায় না। কাহারো হাত পাতের মত—কোন মতে চামড়ায় ঢাকা। দেহের অনুপাতে কাহারো পা অনেক বেশী লম্বা; আবার কাহারো ঘাড় মোটা,—মুখ ত্যাবড়ানো-গোছ, গাল টেবো—দুটি চোখ কোটরে ঢুকিয়া আছে! তাঁদের এসব বিকৃতি ঘটে কাঠামোর বংশানু-ক্রমিক বিকৃতিতে, এ-বিকৃতি একেবারে না সারুক—সমঞ্জস মেদে-মাংসে ঢাকা পড়ে; পেশীর স্বাস্থ্য ভালো হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহও সুকুমার ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে। এ জন্য বিশেষ রীতির ব্যায়াম-সাধনা প্রয়োজন। সেই ব্যায়াম-বিধির কথা বলিতেছি।

১। প্রণতির ভঙ্গীতে

২। মাথায় হাত রাখিয়া

৩। বাঁ দিকে ঘাড় হেলাইয়া

১। সিধা ভাবে দাঁড়াইয়া ১নং ছবির মত প্রণতির ভঙ্গীতে মাথা নোয়ান; তার পর দুই হাত তুলিয়া করতলে মাথা চাপিয়া মাথাকে সামনে-পিছনে ঘন-ঘন দুলাইবেন। প্রায় তিন মিনিট-কাল এ-ব্যায়াম করা চাই। এ ব্যায়ামে মুখের এবং ঘাড়ের গড়ন সুডৌল ছাঁদের হইবে, চিবুকের গঠন হইবে সুকুমার, টিকালো।

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত মাথায় রাখিয়া পিছন দিকে মাথা দুলাইবেন; এবং সামনে ও পিছন দিকে ঘন ঘন ঘাড় ও মাথা দুলাইবেন প্রায় তিন-চার মিনিট। এ ব্যায়ামে ঘাড় গলা মুখের গড়ন হইবে সুডৌল, সুশ্রী; ঘাড় ও বগল হইবে সুছাঁদের; সঙ্গে সঙ্গে দু'-হাতের কনুইয়ের হাড়-ওঠা কোণা-ভাব ঘুচিয়া পুরন্ত গোলালো হইবে।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ দিকে ঘাড় হেলাইয়া বাঁ-হাত মাথায় রাখিয়া চাবি দিকে ধীরে-ধীরে এবং ঘন-সঞ্চালে

মুখ নাড়িবেন—তিন মিনিট; তার পর ডান দিকে মাথা হেলাইয়া ডান হাত মাথায় রাখিয়া এমনি ভাবে তিন মিনিট কাল মাথা-পরিচালনা। এ ব্যায়ামে ঘাড়ের টোল সারিবে, ঘাড় ও গলার গড়ন হইবে সুকুমার; চোখের গড়নও সুশ্রী হইবে; চোখের কোল-বসা ভাব সারিবে।

৪। কনুই রাখিবেন

৪। ৪নং ছবির ভঙ্গীতে সিধা খাড়া দাঁড়ান। ডান হাতের কনুই রাখিবেন কোমরে তলপেটের উপরাংশে—বেশ একটু চাপ দিয়া রাখিবেন। তার পর বাঁ হাতখানি ডান হাতে আঁটিয়া ধরুন। বাঁ হাতখানি ডান হাতে এমনি আঁটিয়া ধরিয়া কনুই-মোড়া বাঁ হাত উপরে তুলুন—কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় তুলিতে হইবে। তুলিবেন ধীরে ধীরে—হাত তুলিয়া পরক্ষণেই ধীরে ধীরে এ-হাত নামাইবেন—নামাইতে হইবে ঠিক ঐ ছবির পোজিসনে! পাঁচ মিনিট এ ব্যায়াম-সাধনার পর বাঁ হাতে ডান হাত চাপিয়া ধরিয়া এই রীতিতে ডান হাত তোলা এবং নামানো পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে কাঠের মত লিক্‌লিকে হাত সমঞ্জস্ ভাবে মেদে-মাষে পুরন্ত হইবে—হাত হইবে সুগোল সুডৌল।

৫। এবার হাঁটুর কাছে দু'পা মুড়িয়া হাঁটু গাড়িয়া দুই হাত সামনে প্রসারিত করিয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে অবস্থান—

৫। হাঁটু মুড়িয়া

তার পর ক্ষিপ্র ভাবে উঠিয়া দাঁড়ানো; দাঁড়াইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গণনা করুন—গণনান্তে হাঁটু দুমড়াইয়া ছবির ভঙ্গীতে পুনরায় অবস্থান। এ ভাবে অবস্থান করিয়া ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত গণিবার পর আবার উঠিয়া দাঁড়ানো—এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

এ ব্যায়ামে হাঁটু গোল হইবে, সুডৌল ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে; পায়ের গড়ন ভালো হইবে—উরু হইবে যাহাকে কবিরা বলেন, 'রম্ভোরু!' সেই সঙ্গে বুক, হাত, পায়ের গড়নও সুকুমার শ্রীতে ভরিয়া পুরন্ত থাকিবে।

—

ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়

শীতের শেষে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত দেখা যাচ্ছে! এ রোগটির ছোঁয়াচ খুব প্রখর—চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজো এ রোগের ছোঁয়াচ থেকে সুস্থ থাকবার উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারেনি!

যুদ্ধের জন্য সহরে-গ্রামে লোকের ভিড় বেড়েছে অসম্ভব রকম। ভিড়ে এ-রোগ রুদ্র ভৈরবের মত মাতন তোলে—আশে-পাশে পল্লীর পর পল্লীকে কঠিন পাশে আবদ্ধ, জর্জ্জরিত, জীর্ণ করে মারে! ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে এ রোগ সব চেয়ে করাল মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যে দেখা দিয়েছিল! তার গ্রাসে কত গৃহ যে শ্মশান হয়েছে, সে মর্ম্মান্তিক কাহিনী মনে হলে গা এখনো ছম্-ছম্ করে।

এবারও সেই যুদ্ধ এবং লোকের ভিড়! সে বারকারের যুদ্ধে আমাদের এখানে ফৌজের ভিড় জমেনি—এবার ফৌজের ভিড় কল্পনাতীত! কাজেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তিতে না আত্ম-প্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে আমাদের যথাসম্ভব সতর্ক সচেতন হতে হবে!

মেয়েদের উপরেই সংসারের ভার। এ জন্য স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি-সম্বন্ধে মেয়েদের উচিত সতর্ক হওয়া। ছেলেমেয়েদের তাঁরা হুঁশিয়ার করবেন—নিজেরা সাবধানে থাকবেন—বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয় পুরুষদের সচেতন রাখবেন।

বড় বড় ডাক্তাররা বলেন, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি দুরন্ত রোগকে ঠেকিয়ে দূরে রাখা যায়—এ যুগের আবিষ্কৃত টীকার দৌলতে! ইনফ্লুয়েঞ্জার সম্বন্ধে টীকার ব্যবস্থা অচল বলেই তাঁরা স্বীকার করছেন! তবে তাঁরা বলছেন, সাধারণ কতকগুলি বিধি মেনে চললে এ রোগের ছোঁয়াচ বাঁচানো সম্ভব হবে।

খুব বেশী পরিশ্রম যাতে হয়, এমন কাজ বা খেলাধুলো করবেন না। তাতে বড় বেশী অবসন্ন হবেন—ক্লান্ত হবেন। দেহের ক্লান্তি-অবসাদ ঘটলে এ রোগের আক্রমণ-সম্ভাবনা প্রবল হয়।

শীতের শেষে এ রোগ দেখা দেয়। এ সময় ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। সিনেমায় বা থিয়েটারের বদ্ধ ঘর এ রোগের বিষে ভরে থাকে—এ সময় সিনেমা-থিয়েটার দেখা বন্ধ রাখলে ভালো হয়। ট্রামে বাসে অসম্ভব ভিড় জমে—অথচ ট্রাম-বাসের সঙ্গে সম্পর্ক কেটেও বাস করা চলবে না। উপায়? বিশেষজ্ঞেরা বলেন, রুমালে ওডিকলো বা একটু ইউকালিপটাস মাখিয়ে রাখা ভালো। নাক-মুখ যথাসম্ভব রুমালে ঢেকে রাখবেন। শ্বাসপ্রশ্বাসেই এ রোগের বীজাণুর লালন ও পরিক্রমণ—কাজেই অপরের শ্বাসপ্রশ্বাস যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চলা উচিত। কেউ যদি হাঁচেন বা কাশেন—তাঁর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে সরে থাকতে হবে। ভিড়ের মধ্যে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন না করে খোলাখুলি ভাবে যাঁরা হাঁচবেন বা কাশবেন, তাঁরা বর্ব্বর—তাঁদের মুখের উপর সুস্পষ্ট শাসন তুলতে হবে! এবং নিজেরাও সাবধান হবেন—হাঁচবার কাশবার সময় নাকে-মুখে রুমাল বা কাপড় ঢাকা দেবেন। এ বিধি

যদি সকলে মেনে চলেন, তাহলে ইনফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে সংক্রামক মহামারী মূর্ত্তি ধরবার সুযোগ থাকবে না।

বন্ধ ঘরে কখনো থাকবেন না। আলো-বাতাসে কোনো রোগের বীজাণু বাঁচতে পারে না। বাড়ীতে কারো ফ্লু হলে তাকে যথাসম্ভব আলাদা করে' রাখবেন। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আদর বা স্নেহ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সে স্নেহের ফলে রোগটিকে বাড়ীময় ছড়িয়ে দেবেন। রোগীর ঘরের জানলা যেন খোলা থাকে, ঘরে বাতাস খেলা চাই—নাহলে রোগ বাড়বে বৈ কমবে না!

অসুখ হলে তখনি কোনো ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে—এতটুকু ঔদাস্য যেন না ঘটে! ফ্লু হয়েছে—বোঝবামাত্র কাজ করা নয়, ঘোরা নয়, খেলা-ধূলা নয়—পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। রোগীর গায়ে ঢাকা দেবার জন্য হালকা কম্বল বা লেপ প্রয়োজন—ভারী লেপ চাপা দেবেন না। জামা-কাপড় নিত্য কেচে দেবেন—বদলে দেবেন। খাবার সম্বন্ধে বিধি—তরল খাদ্য। তরল পানীয়ে দেহ থেকে রোগের বিষ বেরিয়ে যায়। টোমাটোর রস, কমলা লেবুর রস, বেদানার রস পুষ্টিকর—এ রোগে খুব উপযোগী পথ্য। পথ্য সম্বন্ধে অবশ্য ডাক্তারের নির্দ্দেশ মানতে হবে। গরম জলে লবণ বা সোডিয়াম-বাইকার্ব্বনেট দিয়ে সেই জলে যত বার পারেন কুলি (gargle) করবেন। চায়ের কেটলির ঢাকা খুলে ফুটন্ত জলের ভাপ নেবেন গলায় আর নাকে। জ্বর ছাড়বার পর দু'-চার দিন দেখে তবে পথ্য করবেন; এবং পরিশ্রম হয় এমন কোনো কাজ করবেন না।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর দেহে শক্তি ফিরে পেতে একটু দেরী হয়। এর জন্য যে দুর্ব্বলতা, সে দুর্ব্বলতা সারতে সময় লাগে। যত দিন না শরীর বেশ সুস্থ ঝরঝরে হবে, তত দিন ভিড়ে বেরুনো বা ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না—এ বিষয়ে হুঁশিয়ার! নাক সড়সড় করে জ্বালাকর সর্দ্দি—সেই সর্দ্দিতে এ রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়; তার সঙ্গে গা মাটী-মাটী করা, কাজকর্ম্মে অনাসক্তি এবং দেহে-মনে অবসাদ—এ হলে বুঝতে হবে, এ রোগের আবির্ভাব ঘটেছে। তখনি কাজকর্ম রেখে পূর্ণ বিশ্রাম চাই। কায়িক শ্রমে যে ক্লান্তি-অবসাদ, তাতেই এ রোগটি পায় আক্রমণের সুযোগ!

এ বিধিগুলি সর্ব্বতোভাবে মেনে চলতে পারলে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে—সে সম্বন্ধে ডাক্তারদের মধ্যে মতান্তর নেই। এ কথা মেয়েদের কাছে বলার মানে, পুরুষরা সাধারণতঃ বেহুঁশিয়ার—রোগ হলে তাঁদের অভিযোগ-অনুযোগের অন্ত থাকে না, কিন্তু রোগের আগে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ উদাসীন! মেয়েরা তাঁদের সতর্ক করবেন, তাই এ কথা বলা।

ছোটদের আসর

বেণু-চরিত

বেণু কথাটির মানে জানো? বাঁশ। বেণুতে বাঁশের বাঁশীও বুঝায়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে তোমরা—তোমাদের কাছে বাঁশের কথা বলিতে বসিয়াছি, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! কারণ বিলাতী গাছ-পালার পরিচয় জানিলেও অনেকে আমাদের দেশে এই বাঁশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

যাঁহারা ইটের বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করিতে পারেন না, বাঁশের খুঁটা পুতিয়া, তার উপর বাঁশ চাছিয়া বাঁখারির ফ্রেম আঁটিয়া খড়ের বা খোলার চাল তোলেন—বাঁশ ছেঁচিয়া সেই ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘর বাঁধেন,—বাঁশের প্রয়োজন শুধু তাঁদের—এ-কথা মনে করিয়া বাঁশের নামে নাক উলটাইবে, এমন ছেলেমেয়ে বাংলা দেশে আছে,—সেই জন্যই এ কথা বলা!

আমাদের দেশে বাঁশ জন্মায় প্রচুর। বাঁশের চাষে পরিচর্য্যার মেহনৎ নাই, পয়সা-খরচও নাই। বাড়িয়া উঠিতে বাঁশ কাহারো সেবা-যত্নের তোয়াক্কা রাখে না। আজ যুদ্ধের বাজারে বাঁশের দাম বাড়িয়াছে কত! এক-একখানি বাঁশ এক টাকা দু'টাকা দামে বিক্রয় হইতেছে। বাঁশের প্রয়োজন—এখানে যে-ফৌজ আসিয়াছে, এবং আসিতেছে, তাদের মাথা গুঁজিবার আশ্রয়-কুটীর গড়িয়া তুলিবার জন্য এই বাঁশ অনেকের পড়ো জমিতে আপনা হইতে গজাইয়া বিরাট বিপুল ঝাড় গড়িয়া তুলিতেছে। সে বাঁশের আর দাম কত—এমন ধারণা মনে পুষিয়া আমরা বাঁশকে তুচ্ছবোধ করি।

কিন্তু মার্কিন-জাত এই বাঁশের পরিচয় পাইয়া বাঁশকে সমাদরে নিজেদের দেশের মাটীতে বসাইয়াছে। বাঁশের সেবা-যত্নের সেখানে সীমা নাই! নানা ভাবে লালন-পরিচর্য্যা করিয়া বাঁশের ঝাড় এবং বাঁশকে মার্কিণ জাতি প্রয়োজনানুরূপ এবং মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে! মার্কিণ মুলুকের যেখানে যত পতিত জমি ছিল, সেই সব জমিতে সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ কোটি একর জমিতে বাঁশের চাষ করিতেছে। বাঁশের চাষের কাজে বহু সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। বহু বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলিতেছে! ভার্জ্জিনিয়া কালিফোর্ণিয়া, ফ্লোরিডা প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁশের চেহারাকে এমন সুছাঁদের করিয়া তোলা হইয়াছে যে সে বাঁশ দেখিলে এ দেশের বাঁশের স্বজাতি বলিয়া তাদের চেনা যাইবে না! সে সব জায়গায় ছেলেমেয়েরা 'বেণু ক্লাব' বা 'বংশ-সমিতি' স্থাপন করিয়াছে; হাতে-কলমে তারা বাঁশের ফশল ফলাইতেছে।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন,—উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং লাভের গাছ এই বাঁশ গাছ। এই বাঁশের ব্যবসার প্রচলন করিয়া আমেরিকা আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করিতেছে; আর আমরা এ দেশে বাঁশবনে ডোমকানা হইয়া কেরাণীগিরি চাকরি খুঁজিয়া মরিতেছি! অভাব-অনুযোগ, দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার বিষে জীবনকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছি!

আমেরিকা আজ এই বংশ-গোষ্ঠী হইতে ১৫ জাতের বাঁশ সৃষ্টি করিয়াছে।
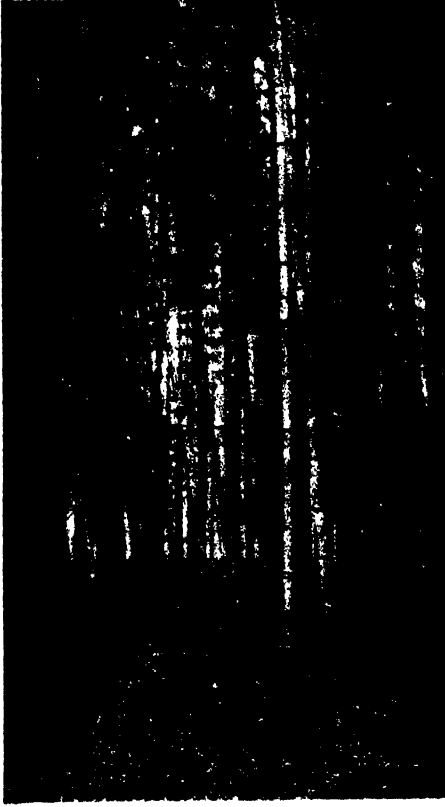
বেণু-বন

তাঁরা বলেন, যব গম প্রভৃতির সমগোত্র এই বাঁশ। এ বাঁশ প্রায় ১২০ ফুট দীর্ঘ এবং গোড়ার দিকবার বেড় হইতেছে তিন ফুট।

এই সাফ করা জমিতে বাঁশের কচি চারা সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁশের এক একটি শিকড় হইতে একশোটি করিয়া বাঁশের চারা বাহির হয় এবং বাঁশের জন্ম-ব্যাপারে জমিতে লাঙ্গল দিবার যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি জমির বা চারার পরিচর্য্যারও কোনো প্রয়োজন নাই। অবহেলা-ঔদাস্য সহিয়াও বাঁশ আপন-তেজে সাত-আট-তলা বাড়ীর মত মাথায় দীর্ঘ হইয়া বাড়িয়া ওঠে।

বাঁশের কোঁড়

বাঁশের গাছে ফুল ফোটে, ফলও ধরে—তবে সে কদাচিৎ! বাঁশের বীজ পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের ফল হয় দেখিতে আপেলের মত। মার্কিণ জাতের কাছে বাঁশ-ফল আপেলের মতই আজ সৌখীন ভোজ্যরূপে সমাদৃত হইয়াছে।

বাঁশ গাছের পরমায়ুও খুব দীর্ঘ। জাপানে এক-জাতের বাঁশ জন্মায়, সে বাঁশ একশো বছরের উপর বাঁচে।

বাঁশের উপকারিতা অপরিসীম। বেড়া, প্রাচীর, আশ্রয়-নীড়—এ সব নির্ম্মাণে বাঁশের প্রয়োজন সমধিক। তার উপর বাঁশ দিয়া বাক্স, পেটরা, পাত্রাদি তৈয়ারী হয়; জলবাহী নল, বাতির জ্বালানি পলিতা, খেলনা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, সিঁড়ি, লিখিবার কলম, বোতাম, লাঠি, চামচ, হাতা, তেলের বোতল, ফ্যান, তীর-ধনু, দড়ি, ছিপ, সুর্‌মা

বিশ ফুট লম্বা বাঁশ　　বাঁশের মূল
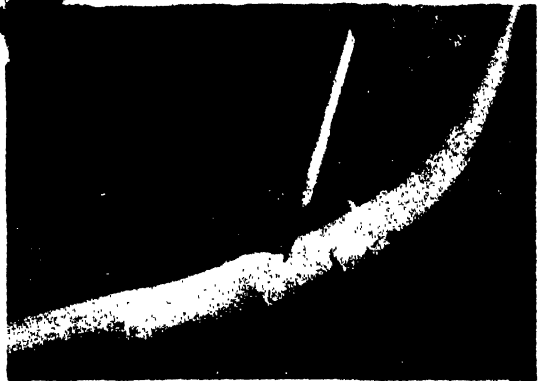
বর্ষার জল পাইলে বাঁশ গাছ প্রত্যহ এক ফুট করিয়া মাথায় বাড়িয়া ওঠে। বাঁশ-ঝাড় কাটিয়া সাফ করিয়া দাও—সাফ-করা জমির উপর দিয়া যদি নিত্য চলা-ফেরা না করো, তাহা হইলে এক মাসে দেখিবে,

প্রভৃতি হাজার রকমের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ারী হয়। আমেরিকার এক প্রদর্শনীতে বাঁশের তৈয়ারী ১০৪৮ রকমের সামগ্রী কিছু কাল পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছিল!

আমাদের দেশে কত কাজে বাঁশের প্রয়োজন, সে-কথা তোমরা জানো—কাজেই তাহার উল্লেখ করিলাম না।

আমেরিকার দেখাদেখি ফ্রান্সে এবং রাশিয়াতেও বাঁশের উপর সকলের নজর পড়িয়াছে। ব্যবসায়-হিসাবে বাঁশকে তারা শিরোধার্য্য করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এই বাঁশকে তারা খর্ব্ব করিতে পারিয়াছে—তার উপর বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারী হইতেছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে বহু লোককে বিনা-খাজনায় পতিত জমি দেওয়া হইতেছে—সে জমিতে তারা করিবে বাঁশের চাষ!

বাঁশের পুল—আমেরিকা

বাঁশের দৌলতে আমেরিকার দৌলতখানা সমৃদ্ধ হইতেছে। আমাদের দেশে চারি দিকে পতিত জমি রহিয়াছে, সে-জমিতে বাঁশ পুঁতিলে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচিবে; বাঁশের দৌলতে সমৃদ্ধি মিলিবে—এ কথা মনে করিয়া তোমরা এদিকে লক্ষ্য রাখিয়ো।

——

ভজহরি

(গল্প)

রাখহরির ছেলে—ভজহরি। কিন্তু ভজহরির কথা বলিবার আগে তার বাবা রাখহরির কথা একটু বলা দরকার। রাখহরি ঠাকুর্দ্দার আমলের চাকর। মেদিনীপুর জেলায় তার বাড়ী। রাখহরির জন্মের আগে তাহার তিনটি ভাই-বোন জন্মিয়া মারা যায়; সেই জন্য সে ভূমিষ্ঠ হইলে, ঠাকুর্দ্দা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'রাখহরি; অর্থাৎ 'হে হরি! ইহাকে বাঁচাইয়া রাখ'। ঠাকুর্দ্দার প্রার্থনা হরি শুনিয়াছিলেন। তার পর, রাখহরির যখন পুত্র হইল, তখন অনেক মাথা ঘামাইয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাখহরি ছেলের নাম রাখিল—'ভজহরি'।

রাখহরি বহু কাল হইতেই আমাদের সংসারে ভৃত্যের কাজ করিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে সে দু'-দশ দিনের ছুটি লইয়া দেশে যাইত, আবার আসিত। কিন্তু সে বার কলিকাতায় বোমা পড়িবার পর বোমার ধাক্কায় রাখহরি সেই যে ছিট্‌কাইয়া দেশে গেল, তিন মাসের মধ্যে আর সে ফিরিল না। তিন মাস পরে হঠাৎ এক দিন অপরাহ্নে রাখহরি আসিয়া হাজির; সঙ্গে একটি ষোল সতেরো বছরের ছেলে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এটি কে রাখহরি?

রাখহরি মুখ-ভরা প্রফুল্লতায় সঙ্গে কহিল—"উটি ভজহরি, আমার খোকা।"

"তোমার ছেলে?"

"আইজ্ঞা।"

ভজহরির দিকে চাহিয়া কহিলাম—"বোসো। ভজহরি তোমার নাম?"

সে-ও বলিল—"আইজ্ঞা।" বলিয়া আমারই পাশে তক্তপোষের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে-দিন ভাবিয়াছিলাম, এটা বেয়াদবী; কিন্তু পরে বুঝিতে পারি, বেয়াদবী নয়—বোকামী।

পরদিন রাখহরি অত্যন্ত বিনীত ভাবে নিবেদন করিল—"বুড়া হোয়ে পড়িচি, দেহে আর খাটা-খাটুনি সয় না; ওদিকে বাড়ীতেও আর না থাকলে চলে না, তাই·········"

বুঝিতে পারিলাম, রাখহরি এখন থেকে দেশেই থাকিতে চায়, সেই জন্যই তার এই বিনীত নিবেদন এবং যোড়হস্ত। কহিলাম, "তা ত বুঝলুম। দেশে না থাকলে তোমার আর চলে না, কিন্তু এখানে কি কোরে চলবে?" তেমনি যোড়হস্তে রাখহরি বলিল—"আইজ্ঞা, ভজহরি এখানে থাকবে, কোন অসুবিধাই হবে না।"

সুতরাং দুই-পাঁচ দিন পরে ভজহরি থাকিয়া গেল, রাখহরি চলিয়া গেল।

সে-দিন বেজায় গরম পড়িয়াছিল। ডাকিলাম—"ভজহরি!"

"আইজ্ঞা!"

"বাজার থেকে বরফ আনতে পারবি এক সের?"

"আইজ্ঞা!"—পয়সা লইয়া ভজহরি বরফ আনিতে গেল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ভজহরি যেন মনে মনে শ্রীহরির ভজনা করিতে করিতে, ভিজা বিড়ালের মত শূন্য হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"তিন ঘণ্টা পরে ত এলি, বরফ কি হোল?"

"আইজ্ঞা, জল হোয়ে গেছে।"

অনেক জেরা-জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটা জানা গেল।

তাহাদের দেশের হাটে বরফ পাওয়া যায়। সুতরাং সে ঠিক করিয়া লইয়াছিল, ও-পারে চেৎলার হাটেই বরফ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ভবানীপুর হইতে সে চেৎলায় যায় এবং সেখানে এক-সের বরফ কেনে। কাঠের গুঁড়া মাখাইয়া দেওয়াতে, ভজহরি ভয়ানক আপত্তি জানায়—ঐ প্রকার নোংরা করিয়া দিতেছে কেন? সুতরাং পথে কলের জলে ভাল করিয়া তাহা ধুইয়া লয়।

তার পর এক বার ডান হাতে এক বার বাঁ হাতে করিয়া এই দেড় ক্রোশ পথ আসায় বরফ সব গলিয়া গিয়াছে। সুতরাং শূন্যহাতে আসা ছাড়া আর উপায় কি!

তাহাকে খুব একচোট বকিলাম—"বোকাকান্ত! কাঠের গুঁড়ো কখনো ধুয়ে ফেলে দিতে আছে! আর বরফ কিনতে গেলে কি না চেৎলার হাটে! এই বাজারের বাইরে, মোড়ের ওপর বরফের দোকান।"

পরের দিন ভজহরি আর এক পর্ব্ব ঘটাইয়া বসিল। বাড়ীতে দু'-এক জন কুটুম আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী ভজহরিকে আট আনার রসগোল্লা আনিতে পাঠায়। রসগোল্লা আনিলে দেখা গেল, সেগুলি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেশ ভাল করিয়া কাঠের গুঁড়ো মাখানো! দেখিয়াই সকলের চক্ষুস্থির! ভজহরি কহিল—"আইজ্ঞা মা-ঠাকরুণ, বাবু কাল কোয়ে দেছ্লেন।"

"বাবু কোয়ে দেছলেন? কাঠের গুঁড়ো পেলি কোত্থেকে তুই?"

"আইজ্ঞা, এই বরফের দোকানের সামনে ফুটপাথে বিছানো ছিল।"

ইহার আর উত্তর কি! কাঠের গুঁড়া মাখাইয়া না আনিলে রসগোল্লা যে গলিয়া যাইবে। যাই হোক, আক্কেলসেলামী স্বরূপ আবার তাকে আট আনা দিয়া দোকানে পাঠানো হইল। এবার পাছে কাঠের গুঁড়া বা অন্য কিছু নোংরা লাগে বলিয়া হাতে করিয়া সে ছয়টি রসগোল্লা আনিয়া হাজির! দুইটা রসগোল্লা হাত হইতে গড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে। খুব খানিক বকিলাম। বলিলাম—"খাবার জিনিস, ঐ রকম হাতে কোরে কখনই আর আনবি না, বোকচন্দ্র কোথাকার! পাতার ঠোঙ্গায় দোকানদার দেয়নি?"

"আইজ্ঞা, দিয়েছিলো; নোংরা লেগে যাবে বোলে……"

"বেটা বুদ্ধির ঢেঁকী কোথাকার! সব জিনিষ ঠোঙ্গায় কোরে আনবি।"

মাথা হেঁট্ করিয়া, মনে মনে ভজহরি বোধ হয় হরিস্মরণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর আমার বড় মেয়ে রমা ভজহরির একটা হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম—"ব্যাপার কি রমা?"

"কি ব্যাপার, একবার ওর কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ।"

দেখিলাম, তাহার পরণের কাপড় বহিয়া তেল ঝরিতেছে, দু'হাত, বুক, মুখ তেলে জব জব করিতেছে। ডান হাতে একটা প্রকাণ্ড শালপাতার ঠোঙ্গা; তাহাতেও তেল ঝরিতেছে!

ইতিহাস শুনিলাম। তাহাকে আধ সের সরিষার তেল আনিতে বলা হইয়াছিল। সে বড় একটা ঠোঙ্গা যোগাড় করিয়া দোকানদারকে তাহাতেই তেল দিতে বলে! দোকানদার প্রথমটায় ঠোঙ্গায় তেল দিতে নারাজ হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত ভজহরি বার-বার বলাতে অগত্যা তাহাতেই তেল ঢালিয়া দেয়। তাহার পর যা হইবার তাহাই হইয়াছে। পথে আসিতে আসিতে সমস্ত তেলই ঠোঙ্গার ফাঁক দিয়া পড়িয়া যায় এবং সেই তৈলে তৈলাক্ত হইয়া শূন্য ঠোঙ্গাটি মাত্র হাতে মূর্ত্তিমান্ হাজির!

কি আর বলিব। বলিবার কিই ছিল না। রমা ধমকাইয়া কহিল—"বোতল নিয়ে যেতে কি হাতে পক্ষাঘাত হোয়েছিলো গর্দ্দভচন্দ্র!"

কহিলাম—"গর্দ্দভ হোলেও তেল আনবার জন্যে বোতল নিয়ে যেতো! গর্দ্দভেরও অধম!"

"ওকে আর কোন কাজকর্ম্ম করতে দেওয়া চলবে না বাবা। ওকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।"

মনে মনে ভাবিলাম, তাহাই করিতে হইবে; তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই! কিন্তু পরদিন ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশ কোন্ ফাঁকে যে তাহাকে পোষ্টাফিসে খাম-পোষ্টকার্ড আনিতে পাঠাইয়াছিল, তাহা কেহই জানে না। জানিল তখন—যখন দেখা গেল একটা মুখ-সরু বোতলের মধ্যে খাম পোষ্টকার্ড ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সে ভরিয়া আনিয়াছে। ব্যাপার বুঝিতে আর দেরী হইল না। দেখিলাম, হয় ভজহরিকে এ বাড়ীতে রাখিয়া আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, নয় ভজহরিকে এ বাড়ী হইতে তাড়াইতে হয়।

সেই দিনই মেদিনীপুরে রামহরিকে পত্র দিলাম যে, তোমার রত্নটিকে যত শীঘ্র পার আসিয়া লইয়া যাইবে। আমার স্ত্রী কহিল, "ওর বাবা কত দিনে আসবে তার ঠিক নেই, আমি কিন্তু ওকে এ বাড়ীতে আর জায়গা দেব না। কিছুতেই দেব না।"

রমা, সতীশ প্রভৃতি কহিল—"চাবুক মেরে ওর বোকামী আমরা ঘোচাবো; নচেৎ—এই দণ্ডেই গর্দ্দভচন্দ্রকে বিদেয় কোরে দিন।"

কি করি? সমস্যায় পড়িলাম। ভজহরিকে কহিলাম—"দেখ্, তোকে আর কোন কাজ-কম্ম করতে হবে না। তুই রাত্রে এসে এখানে শুবি, আর খাবার সময় এসে খেয়ে যাবি। তার পর তোর বাবা এলে চলে যাবি।"

নির্বিকার চিত্তে ভজহরি কহিল, "সারা দিন কোথায় থাকবো, আইজ্ঞা?"

"থাকবে—আইজ্ঞা—ঐ সামনের ফুটপাথে; ঐ বকুল গাছের তলায় বোসে।"

তিলমাত্র বিলম্ব করা নয়! সঙ্গে সঙ্গেই ভজহরি সাম্নেকার ফুটপাথের উপরিস্থিত বকুলতলায় গিয়া উপবেশন করিল। যেন সিদ্ধিলাভের জন্য মহাযোগী মহাযোগে বসিল!

বৈকালের দিকে দেখি, তাহাকে ঘিরিয়া লোক জমিয়া গিয়াছে। অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে; কিন্তু ভজহরি নির্ব্বাক্; কোন উদ্বেগ নাই, কোন চাঞ্চল্য নাই। রাত্রে যথাসময়ে সে আসিয়া আহার করিল এবং সিঁড়ীর নীচে তাহার শুইবার জায়গায় শুইয়া পড়িল। পরদিন সকালে উঠিয়াই আবার বকুলতলায় গিয়া বসিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার একটু কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিলাম, যাহার জন্য কষ্ট, তাহার কিন্তু কোন কষ্টই নাই। তা ছাড়া, আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। দু'-পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহাকে ঘিরিয়া দর্শকের সংখ্যা ক্রমে. বাড়িতে লাগিল। অধিকাংশ দর্শকই ধরিয়া ফেলিল যে, সে মস্ত বড় এক মৌনী সাধক। অনেক কিছু শক্তি তার মধ্যে আছে। এক জন কহিল—"শঙ্করাচার্য্যের 'হাবা' আর কি! চরম সিদ্ধিলাভের প্রতীক্ষায় চুপ কোরে বোসে আছেন।" ইতিমধ্যেই তার পায়ের তলার ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া দু'-চার জনের ব্যারামও সারিয়া গিয়াছে। সুতরাং পয়সা-কড়িও

কিছু কিছু তাহার পায়ের কাছে পড়িতে লাগিল। সেগুলি কিন্তু ভজহরি সেখানে ফেলিয়া আসে না, খাইতে আসিবার সময় লইয়া আসে এবং তাহার বিছানার তলায় রাখিয়া দেয়। দিন দশ পরে রমা এক দিন গণিয়া দেখিল—৮৷৷৵১০।

ভজহরির কথা লইয়া বাড়ীতে বেশ একটু হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব টাকা-পয়সা নিয়ে তুই কি করবি ভজা ?"

মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল—"আইজ্ঞা, মাকে দোবো।" বোকা হোক, অজ্ঞান হোক ; মনে মনে কহিলাম—"বা রে ভজা, সাবাস্—সাবাস !"

শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য আর একখানা চিঠি সেই দিন রাখহরিকে পাঠাইলাম।

এবার রাখহরি আর দেরী করিল না, পত্র পাইয়া পরের হপ্তায় চলিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, ভজহরি ভগবৎ-কৃপায় মৌনী সাধু হইয়া গিয়াছে এবং মাসে এক শত টাকা হিসাবে তাহার পায়ে প্রণামী পড়িতেছে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ভারতে যুদ্ধোত্তর সংগঠন পরিকল্পনা

বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি কত দিনে এবং কি ভাবে ঘটিবে, তাহা কেহ অনুমান করিতেও পারে না। তথাপি অকস্মাৎ হউক, অচিরে হউক, অথবা বহু দিন পরে হউক, এক দিন যে ইহার নিবৃত্তি ঘটিবে, সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সংশয় নাই। বুদ্ধি-বলে মানুষ আশাবাদী এবং ভবিষ্যৎ-দর্শী। এই নিমিত্ত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং যুদ্ধান্তে জীবিত এবং ভাবী উত্তরাধিকারিগণের নিরঙ্কুশ কল্যাণ-কামনায় যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই সকল স্বায়ত্তশাসনশীল দেশে যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্বন্ধে রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা অনুসৃত হইয়াছে। পরাধীন ভারতের ব্যবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র।

যুদ্ধারম্ভের প্রায় তিন বৎসর পরে ভারতে যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নিমিত্ত কয়েকটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের কার্য্য-প্রণালী এত শিথিল যে, সম্প্রতি শ্বেতাঙ্গ-বণিক-সমিতি-সঙ্ঘের (Associated Chambers of Commerce) বার্ষিক অধিবেশনে আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর চির-দৃঢ় সমর্থক শ্বেতাঙ্গ সভাপতিকেও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নাম দেওয়া হইয়াছে,—Post-war Reconstruction,—অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ; কিন্তু ভারতে পুনর্গঠনের প্রশ্ন অথবা প্রস্তাব পরিহাস মাত্র! যেখানে আদৌ সংগঠন ঘটে নাই সেখানে পুনর্গঠনের প্রশ্ন অবান্তর! ভারতের যথার্থ প্রশ্ন এবং প্রয়োজন,—সংগঠন ; এবং সে সংগঠন সূচনা হইবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভারতের চিরদরিদ্র জনসাধারণের দুঃস্থ ও দুর্গত এবং অতি হীন ও হেয় জীবনযাত্রার একটি সংযত ও সমীচীন উন্নত ধারা প্রতিষ্ঠা। সুখের বিষয়, দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধের তীব্র, তীক্ষ্ণ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এবং ভারতের শিল্পী ও বণিক্ সম্প্রদায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধোত্তর সংস্কার সম্পূরণ ও সংগঠন প্রচেষ্টায় আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

সর্ব্বদেশেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কোনরূপে ব্যাহত না করিয়া যুদ্ধোত্তর সংগঠন এবং পুনর্গঠন প্রচেষ্টা যুগপৎ প্রচণ্ড ও প্রগাঢ় ভাবে পরিচালিত হইতেছে। এইটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয় যে, সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধ এবং শান্তি উদ্দেশ্যের সহিত জগতের, বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার সমগ্র মানবমণ্ডলী ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। মিত্রপক্ষীয় প্রবল শক্তি-চতুষ্টয় কর্তৃক বর্ত্তমানে অনুসৃত নীতি ও উপায় হইতে ভবিষ্যৎ জগতের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। যুদ্ধকালীন অর্থ-নীতি এবং যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা একই সূত্রে গ্রথিত, একই সমস্যার দুইটি দিক মাত্র। স্বভাবতঃই যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্তি-প্রচেষ্টায় পরিবর্ত্তিত ও পর্য্যবসিত করিবার উপায়-উপকরণ এখন হইতেই সর্ব্বজাতির রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক নেতৃবর্গের প্রগাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানে বিগত যুদ্ধের সন্ধি-সর্ত্তের ভুল-ভ্রান্তি এবং তাহার বিষম পরিণাম পরিবর্জ্জন করিতে হইলে এরূপ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। নিখিল জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) বিফলতার কারণ আজ সর্ব্বজনবিদিত। কয়েকটি প্রবল শক্তির স্ব স্ব জাতীয় স্বার্থ-সাধন প্রচেষ্টাই সেই নিষ্ফলতার জন্য দায়ী। বিভিন্ন প্রাথমিক উৎপাদক দেশ হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী শিল্পে-অনুন্নত ঐ সকল দেশের বিস্তৃত বিপণিসমূহে উচ্চ মূল্যে বিক্রয়, এবং ঐ সকল দেশে শিল্প, বাণিজ্য এবং বিভিন্ন কাজ-কারবার ও যানবাহন-পরিচালন-প্রতিষ্ঠানে মূলধন নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব জাতীয় অর্থসম্পদ্-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টাই যত অনিষ্টের মূল। ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানেও ভারতের ন্যায় স্বায়ত্তশাসনহীন কৃষিপ্রধান ও শিল্পে-অনুন্নত দেশ-গুলির প্রতি প্রবল শক্তিমান ও শিল্পে-সমুন্নত জাতিসমূহ প্রখর ভাবে এই প্রচণ্ড নীতি পরিচালনা করিবে।

বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে ঐ যুদ্ধের অবসান হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল মধ্যে শাসনকর্ত্তারা যদি জাতীয় শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এ দেশে আত্মরক্ষার্থ এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজন-সাধনার্থ অত্যাবশ্যক গুরু ও বৃহৎ এবং মূল ও স্থূল শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে—আর্থিক না হউক, আন্তরিক সাহায্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ভারত আজ বহু পরিমাণে অর্ণবযান, ব্যোমযান, হাওয়া-গাড়ী, গুরু রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিবিধ প্রকার কলকব্জা ও সাজ-সরঞ্জাম এবং

অধিকতর পরিমাণে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিয়া মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রশক্তিকে বিপুলতর সাহায্য করিতে পারিত। সাগর-পারের শিল্পী বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির ভয়ে বিগত মহাযুদ্ধের পর যে কূটনীতি চলে, তাহার ফলে ভারত বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষের ব্যবধানেও শিল্পে—বিশেষতঃ গুরু ও বৃহৎ এবং মূল ও স্থূল শিল্পে—সমুন্নত নহে, পরন্তু অনুন্নত! বর্ত্তমান জগৎব্যাপী যুদ্ধের অবসানেও সেই নীতি প্রবল হইবে—ইতিমধ্যে যদি ঘটনাচক্রে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়।

স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত জাতীয় স্বার্থের অনুকূল অর্থনীতি ও আর্থিক বিধান প্রবর্ত্তন সম্ভবপর নয়। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেরূপ শুভ পরিবর্ত্তনের ক্ষীণ সূচনাও পরিলক্ষিত হইতেছে না। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র এবং মহাদেশিক য়ুরোপের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক ধুরন্ধরগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে নিবদ্ধ থাকিয়া প্রাচীন পন্থা ও প্রাচীন রীতি-নীতি-অনুযায়ী নূতন যুদ্ধোত্তর জগতে তথাকথিত নববিধান প্রবর্ত্তনের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। বিগত মহাযুদ্ধে রাষ্ট্রপতি উইলসনের সুপ্রসিদ্ধ চতুর্দ্দশ নীতির অনুকরণে বর্ত্তমান যুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও স্বাধীনতা চতুষ্টয়ের উচ্চ ঘোষণা করিয়াছেন। সহকারী রাষ্ট্রপতি ওয়ালেস্‌ও সে দিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে —"No nation will have the God-given right to exploit other nations. Older nations will have the privilege to help the younger nations get started on the path to industrialisation. But there must be neither military nor economic imperialisn. The methods of ninteenth century will not work in the people's century which is now about to begin;" অর্থাৎ কোন দেশই অন্য দেশকে শাসন ও শোষণ করিবার ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু প্রাচীন জাতিগুলি নবীন জাতিগুলিকে শিল্পে সমুন্নত করিবার সাহায্য প্রদানে শুভ সুযোগ লাভ করিবে। সামরিক কিংবা অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। বস্তুতঃ যে "জনসাধারণের শতাব্দী" আরম্ভের উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর রীতিনীতি অচল হইবে।" অতি সাধু ও মহান্ উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই! কিন্তু আট্‌লাণ্টিক সনন্দের যে সুন্দর ব্যাখ্যা চার্চ্চিল্ সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের সাহায্য ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সমিতি (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) ভারতের দুর্ভিক্ষ ও দুর্দ্দশায় যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য দেশের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, দুর্ভাগ্য ভারতের পক্ষে কোন শুভ সংঘটনের আশা সুদূরপরাহত! ভারত সরকার যে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনশীল দেশের ন্যায় যুদ্ধোত্তর সংগঠনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন নাই;—এবং আজ পর্য্যন্ত কোন সুচিন্তিত ও সুসমঞ্জস্ পরিকল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই, তাহার পশ্চাতে সেই উনবিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের তীব্র ও দৃঢ় চিন্তা বিদ্যমান। তথাপি ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের দুর্জ্জয় অভিঘাতে প্রাচীন চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, তীব্র সাম্রাজ্যবাদী ভারত-প্রবাসী শিল্পী-বণিক সম্প্রদায়েরও মতিগতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে আলোচনা আমরা পরে করিব।

যদিও ভারত সরকার এতাবৎ কাল যুদ্ধোত্তর সংগঠনের প্রতি শোচনীয় শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি জাতীয় শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় অর্থ-নীতিবিদ্ মনীষিগণ বহুবিধ বিভিন্ন-মুখীন যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা, সুধীজনের বিচার-বিশ্লেষণের নিমিত্ত প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই হইতে সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-বাণিজ্য-নায়ক এবং অর্থ-নীতিবিদ্ স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, মিঃ জে, আর, ডি, টাটা, স্যার আর্দেসর দালাল, মিঃ কস্তুর-ভাই লালভাই, মিঃ জন ম্যাথে, মিঃ এ, ডি, শ্রফ্, মিঃ জি, ডি, বিরলা এবং স্যার শ্রীরাম প্রভৃতি ধীশক্তিসম্পন্ন ধনিক ও বণিকগণ যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। এই প্রগাঢ় গবেষণাপূর্ণ বিবরণী ভারতের অর্থ-নৈতিক সমুন্নয়নের একটি পরিপাটি পরিকল্পনা প্রকটিত করিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই চিন্তাধারা প্রচলিত ধনতান্ত্রিক গতানুগতিকের অনুবর্ত্তী। একমাত্র শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলাই কিঞ্চিৎ আধুনিক অগ্রগতিসম্পন্ন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লাটপ্রমুখ প্রধান পুরুষগণ যে এ পরিকল্পনাকে তাঁহাদের দ্বিধাকুণ্ঠ আশীর্ব্বচন প্রদান করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Qualified Blessing অথবা Damn with faint praise বলে, ইহা তাহারই নিদর্শন মাত্র! ১৬ই ফাল্গুন অর্থসচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় এই পরিকল্পনার বিপুল অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত যুদ্ধব্যয় পরিচালনের ন্যায় অতি উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারণ ও ঋণগ্রহণের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য এক মুখপাত্র বলিয়াছেন, এই পরিকল্পনার বহুলাংশ সমীচীন; এবং আমলাতন্ত্রের মতে ইহার অধিকাংশ সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাকে কার্য্যকরী করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহই কঠিন সমস্যা! দ্বিতীয়তঃ, ইহাকে পরিচালন করিতে সক্ষম বিশিষ্ট বিদ্যায় অভিজ্ঞ পরিচালকের (Technically qualified administrators) অভাব! কিন্তু এ জন্য দায়ী কে?

দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং শিল্পনিষ্ঠ এবং অর্থনীতিবিদ্ বিশেষজ্ঞগণ ইহা অভিনিবেশ সহকারে অধিগত করিয়াছেন। তথাপি সাধারণ পাঠকগণের অবগতি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনাকে সহজ-বোধ্য করিবার নিমিত্ত আমরা সংক্ষেপে ইহার একটু পরিচয় প্রদান করিব। সমগ্র পরিকল্পনাটি তিনটি খণ্ড পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিপুষ্ট; এবং ইহার একুন ব্যয় দশ হাজার কোটি টাকায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে ব্যয় ধরা হইয়াছে এক হাজার চারি শত কোটি টাকা; দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার নিমিত্ত দুই হাজার নয় শত কোটি এবং তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পাঁচ হাজার সাত শত কোটি টাকা। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই পনের বৎসরের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার সাধন পূর্ব্বক

ভারতের জনসাধারণের মাথা পিছু আয়কে বর্ত্তমান আয়ের দ্বিগুণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে গড়ে ভারতবাসী জনসাধারণের মাথা-পিছু আয় অন্যান্য দেশের জনসাধারণের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। সুপ্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিবিদ্ ডাঃ রাওয়ের (Dr V K R V Rao) হিসাব-অনুযায়ী ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় আয়ের মাথা-পিছু হার ছিল মাত্র বাৎসরিক ৬৫৲ টাকা! ইতিমধ্যে ভারতে অসীম জনবৃদ্ধির ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ঐ অঙ্ক আরও অধোগতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান পরিকল্পনা এই ৬৫৲ টাকাকে ১৫ বৎসরে ১৩৫৲ টাকায় উন্নীত করিতে অভিলাষী। প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে লোক-গণনা হয় তাহার ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে জানা যায় যে, ভারতে গড়ে প্রতি বৎসরে জনসংখ্যা পাঁচ মিলিয়ন, অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারতের জন-সংখ্যার এই বাৎসরিক বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, আমাদের দেশের জন-সাধারণের বর্ত্তমান আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে হইলে আমাদের একুন জাতীয় আয়ের মাত্রা তিন গুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কঠিন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ আমাদের বর্ত্তমান কৃষিজ উৎপাদনকে দ্বিগুণেরও কিঞ্চিৎ অধিক, অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং আমাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার শিল্পোৎপাদনের একুন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে পাঁচ গুণ। এরূপ করিতে সক্ষম হইলেও আমাদের অর্থনৈতিক বিধানে কৃষির প্রাধান্যই প্রবল থাকিবে; কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তখনও কৃষিজ পণ্যে এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট বৃত্তি-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিবে। ফলে কৃষি-প্রধান ভারতে কৃষির প্রাধান্য যৎকিঞ্চিন্মাত্র খর্ব্ব হইবে। ইহার গূঢ় অর্থ বোধ হয় এই যে, ভারত তখনও প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া শিল্পে-সমুন্নত জাতিসমূহের শাসন ও শোষণ স্বার্থের বিশেষ কোন হানি করিবে না!

আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, কৃষির অত্যধিক প্রাবল্য এবং শিল্পের অত্যন্ত অনুচিত স্বল্পতাই ভারতের অর্থ-নৈতিক অনুন্নতির মূল কারণ। পরস্পরসাপেক্ষ কৃষি ও শিল্পের সমুচিত ও সমীচীন সামঞ্জস্য ব্যতীত ভারতের আর্থিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সুদূরপরাহত। এই পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী পরিকল্পনা রচয়িতাদের মনোবৃত্তি যে ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমূলক তাহার অভিজ্ঞান এইখানেই প্রকাশ। বিদেশী ধনিক বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বোধ হয় এই যে, এই পরিকল্পনার প্রবর্ত্তনের ফলে বিদেশী ধনিকদিগের প্রাধান্য প্রশমিত হইয়া এই দেশীয় ধনিকদিগের প্রাধান্য প্রবলতর হইবে। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসক সম্প্রদায় যে এই পরিকল্পনা প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, সে সন্দেহ মনীষী রচয়িতাদের বিলক্ষণ প্রবল! এই হেতু তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই পরিকল্পনাকে যে বহু বাধা-বিঘ্ন এবং গাঢ় ও গভীর কুসংস্কার এবং বিরুদ্ধ ধারাবাহিক রীতি-নীতি অতিক্রম করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অবস্থায় বহু লোককে বহুল পরিমাণে ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। রাজনৈতিক বিরোধহেতু আবশ্যক নীতিসম্মত সংগঠনেরও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে! যুদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ইহার নিরঙ্কুশ উন্নতি ও পরিণতির বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। এই নিমিত্ত তাঁহারা কেন্দ্রে জাতীয় শাসনতন্ত্রের অভাব ও তাহার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের প্রতি তীব্র লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতের অর্থ-নৈতিক ঐক্য তাঁহাদের উদ্দিষ্ট। সুতরাং এই ঐক্য সংরক্ষণার্থ কেন্দ্রে তাঁহারা আভ্যন্তরীণ-শাসনে স্বাধীন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সন্ধিসর্ত্তে বাধ্য ঐক্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ শাসনতন্ত্রের অভিলাষী,—যাহার অধিকার ও ক্ষমতা অর্থ-নৈতিক বিষয়ে সমগ্র দেশের উপর অপ্রতিহত থাকিবে, অর্থাৎ জাতীয় "যুক্তরাষ্ট্রীয়" (Federal) কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র। "জাতীয় সন্ধি-সম্বন্ধ ঐক্য-ও-সখ্য-বদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ব্যতীত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক স্বার্থের অপলাপ অসম্ভব। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে আপোষ রক্ষামূলক বন্দোবস্ত মৌলিক পরিবর্ত্তন কিংবা আমূল সংস্কারের পরিপন্থী।

তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। জাতীয় অর্থাৎ সর্ব্ব-সাধারণের জীবন-যাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় উপযুক্ত আহার্য্য, ব্যবহার্য্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, শিক্ষা, বৃত্তি-ব্যবসায় এবং রোগে ঔষধ-পথ্য এবং চিকিৎসার সহজসাধ্য সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। এবং এই অতি সাধু এবং অতি মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে-কোন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, গুরু-লঘু, মূল ও স্থূল সর্ব্ববিধ শিল্পজ, কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের বৃদ্ধি ও সম্যক্ সদ্ব্যবহার, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, ধাতুসম্পর্কীয় কল-কারখানা, যন্ত্রশিল্পের কারখানা, রাসায়নিক কর্ম্মশালা, অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণাগার, যানবাহন প্রস্তুত ও পরিচালনা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রাথমিক ও সর্ব্বপ্রকার শিল্পকলা শিক্ষা-প্রদানার্থ বহু সংখ্যক বিদ্যায়তন, চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও শুশ্রূষাগার এবং ভেষজ উদ্যান ও সর্ব্বপ্রকার গৃহপালিত পশুর উন্নতি ও প্রতিপালন প্রভৃতি বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদ ও বাধা-বিঘ্ন-শূন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত এই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতির (National Planning Committee) সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এই সমিতি পরিকল্পনা রচনা করিবে এবং একটি শীর্ষ অর্থ-নৈতিক পরিষদ (Supreme Economic Council) সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবে। বিস্ময়ের বিষয়, এই পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এই প্রসঙ্গে জাতীয় মহাসমিতি "কংগ্রেস" মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির (National Planning Committee) কোন উল্লেখ করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ কয়েক জন মনীষীকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হয়েন নাই; তবে তাঁহারা সমিতির কার্য্য নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। অধিকাংশ প্রদেশ এবং কয়েকটি বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্য এই সমিতিতে আন্তরিক ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। মূল সমিতি কয়েকটি বিশিষ্ট উপসমিতিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচন দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণের ভার অর্পণ করিয়া সুষ্ঠু ভাবে কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। কয়েকটি উপসমিতি তাহাদের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইত্যবসরে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস্ মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে হয়, এবং ঘটনাচক্রে অচিরে মূল সমিতির যোগ্য অধিনায়ক শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু কারারুদ্ধ হন। কারাগৃহের নিভৃত অভ্যন্তরে

তাঁহাকে সমিতির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ এবং উপদেশ-নির্দ্দেশ দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়! সুতরাং এই অতি বিশিষ্ট সমিতির কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। এই সমিতি সংস্পর্শে আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বর্ত্তমান পরিকল্পনা-রচয়িতাদের প্রস্তাবিত সমিতি ও পরিসদের প্রতি যে তদ্রূপ বিরূপ মনোবৃত্তি প্রযুক্ত হইবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দুর্লভ—জাতীয় স্বার্থের অনুকূল শিল্প-সমুন্নয়ন-প্রচেষ্টাও অসম্ভব। এই নিমিত্ত ভারতের এই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বণিক পরিকল্পনা-রচয়িতা ভারতে জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রের অনুষ্ঠান অনুমান করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ মিঃ জে, আর, ডি, টাটা বলিয়াছেন,—There is a whole lot of big "ifs" in the plan; অর্থাৎ বহুসংখ্যক প্রবল "যদি" দ্বারা তাঁহাদের পরিকল্পনা বিড়ম্বিত! এখন আমরা এই পরিকল্পনা-ভুক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায়ের আলোচনা করিব। কোথা হইতে এই বিরাট পরিকল্পনা পরিচালন করিবার অর্থ আসিবে? এরূপ বিরাট ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ মূলধন যথেষ্ট হইতে পারে না; দেশ-বহির্ভূত অর্থাৎ বৈদেশিক মূলধনও প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। দশ হাজার কোটি টাকা স্বদেশী মূলধন সম্ভবপর নহে। এরূপ ব্যাপারে সকল দেশই বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে প্রয়োজনানুযায়ী সম্ভবযোগ্য মূলধনের অভাব নাই। সুযোগ্য "ক্যাপিটাল" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জিওফ্রে টাইসন তাঁহার সদ্য প্রকাশিত India Arms for Victory পুস্তকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, অধুনা এ দেশে কোন শিল্প পরিকল্পনার নিমিত্ত মূলধনের অভাব-অনটন ঘটে নাই। তিনি ভারতীয় শ্রমিকগণের শিল্প-কুশলতা, শিক্ষা-প্রবণতা, শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলতার সম্যক্ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা এবং তাহাদের অক্লান্ত কার্য্যতৎপরতার কথাও দৃঢ় ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান পরিকল্পনার রচয়িতাগণ বহিঃস্থ অর্থ-সংস্থান (External finance) মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি দফা সন্নিবেশিত করিয়াছেন:—(১) দেশাভ্যন্তরে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ (Hoarded-wealth), বিশেষতঃ স্বর্ণ; (২) যুক্তরাজ্যকে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী (Short term loans to the U. K.); (৩) ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকৃত ষ্টার্লিং-খৎ (Sterling securities held by the Reserve Bank of India); (৪) ভারতের অনুকূল বহির্বাণিজ্য-জমা-খরচের উদ্বৃত্ত জমা (Favourable balance of trade); এবং (৫) বৈদেশিক ঋণ। অভ্যন্তরস্থ অর্থ-সংস্থান (Internal finance) মধ্যে তাঁহারা ধরিয়াছেন, (১) জনসাধারণের ব্যয়-নির্ব্বাহানন্তর মিত সঞ্চয় (Savings of the people); (২) সাময়িক খতের দ্বারা সৃষ্ট নূতন অর্থ, অর্থাৎ সরকারের সম্পদসিদ্ধ বাজার সম্ভ্রম হইতে লব্ধ অর্থ (New money created aganist ad hoc securitcies, i. e. on the inherent credit of thc Government)। পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় দশ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের পক্ষপাতী:—গুপ্ত সঞ্চয়,—তিন শত কোটি; ষ্টার্লিং খৎ,—এক হাজার কোটি; ভারতের প্রাপ্য বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত জমা,—ছয় শত কোটি; বৈদেশিক ঋণ,—সাত শত কোটি, মিত সঞ্চয়,—চারি হাজার কোটি, এবং সৃষ্ট অর্থ,—চারি হাজার কোটি।

অভ্যন্তরস্থ অর্থ-সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত মিত সঞ্চয় এবং সৃষ্ট অর্থ-ই অর্থাগমের দুইটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ভারতে বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার ধারা অত্যন্ত হীন! অধিকন্তু, করভার বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব এই পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই অথচ সংস্কার-সমুন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনাই করবৃদ্ধি ব্যতীত কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রচয়িতাগণের ধারণা যে, জাতীয় আয়ের গড়ের শতকরা ছয় অংশের অধিক অর্থ পরিকল্পনার স্থিতি-কালের মধ্যে প্রাপ্য নহে। এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া ঐ কালে জন-সাধারণের মিত সঞ্চয়ের পরিমাণ চারি হাজার কোটির অধিক হইতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনীয় মূলধনের একটি বিশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার চারি শত কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাময়িক খতের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই পরিমাণ নূতন অর্থ সৃষ্টি করিতে পারা যায় যদি,—যে শাসনতন্ত্র এই অর্থ সৃষ্টি করিবে, সেই শাসনতন্ত্রের সম্পদ-সামর্থ্য এবং বিশ্বস্ততার প্রতি জনসাধারণের অটল বিশ্বাস দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। এইরূপ অর্থ সৃষ্টির সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত কারণ, সৃষ্ট অর্থ জাতীয় উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি-কল্পে নিয়োজিত হইবে এবং পরিণামে আপনা হইতেই পরিশোধশীল, অর্থাৎ Self-liquidating হইবে। কিন্তু পরিকল্পনার স্থিতি, অর্থাৎ কার্য্যকারী কালের অধিকাংশ সময় সৃষ্ট অর্থের দ্বারা অর্থ-নৈতিক সমুন্নয়ন সাধন করিতে, জন-সাধারণের ক্রয়-শক্তি এবং সেই শক্তি দ্বারা ক্রয়যোগ্য প্রাপণীয় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে অসমঞ্জস্ ব্যবধান ঘটিবে। এই বিপর্য্যয়জনক ব্যবধান দূর করিয়া, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে রক্ষা করিতে পরিকল্পনা-পরিচালক-কর্ত্তৃপক্ষকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। পরিকল্পনার কার্য্যকারী কালের মধ্যে এই প্রকারে অর্থ সংগ্রহ ও নিয়োজনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিছু অন্যায় ও অসঙ্গত আর্থিক পীড়ন ঘটিবে (Inequitable distribution of burden); তৎপ্রশমনার্থ শাসনতন্ত্রকে অর্থ-নৈতিক জীবনের প্রত্যেক অবস্থানকে দৃঢ় ভাবে সংহত ও সংযত করিতে হইবে; ফলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং কারকারবার-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হইবে। কিন্তু যথাসম্ভব ত্যাগ ও তিতিক্ষা ব্যতীত জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধি দুষ্কর;—বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় পরাধীন দেশে।

উপরে উল্লিখিত উপায়ে সংগৃহীত অর্থের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নির্দ্দেশও পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ যথাসম্ভব প্রদান করিয়াছেন। মৌলিক শিল্পের (Basic industries) নিমিত্ত তাঁহাদের বরাদ্দ তিন হাজার চারি শত আশী কোটি টাকা; ভোজ্য-ভোগ্য-দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতি শিল্পের (Consumers' goods industries) নিমিত্ত এক হাজার কোটি টাকা; কৃষির জন্য এক হাজার দুই শত চল্লিশ কোটি; রাস্তাঘাট ও যানবাহনের (Communications) উন্নতি ও বিস্তার হেতু নয় শত চল্লিশ কোটি; শিক্ষা বিভাগে চারি শত নব্বই কোটি; স্বাস্থ্য-বিধানে চারি শত পঞ্চাশ কোটি, বাসগৃহ ব্যবস্থা-কল্পে দুই হাজার দুই শত কোটি এবং অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনে দুই শত কোটি টাকা। মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। এই হেতু পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ মূল ও স্থূল শিল্পের উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

কৃষি-প্রধান ভারতে কৃষির উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য প্রয়োজন। এই নিমিত্ত পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ কৃষিজ উৎপাদনের শতকরা ১৩০ অংশ বিবৃদ্ধি কামনা করিয়াছেন এবং কৃষি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক সংস্কারের বিধান দিয়াছেন। সমবায় নীতিতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চাষ-আবাদ, কৃষি-ঋণের অপনয়ন, ভূমি ক্ষয় (Soil erosion) নিবারণ, এবং কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার-সাধন তন্মধ্যে প্রধান। ভূমি-সংরক্ষণ (Soil conservation) এবং বিবিধ প্রকারে ভূমির উন্নতি সাধন, নূতন খাল খনন, উন্নত প্রণালীতে কৃষি পরিচালন, গাভী পরিপালন ও দুগ্ধ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Dairy farming) স্থাপন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সংস্কারের প্রতিও তাঁহারা গভীর মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতি দশটি গ্রামের জন্য একটি করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (Model Farm) এবং সমগ্র দেশে এইরূপ পঁয়ষট্টি হাজার আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের নির্দ্দেশ এই পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রত্যেক আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের নিমিত্ত ব্যয়ের নির্দ্দেশ পঞ্চাশ হাজার টাকা; এবং তন্মধ্যে কার্য্যকারী ব্যয়ের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা।

কৃষি-প্রধান ভারতের কৃষির উন্নতির প্রতি আমাদের আমলাতান্ত্রিক সরকার কখনও গাঢ় ও গভীর মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই। একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ কৃষি বিভাগ বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাতে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যাও কম ছিল না; কিন্তু এই বিভাগের কার্য্য প্রধানতঃ উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচারমূলক ছিল। কিছু কিছু উৎকৃষ্টতর বীজ উৎপাদিত ও বণ্টিত হইত বটে, কিন্তু নিরক্ষর কপর্দ্দকশূন্য অর্দ্ধভুক্ত ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার ও অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকার ও শিক্ষিত রাজনৈতিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সম্প্রদায়—উভয়েরই পরম ঔদাসীন্য ছিল। শিল্পে নিযুক্ত পরদেশী Vested Interests অর্থাৎ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত-স্বার্থের অধিকারীদের আতঙ্ক ছিল,—কৃষির উন্নতি হইলে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত শিল্পের অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহারা কাঁচা মালের উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। অধুনা বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে এবং অর্থকরী ফসলের (Cash crops) ক্রম-বিস্তার-হেতু খাদ্যশস্যের (Food crops) গুরুতর সঙ্কোচের বিষম পরিণামের ফলে ভারত-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গশিল্পী বণিকদিগের কৃপাদৃষ্টি দরিদ্র কৃষকের প্রতি বিন্যস্ত হইয়াছে। "এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ্ কমার্স" নামক শ্বেতাঙ্গ বণিক সমিতি-সঙ্ঘের গত বার্ষিক অধিবেশনে সঙ্ঘ-সভাপতি মিঃ জে, এইচ,, বার্ডার বলিয়াছিলেন,—"সরকার যদি সরল কৃষকদের জীবনযাত্রার ধারা সমুন্নত করিতে পারেন, তাহা হইলে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মহৎ উপকার সাধিত হইবে।" সঙ্ঘে একটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং ব্যাধি বিদূরণ পূর্ব্বক, জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার আকূতি জানান হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার বর্ত্তমান শেরীফ্ (Sheriff) একটি দেশীয় ব্যাঙ্কের উদ্বোধন-সভায় পৌরোহিত্য করিবার কালে ঐ প্রয়োজনের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মিঃ টি, এস্, গ্রাডষ্টোন্ বলিয়াছেন,—শিল্পে সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষির উন্নতি বিধান ও বিস্তার সাধন দ্বারা ভারতের বিপুল কৃষককুল ও কৃষিনির্ভরশীল জমীদার ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে; নতুবা আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী কিনিবে কে? তিনি বলেন, কৃষি ও শিল্প—The two must go hand in hand—হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইবে। ১২ই ফাল্গুন, "বেঙ্গল চেম্বার্স অফ্ কমার্সে'র" বার্ষিক অধিবেশন সভায় সভাপতি মিঃ বার্ডার-ও দৃঢ়তর ভাবে ঐ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কাঁচা মালের ভাবনাই তাঁহাদের সমধিক।

কৃষি ও শিল্প উভয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ও বিস্তারের সৌকর্য্যার্থ আলোচ্য পরিকল্পনার রচয়িতাগণ যাতায়াত ও মাল-চলাচলের সুবিধার্থ যানবাহনের উন্নতি ও প্রসারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই প্রয়োজনে আরও একুশ হাজার মাইল রেলবর্ত্ম এবং তিন শত হাজার মাইল রাজপথ, অর্থাৎ বর্ত্তমান রেলপথের শতকরা পঞ্চাশ অংশ এবং বর্ত্তমান রাজপথের শতকরা এক শত অংশ অধিকতর বিস্তার অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে চিফ্ এঞ্জিনিয়ারদের এক বৈঠকে বিবৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারতে পঁচাশী হাজার মাইল রাস্তা আছে; কিন্তু যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নিমিত্ত প্রয়োজন চারি হাজার মাইল রাজপথ। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক হইবে সর্ব্বঋতুসহ—যাহাতে ঋতুনির্ব্বিশেষে ভারতের সমস্ত গ্রামগুলি কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃহৎ ও বিভিন্ন রাজপথ ও রেলপথের সহিত সর্ব্বদা সংযোগ রক্ষা করিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত ভারতের যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নিমিত্ত এমন বিরাট পরিকল্পনা কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন, চিন্তাশীল পুরোগমনকারী পথি-নির্দ্দেশকরূপে রচয়িতারা নিখিল ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন। বহু দিন হইল সেই সময় উপস্থিত এবং অতিক্রান্ত হইয়াছে, যখন কেহ না কেহ এইরূপ একটি সমীচীন ও সুসমঞ্জস পরিকল্পনাকে পরিমূর্ত্ত করিয়া সরকার, শিল্পী-বণিক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহিত করিবেন। ভারতের ধনবল, জনবল ও উপাদান-উপকরণ-সম্বল বিপুল। অভাব কেবল—সরকার ও জনসাধারণের সহযোগে ধনিক বণিক শ্রমিক শিল্পী ও কৃষককুলের সমবায়ে সুষ্ঠুরূপে ভারতের যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সংসাধন। আমরা সকলেই সেই শুভ সংযোগের ঐকান্তিক কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্ ফ্রান্সিশকো

মার্কিন মুল্লুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে যুক্তরাজ্য যেন একখানা হাত মেলিয়া দিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরকে স্পর্শ করিতে—এই হাতখানি বাজা কালিফোর্ণিয়া নামে পরিচিত। বাজা কালিফোর্ণিয়ার পূর্ব্ব-গায়ে কালিফোর্ণিয়া সাগর (gulf) এবং এই সাগরের পূর্ব্বে মেক্সিকো তার দীর্ঘ দেহ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। বাজা কালিফোর্ণিয়ার মাথায় সোজা উত্তর দিকে গিরিশ্রেণী; এই গিরিশ্রেণীর কোলে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল ঘেঁষিয়া সান্ ডিয়েগো, লংবীচ, লশ এঞ্জেলেশ, ফ্রেশনো, ষ্টকটন, সান জোশ, সান্ ফ্রান্সিশকো, ওকলাণ্ড, সাক্রামেণ্ট, পোর্টলাণ্ড, সাটল প্রভৃতি প্রদেশগুলিকে মার্কিন রাষ্ট্র আজ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর-সাজে সজ্জিত রাখিয়াছে। এই সব প্রদেশের মধ্যে সান্ ফ্রান্সিশকোর সজ্জায়

জাহাজ-পলায়নের কৌশল-শিক্ষা

বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশী। পশ্চিম-উপকূলের এই সমস্ত প্রদেশকে সান্ ফ্রান্সিশকো নামে অভিহিত করা হয়। এই সমগ্র ভূখণ্ডকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার তোরণ বলিয়া মনে করে—সে জন্য বিপুল শক্তি সজ্জিত করিয়া এ তোরণকে আমেরিকা আজ দুর্ভেদ্য করিয়াছে।

সান্ ফ্রান্সিশকো আজ এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিশেষ সহায়-স্বরূপ। ফৌজ, কামান, বন্দুক, জাহাজ ও মোটরের কারখানা—যুদ্ধের বিপুল সরঞ্জাম-পত্রের ভারে সান্ ফ্রান্সিশকোর চেহারা আজ বদলাইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র সান্ ফ্রান্সিশকো মিত্র-পক্ষের শক্তি কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১২।১৩ নভেম্বর তারিখে সান্ ফ্রান্সিশকো জাপানকে পরাভূত করিয়া তার অগ্রগতিকে যে ভাবে পঙ্গু করিয়াছিল, সে কথা এ যুদ্ধের ইতিহাসে অমর অক্ষরে লেখা থাকিবে!

সান্ ফ্রান্সিশকো আজ সমর-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানকার আদিম অধিবাসীরা রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। পথে-ঘাটে তারের বেড়া: সে বেড়ার গণ্ডীর মধ্যে সমর-আয়োজনের চূড়ান্ত-রকমের ব্যবস্থা। পথে-ঘাটে কাহারো ক্যামেরা বা ফীল্ড গ্লাস লইয়া বাহির হওয়া নিষেধ। সান্ ফ্রান্সিশকো আজ পশ্চিম-আটলাণ্টিকের জিব্রাল্টার।

সান্ ফ্রান্সিশকোর প্রবেশ-পথে বিখ্যাত স্বর্ণ-ফটক (Gold-gate)। সে ফটক আজ দুর্গতোরণের মত দুর্লঙ্ঘ্য। এই ফটকের বাহিরে আটলাণ্টিকের অর্থে অসীম প্রসার—এ ফটক পার হইলেই আমেরিকার সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

শ্রীমতী চুঙের গৃহে প্রদর্শনী

সান্ ফ্রান্সিশকো বহু বীরের জন্ম ও লালন-ভূমি। ফিলা সেরিডান্ উইলিয়াম সারমান, উইনফীল্ড স্কট, আলবার্ট জনষ্টন, জন্ পার্শিং প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ জেনারেলরা এই সান্ ফ্রান্সিশকোতে জন্মিয়া আমেরিকার গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন। এ যুদ্ধের জেনারেল জন ডি-উইটের জন্মও সান্ ফ্রান্সিশকোয় এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় সান্ ফ্রান্সিশকোর নৌবাহিনী জগতে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া তারো খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

জাপান যদি এ যুদ্ধে জয় লাভ করে, তাহা হইলে তার ফলে কি না ঘটিবে, সে সম্বন্ধে সমগ্র সান্ ফ্রান্সিশকোয় আতঙ্কের সীমা নাই।

এখানকার স্বর্ণ-ফটকের পরেই পুরানো কেল্লা বা ফোর্ট পয়েণ্ট। কেল্লার সামনে সমুদ্র-বক্ষে এক দিন মাছের জাহাজ ও নৌকার রীতিমত

ভিড় জমিত। আজ মাছের জাহাজ-নৌকার পরিবর্তে দেখা যায় শুধু রণতরীর বিরাট সমাবেশ! সমুদ্র-কূলের পাহারাদারী করিতেছে এখানকার কোষ্ট-আর্টিলারী বিভাগ। মাটীর নীচে সম্প্রতি যে বিরাট দুর্গ বিরচিত হইয়াছে, সে যেন এক নূতন দেশ! সেখানে সংখ্যাতীত ঘর-বাড়ী এবং সে-সবে নিপুণ ফৌজের ভিড়।

ভূগর্ভের এ কেল্লায় যে নূতন সার্চ্চ-লাইট বসানো হইয়াছে, সে বাতির আলোক-শক্তি আশী কোটি বাতির আলোর অনুরূপ—রাত্রে এ বাতির আলোয় সমগ্র সমুদ্রকূল এমন আলো হইয়া থাকে যে, পথে ছুঁচ পড়িয়া থাকিলে তাহাও দেখা যায়। কাজেই বহু দূরে একশো মাইলের মধ্যে জলে শত্রুর জাহাজ বা আকাশে প্লেনের চিহ্ন ফুটিলে তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে। এবং প্রত্যক্ষ হইবামাত্র অস্ত্রের মুখে সে জাহাজ বা প্লেন নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যাইবে!

সমুদ্রকূলে যে অসংখ্য এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট কামান সজ্জিত রাখা হইয়াছে, সেগুলি হইতে মিনিটে বিশ-পঁচিশটি করিয়া গোলা বর্ষণ হয়। তাছাড়া টেলিফোনের সুব্যবস্থায় চোখের পলক-পাতে একশো মাইল ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র সঙ্কেত পরিচালনা সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। টেলিফোন-ষ্টেশনে খাপ-কাটা টেবিলের সামনে অতন্দ্র বার্ত্তা-বিশারদ কিশোরী বার্ত্তা-বাহিকারা উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে—তার বুকের উপর আছে অজস্র কর্ম্মচারী—শত্রুর আগমন-সঙ্কেত পাইবামাত্র টেবিলের বুকে অঙ্ক দেখিয়া শত্রুর অবস্থান নির্দ্দেশিত হইবে। এবং তাহা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গে-দুর্গে সে সংবাদ প্রচারিত হয়—সংবাদ-লাভে নিমেষ মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী সসজ্জ হইয়া শত্রু-নিপাতে বাহির হইতে পারে।

সান্ ফ্রান্‌সিশকোয় এখানকার মত ব্ল্যাক-আউট প্রথা প্রচলিত হয় নাই। আকাশ-মার্গে প্লেন দেখা গেলে সে প্লেন কোন্ পক্ষের নির্ণয় করিতে না পারিলে টেলিফোন-ষ্টেশন হইতে সাইরেণ বাজে। এ বাজার অর্থ—অজানা প্লেন দেখা গিয়াছে ৫০ মাইলের মধ্যে! রাত্রে এ সাইরেণ বাজিলে তখনি সহরের সমস্ত আলো নিবানো হয় এবং এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট-বাহিনী প্লেন-আক্রমণে বাহির হয়। 'অল্-ক্লীয়ার' সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে সমর-সজ্জার অবসান।

সান্ ফ্রান্‌সিশকো উপসাগরের মুখে অবস্থিত। এ উপসাগরের বুকে মেয়ার দ্বীপ। জাপান কর্ত্তৃক পার্ল হার্বার আক্রমণের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া পৌছায় এই মেয়ার দ্বীপে; এবং সে সংবাদ নিমেষে সারা আমেরিকায় প্রচারিত হয়! সে আক্রমণে আমেরিকার সবল রণতরী 'শকে' বিশেষ ভাবে আহত হয়। সে জাহাজ পরে এই মেয়ার দ্বীপের বন্দরে আনিয়া তাহার সংস্কার চলে। পার্ল-হার্বার হইতে প্রায় ছয় শত জখমী লোককে মেয়ার দ্বীপে আনিয়া সেবায়-শুশ্রূষায় আরোগ্য করা হইয়াছে। আরোগ্য-লাভের পর তারাই জীর্ণ রণতরী 'শকে' আবার গড়িয়া তুলিয়াছে। মেয়ার দ্বীপে এ্যাডমিরাল ফারাগাট এখন টর্পেডো-যূথের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। তাঁর অসাধারণ পটুতা। মেয়ার দ্বীপের বন্দরে

দিকে দিকে শুধু ব্যারাক আর ব্যারাক
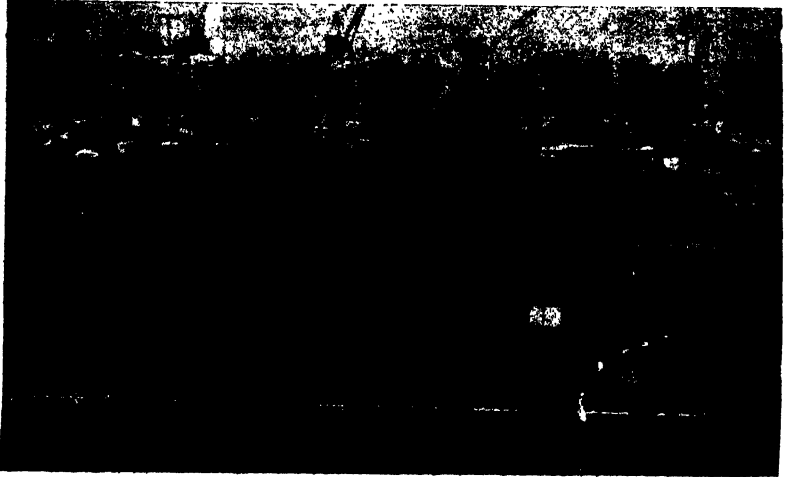
এক বছর আগে এখানে ছিল বসতি—এখন জাহাজ ও মোটরের কারখানা

হাজার হাজার জাহাজ (escort vessels) তৈয়ারী হইতেছে। ব্রিটিশ ও মার্কিণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া নিরাপদে যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া—এই সব রক্ষী-জাহাজের কাজ।

যুদ্ধের সাজসজ্জা-নির্ম্মাণে মেয়ার দ্বীপ আজ সকলের অগ্রণী। বোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা-কল্পে এ দ্বীপটির সর্ব্বত্র অসংখ্য আশ্রয়-নীড় রচনা করা হইয়াছে; সেগুলির জন্য দ্বীপটিকে দেখায় মৌচাকের

মত। এখানকার জাহাজের কারখানায় কারিগরের সংখ্যা দশ হাজারের উপর—সমগ্র মার্কিন যুক্তরাজ্যের কোথাও আজ পর্য্যন্ত এত-বড় জাহাজের কারখানা নির্ম্মিত হয় নাই! এ কারখানায় এবং অন্য বহু কারখানায় পুরুষের সঙ্গে মেয়েরা কাজ করিতেছে। কঠিন কাজ! ২০০০ টন ওজনের হাতুড়ি মারিয়া অতি-তপ্ত বড় বড় লোহার স্তূপ ভাঙ্গিয়া নিমেষে সব চূর্ণ করিতেছে—মোমের মত অনায়াসে গলাইয়া যে কোনো আকারে লোহা নোয়াইয়া দুমড়াইয়া কত রকমের যন্ত্রপাতি

বেসামরিক ও সামরিকদের মিলন-উৎসব

খানা-হল্। ট্রেজার দ্বীপ। ৪০ মিনিটে ৬০০০ লোককে এক-কালে খাওয়ানো হয়

তৈয়ারী করিতেছে! মেয়েদের গায়ে ওভারল-আচ্ছাদনী; চোখে গাগ্‌ল্-চশমা আঁটা। এ বেশে তাদের রূপশ্রী হয়তো ম্লান হইয়াছে, কিন্তু কাজে তাদের এতটুকু ঔদাস্য নাই, আলস্য নাই, অপটুতা নাই। হাসি-মুখে খুশী-মনে সকলে কাজ করিতেছে। রূপপ্রসাধন বলিতে তারা আজ বোঝে লোহার পাত বাঁকানো, হাতুড়ি পিটিয়া লোহার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা প্রভৃতি।

বিভিন্ন কারিগররা যাহাতে কারখানায় আসিতে অসুবিধা না ভোগ করে, এ জন্য তাদের জন্য তিনশো খানি স্বতন্ত্র বাস বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুদূর সান মেটো, সান জোশ, হইতেও কারখানার জন্য কারিগর আসা-যাওয়া করিতেছে। যারা দূর দেশের লোক, তাদের বাসের জন্য ব্যারাক নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ব্যারাক—দূর হইতে দেখায় যেন পাখীর বাসা!

সান্ ফ্রান্সিশকোর ভালেজো এবং রিচমণ্ড—এ দু'টি সহরকে পেট্রোলের ভাণ্ডার এবং ডকে পরিণত করা হইয়াছে। ফৌজ এবং কারিগরদের আমোদ-পরিবেষণের জন্য নৃত্যশালা, থিয়েটার, সিনেমা-গৃহের অভাব নাই; হোটেল আছে, পানাগার আছে; এবং এ-সবে আনন্দলাভের ব্যবস্থা হইয়াছে বেশ শস্তা।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিনের নৌ-বিমান-ঘাঁটী ছিল সাতটি মাত্র—এখন তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে কুড়ি! সবচেয়ে বড় যে-ঘাঁটী, সেটি সান্ ফ্রান্সিশকো উপসাগরের কূলে অবস্থিত। তার নাম আলামেডা নেভাল এয়ার-ষ্টেশন। এই ঘাঁটীতে সার-সার ব্যারাক,—ব্যারাকের সঙ্গে থিয়েটার, খেলার মাঠ, হাসপাতাল প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানে হাজার-হাজার বিমান-পোত নির্ম্মিত হইতেছে। অসংখ্য হাঙ্গার, দোকান, বাহিনী-শিক্ষালয়—অর্থাৎ কোনো কিছুর অভাব নাই! আকাশে নানা টাইপের বিমানপোত ঘর্ঘর শব্দে অহরহ উড়িতেছে; বেতার-সঙ্কেত শিক্ষা দিবার জন্য আলামেডা, সান ডিয়েগো, শীটল এবং জ্যাকসনভিলে আধুনিকতম প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে। এখানকার পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হন, বেতারের বিদ্যায় তাঁদের কৃতিত্বের তুলনা থাকে না!

আহার্য্যাদির ভাণ্ডারগুলি সুবৃহৎ রেফ্রিজারেটারের নবতম সংস্করণরূপে বিরচিত সেখানে শাকসব্জী, তরী-তরকারী, ফল-মূল দুধ-ছানা, পনীর প্রভৃতির পাহাড় জমিয়া আছে। রুটিখানায় প্রত্যহ ১৫০০ রুটি এবং ৭৫০খানি করিয়া পাই তৈয়ারী হয়।

ট্রেজার দ্বীপের ওপারে প্যাসিফিকের বিরাট নৌ-বন্দর। এ বন্দরে বহু ফৌজ রাখা হইয়াছে। ফৌজের আহার্য্যের যে ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থামতে ৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৬০০০ জন করিয়া লোককে তৃপ্তিসহ খাওয়ানো চলে। ফৌজের জন্য এখানে সাপ্তাহিক দুধের বরাদ্দ ২৫০০০ গ্যালন।

ট্রেজার দ্বীপে 'ফিলিপাইন ক্লিপার' নামে যে যুদ্ধ-বিমান-পোতখানি আছে, সেখানি আকাশ-পথে চার কোটি মাইল পথ পাড়ি জমানোর পর পার্ল হার্বারে জাপানী অস্ত্রে আহত হইয়াছিল। সে আঘাত
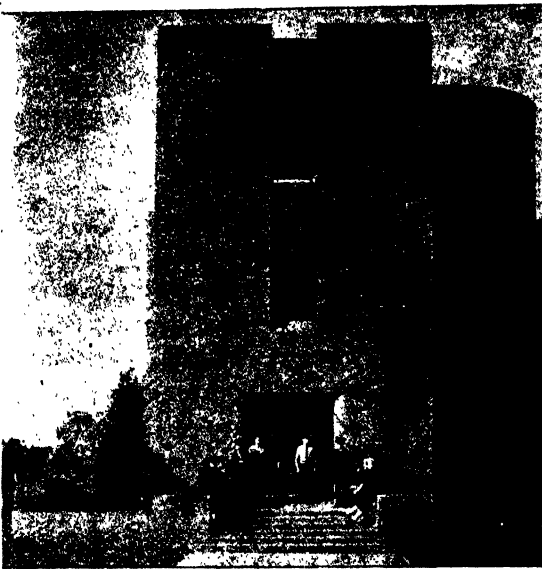
বিমান-ঘাঁটি—আলামেডা
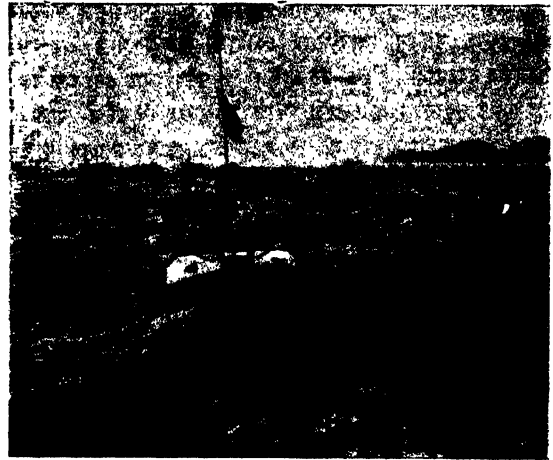
মাছের বোটে আজ কামান ভরা

বার্ত্তা-বাহিকার অফিস-কামরা

মেয়ার দ্বীপের পথ
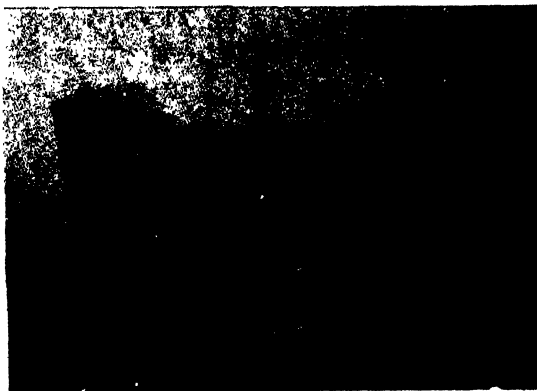
কূল-রক্ষী ফৌজ

আহত নৌসেনার দল। শ্রীমতী রুজভেল্ট আসিয়াছেন কুশল জানিতে

গোবাবা গাড়ী ঠেলে

দ্রাক্ষা-ক্ষেতের কিশোরী

সেণ্ট ফ্রানসিশ হোটেল—এখন ফৌজ-নিবাস
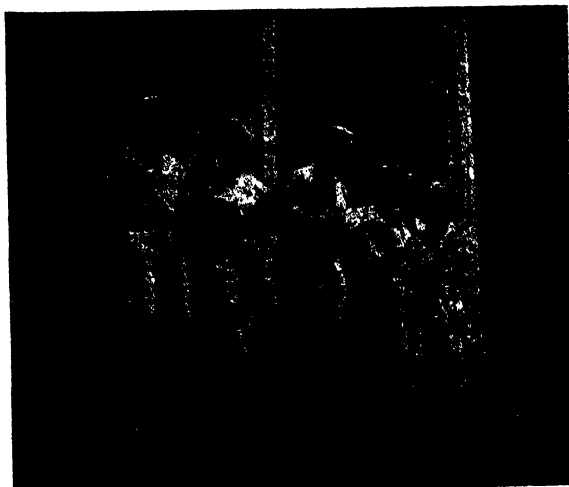
ইংরেজ,—স্বচ্—যুগোস্লাভ—পোলিশ এখানে সকলে আজ এক-জাত !
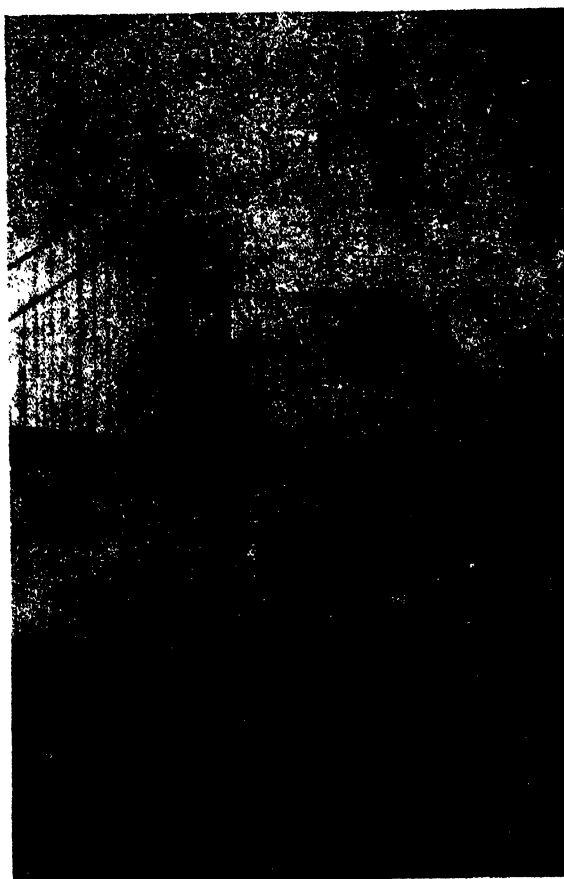
স্বর্ণ-ফটক সেতু

বরিয়াই 'ক্লিপার' বিমানপোত নিরাপদে সান্ ফ্রানসিশকোয় আসিয়া পৌছায়।' একখানি সুবৃহৎ জাপানী সাবমেরিন সান ফ্রানসিশকো বাহিনীর অসাধারণ কৌশলে করায়ত্ত হইয়াছিল; সেখানি আনিয়া উপসাগরে রাখা হইয়াছে। বিজয়-টীকার মত সেখানি সান্ ফ্রানসিশকো বাহিনীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

"ফিলিপাইন্ ক্লিপার" বিমান-পোত

জাপ-হস্তে নিগ্রহ না ভোগ করিতে হয়, এ জন্য মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার 'পিয়ারী' কোনো মতে আত্মগোপন করিয়া ফিলিপাইন হইতে জাভা-উপসাগরে আসিয়া পৌছিয়াছিল—

বারুদখানা

সান্-ইয়েৎ-সেনের মূর্ত্তি-পূজা—সান্ ফ্রান্সিশকো

সেখানে যাত্রী-বাহিনী ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া কোনো মতে ডারুইনে আসিয়া উপস্থিত হয়—সেখানে অবস্থান-কালে জাহাজের উপর বোমা পড়ে। বোমার আঘাতে বহু লোক মারা যায়—অবশিষ্ট ফৌজ বিশেষ ভাবে আহত হয়। আহত-দের সান্ ফ্রানসিশকোর হাসপাতালে আনিয়া চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। তাদের মধ্যে কিশোর-বয়স্ক বানোস্কি ছিল বিমানপোতের প্রধান পাইলট। যব দ্বীপের যুদ্ধে শেয়ারাবাজায় বানোস্কি গুরুতর আহত হয়। এক জন ডাক্তার অস্ত্রোপচারে তার দেহ হইতে গুলীগোলা বাহির করিয়া দেন। বানোস্কি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন সে সান ফ্রান্সিশকোর বিমান-ঘাঁটীতে কাজ করিতেছে।
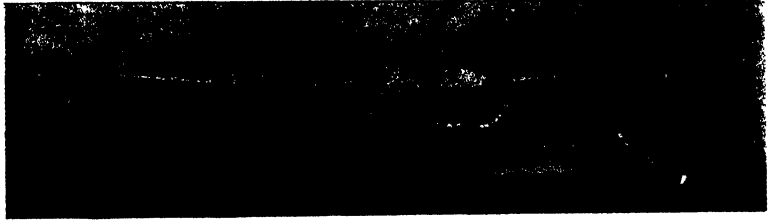
মেয়েরা মোটর চালায়, বাস চালায়

সান্ ফ্রানসিশকোর চীনা মহল্লা পার্ল বন্দরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এ মহল্লায় বহু জাপানীর বাস ছিল—এখন জাপানীর চিহ্নও নাই। এ মহল্লায় চীনারা নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। এখন সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া চীনা পুরুষরা—সংখ্যায় প্রায় ছ' হাজার চীনা—জাহাজের কারখানায় কাজ করিতেছে। এখানকার চীনা-মহিলা-চিকিৎসক শ্রীমতী চুঙ সমর-কাজে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাঁর উৎসাহে শুধু চীনার দল নয়, শ্রমিকের দলও রণোন্মাদনায় মাতিয়াছে। বাহিনীদের জন্য এ মহল্লায় পার্টি এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও প্রীতি-অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। ডক্টর চুঙের গৃহে জাপ-পরাভবের নিদর্শন-স্বরূপ জাপানী পতাকা, সার্পনেল এবং বিবিধ জাপ-অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের ন্যায় সংরক্ষিত আছে।

এক দিক্ দিয়া সমগ্র সান্ ফ্রান্সিশকোকে যেমন বিরাট

দুর্গ বলিয়া মনে হইবে, অন্য দিকে তেমনি চাষবাসেও কাহারো এতটুকু ঔদাস্য নাই! ফুলের চাষ, ফলের চাষ, ফসলের চাষ, গোমেষাদির লালন-পরিচর্য্যা—এ-সবেরও উৎসাহের অন্ত নাই! জয়লাভের জন্য শুধু অস্ত্র শানাইলেই চলিবে না, যুদ্ধ-কৌশল শিখিলে চলিবে না—প্রাণ-ধারণের জন্য সাধনা চাই, শক্তি চাই—চাই উৎকৃষ্ট অশন বসন, পুষ্টিকর ভোজ্য-পানীয়। সে সবের অভাব যাহাতে না ঘটে, সে দিকে সকলের সচেতন লক্ষ্য আছে।

জাপান সাবমেরিন—পার্ল হার্বারে পাওয়া

সান্ ফ্রান্সিশকো হইতে পূর্ব্বে জাহাজ ভরিয়া দেশ-দেশান্তে ফুল চালান যাইত—বছরে প্রায় দেড় কোটি ডলারের উপর। এখন

মেয়ার দ্বীপের বন্দরে জীর্ণ জাহাজ "শ"

এ বিলাস-লীলার দেখা মিলিবে না। এখানে মাছের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ ছিল। মাছের ব্যবসায় শ্লাভ এবং ইতালীয়ানদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশী। এখন সে সমৃদ্ধি নাই। মাছের জন্য সাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালীতেও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দা।

পুরাতন বার্বারি-অঞ্চলকে ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। যে সব পথ-ঘাট পূর্ব্বে হাওয়াই-সঙ্গীতের সুরে মুখরিত থাকিত, এখন সে পথে-ঘাটে ফৌজ-বাহিনীর বুট-কাওয়াজের কলরব-কোলাহল এবং অস্ত্রের ঝনঝনা! জাপানীর উপর হীনতম কৃষকেরও আক্রোশ অপরিসীম! কালিফোর্ণিয়ার চীনা মহল্লাতেই ছিল জাপানীদের বাস। দোকানগুলির মধ্যে জাপানী বণিক সাৎসুমোটার দোকান ছিল সব-চেয়ে বড়—তিন-তলা প্রকাণ্ড বাড়ীতে দোকান। এখন সে বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। দোকানের পিছনে সেণ্ট মেরি পার্ক—পার্কে ডক্টর সান্-ইয়েৎ-সেনের চমৎকার একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। সাৎসুমোটার দোকানের সামনে প্রকাণ্ড চীনা হোটেল—ক্যাথে হাউস। কাচের সার্শি-দেওয়া কামরাগুলি সন্ধ্যার আলোয় স্বপ্নপুরীর মত মনে হয়। এখানকার সৌখীন খাদ্যের মধ্যে হপ্-তো-গাই-কো (ছোট অস্থিহীন মুর্গীর সহিত আখরোট মিশাইয়া তৈরী), ইয়েন-উও-বক-অপ্ (পাখীর বাসার ব্যঞ্জন), এবং অর-ডুং-গো-অপ্ (কমলালেবুর খোশার মধ্যে ভাপানো হাঁসের মাংস)—সর্ব্ব জাতির বিশেষ উপভোগ্য!

সান্ ফ্রান্সিশকোয় পূর্ব্বে জাপানীরা করিত জাহাজ তৈরী,—শিক্ষিত সম্প্রদায় করিত শুধু ব্যাঙ্কিং এবং মাল-চালানী ও আমদানির

স্বর্ণ-ফটকের পিছন হইতে ধুরুম্-ধুম্!

কাজ। তারা বহু উদ্যান ও ক্ষেত-খামার তৈয়ারী করিয়াছিল—লাল মাছ এবং বিচিত্র জলজ গুল্মলতার লালনেও তাদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। ফটোগ্রাফিক ব্যবসাও এখানে জাপানীদের একচেটিয়া ছিল। মাছের ব্যবসায় জাপানীরা কোনো দিন নামে নাই।

সান্ ফ্রান্সিশকোর লোক-জন খুব প্রমোদপরায়ণ; যুদ্ধের কাজে আজ দেহ-মন সমর্পণ করিলেও সুযোগ পাইবামাত্র নাচে-গানে আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে ছাড়ে না! নৌকা লইয়া সমুদ্র-বক্ষে বাহির হয়—যুদ্ধ-জাহাজের চারি দিকে ঘুরিয়া জাহাজের জীবন-যাত্রার পরিচয় গ্রহণ করে। আমোদ-প্রমোদে মনের সহজাত অনুরাগ থাকিলেও আমোদের লোভে কাহারো কর্ম্মে বিরাগ ঘটে না—প্রমোদ-রঙ্গক্ষেত্রে ইহারা কুসুমাদপি কোমল, কিন্তু জাপানীর নামে বজ্রাদপি কঠিন!

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

৭

বিন্দুমতীর এখানে সুশীল তখন আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

সরস্বতীর একটি মাত্র সন্তান এই সুশীল। বাপ-পিতামহের মস্ত জমিদারী। কিন্তু প্রজা ঠ্যাঙাইয়া জমিদারী-চালানোয় বাপ-পিতামহের তৃপ্তি ছিল না। তাই জমিদারীর ব্যবস্থা পাকা রাখিয়া তাঁরা সহরের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন, লেখাপড়া, সভা-সমিতি—এ-সবে তাঁদের অনুরাগ প্রবল। বংশের সে-ধারা সুশীল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলে।

বয়স সাতাশ-আটাশ বছর। এ-বয়সে পৃথিবীর চারি দিকে তার দৃষ্টি···চারি দিককার খবরাখবর রাখিতে তার এতটুকু ঔদাস্য নাই! এবং শুধু খবরাখবর রাখিয়াই সে চুপ করিয়া থাকে না; সে চিন্তা করে; পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। আলাপ-আলোচনায় তার মন এমন ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে যে কোনো বিষয়ে চট্ করিয়া মতামত ব্যক্ত করে না—ভাবিয়া তলাইয়া বিচার করে!

বিন্দুমতীর কাছে সে বলিতেছিল বিজয়ের শ্বশুর জ্ঞানপ্রিয় চাটুয্যের কথা। বিন্দুমতী বলিলেন—এখনো বিয়ে করছিস্ নে সুশীল ···তোর মায়ের সাধ হয় না, বাবা?

সুশীল বলিল—বিয়ের নামে ভয় হয় মামিমা। জানো, বিজয়দার শ্বশুরের অবস্থা?

বিন্দুমতী বলিলেন—কেন? কি হয়েছে তাঁর?

সুশীল বলিল—তাঁর দু'টি ছেলে তো···দু'টি ছেলেই লেখাপড়ায় লায়েক···পাঁশে দিগ্‌গজ···ভালো চাকরি করছে দু'জনে। ওকালতির দিকে গেল না! বলে, অনিশ্চিত পথ! ভদ্রলোক দুই ছেলের বিয়ে দেছেন বেশ বড় ঘরে। বড় বৌ বিয়ের পর যদ্দিন স্বামী ছিল শ্বশুরের আশ্রয়ে, তত দিন সেখানে! তার পর চাকরি পেয়ে বড় ছেলের পাখা গজালো- বৌকে নিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গীর কানাচে এক-বাড়ীর এক-তলায় কামরা ভাড়া নিয়ে সেইখানে আস্তানা পেতেছে। ছোট ছেলের বিয়ে হয়েছে বিলেত-ফেরত এক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে—ছোট ছেলে বৌ নিয়ে শ্বশুর-বাড়ীর কাছে ফিরিঙ্গী-পাড়ার এক ফ্ল্যাটে বাস করছে! জ্ঞানপ্রিয় বাবুর অত-বড় বাড়ী খাঁ-খাঁ করছে! ভদ্রলোকের দেহে নানা রোগ—কেমন যেন হয়ে গেছেন! তাঁর স্ত্রী বলেন—যাদের মুখ চেয়ে দিন কাটাবো ভেবেছিলুম, যাদের ছেলেমেয়ে ঘেঁটে জীবনটা শেষ করে দেবো—এমনি করে চলে তারা গেল! এত-বড় পুরীতে দিন আমাদের কাটে না, বাবা!···ভাবো তো মামিমা, এ দু'টি ছেলে মা-বাপের কথা একটিবার ভাবে না কি বলে?

বিন্দুমতী বলিলেন—এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক মুছে গেছে বাবা। এ কথা শুনিনি তো!

সুশীল বলিল,—দুই ছেলে বিয়ে করে নিজেদের সুখে আত্মহারা হয়ে আলাদা বাসা নেছে! আমি ভাবি, মা-বাপ···যাদের দৌলতে তোরা আজ ভদ্রসমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিস্···কৃতজ্ঞতাও নেই? এমন স্বার্থপর! বেশ, এ বাড়ীতে মা-বাপের সঙ্গে থাকতে তোদের স্বার্থে কি আঘাত লাগতো বাপু যে আলাদা বাস করছিস্ গিয়ে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীল চুপ করিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুমতী বলিলেন—আগে এত কথা মনে জাগতো না সুশীল···এ-সব ভাববার সময়ও পেতুম না। সংসারে পাঁচ জনের কার কোথায় কি দরকার, সেই চিন্তাতেই দিন কাটতো। তার পর বিজয় আমাকে এমন শিক্ষা দিয়ে গেছে যে এখন বসে বসে অনেক কথা ভাবি। আমার মন ছিল পাথরের নীচে চাপা···চোখ ছিল অন্ধ! আজ মনের পাথর সরে গেছে, চোখে আলো ফুটেছে। সে-আলোয় কত দিক যে দেখতে পাই, তা তোকে কি বলবো সুশীল!

সুশীল বলিল—জ্ঞানপ্রিয় বাবুর ছেলেরা-বৌয়েরা সন্ধ্যার সময় মাঠে হাওয়া খেতে বেরোয়···বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী যায়···আর যায় বৌয়েদের বাপের বাড়ীতে···মা-বাপের ধার মাড়ায় না মামিমা। পাওনাদারকে মানুষ যেমন এড়িয়ে চলে, তেমনি এড়িয়ে চলে এ দুই বাঁদর নিজেদের মা-বাপকে!···জ্ঞানপ্রিয় বাবুকে আমি বলি,—ছেলেদের তো পারলেন না মানুষ করতে, তাদের হাতে সারা জীবনের সব সঞ্চয় তুলে দিয়ে তাদের বাদরামি আর বাড়িয়ে তুলবেন না···সব সম্পত্তি দান করে যান ইউনিভার্সিটিকে···মানুষ তৈরী হোক!

মনে-মুখে ঝাঁজ···সুশীল মহা-উৎসাহে বকিতে লাগিল··· এবং এই সতেজ বক্তৃতার মধ্যে মা-সরস্বতী আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই বলিল—বাইরে থেকে গলা শুনেই আমি বলেছি কদমকে, সুশীল এসে মামিমার কাছে বক্তে সুরু করেছে রে!

বিন্দুমতী বলিলেন—সত্যি কথা বলছে ঠাকুরঝি, বকা নয়।

সরস্বতী বলিল—জানি···তোমার আদরের সুশীল···সত্যি ব[illegible] ছাড়া বাজে কথা ও বলে না!

হাসিয়া সুশীল বলিল—মা শুধু হাসে মামিমা আমার কথা শুনে! ভালো বলছি কি মন্দ বলছি, কখনো যদি কিছু বলে!

সরস্বতী বলিল—আজ কার অন্যায় অপকীর্ত্তির বিচার হচ্ছিল সুশীল?

সুশীল জবাব দিল না···বিন্দুমতী জবাব দিলেন। বলিলেন—বিজয়ের শ্বশুর-বাড়ীর কথা বলছিল। সত্যি, যা শুনছি, বুড়ো বয়সে এ কি ওঁদের মহা-দুর্ভোগ!

সরস্বতী বলিল—যা বলেছো!···তবে এ ওঁদের পাপের শাস্তি বৌদি। বৌমা মারা গেলে অনেকে বলেছিল, কচি বাচ্ছাটাকে বিজয় কি করে দেখবে? সেটিকে নিয়ে এসে কাছে রাখুন জ্ঞান বাবু। জ্ঞান বাবু তখন ছেলেদের মুখ চেয়েছিলেন। ছেলেরা বলেছিল, তোমরা যদি মারা যাও···কে ও ছেলের ভার নেবে তখন? বিজয়ের কাছে থাকলে তার দায়িত্ব থাকবে! ছেলেদের কথায় দৌহুরের পানে চাননি তখন।···বেশী মায়া-মমতা ভালো নয় বৌদি···এ বয়সে অনেক-কিছুই দেখলুম! যা দেখলুম, তা থেকে বুঝেছি, সবাই নিজেকে নিজেকে নিয়ে মত্ত! ঐ জন্মই সুশীলকে আমি জেদ করে আর বলি না তো যে বিয়ে কর্ সুশীল···আমার সাধ! কেন বলবো? ওর নিজের জন্ম বিয়ে করা। ও যদি দরকার না মনে করে, আমার সাধ মেটাতে সত্যিই তো আর-একটা প্রাণীকে গলায় বেঁধে—দু'টো খেয়োখেয়ি করে মরে কেন?

মিষ্ট ভৎ'সনার স্বরে বিন্দুমতী বলিলেন—গেল যা···ও কি কথা! খেয়োখেয়ি করে মরা—মানে? ভদ্রঘরে খেয়োখেয়ি!

হাসিয়া সরস্বতী বলিল—চড়-চাপড় ঘুষি-লাথি মারা কিম্বা গালমন্দ করাকেই খেয়োখেয়ি বলছি না বৌদি···মনের পানে যদি না তাকায়? মনে কোথায় কে দুঃখ পাচ্ছে, বেদনা পাচ্ছে, কিসে বা আনন্দ পাবে···তা যদি পরস্পরে না বোঝে, তাহলে আর জীবনে রইলো কি? রইলো কি?

বিন্দুমতী শুনিলেন। এ-কথার অর্থ বিজয়ের সেই নির্ব্বাসনের দিন হইতে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন! বিজয় বলিত, বিপদেই মানুষের আসল শিক্ষা মা···বিপদে পড়লে আমাদের মনের জানলা-কপাট খুলে যায়···আমরা বুঝতে পারি আমাদের কি আছে, কি আমাদের নেই, আর কি-বা আমাদের চাই!

এ-সব কথায় মন অতীত দিনে ফিরিয়া যায়···স্মৃতির কাঁটার ঘা খাইয়া বেদনায় জর্জ্জরিত হয়! তাই তিনি কথার মোড় ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—কদমকে নিয়ে এমন সময় এখানে! এর মানে?

সরস্বতী—বলিল—শুধু কদম নয়, আরো মানুষ এসেছে সঙ্গে—ঠাকুর আর মতির মা।

—আসার মানে?

সরস্বতী বলিল—মেয়ের জীবনে শুভ দিন···তার একটু স্বাদ নেবে না তুমি! দাদাও বললে আমাকে, তুই যা রে সরো!

বিন্দুমতী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—আমার সৌভাগ্য!

মার পানে চাহিয়া সুশীল বলিল—খাবার এনেছো যদি তো মামিমাকে খাইয়ে যাও। রাত হয়েছে বেশ।

সরস্বতী ডাকিল—ঠাকুর···

পাশের ঘরে ঠাকুর খাবার সাজাইয়া রাখিতেছিল; সরস্বতীর আহ্বানে আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। সরস্বতী বলিল—খাবার তুমি সাজিয়ে আনো। কদম তুই মা, ওঠ্···উঠে হাত ধুয়ে এই-খানেই ঠাঁই করে দে।

কদম উঠিয়া গেল।

সুশীল বলিল—এ মেয়েটি কে, মা? দেখিনি তো!

বিন্দুমতী বলিলেন—ওটি হলো অবু চক্রবর্ত্তী···তার মেয়ে। বাপের পয়সা-কড়ি নেই···তাই পুরুত ঠাকুরের বৌ মারা গেলে তারি সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে।

মতির মা আসিয়া বলিল—খোকামণি ঘুমিয়েছে? ভেবেছিলুম একটু নাড়াচাড়া করবো!

সরস্বতী বলিল—খোকামণিকে ঘাঁটবার সাধ থাকলে বিকেল বেলা অনায়াসে আসতে পারিস তো।

মতির মা বলিল—দিনের বেলায় আমার কোনো দিকে চাইবার ফুরসৎ মেলে কি পিসিমা? যে-রাজ্যে মা নেই, সে-রাজ্যে আমাদের ··· মুখ চাইতে কে আছে, বলো?

কদম আসিয়া আসন পাতিয়া জল গড়াইয়া ঠাঁই করিয়া দিল। সরস্বতী খাবার বাড়িয়া বিন্দুমতীকে বলিল—খেতে বসো বৌদি···

বিন্দুমতী বলিলেন—কদমকে এত রাত্রে টেনে আনলি কেন?

সরস্বতী খুলিয়া বলিল কদমকে আনার বৃত্তান্ত!

বিন্দুমতী বলিলেন—কি দিয়ে ওরা আশীর্ব্বাদ করলে?

সরস্বতী বলিল—পঞ্চাশ ভরি সোনার একছড়া চন্দ্রহার দেছে। বাড়ীর পুরোনো জিনিষ! তা হোক—বেশ ভারী জিনিষ।

হাসিয়া সুশীল বলিল—মহা ওস্তাদ! নতুন কোনো জিনিষ দিলে গড়াতে বাণী-খরচ লাগতো—সেটা বাঁচিয়েছে! তাছাড়া বাড়ীর জিনিষ···সিন্দুকে পড়ে ছিল···দিয়ে গেল! জানে, বিয়ের পর ঐ চন্দ্রহারশুদ্ধ বৌ যেমন আসবে অমনি সিন্দুকের গহনা সিন্দুকে গিয়ে উঠবে! উঃ, তোমাদের বোনেদী ঘরের নবাবী দেখে হাসবো, কি কাঁদবো, এক-এক সময় সত্যি বুঝতে পারি না, মামিমা।

৮

গল্পে-স্বল্পে আহারাদি চুকিবার পর সরস্বতী বলিল সুশীলকে—কটা বাজলো রে সুশীল?

সুশীলের কাছে ঘড়ি ছিল···হাতের মণিবন্ধে আঁটা রিষ্ট-ওয়াচ। ঘড়ি দেখিয়া সুশীল বলিল—সাড়ে দশটা।

শুনিয়া কদম শিহরিয়া উঠিল!

সরস্বতী বলিল—কদম বাড়ী যাবি? ওদের সঙ্গে তাহলে যা।

কদমের ভালো লাগিতেছিল এখানে সুশীলের মুক্তকণ্ঠে নানা বিষয়ের আলোচনা···এমন সহজ ভঙ্গীর সরস কথা সে বড় শুনিতে পায় না।

কদম বলিল,—ওদের সঙ্গে যাবো না পিসিমা। তুমি যখন যাবে, তোমার সঙ্গে যাবো।

সরস্বতী বলিল,—আমার যদি ফিরতে দেরী হয়?

—তা হোক!

—কেশব ঠাকুর রাগ করবে না?

লজ্জায় কদম জবাব দিল না; সে চাহিল বিন্দুমতীর পানে। সুশীল তার এ সলজ্জ ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিল; বলিল—রাগ করা অন্যায়। বাড়ীতে ওঁকে একা রেখে কি বলে তিনি সদলে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন?

সরস্বতী বলিল—তা নয়, কেশব তো জানে না—আমি কদমকে নিয়ে এখানে এসেছি! বাড়ী ফিরে ওকে না দেখলে ভাববে তো! তার উপর কদম দোরে তালা লাগিয়ে এসেছে···তারা বাড়ী ঢুকতে পাবে না রে!

সুশীল বলিল—তাহলে ওঁকে বেশী রাত অবধি এখানে আটকে রাখা তোমার অন্যায় হবে মা।

সরস্বতী বলিল—হুঁ। তুই তাহলে এক কাজ কর, সুশীল, বেরিয়ে গিয়ে ওদের ডাক্···কদমকে বাড়ী পাঠিয়ে দি।

সুশীল উঠিল···পথে বাহির হইয়া দেখে, দূরে ঐ চলিয়াছে ঠাকুর আর মতির মা। দ্রুত-পায়ে গিয়া তাদের ডাকিয়া আনিল। তারা আসিলে সরস্বতী বলিল—কদমকে পৌঁছে দিয়ে যা মতির মা। সত্যি, আমি হয়তো কাল ফিরবো! কেশব ঠাকুর ছেলেদের নিয়ে ফিরে বাড়ী ঢুকতে পাবে না শেষে! আয় মা তবে কদম!

কদম কি করে, উঠিল। বিন্দুমতী বলিলেন,—আসিস্ না রে মাঝে-মাঝে আমার কাছে কদম। একলাটি থাকি।

কদম বলিল—আসবো মাসিমা। আসিনি এত দিন···কি জানি, কে কি বলবে!

বিন্দুমতী বলিলেন—তা বটে। তুই এখন আবার অবুর মেয়েটি নোস্ তো—কেশব ঠাকুরের বৌ। ভয় করে মা, যে আমাদের দেশ···

সুশীল চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—দাঁড়াও না মামিমা, আমি যখন এসেছি, মেনির বিয়ের সময় একটা হেস্তনেস্ত করে তবে আমি ফিরবো!

সরস্বতী বলিল—কি হেস্ত-নেস্ত তুই করবি শুনি?

সুশীল বলিল—তা এখন বলতে পারছি না। সে ভেবে ঠিক করবো। ভয় নেই তোমাদের। লাঠি-সোটা চালাবো না, গালমন্দও করবো না। মানে, এমন কিছু করবো যাতে লাঠি ভাঙ্গবে না, অথচ সাপ মরে ভূত হবে।

মতির মা তাড়া দিল···বলিল—এসো গো কদম-ঠাকরুণ—ওদিকে কত কাজ পড়ে রয়েছে আমার!

কদম বলিল—আসি মাসিমা···আসি পিসিমা।

বিন্দুমতী বলিলেন—কদম ওদের সঙ্গে যাবে? হাজার হোক, এক-বাড়ীর বৌ তো! সুশীল তুইও বাবা সঙ্গে যা। এসে খপর দিতে পারবি যে হ্যাঁ, কেশব বাড়ী ফিরেছে···ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবো! ছেলেমানুষ···বাড়ীতে একলাটি রাত্রে না থাকতে হয়!

সরস্বতী বলিল—কেশব যদি না ফিরে থাকে তো মতির মা আর ঠাকুর ওকে খানিক আগলাবে'খন, আর সুশীল গিয়ে ও-বাড়ী থেকে কেশবকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে। বুঝলি মতির মা?

মতির মা বলিল—বুঝেছি পিসিমা।

ক'জনে পথে বাহির হইল। আকাশে জ্যোৎস্না। পল্লীর পথ···ঘন তরুকুঞ্জে কেয়ারি-করা। শাখাপত্রে আকাশের জ্যোৎস্না কোথাও অবরুদ্ধ, কোথাও শাখাপত্রের অন্তরালে পথে আলোর লহর!

চার জনে চলিয়াছে। কাহারো মুখে কথা নাই। এমন চুপ করিয়া থাকা সুশীলের কোষ্ঠীতে লেখে নাই! তাই সে কথা কহিল। ডাকিল,—মতির মা···

মতির মা জবাব দিল—কেন গা দাদাবাবু?

মতির মা অনেক কালের পুরানো দাসী। সুশীলকে ছোটবেলা হইতে দেখিতেছে। পিসিমার কাছে যখন যেটা চাহিয়াছে, পাইয়াছে—তাই পিসিমার ছেলের উপরেও তার মন প্রসন্ন—চিরদিন।

সুশীল বলিল—ভূতের ভয় করে তোমার?

মতির মার গা ছমছম্ করিল। ভয় হইলেও সে-কথা মানিবে কেন? মুখে বলিল—যা নেই, তার ভয় কেন হবে গা দাদাবাবু?

সুশীল মনে মনে হাসিল, মুখে বলিল—নেই! তার মানে, তুমি বলতে চাও ভূত নেই?

মতির মা কোনো জবাব দিল না।

সুশীল বলিল—না যদি থাকবে তো রাম-নাম হয়েছে কেন, বলতে পারো?

মতির মা বলিল—না, দাদাবাবু, আমরা দাসী-বাঁদী মানুষ—রাত-বিরেতে মনিবের পাঁচটা কাজে পথে বেরুতে হয়—কেন আর ওসব কথা বলে ভয় দেখাচ্ছো!

সুশীল বলিল—ভয় দেখাচ্ছি না। পাছে ভয় পাও তাই মানে, আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি।

মতির মা কদমের গা ঘেঁষিয়া আসিল।

সুশীল বলিল—তুমি তো বললে ভূত নেই—কিন্তু এ পথ যেখানে বেঁকেছে, পুব দিকে যেতে ঘাটের ধারে ঐ গঙ্গাযাত্রীর ঘর, সে ঘরের সামনে মস্ত ঝাঁকড়া একটা নিমগাছ···তুমি জানো, কাল রাত্রে ও বাড়ী থেকে খেয়ে মামিমার কাছে আসবার সময় নিমগাছের নীচে আমি কি দেখেছিলুম?

মতির মার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে এবার আসিয়া সুশীলের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল···আর্ত মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল—না দাদাবাবু, অমন করে ভয় দেখিয়ো না···হেই গো!

কদমের খুব মজা লাগিতেছিল। চমৎকার মানুষ! এতখানি পথ চুপচাপ যাওয়া—মতির মাকে ভয় দেখাইয়া কি কৌতুকের সৃষ্টি করিলেন! মনে পড়িতেছিল অনেক বছর আগেকার কথা। মনে পড়িল, সরস্বতী সেবারে বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিল—তীর্থের ফেরত মাখন গাঙ্গুলির গৃহে আসিয়া সকলকে কত-কি উপহার দিয়াছিল! কদমের মাকে দিয়াছিল বৃন্দাবনী থালা গেলাস বাটি—কদমকে দিয়াছিল চমৎকার ছাপ-মারা বৃন্দাবনী শাড়ী। সে শাড়ী পরিয়া কদম কত দিন অলকা-তিলকা আঁকিয়া গোপিনী সাজিয়াছে—যাত্রায় যেমন গোপিনী দেখিত—তেমনি মূর্ত্তি! কিন্তু সুশীলকে তখন কখনো দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না!

সুশীল বলিল—দূর থেকে নিমগাছের গোড়ায় আমার নজর পড়েছিল। দেখি, সাদা ধব্‌ধপে একটা বাছুর দাঁড়িয়ে আছে—একেবারে চুপচাপ—যেন কুমোরদের হাতে-গড়া মাটীর বাছুর! দেখে আমার মনে হয়েছিল, কাছাকাছি কারো বাড়ীর বাছুর—হয়তো গোয়াল থেকে পালিয়ে এসেছে! কাছে এসে দেখি, ওমা, কোথায় বাছুর? একটা ভিখিরী বুড়ী পড়ে আছে। বিশ্রী নোংরা চেহারা! মাথায় সাদা সাদা চুল—জট-বাঁধা। আর দুটো চোখ? ওরে বাপ রে, যেন আগুনের ভাঁটা! বুঝলে মতির মা?

আর মতির মা! এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে মতির মা সজোরে হুঁচট খাইয়া গোঁ-গোঁ করিয়া পড়িয়া গেল!

কদম বসিল; বসিয়া মতির মার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—মতির মা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সর্ব্বনাশ! এমন ঘটিবে, সুশীল ভাবে নাই!

ঠাকুর কথা কয় নাই। কিন্তু ভয়ে তারো হাত-পা যেন অবশ! সুশীল বলিল—এক কাজ করো ঠাকুর, ওখানে ঐ একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে···ছুটে গিয়ে তোমার ঐ গামলা করে জল আনো।

ঠাকুর নড়িতে চায় না···গাছের ডালে ঝুরি নড়িতেছে···বাতাসে তালগাছের পাতাগুলায় বিশ্রী শব্দ! সভয়ে মৃদু কণ্ঠে সে বলিল—আমার ভয় করছে দাদাবাবু।

—ভয় করছে! নামেই এত ভয়—তবু চোখে কিছু দ্যাখোনি!

বামুন ঠাকুর কাতর কণ্ঠে বলিল—ভূতকে আমার বড় ভয় দাদাবাবু।

—আমায় গামলা দাও। এখানে থাকতে পারবে তো? না, পড়ে অজ্ঞান হবে?

গামলা টানিয়া লইয়া সুশীল যাইতেছিল পুকুরের দিকে···দেখিয়া কদম বলিল—আপনার পায়ে জুতো···ওখানে কাদা আছে, আপনি এখানে থাকুন। আমাকে দিন গামলা···আমি এখনি ছুটে গিয়ে গামলা ভরে জল নিয়ে আসি। আমার অভ্যাস আছে!

বলিয়া সুশীলকে প্রতিবাদের অবসর মাত্র না দিয়া গামলা লইয়া কদম ছুটিল্ পুকুরে জল আনিতে।

চক্ষের পলকে গামলা ভরিয়া জল আনিল। সুশীল দেখিল, কদমের কাপড় ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। বলিল—কাপড় ভিজে গেছে যে!

কুণ্ঠিত স্বরে কদম বলিল—আঁচলটায় কাদা লাগলো···কেচে নিয়েছি!

—কিন্তু আধখানা শাড়ী ভিজিয়ে এসেছেন!

সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে কদম কহিল,—বাড়ী গিয়ে ছেড়ে ফেলবো!

সুশীল কোনো জবাব দিল না; হাত হইতে গামলা লইয়া গামলার জল হাতের আঁজলায় ভরিয়া সবলে মতির মার মুখে ছিটাইতে লাগিল···এক-মিমিট···দু' মিনিট···তিন মিনিট!

জলের ঝাপটায় মতির মার চেতনা ফিরিল। সে চোখ মিলিয়া চাহিল।

কদম ডাকিল—মতির মা···মতির মা···

মতির মার মুখে কথা নাই—চোখে কেমন দৃষ্টি!

কদম চাহিল সুশীলের দিকে; কহিল,—কি করবেন? মতির মা কথা কইছে না! ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে শুধু!

—ধমক দিতে হবে। নরম কথায় ভয় ভাঙ্গে না! বলিয়া সুশীল বলিল—বাড়ী যাবে না তো? বেশ, এইখানেই তবে থাকো—তোমার জন্য আমরা সারা-রাত এই পগারের ধারে বসে থাকতে পারবো না বাপু!···সুশীল ডাকিল বামুন-ঠাকুরকে; বলিল—তম্নি তাহলে এইখানে থাকো ঠাকুর···মতির মা উঠলে ওকে বাড়ী যেয়ো। আসুন, আমরা যাই।

কদম বলিল—মতির মা এইখানে থাকবে?

সুশীল বলিল—যদি না যেতে চায়, থাকবে বৈ কি।

মতির মা উঠিল। বলিল,—আমি যেতে পারবো।

পথে কেশব ঠাকুরের বাড়ী। বাড়ীর সামনে কেহ নাই। কদম বলিল—আমি বাড়ী যাই···

মতির মা বলিল—না কদম-ঠাকরুণ, লক্ষ্মী ভাই, দাদাবাবুকে তুমি চেনো না। আমাকে পৌঁছে দিয়ে তার পর···হে ভাই, লক্ষ্মীটি!

সুশীল বলিল—মা আর মামিমা বলে দেছেন, আপনার বাড়ীতে মানুষ-জন যদি না থাকে···

কদম বোঝে! না থাকিলেই বা উপায় কি? বাড়ীর মানুষ-জন কি খেয়াল করে কদমের কথা?···সুশীল তো জানে না, বাড়ীর লোকের কাছে কদমের কি দাম!

সুশীল বলিল—ও-বাড়ীতে যাচ্ছি তো—ভটচাজ্যি-মশাইকে ধরে আপনার সঙ্গে এনে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি ফিরবো। চলুন আমাদের সঙ্গে।

গাঙ্গুলি-বাড়ীর যগ্যি তখনো চোকে নাই! খাওয়ান-দাওয়ানে যেমন ধূম, অতিথিদের তৃপ্তির জন্য গান-বাজনার তেমনি সমারোহ। সহর হইতে দু'জন ওস্তাদ আসিয়াছে; নাচের আসর জমাইবার জন্য দু'জন বাইজি আসিয়াছে। এ সব সনাতন বিধি!

কদম বাড়ীতে ঢুকিল না; গাঙ্গুলি-বাড়ীর অদূরে আম-বাগান—সেই বাগানের প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সুশীল বলিল—বেশ, আমি এখনি ভটাচায্যি-মশাইকে ডেকে নিয়ে আসছি।

সুশীল চলিয়া গেল। পথে কদম একা। গ্রামের পথ হইলেও যগ্যি-বাড়ীর দৌলতে পথ আজ নিরালা নির্জ্জন নয়। উলুনী ঝাঁটাইয়া রাজ্যের লোক আসিয়াছে···ফুর্ত্তিতে সকলে মশগুল্! বাইজীর আসর ছাড়িয়া দু'-দশ জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়াছে···চর্ব্বচোষ্য পাঁচ-রকম ভোজন করিয়া হাওয়া খাইতে···মুখে বার্ডসাই···কণ্ঠে রংদার গানের কলি···

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেলে
আর এলো না!

এমন ধনী কে সহরে
আমার পাখী রাখলো ধরে'···

পাখী-ধরার কণ্ঠে এ-গান শুনিয়া কদম ভয়ে জড়োসড়ো-মূর্ত্তি—বাগানের বেড়া ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

এই সব সৌখীন গাহিয়েদের দেখিলে কদমের ভয় করে। দেখিয়াছে তো, একা নদীর ঘাটে গেলে কিম্বা মন্দিরে ঠাকুর-দেবতার আরতি দেখিয়া রাত্রে ফিরিবার সময়··· গান গাহিয়া মেয়ে-জাতের উপর কি-দরদে বিগলিত হইয়া এই সব পুরুষের দল পথে বেড়ায়!

গাহিয়ের দল এদিকে আসিল না—তারা গেল ওদিকে। কদম তবু কাঁটা হইয়া আছে!

সুশীল ফিরিল। ফিরিয়া কদমকে দেখিয়া বলিল—আপনি পথ ছেড়ে খানায় গিয়ে নেমেছেন যে! আসুন। ভটচায্যি-মশাইকে দেখলুম মামার সঙ্গে আর তাঁর নতুন বেয়াইয়ের সঙ্গে নাচের আসর জমকে বসেছেন। ছেলেরা ঘুমে ঢুলছে। ওঁরা ভাবে তন্ময়। আমি বাড়ীর কথা বললুম···তা আমার কথা কাণে গেল না! মা-মামিমা বলে দেছেন, আপনাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাবো···চলুন।

নিঃশব্দে কদম চলা সুরু করিল···সঙ্গে সুশীল।

কাহারো মুখে কথা নাই।

বাড়ীর সামনে আসিয়া কদম বলিল—আমি বাড়ী যাই···আপনি যান।

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে সুশীল বলিল—কিন্তু···

কদম সে কথার জবাব দিল না। সদরের তালা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তার পর সুশীলের পানে চাহিয়া বলিল—আমার ভয় করবে না। আমার এমন একা থাকা অভ্যাস আছে।

কথার শেষে ভিতর হইতে কদম সদরের কপাট বন্ধ করিয়া দিল। বাহির হইতে সুশীল বলিল—ভিজে কাপড় পরে থাকবেন না যেন!

কদম শুনিল। বুকখানা দুলিয়া উঠিল।···খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর আকাশে কোথা হইতে একখানা বড় মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল···জ্যোৎস্না হইল মলিন-ম্লান।

নিশ্বাস ফেলিয়া কদম আসিয়া দাওয়ায় বসিল। বুকের কোন্ অতল গহন হইতে একরাশ অশ্রু আসিয়া তার দুই চোখে যেন প্লাবন বহাইয়া দিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্থায়ি-ভাবগুলির পর ব্যভিচারি-ভাবগুলির বর্ণনা মহর্ষি দিয়াছেন। 'ব্যভিচারী' এই নাম হইল কেন ?—ইহার উত্তর দিবার প্রসঙ্গে মহর্ষি 'ব্যভিচারী' পদটির ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। বি-অভি—এ দুইটি উপসর্গ। চর্-ধাতু গমনার্থক। রসসমূহে যাহারা বিবিধ প্রকারে অভিমুখ ভাবে চরণ করে (অর্থাৎ গমন করে) তাহারাই ব্যভিচারী। বাচিক-আঙ্গিক-সাত্ত্বিক (অভিনয়)-যুক্ত রস-সমূহকে প্রয়োগে লইয়া যায় বলিয়াই ইহাদিগের নাম ব্যভিচারী। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—ইহারা রসগুলিকে কি প্রকারে প্রয়োগে লইয়া যায়। উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, লোক-সিদ্ধান্ত এই যে—যে প্রকারে সূর্য্য এই দিন বা নক্ষত্রকে লইয়া যায়। বস্তুতঃ, সূর্য্য দুই হাতে কিংবা কাঁধে করিয়া দিন বা নক্ষত্রকে লইয়া যায় না ; তথাপি কিন্তু ইহা লোক-প্রসিদ্ধ যে—সূর্য্য এই দিন বা নক্ষত্রকে লইয়া যায়। ঠিক সেইরূপ ব্যভিচারি-ভাবগুলি রস-সমূহকে প্রয়োগে লইয়া যায় ১।

মহর্ষির বক্তব্য এই যে,—সূর্য্য-কর্ত্তৃক দিবস যেরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ রসের পূর্ণ-প্রয়োগ ব্যভিচারি-দ্বারাই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

ব্যভিচারি-ভাবের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। (১) নির্ব্বেদ-দারিদ্র্য-ব্যাধি-অবমান অধিক্ষেপ-আক্রোশন-ক্রোধ-তাড়ন-ইষ্টজন-বিয়োগ-তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি বিভাব হইতে সমুৎপন্ন। স্ত্রী-নীচপ্রকৃতি ও কুৎসিত প্রাণিগণ রোদন-দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-উচ্ছ্বাস-সম্প্রধারণাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে ২।

এ বিষয়ে সংগ্রহ-শ্লোক—দারিদ্র্য-ইষ্ট-বিয়োগাদি বিভাব হইতে নির্ব্বেদ জন্মে। সম্প্রধারণ-নিঃশ্বাসাদি-দ্বারা উহা অভিনেয়।

ইষ্টজনের বিয়োগে, দারিদ্র্য-বশতঃ, ব্যাধিহেতু, দুঃখ হইতে, অথবা পরের অভ্যুদয়-দর্শনে নির্ব্বেদ উৎপন্ন হয়।

নির্ব্বেদ-পরায়ণ পুরুষ বাষ্প-পরিপ্লুত নয়ন, সনিঃশ্বাস দীন মুখ-নেত্র ও যোগীর ন্যায় ধ্যান-পরায়ণ হইয়া থাকে ৩।

(২) গ্লানি—বমন, বিয়োগ, ব্যাধি, তপস্যা, নিয়ম, উপবাস, মনস্তাপাতিশয়, অতিশয় কাম, অতিশয় মদ্যসেবা, অতিরিক্ত ব্যায়াম, দূরপথ-গমন, ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বিচ্ছেদাদি বিভাব হইতে জাত। ক্ষীণ ব্যক্য, ক্লান্ত নয়ন, শীর্ণ কপোল, মন্দ পদক্ষেপ, কম্প, অনুৎসাহ, তনুতাপ্রাপ্ত দেহ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—বমন, বিয়োগ, ব্যাধি হইতে ও তপস্যা ও জরা দ্বারা গ্লানি জন্মে। কৃশতা, অল্পভ্রমণ-কম্পনাদি-দ্বারা উহা অভিনেয়।

অতি ক্ষীণ বাক্য, দীন-ভাব-সঞ্চারী নেত্র-বিকার, অঙ্গের শিথিল ভাব ইত্যাদির মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগে গ্লানি-ভাবের নির্দ্দেশ করা উচিত ৪।

---

(১) "ব্যভিচারিণ ইতি কস্মাৎ ? উচ্যতে—বি-অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ, চর ইতি গত্যর্থো ধাতুঃ। বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ। বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান, প্রয়োগে রসান্নয়ন্তীতি ব্যভিচারিণঃ। অত্রাহ—কথং নয়ন্তীতি ? উচ্যতে—লোকসিদ্ধান্ত এষ :—যথা সূর্য্যঃ ইদং দিনং নক্ষত্রং বা নয়তীতি। ন চ তেন বাহুভ্যাং স্কন্ধেন বা নীয়তে। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধমেতদ্ যথেদং সূর্য্যো নক্ষত্রং দিনং বা নয়তীতি। এবমেতে প্রয়োগং নয়ন্তীতি ব্যভিচারিণ ইত্যবগন্তব্যা নাম"—নাঃ শাঃ (বরোদা সং), পৃ পৃঃ ৩৫৬—৫৭

("ব্যভিচারিণ ইতি কস্মাদুচ্যন্তে ?···চর গতৌ ধাতুঃ। ধাত্বর্থ-বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ বিবিধমভিমুখেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ। চরন্তি নয়ন্তীত্যর্থঃ। কথং নয়ন্তি ?—যথা সূর্য্য ইদং নক্ষত্রমমুং বাসরং নয়তীতি। ন চ তেন···কিন্তু লোক-প্রসিদ্ধমেতৎ। যথায়ং সূর্য্যো নক্ষত্রমিদং বা নয়তীতি এবমেতে ব্যভিচারিণ ইত্যবগন্তব্যাঃ" —কাশী সং, পৃঃ ৮৪)

(২) "তত্র নির্ব্বেদো নাম—দারিদ্র্যব্যাধ্যবমানা (ন্যোপগমা ; বিক্ষেপাক্রুষ্ট (কৃষ্ট) ক্রোধতাড়নেষ্ট-জনবিয়োগতত্ত্বজ্ঞানাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। স্ত্রীনীচকুসত্ত্বানাং (স্ত্রী-নীচপ্রকৃতীনাং তমভিনয়েৎ—কাশী), রুদিতনিঃশ্বসিতোচ্ছ্বাসিত--সম্প্রধারণাদিভিরনুভাবৈস্তমভিনয়েৎ"——নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৭। অধিক্ষেপ—তিরস্কার, গাল দেওয়া। আক্রুষ্ট—আক্রোশন, উচ্চ স্বরে নাম ধরিয়া আহ্বান। আকৃষ্ট—আকর্ষণ। কুসত্ত্ব—কুৎসিত প্রাণী। সম্প্রধারণ—বিচার, বিবেচনা, হিতাহিত-বিবেক।

(৩) "দারিদ্র্যেষ্টবিয়োগাদ্যৈর্নির্ব্বেদো নাম জায়তে।
সম্প্রধারণনিশ্বাসৈস্তস্য ত্বভিনয়ো ভবেৎ" ॥ ৫৪ ॥

"অত্রানুবংশ্যে আর্য্যে ভবতঃ—
ইষ্টজনস্য বিয়োগাদ্দারিদ্র্যাদ্ব্যাধিতস্তথা দুঃখাৎ।
ঋদ্ধিং পরস্য দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদো নাম সম্ভবতি" ॥ ৪৬ ॥
বাষ্পপরিপ্লুতনয়নঃ পুনশ্চ নিঃশ্বাসদীনমুখনেত্রঃ।
যোগীব ধ্যানপরো ভবতি হি নির্ব্বেদবান্ পুরুষঃ" ॥ ৪৭ ॥
—নাঃ শাঃ, পৃ পৃঃ, ৩৫৭-৫৮,

দারিদ্র্যেষ্টবিয়োগৈশ্চ···········ইষ্টজনবিপ্রয়োগাদ্···········
পরবৃদ্ধিং বা দৃষ্ট্বা··························নিশ্বাসদীর্ঘমুখনেত্রঃ :
—কাশী সং, পৃপৃঃ ৮৪-৮৫

(৪) গ্লানির্নাম—বান্তবিরিক্তব্যাধিতপোনিয়মোপবাসমনস্তাপাতিশয়মদনমদ্যসেবনাতিব্যায়ামাধ্বগমনক্ষুৎ-পিপাসা-নিদ্রাচ্ছেদাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে (বান্তবিরিক্তব্যাধিতভগ্নো·········মনস্তাপাতি-

(৩) শঙ্কা—সন্দেহাত্মিকা—স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতি-সম্ভূতা। চৌর্য্য-অভিগ্রহ-রাজসমীপে কৃত অপরাধ-পাপকর্ম্ম-করণ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। মুহুর্মুহুঃ অবলোকন, অবকুণ্ঠন, মুখশোষ, জিহ্বা-পরিলেহন, মুখ-বৈবর্ণ্য, স্বরভেদ বেপথু, শুষ্কোষ্ঠ-কণ্ঠ, আয়াস (অবসাদ) ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ৫।

এ প্রসঙ্গে সংগ্রহ-শ্লোক—চৌর্য্যাদি-জনিতা শঙ্কা প্রায়ই ভয়ানক-রসে প্রদর্শন-যোগ্য। আর প্রিয়-ব্যলীক-জনিতা শঙ্কা শৃঙ্গাররসে প্রযোজ্য।

এই শঙ্কা-ভাব-প্রদর্শন-স্থলে আকার-সংবরণ কাহারও কাহারও অভিপ্রেত। উহা কুশল উপাধি ও ইঙ্গিত-সমূহ-দ্বারা উপলক্ষণীয় ৬।

এই প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

শঙ্কা দ্বিবিধা—(১) আত্ম-সমুত্থা ও (২) পর-সমুত্থা। আত্ম-সমুত্থা শঙ্কা দৃষ্টি-চেষ্টাদি-দ্বারা জ্ঞেয়।

শঙ্কিত পুরুষ—অল্প কম্পমান অঙ্গবিশিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করে, উহার জিহ্বা (তালুতে) আটকাইয়া যায় ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ৭।

(৪) অসূয়া—নানাবিধ অপরাধ-দ্বেষ-পরকীয় ঐশ্বর্য্য-সৌভাগ্য-মেধা-বিদ্যা-লীলা ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। লোকসমাজে দোষ-খ্যাপন, গুণের উপঘাত, ঈর্ষ্যা-চক্ষুঃপ্রদান, অধোমুখভাবে অবস্থান, ভ্রুকুটী, কার্য্যের অবজ্ঞা, কুৎসা-করণ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

পরের সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, মেধা, লীলা, অভ্যুদয় ইত্যাদি দর্শনে অসূয়ার উদ্রেক হয়। আর যে অপরাধ করে (অথবা যাহার নিকট অপরে কোন অপরাধ করে), তাহারও অসূয়া জন্মে।

ভ্রুকুটী-কুটিল উৎকট মুখ, ঈর্ষ্যা ও ক্রোধে আবর্ত্তিত নেত্র, গুণনাশী বিদ্বেষ ইত্যাদি দ্বারা উহা অভিনেয় ৮।

পানমদ্যসেবাতিব্যায়াম······—কাশী। তস্যাঃ ক্ষামবাক্যনয়ন-কপোলোদরমন্দপদোৎক্ষেপণ-বেপনানুৎসাহতনুগাত্র-বৈবর্ণ্যস্বরভেদাদিভি-রনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ) ·········কপোলমন্দপদোপরমানুৎ-সাহ——কাশী)

অত্রার্য্যে ভবতঃ—

বান্তবিরিক্তব্যাধিষু তপসা জরসা চ জায়তে গ্লানিঃ।
(বাতবিরক্ত— — — কাশী)
কার্শ্যেন সাভিনেয়া মন্দভ্রমণেন কম্পেন। ৪৯।
(মন্দক্রমণামুকম্পেন—কাশী)
গদিতৈঃ ক্ষামক্ষামৈর্নেত্রবিকারৈশ্চ দীনসঞ্চারৈঃ।
শ্লথভাবেনাঙ্গানাং মুহুর্মুহুর্নির্দিশেদ্ গ্লানিম্। ৫০।
(শ্লথভাবাচ্চাঙ্গানাং— কাশী) —নাঃ শাঃ পৃঃ ৩৫৮

বান্ত—বমন। বিরিক্ত—বিয়োগ, বিরহ, পৃথগ্ ভাব, নিয়ম—তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম। নিদ্রাচ্ছেদ—অনিদ্রা। গদিত—উক্তি।

(৫) "শঙ্কা নাম—সন্দেহাত্মিকা স্ত্রীনীচপ্রভবা। চৌর্য্যা-ভিগ্রহণনৃপাপরাধপাপকর্ম্মকরণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে (শঙ্কা নাম চৌর্য্যাভিগ্রহণ·········সমুৎপদ্যতে সন্দেহাত্মিকা স্ত্রীনীচানাম্)। তস্যা মুহুর্মুহুরবলোকনাবকুণ্ঠনমুখশোষণজিহ্বা-পরিলেহনমুখ-বৈবর্ণ্য-স্বর-ভেদবেপথুশুষ্কোষ্ঠকণ্ঠায়াসসাধর্ম্ম্যাদিভি (-কণ্ঠাবসাদাদিভি) রনুভাবৈর-ভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্যঃ (সা চ·········অভিনীয়তে)।—নাঃ শাঃ, পৃ পৃঃ—৩৫৮—৫৯

অভিগ্রহ—অপহরণ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ, আক্রমণ। অবকুণ্ঠন—আবরণ করা, ঘিরিয়া ফেলা।

(৬) "চৌর্য্যাদিজনিতা শঙ্কা প্রায়ঃ কার্য্যা ভয়ানকে।
প্রিয়ব্যলীকজনিতা তথা শৃঙ্গারিণী মতা। ৫২।
অত্রাকারসংবরমভীচ্ছন্তীতি কেচিৎ। তচ্চ কুশলৈরুপাধিভিরিঙ্গিতৈ-রুপলক্ষ্যম্ (তত্রাকারসংবরণমপি কেচিদিচ্ছন্তি······কাশী)
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৯

ব্যলীক—মিথ্যা, অপ্রিয়, শোকদায়ক, কষ্টকর, দোষ, অপরাধ, অকার্য্য, প্রতারণা। আকার-সংবরণ—নিজের আকৃতি লুকাইয়া ফেলা (ছদ্মবেশাদি-দ্বারা)। কুশল—নিপুণ, উপাধি—ছল, মিথ্যা, ছদ্মবেশ, তাৎপর্য্য এই যে—অতি নিপুণ ছদ্মবেশ-দ্বারা বাহ্য আকার গোপন করা সম্ভব। ইঙ্গিত—হৃদগত ভাব। হৃদগত ভাব-সমূহের নিপুণ প্রদর্শন-কৌশলে বাহ্য আকার গোপন করা যায়।

(৭) দ্বিবিধা শঙ্কা কার্য্যা হ্যাত্মসমুত্থা চ পরসমুত্থা চ।
যা তত্রাত্মসমুত্থা সা জ্ঞেয়া দৃষ্টিচেষ্টাভিঃ। ৫৪।
কিঞ্চিৎ প্রবেপিতাঙ্গস্ত্বধোমুখো (মুহুর্মুহুঃ) বীক্ষতে চ পার্শ্বানি।
গুরুসজ্জমানজিহ্বঃ শ্যাবাস্যঃ (শ্যামাস্য) শঙ্কিতঃ পুরুষঃ। ৫৫। —নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৯

গুরুসজ্জমানজিহ্ব :—যাহার জিহ্বা খুব বেশী আটকাইয়া গিয়াছে। শ্যাব—ধূম্রবর্ণ, ধূসর, পিঙ্গল, কৃষ্ণাভ।

(৮) "অসূয়া নাম—নানাপরাধদ্বেষপরৈশ্বর্য্যসৌভাগ্যমেধাবিদ্যা-লীলাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাশ্চ পরিষদি দোষপ্রখ্যাপন-গুণোপঘাতের্ষ্যাচক্ষুঃপ্রদানাধোমুখভ্রুকুটীক্রিয়াবজ্ঞানকুৎসনাদিভিরনুভাবৈ-রভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

অত্রার্য্যে ভবতঃ—

পরসৌভাগ্যেশ্বরতামেধালীলাসমুচ্ছ্রয়ান্ দৃষ্ট্বা।
উৎপদ্যতে হ্যসূয়া কৃতাপরাধো ভবেদ্ যশ্চ। ৫৭।
ভ্রুকুটিকুটিলোৎকটমুখৈঃ সের্ষ্যাক্রোধপরিবৃত্তনেত্রৈশ্চ
(বক্ত্রাদ্যৈঃ—কাশী)
গুণনাশনবিদ্বেষৈস্তত্রাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ৫৮।
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৫৯—৬০

পরে অপরাধ করিলে তাহার উপর অসূয়া জন্মে। আবার পরের নিকট অপরাধ করিলেও সেই অপরাধ গোপনের উদ্দেশ্যে অপরাধী অপর পক্ষের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে। দ্বেষ—অপকার-জনিত। পরের প্রভুত্ব, সম্পত্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, কলাজ্ঞান প্রভৃতি দর্শনে

(৫) মদ—মদ্য-সেবায় উৎপন্ন হয়। উহা ত্রিপ্রকার ও উহার বিভাব (উৎপত্তি-হেতু) পঞ্চবিধ।

এ প্রসঙ্গে নয়টি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

মদ ত্রিপ্রকার—(১) তরুণ, (২) মধ্য ও (৩) অবকৃষ্ট ৯।

উহার করণ (অর্থাৎ অভিব্যক্তি-ক্রিয়া) পঞ্চবিধ। যে যে পঞ্চবিধ ক্রিয়া-দ্বারা অভিনয়ে উহার অভিব্যক্তি করা যায়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) কোন কোন প্রকৃতির মত্ত গান করে, (২) অপর এক জাতীয় মত্ত রোদন করে, (৩) তৃতীয় প্রকার মত্ত হাসিয়া থাকে, (৪) চতুর্থ মত্ত পরুষ-বাক্য বলে ও (৫) পঞ্চম শ্রেণীর মত্ত শুইয়া ঘুমায়।

(ক) উত্তম-প্রকৃতি মত্ত শয়ন করিয়া থাকে ;

(খ) মধ্যম-প্রকৃতি মত্ত হাসে ও গান গায় ; আর

(গ) অধম-প্রকৃতি মত্ত পরুষ-বাক্য বলে ও রোদন করিয়া থাকে। স্মিত-বদন, মধুর-রাগ, হৃষ্ট তনু, কিঞ্চিৎ আকুলিত বাক্য, সুকুমার-আবিদ্ধ-গতি-যুক্ত, উত্তম-প্রকৃতি তরুণ মদ প্রকাশ করে।

স্খলিত-আঘূর্ণিত-নয়ন, ত্রস্ত ব্যাকুলিত বাহু বিক্ষেপ-যুক্ত, কুটিল-ব্যাবিদ্ধ-গতি-যুক্ত, মধ্যম-প্রকৃতি (মধ্য) মদ প্রকাশ করে।

নষ্ট-স্মৃতি, হত-গতি, ছর্দ্দি-হিক্কা-কফ-দ্বারা অত্যন্ত বীভৎস, দৃঢ়-সংসক্ত-জিহ্বা-যুক্ত অধম-প্রকৃতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া থাকে। (এই প্রকারে অধম-প্রকৃতি অবকৃষ্ট মদ প্রকাশ করে।)

রঙ্গমঞ্চোপরি মদ্য-পানের অভিনয় প্রদর্শিত হইলে ক্রমশঃ মদ-বৃদ্ধি নাট্যের উপযোগানুসারে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আর যদি (নট) মদ্যপান করিয়া রঙ্গে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে (অভিনয় যত অগ্রসর হইতে থাকিবে) ততই মদক্ষয় প্রদর্শনীয় ১০।

মদ-প্রণাশের যথাযথ কারণ তত্ত্বাভিজ্ঞগণ নিম্নলিখিত ক্রমানুযায়ী বিবৃত করিয়া থাকেন—সন্ত্রাস, শোক, ভয়, প্রহর্ষ হইতে কারণানুগত মদ-নাশ হইয়া থাকে। অথবা উৎক্রমণ-পূর্ব্বকও মদনাশ কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ভাবসমূহ-দ্বারা মদ দ্রুত প্রণষ্ট হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত, যথা—অভ্যুদয়-সূচক ও সুখ-কর বাক্য-দ্বারা শোক নষ্ট হয় ১১।

(৬) শ্রম—পথ-গমন-ব্যায়াম-সেবনাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। গাত্র-মর্দ্দন-সংবাহন-দীর্ঘশ্বাস-জৃম্ভণ-মন্দ-পদক্ষেপ নয়ন-বদন-বিকূণনসীৎকারাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য। এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

নৃত্ত-পথ-গমন-ব্যায়ামাদি হইতে মানবের শ্রম-ভাব জন্মে। ঘন-নিশ্বাস-পতন খেদ-প্রাপ্তি ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় ১২।

অসূয়ার উদ্ভব। গুণোপঘাত—গুণকে মারিয়া ফেলা ; গুণগুলি চাপা দেওয়া। চক্ষুঃপ্রদান—চোখ মটকান—এই প্রকার চক্ষুর ক্রিয়া-দ্বারাও অসূয়া প্রদর্শন করা হয়। অধোমুখ—অপরের গুণ-বর্ণনা শুনিয়া মুখ নীচু করিয়াও অসূয়া দেখান হয়। ক্রিয়াবজ্ঞান—অপরের সাধু কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনও অসূয়া প্রদর্শনের উপায়। গুণনাশন—গুণোপঘাত।

(৯) "মদো নাম মদ্যোপযোগাদুৎপদ্যতে। স চ ত্রিবিধঃ পঞ্চবিভাবশ্চ (পঞ্চবিধভাবশ্চ—কাশী)।

অত্রার্য্যা ভবন্তি—

(ত্রিবিধস্তু মদঃ কার্য্যঃ—কাশী) "জ্ঞেয়স্তু মদস্ত্রিবিধস্তরুণো মধ্যস্তথাবকৃষ্টশ্চ।

করণং পঞ্চবিধং স্যাৎ তস্যাভিনয়ঃ প্রবোক্তব্যঃ" ।৬০।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬০

(১০) "কশ্চিন্মত্তো গায়তি রোদিতি কশ্চিত্তথা হসতি কশ্চিৎ।
পরুষবচনাভিধায়ী কশ্চিৎ কশ্চিত্তথা স্বপিতি ।৬১।

উত্তমসত্ত্বঃ শেতে হসতি চ গায়তি চ মধ্যমপ্রকৃতিঃ।
পরুষবচনাভিধায়ী রোদিত্যপি চাধমপ্রকৃতিঃ ।৬২।
স্মিতবদ(চ)নমধুররাগো হৃ(হৃ)ষ্টতনুঃ কিঞ্চিদাকুলিতবাক্যঃ।
সুকুমারাবিদ্ধগতিস্তরুণমদস্তূত্তমপ্রকৃতিঃ ।৬৩।
স্খলিতাঘূর্ণিতনয়নঃ স্রস্তব্যাকুলিতবাহুবিক্ষেপঃ।
কুটিলব্যাবিদ্ধগতির্ভবতি মদো (মধ্যমদো—কাশী) মধ্যমপ্রকৃতিঃ।৬৪
নষ্টস্মৃতির্হতগতিশ্ছর্দ্দিতহিক্কাকফৈঃ সুবীভৎসঃ।
গুরুসজ্জমানজিহ্বো নিষ্ঠীবতি চাধমপ্রকৃতিঃ ।৬৫।
রঙ্গে পিবতঃ কার্য্যা মদবৃদ্ধির্নাট্যযোগমাসাদ্য।
কার্য্যো মদক্ষয়ো বৈ যঃ খলু পীত্বা প্রবিষ্টঃ স্যাৎ" ।৬৫।

—নাঃ শাঃ, পৃ পৃঃ ৩৬০-৬১

বাঙ্গালা ভাষায় চলিত একটি কথা আছে—মাতালের তিন ভাব—(১) তোতা (বক্তার, খুব কথা বলে—পরুষবচনাভিধায়ী), (২) প্যাঁচা (গম্ভীর—'রোদিতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য কিছু করা যায়), ও (৩) কুম্ভকর্ণ (স্বপিতি—নিদ্রামগ্ন)। সুকুমার ও আবিদ্ধ—নাটকাশ্রিত প্রয়োগ দ্বিবিধ—সুকুমার ও আবিদ্ধ ["প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ। সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ" ।৫১। বরোদা সং ১৩শ অঃ, কাশী (১৪।৫৭)।] এস্থলে 'সুকুমার' বলিতে মোটামুটি বুঝায় 'মৃদু' আর 'আবিদ্ধ'—উদ্ধত। ব্যাবিদ্ধ—বিশেষভাবে আবিদ্ধ (উদ্ধত)। ছর্দ্দি (ত) বমন। গুরুসজ্জমানজিহ্বঃ—যাহার জিহ্বা তালুতে খুব দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া গিয়াছে। অবকৃষ্ট মদের লক্ষণ স্পষ্ট না বলা হইলেও উহা অধমপ্রকৃতির বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(১১) "সন্ত্রাসাচ্ছোকাদ্বা ভয়াৎ প্রহর্ষাচ্চ কারণোপগতঃ।
(ভয়প্রকর্ষাৎ—কাশী)
উৎক্রম্যাপি (উদ্যম্যাপি) হি কার্য্যো মদপ্রণাশঃ ক্রমাত্তজ্জ্ঞৈঃ ।৬৭। এভির্ভাববিশেষৈর্মদো দ্রুতং সম্প্রণাশমুপযাতি। অভ্যুদয়-সুখৈর্বাক্যৈর্যথৈব শোকাঃ ক্ষয়ং যান্তি (স্তথৈব শোকঃ ক্ষয়ং যাতি)"
।৬৮।—নাঃ শাঃ পৃঃ ৩৬১

কারণোপগতঃ—কারণানুযায়ী (মদপ্রণাশের বিশেষণ)। উৎক্রম্য—লম্ফ দিয়া (পাঠান্তর—উদ্যম্য—উদ্যম প্রদর্শন-দ্বারাও মদ-নাশ হয়।)

(১২) "শ্রমো নাম—অধ্ব (গতি) ব্যায়ামসেবনাদিভির্বিভাবৈঃ

(৭) আলস্য—খেদ-ব্যাধি-গর্ভধারণ-শ্রম-তৃপ্তি ইত্যাদি বিভাব হইতে সমুৎপন্ন। অথবা স্বভাব হইতেও আলস্য জন্মে (অর্থাৎ স্বভাবতঃ আলস্যশীল ব্যক্তিও দৃষ্ট হয়)। ইহা সাধারণতঃ স্ত্রী-নীচপ্রকৃতিক। সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অনভিলাষ, শয়ন, উপবেশন, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে আর্য্যা—

খেদ-জনিত অথবা স্বভাবজ—এই দুই প্রকার আলস্য একমাত্র আহার ব্যতীত অন্য কর্ম্মের অনারম্ভ-দ্বারা অভিনেয় ১৩।

(৮) দৈন্য—দুর্গতি-মনস্তাপাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। অধৃতি, শিরোরোগ, গাত্রের গুরুতা, অন্যমনস্কতা, মার্জ্জনা-ত্যাগ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয়। এ প্রসঙ্গে আর্য্যা—দুঃখহেতু চিন্তা ও ঔৎসুক্য হইতে নরের দীনতা জন্মে। সর্ব্ববিধ-মার্জ্জন-পরিত্যাগ-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য ১৪।

(৯) চিন্তা—ঐশ্বর্য্য-ভ্রংশ, ইষ্ট দ্রব্যের অপহরণ, দারিদ্র্যাদি বিভাব হইতে জাত। নিঃশ্বাস-উচ্ছ্বাস-সন্তাপ-ধ্যান অধোমুখে চিন্তা-কৃশতা ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ ক্ষেত্রে দুইটি আর্য্যা উল্লিখিত হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যভ্রংশ ও অভীষ্ট দ্রব্য-ক্ষয় জনিতা বহু প্রকারা চিন্তা মানবের হৃদয়-বিতর্কানুসাধিনী হইয়া থাকে।

উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, শূন্য-হৃদয়হেতু সন্তাপ, মার্জ্জনা-বর্জ্জন ও অধৈর্য্য দ্বারা ইহা অভিনেয় ১৫। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

---

(১২) "শ্রমো নাম—...সমুৎপদ্যতে। তস্য গাত্রপরিমর্দ্দনসংবাহন-নিঃশ্বসিতবিজৃম্ভিতমন্দপদোৎক্ষেপণনয়ন-বদন-বিকূণন (নয়নবিঘূর্ণন) সীৎকারাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

অত্রার্য্যা—

"নৃত্যাধ্বব্যায়ামান্নরস্য (অধ্বগতিব্যায়ামৈর্নরস্য) সঞ্জায়তে শ্রমো নাম।

নিঃশ্বাসখেদগমনৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ" । ১০ । নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬১

গাত্রসংবাহন—গা-টেপা। বিকূণন—সঙ্কোচন। সীৎকার—মুখের সী-সী শব্দ। বিজৃম্ভিত—হাইতোলা।

(১৩) "আলস্যং নাম—খেদব্যাধিগর্ভস্বভাবশ্রম-সৌহিত্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে [স্ত্রীনীচানাম্। তদভিনয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানভিলাষশয়নাসন-নিদ্রাতন্দ্রী-সেবনাদিভিরনুভাবৈঃ (সর্ব্বকর্ম্মপ্রদ্বেষ—কাশী)। অত্রার্য্যা—

"আলস্যং ত্বভিনেয়ং খেদোপগতং স্বভাবজম্ (খেদব্যাধিস্বভাবজং) চাপি।

আহারবর্জ্জিতানামারম্ভাণামনারম্ভাৎ" । ১২ ।—না-শাঃ, পৃঃ ৩৬২

সৌহিত্য—তৃপ্তি।

(১৪) "দৈন্যং নাম—দৌর্গত্যমনস্তাপাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাধৃতিশিরোরোগগাত্রগৌরবান্যমনস্কতা (গাত্রস্তম্ভমনঃস্তম্ভ) মৃজা-পরিবর্জ্জনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

অত্রার্য্যা—

"চিন্তৌৎসুক্যসমুত্থা (দ্) দুঃখাদ্ যা (বা) দীনতা ভবেৎ পুংসাম্।

সর্ব্বমৃজাপরিমার্জ্জনজৈর্বিবিধৈরভিনয়স্তস্য" । ১৪ ।

(সর্ব্বমৃজাপরিহারৈর্বিবিধোঽভিনয়ো ভবেত্তস্য)—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৩

মৃজা—মার্জ্জন, পরিষ্করণ।

(১৫) "চিন্তা নাম—ঐশ্বর্য্যভ্রংশেষ্টদ্রব্যাপহারদারিদ্র্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাভিনয়ো নিঃশ্বসিতোচ্ছ্বসিতসন্তাপধ্যানাধোমুখচিন্তন-কার্শ্যাদিভিরনুভাবৈঃ।

অত্রার্য্যে ভবতঃ—ঐশ্বর্য্যভ্রংশেষ্টদ্রব্যক্ষয়জা বহুপ্রকারা তু।

হৃদয়বিতর্কোপগতা চিন্তা নৃণাং সম্ভবতি । ১৬ ।

সোচ্ছ্বাসৈর্নিঃশ্বসিতৈঃ সন্তাপৈশ্চৈব হৃদয়শূন্যতয়া।

অভিনেতব্যা চিন্তা মৃজাবিহীনৈরধৃত্যা চ" । ১৭ ।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৩

মানসী

আবেশ-বিহ্বল আঁখি-তারা ঢল-ঢল, অধরে স্ফুরে কার হাসি রে!
শান্তিময়ী হৃদি নির্ম্মল চিত্ত-শোভা দর্শন-আশে আমি আসি রে।
রক্তিম সিন্দুর-দীপ্ত ললাট-তট,
উন্নত[illegible]দি-শোভা কুন্তল লট-পট,
যৌবন-[illegible]ল নয়নের সঙ্গী,
চঞ্চল চরণে নৃত্যের ভঙ্গী,
[illegible] মধু নূপুর নিক্কনে সুধা-রসে আমি ভাসি রে।
অমৃত-[illegible]র সিঞ্চিত হৃদি-সরে মুঞ্জরিত প্রেম-কমল রে,
[illegible] লোভে গুঞ্জিত, অলিকুলে ভুঞ্জিত বিকসিত শোভা কার অমল রে।
স্বর্গীয় সুষমায় মোহন সে দীপ্তি,
সুকোমল করতল পরশে যে তৃপ্তি,
মধুময় ইঙ্গিতে কুঞ্চ ভ্রূভঙ্গ,
লোভনীয় যৌবন মধুর সে সঙ্গ,
অঙ্গের ভঙ্গীতে মধুময় সঙ্গীত বিকসিত প্রেম-শতদল রে।
চিন্তনে স্মৃতি কার বেদনা-বিস্মৃতি শান্তি-সুধা-রস-সিন্ধু রে।
দর্শনে অন্তর হর্ষ-পুলকিত আনন স্নিগ্ধ সে ইন্দু রে।
অধর-চুম্বনে আবেশ-বিহ্বল,
যৌবন-রসাবেশে হৃদয় ঢল-ঢল,
লুণ্ঠিত দেহ-লতা সুবিশাল বক্ষে,
তৃপ্তি-ভরা তার মধুর কটাক্ষে,
মনোহর দুর্জ্জয় মান-বিলাসিনী মনোহর আঁখিজল-বিন্দু রে।
নন্দিত অন্তরে মনোময়ী মানসী অনন্ত কাল রহে জাগি রে,
স্বপ্নে ভ্রমে মম স্বপ্নানুরাগিণী অনন্ত প্রেম-সুধা মাগি রে!
কমনীয় পেলব অঙ্গের স্পর্শে
উজ্জ্বল শিরা-রস অসীম হর্ষে,
অনুভূতি লভে সুখে অন্তর-আত্মা,
অরূপ সীমাহীন জ্যোতিঃ পরমাত্মা,
পূর্ণ করি হৃদি অনন্ত প্রেম-দানে করে মহাপ্রেম-ত্যাগী রে।

শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

ইটালীতে মন্থরগতি—

রোমের দক্ষিণে আন্‌জিও অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের অভিযানের ফল আশানুরূপ হয় নাই। জার্ম্মাণ সেনাপতি কেসারলিং এই অঞ্চলে প্রতিপক্ষের অগ্রগতি নিবারণের জন্য তিন বার প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ চালাইয়াছেন। এই সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সম্মিলিত পক্ষের সেনা এখানে তিষ্ঠিয়া আছে বটে; কিন্তু তাহাদিগের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইটালীর পশ্চিম উপকূল ধরিয়া ৫ম বাহিনীর প্রধান অংশ ক্যাসিনো পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ স্থান এখনও তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হয় নাই। আন্‌জিও ও ক্যাসিনো অঞ্চলে অবস্থিত সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী এখনও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। আন্‌জিও অঞ্চলে যখন জার্ম্মাণ সেনার প্রবল আঘাত পতিত হইতেছিল, সেই সময় ক্যাসিনোয় আক্রমণের প্রাবল্য বর্দ্ধিত করিয়া এই দুইটি সেনাবাহিনীকে সংযুক্ত করিবার প্রয়াস হয়; কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয় নাই। ইটালীর পূর্ব্ব উপকূলে আর্সোগ্‌নার উত্তর-পূর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষের অষ্টম বাহিনীর তৎপরতা গুরুত্বহীন।

সংক্ষেপে, গত এক মাসে ইটালীর রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের সেনা টিকিয়া আছে মাত্র; তাহারা কোথাও আপনাদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত করিতে পারে নাই।

গত অক্টোবর মাসে নেপলস্ অধিকৃত হইবার পর হইতেই ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ইহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত মন্দ আবহাওয়ায় দুর্গম পার্ব্বত্য দেশে যুদ্ধ করিতে হইতেছে; নদীগুলিও সৈন্যদিগের অগ্রগতিতে বিশেষ বাধা দিতেছে। আন্‌জিও অঞ্চলে জার্ম্মাণদিগের এই প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ যে তাঁহাদিগের অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহা মিঃ চার্চ্চিল স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—ষ্ট্যালিনগ্রাডে, নীপার বাঁকে ও টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণী যেরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, রোম রক্ষার জন্যও সে সেইরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করিবে বলিয়া মনে হয়। জার্ম্মাণী না কি অকস্মাৎ ফ্রান্স, যুগোশ্লেভিয়া ও উত্তর-ইটালী হইতে অতিরিক্ত ৭ ডিভিসন সৈন্য এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন—ইটালীতে জার্ম্মাণীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধের উপযোগী সমরায়োজন উত্তর-আফ্রিকায় আছে; বসন্ত কালে আবহাওয়ার অবস্থা উন্নত হইলে যুদ্ধের অবস্থাও উন্নত হইবে। সেনাপতি আলেকজেণ্ডারের উপর মিঃ চার্চ্চিলের বিশ্বাস অগাধ।

ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের এই অপ্রত্যাশিত বিলম্বে তাহাদিগের প্রতিশ্রুত য়ুরোপ-অভিযানে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা। তেহরাণ সম্মিলনীর পর ঘোষিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে জার্ম্মাণীকে প্রবল আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশ্য; অর্থাৎ দক্ষিণ-য়ুরোপে ব্যাপক যুদ্ধও তাঁহাদিগের জার্ম্মাণ-বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হইবে। দক্ষিণ-য়ুরোপে ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইটালীতে শত্রুকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করা একান্ত প্রয়োজন। ইটালীয় উপদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট কীলককে ভিত্তি করিয়াই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আক্রমণ প্রসারিত হইবে। কিন্তু এই কীলক প্রয়োজনানুরূপ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

ইটালীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দক্ষিণ-য়ুরোপের সামরিক ঘাঁটীরূপে ইটালীর গুরুত্ব জার্ম্মাণী বুঝে; রোম এই ইটালীর প্রাণকেন্দ্র। কাজেই, রোম রক্ষার জন্য জার্ম্মাণী যে যথাশক্তি চেষ্টা করিবে, ইহা অনুমান করা বৃটিশ সমর-নায়কদিগের উচিত ছিল। রোম অধিকৃত হইলে সমগ্র ইটালীতে উহার প্রবল নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে; একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটীও জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হইবে।

ইঙ্গ-তুর্কি মতদ্বৈধ—

বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের সহিত তুর্কি সামরিক কর্ম্মচারীদিগের আলোচনা চলিতেছিল; পাঁচ সপ্তাহ কাল আলোচনা চলিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে অকস্মাৎ আলোচনা-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার পর প্রকাশ পাইয়াছে যে, মধ্য-প্রাচী হইতে তুরস্কে সমরোপকরণ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে। এই সময় তুরস্কের প্রধান-মন্ত্রী মঃ সারাজগলু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সম্মিলিত পক্ষে যোগদান করিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত; প্রয়োজনানুরূপ সমরোপকরণ লাভ করিলেই তাঁহারা যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন—এই আশ্বাস বৃটেন ও আমেরিকাকে দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত এই মর্ম্মে চুক্তি করিয়াছিল যে, ভূমধ্যসাগরে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সে চুক্তিবদ্ধ অন্য পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুরস্কের এই চুক্তি পালনের কথা এখন উঠিয়াছে। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণায় ভূমধ্যসাগর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখনই তুরস্কের এই চুক্তি পালন করা উচিত ছিল। ঐ বৎসর শীতকালে ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস্ আক্রমণের সময়েও তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; অথচ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিতে সে গ্রীসকে রক্ষার জন্যও বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ইহার পর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর সহিত তুরস্ক অনাক্রমণ-চুক্তি করে। এইভাবে তুরস্ক এত দিন দুই দিক রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; যুদ্ধে কোন্ পক্ষের বিজয় হইবে, তাহা অনিশ্চিত থাকায় সে কোনও পক্ষের সহিতই নিজ ভাগ্য গ্রথিত করে নাই। কিন্তু এখন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সম্মিলিত পক্ষের বিজয়ের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। এই জন্য সম্মিলিত পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ বৈঠকে বসিতে অধিকারী হইবার জন্য তুরস্ক এখন ব্যগ্র। ইহাই তুরস্কের প্রকৃত মনোভাব; ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তি পালনের আগ্রহ ইহা নহে, সে চুক্তির দায়িত্ব সে ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার এড়াইয়া আসিয়াছে।

তুরস্ক সম্মিলিত পক্ষের সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত থাকিলেও ইঙ্গ-তুর্কি আলোচনা ব্যর্থ হইল কেন? ইহার

কারণ, সম্মিলিত পক্ষ যে ভাবে এবং যত দূর তুরস্কের সহযোগিতা আশা করিতেছিলেন. তুরস্ক সে ভাবে এবং তত দূর সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে। তুরস্ক মনে করে—বর্ত্তমানে ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণী সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এখনও জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি প্রবল; কাজেই, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবামাত্র জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত তুরস্ককে সহ্য করিতে হইবে। এই জন্যই সে সম্মিলিত পক্ষকে আশানুরূপ সহযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সম্মিলিত পক্ষ এখনও গ্রীস্ ও যুগোশ্লেভিয়ায় গরিলা প্রতিরোধের সমন্বয় সাধন করিয়া বল্‌কানে বিরাট রণক্ষেত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই; ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থাও উৎসাহজনক নহে।

তুরস্কে সম্মিলিত পক্ষের সমরোপকরণ প্রেরণ বন্ধ হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মতদ্বৈধ অত্যন্ত প্রবল। ইহা দূর হইবার সম্ভাবনা অল্প; অন্ততঃ সম্মিলিত পক্ষ ইহা দূর হইবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। দক্ষিণ-য়ুরোপে জার্ম্মাণ-বিরোধী অভিযানের পক্ষে ইহা দ্বিতীয় বাধা। তুরস্ক যদি সম্মিলিত পক্ষে যোগ দিত, তাহা হইলে তাঁহারা অতি সত্বর বলকানে ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। ইটালীতে যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক গতিতে এবং তুরস্কের সহিত সম্মিলিত পক্ষের এই মতবিরোধে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির য়ুরোপ অভিযান সম্পর্কে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

চার্চ্চিলের সমর-সমালোচনা—

তেহরাণ-সম্মিলনীর পর মিঃ চার্চ্চিল অসুস্থ হইয়া পড়েন; সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। অথচ, ইতোমধ্যে য়ুরোপীয় রাজনীতিতে নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতেছিল। পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লেভিয়ায় রাজনীতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়; ইটালীয় রাজনীতির ব্যবস্থা সম্পর্কে মতবিরোধ ঘটে। বৃটিশ রাজনীতিকদের সহিত জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব রিবেন্‌ট্রপের গোপন আলোচনার জনরব উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। এই সকল বিষয়ে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর বক্তব্য শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার এই প্রত্যাশিত বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতা শ্রবণে বহু উৎকণ্ঠা ও সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে তিনি রুশিয়াকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—পোল্যাণ্ডের ভিল্না অধিকার বৃটিশ সরকারের সমর্থন লাভ করে নাই; তাঁহারা কার্জ্জন লাইনকেই সঙ্গত রুশ-পোল্ সীমান্তরেখা বলিয়া মনে করেন। ভবিষ্যৎ পোল্যাণ্ড উত্তরে ও পশ্চিমে জার্ম্মাণ অঞ্চল অধিকার করিয়া শক্তিশালী হউক—এই বিষয়ে মার্শাল ষ্ট্যালিনের সহিত মিঃ চার্চ্চিল্ একমত। যুগোশ্লেভিয়া সম্পর্কে বৃটিশ-প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট-নেতা টিটোর প্রাধান্যই যুগোশ্লেভিয়ায় মিহাইলোভিচ, নিষ্প্রভ।

পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লেভিয়া সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তিতে প্রমাণিত হইল যে, রাজনৈতিক বিষয়ে রুশিয়ার সহিত বৃটেনের মতদ্বৈধ ঘটে নাই; বৃটিশ সরকার য়ুরোপের গণশক্তির দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন।

তাহার পর মিঃ চার্চ্চিল পুনরায় দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে প্রবল সংগ্রাম চালাইবার জন্য তাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর এই উক্তিতে বৃটিশ রাজনীতিকদের সহিত রিবেন্‌ট্রপের আলোচনা সম্পর্কে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত সেই জনরবের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন হইল। বৃটিশ জনসাধারণের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃটেনের প্রতিক্রিয়াপন্থীরা যে মধ্যপথে নাৎসী জার্ম্মাণীর সহিত আপোষ করিতে সমর্থ হইবে না, মিঃ চার্চ্চিল তাহাই স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন।

কেবল ইটালী সম্পর্কেই মিঃ চার্চ্চিলের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ইটালীয়দিগের অধিকতর সহযোগিতা লাভের জন্য আপাততঃ বাদোগলিও-ইমানুয়েল্ সরকারের পরিবর্ত্তন সাধনের কোন প্রয়োজন নাই; রোম অধিকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গ চাপা রাখা চলিতে পারে। অথচ, সম্প্রতি বারিতে ইটালীর বিভিন্ন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দলের এক সম্মিলনীতে অবিলম্বে বাদোগলিও-ইমানুয়েল সরকারের উচ্ছেদ দাবী করা হইয়াছিল।

মিঃ চার্চ্চিল্ বৃটিশ রক্ষণশীল দলের বড় পাণ্ডা; তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ। কাজেই তাঁহার পক্ষে আপনা হইতে উদ্যোগী হইয়া গণশক্তিকে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে নিয়োগ করিতে আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক নহে। কাজেই ইটালীর গণ-প্রতিনিধিদিগের দাবী উপেক্ষা করিয়া তথাকার গণশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে নিয়োগে তাঁহার অনিচ্ছা বিচিত্র নহে। পোল্যাণ্ডে ও যুগোশ্লেভিয়ায় গণশক্তি নিজের দাবীকে অপ্রতিরোধ্য করিয়াছে, কাজেই মিঃ চার্চ্চিল তাহা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইটালীতে গণশক্তি এখনও এত দূর শক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই; তাই তাহাদিগের দাবী উপেক্ষায় এই অসঙ্গত প্রয়াস। তবে নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংস সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের আগ্রহ ঐকান্তিক। কাজেই নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ইটালীর গণশক্তির দাবী তাঁহাকে এক দিন স্বীকার করিতেই হইবে।

রুশ-ফিনিস্ সন্ধির কথা—

ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে ডাঃ প্যাসিভিকি ষ্টকহলমের রুশ প্রতিনিধি ম্যাডাম কলোন্টের নিকট সন্ধির সর্ত্ত জানিতে গিয়াছিলেন। ম্যাডাম কলোন্টে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি প্রদান করিয়াছেন—(১) জার্ম্মাণীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নাৎসী সৈন্যদিগকে আটক করিতে হইবে; এই বিষয়ে সোভিয়েট সরকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। (২) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের রুশ-ফিনিস্ সন্ধি পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইবে। (৩) রুশিয়ার ও সম্মিলিত পক্ষের যে সৈন্য ফিন্‌ল্যাণ্ডে বন্দী আছে,তাহাদিগকে এবং আটক বেসামরিক ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন মস্কোয় আলোচনা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। (৫) ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত প্রশ্নও মস্কোয়ে আলোচিত হইবে।

এই সর্ত্ত সম্পর্কে ফিন্‌ল্যাণ্ডের মনোভাব এখনও প্রকাশ পায় নাই। ফিনিস্ সরকার জানাইয়াছেন যে, সর্ত্তাবলী যথারীতি ফিনিস্ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইয়াছে।

রুশিয়া যে বিনাসর্ত্তে ফিন্‌ল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণ দাবী না করিয়া এইরূপ উদার সর্ত্ত প্রদান করিবে, ইহা আশাতীত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার অত্যন্ত সঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পরাজিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের নিকট রুশিয়া তাহার পূর্ব্বের দাবীই উত্থাপন করে, তদতিরিক্ত কিছুই চাহে নাই। সোভিয়েট রাজনীতিকদিগের সেই

মহানুভবতার বিনিময়ে ফিন্‌ল্যাণ্ড গোপনে জার্ম্মাণীর সহিত রুশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর সহিত এক-যোগে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ হেন ফিন্‌ল্যাণ্ড আজ জার্ম্মাণীর বিজয়ের আশা না দেখিয়া রুশিয়ার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি-প্রার্থী! তাহার সহিত রুশিয়া এইরূপ উদার ব্যবহার করিবে, ইহা সত্যই বিস্ময়কর!

ফিন্‌ল্যাণ্ড যদি রুশিয়ার সর্ত্তাবলী গ্রহণ করে, তাহা হইলে উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। জার্ম্মাণরা স্বেচ্ছায় ফিনিস্ রাজ্য ত্যাগে স্বীকৃত না হইলেও রুশ সেনার পক্ষে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহযোগিতায় জার্ম্মাণ-বিতাড়ন কার্য্য দুষ্কর হইবে না। জার্ম্মাণরা বিতাড়িত হইলে মুরমানস্ক অঞ্চল হইতে রুশিয়ার বৈদেশিক সাহায্য-প্রবেশের পথ নিষ্কণ্টক হইবে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের অস্ত্রত্যাগে ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর ও বাল্টিক সাগরে সোভিয়েট নৌ-বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

রুশ-রণাঙ্গন—

রুশিয়ার উত্তরাঞ্চলে লেনিনগ্রাডের দক্ষিণে সমগ্র অঞ্চল জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। রুশবাহিনী এখন এস্থোনিয়া ও ল্যাটভিয়ার উদ্দেশে আক্রমণরত। এস্থোনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নার্ভায় রুশ সেনার প্রচণ্ড আঘাত পতিত হইতেছে, দক্ষিণে তাহারা স্কভের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে এবং স্কভ্ ও অষ্ট্রভের মধ্যে একটি 'কীলক' প্রবেশ করাইয়াছে। হোয়াইট্ রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর ঘাঁটী মিনস্ক অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য রুশ সেনা ভাইটেবস্কে তাহাদিগের আক্রমণ প্রবলতর করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের মধ্যে রুশ সেনা সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগের সাম্প্রতিক তৎপরতায় টারণোপোলের নিকট ওডেসা হইতে ওয়ার্স পর্য্যন্ত প্রসারিত রেলপথ এখন বিচ্ছিন্ন। ইহার ফলে দক্ষিণ-ইউক্রেণে ফন্ ম্যানষ্টীনের সাড়ে সাত লক্ষ সৈন্যের পশ্চাদপসরণের পথ বিপ্লাস্তীর্ণ হইয়াছে। জার্ম্মাণরা ইউক্রেণে নীপারের বাঁকে দৃঢ় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই সময় রুশ সেনাপতিরা অকস্মাৎ কিয়েভ অঞ্চলে আক্রমণের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করেন। তখনই মনে হইয়াছিল—ঐ অঞ্চলে রুশ সেনার সাফল্যের গতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে নীপারের বাঁকে জার্ম্মাণরা বিপন্ন হইবে। এখন সেই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি নীপারের বাঁকে জার্ম্মাণীর প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; ক্রিভয়-রগ এখন রুশ সেনার অধিকারভুক্ত। ইঙ্গুলেট্ নদী অতিক্রম করিয়া খার্শন-রক্ষী জার্ম্মাণ-ব্যূহ রুশ সেনা কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইয়াছে।

প্রাচ্য অঞ্চল—

সম্প্রতি আরাকানে সম্মিলিত পক্ষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। জাপানীরা কৌশলে আক্রমণ প্রসারিত করিয়া সম্মিলিত পক্ষের চতুর্দ্দশ বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাহাদিগের সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তবে এখনও এই অঞ্চলে জাপানীদিগের তৎপরতা প্রবল। চিন পাহাড়ের নিকট সম্মিলিত পক্ষের সামান্য তৎপরতা চলিতেছে। উত্তর-ব্রহ্মে এত দিন চীনা সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল; সম্প্রতি তথায় মার্কিনী সৈন্যও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শীত অতীত হইল; ব্রহ্মসীমান্তে বর্ষা আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। বর্ষা সমাগমেই পূর্ব্ব-ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার হিসাব-নিকাশ হইবে। শীতকালে সম্মিলিত পক্ষ যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বর্ষাকালে অক্ষুণ্ণ থাকে, কি সম্মিলিত পক্ষ "অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইল" বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত বৎসর এই মার্চ্চ মাসেই আরাকানে জাপানের প্রবল প্রতি-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের সেনা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নূতন রণকৌশল সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন মার্কিনী বিমানবাহিনী মার্শাল্ দ্বীপপুঞ্জে নবাধিকৃত ঘাঁটী হইতে ক্যারোলিন্ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ চালাইতেছে; সম্প্রতি ক্যারোলিন্‌সের অন্তর্গত পনেপে এবং জাপানের তথাকথিত "পার্ল হারবারে" ট্রুকে প্রবল আক্রমণ চালিত হইয়াছে। আলিউ-সিয়ানস্ হইতে কিউরাইল্‌সেও আরও আক্রমণ চালিত হইয়াছে, অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে জাপানের উদ্দেশে প্রসারিত সাঁড়াশী আক্রমণ সাফল্যের সহিতই চলিতেছে। ট্রুকে জাপানী নৌবহর চূর্ণ করিবার আশায় আক্রমণ চালিত হইয়াছিল; কিন্তু তথায় জাপানের প্রচুর রণতরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। জাপানের নৌ-বাহিনীকে প্রবল আঘাত না করা পর্য্যন্ত মার্কিনী সেনাপতিরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু এই নৌবহর কোথা—সে সংবাদ তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না।
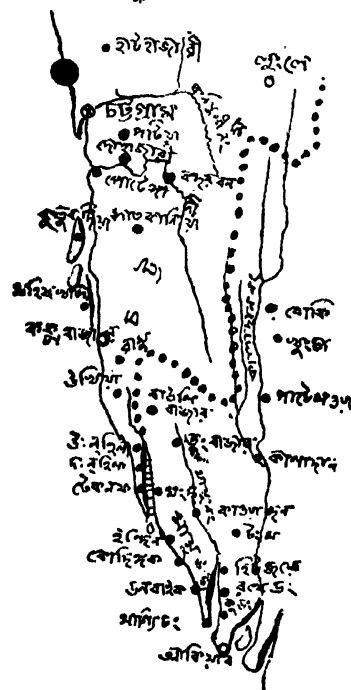
সম্প্রতি জনৈক মার্কিনী সাংবাদিক বলিয়াছেন—জাপানী নৌবহর খুব সম্ভব সিঙ্গাপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথা হইতে সিংহলে ও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে জাপানের আক্রমণ চালিত হইতে পারে; এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

ভারতবর্ষ হইতে জাপ-বিরোধী অভিযান আরম্ভ উভচর আক্রমণ চালাইতে হইবে এবং সিংহল ও ভারত উপকূলই সে আক্রমণের প্রধান ঘাঁটী হইবে। ভারতবর্ষ কেবল স্থলপথে পূর্ব্ব দিকে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালন সম্ভব নহে; কাজেই সম্মিলিত পক্ষের প্রকৃত অভিযান নিবারণের জন্য ভারত মহাসাগরে জাপ-নৌবাহিনী সন্নিবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; সিংহল ও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে সে নৌ-বাহিনীর অবহিত হওয়াও সম্ভব।

১।৩।৪৪ শ্রীঅতুল দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

দুর্গত হাসপাতাল

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ বর্ষাধিক কাল বিশেষ ভাবে কলিকাতায় ও বাঙ্গালায় দুর্গত-সেবা করিয়া আসিতেছেন। অল্প মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়, অন্নসত্রে লোককে বিনা-মূল্যে অন্নদান, বিনা লাভে বস্ত্রদান, কালীঘাটে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা—এই সকলের পর তাঁহারা কলিকাতায় দুর্গত নারী ও শিশুদিগের জন্য একটি বৃহৎ হাসপাতাল ও আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাষ্টিস

দুর্গত হাসপাতালের উদ্বোধন

চারুচন্দ্র বিশ্বাস উহার উদ্বোধন করিয়াছেন এবং উদ্বোধনে লর্ড ও লেডী সিংহ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রী সরকারের বাজেট

কেন্দ্রী সরকারের যে [illegible] পেশ হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে—

রাজস্ব ঘাটতী—১২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা আর বর্ত্তমান আয় অক্ষুণ্ণ থাকিলে আগামী বর্ষে ঘাটতী—৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

স্থির হইয়াছে—

[illegible] ও সুপারীর উপর প্রতি সেরে ৪ আনা কর ধার্য্য

[illegible] এ দেশের তামাকের উপরেও কর বর্দ্ধিত করা

[illegible]

অর্থ-সচিবের আশা কর-বৃদ্ধিতে আয়-বৃদ্ধির ফলে আগামী বৎসর মোট ঘাটতী ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা হইতে পারে।

এই অবস্থায়ও যে অর্থ-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন, বর্ত্তমানে যে স্থলে বার্ষিক আয় দেড় হাজার টাকা হইলেই আয়কর দিতে হয়, সে [illegible] বার্ষিক আয় ২ হাজার টাকার উপর হইতে আরম্ভ হইবে, তাহা জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়াও প্রশংসনীয় বলা যায়।

অর্থ-সচিব যে শেষে চা, কফি, সুপারী ও দেশীয় তামাকের উপরেও কর ধার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায়, আয়-বৃদ্ধির অন্যান্য উপায় পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। সুপারীর দিকে এইরূপ দৃষ্টি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পরে আর কখন পতিত হয় নাই। সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সুপারীর ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন য়ুরোপীয়ই এ দেশের লোককে নিঃস্ব করিবার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ ২ বৎসর পূর্ব্বে ঝড়ে নোয়াখালী অঞ্চলে বহু সুপারী গাছ নষ্ট হওয়ায় এবং মালয় ও ব্রহ্ম জাপানীদিগের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় এ দেশে সুপারীর অভাব ঘটিয়াছে, সুতরাং মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সুপারীর পরিবর্ত্তে খর্জ্জুরের বীজ ব্যবহৃতও হইতেছে। পান এ দেশে বহু লোকের—দরিদ্রেরও নিত্যব্যবহারের বস্তু এবং তাহাতে কেবল যে পরিপাক-সাহায্য হয়, তাহাই নহে—শ্রমাপনোদনার্থও তাহা ব্যবহৃত হয়। তামাক এ দেশে শ্রমিক ও কৃষকদিগের কঠোর শ্রমের পর আরামের উপকরণ।

আমরা বিলাস-দ্রব্যের উপর কর-বৃদ্ধিতে আপত্তি করি না; কিন্তু দরিদ্রের দুর্ল্লভ আরামের উপকরণে কর সমর্থন করা দুষ্কর।

তাহার পরে—

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের কোন উপায় যে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা আমরা বাজেট পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। অথচ মুদ্রাস্ফীতির প্রতীকার না হইলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না—অবনতি অনিবার্য্য হইতে পারে। সরকার কেবল রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু—ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। পদের পর পদ ও উপবিভাগের পর উপবিভাগ কেবলই বর্দ্ধিত হইতেছে! সে বিষয়ে সে আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা মনে হয় না।

সাময়িক ব্যয় অনিবার্য্য হইলেও যে ব্যয় ঋণ করিয়া নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির সময় কর-বৃদ্ধির দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে যে লোকের মনে অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাও এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট

বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যে বাজেট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আগামী বৎসর ঘাটতির পরিমাণ—১৩ কোটি টাকারও অধিক।

কি ভাবে বাঙ্গালার অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—"এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেণ্ট" নামক যে বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোন কাযের পরিচয় বাঙ্গালার লোক এখনও পায় নাই। সেচের ব্যবস্থা যদি সেচ বিভাগের ও বীজ প্রভৃতির

ব্যবস্থা যদি কৃষি বিভাগের কর্ত্তব্য হয়, তবে এই বিভাগের কায কি?

১৩ কোটি টাকারও অধিক ঘাটতি দেখাইয়া—বিক্রয়করও বাড়াইয়া বাঙ্গালার অর্থ-সচিব আবার বলিয়াছেন, হয়ত আরও কর ধার্য্য করিতে হইবে।

যদি বাঙ্গালায় সরকারের সকল বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি অবিরাম-গতিতে চলিতে থাকে, তবে শেষ কোথায়?

—

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত নানা ব্যাধিতে মোট কত লোকের জীবনান্ত হইয়াছে, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব সরকার দেন নাই। ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহা এতই অসম্ভব যে, তাহা যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে সংগৃহীত হইলেও তাহা দেখিয়া বিলাতী সরকার শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং বিপদ বুঝিতে পারিলে উষ্ট্রপক্ষী যেমন ভাবে বালুকায় মস্তক লুকাইয়া মনে করে, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেই ভাবে পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের যে হিসাবে অনুমিত হয়, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধিতে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা যখন ৮টি জিলায় মোট ৮ শত ১৬টি পরিবারে (মোট লোকসংখ্যা ৩ হাজার ৮ শত ৪০) অনুসন্ধানের ফল, তখন তাহা সমগ্র বাঙ্গালার আনুমানিক হিসাব বলা যায় না। কিন্তু সেই সময় যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে বলা হইয়াছিল—"এখনও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৃত্যুতালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই"—তখন তাহা ইচ্ছাকৃত সত্যগোপন কি না, তাহা বুঝা যায় না। কারণ, ২রা মার্চ্চ যখন পার্লামেণ্টে এই কথা বলা হয়, তাহার পূর্ব্বে—২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল :—

"খাদ্যসঙ্কটে কলিকাতায় ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে মোট মৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের কোন সংবাদ নাই। বাঙ্গালা সরকার এখন সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। ভারত-সচিব যে বলিয়াছিলেন, ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে সংবাদ বাঙ্গালা সরকারই সরবরাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ঐ সংবাদ অনুমান-মূলক।"

আর কেন্দ্রী সরকার এই কথা বলিবার ২ দিন পরেই, বাঙ্গালা সরকারের সচিবপক্ষে বলা হইয়াছিল—

(১) স্থানীয় সার্কেল অফিসারদিগের নির্দ্দেশানুসারে মফস্বলে সব অনাহারে মৃত্যু (অনাহারে মৃত্যু না লিখিয়া) "অন্যান্য কারণে মৃত্যু" বলিয়া দেখান হইয়াছে কি না, তাহা সরকার জানেন না।

(২) চৌকীদাররা যে "ফরমে" মৃত্যুর হিসাব রাখে, তাহাতে "অনাহারে মৃত্যুর ঘর নাই" এবং অনাহারে মৃত্যু "অন্যান্য কারণে মৃত্যু" বলিয়া লিখিত হয়।

(৩) অনাহারে মৃতের সংখ্যা জানিবার কোন উপায় নাই।

এমন কি, চৌকীদারদিগের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টাও সচিবরা করিয়াছেন।

ইহাতেই বুঝা যায়, "কেহ কেহ অনাহারে মরিয়াছে"—ইহার অতিরিক্ত সংবাদ বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ লয়েন নাই—হয়ত ইচ্ছা করিয়া নহে ত নিন্দার্হ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত—লয়েন নাই। আর কেন্দ্রী সরকারও সে বিষয়ে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে অবহিত হয়েন নাই।

ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অজ্ঞাতই রহিয়া যাইবে। অথচ প্রত্যেক গ্রামে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লোক-সংখ্যা কত ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা তুলনা করিলে সরকার অনায়াসে অনাহারে বা অনাহারজনিত ব্যাধিতে মৃতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন।

সরকার যখন তাহা করিতেছেন না, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বিজ্ঞানানুমোদিত পদ্ধতিতে যে হিসাব করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না। নৃতত্ত্ব বিভাগের বিবৃতিতে সরকারী হিসাবের ভুলও দেখান হইয়াছে। নদীয়া জিলার কোন গ্রামে সরকারী হিসাবে গত বৎসর অনাহারে মৃতের সংখ্যা ৭ দেখান হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনুসন্ধান করিয়া দেখেন—অনাহারে ঐ গ্রামে ৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ভুল দেখাইয়া দিবার পর সরকারী হিসাব পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব বিভাগের বিবৃতিতে দেখান হইয়াছে, স্থানভেদে মৃত্যুর হার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম পরীক্ষা করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সেই হিসাবের ফলে দেখা যায়—

স্বাভাবিক সময়ে মৃত্যু-সংখ্যা যেরূপ হয়, দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা ৩৫ লক্ষেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এই বিবৃতিতে দেখান হইয়াছে—শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকিতে পারে না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফল আলোচনা করিয়া সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার দেখাইয়াছেন :—

"দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর কাল লোকক্ষয় বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। দুর্ভিক্ষকালে শিশুরাই সর্ব্বাগ্রে অধিক বিনষ্ট হয় এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃদ্ধদিগের মৃত্যু হইলে তাহাদিগের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার কেহ থাকে নাই।"

দুর্ভিক্ষের পরে যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ব্যাপ্তি ঘটে, তাহা জানিয়াও বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ তাহা নিবারণের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই। অথচ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াই বড়লাট (৭ই নভেম্বর) যে "রেজলিউশন" প্রচার করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"খাদ্য-দ্রব্যের অভাবহেতু নানারূপ ব্যাপক ব্যাধির বিস্তার ঘটিতে পারে। কাযেই অভাবগ্রস্ত জিলাসমূহে চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।"

ঐ বৎসরই সার বার্টল ফ্রিয়ার লিখিয়াছিলেন :—

জ্বর ও নানারূপ ব্যাপক ব্যাধিবিস্তারে মৃত্যুর সংখ্যা দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু-সংখ্যারই মত হইতে পারে।

এ বার দুর্ভিক্ষের পরে নানারূপ ব্যাধির প্রকোপ কিরূপ হইয়াছে, তাহা গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে সমর বিভাগের মেজর-জেনারল ডগলাস ষ্টুয়ার্ট দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী ফলে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বহু গ্রামে সূত্রধর, কর্মকার প্রভৃতির মৃত্যুতে লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপথ বিপ্লাস্থত হইয়াছে।

(২) ৪০টি যাযাবর চিকিৎসাকেন্দ্রে ইতোমধ্যেই এক লক্ষ ৩০ হাজার লোক চিকিৎসিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এক লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়া-পীড়িত।

(৩) কলেরা ও বসন্তও সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে।

(৪) স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ৪.৫ গুণ অধিক। তিনি যে গৃহেই গিয়াছেন, প্রায় তাহাতেই হয় লোক ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে—নহে ত লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত।

এই সকল বিবেচনা করিলে মনে করা অসঙ্গত নহে—মৃত্যুসংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা হয়ত ৫০ লক্ষ অধিক হইবে।

অথচ এ বার দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে ঘটে নাই এবং তাহা প্রতীকারসাধ্যই ছিল—কেবল মানুষের ত্রুটিতে প্রতীকার সাধিত হয় নাই।

আমরা মনে করি, মৃতের সংখ্যা স্থির করিবার উপায় এখনও আছে এবং যাহারা প্রতীকার করিতে ত্রুটি করিয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া সেই সংখ্যা স্থির করা সরকারের কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র

"গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্যমা-
মবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্।"

গত ১৬ই ফাল্গুন দিবালোকবিকাশের পূর্ব্বক্ষণে 'বসুমতী'র অধিকারীর একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল-বিয়োগে 'বসুমতী প্রতিষ্ঠান' হইতে আজ ঐ কথা উদ্‌গত হইতেছে।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই মাঘ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গুরু রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া—অন্য দিকে নিঃসম্বল অবস্থায়—যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা যে তিনি অদম্য প্রেরণাবশেই করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যখন সংসাহিত্য প্রচার আরম্ভ করিয়া দেশবাসীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'বসুমতী' সংবাদপত্রও প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার গুরুভ্রাতা বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দই সেই পত্রের মূলমন্ত্ররূপে তাহার ললাটে সন্ন্যাসীর প্রণাম "নমো নারায়ণায়" তিলকরূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে গুরুদেবের নশ্বর দেহ দাহকালে বিষধরদষ্ট হইয়াও উপেন্দ্রনাথ সে বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারই আশীর্ব্বাদ লইয়া উপেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সাধনারূপে 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' স্থায়ী করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌যাপিত করিয়াই আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

তিনি মৃত্যুকালে এই বিশ্বাসের সান্ত্বনা লইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভার দিয়া যাইলেন। তাঁহার সেই বিশ্বাস সফল হইয়াছে। "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ম্"—এই কথা তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র সার্থক করিয়াছেন। পুত্র কেবল পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের গৌরব অক্ষুণ্ণই রাখেন নাই, পরন্তু তাহা বিশেষ ভাবেই বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই যে ভার লইয়াছিলেন, তাহা বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও দুর্ব্বহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ উদ্যম ও অনুশীলন-তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি লইয়া তিনি পিতার স্বপ্ন সফল করিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ পুত্রকে তাঁহার কার্য্যের জন্য শিক্ষা দিবার অবসর পায়েন নাই; পুত্রকে তাহা অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য সতীশচন্দ্র ও রামচন্দ্রের মাতা পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে 'বসুমতী প্রতিষ্ঠানের' পরিচালনোপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শারীরচর্চ্চায়, সঙ্গীতে, ধর্ম্মাচরণের জন্য দীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁহারা পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষায় "ঈশান স্কলার" হইয়াছিলেন ও এম, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

রামচন্দ্র

রামচন্দ্রের অধ্যায়নানুরাগ অসাধারণ ছিল এবং পঠদ্দশাতেই তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যসেবা-বৃত্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি 'কিশলয়' নামক মাসিক-পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছু দিন তাহা পরিচালিত করেন। পিতার নির্দ্দেশে তিনি কিছু দিন 'বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের' কার্য্যেও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

মাত্র ৩ বৎসর পূর্ব্বে সতীশচন্দ্র তেলিনীপাড়ার (চন্দননগরবাসী) বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আজ পিতামহীর স্নেহের দুলাল, পিতামাতার অসীম স্নেহের কেন্দ্র রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া বিধবা ও পিতৃহীন কন্যাকে রাখিয়া—৩ সপ্তাহকাল দুরন্ত টায়ফয়েড রোগ ভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক। কিন্তু যখন কোন যুবক তাহার জীবনের কার্য্য সাধনে শিক্ষিত হইয়া সেই কার্য্য আরম্ভ করে, তখন অতর্কিত ভাবে অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার তিরোভাব বিশেষ বেদনার কারণ হয়। আমরা জানি—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে
কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র
ন মুহ্যতি।"

কিন্তু মায়ামুগ্ধ মানুষ আমরা শোকে সহজে শান্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদিগের পক্ষে এই শোক ভাবার অতীত ইন্দ্রিয় ধারণার অতীত—সান্ত্বনার অতীত।

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্
যদি জন্তুর্নমু লাভবানসৌ।"

কিন্তু সেই জীবিতকালে রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পিতা-মহের প্রতিষ্ঠিত ও পিতাকর্ত্তৃক বিস্তৃতি-গৌরবোজ্জ্বল বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' সম্বন্ধে যে আশা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার পরিণতি-শঙ্কায় মনে হয়—

"He is gone on the mountain,
He is lost to the forest,
Like a summer-dried fountain
When our need was the sorest."

জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল—রহিল তাহার স্মৃতি—বেদনাময় স্মৃতি।

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২০শে ফাল্গুন অপরাহ্নে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারল হাসপাতালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্যতম পরিচালক শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাবতী দাশ

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট দার্জ্জিলিংএ শৈলেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। নদীয়া জিলায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল। তাঁহার পিতা মহেন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিংএ উকীল সরকার ছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ তথায় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়নান্তে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পরে বিলাতে যাইয়া তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন এবং অল্প দিন দার্জ্জিলিংএ ব্যবহারাজীবের কায করিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়েন। মধ্যে কিছু দিন তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে যাইয়া বিশ্রাম সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ শারীরচর্চ্চার অনুরাগী ছিলেন এবং বহু দিন মোহনবাগান ক্লাবের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দার্জ্জিলিংএ তাঁহার পিতার আতিথ্য স্বীকার করেন, সেই সময়েই শৈলেন্দ্রনাথ স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তিনি মধ্যে মধ্যে বেলুড় মঠে যাইতেন।

তাঁহার পত্নী—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, কয় বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তিনি ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন—কনিষ্ঠা এখনও অবিবাহিতা

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এই অর্থ হিন্দু মহাসভার দ্বারা ব্যয়িত হয়।

প্রভাবতী দাশ

সাহিত্যসেবী শ্রীমতিলাল দাশের পত্নী প্রভাবতী দাশ গত ২রা ফাল্গুন পরলোকগত হইয়াছেন।

প্রভাবতী স্বামীর সাহিত্য-সাধনার সঙ্গী ছিলেন। ইনি স্বামীর ৩৪ খণ্ডে সমাপ্য ঋগ্বেদের মূল ও অনুবাদ প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে কায অসমাপ্ত রাখিয়া ২৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।
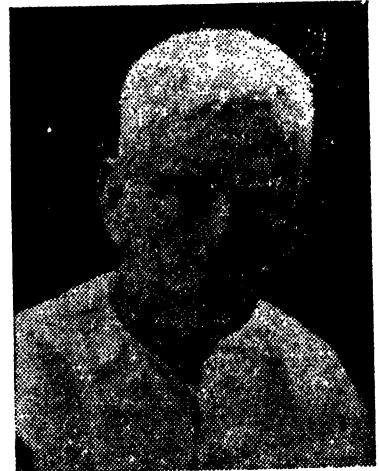
নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় ৮৩ বৎসর বয়সে গত ২৭শে মাঘ উত্তরপাড়ায় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছু দিন 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কায করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি বহু বিদ্যালয়পাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন এবং ইনিই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা

বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত করেন। ইনি 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' ও 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

লোকনাথ দত্ত

কুচবিহার সামন্ত রাজ্যের এঞ্জিনিয়ার ও বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী লোকনাথ দত্ত গত ৯ই মাঘ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চাকরী করিয়া যশঃ অর্জ্জন করেন এবং পরে কুচবিহারে স্থায়ী হইয়া বাস করেন।

লোকনাথ দত্ত

অনাদিনাথ ঘোষ

গত ৮ই ফাল্গুন ভাগলপুরে অনাদিনাথ ঘোষের জীবনান্ত হইয়াছে। তিনি ভাগলপুরের জমিদার হেরম্বনাথ ঘোষের পঞ্চম পুত্র ছিলেন ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন সুরসিক তেমনই কার্য্যক্ষম ছিলেন। প্রজাদিগের সহিত তাঁহার এমনই সদ্ভাব ছিল যে, প্রজারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নামে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অসাধারণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি পুষ্পবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রমল্লিকা ফুল সম্বন্ধে তিনি সমগ্র দেশে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে পুষ্পপ্রিয় ব্যক্তিরা তাঁহার বাগানের চন্দ্রমল্লিকার জন্য প্রতীক্ষায় থাকিতেন। কোন ফুল সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ঘটিলে তিনিই সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার একমাত্র বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহার নামে একটি বিশেষ জাতীয় ফুলের নামকরণ হয়—অনাদিনাথ ঘোষ। তিনি তাঁহার বিধবা, এক পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ফুলেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।
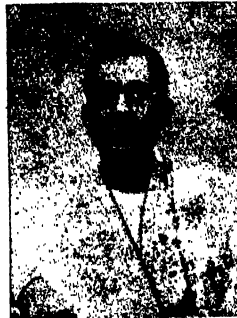
অনাদিনাথ ঘোষ

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ও বিবিধ বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান—"লিষ্টার অ্যান্টিসেপটিকস্ অ্যান্ড ড্রেসিংস কোম্পানী"র পরিচালক-সঙ্ঘের সভাপতি শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত ২৫শে মাঘ শ্রীরামপুরে "চাতরা কুটীরে" লোকান্তরিত হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে একটি এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়া বিহারে ঠিকাদারের কায করিয়া গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় "কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্ক" প্রতিষ্ঠিত করিয়া হাতের তাঁতে চিকিৎসাকার্য্যে ব্যবহৃত গজ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। অসাফল্যের অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি সাফল্য লাভ করেন।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তাহার পরে "লিষ্টার" প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহা ক্রয় করেন ও ভ্রাতার ও পুত্রের সহযোগে তাহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া—নূতন নূতন বিভাগেরও সৃষ্টি করেন। তিনি কেবল যে ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু তিনি অধ্যয়নপ্রিয়, পরদুঃখকাতর, সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও অসাধারণ ছিল।

কস্তুরীবাঈ গান্ধী

গত ৯ই ফাল্গুন পুণায় আগা খাঁ'র যে গৃহ রাজনীতিক নেতৃগণের বন্দিশালায় পরিণত করা হইয়াছে, সেই গৃহে গান্ধীজীর সহধর্ম্মিণী হৃদ্‌রোগে শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই কারাগারেই তাঁহাদিগের পুত্রকল্প সেবক মহাদেব দেশাইও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। জীবনে তাঁহাদিগকে সরকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের মুক্ত আত্মাকে বন্দী করিবার সাধ্য কোন পার্থিব সরকারের নাই।

কস্তুরীবাঈ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্য বর্ষ বয়সে তাঁহা অপেক্ষা কয় মাস অল্পবয়স্ক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু নারীর যে সংস্কার পাইয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মনুর উক্তিতে

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

সেই বিশ্বাসে তিনি অবিচারিতচিত্তে স্বামীর কার্য্যে সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন এবং স্বামীর রাজনীতিক মতেরও অনুবর্ত্তী হইয়া বার বার কারাবরণও করিয়াছিলেন।

বোধ হয়, সেই কার্য্যফলেই তিনি হিন্দু নারীর আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-লাভ করিয়াছেন—স্বামীর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

তিনি হিন্দুর সংস্কারে প্রগাঢ় বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বামীর সহিত জগন্নাথক্ষেত্রে যাইলে—কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার না থাকায় গান্ধীজী জগবন্ধুদর্শনে না যাইলেও

কস্তুরীবাঈ গান্ধী

তিনি নীলাচলে দেবমন্দিরে রত্নবেদীর উপর জগন্নাথের মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন।

তিনি স্বামীর অঙ্কে প্রাণত্যাগ করিয়া পুত্রের দ্বারা মুখাগ্নিলাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু আচারানুসারে তাঁহার চিতাভস্ম পবিত্র তীর্থে সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বিদেশে বিগতজীবন বন্ধুর শব ইংলণ্ডে আসিতেছে, ইহাতে কবি টেনিশন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন :—

"'Tis well ; 'tis' something ; we may stand
Where he in English land is laid,
And from his ashes may be made
The violet of his native land."

সেই ভাবে আমরা তাঁহার হিন্দু নারীর আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে যথা-সম্ভব সান্ত্বনালাভের অবকাশ লাভ করিতে পারি।

কারাগৃহেই তাঁহার হৃদ্‌রোগের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহাকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব—জনগণের পক্ষ হইতে হইলে বিদেশী ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে কেন মুক্তিদান করা হয় নাই, সে সম্বন্ধে বৃটিশ সরকার এক কথা ও কেন্দ্রী সরকার এক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী বলিয়াছেন—কারাগৃহের বিরাটত্ব তাঁহাকে পীড়িত করিত—তাঁহার নিকট অসহনীয় বলিয়া মনে হইত। আগা খাঁর প্রাসাদে আটক হইবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃদ্‌রোগ ছিল না। তাঁহাকে যে মুক্তিদান করা হয় নাই, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত দেবদাস গান্ধীর এই কথাও স্মরণ রাখা আমরা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এডভোকেট ও 'বসুমতীর' সহিত সংশ্লিষ্ট ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অতর্কিত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

গত ২৬শে ফাল্গুন হইতে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সার মহম্মদ আজিজুল হক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মূল সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র দাশ প্রধান কর্ম্ম-সচিব ছিলেন। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন—সাহিত্য গড়িয়া তুলা যায় না, তাহা গড়িয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু সাহিত্য বিভাগে ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন দর্শন-শাখায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাঁহাদিগের চেষ্টায় ও উৎসাহে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন বন্ধ হয় নাই, পরন্তু পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমরা আশা করি, যুদ্ধজনিত অবস্থার অবসান ঘটিলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন আরও সমাদর লাভ করিবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন যে বাঙ্গালার বাহিরে, কার্য্যব্যপদেশে, নানা স্থানে অবস্থিত বাঙ্গালীদিগকে ও তাঁহাদিগের সহিত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগকে এক সাহিত্যের নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ করিবার উপায়, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[স্মৃতিকথা]

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম এবং সেই কর্ত্তব্য পালনেই তাহার সার্থকতা এই মতের ভিত্তির উপর হিন্দু-সমাজ প্রতিষ্ঠিত। যে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্র নামে অভিহিত সেই কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডব-সেনাবলের মধ্যে অবস্থিত গাণ্ডীবীর জয়-রথে সারথ্যতৎপর শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া—মানুষকে "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং" ত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া হিন্দু-সমাজের সেই ভিত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান। সেই কালমধ্যে বহু সভ্যতার ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন হইয়াছে। ভারতবর্ষেও পরিবর্ত্তন অল্প হয় নাই। বিপ্লবের বন্যা, বিদেশীর আক্রমণবাত্যা—এ সকলের প্রভাব যে ভারতীয় সমাজে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিলেও তাহার ভিত্তি শিথিল করিতে পারে নাই, তাহার কারণ—হিন্দুর বিশ্বাস—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" যখনই হিন্দুর এই মতে আস্থা শিথিল হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উপদেষ্টার প্রয়োজনে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে সে প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। কারণ, তখন আমাদিগের সেই মতে আস্থা শিথিল হইবার যেরূপ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল সেরূপ তাহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই। আরবের মরুভূমিতে প্রচারিত যে ধর্ম্মমতাবলম্বীরা ভারতবর্ষে বালুবৈজয়ন্তী মরুবাত্যার মত আসিয়াছিল এবং যাহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিক তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন—sack, sacrilege and slavery অর্থাৎ লুণ্ঠন, অপবিত্রীকরণ ও দাসত্বনিগড়ে বন্ধন—তাহারা উন্নততর সংস্কৃতির অভাবে হিন্দুর স্বমতে শৈথিল্য ঘটাইতে পারে নাই। সে আক্রমণের ফল কি হইয়াছিল ?—

"The East bowed low before the blast
In patient deep disdain ;
She let the legions thunder past.
And plunged in thought again."

ধৈর্য্যসহ ঘৃণাভরে উপেক্ষিয়া তায়—
ঝটিকায় রহে প্রাচী হয়ে নতশির ;
সবেগে বিজয়ী সেনা দ্রুত চলি যায়—
প্রাচী পুনঃ ধ্যানে তা'র চিত্ত করে স্থির।

সেই ঝটিকা ভারতের আধ্যাত্মিকতা বিচলিত করিতে পারে নাই—ভারতে আসিয়া বিগতচাঞ্চল্য হইয়াছিল।

কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচী হইতে যাহারা এ দেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের উদ্দেশ্যও ত্রিবিধ ছিল—commerce, conquest, conversion—ব্যবসা হইতে তাহারা বিজয়ে এবং বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোককে আপনাদিগের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিল।

এই সকল জাতির মধ্যে ইংরেজ—বহু কষ্টে, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রভুত্ব লাভ করিয়া এ দেশে আপনার সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার চেষ্টা করে। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের শিল্প, ইংরেজের সভ্যতা যেমন বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, তেমনই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ—রাষ্ট্রের সহায়তায় ও সাহায্যে সেই ধর্ম্মমত প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন :—

"From Greenlands' icy mountains,
From India's coral strand,
Where Afric's sunny fountains,
Roll down their golden sand ;
From many a mighty river,
From many a palmy plain
They call us to deliver
Their land from error's chain"

যেন ভগবান তাঁহাদিগকে লোককে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন। তাঁহারা কখন কল্পনাও করিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা হয়ত দিবা-লোকদীপ্ত স্থানে প্রদীপ লইয়া অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরেজের শাসন-প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রভাব এ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার ইহকালসর্ব্বস্ব জড়বাদজর্জ্জরিত সভ্যতার আদর্শের দিকে যেমন লোককে আকৃষ্ট করিতে লাগিল, তেমনই তাহার বিলাসপ্রিয় জীবন-যাত্রার পদ্ধতিও অনুকৃত হইতে লাগিল। বাঙ্গালায় যে সম্প্রদায় ইয়ং-বেঙ্গল নামে অভিহিত—সেই সম্প্রদায় কেবল বাঙ্গালায়ই নিবদ্ধ রহিল না। হিন্দুর সংস্কারে আঘাত পতিত হইতে লাগিল—যে ধর্ম্মমতের উপরে হিন্দু-সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহাতে হিন্দুর আস্থা বিশ্বাসের স্থানে সংশয়ে ও আধ্যাত্মিকতার স্থানে দ্বিধায় শিথিল হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। আবার তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

১২৬৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তির দিন—(১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী) কলিকাতায় বিশ্বনাথ দত্তের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তিনি প্রথমে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া বিদ্যালয়ে নরেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হয়েন এবং সন্ন্যাসী হইয়া গুরুকৃপায় বিবেকানন্দ নামে সমগ্র সভ্যজগতে অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইনি তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহারাজীব হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহার অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাব দিন দিন প্রবল হইয়া ইঁহাকে লোকাতীতের চিন্তায় প্রেরণা দিতেছিল। সেই তৃষ্ণায় তিনি মরুভূমির বালুবিস্তারে মৃগের মত পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন—নির্ঝরোত্থিত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ বারির সন্ধান পাইতে-ছিলেন না। তখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রচারফলে হিন্দু ধর্ম্মে ইংরেজী-শিক্ষিতদিগের বিশ্বাস বিচলিত হইতেছিল এবং এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মনামে পরিচিত হইয় ক্রিয়াকর্ম্ম বর্জ্জন করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে সংশয়ের পথে নাস্তিক মতে উপনীত হইয়া ক্রমে ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল না। সেই সময় তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার কূলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে রামকৃষ্ণ পরম-হংসের নিকট নীত হইলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে পরমহংসদেব তেমনই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিলেন। নরেন্দ্রনাথ গুরুর নিকট নূতন জীবনের সন্ধান পাইলেন—তিনি সেই অধ্যাত্ম-জীবনের সন্ধানই করিতে-ছিলেন, তাঁহার সংশয়ের অবসান হইল—বিশ্বাসে তিনি শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ পাইলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়ে প্রভেদ—গুরু সংশয় ও সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করেন নাই সিদ্ধিতেই ছিলেন ; শিষ্যকে সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

পরমহংসদেবের শিষ্যের বিবেকানন্দ নাম সার্থক হইয়াছে। গুরু শিষ্যরত্নোত্তমকে জনসেবাধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সে জনসেবা মানুষের সর্ব্বপ্রকার সেবা—কেবল আত্মিকই নহে। তাহারই ফলে আজ আমরা রামকৃষ্ণ-মঠের মত রামকৃষ্ণ মিশনেরও কায দেখিতে পাই। এক দিকে বেদান্তমত প্রচার। সে মত ভারতের বিততশতশাখ ন্যগ্রোধেরই মত অবারিত ছায়া ও আশ্রয় দিয়া ত্রিতাপতপ্ত মানবকে কৃতার্থ করে। আর এক দিকে অনাথ ও রোগীর সেবা—নানা স্থানে অনাথাশ্রম ও সেবাশ্রম—নানা অনুষ্ঠানে, মানুষের নানারূপ বিপদে সাহায্য-দান-কেন্দ্র স্থাপন।

ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিলে মনে হয়, গুরু যেন যে কার্য্যের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সাধনো-পায় স্থির করিয়া—উপযুক্ত আধারে শক্তি রক্ষা করিয়া যাইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। যে সকল আধারে তিনি শক্তি রক্ষা করিয়াছিলেন—সেই সকলের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কেবল অন্যতমই নহেন—সর্ব্বপ্রধান।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে (১৬ই আগষ্ট) পরমহংসদেবের তিরোভাব ঘটিলে শিষ্যগণ বিবেকানন্দের নেতৃত্বে গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; সে জন্য যে কঠোর সাধনা প্রয়োজন তাহা আরম্ভ করিলেন।

বিবেকানন্দ হিমালয়ে গমন করিলেন এবং হিন্দু সাধু-গণের ব্রহ্মতপস্যাপূত যে হিমাচলে ভগীরথের সাধনাতুষ্ট

"ব্রহ্মকমণ্ডলুজঠরবিঘাতিনী" গঙ্গা এই হিন্দুস্থানে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের জটাজালমধ্যে আপনার দৈব বেগ সংযত করিয়া কল্যাণময়ীরূপে প্রবাহিতা হইয়াছিলেন, তাহার নিভৃত নিবাসে সাধনায় রত হইলেন।

সেই সাধনার বিষয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ও কয় জন গৃহী ভ্রাতা ব্যতীত আর কেহই জানেন না—জানিবার অধিকারও অপরের নাই। শতদল যখন বিকশিত হয়, তখন লোক তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়, কিন্তু কত দিন কত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করে,

স্বামী বিবেকানন্দ

তাহা কয় জন জানিতে পারেন—কয় জন তাহা অনুমান করিতে পারেন?

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কয় বৎসর পরে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি যখন প্রথম তাঁহাকে দর্শন করি, তখন সেই জয়ন্তের যশমুকুট-ময়ূখ প্রাচীর ও প্রতীচীর প্রশংসায় সমুজ্জ্বল। তিনি প্রতীচীতে হিন্দু ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া—ধর্ম্মমত-সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার স্বদেশে—তাঁহার জন্মভূমি বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালাকে তিনি কত ভালবাসিতেন তাহা কলিকাতার নিকটে জাহ্নবীকূলে বেলুড়ে তাঁহার কল্পনা কি ভাবে মূর্ত্তিগ্রহণ করিতেছে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আজ তথায় যে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও যে তাঁহারই পরিকল্পিত—তাহার আদর্শও যে তিনিই রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা হয়ত অনেকে জানেন না।

শেষ বার য়ুরোপে গমন করিয়া তিনি (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) তথা হইতে যাহা লিখিয়াছিলেন এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাফল্যে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রকট হইয়াছিল:—

স্বামী বিবেকানন্দ

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যায় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী—নানা দিগ্দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনমধ্যে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতির বুধমণ্ডলীমণ্ডিত রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সেই বহু গৌরবর্ণ জাতিমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলে—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বসু। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে

পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী—বঙ্গবাসী। ধন্য বীর!"

বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন প্রতীচী হইতে স্বদেশ-যাত্রা করেন, তখন—যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে—কোন ইংরেজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্বামীজী, চারি বৎসর বিলাসপূর্ণ, শক্তিশালী, বিরাট প্রতীচীর অভিজ্ঞতার পরে আপনি আপনার স্বদেশ কিরূপ ভালবাসিতেছেন?" স্বামীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতাম। আজ ভারতবর্ষের ধূলিও আমার নিকট পবিত্র—এখন ভারতবর্ষ পুণ্য দেশ—দেবস্থান—তীর্থক্ষেত্র।" যেন বায়রণের সেই কথা—"Where'er we tread 't is haunted holy ground."

স্বামীজী জগতের জীবন অধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতের জীবন সেই ভিত্তির উপর গঠিত; সেই জন্যই তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিকতার সহিত জাতীয়তার সম্মিলনের আদর্শ—তাঁহার স্বদেশী সমাজ বিশেষ প্রিয় ছিল, এবং তাহাতে যে আবর্জ্জনা কালে সঞ্চিত হইয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিতে তাঁহার স্বদেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সেই আদর্শের সন্নিহিতও হইতে পারে না, তাহারা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার অযোগ্যতাহেতু তাহাতে রাজনীতিক বিপ্লববাদের প্রভাব আরোপ করিয়াছিল। সার ভার্ণি লভেট তাঁহার এক বক্তৃতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ উদ্‌ধৃত করিয়াছিলেন :—

"আমি কল্পনাপ্রবণ এবং হিন্দুর দ্বারা জগৎ জয়ই আমার অভিপ্রেত। পৃথিবীতে নানা বিজেতা জাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরাও বিজেতা ছিলাম। ভারতের প্রসিদ্ধ সম্রাট অশোক আমাদিগের বিজয়কে ধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিকতার বিজয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে আবার পৃথিবী জয় করিতে হইবে। * * * বিদেশীরা যদি ভারতে আসিয়া তাহাদিগের সেনাবলে দেশ প্লাবিত করে, তাহাতে কিছুই আইসে-যায় না। ভারতবর্ষ—উত্তিষ্ঠ—তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় কর। এই পুণ্যভূমিতেই উক্ত হইয়াছে, প্রথমে প্রেমের দ্বারা ঘৃণা জয় করিতে হইবে; ঘৃণা আপনাকে জয় করিতে পারে না। জড়বাদ ও তাহার আনুসঙ্গীন দুর্গতি জড়বাদের দ্বারা জয় করা যায় না। সৈনিকরা যখন সৈনিকদিগকে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা কেবল সৈনিকেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করে—মানুষকে পশু করে। প্রতীচীকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় করিতে হইবে। প্রতীচী এখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে, জাতিরূপে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন।"

এই মহান্ উক্তি পাঠ করিয়াও সার ভার্ণি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাবল্যকালে যে বাঙ্গালায় বহু ছাত্রের কক্ষ-প্রাচীরে ও বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের উপদেশ লিখিত ছিল, তাহাতেই তাঁহার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যখন (ইংরেজ) শাসকদিগের কোন কোন ব্যবস্থা জাতীয় বিস্তৃতির পথে বাধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল, তখন এইরূপ শিক্ষায় যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহাতে বাহুবল ও তিক্ততা যোগ করা হয়! মনে পড়ে—"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" অথবা যে মাতৃস্তনে শিশু সুধা লাভ করে, জলৌকা তাহাতে রক্ত ব্যতীত আর কিছুই পায় না। আর বাঙ্গালার জিলা-শাসন কমিটী স্বদেশী আন্দোলনকালে বাঙ্গালার যুবকদিগের নিকট বিবেকানন্দের রচনার আদর লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের লোককল্যাণকর দিক আছে এবং তাহা অনেক সময় যুবকদিগের উৎসাহ সমাজসেবায় আকৃষ্ট করে; কিন্তু বিবেকানন্দের প্রচারিত উপদেশে ধর্ম্মপ্রবণ জাতীয়তার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কথা এত ভিত্তিহীন যে, তাহা বিকৃত বুদ্ধির ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, রামকৃষ্ণ মিশনের জনসেবা ব্যতীত অন্য কোন দিক—কোন উদ্দেশ্য নাই এবং তাহা সর্ব্বদাই যুবকদিগকে জনসেবায় আকৃষ্ট করে—প্ররোচিত করে। আর ধর্ম্মশূন্য জাতীয়তা যে তাহার অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যেই—প্রবিষ্ট-কীট কোরকের মত—নষ্ট হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা জগতের ইতিহাসে পাইয়াছি।

যে ভ্রান্ত ও দুষ্ট বিশ্বাস সার ভার্ণি লভেটের রচনায় ও জিলা শাসন-কমিটীর রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই, তাহাই কোন কোন রাজকর্ম্মচারীকে এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে, তাঁহারা—রেলের প্রয়োজনের ছল ধরিয়া—বেলুড় হইতে মঠ উচ্ছিন্ন করিয়া দিবার হীন প্রচেষ্টায়ও বিরত হয়েন নাই। সুখের বিষয়, সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

বিবেকানন্দ যখন মার্কিণে যাইয়া প্রতীচীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বেদান্তমত গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বলিবেন মনে করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণে ধর্ম্ম-সম্মিলনে গমন করেন, তখনও তিনি স্বদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহার মার্কিণ যাত্রা এ দেশে অনেক লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। মার্কিণে ধর্ম্মসভার অধিবেশন। তথায় নানা দেশ হইতে নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধিরা সমুপস্থিত। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী—প্রবীণ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও যুবক স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবুর নিকট সেই সভায় বিবেকানন্দের বিজয়-বিবরণ শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বক্তার পর বক্তা তথায় হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিলে যুবক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর গাম্ভীর্য্যে দণ্ডায়মান হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, বক্তৃগণের মধ্যে কয় জন হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন? সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি—যেন তাঁহাদিগের ব্যক্ত মত তুচ্ছ বলিয়া উপহাস করিয়া—বলিলেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের বিচার করিতে সাহস করেন! ধৃষ্টতার প্রতি গাম্ভীর্য্যের, অজ্ঞতার প্রতি জ্ঞানের তিরস্কার কি ইহা অপেক্ষা তীব্র হইতে পারে?

আমি যে দিন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি, সে দিন তিনি মার্কিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। যখন তাঁহার যান অশ্বমুক্ত করিয়া তাঁহার অনুরক্ত বাঙ্গালীরা তাহা

স্বামী বিবেকানন্দ

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লইয়া যায়েন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—যানে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি পথের ও পথিপার্শ্বস্থ গৃহ-বাতায়নের জনতার নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছিলেন। সে দিন তাঁহার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার প্রতিকৃতিতে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন—সে তাঁহার বিশালায়ত নেত্র। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলাম; তাহা চিত্রে প্রকট হয় না; তাহা সেই বিশালায়ত প্রতিভাদীপ্ত নেত্রে ব্রহ্মচর্য্যপ্রোজ্জল দৃষ্টি। চক্ষুতে যদি মনের ভাব প্রতিভাত হয়, তবে সে চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বিস্ময়কর মনোভাবের পরিচায়ক।

তাহার কয় দিন পরে যিনি ভোগসুখ বর্জ্জন করিয়া বৃন্দাবনের রজে দেহরক্ষার জন্য তথায় গিয়াছিলেন, সেই রাধাকান্ত দেবের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল।

সেই সময় কলিকাতায় কোন মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? তিনি সেই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে—

যে দেশে পথে, যানে আমাদিগের জননী-ভগিনীরা লাঞ্ছিতা হইতে পারেন, সে দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, শারীর চর্চ্চা—ভীতিজয়।

সেই উক্তির মূলে যে ভাব ছিল তাহা তিনি বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, যে গৃহস্থ তাহার প্রথম প্রয়োজন ধর্ম্মের—মোক্ষের নহে।—

"হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। * * অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা। কথা ত বেশ; তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদ্ধস্তং' ইত্যাদি—হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর্য্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটালাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের সত্য। সত্য, সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে স্ত্রী-পরিবার প্রতি-পালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ'!!"

ধর্ম্ম কার্য্যমূলক। 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দ সেই কথা মহেন্দ্রকে বুঝাইয়াছিলেন—অহিংসা যে বৈষ্ণবের পরম ধর্ম্ম—

"সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। * * * প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশ বার শরীরধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংশ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা। * * * চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়।"

তিনি "সন্তানদিগকে" আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন,

মধু-মুর-নরকমর্দ্দন, লোকপালন তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন।”

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্ম্মমূলক নহে, তাহা গৃহীর জন্য নহে। তাহার প্রমাণ আমরা বাঙ্গালায় স্বাধীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের পতনে দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুর “মল্লভূমি”—তাহা অজেয় ছিল—তথায় রাজা এমন বীর ছিলেন যে, লোক মনে করিত, যুদ্ধকালে পুরদেবতা স্বয়ং শক্রনাশের জন্য কামান চালনা করিতেন। সে রাজ্যের মহিলারাও কিরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তাহার প্রমাণও ইতিহাসে আছে। রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া যবনীপ্রীতি-পরবশ হইলে প্রজারা পট্টমহারাণীর নিকট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—যে রাজা ধর্ম্মভ্রষ্ট তিনি বধ্য। তিনিই শয়নাগারের দ্বার অনর্গল করিয়া হত্যাকারীদিগকে তথায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে হত্যা করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাহার পরে—পতির চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুপুর-বাসীরা যখন কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম বর্জ্জন করে, তখনই তাহার পতন হয়। তখন রাজা গোপাল সিংহ যুদ্ধশিক্ষার পরিবর্ত্তে মালাজপ বাধ্যতামূলক করেন। সেই সময়ের কথা—“গোপাল সিংহের বেগার খাটা।” কোন শ্রমিক দীর্ঘ দিন শ্রমের পর শয়ন করিয়া যখন স্মরণ করিল, তাহার মালা জপ করা হয় নাই, তখন—পাছে রাজা জানিতে পারেন সেই ভয়ে—স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, “মালাটা আন—গোপাল সিংহের বেগার খাটি।”

প্রেমধর্ম্মের যে কোন প্রয়োজন নাই অথবা তাহার গৌরব যে অল্প—এমন নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। কিন্তু সে সবই হিন্দুধর্ম্মের অংশ—সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম্ম নহে। সেই জন্যই ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন:—

"Nirvana was reached by annihilation of egoism. Mukti was reached by development of personality. These two doctrines are but obverse and reverse of one coin. Adwaita was the secret of the two. Concentration and renunciation, not any given creed—were the differential of the Hindu. Hinduism is thus a synthesis not a sect, a spiritual university not a spiritual church and of this synthesis Buddhism is an inalienable part."

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বজননাশসম্ভাবতাকাতর অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—“ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ” কারণ—

“অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥”

বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম স্বধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষ যে তাহার আধ্যাত্মিকতাহেতুই অমর সেই সত্য আমরা বিস্মৃত হইতেছিলাম। কিন্তু সেই অমরত্বের কারণ উপলব্ধি করিয়াই বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:—

“বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, এটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এ দু'টি প্রথম বোঝ, আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্বহি সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু', 'তোমরা, হে ইয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ, আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে হাসেন হোসেন করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি—আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে, ভারতবর্ষ থেকে, এক দিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর এক দিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সিবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী। উনি চীন জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন; ওঁকেই যীশুর মা মেরী করে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ঐ কৈলাস দশমুণ্ড কুড়ি হাত রাবণ নাড়াতে পারেনি, ও কি এখন পাদ্রী টাদ্রীর কর্ম্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?”

তিনি বলিয়াছেন:—

“ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর * * আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহাউৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর। শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হ'লো; ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না * * আর, আমরা কোণে বসে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দিনরাত, মরণের ভাবনা ভাবছি। * * গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কার্য্য করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!!! * * * ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন; দেশটার বাঁচবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ৩০ ক্রোর লোক, দেরি হচ্ছে। ৩০ ক্রোর লোককে চেতানো কি এক দিনে হয়?”

এই সকল উক্তি-প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়—ভাষা। ভাবপ্রকাশক্ষমতাই ভাষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ও গুণ। আজ যখন সাধারণ কথ্য ভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা হয় এবং কোন কোন লোক

ধৃষ্টতা সহকারে বলেন, তাঁহারাই সে বিষয়ে পথিপ্রদর্শক, তখন ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিবেকানন্দের এই সব প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অজ্ঞতা তাহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন করে।

"কমলাকান্ত"রূপী বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কাল-সমুদ্রে আতৃসন্ধানে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "কোথা মা"—"কই মা আমার?"—বিবেকানন্দ তেমনই প্যারিসের মহা-প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্মভূমি তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি?" আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে তিনি সোল্লাসে বলিয়াছিলেন—জগদীশচন্দ্র "ভারতবাসী, বঙ্গবাসী।" ভারতবর্ষকে আমরা ভালবাসি; কিন্তু বাঙ্গালা আমাদিগের অধিক প্রিয়। কেবল তাহই নহে —বাঙ্গালা হইতে ভালবাসার পরিধি-বিস্তার করিয়া

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীর-ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার

বেলুড়ে মন্দির
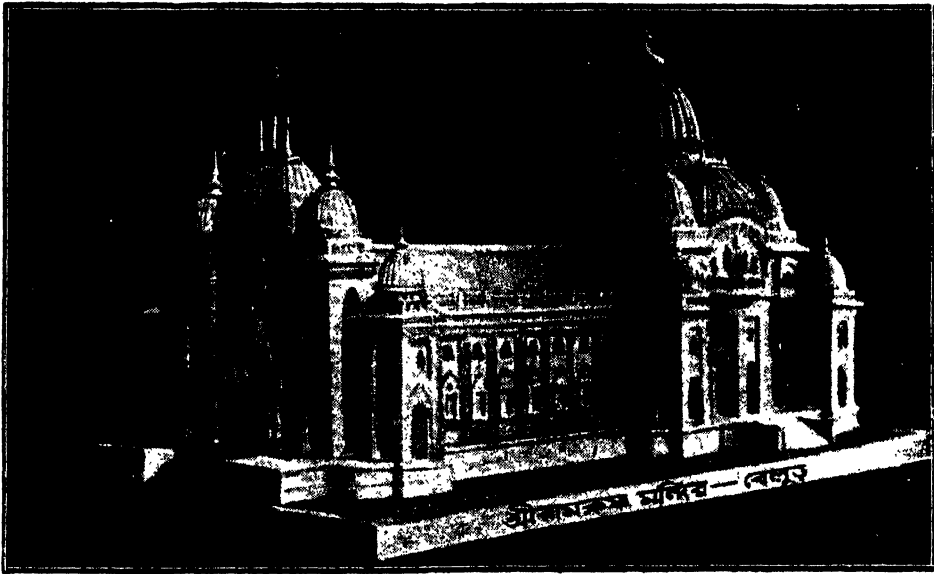
প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

ভারতবর্ষকে সেই পরিধিভুক্ত করাই সঙ্গত। সেই পদ্ধতি কৃষ্ণপ্রণামে সপ্রকাশ:—

> হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
> গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে॥"

রাধাকান্তকে উপলব্ধি করিয়া—ভালবাসিয়া ক্রমে কৃষ্ণকে লাভ করিতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেশকে—এই হিন্দুস্থানকে ভালবাসিতেন বলিয়াই ভারতবাসীর উন্নতির পথিনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—সে পথে যে সকল বিঘ্ন পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সে সকল অপসারণে লোককে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। সমাজের যে স্তর হইতে শক্তি উদ্গত হয় সেই স্তরের লোককে অবজ্ঞা করার প্রতিবাদ করিয়া তিনি 'বর্ত্তমান ভারতের' উপসংহারে বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছেন:—

সন্ন্যাসীর ত্যাগের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান বিবেকানন্দের এই উপদেশ—এই নির্দ্দেশ পাঠ করিতে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে; মনে হয়, কবি হেমচন্দ্র কি কল্পনায় বিবেকানন্দের প্রচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? সেই—

> "আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
> সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
> শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী—
> নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী;
> বদনে ভাতিল অতুল আভা।"

বৈজয়ন্তীর গৌরবরক্ষা কিরূপে করিতে হয়, তাহাও বিবেকানন্দ বুঝাইয়া গিয়াছেন :—

"ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারই
ধ্বজা নিয়ে আগে চলে।
তলে তা'র ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়
তবু পিছে নাহি টলে।"

যে দেশপ্রেম আধ্যাত্মিকতার উৎস হইতে উদ্গত হয়, তাহাতে কৃত্রিমতাও থাকে না, বিদ্বেষবিষও থাকে না। তিনি সেই স্বদেশপ্রেমের প্রচারক হইয়া বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের দ্বারা আধ্যাত্মিকতায় পৃথিবীজয় তাঁহার কাম্য—তাঁহার স্বপ্ন।

আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বজয়ী—তাহা সর্ব্ববিধ হীনতাকে জয় করে—তাহাই জড়বাদজর্জ্জরিত সভ্যতায় পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া তাহাকে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারে। তাহাতে কোনরূপ দৌর্ব্বল্যের স্থান নাই। তাহা বীরের ধর্ম্ম। বীর বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশের নরনারীকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহারা যেন সেই দীক্ষার দায়িত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন—ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য যে অভিন্ন তাহা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার মৃত্যু তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বার য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি বেলুড়ে মঠে তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করেন। সাধুদিগকে পাণিনি পড়াইয়া তিনি ধ্যানস্থ হয়েন। সেই সমাধি আর ভঙ্গ হয় নাই। সেই অবস্থায় তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শরীর ত্যাগ করেন। মৃত্যুর বহু দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন হয়ত দেহত্যাগ করাই তিনি কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন—জীর্ণবাসের মত দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু তিনি কার্য্যসাধনে বিরত হইবেন না! যত দিন পৃথিবীর লোক জগত ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি না করিবে, তত দিন তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোককে সেই বিশ্বাসে প্রণোদিত করিবেন।

স্বামীজী যে সেই কার্য্য করিবেন, তাহা মনে করিলে আনন্দোদয় হয়। তিনি যখন বলিয়াছিলেন—এ দেশে "যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই"—তখন কয় জন কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র য়ুরোপ যুদ্ধের দাবানলে দগ্ধ হইবে এবং সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই তাহার জলদঙ্গার হইতে আবার—আরও ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং তাহার লেলিহান শিখা কেবল প্রতীচীকে দগ্ধ করিয়াই নির্ব্বাপিত না হইয়া সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইবে? সেই সকল যুদ্ধেই আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত জড়বাদী সভ্যতার অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে। হয়ত আরও কিছু দিন পরে য়ুরোপ ও মার্কিণ বুঝিবে—ভারতের "এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে।" সে দান কি তাহা স্বামীজী বুঝাইয়া গিয়াছেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। সেই আধ্যাত্মিকতার উৎস এই ভারতেই লাভ করিতে হইবে। সেই জন্যই স্বামীজী অশোকের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, —ধর্ম্মের দ্বারা—আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ভারতবর্ষ পৃথিবী জয় করিবে—ইহাই তাঁহার স্বপ্ন। তিনি ভারতবাসীকে সেই জয়ের জন্য—দিগ্বিজয়ীর জয়যাত্রা করিতে বলিয়াছেন—সে আহ্বান তাঁহার তূর্য্যনিনাদে ধ্বনিত হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুতে ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।"

তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষ আবার পৃথিবী জয় করিবে—বাহুবলে নহে, আত্মিক বলে। ভারতবর্ষ আবার তাহার কর্ত্তব্যে প্রবুদ্ধ হইবে—তবে এ দেশে ৩০ কোটি লোক—তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা সময়-সাধ্য। হয়ত প্রতীচীর যুদ্ধাদিজনিত দুর্গতির মধ্য দিয়াই সেই সময়সাধ্য কার্য্য সাধনার সময় সমুপস্থিত হইতেছে। আর স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সেই দিনের মঙ্গল-আহ্বান জানাইতেছে। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ আপনার কমণ্ডলু লইয়া সেই সুধা দান করিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।

নব ভারতের উপদেষ্টা বিবেকানন্দের বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই :—

"As some tall cliff that lifts its
awful form,
Swells from the vale, and midway
leaves the storm,
Though round its breast the
rolling clouds are spread,
Eternal sunshine settles on its
head."

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(১০) মোহ—দৈবোপঘাত, ব্যসনাভিঘাত, ব্যাধি, ভয়, আবেগ, পূর্ব্ববৈর-স্মরণ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। চৈতন্যহীনতা, ভ্রমণ, পতন, আঘূর্ণন, অদর্শন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় ১।

এ প্রসঙ্গে একটি অনুষ্টুপ্ শ্লোক ও একটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

অস্থানে তস্কর-সমূহের দর্শনে ও নানা প্রকার ত্রাস-হেতু-দ্বারা উহার প্রতিকার-শূন্য ব্যক্তির মোহ জন্মিয়া থাকে ২।

ব্যসন-অভিঘাত-ভয়-পূর্ব্ববৈর-স্মরণ - রোগাদি - জনিত মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ের সম্মোহ-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য ৩।

(১১) স্মৃতি—সুখ-দুঃখ-কৃত ভাব-সমূহের অনুস্মরণ। উহা স্বাস্থ্য, শেষরাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ, সমান-দর্শন, উদাহরণ, চিন্তা, অভ্যাস ইত্যাদি বিভাব হইতে জন্মে। শিরঃকম্প, অবলোকন, ভ্রূ-সমুন্নমন, (প্রহর্ষ) ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় ৪।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

অতিক্রান্ত সুখ-দুঃখ, যথাযথভাবে সংঘটিত অতীত ঘটনা দীর্ঘদিন বিস্মৃত হইলে পর বুদ্ধিবলে যিনি স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে 'স্মৃতিমান্' বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্য (অস্বাস্থ্য ?) ও অভ্যাস হইতে জাত, ও শ্রবণ ও দর্শন হইতে উদ্ভূত স্মৃতি, নিপুণগণ-কর্ত্তৃক শির উদ্বাহন-কম্প-ভ্রূবিক্ষেপাদি-দ্বারা অভিনেয় ৫।

(১২) ধৃতি—শৌর্য্য-বিজ্ঞান-শ্রুতি-বিভব-শুচিতা-আচার-গুরুভক্তি—অধিক-মনোভীষ্টপূরণ—অধিক—অর্থলাভ—বিবিধ-ক্রীড়াদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। প্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগ, ও অপ্রাপ্ত, বিগত, উপহত, বিনষ্ট বিষয়ের অনুশোচনার অভাব-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বিজ্ঞান-বিভব-শ্রুতি-শক্তি-শৌচ-সম্ভূতা, ভয় শোক-বিষাদাদি-রহিতা ধৃতির প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই পঞ্চ প্রাপ্ত বিষয়ের

---

(১) "মোহো নাম—দৈবোপঘাত-ব্যসনোপঘাত (ব্যসন) ব্যাধি-ভয়বেগপূর্ব্ববৈরস্মরণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্য নিশ্চেতন্যভ্রমণ (নিশ্চেষ্টিতাঙ্গভ্রমণ) পতনাঘুর্ণনাদর্শনাদিভি (পতনঘূর্ণনদর্শনাদিভি) র্বিভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ"।

—নাঃ শাঃ বরোদা সং, পৃঃ ৩৬৩

দৈবোপঘাত—দৈব-কর্ত্তৃক উপঘাত—দৈব-দুর্বিপাক। ব্যসন—এ স্থলে অর্থ বিপৎ। অদর্শন—কাশী সংস্করণের পাঠ দর্শন—মোহে অদর্শনই স্বাভাবিক। কাশী সংস্করণের পাঠ শুদ্ধ নহে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অস্থানে সহসা চৌর বা অন্য কোন ভয়-হেতু (ভূত-প্রেতাদি) দর্শন করে ও উহার প্রতিবিধানের কোন উপায় তাহার না থাকে, তাহা হইলে ভয়ের আতিশয্যে সে মোহ-গ্রস্ত হয়—ইহা স্বাভাবিক।

(৩) অত্র শ্লোকস্তাবদার্য্যা চ—

অস্থানে তস্করান্ দৃষ্ট্বা ত্রাসনৈর্বিবিধৈরপি (ত্রাসনৈ র্বা পৃথগ্বিধৈঃ)।

তৎপ্রতীকারশূন্যস্য মোহঃ সমুপজায়তে। ৭৯।

ব্যসনভিঘাতভয়পূর্ব্ববৈরসংস্মরণরোগজো মোহঃ

(……সংস্মরণজো ভবতি মোহঃ)।

সর্বেন্দ্রিয়সম্মোহাত্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ"। ৮০।

—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, পৃঃ ৩৬৩-৬৪

কাশী সংস্করণে 'অত্র শ্লোকঃ' 'অত্র আর্য্যা' বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ আছে।

(৪) "স্মৃতির্নাম সুখদুঃখকৃতানাং ভাবানামনুস্মরণম্। সা চ স্বাস্থ্য-জঘন্যরাত্রিনিদ্রাচ্ছেদসমানদর্শনোদাহরণচিন্তাভ্যাসাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েচ্ছিরঃকম্পনাবলোকনভ্রূসমুন্নমন (প্রহর্ষা) দিভিরনুভাবৈঃ"—না শাঃ, পৃঃ ৩৬৪

স্বাস্থ্য—পাঠান্তর আছে—সা চাস্বাস্থ্য…। পাঠটিতে বর্ণাশুদ্ধি থাকিলেও উহার অর্থ-সঙ্গতি আছে। অস্বাস্থ্য-বশতঃ নানারূপ স্মৃতি জন্মে। জঘন্যরাত্রিনিদ্রাচ্ছেদ—শেষরাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে নানা কথার স্মরণ হয়।

সমানদর্শন—সমভাব-দর্শনেও স্মৃতি জন্মে—আমারও এইরূপ সুখ বা দুঃখ হইয়াছিল। উদাহরণ—উল্লেখ—সমান বিষয়ের উল্লেখ। সমভাব-দর্শনে যেমন স্মৃতির উদ্রেক হয়, সমভাবের শ্রবণেও তদ্রূপ জন্মে। অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ কোন বিষয়ের অনুশীলন।

(৫) "সুখদুঃখমতিক্রান্তং তথা মতিবিভাবিতং যথাবৃত্তম্।
চিরবিস্মৃতং স্মরতি যঃ স্মৃতিমানিতি বেদিতব্যোঽসৌ॥
(কাশী সংস্করণে এই আর্য্যাটি শ্লোকাকারে পঠিত—
সুখদুঃখমতিক্রান্তং তথা মতিবিভাবিতম্।
বিস্মৃতং চ যথাবৃত্তং স্মরেদ্ যঃ স্মৃতিমানসৌ॥)
স্বাস্থ্যাভ্যাসসমুত্থা শ্রুতিদর্শনসম্ভবা স্মৃতির্নিপুণৈঃ।
শিরউদ্বাহনকম্পৈর্ভ্রূক্ষেপৈশ্চাভিনেতব্যা॥
(……ভ্রূবিক্ষেপৈঃ সাভিনেতব্যা")

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৪

মূলে পাঠ 'স্বাস্থ্য' ধরা আছে। অস্বাস্থ্য পাঠটি অধিকতর সঙ্গত মনে হয়—অসুস্থাবস্থায় পূর্ব্বকার সুস্থাবস্থার স্মৃতি মনে জাগে। তবে সুস্থ থাকিলেও স্মৃতি-শক্তি প্রবল থাকে। এ কারণে 'স্বাস্থ্য' পাঠও রক্ষা করা যায়। শ্রুতিদর্শন-সম্ভবা—সম বিষয়ের শ্রবণ বা দর্শনে স্মৃতি জন্মে।

গ—ও ইহাদিগের অপ্রাপ্তিতে শোকাভাব যাহাতে বিদ্যমান, তাহাই ধৃতি ৬।

(১৩) ব্রীড়া—অকার্য্যকরণাত্মিকা। গুরুজনের আজ্ঞাদির উল্লঙ্ঘন, অবজ্ঞা, প্রতিজ্ঞার অপরিপালন, কৃতকার্য্যের অস্বীকার, পশ্চাত্তাপ ইত্যাদি বিভাব হইতে জাত। নিগূঢ় বদন, অধোমুখে বিচিন্তন, পৃথ্বীতলে লিখন, বস্ত্রাঙ্গুলী সংস্পর্শ, নখ-নিকৃন্তন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

কোন অকার্য্য করিতেছে এরূপ কোন লোককে যদি অন্য সাধু ব্যক্তিগণ দেখিতে পান, তখন সে ব্যক্তি অনুতাপ-গ্রস্ত হইলে তাহাকে ব্রীড়াযুক্ত বলা চলে।

লজ্জায় মুখ-গোপন করিয়া ভূমি-লেখন, নখচ্ছেদন, বস্ত্র ও অঙ্গুলীয়কাদির সংস্পর্শ ব্রীড়া-যুক্ত ব্যক্তি করিয়া থাকে ৭।

---

(৬) "ধৃতির্নাম—শৌর্য্যবিজ্ঞানশ্রুতিবিভবশৌচাচারগুরুভক্ত্যধিকমনোরথার্থলাভ (বিবিধ) ক্রীড়াদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ প্রাপ্তানাং বিষয়াণামুপভোগাদপ্রাপ্তাতীতোপহতবিনষ্টানামনুশোচনাদিভিরনুভাবৈঃ। অত্রার্য্যে ভবতঃ—

বিজ্ঞানশৌচবিভবশ্রুতিশক্তিসমুদ্ভবা ধৃতিঃ সদ্ভিঃ।
ভয়শোকবিষাদাদ্যৈ রহিতা তু সদা প্রয়োক্তব্যা। ৮৫।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৪

প্রাপ্তানামুপভোগঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্।
অপ্রাপ্তৈশ্চ ন শোকো (অপ্রাপ্তে ন হি শোকো) যস্যাং হি ভবেদ্ ধৃতিঃ সা তু" । ৮৬। —নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৪-৬৫

শ্রুতি—শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান।

(৭) "ব্রীড়া নাম—অকার্য্যকরণাত্মিকা। সা চ গুরুব্যতিক্রমণাবজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা (না) নির্ব্বহণ (কৃতপ্রত্যাদিষ্ট) পশ্চাত্তাপাদিভিবিভাবাদিভিঃ সমুৎপদ্যতে। তাং নিগূঢ়বদনাধোমুখবিচিন্তনোর্ব্বীলেখনবস্ত্রাঙ্গুলীয়কস্পর্শননখনিকৃন্তনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ। অত্রার্য্যে ভবতঃ—

কিঞ্চিদকার্য্যং কুর্ব্বন্নেবং যো (কুর্ব্বন্ যো হি নরো) দৃশ্যতে শুচিভির্যঃ।
পশ্চাত্তাপেন যুতো ব্রীলিত (ব্রীড়িত) ইতি বেদিতব্যোঽসৌ।
লজ্জানিগূঢ়বদনো ভূমিং বিলিখন্নখাংশ্চ (নখৈশ্চ) বিনিকৃন্তন্।
বস্ত্রাঙ্গুলীয়কানাং সংস্পর্শং ব্রীলিতঃ (ব্রীড়িতঃ) কুর্য্যাৎ" । ৭১

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৫

গুরুব্যতিক্রমণ—গুরুর আদেশ পালন না করা। অবজ্ঞান—গুরুকে উপেক্ষা করা, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা। প্রতিজ্ঞা নির্ব্বহণ—প্রতিজ্ঞার অনির্ব্বহণ—প্রতিজ্ঞা পালন না করা। কৃত-প্রত্যাদিষ্ট—করিয়া উহা অস্বীকার করা। পশ্চাত্তাপ—অনুতাপ। নিগূঢ়বদন—মুখলুকান। অধোমুখ-বিচিন্তন—অধোমুখে চিন্তা, অথবা অধোমুখ থাকা ও চিন্তা করা। উর্ব্বীলেখন—পায়ের নখ বা অন্য কিছু দিয়া মাটিতে লেখা। বস্ত্রাঙ্গুলীয়ক-স্পর্শন—বস্ত্র ও অঙ্গুলীয়ক (আংটীয়ক) স্পর্শ; অথবা—আঙুলে বস্ত্র জড়ান। নখ-নিকৃন্তন—নখ কাটা বা নখ খোঁটা।

(১৪) চপলতা—রাগ-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-অমর্ষ-ঈর্ষ্যা-প্রতিকূলতাদি বিভাব হইতে সঞ্জাত; বাক্পারুষ্য, ভৎর্সনা, সম্প্রহার, বধ, বন্ধন, তাড়ন, (জ্ঞাপন) ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র আর্য্যা উক্ত হইয়াছে—

বিবেচনা না করিয়া কোন ব্যক্তি বধ-তাড়নাদি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, অবিনিশ্চিতকারিত্বহেতু সে ব্যক্তি চপল বলিয়া বুধগণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ৮।

(১৫) হর্ষ—মনোরথ-প্রাপ্তি, ইষ্টজন-সমাগম, মনঃ-সন্তোষ, গুরু-নৃপ-প্রভুর প্রসন্নতা, ভোজন-বস্ত্র-(ধন)-লাভ, উপভোগ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নয়ন-বদনের প্রসন্ন ভাব, প্রিয়বাক্য কথন, আলিঙ্গন, পুলক, অশ্রু, স্বেদোদ্গম, মৃদু তাড়ন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

অপ্রাপ্য বা প্রাপ্য অর্থের প্রাপ্তিতে, প্রিয়-সমাগমে, হৃদয়-মনোরথ-লাভে পুরুষগণের হর্ষ উৎপন্ন হয়।

নয়ন বদনের প্রসন্ন ভাব, প্রিয়ভাষণ, আলিঙ্গন, রোমাঞ্চ, ললিত অঙ্গ-বিক্ষেপ, স্বেদ ইত্যাদি দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য ৯।

---

(৮) "চপলতা নাম—রাগদ্বেষমাৎসর্য্যামর্ষের্ষ্যাপ্রতিকূলাদিভিবিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাশ্চ বাক্পারুষ্যনির্ভৎসনবধবন্ধসম্প্রহারতাড়না (জ্ঞাপনা) দিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। অত্রার্য্যা ভবতি—

অবিমৃশ্য তু যঃ কার্য্যং পুরুষো বধতাড়নং (বধবন্ধনাদিকং) সমারভতে।
অবিনিশ্চিতকারিত্বাৎ স তু খলু চপলো বিবোদ্ধব্যঃ (বুধৈর্জ্ঞেয়ঃ)। —নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৬

রাগ—অনুরাগ। দ্বেষ—অপ্রীতি, বিদ্বেষ, অপকার। মাৎসর্য্য—অন্যশুভদ্বেষ। অমর্ষ—ক্রোধ, অসহন। ঈর্ষ্যা—অক্ষমা, পরোৎকর্ষের অসহিষ্ণুতা। অসূয়া—পরগুণে দোষাবিষ্করণ। প্রতিকূলতা—বিরোধ।

অবিনিশ্চিতকারী—নিশ্চয় না করিয়া যে ব্যক্তি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

(৯) হর্ষো নাম—মনোরথলাভে (ভিতাপ্তী) ইষ্টজনসমাগমমনঃপরিতোষদেবগুরুরাজভর্ত্তৃপ্রসাদভোজনাচ্ছাদন-(ধন) লাভোপভোগাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তমভিনয়েন্নয়নবদনপ্রসাদপ্রিয়ভাষণালিঙ্গনকণ্টকিতপুলকিতস্বেদাদিভিরনুভাবৈঃ (স্বেদোদ্গমললিততাড়নাদিভিরনুভাবৈঃ)। অত্রার্য্যে ভবতঃ—

অপ্রাপ্যে প্রাপ্যে বা (প্রাপ্যে বাপ্রাপ্যে বা) লব্ধেঽর্থে প্রিয়সমাগমে বাপি।
হৃদয়মনোরথলাভে হর্ষঃ সঞ্জায়তে পুংসাম্। ৯৩।
নয়নবদনপ্রসাদপ্রিয়ভাষালিঙ্গনৈশ্চ রোমাঞ্চৈঃ।
ললিতৈশ্চাঙ্গবিহারৈঃ স্বেদাদ্যৈরভিনয়স্তস্য" । ৯৪।

—নাঃ শাঃ পৃঃ ৩৬৫

কণ্টকিত, পুলকিত—উভয়ই প্রায় একরূপ। একারণে কাশী সংস্করণে 'পুলকিত' আর পৃথক্ ধরা হয় নাই।

(১৬) আবেগ—উৎপাত, বাত্যা, বর্ষণ, অগ্নিদাহ, হস্তীর উদ্‌ভ্রমণ, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ, প্রাকৃতিক বিপত্তি, অভিঘাত ইত্যাদি বিভাব হইতে সমুৎপন্ন ১০।

(ক) উৎপাত-কৃত আবেগ, যথা—বিদ্যুৎ, উল্কা, নির্ঘাত-প্রপতন, চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ, ধূমকেতু দর্শন নিমিত্ত। সর্ব্বাঙ্গের স্রস্তভাব, বৈমনস্য, মুখবৈবর্ণ্য, বিষাদ, বিস্ময় ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় ১১।

(খ) বাত-কৃত আবেগ—অবকুণ্ঠন, অক্ষি-মার্জ্জন, বস্ত্র-সংগ্রহণ, ত্বরিত গমন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় ১২।

(গ) বর্ষ-কৃত আবেগ—সর্ব্বাঙ্গ সম্পীড়ন, প্রধাবন, আচ্ছাদন, আশ্রয়ান্বেষণ ইত্যাদি দ্বারা অভিনেয় ১৩।

(ঘ) অগ্নিজনিত আবেগ—ধূমাকুল-নেত্রের ভাব, অঙ্গ-সঙ্কোচ, বিধূনন, অতিক্রমণ, অপক্রমণ ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা প্রদর্শনীয় ১৪।

(ঙ) কুঞ্জরোদ্‌ভ্রমণ-কৃত আবেগ—সত্বর সরিয়া যাওয়া, চঞ্চলভাবে গমন, ভয়,স্তব্ধ ভাব, কম্প, পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ, ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় ১৫।

(চ) প্রিয়-শ্রবণ-হেতুক আবেগ—অভ্যুত্থান (উঠিয়া পড়া) আলিঙ্গন, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় ১৬।

(ছ) অপ্রিয়-শ্রবণে উৎপন্ন আবেগ—ভূমিতে পতন, বিষম বিবর্ত্তন, পরিধাবন, বিলাপ, আক্রন্দন, ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় ১৭।

(জ) প্রাকৃতিক-ব্যসন-জাত আবেগ—সহসা অপসর্পণ, শস্ত্র-চর্ম্ম-বর্ম্ম-ধারণ, গজ-তুরগ-রথারোহণ, সম্প্রধারণ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় ১৮।

সম্ভ্রমাত্মক আবেগের এই আট প্রকার ভেদ। উত্তম-প্রকৃতি ও মধ্যম-প্রকৃতির পক্ষে স্থৈর্য্য ও নীচ-প্রকৃতির পক্ষে অপসর্পণাদি-দ্বারা উহা প্রদর্শনীয় ১৯।

---

(১০) "আবেগো নাম—উৎপাতবাতবর্ষাগ্নিকুঞ্জরোদ্‌ভ্রমণ-প্রিয়াপ্রিয় শ্রবণপ্রকৃতিব্যসনাভিঘাতাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে"।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭

কাশীসংস্করণে 'প্রকৃতিব্যসন' পাঠ নাই—'ব্যসনাভিঘাত' পাঠ ধৃত হইয়াছে। উৎপাত—ইহার বিবরণ পরে মূলেই প্রদত্ত হইয়াছে; ১১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বাত—বাত্যা। বর্ষ—বৃষ্টি। কুঞ্জরোদ্‌ভ্রমণ—হাতী ক্ষেপিয়া যদি ছুটিয়া বেড়ায়। প্রকৃতিব্যসন ও অভিঘাত—বরোদা সংস্করণে অভিঘাতের দৃষ্টান্ত আর পৃথক্ ধরা হয় নাই—প্রকৃতি ব্যসনাভিঘাত একটি পদ ধরা হইয়াছে অনুমান করা যায়। কাশী সংস্করণে ত 'ব্যসনাভিঘাত' স্পষ্ট একপদ ধরা হইয়াছে।

(১১) "তত্রোৎপাতকৃতো নাম বিদ্যুদুল্কানির্ঘাতপ্রপতনচন্দ্রসূর্য্যোপরাগকেতুদর্শনকৃতঃ (দর্শনাদিবিভাবৈরুৎপদ্যতে")—তমভিনয়েৎ সর্ব্বাঙ্গস্রস্ততাবৈমনস্যমুখবৈবর্ণ্যবিষাদবিস্ময়াদিভিঃ"।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭

নির্ঘাত—বিনাশ, প্রলয়, প্রবল বাত্যা, ঘূর্ণিবায়ু, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প। বায়ু যখন বিপরীত-বেগশালী বায়ু-কর্ত্তৃক প্রহত হইয়া গগন হইতে অধোদেশে পতিত হয়, তখন উহাতে যে প্রচণ্ড ঘোর নির্ঘোষ উৎপন্ন হয় তাহার নাম নির্ঘাত—"বায়ুনা নিহতো বায়ুর্গগনাচ্চ পতত্যধঃ। প্রচণ্ডঘোরনির্ঘোষো নির্ঘাত ইতি কথ্যতে"। উপরাগ—রাহুগ্রাস, গ্রহণ। কেতু—ধূমকেতু বা অপর কোন অমঙ্গল চিহ্ন।

(১২) "বাতকৃতং পুনরবকুণ্ঠনাক্ষিপরিমার্জ্জনবস্ত্রসংগ্রহ (সংগ্রহণ) ত্বরিতগমনাদিভিঃ"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭। অবকুণ্ঠন—পরিবেষ্টন, আকর্ষণ। অক্ষি-পরিমার্জ্জন—ঝড়ে ধূলা উড়িয়া চোখে পড়িয়াছে এই ভাব দেখাইতে হইবে। বস্ত্রসংগ্রহণ—ঝড়ে কাপড় উড়িয়া যাইতেছে—উহা টানিয়া রাখা হইতেছে যাহাতে না উড়িয়া যায়—এই ভাব। ত্বরিত গমন—যেন ঝড়ের বেগে ঠেলা মারিয়া লইয়া যাইতেছে—এই ভাব।

(১৩) "বর্ষকৃতং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পীড়নপ্রধাবনচ্ছত্রাশ্রয়মার্গণাদিভিঃ (সর্ব্বাঙ্গসংপিণ্ডনপ্রধাবনচ্ছত্রাশ্রয়ণাদিভিঃ)"।—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭।

সর্ব্বাঙ্গসম্পীড়ন বা সর্ব্বাঙ্গসংপিণ্ডন—সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে—নিঙড়াইয়া যেন জল বাহির করা হইতেছে—এই ভাব দেখাইতে হইবে। ছত্র—দেহাচ্ছাদন। কাশীর পাঠ—ছত্রাশ্রয়ণ—

(১৪) "অগ্নিকৃতং নাম—ধূমাকুলনেত্রতাঙ্গসঙ্কোচবিধূননাতিক্রান্তাপক্রান্তাদিভিঃ (……নেত্রসঙ্কুচনাঙ্গসংবেগবিধূননাতিক্রান্তপাদাদিভিঃ)

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭

বিধূনন—কম্পন। অতিক্রান্ত—ডিঙ্গাইয়া যাওয়া। অপক্রান্ত—পলায়ন।

(১৫) "কুঞ্জরোদ্‌ভ্রমণকৃতং নাম ত্বরিতাপসর্পণচঞ্চল (চপল) গমনস্তব্ধস্তম্ভবেপথু পশ্চাদবলোকনবিস্ময়াদিভিঃ"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭। ত্বরিতাপসর্পণ—তাড়াতাড়ি পালান। বেপথু—কম্প। পশ্চাদবলোকন—পিছনে তাকান—হাতী তাড়া করিয়া আসিতেছে কিনা—ইহা দেখিবার ভাণ করা।

(১৬) "প্রিয়শ্রবণকৃতং নামাভ্যুত্থানালিঙ্গনবস্ত্রাভরণপ্রদান (প্রোদ্যতা) শ্রুপুলকাদিভিঃ"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭।

(১৭) "অপ্রিয়শ্রবণকৃতং নাম ভূমিপতনবিষমবিবর্ত্তনপরিধাবন-বিলাপনাক্রন্দনাদিভিঃ (ভূমিপতনপরিদেবিতবিষমপরিবর্ত্তিতপরিধাবিত-বিলাপরুদিতাদিভিঃ)—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭। বিষমবিবর্ত্তন—ভয়ানকভাবে ওলোট-পালোট চাওয়া। বিলাপ—করুণবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক রোদন। আক্রন্দন—কাহারও নাম ধরিয়া উচ্চ রোদন। পরিদেবন—অনুশোচনা-পূর্ব্বক ক্রন্দন। রোদন—ক্রন্দন, অশ্রুপাত।

(১৮) "প্রকৃতিব্যসনকৃতং নাম (ব্যসনাভিঘাতকৃতং) সহসাপসর্পণ (পক্রমণ) শস্ত্রচর্ম্মবর্ম্মধারণগজতুরগরথারোহণসম্প্রধারণাদিভিঃ (সম্প্রহরণাদিভিরভিনয়েৎ)"—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৭-৬৮ সম্প্রধারণ—বিচারণ। সম্প্রহরণ—যুদ্ধ।

(১৯) "এবমষ্টবিকল্পোঽয়মাবেগঃ সম্ভ্রমাত্মকঃ (ইত্যেবোঽষ্টবিধো জ্ঞেয় আবেগঃ সম্ভ্রমাত্মকঃ)।

স্থৈর্য্যেণোত্তমমধ্যানাং নীচানাং চাপসর্পণৈঃ" ॥ ১৬॥

এই প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

অপ্রিয় নিবেদন অথবা সহসা অভিধারিত শত্রুবাক্য-শ্রবণ, শস্ত্রক্ষেপ, অথবা ত্রাস হইতে আবেগ উৎপন্ন হয়।

যে আবেগ অপ্রিয়-নিবেদন-জনিত, উহার অনুভাব বিষাদ-ভাবাশ্রিত। পক্ষান্তরে, সহসা অরি-দর্শনে যে আবেগ, প্রহরণ-পরিঘট্টন-দ্বারা উহার অভিনয় প্রদর্শনীয় ২০।

(১৭) জড়তা—সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের বোধ না হওয়া। ইষ্ট বা অনিষ্ট শ্রবণ বা দর্শন, ব্যাধি ইত্যাদি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। অকথনীয় বাক্যের উক্তি, তূষ্ণীম্ভাব (কথা না বলা), অনিমেষ দৃষ্টি, পরবশতা ইত্যাদি অনুভাব, দ্বারা ইহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

মোহবশতঃ যে ব্যক্তি ইষ্ট বা অনিষ্ট, সুখ বা দুঃখ বুঝিতে পারে না, তূষ্ণীম্ভাবাশ্রিত, পরবশ সেই পুরুষকে 'জড়'-সংজ্ঞা-দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে ২১।

(১৮) গর্ব্ব—ঐশ্বর্য্য-কুল-রূপ-যৌবন-বিদ্যা-বল-ধন-লাভাদি বিভাব হইতে সমুদ্ভূত। অসূয়া, অবজ্ঞা, ধর্ষণ, উত্তর না দেওয়া, অসম্ভাষণ, নিজ অঙ্গ অবলোকন, বিভ্রম, অপহসন, বাক্‌পারুষ্য, গুরুজনের বাক্যলঙ্ঘন, অধিক্ষেপ, বচন-বিচ্ছেদ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা দৃষ্ট হয়—

বিদ্যালাভ, রূপ, ঐশ্বর্য্য, ধনাগম ইত্যাদি হেতু হইতে গর্ব্ব জন্মে। নীচ-প্রকৃতির পক্ষে (সগর্ব্ব) দৃষ্টি ও অঙ্গ-সঞ্চালন-দ্বারা উহা প্রদর্শনীয় ২২।

(১৯) বিষাদ—কার্য্য সম্পন্ন না করা হেতু, অথবা দৈব-বিপত্তি-সমুখ। সহায়ের অন্বেষণ, উপায়-চিন্তন, উৎসাহ-ভঙ্গ, বৈমনস্য, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উত্তম-প্রকৃতি বা মধ্যম-প্রকৃতি পাত্র-কর্ত্তৃক অভিনেয়। পক্ষান্তরে, অধম-প্রকৃতি—পরিধাবন, আলোকন, মুখশোষ, সৃক-পরিলেহন, নিদ্রা, দীর্ঘশ্বাস, ধ্যানাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা ও একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

কার্য্যের অনিষ্পাদন, চৌরাদির আক্রমণ, রাজদোষ (রাজরোষ), অথবা দৈববশতঃ অর্থের বিবর্ত্তন (পরিবর্ত্তন) ঘটিলে উহা হইতে জনগণের সর্ব্বদা বিষাদ জন্মে।

বৈমনস্য ও উপায-চিন্তা-দ্বারা উত্তম-প্রকৃতি ও মধ্যম-প্রকৃতি-কর্ত্তৃক ইহা প্রদর্শনীয়। আর অধমপ্রকৃতি-কর্ত্তৃক নিদ্রা-নিঃশ্বাস-ধ্যান-দ্বারা ইহা অভিনেয় ২৩।

---

(২০) "অপ্রিয়নিবেদনাদ্বা সহসা হ্যভিধারিতারিবচনেন (অপ্রিয়-নিবেদনাদিশ্রবণাদবধারিতবচনস্য)।

শস্ত্রাক্ষেপাৎ ত্রাসাদাবেগো নাম সম্ভবতি ॥ ১৮ ॥
অপ্রিয়নিবেদনাদ্ যো বিষাদভাবাশ্রয়োঽনুভাবোঽস্য।
সহসারিদর্শনাচ্চেৎ (সহসা নিদর্শনং) প্রহরণ-
পরিঘট্টনৈঃ কার্য্যঃ (…পরিঘট্টনং কার্য্যম্") ॥ ১১ ॥

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৮

অভিধারিত—সম্যগ্‌রূপে গৃহীত।

(২১) "জড়তা নাম—সর্ব্বকার্য্যাপ্রতিপত্তিঃ। ইষ্টানিষ্টশ্রবণদর্শন-[illegible]বৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েদকথনাভিভাষণ-[illegible]—কথিয়া ৬। (কথনাভাষণতূষ্ণীম্ভাবাপ্রতিভনিমেষনিরীক্ষণ)-[illegible]—মুখলুকান। অত্রার্য্যা ভবতি—

অধোমুখ থাকা ও চিন্তা
কিছু দিয়া মাটিতে [illegible]

ইষ্টং বা নিষ্টং বা সুখানি বা দুঃখে বা ন বেত্তি যো মোহাৎ।
(অনুরীক) স্পর্শ; তূষ্ণীকঃ পরবশগঃ স ভবতি জড়সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ" ॥ ১০১ ॥
নখ কাটা বা নখ খোঁট

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৮

[illegible]—অকথনের অভিভাষণ, অবাচ্য-কথন।

(২২) "গর্ব্বো নাম—ঐশ্বর্য্যকুলরূপযৌবনবিদ্যাবলধনলাভাদিভি-র্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাসূয়াবজ্ঞাধর্ষণানুত্তরদানাসম্ভাষণাঙ্গাবলো-কনবিভ্রমাপহসনবাক্‌পারুষ্যগুরুব্যতিক্রমণাধিক্ষেপবচনবিচ্ছেদাদিভিরনু-ভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। অত্রার্য্যা ভবতি—

বিদ্যাবাপ্তে রূপাদৈশ্বর্য্যাদথ বা ধনাগমাদ্বাপি।
গর্ব্বঃ খলু নীচানাং দৃষ্ট্যঙ্গবিচালনৈঃ (বিচারণৈঃ) কার্য্যঃ" ॥ ১০৩ ॥

অসূয়া—পরগুণে দোষাবিষ্করণ। আধর্ষণ—অত্যাচার করা। অঙ্গাবলোকন—সর্ব্বদা নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা—গর্ব্বের সূচক। বিভ্রম—শোভা—অঙ্গসজ্জা। অপহসন—হাসিতে হাসিতে চোখে জল আসে, স্কন্ধ-মস্তক হাসির বেগে কম্পিত হয়—নীচের হাস্য (নাঃ শাঃ ৬।৭১)। বাক্‌পারুষ্য—কড়া কথা বলা। অধিক্ষেপ—তিরস্কার, অবমাননা। বচন-বিচ্ছেদ—কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া।

শ্লোকটির এরূপ যোজনাও হয়—নীচগণের বিদ্যালাভ, রূপ, ঐশ্বর্য্য, ধনাগম হইতে গর্ব্ব জন্মে ইত্যাদি।

(২৩) "বিষাদো নাম—কার্য্যানিস্তরণ (কার্য্যারম্ভানিস্তরণ) দৈব-ব্যাপত্তিসমুত্থঃ। তমভিনয়েৎ সহায়ান্বেষণোপায়চিন্তনোৎসাহবিঘাত-বৈমনস্যনিঃশ্বসিতাদিভিরনুভাবৈরুত্তমমধ্যমানাম্। অধমানাস্তু পরিধাব-নাবলোকনমুখশোষণসৃক্কপরিলেহননিদ্রানিশ্বসিতধ্যানাদিভিরনুভাবৈঃ। অত্রার্য্যাশ্লোকৌ—

কার্য্যানিস্তরণাদ্বা চৌর্য্যাভিগ্রহণরাজদোষাদ্বা (কার্য্যানিস্তরণকৃত-শৌর্য্যাদিগ্রহণরাজদোষাদ্যৈঃ)।

দৈবাদর্থবিবর্ত্তনবতি বিষাদঃ সদা পুংসাম্ (দৈবাদিষ্টা যোঽর্থ-[illegible] বিষাদঃ [illegible]—কাশী) ॥ ১০৫

(২০) ঔৎসুক্য—ইষ্টজন-বিয়োগ, অনুস্মরণ, উদ্যান-দর্শন ইত্যাদি বিভাব-সম্ভূত। দীর্ঘনিঃশ্বাস, অধোমুখে চিন্তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শয়নের অভিলাষ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

ইষ্টজনের বিয়োগে ও অনুস্মৃতি দ্বারা ঔৎসুক্য জন্মে। চিন্তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, গাত্র-গুরুতা ইত্যাদি দ্বারা উহা অভিনেয় ২৪।

(২১) নিদ্রা—দৌর্ব্বল্য, শ্রম, ক্লম, মদ, আলস্য, চিন্তা, অতিভোজন, স্বভাব ইত্যাদি বিভাব হইতে সমুৎপন্ন। মুখের গুরুতা (ভারি ভারি ভাব) শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত, নেত্র-ঘূর্ণন, গাত্র-বিজৃম্ভণ, মান্দ্য, উচ্ছ্বাস, অবসন্ন-গাত্রতা, অক্ষি-নিমীলন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—

আলস্য, দৌর্ব্বল্য, ক্লম, শ্রম, চিন্তা, স্বভাব ও রাত্রি-জাগরণ-বশতঃ পুরুষের নিদ্রা উৎপন্ন হয়।

মুখ-গৌরব, গাত্রের প্রতিলোলন, নয়ন-নিমীলন, জড়ত্ব, জৃম্ভণ, গাত্র-বিমর্দ্দন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা প্রাজ্ঞ উহার অভিনয় করিবেন ২৫। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বৈচিন্ত্যোপায়চিন্তাভ্যাং কার্য্যমুত্তমমধ্যয়োঃ।
নিদ্রানিঃশ্বসিতধ্যানৈরধমানাং তু যোজয়েৎ"। ১০৬।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০

(বিচিত্রোপায়……দর্শয়েৎ—কাশী—পৃঃ ১১)

বৈচিন্ত্য—বৈমনস্য; 'বিচিত্র'—কাশীর পাঠ অপেক্ষা ভাল। কার্য্যানিস্তরণ—কার্য্যের অসমাপ্তি। সৃক্ক, সৃক্ক, সৃক্কণী, সৃক্কণী—ওষ্ঠাধরের প্রান্তদেশ।

(২৪) "ঔৎসুক্যং নাম—ইষ্টজনবিয়োগানুস্মরণোদ্যানদর্শনাদিভিবিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্য দীর্ঘনিঃশ্বসিতাধোমুখবিচিন্তননিদ্রাতন্দ্রী-শয়নাভিলাষাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। অত্রার্য্যা ভবতি—

ইষ্টজনস্য বিয়োগাদৌৎসুক্যং জায়তে হ্যনুস্মৃত্যা।
চিন্তানিদ্রাতন্দ্রীগাত্রগুরুত্বৈরভিনয়োঽস্য"। ১০৮।

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭০

তন্দ্রী—তন্দ্রা।

(২৫) "নিদ্রা নাম—দৌর্ব্বল্যশ্রমক্লমমদালস্যচিন্তাত্যাহারস্বভাবাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েদ্ বদনগৌরবশরীরাবলোকননেত্রঘূর্ণনগাত্রবিজৃম্ভণমান্দ্যোচ্ছ্বসিতসন্নগাত্রতাক্ষিনিমীলনাদিভিরনুভাবৈঃ (……গাত্রপরিলোড়ননেত্রবিঘূর্ণনজৃম্ভণগাত্রবিমর্দ্দনোচ্ছ্বসিতনিঃশ্বসিতসন্নগাত্রতাক্ষিনিমীলনসম্মোহনাদিভিরনুভাবৈঃ) অত্রার্য্যে ভবতঃ—

আলস্যাদ্দৌর্ব্বল্যাৎ ক্লমাচ্ছ্রমাচ্চিন্তনাৎ স্বভাবাচ্চ।
রাত্রৌ জাগরণাদপি নিদ্রা পুরুষস্য সম্ভবতি। ১১০।
তাং মুখগৌরবগাত্রপ্রতিলোলননয়ননিমীলনজড়ত্বৈঃ।
জৃম্ভণগাত্রবিমর্দ্দৈরনুভাবৈরভিনয়েৎ প্রাজ্ঞঃ। ১১১।

(তন্দ্রা মুখগৌরবগাত্রৈর্নয়ননিমীলনবিঘূর্ণনজড়ত্বৈঃ। ……রভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।"—কাশী)—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭০

ক্লম—ক্লান্তি। মদ—মদ্যসেবন, উন্মত্ততা। স্বভাব—কাহারও কাহারও নিদ্রা যাওয়াই স্বভাব। গাত্রবিজৃম্ভণ, গাত্রবিমর্দ্দ—গা-মোড়া দেওয়া। বিজৃম্ভণ, জৃম্ভণ—হাই তোলা। উচ্ছ্বাস—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ। গাত্র-প্রতিলোলন—গাত্র লোল হইয়া পড়া—এলাইয়া পড়া।

করো ত্বরা

ধরণীরে দাও পরিত্রাণ!
হোক্ ধরা নিষ্কণ্টক নির্ভয়!
প্রয়োজন যদি হয়
আমাদের সমূলে করিয়া দাও দূর!
তবু তব বাজুক নূপুর
ধরণীর পূত বক্ষ 'পরে
পূর্ণানন্দ ভরে।
মোরা পরবাসী
দু'দিনের লাগি ধরণী ধরিয়াছিল
বক্ষে, ভালোবাসি।
মোরা গেলে নিষ্কণ্টক হয় যদি ধরা—
করো ত্বরা!
নাহি সহে ধরণীর গ্লানি,
দীন ম্লান মুখখানি!
হানো অস্ত্র প্রলয়-সংঘাত
করো বজ্রপাত—
মুছে যাক ধরার মানব
নব সৃষ্টি হউক উদ্ভব!

শ্রীমিতা দেবী

ভুলে যাও

ভুলে যাও প্রিয় ভুলে যাও
মিলন-রাতের শুকতারাটিরে
আর কেন ফিরে চাও!
উষা হাসে আজ ললাটে তোমার
আলোর যাত্রী তুমি—
আমি আঁধারের অন্ধ কামনা
মরণের গান শুনি!
নীহারিকা কাঁদে মৌন আকাশে,
অকারণে চেয়ে রও!
ভুলে যাও প্রিয়, ভুলে যাও!
ফুটেছিনু আমি কোন্ দূর বনে
সুরভি-বর্ণহীন;
ঝ'রে গেছি কোন্ অজানা হাওয়ায়
ধরণীর বুকে লীন!
সমাধির পাশে
কেন কাঁদ বসে—
কি বাণী শুনিতে পাও?

[illegible]

রামচন্দ্রের স্মৃতি

সাধু বা মহাপুরুষদের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিলেও এই নিত্য-চঞ্চল সংসারে তাঁহাদিগকে যেন প্রতিনিয়ত স্মরণ করিতে পারি না! মনে হয়, তাঁহারা যেন গুণের একঘেয়ে একটানা বৈচিত্র্যহীন তালিকামাত্র! কোন অলক্ষ্যসূত্রে মানুষের গুণগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া কাহারো ব্যক্তিত্ব অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশ পাইলে স্বতঃই তাহা আমাদের হৃদয়ে গভীর রেখা আঁকিয়া তোলে। রামচন্দ্রের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে যখন সে চলিয়া গেল, বন্ধুজনের হৃদয়ে তাহার সরল সুন্দর মুখচ্ছবি, কৌতুক-হাস্যময় ধী-প্রদীপ্ত মূর্ত্তি অম্লান হইয়া রহিল। অকাল-বৃন্তচ্যুত অনাঘ্রাত-প্রায় পুষ্পের মত জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে, এ অনুভূতি আসিতেছে না! প্রভাতের রৌদ্রের সহিত চিরপরিচিত ফুল আবার ফুটিয়া উঠিবে, অলিকুল আবার গুঞ্জন করিবে—ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম!

রামচন্দ্র সুবিখ্যাত ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—মাতা-পিতার নিরতিশয় আদর স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও দেশের অধিকাংশ ধনীগৃহের নন্দদুলালের ন্যায় উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত কর্ম্মহীন অক্ষমতা, আলস্য ও প্রতিভাহীনতার অধিকারী হন নাই। পিতার বিরাট কর্ম্মশক্তি বাল্যকালে রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; এবং লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের স্বাভাবিক শক্তিও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের লীলা-সহচর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশীর্ব্বাদ এই বালকের শিরে বর্ষিত হয়, তাই ধনীগৃহের পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও রামচন্দ্রের হৃদয় পর-দুঃখে কাঁদিত—পিতার কর্ম্মমুখর বিস্তৃত কার্য্যালয়ের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিবার পর নিম্নতম কর্ম্মচারিবৃন্দও অবাধে অভাব জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রতি-নিয়ত অর্থ এবং সাহায্য পাইত। রামচন্দ্রের ব্যক্তিগত তহবিল ইহাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত এবং অর্থ-প্রদানে মাধুর্য্য ছিল এই যে, দাতা পরমুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইতেন কাহাকে কত দিয়াছেন—গৃহীতা সুযোগ লইয়া ঋণ-পরিশোধের কথা ভুলিয়া গেলেও চলিত! কর্ম্মচারি-দের প্রতি তাঁহার ব্যবহারে প্রভুত্বের স্পর্দ্ধা কখনও ছায়া-পাত করে নাই।

রামচন্দ্র যে বিরাট সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তাঁহার ক্রমাগত চমকপ্রদ সাফল্য—তাহার অতি অকিঞ্চিৎকর পরিচয় মাত্র। এ প্রতিভার সামান্য বিকাশ বিদ্যুৎ-সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্স-ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'ঈশান বৃত্তি' লাভ করা—বিস্ময়ের ব্যাপার হইলেও তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। তীক্ষ্ণ প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি যেন নবতম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ও আলোকের অন্বেষণে তৎপর থাকিত। চিরপ্রচলিত ভ্রান্ত তথ্যে বা যুক্তিহীন সংস্কারে রামচন্দ্রের বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। জ্ঞানগরিমাদীপ্ত শঙ্করাচার্য্যের আলেখ্য তাই তাঁহার নিকট নিতান্ত প্রিয় ছিল। Knowledge is power—রামচন্দ্র ইহা মনে-প্রাণে জানিতেন, তাই কোন বাধাই তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। অপরের যুক্তি বা বক্তব্য শুনিয়া তাহা বিচার করিবার মত ধৈর্য্য ও শক্তি রামচন্দ্রের ছিল এবং যুবক-সমাজে বিরল এই গুণটি তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম-জীবনের কয়েকটি গোণা দিনকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র ছিলেন সত্য ও সুন্দরের উপাসক। বিচার ও যুক্তি ছিল তাঁহার কর্ম্মের মাপকাঠি।

যৌবনের অফুরন্ত সৃজনী-শক্তি রামচন্দ্রের উন্নত দেহকে সর্ব্বদা চঞ্চল রাখিত—অন্তর্নিহিত বিপুল প্রাণ-শক্তি যেন বাহিরে প্রকাশ পাইবার আধার অন্বেষণ করিত। কল্পনা উদিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করা চাই! শারীরিক শ্রম বা উদ্বেগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইত না বরং কর্ম্মেই তাঁহার সরস কৌতুকের ধারা অবিরাম পর্য্যায়ে বহিয়া চলিত।

Pratikea
Kalimpong
13. 4. 43

y Dear Roy

....

Let me know what did you decide about my future,—am I going to die in 3 days and a half or am I going to live one thousand years seven months and 3 days............

Yours
Ram Chandra Mukherjee

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। কালিম্পঙে পূজনীয় স্বামী গঙ্গেশানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কয়েকটি দিন আনন্দে কাটাইয়া রামচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় ফিরিতেছি; সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেণ শিলিগুড়ীর নিকটে আসিতেই রামচন্দ্রের হঠাৎ খেয়াল হইল, কার্সিয়ঙ্ যাইতে হইবে—কার্সিয়ঙের গাড়ী পরের দিন।

উঠিলাম। রাত্রে আহারাদির পর মশার অত্যাচারে ঘুম আসিতেছিল না—বিরক্ত হইয়া আমরা দু'খানি চেয়ার লইয়া বারান্দায় গেলাম। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা—চৈত্র-শেষের অবারিত জ্যোৎস্না দূরের উন্মুক্ত প্রান্তরে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে; বসন্তের উগ্র বাতাস আম্র-মুকুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল; কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর রামচন্দ্র সঙ্গীতের কণ্ঠস্বরে কুমারসম্ভব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। স্বরের উত্থান, পতন, বিভিন্নতা, সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল উচ্চারণ এবং অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম! দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অন্তরের অনুরাগ-চন্দনে চর্চ্চিত তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া এক অবিনশ্বর মায়ালোকের সৃষ্টি করিল! দেবগণ জয়-ধ্বনি করিতে করিতে কার্ত্তিকেয়ের মস্তকে কল্পদ্রুমের পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন—সে-সময় আমার মনে হইতে লাগিল—

> " "আজ মনে হয়
> ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
> অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
> ধ্যান ভাঙ্গি উমাপতি ভূমানন্দ ভরে
> নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
> গর্জ্জিত মৃদঙ্গ রবে, তড়িত চপল
> ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেইক্ষণে
> গাহিতে বন্দনা-গান,—গীত-সমাপনে
> কর্ণ হতে লয়ে পুষ্প স্নেহ-হাস্যভরে
> পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া'পরে!"

পরদিন সকালে শিলিগুড়ী ষ্টেশনে দু'জনে পায়চারি করিতে করিতে দেখি, প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া 'লক্ষ্মীবিলাস হাউসের' শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মিত্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। তিনি ট্রেণ ফেল করিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতা ফিরিবেন ইচ্ছা ছিল। রামচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে এক-রকম জোর করিয়াই তাঁহাকে কার্সিয়ঙ্ ট্রেণে তোলা হইল। পার্ব্বত্য-পথের নয়নাভিরাম দৃশ্য, মেঘ ও রৌদ্রের লীলাচঞ্চল আলো-ছায়ার খেলা ট্রেণ হইতে পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টি-পথে আসিতেছিল বটে, কিন্তু সমগ্র কামরায় বিভিন্ন জাতের আরোহীদের একাগ্র দৃষ্টি এই প্রিয়দর্শন যুবকের হাস্যচঞ্চল কৌতুকজড়িত কথোপকথনের উপর নিবদ্ধ ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর এক হীন বেশধারী যাত্রীর সহিত নিতান্ত অকপটে মার্জ্জিত হাস্যরসের অবতারণার অন্তরালে রামচন্দ্রের মনুষ্যত্বের যে মেরুদণ্ড দেখিয়াছিলাম, আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। সাধারণকে আপনার করিবার যে শক্তি, তাহার মূলে হৃদয়ের স্বচ্ছতা থাকা দরকার এবং এই গুণেই তিনি শিক্ষাভিমানী বর্ত্তমান যুবসমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবেন।

কার্সিয়ঙে নামিয়া আমরা উপরে একেবারে St. Joseph Schoolএর নিকট চলিয়া গিয়াছিলাম। বৈকালের গাড়ীতে ফিরিবার কথা। সময় ছিল খুব কম; তাই তাড়াতাড়ি নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখিলাম, ফিরিবার ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমরা ছুটিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম—ট্রেণ তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র এক ট্যাক্সি-ওয়ালার সহিত ব্যবস্থা করিলেন, যদি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ট্রেণ ধরাইয়া দিতে পারে, তবে তাহাকে চারি টাকা দেওয়া হইবে। ট্যাক্সিচালক বলিল, মাইলখানেক গেলেই ট্রেণ ধরিতে পারা যাইবে এবং সেখানে ট্রেণ থামাইতেও পারা যাইবে। ট্যাক্সি-চালক অতিশয় বেগে গাড়ী চালাইয়া কিছু দূর গিয়া ট্রেণ ধরিয়া ফেলিল এবং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গাড়ী থামাইল। ট্রেণ তখন আসিতেছে, তাহার গতি অনেকটা কমিয়াছে—দৌড়াইয়া রামচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সেই চলন্ত ট্রেণের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া এক লাফ দিয়া কামরার মধ্যে উঠিয়া পড়িলেন। গার্ড নিশান দেখাইয়া হৈ-হৈ শব্দে গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। আমরা অতিশয় ব্যস্তভাবে কামরায় উঠিয়া দেখি, রামচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত বসিয়া আছেন! আমাদের দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "শিকল টানলে ৫০৲ জরিমানা দিতে হয়। দেখি টাকা, Quick"!

১৯৪৩ জানুয়ারী মাসে রামচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে 'দৈনিক বসুমতী'র একখানি বিশেষ বীমা-সংখ্যা আমি সম্পাদন করি। বাংলায় দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বীমা-সংখ্যা—কাজেই ইহাতে রামচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহ ছিল। কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বদিন আমার কাজ শেষ হইতে রাত প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল—জ্যোৎস্নালোকিত সেই গভীর রাত্রে তখনকার জাপানী বোমার ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র নিজে মোটর হাঁকাইয়া রাত্রি আড়াইটার সময় পাঁচ মাইল দূরে আমাকে আমার গৃহে পৌঁছাইয়া বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে ফিরিয়া আবার এক ঘণ্টা কাজ করিয়াছিলেন।

কাজে আত্মনিয়োগ করিলে রামচন্দ্রের আহার-নিদ্রার কথা মনে থাকিত না। রাত্রি তিনটার সময় রোটারি মেসিনের উপরে উঠিয়া পেরেক ঠুকিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। ধনিকপ্রধান সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর মত প্রতিদিনকার নিয়মিত কার্য্যের সহিত তিনি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখিতেন না। 'দৈনিক বসুমতী' সাহিত্য-বিভাগের প্রত্যেকটি প্রুফ তিনি নিজে সংশোধন করিতেন। কাজ

হইতে নিজে সমস্ত রাত্রি মোটর চালাইয়া পরদিন বেলা দশটার সময় বাড়ী পৌঁছিয়া তার এক ঘণ্টা পরেই অফিসে আসিয়া কাজ দেখা—অতি কর্ম্মঠ যুবকের পক্ষেও শক্ত বলিয়া মনে হয়।

রামচন্দ্র চির-তারুণ্যের প্রতীক ছিলেন। হাজলিট একটা কথা বলিয়াছেন, "There is a feeling of immortality in youth which make amends for everything." রামচন্দ্রের নাতিদীর্ঘ জীবনে এই উক্তির অপরূপ বিকাশ দেখা যায়। তাঁহার প্রাণের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত গতি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যেন আপন গতিতে বহিয়া চলিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির আনন্দের কল্পনা তাঁহাকে প্রতিনিয়ত শক্তি ও শান্তি দিত। বাংলা দেশে ছাপা যাহাতে উন্নত হয়, বিদেশী উৎকৃষ্ট ছাপার মত যাহাতে এ দেশে ছাপা সম্ভব হয়, ইহাই ছিল তাঁহার মনের একান্ত বাসনা। এ দেশে চিরাচরিত প্রথায় পরিচালিত মামুলি সাহিত্য-পত্রিকাগুলির সার্থকতা থাকিলেও রামচন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা ছিল হালকা সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশবাসীর নিকট রস পরিবেষণ করা। দেশবাসীর আনন্দহীন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে অন্ততঃ সামান্য সময়ের জন্যও শ্রান্তি-অবসাদ ভুলাইয়া আনন্দ জাগাইয়া তোলা চাই। আমেরিকায় যেমন 'Comet' পত্রিকা, লণ্ডনে 'London Opinion' আছে, এ দেশে তেমন পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করিয়া অভাবনীয়-রূপে রস সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহার অধুনালুপ্ত পত্রিকা 'কিশলয়'কে এই আদর্শ লইয়া পুনরায় নূতন পর্য্যায়ে বাহির করিবার আয়োজন তিনি করিতেছিলেন।

কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না এই ভাবী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে উচ্ছ্বসিত হইত! কালিম্পঙ্ হইতে তাঁহার লিখিত (১৮-৪-৪৩) চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"এখানে কদিন ধরে খুব বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডা প্রবল। বেশ লাগছে। দিনরাত নীচে থেকে কুয়াশা উঠছে দেখা যায়। কু বলেই এত ওপরে ওঠে! ভাল আশা কখনও এত ওপরে ওঠে না বা এত সর্ব্বগ্রাসী হয় না।"

রামচন্দ্র যে 'উৎপলা প্রেস' স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে এক বিরাট আদর্শ ছিল। এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সর্ব্বপ্রকারের আরাম ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া, হাসিমুখে অশেষ শারীরিক শ্রম বরণ করিয়াছিলেন। এখানকার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক রামচন্দ্র প্রদীপের শিখার ন্যায় নিজেকে নিঃশেষিত করিয়া যে-আলোক দান করিয়াছেন, তাহা দরিদ্র জননীর মাটির সন্ধ্যা-প্রদীপের মতই পবিত্র প্রাণের সামগ্রী! আজিকার মেরুদণ্ডহীন যুবক-সমাজে এই আলো চিরদিন ধ্রুবতারার মত জ্বলিতে থাকিবে! ইংরেজ কবি Mathew Arnold-এর কয়েকটি লাইন আজ বার-বার মনে পড়িতেছে—

"Why faintest thou? I wondered
till I died.
Room on! The light we sought's
shining still."

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়

রামচন্দ্র

অমরা ছাড়িয়া তুমি
কোন্ খেয়ালের বশে
এসেছিলে ধরামাঝে
পূর্ণ—গন্ধে রূপে রসে।

না কাটিতে মধ্যদিন, কি-জানি-কি মনে করি'
সহসা ফিরিলে পুনঃ ত্রিবিদের পথ ধরি'!
স্নেহে-প্রেমে বসুমতী তোমারে দেছিল কোল।
আজি তার শূন্য বক্ষে উঠিছে ক্রন্দন-রোল।
ক্ষণিকের তরে আসি যে-শক্তি দেখালে তুমি,
মুগ্ধ তাহে সর্ব্বলোক, ধন্য তাহে বঙ্গভূমি।

সেই শক্তিবলে তুমি, রামচন্দ্র, দাও দাও
ভুলায়ে সবার ব্যথা—স্বর্গ হতে ফিরে চাও।

আবার আসিবে তুমি
কোন্-এক শুভক্ষণে।
আবার ফোটাবে হাসি
বসুমতী ফুল-বনে।
স্বর্ণরথে স্বর্ণপথে স্বর্গীয় সুবাসে ঘিরি'
নবরূপে তুমি রাম, আবার আসিবে ফিরি!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

যাত্রা-নাস্তি

(গল্প)

সাত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। রেণুর বয়স একুশ। ইহারি মধ্যে জীবনটা বিরস হইয়া উঠিয়াছে।

ছেলে নাই, মেয়ে নাই। স্বামী বিজনের রুচি সৌখীন। বিবাহের পর ক'টি বৎসর···কি রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে ভরিয়াই না কাটিয়াছিল! তার পর বিজন ঢুকিল ষ্টক এক্সচেঞ্জে। পৈত্রিক ব্যবসা। কাজে ঢুকিয়া বুঝিয়াছে, জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের দিকে নজর রাখিতে হয়! কাজেই···

অর্থাৎ আর পাঁচ জনের জীবনে যেমন হয়, তেমনি ঘটিয়াছে। তবে এমন ঘটনায় আর পাঁচ জনে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা যা করে, তাহাতে আক্ষেপ বা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ওঠে না! কিন্তু রেণু···

ছেলেমানুষী তার সব-কিছুতেই! গৃহিণীপনা কোনো দিন করে নাই,—সে-কাজ শিখিতে হয় হাতে-কলমে। সে-শিক্ষা তার কখনো হয় নাই।

সেদিন সকালে ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া হাতে স্পিরিট ঢালিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিল। বিজন আসিয়া পরিচর্য্যা করিতে বসিল। বলিল,—যা জানো না, কেন যে তা করতে যাও! সূর্য্যকে বললেই তো সে ষ্টোভ জ্বেলে দিত এসে।

স্বরে দরদ নাই···ঝাঁজ। স্বর কঠিন। রেণু বলিল—বেশ, বেশ, তোমার হাত পোড়েনি তো···আমার হাত পুড়েছে!

বিজন বলিল—হুঁ···সে-কথা তুমি না বললেও আমি জানি।

হাতখানা সবলে বিজনের হাত হইতে টানিয়া ঝঙ্কার দিয়া রেণু বলিল—কে তোমাকে ডেকেছে আমার হাতের পরিচর্য্যা করতে!

কথাটা বলিয়া রেণু উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজন বলিল—স্পিরিটে-ভেজানো রুমালখানা ফেলে দিয়ো না···খানিকক্ষণ থাকতে দাও। জ্বালা কমবে, ফোস্কা হবে না!

রেণু সে-কথার জবাব না দিয়া মুখখানা যথাসম্ভব ঘোরালো করিয়া চলিয়া গেল!

এমন ঘটে প্রায়।

টাকা-পয়সার বাজারে ঢুকিয়া বিজন বুঝিয়াছে, টাকা-পয়সার চেয়ে সেরা কামনার সামগ্রী পৃথিবীতে আর নাই!

বাড়ী ফিরিয়া বিজন করিতেছে লাভের হিসাব—সাজিয়া গুজিয়া রেণু আসিয়া বলিল—শুনছো?

সে-কথা বিজনের কাণে যায় না! হালিফাক্স জুটের শেয়ারে সেদিন সে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে, তার উপর গঙ্গা-ভ্যালি টী কোম্পানির শেয়ারেও···

রেণু রাগ করিয়া হিসাবের কাগজখানা টানিয়া ফেলিয়া দিল। বিজনের বুকখানা সেই সঙ্গে ধড়াস্ করিয়া কোন্ পাতালে নামিবার জো! জ কুঞ্চিত করিয়া বিজন বলিল—কাজের সময় কি ছেলেমানুষী যে করো! হুঃ!

রেণুর পানে দৃষ্টির ছোট একটা কণাও সে নিক্ষেপ করে না···মেঝে হইতে হিসাবের কাগজ তুলিয়া টেবিলের উপরে মেলিয়া ধরে। রেণু দাঁড়াইয়া দেখে···অপমানে ক্ষোভে তার বুকখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়!

বাড়ী ফিরিয়া সেদিন রেণুকে সামনে দেখিয়া বিজন তার হাতে দিল চেক-বই। বলিল—দোতলায় আমার ড্রয়ারে এটা রেখে দিয়ো তো! আমাকে এখনি বেরুতে হচ্ছে। ফিরতে রাত হবে।

কথাটা বলিয়া বিজন চেক-বই ফেলিয়া নিমেষমাত্র দাঁড়াইল না—বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়াছিল, সোজা গিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল।

রেণুর মনে জমাট মেঘের ভার! দিদি আসিয়াছে বৌবাজারে —চিঠি লিখিয়াছে, কাল চলিয়া যাইবে, অবসরের অত্যন্ত অভাব—সন্ধ্যার সময় বিজনকে লইয়া বৌবাজারে তার ননদের বাড়ীতে গিয়া যদি দেখা করিয়া আসে। রেণু ভাবিয়াছিল, বিজন আসিলে সেই ব্যবস্থাই করিবে!

দিদি থাকে সুদূর মফঃস্বলে। কত কাল দিদির সঙ্গে দেখা হয় নাই! অথচ এমন দিন ছিল, দিদির ছায়া হইয়া রেণু ঘুরিয়া বেড়াইত!

বিজন আসিল যেন ঝড়ো বাতাসের দমকার মতো···গেলও ঠিক তেমনি ভাবে! কোনো কথা বলা হইল না।

রাগ হইল। ভাবিয়াছে কি? পয়সা আর কেহ রোজগার করে না? উনিই শুধু পয়সা রোজগার করিতেছেন?—স্ত্রী···তা'ও স্ত্রীর কি-বা বয়স! এখনি এমন অবহেলা···সব কটা বয়স এখনো পড়িয়া আছে! ভাবিয়াছে কি? স্ত্রী মানুষ নয়?···তার পানে একদণ্ড চাহিবার সময় হয় না?

অথচ রেণু নিজে?···আই-এ এগজামিনের সাত মাস আগে বিবাহ হইয়াছিল। আই-এ পাশ করিবে, তার কি প্রচণ্ড সাধ ছিল! বিবাহের পর প্রমোদ-কুঞ্জ-বনে রেণুকে কি ভাবেই না বন্দী করিয়া রাখিত! শুধু চাঁদ আর ফুল···কথা আর গান। রেণু বলিত, —আমাকে তুমি এগজামিন দিতে দেবে না?

বিজন বলিত,—না।

রেণু বলিত,—বা রে, লোকে হাসবে যে! সকলের কাছে বড় মুখ করে আমি বলেছি, হোক না বিয়ে, এগজামিন আমি দেবোই। সুরো আর পদ্ম ভয়ঙ্কর হাসি-টিটকিরী করবে।

বিজন বলিল—আমার আনন্দের চেয়ে তাদের হাসি-টিটকিরি বড় হবে?

রেণু বলিল—দু'টি মাস শুধু বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকবো পড়াশুনা করতে! লক্ষ্মীটি···তুমি মাঝে মাঝে যাবে···

আবেগে রেণুকে বক্ষলগ্ন করিয়া বিজন বলিয়াছিল,—না···না··· না! তোমাকে ছেড়ে দিলে একদণ্ড আমি বাঁচবো না, রেণু!

সেই রেণু! সেই বিজন!···রেণু আজো তেমনি আছে···বিজনের চোখের চকিত দৃষ্টির চমকে আজো সে কি যে পায়! কত-কিছু! বুকের মধ্যে অজস্র নির্ঝর উথলিয়া উঠিল! চুপ করিয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল! কাঠের মতো···তেমনি চেতনাহীন! চেতনা ফিরিল কুকুর ডাকে,—মাসিমা···

চমকিয়া রেণু চাহিয়া দেখে, সুকু···দিদির ছেলে···বয়স আট বছর।

সুকুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রেণু বলিল—মা এসেছে? কৈ?

সুকু বলিল,—না, মা আসেনি। আমার পিসতুতো ভাই এসেছে···ননীদা···গাড়ী নিয়ে। মা বললে, তোর মেসোমশাই যদি সময় না করতে পারে···তাই ননীদাকে বললে, আমাকে নিয়ে এখানে আসতে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্ম।

রেণু বলিল—আমাকে নিয়ে যাবি?

সুকু বলিল—হ্যাঁ। মেসোমশাই নেই?

—না। কাজে বেরিয়েছেন। তুই আয় সুকু, বসবি। আমি এখনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নেবো।

চেক-বই পড়িয়া রহিল একতলার দালানে। সুকুকে দোতলায় পাঠাইয়া রেণু ছুটিয়া বাথ-রুমে গিয়া ঢুকিল।

দিদির সঙ্গে কত কথা! দিদি বলিল, ভগ্নীপতি কলিকাতার অফিসে বদলি হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। তা যদি হয়, আঃ!

দিদির ননদ সহজে ছাড়িয়া দিল না। রেণুকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বাড়ীর গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়া দিল ননীর সঙ্গে। রাত তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

দোতলার ঘরে বিজনের সঙ্গে দেখা···ইজিচেয়ারে বিজন গুম্ হইয়া বসিয়া আছে!

হাসি-মুখে খুশী-মনে রেণু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বিজনের মুখের পানে চাহিবামাত্র তার মুখ হইল পাংশু···বুক একেবারে খালি! বিজনের মুখে রাজ্যের বিরক্তি! রেণু ভাবিল, না বলিয়া গিয়াছিল, তার জন্ম? না, ফিরিতে এতখানি রাত হইয়াছে, তাই? কোনো রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সহজ মৃদু কণ্ঠে বলিল—দিদি এসেছে তার ননদের ওখানে বৌবাজারে। সুকুকে গাড়ীশুদ্ধ পাঠিয়েছিল আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবার জন্ম। তা তুমি তো বাড়ী ছিলে না।

মুখ তুলিয়া বিজন শুধু তার পানে চাহিয়া রহিল···জবাব দিল না।

রেণু ঢুকিল পাশের ঘরে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে।

ফিরিল মিনিট দশেক পরে। বিজন তখনো তেমনি গম্ভীর! রেণু বলিল—রাগ হয়েছে অনুমতি না নিয়ে গিয়েছিলুম বলে? নিজের ইচ্ছায়?

বিজন বলিল,—না।

—তবে?

বিজন বলিল—কি তবে?

—অমন গম্ভীর মুখ! বাবাঃ, সব সময়েই মেঘ নেমে আছে!

বিজন বলিল,—হুঁ! চেক-বইখানা আমার ড্রয়ারে খুঁজলুম, পেলুম না।

রেণুর মনে ছিল না···এখন মনে পড়িল। চেক-বইখানা··· তাই তো!

না, ড্রয়ারে সে রাখে নাই! তোলেও নাই! যেখানে বিজন দিয়া গিয়াছিল···নীচে···ভাঁড়ারের সামনের দালানে···

তখনি ছুটিল একতলায়। না, চেক-বই নাই! ঠাকুরকে প্রশ্ন করিল। সূর্য্যকে বলিল,—বাবুর চেক-বই?

তারা বলিল, জানে না।

রেণুর পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া গেছে! ভূমিকম্পের দোলায় পৃথিবী দুলিতেছে! সেই সঙ্গে বাড়ী-ঘর···মাথার উপরে আকাশখানা!

বিজন সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। বলিল,—চেক-বই খুঁজতে এসেছো?

রেণু যেন চোর! তেমনি কুণ্ঠিত অপরাধীর দৃষ্টি তার দুই চোখে! কোনো কথা সে বলিতে পারিল না।

মৃদু হাস্যে বিজন বলিল—খুঁজতে হবে না। সে বই আমি পেয়েছি—উঠোনে সিঁড়ির কোলে পড়েছিল।

রেণুর বুকে জাগিল প্রাণের স্পন্দন! বিজন বলিল,—আমি জানতুম, তোমার খেয়াল থাকবে না!···দুঃখ হয় রেণু, কোনো দিন মানুষ হবে না?

কথা নয়, যেন আগুনের ডেলা! সে আগুনের আঁচে জ্বলিতে জ্বলিতে রেণু কি করিয়া দোতলায় উঠিয়া আসিল···আসিয়া নিজের ঘরে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, যেন মিষ্টী! বিছানায় পড়িবামাত্র দু' চোখের পর্দ্দা ঠেলিয়া হু-হু বেগে ঝরিয়া পড়িল কত কালের সঞ্চিত পুঞ্জিত অশ্রুর রাশি!

ঘড়িতে একটা বাজিল। কে সুইচ্ টিপিল। ঘরে আলো।

বিজন।

বিজন আসিয়া ডাকিল,—রেণু···

যে-অশ্রু কোনো মতে রুদ্ধ হইয়াছিল, এ-স্বরের খোঁচায় আবার তাহা ঝরিল।

বিজন বসিল রেণুর পাশে। আদর করিয়া তুলিয়া তাকে বসাইল। বলিল,—কেঁদো না।

রেণু বলিল—কেন তুমি চাকর-বাকরের সামনে আমাকে ও-কথা বললে? তার চেয়ে ঘরে এনে আমাকে দু'ঘা জুতো মারলেও আমার এমন বাজতো না!

বিজন কোন জবাব দিল না।

রেণু বলিল,—আমি জানি, আমার নিয়ে তুমি এতটুকু সুখী নও! আমাকে তুমি ত্যাগ করো···করে ভালো দেখে তোমার যোগ্য বুঝে আর-কাকেও বিয়ে করো।

বিজন বলিল—হুঁ। কনে দেখে দেবে তুমি?

রেণু বুঝিল, পরিহাস! বলিল—তামাসা নয়। সত্যি।

বিজন বলিল—বেশ, তুমি কনে দ্যাখো···আমি রাজী!

দু'-চার মাস পরের কথা···

বিজনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল···সবে সারিয়াছে। রেণুর তদারকীর সীমা নাই! অফিসে যাইতে চায়···রেণু বলে,—না! ডাক্তার বাবু যতক্ষণ না অনুমতি দেবেন, অফিস যাওয়া হবে না!

বিজন বলিল—কিন্তু এখন বাড়ীতে বসে থাকবার দরকার নেই! কোথাও ঘোরাঘুরি করবো না—শুধু অফিসে বসে থাকবো··· টেলিফোনটি ধরে কাজ···কি বলো?

রেণু বলিল—আমার যা বলবার, বলেছি। মানা না মানা তোমার খুশী।

গম্ভীর কণ্ঠে এ-কথা বলিয়া রেণু চলিয়া গেল।

বেলা প্রায় বারোটা। আহারাদি সারিয়া রেণু আসিল দোতলায় নিজের ঘরে। বিজন ঘরে নাই।

সূর্য্যি ঝাতা-বালতি লইয়া ঘর মুছিতেছিল, রেণু তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু কোথায় রে?

সূর্য্যি জবাব দিল, বাবু শুইয়াছিলেন···টেলিফোন বাজিল··· বাবু টেলিফোনে কথা কহিলেন···তার পর বাহির হইয়া গিয়াছেন।

রেণু বলিল—গাড়ী?

সূর্য্যি বলিল,—ট্যাক্সি ডেকে আনলুম। বাবু বললেন, ঘরের গাড়ীতে যাবেন না। বললেন, ঘরের গাড়ী আপনার কি দরকার··· কোথায় না কি নিমন্তন যাবেন।

রেণুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এত করিয়া বারণ করিলাম, গ্রাহ্য হইল না? যেমন খাইতে গিয়াছি, অমনি সেই ফাঁকে সরিয়া পড়া! এতখানি তুচ্ছ করো! আচ্ছা, রেণুও···

নিমন্ত্রণ ছিল সখী বনমালার গৃহে। তার ছেলের অন্নপ্রাশন গিয়াছে···তারি ভোজ সন্ধ্যার সময়।

রেণুর অসহ্য বোধ হইল। বাড়ীতে থাকা যায় না! বাড়ী যেন অট্টহাস্যে ফাটিয়া তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে, রূপযৌবনের সম্পদ লইয়া মনে মনে ভারী যে তোর গর্ব্ব! কেমন, স্বামী সামান্য কথাটিও রাখে না!

সাজিয়া সে বাড়ীর গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গেল···বনমালার গৃহে। মনে মনে যে-সঙ্কল্প আঁটিল···তার ফলে ফিরিল রাত্রি প্রায় বারোটায়।

বনমালার গৃহে ভোজের পর্ব্ব চুকিয়াছিল আটটার মধ্যে। সেখানে আসিয়াছিল সুলতা, বিনীতা। তারা বলিল—যাবি রে রেণু সিনেমা দেখতে? খুব ভালো হিন্দী ছবি আছে প্যারাডাইসে।

রেণু বলিল,—তার পর বাড়ীতে জবাবদিহি করবে কে?

বিনীতা বলিল—এখনো এ বয়সে জবাবদিহি! তুই বলিস কি?

সুলতা বলিল—এখনো কপোত-কপোতী!

বিনীতা বলিল,—কপোত-কপোতী নয়···একে বলে, শ্রীচরণেষু আজ্ঞাবহা দাসী শ্রীমতী রেণুবালা দেবী! জালালি ভাই, সত্যি! এখনো নিজের ইচ্ছা, নিজের মর্জ্জি বলে কিছু থাকবে না? ওরা এমন মেনে চলে আমাদের বল্! তবে?

রেণু বুঝিল, ঠিক তো! এতখানি বশ্যতা সে স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই না বিজন তাকে এমন তুচ্ছ-জ্ঞান করে! এই যে বিনীতা, সুলতা···যা-খুশী করিয়া বেড়াইতেছে···যখন খুশী বাহির হইয়া আসিতেছে! বিনীতা রেডিয়োর আসরে গান গাহিতে যায়। সুলতা সেবার শান্তি-নিকেতনের প্লেতে নামিয়াছিল ষ্টেজে! তাদের স্বামীরা কতখানি তাদের মানে!

রেণু বলিল,—বাবো, চ'! কিন্তু সঙ্গে যাবে কে?

সুলতা বলিল—বিনীতার স্বামীদেবতা নরেশ বাবু থাকবেন সঙ্গে।

বিনীতা বলিল—তো[illegible] আছে তো?

রেণু বলিল,—আছে।

বনমালার বাড়ী হইতে প্যারাডাইস সিনেমা। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিতে প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল।

বিজন গুম্ হইয়া বসিয়া আছে দোতলার শয়ন-ঘরে। রেণুকে দেখিয়া বলিল—সারা দিন ধরে নেমন্তন্ন খেয়েও তৃপ্তি হয়নি···রাত বারোটা পর্য্যন্ত মজলিশ!

রেণু জবাব দিল না—পাশের ঘরে গেল কাপড় ছাড়িতে। ফিরিয়া মুখ-হাত ধুইয়া শুইতে যাইতেছিল, বিজনের পানে চাহিয়া বলিল—ভালোই আছো বোধ হয়!

বিজন বলিল—থাক্, রাত বারোটা পর্য্যন্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মজলিশ করে ফিরে আর আমার কুশল জিজ্ঞাসা করতে হবে না!

রেণু বলিল—তার প্রয়োজন নেই, জানি। মুখ থেকে কথাটা কেমন ফস্কে বেরিয়ে গেছে!

রেণু চলিয়া যাইতেছিল, বিজন ডাকিল,—রেণু···

রেণু দাঁড়াইল।

বিজন বলিল,—এত রাত পর্য্যন্ত কি করছিলে, শুনি? বাড়ীর কথা মনে থাকে না বুঝি?

রেণু বলিল,—না। তোমার মনে থাকে বাড়ীর কথা—যখন বেরোও?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা?

—কেন নয়, শুনি? তোমাকে যে বিধাতা গড়েছেন, আমাকেও তিনিই গড়েছেন! তুমি পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মেছো বলে যা-খুশী করবে আর আমি মেয়ে-জন্ম নিয়েছি বলে আমার বুঝি কোনো-কিছু করবার অধিকার থাকবে না? ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকবো?

বিজন বুঝিল, রেণু বাঁকা গলি-পথ ধরিয়াছে! বলিল—যদি ছেলে-মেয়ে হতো, তাদের বয়স হতো আজ কত?

রেণু বলিল—ছেলেমেয়ে চাই না আমি!

রেণু চলিয়া যাইতেছিল, বিজন বলিল—যা বললে, সে কথার মানে?

রেণু বলিল—মানে খুব পষ্ট! পুরুষ-মানুষ···স্বামী, তাই বুঝে ভেবেছো কোনো বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা থাকবে না? জী-হুজুর বলে তোমাকে সেলাম ঠুকে আদেশ পালন করে আমাকে বাঁচতে হবে?

বিজন উঠিয়া দাঁড়াইল···ছ'চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ভরিয়া বলিল—বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ!

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া রেণু বলিল—হুঁ···তাই! সয়ে-সয়ে মাটির নীচে নেমে গেছি! যা করি, তাতেই আমার দোষ! সত্যি আমার গুরুমশায়ের উপদেশ শোনবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে। তুমি যদি যা খুশী তাই করতে পারো, আমি কেন তবে পারবো না—বলতে পারো? স্বার্থপর পুরুষ···তার দাস্য করে নিজের জীবনকে আর আমি চুরমার করতে পারবো না!

পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আগুন ছিটকায়। ছ'জনের মন আজ পাথরের মতো···ঠোকাঠুকি হয়···আগুন ছিটকায়! আগুনের সে কুচিগুলায় ছ'জনের মনে বেশ আঁচ লাগে! কিন্তু কি করিলে এ আঁচ না লাগে, ভাবিয়া ছ'জনের কেহ কূল-কিনারা পায় না।

বিজন বুঝাইয়া বলিতে যায়···কিন্তু ছ'-একটা কথার

উপদেশের সেই ইঙ্গিত···সে ইঙ্গিতে রেণুর সব ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া যায়··· সে জ্বলিয়া ওঠে। বলে—পুরুষ-মানুষের অতখানি আনুগত্য করে বাঁচা···তাকে বাঁচা বলে না। মোর দ্যান্ এ স্লেভ! তার উপর স্লেভ্-দের জোরে দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ স্লেভারি এ্যাবলিশ্ হয়েছে!

বিজন বলে—স্লেভ্ কে বলেছে? সব সময়ে আমার কথার যদি বাঁকা অর্থ করো, রেণু···

ঝুম্ করিয়া রেণু জবাব দেয়—কথা তাহলে বলো না আমার সঙ্গে।

টেলিফোন-শেটের কাছে বাক্স আছে···খাতা-পেন্সিল আছে। দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিয়াছিল, যে কল্ করিবে, কলের দাম-বাবদ সে পয়সা ফেলিবে বাক্সে; এবং পেন্সিল লইয়া খাতায় লিখিয়া রাখিবে কলের বিবরণ। এ ব্যবস্থায় টেলিফোনের বিল গায়ে লাগিবে না এবং কল্-সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা চলিবে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত···

সেদিন ইংরেজী মাসের দোসরা তারিখে টেলিফোনের বিল আসিয়া হাজির। সাতান্নটা কল্। খাতার লেখার সঙ্গে মিলাইতে গিয়া বিজন দেখে, বত্রিশটা মিলিতেছে তার লেখা কলের সঙ্গে—বাকি পঁচিশটা কলের কোনো নির্দ্দেশ নাই। বুঝিল, রেণু করিয়াছে এ-সব কল্···খাতায় লিখিয়া রাখে নাই। বিরক্ত হইল। এই সামান্য কাজটুকু···

স্নান সারিয়া ফিকে শাড়ী পরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া রেণু মাথার চুলে চিরুনী টানিতেছিল, টেলিফোনের খাতা এবং বিল-সমেত বিজন আসিয়া উপস্থিত। বলিল—কোনো কথা বললে তুমি রাগ করো—কিন্তু এই সামান্য কাজ···টেলিফোন্ করলে খাতায় লিখে রাখা···তাতেও তোমার ঔদাস্য!

রেণু বলিল,—ঔদাস্য যদি হয়, কি করবে শুনি?

বিজন বলিল—মানে?

রেণু বলিল—মানে, আমাকে পায়ে থেঁৎলে এমন করে দেছো···

বাধা দিয়া বিজন বলিল—তোমাকে পায়ে থেঁৎলে!

বহু দিনকার রুদ্ধ অভিমানে রেণুর দু'চোখ বাষ্পভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল···

রেণু বলিল—পঁচিশটা কল্? বেশ, তার দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি···এর পর কখনো যদি আর তোমার টেলিফোনে হাত দিই, আমার অত্তি-বড় দিব্যি রইলো।

বিজন নির্ব্বাক নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল···রেণু হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল এবং তখনি ফিরিয়া আসিয়া একখানা দশ-টাকার নোট বিজনের গায়ে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—এতে আমার পঁচিশটা কলের দাম মিটবে তো? না হয়, বলো···বাকী টাকা···

সে-কথা বিজনের কাণে গেল কি না, সন্দেহ! নোটখানা মেঝের পড়িয়া রহিল। বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিজন সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ রেণুর পানে চাহিয়া বিজনের মনে হইল, রেণু যেন শুকাইয়া গিয়াছে···অমন ফুলের মতো তার মুখ! বলিল—তোমার মুখ এমন শুকনো কেন গা?

[illegible] একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—খবর ভালো···নজর পড়েছে!

বিজন বলিল—হ্যাঁ, পড়েছে। তা···

রেণু বলিল—আজ তিন দিন জ্বরে ভুগছি, সে খপর রাখো কি তুমি?

বিজন বলিল—কি করে জানবো···না বললে?

রেণুর বুকের মধ্যটা আর্ত্ত ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িবার জো! রেণু বলিল,—তোমার একটু মাথা ধরলে কিন্তু তখনি আমি তা বুঝতে পারি। আর আমার···

কথা শেষ হইল না···অভিমানের বিপুল বাষ্প-ভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

বিজন সরিয়া কাছে আসিল···রেণুর হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—রেণু···

—যাও···গোড়া কেটে আর এখন তোমায় আগায় জল ঢালতে হবে না। কথার সঙ্গে ঠিকরিয়া ছিটকাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু এমন করিয়া পারা যায় না। যে-বয়সে পৃথিবীকে মনে হয় বসন্তের শ্যামলশ্রীতে ভরিয়া আছে, সে-পৃথিবী এমন শীতের শুষ্ক বিরসতায় ভরা! দু'জনেই বুঝিতেছে, একটা কিছু হওয়া যেন প্রয়োজন···নহিলে এমন করিয়া সংসার···সে-সংসারের প্রাণ কিসের জোরে টিঁকিবে?

রেণুর দিদি গৌরীর চিঠি আসিল। গৌরীর স্বামী শরৎ কলিকাতায় বদলি হইয়াছে। শরতের ভগ্নীপতি কলিকাতায় ফ্ল্যাট-বাড়ী দেখিয়া ঠিক করিয়াছে, দিদিরা দু'-এক দিনের মধ্যে আসিয়া সেই বাড়ীতে উঠিবে এবং সেইখানেই থাকিবে।

চিঠি পড়িয়া রেণু বলিল বিজনকে,—আমার একটি প্রার্থনা আছে···

বিজন বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল। হিসাব হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল,—কি প্রার্থনা?

—যদি মঞ্জুর করো, তবেই বলি। নাহলে মিছে বলে মুখ নষ্ট করা···সে-প্রবৃত্তি আর আমার নেই।

বিজন চাহিল রেণুর পানে; বলিল—নামঞ্জুর হবে, ভাবছো কেন?

রেণু বলিল—যে-রকম দেখছি, তাতে মঞ্জুরীর আশা হয় না।

বিজন বলিল—বলো···মঞ্জুর হবে।

রেণু বলিল—দিদি আসছে···আমাকে তুমি ছেড়ে দাও···সত্যি, তুমিও বাঁচবে, আমারও গায়ে বাতাস লাগবে। জেলের কয়েদীর মতো সব-তাতে ধমক খেতে-খেতে আমার মন এমন হয়েছে যে ভয় হয়, কোন্ দিন না গায়ের কাপড়ে কেরোসিন জেলে মরি!

বিজন জবাব দিল না। ভাবিল, একবার একটু ছাড়াছাড়ি বোধ হয় ভালো।···তাই বলিয়া এমন ধারণা রেণুর কি করিয়া হইল যে, রেণুকে বিজন তুচ্ছ করে? এ-বয়সে ভাষায় উচ্ছ্বাসে মনের সব কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে। তবু অনেক দিন সে ভাবিয়াছে, ঘটে না এমন কোনো ঘটনা, যার জোরে রেণু বুঝিবে তার উপর বিজনের ভালোবাসা বাড়িয়াছে···কমে নাই?

ভাবিল, দিদি আসিতেছেন, বেশ, তাঁর সঙ্গেও না হয় এ সম্বন্ধে একটু পরামর্শ···

সকালে সেদিন চা খাইতে বসিয়া বিভ্রাট। বিজন বলিল—আমরা ভাত-ডাল দুধ-ঘি খাই, এ খাওয়ার উদ্দেশ্য দেহকে পুষ্টি দেওয়া। তোমাকে কত বার বলেছি, এই ডিমের কথা···চার মিনিটের বেশী সময় ধরে ডিম সিদ্ধ করবে না। ডিম এমন হবে যে ওর সাদা-ভাগটা জমে যাবে আর হলদে-ভাগটা ক্ষীরের মতো ঘন থাকবে···তবেই সে ডিমে উপকার।

রেণু বলিল—ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, ও যদি না পারে···

বিজন বলিল—যাতে পারে, তোমার উচিত সে সম্বন্ধে ওকে হুঁশিয়ার করা।

রেণু বলিল—তুমি ভাবো, তোমার বাড়ীতে বসিয়ে বসিয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছো, এটুকুও আমি দেখতে পারি না!···বেশ, দাও, ঠাকুর ছাড়িয়ে দাও···আমিই রান্নাবান্না করবো। সত্যিই তো, বিনা-পয়সায় এত সুখ উপভোগ করবো, এতে আমার কি দাবী?

দু'চোখ কপালে তুলিয়া বিজন বলিল—কি থেকে কি কথা এলো! তোমাকে কিছু বলবার জো নেই!

—তা যদি ভেবে থাকো, কথা না বললেই পারো!

বিজন ভাবিল, অসম্ভব! কোথা হইতে রেণু কি যে সব ধারণা করিতে শিখিয়াছে! দিদি গৌরী আসিতেছেন, আসুন···তাঁর শরণ লইবে সে।

গৌরী বলিল বিজনকে,—বিয়ে হয়ে ইস্তক দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে আছো! একটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি নয়! বিচ্ছেদ-বিরহ হবে ভালো ভাই, তাতে ভালোবাসার রঙ্ অটুট থাকে।

বিজন বলিল—তাহলে ও যা বলছে···

গৌরী বলিল—বলেছে, আমার ফ্ল্যাটে ও থাকবে না···আমার অধীনে নয়। এ-ফ্ল্যাটের গায়ে দু'খানা ঐ ঘর···তা ঘর বেশ ভালো···দক্ষিণ খোলা···ঐ ঘর দু'খানি ভাড়া করে ও থাকবে। এক জন ঝী সঙ্গে থাকবে···আর আমার কাছে খাবে। বলছে, তাও অমনি নয়, খোরাকীর দাম দেবে আমাকে।

হাসিয়া বিজন বলিল—আমি বলেছিলুম, বাড়ীর লোকজন কি মনে করবে? তাতে বললে, তাদের বলবে, দিদি এসেছে···কখনো তো বাপের বাড়ী যেতে পায়নি, দিদির সঙ্গে দু-এক মাস এক-সঙ্গে থাকবে। আমিও বলেছি, বেশ বাবু, তাতে যদি আরাম পাও, তাই থাকো। আর বলেছি, আইনতঃ এবং ধর্ম্মতঃ তোমার খোরাক-পোষাকের দায় আমার। মাসে তোমাকে আমি দেড়শো টাকা করে দেবো—কিম্বা বলো যদি, দু'শো-আড়াইশো! তাতে বললে, না, অত টাকা কি হবে? একশো টাকা করে দিলেই চলবে! তাই···

হাসিয়া গৌরী বলিল—দু'দিন স্বাধীন ভাবে বাস করতে দাও। জানে না তো পৃথিবীতে স্বাধীন বলে কোনো-কিছু নেই···থাকতে পারে না!

বিদায়-বেলা। বিজন বলিল—দু'জনে তাহলে ফারখৎ?

বুকের ভিতরটা বেদনার বাষ্পে ভরিয়া ছিল। কোনো মতে গলা পরিষ্কার করিয়া রেণু বলিল—স্বামীর ঘর মেয়ে-মানুষ কত জ্বালা দুঃখে ছেড়ে যায় না।

বিজন বলিল—তোমার দুঃখ এখানে এমন অসহ্য হয়েছিল?

রেণু বলিল—তুমি তার কি বুঝবে? আমি তোমার বাঙালীর ঘরের বৌ···কামনা-সাধনা করে আমাকে আনতে হয়নি তো! চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে আসা! তোমার গঙ্গা-ভ্যালি টারের শেয়ার নই তো আমি!

বিজনের কণ্ঠে কৌতুকের ভাষা আসিয়া জমিল! কিন্তু এতখানি ঘন-গম্ভীর pathosএর মধ্যে কৌতুকের এতটুকু চাপ সহিবে না! তাই কৌতুকের সে-ভাষা চাপিয়া রাখিয়া বিজন বলিল—এ-রকম অবস্থা ঘটলে ডিভোর্স একমাত্র গতি! সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল; করিয়া বলিল—ও-বাড়ীতে যদি কখনো যাই, দেখা হবে তোমার সঙ্গে?

রেণু বলিল—দেখা যাবে···কখনো যাও যদি, সে তখনকার কথা!

দু'-চার দিন মন্দ লাগিল না। দিদির ছেলেমেয়েরা মাসিমা বলিতে অজ্ঞান! ভগ্নীপতি শরতের হাসি-কৌতুক-গল্প। দিদির ভালোবাসা! রাত্রে কিন্তু ঘুম হয় না। একা···গা ছম্‌ছম্ করে। যদি বা একটু ঘুম আসে, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকে। লজ্জার মাথা খাইয়া দিদিকে গিয়া ডাকিতে পারে না!

পঞ্চম দিন সকালে রেণু বলিল গৌরীকে—এ-বাড়ীতে কিছু আছে ভাই দিদি···সারা রাত কত রকম আওয়াজ শুনি! কে যেন পা টিপে-টিপে চলছে! কাশ্‌ছে! আজ থেকে ভাই, সুকুকে ছেড়ে দিয়ো, আমার কাছে ও শোবে।

গৌরী বলিল—একলা ভয় হবেই তো। আমি বলেছিলুম ঘর ভাড়া নিয়েছিস, থাকুক সে-ঘর···রাত্রে এসে আমার কাছে শো। তা নয়···

রেণু বলিল—না ভাই, ঐ ঘরেই শোবো। তবে একা···তাই সুকুকে সঙ্গে রাখতে চাইছি।

সেদিন হইতে সুকু আসিয়া রাত্রে মাসিমার কাছে শোয়। মাসিমাকে জ্বালাতন করে,—গল্প বলো মাসিমা! মাসিমা গল্প বলে। গল্প শুনিতে শুনিতে সুকু ঘুমাইয়া পড়ে। রেণুর চোখে ঘুম আসে না। খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রেণু ভাবিতে থাকে নিজের বাড়ীর কথা। বিজন কি করিতেছে? এখন একা···নিশ্চয় জাগিয়া বসিয়া হিসাব মিলাইতেছে! জানে তো, তাড়া দিয়া বিজনকে রেণু পাঠাইত শুইতে। এখন রেণু কাছে নাই···মনের সাধে লাভের হিসাব কষিতেছে! রেণু রাগ করিত! কত বলিয়াছে, কার জন্য টাকার নেশা এমন প্রবল হইয়া উঠিল? ছেলে-মেয়ে থাকিলে মানুষ···তার ভাগ্য মন্দ! ছেলে হইল না, মেয়ে হইল না। তবে? স্ত্রী? তাও কি বিজন স্ত্রীর মুখ চাহিয়াছে কখনো?

দুঃখী-কাঙালের মতো মন সে বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়···ঘুরিয়া শ্রান্ত হয়···তবু সে বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে পারে না!

দু'-চার রাত্রি এমনি ভাবে কাটিল। অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা! দেহ ক্লান্ত অবসন্ন! মনে দারুণ শূন্যতা!

এমন করিয়া দুশ্চিন্তা পুষিয়া থাকিবে কি করিয়া? বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া কোন্ সুখেই বা বাঁচিয়া

এখন ফিরিয়া যাইবে? বিজন বেশ আছে···রেণুর মতো অবস্থা হইলে নিশ্চয় আসিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইত!

বুকে কে যেন মুগুর মারিতে লাগিল!

পরের দিন সুকুকে বলিল—একটা কাজ পারবি সুকু?

—বলো।

—আজ সন্ধ্যার সময় একখানা রিক্‌শয় করে আমায় নিয়ে ও-বাড়ীতে যেতে পারবি?

—কেন মাসিমা?

রেণু বলিল—ও-বাড়ীতে আমার একটা টেবিল-ল্যাম্প আছে, সেইটে আনবো। রাত্রে ঘুম হয় না। জেগে বিছানায় পড়ে না থেকে ভাবছি, উলের সোয়েটার কিম্বা জাম্পার বুনবো।

সুকু বলিল—আমায় একটা বুনে দেবে মাসিমা?

—দেবো। উল আছে ও-বাড়ীতে···একেবারে ডাঁই-করা··· নিয়ে আসবো'খন···এনে বুনবো।

সুকু খুশী! বলিল—যাবো মাসিমা তোমায় নিয়ে।

সন্ধ্যার পর রিক্‌শ আসিল। গৌরী বলিল—মন কেমন করছে বুঝি রে?

রেণুর বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। বলিল—না···না···না··· আমি যাচ্ছি টেবিল-ল্যাম্প আর উল আনতে।

গৌরী বলিল—কাকেও পাঠালে হতো না?

—না। আলমারির মধ্যে আছে উল···দেখে আনতে হবে। তা ছাড়া ঘরদোরের শ্রী ক'দিনে কি হয়েছে, একবার দেখবো না?

গৌরী মনে-মনে হাসিল! যে-ঘর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিস, সে ঘরের মায়া কি অমনি মুখের কথায় ত্যাগ করিতে পারিস্?

রিক্‌শ হইতে নামিয়া সুকুকে লইয়া রেণু চলিল দোতলায়। সিঁড়ির সামনে দালানে বসিয়া সূর্য্য মনিবের ধুতি কোঁচাইতেছিল··· রেণুকে দেখিয়া ধড়-মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—মা!

রেণু বলিল,—হ্যাঁ। তোর বাবু ফিরেছেন?

সূর্য্য বলিল—বাবু আজ বেরোননি। বললেন, শরীর ভালো নয়। বাড়ীতে ছিলেন···এই একটু আগে বেরুলেন। বললেন, একটু ঘুরে আসি।

রেণু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। যত দিন রেণু কাছে ছিল, বাহির হইবার সময় মিলিত না···অফিসের যত জঞ্জাল ঘরে আনিয়া···আর এখন?

রেণু দাঁড়াইল না···দোতলায় উঠিল। দালানের এক ধারে খাঁচার মধ্যে ছিল নানা জাতের পাখী···মুনিয়া, জাভা স্প্যারো, পারকিট, ক্যানারি প্রভৃতি···সুকু গিয়া দাঁড়াইল সেই খাঁচার সামনে!

দোতলায় নিজের ঘর···ঘরে পা দিতে মনে হইল, কে যেন নিশ্বাস ফেলিল! রেণুর সারা দেহে রোমাঞ্চ!

রেণু একবার দাঁড়াইল···তার পর সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। সে-আলোয় ঘরের শ্রী যা দেখিল···চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার জো!

—বিছানার উপর রাজ্যের খাতাপত্র···সিগারেটের ছাই-ঝাড়া ট্রে··· দেশলাইয়ের কটা খালি বাক্স। বালিশগুলা গাদা হইয়া আছে···ময়লা চাদর!···একটা বালিশ ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়াছে···ডাকিল—

সূর্য্য আসিল। বিছানার দিকে দেখাইয়া রেণু বলিল—এ কি কাণ্ড! বিছানা? না, নরক! এই বিছানায় বাবু শুচ্ছেন?

কুণ্ঠিত স্বরে সূর্য্য বলিল—কি করবো মা? বাবু মানা করে দেছেন। বলেছেন, খবর্দ্দার, বিছানা ঘাঁটিস্‌নে না।

রেণু বলিল—ধোপা এসেছিল?

—এসেছিল।

—ও ময়লা চাদর কাচতে দিসনে কেন?

সূর্য্য বলিল—বাবু মানা করেছেন। বললেম, ও-সব কিছু কাচতে যাবে না এ ধোপে!

—চমৎকার ব্যবস্থা! এমনি ময়লা বিছানায় শুতে হবে! মা গো! বলিয়া সে পাশের ঘরে ধোপার বাঁধা গাটরি হইতে বিছানার চাদর বাহির করিল, বালিশের ওয়াড় বাহির করিল···সূর্য্যকে বলিল বালিশের ওয়াড় বদলাইয়া দিতে···এবং নিজে খাতাপত্র গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া ফর্শা চাদর পাতিয়া বিছানাটি পরিচ্ছন্ন পরিপাটী করিল! তার পর সূর্য্যর পানে চাহিল, বলিল—ময়লা চাদর আর ওয়াড়···এ-সব কাল সকালে ধোপার বাড়ী দিয়ে আসবি···বুঝলি? এ-কথার নড়চড় না হয়!

সূর্য্য বলিল—জী।

সে চলিয়া যাইতেছিল···রেণু ডাকিল! বলিল—টেবল-ল্যাম্পটা নীচেয় নিয়ে যা···আমি ওটা নিয়ে যাবো।

আলমারি খুলিয়া ড্রয়ার হইতে ক'বাণ্ডিল উল বাহির করিয়া আলমারি বন্ধ করিল: তার পর···

পা যেন চলিতে চায় না!···ঘরের চারি দিকে চাহিল। এ ঘরের প্রত্যেকটি কোণ···তার সুখ-দুঃখের স্মৃতি মাখিয়া যেন করুণ ছলছল নয়নে তার পানে চাহিয়া আছে···মৌন···মূক!

বুকখানা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল! একবার ভাবিল, থাক, আর ফিরিয়া যাইব না!···তখনি মনে হইল, না, বড়-মুখ করিয়া যে কথা বলিয়াছে···

চলিয়া আসিতেছিল, কে যেন জোর করিয়া ফিরাইল। রেণু ফিরিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল। বালিশে চোখের ক'ফোঁটা জল! তার পর টেবিলের উপর হইতে কাগজের প্যাড টানিয়া লিখিল—

—এসেছিলুম তোমার সুখ দেখতে, আরাম দেখতে। দেখা হলো, চলে যাচ্ছি। ইতি তোমার আপদ।

লেখা কাগজখানা খামে মুড়িয়া খামের উপরে লিখিল বিজনের নাম। তার পর সে-খাম রাখিল টেবিলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল টেবিলে-রাখা তারি একখানা ফটোর উপর। সে চলিয়া গিয়াছে···তার ফটোখানা তবু টেবিলে আছে! হায় রে, আসলে মানুষের দরদ হয় না, দরদ হয় নকলের উপর! ফটোখানা লইয়া আলমারির মাথায় ছুড়িয়া ফেলিল···

সুকু আসিয়া ডাকিল,—মাসিমা···

রেণু বলিল—হ্যাঁ রে, আমার হয়েছে। এই উল···তুই নে, আয়—

রিক্‌শ আসিয়া দাঁড়াইল ফ্ল্যাট-বাড়ীর সামনে। সুকুকে লইয়া রেণু নামিল।

তিন-তলায় কামরা।

সুকু বলিল—আমি খাইগে মাসিমা…বড্ড খিদে পেয়েছে।

রেণু বলিল—যা…এগুলো রেখে আমিও এখনি আসছি।

সুকু গেল তাদের কামরায়…রেণু নিজের কামরায়।

কামরার দ্বার ভেজানো ছিল…ঠেলিতে খুলিয়া গেল। অন্ধকার! ণু ডাকিল—কামিনী…

কামিনী দাসী! সাড়া মিলিল না।

রেণুর গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, দ্বার খোলা পাইয়া র যদি কোনো মানুষ আসিয়া থাকে?

সভয়ে সুইচ টিপিল…ঘরে আলো।

সে আলোয় সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি মেলিতে চোখে পড়িল…জুতা… উ-কাট্…পুরুষ-মানুষের জুতা!

চমকিয়া উঠিল! দ্রুত পায়ে দ্বারের কাছে সরিয়া আসিতেছিল, ং কে তাকে বাহুর বজ্রবাঁধনে ঘিরিয়া…

চমকিয়া চোখ তুলিয়া দেখে, বিজন! বলিল,—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি! আশ্চর্য্য হচ্ছো?

রেণু নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া গেল। বুকের মধ্যে যেন াও বাজিতেছিল…বিবাহের পরের দিন মহাপায়ায় চড়িয়া সে সিতেছিল পতিগৃহে, তখন যে-ব্যাণ্ড বাজিয়াছিল, সেই ব্যাণ্ড!

বিজন বলিল—দু'দিন অফিসে যাইনি। কাজে মন লাগছে না… বলি তোমার কথা ভেবেছি। সন্ধ্যার আগে বেরিয়েছিলুম ঠের দিকে…ভালো লাগলো না। মনে হলো, পৃথিবীতে আলো ই…বাতাস নেই…গাছপালা সব যেন পাথর হয়ে গেছে! তাই মার এখানে এসেছিলুম।

—দিদি জানে?

—না। নিঃশব্দে আমি এসেছি। তোমায় ঝী বললে, তুমি চুকে নিয়ে কোথায় গেছ। তাকে আমি আমাদের ওখানেই ঠিয়েছি…একটা মিথ্যা ছুতোয়। তোমার নাম করে বলেছি ার বৌদি ও-বাড়ী গেছে…তোকে ডেকেছে, যা…

রেণুর মনের উপর হইতে যেন থিয়েটারের শ্মশানের সীনখানা হড়্‌হড় সরিয়া যাইতেছিল…সঙ্গে সঙ্গে বুকে জাগিতেছিল ফুলে-ফুলে ফুলন্ত, আলোয়-আলো মায়াপুরীর দৃশ্য!

বিজন বলিল—তুমি আমার মঞ্জুরী-নামা চেয়েছিলে…আমার কাছ থেকে যাত্রা করে এসে আলাদা থাকবার জন্ত! কিন্তু আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব! তার কারণ, আমাদের দু'জনের জীবন মিলে এক হয়ে আছে…আমার সুখে তোমার সুখ… তোমার সুখে আমার সুখ। দু'জনে এত কাল একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করে এমন অবস্থা হয়েছে যে তুমি না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকবে না! তুমি অনুযোগ করো আমাকে পাও না বলে'…আমি ভাবতুম, তোমার ভুল। তুমি চলে এলে আমি দেখলুম, পাশে তুমি ছিলে বলেই আমার কাজ করবার শক্তি ছিল! তুমি পাশ থেকে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শক্তি, আমার বুদ্ধি সব যেন চলে গেছে। যে-মনকে কখনো শূন্য মনে হয়নি, এখন সে-মন কাজে বসতে চায় না—দিবারাত্রি তোমার পিছনে ছুটোছুটি করছে! এ যে কি অশান্তি…

রেণু একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল বিজনের পানে। বিজনের কথার শেষে বিজনের গায়ে হাত বুলাইয়া রেণু বলিল—ক'দিনে বেশ রোগা হয়ে গেছ! খুব অনিয়ম করছো, নিশ্চয়!

—বাড়ী চলো রেণু…নাহলে আমার পক্ষে বাঁচা দায় হবে।

রেণু বলিল—তার পর?

বিজন বলিল—দিদি বলেছিলেন, মিলনে মাঝে-মাঝে বিচ্ছেদ চাই! তা ক'দিনের এ-বিচ্ছেদে…সত্যি বলবো?

—কি?

বিজন বলিল,—তুমি এ ক'দিন ভালো ছিলে?

বিজনের বুকে মুখ লুকাইয়া রেণু বলিল—ক'দিন রাত্রে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি…কেবল তোমার কথা ভেবেছি!

বিজন বলিল,—দূরে যাবো বললেই যাওয়া যায় না, রেণু! এ যা সম্পর্ক…এতে ছাড়ছাড়ি নেই…যাওয়া-যাওয়ি নেই! পাঁজীতে বলে যাত্রা-নাস্তি…আমাদেরো সেই যাত্রা-নাস্তি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রন্থাবলী ও শিষ্যগণ

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হরিভক্তিবিলাস। এই গ্রন্থ কোথাও কোথাও শ্রীভগবদ্ভক্তি-লাস নামেও পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, 'বৃহৎ হরিভক্তি-লাস' নামক আর একখানি পুস্তক আছে—সেই গ্রন্থখানিই -সনাতন গোস্বামি-লিখিত—কিন্তু ঐ হরিভক্তিবিলাসের কোনও তলিখিত পুঁথি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই এবং ঐরূপ কোনও হু দেখিয়া তাহার পরিচয় এ পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশ করেন নাই। ই জন্যই 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামক যে গ্রন্থ বর্ত্তমানে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহার ১ম বিলাসের দ্বিতীয় শ্লোকরূপে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

> "ভক্তেৰ্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
> নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
> গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
> সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ।" *

এবং যাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীল দিগ্‌দর্শিনী নামে টীকা আছে, আমরা তাহাকেই মূল হরিভক্তিবিলাস বলিয়া

* শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাসও শ্রীরূপ-সনাতনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত ভক্তির বিলাসসমূহ অর্থাৎ পরম বৈভবরূপ ভেদসমূহ সংগ্রহ করিতেছেন।

মনে করি। ভক্তিরত্নাকরের মতে এই গ্রন্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামীই লিখিয়া শ্রীল গোপাল ভট্টের নামে প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী উভয়েই মিলিত হইয়া যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবসদাচারই সংগৃহীত হইয়াছে, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারবিভাগের বা দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি ইহাতে লিখিত হয় নাই; মাত্র বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ যে বিষ্ণু-নৈবেদ্যের দ্বারাই কর্ত্তব্য এবং একাদশী তিথিতে যে শ্রাদ্ধ করণীয় নহে, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অষ্টাদশ বিলাসে অন্ত নানাবিধ বৈষ্ণবের উপাস্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কথা থাকিলেও ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কোনও প্রসঙ্গ নাই; বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কোনও কথাই পাওয়া যায় না। গোপীজনবল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের বিষয় পঞ্চম বিলাসে উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে শ্রীরাধিকার কোনও উল্লেখ নাই। প্রত্যুত শালগ্রামশিলার পূজায় দক্ষিণ দেশবাসী 'মহত্তম' শ্রীবৈষ্ণবদিগের আচার অনুসরণ করিয়াই শ্রীগোপাল ভট্টের এই গ্রন্থে ভগবৎপরায়ণ শূদ্রকেও শালগ্রামার্চ্চনের অধিকার অর্পণ করা হইয়াছে এবং তাহা যে শাস্ত্র-সঙ্গত তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যদেশে ও দক্ষিণ দেশের প্রচলিত এই সদাচার বঙ্গদেশে গৃহীত হইতে পারে নাই। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত অধিকার দাবী করিবার মত মনোভাবের সামঞ্জস্যের অভাবও যে তাহার একটি কারণ, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, জন্মমাত্রহেতু জাতিগত অধিকার অবহেলা না করিয়াও গুণগত ভক্তিব্যবহারমূলক সদাচারের প্রতিষ্ঠা খ্যাপন করা হরিভক্তিবিলাসের বৈশিষ্ট্য। দাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে এই সদাচার সুস্পষ্টরূপেই প্রবর্ত্তিত। শ্রীগোপাল ভট্টও এ দেশে শাস্ত্রসঙ্গত ও সদাচারসম্মত বলিয়া সেই বৈষ্ণবাচারই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসই বঙ্গদেশের বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান এবং প্রথম স্মৃতি। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিরোধ এবং শিব ও বিষ্ণুর ভেদ কল্পনা, দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান কলঙ্ক; বলা বাহুল্য, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রভাবপূত হরিভক্তিবিলাসে তাহার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। স্মৃতিগ্রন্থ সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী—স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সামাজিক সংস্থানের মূলীভূত আচারের দেশকালগত তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাহেন, তাদৃশ সারগ্রাহী পণ্ডিতের সংখ্যা সর্ব্বত্র অঙ্গুলিমাত্র-গণনীয় হইলেও তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রকৃত উৎকর্ষ কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত পরম পণ্ডিত ও অসামান্য প্রতিভাশালী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রায় সমকালে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু রঘুনন্দন যেমন সামাজিক ও ব্যাবহারিক সর্ব্ববিধ বিধান সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্বক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গদেশের সমাজকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট—হরিভক্তিবিলাসকার তাহা করেন নাই; তিনি মাত্র বৈষ্ণবগণের সদাচার নির্দ্দেশ করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যাপক চেষ্টার নিকট যে এই প্রয়াস নিতান্ত আংশিক বলিয়া উপলব্ধ হইবে তাহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। তথাপি হরি-ভক্তিবিলাসের সমজাতীয় চেষ্টা বঙ্গদেশে আর হয় নাই বলিয়া মনীষিগণের নিকট এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইয়াছিল। রাধামোহন ভট্টাচার্য্য "হরিভক্তিতরঙ্গিণী" নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধে হরিভক্তিবিলাসের মতবাদের অনুসরণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের সন্নিহিত রায়ান গ্রামনিবাসী ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিভক্তিবিলাসের একখানি পদ্যানুবাদ করেন। *

অতঃপর গোপাল ভট্টের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি টীকার বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। এই টীকাটির নাম "শ্রীকৃষ্ণবল্লভা"। বঙ্গদেশে এই টীকাটির প্রচার ছিল না। বহু কষ্টে শ্রীধাম পুরী হইতে ও পরে কলিকাতার "এশিয়াটিক সোসাইটী" হইতে পুঁথি লইয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই টীকাটি প্রকাশ করেন। টীকার এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে ইহাকে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর টীকা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; পরন্তু এই টীকা থাকিতে তাহার কিয়ৎকাল পরেই সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী ইহার আর একটি টীকা লিখিবেন ও তাহাতে এই টীকাটির উল্লেখমাত্র করিলেন না ইহা কোনওক্রমে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণবল্লভার রচয়িতা গোপাল ভট্ট ঐ টীকাতেই নিজের যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের পিতার নাম দ্রাবিড় হরিবংশ ভট্ট ও পিতার নাম নৃসিংহ ভট্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু কালকৌমুদী ও রসিকরঞ্জনী টীকাতেও ঐ পরিচয় পাওয়া যায়। † অতএব উহা যে বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের লিখিত নহে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীগোপাল ভট্ট সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদর্শনের মতবাদ আলোচনা করিয়া একখানি দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমাহৃতিমূলক গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। ইহাতে বিশেষ ভাবে দাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণবগণের ও মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের মতবাদই আলোচিত হইতেছিল। শ্রীজীব যখন কাশীধাম হইতে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্য লাভ পূর্ব্বক বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিচক্ষণতা লাভ করেন, তখন গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া এই ক্রান্ত ব্যুৎক্রান্ত ও খণ্ডিত গ্রন্থের রচনার ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন ইহা শ্রীজীব তাঁহার সুবিখ্যাত ষট্সন্দর্ভের আদিসন্দর্ভ তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হিতজনক এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তেই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ষট্সন্দর্ভের ও সর্ব্বসম্বাদিনীর

* শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (পৃঃ ১০১০)

† ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" (১৬৩ পৃঃ)

উদ্ভবের মূল কারণই গোপাল ভট্ট গোস্বামী। তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মনোভাব-প্রসূত সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন, শ্রীজীব তাহাই করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে শ্রীজীবের জীবনচরিত আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখাইয়াছি।

শ্রীরূপ গোস্বামী "পদ্যাবলী" নামে যে কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়:—

"ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডখণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দরস্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দমুকুন্দসুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।"

অনুবাদ—হে ভাণ্ডীরবটেশ্বর! হে ময়ূরপুচ্ছভূষণ! হে উৎকৃষ্ট চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনপুরন্দর! হে প্রফুল্ল ইন্দীবর তুল্য শ্যামলাঙ্গ। হে কালিন্দীপ্রিয়! হে নন্দনন্দন! হে পরমানন্দময় অরবিন্দ-লোচন! হে গোবিন্দ! হে সুন্দরতনু মুকুন্দ! আমি দীন, আমাকে আনন্দিত কর।

এই শ্লোকটি ব্যতীত গোপাল ভট্টের তিনটি ব্রজবুলিতে বিরচিত পদ পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আরও পদাবলী থাকিতে পারে, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বিরচিত অন্য কোনও গ্রন্থ বা শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিংশতি বিলাসের প্রত্যেক বিলাসের প্রারম্ভেই যে একটি করিয়া বন্দনা শ্লোক পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি শ্লোকেই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবদ্-বুদ্ধিতে বন্দনা করিয়াছেন।

অতঃপর গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই "অনুরাগবল্লীতে" দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরূপসনাতন-প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ পশ্চিমদেশীয়গণকে গোপাল ভট্ট গোস্বামী দীক্ষাদান করিবেন এইরূপ একটি নিয়ম স্থির করেন। যথা—

"গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমামাত্র।
গৌড়িয়া আসিলে রঘুনাথ-কৃপাপাত্র।"

—অনুরাগবল্লী, ২য়, ১৪ পৃঃ।

এ স্থানে রঘুনাথ বলিতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু অনুরাগবল্লীর এই কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালী শ্রীনিবাস আচার্য্য গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট এবং বঙ্গদেশের নরোত্তমদাস ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। ব্রজবাসী 'দাস' নামক এক জন ভক্তকে আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবকরূপে দেখিতে পাই। বঙ্গদেশবাসী অনেকেই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অপ্রকটে শ্রীজীব, গোস্বামীর নিকটও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অবশ্য বর্ত্তমানে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পরিবারের গোস্বামিগণের মধ্যে, পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকেই দীক্ষা দান করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি অনেক বাঙ্গালী নিত্যধাম-প্রাপ্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা অবগত আছি।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যগণের বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কথাই আলোচনা করিতে হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বপ্রথম। তিনি রাঢ়দেশে ও বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে অগ্রণী। তিনি কি প্রকারে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-পীঠ ও উৎকলের তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া গোস্বামি-গ্রন্থাবলী লইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীর হাম্বিরকে সপরিবারে দীক্ষিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্য্য দেশে আসিয়া পর পর দুই বার বিবাহ করেন। প্রেম-বিলাসের ষোড়শ বিলাসে বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব গোপাল ভট্ট গোস্বামী "স্খলৎ"—অর্থাৎ বৈষ্ণব-পথ হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রেম-বিলাসের এই বর্ণনা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়; কারণ, শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর ও গৌড়-মণ্ডলের অন্যান্য বৈষ্ণবের আজ্ঞানুসারে বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর দ্বারা যথাকালে সন্তান লাভ না ঘটায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে ও তাঁহার বংশাবলী বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারের দ্বারা বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটে ও তাহার মর্য্যাদা সুরক্ষিত হয়। যেমন মহারাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন, তেমন সৈয়দাবাদের মহারাজা নন্দকুমার, পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়-প্রমুখ সমাজ-প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিগণ এই বংশের বংশধরগণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। অশেষ প্রতাপশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও এই বংশের বংশধরগণের অনুগত হওয়ায় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলী গৌড়দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একরূপ পরিচালকরূপে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পরিবারের মর্য্যাদা গৌড়দেশে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর দ্বিতীয় প্রধান শিষ্যের নাম গোপীনাথ দাস পূজারি। ইনি গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ। গোপাল ভট্ট যখন দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিবার সময় উত্তরাখণ্ডের তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী দেববন হইতে ইঁহাকে দীক্ষাদান করিয়া সঙ্গে লইয়া আসেন এবং কালক্রমে ইঁহার আনুগত্যে ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার উপর শ্রীরাধা-রমণের সেবার ভার অর্পণ করেন। গোপীনাথ চিরকুমার ছিলেন;

* শুনিতে পাওয়া যায়, গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পরবর্ত্তী কালে তাঁহার শিষ্য ও শ্রীরাধারমণের সেবাইত গোপীনাথের ভ্রাতা দামোদরের বংশধরগণ বাঙ্গালী বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। প্রথমে না কি শ্রীরাধারমণের সন্নিকটেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমাধি বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তী কালে ঐ সমাধি উঠাইয়া শ্রীঈশ্বরীজীর কুঞ্জে অপসৃত করিতে হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারের মূলে কিছু না থাকিলেই আমরা সুখী হইব।

তিনি পরলোকগমনের প্রাক্কালে তাঁহার ভ্রাতা দামোদরকে নিজ বংশীয়গণের দ্বারা স্বহস্তে শ্রীরাধারমণের সেবা করাইবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া তাঁহার হস্তে সেবার ভার অর্পণ করেন। তদবধি দামোদরের বংশীয়গণই স্বহস্তে শ্রীরাধারমণের সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বংশানুক্রমে, গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পশ্চিমদেশীয় ও উৎকলদেশীর শিষ্যগণের বংশাবলীকে দীক্ষা দিয়া আসিতেছেন এবং শ্রীরাধারমণের গোস্বামী নামে পরিচিত হইতেছেন। এই বংশে কোনও দিন পাণ্ডিত্যের অভাব ঘটে নাই। নিত্যধামগত মধুসূদন সার্ব্বভৌমের পরেই এখন শ্রীপাদ দামোদরলাল দর্শনশাস্ত্রীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহরিবংশ মিশ্র গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তৃতীয় শিষ্য। ইনি সাধারণতঃ "হিত হরিবংশ নামেই পরিচিত। ইঁহার পিতার নাম ব্যাস মিশ্র, মাতার নাম তারাদেবী; ইঁহার পিতা কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্যাস মিশ্র দিল্লীর বাদশাহের অধীনে কাজ করিতেন এবং মথুরার নিকট বাদগ্রামে বাস করিতেন। হরিবংশের পত্নীর নাম রুক্মিণী দেবী। প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হইলে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার পথে অনন্ত নামক জনৈক বিপ্রের বাটীতে অতিথি হন এবং অনন্ত বিপ্র তাঁহার কন্যাদ্বয়কে ও তাঁহার সেবিত শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহকে স্বপ্নাদেশে হরিবংশকে অর্পণ করেন। হরিবংশ পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধাবল্লভজীউর সেবা প্রকাশ করেন। পরে ইনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবাচার মতে একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ, তাম্বুলচর্ব্বণ ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু হরিবংশ একাদশী দিনেও শ্রীরাধিকার কৃপা-প্রসাদ বলিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিতেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিবংশকে উহা সদাচার-বিরোধী বলিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু হরিবংশ ঐ তাম্বুল শ্রীরাধারাণীর প্রদত্ত প্রসাদ বলিয়া সে আদেশ অমান্য করেন। বাধ্য হইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিবংশকে পরিত্যাগ করেন। হরিবংশ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর আশ্রয়-ভিক্ষা করিলে, তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকলেই হরিবংশের ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংসর্গ ত্যাগ করেন। হরিবংশ "রাধা-বল্লভী" সম্প্রদায় নামে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করেন। এখন পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ে একাদশীর দিনেও শ্রীভগবৎপ্রসাদ গৃহীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, হরিবংশ "রাধারসসুধানিধি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ও "সেবা-সখিবাণী" নামক হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়ে অগ্রে শ্রীরাধার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, হিত হরিবংশের এই প্রকারে গুরুর নিকট অপরাধের ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়াছিল। বৃদ্ধকালে হরিবংশ পুত্রকে শ্রীরাধারমণের সেবা সমর্পণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনে শ্রীহরিভজনার্থ গমন করেন।

"দৈবের বিচিত্র গতি বুঝা নাহি যায়।
(দস্যু) হরিবংশের মুণ্ড কাটি ফেলে যমুনায়।
রাধা রাধা বলি মুণ্ড উজাইয়া যান।
যথি গোপাল ভট্ট গোসাঞি করে স্নান।
সেই ঘাটে মুণ্ড গিয়া স্থির হইল।
রাধা বলি নেত্রজল ছাড়িতে লাগিল।
সেই সময় ভট্ট গোসাঞি সেই ঘাটে ছিলা।
কাটামুণ্ডে রাধা বলে আশ্চর্য্য হইলা।
নিরখিয়া দেখে গোসাঞি হরিবংশের মাথা।
আইস আইস বলে মনে পাইলা বড় ব্যথা।
কাটামুণ্ড আইসা প্রভুর চরণে ঠেকিল।
অপরাধীর অপরাধ ক্ষমিবে কি না বল।
গোসাঞি কহে তোর অপরাধ ক্ষমা কৈল।
এত বলি তার মাথে চরণ অর্পিল।
চরণ পাঞা হরিবংশ মুক্ত হইয়া গেল।
গোপাল ভট্ট সবা স্থানে সকল কহিল।"

—প্রেমবিলাস, ১৮ বিলাস (তালুকদার সং, ১৫৪ পৃঃ)

এই তিন জন শিষ্য ব্যতীত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আর দুই জন শিষ্যের এক জন গুজরাটবাসী মকরন্দ ও অপরের নাম শম্ভুরাম। কেহ কেহ গদাধর ভট্টকেও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি যে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য, আমরা শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনীতে তাহা দেখিয়াছি। এই কয়েক জন শিষ্য ভিন্ন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বহু পশ্চিমা শিষ্য ছিল, তাঁহাদিগের এখন আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত যে ভজনপন্থা তাহাই শ্রীরূপানুগা ভজনপদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। শ্রীগোপাল ভট্ট এই শুদ্ধা ভজনপদ্ধতিরই অনুসরণ করেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বিশেষতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহাই বিশেষ ভাবে প্রচার করেন। ঐ সমস্ত হইতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবাইত গোস্বামিবংশে এই পদ্ধতিই নিষ্ঠাভরে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাবান্তে শ্রীশ্রীরাধারমণের মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। শিষ্যবর্গ ও শ্রীজীবাদি শ্রীবৃন্দাবনের প্রভাবশালী গোস্বামিগণ মহা-মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"—এই ষোল নামের বত্রিশ অক্ষরের নামমন্ত্র অষ্টপ্রহর অর্থাৎ দিবারাত্রি কীর্ত্তিত হয়। তদবধি প্রতি বৎসর ভট্টগোস্বামীর তিরোভাব-স্মরণ-উৎসবে এই নাম অষ্টপ্রহর কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দদেব আজ জয়পুরের রাজপ্রাসাদে রাজভোগে সেবিত; শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবিত শ্রীল মদনমোহনদেব আজ করৌলীর রাজগৃহে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবিত শ্রীল রাধারমণদেব তাঁহারই মনোনীত সেবাইত গোস্বামিবংশের দ্বারা নিষ্ঠাভরে অতি শুদ্ধভাবে সেবিত হইয়া শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টের স্মৃতি সগৌরবে ঘোষণা করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৪৬
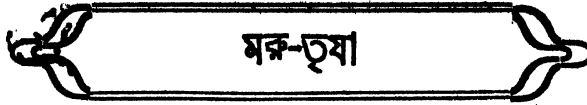
অনিল উঠিয়া পাশের ঘরে শুইতে গেল। এক ঘরে দু'জনে রাত্রি-যাপন করে না। তবু তাহাদের মিথ্যা কলঙ্ক নিবিড় মসীময় হইয়া তাহাদের নামের উপর চিরকালের মত লেপিয়া গেল। এটুকু রত্না নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল।

দ্বার-বন্ধ করিয়া রত্না আসিয়া শয্যায় বসিল। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে কোথায় পড়িয়াছিল, উত্তেজনার মুখে কোন কাজ করিতে নাই। তাহাতে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। সে বইখানার নাম ভুলিয়া গিয়াছে! কে লেখক, তা'ও মনে নাই। এই ক'টা লাইন শুধু রত্নার মনের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতে লাগিল।

আবেগের মুখেই সে শিশু-কাল হইতে পরিচালিত—তাহার অভ্যাস। বাধা দিবার কেহ ছিল না! মা রাগ করিলে বাপ বলিতেন,—মহাদেবের কৃপায় যাহাকে পাইয়াছ, শাসনে তাহাকে নষ্ট করিয়ো না! দেবতার ক্রোধ হইবে।

দর-দর ধারে রত্নার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এবার দেশ হইতে আসিবার সময় মা তার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন,—রত্না, লক্ষ্মী মা আমার, একটি বারও ভুলিস্‌নি, তুই আমার পেটে জন্মেছিস্‌, তুই আমারি মেয়ে! মায়ের স্বরে কি গভীর কাকুতি!

সে দিন সে কথার মধ্যে এত বড় ইঙ্গিত ছিল, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত মায়ের চোখ সন্তানের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত চঞ্চল হইয়াছিল—তাই মা ও-কথা বলিয়াছিল। পিতা-পুত্রী বুঝিতে পারে নাই। বাপ শুধু বলিয়াছিল,—বড়-বৌ খালি ভাবো মেয়ে পর হোলো—গোস্বামী সাহেবের ও পুষ্যি-মেয়ে হয়েছে! হাঃ হাঃ! তাও কি হয় কথনো? ওর বাপু, এ তেল আর জল! আমার মেয়ে আমারই আছে! ওখানে শুধু বড়লোকের কাছে মানুষ হচ্ছে!

তাই! রত্না মানুষই হইতেছিল। মানুষ হইলও ভালো! উৎকট আবিকারে ক্ষিপ্তের যেমন হাসি ফোটে, রত্নার অধরে তেমনি অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটিল! অত্যধিক শিরঃপীড়ায় সকালে সে স্নান করিয়া-ছিল। সারাদিন কেশগুচ্ছের প্রসাধন করে নাই। সেই অবিন্যস্ত রুক্ষ চিকুরজাল এলায়িত হইয়া পিঠের উপর লুটাইতেছে; হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সেগুলাকে সরানো ছাড়া প্রসাধনের স্পৃহাও মনে জাগে নাই। এখন ক্রন্দন-রক্তিম নেত্র বিষণ্ণ মুখে এলায়িত কেশে তাহাকে দেখাইতেছিল যেন মূর্তিমতী বিষাদ!

স্নেহময়ী জননীকে স্মরণ করিয়া রত্না মনে মনে শত বার বলিল,—কেন তুমি এই অযোগ্য সন্তানকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে মা? দেবতাকে স্মরণ করিয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বহু বার বলিল, তোমার সুন্দর হাত এই সুন্দর দেহ যদি রচনা করিয়াছিলে ঐ হাতেই কেন তবে এর ভাগ্য-লিপি এমন নির্ম্মম করিয়া লিখিয়াছিলে? কি কর্ম্মদোষে এত বিড়ম্বনা তাহাকে সহিতে হইতেছে!

রত্না ভাবিতেছিল, এই তো উনিশ বছর বয়স, ইহার মধ্যে তিনটি দিনেই যেন বার্দ্ধক্যে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেছে! সংসারে সকল ভোগের স্পৃহাতেই তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কেন? কেন? কে তাহার এমন নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘটাইল! কাহাকে সে দায়ী করিবে? অনিলের সঙ্গে রত্না বহু বাক-বিতণ্ডা, তর্ক, কলহ করিয়াছে। বিদ্রূপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনাও উভয় পক্ষে হইয়া গিয়াছে তবু কোন মতেই রত্না নিজের দুঃখের জন্য অনিলকে দায়ী করিতে পারিল না।

এবং এই নির্জ্জন রুদ্ধ কক্ষে বিচারে বসিয়া রত্না এ দুর্গতির জন্য যে ব্যক্তিকে মনে মনে দায়ী করিতে চাহিল, তাহার নাম স্মৃতিপথ হইতে সরাইতে চাহিতেছিল! এখন সে নাম মনে হইতে কাটা ঘা মাড়াইয়া দিবার মত মনে নিদারুণ জ্বালার সঞ্চার হইল। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য তাহাকে দোষী করিতে গিয়া চিত্ত শিহরিয়া উঠিল! তাহার কানে যখন রত্নার এই দুর্মতি কলঙ্ক-কাহিনী গিয়া পৌঁছিবে, তখন সে রত্নাকে হীন ভাবিয়া কতখানি অবজ্ঞা করিবে! না, তাহার বুকে রত্নার জন্য ব্যথা বাজিবে? সমস্ত চিন্তাকে ডুবাইয়া সেই চিন্তাই অকস্মাৎ প্রবল হইয়া রত্নাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনিলের কথাও রত্না ভাবিতেছিল, তাহার কত বড় সর্ব্বনাশ রত্না করিয়া বসিল! অনিল নিজের বুকে হাত দিয়া বলিয়াছে, এখানে গুলী চালাইবে! রত্না শিহরিয়া উঠিল! হায় রে, এমন কোন দেবতা নাই, যে অনিলকে রক্ষা করে! বাস্তবিক সে নিরপরাধ! রত্নার জন্যই তাহার এ দুর্গতি!

হঠাৎ রত্নার মনে হইল, অনিল আত্মহত্যা করিবে বলিল, রত্না তা পারে না? রত্না কাঁপিয়া উঠিল। মরণ সে কামনা করে। জগতে তাহার আশা করিবার, কামনা করিবার, চাহিবার সব কিছু ফুরাইয়াছে! এই দুর্নিবার লজ্জার বোঝা সে মৃত্যুর পায়ে নামাইতে চায়। তবু না, না, রত্না নিজের হাতে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারিবে না! সে দুঃসাহস হোক, ভীরুতা হোক, রত্না তাহা পারিবে না।

কিন্তু এই দুর্ভর জীবন লইয়াই বা কি করিবে? একটি একটি করিয়া রত্নার মানস-নেত্রে তার পরিচিতের দল আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া রুদ্ধ-কপাটের গায়ে লাগিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। রত্নার কাণে যেন আত্ম-পরিজনদের রূঢ় কটূক্তিগুলা ঐ মত্ত বায়ুর সহিত মিশিয়া কাণে আসিয়া লাগিল!

বিভোর মনে রত্না বসিয়া রহিল! নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ যেমন কত কি শুনিতে পায় দেখিতে পায়, তেমনি তাহারই মধ্যে রত্না দেখিতেছিল হরিমতীর কোলে মাথা রাখিয়া সহাস্যে তাহার স্বামী বলিতেছে, ইস্‌, তোমার সেই মেম-বোনের সঙ্গে মা আমার সম্বন্ধ করেছিলেন! ভাগ্যিস্‌ বিয়ে হয়নি! খুব বেঁচে গেছি!

পরিহাসে হরিমতী বলিতেছে, তবু তো সুন্দরী বউ পেতে, আমার মত তো কালো নয়।

বাহুপাশে হরিমতীকে বাঁধিয়া তাহার স্বামী বলিতেছে, চাই না আমি অমন সুন্দর!

রত্নার মুখ বেদনায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে যাহাদের চিরকাল কৃপার পাত্র ভাবিয়াছে, তাহারাই আজ তাহার নামে বাঁকা কটাক্ষে এমন কথা কহিতেছে। তাহাদের চোখে রত্না আজ কত ছোট!

ধ্যান-নিবিষ্টার মত রত্না দেখিতেছিল, তাহার দুর্মতিতে জননী মৃতকল্পা, পিতা বিকৃত-মস্তিষ্ক। আকাশের অশনি-পাতে কেন তাহার মৃত্যু হইল না? দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাহাকার ক্রন্দনে রত্না লুটাইয়া পড়িল। তথাপি চিন্তার হাত হইতে—মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মত চিন্তার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ ছুটিয়া আসে। গোস্বামী সাহেবের দুর্জ্জয় ঘৃণা! মিসেস্-গোস্বামীর ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, কল্পনার বিনাইয়া বিনাইয়া সান্ত্বনা দেওয়া—সমস্তই যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অমিয়র কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কল্পনা বলিতেছে,—রত্নার ঐ তো স্বভাব! আমি জানতুম! কল্পনার বলিবার ভঙ্গীটুকুও যেন রত্না দেখিতে পাইল।

বিছানা ছাড়িয়া পাগলের মত রত্না ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

কখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব-গগনে উষার মৃদু আলোকপাত হইয়াছে, রজনীর মত্ততা থামিয়াছে, মেঘের জল-নীল গগনপ্রান্তে পাড়ি দিতেছে, তাহার কিছুই রত্না জানিল না। সে শুধু অস্থির চিত্তে পাদচারণে রত রহিল।

বাহিরে ডাক-বাংলার প্রাঙ্গণে সেই আলো-আঁধার-বিজড়িত প্রত্যূষে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। এবং তাহার মধ্য হইতে বর্ষাতিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা টুপী-মাথায় সাহেব-বেশী এক মনুষ্য-মূর্ত্তি অবতরণ করিল। সে ব্যক্তি সোজা ডাক-বাংলার সোপানশ্রেণী বাহিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং বাহির হইতেই রুদ্ধ একটা কপাটে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাক দিল,—অনিল! অনিল!

ঘরের ভিতরে অনিল বোধ করি জাগিয়াই ছিল। আহ্বানে সে কপাট খুলিয়া আগন্তুকের পানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

কোন ভূমিকা না করিয়া আগন্তুক কহিল,—রত্না? রত্না কৈ? তাকে ডাক্—

কোন উত্তর না দিয়া অনিল ঘরের বাহিরে আসিল এবং অন্য একটা বন্ধ-দ্বার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদু স্বরে কহিল—রত্না ঐ ঘরে।

আগন্তুক কহিল—ও···তা বেশ, তুমি তৈরী হয়ে নাও! সাতটার গাড়ীতেই আমি তোমাদের নিয়ে ফিরতে চাই! বলিয়া অনিলের প্রদর্শিত ঘরের কাছে আসিয়া দ্বারে টোকা মারিয়া কহিল,—রত্না, দরজা খোলো।

দু'জনকে স্বতন্ত্র ঘরে দেখিয়া অমিয়র অন্তরে বিস্ময়ের সীমা ছিল না! কিন্তু বাহিরে সে বিস্ময় এতটুকু প্রকাশ পাইল না! তাহার সুদৃঢ় মুখে, কণ্ঠের গম্ভীর স্বরে শুধু কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠিল।

অমিয়র আহ্বানে রুদ্ধ কপাট মুক্ত হইল না। ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়াও আসিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অমিয় দ্বারে আবার মৃদু করাঘাত করিল এবং আদেশের ভঙ্গীতে কহিল,—দরজা খোলো, রত্না।

এবার রত্না আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল,—সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে! এখন কম্পিত হাতে দ্বারের অর্গল মুক্ত করিল!

খিল খোলার শব্দে অমিয় কপাট ঠেলিল এবং মুক্ত দ্বার-পথে তখনি ঘরের মধ্যে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

খাটের পাশে বিছানার উপর হাত রাখিয়া রত্না দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এলায়িত চিকুর বাতাসে দুলিতেছে। অদৃশ্য তুলি হাতে আয়ত নেত্রকোণে কে যেন নিবিড় কালি লেপিয়া দিয়াছে। অবিরাম ক্রন্দনে আঁখিপল্লব স্ফীত! শ্বেত পলাশ দু'টি রক্তিম! রত্না যেন শুষ্ক ফুলের মত ম্লান!

জ্বলন্ত অনুশোচনা, তীব্রতম গ্লানি যেন সে মুখে আঁকা রহিয়াছে! রত্নার চেহারা গভীরতম বেদনার জমাট মূর্ত্তি বলিয়া নিমেষ দৃষ্টিপাতেই বুঝা যায়!

অমিয় দৃষ্টি ফিরাইল। কহিল,—আমি সাতটার ট্রেণে তোমাদের নিয়ে বাড়ী ফিরবো। হ্যাঁ, চট্ করে হাত-মুখ ধুয়ে চুলটুল পরিষ্কার করে তৈরী হয়ে এসো। আমাদের চা করে দেবে। আমি তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছি! একটুও কুড়েমী করবে না।

অমিয়র স্বরের শেষ দিকটা কেমন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। নিজেই সে ইহাতে বিস্মিত হইল। এবং তাহার মধ্য হইতে নিঃশব্দে যে মমতা ঝরিয়া পড়িল, তাহা রত্নার চোখ দু'টিকে নিমেষে অশ্রুপ্লাবিত করিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দুর্নিবার ক্রন্দন-নিবারণে রত্না কাঠ হইয়া রহিল।

অমিয় আসিয়া চায়ের হুকুম দিয়াছিল। বাংলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া সে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন তাহার অনেক কাজ! অনেক ভাবনা! প্রথমে রত্নাকে পিতা-মাতার কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। যে সমাজে যে কুলে সে জন্মিয়াছে, তাহারই অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে জীবনকে সমর্পণ করিতে বলিবে। তাহাতেই শুধু রত্নার মঙ্গল। তার পর সহোদরের সমস্ত দুষ্কৃতি ঢাকিয়া জনক-জননীর বুকে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তার পর সে ফিরিয়া আসিবে নিজের কর্ম্মস্থলে; সেখানে শ্রান্ত চিত্তে অন্তরের জমা-খরচের খাতা খুলিয়া আর এক বার মিলাইবে। দেখিবে, রত্নার জন্য যে-জায়গা খালি পড়িয়া আছে, কি দিয়া তাহা পূরণ করা যায়!

পোষাক পরিয়া অনিল অগ্রজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয় তাহার ঈষৎ লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—এসো! তেষ্টা যা পেয়েছে! কিন্তু রত্না কৈ? তাকে ডাকো। চা করবে।

অনিল নত মুখে কহিল,—রত্নাকে তুমি নিয়ে যাও দাদা। আমায় বিশ্বাস করো, সত্য বলছি, রত্না নির্দ্দোষ! শুধু মনের উত্তেজনায় আমার সঙ্গে সে চলে এসেছে! এই তার অপরাধ! তাছাড়া আর কোন দোষে ও দোষী নয়।

নিমেষে যেন অমিয়র বুকের বিশ-মণী পাথরখানা সরিয়া গেল।

কিন্তু ভ্রাতার মতই গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল,—তা হয় না অনিল, তা হলে ওর দুর্নাম ঘুচবে না! ওকে রক্ষা করবার জন্যই বাবার কাছে তোমায় যেতে হবে। বলিয়া অমিয় হাঁক দিল,—রত্না! নাঃ, চিরকালের নিড়বিড়ে স্বভাব আর তোমার সারলো না।

অনিল অবাক হইয়া অগ্রজের মুখের পানে চাহিল। এমন শান্ত, এমন স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারিল না।

মন্থর পদবিক্ষেপে রত্না আসিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইল। মিয় চাহিয়া দেখিল,—তাহার কেশ-বেশ সমস্তই পরিচ্ছন্ন। প্রসাধন রিয়াছে! তৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া কহিল,—নাও, চট্ করে চা'টুকু রে লক্ষ্মীর মত আমাদের দিয়ে ফেল। আর পনেরো মিনিট র সময় নেই রত্না।

৪৭

পাঁচটা দিন রত্না গোস্বামী-গৃহে যাপন করিল, তাহার ধ্যে একটি বারও সে অমিয়র সহিত দেখা করে নাই! অধিকাংশ ময় নিজের ঘরে কাটাইত। এবং অমিয় যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, সময়ে সে ঘরের বাহিরে পা দিত না। পাছে অমিয়র সহিত চোখো-চোখি হইয়া যায়। এমনি দুর্নিবার লজ্জা তাহাকে অহরহ কুচিত রাখিয়াছিল।

সে দিন সকালে অমিয় নিজে আসিয়া তাহার ঘরের দরজার মনে দাঁড়াইল এবং রত্নাকে ডাকিয়া কহিল,—আজ তোমায় দেশে য়ে যাবো রত্না—রেডী হয়ে থেকো! ভূষণকে বলে দিয়েছি াড়ী বার করতে। বলিয়া অমিয় প্রস্থান করিল।

রত্না দেওয়ালের এক পাশে নত মস্তকে মৌনমুখী দাঁড়াইয়াছিল—ীরব নিস্পন্দ।

লছমন আসিয়া যখন জানাইল হাকিম্ সাহেব সেলাম দিয়াছেন, খন চোরের মত নিঃশব্দে সে আসিয়া দাঁড়াইল গোস্বামী াহেবের ঘরের সামনে। ভিতরে পা দিবে কি না বুঝিয়া উঠিতে ারিল না।

ঠিক সেই সময় বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়া অমিয় রের সামনে আসিয়া রত্নাকে স্থাণুর মত দেখিয়া থমকিয়া াড়াইল। কহিল,—এসো। বাবা জেগে আছেন। ঘরে এসো। লিয়া দরজার পর্দ্দা সে তুলিয়া ধরিল।

—কে? বলিয়া মুখ তুলিতেই মিসেস্ গোস্বামী দেখিলেন, অমিয় র্দ্দা ঠেলিয়া রত্নাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

নত মুখে তিনি স্বামীর হরলিক্স্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গাস্বামী সাহেব বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সস্নেহ আহ্বানে ডাকিলেন, ত্নাবলী মা—এসো।

মমতা-সিক্ত কণ্ঠ—যেন নিদাঘের অগ্নি-ভরা দিনের শেষে সজল মেঘের স্নিগ্ধ কোমল ছায়া! এ ছায়ায় অন্তর-বাহির নিমেষে জুড়াইয়া ায়।

রত্না ত্বরিত পদে তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া বালিসের পর স্থাপিত চরণযুগলে মাথা রাখিল।

—থাক্, থাক্ মা, হয়েছে! আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তোমার ালো হবে। গোস্বামী সাহেবের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি ত্নার নমিত শিরে হাত রাখিলেন। কহিলেন,—যদি কখনো ইচ্ছে র, আমার কাছে যেয়ো।

কথাটার মধ্যে কি উহ্য ইঙ্গিত রহিল, একমাত্র অমিয় ছাড়া আর কহ বুঝিল না! অমিয় জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গোস্বামীকে প্রণাম করিতে তিনি কহিলেন,—এসো! অমিয় তোমায় নিয়ে যাচ্ছে। বলিয়া থামিয়া একটু ইতস্ততঃ রিয়া কহিলেন,—মাকে বাবাকে বলো, যত দূরেই থাকি বিয়ের চিঠি যেন পাই।

ভূষণ গাড়ী আনিল। রত্না অমিয় ভিতরের আসনে বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

গাড়ী যখন তাহাদের গ্রামের সীমান্তে আসিল, তখন রত্না অমিয়র পানে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল,—আমার কলঙ্ক তুমিও বিশ্বাস করেছো?

রত্নার দিকে একটু সরিয়া বসিয়া অমিয় তাহার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল,—না। এই তোমায় ছুঁয়ে আমি বলছি।

বলিয়া থামিয়া হাতখানার উপর মৃদু চাপ দিয়া কহিল,—আমি সব শুনেছি রত্না, অনিল আমায় সব বলেছে। শীকার-পার্টির গ্রূপ-ছবিখানা তোমায় পাগল করে তুলেছিল! আমি শুনেছি।

খপ্ করিয়া রত্নার মুখ দিয়া কেমন আপনা হইতে কথা বাহির হইল,—তুমি কল্পনাকে ভালোবাসো?

সুদৃঢ় স্বরে অমিয় কহিল,—না। জীবনে আমি শুধু এক জনকে ভালোবেসেছি। এবং তাকেই ভালোবাসি। বলিয়া রত্নার হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

তার পর ধীর-গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল—তুমি ফিরে যাও রত্না। আমাদের সঙ্গে, সহরের সঙ্গে কোন সংস্রব তুমি রেখো না। এমন করে নিজের মনের শান্তি হারিয়ো না। নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করো! তুমি তা পারবে।

অমিয় থামিল। রত্নার মুখের উত্তর শুনিবার ইচ্ছা ছিল। রত্নার মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু সে মূকের মত নিঃশব্দে অমিয়র পানে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিল। অমিয় যেন নিমেষে রত্নার হৃদয়ের সুগভীর ভালোবাসা আর একবার সেই বৃহৎ কৃষ্ণ-তারকা দুইটির মধ্য দিয়া নূতন করিয়া দেখিতে পাইল! বুকে উদ্বেলন জাগিল।

কিন্তু চিরদিনের সংযত প্রকৃতি অমিয় মুহূর্ত্তে নিজেকে শান্ত করিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো হীন-বৃত্তি খোঁজে না, রত্না। যাকে ভালোবাসে, তাকে সে চায় বড় করে তুলতে। সেইখানেই তার গর্ব্ব। সেই তার গৌরব। তাতেই জাগে আনন্দ।

অন্তরের দুর্জ্জয় বাসনাকে নিঃশব্দে দমন করিয়া রত্না নত হইয়া অমিয়র পদধূলি লইল।

রত্নার নির্দ্ধারিত পথে গাড়ী হাঁকাইয়া ভূষণ রমেশের গৃহ-দ্বারে পৌঁছিয়া মোটর থামাইল।

রমেশ বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। কন্যাকে দেখিয়া মাছ-তরকারী ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন।—এঁয়া, রত্না, তুই এমন সময়ে!

রত্নার মনে পড়িল, এমনি প্রভাতে এক দিন সে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল,—মাকে প্রণাম করা অবধি হয় নাই! এমনি ছিল সে দিন মানুষ হইবার তাড়া!

পিতাকে প্রণাম করিয়া রত্না মৃদু স্বরে কহিল,—মাসিমার বড় ছেলে,—যিনি হাকিম। বলিয়া সে মাতৃ-সন্ধানে চলিয়া গেল।

রমেশ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অমিয়র অভ্যর্থনার মহা কলরব বাধাইলেন।

—এসো, এসো বাবা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! এ আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি আসবে আমার বাড়ী! এ কি কম কথা!

তা সত্য ভালো আছে? কলেজ এখন বন্ধ! তোমার কি এখন?

একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন! অমিয় বুঝিল উল্লাসে, বিস্ময়ে রমেশের সমস্ত কথা। রমেশের মনের দ্বারে ভীড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে।

অমিয় উত্তর দিল,—বাবার অসুখ। তাই আমায় একে নিয়ে আসতে হোল।

—এঁ্যা, সত্যর অসুখ? কি হয়েছে তার! রত্না তো আমায় কিছু লেখেনি চিঠিতে! আমি জানিও না! নিশ্চয় তাহলে দেখতে বেতুম।

অমিয় উত্তর দিল,—আমিও জানতুম না! মার চিঠি পেয়ে ছুটি নিয়ে এলুম।

অমিয়কে লইয়া রমেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। শুধাইলেন —কি অসুখ?

"—ব্লাড্‌প্রেসার! হঠাৎ বড় বেড়ে গেছলো—আমরা ভয় পেয়েছিলুম। এখন অবশ্য ভালো আছেন। তবে ডাক্তাররা বলেন, পরিশ্রম আর চলবে না; প্র্যাকটিস্ ছাড়তে হবে। অন্ততঃ কিছু কালের জন্ত অবসর নিতে হবে। আমাদের ইচ্ছে, প্র্যাকটিস আর না করেন।

অমিয়কে বসাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রমেশ কহিলেন—তাই তো! ভারী ভাবনার বিষয়! মুস্কিল হলো বলো! হাঁা, তোমাকে চা দিতে বলি বাবা। ওরে রত্না, তোর অমিয়-দার চা নিয়ে আয়। হাঁা বাবা অমিয়, অনিল ভালো আছে? ভারী সুন্দর ছেলে! কি মিষ্টি ব্যবহার! কি অমায়িক! সে ভালো আছে?

সংক্ষেপে অমিয় কহিল—আছে। বলিয়া কহিল,—বাবাকে ডাক্তার চেঞ্জে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

—চেঞ্জে! তা কোথায় যাওয়া হবে? তাই বুঝি রত্নাকে নিয়ে এলে! ওর কলেজ খোলা না থাকলে ওকেও আমি পাঠাতুম সত্যর সঙ্গে। সে মেয়ের মত রত্নাকে ভালোবাসে।

অমিয় উত্তর দিল,—হাঁা, বাবা উইলে রত্নাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। ওর বিয়ের জন্ত! বাবা! শ্রীবৃন্দাবন যাচ্ছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রমেশ কহিলেন,—দশ হা-জা-র টাকা! হাঁা! সত্য বৃন্দাবনে যাবে! কি বলছো বাবা?

অমিয় হাসিল, কহিল,—প্র্যাকটিস্ যখন ছাড়তে হলো, বাবার ইচ্ছা সেইখানেই থাকেন। বলেন, আমার মাতামহ-মাতামহী শেষ জীবন তাঁদের ওই বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছেই কাটিয়েছিলেন! আমারো নাড়ীর টান বৃন্দাবনের দিকে!

—তা বটে! তা বটে! আর ওখানকার জল-হাওয়াও ভালো। রক্তের টান নিশ্চয়। চাটুষ্যে জেঠিমা পাকা বোষ্টম্ ছিলেন যে!

জলখাবার লইয়া মণি ঘরে প্রবেশ করিল।

রমেশ কহিলেন,—তুমি! রত্না?

—দিদি আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

—সে কি, তাকে ডেকে দাও।

অমিয় ব্যস্ত হইল। কহিল,—থাক্! সে কথাবার্ত্তা কইছে। বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া মণির নিকট হইতে চায়ের কাপ ও জলখাবারের রেকাবীটা টানিয়া লইল। যেন এইগুলার জন্তই সে অপেক্ষা করিতেছিল! এবং খানিকটা খাবার গলাধঃকরণ করিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল,—দেখুন রমেশ বাবু, আমার মনে হয়, রত্নাকে আর পড়াশোনা করাবার প্রয়োজন নেই।

রমেশ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

অমিয় বলিল,—বাবার সঙ্গে মা-ও যাচ্ছেন। অবশ্য আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের পর তাঁরা যাবেন। তার আগেই আমি ফিরছি চাকরীতে। হাঁা, কি বলছিলুম, আমার কথা হচ্ছে,—সব কাজের উদ্দেশ্য থাকে। আমি বলি, রত্না তো যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে, এবার মেয়েরা যা চায়—আপনি তাই করুন, ওর বিয়ে দিন। ওর মত মেয়ের সুপাত্রের অভাব হবে না।

রমেশ যেন ধাঁধার মধ্যে পড়িলেন! কহিলেন,—তুমি খুব ভালো কথাই বলেছো। কিন্তু—

অমিয়র খাওয়া শেষ হইয়াছিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—তাছাড়া আপনাদেরও বয়স হোল, আর কোন সন্তান নেই! বারো মাস ও'কে ছেড়ে থাকা কি উচিত?

স্খলিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—তা বটে! তুমি উঠছো অমিয় এর মধ্যে!

—আজ্ঞে, আমাকে এখনি ফিরতে হবে।

—রত্নাকে ডাকি। আঃ! তার হলো কি? আসে না কেন?

রমেশ কন্তাকে ডাকিতে অন্দর-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হরিশের কনিষ্ঠ পুত্র টুকু আসিয়া অমিয়র হাতে এক টুকরা কাগজ দিল।

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল,—কি?

দিদি দিলে।

বাক্যব্যয় না করিয়া অমিয় চিরকুটটি পকেটে পূরিল।

রমেশ বকাবকি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন, —কি বোকা মেয়ে, এমন সময় গেছে খুড়োর বাড়ী; হরিশ আপিস চলে যাবে, তাই দেখা করতে। কেন, সন্ধ্যেবেলা গেলে হতো না?

অমিয় হাসিল। কহিল,—দেখা তো হয়েছে। তার সঙ্গে তো একসঙ্গেই এলুম।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

অমিয় পকেট হইতে রত্নার চিরকুটখানা বাহির করিল।

সম্ভাষণ-হীন কয়েকটি ছত্র—

—"ভুলে যাওয়া যায় না। শিলালিপির মত যা বুকে কোদা হয়ে আছে, তা ভুলবো কি করে? না, ভুলতে আমি পারবো না। সে চেষ্টাও করবো না। মেশোমশায়ের কথার অর্থ এখন বুঝেছি।

কাগজখানা পকেটে পূরিয়া একটা নিশ্বাস মোচনে মুখ তুলিতেই অমিয় দেখিল, একটা ঝোপের আড়ালে বেড়ার পাশে মুখ বাড়াইয়া রত্না তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমিয়কে দেখিয়া রত্না হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মাথা নাড়িয়া অমিয় নীরব সম্ভাষণ জানাইল।

হরিশের বাড়ী ফেলিয়া গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

৪৮

অমিয় ক'মাস কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

জননীর আহ্বান আসিল, অনিলের বিবাহ। তুমি এসো।

গোস্বামী সাহেবের নিকট হইতে সাড়া আসিল না।

অমিয় বিবাহের যৌতুক পাঠাইল। মাকে লিখিল,—বড্ড কাজ। ছুটি পাওয়া অসম্ভব। তাহাকে যেন ক্ষমা করা হয়।

ভ্রাতার বিবাহে অমিয় উপস্থিত হইল না। সোদরকে লিখিল,—দুঃখ করো না অনিল, আমি আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

•

অমিয়র নূতন বই "বন-বিহগী" রূপালী পর্দ্দায় উঠিয়াছে।

ফিল্ম-ডিরেক্টর বন্ধু লিখিয়াছে,—ভায়া হে, হাকিমী করে যে খ্যাতি তুমি পাওনি, বায়োস্কোপে বই দিয়ে তার অনেক বেশী পেয়েছ। হাউস-ফুল! মানুষের মুখে মুখে তোমার নাম ঘুরছে। এক বার নিজে এসে দেখে যাও তোমার "বন-বিহগী"কে। হ্যাঁ, বহুমুখী প্রতিভা বটে!

কিন্তু সকল কর্ম্মের শেষে বিশ্রামের জন্য রাত্রে যখন উপাধানে অমিয় মাথা রাখে, তখন কত দিন বন-বিহগীর স্মৃতি তাহার আঁখি-পল্লবকে সিক্ত করে। বুক-জোড়া হাহাকার ওঠে,—রত্না! রত্না!

পিতা পত্র লিখিয়াছেন,—অমিয়, জীবনে এক নূতন আস্বাদ পাচ্ছি, বড় মধুর! নিবিড় আনন্দময়! বৃন্দাবনের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক। পারো তো ছুটিতে এসো।

অমিয় বোঝে তাহার অন্তরের কথা, অন্তর্যামীর মত পিতা যেন জ্ঞান-চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন! তাহার ওষ্ঠাধরে বেদনার হাসি ফোটে।

পিতাকে অমিয় লিখিল,—অনেক কাজ। ছুটি মিলিবে না। অবসর পাইলে নিশ্চয় যাইব।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া অমিয় মুখ তুলিয়া চাহিল,—খোলা বাতায়ন-পথে আসন্ন সন্ধ্যার অস্তমান রাঙা রবির পানে। চাহিতেই অমিয়র মনে জাগিয়া উঠিল,—পল্লীগৃহে তুলসী-বেদীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া রত্না হয়তো দেবতাকে প্রণাম করিতেছে!

অমিয় ভাবিতে চেষ্টা করিল, দেবতার কাছে সে কি প্রার্থনা করিতেছে? হৃদয়ের শান্তি? অমিয়কে ভুলিবার কামনা? না, জন্মান্তরে অমিয়কে পাইবার বাসনায় দেবতাকে মিনতি জানাইতেছে?

কেন এমন হয়? যাহার সহিত মিলন হইবার নয়, অবাধ্য হৃদয় সেই দুষ্প্রাপ্যকে কেন কামনা করিয়া বসে? সে কেন হইয়া ওঠে অভীপ্সিত? ইহার কি উত্তর আছে?

হৃদয়-জোড়া নিশ্বাস উত্থিত হইল। অমিয় জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় রহিল। রত্না! রত্নাকেই চাই! সে-ই অমিয়র একমাত্র অভীপ্সিতা! একটা জন্মের ব্যবধান বৈ তো নয়!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

শেষ

ভারতবর্ষ

নীরব নিশীথে অসহায় তব রুদ্ধ বেদনা হৃদয়ে স্মরি
ভারতবর্ষ হে মহা জননি, আজিকে তাদের প্রণাম করি—
কোথায় তোমার শত সন্তান জলদ-মন্দ্র যাদের তূর্য্য
টুটিয়া জাতির তন্দ্রার মোহ উদয়-শিখরে দেখাল সূর্য্য!

মৃত্যু-আহত তিমির রাত্রে নব-জীবনের প্রদীপ জ্বেলে
ঘূর্ণায়মান কালের চাকায় দু'হাতে যাহারা দিয়েছে ঠেলে!
লক্ষ্য যাদের বাসনার শেষ, মুক্ত যাদের জ্ঞানের শিখা,
চক্ষে জাগিছে বীর্য্য-বহ্নি, কপালে শোভিছে রুদ্র টীকা—
অমর হয়েছে চির-বিস্মৃতি যাদের কীর্ত্তি অঙ্কে ধরি,
তোমায় স্মরিয়া হে মহা জননি, আজিকে তাদের প্রণাম করি!

স্বাধীন রক্তে হলদি-ঘাটার প্রতি পঞ্জর লোহিত করি
লক্ষ বীরের জীবন-কোরক মরণোৎসব সাজিতে ভরি
জাতির অস্তাচলের সূর্য্যে প্রতাপ দিয়েছে নবীন অর্ঘ্য—
ছেলের বাসনা বক্ষে ধরিয়া হেথায় মা তুমি মাটীর স্বর্গ!
ভবিষ্যতের স্বপ্নের মোহে মৌন-গুহার আঁধারে বসি
লেখনী ফেলিয়া কিশোর হস্তে যে নিয়েছে তুলি শাণিত অসি,
সঞ্জীবনীর অমোঘ মন্ত্রে চেতনা-বহ্নি জ্বালায়ে ধরি
মারাঠার বুকে শিবাজী গিয়াছে মৃত্যুজয়ীর সৌধ গড়ি।
যাদের কীর্ত্তি সহস্রদল ঝলসে কিরণে লাক্ষা রাগে—
হাসি পায় মা গো, তাহাদের জাতি পথে পথে আজ ভিক্ষা মাগে।

যুগান্তরের সমাধি ভাঙ্গিয়া দীপঙ্করের [illegible]
মানবাত্মার ব্যর্থতা নয় দিকে দিকে তার পেয়েছে দিশা,
রামকৃষ্ণের দৃষ্টি-প্রদীপ নব তাপসের বজ্রবাণী—
সারা বিশ্বের জয়ের তিলক তোমার ললাটে দিয়েছে টানি।
ছন্দে গাঁথিয়া জীবন-মন্ত্র প্রাচ্যের নব উদিত রবি
হতাশার বুকে এঁকেছে, জননি তোমার বিশ্ব-বিজয়ী ছবি।
বুদ্ধের মত সন্তান যার, শঙ্কর যার এসেছে ক্রোড়ে
শত পাবকের জন্মদাত্রী এত অসহায় কেমন করে?

মহার্ণবের ঊর্ম্মি-আঘাতে এসেছিল যারা হেথায় ফিরে—
পূর্ণ করিতে যশের মাল্য, দুলিতে তোমার কণ্ঠ ঘিরে,
কালের কঠিন করের পরশে একে একে তারা গিয়াছে ঝরি
অপরিচয়ের রিক্ততা নয়, মানব-জন্ম অমর করি।
দেহের ধ্বংসে পরিহাস করি সাধনা তাদের রয়েছে জাগি
অত্যাচারের মৌন গুহায় তৃতীয় চোখের বহ্নি লাগি।
গ্লানির ভস্ম উড়ে যাবে জানি অতীত কীর্ত্তি মুক্ত করি
সে মহা দিনের আশা-পথ চেয়ে আজিকে তাঁদের হৃদয়ে স্মরি।

শ্রীঅমর [illegible]

বিড়াল-শিশু

(গল্প)

খেয়ালী দামোদরের পারাপারের একটা ঘাট। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ধান-চালের বেশ বড়-রকমের বাজার। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক পারাপার করিতেছে, শ্রেণীবদ্ধ গরুর গাড়ীতে ধান বোঝাই হইয়া ও-পার হইতে এ-পারের আড়তে আসিতেছে। শীর্ণ স্রোতোধারার দুইটি রেখা সুদূর বিস্তীর্ণ বালুরাশির বুক চিরিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটির মাঝখানে গভীরতা কিছু বেশী। সেখানে এখনো নৌকার প্রয়োজন হইতেছে। অন্যত্র হাঁটিয়া পার হওয়া চলে।

ও-পারের বনরেখার মাথায় সোণার কুচি ঢালিয়া সূর্য্য ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিতেছে। হু-হু করিয়া জোরে বাতাস বহিতেছে এবং তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বালুকণাগুলি গায়ে আসিয়া বিঁধিতেছে। শুষ্ক বালির উপর পা ছড়াইয়া আধ-শোয়া অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া নিবারণ কি যেন ভাবিতেছিল। তাহারই খানিক দূরে কতকগুলা গরুর গাড়ী তাহাদের মাল নামাইয়া দিয়া এটা-সেটা সওদা কিনিয়া ও-পারের গ্রামের দিকে ফিরিতেছে। নিবারণ শূন্যদৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছে।

পিছন হইতে কে এক জন বলিল,—কি রে ভাই, তুই দিব্যি আরামে বালির ওপর পড়ে পড়ে কি ভাবছিস্ বল দিকিন্? একটুখানি নেশা করাতে পারিস্?

মুখ ফিরাইয়া কণ্ঠে অনেকখানি বিরক্তি ঢালিয়া নিবারণ বলিল,—কি চাই, নেশা? মানে, পচুই? না, তাড়ি?

মনাই হাসিমুখে বলিল,—না রে ভাই, না, পচুই নয়, তাড়িও নয়। একটা বিড়ি দিতে পারিস্ যদি তো তাই দে।

নিবারণ তাহাকে একটা বিড়ি দিয়া বলিল,—দেশলাই চাইলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো কিন্তু! এত বড় বাজার ঘুরে কোথাও একটা দেশলাই পাবার জো নেই।

মনাই হাসিয়া বলিল,—আমার কাছে চক্‌মকি আছে রে, ভাবনা নেই।

মনাই চক্‌মকি ঠুকিয়া বিড়ি ধরাইল। এবং জোরে একটা টান্ দিয়া বলিল,—ধান আজ কতো ক'রে গেল দেখ্‌লি! ষোল টাকা! শুনেছিস্ কখনো? এক-এক বেটা এক গাড়ী ক'রে ধান বিক্রী করে' লাল হ'য়ে বাড়ী ফিরলো।

নিবারণ বলিল,—তাতে আমার কি! তুই তো তবু বাবুদের দোকানে দু'বেলা খেতে পাচ্ছিস্, আমার যে তাও বন্ধ হলো। আজ সারাদিন ঘুরে মোটে আট আনা রোজগার করেচি। একবেলা খেতেই তো ফাবার!

—যা বলেচিস্!

—বসে' বসে' তাই ভাব্‌চি, কি করা যায়! না-খেয়ে মরার চেয়ে চুরি করা ভালো। তাই করবো কি না ভাবচি।

—মন্দ কি! অবিশ্যি, যদি না পড়ো ধরা!

—পড়ি, সে-ও ভালো। তবু পেটের ভাবনা তো ঘুচে যায়। আধ সের চাল নইলে যার একবেলা পেট ভরে না, তার এ-বাজারে চলে কোত্থেকে বল্ দিকিন্? তেরো গণ্ডা পয়সা ফেল্‌লে তবে এক সের চাল!

—তাইতো হয়েচে রে ভাই। শুনচি, কোল্‌কেতায় এত্তো ভিকিরি জড়ো হয়েচে যে, রোজ অমন দু'-তিনশো মরচে।

নিবারণ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বলিল,—আরে, সেখানকার বড় বড় কথা ছেড়ে দে না। আমাদের এখানেই ভিকিরির আমদানী কি রকম বেড়েচে, দেখছিস্‌নে। দুঃখের কথা বলবো কি, আমি নিজে খেতে পাইনে, আমার ঘাড়ের ওপর ভর করলো কি না কোথাকার একটা হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। ক'দিন হলো, সে রোজ এসে আমার কাছে ধর্ণা দেবে। এমন ঝঞ্ঝাটেও মানুষে পড়ে।

সমস্ত আকাশ হইতে একটা যেন পাতলা ধূমের যবনিকা বালুকাময় নদীগর্ভে নামিয়া আসিতে লাগিল। দূরের গাছপালা অদৃশ্য হইতে লাগিল। দু'জনে বালুকাশয্যা ছাড়িয়া বাঁধের দিকে উঠিতে লাগিল।

দূরের একটা আবছায়া মূর্ত্তির পানে আঙুল দেখাইয়া নিবারণ বলিল,—ঐ দেখচিস্, ছোঁড়াটা এসে দাঁড়িয়েচে। সমস্ত দিন দেখা পাওয়া যাবে না, মনে হয়, ঘাড় থেকে নাম্‌লো বুঝি। কিন্তু ঠিক সময়ে—

মনাই বলিল,—তা, পুণ্যি হবে রে ভাই, পুণ্যি হবে, তবু এক জনকে এক মুঠো ভাত দিতে পারলে। ইস্, কি চেহারা। কাদের ছেলে রে? এলো কোত্থেকে?

নিবারণ বলিল,—কি করে' জান্‌বো বল্? বলে, মা মরে' গেছে। বাপ ছেড়ে পালিয়েচে! বোধ হয় নিজের পেটের জ্বালায়। আমার অপরাধের মধ্যে এক দিন দেখে ভারী মায়া হয়েছিল, নিজে ডেকে একটা আধ-আনি দিয়েছিলুম। ব্যস্, আর যায় কোথা। ক্যাংলা আর এ শাগের খেতটুকু ছাড়তে চাইছে না।

ছেলেটার কাছে আসিয়া নিবারণ বলিল,—কি বাবা চোদ্দপুরুষ, এসে হাজির হয়েচ? আজ আমারই যে এক মুঠো জোটবার রাস্তা দেখচিনে!

মনাই নিজের মনিব-বাড়ীতে চলিয়া গেল। নিবারণ ছেলেটাকে বলিল,—আচ্ছা, রোজ তুই আমার কাছেই আসিস্ কেন বলতো? কোন্ দিন রাগের মাথায় হয়তো তোর হাড়গুলো আমার হাতে গুঁড়ো হয়ে যাবে হতভাগা!

ছেলেটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—সারাদিন কিছু খেতে পাইনি বাবা।

মুখ ভেঙ্‌চাইয়া নিবারণ বলিল,—তবে আর কি! গা জল করে দিলে। তোর মা গেল মরে', বাপও না খেতে দিতে পেরে কোথায় সরে' পড়্‌লো, আর আমি শালাই কি চোরের দায়ে ধরা পড়ে' গেলুম! কাল তো তোকে বলে' দিলুম, আর আসিস্‌নে কোনো দিন।

হাস্ত-মুখের এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিয়া ছেলেটা বলিল,—এক মুঠো মুড়ি দাও বাবা, আর কিছু না।

—ওরে আমার নবাব-পুত্তুর, মুড়ি খাবে? তোমার ঐ হাড়-জিরজিরে পেটের মধ্যে এক টাকার মুড়ি এখ্‌খুনি কোথায় তলিয়ে

খাবে যে বাপধন। মুড়ি খাবে? হা হা হা, বলে কি ছোঁড়া! বেরো—বেরো!

কিন্তু নিবারণের চলার পিছনে-পিছনে ছেলেটারও পা চলিতে লাগিল।

ক'দিন হইতে শরতের আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে কালো হইয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি নামিতেছে। লোক-চলাচল, মাল-আমদানী ওঠা-নামা সবই এক রকম বন্ধ। খেয়া-নৌকা এ-পার ও-পার করিতেছে। কিন্তু লোকজন নিতান্ত কম, নেহাৎ দায়ে না পড়িলে এ দুর্য্যোগে কেহ ঘরের বাহির হইয়া নদীর এই বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে না।

নিবারণ দিন-মজুরি করিয়া খায়। বাজারের এখানে সেখানে যেমন তেমন কাজ তার জুটিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু মজুরি যাহা মিলিতেছে, তাহাতে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া দুষ্কর। তার উপর, সেই অযাচিত অতিথিটি তাহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিতেছে না!

মাকড়দের গুদামঘরের বাহিরের দাওয়ায় সে রোজ রাত কাটায় এবং তাহারই এক কোণে খানিকটা ছেঁড়া চট্ টাঙ্গাইয়া আড়াল করিয়া তাহার মধ্যে রান্না করে।

সে দিন সন্ধ্যার পর এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি বেশ জোরে নামিয়াছিল। দাওয়ার উপর অনেকক্ষণ গুটিসুটি মারিয়া পড়িয়া পড়িয়া নিবারণ কালো আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সেখানে সবটাই অন্ধকার। বুকচাপা অন্ধকারে প্রকৃতি যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নিবারণ এক সময় উঠিয়া তাহার রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। ভুষা-পড়া হাঁড়ির মধ্যে ও-বেলার ভাত আর গোটাকতক কচুসিদ্ধ কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা পেঁয়াজ। মাটীর সান্‌কিতে ভাতগুলো ঢালা শেষ হইয়াছে, এমন সময় চটের পাশে উসৃখুস্ শব্দ হইল। সেই সাদা বিড়ালটা বুঝি এতক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, এখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, বিড়াল নয়, মানুষ। সেই হাড়-জিরজিরে ছোঁড়াটা আবার আজ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই দুর্য্যোগের মধ্যে কোথায় সে ছিল এতক্ষণ? কেমন করিয়াই বা আসিল? ইতিপূর্ব্বে ক'বার তার কথা নিবারণের মনে হইয়াছে, এবং এই ঝড়বৃষ্টিতে আজ আর সে এ-মুখো হইতে পারিবে না, এই চিন্তায় বেশ যেন একটু আরামও অনুভব করিয়াছিল। এখন হঠাৎ তাহাকে চোখের সামনে দেখিয়া সে নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। মূর্ত্তিমান্ দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি! সব ছাপাইয়া তার ঐ শ্যেন-চক্ষু দু'টি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতই জ্বলিতেছে!

নিবারণ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে, ভাত খাবি?

উত্তর হইল—হ্যাঁ।

ঐ একটি অক্ষরের ভিতর দিয়া সে যেন তার সমস্ত জীবনী-শক্তিটুকু ঢালিয়া দিল। এমন করিয়া 'হ্যাঁ' বলা নিবারণ জীবনে আর কাহারো কাছে কখনো শোনে নাই। সে বলিল,—আচ্ছা আয়, বোস্।

বলিয়া সে কাছের একখানা শালপাতা টানিয়া লইয়া তাহাতে কতকগুলো ভাত বাড়িয়া দিল। মনে মনে বলিল, ভাতে ঠিক দু'জনের পেট না ভরিলেও মোটের উপর দু'জনেরই খাওয়া চলিবে! উপবাসের চেয়ে ঢের ভালো বৈ কি! তাছাড়া এই সজীব দুর্ভিক্ষকে চোখের সামনে রাখিয়া সে খাইবেই বা কেমন করিয়া?

কাঁচা পেঁয়াজ ও কচুসিদ্ধ একপাশে পড়িয়া রহিল, কাঁচা লঙ্কা টিপিয়া ও একটুখানি নুণ মাখাইয়া ছেলেটা ঠাণ্ডা ভাতগুলো গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। নিবারণের চোখের পলক বুঝি পড়িল না, সে হাঁ করিয়া ছেলেটার খাওয়া দেখিতে লাগিল। ছেলেমেয়ে-স্ত্রী লইয়া সংসার জমাইবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তার কোন দিন হয় নাই, কিন্তু এই বুভুক্ষু ছেলেটার সামনে ভাত বাড়িয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া এক অপূর্ব্ব মমতায় তার বুকখানা ভরিয়া উঠিতেছিল। সত্যই হয়তো ছেলেটা সারাদিন ধরিয়া দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়াও কোথাও একটি তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নহিলে মানুষে এমন করিয়া খাইতে পারে?

হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ছেলেটার পাতা খালি হইয়া গেছে এবং সে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিতেছে। সে তাড়াতাড়ি যেন খানিকটা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল,—আর নিবি? এই নে!

বলিতে বলিতে সে তাহার নিজের সান্‌কির সব ভাতগুলোই তাহার পাতে ঢালিয়া দিল। ছেলেটা একবার নড়িয়া-চড়িয়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিল এবং পেঁয়াজ-কুচিগুলি কচুসিদ্ধর সঙ্গে মাখিয়া পরম আরামে তাহার আহারের দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু করিয়া দিল।

তাহার খাওয়া শেষ হইতে সামান্য একটুখানি বাকী আছে, এমন সময় নিবারণের যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। তাই ত! সে এখন নিজে খাইবে কি? ক্ষুধার জ্বালা যেন সহসা তাহার দেহের সর্ব্বত্র একটা সুতীক্ষ্ণ বেদনার সঞ্চার করিয়া গেল। চোখের সামনে তাহার সঞ্চিত আহার্য্যের শেষ কণিকাটুকু এমনি করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতে দেখায় মর্ম্মান্তিক ব্যথা যেন এতক্ষণে তাহার বুকের কিনারায় আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে মমতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন কেমন করিয়া উবিয়া গেল! একটা কুৎসিত সরীসৃপ যেমন পর্য্যাপ্ত আহারের পরেও লকলকে জিহ্বা বাহির করিয়া আরও আহার্য্যের জন্য এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে, ঐ ছেলেটার পানে চাহিয়া তুলনায় সেই ছবিটাই এখন নিবারণের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল।

বাহিরে দুর্য্যোগ তখনো পূরামাত্রায় চলিয়াছে। বৃষ্টির একটু উপশম হইলেও বাতাস যেন আরও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিবারণ পর্দ্দা সরাইয়া দাওয়ার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় দামোদরের বিশাল বক্ষ অতি ভয়াবহ দেখাইতেছে। সেইখানে সেই ঝড়ো বাতাসের মাঝখানে বসিয়া নিবারণ শূন্যদৃষ্টিতে সেই অন্ধকার নদীগর্ভের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সে যখন পর্দ্দার ভিতরে আসিল, ছেলেটা তখন এক পাশে পড়িয়া গভীর ভাবে ঘুমাইতেছে। হঠাৎ মনাইয়ের কথা মনে পড়িল,—পুণ্যি হবে রে ভাই, পুণ্যি হবে! এই যে নিজে না খাইয়া সে ঐ অপরিচিত ছেলেটাকে খাইতে দিল, ইহাতে তাহার সত্যই পুণ্য হইল না কি? কে জানে?

আপনার মনেই একটুখানি হাসিয়া এক পাশে ক'খানি ইটের উপর পাতা চটের থলিয়ার উপর শুইয়া সে চোখ বুজিল।

সকালে ঘুম ভাঙিলে দেখিল, ছেলেটা তার পূর্ব্বেই কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। নিজের তার শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা হইতেছিল না। মনে মনে বলিল,—নিজে উপবাসী থাকিয়া এত-বড় নেমক্‌হারামকে খাইতে দেওয়ায় পুণ্য তো নাই-ই, বরং পাপ আছে যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোন দিন ঐ হতভাগাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা যে তার পক্ষে নূতন নয়, এটুকুও তার অজানা ছিল না।

আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। আড়তগুলিতে আবার কাজের ভিড় জমিতেছে। দু'-চারখানা গাড়ীও ও-পার হইতে এ-পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু গরু ও গাড়ী লইয়া সকলেই যেন বেশ সন্ত্রস্ত। সকলের মুখেই এক কথা, নদীতে হড়্‌কা নামিবে। রায়েদের বড়বাবু বলিতেছেন, ক' দিন ধরিয়া রামগড়ে আর ধানবাদে প্রচুর বৃষ্টির ফলে আজ দুপুর নাগাদ এখানে ১৬ ফুট জল আসিয়া পৌঁছিবে। সুতরাং সকলে সাবধান!

বেলা আন্দাজ দু'টোর পর সত্যই বন্যা আসিয়া পৌঁছিল। ক্রুদ্ধ ফেনায়িত জলরাশির বিপুল উচ্ছ্বাস হঠাৎ দামোদরের বিশাল বালুকা-গর্ভের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভাসাইয়া ছাপাইয়া একাকার করিয়া দিল। গৈরিক জলরাশি স্থানে স্থানে বিপুল আবর্ত্ত রচনা করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহে ছুটিতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত যাইতে আর বড় বেশী দেরী নাই। ও-পার হইতে খেয়া-নৌকা এখনো এ-পারে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তাহারই প্রতীক্ষায় বাঁধের উপর অনেকগুলি যাত্রী বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে এক এক জন জোরে ডাক-হাঁক করিয়া ও-পারের মাঝিদের শীঘ্র শীঘ্র আসিবার জন্য তাগাদা দিতেছে।

নিবারণও যাত্রীদের কাছে আসিয়া বসিয়া আছে। ক'জন বাবু নৌকায় ও-পারে যাইবেন. তাঁহাদের সঙ্গে মালপত্রও কিছু বেশী পরিমাণে আছে। নৌকায় মালপত্রগুলা গুছাইয়া তুলিয়া দিলে কিছু মোটা বথসিস্‌ মিলিবে।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া পৌঁছিল। নিবারণ মালপত্র লইয়া নৌকায় তুলিয়া দিল এবং বাবুদের হাত ধরিয়া একে একে উঠাইয়া দিল। এক জন বাবু নিবারণের হাতে একখানি এক টাকার নোট দিলেন।

নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিবারণ আড়তের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ নজরে পড়িল, ঠিক তার সাম্‌নের আঁকড় গাছটার তলায় সেই ছোঁড়াটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিবারণ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—কি বাবা, আবার এসেচ যে। হুঁ হুঁ, আজ আর কিছু হচ্চে না। বেশী চালাকি করবে তো—

ছেলেটা বলিল,—সকাল থেকে কিছু খাইনি বাবা।

নিবারণ বলিল,—তাতে আমার কি রে হতভাগা?

পিছনে মনাইয়ের গলা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধের উপর এক-খানা হাত পড়িল।

—ওরে, দেখ্‌ দেখ্‌, ভারী মজার ব্যাপার তো। বলিয়া মনাই নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

নিবারণ দেখিল, সত্যই একটা মজার ব্যাপার। খেয়া নৌকাখানার খানিক দূরে নদীর স্রোতের উপর একটা কলার ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং ভেলার উপরে একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। বিড়ালটার গলায় বগলসের মত দড়ি বাঁধা, এবং যত দূর মনে হইতেছে, সেই দড়ির একপ্রান্ত ভেলার সহিত বাঁধা হইয়াছে। অসহায় বিড়ালটা ভয়ে যেন অসাড় হইয়া ভেলার উপরে বসিয়া সেই খরস্রোতে অনির্দ্দেশ পথে ভাসিয়া চলিয়াছে।

নিবারণ নির্ব্বাক্‌ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মনাই হাসিয়া বলিল,—লোকটার কিন্তু বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

নিবারণ বলিল,—কার?

—যে এই ব্যবস্থাটা করেচে। ওরে ভাই, আমি নিজেও যে একবার একটা বেড়াল পুষেছিলুম। উঃ সে কি নাকাল, তোকে কি বলবো! তাড়িয়ে দিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে' দাও, দশ মিনিট পরে দেখবে পাঁচিল টপ্‌কে আবার এসে সে তোমার পায়ের কাছে মিউ-মিউ করচে। এ-পাড়া থেকে নিয়ে গিয়ে ঐ একেবারে গাঁয়ের শেষে ছেড়ে দিয়েও দেখেছি, সে ঠিক আবার এসে হাজির হয়েচে।

নিবারণ হঠাৎ এক-মুখ হাসিয়া বলিল,—ঠিক এই আমার বাপ-ধনের মতো!

মনাই বলিল,—আমার কিন্তু এ-বুদ্ধি হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ। নিশ্চয় সে বেচারা ঐ বেড়ালটাকে কিছুতেই আঁটতে না পেরে শেষে এই মতলব করেচে। ও-শালার জাত একবার তোমার পিছু নিলে কিছুতেই আর তোমার সঙ্গ ছাড়বে না।

নিবারণ যেন সমস্ত ব্যাপারটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিল। সে হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বাঃ! বেড়ে করেচে, খাসা করেচে তো! ঠিক হয়েচে। বেটার যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। নাও, এখন যাও কোথায় যাবে জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে। বাঁচতে হয় বাঁচো, মরতে হয় মরো,—হাঃ হাঃ হাঃ! বেড়ে মজা করেচে কিন্তু।

বলিতে বলিতে মনাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—বুঝ্‌লি রে, তাইতো বলছিলুম, আমারও ঐ বেড়াল পোষার দুর্ভোগ হয়েচে।

মনাই বলিল,—তাইতো দেখচি। ঠিক সময়টিতে এসে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ করচে।

নিবারণ বলিল,—দুঃখের কথা বলিস্‌ কেন? কাল সারা-রাত আমার উপোস গেছে। সব ভাতগুলো ও-ই গিলেচে। উঃ, সে খাওয়া যদি ওর দেখ্‌তিস্‌! এক-একবার মনে হচ্ছে তাই—

বলিয়া সে একবার ছেলেটার দিকে এবং একবার নদীর দিকে চাহিল। ছেলেটাও ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া একবার নিবারণের দিকে একবার অতল জলস্রোতের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মনাই তাহাদের উভয়ের পানে চাহিয়া একটা উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

নিবারণ বলিল.—সকাল থেকে আর আসিস্‌নি যে রে হতচ্ছাড়া! কোথায় ছিলি?

ছেলেটা কোন জবাব দিল না।

নিবারণ বলিল,—আরে ম'লো যা। কথা বল্‌চিস্‌ না যে? মতলব কি? ভাত খাবি?

তবু কোনো জবাব নাই।

নিবারণ বলিল,—তবে মরগে যা। তুই-ই খেতে পাবিনে

আজ দেখছিস্, অনেক পয়সা আমার হাতে। কি খাবি বল্? বলিয়া সে নিজের ডান হাতে নোট ও কতকগুলো রেজকী মেলিয়া ধরিল।

ছেলেটা কিন্তু যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এক-পা আগাইয়াও আসিল না, একটা জবাবও দিল না।

নিবারণের হঠাৎ মায়া হইল। কাল রাত্রে সেই যে খাইয়াছিল, নিশ্চয় তাহার পর হইতে আর কোথাও আহার জোটে নাই। মুখখানা তাই মড়ার মত শুকাইয়া গিয়াছে।

নিবারণ হাত বাড়াইয়া বলিল,—আয়, খাবি চল্।

ছেলেটা হঠাৎ ক'পা পিছাইয়া গেল। চোখে তার ভয়চকিত দৃষ্টি। নিবারণ বলিল,—আরে মলো, আবার পিছোস্ যে! শোন্ বলছি।

সে তাহাকে ধরিতে গেল। ছেলেটা দৌড়াইতে সুরু করিল। নিবারণও তার পিছু পিছু ছুটিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন হইয়া আসিতেছে। বুনো গাছপালার মাঝখান দিয়া ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নিবারণও ছুটিল, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। অনেকখানি ছুটিবার পর সে আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

সেই সান্ধ্য নদীস্রোতের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, ভেলায় বাঁধা বিড়াল-শিশুটাও আর নজরে পড়িতেছে না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল (বি-এল)।

সহজিয়া সাধন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই সহজতত্ত্ব বা প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব বৈষ্ণবশাস্ত্রে বৃন্দাবনলীলা বা নিত্যলীলা নামেও পরিচিত দৃষ্ট হয়। নিত্য-বৃন্দাবন বা সহস্রার চক্রে শ্রীকৃষ্ণ (পরম শিব) শ্রীরাধার (রাধাশক্তি বা কুণ্ডলিনীর) সহিত রসভোগ করেন। দেহতত্ত্ব সাধনারই অন্য নাম বৃন্দাবনলীলা-তত্ত্ব। বৈষ্ণব-দেহতত্ত্ব-সাধকগণ দেহকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং দেহমধ্যেই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থান নির্দ্দেশ করেন। যথা ;—

"ব্রহ্মাণ্ড আকার হয় মানুষ শরীর।
শরীর ভিতর জান আছয়ে গভীর।

মানবদেহের পদ হইতে পৃথ্বী বা মূলাধার চক্রের নিম্ন পর্য্যন্ত স্থান-মধ্যে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এ সম্বন্ধে আত্মসারস্বত-কারিকায় আছে :—

"সপ্ত পাতাল উর্দ্ধে পৃথিবী বিস্তার।"

নরোত্তম দাসও বলিতেছেন ;—"সপ্ত পাতাল ভেদি উঠিল এক পদ্ম।" এই পৃথিবী চক্রের (মূলাধারের) (১) উপরে সহস্রার পর্য্যন্ত আরও ছয়টি চক্রের অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। উল্লিখিত সপ্ত পাতাল এবং এই সপ্ত চক্র লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রেও আছে ;—

অধোভাগে মহেশানি প্রতিষ্ঠিতি রসাতলং।
এবং ক্রমে মেরুমধ্যে ভুবনানি চতুর্দ্দশ।

আত্মসারস্বতকারিকায় আছে :—

"নিত্যবৃন্দাবন নাম গুপ্তচন্দ্রপুর।
অবিচ্ছিন্ন প্রেমাধার আনন্দের পুর।"

এই বৃন্দাবনলীলা বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিত্যলীলা নামেও কথিত হয়। "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" নামক এক বৈষ্ণবগ্রন্থে এই নিত্যলীলার বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

"সুমেরু শিখর(১) তার মধ্যে বেবহিত।
তাহাতেঞি রাত্রিদিবা হয় নিয়োজিত।
ঐছে কৃষ্ণলীলাগণ ভ্রমে সূর্য্য প্রায়।
এক অণ্ড ছাড়ি লীলা আর অণ্ডে যায়।
তাহাতেঞি প্রকট প্রকট লীলা হয়।
নিত্যলীলা বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

বৈষ্ণবশাস্ত্রের এই পরকীয়া রতিসাধন লতাসাধন, কিশোরীসাধন প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়। রাধাশক্তি বা কুণ্ডলিনীর আকৃতি লতার মত বলিয়া এই সাধনাকে লতাসাধন বলে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং দেবীভাগবতে কুণ্ডলিনীকে লতা বলা হইয়াছে। শ্রীরাধার সহস্র নামের মধ্যে শ্রীরাধার লতা নাম পাওয়া যায়। সাধারণ বৈষ্ণবগণ লতা শব্দের অর্থে স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া এই লতাসাধনের যে বিকৃত ব্যাখ্যা করেন, তাহা শুনিয়া শিক্ষিত সমাজ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক লতাসাধন প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী সাধনারই নামান্তর মাত্র। লতাসাধন সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—

"দেশে দেশে উপাসনা দেশে দেশে গতি।
কেহ অঙ্গে লিপ্ত হয় কেহ হয় মুক্তি।"

*   *   *

"আর কোন ভক্ত যদি লতা বাড়াইল।
রসময় বৃন্দাবনে ব্যাপিত হইল।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ রসিক-শেখর।
সখাসখি দাসদাসী আছে বহুতর।"
"শ্রীরূপ-চরণে লতা ধরে প্রেমফল।"

১। মতান্তরে মণিপুর বা নাভিচক্রকে পৃথ্বী বা পৃথ্বীচক্র বলে। যথা ;—

"নাভিপদ্মনালের মধ্যে ধরণী বিস্তার।
সত্ব রজঃ তমঃ তিন তাহাতে অবতার।"

১। সহস্রার চক্র।

উল্লিখিত পদে 'দেশ' শব্দে দেহমধ্যস্থ চক্রসমূহকে নির্দ্দেশ করিতেছে। দেশে বা প্রতিচক্রে লতার (কুণ্ডলিনীর) গতি হয়। এই লতা বাড়াইয়া বাড়াইয়া অর্থাৎ সাধনা-বলে চক্রসমূহ ভেদ করিয়া রসময় নিত্য-বৃন্দাবনে (সহস্রারে) রাধাকৃষ্ণের (তন্ত্রমতে শিবশক্তির) মিলন সাধক নিজ দেহে অনুভব করেন। চণ্ডীদাসও চক্রসমূহকে 'দেশ' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"ধনের উদ্দিশে যাবে নানা দেশে
সুমেরু-শিখরে পাবে।"

পাতঞ্জল দর্শন-ভাষ্যে ভোজরাজও বলিয়াছেন—দেশে নাভিচক্র-নাসাগ্রাদৌ চিত্তস্য বন্ধো বিষয়ান্তরপরিহারেণ যৎস্থিরীকরণং সা চিত্তস্য ধারণোচ্যতে। এখানেও দেশ শব্দে চক্রসমূহকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বৈষ্ণবপদাবলীতে চক্রসমূহকে 'পাড়া' শব্দেও অভিহিত দেখা যায়। যথা—

"সাধক বাসে ঘর বেঁধেছে দুয়ার রেখাছে নটা।
ঘরের ভিতর ভূতের বাসা গালিম আছে ছটা।
সেই ঘরেতে ফুল বাগিচা পাড়ায় পাড়ায় মেয়া।"

—হরিদাস।

সাধকের দেহ-গৃহে নয়টি দরজা আছে। শাস্ত্রেও আছে—"নবদ্বারে পুরে দেহী।" (শ্বেতাশ্বতর) সেই "ঘরের ভিতর ভূতের বাসা" অর্থাৎ পঞ্চভূত রহিয়াছে; এবং ছয়টি গালিম (১) অর্থাৎ ষড়-রিপু রহিয়াছে। আবার সেই ঘরের ভিতর পাড়ায় পাড়ায় (চক্রে চক্রে) মেয়ে সকল (তন্ত্রমতে হাকিনী লাকিনী প্রভৃতি শক্তিসমূহ এবং বৈষ্ণবমতে মঞ্জরীসমূহ) রহিয়াছে।

এখন কিশোরী-সাধন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। চণ্ডীদাসের পদে আছে—

"চতুর্থ আখর সামান্ত রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ।
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত পার।"

আগমসার গ্রন্থে আছে ;—

"নিত্যস্বরূপ কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
নিত্যানন্দ দেহ তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠময়।
আপনার ইচ্ছায় যখন যে বা করে।
কিশোর বয়সে সদা বিহরে ব্রজপুরে।"

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপাসক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কিশোর বয়সেরই কল্পনা করিয়া থাকেন; কারণ, সেই সময়েই হৃদয়ে প্রেমের বীজ উদ্গত হইয়া থাকে; এ জন্ত বলা হয় ;—

"কিশোর বয়স নিত্য প্রেমের স্বরূপ।"

—আদ্যসারস্বত-কারিকা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণই কিশোর-কিশোরী। দেহমধ্যে নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) শ্রীরাধাকৃষ্ণের (তন্ত্রমতে শিবশক্তির) লীলাসুখ অনুভবই কিশোর-কিশোরী সাধনার উদ্দেশ্য।

এইবার চণ্ডীদাসের রামিণী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সাধারণতঃ লোকের একটা বদ্ধমূল ধারণা এই আছে যে, চণ্ডীদাস রামিণী বা রামী নামক এক রজকিনীর সহিত প্রেমসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই রামী রজকিনীই চণ্ডীদাসের প্রেম-সাধনার পথে আশ্রয়স্বরূপা ছিলেন। কিন্তু মাসিক বসুমতী ১৩৪১, মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "চণ্ডীদাসের রামী কি মানবী" প্রবন্ধে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, চণ্ডীদাসের রামিণী কোন মানবী নহেন; ইনি চণ্ডীদাসের অন্তরতম সাধনার ধন রাগাত্মিকা শক্তি বা কুণ্ডলিনী। রামিণী শব্দের আভিধানিক অর্থ 'রমণ (শৃঙ্গার) উৎসুকা।' তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকেও "শৃঙ্গাররসোল্লাসা' বলা হইয়াছে। নিত্যবৃন্দাবনে (সহস্রারে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত 'রমণ উৎসুকা' বলিয়া এই শক্তিকে তন্ত্রশাস্ত্রে এবং চণ্ডীদাসের পদে রামিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে বলা হইয়াছে ;—

"সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকাস্বরূপ তার প্রাণ।"

'সে দেশের রজকিনী' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সাধনার ধন রজকী কুণ্ডলিনী। এই শক্তিকে রজকী বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি সাধকের জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপ মলরাশি ধৌত করিয়া দিয়া সাধককে মুক্তির পথে লইয়া যান।

চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া প্রচলিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' নামক এক বৈষ্ণবসাধনগ্রন্থে 'রজকিনী' নামে দেহমধ্যস্থ এক নাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :—

"সেই লাড়ি সাতাইশ প্রকার। কোন কোন লাড়ি রাগরতি। আদৌ (১) ভাব লাড়ি, (২) রসমোহন, (৩) চিত্র প্রাকাশ, (৪) রসপ্রকাশ (৫) রসোল্লাস।" ইত্যাদি। "রস বিলাপন জিহ্ তিহ্ রজকিনী লাড়ি।" "জিহ্ রজকিনী তিহ্ রাগময়।"

চণ্ডীদাসের সাধনা অতীন্দ্রিয় দেহতত্ত্ব সাধনা। এ সাধনায় কাম-রতির স্থান ছিল না। চণ্ডীদাস বলিতেছেন :—

"চণ্ডীদাস বলে প্রভু মোর নিবেদন।
স্বপনে কামিনী সনে না হয় গমন।"

সহজ পীরিতি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

"চেষ্টা সুখ মর্ম্ম থাকিতে নয়।
এ তিন ছাড়িলে তবে সে হয়।"

চণ্ডীদাসের সহজ পীরিতি তত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের অতীত তত্ত্ব।

সহজিয়া সাধকদের ন্যায় বাউলদের সহজ সাধনাতেও ষট্‌চক্রের সাধনা আছে। বাউল বলিতেছেন ;—

"কুলকুণ্ডলিনী সর্পের আকার
আছে সেই আসনের পরে।"

—মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' গ্রন্থ।

লালন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের এক জন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহার রচিত একটি গানে আছে ;—

"পর অর্থে পরম ঈশ্বর আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল কারামধ্যানা, শতদল সহস্রদলে অমস্ত করুণা।"

বাউল বলিতেছেন ;—

"মেরুদণ্ডের পূর্ব্বভাগে
ধায় চন্দ্র দ্রুতবেগে।"

চন্দ্র, সূর্য্য হইতেছে ইড়া ও পিঙ্গলা। প্রাচীন সহজিয়াদের

১। গালিম—রিপু ;—মুসলমানী শব্দ।

কখনও এই নাড়ীদ্বয়কে চন্দ্রসূর্য্য, কখনও বা আলিকালী বলিয়াছেন। যথা ;—

"আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।"
—কৃষ্ণাচার্য্যের দোহা, (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-সংগৃহীত)।

প্রাণবায়ু যখন ইড়া পিঙ্গলায় যাওয়া-আসা করে, তখন বহির্জ্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্পূর্ণ যোগ থাকে—দিবা-রাত্রির সময়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, তখন মায়াশক্তির সৃষ্টি চলিতে থাকে। সেই জন্যই ইড়া-পিঙ্গলাকে চন্দ্র-সূর্য্য বলা হইয়াছে। প্রাণ যখন সুষুম্নাগত হয়, তখন বহির্জ্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, সুতরাং দিবারাত্রি এবং সময়ের জ্ঞানও থাকে না। সে অবস্থায় প্রাণবায়ুর চঞ্চলতা নষ্ট হয়, আসা যাওয়া বা অনাগমন বন্ধ হয়। লোচনদাসের একটি পদে এই কথাটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"এ দেশে কপাট দিলে সে দেশে পাই।
বাহিরে আর কাজ নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই।"

সহজ সাধক কবীরের পদে ষট্চক্র সাধনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"উলটত পবন চক্র ষট্ভেদে সুরতি সুন্ন অনুরাগী।
আবৈ ন জাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোঁজ বৈরাগী।"

জৈন সাধক আনন্দঘন এবং চিদানন্দের পদাবলীমধ্যেও সহজ ও ষট্চক্রসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুখমনা সাধকে, অরুণ প্রতিথী প্রেম পগীরী ;
বঙ্কনাল, ষট্চক্র ভেদকে, দশমদ্বার শুভজ্যোতি-জগিরী।"
—চিদানন্দ।

চণ্ডীদাসের ন্যায় আনন্দঘন এবং চিদানন্দও নিজেদের উপাস্য-দেবকে শ্যাম, শ্যামসুন্দর, কনহিয়া প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহাদের পদাবলীতে আত্মাকে সম্বোধন করিয়াও এইরূপ শব্দের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, বাউলদের গানে সহজ ও ষট্চক্র সাধনার যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বাউলের মতে সহজ অর্থাৎ 'মনের মানুষ' 'নির্গুণ' 'অটলের ঘরে' তার অবস্থান। বাউল যেমন তাঁহার পরম তত্ত্বকে 'নিগুণ' ও 'অটল' বলিয়াছেন, চণ্ডীদাসও সেইরূপ তাঁহার সাধনার ধন তত্ত্ববস্তুকে 'নিগুণ ও অটল' বলিয়াছেন। যথা—

"মনের সহিত পীরিতি করিয়া
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।"

"অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস দেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম।"

চণ্ডীদাসের এই পীরিতি অতীন্দ্রিয়। অজ্ঞানী ইহার সন্ধান পাইতে পারে না। ভাগ্যবলে অটলরূপের যিনি দর্শন পান, চণ্ডীদাস তাঁহাকেই রসিক বলিতেছেন।

চণ্ডীদাস আরও বলিয়াছেন—

"সখি কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরি বৈসে মন পরি
জাতির বাহির সে।"

সের এই পীরিতির স্বরূপ নিরাকার ; কোনরূপ পদার্থ বা জাতিতে পর্য্যবসিত নহে। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই চণ্ডীদাসের পীরিতির স্বরূপ একই তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণানন্দ গোস্বামিকৃত 'ষট্চক্র' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলং।"

এই সহস্রদলপদ্মমধ্যস্থ স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ, কেহ কেহ হরিহরপদ, শাক্তেরা দেবীপদ, রসিক ভক্তগণ যুগলানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মিলন এবং মুনিগণ ও অন্যান্য লোকে প্রকৃতি-পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তু সকলেরই এক ও অভিন্ন। শুধু বর্ণনার ভঙ্গী বিভিন্ন মাত্র।

সহজিয়াগণের সাধনার সহিত বৌদ্ধ বজ্রযান বা সহজযানের সাধনার সাদৃশ্য দেখা যায়। সহজিয়াগণ যেরূপ নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনকে সহজাবস্থা বলেন, বৌদ্ধ বজ্রযানীরাও সেইরূপ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর মিলনাবস্থায় 'সহজানন্দ'ও সহজেকস্বভাব জ্ঞানের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাক্ত ও শৈবতন্ত্রের সাধনার সহিত সহজিয়াদের সাধনার যে মিল আছে, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাথপন্থ, কবীর, আউল, বাউল, দরবেশ, সৎনামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যযুগীয় সাধকগণের সাধনার সহিতও সহজিয়াগণের সাধনার মিল দেখা যায়।

উপরোক্ত প্রত্যেক ধর্ম্মমত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—এবং ইহা বেদোপনিষদ্‌সম্মত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের কথা আছে। যথা;—

"মায়া তু প্রকৃতিং বিদ্যাদ্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।"

সাংখ্যমতও এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের প্রতিপাদন করিতেছে। সাংখ্যসাধনেও দেহমধ্যস্থ চক্রসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কপিলগীতা' নামক গ্রন্থে দেহমধ্যস্থ চক্রসমূহের বিস্তৃত বিবরণ ও সাধনার অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কপিলগীতার চক্রসাধনক্রম ও তন্ত্রের চক্রসাধনক্রম মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, উভয় সাধনই এক ও অভিন্ন। বেদান্তসাধনেও প্রাণায়াম প্রসঙ্গে চক্রসমূহ এবং কুণ্ডলিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন, চণ্ডীদাসপ্রমুখ সহজিয়াগণ প্রেম-মার্গে ষট্চক্রসাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগী ও শাক্ত শৈব তান্ত্রিকগণ জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গে ষট্চক্রের সাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্নতা প্রদর্শন অমূলক। কারণ সহজিয়া শাস্ত্রে রস, শৃঙ্গার, লীলা, বিলাস প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া যদি সহজিয়াগণের মার্গকে প্রেমমার্গ বলা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, শাক্ততন্ত্রেও রস শৃঙ্গার প্রভৃতি রসশাস্ত্রোক্ত শব্দের অভাব নাই। তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে 'রসস্বরূপা' এবং 'শৃঙ্গার-রসোল্লাসা' প্রভৃতি বচনে বহু স্থানেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে যেমন আধ্যাত্মিক রাসলীলার উল্লেখ আছে, শাক্ততন্ত্রেও অনুরূপ রাসলীলার বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক সহজিয়া সাধন অতি পবিত্র ; এই সাধনায় মেয়েমানুষের প্রয়োজন হয় না। কুণ্ডলিনী সাধনাই সহজিয়াগণের প্রেম-সাধনা। সহজিয়াগণের একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা রসশাস্ত্রের শব্দ ও সংজ্ঞাসমূহ তাঁহাদের সাধনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যত দূর সম্ভব হেঁয়ালীর ভাষায় সাধনতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

(উপন্যাস)

এগারো

জঙ্গল-পুলিশের আপিসে ঢুকে এক দল নাগা জংলি-দারোগা প্রতাপ সিংকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে, এ সংবাদ দুর্গম পাহাড় অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে বেশী বিলম্ব হলো না। আপিসের হেড-গার্ডের টেলিগ্রাম পেয়ে কাছাড়ের পুলিশ-সাহেব অবিলম্বে উচ্চপদস্থ এক জন কর্ম্মচারীর সঙ্গে এক দল সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজেও তিনি এলেন। ফরেষ্টার প্রতাপের উদ্ধার-সাধন এবং দুর্ব্বৃত্ত নাগাদের সমুচিত শিক্ষা-দান—এই দু'টি ছিল পুলিশ-অভিযানের উদ্দেশ্য। আবার ডেপুটি কমিশনর সাহেবও এ ব্যাপারকে নাগা-বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে লাট সাহেবের কাছে মিলিটারীর সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ব্যাপারটা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো।

সশস্ত্র পুলিশদল যখন পাহাড়ে ঢুকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পাহাড়ীদের উপর গুলী-বর্ষণ সুরু করলো, তখন নাগা-কুকিদের সব সম্প্রদায়ের লোক একেবারে ক্ষেপে উঠলো। তারা ভেবেছিল, সরকার-পক্ষ যুদ্ধের আয়োজন না ক'রে তাদের সঙ্গে একটা রফা করবে। কাজেই রফার পরিবর্ত্তে যখন গুলী-বর্ষণ চললো, তখন নাগা-রাজা এবং তার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সব লোক আক্রোশে ফুঁশে উঠলো। সে আক্রোশের তাপ প্রতাপকে স্পর্শ করলো সকলের আগে। তার সম্বন্ধে রাজার আদেশ হলো, দশ দিন তাকে সম্পূর্ণ অনাহারে রাখা হবে এবং তার পরেও যদি পাপ-আত্মা তার ঘৃণিত দেহ ছেড়ে চলে না যায়, তখন অন্য উপায়ে সে আত্মা ছাড়াবার ব্যবস্থা করা হবে। এই নূতন আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানান্তরিত করা হলো এমন জায়গায়, যার সন্ধান পাওয়া বাইরের লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। এখানেও পাহারার কড়া ব্যবস্থা হলো।

পুলিশের গুলী-বর্ষণে পাহাড়ীদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি; মাত্র এক জন লোক এবং কটা মোষ মারা গিয়েছিল। তারা পাহাড়ের উচ্চ ভূমির আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সহজেই আত্ম-রক্ষা করলো। তা ছাড়া অফুরন্ত পাহাড়ের অসংখ্য কন্দরে তাদের লুকিয়ে থাকার সুবিধা এত বেশী যে, বৃটিশ পুলিশ বা সৈন্য-বাহিনীর পক্ষে সে সব অজানা জায়গায় শত্রুর সন্ধান বা অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এক জংলি-দারোগাকে নাগারা ধরে এনেছে, এ সংবাদ ঝিম্‌লির কাণেও পৌছেছিল এবং তাকে যে অনাহারে রেখে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে সে খবরও তার অজানা ছিল না। কিন্তু এই জংলি-দারোগার নাম যে প্রতাপ এবং এই লোকই যে এক দিন তাকে ভালুকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল; আর এক দিন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সলিল-সমাধি থেকে বাঁচিয়েছিল, তা সে প্রথমে জানতে পারেনি। সে খবর পেলো শেষে সেনাপতি নান্দুর কাছ থেকে।

প্রতিহিংসার বশে নান্দু এক দিন এসে প্রচুর উল্লাসে আগ্রহে ঝিম্‌লিকে নিরিবিলি এ খবর জানিয়ে গেল। জানিয়ে শেষে বললো, এত দিনে তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে—প্রতাপের আর রক্ষা নেই।

নরহত্যায় নাগাদের যে মোটে দ্বিধা নেই, বরং যে যতো বেশী নর-হত্যা করে ততই তার বীরত্বের খ্যাতি—এ কথা ঝিম্‌লি জানতো। তবু প্রতাপের মত সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ যুবকের এমন নির্ম্মম মৃত্যুর সম্ভাবনায় সে যার পর নাই বিচলিত এবং আতঙ্কিত হলো। সে আরো জানতো, নান্দুর কাছ থেকে এতটুকু সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করা আর পাথরে জল-পাওয়ার আশা একই কথা! তবু সে জানতে চাইলো, প্রতাপকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। হেসে নান্দু বললে,—"সে বেশ ভালো জায়গাতেই আছে,—তা জেনে আর কি হবে? তুই যদি আমার 'কিমা' (স্ত্রী) হতে রাজী হোস্, তাহলে তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। বল্ রাজি আছিস্?"

দারুণ ঘৃণায় ঝিম্‌লি বললো,—"চলে যা তুই আমার সামনে থেকে।"

প্রত্যাখ্যাত নান্দু কুপিত ভাবে জানিয়ে গেল, প্রতাপের দেহ টুক্‌রো-টুক্‌রো করে কেটে নাগাদের ভোজে না লাগানো পর্য্যন্ত সে এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকবে না।

এমনি ভয় দেখিয়ে নান্দু চলে যাবার পর ঝিম্‌লির মনে সত্যই আশঙ্কা হলো প্রতাপকে প্রাণে মারবার জন্য নান্দু সত্যই চেষ্টার ত্রুটি করবে না! ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

ঝিম্‌লি অশিক্ষিতা,—সভ্য-সমাজের কোনো সংবাদ রাখে না—তাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সে কিছুই জানে না। সে মানুষ হয়েছে এই অসভ্য এবং নৃশংস জাতির অতি-বীভৎস পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সমাজের মধ্যে। শিশু-বয়সের শিক্ষা এবং সংসর্গের স্মৃতি তার প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে যখন নাগাদের দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠুর লীলা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতো, তখন তার স্বাভাবিক স্নেহ-প্রবণ করুণ চিত্ত গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতো। সে বুঝতো পারতো না, নাগারা যে সব কাজ করে বা দেখে উল্লাসে মেতে ওঠে, তার মন কেন সে সবে সাড়া দেয় না, তাতে বরং ব্যথা বোধ করে! তার যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে বা থাকতে পারে, এ জ্ঞানও তার জন্মায়নি। রাণী জুমেলার কাছে সে যে স্নেহ আর আদর পায়, ঐটুকুই তার জীবনে একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু! তবে কি আনন্দ বলে কোনো জিনিবের উপলব্ধি তার নেই? আছে। যখন রাণীর অনুগ্রহে ইচ্ছা-মতো যেখানে-সেখানে সে বেড়াবার সুযোগ পায়। পাহাড়ের অতুল অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিভ্রমণের আনন্দ তার মনের সকল গ্লানি, সকল বিষাদ মুছে দেয়।

বয়সের সঙ্গে দেহের পুষ্টি এবং সেই সঙ্গে মনোবৃত্তির বিকাশ প্রাকৃতিক ধর্ম। কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তি সাধারণতঃ তার সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন অতিক্রম করে গড়ে উঠতে পারে না—এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতে পারে শুধু জন্মগত মনোবৃত্তি। ঝিম্‌লির অজ্ঞাতে তার সভ্য মাতা-পিতার হৃদয়তার বৃত্তি তার মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রতাপের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই তার মন ঐ যুবকের তেজোদীপ্ত সৌম্য চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তায় সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে। ভালুকের মতো হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ থেকে সে দিন ঐ যুবক ছাড়া কে আর তাকে রক্ষা করতে পারতো? নিজের জীবন বিপন্ন করে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে-ই তাকে বাঁচিয়েছিল? কোনো অসভ্য নাগা তা করতো? দেবতার মতো এমন লোককে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌বার জন্য নিয়ে এসেছে এই নর-রাক্ষস! ঝিম্‌লি এ কথা জানতে পেরেও চুপ করে বসে থাকবে? তার কিছুই করবার নেই তাকে বাঁচাবার জন্য? নাম্‌দু আবার বলে গেছে, প্রথমে অনাহারে রেখে তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা হবে।

কিন্তু কি করা যায়? যদি জানতে পারা যেতো সেই যুবককে কোন্ জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাহলে হয়তো কিছু না কিছু করবার চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞেস্ করতে যাওয়াও বিপদ! ঐ জংলি-দারোগার উপর ঝিম্‌লির অতি সামান্য সহানুভূতি আছে জান্‌তে পারলে ঝিম্‌লিকে রাজা কখনো ক্ষমা করবে না, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। শাস্তির ভয় ঝিম্‌লি করে না, তা সে যতই কঠোর হোক না কেন! কিন্তু ঝিম্‌লির উপর এদের সন্দেহ জাগলে ঐ যুবকের উদ্ধার-সম্পর্কে সে আর কোনো কাজই করতে পারবে না। সুতরাং তাকে চলতে হবে এমন ভাবে যেন কেউ তাকে না সন্দেহ করে। তাই সে সংকল্প করলো, গোপনে অপর লোকের কথা-বার্ত্তার ভিতর থেকে ঐ যুবকের সংবাদ সংগ্রহ করা যায় কি না, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবে এবং উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত এ কাজে তার বিরতি ঘটবে না!

বারো

ফরেষ্টার প্রতাপ সিংকে বেঁধে নিয়ে যাবার খবর গিরিধারীর বাংলোতেও পৌঁছেছিল্ নিকটবর্ত্তী বস্তির মণিপুরীদের মারফত। গিরিধারী এ সংবাদে প্রতাপের সম্বন্ধে খুবই শঙ্কিত হলেন। কুসুমিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। নাগাদের নৃশংসতার অনেক লোমহর্ষণ কাহিনী সে শুনেছে। ওরা যে প্রতাপকে সহজে ছেড়ে দেবে বা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে, এ একেবারে সম্ভাবনার বাইরে। কুসুমিয়াকে আশ্বাস দিয়ে গিরিধারী বললেন, প্রতাপ গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী। সমস্ত বৃটিশ শক্তি তাকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হবে, এমন কি নাগারা যদি ভালোয় ভালোয় তাকে অবিলম্বে অক্ষত দেহে ছেড়ে না দেয়, তাহলে ইংরেজের সঙ্গে নাগাদের লড়াই বাধবে। নাগারা নিশ্চয় লড়াই করতে সাহস পাবে না, সুতরাং আপোষ-নিষ্পত্তি হওয়াই সম্ভব এবং তাহলে প্রতাপকে ওরা নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

গিরিধারী এই ভাবে আশ্বাস্ দিলেন বটে, কিন্তু কুসুমিয়ার মন এতে আশ্বস্ত হলো না। গিরিধারী জানতেন না এবং তিনি সন্দেহ করতে পারেননি, দু'-চার দিনের দেখা-সাক্ষাতের ফলেই কুসুমিয়া কি গভীর ভাবে প্রতাপের অনুরাগিণী হয়ে পড়েছিল। কুসুমিয়া ভাবলো, প্রতাপের এই দারুণ বিপদে সে কি কোনো সাহায্য করতে পারে না? স্ত্রীলোক ব'লে তার কোন শক্তিই নেই? কিছু দিন আগে এক বুড়ো মণিপুরীর কাছে সে আঙ্গমি নাগাদের ভাষার চল্‌তি কথা মোটামুটি শিখে নিয়েছিল শুধু কৌতুহল তৃপ্তির জন্য। সে জ্ঞান এখন কাজে লাগানো যায় না? নাগা ভাষার সেই কথা-গুলো তার খাতায় লেখা রয়েছে এবং একবার দেখে নিলে সমস্তই আবার মনে থাকবে। কিন্তু কি ভাবে এই জ্ঞানটুকু কাজে লাগাবে, কুসুমিয়া ভেবে স্থির করতে পারলো না। নিষ্ঠুর শত্রু-গৃহে প্রতাপ ভীষণ বিপন্ন—জানা সত্ত্বেও ঘরে সে নিশ্চেষ্ট বসে থাকবে?

অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত বিষয়টা নানা দিক্ দিয়ে সে ভেবে দেখলো এবং অবশেষে মনে মনে কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করলো। বাকি দিনটা সে গিরিধারীর অগোচরে সংকল্পিত কার্য্যের প্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটির আয়োজনে কাটিয়ে দিল। এই সংকল্পের বিষয় গিরিধারী কিছুই জানলেন না।

রাত্রি-ভোজনের পর কুসুমিয়া পিতার কাছে নিত্যকার অভ্যাস-মতো কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করে নিজের কামরায় গেল ঘুমোবার জন্য। তার কামরা এবং গিরিধারীর শোবার ঘরের মাঝখানে একটি দরজা—সে দরজা সাধারণতঃ খোলা থাকে। সে যথাসময়ে শয্যাগ্রহণ করলো। গিরিধারীও অভ্যাসানুযায়ী আধ ঘণ্টা একখানা গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শুয়ে পড়লেন এবং শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে বিভোর হলেন।

কুসুমিয়া তার পিতার প্রকৃতি ভালোই জান্‌তো। তাঁর অভ্যাস ছিল, একটানা চার ঘণ্টা অঘোরে ঘুমিয়ে খুব ভোরের দিকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়তেন। কুসুমিয়া আজ আর ঘুমোলো না। মানসিক দুশ্চিন্তায়, বিশেষ তার সংকল্পিত কাজে প্রবৃত্ত হবার উত্তেজনায় ঘুম তার চোখের কোণে ঘেঁসতে পারলো না।

গিরিধারী ঘুমিয়ে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই কামরায় ছোট কুপি জ্বেলে নিজের সর্ব্বাঙ্গে ও মুখে কুসুমিয়া একটা তরল রং ভালো করে মাখলো। এ রং সে দিনের বেলায় বিশেষ যত্নে তৈরি করে রেখেছিল। রং মাখা শেষ হলে একটা বড় আরসীতে মুখের চেহারা দেখে খুসীই হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই রং বেশ শুকিয়ে গেল। তার পর একটা বেতের ঝুড়িতে কতোগুলো ছোট-খাটো জিনিষ গুছিয়ে রাখলো। এ-সব কাজে রাত প্রায় দুপুর বেজে গেল। কাজের শেষে বাতি নিবিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

যখন উঠলো, ভোরের আলো তখনও পূব-আকাশে উঁকি দেয়নি। অভ্যাসমতো গিরিধারী ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই জেগে উঠবেন এবং বাড়ীর ভৃত্যেরাও তার একটু পরে উঠে পড়বে। কুসুমিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চিঠির কাগজ বার করে বাবার নামে ক'ছত্র লিখে নিজের টেবিলের উপর পাথর-চাপা দিয়ে রাখলো :—

"বাবা আমায় ক্ষমা করো। তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই আজ এক গুরু কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বেরুচ্ছি। অনুমতি চাইতে সাহস হলো না। কারণ, জানি সে অনুমতি তুমি দেবে না এবং দিতে পারবে না। তবে এইটুকু তোমায় বলে যাচ্ছি যে, কোনো অন্যায় আমি করবো না। কাজটায় বিপদ হয়তো খুব! কিন্তু, বাবা,

তোমার আশীর্বাদে আমি নিশ্চয় সে বিপদ অতিক্রম করে শীগ্‌গিরই তোমার কাছে ফিরে আসতে পারবো। আমার খোঁজে লোক পাঠিও না, তুমিও বেরিও না। আবার তোমার ক্ষমা চাইছি।

তোমার আদরের কুসুমিয়া।"

তার পর কোমরবন্ধে একটা ছোরা এবং হাতে বেতের ঝুড়িটা নিয়ে অতি সন্তর্পণে সে এলো তার পিতার ঘরে,—এসে নিদ্রিত, পিতার পায়ের কাছে প্রণাম করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাংলোর বাইরে চলে এলো।

রাত্রিশেষে আঁধারের পাত্‌লা আবরণে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত পায়ে সে পাহাড়ের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হলো। ভোর হবার আগেই সে একটা পাহাড়ী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলো। এই নদী পার না হলে নাগা-বস্তিতে যাবার উপায় নেই। সে নদী-তীর ধরে এগিয়ে চললো খেয়া নৌকোর সন্ধানে।

কুসুমিয়াকে গিরিধারীও হয়তো এখন চিনতে পারতেন না—সে তার চেহারায় এবং বেশ-ভূষায় এমন পরিবর্ত্তন করেছে। তার এই ছদ্মবেশে তাকে সাধারণ মণিপুরী মেয়ে বলেই মনে হয়। সূর্য্যোদয়ের একটু পরেই সে নদী পার হয়ে খানিক দূর এগিয়ে পড়লো। তার পিছনে গিরিধারী যদি কাউকে পাঠিয়ে থাকেন এই আশঙ্কায় সে অবিশ্রাম চলতে লাগলো। ক'ঘণ্টা চলার পর এক পাহাড়ী বস্তিতে পৌঁছুলো। কিন্তু বস্তিতে ঢুকেই বিস্মিত হলো যে বস্তিটা সম্পূর্ণ জন-হীন—কুটীরগুলোও লণ্ডভণ্ড। বস্তির লোকজন যেন তাড়াতাড়ি তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমেত পালিয়ে গিয়েছে! কুসুমিয়া বুঝতো পারলো না বস্তির অবস্থা কেন এমন হলো। সে জানতো না, প্রতাপের সন্ধানে সশস্ত্র পুলিশ এই দিকে ক'দিন ঘোরা-ফেরা করেছে,—তাই বস্তির লোকজন পুলিশের গুলীর ভয়ে দূরের কোনো বস্তিতে সরে পড়েছে।

বস্তিবাসীদের পরিত্যক্ত কটা ঘরে ঢুকে কুসুমিয়া দেখলো, সে সব ঘরে থাকবার মধ্যে শুধু হাঁড়ি-কুঁড়ি—তা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে সে পেলো একটা কাপড়ের বুচ্‌কি—ঐ ঘরেরই এক কোণে। বুচ্‌কি খুলে তার মধ্যে পেলো নাগা মেয়েদের হাতে আর গলায় পরার কিছু গহনা এবং একটা পুরোনো পোষাক। কুসুমিয়া চুপ করে কিছুক্ষণ সে সবের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার পর একটা পোষাক তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে দেখলো। দেখে নিজের পরণের মণিপুরী সাজ রেখে ঐ পোষাক পরলো—নাগা মেয়েদের ধরণে।

সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্ম-পদ্ধতি একটু বদ্‌লে নিল। সে সংকল্প করেছিল, যত কষ্ট বা বিপদ হোক যেমন ক'রে পারে নাগাদের প্রধান আড্ডায় গিয়ে সে প্রতাপের সংবাদ সংগ্রহ করবে—তার পর তার উদ্ধারের চেষ্টা। নাগা-মেয়ের বেশে ওদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা হবে সব-চেয়ে নিরাপদ।

ইংরেজ পুলিশের তাড়া খেয়ে নাগা-কুকির দল পাহাড়ের সীমান্ত-দেশ ছেড়ে অনেকটা ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে। সেখানে পুলিসের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ সহজ ছিল না।

কুসুমিয়া প্রায় সারাদিনই চললো পাহাড়ের অজানা অচেনা নানা পথে। মানে জঙ্গলে-পাহাড়ে পথ বলে কিছু নেই। মাঝে মাঝে কোনোখানে বন্য পশুদের চলাচলের যে সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, তাই দেখেই সে চলছিল। পাহাড়ের আর শেষ নেই—একটার পর একটা—তার পর আর একটা—ঘাড়াঘাড়ি আটটা-দশটা-বারোটা পাহাড় মাথা উঁচু করে সামনে দাঁড়িয়ে। এই সব পাহাড় অতিক্রম করা অসাধ্য না হলেও যে দুঃসাধ্য কুসুমিয়া ক্রমেই তা বুঝছিল। তার ধারণা ছিল, পাহাড়ের গায়ে নিশ্চয় কোনো পথ পাবে—সে-পথে চলে একেবারে সোজা সে নাগা-বস্তিতে পৌঁছুবে। সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল পাহাড়ের ভিতর দিকে খানিক দূর এসে সে তা বুকতে পারলো। সকলের চেয়ে বেশি নৈরাশ্যের কারণ হলো এতোখানি পথ চলেও সে কোথাও এক জন মানুষের দেখা পেলো না—যার কাছে পথের সন্ধান পাবে।

অপরাহ্ণে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে এক ঝরণার ধারে বিশ্রামের জন্য বসলো। ঝুড়ি থেকে ফল বার করে তাই দিয়ে আহার শেষ করে আবার সে বেরুলো অজানা পথে—মনে দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে।

সন্ধ্যার দিকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে ক্ষত-বিক্ষত চরণে সে একটা ছোট বস্তির কাছে এসে উপস্থিত হলো। বস্তির লোকজন কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, কেমন তাদের প্রকৃতি, কিছুই জানে না। তাই তার সাহস হলো না বস্তির ভিতরে যেতে। একটা অনুচ্চ ঝোপের আড়ালে চুপ করে বসলো দেহের শ্রান্তি দূর করবার বাসনায়। এতখানি পথ চলার অভ্যাস তার ছিল না, শুধু মনের জেরে এ পর্য্যন্ত চলতে পেরেছে। বিশ্রাম করতে গিয়ে তার অবসন্ন দেহ শেষে সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো নিদ্রার আবেশে। আগের রাত্রে সে মোটেই ঘুমোয়নি, সুতরাং ঘুম তাকে সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেললো।

কতক্ষণ এ ভাবে সেখানে প'ড়েছিল খেয়াল নেই, যখন জাগলো তখন অন্ধকার হলেও একটু জ্যোৎস্নার আলো যেন সে আঁধারকে একখানা সাদা কাপড়ের আবরণে আলগোছে ঢেকে রেখেছে! চোখ মেলে চেয়ে সে দেখলো এক জন পাহাড়ী স্ত্রীলোক তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে আর একটু একটু হাসছে। সে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে গহনা,—গলায় নানা রঙের কাচের আর পাথরের অসংখ্য মালা, কাণে বড় বড় আংটি, এবং হাতের কব্‌জি থেকে কনুইর উপর পর্য্যন্ত নানা রকমের চুড়ি আর বালা, কটিদেশে সামান্য একখণ্ড বস্ত্রের আবেষ্টন মাত্র।

কুসুমিয়া বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো একেবারে নির্ব্বাক্ হয়ে। অবশেষে স্ত্রীলোকটি তাকে জিজ্ঞেস্ করলো,—"তুই কে? ঐখেনে একলা পড়ে ঘুমাইছিলি?"

স্ত্রীলোকটির হাসিমাখা মুখ দেখে কুসুমিয়া বুঝতে পারলো, প্রশ্ন-কর্ত্রী দয়া-মায়া-বর্জ্জিতা নয়। সে-ও তাই হাসিমুখে উত্তর দিল, তার নাম মনুয়া, জাতে আঙ্গমি নাগা—ইংরেজ পুলিশের গুলীতে তার একটি মাত্র ভাই শাংটু মারা গেছে,—তার আর কেউ নেই যে তাকে আশ্রয় দেয়—তাই সে চলেছে রাজার কাছে দুঃখের কথা জানাতে এবং রাজা যেন তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বিলম্ব না করে—নিবেদন জানাতে। কিন্তু সে জানে না, রাজার কাছে যেতে হলে কোন্ পথে যেতে হবে!

মনুয়ার দুঃখের কাহিনী শুনে স্ত্রীলোকটি সমবেদনা জানিয়ে বললো, তার নাম মিচিন্। সে-ও নাগা তবে আঙ্গমি নাগা নয়, কনিয়াক নাগা। আঙ্গমিদের সঙ্গে তাদের খুব সদ্ভাব ছিল না, তবে এখন ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে হবে বলে সব নাগারা আজকার

ঝগড়া-বিবাদ ভুলে এক হয়ে গেছে। কাজেই ওদের বস্তিতে গিয়ে রাত্রিবাস করতে মন্নুয়ার ভয়ের কারণ নেই। মিচিন্ তাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবে, ভালো খেতে দেবে এবং তাদের গাঁয়ে নাচের উৎসবে নিয়ে যাবে।

এই অজানা দেশের অসভ্য রমণীর কাছে এতখানি সহানুভূতি এবং আদর পাবে, কুসুমিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ভাবতে পারেনি। ভাগ্যিস্ সে নাগা-ভাষার চল্‌তি কথাগুলো শিখে রেখেছিল, নাহলে নিজেকে নাগা বলে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হতো না।

মিচিন্ তাকে আদর করে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে। মন্নুয়ার সুন্দর মুখ দেখে সকলেই তাকে সাদরে গ্রহণ করলো। রাত তখন বেশ হয়েছে। মিচিন্ তাই বিলম্ব না করে মন্নুয়াকে নিয়ে উৎসব-বাড়ীতে নাচ দেখতে বেরুলো। নাচ তখনও আরম্ভ হয়নি। তাল-পাতার খাটো ঘাগরা-পরা এক জন রমণীকে দেখিয়ে মিচিন্ বললো, এ বস্তিতে নাচে-গানে ঐ মেয়েটির মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই—ওর নাম 'পিল্‌লা'। পিল্‌লাকে বিয়ে করবার জন্য গাঁয়ের জোয়ানদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। পিল্‌লা কিন্তু পছন্দ করেছে 'মিটাঙ্'কে। মিটাঙ্ খুব ভালো নাচে, তার উপর সে একে একে সাতটা মানুষ খুন করে খুব নাম কিনেছে। সে-ও আজ নাচ্‌বে—ঐ যে নাচের সাজ পরে পিল্‌লার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐ হলো মিটাঙ্।

মিচিন্ এই ভাবে অনেক কথাই বলতে লাগলো মন্নুয়ার তৃপ্তির জন্য। সাত সাতটা মানুষ খুন করার গৌরব-অর্জ্জন সে খুব সহজসাধ্য নয় এবং যে তা করতে পারে, সে যে অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ, এ কথাটা মিচিন্ খুব সহজ ভাবেই বললো, অথচ মিচিন্ যে হৃদয়হীনা তা নয়। মিটাঙের নরহত্যা গুণগ্রামের উচ্চ-প্রশংসা শুনে কুসুমিয়ার মনে হলো, নিত্য নর-হত্যা দেখে দেখে এ দেশের মেয়েরাও হত্যা-কার্য্যে শুধু বীরত্বই দেখতে পায়, নিষ্ঠুরতা তাদের চোখে পড়ে না। কুসুমিয়া নিঃশব্দে এ সব কথা শুনতে লাগলো—কোনো মন্তব্য করলো না—পাছে ও সন্দেহ করে! নিজেকে নাগা বলে পরিচয় দিয়েছে—কাজেই নাগাদের মতোই তাকে চলতে হবে!

নাচের উৎসব চললো অনেক রাত পর্য্যন্ত। নাচের সঙ্গে যে সব গান হচ্ছিল তার একটা ছিল এই :—

হেগোয়াঙ্ পিওকি, শেগোয়াঙ্ ইলে আঠাই,
মাইজু বুইছে হাংলেম্ লেয়ার নিলা ;
হেগোয়াঙ্ পিওকি বাইনান্ ভাই ভাই রেঙ্ বঙ্
কানিয়াঙ্ কিন্‌টাম্ লেয়ার নিলা। *

মিচিনের সঙ্গে এই উৎসবের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে নাগাদের সামাজিক জীবনের একটা দিক্ সম্বন্ধে কুসুমিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মালো। ভালোই হলো। শেষ রাত্রে দু'জনেই ফিরে এলো মিচিনের বাড়ী এবং কুসুমিয়া মিচিনের সঙ্গে একই শয্যায় শুয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

পরের দিন যখন তারা জেগে উঠলো তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। মিচিন্ খুব যত্নে কুসুমিয়ার আহারের আয়োজন করতে গেল ; কুসুমিয়া কিন্তু তাকে বুঝিয়ে বললো, ভাইয়ের শোকে পাকা ফল ছাড়া সে আর কিছু খাবে না। যদিও এমন আহারের রীতি কোনো রকম শোকের অবস্থায় নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক নয়, তবু মিচিন্ প্রতিবাদ না করে কুসুমিয়ার (মন্নুয়ার) ইচ্ছানুযায়ী আয়োজন করলো। বেল, কলা, পেঁপে, কুমড়ো আরো ক'জাতের ফল এবং এক চোঙা খাঁটি দুধ হলো মিচিনের অতিথি-সৎকারের উপকরণ। কুসুমিয়া পরিতৃপ্তির সহিত আহার করে দেহে নূতন শক্তি পেলো। সে সত্যই মুগ্ধ হলো মিচিনের সহৃদয় আতিথেয়তায়। মিচিন্ তাকে এখানে দু'-এক দিন রেখে তাদের "জুম্"-এর ফসল এবার কেমন ভালো হয়েছে দেখাতে চাইলো—কিন্তু মন্নুয়া বললে, তার দেরী করা পোষাবে না! মিচিন্ আপত্তি করলো না,—দু'-তিন ক্রোশ রাস্তা একসঙ্গে যেতে পারে এমন এক জন সাথী জুটিয়ে দিল। এই সাথীটি এই বস্তিরই মেয়ে—তার নাম মুংরি। ঐ দিনই সে তার এক কুটুম-বাড়ীতে বেড়াতে যাবে স্থির ছিল।

মিচিনের কাছে বিদায় নিয়ে মন্নুয়া রওনা হলো মুংরির সঙ্গে। নানা রঙের মালা, চুড়ি, বালা ইত্যাদিতে ভূষিত মুংরিকে খুব জমকালো দেখাচ্ছিল। মন্নুয়ার কথা মুংরি ঐ দিনই সকাল বেলা মিচিনের কাছে শুনেছে। এখন তাকে সঙ্গে পেয়ে মুংরির খুব আনন্দ হলো। মন্নুয়া বেশি কথা বলে না দেখে সে ভাবলো ভাইয়ের শোকে মন্নুয়া বিহ্বল।

সন্ধ্যার একটু আগে তারা এসে পৌঁছুলো একটা গ্রামের প্রান্তে। মুংরির গন্তব্য স্থান এই গ্রামের অপর প্রান্তে। মুংরি চাইলো তার কুটুম-বাড়ীতে মন্নুয়াকে নিয়ে যেতে। কিন্তু মন্নুয়া বললে, না, পথে মিথ্যা বিলম্ব করা উচিত হবে না। কাজেই পরস্পর দুঃখ প্রকাশ করে দু'জনে বিদায় গ্রহণ করলো। বিদায়ের পূর্ব্বে মুংরি রাজ-বাড়ী যাবার পথ বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

এখন তাকে আবার একা চলতে হলো। গন্তব্য স্থানের পথ সম্বন্ধে মুংরি যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে সে ঠিক সেই মতো চলতে লাগলো। চারি দিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝরণা-ধারা, আবার কোথাও বা গভীর খাদ—সে দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। বড় বড় গাছের ডালে বসে কত মর্কট, কত উল্লুক যে তাকে ভ্রূকুটি করেছে তার অন্ত নেই! বনের হরিণ বরাহ ছুটোছুটি করে কত বার তার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। একটা বরাহ তো এক জায়গায় পথ আগলে রুখে দাঁড়িয়েছিল, শেষটা কি মনে করে নিজে থেকেই চলে গেল গভীর জঙ্গলে।

পাহাড়ের উচ্চ চূড়া থেকে অস্ত-রবির কিরণচ্ছটা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ক্রমে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। তখন সেখানে ছড়িয়ে পড়লো আঁধারের বিরাট আচ্ছাদন একান্ত অস্বস্তিকর নিবিড় নিস্তব্ধতা। আকাশের কালো চন্দ্রাতপে কোটি কোটি তারকা ঝিকিমিকি দিয়ে জেগে উঠলো। কুসুমিয়া শ্রান্ত—এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন। ঘর বা শয্যা কোনোটাই এখানে মেলবার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং আশ্রয় নিতে হবে কোনো গাছের শাখায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের নর-নারীর মতো। এখানে বড় গাছের অভাব ছিল না, কিন্তু গাছ বেয়ে ওঠবার সুবিধা চাই। কুসুমিয়া অনেকক্ষণ

---

* See the house of the Raja—the Raja is good
Girls and youths come to dance,
See the fine Toucan beaks in his house
See (and he is finely dressed as the tails and beaks of the Toucan sitting with him).

এ-দিক ও-দিক ঘুরে শেষে একটা গাছের উপর কষ্ট করে উঠলো,—তার পর একটা ডালের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে গাছে হেলান দিয়ে বসলো। ঘুমন্ত পাছে পড়ে যায় সে জন্য ঝুড়ি থেকে দড়ি বার করে গাছের সঙ্গে নিজের বক্ষোদেশ এবং ডালের সঙ্গে পা ছ'টো বেঁধে নিল।

সেই অবস্থায় বসে বসে অনেক কিছু সে ভাবতে লাগলো। যাঁর জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে দুঃসাধ্য অভিযানে বেরিয়েছে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন? তাঁর উদ্ধার-কল্পে গবর্ণমেন্টের সশস্ত্র পুলিশ এসেছে, কিন্তু তারা তো নাগাদের আসল আড্ডার সন্ধান এখনো পায়নি। পুলিশ বা ফৌজ এলেই নাগারা হয়তো পাহাড়ের এমন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকবে যেখানে ওরা পৌঁছুতেই পারবে না। অবশ্য নাগারা যদি প্রকাশ্য লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তা হলে ইংরেজের গোলা-গুলীর কাছে তারা দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারবে না! কিন্তু পাহাড়ীরা কখনো প্রকাশ্য যুদ্ধে নামবে না। কাজেই ব্যাপার সহজে মেটবার নয়। প্রতাপকে বাঁচাতে হলে ইংরেজের যুদ্ধের আয়োজনের উপর নির্ভর করলে চলবে না। গোপনে শত্রু-গৃহে প্রবেশ ক'রে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেছে কুসুমিয়া। ভগবান্ তার সহায় হবেন না?

কুসুমিয়ার চিন্তা-স্রোত এই ভাবে চললো অনেকক্ষণ। অবশেষে তার অবসন্ন দেহ নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে নিশাচর পশু-পক্ষীর বিকট চিৎকারে পাহাড়-প্রদেশ কম্পিত হ'য়ে উঠলেও কুসুমিয়ার ঘুম তাতে ভাঙলো না! (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন

ইতিহাসের অনুসরণ

বাঙ্গালার অতীত রাজধানী

ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী বা মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর তীরেই বেশীর ভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার শাসকদের বাসনা-অনুযায়ী এক একটি রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-রাজত্ব-কালে বিক্রমপুর, রামপাল, গৌড়, পাণ্ডুয়া; মুসলমান রাজত্ব-কালে রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে বাঙ্গালার এক একটি রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। এখন তাহাদের কোন-কোনটি একেবারে লুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত; কোন-কোনটি বা শ্রীহীন হইয়াছে।

বিক্রমপুর—(খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৫০—১০০০ খৃষ্টাব্দ)। ধলেশ্বরী ও মেঘনা এই দুটি নদীর সঙ্গম এবং ঢাকা হইতে প্রায় একুশ মাইল দূরে প্রাচীন হিন্দু নৃপতিদের রাজধানী বিক্রমপুর অবস্থিত ছিল। ইতিহাসে বিক্রমপুরই বাঙ্গালার প্রথম রাজধানী। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বিখ্যাত নবরত্ন-সভার না কি ইহাই ছিল কেন্দ্রস্থল। পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপন্থী পাল-বংশীয় রাজারা এই বিক্রমপুরে মাঝে-মাঝে বাস করিতেন। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। তাঁহাদের প্রাসাদ, দেউল প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ কিংবা ইমারতাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। পাল-বংশের পর আসিলেন কনৌজ হইতে সেনরাজারা। সেন-রাজারা বিক্রমপুর নগরে সম্ভবতঃ বাস করেন নাই।

রামপাল—(১১০০—১১৮০ খৃষ্টাব্দ)। সেন-বংশের রাজা আদিশূর রামপালে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল এখন একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র—ঢাকা হইতে আন্দাজ বারো এবং মুন্সীগঞ্জ হইতে মাত্র দু' মাইল দূরে অবস্থিত। সে রামপাল অর্থাৎ আদিশূরের রামপাল বহু দিন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেন-বংশের রাজত্বের সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সেন-বংশের অন্যতম যশস্বী নৃপতি বল্লালসেনের প্রাসাদের সামান্য ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এক কৃষক এই রামপালের মাটীতে চাষ করিতে করিতে বহুমূল্য একটি হীরকখণ্ড পাইয়াছিল। বল্লালসেনের প্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির চিহ্নও রামপালে পাওয়া গিয়াছে। কিংবদন্তী যে রাজা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজা-হিতার্থে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে স্থির হয়, এক রাত্রে ইহার খনন-কার্য্য শেষ করিতে হইবে এবং ইহার দৈর্ঘ্য হইবে—রাজ-মাতা পদব্রজে যতখানি যাইতে পারিবেন, তত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দীঘির আয়তন বেশ প্রশস্ত।

সোনারগাঁ—(১২০০—১৩০০)। সেনবংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রাচীন গৌড়ে নূতন করিয়া রাজধানী বসাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান সুলতানদের আক্রমণে রামপালের অপর পারে ইচ্ছামতীর তীরে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ে রাজধানী তুলিয়া আনিতে হয়। এই স্থানে সেন-বংশ প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজ্য হারাইয়া অবশেষে সামান্য ভূস্বামীতে পরিণত হয়। এখানে ঝিকটা বলিয়া একটি পুরাতন বাটীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। হিন্দু-রাজত্বের অবসানে এবং বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের প্রারম্ভে সোনারগাঁ এক প্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিন-নিযুক্ত বাহাদুর খাঁ হইতে ঈশা খাঁ প্রভৃতি শাসকগণ এই সোনারগাঁয়েই বাস করিতেন এবং পরে স্বাধীন হইয়া সোনারগাঁয়েই রাজধানী স্থাপনা করিয়াছিলেন।

গৌড়—(৮০০—১০৬৩) (১২০০—১৩৫৪)। ওদিকে গৌড় যে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ্মণ সেনের বহু পূর্ব্ব হইতেই গৌড় নগরে রাজন্যবর্গের বাসের কথা সুপ্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, বাঙ্গালার পাল-বংশীয় রাজারা গৌড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালদেব সম্ভবতঃ গৌড়ের পত্তন করেন। গোপালদেব হইতে খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর মদনপাল পর্য্যন্ত রাজারা এই গৌড়ে রাজত্ব করেন। গৌড় বহুদূর-বিস্তৃত, জনাকীর্ণ এবং বহু মন্দির ও প্রাসাদে সুশোভিত ছিল। গৌড়ে তাঁহাদের রাজধানী ছিল কালিন্দী নদীর দক্ষিণে এবং সে-জায়গার ক'মাইল দক্ষিণে মুসলমান শাসকগণ নূতন রাজধানী স্থাপনা করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাল-রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ; তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলি এখনও পাঠান-গৌড়ের মসজিদ-মিনারাদির অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান আমলে ঐ সকল কীর্ত্তিচিহ্ন দূরীকৃত স্থানান্তরিত করা

হইয়াছিল। সেন-বংশের প্রথম রাজা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সামন্ত সেন এই গৌড়েই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। পালেরা তিন শত বৎসর রাজত্ব করেন। সেন-বংশের রাজা বল্লালসেন গৌড়ে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের আরও উত্তরে নূতন সহর বসাইয়া তাহার নাম রাখিলেন লক্ষ্মণাবতী। গৌড় বিস্তার লাভ করিয়া লক্ষ্মণাবতীর সঙ্গে মিশিয়া যায়। মালদহে মহানন্দার তীরে ইংলিশ বাজারের নিকট বল্লালবাড়ী বলিয়া যে প্রাসাদের ধ্বংসাবলী এখনও বিদ্যমান আছে, লোকে বলে বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন সেই প্রাসাদেই বাস করিতেন। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে ও সোনারগাঁয়ে এবং কেহ কেহ বলেন রামপালে নূতন নূতন সহরের পত্তন করিয়াছিলেন। রামপাল, সোনারগাঁর কথা বলিয়াছি, পরে নবদ্বীপের কথা বলিব।

সেন রাজাদের পরে পাঠান আমলেও গৌড়েই তাঁহাদের রাজধানী এবং গৌড়ের সমৃদ্ধি তখনো পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীর পাঠান সুলতানের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী—১২০০ খৃষ্টাব্দে গৌড় আক্রমণ করেন। বক্তিয়ার গৌড় জয় করিয়া নূতন রাজধানী বসান। তখনও লোকে গৌড়কে লক্ষ্মণাবতী বলিত। পাঠান আমলে গৌড় বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে; পাঠান আমলে মায় শের শাহের সময় পর্য্যন্ত গৌড় ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ ছিল; মসজিদ, মিনার, মহাল, গম্বুজে পূর্ণ ছিল; তাহার ধ্বংসবেশেষ আজও রহিয়াছে।

প্রাচীন রাজধানীর মধ্যে গৌড় কিরূপ বিরাট ছিল, তাহা য়ুরোপীয় পর্যটকের বিবরণ হইতে জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও গৌড়ের সমৃদ্ধির কথা বিশ্ববিশ্রুত ছিল। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফারিয়া-ই-সয়জা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (মুসলমান আমলে) গৌড়ের জন-সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক বারো লক্ষ।

নবদ্বীপ—(১১৬৩—১১৯৯)। সেন রাজারা নবদ্বীপেও কিছু কাল ছিলেন। কথিত আছে, পাঠানরা আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপ কিছু কালের জন্য বাঙ্গালার বা পশ্চিম-বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ বলেন, রাজা লক্ষ্মণসেনই ভাগীরথী ও জলাঙ্গীর সংযোগস্থল পুণ্যভূমি নবদ্বীপে (নদীয়া) আসিয়া কিছু কাল রাজত্ব করেন। সে সময় হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল নদীয়া, পরে এই স্থানেই শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় হয়। এখনকার নবদ্বীপ দেখিলে বুঝা যায় না যে, এক সময়—অল্প দিনের জন্য হইলেও—প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল এই নবদ্বীপ বাঙ্গালার রাজ-নগরে পরিণত হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়া—(১৩৫০—১৪১৪)। পাণ্ডুয়া অতি প্রাচীন সহর। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পাণ্ডুয়া প্রাচীন যুগের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাণ্ডুনগর। চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জয়ন্ত ছিলেন গৌড়ের রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। মুসলমান আমলে এই সহরের নাম ছিল ফিরোজাবাদ। গৌড়ের বাদশাহ সেকন্দর শাহ পাণ্ডুয়ায় স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমোলে গৌড়ে রাজা গণেশের পুত্র ধর্ম্মত্যাগী যদু বা জালালুদ্দিন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন তাঁহাকে পাণ্ডুয়া হইতে তাড়াইয়া দিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহেন্দ্রদেবের নিকট হইতে জালালুদ্দিন পুনরায় পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া লন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পাণ্ডুয়ায় রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্মী জালাল কিছু কাল শাসনকার্য্য করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুয়া পরে গৌড়ের রাজধানী হইয়াছিল; কিন্তু মাঝে মাঝে গৌড়ে সরকারী দপ্তর চলিয়া আসিত—তখন খেয়ালী নবাব বাদশাহ বা রাজারা মাঝে মাঝে গৌড়ে আসিয়া রাজত্ব করিতেন। তবে, পাণ্ডুয়ার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌড় ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। যেমন গৌড়ে, তেমনি পাণ্ডুয়ায় এখনো হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের বহু কীর্ত্তি-নিদর্শন বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বড় দরগা, বড় সোনা মসজিদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষে মুসলমান রাজত্বের স্মৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। গৌড়ের বারদুয়ার ফিরোজ মিনার প্রভৃতি কালের স্রোতে ক্ষয় পাইতেছে।

রাজমহল—(১৫৭৬-১৬০৮) (১৬৪০-১৬৫৯)। মুঘল আমলে প্রথমে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজমহল ছিল বাঙ্গালার রাজধানী। ঐ বৎসর রাজমহলের কাছে আকবরের সৈন্যের হাতে দাউদ খাঁ পরাজিত হইলে বঙ্গে মুঘল-সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। রাজমহলে আকবর বাদশাহের প্রতিনিধি বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা (মানসিংহ প্রভৃতি) বাস করিতেন ও রাজকার্য্য চালাইতেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের তরফে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতে এবং মগ ও পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুদের দমন করিতে ইসলাম খাঁ রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

শুনা যায়, রাজমহলের নাম ছিল আগমহল। মানসিংহ এখানে রাজধানী স্থাপনা করিয়া নাম রাখেন রাজমহল। আকবর অধিকার করিলে মুসলমানরা এ জায়গাকে বলিত আকবরনগর। মানসিংহ এক বৃহৎ প্রাসাদপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ফতেপুর সিক্রীর ন্যায় রাজধানী রাজমহল নগরীর চারি দিকে প্রাচীর গাঁথাইয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া ফিরিবার সময় মানসিংহ এই রাজমহলকেই বঙ্গ-বিহারের রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করেন। তার পরই ইহা রাজধানীরূপে গণ্য হয়। প্রাসাদ, দুর্গ, জুমা মসজিদও মানসিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন সে সমস্ত ধ্বংস পাইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ১৭৪২ সালে মারাঠারা মুসলমানদের হাত হইতে রাজমহল কাড়িয়া লয় এবং তাহার সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে। ইহার পর আলিবর্দ্দী গদিতে আরোহণ করিয়া ইহার কিছু উন্নতি করাইয়াছিলেন; ইসলাম খাঁ ঢাকায় চলিয়া গেলে রাজমহল আর রাজধানী রহিল না—তথাপি লোকের বসতিতে পূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল। গঙ্গার উপর ইহার অবস্থান বলিয়া খুব বড় বাণিজ্যকেন্দ্র এবং অন্যতম মহানগরীরূপেই বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়েও ঢাকা (জাহাঙ্গীর নগর) ছিল রাজধানী। পরে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ সুজা বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজমহলে শাহ সুজা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহের বঙ্গীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ বসবাস করেন। তিনি সুন্দর

একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—মানসিংহের প্রাচীরকে আরও দৃঢ় ও উচ্চ করাইয়াছিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে রাজমহলকে আবার সুন্দর নগরে অর্থাৎ যথার্থ রাজধানীতে পরিণত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে * রাজমহল সহর, কিল্লা ও প্রাসাদের কিয়দংশ ভীষণ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায়। তার পর ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে রাজদপ্তর এখান হইতে চলিয়া যাওয়ায় রাজমহলের রাজধানী-গর্ব্ব ঘুচিয়া যায়। আজ গঙ্গার উপর 'কালের কপোলতলে' ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাসাদ, মিনার প্রভৃতি বহন করিয়া রাজমহল মলিন মুখে অবস্থান করিতেছে।

বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব মীরকাশেম পরে রাজমহলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্পদিনের জন্য। মীরকাশেমের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই রাজমহলের সকল গৌরবের অবসান ঘটিল।

রাজমহল সত্যই রাজার মহলের যোগ্য স্থান—গঙ্গার কোলে সাঁওতাল পরগণার মুখাগ্রে অবস্থিত। রেলযোগে ভাগলপুর লাইনের তিনপাহাড় জংসন হইতে শাখা-লাইন ধরিয়া রাজমহলে যাইতে হয়। আজ তার সে শোভা-সমৃদ্ধি আর নাই—সবই ম্লান হইয়াছে; জনসংখ্যা কমিয়াছে, জনপদের কুটীর-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। বাল্যকালে প্রথম এই রাজমহলের কথা পড়ি—৺রাজনারায়ণ বসুর রাজমহল ও গৌড়ভ্রমণে—"মুর্শিদাবাদ হইতে ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থানাভিমুখে ষ্টিমার চালানো হয়। তৎপরে উচ্চ সঙ্গমস্থল হইতে আমরা রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। রাজমহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা ষ্টিমারে আরোহণ পূর্ব্বক রাজমহলের পর্ব্বতের দিকে গঙ্গানদীর যে খাড়ী গিয়াছে, সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া উক্ত পাহাড়সকল পর্য্যবেক্ষণ ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য দর্শন করি।"

ঢাকা—(১৬০৮–১৭০৪)। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা দুই বার সমগ্র বঙ্গের এবং এক বার (বৃটিশ আমলে) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হইয়াছিল। ঢাকা এখন বাঙ্গালার দ্বিতীয় মহানগরী। মুঘল রাজপ্রতিনিধি ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় প্রথম রাজধানী স্থাপনা করেন। সুলতান সুজা (শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র) বঙ্গের শাসনকর্ত্তারূপে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে রাজমহলেই বাস করেন। রাজমহলকে পুনরুজ্জীবিত করিলেও পরে ঔরঙ্গজেবের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আবার তিনি ঢাকায় আসেন। তখন ঢাকাকে সকলে জাহাঙ্গীরনগর বলিত; কারণ, জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলেই ইহা রাজধানীরূপে গণ্য হয়। জাহাঙ্গীর অসুস্থ হইয়া বৃদ্ধ অবস্থায় যখন নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন, সেই সময় সেলিম (শাজাহান) বিদ্রোহ করিয়া বাংলা দখল করেন; তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁকে পরাস্ত এবং নিহত করিয়া এই ঢাকাতেই (জাহাঙ্গীর নগর) তাঁহার বঙ্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর (শাজাহান) সেলিম বুদ্ধি ও শৌর্য্য-বলে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র হইয়াও দিল্লীর সিংহাসনে বসিলে কাশিমখাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। হতভাগ্য সুজাকে ঢাকা হইতে ত্রিপুরার দিকে পলায়ন করিতে হয় এবং আরাকানে দস্যু-হস্তে তিনি প্রাণ সমর্পণ করেন। মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের সৈন্যসহ এখানে আসিয়া সুজাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তারূপে শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় আসেন এবং ২৩ বৎসর কাল শাসনকার্য্য চালাইয়া ঢাকা সহরকে তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী করেন। শায়েস্তা খাঁ খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি মুঘল বাদশাহের প্রতিনিধি হইলেও বঙ্গের স্বাধীন নবাবদের ন্যায় প্রতাপ বিক্রম ও বুদ্ধি-কৌশলে বঙ্গ শাসন করিয়া ঢাকাকে রাজধানীর উপযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ঢাকা ইহার পূর্ব্ব হইতেই বড় বাণিজ্যকেন্দ্র এবং মস্‌লিন ও শঙ্খ-শিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল। তবু এই সময় হইতে উহা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

প্রায় শত বৎসর ধরিয়া ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর মুসলমান শাসকদের রাজধানী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইব্রাহিম খাঁর রাজত্বের সময় হইতেই ঢাকা হীনপ্রভ হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান হইতে নবাবের গদি অধিকার করিয়া ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। আজিম ওসমান শেষ মুঘল শাসনকর্ত্তা। তিনি ঢাকায় বাস করিতেন। স্বাধীন-চেতা মুর্শিদকুলি নামেমাত্র মুঘল বাদশাহের অধীন ছিলেন। স্বীয় প্রতাপে ভাগীরথীর তীরে বহরমপুরের নিকট আসিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ সহর প্রতিষ্ঠা করেন।

মুর্শিদাবাদ—(১৭০৪-১৭৫৭)। এই মুর্শিদাবাদে ইংরেজ আসিয়া বাঙ্গালাকে করতলগত করে। মুর্শিদাবাদ আমাদের শেষ রাজধানী—কলিকাতা যেমন আজ বৃটিশ-বঙ্গের রাজধানী। পঞ্চাশ বৎসর মাত্র মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙ্গালার রাজধানী। রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন কিছু কিছু এখনও আছে। নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁ বহরমপুরের উত্তরে কাশিমবাজার লালবাগের পর নূতন রাজধানী বসান। বড় বড় প্রাসাদ, ইমারত, মসজিদ, দেউল, দেউড়ি সমেত ভাগীরথীর তীরে এক গণ্ডগ্রামে গজাইয়া উঠিল সমৃদ্ধ নগর। নিজ নামে নবাব নামকরণ করিলেন মুর্শিদাবাদ! দেখিতে দেখিতে ঢাকা হইতে কিছু এবং সমগ্র বঙ্গ হইতে বহু ধনী, গুণী, লোভী, রাজ-সম্মানাকাঙ্ক্ষী পুরুষ নূতন রাজধানীতে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া নগরীর মর্য্যাদা বাড়াইলেন। মুর্শিদাবাদ এখন বলিতে গেলে পরিত্যক্ত।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিন এবং তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ স্বাধীন ভাবেই বঙ্গ-শাসনের প্রয়াস পান। দিল্লীতে মুঘল-শক্তি তখন ক্ষীণ হইয়াছে। বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ পাটনা হইতে আসিয়া সরফরাজকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিরোহণ করেন। আলিবর্দ্দী স্বাধীন নবাব ছিলেন—দিল্লীতে রাজস্ব দিতেন না। আলিবর্দ্দী ১৬।১৭ বৎসর রাজত্ব চালাইয়াছিলেন (১৭৩১ খৃষ্টাব্দে হইতে)। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার দ্বারা মুর্শিদাবাদের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারী, ধনী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের বাসভূমি হওয়াতে একটি সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঢাকার মত বাণিজ্যেরও বড় কেন্দ্র হইয়াছিল, যেহেতু, বুড়ীগঙ্গার মত ইহা ভাগীরথীর উপর অবস্থিত। ঢাকাই মসলিনের ন্যায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক (গরদ, তসর, মটকা) এবং ঢাকার শঙ্খের ন্যায় খাগড়াই কাঁসের বাসন আজও আমাদের বাঙ্গালার গৌরবের জিনিষ।

* Stewatএর মতে।

আলিবর্দ্দীর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ এই মুর্শিদাবাদেই রাজত্ব করেন। তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের গৌরব-মহিমা-সম্পদ বিলুপ্ত হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ (এম-এ বি-এল)

আকবরের প্রতিভা

ভারতে সম্প্রতি যে শাসন-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেশের লোককে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত ভারতবাসীর মন এই ব্যাপারে অপার নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। সেই জন্য ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আগ্রার দুর্গে যে মহাপ্রাণ প্রতিভাশালী বাদশাহ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই শাহানশাহ বাদশাহ আকবরের শাসন-পদ্ধতিতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার কথা মনে পড়িতেছে।

আকবরের জীবন-কাহিনী অনেকেই অনেক ভাবে লিখিয়াছেন। এত বিস্তীর্ণ ও বিশদ ভাবে কোন বাদশাহের জীবন-কাহিনী বোধ হয় আলোচিত হয় নাই। কিন্তু বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ উহার একটা দিক বা একটা কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। আকবর বাদশাহ এমন কি কাজ করিয়াছিলেন যে জন্য এই মোগল-বিজিত ভারতের হিন্দুরাও এত কাল ধরিয়া ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করেন?

য়ুরোপীয়েরা বলেন, আকবরের শাসন-নীতিতে দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। সেই দুটি গুণ—তাঁহার তোষণ-নীতি (conciliation) এবং ভিন্ন-মত-সহনশীলতা (toleration)। আকবর সকল সম্প্রদায়ের প্রজাকে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেন এবং মতভেদ ঘটিলে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মতকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিতেন না, বা তাহাদিগকে নির্য্যাতনও করিতেন না; বরং মনোযোগ-সহকারে তাহাদের মত শুনিতেন এবং নিজের সংস্কার দূরে রাখিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ভিন্ন মতের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না, তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার শাসননীতির মুখ্য লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয় না। আকবর যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, সে যুগের শাসকগণ এবং মনীষিগণের মধ্যে তিনি অনেক-বেশী অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইহা তাঁহার প্রতি কার্য্যে পরিস্ফুট ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের নানা জাতিকে তিনি একই জাতীয়তা-সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণ ভূভাগে নানা জাতীয় এবং নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক থাকিবেই। তাহারা যদি পরস্পর পরস্পরের উপর বিদ্বিষ্ট বা পরস্পরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে দেশের লোকের পক্ষে,—ইহার স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইবে না। ইহাও তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ ভেদবুদ্ধিদীর্ণ জনসমাজ কখনও আপনাকে স্বাধীন রাখিতে সমর্থ হয় না। ঐরূপ ভেদবুদ্ধি শাসিত প্রজার পক্ষে উন্নতি-সাধক নয়, শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষেও কল্যাণকর নয়। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিত না; তাহাদের যেরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল, তদনুসারে তাহারা বিধর্ম্মীদিগের উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিল। যে সকল মুসলমান বীর ভারত-বিজয়ে প্রলুব্ধ হইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই ধর্ম্মভাবে প্রভাবিত ছিল, তাহা নয়। অধিকাংশ বিজেতাই ভারতের ধনরত্ন-লোভে লুণ্ঠনের জন্য ভারত আক্রমণ করিত। পাঠানগণের অবস্থাও ছিল ঐরূপ; মোগল বিজেতাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল না।

আকবরের পিতামহ বাবর তাইমূর-বংশ-সম্ভূত। তাইমূর যে বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার পর এই বংশের কেহ কেহ তাঁহাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের কিছু কিছু বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মৃত্যুর পর সে সব বিজিত রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষিত হয় নাই। যেখানে শাসিত প্রজার সহিত শাসকবর্গের আন্তরিক যোগ না থাকে, যেখানে কেবল অর্থ-লোভে মানুষ কোন পক্ষে যোগ দিয়া দেশ লুণ্ঠন করে,—সেখানে কোন মতেই স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাইমূরের প্রপৌত্র আবু সৈয়দ এইরূপ একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবু সৈয়দের পুত্র উমার সেখ মির্জ্জার অংশে পড়িয়াছিল ফারগণা অঞ্চল। এই উমার সেখ মির্জ্জাই ছিলেন বাবরের পিতা।

কয়েক বার চেষ্টার পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। জন-নায়ক হিসাবে সামরিক ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষ প্রকাশ পাইলেও রাজ্যগঠন-কার্য্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ভারতে তাঁহার রাজত্ব শুধু চার বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্য-গঠনের প্রতিভা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের রাজত্ব-কাল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। প্রথমে তিনি দশ বৎসর (১৫৩০-৪০) পরে এক বৎসর কাল মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পনেরো বৎসর কাল তিনি নির্ব্বাসনে কাটাইয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি পারদর্শী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু অহিফেন-সেবী ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না। কাজেই তিনি শাসনযন্ত্র-গঠনে কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

প্রথম আমলে আকবর তাঁহার মনের উদার ভাব প্রকটিত করিতে পারেন নাই। তখন তিনি অন্যান্য মোগল সর্দ্দারদিগের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। পরে ফতেপুর শিক্রির ইবাদৎখানায় পাদ্রী রোডলফ, একোয়াবিভার বক্তৃতা শুনিয়া এবং বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া আকবর বলিয়াছিলেন—"আমি অনেক ব্রাহ্মণকে আমার শক্তিতে ভীত করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার মানসনেত্র সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে,—এখন শক্তির অহমিকা ও সংস্কারের ঘনকৃষ্ণ মেঘ এবং কুহেলিকা অপসৃত হওয়ায় আমি বুঝিতেছি, বিনা-প্রমাণে এক পদ অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। পরিষ্কার বিচার-বুদ্ধিতে যাহা ভালো মনে হয় সেই পথ অবলম্বন করিলেই মঙ্গল।" কথাগুলি আবুল ফজল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্লকম্যান বলিয়াছেন, আকবর জোর করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি যখন বৈরম খাঁর নেতৃত্বাধীনে ছিলেন, তখন হয়ত তাঁহার সম্মতি লইয়া ঐরূপ সঙ্কীর্ণতাসূচক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল! কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-দত্ত বিচারবুদ্ধি বিকশিত হইলে তিনি উদার সকল

অবলম্বন করেন। অবশ্য ফৈজী এবং আবুল ফজলের সাহচর্য্যে তাঁহার বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেখ মুবারক ছিলেন সেখ ফৈজির এবং সেখ আবুল ফজলের পিতা। শেখ মুবারক আরব দেশের সেখ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক জন রাজপুতানায় নগর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তিনি মুঘল ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং নিজ পুত্রদ্বয়কে উহা বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ফলে যে সকল ধর্ম্মান্ধ মুসলমান শিক্রির ইবাদৎখানায় তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আসিতেন, তাঁহারা সহজেই উঁহাদের বিচারে পরাভূত হইতেন। কাজেই আকবর ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আকবরের স্বভাবসিদ্ধ উদারতা সেখ আবুল ফজলের ভ্রাতাতে সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অন্য কোন মুসলমান শাসক যে আকবরের ন্যায় পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নয়। কাশ্মীরের মুসলমান শাসক জৈন উল আবাদীনও পর-মত-সহিষ্ণুতা বিশেষরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। সে জন্য ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ বলিতেন যে, জৈন উল আবাদীনের মৃত্যু হইয়াছে এবং এক জন হিন্দু সন্ন্যাসীর আত্মা তাঁহার মৃতদেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আকবর সম্বন্ধেও এইরূপ কথা আছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে হিন্দু সাধু ছিলেন,—পরজন্মে আকবর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

আকবর বাদশাহ যে কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহা নয়; সকলকে সর্ব্ববিষয়ে সমান দৃষ্টিতে দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কঠোর হস্তে গোহত্যা এবং অনিচ্ছুক নারীদিগের সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগকে শাসক জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে দিতেন না; এবং সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন।

সেই জন্য কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন যে, আকবর বাদশাহ নিখিল ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সকল কথা সত্য। কিন্তু এইটুকু বলিলেই আকবরের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিবৃত হয় না। আকবর চাহিয়াছিলেন দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রগত জাতীয়তার (National feeling) অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোকের সবই আছে, নাই কেবল দু'টি জিনিষ—দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তার অনুভূতি। এ দেশের জনসাধারণ—কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্থপতি শ্রমিক প্রভৃতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা কল্পনা করিত না। পরাধীনতা বিশেষ অনিষ্টকর মনে করিত না। রাজ্য লইয়া স্বদেশী ও বিদেশীরা সংগ্রাম করিতেছে—তাহারা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইত। তাহারা বুঝিত, যে রাজা হইবে তাহাকেই কর দিবে। মুসলমান বিজেতারা, বিশেষতঃ পাঠান বিজেতারা ঠিক শাসক ছিল না। তাহারা বড় বড় সহরে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া সৈন্য-সামন্তসহ অবস্থান করিত-এবং গ্রাম্য লোকের নিকট হইতে নিম্নপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কর আদায় করিত। সহরের লোকরাই তাহাদের অত্যাচার সহিতে বাধ্য হইত, গ্রাম্য লোকেরা তাহা বড় ভোগ করিত না। কাজেই তাহাদের সেই অধীনতা দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই।

বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও আর্থিক শোষণ মনুষ্য জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলে। ভারতে সেরূপ পরকীয় শাসন কস্মিন্‌কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাই ভারতবাসীর মনে নিবিড় দেশাত্মবোধ জাগে নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন; আলাউদ্দীন খিলিজীর ন্যায় ধর্ম্মান্ধ শাসকের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জ্জরিত হিন্দু প্রজারা তাঁহারই আমলে পরাজিত হইয়াও পরে একতাবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ রাজ্যের প্রনষ্ট স্বাধীনতা উদ্ধার-কল্পে যুদ্ধ করিয়া আবার নষ্ট-স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে গুজরাট, চিতোর, দেবগিরি প্রভৃতি অঞ্চল স্বাধীন হইয়া ওঠে। সেই সময়ে আলাউদ্দীন ভগ্নহৃদয় হইয়া দেহত্যাগ করেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়াই আকবরের মনে ধারণা জন্মায় যে, এই বিস্তীর্ণ দেশের লোকের মনে দেশ-শাসন ব্যাপারে রাজনীতিক জাতীয়তা বুদ্ধি না জাগিলে এ দেশ দুর্ব্বল রহিবে এবং নানা লুণ্ঠনকারী সর্দ্দারদিগের ক্রীড়াভূমি হইয়া থাকিবে। উহা কখনই সবল দেশ হইবে না। সেই জন্য তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবধান দূর করিয়া যথাসাধ্য সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই রাজনীতিক জাতীয়তা (Nationality) কাহাকে বলে? আকবরের সময় উহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লোকের মনে জাগিয়াছিল কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, দেশের শাসন-পদ্ধতির ও শাসনযন্ত্রের উপর ঐকান্তিক মমত্ববুদ্ধিই জাতীয়তার বনিয়াদ। জাতীয়তা রাষ্ট্রের অনুগামী। সেই জন্য বিখ্যাত রাজনীতিক লেখক ব্লুণ্টশিলি (Bluntchile) বলিয়াছেন—No State, no Nation। যেখানে রাষ্ট্র নাই,—সেখানে জাতিও নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, রাষ্ট্র কাহাকে বলে? অধ্যাপক সিজুইক ষ্টেট-অর্থে বলিয়াছেন যে, একই শাসন-যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত পরস্পরে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট মানব-সমাজকেই রাষ্ট্র বলে।* রাষ্ট্রের উপর মমত্ব-বুদ্ধিই জাতীয়তার প্রবল বন্ধন। ইহা একটা অনুভূতি। যেখানে সে অনুভূতি নাই, সেখানে রাষ্ট্র নাই, জাতীয়তাও নাই। সবই কেবল কথার কথা—অর্থশূন্য বাক্য।

---

* I think, therefore, that what is really essential to the modern conception of a State which is also a Nation is meraly that the persons composing it should have a consciousness of belonging to one another by, of being members of one body, over and above what they derive from the mere fact of being under one Government, so that if their government were destroyed by war or revolution, they would still hold firmly together. When they have this consciousness we regard them as forming a 'Nation' whatever else they may lack. Henry Sidwick—The Elements of Politics, chap. 14

এখন কেহ কেহ বলিবেন যে, যে-কালে আকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-কালে এই ভারতের লোকের পক্ষে রাজনৈতিক জাতীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতেই পারে না! বিশেষ আকবরের মত লোকের মনে সেরূপ জাতীয়তা-বুদ্ধি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আকবর যে এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের সমসাময়িক লোকদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় বুঝিতে পারেন। সেই জন্য অনেক বিষয়ের ধারণা বৈজ্ঞানিকদিগের মনে উদিত হইবার পূর্ব্বে কবিদিগের মনে ভাবের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে। যাঁহারা প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সে কথা স্বীকার করিবেন। আকবরের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের পক্ষে রাজনীতি-ক্ষেত্রে জাতীয়তার কথা মনে জাগা অসম্ভব নয়। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক তদানীন্তন ভারতের শাসন-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট এবং পরস্পরের প্রতি মমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হন, সে জন্য আকবর সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের লোককে যোগ্যতানুসারে রাজ-সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে পাঠান এবং মোগলরাজগণ পারতপক্ষে হিন্দুদিগকে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আকবর সে দুষ্টনীতি পরিহার করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি শত পনেরো জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন ছিলেন হিন্দু। তিনি যোগ্যতা দেখিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেন। ভগবান দাস, টোডরমল্ল, মানসিংহ, বীরবল প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী লোকদিগকে বাছিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা আকবরের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। ইঁহাদের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি মুসলমান রাজসরকারে তৎপূর্ব্ব কস্মিন কালে নিযুক্ত হন নাই। আকবর গোমাংস ও পলাণ্ডু ভোজন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, জোরোষ্ট্রিয়ান বা পার্শী সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভেদের রেখা যত কম হইবে, নিবিড় ভাবে মিলনের পথ ততই প্রশস্ত হইবে, জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পথও তত পরিষ্কার হইবে। তিনি দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থান্ধ লোকেরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদের কারণ জাগাইয়া রাখে। সেই জন্য তিনি সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া তাউদি ইলাহি বা স্বর্গীয় ধর্ম্ম নামে এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম তাঁহার প্রভাবপুষ্ট হইলেও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে গৃহীত হয় নাই। তিনি রাজা, দেশের ভূসম্পত্তির অধিকারী, এ কথা স্বীকার করিতেন না। তিনি চাষী প্রজার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে রাজকর লইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। এই ব্যবস্থার আদি প্রবর্ত্তক শের শাহ। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাহার কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। প্রজারা ইচ্ছামত বা তাহাদের সুবিধা মত বাজার দরে টাকায় বা ফশলে কর দিতে পারিত। অজন্মা হইলে তিনি চাষী প্রজাদিগকে রাজ-কোষ হইতে শস্যের বীজ দান করিতেন। আবশ্যক হইলে হলকর্ষী বলীবর্দ্দও দিতেন। তিনি প্রতি জিলাতেই সরকারী পশু রাখিতেন; ঐ সকল পশু ও খাদ্যশস্য প্রজাদিগের নিকট হইতে তিনি করস্বরূপ পাইতেন। দুর্ভিক্ষ হইলে ঐ সকল সরকারী ভাণ্ডার হইতে প্রজাদিগকে খাদ্যশস্য দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল সরকারী কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত থাকিত। ভূমি-সম্পত্তিতে সরকারের নির্ব্যূঢ় অধিকার নাই,—প্রজা এবং উত্তরাধিকার স্বত্বে স্বত্ববান ব্যক্তিদিগের অধিকার আছে,—ইহা বলায় প্রজাসাধারণ সন্তুষ্ট হইয়াছিল। রুশিয়াতে লেনিনের প্রথম আমলে হলকর্ষক প্রজাদিগকেই ভূস্বামী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, পরে সে ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া দেওয়া হয়। এখন সেখানে 'একজাই' ভাবে জমির ফশলের ভাগ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনী আকবরীতে লেখা আছে যে আকবর প্রতি বিঘা ভূমি হইতে রাজপ্রাপ্য হিসাবে দশ সের করিয়া গম প্রভৃতি ফশল লইতেন! সেই জন্য সে সময়ে চাষী প্রজার অবস্থা খুব ভালই হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আকবরের সময় জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল? এ সম্বন্ধে মিষ্টার ডবলিউ, এইচ মোরল্যাণ্ড India at the Death of Akbar নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি তিনটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(১) সে সময় উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা অধুনাতন ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর লোকের অবস্থা অপেক্ষা ভাল ছিল। তাঁহারা বেশ জাঁক-জমকের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

(২) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলির আর্থিক অবস্থা অনেকটা বর্ত্তমান সময়ের মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থার অনুরূপ ছিল, কিন্তু জনসাধারণের তুলনায় তাহাদের আনুপাতিক সংখ্যা অনেক কম ছিল।

(৩) নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখনকার ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করিত। তাহারা তৎকালে অধিক খাইতে পাইত কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলিতে না পারা গেলেও তৎকালে তাহাদের বসন এবং আসন (তৈজসপত্র) কম ছিল।

আমরা মোরল্যাণ্ডের এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তাঁহার কতকগুলি কথায় আপত্তি করিয়াছিলেন। উহা Indian Journal of Economics-এ প্রকাশিত হয়। আমরা এ প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা করিব না। তবে মোটের উপর বলিতে পারি যে, তখনকার জনসাধারণের তুলনায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সংখ্যা অল্প ছিল, এ-কথা সত্য নয়। তখন সমাজে শিল্পী ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, কারবারী ছিল এবং তাহারা সংখ্যায় অনেক অধিক ছিল। তখন শিল্পকার্য্যে ও ব্যবসায়ে বহু লোক আত্মনিয়োগ করিত, সুতরাং তখন মধ্যবিত্ত সমাজে লোক অধিক ছিল।

তখন সাধারণ লোক এখনকার সাধারণ লোকের ন্যায় এত অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিত না! এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাপড়ের এত প্রয়োজনও ছিল না। লোকে তখন ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটিত; তাঁতি জোলার সংখ্যা অধিক ছিল, তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত। কাজেই বস্ত্রের বিশেষ অভাব ছিল না! তখন খাদ্যশস্য সুলভ ছিল; সকলেই স্বচ্ছন্দে খাইতে পাইত। নদীতে তখন মাছ ছিল, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গোশালা ও গাভী ছিল; দেশে জঙ্গল অধিক ছিল বলিয়া গাভী পুষিতে অতি দরিদ্রেরও কষ্ট হইত না। তখন গাভী দুগ্ধবতী ছিল। কারণ

করিত না ; মৎস্য অধিকাংশ লোক বিনামূল্যে ধরিয়া খাইত। এখনকার মত দেড় টাকা দুই টাকা সের দরে কিনিতে বাধ্য হইত না। সুতরাং তখনকার লোক সংসার-যাত্রা অতি সহজে নির্ব্বাহ করিত। তবে মহামারী হইলে লোক তখন অধিক মরিত এবং স্থান-বিশেষে অজন্মা হইলেও লোক অধিক মরিত—কারণ, তখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় শস্য লইয়া যাওয়া এখনকার মত এমন সহজ ছিল না। নদীবহুল বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা সম্ভব হইলেও অনেক অঞ্চলে তাহা হইত না। ফলে মোটের উপর তখন নিম্নস্তরের লোকের অবস্থা এখনকার নিম্নস্তরের লোকের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। তখন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ছিল না। গৃহস্থেরা তখন ঘরে ঘরে অতিথি-সেবা করিত,—অন্ন দিতে কেহ কাতর হইত না। এখন লোক যেরূপ ভুষি-মিশ্রিত আটা এবং কুঁড়া ও কাঁকর মিশ্রিত সরকারের দয়াদত্ত চাউল খাইতে বাধ্য হইতেছে, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তাহা খাইবার কল্পনাও লোক করিতে পারিত না। আকবরের আমলে যুদ্ধ কম হয় নাই। কিন্তু এমন দুরবস্থাও লোকের কখনও হয় নাই। সত্য বটে, এখন সামরিক পদ্ধতির ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু নানা দেশ হইতে তেমনি খাদ্য আমদানীর অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে।

জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব জাগাইবার জন্য আকবর বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সে চেষ্টায় কতকটা সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ে বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পৌত্র শাহজাহান যদি তাঁহার নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রুশিয়া সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর লোকের মনে যেমন জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতেও তাহা জাগিয়া উঠিত। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিধাতার বিধান—ভারতবাসীর পাপের ফল। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যদি আকবরের প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইতেন এবং ঔরঙ্গজেবের পরিবর্ত্তে দারা যদি দিল্লীর সিংহাসনে বসিতেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহা হইলে অন্যরূপ হইত! সমগ্র মুসলমান শাসনকালের মধ্যে আকবরের আমলেই ভারতবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দেশের লোকের অন্নচিন্তা ছিল না—দস্যুভয় অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল, সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনে রাষ্ট্রীয় জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। বর্ত্তমান সময়ে শাসকদিগের মধ্যে সেরূপ প্রতিভাশালী জননায়ক আবির্ভূত হইলে ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

ছোটদের আসর

বম্বে-পর্ব্ব

(গল্প)

৪০ নম্বর হর্ণবি রোড, বম্বে। বিরাট অট্টালিকা। দোতলায় সাইনবোর্ড আটকানো—"হীরালাল রতনলাল, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ্‌স্।" আপিসের ঘরগুলি অতি-আধুনিক কায়দায় সজ্জিত। ফার্নিচার, কার্পেট, টেলিফোন কিছুরই অভাব নেই। আপিসে ঢুকলেই সম্ভ্রম-বিশ্বাসের ভাব মনে জাগে।

হীরালাল এবং রতনলালের বয়স বেশী নয়। দু'জনেই ছোকরা। সৌম্যদর্শন, মুখে-চোখে বুদ্ধির ছাপ। বোম্বাইয়ে নতুন এসে আপিস খুলে বসেছে। প্র্যাক্‌টিস কি রকম জমেছে বলা শক্ত, তবে আপিসের রূপ আর সজ্জা দেখে মনে হয় বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে। প্রায়ই "বম্বে ক্রনিকলে" এবং অন্যান্য কাগজে বিজ্ঞাপন বার হয়—"হীরালাল রতনলাল, প্রাইভেট ডিটেকটিভস্। যদি কারো মনে সুখ না থাকে, যদি কেউ কোন বিপদে পড়ে থাকো তবে এ আপিসে এসে মনের কথা খুলে বললেই সকল অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ফী অত্যন্ত অল্প।"

এক দিন সকালের ঘটনা। আপিসে এক মক্কেল এসেছে। নমস্কারাদি সেরে আগন্তুককে চেয়ারে বসিয়ে হীরালাল জিজ্ঞেস করলে—"আপনার বক্তব্য জানতে পারি?"

আগন্তুক রোগা এবং লম্বা। মুখে-চোখে যেন ভীতির ভাব। হাতের আঙুল মটকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—"আপনার নামই হীরালাল আলুওয়ালা?"

হীরালাল হেসে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ইনি আমার সহকারী রতনলাল দুধওয়ালা।"

"আপনারাই তো বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, যদি কারো মনে সুখ না থাকে, যদি কেউ বিপদে পড়ে থাকে তো আপনাদের কাছে আসবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেখুন, আমার মনে সুখ নেই। আমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি। তাই বিজ্ঞাপন দেখে ভাবলুম একবার আপনাদের কাছে আসি।"

"ঠিকই করেছেন। যদি ব্যাপারটা খুলে বলেন—"

"মানে, ব্যাপার খুব ডেলিকেট্। আপনাকে যদি বলি—মানে, অতি গোপনীয় কি না—"

বাধা দিয়ে হীরালাল বললে—"যদি আমাকে বিশ্বাস না করতে পারেন তাহলে বলবেন না। আমাদের ব্যবসার গোড়াকার কথাই হলো—বিশ্বাস। অনেকের অনেক গোপন্ কথাই আমাদের শুনতে হয়। তা প্রকাশ করা বা কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করা ব্যবসায় নীতি-বিরুদ্ধ। আমাদের পেশা গোয়েন্দাগিরি করা,—ব্ল্যাকমেল্ করা নয়।"

অপ্রস্তুত হয়ে জিভ কেটে আগন্তুক বললে—"না, না, আমি তা বলছি না। আপনাকে দেখে অবধি আমার মন বলছে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। আপনি নিশ্চয় আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।"

"এ বিশ্বাস যদি আপনার মনে জেগে থাকে, তাহলে আর ইতস্ততঃ না করে ব্যাপারটা খুলে বলুন। কোন কথা গোপন করবেন না। তা হলে আমাদের পক্ষে আপনাকে সাহায্য করা অসম্ভব হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে আগন্তুক বললে,—"না, আপনাকে সব কথাই খুলে বলি! এক জন কাউকে না বলতে পারলে দম বন্ধ হয়ে আমি মারা যাব।"—এই কথা বলে পকেটে হাত পূরে একটা বটুয়া বার করলে। আর সেই বটুয়া থেকে বেরুলো সুদৃশ্য অপূর্ব্ব একটি হীরের হার। কি প্রকাণ্ড সব হীরে! দেখলে চোখ ঝল্‌সে যায়। যেমন সাইজ, তেমনই কাটিং! হারটি আগন্তুক হীরালালের হাতে দিল।

হীরালাল হারটিকে নেড়ে চেড়ে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বললে—"চমৎকার হার, প্রথম শ্রেণীর হীরে। একেবারে নিখুঁত। দাম হাজার চল্লিশেরও বেশী হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এটি আমার নয়। আমি—মানে, যদিও ঠিক চুরি করিনি, কিন্তু কার্য্যত: একে চুরিই বলতে হবে বই কি!"

হীরালাল একটু বিস্ময়ের ভাণ করে বললে—"তাই না কি!"

আগন্তুক লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল! একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"লোভে পড়ে একটা কাজ করে ফেলেছি, এখন পস্তাছি! ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি। আমি পরলোকমণ্ডির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। আমার নাম ঘনশ্যামদাস চনচনিয়া। মহারাজ কিছু দিন থেকে বম্বেতেই আছেন। তাই তাঁর ইচ্ছা, ক'টি বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যাঙ্কে রাখবেন।"

"এ তো খুবই ভাল কথা।"

"কিন্তু আমার হয়েছে মুস্কিল। ব্যাঙ্কে পাঠাবার আগে তাঁর খেয়াল হয়েছে কোনো পাকা জহুরীকে দিয়ে প্রত্যেকটি গহনার দাম কষিয়ে ইনসিওর করে তার পর ব্যাঙ্কে জমা দেবেন।"

"বেশ তো! এতে আপনার মুস্কিলের কি আছে?"

"সবটা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। মাস-খানেক আগে দু'-একটি হীরে খুলে যেতে তিনি আমাকে বম্বের বিখ্যাত জহুরী ঘীসামল ঘসীটামলের দোকানে হারটা সারিয়ে দেবার জন্য দিয়ে আসতে বলেন। দোকানের কাছ-বরাবর গিয়ে দেখলুম দোকান তখনও খোলেনি, দু'টোর পর খুলবে। অন্যমনস্ক ভাবে এ-দিক ও-দিক বেড়াচ্ছি হঠাৎ মাথায় কেমন দুর্ম্মতি জাগলো। কিছু টাকার ছিল ভয়ানক প্রয়োজন। চারিধারে দেনা। রেশে অনেক টাকা খুইয়েছি। ভাবলুম, এক কাজ করলে কি হয়—যদি ঠিক এই রকম একটা নকল হীরের হার করিয়ে দিয়ে আসলটা বিক্রী করি, তাহলে সব দিক দিয়েই সুরাহা হয়; অথচ কেউ জানতে পারে না। কিম্বা বিক্রী না করে যদি এখন কোন জহুরীর কাছে বাঁধা রাখি পরে রেশে জিতলে আবার হারটা ছাড়িয়ে নিবো,—তাহলেও মন্দ হয় না। মোট কথা, যে রকম করে হোক টাকার জোগাড় করতেই হবে। অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব চললো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যা হয়ে থাকে—কুমতিরই জয় হলো। মহারাণীর গলায় গিয়ে উঠলো নকল হীরের হার আর জহুরীর সিন্দুকে স্থান পেল মহারাজের আসল হার। হ্যাঁ, কেরামতি বলতে হবে! নকলে-আসলে কোন পার্থক্য নেই। জহুরী ছাড়া কারো সাধ্য নেই ধরে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল!"

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে হীরালাল বললে—"বটেই তো! হুবহু একরকম না হলে মহারাজ তো ফাঁকি ধরে ফেলতেন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু সেই থেকে মনটা ভারী খারাপ যাচ্ছে। সব সময়ই ভয় করে বুঝি ধরা পড়ে গেলুম! কাল রেশে অনেক টাকা জিতেছি। আজ হারটা ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা আপনার কাছে এসেছি। হারটা কোন উপায়ে বদল করে দিতে চাই। বিবেকের এ তাড়না আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

হীরালাল বললে—"এক কাজ করুন না। আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভালো প্ল্যান। মহারাজাকে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলে হারটা ফেরত দিন। মন হাল্কা হবে, বিবেকও শান্ত হবে। কি বলেন?"

বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ হীরালালের দিকে চুপচাপ চেয়ে থেকে ঘনশ্যামদাস বললে—"কি বলছেন আপনি! মহারাজাকে আপনি চেনেন না। চিনলে বুঝতে পারতেন, যা বলছেন তা করা অসম্ভব। এমনিতে তিনি বেশ ভালো মানুষ, কিন্তু যদি কেউ তাঁকে ঠকায় তা'হলে তিনি ক্ষেপে যান। যদি জানতে পারেন এত দিন মহারাণী নকল হার পরেছিলেন তা হলে কি আমাকে রক্ষা রাখবেন? সেই মুহূর্ত্তে আমায় জেলে দেবেন।"

চিন্তিত ভাবে হীরালাল বললে—"তাই তো! তা হলে আমায় কি করতে বলেন?"

"আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। যদি আপনি রাজী হ'ন তো বলি। অবশ্য আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।"

"প্ল্যানটা না শুনে আগে থাকতে মতামত দিই কি করে?"

"বেশ, প্ল্যান শুনুন। গহনাগুলো ব্যাঙ্কে পাঠাবার আগে মহারাজের ইচ্ছা কোনো জহুরীকে দিয়ে ভ্যালুয়েশন্ করিয়ে নেবেন। এ কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। সুতরাং জহুরী ডাকবার ভার আমার উপরেই পড়বে। সেই সময় আপনি জহুরী সেজে যাবেন। তার পর—"

"তার পর হারটা বদলে দেবো—কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। দেখুন, আপনি রাজী আছেন?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হীরালাল বললে, "কাজটা ঠিক আমাদের লাইনের নয়। তবে আপনি এক জন সজ্জন ব্যক্তি—বিপদে পড়েছেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে চান—এ ক্ষেত্রে আমার রাজী হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু ফীটা একটু বেশী দিতে হবে।"

ঘনশ্যাম দাস হেসে বললে—"ফীর জন্য ভাববেন না। উঃ! আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা আর কি বলবো! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন। তা আপনাকে কত দিতে হবে, বলুন?"

"এক হাজার টাকা।"

"এই নিন্ পাঁচশো। কাজ হাসিল হলে বাকী পাঁচশো পাবেন। আজ তবে উঠি।"—এই কথা বলে হীরালালের হাতে পাঁচশো টাকার নোটের তাড়া গুঁজে দিয়ে ঘনশ্যামদাস উঠে দাঁড়ালো!

হীরালাল বললে—"হারটা আমার কাছেই থাক্। কি বলেন?"

ঘনশ্যাম উত্তর দিলে—"বেশ তো! আপনাকে যখন এতটা বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললুম, তখন হারটা আপনার কাছে থাকবে, এ আর এমন বড় কথা কি! আচ্ছা নমস্কার! দু'-এক দিনের মধ্যেই আপনাকে খবর দেবো।"

নমস্কার করে ঘনশ্যাম দাস ঢনঢনিয়া বেরিয়ে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই হারটা পকেটে নিয়ে হীরালালও আফিস ত্যাগ করলে।

* * * *

দিন তিনেক পরের কথা। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ৪০ নম্বর হর্ণবি রোড বম্বের বিরাট অট্টালিকায় "হীরালাল রতনলাল, প্রাইভেট ডিটেকটিভসের" আপিসে হীরালাল অস্থির ভাবে পদচারণা করছে, এমন সময় রতনলাল এসে উপস্থিত হলো। হীরালাল প্রশ্ন করলে—"টিকিট পেয়েছ?"

রতনলাল উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, দু'খানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছি। ট্রেন সাড়ে আটটায়।"

"গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছ?"

"হ্যাঁ! রাস্তার মোড়েই ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড। এক জনকে ঠিক করে দু' টাকা বায়না দিয়ে এসেছি।"

"ফার্ণিচার, কার্পেটওয়ালাদের বলে এসেছ তো?"

"হ্যাঁ। বিল চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। তারা কাল সকালে সব নিয়ে যাবে।"

"বেশ। আমি পাশের ঘরে সুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। মনে রেখো, ইসারা করলেই—কুইক আক্‌শন্। যেন আওয়াজ না করতে পারে!"

"সে ঠিক হয়ে যাবে। সাতটা বাজে। এখনও তো মক্কেলের দেখা নেই।"

"কিছু ভেবো না। ঠিক আসবে। ঐ পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।"

দ্বারে ঘনশ্যামদাস ঢনঢনিয়াকে দেখা গেল। হীরালাল বললে—"আসুন, আসুন ঘনশ্যাম বাবু! অনেক দিন বাঁচবেন। এই আপনার কথা হচ্ছিল! অন্য দিন এতক্ষণ আমরা আপিস বন্ধ করে চলে যাই। আজ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। বসুন।"

আসন গ্রহণ করে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলে—"কাজটা হাসিল হয়েছে তো?"

"নিশ্চয়। যে কাজ হবে না, সে কাজে আমি হাত লাগাই?"

"মেকী হারটা আমাকে দিন তাহলে!"

"দিচ্ছি। আমার ফী?"

"নিশ্চয়। এই নিন পাঁচশো টাকা। এটা আমার কাছ থেকে পেলেন। আর এই পাঁচশো টাকা মহারাজা দিয়েছেন। দাম-যাচাইয়ের পারিশ্রমিক!"

নোটের তাড়া পকেটে পূরে হীরালাল একটি এটাচী-কেস খুলছে, এমন সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটলো। রতনলাল লাফিয়ে গিয়ে ঘনশ্যামদাসের মুখ চেপে ধরলো। অমনই হীরালাল ঘনশ্যামদাসের মুখে রুমাল পূরে আচ্ছা করে বেঁধে দিলে। ব্যাপারটা এত আকস্মিক এবং এমন অপ্রত্যাশিত যে, ঘনশ্যামদাস বাধা পর্য্যন্ত দিতে পারলো না। দেখতে দেখতে ঘনশ্যামের হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। তার পর একটা খুব ভারী চেয়ারে বসিয়ে দু'জনে মিলে চেয়ারের সঙ্গে এমন ভাবে পিচমোড়া করে বাঁধলো যে নড়বার তার আর এতটুকু শক্তি রইল না। এটাচী-কেস থেকে হার বার করে টেবিলের উপর রেখে হীরালাল বললে—"এই আপনার হার। যেটা দিয়েছিলেন, সেইটেই। আপনি আমাকে এত বেকুব মনে করেন যে ঝুটো হীরের হারকে আমি আসল মনে করবো! আপনি চেয়েছিলেন আমাকে দিয়ে মহারাণীর আসল হারটা বাগিয়ে নেবেন। কিন্তু খুব দুঃখের কথা যে আপনার জন্য হারটা বদলে দিতে পারলুম না। যাই হোক, আশা করি, আপনার বিবেক শান্ত হয়েছে। আমরা এবার চললুম। কাল সকালে লোক আসবে ফার্নিচার নিয়ে যেতে। তারা আপনাকে খুলে দেবে। আজ রাতটা একটু কষ্ট করুন। এত দিন বিবেকের তাড়না সহ্য করেছেন একটা রাত না হয় দেহের যাতনা সহ্য করবেন! আচ্ছা, নমস্কার।"

হীরালাল এবং রতনলাল দু'জনে দু'টো স্যুটকেশ হাতে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * * *

বম্বে মেল হু-হু করে চলেছে। একটা ফার্ষ্ট-ক্লাস কামরায় মাত্র দু'জন যাত্রী। এক জন প্রশ্ন করলে—"তার পর? লাভ কি হলো?"

আর এক জন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে তিন তাড়া পাঁচশো টাকার নোট বার করে দেখাল। প্রথম যাত্রী বললে—"দেড় হাজার টাকা! বম্বে থাকতে এর চেয়ে অনেক বেশী খরচ হয়ে গেছে। এ যাত্রা সুবিধা হলো না।"

দ্বিতীয় যাত্রী একটু হেসে পকেট থেকে হীরের একটি হার বার করলে। যেমন জ্যোতি, তেমনই দ্যুতি! অপূর্ব্ব! প্রথম যাত্রী বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে—"মানে?"

দ্বিতীয় যাত্রী উত্তর দিলে—"পরলোকমণ্ডির মহারাণীর কণ্ঠহার! ঘনশ্যামদাসের নকল হারের অনুরূপ আর একটি নকল হার তৈরী করিয়ে মহারাণীর গলায় দুলিয়ে দিয়ে এসেছি। ঘনশ্যাম-দাসের কিছু বলবার উপায় নেই। অবশ্য মহারাজা নিজেও জানতে পারবেন না। কালই গয়নাগুলি ব্যাঙ্কে চলে যাবে। হারটা ব্যাঙ্কে পচতো, তা না হয়ে আমার কাছে রইলো। এতে আর মহারাজের ক্ষতি কি? কি বলো?"

প্রথম যাত্রীর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথা বার হলো না। একেবারে থ' হয়ে গেছে! একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"ব্রাদার, তুমি একটি জিনিয়াস!"

বম্বে মেল হু-হু করে চলেছে। যাত্রী দু'জন? কৌতুহল স্বাভাবিক। এরা একটু আগে বম্বেতে ছিল হীরালাল আর রতনলাল—এখন কিন্তু সলিল সেন ও গগন গুপ্তে রূপান্তরিত হয়েছে। পরণে কোঁচানো ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী,—তার উপর জরীর ধাক্কা দেওয়া উড়্‌নী—পায়ে নিউ-কাট্—কে চিনবে হীরালাল আর রতনলাল বলে'!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম্-এ)

—

হাতে-কলমে

গত বছরের কথা। বোমার ভয়ে অনেকে তখন কলিকাতা-সহর ছাড়িয়া পলাতক! আমরা ক'ঘর কলিকাতায় আছি,—পলায়নের উপায় ছিল না। এখানে কাজকর্ম্ম করিতে হয়—তার উপর কোথায় পলাইব?

সন্ধ্যার পর সেদিন এক বন্ধুর গৃহে গিয়াছিলাম—তিনিও সপরিবারে কলিকাতায় ছিলেন।

গিয়া দেখি, বাড়ী অন্ধকার। হুলস্থুল ব্যাপার! ইলেকট্রিক লাইন ফিউজ! বাড়ীর লোক দু'মাইল ঘুরিয়া মিস্ত্রী পায় নাই!

বাড়ীর কেহ জানে না নষ্ট-লাইনের মেরামতী হয় কি করিয়া! বাড়ীতে দু'টি ডাগর ছেলে—একটি বি-এ পাশ; অপরটি আই-এ। তারা ইলেকট্রিক-লাইনের খবর রাখে না—কলেজের পড়ায় অথচ দুই ছেলেই দিগ্‌গজ!

ও-কাজ একটু-আধটু জানা ছিল। মই আনাইয়া লাইন মেরামত করিয়া দিলাম। বাড়ীতে আলো জ্বলিল। লোকে প্রাণ পাইয়া বাঁচিল!

এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ঘর করিতে গেলে ঘরের খুঁটিনাটী কতকগুলা কাজ জানিয়া রাখা উচিত। কথায়-কথায় মিস্ত্রী ডাকিতে

১। ফোঁটা ফেলা

গেলে পরের উপর বড় বেশী নির্ভর রাখিতে হয়। বেশী পর-নির্ভরতায় স্বাচ্ছন্দ্য মেলে না! তোমাদের বলি, এগ্‌জামিনে শুধু ফার্ষ্ট হইলে চলিবে না—তাহাতে জীবনে পয়সা ও সম্মান মিলিতে পারে; কিন্তু নিত্য দিনের সংসার-যাত্রায় অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে প্রচুর। দাসী-চাকরের উপর যাঁরা সব বিষয়ে নির্ভর করেন,

২। সার্শি সাফ্‌ করা

দাসী-চাকরের অভাবে অপদার্থতার গ্লানি কতখানি তাঁদের ভোগ করিতে হয়! কেন পরের উপর সব বিষয়ে নির্ভর করিব? তাহাতে নিজের বুদ্ধির মর্য্যাদা থাকে না!

এই-যে সার্শির কাঁচ, আয়নার কাচ মাঝে মাঝে ঘোলাটে হয়—স্বচ্ছতার উপর ময়লা পড়িয়া কাচগুলা শুধু কদর্য্য দেখায়, তা নয়; রক্ষা করা যায়—ঘোলাটে কাচকে স্বচ্ছ নির্ম্মল করা যায়—যদি একটু পরিশ্রম করো। কাচ যদি ময়লা ঘোলাটে হয়, তাহা হইলে প্রথমে জল দিয়া ধুইয়া ফ্যালো; তার পর পাথরের বা কাচের পাত্রে এক

পাঁইট জল ঢালিয়া লইয়া তাহাতে মিশাও দু' আউন্স হাইড্রোক্লোরিক (মুরিয়াটিক) এসিড। জলে এসিড ঢালিবে ফোঁটায় ফোঁটায় ১নং ছবির পদ্ধতিতে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঘাঁটাঘাটি করিবার সময় সাবধান—রবারের দস্তানায় হাত ঢাকিবে—নহিলে

৩। চেয়ার সাফ্‌ করা

হাতে ফোস্কা হইতে পারে। তাছাড়া জামা-কাপড়েও যেন এ এসিড না লাগে—লাগিলে পুড়িয়া যাইবে! জলে আর্শি বা আয়নার কাচ ধুইবার পর হাইড্রোক্লোরিক লোশনে ন্যাকড়া বা তোয়ালে ভিজাইয়া তাহা দিয়া ২নং ছবির রীতিতে
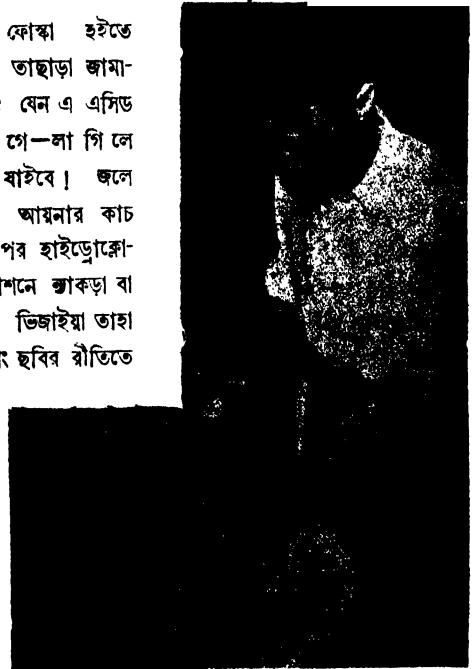
৪। বেশিন সাফ্‌

ঘষিয়া কাচ সাফ করো। তার পর খড়ির খুব মিহি গুঁড়া জলে ভিজাইয়া কাচের গায়ে তাহারি প্রলেপ লাগাইয়া রাখো-

নরম গ্যাকড়া ঘষিয়া সে প্রলেপ মুছিয়া লও—কাচ হইবে নূতনের মত ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ।

চেয়ারে সোফার কৌচে পোকা হয়—ছারপোকা হয়। সে সব পোকা ও ছারপোকা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা বলি। এক আউন্স প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন, চার পাইট এগারো আউন্স এথিলিন ডাইক্লোরাইড এবং এক পাইট ন' আউন্স কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ডাক্তারখানা হইতে কিনিয়া আনিয়া একসঙ্গে একটি পাত্রে মিশাও। তার পর যে টিনের পিচকারীতে ভরিয়া ফ্লিট দেওয়া হয়—সেই পিচকারীতে কিম্বা কাচের পিচকারীতে ঐ মিশ্র-দ্রাবক ভরিয়া চেয়ার কৌচ বা সোফায় ছিটাইয়া ছিটাইয়া সর্বত্র দাও—এ দ্রাবকে অগ্নি ভয় নাই, কৌচে সোফায় দাগ ধরিবারও ভয় নাই। ৩নং ছবি দেখিয়া ঐ ছবির ভঙ্গীতে মিকশ্চার ছিটাও। এ মিকশ্চার বর্ষণে পোকা-ছারপোকার ঝাড় মরিবে।

৫। বইয়ে রুটি ঘষা

যাদের বাড়ীতে মুখ-হাত ধুইবার জন্য বেশিন আছে, তাদের উচিত সে বেশিন নিত্য না হোক সপ্তাহে দু'বার করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া সাফ করা। সাফ করিবার জন্য এমন দ্রাবক চাই যে-দ্রাবকের রোগ-বীজাণু ধ্বংস করিবার সামর্থ্য আছে। জলে ফেনাইল মিশাইয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে বেশিন ঘষিয়া মাজিয়া সাফ করিবে—তার পর মক্ষি ব্রাণ্ড সাবান ঘষিয়া ধুইয়া লইলে বেশিন্ হইবে বেদাগ এবং ঝক্‌ঝকে!

শেলফে বই সাজাইয়া রাখো—সে সব বই ঝাড়া-মোছা করো? নিত্যদিন ঘষিয়া সাফ করিলেও বইয়ের গায়ে ধূলা জমে—তার ফলে পাতার ডগাগুলা কদর্য্য ময়লা হয়। নিত্য ঝাড়ন্ দিয়া শেলফের বই ঝাড়া উচিত, তার উপর মাসে দু'দিন অন্তত—নিয়ম করিয়া শেলফ হইতে প্রত্যেকখানি বই পাড়িয়া মলাটের মধ্যে যে পত্রপ্রান্ত ধূলায় ময়লায় ভরিয়া থাকে, ঝাড়ন দিয়া ধুলা ময়লা ঝাড়িয়া ৫নং ছবির রীতিতে পত্রপ্রান্তভাগে পাঁওরুটীর নরম শাঁস ঘষিবে; পাতার ময়লা প্রান্তগুলি সাফ হইবে—ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকিবে।

বুদ্ধি শাণানো

কথাটা শুনলে মনে হবে, বুঝি অসম্ভব রূপকথা! কিন্তু আসলে তা নয়।

দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে যেমন দেহের ব্যায়াম প্রয়োজন, তেমনি বুদ্ধিকে শাণিয়ে প্রখর করতে হলে মনের ব্যায়াম-সাধনা করতে হবে। ছোট বয়সই হলো মনের ব্যায়াম-সাধনার পক্ষে প্রশস্ত সময়। মনের যে-ব্যায়ামে বুদ্ধি প্রখর হয়, সে-ব্যায়ামে খেলার আনন্দ পাওয়া যায় অনেকখানি, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও প্রচুর লাভ হয়। ক্লাশের পড়াশুনা শেষ করে সকলে দল বেঁধে যেমন খেলার মাঠে নামো ফুটবল-হকি-ক্রিকেট-ডাংগুলি খেলতে, তেমনি এ ব্যায়াম-খেলাতেও সকলে মিলে যদি দল বেঁধে নামো, তাহলে ইংরেজীতে যাকে বলে স্মার্ট বা চৌখশ হওয়া, সেই 'স্মার্টনেশ' আয়ত্ত করতে পারবে।

মনের ব্যায়াম-সাধনায় মনকে নানা দিকে নিয়োজিত করতে পারা যায়।

ধরো, দল জড়ো হয়ে বসলে—দলে আছে চারু, চুনী, মতি, নবীন আর প্রিয়। প্রিয় বললে—এসো, আজ আমরা দল বেঁধে কবিতা রচনা করি। বসন্ত সম্বন্ধে কবিতা। এই ভূমিকার পর প্রিয় বললে—আমি বলছি কবিতার প্রথম লাইন—"আসিল বসন্ত আজ শীত হলো শেষ!" এ লাইনটি বলে প্রিয় বললে চারুকে—তুমি দ্বিতীয় লাইন বলো। চারু বললে—"নব রূপে সাজে ধরা ফেলি জীর্ণ বেশ।" তার পর চুনীর পালা। চুনী বলবে তৃতীয় লাইন। চুনী বললে—"জীর্ণ পাতা খশে পড়ে তরুশাখা হতে।" মতি বললো চতুর্থ লাইন,—"গীত-গন্ধ-বর্ণ হলো উদয় জগতে।" এমনি করে একটি বিষয়কে ছন্দ মিলিয়ে ছত্রে-ছত্রে ফুটিয়ে তোলায় মনের ব্যায়াম সংসাধিত হয়। এ ব্যায়ামে আমাদের কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়; আমরা ভাবতে শিখি; প্রকৃতির রাজ্য সন্ধান করে বসন্তের যে-বৈশিষ্ট্য, সেটুকু সংগ্রহ করতে শিখি। শুধু বসন্ত কেন—ধরো, মনের ব্যায়াম-সাধনায় যেমন বসন্ত বর্ণনা করেছো, তেমনি ক'বন্ধুতে মিলে বসে দেশের দুর্দ্দিনের ছবি আঁকো এমনি ভাষায় ছন্দে! এ ব্যায়ামে অনেকের কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হবে। শুধু কবিতা কেন, এমনি করে ক'জনে মিলে গল্প রচনা করতে পারো। শুধু রচনা কেন, ধরো স্কুলের পাঠ্য-গ্রন্থ—পড়ছো মার্চেণ্ট অফ ভেনিসের গল্প। অবসর-সময়ে ক'বন্ধুতে মিলে ভাগাভাগি করে ঐ গল্পটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করো—এতেও মনের ব্যায়াম হবে। এ ব্যায়ামে স্মরণ-শক্তি প্রখর হয়!

এ ছাড়া কোনো সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করতে পারো—ডিবেটিং ক্লাবে যেমন কোনো নির্দ্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়—তাতেও মনের ব্যায়াম সম্পাদিত হয়। সে ব্যায়ামের ফলে চিন্তাশক্তি বাড়ে—যুক্তি-তর্ক করবার সামার্থ্য লাভ হয়; এবং লাজুকতা বা **shyness** অথবা মুখচোরা-ভাব থেকে মুক্তি পেয়ে কথাবার্তায় পটু হতে পারবে।

কোনো দিন বা সকলে বসে বড় বড় কবির কাব্য থেকে দু'-এক ছত্র বলে প্রশ্ন তুললে—কার লেখা, বলো? ধরো কবিতার ছত্র বলা হলো—"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!" কার লেখা? দু' সেকেণ্ডের মধ্যে জবাব চাই! জবাবে তোমরা বললে, রবীন্দ্রনাথের "দুই বিঘা জমি" কবিতার ছত্র! শুধু বাংলা কবিতা কেন, প্রশ্ন হলো **All the world's a stage** কার লেখা? উত্তর হলো, সেক্সপিয়রের লেখা।

এতে কি হয়, জানো? জ্ঞানের প্রসার বাড়ে! মনোযোগিতা প্রখর হয়, ক্ষিপ্র হয়।

এমনি ভাবে ইতিহাসের সাল-তারিখ, দেশের কঠিন সমস্যাদি, বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত—গল্পচ্ছলে আনন্দের মধ্য দিয়ে মনে গেঁথে বসবে! তার উপর নিত্য মনের এ ব্যায়াম-সাধনায়—যে ছেলেকে মাষ্টার-মশাইরা **dull-headed** বা 'গাধা' বলে লাঞ্ছিত করেন, সে সব ছেলের বুদ্ধিও শাণ পাবে, বুদ্ধি খুলবে! একটা কথা জেনে রেখো, হাত পা পেশী থাকতেও দৌর্ব্বল্য-হেতু অনেকে যেমন সে সব যথারীতি ব্যবহার করতে পারে না, অকর্ম্মণ্য হয়—তেমনি বুদ্ধি থাকতেও মনের ব্যায়ামের অভাবে অনেকে নির্ব্বোধ এবং মূর্খ হয়। দেহের ব্যায়ামে শক্তি-সামর্থ্য যেমন বাড়ে, মনের ব্যায়ামেও তেমনি বুদ্ধি খোলে—বাড়ে।

বিজ্ঞান-জগৎ

বমার-প্লেনে নৌ-বাহিনীর বল

এ যুগে প্লেনের শক্তির কাছে নৌ-বাহিনীর শক্তি তুচ্ছ হইয়াছিল; অথচ নৌ-বাহিনীকে তুচ্ছ করিলে যুদ্ধ-জয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। এই কারণে বহু গবেষণায় আমেরিকা নৌ-শক্তির

ফ্লোট-লাগানো লড়ায়ে প্লেন

সঙ্গে বিমান-শক্তি সংযুক্ত করিয়াছে। নৌ-শক্তি বাড়াইতে মার্কিণ রণতরী-বিভাগ বিশেষ পদ্ধতিতে ১৫০০০ প্লেন তৈয়ারী করিয়াছে। এই ১৫০০০ প্লেন যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আটলাণ্টিক ও প্যাসিফিক সাগরে মার্কিণ শত্রু-দলনে সমুদ্যত রহিয়াছে! এ সব

প্যাহারাদার প্লেন
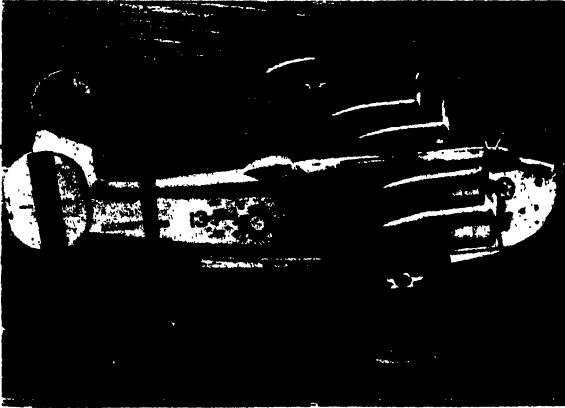
প্লেনের সঙ্গে 'ফ্লোট' সংলগ্ন আছে। ফ্লোটের সাহায্যে বিপুল তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত সাগরবক্ষে এ প্লেনগুলি অনায়াসে যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তার উপর আছে পেট্রল-বমার-প্লেন,—এ প্লেনগুলি আমেরিকার সমুদ্রোপকূল-প্রদেশে প্যাহারাদারী করিতেছে। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের বুকে মঞ্চ তৈয়রী করিয়া সেই মঞ্চের উপর প্যারাশুট-বাহিনী ও বমার বহন করিয়া যুদ্ধ-জাহাজ সাগর-বক্ষে পাড়ি দিতেছে। শত্রুর সন্ধান মিলিবামাত্র এ-সব বমার নিমেষে যুদ্ধ-জাহাজ হইতে শূন্য-পথে উড়িয়া যায়; এবং শত্রুর জাহাজ লক্ষ্য করিয়া সজ্জ প্যারাশুট-বাহিনী ঝাঁপ দিয়া সে-জাহাজ আক্রমণ করে। ইহার উপর যুদ্ধ-জাহাজগুলিকেও আজ অসংখ্য অতিকায়-কামানে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত
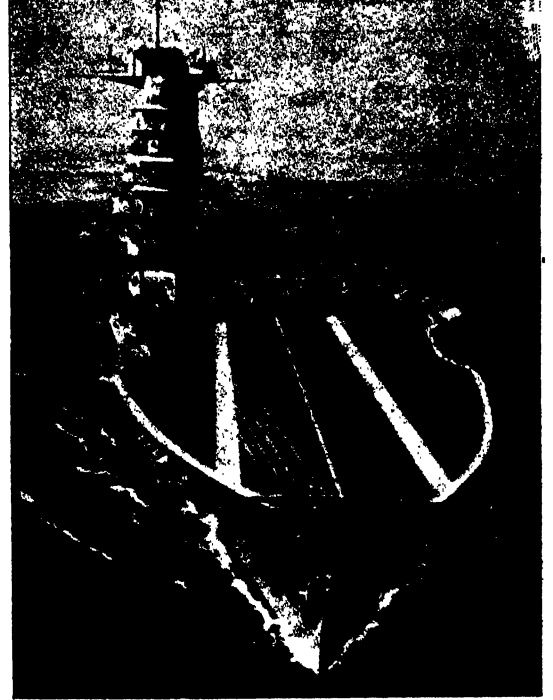
এ জাহাজে চলে বমার ও প্যারাশুট-বাহিনী

যুদ্ধ-জাহাজে অতিকায় কামান

করা হইয়াছে। সে সব কামানের শক্তি অমোঘ, লক্ষ্য অব্যর্থ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

যুদ্ধের ফটোগ্রাফ

যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর জাতির ভাগ্য ও জীবন নির্ভর করিতেছে—সে জন্য যুদ্ধ-রত জাতিসমূহের আন্তরিকতার সীমা নাই! জীবন-

মুক্ত গবাক্ষ-পথে ক্যামেরা

পণ যুদ্ধ করিলেও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আমেরিকার বিরাম নাই! এ গবেষণার জন্য চাই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা। যুদ্ধের

• কতকগুলি ক্যামেরা

বিভিন্ন পর্য্যায় প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে এক দল বাহিনী নিযুক্ত আছে। প্রাণের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধের ফটো তুলিয়া বেড়ানোই তাদের কাজ। ইহাদের জন্য আছে স্বতন্ত্র ছাঁদের প্লেন; সেই প্লেনে চড়িয়া প্লেনের মুক্ত গবাক্ষ-পথে ক্যামেরা বসাইয়া ইহারা যুদ্ধের প্রতি স্তরের চলচ্চিত্র তুলিতেছে। এ ছবি তোলার জন্য যে সব ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়, সে গুলিতে খুব জোরালো টেলি-ফটো-লেন্স সংলগ্ন আছে। এই ক্যামেরায় রাত্রে নিউ-ইয়র্ক সহরের যে ফটো তোলা হইয়াছে, পাশের ছবি দেখিলে ক্যামেরার শক্তি-সামর্থ্য নিমেষে বুঝিতে পারিবেন। শূন্যপথ হইতে

রাত্রে নিউইয়র্ক

ফটো তোলার এ-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন মার্কিণ ফৌজ-বিভাগের অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল জর্জ্জ গডার্ড। এ ক্যামেরার সাহায্যে বহু ঊর্দ্ধ শূন্যলোক হইতে প্রতি সেকেণ্ডে আট-দশখানি ফটো পর্য্যায়ক্রমে তোলা যায়!

—

দূরকে করিল নিকট-বন্ধু

সেকালে যে সব ফৌজ যুদ্ধ করিতে দূরদেশে যাইত, তারা যেমন ইচ্ছামাত্র দেশের খবর পাইত না, দেশের লোকও তেমনি জানিতে পারিত না তাদের ভাগ্যে কি ঘটিতেছে! এখন এ বৈজ্ঞানিক যুগে ফৌজকে যত দূরেই পাঠানো হোক, প্রতি নিমেষের খবরা-খবর পাইতে এতটুকু অসুবিধা ঘটে না। জার্ম্মা-

ছাউনিতে পৌছিয়াই তার খাটায়

নিতে গিয়া মিত্রপক্ষ যদি কিছু করে, সে খবর তখনি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, এ-কাজ সহজসাধ্য হইয়াছে টেলিফোনের সুব্যবস্থায়। দূরে ফৌজ গিয়া ছাউনি ফেলিবামাত্র চকিতে টেলিফোনের তার খাটাইয়া ছাড়িয়া-আসা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ গড়িয়া তোলে। প্রধান কেন্দ্রের সঙ্গে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির সংযোগ থাকে টেলিফোন-লাইনে। ফৌজের সঙ্গে স্বতন্ত্র ট্রাকে করিয়া টেলিফোন-বাহিনী চলে টেলিফোনের

সরঞ্জামপত্র লইয়া; যাইতে যাইতে বরাবর তারা লাইন খাটাইয়া যায়। কাজেই ছাউনিতে পৌছিবামাত্র খবরের লাইনও নিমেষে গড়িয়া ওঠে। টেলিফোনের এ লাইন না খাটাইতে পারিলে অসহায়তার সীমা থাকে না। কারণ, যারা অগ্রসর হইয়া গেল, তাদের ভাগ্যে কি

চলিতে চলিতে টেলিফোনের লাইন পাতে

ঘটিল, না জানিলে প্রধান-কেন্দ্রস্থিত সামরিক-বিভাগকে অন্ধকারে হতভম্ব থাকিতে হয়! তাহার ফলে বিপর্য্যয়-পরাজয় ঘটা বিচিত্র নয়। টেলিফোন-বিভাগের কাজ শিখাইবার যে-ব্যবস্থা, তাহা নিখুঁৎ। যুদ্ধ না করিলেও এ বিভাগের দক্ষতার উপর জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে।

ঘোড়া টানে মোটর-গাড়ী!

পরিহাস নয়,—সত্য কথা! এখানে নয়, ফ্রান্সে। পেট্রোলের দারুণ অভাব। রেশনিংয়ের কল্যাণে বেসামরিক অধিবাসীদের মোটর-

ঘোড়ায়-টানা মোটর-গাড়ী

ফটো হইতে ছেলের মুখ

গাড়ী গেরাজে পড়িয়া পচিতেছে—কা কস্য পরিবেদনা! ফ্রান্সে অনেকে ঐ মোটর-গাড়ীর সামনের অংশটুকু কাটিয়া বাদ দিয়াছেন—বদলে দিবী সামনের দিকে আঁটিয়াছেন 'কম্‌পাশ'। সেই কম্‌পাশে ঘোড়া জুতিয়া তাঁরা গাড়ীকে সচল করিয়া গাড়ীর প্রাণ বাঁচাইয়া নিজেদের পথ-চারণাকে স্বচ্ছন্দ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রে খোদকারি

চিত্রাঙ্কনে যাঁদের তেমন কুশলতা নাই, তাঁরাও যাহাতে অনায়াসে এবং নিখুঁৎ ভাবে কাঠের গায়ে ছবি কুঁদিয়া তুলিতে বা কাঠের মূর্ত্তি গড়িতে পারেন, তৎকল্পে মার্কিণ শিল্পীরা কাঠে মডেলের প্রতিলিপি মুদ্রণাদির জন্য এক-রকম যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। এ যন্ত্র বৈদ্যুতিক-শক্তিতে চলে। কাঠের গায়ে ছবি রাখিয়া এই যন্ত্র-সাহায্যে কাঠে সে-ছবির প্রতিলিপি নিখুঁত ভাবে তোলা যায়। তার উপর যন্ত্রে বাড়তি-অংশ যোগ করিয়া তাহার সাহায্যে ফটোগ্রাফ বা চিত্রাদি হইতে প্রতিলিপি ফেলিয়া কাঠ কাটিয়া চমৎকার মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈয়ারী করা চলে। শুধু কাঠ নয়; কাচ, অন্যান্য ধাতু বা প্ল্যাষ্টারেও এ যন্ত্র-সাহায্যে চিত্র-প্রতিলিপি তোলা বা মূর্ত্তি প্রভৃতি গড়িয়া তোলা চলে। নীচে ছাপা দু'খানি ছবি দেখিলে বুঝিবেন, এ যন্ত্র-সাহায্যে ঐ ছেলেটির ফটো হইতে কাঠে কি চমৎকার মুখ কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে—কাঠের ফুলদানী, প্ল্যাষ্টারের পুতুলও কি চমৎকার তৈয়ারী হইয়াছে!

ফুলদানী ও প্রতিমূর্ত্তি

টুপির মাথায় টুপি

বোমার শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ কামানে যে সমারোহের সৃষ্টি হইয়াছে, তা জোরে শত্রুর বমারের স্বেচ্ছাচারিতায় অনেকখানি বাধা পড়িয়াছে। এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ কামানের গোলাগুলী চূর্ণাবশেষে ঝরিয়া পড়িলে আমাদের অঙ্গহানির ও মরণের ভয় আছে অথচ বোমারু আসিয়া দেখা দিলে মার খাইতে-খাইতে সে বহু ক্ষতি সমাধা করিয়া যায়; বহু লোককে আহত ও নিহত করে। যারা আহত হয়, তাদের পরিচর্য্যা এবং অগ্নি-নির্ব্বাণ প্রভৃতির জন্য রক্ষী প্রহরীদের এবং শুশ্রূষা-কারীদের বিপদের মুখে কাজ করিতে হয়; সে সময় বর্ম্মাবরণে নিজেদের সুরক্ষিত রাখিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ! রক্ষী-প্রহরী-ফৌজ—সকলকে যথাসম্ভব নিরাপদ

সে হ্যাটে মাথা বাঁচানো সম্ভব হইলেও ঘাড়-পিঠ বাঁচানোর সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। এ জন্য মার্কিণ ফৌজ-বিভাগ হেলমেটের উপরে আর-একটি হেলমেট চড়াইয়া বিপত্তির আশঙ্কা লঘু করিয়াছে।

দোতলা-হেলমেট্

এই ডবল-হেলমেট মাথায় আঁটা থাকিলে ট্রেঞ্চের পুরোবর্ত্তী ফৌজদল, রক্ষী-প্রহরী এবং ট্যাঙ্ক-বাহিনী অনেকখানি নিরাপদ থাকিবে।

ফুল তোলা

গাছে ফুল ফোটে; সে ফুল না তুলিলে আমাদের তৃপ্তি নাই! কেহ ফুল তোলেন দেবদেবীর পূজার কামনায়; কেহ তোলেন সাজ-

লাঠিতে সাজি গোঁজা

সজ্জা বা বিলাস-সুখের জন্য! গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ফুল তোলা—ঠিক নয়। তাহাতে গাছের অনিষ্ট ঘটে! ফুল তোলা উচিত—কাঁচি দিয়া ডাল হইতে ফুলটি কাটিয়া। এক হাতে সাজি লইয়া ফুল তুলিতে গেলে হাত জোড়া থাকে—কাজেই অপর হাতে কাঁচি চালাই কি করিয়া? এ সমস্যার সমাধান হয় যদি ঐ ছবির ভঙ্গীতে টুকরি বা সাজির বুক ফুঁড়িয়া লাঠি চালাইয়া সেই লাঠি মাটিতে পুঁতিয়া রাখি; তাহা হইলে সাজি নিরাপদ থাকিবে এবং দুই হাত খালি থাকিলে কাঁচি চালাইয়া সযত্নে সতর্ক ভাবে বোঁটা কাটিয়া ফুল তুলিয়া সাজিতে রাখা চলিবে। এ ভাবে রাখিলে ফুল যেমন হাতের ছোঁয়া বাঁচাইয়া তাজা থাকিবে, ফুল তোলার কাজ হইবে তেমনি সহজ; এবং গাছের কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না।

ব্যাটারি-ট্রলি

কালিফোর্ণিয়ায় জল-সরবরাহ-বিভাগে পরিশ্রমের অন্ত নাই! তার কারণ, সমগ্র প্রদেশে জল-সরবরাহের জন্য পাহাড়ের গা কাটিয়া অসংখ্য টানেল তৈয়ারী করিয়া সেই সব টানেলের মধ্য দিয়া শত-শত মাইল-ব্যাপী পাইপ চালানো হইয়াছে। এই সব পাইপ নিত্যদিন পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হয়—কোথায় পাহাড়ের পাথর খশিয়া

জীপ্-ট্রলি

পাইপ ভাঙ্গিল বা অকর্ম্মণ্য হইল—সর্ব্ব সময়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এক-একটি টানেল অমন পঞ্চাশ মাইল লম্বা—কোনো টানেল মাথায় খাটো। সে-সব টানেলের মধ্য দিয়া চালানো সহজ হয় এমনি ছোট ছোট ট্রলি তৈয়ারী করা হইয়াছে। এ ট্রলির নাম 'জীপ'। 'জীপে' তিনখানি করিয়া ছোট রবারের চাকা আছে; দু'টি জোরালো ব্যাটারি-যোগে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া এ জীপ চালানো হয়। গাড়ীর সামনে আছে দু'টি জোরালো সার্চ-লাইট। জীপ-ট্রলি চলে ঘণ্টায় পনেরো মাইল রেটে। এক-একখানি গাড়ীতে তিন জন করিয়া লোক স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিতে পারে। এই ট্রলির কল্যাণে সরবরাহ-বিভাগের পরিদর্শন-কার্য্য বেশ সহজ হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থরচনার কৌশল

কিরূপ প্রণালীতে এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এই বার তাহার আলোচনায় প্রয়াস পাইতেছি। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের এই রচনা-প্রণালী না জানিতে পারিলে সূত্রার্থ বুঝিতে নানারূপ অসুবিধা হইবার কথা। অধিক কি, ইহা না জানিলে নানারূপ সংশয় ও ভ্রমের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ জন্য এ স্থলে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচনা-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

গ্রন্থরচনার কৌশল

প্রথম কৌশল—এই গ্রন্থটির সূত্রাকারে রচনা। যে হেতু দেখা যায়, এই গ্রন্থটি কতকগুলি সূত্রের দ্বারা রচিত। সেই সূত্র বলিতে অল্প কথায় বহু অর্থের সংক্ষেপে সমাবেশ বুঝায়। সূত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

অর্থাৎ যাহাতে খুব অল্প অক্ষর থাকে, যাহার অর্থে কোন সন্দেহ জন্মে না, যাহা সারবৎ, যাহা বহু অর্থের প্রকাশক, যাহা অস্তোভ অর্থাৎ নিরর্থকশব্দশূন্য এবং যাহা অনিন্দনীয় বাক্য, তাহাই সূত্র। ইহাই সূত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। এ জন্য সংক্ষেপে বহু অর্থের প্রকাশ করা এই ব্রহ্মসূত্র রচনার একটি কৌশল। আর এই কারণে পূর্ব্বসূত্রে যে পদাদির দ্বারা যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা আর পরসূত্রে উল্লেখ করা হয় না। পরসূত্রে সেই পদাদির অনুষঙ্গ করিয়া লইতে হয়, যেমন প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" ইহাতে ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তী সূত্র যে "জন্মাদ্যস্য যতঃ", তাহাতে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলিবার কালে আর "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ করা হইল না। সেখানে বলা হইল—"যাহা হইতে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়"—এইমাত্র। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য পূর্ণ হয় না, এ জন্য প্রথম সূত্র হইতে "ব্রহ্ম" পদটি লইয় সূত্রটিকে পূর্ণ করা হইল,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ তদ্ ব্রহ্ম," অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হয়, তাহাই ব্রহ্ম। এইরূপ বহুসূত্রে সংক্ষেপের অনুরোধে পূর্ব্বসূত্র হইতে বিশেষ বিশেষ পদের অনুষঙ্গ করিয়া সূত্রার্থ করিতে হইবে—ইহা এই ব্রহ্মসূত্র রচনার একটি কৌশল। ইহার ফলে গ্রন্থোক্ত যাবতীয় বিষয় সহজে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা যাইতে পারিবে।

দ্বিতীয় কৌশল—এই গ্রন্থের অধ্যায় ও পাদাদির বিভাগ। গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থে চারিটি অধ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ, এবং প্রত্যেক পাদে কতকগুলি অধিকরণ বা বিচার, এবং প্রত্যেক অধিকরণ বা বিচারে এক বা একাধিক সূত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইরূপ চারিটি অধ্যায়ে ষোলটি পাদে ১৯১টি অধিকরণে ৫৫৫টি সূত্র সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে ইত্যাদি।

অধ্যায়-বিভাগে ব্যাসদেবের কৌশল

অধ্যায় পাদ এবং অধিকরণ বিভাগের মধ্যে কিরূপ কৌশল আছে, তাহা দেখা যাউক। সেই কৌশলটি এই যে,—

(১) এই গ্রন্থ দ্বারা শ্রুতিবাক্যের মীমাংসা করা হইবে। কিন্তু যে সব শ্রুতিবাক্যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের কথা আছে, সে সব শ্রুতিবাক্যের মীমাংসার জন্য এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ রচিত নহে। তাদৃশ শ্রুতিবাক্য-সমূহের মীমাংসা মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা মধ্যেই করিয়াছেন, এ জন্য ইহাতে যে শ্রুতিবাক্য সমূহের মীমাংসা থাকিবে, তাহা অনিত্যফল কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যে নিত্যফল ব্রহ্মের ধ্যান ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য সমূহের মীমাংসা করা হইয়াছে। (২) পূর্ব্বমীমাংসার পর এই ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া এবং কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডের আবশ্যকতা হয় বলিয়া পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে শ্রুতিবাক্য-সমূহের মীমাংসার যে নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই নিয়ম ও পদ্ধতির যথাসম্ভব অনুসরণ করা হইবে। (৩) উক্ত নিয়মে প্রথম অধ্যায়ে যাবতীয় শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় বা তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইবে। আর এই জন্যই ইহাকে সমন্বয় অধ্যায় বলা হয়। ইহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ সাধন যে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহার মধ্যে প্রথম সাধন যে শ্রবণ, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রথম অধ্যায়োক্ত যে ব্রহ্মসমন্বয়, তাহার সহিত কোন মতবাদের বিরোধ নাই ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর তজ্জন্য ইহার নাম অবিরোধ অধ্যায় বলা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় সাধন যে মনন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইয়াছে। এই অবিরোধ প্রদর্শনের জন্য আবার দুইটি উপায় বা পথ অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমটি পরমতের বেদবিরোধিতা প্রদর্শন, এবং দ্বিতীয়টি পরমতের যুক্তির দোষ প্রদর্শন। যেহেতু যাহাতে বেদবিরোধিতা নাই এবং যুক্তিদোষও নাই, তাহাই স্বমত বা বেদান্ত মত। অর্থাৎ যাহারা বেদবিরোধী মত পোষণ করে, তাহাদের সহিত ব্রহ্মবাদীর বা বেদান্তীর কোনও বিরোধ নাই, অথবা যাহারা যুক্তিদোষ দুষ্ট মত পোষণ করে, তাহাদেরও সহিত ব্রহ্মবাদী বা বেদান্তীর কোনও বিরোধ নাই। ইহাই প্রদর্শন করা এই অবিরোধ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহাতে বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা নাই এবং যুক্তির দোষ নাই তাহাই ব্রহ্মবাদীর মত বা বেদান্তীর মত অথবা তাহাই নিজমত। ইহার ফলে বিচারের অঙ্গ যে স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষখণ্ডন তাহা সাধিত হইয়া থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম অধ্যায়ের বিষয় সমন্বয়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে বিষয় অবিরোধ, তাহার দ্বারা যে ব্রহ্ম নির্ণীত হন, সেই ব্রহ্মের জ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে শ্রুতিবিরোধ আপাততঃ বোধ হয়, তাহারই মীমাংসা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহার নাম সাধন-অধ্যায় বলা হয়। ইহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যে তৃতীয় অন্তরঙ্গ সাধন—নিদিধ্যাসন, তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে সহায়তা করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, তাহার ফল যে সাক্ষাৎকার সেই ফল বিষয়ে শ্রুতিবাক্য-সমূহের যে আপাত বিরোধ প্রতীত হয়, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। এ জন্য ইহার নাম ফলাধ্যায় বলা হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় আত্মা বা "আরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বেদান্ত-বাক্যের অনুসরণে এই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে। আর (৪) এই অধ্যায়-বিভাগের নিদর্শন জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে সূত্রপাদের পুনরুক্তি

করা হইয়া থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের শেষে যে সূত্রটি রচনা করা হইয়াছে, যথা—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এই সূত্রে ব্যাখ্যাতা পদের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা যেখানে অধ্যায় শেষ হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। তদ্রূপ চতুর্থ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেখানে শেষ সূত্রটির সমুদায়ই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। যেমন এই গ্রন্থের শেষসূত্রটি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইহাকে সমগ্র ভাবে পুনরুক্ত করিয়া গ্রন্থের শেষ ঘোষণা করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এইরূপে যে গ্রন্থশেষ জ্ঞাপন বা অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপন তাহাও উপনিষদ্ বা বেদান্তেরই অনুকরণে করা হইয়াছে। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের শেষজ্ঞাপনের জন্য "তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে, তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে" এই বাক্যাংশের পুনরুক্তি দেখা যায়। ইহাই হইল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের অধ্যায়বিভাগের মহর্ষি বেদব্যাসের একটি কৌশল।

পাদবিভাগে ব্যাসদেবের কৌশল

অতঃপর দেখা যাউক, প্রত্যেক অধ্যায়ের চারিটি পাদের বিভাগে মহর্ষি বেদব্যাসের কৌশলটি কি? ইহাতে দেখা যায়—

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদে—স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্মের বোধক যে সব শ্রুতিবাক্য তাহাদের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রুতি-মীমাংসা।

দ্বিতীয় পাদে—উপাস্য ব্রহ্মবাচক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রুতি-মীমাংসা।

তৃতীয় পাদে—জ্ঞেয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতি-বাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রুতি-মীমাংসা।

চতুর্থ পাদে—অব্যক্ত প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদমাত্রের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রুতি-মীমাংসা।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে—সাংখ্য, যোগ ও বৈশেষিকাদি স্মৃতিতে গৃহীত যুক্তিতর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক শ্রুতি-মীমাংসা।

দ্বিতীয় পাদে—সাংখ্যাদিমতের দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমত খণ্ডন পূর্বক বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ পরিহারমুখে শ্রুতি-মীমাংসা।

তৃতীয় পাদের—পূর্বভাগে পঞ্চ মহাভূতবিষয়ক শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ-পরিহার পূর্বক শ্রুতিমীমাংসা।

—উত্তরভাগে, জীববিষয়ক শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ পরিহার পূর্বক শ্রুতিমীমাংসা।

চতুর্থ পাদে—লিঙ্গশরীর বিষয়ক শ্রুতি সকলের বিরোধ পরিহার পূর্বক শ্রুতি-মীমাংসা।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে—জীবের পরলোকগমন বিচার পূর্বক বৈরাগ্য নিরূপণমুখে শ্রুতিমীমাংসা।

" দ্বিতীয় পাদের—পূর্বভাগে, ত্বং পদার্থের শোধনমুখে শ্রুতিমীমাংসা।

উত্তরভাগে তৎপদার্থের শোধনমুখে শ্রুতিমীমাংসা।

" তৃতীয় পাদে—সগুণ বিদ্যাতে গুণের উপসংহার দ্বারা এবং নির্গুণ ব্রহ্মে পুনরুক্ত দোষের উপসংহার নিরূপণমুখে শ্রুতিমীমাংসা।

" চতুর্থ পাদে—নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি বহিরঙ্গ-সাধন এবং অন্তরঙ্গ সাধনের নিরূপণ দ্বারা শ্রুতিমীমাংসা।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদে—শ্রবণাদির দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের এবং উপাসনা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারী জীবের পুণ্যপাপবিনাশরূপ মুক্তিবিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা।

" দ্বিতীয় পাদে—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রান্তি বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা।

" তৃতীয় পাদে—মৃত সগুণব্রহ্মজ্ঞের উত্তর মার্গসমন-বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা।

" চতুর্থ পাদের—পূর্বভাগে, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞের বিদেহ কৈবল্য বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা।

—উত্তর ভাগে, সগুণ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি বিষয়ক শ্রুতি-মীমাংসা।

ইহাই হইল, এই গ্রন্থের ষোলটি পাদের ষোলটি প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্মৃতিপথে রাখিয়া সূত্রার্থ করিলে সেই সূত্রার্থ মধ্যে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা অথবা অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা খুবই অল্প হইবার কথা। উপনিষৎ সমূহ হইতে কোন দার্শনিক মতের আবিষ্কার করিতে হইলে এই ক্রমেই মতপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সন্নিবেশ খুবই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুতঃ, তাহাই এ স্থলে অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে, শ্রুতিমীমাংসার মুখে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সন্নিবেশ করা বেদব্যাসের একটি কৌশল।

পাদবিভাগের কৌশল অংশতঃ অজ্ঞাত

কিন্তু অধ্যায়-বিভাগের চিহ্নের জন্য যেমন গ্রন্থ মধ্যে প্রথম তিনটি অধ্যায়ের শেষ তিনটি সূত্রের পদবিশেষের পুনরুক্তি দেখা যায়, পাদ-বিভাগের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস সূত্রমধ্যে সেরূপ কোন চিহ্ন রাখেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্যকার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচলিত পাদবিভাগই মান্য করিয়া গিয়াছেন। কেহই পাদবিভাগের অন্যথা করেন নাই। অধিকরণ-বিভাগের অন্যথা করিলেও পাদবিভাগের অন্যথা করেন নাই। এ জন্য মনে হয়—এই পাদারম্ভ ও পাদশেষ বুঝিবার জন্য কোন প্রকার ইঙ্গিত ছিল, তাহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণ জানিতেন; অথবা প্রাচীনের স্বীকৃত পাদবিভাগই পরবর্তী ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। পাদবিভাগের

উক্ত কোনরূপ ইঙ্গিত যদি না থাকে, তাহা হইলে সম্প্রদায়াগত শিক্ষাই এই পাদবিভাগের অবলম্বন বলিতে হইবে। পাণিনি ব্যাকরণে এক একটি প্রকরণ বা অধিকারের জন্য স্বরিত স্বরে সূত্রপাঠই অধিকরণ বা প্রকরণ বিভাগের ইঙ্গিত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এ স্থলে যে সেরূপ কিছু ছিল, না—তাহা বলা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও ভাষ্যকার বা ভাষ্যটীকাকার কেহই কিছু বলেন না। সূত্রকারও কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক, এই বিষয়টি অনুসন্ধানের যোগ্য। বলা বাহুল্য, ইহার জ্ঞান থাকিলে প্রত্যেক পাদের অন্তর্গত অধিকরণ বা বিচারগুলির অসঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যেমন যে পাদে পরমত খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য, সে পাদের যদি কোন অধিকরণে স্বমত স্থাপন করিয়া সূত্র ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ, এরূপ যে কোন কোন ভাষ্যে ঘটে নাই, তাহা নহে। ইহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব।

অধিকরণ-বিভাগে মতভেদ

এই বার দেখা যাউক, প্রত্যেক পাদের অন্তর্গত অধিকরণের বিভাগে, সুতরাং অধিকরণ রচনায় মহর্ষি বেদব্যাস কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, পাদবিভাগের নিয়মের ন্যায় অধিকরণ বিভাগের নিয়ম আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বহু বিভিন্ন ভাষ্যকারেরই এ বিষয়ে ঐকমত্য নাই। কারণ,—

শাঙ্করভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে			১৯১টি	অধিকরণ	আছে,
ভাস্কর ভাষ্যেও	„	„	১৯১টি	„	„
রামানুজ ভাষ্যে	„	„	১৫৬টি	„	„
মাধ্বভাষ্যে	„	„	২২৩টি	„	„
নিম্বার্ক ভাষ্যে	„	„	১৩১টি	„	„
শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যে	„	„	১৮২টি	„	„
শ্রীকর ভাষ্যে	„	„	১৭২টি	„	„
বল্লভ ভাষ্যে	„	„	১৬২টি	„	„

এইরূপ অপর প্রায় প্রত্যেক ভাষ্যেই অধিকরণ-বিভাগ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এখন অধিকরণগুলি এক একটি "বিচার" বলিয়া প্রায় সকল ভাষ্যকারের মতেই ব্রহ্মসূত্রের বিচারের সংখ্যা বিভিন্ন হইয়া পড়িল। আর তজ্জন্য তাহাদের বিষয়ও বিভিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ব্যাসদেব নিশ্চয়ই এ ভাবে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই একটি অর্থ লক্ষ্য করিয়া সূত্র রচনা করিয়াছিলেন।

অধিকরণ-বিভাগে ব্যাসদেবের কৌশল

কিন্তু তাহা হইলেও বহু অধিকরণেই সকল ভাষ্যই একমত হইয়াছেন, দেখা যায়। এই সকল একমতাবলম্বী ভাষ্য হইতে এই অধিকরণ বিভাগের একটা সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। এই চেষ্টা "ব্যাসসম্মতব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়:" গ্রন্থে কতকটা করা হইয়াছে। সেই নিয়মগুলের মধ্যে সর্বপ্রধান একটি নিয়ম এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

"যেখানে সূত্রমধ্যে প্রথমান্ত পদ থাকে, অথবা প্রথমান্ত পদ উহ্য থাকে, সেখানে অধিকরণ আরম্ভ হইয়া থাকে। অগত্যা তৎপূর্ব সূত্রে অধিকরণের শেষ হইয়াছে ইহাও বুঝা গেল।" ইত্যাদি।

যেমন "তৎ তু সমন্বয়াৎ" এই চতুর্থ সূত্রে "তৎ" এই প্রথমান্ত "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই পঞ্চম সূত্রে "অশব্দম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এখানে অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। অথবা যেমন "জন্মাদ্যস্য যত:" এই দ্বিতীয় সূত্রে "তদ্ ব্রহ্ম" এই প্রথমান্ত পদ প্রথম সূত্র হইতে অনুষঙ্গ করিতে হয় বলিয়া এই "জন্মাদ্যস্য যত:" এই সূত্রে দ্বিতীয় অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা হইলেও অপর বহু সূত্রে এত মতভেদ আছে যে, অধিকরণ আরম্ভের নিয়ম ঘোর তমসাচ্ছন্ন তাহা বলিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ হয় না। যাহা হউক, এই জাতীয় নিয়মগুলি অধিকরণের বিভাগ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেবের একটি কৌশল বলা যাইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক, অধিকরণের অবয়ব রচনা সম্বন্ধে মহর্ষি কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

অধিকরণাবয়ব রচনায় কৌশল

অধিকরণের রচনা সম্বন্ধে দেখা যায়—প্রত্যেক অধিকরণের ছয়টি অবয়ব মহর্ষির সম্মত। এই ছয়টি অবয়ব একত্র করিলে এক একটি অধিকরণ বা এক একটি বিচার সম্পূর্ণ হয়। সেই অবয়ব ছয়টি এই—

১। সঙ্গতি, ২। বিষয়, ৩। সংশয়,
৪। পূর্বপক্ষ, ৫। সিদ্ধান্তপক্ষ, এবং ৬। ফলভেদ।

এইবার দেখা যাউক, এই অবয়ব ছয়টির পরিচয় কিরূপ? এ স্থলে এই সঙ্গতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। এই সঙ্গতি নামক অবয়বটির আবার বহু প্রকার ভেদ আছে। যথা—

১। শ্রুতিসঙ্গতি, ২। শাস্ত্রসঙ্গতি, ৩। অধ্যায়সঙ্গতি,
৪। পাদসঙ্গতি, এবং ৫। অধিকরণসঙ্গতি।

এই অধিকরণসঙ্গতি আবার বহু প্রকার হয়, যথা—

১। আক্ষেপ-সঙ্গতি, ২। দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি বা উদাহরণ-সঙ্গতি, ৩। প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি, ৪। প্রসঙ্গ-সঙ্গতি ইত্যাদি।

ফল-ভেদটিও পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত ভেদে আবার দ্বিবিধ।

এইবার এই সঙ্গতি প্রভৃতি অবয়বগুলির পরিচয় কিরূপ তাহা দেখা যাউক—

(১) অধিকরণের প্রথম অবয়ব-সঙ্গতি পরিচয়

(১) প্রথম—শ্রুতি-সঙ্গতির অর্থ—শ্রুতির সহিত সম্বন্ধ। ইহার অনুরোধে এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে, প্রত্যেক পাদে, প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে শ্রুতির সহিত একটা সম্বন্ধ থাকিবে; অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত কোন না কোন বিষয়ের মীমাংসা থাকিবে। আর তজ্জন্য শ্রুত্যুক্ত বিষয় ভিন্ন কোনও বিষয়ই এই গ্রন্থের কোথাও আলোচিত হইবে না।

(২) শাস্ত্রসঙ্গতির অর্থ—শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ। সেই শাস্ত্র বলিতে এখানে ব্রহ্মবিচার শাস্ত্র বুঝিতে হইবে। ইহার অনুরোধে প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কথাই আলোচিত হইবে। ব্রহ্ম ভিন্ন বা তৎসক্রান্ত বিষয় ভিন্ন কোন বিষয়ই এই গ্রন্থের কোথাও আলোচিত হইবে না।

(৩) অধ্যায়-সঙ্গতির অর্থ—অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে একটা সম্বন্ধ। যেমন প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয়। এ জন্য এই অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক

থাকিবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অবিরোধ, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে যে সমন্বয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহার সহিত সাংখ্যাদি অন্য কোনও মতবাদের বিরোধ নাই—ইহাই প্রতিপাদন করা। সুতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে এই অবিরোধ প্রদর্শিত হইবে। তদ্রূপ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য সাধন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মীমাংসা, সুতরাং ইহার প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে উক্ত সাধন-বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা থাকিবে। এইরূপ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ফল, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের ফলবিষয়ক যাবতীয় শ্রুতিবাক্যের মীমাংসা। সুতরাং ইহার প্রত্যেক পাদে প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রত্যেক সূত্রে এই সাধনের ফল-বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসা থাকিবে। এই ভাবে এই গ্রন্থের সূত্রার্থ বুঝিলে সেই অর্থ সঙ্গত হইবে। ইহার ফলে এক অধ্যায়ের বিষয় অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে না। যেমন প্রথম অধ্যায়ের বিষয় যে ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতি-সমন্বয়, তাহা না করিয়া প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের বিষয় আলোচনা করিলে অসঙ্গত হইবে।

এইরূপ প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের একটি সঙ্গতি থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়-বিষয়িভাব নামক সঙ্গতি। যেহেতু, প্রথম অধ্যায়ে অভিহিত বিষয় যে সমন্বয় তাহার সহিত স্মৃত্যাদির বিরোধনিরসন এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে। তদ্রূপ—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের হেতুহেতুমদ্‌ভাব-সঙ্গতি। যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম-বিষয়ক সমন্বয় এবং অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় যে তত্ত্ব নির্ণীত হইল, তাহার লাভের জন্য যে সাধন আবশ্যক সেই সাধনের বিচার এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিপাদ্যটি হেতুস্থানীয় হয় এবং এই সাধনরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্যটি হেতুমদ্ অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট হয়। এ জন্য ইহাদের সঙ্গতির নাম হেতু-হেতুমদ্‌ভাব সঙ্গতি বলা হয়। তদ্রূপ—

তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত চতুর্থ অধ্যায়েরও হেতুহেতুমদ্‌ভাব সঙ্গতি হয়। কারণ, তৃতীয় অধ্যায়ে যে সাধন নিরূপণ করা হইয়াছে, এই চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার ফল নিরূপণ করা হইয়াছে। এ জন্য সাধনটি হেতুস্থানীয় হইতেছে এবং ফলটি হেতুমদ্ বা হেতুবিশিষ্ট বিষয়রূপ হইতেছে।

(৪) পাদসঙ্গতির অর্থ—প্রত্যেক পাদের যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা অল্প পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেমন প্রথম পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়—"স্পষ্টব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়",—সেই প্রত্যেক পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই সেই পাদের অন্তর্গত অধিকরণগুলির এবং সূত্রগুলির একটা না একটা সম্বন্ধ। ইহার ফলে এক পাদের যাহা আলোচ্য, তাহার মধ্যে অন্য পাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া অধিকরণ এবং তদন্তর্গত সূত্রের অর্থ করা যাইবে না। ইহার অন্যথা করিলে অপ্রাসঙ্গিক দোষ হইবে। বস্তুতঃ, এই অপ্রাসঙ্গিক দোষ কোন কোন ভাষ্য মধ্যে ঘটিয়াছে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদের আলোচ্য স্বপক্ষস্থাপন, অর্থাৎ অন্যের আক্রমণ হইতে স্বপক্ষের রক্ষা, এবং দ্বিতীয় পাদের আলোচ্য পরপক্ষখণ্ডন অর্থাৎ অন্য মতের দোষ প্রদর্শন। শাঙ্কর ভাষ্যে এবং ভাস্কর ভাষ্যে দেখা যায়—এই দ্বিতীয় পাদে "মহদ্দীর্ঘ" নামক দ্বিতীয় অধিকরণে আক্রমণের উত্তর দেওয়া হইতেছে, অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডন না করিয়া স্বপক্ষস্থাপন করা হইতেছে এবং অন্য সমুদায় অধিকরণে পরমতেরই খণ্ডন করা হইতেছে। কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে এই অধিকরণে পরমত খণ্ডনই করা হইয়াছে। সুতরাং পাদসঙ্গতির লঙ্ঘন শাঙ্কর ও ভাস্কর ভাষ্যে ঘটিতেছে, কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে সে দোষ ঘটিতেছে না। অবশ্য ইহার উত্তর শাঙ্কর মতে এই দেওয়া হয় যে, এই পাদের সমস্ত অধিকরণে নিষেধ বাচক কোন না কোন পদ থাকে, কিন্তু এই মহদ্দীর্ঘাধিকরণে তাহা নাই। অথচ ইহার পরবর্ত্তী অধিকরণে নিষেধ বাচক পদ আছে এবং অধিকরণারম্ভক চিহ্নও আছে। এ জন্য শাঙ্কর ব্যাখ্যা সূত্রকারের অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে, ইত্যাদি। তদ্রূপ এই দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের শেষ অধিকরণে শাঙ্কর ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র মতের অংশবিশেষ খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং অন্য ভাষ্যে শাক্তমতের খণ্ডন করা হইয়াছে, কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে রামানুজ ভাষ্যে পাদসঙ্গতি লঙ্ঘনজন্য দোষ ঘটিয়াছে, কিন্তু শাঙ্কর ও ভাস্কর ভাষ্যে সে দোষ ঘটে নাই। যাহা হউক, পাদসঙ্গতির দ্বারা এইরূপে সূত্রার্থ সঙ্গত ভাবে করা হয়।

এ স্থলেও অধ্যায়ে অধ্যায়ে সঙ্গতির ন্যায় পাদে পাদেও একটা সঙ্গতি দেখা যায়। যেমন প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের হেতু-হেতুমদ্‌ভাবসঙ্গতি আছে বলা হয়। এই সঙ্গতির বলে পাদান্তর্গত অধিকরণের অর্থও নিয়মিত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গতিগুলি যথা—

প্রথম পাদের সহিত	দ্বিতীয় পাদের	—	হেতুহেতুমদ্‌ভাব সঙ্গতি।
দ্বিতীয় " "	তৃতীয় "	—	ঐ
তৃতীয় " "	চতুর্থ "	—	আক্ষেপ সঙ্গতি
চতুর্থ " "	পঞ্চম "	—	সঙ্গতি নাই, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।
পঞ্চম " "	ষষ্ঠ "	—	উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতি
ষষ্ঠ " "	সপ্তম "	—	দৃষ্টান্ত সঙ্গতি
সপ্তম " "	অষ্টম "	—	ঐ
অষ্টম " "	নবম "	—	সঙ্গতি নাই, কারণ, তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।
নবম " "	দশম "	—	হেতুহেতুমদ্‌ভাব সঙ্গতি
দশম " "	একাদশ "	—	ঐ
একাদশ "	দ্বাদশ "	—	একবিদ্যাবিষয়ত্ব সঙ্গতি
দ্বাদশ " "	ত্রয়োদশ "	—	সঙ্গতি নাই, কারণ, চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।
ত্রয়োদশ "	চতুর্দ্দশ "	—	হেতুহেতুমদ্‌ভাব সঙ্গতি
চতুর্দ্দশ "	পঞ্চদশ "	—	ঐ
পঞ্চদশ "	ষোড়শ "	—	ঐ

এই সঙ্গতির কথা স্মরণ রাখিয়া অধিকরণার্থ বা সূত্রার্থ করিলে আর অসঙ্গত কষ্টকল্পিত অর্থের সম্ভাবনা থাকিবে না।

৫। অধিকরণ সঙ্গতির অর্থ—প্রত্যেক অধিকরণের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ পূর্ব্বাধিকরণের যাহা সিদ্ধান্ত তদবলম্বনে পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ রচনা।

এইরূপে এই সম্বন্ধে—(ক) আক্ষেপ (খ) দৃষ্টান্ত (গ) প্রত্যুদাহরণ অথবা (ঘ) প্রসঙ্গরূপ হইয়া থাকে। ইহাকেই এ স্থলে সঙ্গতি পদে

অভিহিত করা হয়। ইহাকেই অবান্তর সঙ্গতি নামেও অভিহিত করা হয়। যেমন—

প্রথমাধিকরণের সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিচার শাস্ত্র আরম্ভণীয়। কারণ, ব্রহ্ম বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এ স্থলে যে দ্বিতীয় অধিকরণ হইবে, তাহাতে উক্ত প্রথমাধিকরণের সিদ্ধান্তের উপর আক্ষেপ করিয়া বলা হইল—জগতের যে জন্মাদি তাহা ব্রহ্মের লক্ষণ হয় না, আর ব্রহ্মের যদি লক্ষণ সিদ্ধ না হয়, তবে ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইতে পারে না। এই ভাবে দ্বিতীয় অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রথম অধিকরণের সহিত দ্বিতীয় অধিকরণের আক্ষেপ-সঙ্গতি বলা হয়।

এইরূপ এ স্থলে দৃষ্টান্ত সঙ্গতি ও প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এই উভয়ই প্রদর্শন করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত সঙ্গতি, যথা—সন্দিগ্ধত্ব হেতু দ্বারা ব্রহ্মের যেমন বিচার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জন্মাদি জগন্নিষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে বলিয়া জন্মাদি হেতু ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না।

প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এ স্থলে এইরূপ—যেমন ব্রহ্মের বিচার্য্যত্বে হেতু আছে, সেই ব্রহ্মের যে লক্ষণ আছে, তাহার প্রতি কোন হেতু নাই। ইহাই এ স্থলে প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি বলা হয়। এইরূপ সকল স্থলেই এই দৃষ্টান্ত সঙ্গতি ও প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি দেখাইতে পারা যায়।

প্রসঙ্গ সঙ্গতির স্থল প্রথমাধ্যায় তৃতীয় পাদের ৭ম ও ৮ম অধিকরণের মধ্যে দেখা যায়। ৭ম অধিকরণে মনুষ্যের শাস্ত্রে অধিকার আছে বলা হইয়াছে, ৮ম অধিকরণে দেবতাদিগের সেই অধিকারের কথা বলায় ইহা প্রাসঙ্গিক কথাই হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই চার প্রকার সঙ্গতি ভিন্ন অন্য বহু প্রকার সঙ্গতির উল্লেখ ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিমধ্যে দেখা যায়। যথা (১) উপোদ্ঘাত সঙ্গতি, (২) একফলত্ব সঙ্গতি (৩) হেতুহেতুমদ্ভাব সঙ্গতি (৪) বিষয়বিষয়িভাব সঙ্গতি, (৫) কার্য্যকারণ সঙ্গতি, (৬) উপজীব্যোপজীবকভাব সঙ্গতি (৭) অতিদেশ সঙ্গতি, (৮) আশ্রয়াশ্রয়িভাব সঙ্গতি (৯) একপ্রযোজনকত্ব সঙ্গতি, (১০) আন্তরবহির্ভাব সঙ্গতি, (১১) প্রতিযোগ্যনুযোগিভাব সঙ্গতি, (১২) ফলফলিভাব সঙ্গতি, (১৩) একবিষয়কত্ব সঙ্গতি, (১৪) উৎসর্গাপবাদ সঙ্গতি, (১৫) উত্থাপ্যোত্থাপক সঙ্গতি, (১৬) বুদ্ধিস্থত্ব সঙ্গতি।

বস্তুতঃ, এই ১৬টি সঙ্গতি পূর্বোক্ত আক্ষেপ, দৃষ্টান্ত প্রত্যুদাহরণ ও প্রসঙ্গসঙ্গতিরই প্রকারভেদ মাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ খুবই অল্প। সেই প্রভেদ বুঝিতে হইলে ইহাদের এক একটি স্থলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। যথা—

১।	আক্ষেপ সঙ্গতির দৃষ্টান্ত		১।১।২	অধিকরণ
২।	দৃষ্টান্ত	” ”	১।১।৭	”
৩।	প্রত্যুদাহরণ	” ”	১।১।৬	”
৪।	প্রসঙ্গ	” ”	১।২।৭	”
৫।	উপোদ্ঘাত	” ”	১।১।১	”
৬।	একফলত্ব	” ”	১।১।৩	”
৭।	হেতুহেতুমদ্ভাব	” ”	১।৪।৭	”
৮।	বিষয়বিষয়িভাব	” ”	২।১।১০	”
৯।	কার্য্যকারণ ভাব	” ”	২।১।৯	”
১০।	উপজীব্যোপজীবকভাব	”	২।২।৫	”
১১।	অতিদেশ সঙ্গতির	”	২।৩।২	”
১২।	আশ্রয়াশ্রয়িভাব	” ”	২।৩।৭	”
১৩।	একপ্রয়োজনকত্ব	” ”	২।৩।৯	”
১৪।	আন্তরবহির্ভাব	” ”	২।৩।১৩	”
১৫।	প্রতিযোগ্যনুযোগিভাব	”	৩।২।২	”
১৬।	ফলফলিভাব	” ”	৩।৩।২	”
১৭।	একবিষয়কত্ব	” ”	৪।১।৪	”
১৮।	উৎসর্গাপবাদ	” ”	৪।১।১১	”
১৯।	উত্থাপ্যোত্থাপকভাব	”	৪।১।১৪	”
২০।	বুদ্ধিস্থত্ব	” ”	৪[illegible]	”

এই সঙ্গতির ফল অসঙ্গত প্রসঙ্গের নিবারণ। সঙ্গতির জ্ঞান থাকিলে সূত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সুবিধা হয়, ব্যাখ্যান্তরের নৈকট্য বা দূরত্ব নির্ণয় হয়। ইহাই হইল অধিকরণের প্রথম অবয়ব-সঙ্গতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। এ জন্য সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি দ্রষ্টব্য। এ জন্য ইহাও একটি ব্যাসদেবের কৌশল। এইবার দেখা যাউক, অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব বিষয় বলিতে কি বুঝায়?

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী।

শেষ পথ

অনেক গেয়েছ গান ; ব্যর্থ আলোকের
আঁধারে দেখেছ পথ ; ধূলির কণায়
ছড়ায়েছ স্বর্ণ-রেণু ; কর্ম্ম-সাগরের
ডাক ভুলে ছুটিয়াছ সৈকত-বেলায়!
সেই ফাঁকে হারায়েছ খামারের ধান!
মাঠের কোমল বুক হয়েছে চৌচির ;
সঙ্গীন করেছে ক্ষয় জীবনের দান—
ভরেছে শ্মশান-ধূমে সোনার কুটীর।
এইবার চাই ফিরে হে আমার মন,
চূর্ণ করো আজিকার নির্মম বিধান
প্রকৃতির ; গড়ে তোলো নতুন জীবন
ধরার খাঁটি-হাড়ে ; জাগার নিশান
রেখা দিক! অথবা মিশিয়া যাও ধীরে
কালের অতল বুকে সমাধির তীরে।

অনির্ব্বচনীয়

বাস্তবে তোমারে নাহি পাই প্রিয়, স্বপনে তোমারে পাই।
মরণেরে ভুলি প্রেমের দেউলে, জীবন্ত রহ তাই।
চকিত চরণে জড়িত মরমে মোর পাশে তুমি এসে
চুমি' হাতখানি বুকে তুলে নাও কতখানি ভালোবেসে!

কি প্রেম-পরশ দিয়ে যাও মোরে ভাষাহীন অভিনব!
ঘুমে-জাগরণে অনুভব করি মধুর সঙ্গ তব।
লাগে শিহরণ, স্পন্দিত মন—ভুলে যাই ব্যবধান।
অদেয় তোমার প্রেম-ফুলহার স্বপনে করো গো দান।

দেয়া-অদেয়া চাওয়া ও পাওয়ার অনেক ঊর্দ্ধে আনি'
হৃদয় আমার ভরে দাও তুমি ভুলায়ে হতাশা গ্লানি।
ভুলে যাই দুখ, ঘুচায়ে বেদন—দেখা দাও তুমি প্রিয়,
না-পাওয়া পরশ গোপন স্বপনে—কি অনির্বচনীয়!

বন-জ্যোৎস্না

(গল্প)

মিষ্টার গুপ্ত এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। বিলাত-ফেরত অথচ দাম্ভিকতা নাই। চেহারা আবলুস কাঠের মত কালো, চোখ দু'টি ভাঁটার মত গোল। বয়স সবে চল্লিশ পার হইয়াছে, অথচ চুলগুলি অর্দ্ধেক পাকিয়া গিয়াছে—সেগুলি পিছন দিকে ফেরানো—সাদায়-কালোয় মিশিয়া সে এক অপূর্ব্ব জিনিব! কথা যখন বলেন, হাত নাড়িয়া এমন ভাব করেন যে শ্রোতা না হাসিয়া পারে না!

গল্প যা বলেন, সবই আজগুবি। কিন্তু এমন সহজ আত্মপ্রত্যয়ে, এমন সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি বলেন যে সহজে কেহ তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

নিবিড় অরণ্যের যে যাদু আমরা গল্পে পড়ি, তাহাই উপভোগ করিবার জন্ত আমরা ক'জনে ভুটান-দুয়ারের জঙ্গল দেখিবার জন্ত মিষ্টার গুপ্তকে ধরিয়াছিলাম।

ক'দিনের ছুটি উপভোগ করিবার জন্ত অভিযান। দুয়ারের য়ুরোপীয় চা-বাগানগুলির কল্যাণে পথ-ঘাট চমৎকার। তরু-বীথির মধ্য দিয়া মোটর বায়ুগতিতে ছুটিয়া চলিল।

মিষ্টার গুপ্ত ডি, এফ, ও। বনের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতল বাংলো। বাংলোটি এত সুন্দর যে মনে হয় সেইখানেই চিরদিন বাস করি। গেটের উপর ব্যুগনভিলা পুষ্পের তাম্র ও পাটল বর্ণের সমাহার বহু দূর হইতে চোখে পড়ে। ঢুকিতেই দু'ধারে ঋতু-পুষ্পের বাহার। আমরা শীতকালে গিয়াছিলাম। ডালিয়া, কার্ণেসন্, পিঙ্ক ও ক্যানায় যে বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা ভুলিব না।

বিশাল, বিপুল অরণ্যানীর মাঝে এই বাংলো—সভ্যতার স্পর্শ নাই। আমার অজস্র প্রশংসা শুনিয়া গুপ্ত বলিলেন—"আমরা কিছু ব্যয় করি বটে, কিন্তু এই মাধুর্য্যের উৎস একটি বঞ্চিতা নারীর স্নেহস্পর্শ···"

গুপ্ত সাহিত্যচর্চ্চাও করেন। মাঝে-মাঝে কথার মধ্যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস জাগে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা অভ্যর্থনা করিতে আসিল—তাঁহার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়িল।

আহারের আয়োজন যথেষ্ট হইয়াছিল। আহারান্তে বাংলোর বারান্দায় বসিয়া নিস্তব্ধ বনানীর নিবিড় মায়া উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছিলাম। কফি পরিবেশন হইয়াছিল। গুপ্ত কফির পাত্র নিঃশেষ করিয়া বার্ম্মা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন,—"মিষ্টার দাশ, ভূতের ভয় করেন না ত?"

হাঁ কি না—বলা মুস্কিল। বিশ্বাস করি না অথচ কদ্দি, বোধ হয় অতীতের সংস্কার সব মোছে না।

দাদা প্রশ্ন করিলেন,—"কেন? এখানে ভূত আছে না কি?"

মিষ্টার গুপ্তর উচ্ছ্বাস হাসির ফোয়ারায় ঝুরঝুরি বহাইয়া দিল। মিষ্টার বলিলেন,—"ভূত একটা নয়, চার চারটে ভূত আছে।"

অস্ফুট স্বরে বলিলাম—"চারটে!"

"হাঁ, এক জন হিন্দু, এক জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এক জন য়ুরোপীয়ান্, এক জন মুসলমান···"

দাদার আগ্রহ বাড়িল, বলিলেন—"কি রকম?"

"সে সব অদ্ভুত ইতিহাস। পয়লা নম্বর জ্ঞান ভট্টাচার্য্য—স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে আমাদের ড্রয়িং-রুমের পাশে যে আফিস-ঘর—তার দরজা বন্ধ করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ভদ্রলোকের ছিল কাগজ ফ্যাস্-ফ্যাস্ করে ছেঁড়া রোগ, এখনও অনেক রাত্রে ড্রয়িং-রুমে বসলে শুনবেন—ফ্যাস্—ফ্যাস্···"

হাতের ভঙ্গীতে কাগজ ফ্যাস্ করিবার যে অভিনয় মিষ্টার গুপ্ত করিলেন—ছেঁড়া কাগজ বেতের ঝুড়িতে ফেলিবার যে বর্ণনা করিলেন, তাহাতে কৌতূহল জাগ্রত হইয়া উঠিল। বলিলাম, "সত্যি?"

"আজ রাত্রেই পরীক্ষা করতে পারেন।"

তাঁহার আয়ত চোখে হাসির দীপ্তি! চুপ করিয়া গেলাম। গুপ্ত পুনরায় সুরু করিলেন—"দুই নম্বর রোজারিও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সে কালো। য়ুরোপীয় ললনার সঙ্গে তার প্রেম সম্ভব নয়—বেচারী তা জানেনি—বাক্সা দুয়ারের এক সৈনিক-কন্তার প্রেমে পড়ে, কিন্তু মিশিবাবা তার সঙ্গে হৃদয় মেলাতে পারেনি! তাই সে আত্মঘাতী···"

দাদা বলিলেন···প্রেমও মানুষকে সমান করতে পারেনি!"

"না, মৃত্যুও পারেনি···রোজারিও তাই ঘরে স্থান পায়নি···সে টিনের ছাদে চলে বেড়ায়। মাঝ-রাত্রে তার ঘোড়ার খুরের টগ-বগাবগ শব্দ শোনা যায়। আজ যদি শোনেন, ভয় পাবেন না, ঘুমের ঘোরেই তার আত্মার কল্যাণ কামনা করবেন।"

আমি বলিলাম···"না। তার প্রয়োজন নেই···রোজারিও আজ ঘুমিয়েই থাকুন···"

গুপ্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—"তিন নম্বর আর্থার জোন্স···অব্যর্থ শিকারী···এক গুলীতে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে ফেলে!"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারণ?"

"কারণ অজ্ঞাত, কেউ বলে তার মেম পালিয়ে গিয়েছিল সেই শোকে। কেউ বলে উপরওয়ালার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল। চার নম্বর মৌলভী নুরুদ্দিন! আমাদের এক বন-কর-দারোগা···গোঁড়া মুসলমান—সাহেবের সঙ্গে বসে খানা খায়! হ্যাম খেয়ে জ্বলে বেচারী আত্মগ্লানিতে পাশের ইউক্যালিপটাস গাছে গলায় ফাঁস লটকে মরে। এখনও কেউ কেউ তাকে বাংলোয় ঢারি ড্রিঙ্ক খুঁজতে দেখে···"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম···"আপনি দেখেছেন?"

"না, তবে এ সব সত্যি। মোদ্দা ভয়ের কিছু নেই···"

দূরের বনরেখা রাত্রে যেন আমাদিগকে চুম্বন করিতে আসে। ভূতের গল্পের সঙ্গে এই কালো বনরেখা যেন রহস্তের বাহুতে আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। অজানিতে গা ছম্-ছম্ করিয়া ওঠে।

বলিলাম—"ঘুম পেয়েছে, শুতে যাই···"

গুপ্ত বলিলেন—"এখন শোবেন···? বন-জ্যোৎস্নার গল্প শুনবেন না? সেই ত এই মৃত্যুপুরীর উর্ব্বশী।···তারই নৃত্যের ছন্দে এখানকার পুষ্পশাখায় ছন্দ জাগে।"

আমি উঠিয়া বলিলাম—"না, শুভ রাত্রি। সকালে শোওয়া আমার অভ্যাস।" শয়ন-ঘরে চলিতে চলিতে দাদার প্রশ্ন শুনিলাম, "—বন-জ্যোৎস্না কে?"

"সে একটা সাঁওতালী মেয়ে। এখানকার এই উদ্যান-শিল্প তারই হাতের কারিগরী···কিন্তু সে-গল্প কাল করবো···আপনিও বোধ হয় সকাল সকাল শোন্···শুয়ে পড়ুন···কাল আবার সভায় দর্শনের আলোচনা···গুড নাইট···"

নূতন স্থান, নূতন পরিবেশ, কিছুতেই যেন ঘুম আসে না! আমার ঘরের কাচের জানালা দিয়া একটুখানি আকাশ দেখা যায়। ত্রয়োদশীর চন্দ্র চোখে পড়ে। তার পাশে বৃহস্পতি গ্রহ। নীচে বনস্পতির পত্রল শাখার মিলিত কৃষ্ণ যবনিকা।

নিস্তব্ধ রাত্রি, নিস্তব্ধ বনানী। তবু মনে হয় যেন বসুধার প্রথম চঞ্চল বাণী কানে আসে, প্রকাশের বেদনা তার ভাষা নেয় বনস্পতির মাঝে। বনভূমি যেন বারণ করে—মানুষের পদক্ষেপ যেন তার ধ্যান ভঙ্গ করে! বনচর প্রাণীর জীবন-লীলা যেন ব্যাহত হয়।

ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। সহসা যেন কাহার রাগ-বিহ্বল চুম্বনে জাগিয়া উঠিলাম! স্বপ্ন? না, সত্য? কালো মেয়ের এমন রূপ কখনো দেখি নাই! ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আলো নিবাই নাই। তন্দ্রাতুর চোখে দেখিলাম তন্বী যুবতী—নিকষ-কৃষ্ণ, কিন্তু তার নিটোল স্বাস্থ্য, তার সুবেশ, তার প্রসাধন তাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। চোখ দু'টি যেন জ্বলিতেছিল! আমাকে জাগিতে দেখিয়া যুবতী তার পেলব অঙ্গুলি মুখে দিয়া ইঙ্গিতে কথা বলিতে বারণ করিল—তার পর দরজা দেখাইয়া আমাকে তাহার অনুগমন করিতে বলিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া পড়িলাম। যুবতী আলগোছে আমার ওভারকোট আমাকে বাড়াইয়া দিল—তার পর দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে সহযাত্রী হইতে বলিল।

চলিলাম। নিশীথ রাত্রির মায়া যেন আমাকে ভুলাইয়া লইয়া চলিল। বনের মর্ম্মর-ধ্বনি মুখর সঙ্গীতে যেন তার নিভৃততম অন্তরে ডাক দেয়। চলিলাম সরু বনপথে—দু'ধারে কত অজানা তরুপল্লব! বনচর প্রাণীও চোখে পড়িল—কিন্তু ভয়ে বিভ্রান্ত হইলেও ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না।

যুবতী ফিরিয়াও তাকায় না··· চাঁদের ক্ষীণ আলো বনস্পতির শাখার ফাঁকে একটু ক্ষীণ আলো দেয়—সেই আলোয় কোথায় এই অভিসার যাত্রা, কে জানে?

সহসা একটু মুক্ত স্থান লক্ষ্য হইল। খরস্রোতা তোড়সা—শীতের দিনে তার তেজ নাই। উপলখণ্ডের উপর বসিয়া যুবতী আমাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

ফুলের সাজে সে সাজিয়াছে! কবরীতে রজনীগন্ধার মৃদু সৌরভ, বাহুতে পুষ্পকঙ্কণ, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য···আধ-অন্ধকার আধ-জ্যোৎস্নায় কে এই মহিমাময়ী? বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবতী এবার কথা কহিল।—"নিরুপম, তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?"

কি বিপদ, জীবনে একটি মাত্র নারীই এ কথা বলিতে পারে, কিন্তু সে কখনও এমন প্রশ্ন করে নাই!

আমি বলিলাম, "বনদেবি, আপনার ভুল হয়েছে, আমি নিরুপম নই···"

সে হাসিল। উন্মাদের মত অসংলগ্ন উদ্দাম হাসি। তার পর বলিল—"তুমি কমিউনিষ্ট, তুমি সাম্যমন্ত্র প্রচার করো! কিন্তু আমি জানি, এ সব তোমার ভুয়ো কথা! সব মানুষকে তুমি সমান মনে করো না! আজ আর চালাকি করো না, আজ তোমায় আমি সব কথা বলবো···বলে একটা হেস্তনেস্ত করব···" উন্মাদিনীর মত তাহার চোখের জ্বালা অন্ধকারেও যেন জ্বলিতে থাকে! আমি নীরবে বসিয়া শুনি।

"মনে করো নিরুপম তোমার সেই বক্তৃতা! তুমি বলেছিলে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই! পৃথিবীতে এই যে বৈষম্য—মানুষের হাতে-গড়া। মানুষ এ বৈষম্য ভেঙ্গে গড়বে নূতন সাম্য—নূতন রাষ্ট্র—সেখানে শুধু থাকবে সমান অধিকার। মনে পড়ে না—আমাদের পাশের চা-বাগানের কুলিদের সভায় আম-বাগানের ছায়ায় তুমি বলেছিলে—সভা যখন ভেঙ্গে গেল তখন আমি তোমায় দিলাম আমার নিজের হাতে-গাঁথা ফুলের মালা? তুমি প্রদীপ্ত হয়ে বললে—সেই তোমার বিজয়-মাল্য?

"মনে পড়ে সেই সন্ধ্যারাগধূসর প্রথম মিলন? সে দিন আমি আপনাকে জানলাম! আমার মধ্যে যে গোপন সুধা-রস রয়েছে, তা' সেই দিন জানলাম! মনে নেই তুমি হাসলে মিষ্টি হাসি—যেন মাণিক ঝরে পড়লো অভাগীর জীবন-পথে! তখন আমি বুঝলাম আমি হেলার নই, আমি মহীয়সী···এই পৃথিবীর চলার গানে আমার প্রাণের সুরেরও একান্ত প্রয়োজন আছে।"

নিশীথ রাত্রির ছন্দের সঙ্গে প্রতারিতা বঞ্চিতা এই নারীর হৃদয়ছন্দ মিলিয়া যেন এক ঐক্যতান সৃষ্টি করে! নিঃশব্দ অনুরাগে মুগ্ধ শ্রোতার মত আমি শুধু শুনি! চারি পাশের ভয় ও বিভীষিকা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া যাই!

"তার পর মনে পড়ে তোমার ভালবাসার সেই নিদ্রাহীন গুঞ্জরণ···; তুমি তোমার কাজ ভুলে আমায় নিয়ে মেতে উঠতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তোমায় ছোট হতে দিইনি! তার কারণ তুমি অগ্রদূত, তুমি নব কালের যাত্রী! তোমার প্রেম যখন কামনায় উদ্বেল হয়েছে, তখন তাকে আমি মলিন হতে দিইনি!"

বন-জ্যোৎস্নার মত শুচি ও সুন্দর—হায় বেদনার্ত্ত নারী, তোমাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? বলো তোমার বেদনা! প্রকাশে যদি সান্ত্বনা পাও!

"মনে পড়ে সেই বিদায়-ক্ষণ, সেই বকুল-তলায় যখন তুমি আমায় পরিয়ে দিলে বকুল-মালা—বললে কলকাতা থেকে ফিরেই আমায় বিয়ে করবে···কিন্তু সেই যে চলে গেলে আর এলে না! নিষ্ঠুর, তুমি কি পাষাণীর ব্যথা একটুও বুঝতে পারোনি···না, অপরকে বিয়ে করেছ?"

আমি বলিলাম—"তোমার ভুল হচ্ছে···আমি নিরুপম নই···"

"না, না, আমায় ভুল বোঝাতে পারবে না! তুমিই নিরুপম··· বলো, আমায় গ্রহণ করবে? আমি আর সইতে পারছি না—এ জ্বালা আমি আর সইতে পারছি না···!"

উন্মাদিনী অধীর আবেগে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার মুখে অজস্র চুম্বন করিল। পাগলিনীর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কিরূপে, ভাবিয়া পাই না।

"না, না, তুমি পাষাণ; তুমি আমায় ভালোবাস না! তোমার পায়ে ধরি, নিরুপম, আগের মত তেমনি মিষ্ট সুরে একবার ডাকো—মণিয়া!

আলিঙ্গন-পাশ মুক্ত করিয়া মণিয়া আমার পা ধরিয়া সাধিতে লাগিল। "বলো, বলো একবার, বলো তুমি আমায় ভালবাস!"

তোড়সার কালো জল খরস্রোতে বহিয়া যায়। চন্দ্রমা বনস্পতির ছায়ায় যেন হারাইয়া যায়।

উন্মাদিনী উঠিল···বলিল—"জানি, পুরুষ সয়তান, পুরুষ ডাকু! আমার অভিশাপ রইলো তোমার উপর—ভালোবাসায় তুমি সুখ পাবে না"···তার পর চক্ষের নিমেষে সে জলের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া আমি হতভম্ব বসিয়া পড়িলাম।

মিষ্টার গুপ্তের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কিসের শব্দ ওটা মিষ্টার দাশ?"

আমি বলিলাম—"শীগ্‌গির আসুন···আপনার মণিয়া জলে ঝাঁপ দিয়েছে···"

গুপ্তের সঙ্গে বাংলোর দশ-বারো জন লোক ছিল—সকলে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেই গভীর স্রোতোরাশি মণিয়াকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না!

মণিয়া আমাকে নিরুপম বলিয়া সম্বোধন করিয়া যে আলাপ করিয়াছে, তাহা বলিলাম। মিষ্টার গুপ্ত হাস্যোচ্ছল কণ্ঠে বলিলেন—"ওঃ! সত্যি আপনি আর ওর নিরুপম দেখতে অবিকল এক।"

ফিরিবার পথে মিষ্টার গুপ্ত নিরুপমের কাহিনী আমাকে খুলিয়া বলিলেন। কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রচার করিতে আসিয়া সে এই বন-হরিণীকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল। সে হৃদয় দিয়াছিল—কিন্তু মনুষ্যত্ব দেয় নাই!

গুপ্তের নামকরণ ঠিক—মণিয়া সত্যই বন-জ্যোৎস্না।

প্রাত্যহিক জীবনের বেদনা ভুলিতে গিয়াছিলাম! ভাবিয়াছিলাম, ক'দিন হল্লা করিয়া মনের জড়তা ঘুচাইব! তাহা হইল না—বনের নীরব বেদনায় অন্তর ভরিয়া রহিল।

মানুষে মানুষে সাম্য···ধনের ও অধিকারের—হয়তো সে স্বপ্ন! কিন্তু এক জায়গায় তাহার সাম্য অনাদি···চিরন্তন···বেদনা যেখানে, সেখানে সকলেই বর্ণ, জাতি, শিক্ষা ও আভিজাত্য ভুলিয়া এক হইয়া যায়!

বন-জ্যোৎস্নার এই ট্রাজেডি তাই কখনো ভুলিব না।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ বি-এল)

বাসন্তী-পূজা

স্বারোচিষ মন্বন্তর সময়ে চৈত্রবংশ-সম্ভূত মহা-পরাক্রমশালী সুরথ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, ধনসংগ্রহ-কর্তা, বিখ্যাত দাতা এবং মাননীয় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং শত্রু-মর্দনে তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। এক সময় প্রবল-পরাক্রান্ত শত্রু-সৈন্য আসিয়া সুরথের কোলানগরী বিধ্বংস এবং তাঁহার রাজধানী অবরোধ করে। রাজা সুরথ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং মন্ত্রিগণ সেই সুযোগে তাঁহার কোষাগার হইতে সমস্ত ধন অপহরণ করিল। রাজা তখন নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে বিজন কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে দীর্ঘদর্শী মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৃক্ষমূলে বসিয়া রাজা যখন নিজের দুর্ভাগ্য-চিন্তায় নিমগ্ন, তখন ধনলোভে স্ত্রীপুত্র কর্তৃক বিতাড়িত সমাধি নামে এক বৈশ্য সেখানে উপস্থিত হইল। দস্যুদিগের পীড়নে এবং মন্ত্রিগণের প্রতারণায় রাজ্যভ্রষ্ট সুরথের সহিত সহজেই আত্মীয়-পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় সমাধির বন্ধুত্ব জন্মিল। উভয়ে শান্তগুণাবলম্বী মুনির নিকট আসিলেন। মুনিচরণে প্রণত হইয়া রাজা প্রশ্ন করিলেন,—যাহাদের অত্যাচারে আমরা দেশত্যাগী, সেই দুর্বৃত্তদিগের জন্য আমাদের মমতা বোধ হইতেছে কেন? আমরা এখন কি করি? কোথায় যাই? কিরূপেই বা সুখী হইতে পারি? আপনি তাহার উপায় বলুন।

মুনি বলিলেন,—হে মহীপাল, অতি বিস্ময়কর সর্ব্বকামপ্রদ অতুল দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। জগন্ময়ী মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। তিনি নিখিল জীবের চিত্ত আকর্ষণ এবং মোহে তাহা নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সর্বদা অখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। সেই মহামায়া জীবগণের কামনা-পূরণকারিণী এবং দুরত্যয়া কালরাত্রি নামে অভিহিতা। তিনিই বিশ্ব-সংহারিণী কালী এবং কমলবাসিনী কমলা। এই নিখিল জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাতেই লয় পায়। তিনিই পরাৎপরা। হে রাজন্‌, এই দেবী যাহাকে কৃপা করেন, সেই ব্যক্তি মোহ অতিক্রম করিতে পারে। নতুবা কেহই মোহ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। তুমি সেই জগন্মোহনিবারিণী পরম-পূজনীয়া দেবী মহামায়াকে আশ্রয় কর, তাহা হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

মুনির কথায় রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি সেই সর্ব্বাভীষ্ট-ফলদায়িনী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। নিয়ত তন্মনা হইয়া সমাহিত

ভাবে তাঁহারা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূজায় প্রীত হইয়া জগজ্জননী দেবেশী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলেন। রাজা কহিলেন,—হে দেবি, আপনি মদীয় শত্রু বিনাশ করিয়া আমাকে মদীয় রাজ্য প্রদান করুন। দেবী কহিলেন,—হে রাজন্, তুমি নিজ গৃহে গমন কর এবং নিজ রাজ্য পালন কর। তোমার শত্রুগণ হীন-বল ও পরাজিত হইয়াছে এবং তোমার মন্ত্রিগণও তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে।

বৈশ্য কহিলেন,—মাতঃ, গৃহ পুত্র বা ধন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই। কারণ, গৃহাদি বস্তু সকল সংসার-বন্ধনের হেতু এবং স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। হে দেবি, আপনি আমাকে মোক্ষপ্রদ বন্ধন-নাশক নির্ম্মল জ্ঞান প্রদান করুন। মূঢ় পামর ব্যক্তিরাই অসার সংসারে মগ্ন হইতে ইচ্ছা করে; পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিস্তার পাইতে চান।

"হে বৈশ্যবর্য্য, তোমার জ্ঞানলাভ হইবে",—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

মুনিবরকে প্রণাম করিয়া রাজা অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে ফিরিতে উদ্যত হইলে তাঁহার অমাত্যগণ ও প্রজাবৃন্দ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার শত্রুগণ বিনষ্ট এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। রাজা মুনিবরকে আবার প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পবিত্র-হৃদয় বৈশ্যও দিব্য জ্ঞান লাভে আসক্তিশূন্য হইয়া ও ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ভগবতীর গুণগ্রাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মধু অর্থাৎ চৈত্র মাসে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। মেধস মুনি প্রসঙ্গক্রমে দেবীর হস্তে দেবগণের পরমশত্রু দৈত্যগণের বিনাশ বর্ণন করিয়া দেবীর পূজায় নিম্নলিখিত বিধান দিয়াছিলেন—"হে নরাধিপ, আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে শুভকামনায় নিত্য পূজা, হোম ও তর্পণ-সমাপ্তির পর মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত দেবীর চরিত্রত্রয়াত্মক দেবীমাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করতঃ যথোক্ত বিধানে নবরাত্র ব্রত সমাপন করিয়া দেবীর বিসর্জ্জন করিবে!"

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির পূজা চৈত্র মাসে যথাকালে বিহিত হইয়াছিল। উত্তরায়ণ দেবগণের জাগ্রত কাল। সুতরাং পূজার পক্ষে প্রশস্ত ও উপযুক্ত। কিন্তু ত্রেতাযুগে লঙ্কার রণক্ষেত্রে রাক্ষস-রাজ রাবণের সহিত সংগ্রামে বিপন্ন শ্রীরামচন্দ্র আশ্বিন মাসে দক্ষিণায়নে দেবতাদের সুষুপ্তিকালে দেবীর আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অসময় ও অকাল হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে বোধন করিয়া দেবীকে জাগাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে,—

"শ্রীরাম আপনি কয় বসন্তে শুদ্ধ সময়
শরত অকাল এ পূজায়।
বিধি আর নিরূপণ নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তার।
সে দিন হয়েছে গত প্রতিপদে আছে মত
কল্পারম্ভে সুরথ রাজার।
সে দিন নাহিক আর পূজা হবে কি প্রকার
শুক্লাষ্টমী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যা রাশি মাস বটে কিন্তু পূজা নাহি ঘটে
অত্র যোগ সব হইল যাতে।
বিধাতা কহেন সার শুন বিধি দিই তার
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায় বিধি খণ্ডি পুনরায়
কল্পখণ্ডে সুরথ রাজন।"

কন্যারাশি মাস—সুতরাং আশ্বিন মাস! কিন্তু দেবীভাগবতে দেখি, শ্রীরামচন্দ্র যখন কিষ্কিন্ধ্যায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইখানেই জগদম্বিকার পূজা করিতে উপদেশ দেন। নারদ স্বয়ং আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। নারদ বলিয়াছিলেন,—"আপনি সম্প্রতি এই আশ্বিন মাসে পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিকর নবরাত্র ব্রত করুন।" শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় তুষ্ট হইয়া ভগবতী তাঁহাকে বানর-সহায়ে রাবণ-বিজয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া এই অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন,—"রাঘব, তুমি লঙ্কায় বসন্তকালে পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমার আরাধনা করিও, পরে পাপমতি দশাননকে সংহার পূর্ব্বক যথাসুখে রাজ্য করিতে পারিবে! শ্রীরামচন্দ্র তচ্ছ্রবণে প্রফুল্লহৃদয় হইয়া সেই ব্রত সমাপন পূর্ব্বক বিজয়া দশমী দিবসে বিজয়া পূজা সমাপনান্তে দেবর্ষি নারদকে বহুল দক্ষিণা-দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

বেদব্যাস রাজা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, "এই ব্রত শরৎকালে বিশেষরূপে যথাবিধি করিতে হয় এবং বসন্তকালেও উহা প্রীতি-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য। কারণ, শরৎ ও বসন্ত নামক ঋতুদ্বয় প্রাণি-গণের পক্ষে অতিদুঃখে অতিবাহনীয় বলিয়া ঐ দুই ঋতু সমস্ত লোকের নিকট যমদংষ্ট্রা বলিয়া বিখ্যাত। এ জন্য সর্ব্বত্র শুভার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই ঐ সময়ে যত্ন-পূর্ব্বক উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বসন্ত ও শরৎ এই দুই ঋতুই অতি ভয়ঙ্কর। ঐ সময়ে বিবিধ প্রকার পীড়ায় বহু মানব কাল-কবলে কবলিত হয়। তজ্জন্য হে নরাধিপ, চৈত্র ও আশ্বিন মাসে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের ভক্তি-পূর্ব্বক দেবী চণ্ডিকার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে ভক্তিভাবে উক্ত শুভ নবরাত্র ব্রত করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

নবরাত্র ব্রত দুর্গোৎসব ও বাসন্তীপূজার নামান্তর মাত্র। বঙ্গদেশে উভয় কালেই দেবী ভগবতীর পূজা প্রচলিত আছে। তবে শরতের পূজাই আমাদের দেশে জাতীয় মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। চৈত্রের পূজা এ যুগে কুলাচার-অনুযায়ী ভক্তিমান গৃহস্থের গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। ইহার প্রথম কারণ প্রাকৃতিক বলিয়া মনে হয়। ঋতুরাজ

---

* বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই পূজা-কাহিনী পৌরাণিক। অতএব শ্রীরামচন্দ্র বসন্তকালেও পূজা করিয়াছিলেন কি না জানিতে হইলে কালিকা, দেবী, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, লিঙ্গ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাদি আলোচনা করিতে হয়। এ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

বসন্ত নানা কারণে বাঙ্গালার শরতের নিকট নিষ্প্রভ। বাঙ্গালা দেশে আমরা কয়েকটি কারণে বসন্ত অপেক্ষা শরৎকালকেই বেশী পছন্দ করি। আমরা সকলেই জানি, বাঙ্গালার কৃষক প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও প্রবল বর্ষায় ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করিয়া শরৎকালে কিছু কাল বিশ্রাম লাভ করে। হেমন্তে ধান কাটিয়া গোলা ভর্ত্তি করিবে এবং নূতন ধান্যে নবান্ন করিবে, এই আশায় উৎফুল্ল থাকে। শীত ঋতুর অগ্রদূত শরৎ,—বসন্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আসন্ন আগমন ঘোষণা করে। শরৎ আশা ও আনন্দের কাল,—বসন্ত দীর্ঘশ্বাসের বার্ত্তাবহ। এই জন্যই বোধ হয় সৌন্দর্য্য-রসজ্ঞ বাঙ্গালী শরৎকালে তাহার জাতীয় মহোৎসব এমন আড়ম্বরে সম্পাদন করে।

দ্বিতীয় কারণ ঐতিহাসিক। সুরথ রাজা সাধারণ মানবের ন্যায় ধর্ম্মশীল ও বদান্য নৃপতি ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে তাঁহার অন্য কোন মানবাতীত বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন বিষ্ণুর অবতার, মানবাকারে লীলা হেতু মানবধর্ম্মশীল দেবতা। ত্রিভুবনের কার্য্যের জন্যই তাঁহার উৎপত্তি। কেবল রাবণ-বধাকাঙ্ক্ষায় তিনি দশ হাজার দশ শত বৎসরের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত কাল শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ;—

আদিত্যাদ্ বীর্য্যবান্ পুত্রঃ ভ্রাতৄণাং বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়ম্ এবাত্মনা পুরা।
স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুর্মানুষেষিহ।
কালো নরবরশ্রেষ্ঠ সমীপম্ উপবর্ত্তিতুম্।—রামায়ণম্।

সত্যযুগের সুরথ রাজার ইতিহাস সাধারণ হিন্দুর তত পরিচিত নয়—যত পরিচিত ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধ-কাহিনী। সুতরাং কালের দীর্ঘতর ব্যবধানেও বটে এবং শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব হেতু তাঁহার প্রতি সমধিক ভক্তিশ্রদ্ধা-প্রযুক্ত সুরথ রাজার চৈত্র মাসের উৎসব অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বিন মাসের পূজা ভারতে অধিকতর প্রচলিত হইয়াছে। আরও একটি কথা, শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র অবতার নন, মানব-কলেবরে তিনি অদ্বিতীয় বীর। সুরথ রাজা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, নিষ্কণ্টক রাজ্য ও মোহ-নাশক জ্ঞান পাইবার জন্য। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে দেবি, আপনি বলপূর্ব্বক মদীয় শত্রু বিনাশ করিয়া আমাকে মদীয় রাজ্য প্রদান করুন।" এ বীরের উক্তি নয় ; ইহা দুর্ব্বলের অতি কাতর প্রার্থনা। পক্ষান্তরে, শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন মহাবলপরাক্রান্ত বীর, তিনি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন,—পরম অত্যাচারী সীতা-অপহরণকারী রাক্ষস-রাজ রাবণের প্রতি ভগবতীর যে অনুচিত অনুগ্রহ ছিল তাহা প্রত্যাহরণের নিমিত্ত। তিনি নিজেই যুদ্ধে স্বীয় বাহুবলে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহামায়া কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মহাসত্ত্ব দশাননকে বধ করা, মানবাকারে মানবধর্ম্মশীল শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব ছিল না! কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও সৃষ্টিকর্ত্রী। দৈববলের নিকট মনুষ্য-বল সর্ব্বত্র অসমর্থ।

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালের পূজা সুরথ রাজার বসন্তকালীন পূজা অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আত্মশক্তির হীনতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। মানবমাত্রেই স্ব স্ব শক্তি-বলে কার্য্যোদ্ধার করিতে চায়। পৌরুষই মানবের একমাত্র আভিজাত্য ও উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে সূতপুত্র কর্ণের একটি উক্তি মনে পড়ে। কর্ণ বলিয়াছিলেন,—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।" উচ্চবংশে জন্ম-লাভ দৈবের বশীভূত, আর পৌরুষ আমার আপনার আয়ত্ত। জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয় ; কর্ম্মের জন্য দায়ী। আমাদের রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন,—"বিপদে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় বাহুবলে রাবণকে মারিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। অরণ্য-বাস-কালে তিনিও সুরথের ন্যায় অসহায় ছিলেন ; কিন্তু স্বীয় শক্তিবলে সহায়-সম্পদ্ লাভ করিয়া সমুদ্রবন্ধন ও রণজয় করেন। সুতরাং রামচন্দ্রের আদর্শই সমধিক জনপ্রিয় ও অনুকরণযোগ্য। শ্রীরামচন্দ্রের দেবীপূজায় যে শক্তি ও সাহসের পরিচয় আছে, সুরথ রাজার পূজায় তাহা নাই। ভক্তি-শ্রদ্ধাতেও শ্রীরামচন্দ্র সুরথ রাজার অপেক্ষা ন্যূন নহেন। সুরথ রাজা যেমন স্বীয় গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি স্বীয় নীলোৎপলতুল্য চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেবীর চরণে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

যদি শোক-বিনাশক জ্ঞানের জন্য পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্যের প্রার্থনা কেন? সে ক্ষেত্রে বৈশ্য সমাধির প্রার্থনাই অধিকতর সঙ্গত। তিনি গৃহ, ধন, পুত্র-পরিজন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি মোক্ষপ্রদ বন্ধন-বিনাশক জ্ঞান মাগিয়া লইয়াছিলেন। মূঢ় পামর ব্যক্তিরাই অসার সংসারে মগ্ন হইতে ইচ্ছা করে ; পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিস্তার পাইতে চাহেন। সুতরাং আত্মশক্তির অভিমান বর্জ্জন করিয়া শরণাগতিই প্রকৃত নিরভিমানী ভক্তের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়। সঙ্কল্প শুভ এবং কামনা বিশুদ্ধ হইলে দেবীর পূজা সার্থক হয়। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

এই শরণাগতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাজা সুরথের পন্থাই প্রকৃষ্ট। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়াছিলেন,—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।

প্রাণিগণ দেহধারণমাত্রেই একেবারে অহঙ্কারের দাস হইয়া পড়ে এবং অহঙ্কারজনিত অধঃপতনকারী মোহজালে বিজড়িত হইয়া অশুভ ও অন্যায় কার্য্য করে। অহঙ্কারের বশীভূত হইয়াই জীব বদ্ধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই বিমুক্ত হয়। কামিনী-কাঞ্চন ও পুত্র-পরিজন কিংবা বিষয়-বৈভব বন্ধনের হেতু নয় ; অহঙ্কারই বন্ধনের হেতু। অহং বুদ্ধিতে "আমি বলবান,"—"আমি এই কার্য্য করিতেছি, করিয়াছি বা করিব" এরূপ জ্ঞান দ্বারাই জীব আবদ্ধ হয়। অহঙ্কার-বিমুক্ত হইলে মানুষ নির্ম্মলাশয় হয়। তখন সে সংসার-প্রবাহে মগ্ন হয় না। অহঙ্কার হইতে মোহের সৃষ্টি। মোহ হইতে সংসার। অহঙ্কার-বিহীন পুরুষের মোহ হয় না, সুতরাং সংসারে প্রবৃত্তি থাকে না। বৈশ্য সমাধির তাহাই ঘটিয়াছিল ; কিন্তু রাজা সুরথের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রজা-প্রতিপালনে বাসনা ছিল। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা। সুরথ কুটিল

বা কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি স্বীয় শক্তিসামর্থ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত এবং স্বজন কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন। যখন শৌর্য্য-বীর্য্য সহকারে সংগ্রাম করিয়া হৃত-সর্ব্বস্ব, তখন তাঁহার শরণাগতি ব্যতীত উপায় ছিল না এবং তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে দেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং কেবল-মাত্র রাজ্য ও জ্ঞান লাভ করেন নাই; ভবিষ্যৎ জন্মে সূর্য্যের পুত্ররূপে সাবর্ণি মনু নামে মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

আরও একটি বিবেচ্য বিষয় আছে। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের যে তেজ ও বল-বিক্রম এবং শৌর্য্য-সাহস সম্ভবপর ছিল, সত্য-যুগের হইলেও সুরথের স্থায় সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তাহা ছিল না। আশ্বিনের পূজায় বর্ত্তমানে যে আস্থা ও আড়ম্বর, চৈত্রের পূজায় তাহার অভাব—এই দুই আদর্শের অতিমানবতা এবং মানবতার এবং উভয়ের উদ্দেশ্যে ও অভিপ্রায়ের পার্থক্য হেতু। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়াভিলাষ আত্ম-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—রাজা সুরথের অভিলাষ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ রাজধর্ম্ম পালনার্থ—আত্মসমর্পণের উপর। নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে আমরা আত্ম-সমর্পণ ও শরণাগতি অপেক্ষা আত্মশক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

যাহা হউক, বাসন্তী-পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা যথাকালে দেবীর জাগ্রতাবস্থায় আত্ম-সমর্পণের পূজা; ইহাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। দেবীর পাদমূলে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারই কৃপা-ভিক্ষা! সবই তাঁহার—আমিও তাঁহার। আমার শক্তিও তাঁহার,—আমার সত্তাও তাঁহার। আমার জয়-পরাজয়—উভয়ই তাঁহার। অহঙ্কার রিপু,—আত্মসমর্পণ মুক্তির প্রকৃষ্ট পথ। ইহাই সাত্ত্বিক ও সনাতন ধর্ম্ম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

অঙ্গ-ছাঁদ

ভাস্কর সে-মূর্ত্তি গঠন করে, আগে সে-মূর্ত্তির কাঠামো তৈয়ারী করিয়া লয়। এই কাঠামোকে ইংরেজীতে বলে outline. স্ত্রী-পুরুষের মূর্ত্তি আঁকিতে হইলে চিত্র-শিল্পীরাও প্রথমে রেখা বা লাইন টানিয়া সে-মূর্ত্তির আদরা বা কাঠামো গড়িয়া লন। রেখা বা আউট লাইনে এই মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সীমানা রচিয়া লন, তাহারি মধ্যে তুলির লেখায় চিত্র-শিল্পী স্ত্রীপুরুষের দেহসৌষ্ঠব আঁকিয়া তোলেন। ব্যায়াম-শিল্পী নারীর দেহসৌষ্ঠবের সম্বন্ধে বলেন—কাঁধের গোলালো-গড়নে নারীর সৌন্দর্য্য-মাধুরী নির্ভর করে। তাঁদের মতে কাঁধ হইবে নীচের দিকে হেলানো অর্থাৎ বাহুমূলের দিকে গড়ানে-ধরণের; অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে হইতে কাঁধ যেন হেলিয়া বাহুমূলে লুটাইয়া পড়িয়াছে! সোজা সমতল বা কোণা গড়নের কাঁধে রমণীর সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে। এমনি গড়ানে যাঁর কাঁধ, তাঁর গঠনের সৌকুমার্য্য সত্যই কমনীয় এবং লোভনীয়।
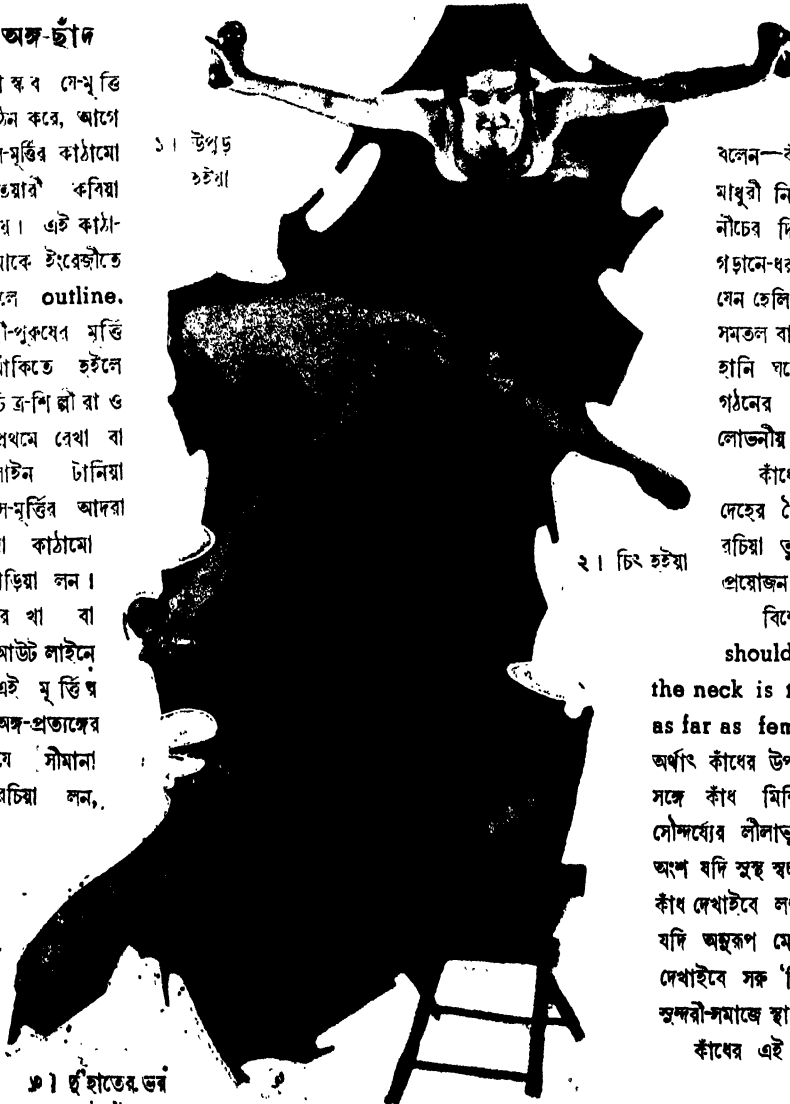
১। উপুড় হইয়া

২। চিৎ হইয়া

৩। দু'হাতের ভর

কাঁধের এই হেলানো-গোলালো গড়নের সঙ্গে দেহের দৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য থাকা চাই। সামঞ্জস্য রচিয়া তুলিতে হইলে বিশেষ ব্যায়াম-বিধির প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—The top of the shoulder, where it merges into the neck is the most important section as far as feminine beauty is concerned. অর্থাৎ কাঁধের উপর দিকটুকু—যেখানে গ্রীবা বা গলার সঙ্গে কাঁধ মিশিয়াছে, সে অংশটুকুকে রমণীর দেহ-সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! এ অংশ যদি সুস্থ স্বচ্ছন্দ ভাবে গড়িয়া না ওঠে, তাহা হইলে কাঁধ দেখাইবে লম্বা-চওড়া এবং ফ্ল্যাট; আবার এ অংশে যদি অনুরূপ মেদ-মাংস না থাকে, তাহা হইলে গলা দেখাইবে সরু 'ছিনে-পড়া'—তাহাতে অতি-বড় রূপসীও সুন্দরী-সমাজে স্থান পাইবেন না!

কাঁধের এই গোলালো-গড়ানে ছাঁদ বিশেষ ব্যায়াম-

পেশীগুলি যে ব্যায়ামে স্বচ্ছন্দে গড়িয়া ওঠে, সেই বিশেষ ব্যায়াম-বিধির কথা বলিতেছি।

আড়াই-সের ওজনের দু'টি ডাম্বেল বা ঐ ওজনের দু'খানি বাঁধানো বই চাই। সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে দু'টি ডাম্বেল বা বই নিন। দু' হাত ঝুলাইয়া দিন্ সামনের দিকে উরু-দেশ পর্য্যন্ত; এবার দু' হাত বা হাতের কবজী এতটুকু না বাঁকাইয়া না নোয়াইয়া শুধু দুই কাঁধ উপরে-নীচে দু'-তিন ইঞ্চিটাক ধীরে ধীরে তুলিবেন ও নামাইবেন। গলা ও মুখ এতটুকু নড়িবে না—হেলিবে না। এমনি ভাবে দুই কাঁধ যতখানি পারেন উপর দিকে তুলিবেন—তুলিয়া পরক্ষণে নামাইবেন।

যাঁরা খুব রোগা, তাঁদের (কলার-বোন্) গলার হাড় ঝিঁকের মত কদর্য্য দেখায়। এখুঁৎ সারিয়া কাঁধের গড়ন গড়ানে-সুছাঁদে গড়িয়া তুলিতে ব্যায়াম-সাধনা প্রয়োজন।
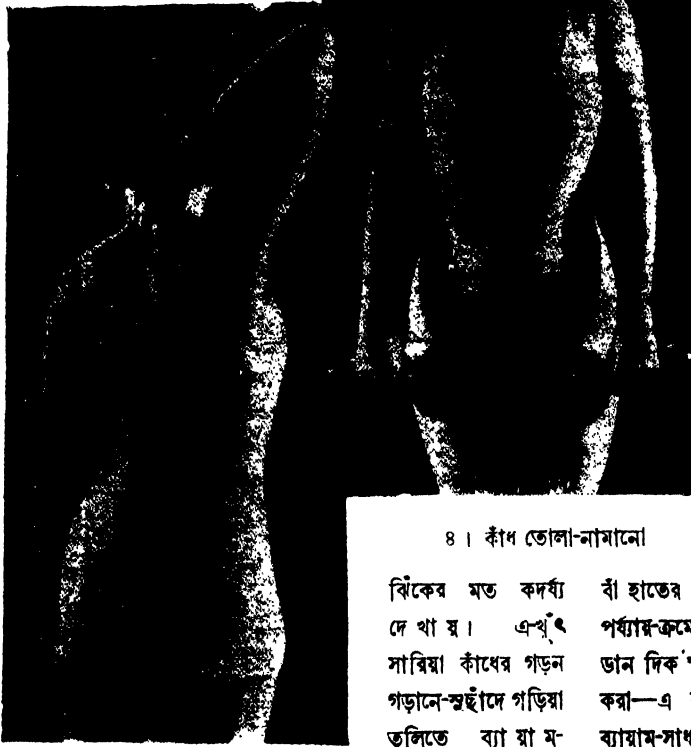
৪। কাঁধ তোলা-নামানো

৫। ঘাড়ের পিছন-দিকে ডাম্বেল

১। একখানি বেঞ্চের উপর তোষক চাপা দিয়া তার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন—১নং ছবির ভঙ্গীতে। দু' হাতে দু'টি ডাম্বেল বা বাঁধানো বই (প্রত্যেকটি বই বা ডাম্বেলের ওজন যেন আড়াই সেরের কম না হয়—অর্থাৎ একটু ভারী জিনিষ হওয়া চাই) নিন। ঠিক ঐ ছবির ভঙ্গীতে ডাম্বেল বা বই হাতে ধরিয়া দু' হাত দু'দিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া দিন—তার পর দু' হাত গুটাইয়া দু' হাতের ডাম্বেল বা বইয়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করুন। বেঞ্চের উপর এমন ভাবে শুইতে হইবে যেন বেঞ্চের সামনের দিকে ফাঁকা জায়গা থাকে—দু' হাত গুটাইয়া সেই ফাঁকা জায়গায় দু' হাতের ডাম্বেলে বা বইয়ে ছোঁয়া লাগোনো চাই। ছোঁয়া দিয়া পরক্ষণে আবার দু'দিকে দু' হাত প্রসারিত করিতে হইবে। এমনি ভাবে একবার দু' হাত প্রসারিত করা, পরক্ষণে গুটাইয়া আনা—এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

২। দ্বিতীয় বারে ঐ বেঞ্চে চিৎ হইয়া শুইতে হইবে—দু' হাতে ডাম্বেল বা বই থাকিবে। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে দু' হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। ছবিতে যেমন দেখিতেছেন, দু' হাত নীচের দিকে ঝুলিবে; তার পর দু' হাত গুটাইয়া বুকের উপরে আনিয়া দু' হাতের ডাম্বেল বা বইয়ে ছোঁয়া লাগানো। ছোঁয়া লাগানোর পরক্ষণে আবার হাত প্রসারিত করিয়া লওয়া—এ ব্যায়ামও করা চাই পাঁচ মিনিট।

৩। এবার ছোট টেবিলের প্রান্তে দু' হাতের ভর রাখিয়া বুক হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে উপরে তোলা এবং পরক্ষণে নামাইতে হইবে—৩নং ছবির ভঙ্গীতে। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

১, ২ এবং ৩—এই তিন রীতির ব্যায়ামে পিঠ, ঘাড়, কাঁধ ও গলার গড়ন হইবে সুকুমার।

৪। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান—মাথা মুখ বা কোনো অঙ্গ এতটুকু দুলিবে না, হেলিবে না, বাঁকিবে না বা ঝুইবে না। দু' হাতে ধরিবেন দু'টি ডাম্বেল বা বাঁধানো বই। এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া সর্ব্ব দেহ সুদৃঢ় ভাবে স্থির অবিচল রাখিয়া শুধু দুই কাঁধ উপরে তুলিবেন ও নীচে নামাইবেন প্রায় পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে গলার নীচে টোল থাকিবে না; এবং ঝিঁকের মত গলার হাড় সুকুমার শ্রীতে ভরিয়া পুরস্ত হইবে।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া ডান হাত তুলিয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড়ের পিছন দিকে ডাম্বেল দিয়া স্পর্শ করুন—তার পর ডান হাত নামান। তার পর এমনি ভঙ্গীতে বাঁ হাত তুলিয়া বাঁ হাতের ডাম্বেল দিয়া ঘাড়ের পিছন দিকে—বাঁয়ে—স্পর্শ করুন। পর্য্যায়-ক্রমে এক বার ডান হাতের ডাম্বেল দিয়া ঘাড়ের উপরে ডান দিক স্পর্শ করা, পরে বাঁ হাতের ডাম্বেল দিয়া বাঁ দিক স্পর্শ করা—এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট। নিয়মিত ভাবে এ ব্যায়াম-সাধনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুকুমার সুডৌল ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

খাওয়ায় পরিচ্ছন্নতা

সেদিন আমাদেরি মত এক গৃহস্থ-বাড়ীতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বিকেল-বেলা। বাড়ীর তিনটি ছেলে স্কুল থেকে ফিরেছে, —ফিরে জলখাবার খাচ্ছিল। জলখাবার খাওয়া মানে, মেঝেয় চারখানি করে রুটি ছিল বাটি-ঢাকা; তিন ভাইয়ে বাটির ঢাকা তুলে রুটিগুলো বার করে গুড় দিয়ে খাচ্ছিল। দেখে গা নিসপিস করে উঠলো। ডাকলুম তাদের মাকে। তিনি বান্ধবী। মা এলেন। বললুম—ধুলোয়-রাখা রুটি খেতে দিচ্ছ ছেলেদের? রোগ হতে পারে! বান্ধবী-মা বললে—চিরকাল তো খাচ্ছে, ভাই! তাকে দিলুম ধমক, বললুম—না। যা খেয়েছে খেয়েছে—খবর্দ্দার, এমন ধুলোয়-মাখা

খাবার ছেলে-মেয়েকে খেতে দিস্‌নে। ও-ধূলোয় কোন্ রোগের জড় না থাকতে পারে, বল্ তো? ধূলোয় খাবার জিনিষ পড়লে কাকেও তা খেতে দিতে নেই—শত্রুকেও নয়!

বান্ধবীর বাড়ীর রীতি দেখে সত্যই আতঙ্ক হয়েছিল! একালের লোক—সকলে লেখাপড়া শিখেছে—এখনো স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলো এদের রপ্ত হলো না? সকাল থেকে নিজের মুখ-হাত-গা সাফ করলেই পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পায় না। বেশ-ভূষায় আহারে-বিহারে সব বিষয়ে চাই পরিচ্ছন্নতা—বিশেষ করে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতার বিধি সতর্ক ভাবে না মানলে রক্ষা থাকবে না যে!

ধূলো-ময়লায় খাবার হয় বিষ—এ জ্ঞান করে হবে সকলের—বিশেষ মা-বোনদের? সেকালে রান্না-ঘর এবং খাবার ঘরটিকে গৃহিণীরা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। এ ঘরে ও শোবার ঘরে জুতো পায়ে দিয়ে ঢোকা ছিল নিষিদ্ধ। বাসি-কাপড়ও নিষিদ্ধ ছিল অনেক ঘরে। এখন আমরা সভ্য হয়েছি বলে অহঙ্কার করি,—কিন্তু খাবার-শোবার ঘরে জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকলে সে-জুতোর দৌলতে রাজ্যের কত কি নোংরা আবর্জ্জনা যে ছড়িয়ে বেড়াই, সভ্যতার ঝাঁজে তা আমাদের বোধগম্য হয় না—আশ্চর্য্য!

ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরিয়ে চায়ের দোকানে রাজ্যের লোকের এঁটো পেয়ালায়-প্লেটে যা-তা খেয়ে বেড়াচ্ছে! দেশ জুড়ে এই যে ডিসপেপসিয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ঐ সূত্র ধরে কি সর্ব্বনাশই না ঘটাচ্ছে!

বাজারে রাজ্যের আবর্জ্জনা মেখে বিক্রী হচ্ছে ফল, শাকসব্জী প্রভৃতি; কত লোকের ছোঁয়ায় সে সবে কত রোগের বীজাণু আশ্রয় নিচ্ছে, সাদা চোখে তা প্রত্যক্ষ না হলেও অণুবীক্ষণ দিয়ে একবার দেখলেই তার মাত্রা বুঝতে পারবেন। এজন্য উচিত—তরী-তরকারী, শাক-সব্জী ফল-মূল—বাড়ীতে এনে পার্ম্যাঙ্গানেট-পটাশ মেশানো জলে সেগুলি ধুয়ে সাফ করে নেওয়া।

অনেকের অভ্যাস আছে রুটি, বিস্কুট লজেঞ্জেস প্রভৃতি কিনে যা-তা কাগজে মুড়ে বাড়ীতে আনেন। এ কাগজ কার পায়ের তলার স্পর্শ পেয়েছে—কোথায় দোকানের কোণে আবর্জ্জনায় পড়েছিল—যা-তা হাতের ছোঁয়া লেগে রোগ-বীজাণুতে পূর্ণ রয়েছে, এ কথাগুলি যদি ভেবে দেখি, এবং ভেবে ঐ প্যাকিং-কাগজ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হই, তাহলে বহু রোগের আক্রমণ থেকে ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ রাখতে পারবো, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই!

খাবারের দোকানে আদুড় খাবার রাখা হয়। খাবার যে বিক্রী করছে, সে যে-হাতে গা চুলকোচ্ছে, পা চুলকোচ্ছে, বিড়ি টানছে—সেই হাতেই রসগোল্লার গামলা থেকে রসগোল্লা তুলে খদ্দেরকে দিচ্ছে এবং খদ্দের সে-রসগোল্লা অম্লান বদনে মুখে পুরছেন, এ দৃশ্য দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়! এ সব খাবার বিষতুল্য।

উড়ে বামুনের গলায় পৈতে দেখে তাকে দিচ্ছি আমাদের অন্ন তৈরীর ভার! পরনে ময়লা চিরকুট নোংরা ধুতি! বামুন না হলে অন্ন পাক হবে না, জানি। কিন্তু বামুনকে রীতিমত পরিষ্কার করে তুলুন, নাহলে নোংরা হাতে সে যে-অন্ন ধরে দেবে, সে-অন্ন হবে রোগ-বীজাণুর পুঁটলি!

মশা মাছি, ছারপোকা—এগুলিকে তুচ্ছ করবেন না—আশ্রয় দেবেন না। এদের দৌলতে কালা জ্বর আসতে পারে—ফাইলেরিয়া বা গোদ—তাও আসে ঐ মশা মাছি ছারপোকার দৌলতে। অতএব সকল দিকে যাতে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয়, সেদিকে সতর্ক হবেন।

পথের দ্বন্দ্ব

আমি হেথায় থাকব না গো এই ভুবনে থাক্‌ব না;
তোমাদের তোষাখানায় সোনার ধূলা মাখ্‌ব না।
এই ভুবনের নকল গানে
জাগিয়ে সকল প্রাণে প্রাণে
নিজেরে আর এমন কোরে আবরণে ঢাক্‌ব না।
আবর্জ্জনার মলিন বোঝা আর তো আমি বইব না;
অনাচারের এই ছলনা এমন কোরে সইব না!
আঁধার রাতে শয্যাতলে
গভীর নিশায় নয়ন-জলে
মন-বিজয়ের জয়ের আশে কাতর প্রাণে রইব না।
এই ভুবনের ব্যবসাদারি শুধুই যদি মন-রাখা—
মানবতার সত্তা ভুলে কিসের আশায় আর থাকা!
চাই না যাহা তারেই চেয়ে
মিথ্যা দিয়ে পরাণ ছেয়ে
ক্ষুব্ধ প্রাণে পঙ্ক তুলে আপন হাতেই হয় মাখা।
আপন-জনে চেনার দাবি হেথায় শুধু বৈভবের;
বন্ধু শুধু স্বার্থে ভরা হোক্ না তারা শৈশবের।
স্বাধীন বাণী ভুলতে হবে
এই ভুবনে রইবে তবে
উচ্চ আশার উচ্চ চূড়া ভাঙ্‌তে হবে কৈশোরের!

এই ভুবনের বাইরে আমি যাবই এ মোর মন-রথে;
যাবই আমি হোক না আঁধার, থাক্ না কাঁটা সেই পথে!
চলব নিয়ে অভয় বুকে
হান্‌ব হেলা পথের দুখে
পার হব ঠিক গভীর বিজন শঙ্কাভরা পর্ব্বতে;
বাঁধব সেথায় নূতন কুটীর অচিন নদীর তীর ঘেঁসে;
অবসরের ক্ষণটুকু মোর মিলবে যখন দিন-শেষে!
রইব বসি নদীর তীরে
পরাণ আমার আমায় ঘিরে
শিশুর মত প্রশ্ন কত করবে জানার উদ্দেশে।
সূর্য্য তখন নামবে পাটে হান্‌বে রাঙা পিচকারী;
পশ্চিমাকাশ রক্ত-রাঙা নদীর হবে লাল বারি।
এ মোর শিশুর পরাণ চপল
খেল্‌বে নিয়ে সাজিয়ে উপল
মৌন-মুখর ভাবের ছোঁয়ায় বাস্তবতা সঞ্চারি।
প্রভাত যবে নিদ্রা টুটি বাহির দ্বারে আনবে মন;
সূর্য্যমুখীর সূর্য্য মুখে দেখ্‌ব তোমায় একটি ক্ষণ।
বিশ্ব-বিহীন বৈরাগী সুর
ডাক্‌বে আমায় অসীম সুদূর
সাধন আমার সর্ব্বজয়ের করব তোমায় সমর্পণ।

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

যুদ্ধের ভাণ্ডারী

ছেলেবেলায় মহাভারতে যখন পড়িয়াছিলাম, দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন এক-লক্ষ নারায়ণী সেনা, তখন বিস্ময়ে চমকিয়া ভাবিতাম, বাস্‌ রে, এত লোক যুদ্ধ তো করিবে—কিন্তু তারা কোথায় থাকিবে? খাইবে কি? এ প্রশ্নের জবাব মেলে নাই! তার পর ইতিহাসে পড়িলাম সেকন্দার সা, তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিশ্‌ খান, গজনীর মাহমুদ প্রভৃতির অভিযানের বৃত্তান্ত। লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি সেনা লইয়া অজানা বিদেশে আসিয়া যুদ্ধ করা—শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুর বিড়ম্বনা-ভোগ ছিল—তার উপর খাওয়া-পরার হাঙ্গামা! কোথায় মিলিত এত লোকের খাদ্য? কোথায় বা কাপড়চোপড়?
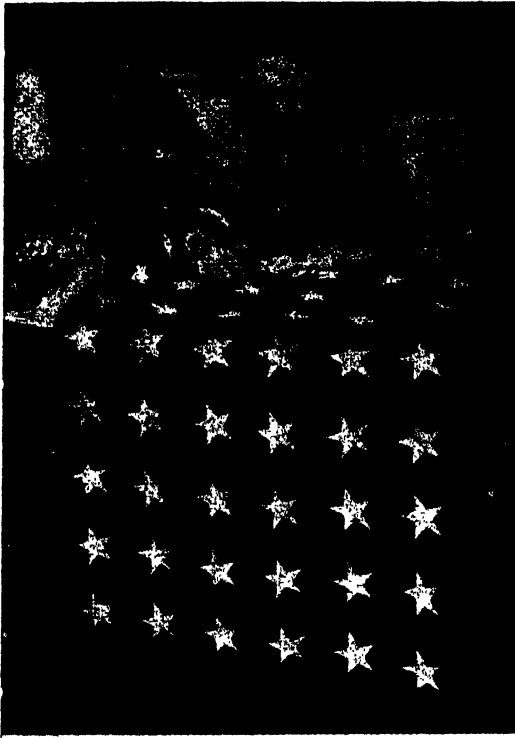
ব্যাজ্‌ তৈয়ারী

এগজামিনের ভয়ে এ সব প্রশ্ন মনে তেমন থিতাইতে পারে নাই—যুদ্ধের সাল-তারিখ আর "ইমপর্টাণ্ট পয়েণ্ট" মুখস্থ করিয়াই চুপচাপ থাকিতাম!

কিন্তু এবারকার এ মহাযুদ্ধে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি—এই যে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে দারুণ নরমেধ-যজ্ঞ, এ যজ্ঞের সাধনে শুধু অস্ত্র-শস্ত্র আর সেনানীর ইন্ধন জোগানোতেই তো সিদ্ধি নয়! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এই সব সেনার অশন-বসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে এতটুকু না ব্যাঘাত ঘটে, সে জন্য আয়োজন যা হইয়াছে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! যখন যেটি চাই, হাতের নাগালে মজুত দেখিতেছি! এ আয়োজন কে করিতেছে? এ বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর কে? এই বিপুল বাহিনীর প্রত্যেকের খাওয়া-পরা চলাফেরা স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের সকল ব্যবস্থা এমন তৎপরতার সহিত সুসম্পাদিত হইতেছে যাঁহার ইঙ্গিতে, তাঁহার কথা এবং তাঁহার কর্ম্মধারার কাহিনী জানিবার আগ্রহ কাহার নাই?

নরমেধ-যজ্ঞের এ যজ্ঞেশ্বর কোয়ার্টার-মাষ্টার-জেনারেল নামে অভিহিত। তাঁর অধীনে যে-বাহিনী কাজ করিতেছে, সে-বাহিনীর নাম কোয়ার্টার-মাষ্টার কোর। যুদ্ধে চিকিৎসক ও নার্শদের প্রয়োজন যতখানি, ঠিক ততখানি প্রয়োজন এই কোয়ার্টার-মাষ্টারের প্রকাণ্ড দলটির।

এই যুদ্ধের সময়েই বাটানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, কোয়ার্টার-মাষ্টার-জেনারেল বা ভাণ্ডারীর লোকজন তখন ক্ষেত হইতে ধান কাটিয়া মাড়িয়া চাল সংগ্রহ করিয়াছে; সাগরকূল হইতে লবণ
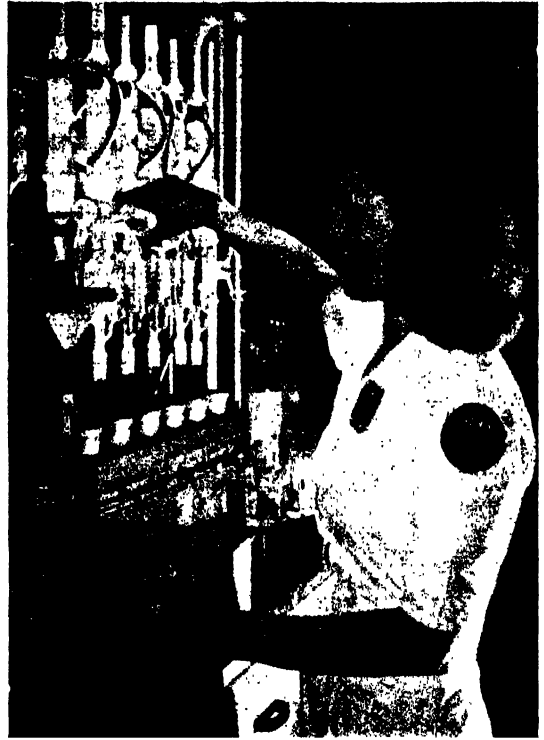
নকল রবারের পরীক্ষা

ছেঁচিয়া তুলিয়াছে: ক্ষুধার্ত্ত সেনাদের খাদ্যার্থে নিজেদের ঘোড়া ও অশ্বতর বলি দিয়া তাহার মাংস খাইতে দিয়াছে! বিপক্ষের বোমা-বর্ষণে বনের মধ্যে ভাণ্ডার ছাড়িয়া একটি প্রাণী সরিয়া যায় নাই। তার ফলে শত শত লোক দাঁড়াইয়া প্রাণ দিয়াছে! এ যুগে এই ভাণ্ডারী-বাহিনীর নিঃস্বার্থ আন্তরিক পরিচর্য্যার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর অক্ষরে লেখা থাকিবে।

কোথায় কখন্‌ কোন্‌ বাহিনী চলিল যুদ্ধ করিতে—সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারী-বাহিনী তাদের প্রয়োজনীয় অশন-বসনের বোঝা লইয়া সহযাত্রী হইল! প্রয়োজনীয় সর্ব্ব দ্রব্য ঠিক জায়গাটিতে যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ভাণ্ডারী-বাহিনীর পটুতার আর সীমা নাই! এ দলের তৎপরতার গুণে সমর-বাহিনীকে আজ কোনো বিষয়ে এতটুকু অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয় না।

পুরাণে আমরা পড়ি রাজসূয়-যজ্ঞের কথা। সে যজ্ঞে কোনো জিনিষের এতটুকু অভাব ঘটিত না। ভাণ্ডারী-বাহিনীর ভাণ্ডারে আজ তেমনি ছুঁচ-আলপিন হইতে পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পটি পর্য্যন্ত সর্বসময়ে মজুত মিলিবে।

ছোট-বড়-মাঝারি—প্রতি ফৌজদলের সঙ্গে ভাণ্ডারীর ভাণ্ডার মজুত থাকে। এ ভাণ্ডারে দর্জী আছে, জুতি-সেলাই মুচী আছে, নাপিত আছে, ধোপা আছে, রেডিয়ো-মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আছে, রুটিওয়ালা আছে, পাচক আছে। রুটি-ওয়ালারা দিনে ত্রিশ লক্ষ রুটি তৈয়ারী করিয়া দিতেছে।

মার্কিণ ফৌজের প্রধান ভাণ্ডারী এখন মেজর জেনারেল এডমণ্ড গ্রেগরি। তাঁর প্রধান অফিস ফিলাডেলফিয়ায়। ব্যবসায়ী-হিসাবে তাঁর তুল্য বিচক্ষণ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর দু'টি নাই! তাঁর

এঁরা করেন ইউনিফর্ম্মের ডিজাইন-পরীক্ষা

অধীনে কাজ করিতেছে লক্ষ লক্ষ লোক। সকলের মেজাজ বুঝিয়া সবলের সঙ্গে এমন হাসি-মুখে তিনি কাজ করেন—যোগ্যতা বুঝিয়া প্রত্যেকের কাজের মাত্রা যে ভাবে তিনি ভাগ করিয়া দেন,—তাহাতে কাজে যেমন কোনো দিন এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপায় নাই, তেমনি কাহারো মনে অশান্তি-অতৃপ্তি বা ফাঁকি দিবার ইচ্ছা জাগে না!

মেজর জেনারেল গ্রেগরিকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—এ কাজে সবচেয়ে মুস্কিল মনে করেন কিসে? উত্তরে তিনি বলেন,—ঠিক জায়গায় ঠিক ব্যুজটুকুর জন্য ঠিক লোকটিকে খুঁজিয়া লওয়া!

প্রশ্ন হইল—আপনি নিজে কি কি কাজ জানেন?

হাসিয়া তিনি জবাব দিলেন—দর্জির কাজ জানি। মিস্ত্রীর কাজ জানি। রাঁধিতে জানি। সব-রকম রান্না,—কেক পুডিং রুটি তৈয়ারী হইতে রোগীর পথ্য পর্য্যন্ত! তাছাড়া বাঁশী বাজাইতে জানি। ছবি আঁকিতে জানি।

অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব-কর্ম্মান্বিত।

তিনি বলেন—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক লইয়া সমর-বাহিনী গড়িলেই এ যুদ্ধে জয় লাভ হইবে না। তাদের খাওয়ানো-পরানো,—তাদের সর্ব্ব রকমে স্বচ্ছন্দ ও সুস্থ রাখা প্রয়োজন। নহিলে অবসন্ন মনে কে যুদ্ধ করিবে? ঘর ছাড়িয়া আত্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া আরাম ছাড়িয়া সকলে আসিয়াছে—ঘরে সকলে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ ভোগ করিত, তার চেয়েও তাদের বেশী স্বাচ্ছন্দ্য-সুখের ব্যবস্থা না করিলে তাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইবে—যুদ্ধ করিবার শক্তি ও উৎসাহ লোপ পাইবে। অশন-বসনাদির অভাব ঘটিলে কোটি কোটি সেনা লইয়াও বিজয়-লাভ সম্ভব হইবে না।

মোটা-রোগা লম্বা-বেঁটে—সব মাপের ইউনিফর্ম্ম মজুত

অত বড় বীর হানিবল রোম ধ্বংস করিতে পারেন নাই। তার কারণ সেনাদের প্রয়োজনীয় রসদ-পত্র যোগাইবার সুব্যবস্থা ছিল না। ব্লেনহিমে মার্লবরো যে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ ফৌজের খাইবার জন্ম রুটি এবং তাদের পাগুলিকে অক্ষত রাখিবার জন্ম জুতার যোগান সম্বন্ধে তিনি পাকা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রোমেল যে মিশরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তার কারণ, রোমেল পূর্ব্বাহ্নেই মিশরে খাদ্য-শস্যাদি পাঠাইয়াছিল! আজিকার এ যুদ্ধে লড়াইয়ে-ফৌজের সংখ্যা যেমন বর্ণনাতীত, ট্রাক-চালক মায় ধোপা-নাপিত, রুটিওয়ালা মুচি প্রভৃতি কর্ম্মীর সংখ্যাও তার চেয়ে কম নয়। এ জন্ম যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজের একটি প্রাণীও

দেহ-মন অবসাদ হইতে মুক্ত; শক্তি এবং উৎসাহ তাই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে।

মেজর-জেনারেল গ্রেগরি বলেন—এ সব মিস্ত্রী-মজুর দর্জ্জী-মুচি বা রুটিওয়ালা—প্রত্যেকে যুদ্ধ-বিদ্যায় সুনিপুণ। প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকে কামান-বন্দুক ধরিতে পারে; এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ গান্ ছুড়িয়া বিপক্ষের বমারকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতে পারে। যে-লোকটি

জামা-মোজা প্রভৃতি ষ্টেরিলাইজ্ করা হয়

ফৌজের খানা-ভোজ

রেডিও-যন্ত্র সারায়, রেডিয়োর প্রোগ্রাম পরিচালনা করে, সমর-বিদ্যাতে সেও রীতিমত পটু!

গতিবেগ এ যুদ্ধে বিরাট শক্তি-স্বরূপ। অর্থাৎ আজ বেলা বারোটায় এক-দল রেজিমেণ্ট হয়তো আসিয়া আমাদের এই কলিকাতা সহরে গড়ের মাঠে আস্তানা পাতিল,—বেলা দু'টায় হুকুম হইল, ছাউনি তোলো— তুলিয়া এখনি ছোটো চাটগাঁ! আদেশমাত্র রেজিমেণ্টকে ছাউনি তুলিয়া ত্বরিত গতিতে চাটগাঁয়ে ছুটিতে হইল—তাদের ছোটার সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারী-বাহিনীকেও ছুটিতে হইবে—খাবার-দাবার, ঔষধ পথ্য, কাপড়-জামা-জুতা, ছুরি-কাঁচি-শূতা প্রভৃতি সকল রকমের দ্রব্যসম্ভার লইয়া চাটগাঁ! তাদের পাঠাইবার ব্যবস্থা-ভার কোয়ার্টার-মাষ্টার বিভাগের হাতে।

চেঙ্গিশ্ খানের আমোলে যে রীতিতে যুদ্ধ চলিত, এ যুগে সে

অল্প জায়গায় যত বেশী মাল ঠাশা যায়—তাহার শিক্ষা চলিতেছে

যুদ্ধের ঘোড়া

রীতি সম্পূর্ণ অচল। চেঙ্গিশ খানের আমোলে ঘোড়া ছিল সবচেয়ে ক্ষিপ্র বাহন; এ যুগে আর্মার্ড-কার এবং ট্যাঙ্ক শুধু বাহনমাত্র নয়—এক একটি দুর্গ-স্বরূপ! ট্যাঙ্ক প্রভৃতির কল্যাণে ফৌজের চলার গতি বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দিনে দু'-তিন শত মাইল অতিক্রম করা—পথ যত বাধাবিঘ্নসঙ্কুল হোক—এ যুগে শুধু সম্ভব কেন, অনায়াস ও সহজ হইয়াছে। চলিতে চলিতে লড়ায়ে ফৌজের দল অশন-বসন

পাইতেছে, সিগার পাইতেছে, চা পাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ দেখিয়া সকল জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে। আস্তানায় পৌঁছিয়া ছাউনি পাইতে এতটুকু বিলম্ব

রকমারি কাজ চলিতেছে। মোটর-ক্যাম্পে বহু ট্রাক ও ট্যাঙ্ক মজুত আছে; ট্রাক-ট্যাঙ্কের মেরামতির কাজ চলিতেছে, ট্রাক-ট্যাঙ্কের শক্তি পরীক্ষা হইতেছে! কোনো ক্যাম্পে আছে

প্যারাশুট-বাহিনীর ব্যাগে নানা পুষ্টিকর খাদ্যের প্যাকেট
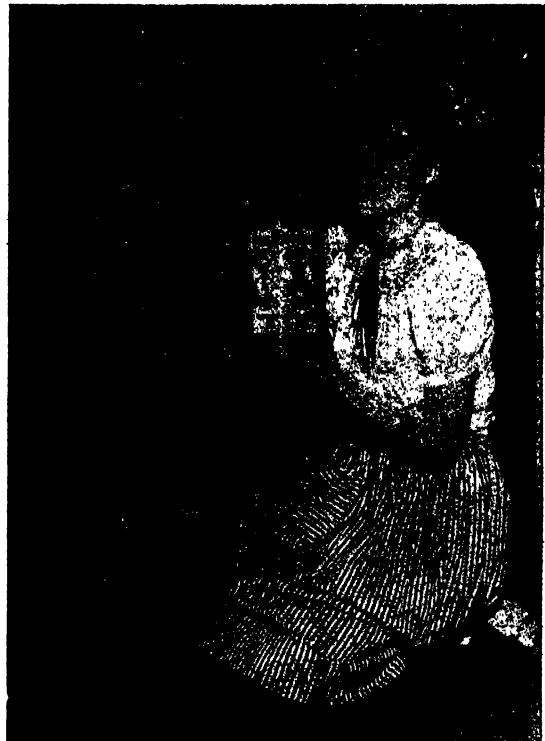
কমলা লেবুর রস জমানো

মাটির উনান্

ফৌজের সঙ্গে ধোপার ভাঁটি

ঘটিতেছে, না—ভাণ্ডারী-বিভাগ পূর্ব্ব হইতে আস্তানা পাতিয়া রেজিমেণ্টকে স্বচ্ছন্দ-অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত করিতেছে!

ভাণ্ডারীদলে বহু বিভাগ। অসংখ্য ক্যাম্পে এই সব বিভাগের

অসংখ্য শিক্ষিত রক্ষী প্রহরী ও বার্ত্তাবাহী কুকুর; কোথাও দর্জ্জির দোকান—অসংখ্য দর্জ্জি সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া ইউনিফর্ম্ম সার্ট মোজা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে; বিরাট বাহিনীর

ভোজনার্থে কোনো ক্যাম্পে আছে পশু-পক্ষীর বিরাট অক্ষৌহিণী।

কুকুর-রক্ষী-প্রহরীর কথা বলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার সময় হিটলারের ফৌজ-দলে শিক্ষিত কুকুরের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। রাশিয়ার ফৌজ-বিভাগে পঞ্চাশ হাজার কুকুর আছে; আহতদের জন্য সর্ব্বপ্রকার রশদপত্র বহা তাদের কাজ। গ্রেট ডেন্ এবং নিউ-ফাউণ্ড্ল্যাণ্ড জাতের কুকুরকে দিয়া জল এবং খাদ্যাদি বহানোর কাজ করানো হইয়াছে। এ কাজে তাদের পটুতা দেখিয়া মানুষেরও লজ্জা হইবে!. তার উপর দলের কে কোথায় আহত হইয়া ছিন্নমুণ্ড পড়িয়া আছে, এই সব কুকুর সন্ধান করিয়া তাদের বহিয়া আনে। যে সব কুকুর রক্ষীর কাজ করে, তাদের ঘ্রাণ-শক্তি এমন উগ্র যে ভিন্ন-পক্ষীয় কোনো লোক দুশো গজ দূরে আসিবা মাত্র তারা বুঝিতে পারে—

জমাট খাদ্যে জল মিশাইয়া

বুঝিয়া সঙ্কেত-ধ্বনি করে। শিক্ষিত মানুষ-রক্ষীর সাধ্য কি—গন্ধে শত্রুর নির্দ্দেশ পাইবে! রক্ষী-কুকুর শুধু সঙ্কেত জানাইয়া চুপ করিয়া থাকে না—অনেক সময় নিঃশব্দে গিয়া শত্রুর টুঁটি কামড়াইয়া ধরে। সে কামড় এমন যে তার ফলে শত্রুর জীবনান্ত ঘটে! এই সব কুকুরের লালন ও শিক্ষার ভার ভাণ্ডারী-বিভাগের হাতে সংন্যস্ত।

কোনো দেশে ফৌজ পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবামাত্র ভাণ্ডারী-বিভাগ সেখানে লোক পাঠায়। এ বিভাগের লোক-জন গিয়া সেখানে প্রয়োজন মত সমর-ঘাঁটী বা ফৌজ থাকিবার আস্তানা নির্ম্মাণ করে—ফৌজের প্রয়োজন বুঝিয়া সর্ব্বপ্রকার রশদ-পত্রে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার খুলিয়া বসে। ইজারা-ঋণ-পদ্ধতির ফলে চীন, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া—সর্ব্বত্র আজ এই ভাণ্ডারী-বিভাগ রসুইশালা রচনা করিতেছে।

জলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী—নির্ম্মল বিশুদ্ধ পানীয় জল। ফৌজের প্রত্যেকের অন্ততঃ এক পোয়া জল প্রত্যহ পান করা চাই। পাহাড়ী প্রদেশে ভাণ্ডারী-বিভাগ পাহাড় খুঁড়িয়া বিরাট বাহিনীর প্রয়োজনানুরূপ জল কি করিয়া পাইবে? এ জন্য দলে আছে বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ার ও মিস্ত্রী-মজুর; এবং সিমেন্ট, লোহার পাইপ, পাম্প, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি। পাহাড় ফাটাইয়া নির্ঝর বহাইয়া পাইপ-যোগে জল আনা হয়—সে জল থাকে বড় বড় ট্যাঙ্কে বা চৌবাচ্ছায়। সঙ্গে আছে সিমেন্ট—অসংখ্য পিপা-ভরতি—সিমেন্ট দিয়া নিমেষে বড় বড় চৌবাচ্ছা তৈয়ারী করা হয়। কাজেই যত বড় বিরাট বাহিনী আসিয়া আশ্রয় লউক, এতটুকু জল-কষ্ট কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না!

তার উপর আছে মশা-মাছি-ছারপোকা প্রভৃতির উৎপাত! কোনো জলার ধারে বা জঙ্গলের বুকে ফৌজের ছাউনি পড়িল—সেখানে মশা-মাছি-ছারপোকার উৎপাতে ফৌজ স্বাচ্ছন্দ্য পাইবে কেন? নানা রোগের আশঙ্কা! মশা-মাছি প্রভৃতি ধ্বংস করা হয় বৈজ্ঞানিক কৌশলে। তাছাড়া ফৌজের পোষাক, বালিশের ওয়াড়,

বর্ষাতি কোট

বিছানার চাদর প্রভৃতি ভালো করিয়া কাচিয়া যন্ত্রযোগে নিত্য বিশুদ্ধ বা ষ্টেরালাইজ্ করা হয়। এ ব্যবস্থাও এই ভাণ্ডারী-বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে।

ভাণ্ডারী-বিভাগের অধীনে একটি উপবিভাগ আছে। তার নাম সিগনাল-কোর বা সাঙ্কেতিক-দল। এ দল না থাকিলে সমগ্র ফৌজ অন্ধ-বধির এবং মূক বনিবে! এ দলের কাজ যে পথে ফৌজ চলিবে—যেখানে আস্তানা পাতিবে—প্রধান কেন্দ্র হইতে সে-পথ ধরিয়া ছাউনি পর্য্যন্ত তারা পতাকা, সাঙ্কেতিক বাতিদান, টেলিফোন, টেলিটাইপ, টেলিগ্রাফ ও রেডিয়োর ব্যবস্থা করিবে। এ দলের সঙ্গে আছে শিক্ষিত পারাবত-বাহিনী। এই সব পারাবত-মারফৎ স্বপক্ষের সঙ্গে সর্ব্বদা বার্ত্তা-বিনিময় হয়। এ দলে বহু ভারতীয়কেও নিয়োগ করা হইয়াছে; তার কারণ, ভারতীয় বার্ত্তাবাহী যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে,

তাহা হইলে ভারতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া শত্রুপক্ষ তাদের মুখ হইতে কোনো মতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে না!

ভ্যালি ফোর্জে ঘন বরফে মার্কিণ ফৌজের জুতা জীর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল—পা ফাটিয়া রক্ত ঝরিয়া ফৌজদল সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয় এবং অনেকের প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল। সে বহু যুগের কথা। তখন জুতা ছিঁড়িলে ফৌজকে নূতন জুতা জোগাইবার ব্যবস্থা ছিল না।

এখন এমন সুব্যবস্থা হইয়াছে যে প্রতি রেজিমেন্টে ভাণ্ডার-বিভাগের অধীনে বহু জুতি-সেলাই ও জুতা তৈয়ারী করিতে নিপুণ মুচির সংখ্যা প্রচুর। জুতায় যদি পেরেক ওঠে, জুতা যদি কষা হয়, তখনি ভাণ্ডার-বিভাগের মুচি সে-সব জুতা মেরামত করিয়া দেয়।

ফৌজের জন্য মাংস

ফৌজ-বিভাগে কেহ প্রবিষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের মাপ লইয়া তাকে দেওয়া হয় ৬৬ দফা পোষাক—সুতির সার্ট হইতে সুরু করিয়া ষ্টিলের হেলমেট পর্য্যন্ত। এই ৬৬ দফা পোষাকে খরচ পড়ে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা! এক জনের পোষাকে যদি এত টাকা খরচ হয়, তাহা হইলে কোটি লোকের পোষাকের খরচ কত, কষিয়া দেখিলে রোমাঞ্চ ঘটিবে! প্রত্যেকের জন্য এ-পোষাক জোগাইতে হয় এই বিরাট ভাণ্ডার-বিভাগকে। প্রত্যেকটি লোকের গায়ের মাপ লইয়া পোষাক এবং পায়ের মাপ লইয়া জুতা তৈয়ারী করিতে গেলে সময় লাগিবে কত! এ বিলম্ব না ঘটে, এ জন্য ভাণ্ডার-বিভাগ, মোটা-রোগা-বেঁটে-লম্বা গড়নের সকলের গায়ের মাপের লক্ষ লক্ষ পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ব্বক্ষণ তৈয়ারী মজুত রাখিতেছে—পায়ের জুতা-মোজা হইতে সুরু করিয়া সুতি ও গরম কাপড়ের শর্ট, ট্রাউজার, সার্ট, কোট, ভেষ্ট, মাথার টুপি, কোমরের বেল্ট পর্য্যন্ত! তার উপর ভাণ্ডারে আছে গরম মেশিনগান্ চালাইবার জন্য এ্যাসবেষ্টসের দস্তানা; যারা মোটর-বাইক চালায়, শীতের দিনে তাদের ব্যবহারের জন্য ভেড়ার চামড়ার মাফলার; গরম-দেশে ব্যবহারোপযোগী ঠাণ্ডা ওয়াটার-প্রুফ কোট; আর্মার্ড-ফোর্সের বাহিনীর জন্য চামড়া এবং উলের তৈয়ারী দস্তানা; প্লেন বা জাহাজ হইতে বিপক্ষ-প্রদেশে থাকিয়া বাহিনীকে কাঁটা-তারের বেড়া কাটিয়া আস্তানা রচনা করিতে হয়, তাদের জন্য ঘোড়ার চামড়ার তৈরী বিশেষ প্যাটার্ণের দস্তানা; তুষার দেশে ও জলা-জঙ্গলে সেনাদের ব্যবহারোপযোগী এক পিঠে সাদা অন্য দিকে সবুজ রঙ করা স্যুট্। বরফের দেশে এ পোষাক
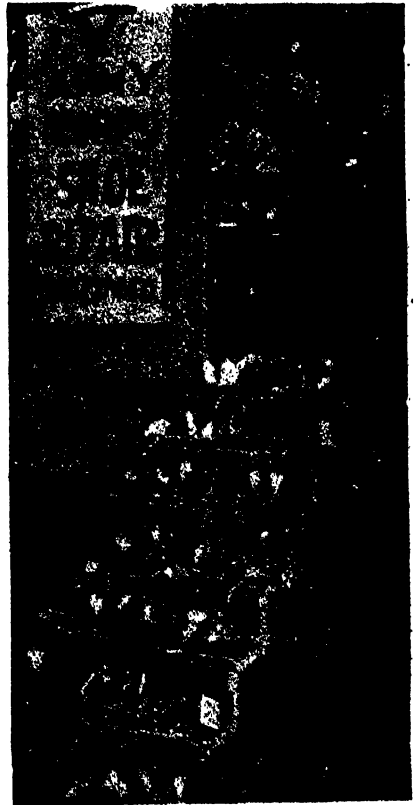
জুতার কারখানা

বরফের সাদা রঙে যেমন মিশিয়া থাকিবে, জঙ্গলে তেমনি সবুজ রঙ শত্রুর চোখে পড়িবে না! বিশেষ-গড়নের টুপি, চশমা, শয্যাথলি; বিমান-বাহিনীর জন্য শীত-নিবারক বৈদ্যুতিক-শক্তিতে তাপ-যুক্ত পোষাক। বৈদ্যুতিক তাপ-যন্ত্র এ পোষাকে এমন কৌশলে আঁটা যে ইচ্ছামত সঞ্চারিত তাপের মাত্রা বেশী বা কম করা যায়।

ফিলাডেলফিয়ার বিরাট কারখানা যেন ময়মদানবের পুরী! সেখানে এ-সব জিনিষ বিচক্ষণ শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে অজস্র পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে। তৈয়ারীর কাজে এক-নিমেষ বিরাম নাই! কাপটেন্ পল্ সিপল্ গিয়াছিলেন দক্ষিণ-মেরু অভিযানে বয়-স্কাউট-দলের অধ্যক্ষরূপে। তিনি আজ ফিলাডেলফিয়ার কারখানায় শীতের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করাইতেছেন। ভারী পোষাক গায়ে চড়াইয়া বিমান-বাহিনীর পক্ষে আকাশ-পথে যুদ্ধ করায় অস্বাচ্ছন্দ্য

ঘটে ; এ জন্য তাঁদের জন্য তৈয়ারী হইতেছে খুব হালকা অথচ শীত-নিবারক পোষাক।

ফিলাডেলফিয়ায় সমর-ভাণ্ডারে জুতা জামা মোজা দস্তানা টুপি কম্বল, বেল্ট, শয্যা, মশারি, শয্যা-থলি জড়ো হইয়া আছে পাহাড়-প্রমাণ! বেল্ট যা আছে সেগুলি পর-পর লম্বালম্বি ভাবে সাজাইলে দু' হাজার মাইল পথ বেল্টে ছাইয়া যাইবে। স্যাম-ব্রাউন বেল্টও এমনি অজস্র পরিমাণে মজুৎ আছে।

ছাব্বিশ সের ওজনের ভারী জিনিষ চাপাইয়া বহন করিলে যে-কম্বল ছিঁড়িয়া যায়, এমন কম্বল বাতিল ও নামঞ্জুর। উল বাছাই করা হয়—চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া উলের অতিসূক্ষ্ম তন্তুটিকে মাইক্রশকোপে পরখ করিয়া। কাপড়-চোপড় যে বিভিন্ন রঙে রঙানো হয়, সে সব রঙ রৌদ্রে-জলে ব্যবহারে উঠিয়া না যায়—সে জন্য রাসায়নিক শিল্পীদের কি অধ্যবসায় চলিতেছে, দেখিলে তাক লাগিবে। রবার কত মিলিবে? এ জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফৌজের পোষাকে ব্যবহারার্থে রবারের পরিবর্ত্তে রৌদ্র-জল-নিবারক নকল রবার তৈয়ারী হইতেছে। সে সব রবার নানা রাসায়নিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই পোষাক

রুটি তৈয়ারী

তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয় ; নচেৎ সেগুলি বাতিল হইয়া যায়। গাড়ীতে মালপত্র অল্প জায়গায় যত বেশী তুলিয়া সাজাইয়া পাঠানো যায়, সে-কৌশলও ফৌজের প্রত্যেকটি প্রাণীকে সযত্নে শিখানো হয়!

তাঁবু চাই লক্ষ লক্ষ। তাঁবুর জন্য ক্যাম্বিশ অপরিহার্য্য। সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাজ্যের যেখানে যত ক্যাম্বিশ তৈয়ারী হইতেছে, সে ক্যাম্বিশ পুরাপুরি মার্কিণ সমর-বিভাগ আজ গ্রহণ করিতেছে। তাঁবু তৈয়ারী হইতেছে সম্পূর্ণ নূতন প্রথায় ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা মানিয়া। এ সব তাঁবুর ক্যাম্বিশে রঙ দিয়া চিত্রবিচিত্র নক্সা আঁকা হয়। জঙ্গলে যে তাঁবু খাটানো হইবে, গাছপালার রঙে রঙ মিশিয়া একাকার থাকিবে বলিয়া সে সব তাঁবুর ক্যাম্বিশে যেমন গাছপালার বিচিত্র রঙিন নক্সা, তেমনি বালুকাময় প্রদেশের তাঁবুর ক্যাম্বিশ রঙের মায়ায় দেখায় বালুকার মত! এলুমিনিয়ামে টান ধরিয়াছে বলিয়া পাতলা লোহার পাতে বালতি, বাসন, তৈজসপত্রাদি তৈয়ার হইতেছে।

তার পর ব্যাণ্ড! ব্যাণ্ডের বাদ্যে প্রাণে উদ্দীপনা জাগিবে, মনের অবসাদ দূর হইবে—এ জন্য ব্যাণ্ডের বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারী হইতেছে লাখে-লাখে। এক একটি বাদ্যকর-দলে বাদ্যযন্ত্র থাকে আটাশটি করিয়া। ড্রাম, চেলো, বেহালা, হর্ণ, ক্লারিয়োনেট, পিকোলো, ফ্লুট প্রভৃতি। এ সব বাদ্যযন্ত্র শুধু তৈয়ারী করা নয়, সুর মিলাইয়া নিখুঁৎ করিয়া তোলা হইতেছে।

হানিবল ও জুলিয়াস সীজরের আমোল হইতে সেনাদের পদ-মর্য্যাদানুসারে তাদের পোষাকে নিদর্শন আঁটার রীতি চলিয়া আসিতেছে। মার্কিণ ফৌজ বিভাগে চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে সার্জ্জেণ্টের সংখ্যা ন' লক্ষ—এ-সব সার্জ্জেণ্টের পদে বহু বিভাগ আছে ; এবং কর্পোরালের সংখ্যা আট লক্ষ! প্রত্যেকের পোষাক তাঁদের পদানুযায়ী বিভিন্ন নিদর্শন। অর্থাৎ ধাতু-নির্ম্মিত নক্ষত্রভূষণে জেনারেলের মর্য্যাদা বুঝায় ; ঈগলে বুঝায় কর্ণেল ; ওক-তরুপল্লব এবং রেখার মাত্রায় বুঝায় অফিসারদের শ্রেণী ; পক্ষভূষণে বুঝায় বিমান বাহিনীভুক্ত ফৌজ ; আর্টিলারী বিভাগের নিদর্শন আড়াআড়ি কামানের ছবি ; রাইফেলে পদাতিকের পদসঙ্কেত। আর্মার্ড বাহিনীর পদ বুঝায় ট্যাঙ্কে ; পতাকায় বুঝায় সিগনাল-কোর এবং ক্রশ-চিহ্নে বুঝায় মেডিকেল-কোর! এ সব সঙ্কেত-নিদর্শন কাপড় কাটিয়া সেই কাপড়ে তৈয়ারী হইতেছে—সমর-ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারে কোটি কোটি 'নিদর্শন' মজুত আছে! ডিজাইনের এক এক থাক কাপড়ে একশোটি করিয়া সাদা ছাপ মারিয়া মেয়েরা এই সব নিদর্শন ছাপিতেছে।

ফৌজের এক-এক জনের পোসাকে উল লাগে আড়াই মণ ওজনের! ২৬টি ভেড়ার লোম হইতে আড়াই মণ উল মেলে! সৌভাগ্যক্রমে মিত্রপক্ষকে উলের জন্য বেগ পাইতে হয় না—সমগ্র পশ্চিম ভূখণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় মেষ প্রচুর—কাজেই মিত্রপক্ষের পশমের অভাব কোনো দিন ঘটিবে না! লুঠপাট করিয়া হিটলার সামান্য উল সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে। উলের অভাবে হিটলারী বাহিনীকে শীতের দিনে দায়ে পড়িয়া অকর্ম্মণ্য থাকিতে হয়।

তার উপর ফৌজের প্রত্যেকটি লোকের জন্য চাই ন' জোড়া করিয়া জুতা। ফৌজে ঢুকিবামাত্র দেওয়া হয় তিন জোড়া ; চার জোড়া মজুত রাখা হয়—নাম লিখিয়া চিহ্নিত করিয়া—চাহিবামাত্র এ তিন জোড়া পাঠাইতে হইবে ; এবং বাকী দু' জোড়ার জন্য চামড়া কাটিয়া হীল বানাইয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় পর্ব্বে তিন জোড়া পাঠানো হইলে এ দু' জোড়াকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখা হয়।

যে সব সেনাকে শীতপ্রধান দেশে পাঠানো হয়, তাদের ব্যবহার-উপযোগী জুতা তৈয়ারী করানো হয় সীল ও রেইন-ডীয়ারের চামড়ায়। এ জুতা তৈয়ারী করে এসাকিমো রমণীরা। সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও হইয়াছে। প্যারাশুট-বাহিনীরা সবেগে মাটীতে নামিলে পায়ে চোট লাগিবে—সে চোট না লাগে, এ জন্য তাদের জন্য খুব মোটা রবারের জুতা তৈয়ারী হইতেছে। এ জুতার ছাঁদ-প্যাটার্ণ সবই স্বতন্ত্র!

চেঙ্গিশ খান যখন বিপুল অক্ষৌহিণী লইয়া অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, তখন প্রয়োজন ঘটিলে তাঁর সেনাদের খাইতে দেওয়া হইত ঘোড়ার দুধ। ঘোড়ার দুধ না মিলিলে ঘোড়ার রক্ত। খাদ্যাভাবে কখনো বা অভিযান বন্ধ রাখিয়া সেনাদের দিয়া জমি চষাইয়া ফশল ফলানো হইত—সে-ফশলে অন্নাভাব মোচন হইলে তবে আবার অভিযান চলিত! সে যুগের অভিযাত্রী-বাহিনীর চেয়ে এ মহাযুদ্ধে বাহিনীর সংখ্যা অনেক বেশী—অথচ সমর-ভাণ্ডারীর কুশলতায় আহারে-বিহারে আশ্চর্য্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা। এবং এই নিয়ম ও

শৃঙ্খলার জন্য অর্থাচ্ছন্দ্য বা অস্বাস্থ্য হেতু অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কা কাহারো নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সেনার জন্য তিন সের ওজনের খাদ্য বরাদ্দ আছে। তার অর্থ পঞ্চাশ লক্ষ সেনার জন্য চাই দিনে ৩৭৫০০০ তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মণ ওজনের খাদ্য। বড় গাড়ীতে হাজার মণ খাদ্য বহন করা চলে। কাজেই তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মণ ওজনের খাদ্য বহিতে অন্ততঃপক্ষে ৩৭৫ খানি ট্রাক্-গাড়ীর প্রয়োজন; অথবা প্রত্যহ চাই ছ'খানি করিয়া বড় মাল-বাহী ট্রেণ! সমর-ভাণ্ডারীর কর্ম্ম-কুশলতায় খাদ্য-সরবরাহে একটুকু অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে না।

তার পর খাদ্যে কত রকমের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হয়! গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যে সব ফৌজ যায়, তাদের জন্য চাই সে-দেশের জল-দশ সের! বাঁধাকপি দাঁড়ায় ওজনে এক মণ দশ সের! আড়াইসেরী টিনে যে মুর্গীর সুরুয়া জমাট চূর্ণ ভাবে দেওয়া হয়, তাহাতে জল মিশাইলে সুরুয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ওজনে ২৫ গ্যালন!

চালানী জাহাজে ও গুদামে জায়গা বাঁচাইবার জন্য লেবু দেওয়া হয় শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া। সাত সের ওজনের কমলা লেবু—বরফে জমাট বাঁধাইয়া এক সের ওজনে পরিণত করিয়া বোতলে বা টিনে ভরা হয়। এমনি করিয়া সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর ভোজ্য-পানীয়কে জমাট করিয়া তোলা হইতেছে—এ জন্য ভাণ্ডারীর অধীনে বিবিধ কারখানায় কত লোক খাটিতেছে, কত যন্ত্র চলিতেছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না! এই ভোজ্য-পানীয়ে যাহাতে এতটুকু অস্বাস্থ্যের বিষ না জমে, সে সম্বন্ধে সতর্কতার সীমা নাই।

ভাণ্ডারের পাচকরা অজানা জায়গায় গিয়া মাটী খুঁড়িয়া উনান

অশ্বতর-পালন—টেক্‌শাস্

বাতাস বুঝিয়া তার অনুরূপ খাদ্য; প্যারাশুট ও বিমান-বাহিনীর জন্য খাদ্য দেওয়া হয় ছোট প্যাকেটে করিয়া—হালকা এবং জমাট খাদ্য।

সমর-ভাণ্ডারীর খাদ্য-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র সিকাগো সহরে। খাদ্যের তালিকায় ৩০০ দফা আহার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। চর্ব্বি, প্রোটিন, জল, তামা, ফস্‌ফেট, এবং বী ভিটামিন মিশাইয়া যে জমাট খাদ্য তৈয়ারী হইতেছে, তাহা সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। ফল-মূল, সব্জী, মাংস —এ সব ডী-হাইড্রেট্ করিয়া দেওয়া হয়। তার এক-টুকরা মাত্র লইয়া তাহাতে জল মিশাইলে ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হয়; শক্তি ও পুষ্টি মেলে। ফৌজকে দিনে তিন বার করিয়া মাংস খাইতে দেওয়া হয়। প্রত্যহ টাটকা মাংস মিলিবে কি করিয়া? তাই ডী-হাইড্রেট করিয়া টিনে ভরিয়া মাংসের সার রাখা হয়।

ডী-হাইড্রেট রীতির গুণে ৩১০৫ মণ ওজনের শুষ্কীকৃত সব্জী ও ফলের খাদ্য-মূল্য ৩১০৫০ মণ ওজনের তাজা সব্জীর চেয়ে এতটুকু কম নয়! শুষ্ক করার ফলে এক-টন ওজনের গাজর ওজনে দাঁড়ায় তিন মণ তৈয়ারী করে—আমাদের দেশের ভেন-কর পাচকদের মত—এ বিদ্যাও তারা শিখিয়াছে। ফৌজের প্রত্যেককে দিনে এক আউন্স করিয়া মিছরী ও বিশটি করিয়া সিগারেট দেওয়া হয়। মিছরী ও সিগারেট চাহিবামাত্র তারা পায়। এ দু'টি জিনিষের প্রত্যাশায় কাহাকেও একটি নিমেষ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। ইহাতে ভাণ্ডার-বিভাগের কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মোটরের যুগ বলিয়া যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন এ যুদ্ধে ট্রাক-ট্যাঙ্কই সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিতেছে—ঘোড়া ও অশ্বতরের কোনো প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে। এখনো যুদ্ধে ঘোড়-সওয়ারের সংখ্যা বড় অল্প নয়। ট্যাঙ্ক-বাহিনীর মত অশ্বারোহী বাহিনীও আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গতিবেগেই এ মহাযুদ্ধে জয়ের ইতিহাস লিখিত হইবে! সে সম্বন্ধে মার্কিন সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল লয়েড ফ্রেডেনডাল বলেন—এক একটি ফৌজ-ডিভিশন যখন

অভিযানে অগ্রসর হয়, তখন সে দলে লোক থাকে কম-পক্ষে পঞ্চাশ হাজার! এই সব লোকের সঙ্গে চলে কামান-বন্দুক, ট্রাক-ট্যাঙ্ক—দোকান-পাট, কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী—সব। সে এক বিরাট ব্যাপার! এ-কাজের জন্য মোটর গাড়ী থাকে দু' হাজার। মোটরের বদলে মাল-গাড়ী লইলে আশীখানি সুদীর্ঘ মাল-গাড়ীর প্রয়োজন হইত।

এই দু' হাজার মোটর-গাড়ীর মধ্যে কামানের গাড়ী ও ট্যাঙ্ক ছাড়া থাকে ভাণ্ডারীর প্রকাণ্ড রেডিয়ো-গাড়ী—তার প্রচার-ব্যবস্থার সরঞ্জাম সমেত; রান্না-গাড়ী; খাদ্যাদির সম্ভারবাহী গাড়ী; স্নানের গাড়ী; স্টেরালিজেশন-ট্রাক; মেসিন-গান চালকদের মোটর ও বাইক-ভরা ট্রাক; আর্মাড কার; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের বিপর্য্যয় পরিমাণ তার-বাহী গাড়ী—(এ তার দশ মাইল পথ জুড়িয়া বিছানো যায়) এঞ্জিনীয়ারের পুরা সরঞ্জামবাহী গাড়ী, বিবিধ সেতু-বাহী গাড়ী—এ গাড়ীতে সেতু বাঁধিবার সকল সরঞ্জাম মজুত থাকে—প্রয়োজনমাত্র সে সব সরঞ্জাম নামাইয়া ৩৫০ ফুট চওড়া নদীর বুকে নিমেষে সেতু রচনা করা হয়।

অভিযাত্রীদের জন্য সমর-ভাণ্ডারী সব সময়ে জোগান দেয় এক লক্ষ পনেরো হাজার গ্যালন পেট্রোল। এ-পেট্রোলে এক একটি ডিভিশন দিনে ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে—সিধা ভালো পথ হইলে ৩০০ মাইল অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। যখন যুদ্ধ বাধে, দিনের পাড়ি তখন ১৫ হইতে ২৫ মাইল মাত্র দাঁড়ায়!

এঞ্জিনীয়াররা গড়িতে যেমন তৎপর, ভাঙ্গিতেও তেমনি! বিপক্ষ-প্রদেশে পৌঁছিয়া তাঁরা মাতেন সেতু ভাঙ্গা, দুর্গ-পরিখা চূর্ণ করা, পথ ধ্বংসানো—এই সব কাজে।

স্থলপথে যুদ্ধের ঘনঘটা জমিয়া উঠিলে বিমান-বাহিনী রেডিয়ো-মারফৎ সংবাদাদির আদান-প্রদানে প্রাণের ভয় রাখে না—চারি দিকে কাজের যে সাড়া জাগে, তাহার মধ্যে কেহ নিজের কর্ত্তব্য ভোলে না। এ সময় ভাণ্ডার-বিভাগের লোকজন যথাসময়ে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ-পত্র, খাদ্য-পানীয়, পথ্য-ঔষধ জোগানো—কোনো কাজে এতটুকু ত্রুটি ঘটিতে দেন না! এই শৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ফলে মিত্রপক্ষের সমরায়োজন এমন নিখুঁৎ হইয়াছে যে অকারণে যেমন শক্তিক্ষয় হইতেছে না, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীর সাধনায় বিপুল-বাহিনীর আশা-উৎসাহও এতটুকু কমিতেছে না। এই আশা ও উৎসাহই যুদ্ধ-জয়ের মন্ত্র—এ মন্ত্র সফল হইবে সমর-ভাণ্ডারীর অপরূপ সহযোগিতার গুণে।

ফৌজের সঙ্গে চলে রশদের গাড়ী

স্ত্রী ও পুরুষ

(বিদেশী কবিদের ভাবানুসরণে)

১

পুরুষ-জীবন বেড়ি জড়াইয়া উঠে নারী লতিকার মত
যত গাঢ় আবেষ্টন, তত দৃঢ় সে বাঁধন—বাড়ে শক্তি তত!

২

রমণী যখন প্রেমের স্বপ্ন হেরে, পুরুষ তখন যশের পিছনে ধায়!
পুরুষ যখন প্রেম-তৃষ্ণায় ফেরে, মা হয়ে রমণী অবসর নাহি পায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্রোত বহে যায়

(উপন্যাস)

৬।

শেষ রাত্রে আকাশ ফাটিয়া প্রচণ্ড বৃষ্টি নামিল। সে বৃষ্টি সমানে চলিল। সকালে সাতটা বাজিল, আটটা বাজিল, বৃষ্টির তবু বিরাম নাই! বিচ্ছেদ নাই!

আটটা বেলায় উলুন্দীর দলের ফিরিবার কথা। ঘাটে জমিদার বাবুর বজরা আছে; উলুন্দী হইতে পাঁচ-সাতখানা পান্‌সীও আসিয়াছে। যাত্রার লগ্ন নির্দ্দিষ্ট। বাবুদের সঙ্গে আসিয়াছেন গুরু-পুরোহিত,—পাঁজি খুলিয়া নির্দ্দোষ লগ্ন কষিয়া দিলে তবে বাবুরা পথে বাহির হন্—সনাতন রীতি। এ রীতি চলিয়া আসিতেছে না কি বাবুদের পূর্ব্ব-পুরুষের আমোল সেই নবাব আলিবর্দ্দীর যুগ হইতে!

নিরাপদ আশ্রয়ে আরাম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি···বিশেষ বাদলার দিনে এবং ধনী কুটুম্বের গৃহে! সে-আরাম ত্যাগ করিয়া জলে-কাদায় বাহির হওয়া—গুরু-পুরোহিত যাইবেন পান্‌সীতে! ছোট পান্‌সী,—উলুন্দী নেহাৎ কাছে নয়,—নদীতে পাঁচ-ছ' ঘণ্টার পথ; খল এবং ক্রুর বলিয়া নদীটির কুখ্যাতি আছে! কি জানি, বর্ষার বিপুল স্রোতে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া যদি কিছু ঘটিয়া যায়!

পুরোহিত বলিলেন—এ-বৃষ্টিতে বেরুনো সমীচীন হবে কি?

কর্ত্তা দেবেশ মুখুয্যে বলিলেন—আপনারাই তো বলেছেন, বেলা আটটায় মাহেন্দ্র-ক্ষণ···

গুরু বলিলেন—তা বলে' এ দুর্য্যোগে জল-পথে যাত্রা সমুচিত হবে না!

মাখন গাঙ্গুলি মিনতি জানাইলেন, বলিলেন,—আমারো ইচ্ছা নয়, এ-জলে বেরুবেন।

দেবেশ মুখুয্যে বলিলেন—বজরায় ভয় নেই!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—তা নেই, জানি। তবে যাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দ হবে না। বজরার কামরার মধ্যে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা নির্জীবের মতো চুপচাপ থাকতে হবে!

সঙ্কোচ ঠেলিয়া পুরোহিত বলিলেন—বজরায় তো সকলে যাবেন না···পান্‌সীতেই বেশী লোক যাবে। বলা যায় না,—পান্‌সীতে বিপদ নেই, এমন নয়? এতগুলি প্রাণী···এঁদের সম্বন্ধে আপনার দায়িত্ব আছে···

দেবেশ মুখোপাধ্যায় এ কথার জবাব দিলেন না। তিনি চাহিলেন মাখন গাঙ্গুলির পানে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—আমার ইচ্ছা, এবেলা এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে···অর্থাৎ দেরী হবে না। তার পর বেলা বারোটা-একটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা করবেন। বৃষ্টিও ততক্ষণে ধরবে, মনে হয়।

দেবেশ মুখুয্যে বলিলেন—আপনারা সকলে বলছেন যখন··· কিন্তু···

এ-কিন্তুর ব্যাখ্যা তিনি বুঝাইয়া দিলেন মাখন গাঙ্গুলিকে অন্তরালে লইয়া গিয়া।

ব্যাখ্যা শুনিয়া মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—বিলক্ষণ! তার জন্য চিন্তা কি!

সঙ্গে সঙ্গে খাস-ভৃত্য বনমালীর ডাক পড়িল। এবং···

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—বিরাট বাবুর ঘুম ভাঙ্গলো?

বিরাট অর্থে বিরাটেশ্বর রায়···দেবেশ মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী-পতি ···রায়-মাটীর জমিদার। সৌখীন বলিয়া তাঁর খ্যাতি আছে এবং গান-বাজনা প্রভৃতি ললিত-কলার নামে তিনি একেবারে মাতিয়া ওঠেন!

দেবেশ মুখুয্যে বলিলেন—তার ঘুম এখনি ভাঙ্গবে? সে শুতে যায় রাত তিনটে-চারটের সময় আর ওঠে বেলা বারোটায়! দারুণ বোনেদী চাল। ও বলে, ওদের গোষ্ঠীতে কেউ কখনো সূর্য্যোদয় দেখেনি! দেখা না কি নিষেধ!

মাখন গাঙ্গুলি মনে-মনে খুশী হইলেন। এ-ঘরের নাম বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন। বাঙলা দেশে এত-বড় প্রাচীন জমিদার-বংশ আর নাই! ইতিহাসে না কি এ-বংশের আদি-পুরুষের কীর্ত্তি-কথা নবাব আলিবর্দ্দির সঙ্গে অমর অক্ষরে লেখা আছে! ইতিহাস খুলিয়া সে কীর্ত্তি-কলার পরিচয় তিনি কখনো লন নাই; তবে লোক-মুখে প্রচারিত এ-কথা শুনিয়া আসিতেছেন তাঁর জ্ঞান হওয়া ইস্তক!

দেবেশ মুখুয্যে ডাকিলেন—শঙ্কর···

শঙ্কর তাঁর খানশামা। উলুন্দী হইতে আসিয়াছে!

শঙ্কর আসিল।

দেবেশ মুখুয্যে বলিলেন,—এ বৃষ্টিতে এবেলা আর যাওয়া হবে না। তুই আমার স্নানের উদ্যোগ কর্।

বিরাটেশ্বর কিন্তু বনিয়াদী-নিয়ম ঠেলিয়া বেলা নটায় আজ শয্যা ত্যাগ করিলেন! খানশামার সাহায্যে মুখ-হাত ধুইয়া তিনি আসিলেন সদরের বৈঠকখানায়। গত রাত্রির উৎসবের পর বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে সারা বাড়ীতে কেমন যেন বিশৃঙ্খলা! উৎসবের সে সুর কেটে গিয়াছে···দীপ্তি-মহিমাও মলিন মূর্চ্ছিত রহিয়াছে!

বিরাটেশ্বর কহিলেন—মুনিয়া জানের কানাড়াটা কাল খাশা জমেছিল! বোনেদী ঘর! ওর মা লীলা-জানের গান আমরা শুনেছি। মায়ের নাম রাখবে বটে! কর্ত্তাদের আমোলে আমাদের রায়বাটীতে উঠতে-বসতে লীলা-জানকে আনিয়ে তাঁরা আসর মাত করে তুলতেন!···তা মুনিয়া চলে গেছে?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—যাবার উদ্যোগ করছে! গাড়ী তৈরী ···ষ্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—এই বাদলায় বেরুবে? ভাবছিলুম, এ-বেলাটা থেকে গেলে হয়! কি বলেন মুখুয্যে মশাই? মুনিয়া একখানা মেঘ-মল্লার ছাড়তো···আঃ!

অতিথির সাধ···মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—বেশ, ওর লোককে ডেকে ফরমাশ জানাই।

মুনিয়ার লোক আলম মিয়া আসিল। মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বিবির মেহেরবাণী হবে? এ বেলায় বাবুরা গান শুনতে চাইছেন!

আলম বলিল—আপনারা হুকুম করছেন···গিয়ে বলি। কাল রাত্রে মেহনৎ গেছে···আজকে জিরেন! এমনি উনি নিয়ম।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—কুছ পরোয়া নেই মিয়া-সাব!···মেহনতের

[illegible]থাকবে। বিবি-সায়েবকে একবার বেলায় জানাও।

আলাম বলিল—জী···

রাত্রে সরস্বতীর আর এ-বাড়ীতে ফেরা হয় নাই···বিন্দুমতীর [illegible] রহিয়া গিয়াছে। সকালে ঘুম ভাঙিতে এই দুর্য্যোগ··· [illegible]লও মামীমার ওখানে রাত্রি কাটাইয়াছে।

এখন বেলা নটায় গাঙ্গুলি-বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া হাজির।

[illegible]—পিশিমা···

সরস্বতী বলিল—কেন রে?

ভৃত্য বলিল—বৃষ্টিতে এবেলায় ওঁদের যাওয়া হলো না···সব রয়ে [illegible]লেন। এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন!

সরস্বতী বলিল—তা হলে উদযুগ চাই তো! আবার যজ্ঞির ধুম!

সুশীল বলিল—একশো জনের ব্যবস্থা!

ভৃত্য বলিল—কর্ত্তাবাবু পাঠিয়ে দিলেন। তুমি চলো···তোমাকেই [illegible] দেখতে হবে!

সরস্বতী বলিল—চ···বিন্দুমতীর পানে চাহিল, কহিল—ওরা [illegible] গেলে আবার আমি আসবো বৌঠাকরুণ।

বিন্দুমতী বলিলেন—আসিস্···

ভৃত্য পাল্‌কী আনিয়াছিল; সেই পাল্‌কীতে করিয়া সরস্বতী [illegible]য়া গেল।

সুশীল বলিল—আমিও যাই মামীমা। একবার ঘুরে বনেদী সংসর্গ [illegible]ভোগ করে আসি।

বিন্দুমতী বলিলেন—এই জলে যাবি?

সুশীল বলিল—ছাতা নিয়ে যাচ্ছি মামীমা। জল বলে চুপচাপ [illegible]লেও তো চলবে না। মামাবাবু বলবেন, গা-ঢাকা দিয়ে [illegible] কাজের বাড়ীতে এসে!

বিন্দুমতী বলিলেন—তাহলে যা···অনর্থক কিন্তু ভিজিস্‌নে যেন।

—না, না, খামোকা ভিজতে যাবো কেন!

ছাতা লইয়া সুশীল বাহির হইয়া পড়িল।

বৃষ্টির কি বেগ···ক'ঘণ্টা সমান তোড়ে বর্ষণ হইতেছে। জলে পথ জল-ময়···হাঁটুর উপরে কাপড় গুটাইয়া ছাতায় নিজেকে যথাসম্ভব [illegible]কিয়া সুশীল চলিয়াছে।

একটা গলির বাঁকে বনমালীর সঙ্গে দেখা। বনমালীর হাতে ঠ্যাঙে [illegible] বাঁধা কটা মুর্গী। গলির অপর প্রান্তে ক'ঘর মুসলমানের বাস।

সুশীল বলিল—এ কি বনমালী! হাতে তোমার···

বনমালী যেন শিহরিয়া উঠিল! বলিল—চুপ করো দাদাবাবু···

সুশীল বলিল—কেন রে? চুরি করেছিস্ না কি? না, খাজনা [illegible]য়নি বলে মুর্গী ক্রোক করে নিয়ে চলেছিস্?

বনমালী বলিল—না। ওঁরা এবেলায় থাকবেন কি না···বৃষ্টিতে [illegible] হলো না। তা মেনিদিদির মামাশ্বশুর এসেছেন যিনি···মুর্গী [illegible] তেনার খাবার কষ্ট হয়···তাই কর্ত্তাবাবু আমাকে ডেকে চুপি-[illegible]লেন, বাবা বনমালী, চুপিচুপি যেমন করে পারিস্, গোটা [illegible] মুর্গী জোগাড় করে আন্···এনে খিড়কীর বাগানে ঐ যে [illegible]নো গোয়াল-ঘর আছে, সেখানে চুপিচুপি রান্নার ব্যবস্থা কর! [illegible] বাবা বনমালী···বে দেখ,··· [illegible] কাক-পক্ষীতেও না জানতে [illegible]

[illegible] কৌতুক বোধ করিল। [illegible] এ-আচার যতই বিরাজ করুক, ভিতরে তাহা হইলে···

সুশীল বলিল—তুমি মুর্গী রাঁধতে জানো বনমালী?

হাসিয়া বনমালী বলিল—আপনাদের এখানে চাকরি করছি··· কোন্ কাজটা বনমালী না জানে? সাহেব-সুবো আসে···তেনাদের খুশীর জন্ম খাবার তৈরী এই আমাকেই করতে হয় গো দাদাবাবু। সে-বারে মহকুমা থেকে এসেছিল এস-ডি-ও রহমৎ সাহেব···দু'দিন ছিল···তেনাকে এই আমিই পরিতোষ করে খাইয়েছি বটে!

—তোমার কর্ত্তাবাবু মুর্গী খান্?

এতখানি জিভ বাহির করিয়া বনমালী বলিল—অমন কথাটি বলো না! কর্ত্তাবাবু এ-সব মুখে তোলেন না। তবে বলেন, সংসারে পাঁচ জনকে নিয়ে বাস করতে গেলে এগুলো কতক সয়ে থাকতে হবে বৈ কি বনমালী!

সুশীল বলিল,···হুঁ!—তা তুমি মুর্গী খাও?

বনমালী বলিল—তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না দাদাবাবু ···সে-বারে মাংস রান্না হয়েছিল অনেক···জেলার হাকিম এসেছিল ···তার সঙ্গে আরো লোকজন। তা তেনাদের খাওয়া চুকলে এত মাংস পড়ে রইলো। ফেলা যাবে? কর্ত্তাবাবুকে বললুম, ফেলে দেবো? কর্ত্তাবাবু বললেন—ফেলে দিবি নে তো কি! আমি বললুম, না বাবু, তা পারবো না। এত মেহনতের রান্না! আর তার কি সুবাস গো দাদাবাবু! কর্ত্তাবাবুকে বললুম, আমি খেয়ে ফেলি। কর্ত্তাবাবু বললেন—সে কি রে বনমালী, মুর্গীর মাংস খাবি? আমি বললুম, কেন খাবো না? দোষ কি? যখন মাছ খেতে পারি, পাঁঠা-পাঁঠী খেতে পারি, তখন মুর্গীর অপরাধ? কর্ত্তাবাবু বললেন—শাস্তরে মানা আছে রে বনমালী···কেউ শুনলে তোকে জাতে ঠেলবে! আমি জবাব দিলুম, আমরা মুখ্যু মানুষ··· আমাদের জাতই বা কি! শাস্তরই বা কি! পাঁঠার মাংস খেলে যদি দোষ না থাকে, তাহলে মুর্গীতেই বা কি দোষ, বুঝি না! জাতের কথায় কর্ত্তাবাবুর মান রেখে জবাব দিলুম, আমার খাওয়ার কথা কেউ না জানলেই হলো। কি বলো দাদাবাবু···হ্যাঃ, বলে, লুকিয়ে কত লোক কত কি খেয়ে পাচার করে দিচ্ছে···এ তো তুচ্ছ মুর্গীর মাংস!

হাসিয়া সুশীল বলিল—কে কি পাচার করছে?

কণ্ঠ মৃদু করিয়া বনমালী বলিল—কেন? মদ! আমার এই হাতেই আমি দিয়েছি গো দাদাবাবু! এই কাল রাত্তিরেই যে··· কর্ত্তাবাবু আমায় ডেকে চুপিচুপি বললেন, এনাদের মধ্যে কেউ কেউ খেতে চাইছে রে···কর্ত্তাবাবু আগে থেকে লুকিয়ে কিনিয়ে আনিয়ে-ছিলেন···আমার জিম্মাতেই ছিল। কাল রাত্তিরে যখন গান হচ্ছে··· তখন উলুন্দী থেকে যাঁরা এসেছেন, তেনাদের মধ্যে পাঁচ-সাত জন··· তবে গিয়ে, তুমি যদি কাকেও না ফাঁশ করে দাও তো তোমায় ব[illegible]···

সুশীলের কৌতূহল জাগিল। সুশীল বলিল—এ কথা আবার কাকে বলবো? কি, তুমি বলো···

সুশীলের গা ঘেঁষিয়া তার আরো-কাছে আসিয়া কণ্ঠ আরো মৃদু করিয়া বনমালী বলিল—আমাদের পুরুত-ঠাকুর গো দাদাবাবু। বললে, বনমালী, সে বাবা আমাকে একটা মাটির ভাঁড়ে ক[illegible]···একটু খানিক···দেহটা বড্ড কাহিল বোধ করছি···একটু কেমন সর্দ্দির

ও বড় চমৎকার ওষুধ! মনে মনে হেসে আমি বললুম, রও ঠাকুর, খাওয়াচ্ছি আমি তোমাকে ওষুধ! বোতল থেকে দিলুম ঢেলে একটি ভাঁড়···ঝাপাঝাপি করে'! ঠাকুর ঢক্ করে খেয়ে ফেললে···যেন মা-কালীর চর্ণামেত্ত খেলেন! হাঃ হাঃ!

শুনিয়া সুশীল বলিল—কোন্ পুরুত-ঠাকুর রে?

—কেন, তোমাদের ভশ্চাজ্জি মশাই গো···কেশব ঠাকুর।

—বটে! ঠাকুর তো খুব ওস্তাদ দেখছি, তাহলে!···অনেক গুণই আছে! মামাবাবু জানেন?

—না!···কর্তাবাবু জানেন না! তবে আমি শুনে আসছি অনেক দিন থেকে···পুরুত-ঠাকুরের ও-রোগটি আছে। ও-রোগ ধরেছে···সেই এখানে একবার এসেছিল সদর থেকে এক দারোগা··· তার কাছে হামেশা উনি যেতো তো···ঘোষপাড়ার বাগান নিয়ে ভাইপোর সঙ্গে বিবাদ চলছিল···দারোগাকে ধরে সেই বাগানখানি বাগিয়ে নিলে। ভাইপো বেচারী কিছু করতে পারলে না!···সেই সময় দারোগাবাবুর কাছে না কি ওঁর এ বিদ্যেয় হাতে-খড়ি হয়েছিল! তার পর মাঝে মাঝে ও-পারে যান। বলেন, যজমান আছে। মিথ্যে কথা গো দাদাবাবু···ও-পারে যান্ নেশা করতে! এ-পারে খেলে —জানাজানি হবে···গোল উঠবে···তাই ও-পার থেকে খেয়ে আসেন।

সুশীল বলিল—তোর কাছ থেকে কালকে চেয়ে খেলেন, জানাজানি হবে, সে-কথা মনে হলো না?

বনমালী হাসিল, হাসিয়া বলিল—ওষুধ বলে' খেলে। তার পর আমার দু'টি হাত ধরে বললে—তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো বনমালী···বোঝো তো, অসুখে ওষুধ খেতে দোষ নেই। তবু কাকেও বলো না ভাই···অপরে তা বুঝবে না! ভাববে, নেশার লোভে খেয়েছি!···এ-কথা বলে আমার দু'টি হাত ধরে মিনতি। আমি বললুম, না ঠাকুর, না···ভয় নেই, কাকেও আমি এ কথা বলবো না!···আমার মুখ যদি তেমন আলগা হতো, তাহলে গাঁয়ে এত দিনে লাঠালাঠি বেধে যেতো···কত লোকের কত কথাই আমার জানা আছে!

সুশীল বলিল—ঠাকুর-মশাইকে কথা দিয়ে আমাকে তবে এ কথা বললি যে?

বনমালী বলিল—বলবো বলে' বলিনি দাদাবাবু! কথায় কথায় কথাটা কেমন জিভ ফশকে বেরিয়ে পড়েছে। তাছাড়া তুমি তো এখানে থাকো না! দু'দিনের জন্ত এসেছো···কাকে আর তুমি এ-কথা বলতে যাবে!

সুশীল শুধু বলিল—হুঁ···

কথায় কথায় এ দুর্য্যোগ গায়ে লাগিল না···দু'জনে জমিদার-বাড়ীর নিকটে আসিল।

সুশীল বলিল—পাখীগুলো লুকোও বনমালী···কেউ যদি দেখে ফেলে, তখন জাত বাঁচানো দায় হবে।

হাসিয়া বনমালী বলিল—ছাতার আড়াল দিয়ে খিড়কীর বাগানে টুপ্ করে' ঢুকে পড়বো! ভাগ্যিস্ এখন জল হচ্ছে, পথে মানুষ নেই···নাহলে এতখানি পথ আসা মুস্কিল হতো।

বৃষ্টি থামিল বেলা প্রায় একটায়। অতিথিজির সেবা চুকিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

দেবেশ মুখুয্যে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নায়েবকে একান্তে ডাকিয়া কি সব পরামর্শ করিলেন। নায়েব আসিয়া মাখন গাঙ্গুলিকে প্রণাম করিয়া নিবেদন জানাইল—এখানকার নায়েব মশাইকে যদি আজ্ঞা করেন···

মাখন গাঙ্গুলির নায়েব কৃত্তিবাস ছিল কাছে। মাখন গাঙ্গুলির নির্দেশে দুই নায়েবে গিয়া অফিস-কামরায় প্রবেশ করিল।

দোতলায় সাজানো বৈঠকখানা হইতে এখনো তবলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে···সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কণ্ঠে বিরাটেশ্বরের তারিফের উচ্ছ্বাস! মাখন গাঙ্গুলি বুঝিলেন, মুনিয়া জানের আসরে বিরাটেশ্বর এখনো মশগুল!

কৃত্তিবাস আসিয়া সবিনয়ে মাখন গাঙ্গুলিকে জানাইল,—ওঁরা বলছেন, এবেলায় এখানে এত লোকের যে আহারাদি হলো, এর জন্ত মূল্য ধরে দেবেন। নাহলে ওঁদের কুল-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

কথা শুনিয়া মাখন গাঙ্গুলি চমকিয়া উঠিলেন!

কৃত্তিবাস বলিল,—ওঁরা বলছেন, নিয়ম বা রীতি যখন নেই—দুর্য্যোগের জন্ত নিরুপায়ে দৈবাৎ যখন আহার করতে হলো···

মাখন গাঙ্গুলির মনে তাঁর জমিদারী-মর্য্যাদা আহত সাপের মতো ফণা তুলিয়া ফুঁশিয়া উঠিল! দু'চোখের দৃষ্টিতে সে-আক্রোশের বহ্নি দেখা দিল।

এ বহ্নিশিখা কৃত্তিবাসের অপরিচিত নয়! তাই নম্র কণ্ঠে সে বলিল—ওঁরা হলেন বর-পক্ষ···

মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিতে হইল। মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বেশ···ওঁদের নায়েবকে তুমি বলো গে···সে-মূল্য একটা কড়িতেও দিতে পারেন। কুল-মর্য্যাদা তাহলে ক্ষুণ্ণ হবে না! গুরু-পুরুতরা রয়েছেন তো—ওঁরা এ বিধানে অমত করবেন না, বোধ হয়।

কৃত্তিবাস এ কথা জানাইলে বর-পক্ষ রাজী হইলেন। দু'পক্ষের গুরু-পুরোহিতের তলব হইল।

কেশব ঠাকুরকে পাওয়া গেল না। তাঁর পরিবর্তে আসিয়াছে তাঁর বড় ছেলে বিপিন। বিপিনের বয়স কুড়ি-বাইশ বছর। বিপিন বলিল, কেশব ঠাকুরের শরীর অসুস্থ···তাই তিনি বিপিনকে পাঠাইয়াছেন প্রতিনিধি···যথোচিত বিদায়-প্রণামী আদায় করিতে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—আম্‌দের পক্ষ থেকে তাহলে মর্য্যাদার মীমাংসা···

কৃত্তিবাস পরামর্শ দিল—ওঁদের উপরেই ভার দিন্।

গুরু-পুরোহিত তর্ক তুলিলেন না। তর্ক করিবার মতো মনের অবস্থা তাঁদের নয়। পান্‌সীতে করিয়া বহু দূর যাইতে হইবে। হাজিরা দিয়াছেন প্রণামী-আদায়ের জন্ত। সে কাজ চুকিয়াছে···এখন হাজিরার প্রণামী লইয়া কথা! বিশেষ, খাওয়ার মূল্যে তাঁদের কোনো স্বার্থ নাই! তাঁরা বলিলেন—এ খুব সমীচীন প্রস্তাব। বেশ, পাঁচটি কড়ি দিলেই চলবে। মূল্য মানে দু'শো-পাঁচশো টাকা,—শাস্ত্রে তা বলেনি···

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—শাস্ত্র-বাক্য উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। শাস্ত্র ঘেঁটেই তো আপনারা মত দিচ্ছেন···

তাহাই হইল। এ-দফায় এখানে পাঁচ-কড়া কড়িতে মূল্য সারিয়া নায়েব খুলিল টাকার থলি। গুরু-পুরোহিত, কুলীন, দেব-মন্দির, বারোয়ারি প্রভৃতির বাবদ যেমন যাহা দিবার রীতি

চলিত আছে, সে-রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উলুন্দীর দল মহাসমারোহে বিদায় লইল।

সুশীল গিয়াছিল নদীর ঘাটে মামাবাবুর প্রতিনিধি-স্বরূপ কুটুমদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতে।

সে-পালা চুকিলে সে আর মামার বাড়ীতে ফিরিল না··· মামীমার কাছে চলিল।

পথে কেশব ঠাকুরের বাড়ী। হঠাৎ মনে কেমন কৌতূহল জাগিল। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ থাকায় বিদায় লইতে যাইতে পারেন নাই। ছেলেকে পাঠাইয়া সে-কাজ সারিয়াছেন। সত্যই অসুখ? না, বনমালী যাহা বলিয়াছে···

মনে পড়িল কদমের কথা। সেই দীপ্তিময়ী কিশোরী!···মমতা জাগিল···বেচারী! কেশব ঠাকুরের মতো স্বামী···ও-মেয়ের মর্য্যাদা কি বুঝিবে?

মন বলিল, তোমার এ মাথাব্যথা কেন? কে তোমাকে বলিল, কেশব ঠাকুরের হাতে পড়িয়া মেয়েটি মনোবেদনায় দিন কাটাই-তেছে?···যদি বা কাটায়, সুশীল কে? কদমের কি-বা করিতে পারে?

এমনি নানা চিন্তায় সে যেন তন্ময়!

হঠাৎ কাণে শুনিল···সেই কণ্ঠ! চিন্তার তন্ময়তা ভাঙ্গিল। সচেতন মনে তাকাইয়া দেখে, ডান-দিকে সেই বাড়ী। কেশব ঠাকুরের বাড়ী। রাত্রে এই বাড়ীর দ্বারে কদমকে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

কে যেন তার পা দু'খানাকে চাপিয়া ধরিল! সুশীল দাঁড়াইল। বাড়ীর মধ্যে কদমের কণ্ঠ···কদম বেশ চড়া গলায় কার সঙ্গে কথা কহিতেছে।

কদম বলিতেছিল,—একটা মানুষ সারাদিন ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে···এত করে বলছি, বাবুদের কোবরেজ-মশাইকে ডেকে দাও···তা তোমাদের সব কাজ হচ্ছে···আর এ কাজটুকু হয় না?··· আমি মেয়েমানুষ···আমি যাবো কোবরেজ ডাকতে?

এ কথার উত্তরে জাগিল এক কিশোরের কণ্ঠ। সুশীল দাঁড়াইয়া উত্তর শুনিল।

—আপনি সেরে যাবে। ওর জন্ম কে আবার যাবে বড় লোকের কোবরেজকে ডাকতে! আমি পারবো না···

এ-কথার পর কদম নীরব রহিল। সুশীল আর কোনো কথা শুনিল না। হঠাৎ তার কি খেয়াল হইল···সে ঢুকিল কেশব ঠাকুরের বাড়ীর আঙ্গিনায়। ডাকিল,—ঠাকুর-মশাই আছেন?

দাওয়ায় ছিল কদম এবং এক জন কিশোর।

কদম দেখিল সুশীলকে। নিমেষে চিনিল। তার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া বলে, আপনি এখানে? কিন্তু পারিল না। মাথায় কাপড় টানিয়া বায়ুর গতিতে সে গিয়া ঘরে ঢুকিল।

সুশীলকে কিশোর চেনে। বাবুদের বাড়ীতে দেখিয়াছে। জানে, কর্ত্তাবাবুর ভাগিনেয় সুশীল।

দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—আপনি!

সুশীল বলিল,—হ্যাঁ। এলুম ভটচায্যি-মশাইয়ের খপর নিতে। অসুখ শুনলুম। তুমি ওঁর ছেলে?

—হ্যাঁ।

—বড়? না···

কিশোর বলিল—বড়।

—তোমার নাম?

—আমার নাম বিপিন।

—বাবার কি-অসুখ করেছে?···কাল ওখানে দেখলুম···রাত্রে নাচের আসরে ছিলেন কর্ত্তাদের সঙ্গে!

বিপিন বলিল—হ্যাঁ···অনেক রাত্রি জেগেছিলেন···তার দরুণ শরীর ভালো নেই! এ বয়সে অনিয়ম সহ্য হবে কেন!

সুশীল বলিল—দেখা হতে পারে?

বিপিন একটু কুণ্ঠিত হইল। সে জানে, বাপের অসুস্থতা কিসের জন্য!···ও-গন্ধ তার একেবারে অপরিচিত নয়। যে-দলে মিশিয়া বেড়ায়, সে-দলে ও-জিনিসের স্বাদ নিজে গ্রহণ না করিলেও দু'-চার জন করে। তাদের দৌলতেই···

সুশীল বলিল—কোন্ ঘরে আছেন?

প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল।

বিপিন বলিল—এই ঘরে।

বলিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া কদমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল— তুমি একবার অন্য ঘরে যাও বৌমা···সুশীল বাবু বাবাকে দেখতে যাচ্ছেন।

কদম দ্বারের পিছনে উৎকর্ণ দাঁড়াইয়াছিল···একেবারে যেন ছিটকাইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাওয়ার এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। শাড়ীর আঁচলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া···মুখে ঈষৎ ঘোমটার আবরণ।

সুশীল দাওয়ায় উঠিল। কদমের পানে চাহিল। চাহিবামাত্র দু'জনের দৃষ্টি মিলিল। কদমের চোখের দৃষ্টিতে যেন খানিকটা আভা! আনন্দের মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিলে আকাশে যেমন আভা জাগে, তেমনি!

চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুশীল ঢুকিল বিপিনের নির্দ্দেশে কেশব ঠাকুরের ঘরে। ঢুকিতেই একটা উগ্র গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিল।

তক্তাপোষে বিছানা পাতা। বিছানায় কেশব ঠাকুর পড়িয়া আছে। ঘরের জানলা বন্ধ।

সুশীল ডাকিল—ভটচায্যি-মশাই···

বিপিন বলিল,—কর্ত্তাবাবুর ভাগনে সুশীল বাবু এসেছেন, বাবা···

কোনো মতে মাথা তুলিয়া চোখ মেলিয়া কেশব চাহিল সুশীলের পানে। দু' চোখ লাল টক্‌টক্ করিতেছে···যেন দু'টি রাঙা জবা!

সুশীল বুঝিল···বলিল—অসুখ করেছে!

জড়িত কণ্ঠে কোনো মতে কেশব জবাব দিল—হ্যাঁ বাবা।

সুশীল কহিল—কি অসুখ?···বলিয়া কেশবের কপালে হাত রাখিল, বলিল,—না, জ্বর নয়। গা ভালো।

বিপিন বলিল—হ্যাঁ।

সুশীল বলিল—তুমি যা বললে! এ বয়সে রাত জাগার দরুণ ক্লান্তি···তারি ফলে শরীর বেজুৎ হয়ে আছে আর কি!

বিপিন সংক্ষেপে উত্তর সারিল—তাই।

ঘরের মধ্যে চারি দিকে চাহিয়া সুশীল বলিল—জানলাগুলো খুলে দাও হে···এমন বন্ধ ঘরে আমারি শরীর এলিয়ে আসছে যেন!

—আজ্ঞে, অসুখ হয়ে গেল···জলো-হাওয়া, তাই।

বলিতে বলিতে বিপিন জানলা দু'টা খুলিয়া দিল। ঘরে স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের ঝলক বহিয়া আসিল।

সুশীল বলিল—কিছু আহারাদি করেছেন আজ?

বিপিন বলিল—না।

সুশীল বলিল—চিকিৎসা-বিদ্যা আমার কিছু-কিছু জানা আছে। তুমি এক কাজ করো···সরবৎ তৈরী করে আনো দিকিনি···মিছরি ভিজিয়ে। কিম্বা ডাবের জল। মিছরির সরবৎ হলেই ভালো হয়। তাতে একটু লেবুর রস দিয়ে। আমি বসছি···আনো তুমি মিছরির সরবৎ···আমি ওঁকে এখনি খাড়া করে দিচ্ছি! মানে, অসুখে ওঁর এখন শুয়ে থাকলে চলে কখনো? মামাবাবুর ফরমাস আছে আমার উপর···ওঁর সঙ্গে পরামর্শ না করতে পারলে আমি কাজের কিছু করতে পারবো না! অথচ জানো তো কাজের কি-ভার আমাদের সকলকে এখন বইতে হবে!

বিপিনের বিশ্রী লাগিতেছিল,—বাপের অসুস্থতার জন্য বিদায়-প্রণামী আনিবার অত বড় সুযোগ তার মিলিয়াছিল! প্রণামীর টাকা মিলিয়াছে নগদ পঞ্চাশ! সে টাকা হইতে দশটি অবাধে সরাইয়া রাখিয়াছে। আখড়ায় গিয়া ও-টাকার কল্যাণে আমোদের কি বন্যা না বহাইবার ব্যবস্থা করিবে! সাজিয়া বাহির হইতেছিল···কবিরাজের কথায় কদম তুলিল বিঘ্ন! সে-কথায় তার আসিয়া যাইত না! ভারী তো পুঁচকে মেয়ে কদম! দু' বছর আগে গাছে চড়িয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়াছে···বুড়া বয়সে বাবা তাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেও বিপিন তাকে কেয়ার করে না! কিন্তু সুশীল! সে আসিয়া তার যাওয়া এমন ভণ্ডুল করিয়া দিবে!···

মিছরীর সরবতের কথায় সে যেন সুযোগ পাইল। বলিল—বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

বলিয়া দ্রুত ঘরের বাহিরে গেল। বাহিরে দাওয়ার কোণে কদম তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। দু' চোখে উদাস দৃষ্টি···নির্ব্বাক্··নিস্পন্দ···যেন কাঠের পুতুল!···

বিপিন আসিল কদমের কাছে, বলিল—শীগগির মিছরীর সরবৎ তৈরী করে দাও বৌমা। সুশীল বাবু বললেন, বাবাকে এখনি চাঙ্গা করে তুলবেন। তোমার কোবরেজ মশাইয়ের কাছে আর ছুটতে হবে না। বুঝলে!

কদম চাহিল বিপিনের পানে···তার কথার কোনো জবাব না দিয়া সে ঢুকিল ভাঁড়ারে মিছরী আনিতে।

এক বার বাহির হইবার সুযোগ পাইবামাত্র বিপিন সে-সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে বিলম্ব করিল না—সরবতের ফরমাশ জানাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া একবার দাঁড়াইল। পকেটে ছিল পাকানো সিগারেট। কাল ও-বাড়ী নিমন্ত্রণ গিয়া পাঁচ-ছ'টা প্যাকেট সরাইয়া পকেটস্থ করিয়াছে। সিগারেট জ্বালিয়া সানন্দে বিপিন চলিল আখড়ার দিকে।

পাথরের বাটীতে মিছরীর সরবৎ তৈয়ারী করিয়া কদম আসিল কেশবের ঘরে। হাতের চুড়ি এবং আঁচলের রিঙে বাঁধা চাবির শব্দে সুশীল ফিরিয়া চাহিল। কহিল,—ও···মিছরীর সরবত এনেছো!

মাথা নাড়িয়া কদম সরবতের বাটি আগাইয়া ধরিল।

সুশীল বলিল—তুমি খাইয়ে দাও।

কদম গিয়া বসিল কেশব ঠাকুরের মাথার কাছে।

সুশীল ডাকিল—ভটাচার্য্যি-মশাই···

চোখ না খুলিয়াই কেশব ঠাকুর সাড়া দিল—উঁ!

সুশীল বলিল—কদম সরবৎ এনেছে। খেয়ে ফেলুন। আরাম পাবেন।

কদম সরবৎ খাওয়াইল।

সুশীল প্রশ্ন করিল—বাড়ীতে দুধ আছে?

মাথা নাড়িয়া কদম জানাইল, আছে।

—বেশ। এখন একটু দ্যাখো—আধ ঘণ্টাটাক। যদি না সেরে ওঠেন, তাহলে একবাটি দুধ খাইয়ে দিয়ো।

এ-কথা বলিয়া সুশীল বাহিরে আসিল।

কদমও আসিল। বাহিরে আসিয়া কদম কথা কহিল। বলিল,—আপনি চলে যাচ্ছেন?

সুশীল বলিল—হাঁ···কেন বলো তো?

কণ্ঠে যে-কথা আসিয়া জমিয়াছিল, সে কথা মুখে বাহির হইল না! কদম মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুশীল ততক্ষণে উঠানে নামিয়া গিয়াছে। কদমের পানে চাহিল। ঘোমটার ফাঁক দিয়া কদমের দু' চোখের দৃষ্টিতে যে করুণ মিনতির আভাষ দেখিল, মমতা হইল!···বলিল,—কিছু বলবে আমাকে?

কদম জবাব দিল না···মাটার পানে চাহিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

কদম কি বলিতে চায়? সুশীল বলিল,—বলো। সঙ্কোচ করো না।

একটা তীব্র নিশ্বাস কদমের বুকের অতল গহন হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। কোনো মতে কদম বলিল,—আমি একলা···আমার এত ভয় করে···এরা কেউ কিছু দেখবে না।

সুশীল দাঁড়াইল। বলিল—বুঝেছি। আচ্ছা, টুল কি মোড়া আছে?

কদম গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা টুল আনিয়া উঠানে পাতিল—পাতিয়া আঁচল দিয়া টুল মুছিয়া দিল।

সুশীল বলিল—আচ্ছা, আমি না হয় আধ ঘণ্টা বসছি। এতে যদি না সারে, অন্য ব্যবস্থা করবো।

সুশীল বসিল। কদম দাঁড়াইয়া রহিল···দাওয়ার নীচে কুণ্ঠিত অপরাধীর মতো!

সুশীল বলিল—কি হয়েছে, আমি বুঝেছি। তুমিও জানো, নিশ্চয়।

লজ্জায় ক্ষোভে কদম মাথা তুলিতে পারিল না।

সুশীল বলিল—এমন নেশা বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে করে আসেন?

মাথা নাড়িয়া কদম জানাইল, হাঁ।

সুশীল মনে মনে বলিল, দুর্ভাগিনী! মুখে বলিল—ভয় নেই। নেশার ঘোর! সহ্য হবে কেন? বয়স হয়েছে···তার উপর নতুন! কখনো অভ্যাস ছিল না তো!

বাহিরে কে দ্বারের কড়া নাড়িল।

কদম চাহিল সদরের দিকে। দ্বার ছিল ভেজানো। দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল···অখিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

ভারতীয় রণাঙ্গন—

প্রধানতঃ চীন-ভারত সীমান্ত তথা রুশ-রুমানিয় সীমান্তে যুদ্ধ যেরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কে যে মলিনতার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতাই এ মাসে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপ প্রধান-মন্ত্রী হিদেকি তোজো ১০ই চৈত্র জাপ পার্লামেণ্টকে জানান, "গত কয় মাসে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমর-পরিস্থিতি অত্যন্ত বিষম হইয়া উঠিয়াছে। শত্রু তাহার সমরোপকরণের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহারা নূতন যে আক্রমণ করিবে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইবে। এই নূতন যুদ্ধেই জয়-পরাজয় নির্ণীত হইবে, ইহার উপরই জাপ-জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।" অন্য দিকে তাহার পরের দিনই বৃটিশ ইনভেসন আর্ম্মির প্রধান সেনাপতি জেনারল মণ্টগোমেরি ঘোষণা করেন—"উভয় পক্ষে এমন বাঁও-কষাকষি হইবে যে, পৃথিবীতে তেমন কখনও হয় নাই। আমরা এই যুদ্ধের অংশ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। এ-যুদ্ধ কত দিন চলিবে কেহ বলিতে পারে না। এক বৎসর চলিতে পারে, বেশী দিনও চলিতে পারে।"

জাপ-শত্রুর নব পরিকল্পনার আভাস সম্পূর্ণ না পাওয়া গেলেও আমরা দেখিয়াছি, গত মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে বিশেষতঃ নিউ-গিনি, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়র্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপে মার্কিণ বিমান ও নৌ-বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ছোট-খাট অনেক দ্বীপে মার্কিণ সৈন্য অবতরণ করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে জাপ-অধিকৃত অনেক স্থানে মার্কিণ-বিমান বোমা বর্ষণ করে। নিউ গিনিতে সাফল্যের কথা ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার জন কার্টিন বলেন যে, অষ্ট্রিয়ায় জাপ-অভিযানের আর আশঙ্কা নাই।

পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধে প্রথম ব্রহ্ম-অভিযানের ন্যায় দ্বিতীয় ব্রহ্ম-অভিযানও ব্যর্থ হয়। মার্কিণ সাংবাদিকের ভাষায় "monsoon, malaria and mud" (বর্ষা, ম্যালেরিয়া ও কর্দ্দম) এই ত্রিশক্তির কবলে না পড়িয়া বৃটিশ অভিযান-বাহিনীর এবারকারের তৃতীয় অভিযান যাহাতে সুপরিচালিত হয়, সে জন্য চীনা, ইংরেজ ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগের ত্রুটি করেন নাই।

১লা চৈত্রের সংবাদে জানা যায়, ইংরেজ সৈন্য নীরবে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দুর্গম অরণ্য-পথে উত্তর-ব্রহ্ম-সীমান্তে ১০০ মাইল অতিক্রম করিয়া চিন্দুইন নদী-তট পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। জেনারেল ষ্টিলওয়েল সগর্ব্বে ঘোষণা করেন,—তাঁহার সাড়ে চারি মাসের চেষ্টার পর তাঁহার সৈন্যগণ হুকং উপত্যকা হইতে জাপদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে বিতাড়িত করিয়া ১৮০০ বর্গ-মাইল পরিমিত স্থান অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণে আরাকান অঞ্চলেও বৃটিশ-তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে ইংরেজরা দুই দিনের যুদ্ধের পর জাপ-সুরক্ষিত রাজাবিল নামক স্থান দখল করে, রাত্রির অতর্কিত আক্রমণে বুথিডং গ্রাম দখল করে, মায়ু পাহাড়ের (মায়ু অঞ্চল—কক্সবাজার হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে, বাউলি বাজারের দক্ষিণ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত উপকূলে অবস্থিত) পূর্ব্ব দিকে জাপ সৈন্যকে হঠিতে বাধ্য করে, চিন পাহাড় অঞ্চল (মণিপুর রাজ্যের দক্ষিণে) এবং মাকাও সোমরা উপত্যকাতেও (চিন্দুইন নদী ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত) আক্রমণ করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ ও মার্কিণ বিমানবহর উত্তর-আসাম প্রান্ত হইতে আরাকান-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অঞ্চলে জাপ-লক্ষ্যস্থানগুলির উপর বেপরোয়া বোমা-বর্ষণ করে।

কিন্তু মিত্র-পক্ষের সামরিক মুখপাত্র মন্তব্য করেন, অতর্কিত আক্রমণে আমরা অবশ্য প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু জাপানীরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না, ইহার প্রতিক্রিয়া হইবেই। তিনি সতর্ক করিয়া বলেন—বর্ষা আসন্ন, প্রাথমিক আক্রমণের ফলে যে লাভ হইয়াছে, আবহাওয়ার আক্রমণের ফলে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

এ সময়ে জাপানের আয়োজন দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা আরাকান অঞ্চলের উপর তত বেশী মনোযোগ না দিয়া উত্তর রণাঙ্গনের দিকেই অধিক মনোযোগী।

অবশ্য আরাকানের বুথিডং অঞ্চল হইতে জাপদিগকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই। বুথিডংএর দক্ষিণ ভাগ (কক্সবাজার হইতে প্রায় ৫২ মাইল দূরে) এবং রাজাবিল অঞ্চল জাপানীরা সুরক্ষিত করিতে থাকে। চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাহারা মংড-বুথিডং পথের টানেলের উপর অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। চিন পাহাড় ও কাব উপত্যকায় তাহারা ক্রমে উত্তরাভিমুখে (মণিপুরের দিকে) অগ্রসর হইয়া টিড্ডিম-টামু পথের নানা স্থান দখল করে এবং জাপ বিমানদল ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে; জাপ সৈন্য সোমরা অঞ্চলের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের ৩০ মাইল মধ্যে মণিপুর-ইম্ফল রোডের (এই পথে চিন পাহাড় রণক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যদিগকে পত্রাদি পাঠানো হয়) পূর্ব্বস্থিত এক স্থানে ইংরেজ সৈন্য জাপদিগকে বাধা দিলে তথায় প্রবল যুদ্ধ চলিতে থাকে। হুকং উপত্যকায় জাপরা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে বলিয়া জানা গেলেও এবং ঐ অঞ্চলে চীনা, গুর্খা ও কাচিন সৈন্যদিগের তৎপরতায় ব্রহ্মের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকৃত হইলেও চিন্দুইন নদীর পশ্চিমাভিমুখে জাপ সৈন্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। জাপানীরা ভারতীয় সীমান্তে যে সকল অঞ্চল আক্রমণ করিতেছে, তাহা ঘনারণ্য-সমাচ্ছাদিত। হাল্কা হাতিয়ারে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল অতি সহজে মণিপুর রোড-বিচ্ছিন্ন করিতে পারে বলিয়া সামরিক বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন। বিলাতী 'ডেলি টেলিগ্রাফের' সংবাদ-দাতা বলেন যে, শত্রু যতই অগ্রসর হইবে, ততই তাহার রসদ-সমস্যা গুরুতর হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতিও এই কথার প্রতিধ্বনি করেন।

২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে ভারতীয় রণাঙ্গনের অবস্থা এইরূপ অনুমিত হয়—

ইম্ফলের উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে কোহিমা পর্য্যন্ত (ডিমাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৪৬ মাইল) স্থানে জাপ সৈন্য সমাবেশ। তাহারা নাগা পাহাড়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই উত্তর দিক হইতে তাহারা ধীরে ধীরে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ২৩শে চৈত্র মধ্যে জাপানীরা ইম্ফলের ৮ মাইল মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধের পরবর্ত্তী কোন সংবাদ ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

দক্ষিণ দিক হইতেও ইম্ফল আক্রমণ করিবার জন্য জাপ সৈন্য ইম্ফল-টিড্ডিম পথে বিষেনপুর—ইম্ফল হইতে বাহিরে যাইবার স্থল-পথ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ দিকেও জাপ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানীরা টামু অধিকার করিয়াছে। তাহারা যুগপৎ টামু এবং কোহিমা আক্রমণ করে।

২৭শে চৈত্র দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক হইতে কোহিমা আক্রান্ত হয় এবং সেখানে প্রবল যুদ্ধ চলে।

২০শে চৈত্রের সংবাদ—এক দল জাপ সৈন্য ডিমাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার পর এ দিককার কোন সংবাদ ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরে জাপ জাহাজের গতিবিধি দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি দুইখানি জাপ জাহাজ আত্মনিমজ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সামরিক সংবাদ-বণ্টনকারীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানীরা যদি আরও অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রসদাদি পাইতে সবিশেষ কষ্ট হইবে। টামু-প্যালেল-ইম্ফল পথ বর্ষার পূর্ব্বে দখল করিতে না পারিলে তাহারা খুবই অসুবিধায় পড়িবে, নাগা পাহাড়ে বেশী দিন তাহাদিগের থাকা চলিবে না। ইহাদের অভিমত যে, **monsoon malaria and mud** এবার মিত্রপক্ষের সৈন্যদিগকে কাবু না করিয়া জাপনিগ্রহে তাহাদের সহায় হইবে।

সোভিয়েট বিজয়—

চৈত্র মাসেও রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ রণাধিনায়কগণ প্রবল সোভিয়েট আক্রমণের চাপে আপনাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে সুপরিচালিত করিবার অবসর পান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বা একাই কোন প্রকারে পশ্চাদপসরণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এক প্রকার ব্যাপক আদেশ দিতে হয়। চৈত্রের শেষ দুই সপ্তাহে রুশ সৈন্য শতাধিক মাইল পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এক দিকে চেক-রুমানিয়া সীমান্তে পৌঁছায়, অন্য দিকে কৃষ্ণসাগরের তটে প্রসিদ্ধ বন্দর ওডেসা অবরোধ করে। আড়াই বৎসর পরে ২৭শে চৈত্র রাত্রে জার্ম্মাণরা ওডেসা ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। নিষ্টার নদীর তটে চোরাবালি ও কর্দ্দম-ভূমিতে আপনাদের শক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য জার্ম্মাণরা রুমানিয়ায় স্থপতি শিল্পী ও এঞ্জিনিয়ার প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সোয়া লক্ষ সৈন্য লইয়া জার্ম্মাণ জেনারেল ফন ম্যান্‌ষ্টেনকে এ মাসে রুশ সেনা-নায়ক ঝুকভ, ও কোনিভের হস্তে যে ভাবে নাজেহাল হইতে হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত রুশরা রুমানিয়ার মধ্যে দুই শতের অধিক লোকালয় এবং চেক-সীমান্ত অধিকার করে।

এই দুর্দ্দশার অবস্থা জার্ম্মাণরা পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিল। পশ্চাদপসরণ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য জার্ম্মাণী সহসা সমগ্র হাঙ্গেরী অধিকার করিয়া সেখানে এক জার্ম্মাণপন্থী তাঁবেদার সরকার স্থাপন করে। রুমানিয়ার অবস্থাও ঐরূপ হয়। অন্য দিকে রুশরা কার্পেথিয়ান গিরিশ্রেণীর পর-পারে প্যারাশুট-সৈন্য নামাইয়া হাঙ্গেরীতে এক বিদ্রোহী দল সংগঠন করে এবং বেতারে রুমানিয়াবাসীকে জার্ম্মাণ-প্রীতি বর্জ্জন করিতে বলে।

ইটালী অভিযান—

৩০শে চৈত্র ইটালী সমরাঙ্গনের অবশ্য বিলম্বিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জেনোয়া উপসাগর ও আড্রিয়াটিক সাগরের তটে সম্মিলিত সৈন্যের অবতরণের সম্ভাবনা। কিন্তু ১০ই চৈত্র মার্কিণ সহকারী সমর-সচিব বলেন যে, ক্যাসিনোতে মার্কিণ সৈন্যের অবস্থা ভাল নয় (still precarious); কারণ, প্রাথমিক বোমা-বর্ষণে সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও পরে সেখানে জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ করে। সেখানে জার্ম্মাণরা যে ভাবে আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ করিতেছে, তাহা শত্রুর শক্তির কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মার্চ্চের তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিণ সমর-সচিব মিষ্টার হেনরী ষ্টিমসন এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইটালীতে যে সকল সৈন্য (মিত্রপক্ষের) আছে, তাহাদিগকে কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করিতে হইতেছে এবং সে কাজেরও বিশেষ কোন মূল্য নাই। ক্যাসিনো সালেরনো ও এঞ্জিওতে যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহার বিশেষ কোন কূটনীতিক লক্ষ্য নাই। একটি প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য—যত পারো জার্ম্মাণ হত্যা করো। ইটালীর যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পদাতিক ও ট্যাঙ্ক-বাহিনী যে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কোন সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই।

জার্ম্মাণী বনাম বৃটেন অভিযান—

ব্যাপক ভাবে জার্ম্মাণী তথা জার্ম্মাণ-অধিকৃত য়ুরোপ আক্রমণ করিবার পাঁয়তাড়া অনেক দিন যাবৎ চলিলেও প্রকৃত অভিযান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। মিত্রপক্ষের বিমান যেমন জার্ম্মাণীর প্রধান সহরগুলির উপর নিত্য প্রবল বোমাবর্ষণ করিয়াছে, জার্ম্মাণীও তেমনি বৃটেনে তাহার বিমান প্রেরণ করিয়াছে। বৃটেন যে য়ুরোপ আক্রমণ করিবে তাহার উদ্যোগ আয়োজনের জন্য ইংলণ্ড, ওয়েলস ও স্কটলাণ্ডের উপকূলে প্রায় ছয় শত মাইল স্থান সংরক্ষিত হইয়াছে। বিলাতী 'টাইমস্' পত্রের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বিমান আক্রমণের ফলে ৪০ লক্ষের অধিক জার্ম্মাণ নর-নারী নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হইয়াছে এবং ২০ লক্ষ অধিবাসীর গৃহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিলের ধারণা, বোমা মারিয়াই জার্ম্মাণীকে 'খতম' করা যাইবে। কিন্তু এই বোমা-বর্ষণের পূর্ণ ফলাফল কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্র গত ১৭ই মার্চ্চ লিখিয়াছেন—সম্প্রতি জার্ম্মাণ বন্দি-নিবাস হইতে যে সকল মার্কিণ প্রজা লিসবনে পৌঁছিয়াছে বোমাবর্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহারা অতি নিরুৎসাহকর বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—জার্ম্মাণরা ভাল খাইতে পায়, তাহাদের উৎসাহ নষ্ট হয় নাই। তাহাদের পণ্যাদি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

মন-কষাকষি—

ইটালীর মার্শাল বাডাগলিও সরকার মিত্রপক্ষের করধৃত বলিয়াই প্রচারিত হয়। সোভিয়েট ও আর্জেন্টিনা সরকারের সহিত বাডাগলিও সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন এবং বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গেও এরূপ সম্পর্ক স্থাপনের আশা করেন। কিন্তু মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার কর্ডেল হাল স্পষ্টই বলিয়াছেন, আমেরিকা তাহাতে সম্মত নয়। বৃটেন ও আমেরিকার সহিত পরামর্শ না করিয়া রুশিয়ার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করায় বৃটেন বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছে। নেপলসে সম্প্রতি এক বিরাট জন-সভায় কম্যুনিষ্ট সোসালিষ্ট নামধেয় এক দল লোক বাডাগলিও সরকারের অবসানের দাবী করে।

রুশিয়ার সহিত বৃটেন ও মার্কিণ সম্পর্ক এ সকল কারণে খুব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্ম রুমানিয়ার প্রিন্স বার্ব্বষ্টিরকে মধ্য-প্রাচীতে যাইতে দেওয়া হয়। তুরস্ক সরকার এই ভদ্রলোককে কায়রো যাইতে সাহায্য করেন বলিয়া রুশ সরকার বিরক্ত হন। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত।

আয়ার্লাণ্ডে ডি ভ্যালেরা সরকার বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ। মিত্র-শক্তি অভিযোগ করেন যে, যুদ্ধকালে উচ্চ হারে মজুরী অর্জ্জন করিবার জন্ম আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির যে প্রায় তিন লক্ষ কর্ম্মী বৃটেনে গিয়াছে, তাহারা মিত্রপক্ষের সামরিক গুপ্ত তথ্য আয়ার্লাণ্ডে জার্ম্মাণ ও জাপ প্রতিনিধিদের মারফত শত্রুকে জানাইয়াছে। বৃটেন তাই দাবী করে যে, আয়ার্লাণ্ড হইতে জার্ম্মাণ ও জাপ রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদিগকে বিতাড়িত করা হউক। আয়ার্লাণ্ড অসম্মত হয়। ফলে বৃটেনের সহিত আয়ার্লাণ্ডের যোগাযোগের সকল ব্যবস্থা ছিন্ন করা হইয়াছে।

১লা চৈত্র রুশিয়া জার্ম্মাণ-মিত্র ফিন্‌লাণ্ডের নিকট এক যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব করে। ফিন্‌রা এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহাতে আমেরিকা তথা বৃটেনের আশা ভঙ্গ হইয়াছে। বৃটিশ বেতার-কেন্দ্র ফিন্ জাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,—জার্ম্মাণীর পরাজয় যখন আসন্ন, তখন এ সন্ধি-সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিলে ফিন্‌লাণ্ডের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। এ উপদেশ পাইয়াও ফিন্‌রা সন্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পুনর্বিবেচনা করে নাই।

শ্রীতারানাথ রায়

দেশমাতা

নম নম নম নম
স্বদেশ জননী মম।
যড় ঋতু দ্বারে তব
অর্ঘ্য সাজায় নিতি,
রবি শশী গ্রহ নব
গাহে উদাত্ত গীতি।
ধূসর ধূমল গিরি,
তরুলতা প্রান্তর
চারি দিকে তোমা ঘিরি
নদ-নদী বালুচর!
নদীর শ্যামল তটে
বিটপীর ঘন ছায়া;
যেন ছবি-আঁকা পটে
রচিছে মোহন মায়া।
নম নম মনোরম
স্বদেশ জননী মম।
রবির আলোর দেশে
পুণ্য ভারত ভূমে.
যেথায় যজ্ঞ-ধূমে
গগন ফেলিত ছেয়ে
আলোর তরণী বেয়ে
সেথায় এসেছি ভেসে।
নশ্বর দেহ ছাড়া
আত্মা সত্তা আছে,
জেনেছি যাদের কাছে—
ভোগের চরমে উঠে,
বরিত যাহারা ত্যাগে,
প্রাণের অনুরাগে,
আকুল প্রাণের টানে
বিশ্বের সে আহ্বানে—
ঋড়রে সেথায় লুটে!
সোনা সে দেশের মাটী,
আশিস্ সত্য খাঁটি
নহেকো তাহার বাড়া—
মম প্রাণ সম
দেশ জননী মম।
এই মাটীতেই গোরা
বিলালো বিশ্বে প্রেম
হেথা সে অলকঝোরা
ফেলি' কাঞ্চন হেম
বরিল ভিক্ষা ঝুলি
মাখিল অঙ্গে ধূলি।
নম নম শত নম
স্বদেশ জননী মম,
জ্ঞান-গরিমার রাণী!
বুদ্ধ-অশোক-বাণী
আজো প্রস্তরে লেখা
উজ্জ্বল স্মৃতি-রেখা—
মৃত্যুহীনের নাম,
অক্ষরে লিখিলাম।
নিজেরে ধন্য গণি
বিশ্ব-মুকুটমণি,
নম নম নম নম
স্বদেশ জননী মম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (এম্-এ, বার-এ্যাট-ল)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

যুদ্ধের গতি

আমরা এত দিন যুদ্ধ সম্বন্ধে বৈদেশিক সংবাদে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছি—রুশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ পুনরধিকার, ইটালীতে মিত্রপক্ষের আক্রমণের আয়োজন—বলকানের ভবিষ্যৎ এই সকলে আমরা যত গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছি, ভারত সীমান্তের অবস্থায় তত গুরুত্ব আরোপ করি নাই। যেন আমাদিগের কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব ছিল। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে আমাদিগের ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন—যদি দেশ আক্রান্ত হয়, তবে বিদেশীরা তাহা রক্ষা করিবে। এত দিনেও ইংরেজ আমাদিগকে সেই মনোভাব পরিবর্ত্তনের অবসর দেয় নাই। এ বার যুদ্ধে ব্রহ্ম জাপানীদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার পরেও পূর্ব্ব ব্যবস্থা চলিয়াছে—কেবল পরিবর্ত্তন এই হইয়াছে যে, এ বার আর ব্রহ্ম-আসাম সীমান্তে কেবল ইংরেজ ও ভারতীয় সৈনিকই নাই; পরন্তু মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সেনাবল তথায় সমবেত হইয়াছে এবং বনভূমিতে যুদ্ধে তাহারা অভ্যস্ত বলিয়া কাফ্রি সৈনিকও দলে দলে আমদানী করা হইয়াছে। জাপানীরা যে আরাকানে—ভারতের সীমান্তে সেনা-সন্নিবেশ করিয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ ছিল না। সেই জন্ত সীমান্তে মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধও হইয়াছিল। সে সকলে জাপানীরা যে বিশেষ ভাবে জয়লাভ করিতে পারিতেছিল, এমন সংবাদও প্রচারিত হয় নাই।

ভারতীয় রণাঙ্গন

বাঙ্গালা সমর-সরঞ্জামের ঘাঁটী হইয়াছে। গত কয় মাসের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা পিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালায় সমর-সরঞ্জাম সরবরাহে কোন ত্রুটি হয় নাই।

ও দিকে মিত্রপক্ষের ব্রহ্ম আক্রমণের আয়োজন লক্ষিত হইতেছিল। এমন কি, নৌবাহিনীর সাহায্য না পাইলেও ব্রহ্মে সেনাদল—এমন কি অশ্বতর পর্য্যন্ত উপস্থিত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

চীনকে সাহায্য প্রেরণজন্ত ব্রহ্মের পথ মুক্ত করিবার যে আয়োজন দিন দিন অধিক প্রবল হইতেছিল তাহার জন্তই এই আয়োজন।

এই সময় প্রথম—চৈত্র মাসের মধ্যভাগ শেষ হইলেই—সংবাদ পাওয়া গেল, কতকগুলি জাপানী সেনা ভারতসীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। গত বর্ষাধিক-কাল সম্মিলিত পক্ষের আয়োজন ক্ষুণ্ণ করিয়া কিরূপে জাপানীরা সীমান্ত অতিক্রম করিল, এই প্রশ্ন যখন লোককে বিক্ষুব্ধ করিতেছিল সেই সময় জঙ্গীলাট—১৮ই চৈত্র—কেন্দ্রী পরিষদে সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,

ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু জাপানীদিগের প্রত্যেক আক্রমণ প্রহত করা সম্ভব নহে। জাপানীরা ২ পথে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিতে পারে—

(১) দক্ষিণে আরাকান হইতে চট্টগ্রামের দিকে ;

(২) উত্তরে পর্ব্বতসঙ্কুল স্থান দিয়া মণিপুর ও আসামের দিকে।

জাপানীরা ২ শত মাইল-ব্যাপী দুর্গম পথে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন—আসাম সত্য সত্যই বিপন্ন নহে—সমগ্র ভারতের ত কথাই নাই। জাপানীদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া তাহারা পূর্ব্বে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা হইতেও পশ্চাতে অপসারিত করা যাইবে।

তাঁহার এই আশ্বাসে এ দেশের লোক আশ্বস্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি দুর্ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মের বিরুদ্ধে অভিযানে বিমান বাহিনীর নায়ক মেজর-জেনারল উইংগেট বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ১৯শে চৈত্র প্রচারিত এই সংবাদ সর্ব্বত্র বিষাদ ব্যাপ্ত করে। জানা যায়—সংবাদ-প্রকাশের ৮ দিন পূর্ব্বে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বিমানে পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং জাপানীদিগের ঘাঁটার পশ্চাতে তাঁহার বিমান নষ্ট হয়। অনুমান করা হয়—ঝড়েই ইহা ঘটিয়াছিল।

জাপানীরা কোহিমার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে এবং শেষ সংবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, তাহারা কোহিমার উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে। ও দিকে জাপানীরা তামু অধিকার করিয়াছে। মিত্রপক্ষের বাহিনী তামু রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিতে পারে, আর সে চেষ্টা করা সঙ্গত নহে, তখন তামু-ইম্ফল পথে ফিরিয়া আইসে।

জাপানীরা ইম্ফল অধিকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। মিত্রপক্ষও ইম্ফলে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। হয়ত এই স্থানে যে যুদ্ধ হইবে, তাহার ফল বহুদূর-প্রসারী হইবে।

জাপানের ভারতে প্রবেশ জঙ্গীলাট "নামমাত্র আক্রমণ" বলিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, জাপানীরা ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে পারিবে না—ইম্ফলের নিকটেই তাহারা পরাভূত হইবে। তবে আক্রমণ "নামমাত্র" হইলেও তাহা যে সম্ভব হইয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয়। কারণ, ইহাতে ভারতবর্ষে—বিশেষ আসামে চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইবে এবং ক্ষতিও যে হইবে না তাহা নহে।

এ দিকে বর্ষা আগতপ্রায় ; কাযেই ব্রহ্মে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবলের অগ্রগতিতেও অসুবিধা ঘটিবে। আর ব্রহ্মের পথ মুক্ত করিতে যত বিলম্ব হইবে চীনের ততই অসুবিধা অনিবার্য্য হইবে।

ভারতবর্ষের লোক আসামে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে। যুদ্ধ যে স্থানে হয়, সেই স্থানেই দুর্গতি ঘটে বলিয়াই চতুর জার্ম্মাণরা গত যুদ্ধে যেমন বর্ত্তমান যুদ্ধেও তেমনই প্রথমেই অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। এত দিন ভারতবর্ষ—মধ্যে মধ্যে বিমান হইতে আক্রমণ উপেক্ষা করিলে—যুদ্ধক্ষেত্র হয় নাই। এই বার তাহা হইল। ইম্ফলের দিকেই এখন সকলের দৃষ্টি বদ্ধ হইয়াছে। ইম্ফল-কোহিমা পথ ইম্ফলের পক্ষে রুদ্ধ হওয়ায় ইম্ফল অবরুদ্ধপ্রায়। কিন্তু তথায় সম্মিলিত পক্ষের যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে জাপানীরা তথায় বিশেষ বাধা পাইবে, সন্দেহ নাই।

সম্মিলিত পক্ষের নৌবাহিনী এখনও ব্রহ্ম অভিযানের জন্য অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং সেই জন্যই সে অভিযানে অসুবিধা ঘটিতেছে। কত দিনে সেই বাহিনীর পক্ষে ভারত মহাসাগরে আগমন সম্ভব হইবে, তাহা বলা যায় না। সেই নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে উপনীত হইলে এক দিকে যেমন, ব্রহ্ম পুনরধিকারে সাহায্য হইবে, তেমনই ভারতবর্ষও জলপথে নিরাপদ হইবে।

জাপানীরা ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে তাঁহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তাহারা ব্রহ্মবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে বলিতেছে। তাহারা ব্রহ্মে যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার স্বরূপ যাহাই কেন হউক না, তাহাদিগের প্রচারকার্য্য যে অসাধারণ তাহা ইংরেজ-দিগের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়াছে। সেই প্রচারকার্য্যের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য ইংরেজ যদি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন—যুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের জয় হইলে ব্রহ্মে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন-সমূহে প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে, তবে হয়ত ব্রহ্মের লোক সম্মিলিত পক্ষের বিরোধী হয় না। সে বিষয়ে ইংরেজ কি করিবেন ?

সম্প্রতি বড়লাট আসিয়া আসাম সীমান্ত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সমরজ্ঞ। তিনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মাদ্রাজে জঙ্গীলাট বলিয়াছেন—

জয়লাভের পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু জাপানীরা যত দিন জাপানে বিতাড়িত না হয়, তত দিন ভারতের ও পৃথিবীর শান্তির সম্ভাবনা নাই।

জাপান পরাভূত হইলে হয়ত প্রাচীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু প্রাচীই সমগ্র পৃথিবী নহে। জাপানের সহিত রুশিয়ার যুদ্ধ-ঘোষণা হয় নাই। যদি সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় না করা হয়, তবে যে ফল গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের পরে হইয়াছিল, তাহাই যে হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে কার্য্য যে কেবল সমগ্র জগতে গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার দ্বারাই হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ নষ্ট করা যায় না।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদ

এ বার কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বার বার সরকার পক্ষের পরাজয় হইয়াছে। যে দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল সে দেশে একটি পরাভবেই সরকারকে পদত্যাগ করিতে হয়। এ দেশের স্বৈর-শাসনশীল সরকার লোকমত গ্রাহ্য করেন না। যে সরকার লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন—যে সরকার বিজেতার অধিকারে ক্ষমতা সম্ভোগ করেন,—সে সরকার এইরূপ পরাভবে লজ্জানুভবও করেন না। এ বার বিলাতে চার্চিলের সরকার যে পরাভূত হইয়াও পদত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না, তাহার জন্য তাঁহারা নিন্দিতই হইতেছেন।

কেন্দ্রী সরকারের পরাভবসমূহের মধ্যে অর্থবিল বর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বিল বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া

পরিষদে কংগ্রেসী দলের দলপতি শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সরকারের অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন, এই বিল বর্জ্জনের প্রথম কারণ—যাহারা অর্থ প্রদান করে—ভার বহন করে, তাহাদিগেরই তাহা ব্যয় করিবার অধিকার থাকা সঙ্গত। যদি সরকার লোকের প্রতিনিধিদিগকে আপনাদিগের কার্য্য-পরিচালনের অধিকারে বঞ্চিত রাখেন, তবে জনগণের প্রতিনিধিরা কেন তাঁহাদিগের জন্য অর্থ প্রদানে সহায় হইবেন? তিনি বলেন, কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সরকারকে দেশরক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভার প্রদান করুন। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত পরিষদ অর্থ-বিল সম্বন্ধে কিছুই করিবেন না।

দেশাই মহাশয় বলেন, দেখা গিয়াছে—একটি ভোটে সরকারের পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে—সরকারের পক্ষে মাত্র ১৮টি ও বিরোধীদিগের পক্ষে ৫৬টি ভোট হইয়াছে। কারণ—

(১) সরকারের পক্ষে যে ৫৫টি ভোট হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে ৩৭টি যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা কোন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন নাই—সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) তদ্ভিন্ন সরকার পক্ষে অবশিষ্ট ১৮টি ভোটের মধ্যে ৯টি য়ুরোপীয়দিগের ভোট। তাঁহারা যে সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত, সে সকল অকারণ অধিক অধিকার পাইয়াছে এবং ঐ সকল সভ্যের সহিত এ দেশের লোকের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩) তদ্ভিন্ন যাঁহারা মুক্ত থাকিলে নিশ্চয়ই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এমন ১২ জন সভ্য বিনাবিচারে আটক আছেন এবং পরিষদের কার্য্যে যোগদানের অধিকারে বঞ্চিত।

ইহার পরদিন বড়লাট কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে উহা আবার পরিষদে উপস্থাপিত করা হয়। সে দিন ভোটের ফল—

বিলের পক্ষে·········৪৫ ভোট

বিপক্ষে·············৫৬ ভোট

ইহার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইতে পারে না।

কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ এবং কেন্দ্রী সরকার সর্ব্বতোভাবে স্বৈর-শাসনশীল।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সরকারকে ভোটে পরাভূত করিবার জন্য কংগ্রেস, জাতীয় দল ও মসলেম লীগ দল—এক যোগে কায করিয়াছিলেন।

পঞ্জাব সরকার কেন্দ্রী পরিষদে কংগ্রেস দলের যে ডেপুটী নায়কের পঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তিনি (মিষ্টার কায়েম) পরিষদের কায শেষ করিয়া দিল্লী-ত্যাগ-কালে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতে বলেন—বৃটিশ সরকারের এ দেশে লোকমত অগ্রাহ্য করা প্রচলিত প্রথা। হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ ভিত্তি করিয়া তাঁহারা বড়লাটের শাসন-পরিষদের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এ বার পরিষদে বিভিন্ন দল যে ভাবে একযোগে কায করিয়াছেন, তাহাতেই সমগ্র অর্থ-বিল বাতিল হয়। তাহার পরে আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিরোধের যুক্তি উত্থাপিত করা যায় কি?

ক্ষমতা না পাইলে যে সকল দলে মতভেদ লক্ষিত হয় ক্ষমতা পাইলে সে সকলের একযোগে কায করা সহজসাধ্য হয়। বড়লাটের শাসন-পরিষদ যে দেশের লোকের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহাও ইহাতেই বুঝা যায়। পাঠকদিগের স্মরণ আছে, কিছু দিন পূর্ব্বে এই শাসন-পরিষদের সদস্যদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া দিল্লীর রাজপথে গর্দ্দভের শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধিতা কেবল একটি বিষয়ে সফল হইয়াছে। যে সময় দেশের লোক নানারূপে বিব্রত, সেই সময়েও সরকার রেলে যাত্রীর ভাড়া বাড়াইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ব্যবস্থা পরিষদে তাহার তীব্র প্রতিবাদ হয়। বাঙ্গালার প্রতিনিধিদিগের মধ্যে স্যার আবদুল হালিম গজনভী ও শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ঐ প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রস্তাব ত্যক্ত হইয়াছে।

কেন্দ্রী সরকারের বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই—কেবল তাহাই নহে, বাজেটে এই দুঃসময়ে—যখন ভারতবর্ষ জাপানীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তখনও—ব্যয়সঙ্কোচের কোন প্রস্তাব উল্লেখ নাই। ব্যয়ের উপর ব্যয় পুঞ্জীভূত করিয়া করের বহর বৃদ্ধি করিয়া সেই ব্যয় বহন করা কখনই রাজনীতিকোচিত কায নহে। আরও একটি কথা—দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির উপায়জন্য যে ব্যয় সমর্থনীয় এ বার কেন্দ্রী সরকার সেরূপ কোন ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, বলা যায় না।

বিলাতে ভারত-সচিব কেন্দ্রী পরিষদে সরকারের পরাভবের কোন সুষ্ঠু কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নাই। তবে যত দিন ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তত দিন লোকমতের জয়েও গণতন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে না।

গভর্ণরের বক্তৃতা

গভর্ণর হইয়া আসিবার পরে গত ২০শে চৈত্র মিষ্টার কেসী প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি যে খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধেই তাঁহার মত, আশা ও আকাঙ্ক্ষা বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছে। তিনি যে বলিয়াছেন—

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তাহা আবার হইবে না।

ইহা আশার ও আনন্দের কথা।

আমাদিগের বিশ্বাস, আবশ্যক চেষ্টা হইলে গত বৎসরও দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হইত না, হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় হইত। কাযেই এ বার গভর্ণর আবশ্যক চেষ্টা করিলে—সতর্কতা অবলম্বন করিলে—ফসল যেরূপ হইয়াছে তাহাতে—কখনই দুর্ভিক্ষ হইবে না। দুর্ভিক্ষ হইবে না জানিতে পারিলেই বাঙ্গালার লোকের আস্থার অভাব দূর হইবে।

আমরা মিষ্টার কেসীকে তাঁহার সময়োপযোগী ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ও লোকের মনে অনাস্থার প্রকৃত কারণ সন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় অবলম্বন করিতে বলিব। তাঁহার বক্তৃতায় একটি ভাব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের মত একেবারে বর্জ্জন করিয়া তাহার প্রভাব-মুক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আমাদিগের এ কথা বলিবার বিশেষ কারণ, গত বৎসরের দুরবস্থার জন্য প্রাকৃতিক ও যুদ্ধজনিত অবস্থা অপেক্ষাও সচিবসঙ্ঘের কার্য্য অধিক দায়ী।

প্রথম কথা—সচিবগণ কেবলই মিথ্যা কথা বলিয়া লোককে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছেন—চাউলের অভাব নাই। সেই জন্যই যথাকালে আবশ্যক ব্যবস্থা হয় নাই; এমন কি, সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও কুমার সার জগদীশপ্রসাদের মত লোকের কথাও তাঁহারা শুনেন নাই। যখন রাজপথে, ঘাটে, মাঠে লোক অনাহারে মরিতেছিল, তখনও আবশ্যক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই—তখনও ভারত সরকারের প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য অতল গহ্বরে অন্তর্হিত হইয়াছে—তখনও বাঙ্গালার সচিবরা পঞ্জাবে ক্রীত গমে লাভের লোভ ত্যাগ করেন নাই; শেষে যে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হইতে পারে না।

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ২ কোটি লোক পীড়িত হইলেও সরকার প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনাহারে একটি লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই এবং ব্যাধিও বিস্তৃতিলাভ করে নাই। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিলেই লর্ড নর্থব্রুক যে বলিয়াছিলেন, তিনি প্রজার অনাহারে মৃত্যু ঘটিতে দিবেন না, সে কথা রক্ষিত হইয়াছিল। এ বার—তাহার এত দিন পরে, যখন সরকার গর্ব্ব করিয়া বলেন, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে সেই সময়—যে কলিকাতার রাজপথেও লোক অনাহারে মরিয়াছে, তাহার মূলে কি সচিবসঙ্ঘের অব্যবস্থাই ছিল না? তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ বার যে বাঙ্গালায় ২৫ হাজার নৌকা অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহা সচিবদিগের অজ্ঞাত ছিল না। ইহার সহিত ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় শস্য লইয়া যাইবার জন্য ৫৩ দিনে ৫৩ মাইল রেলপথ রচিত হইয়াছিল। তাহার বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। সে বার দুর্ভিক্ষ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য বিভাগকে ব্যাধিবিস্তার নিবারণজন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং "রিলিফ" কাযে লোকের অর্থার্জ্জনের উপায় করাও হইয়াছিল। এ বার এখনও সে সব "হইতেছে" ও "হইবে।"

যে সচিবগণ এই সকল অব্যবস্থার জন্য ও মিথ্যার জন্য দায়ী—যাঁহারা লবণ, কয়লা, চিনি কিছুই সুষ্ঠুরূপে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই—সেই সচিবদিগের কথা, কতকগুলি লোক রাজনৈতিক কারণে লোককে অতিরিক্ত ধান্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিতেছে। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, মিষ্টার কেসীও সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা নিঃস্ব তাহারা কি মাল মজুদ রাখিতে পারে? তাহাদিগের সে সামর্থ্য কোথায়? যদি এ কথা সত্য হয় যে, কোন কোন মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি কৃষকদিগকে সেই পরামর্শ দিতেছে—তথাপি এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে কৃষকরা তাহাদিগের কথায় ভুলিবে? তাহারা তত নির্ব্বোধ নহে।

মিষ্টার কেসী গত দুর্ভিক্ষের কারণের উল্লেখে বলিয়াছেন :—

(১) বাঙ্গালায় ঝটিকা বন্যা প্রভৃতি কারণে ধান্যের ফশলের অল্পতা;

(২) মাল বহনের অসুবিধা;

(৩) যুদ্ধের জন্য অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলা;

(৪) সহসা যে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার জ[ন্য] আবশ্যক ব্যবস্থা করায় সরকারের অক্ষমতা।

এই সকল কারণ স্বীকার্য্য; কিন্তু—

(১) বন্যা ঝটিকা প্রভৃতি কারণে যেমন ফশল অল্প হইয়াছি[ল] তেমনই আবার ভারত সরকার খাদ্যদ্রব্য প্রেরণে কার্পণ্য ক[রেন] নাই। সচিবসঙ্ঘ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই।

(২) মালবহনের অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা কেন করা [হয়] নাই? কেন সময় থাকিতে ২৫ হাজার নৌকাপসারণের প্রতীক[ার] হয় নাই? ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ভারবাহী জন্তুর পৃষ্ঠে খা[দ্য] দ্রব্য বহনের ব্যবস্থাও দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই করিয়া রাখা হইয়াছি[ল]। রেলপথ রচনার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি।

(৩) যুদ্ধের জন্য যে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য তাহার প্রতীকার-ব্যব[স্থা] কি হইয়াছিল?

(৪) দুর্ভিক্ষ অতর্কিত ভাবে আইসে নাই। ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যু[দ্ধের] অগ্নিশিখা অগ্রসর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে কোন কোন সংবা[দ] পত্র বাঙ্গালা সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন; সরকার সে কথ[ায়] কর্ণপাত করেন নাই। বর্ত্তমান প্রধান-সচিব লক্ষ লক্ষ লোকে[র] অনাহারে মৃত্যুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা শূন্য ভাণ্ডার লই[য়া] সচিব হইয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয় মিষ্টার জিন্না বলিয়াছে[ন] বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবরা দমকলের কুলীর কায করিতে আসি[য়া]ছিলেন। দুর্ভিক্ষ কি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়াছিল?

আমরা মিষ্টার কেসীকে এই সচিবদিগের মত সর্ব্বতোভা[বে] উপেক্ষা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে বলিব। আমরা তাঁহ[ার] সাফল্যই কামনা করি। তাঁহার সাফল্যের উপকরণেরও অভাব নাই। তাঁহাকে সচিবদিগের মত গ্রহণ না করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করি[তে] হইবে। যাহা হইয়াছে, তাহা তিনি কি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচ[না] করেন?—

(১) গত কয় মাসে হাসপাতালের ও হাসপাতালে রোগীর সংখ[্যা] বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা কত দিন পূর্ব্বে হওয়া সঙ্গত প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি মেজর-জেনারল ষ্টুয়ার্টের জানুয়ারী মা[সের] প্রথম ভাগে প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। য[াহা] হয় নাই, সে জন্য আক্ষেপ করিলে আর কোন ফল হইবে না। এ[খন] দ্রুত কায করিতে হইবে।

(২) জনস্বাস্থ্য বিভাগের বিস্তার সাধন করা হইয়াছে। এ ক[ায] অন্ততঃ ১০ মাস পূর্ব্বে হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহা না হওয়ায় [যে] জীবনক্ষয় হইয়াছে, তাহা কি সচিবদিগের অযোগ্যতার পরিচা[য়ক] নহে?

(৩) দুর্গতদিগের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কা[য] অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু মিষ্টার কেসী নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন, [সে] দিন ব্যবস্থা পরিষদে সচিবপক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—[বহু] স্ত্রীলোক অভিভাবকহীন হইয়া অসহায় ও নিরন্ন হইয়াছে; আ[র] অনেকের দৌর্ব্বল্যহেতু কায করিবার সামর্থ্য নাই। ইহাদিগ[কে] লইয়া গণিকার ব্যবসা চলিতেছে। অথচ আজও ইহাদিগের জ[ন্য] পরিকল্পিত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সচিবসঙ্ঘ নির্দ্দেশম[াত্র] দিয়াছেন।

(৪) এখনও সচিবসঙ্ঘ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করি[তে]

পারেন নাই।—তাহা আজও বিবেচনাধীন! আর কত লোকের মৃত্যু ও সর্ব্বনাশের পরে তাহা রচিত হইবে?

মিষ্টার কেসী যে মানসিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতে লোকের মনে নিরাশাব্যাপ্তি যে অস্বাভাবিক নহে, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। লোকের মনে আস্থানাশের জন্য—নিরাশার কারণের জন্য তাহারা যাহাদিগকে দায়ী করিতেছে তাহাদিগকে শাসনকার্য্য হইতে অপসৃত করা প্রয়োজন কি না, তাহা তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্যে—বিশেষ মানসিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের—জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহযোগের প্রয়োজন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আমলাতন্ত্র এ দেশের লোককে—"আধা-শিশু-আধা-সয়তান" মনে করিয়া কায করিয়া আসিয়াছেন। তাহার ফল কি হইয়াছে?

মিষ্টার কেসী আমলাতন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষালাভ করেন নাই; তিনি যদি সে কাযে জনগণের ও যে সকল নেতার কথায় জনগণ আস্থা স্থাপন করে, তাঁহাদিগের সহযোগ লইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার কায সম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হয়েন, তবে সে সহযোগ তিনি চাহিলেই পাইবেন। কারণ, বাঙ্গালার কল্যাণকামীরা বাঙ্গালার শ্মশানে আবার শিক্ষা শিল্প প্রাচুর্য্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতেই চাহেন—তাঁহারা সচিব নহেন, কাজেই ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের সন্ধান করেন না; তাঁহারা বিদেশীর ভোটে আত্মরক্ষা করিয়া মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সচিবত্ব কায়েম রাখিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহেন না; তাঁহারা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—আগ্রহশীল। সচিবগণ যাহা করিতে পারেন নাই—যাহা হয়ত করিতে চাহেন না, সে কায তাঁহারা করিতে পারেন ও করিবেন।

মিষ্টার কেসী কি যে সচিবগণ গত দুর্ভিক্ষে দারুণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং মিথ্যারও আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিবেন? না—তিনি দেশের কল্যাণকামী প্রকৃত জননেতাদিগকে লইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইবেন? আর বিলম্ব করিবার সময় নাই—এক দিন বিলম্বেও মূল্যবান জীবন নষ্ট হইতে পারে। তাহা বিবেচনা করিয়া কি তিনি সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন?

সত্যই এ বার খাদ্য-দ্রব্যের অভাব নাই। কিন্তু লোকের আস্থার অভাব দূর করিতে হইবে—পুনর্গঠনে বাঙ্গালাকে প্রকৃত উন্নতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কয়লা

বৈজ্ঞানিকের নির্দ্ধারণে কয়লা ও হীরক একই গোত্রের। বাঙ্গালায় আজ যেন সেই সত্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। কলিকাতায় ও বাঙ্গালার অন্য কতকগুলি স্থানে জ্বালানী কয়লা দুষ্প্রাপ্য—সুতরাং দুর্ম্মূল্য। বাঙ্গালার—সচিবগণ—বিশেষ বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী শিখিয়াছেন—"যত দোষ নন্দ ঘোষ।" খুলনা রেল লাইনে কতকগুলি ষ্টেশনে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম্মে যখন বস্তাবন্দী ধান্য শিশিরে ও জলে ভিজিতেছিল, তখন তিনি বলেন, ভারত সরকারের রেল বিভাগ মালগাড়ী দিতে নারাজ; তাই সে সকল স্থানান্তরিত করা যাইতেছে না। কিন্তু কেন্দ্রী সরকারে শাসন-পরিষদের সদস্য বলিলেন, বাঙ্গালা সরকার সে জন্য মালগাড়ী চাহেন নাই। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী জয়ী; কোন কথা বলিলেন না। বাঙ্গালায় লবণের অভাব—লবণ এক টাকা সের দরেও পাওয়া যায় না। তিনি বলিলেন, ভারত সরকার লবণ দিতেছেন না। কয়লা সম্বন্ধেও তিনি সেই কথাই বলিতেছেন—মালগাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য রাণীগঞ্জে যে কয়লা মাটী খুঁড়িলে পাওয়া যায়, কলিকাতায় তাহা মণ দরে বিক্রীত না হইয়া ভরী হিসাবে হইবে।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত "পোড়া" কয়লা ৫/৬ আনা মণ দরে বিক্রীত হইত; এখন চোরা বাজারে তাহা ৫।৬ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে! অল্প দিন পূর্ব্বেও ৪০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হওয়ায় দরিদ্র গৃহস্থ (যাহারা অনাহারে মরে নাই তাহারা) থালাঘটী বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এখন কয়লা সাধারণ সময়ের তুলনায় ৪।৫ গুণ অধিক দরে কিনিতে হইতেছে—বিক্রয় কিছু আর অবশিষ্ট না থাকায় সমাজের সর্ব্ব-নিম্ন শ্রেণীর উচ্চ-স্তরস্থ বিরাট সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা দুর্ভিক্ষকালীন দুর্দ্দশারই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেককেই কয়লার অভাবে, এক বেলা রন্ধন করিয়া দুই—কখন বা তিন বেলা খাইয়া দগ্ধ উদর পূর্ণ করিতে হইতেছে। গ্রীষ্মকাল আসিল। এ সময় দুর্ভিক্ষান্তে অপুষ্ট দুর্ব্বল দেহে উহাতে কিরূপ স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

অথচ সামান্য সুব্যবস্থায় জ্বালানী কয়লার অভাব দূর করা যায়। কলিকাতা হইতে মাত্র এক শত ২০ মাইল দূরে—রাণীগঞ্জ অঞ্চলে—কয়লার খনি অবস্থিত। এখন কয়লার অভাবও নাই। অভাব কেবল মালগাড়ীর। কিছু দিন পূর্ব্বে খনির শ্রমিকরা ধান কাটিতে যাওয়ায় খনিতে কিছু লোকাভাব হইয়াছিল। এখন আর সে অভাব নাই। বিশেষ স্ত্রীলোক শ্রমিকদিগকে খনির মধ্যে কায করিবার অনুমতি প্রদান করায়, সকল শ্রমিকের খাদ্যদানের সুব্যবস্থা হওয়ায় ও অতিরিক্ত লাভকর হইতে কয়লার খনি বাদ দেওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে খনিতে স্ত্রী-শ্রমিকদিগকে কায করিতে দেওয়া সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যায়। স্ত্রীশ্রমিকদিগকে পুনরায় খনির মধ্যে কায করিবার সম্মতিদানে এক শ্রেণীর ভারতীয়রা ও নিখিল-ভারত মহিলাসঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান যে আপত্তি করিতেছেন, তাহা একদেশদর্শিতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। প্রতীচীর খনিগর্ভে অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক পূর্ব্বে কায করিত; এ দেশে তাহা হয় না। এ দেশে সমাজ যে ভাবে গঠিত তাহাতে সমাজের অবনত শ্রেণীর বাউরী, সাঁওতাল প্রভৃতিও স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে কায করে। সুতরাং এ দেশে যৌন দুর্নীতি বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নাই! আর এক কথা, খনিগর্ভে কায করিলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। যে দেশে সাধারণ লোক স্বাভাবিক অবস্থায় দুই বেলা পূর্ণাহার পায় না, তথায় বাহিরে অপূর্ণাহারে স্বাস্থ্য যত ক্ষুণ্ণ হয়, খনিগর্ভে কয় ঘণ্টা কায করিয়া পূর্ণাহার পাইলে তত হয় না। গত মহাযুদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে ভারত সরকারের মনোনীত তথা-কথিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা যখন খনিতে স্ত্রীমজুর নিয়োগ বন্ধ করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করেন, তখন কয়লার খনির ভারতীয় মালিকদিগের প্রতিষ্ঠান—ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন—তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় খনিওয়ালাদিগের মূলধন অধিক;

অল্পব্যয়সাধ্য যন্ত্র কিনিয়া মজুরের সংখ্যা কম করিতে পারেন; কিন্তু স্বল্পবিত্ত ভারতীয় মালিকদিগের পক্ষে যত অধিক মজুর পাওয়া যায়, ততই সুবিধা। বিশেষ যন্ত্র যে স্থানে মজুরের স্থান অধিকার করে, তথায় বেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধি অনিবার্য্য। ঐ ব্যবস্থায় ভারতীয় খনিওয়ালারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন।

য়ুরোপীয়দিগের অসম প্রতিযোগিতা কয়লা-শিল্পের ইতিহাস কয়লারই মত মলিন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও তাহার পরেও কয় বৎসর দেখা গিয়াছে, হাওড়া সহরে য়ুরোপীয়দিগের ঢালাই কারখানা ৫০ টাকা টন পড়তায় "হার্ডকোক" কয়লা মালগাড়ীতে পাইতেছে, আর ভারতীয়দিগের কারখানা—মালগাড়ীর অভাবে—মোটর লরীতে সেই কয়লা আনিতে বাধ্য হইয়া—এক শত ২০ টাকা টন পড়তায় ঝরিয়া হইতে আনিতেছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের এক দিকে এই ক্ষতি। আর এক দিকে ক্ষতি—য়ুরোপীয়রা য়ুরোপীয়দিগের খনি হইতে কয়লা ক্রয় করে—ঐ সকল কারখানা মালগাড়ীর জন্য অধিক ছাড় পাওয়ায় সে সব খনিতে অধিক কায হয়। আর ভারতীয়দিগের খনি গাড়ীর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাঙ্গালী ধনিকদিগের অনেক টাকা কয়লার খনিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং ব্যবসার লাভের টাকায় তাঁহারা এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও বিবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যদি তাঁহাদিগকে গত মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব্বকথিত অসুবিধা ভোগ করিতে না হইত, তবে হয়ত আজ বাঙ্গালীর শিল্প-ব্যবসার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। এ বারও যেন সেই অবস্থা ঘটিতেছে। যদি—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে য়ুরোপীয়দিগের খনিগুলি কত মালগাড়ী বরাদ্দ পাইত ও এখন কত পাইতেছে এবং ভারতীয়দিগের খনিগুলি পূর্ব্বে কত মালগাড়ী পাইত ও এখন কত পাইতেছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায়, তবে অবস্থা বুঝা যায়; কারণ, খনিতে কি পরিমাণ কয়লা উঠে তাহার উপরে গাড়ী বরাদ্দ করা প্রথা। কিছু দিন পূর্ব্বে কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছিল, কতকগুলি খনি যে কয়লার হিসাব দিয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত—অধিক গাড়ী পাইবার জন্যই তাহারা মিথ্যা হিসাব দিয়াছিল। কেন সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহা ধরিতে পারেন নাই; আর কেনই বা দোষী কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় ও মিথ্যাচারী খনিগুলি বর্জ্জন করা হয় নাই, তাহা কে বলিবে?

বাঙ্গালায় চাউলের কলগুলি সবই ভারতীয়দিগের। সেগুলি ও আরও অনেক ছোট কল-কারখানা বড় বড় কলকারখানার অনুপাতে অল্প সংখ্যক মালগাড়ী পাইতেছে। বড় বড় কারখানা অধিকাংশই বিদেশীদিগের। ভারতীয়দিগের বড় কারখানাগুলি অবশ্য তাহাদিগের সঙ্গে সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু ভারতীয়দিগের বড় কারখানার সংখ্যা এত অল্প যে, ছোট বড় ধরিলে য়ুরোপীয়দিগের স্বার্থের তুলনায় ভারতীয়দিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

ইহার পরে রন্ধনাদি গার্হস্থ্য কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত "পোড়া কয়লার" কথা। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইহার দর কখন দেড় টাকা মণ অতিক্রম করে নাই। তখন সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই "পোড়া কয়লায়" আমাদিগের ক্ষতির পরিমাণ অল্প নহে। সরকার "পোড়া কয়লা" প্রস্তাবকারী খনিসমূহকে আবশ্যক সংখ্যক মালগাড়ী না দেওয়ায় ক্রেতার "মাথায় ভাঙ্গা" হইতেছে—এক টাকা মণ পড়তার কয়লার মূল্য তাঁহারা খনির মুখে ১৭ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ কি? রন্ধনের জন্য দরিদ্রেরও নিত্য-ব্যবহার্য্য ও অনিবার্য্য "পোড়া কয়লা" যদি রপ্তানীর সময়—যুদ্ধের জন্য আবশ্যক কয়লার পরেই স্থান পাইত, তবে গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত। যুদ্ধের সহিত যাহাদিগের, প্রত্যক্ষ ত পরের কথা, পরোক্ষ সম্বন্ধও নাই এমন পাটকল, চা-বাগান প্রভৃতি কয়লার জন্য মালগাড়ীর ছাড়ে "পোড়া কয়লার" তুলনায় প্রাধান্য পাইতেছে!

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় দরিদ্রদিগকে যে "আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিবার" আশা দেওয়া হইতেছে, ইহাই কি তাহার পূর্ব্বাভাস? এ দিকে বর্ষার আর বিলম্ব নাই। বাঙ্গালায় ও বিহারে খনির শ্রমিকরা অনন্যকর্ম্মা হইয়া খনিতে কায করে না—কৃষিকার্য্যের অবসর-কালেই তাহা করে। বর্ষায় তাহাদিগের অনেকে জমি চাষ করিতে যাইবে। তখন মালগাড়ী পাইলেও কয়লা পাওয়া যাইবে না। এ বার দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়হেতু ও স্বাস্থ্যহানিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে শ্রমিকের অভাব—গ্রাম হইতে খনির জন্য তখন শ্রমিক সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। সময় থাকিতে যদি চাউল কলে আবশ্যক কয়লা দিয়া ধান্য হইতে চাউল করা না হয়, তবে কি বাঙ্গালার লোক ধান্য খাইয়া বাঁচিবে? বাঙ্গালায় সুরাবর্দ্দী মার্কা চাউলে অনেক ক্ষেত্রে ধান্যের পরিমাণ এখনই উপেক্ষণীয় নহে; পরে কি অর্দ্ধেক হইবে?

অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে চাউল বাঙ্গালায় আসিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবার কাযেও বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনবহিত হইয়াছেন। অথচ বাঙ্গালায় এ বার যে ধান্য হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর (দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়ের পরে) চাউলের অভাব হইবার কথা নহে। সে ধান কি রেল-ষ্টেশনে ও গুদামে পচাইয়া বাঙ্গালীকে চড়া দামে আমদানী করা নিকৃষ্ট চাউল দেওয়া হইবে?

কৃষির উন্নতি

লোক দেখিয়া শিখে আর ঠেকিয়া শিখে। আমাদিগের দেশের সরকার দেখিয়া শিখেন না। তাঁহারা যদি দেখিয়া শিখিতেন, তবে গত মহাযুদ্ধে তাঁহাদিগের স্বদেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও কৃষিপ্রাণ ভারতবর্ষকে খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী রাখিতেন না! বাঙ্গালায় আমরা ব্রহ্ম হইতে আনীত চাউলের উপর কতকটা নির্ভর করিতেছিলাম। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বিলাতে যে ভাবে অধিক খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে বিলাতে উৎপন্ন খাদ্য-দ্রব্যে বিলাতের লোকের দুই-তৃতীয়াংশের উদর-পূর্ত্তি হয়। আর যে বাঙ্গালায় এখনও বহু আবাদ-যোগ্য ভূমি পতিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালা আজও খাদ্য-দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে।

যে সময় আমরা এই অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি এবং তাহার ফলভোগ করিতেছি, সেই সময় কেন্দ্রী সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার যোগেন্দ্র সিংহ গত ১লা এপ্রিল ডেরাডুনে বলিয়াছেন, যদি গোবর জ্বালানীরূপে ব্যবহার না করিয়া সাররূপে ব্যবহার করা যায়, তবে ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বর্দ্ধিত হইতে পারে।

তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন, এই বিষয়টি মৌলিক আবিষ্কার,

তবে তিনি ভ্রান্ত। এ দেশের কৃষকগণ সারের প্রয়োজন বিশেষরূপ অবগত আছে। আজ অনেক দিন হইল বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রহিমতুল্লা সিয়ানী বলিয়াছিলেন, এ দেশের কৃষক সারের প্রয়োজন বুঝে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু যেহেতু সে সার ব্যবহার করিতে পারে না।

গোবর যে সাররূপে ব্যবহার করিলে উপকার হয়, তাহা এ দেশের কৃষক জানে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার লিখিয়াছিলেন—

(১) এ দেশে কৃষিকার্য্যের প্রথম অন্তরায় গবাদি পশুর সংখ্যাল্পতা ও দৌর্ব্বল্য। অধিকাংশ স্থানে বৎসরে ৬ সপ্তাহ ঐ সকল পশু আবশ্যক আহার পায় না। গ্রীষ্মে যখন তৃণাদি শুকাইয়া যায় সে সময়ের জন্য কোন বিশেষ পশুখাদ্যের চাষ করা হয় না—গাছের পাতা প্রভৃতি দিয়া সেগুলিকে কোনরূপে জীবিত রাখা হয়। তাহার পরে বর্ষা আসিলে—যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে—সপ্রাচুর্য তৃণাদি দেখা দেয়—তখন অনাহার-দুর্ব্বল পশুগুলি সেই অপরিপক্ক খাদ্য অত্যধিক পরিমাণে আহার করিয়া নানা রোগে পীড়িত হইয়া মরিয়া যায়। বৎসরে ইহাতে এক কোটিরও অধিক পশুর মৃত্যু হয়।

(২) কৃষির দ্বিতীয় অন্তরায় সারের অভাব। যদি অধিক সংখ্যক গবাদি পশু থাকিত, তবে সারও অধিক পাওয়া যাইত। আবার জ্বালানীর অভাবে লোক গোবর জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়—"the absence of firewo. compels the people to use even the scanty drping of their existing cattle for fuel"—ফলে রাসায়নিক উৎপাদন না করিয়া জমির উর্ব্বরতা নষ্ট করে।

তখনই তিনি বলিয়াছিলেন—সরকার এখন খাদ্যের চাষে সেচের খালের জলের দাম কমাইবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। আর—

যদি প্রতি গ্রামে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা হয়, তবে যে কেবল জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে তাহাই নহে, পরন্তু তাহাতে সে ও বৃক্ষের ছায়ায় যে তৃণাদি পাওয়া যাইবে, তাহাতে ঐ সপ্তাহ কাল গবাদি পশুর খাদ্য পাওয়া সম্ভব হইবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রায় এই ৬০ বৎসর তাহার ব্যবস্থা হয় নাই। যখন হাণ্টার ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তখন যোগেন্দ্র সিংহের বয়স ৩ বৎসর; আর আজ তিনি বৃদ্ধ। ইহার মধ্যেও সরকার ঐ কায করেন নাই। আজ সার যোগেন্দ্র সিংহ প্রস্তাব করিতেছেন—ভারতবর্ষে এক লক্ষ বর্গ-মাইল স্থানে রোপণ করা হইবে।

তিনি যাহা বলিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে উপকার হয়; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে কি না, সে বিষয়ে অতীতের অভিজ্ঞতায়—আমরা যদি সন্দেহ প্রকাশ করি, তবে আশা করি, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

—

হাতের তাঁতের কাপড় ও বিক্রয়কর

বাঙ্গালায় যে সচিবসঙ্ঘ চাকরী বাড়াইয়া আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সচিবসঙ্ঘ যে বিক্রয়-করের পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ, তাঁহাদিগের অবলম্বিত নীতির সার কথা—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" যে সময় গত ১০ মাসের দারুণ দুর্ভিক্ষপাকে জনগণ নিঃস্ব—সেই সময়ে বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করা যে "মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা"—তাহা যে সচিবসঙ্ঘ বুঝে না—তাহা বলা যায় না! তবে তাঁহাদিগের এখন "গরজ বড় বালাই।"

বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—অন্ততঃ হাতের তাঁতের কাপড় এই কর হইতে অব্যাহতি লাভ করুক। কিন্তু অর্থসচিব তাহাতেও সম্মত হইতে পারেন নাই। এ দেশে কৃষির পরেই শিল্পমধ্যে হাতের তাঁত-শিল্পের স্থান। সরকারী হিসাব অনুসারেই ইহার আয়ে প্রায় ২ লক্ষ লোক (এক লক্ষ ৯৭ হাজার ৬ শত ১১ জন) জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইতঃপূর্ব্বে বিদেশী কাপড় অপেক্ষা বিদেশী সূতায় শুল্ক শতকরা ১২ টাকা হ্রাস করায় এই শিল্পের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে সুবিধাও নাই। কারণ, বিদেশী সূতার শতকরা ৫৮ ভাগ জাপান হইতে আসিত; এখন আর কোন দেশ হইতেই তাহা আসা বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটেন হইতে শতকরা যে ১৩ ভাগ আসিত, তাহাও আর আসিতেছে না। যখন মাদ্রাজে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন মাদ্রাজী সরকার কলের কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর বজায় রাখিয়া হাতের তাঁতের কাপড়কে তাহা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, এ বার বাঙ্গালার গভর্ণর সে দিন যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"ভূমিশূন্য সম্প্রদায়ের, বিশেষ ধীবর ও কুম্ভকারদিগের সাহায্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" তিনিও কৃষির পরেই যে শিল্পে সর্ব্বাধিক লোকের অন্নসংস্থান হয়, তাহার উল্লেখ করেন নাই! ইহা অবশ্য অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন তন্তুবায়দিগকে সাহায্যদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের কোন বিষয় বিশেষ ভাবে জানিবার বা বুঝিবার বালাই নাই। সম্প্রতি 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ আপনাদিগকে মসলেম লীগ সচিবসঙ্ঘ নামে পরিচিত করেন; কিন্তু বাঙ্গালার হাতের তাঁতশিল্পীদিগের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সকল শিল্পীর জীবিকার উপায় যে এই ব্যবস্থায় বিপন্নই হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার অবসরও এই সচিবসঙ্ঘের হয় নাই। অবশ্য সচিবগণ সচিবের বেতনে ও ভাতায় ধনী—মুসলমান তন্তুবায়গণ দরিদ্র। সচিবরা দরিদ্র সহধর্ম্মীদিগকে পিষ্ট করিয়া আরও ধনী হইতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বিধা বা লজ্জা নাই। কিন্তু এই যে লক্ষাধিক মুসলমান তন্তুবায় ইহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে, তবে কি সেই প্রতিবাদের ফুৎকারেই বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের জল-বিম্ব ফাটিয়া যায় না?

১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দেও হাতের তাঁতের ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫১ হাজার পাউণ্ড সূতা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। ইহাতেই হাতের তাঁত শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। এখন বিদেশ হইতে সূতা আমদানী প্রায় বন্ধ হওয়ায়—সূতার দাম বাড়িয়াছে ও সূতা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাহাতে এই শিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই অসাধারণ। তাহার উপর লোকের হিতবিষয়ে অনবহিত—নির্ম্মম সচিবসঙ্ঘের ব্যবস্থায়, এই শিল্পের আরও যে অনিষ্ট সাধিত হইল, তাহাতে তাহার

সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অবশ্য তাহাতে সচিবসঙ্ঘের ইষ্টাপত্তি নাই। চৈত্র-সংক্রান্তিতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হয়ত হাতের তাঁতের মোটা কাপড় রক্ষা পাইবে। এই পর্য্যন্ত।

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালায় এ বার "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা"। তদ্ভিন্ন কেন্দ্রী সরকার কলিকাতা ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আজও বাঙ্গালায় চাউলের মূল্য দরিদ্রের পক্ষে দুর্ম্মূল্য। অস্থায়ী গভর্ণর হইয়া সার টমাস রাথারফোর্ড যে আশা করিয়াছিলেন, জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত চাউলের মূল্য ১০ টাকা মণ হইবে, সে আশা নিরাশায় লুপ্ত হইয়াছে। গত ২৯শে চৈত্র বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন :—

"সরকারের চাউলের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস করিবার ঘোষিত নীতি অনুসারে ১৫ই এপ্রিল হইতে চাউল ও ধান্যের নিয়ন্ত্রিত সর্ব্বোচ্চ মূল্য আরও হ্রাস করা হইবে।

"বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়া ও মালদহ জিলায় চাউলের মূল্য (পাইকারী ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে) প্রতি মণ সাড়ে ১৩ টাকা এবং কৃষকদিগের নিকট হইতে প্রতি মণ ১৩ টাকা আছে। এই মূল্য ঐরূপই থাকিবে। তবে ধানের মূল্য যথাক্রমে ৭ টাকা ১২ আনা ও ৭ টাকা ৮ আনা হইবে। অন্যান্য জিলায় পাইকারী ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রতি মণ ১৪ টাকা ১২ আনা এবং কৃষকদিগের নিকট হইতে ১৪ টাকা দরে বিক্রয় হইবে। ধান্যের মূল্য যথাক্রমে ৮ টাকা ৪ আনা ও ৮ টাকা।

"এই মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে চাউল বা ধান্য বিক্রয় করিলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে। তবে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে চাউল ও ধান্য বিক্রয় করা চলিবে। নূতন মূল্য পরে আরও হ্রাস করা হইবে।"

এই মূল্যহ্রাস যৎসামান্য। আমরা জানি, ফরাসীতে একটি কথা আছে, আরম্ভই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা সঙ্গত কি না, সন্দেহ। কারণ, যাহারা গত বৎসর নিঃস্ব হইয়াছে, এ বৎসরও রোগজীর্ণ হওয়ায় জীবিকার্জ্জনোপযোগী শ্রম করিতে অক্ষম, তাহারা কি করিবে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। আমরা আশা করি, বাঙ্গালা সরকার ও ভারত সরকার তাহা বিবেচনা করিবেন। যদিও ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বাঙ্গালায় অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—খাদ্য-সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের, তথাপি লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হইয়া আসিয়া সে মত অগ্রাহ্য করিয়া এ দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট যদি সেই মত গ্রহণ করিতেন, তবে যে বাঙ্গালায় দুর্দ্দশা চরমে উপনীত হইতে পারিত না, সে বিশ্বাস আমাদিগের আছে। যখন লর্ড লিন্‌লিথগোকে বাঙ্গালায় আসিয়া অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার সফরের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহার আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না!

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি :—

(১) গত ৪ঠা এপ্রিল রেলওয়ে বোর্ড এক সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়, লোক যেন যথাসম্ভব অল্প রেলে ভ্রমণ করেন। কারণ খাদ্যদ্রব্যাদি ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য অধিক গাড়ী প্রয়োজন। অনেক লোকের জীবন এখনও বিপন্ন।

(২) ৬ই এপ্রিল ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে বলেন, যত চেষ্টাই কেন করা হউক না, ভারতে যে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতে সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যদি চাষের সময় প্রাকৃতিক অবস্থা প্রতিকূল হয়, তবে যে অভাব হইবে না, এমনও বলা যায় না।

যখন এই সকল কথা শুনা যাইতেছে—রেলওয়ে বোর্ড ও ভারত-সচিবও যখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, তখন যে বাঙ্গালা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময় কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙ্গালায় বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ত্রুটির সংবাদ কেন্দ্রী সরকারের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং এমনও না কি শুনা গিয়াছে যে, ভারত সরকার কলিকাতা ও শিল্পকেন্দ্র অঞ্চলের জন্য যে খাদ্য-শস্য পাঠাইয়াছেন, বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ তাহার কিয়দংশ স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সরকার এই সংবাদ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালার লোকের ঔৎসুক্য যে উৎকণ্ঠাসীমায় উপনীত হওয়া অনিবার্য্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সরকারী সাহায্যের এক দিক

বাঙ্গালা সরকার দুর্গতদিগের সাহায্যদান-কার্য্যে কি করিয়াছেন, তাহার একটা হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, গত ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বরাদ্দ—

কৃষি ঋণ	··· এক কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭০	টাকা
খয়রাতী দান	··· ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার ১ শত ৫৯	"
টেষ্ট রিলিফ	··· এক কোটি ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ৫৩	"

এই টাকা কোন্ তারিখ হইতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে কি? কারণ, বাঙ্গালায় যে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-নাশ হইয়াছে, তাহা সরকারও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অবশ্য অনাহারে মৃতের সংখ্যা কখনই নির্ভরযোগ্য ভাবে জানা যাইবে না। কারণ—বাঙ্গালা সরকার কবুল জবাব দিয়াছেন—তাঁহারা যে ভাবে মৃত্যু লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে অনাহারে মৃত্যুর কোন হিসাব রাখা হয় না। অবশ্য এ বারও বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ সেরূপ হিসাব রাখিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, বিলাতে ভারত-সচিব প্রথমে বলিয়াছিলেন, অনাহারে মৃতের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে না। তাহার পরে তিনি উহা প্রায় ৬ [illegible] নামাইয়াছেন। ও দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ যে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ হইবে।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ১০ লক্ষ মৃত্যুর সংবাদ ভারত-সচিব কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রশ্নের উত্তর সরল ভাবে দেওয়া হয় নাই। কেবল ভারত সরকার ঐ সংবাদ

সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাহাতেই মনে হয়, সংবাদের উৎস বাঙ্গালায়। এমন কি হইতে পারে যে, বাঙ্গালা সরকার "ষ্ট্যাটিসটিকস" বিভাগকে আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ঐরূপ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন?

এই অনুমান যদি করা যায়, তবে জিজ্ঞাস্য—তাহার পরে কিরূপে সে সংবাদ বর্জ্জিত হইল? গত বার লোকসংখ্যা-গণনায় গ্রামে গ্রামে যে লোকসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই সরকারী দপ্তরে আছে। এখন প্রতি ১০খানি গ্রামের মধ্যে একখানিতে লোকসংখ্যা গণনা করিলেই যে নির্ভরযোগ্য হিসাব করা যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সরকার তাহা করিবেন কি?

সরকার যে "টেষ্ট রিলিফ" কাযের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোথায়—কবে আরম্ভ হইয়াছে? বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর বলিয়াছিলেন, বর্ষা আসিয়া পড়ায় সে কাযের উপায় করা অসম্ভব। কেন যে তাহার পূর্ব্বে সে কায আরম্ভ করা হয় নাই, তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু তিনি যদি একটু চেষ্টা করিতেন, তবে জানিতে পারিতেন, বর্ষাকালেও সে ব্যবস্থা করা পূর্ব্বে হইয়াছে; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে এ বারও করা যে যাইত না এমন নহে।

যথাকালে ও যথাযথ ভাবে "টেষ্ট রিলিফ" কায করিলে তাহাতে যে বাঙ্গালার স্থায়ী উপকার হইতে পারিত, তাহা আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তাহা যে হয় নাই, তাহার কারণ—

অজ্ঞতা? না—

উপেক্ষা?

এখন কিরূপ কার্য্যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহা কি লোককে জানান হইবে? এ সব কায কোন বিভাগের অধীনে হইতেছে এবং সে বিভাগের সচিব কে, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল অবশ্যম্ভাবী।

সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ

কথায় বলে, ঘর যখন দগ্ধ হয়, তখন পক্ষীবিশেষ সানন্দে ধূম সম্ভোগ করে। যে সময় বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বহু লোকক্ষয় করিয়া প্রশমিত হইলেও—লোকের রোগ ও দারিদ্র্যহেতু দুর্দ্দশার অন্ত নাই, সেই সময়েও যে বাঙ্গালার সচিবগণ—ব্যবস্থা পরিষদের এক জন সদস্যের [illegible] মামলা নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কলিকাতা হাইকোর্ট রায়ে বলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও একটি মামলা-সম্পর্কে জানা গিয়াছে। সচিবসঙ্ঘ ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগকে সার্কুলার দিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন—যাহারা অন্নাভাবে বা অন্নাভাবের আশঙ্কায় অপরাধ করে, তাহাদিগকে যেন দণ্ড দান করা না হয়। এই সচিবসঙ্ঘের প্রধান-সচিব বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালা হইতে যাইয়া গয়ায় পাকিস্থান সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন।

সে সভায় তিনি মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাকিস্থান দাবী করিতেই প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বৃটেন ভারতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এখন বৃটেনকে [illegible]দিগের সব দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। যখন [illegible], তখন যাহাতে কেহই ভারতের মুসলমানদিগের (অবশ্য তিনি মুসলমান বলিতে মুসলেম লীগের লোককেই বুঝেন) দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারেন তাহা করিতেই হইবে।

কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কাযের সময় ছায়ায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে এবং যখন দিনশেষ হয় তখন যাহারা কায করিয়াছে তাহাদিগের সহিত পারিশ্রমিক বিভাগ করিবার দাবী করে। খাজা সার নাজিমুদ্দীন-প্রমুখ ব্যক্তিরা সেই দলের। তাঁহারা কি করিয়াছেন?

তাঁহারা যে বাঙ্গালার দুর্দ্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাঙ্গালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা—মুসলমান কৃষক, মুসলমান তন্তুবায় প্রভৃতি যে তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ উপকার লাভ করে নাই, তাহা তাহারাও আজ বুঝিতেছে। আমরা জানি, খাজা সার নাজিমুদ্দীন যখন তাঁহার সতসচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর সহিত যশোহর ও নদীয়ায় সফরে গিয়াছিলেন, তখন মুসলমানরাই বলিয়াছিলেন—রেল-ষ্টেশনে যে বস্তা বস্তা ধান পড়িয়া পচিতেছে, তাহার জন্য কে দায়ী? তাঁহারা বলিয়াছিলেন—ভারত সরকার। কিন্তু ভারত সরকার দেখাইয়া দিয়াছেন, অপরাধ বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের। তবে এই সচিবরা লজ্জাজয়ী, সুতরাং অভয়। সেই সময় প্রকাশ্য সভায় কোন কোন মুসলমান বলিয়াছিলেন, যখন লোক অনাহারে মরিতেছিল—তখন হিন্দু ও মুসলমান একযোগে লোকের জীবনরক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে; তখন মসলেম লীগের কর্ত্তারা কোথায় ছিলেন? যদি সচিবগণ সত্য কথা বলিতে পারিতেন, তবে বলিতেন—তাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতেছিলেন—দরিদ্র মুসলমানদিগের দিকে চাহিবার সময় ছিল না।

বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান যদি গত দুর্ভিক্ষে অনাহারে একসঙ্গে মরিয়াও মুষ্টিমেয় মসলেম লীগপন্থীর কথায় ভুলিয়া সাম্প্রদায়িকতার বশবর্ত্তী হয়েন—হিন্দু ও মুসলমান যদি একযোগে কায করিয়া বাঙ্গালার উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতে না পারেন, তবে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশই অনিবার্য্য। এই সচিবসঙ্ঘের কার্য্যকালেই বাঙ্গালায় কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির মনে আস্থা লোপ পাইয়াছে। আজ যখন কেন্দ্রী সরকার ও বাঙ্গালার গভর্ণর বলিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে লোকের মনে আস্থা পুনরায় গঠিত করা প্রয়োজন, তখন কি লোক এই সচিবদিগের গত ১০ মাস কালের কায স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কল্যাণবিরোধী বলিয়াই বিবেচনা করিবে না? বাঙ্গালা আজ বিপন্ন, বিষণ্ণ—তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা বিঘ্ন—সে বিঘ্ন দলিত করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানকে দৃঢ়পদে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আভাস!

আজ পৃথিবীর নানা দেশে যুদ্ধের পর পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি। এই সময় বাঙ্গালায়ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে—তবে সে যুদ্ধের পরে নহে—দুর্ভিক্ষের পরে। যুদ্ধ আজ বাঙ্গালার সীমান্তে—তাহার ফল এখনও অনিশ্চিত; কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলে সমাজে, সম্পত্তিতে, মানুষের মনে যে ফল ফলিয়াছে, তাহার জন্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ইতোমধ্যেই আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন ছিল।

... যোজনায়ক অনেকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ব... ...ত কার্য্য বিরূপ হইতেছে, ...তাঁহার পরিচয় গত ... স্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে সচিবপক্ষের কথায় ... সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী স্বীকার ক... ...সে বহু স্ত্রীলোক অসহায় হইয়া পড়িয়াছে— ... অন্নার্জ্জনকারীর মৃত্যু হইয়াছে ; কেহ বা সে ... করিতে বাধ্য হইলেও দৈহিক দৌর্ব্বল্য-হেতু ... রিতে অক্ষম ; কাহারও বা গৃহ আর নাই। এই ... পথের পথিক হইতেছে এবং কতকগুলি লোক ... লইয়া পাপের ব্যবসা চালাইতেছে।

...সমাজের এই ভয়াবহ অবস্থা নিবার... কর্ত্তব্য, ...তা সচিবরা অস্বীকার করিতে পারেন ... ...কার নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, যে স্থানেই ... স্ত্রীলোক দেখা যাইবে, সেই স্থানেই এক ... স্থাপিত করিতে হইবে। বিলাতে "... পরিচালিত হয় কতকটা সেই ভাবে এই ... চালিত হইবে—যাহাতে স্ত্রীলোকগণ (নৈতিক) ... থাকিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আশ্রম পরিচাল... ...ন করা হইবে এবং কার্য্য-পরিদর্শনার্থ সমিতি নিযুক্ত করাও হইবে। যে সকল ...র্গত স্ত্রীলোকের গৃহ আছে, তাহারা কর্ম্মক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে গৃহেই সাহায্যলাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।—ইত্যাদি।

কাগজে-কলমে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয়ত হয় নাই। যে সচি...ন্দ্রে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ও শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আছেন, সেই সচিবসঙ্ঘের এই পরিকল্পনাও অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বাঙ্গালা সরকার আশ্রম প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—এই মাত্র ; এখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বলা হইয়াছে—"যথাসম্ভব শীঘ্র" নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করা হইবে।

গত ১০ মাসে যাহা হয় নাই, তাহা হয়ত পরবর্ত্তী ১০ মাসে হইবে। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যত নারী অন্নাভাবে পাপ-পথের পথিক হইয়াছে বা হইবে, তাহাদিগের নৈতিক দুর্গতির জন্য কাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা কি সচিবরা বলিতে পারেন ?

সচিবপক্ষের দ্বারা বাঙ্গালায় সমাজে যে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টিত হইয়াছে, তাহা কি যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে ? সংসারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি মৃত, গৃহিণী অনাহারজনিত দৌর্ব্বল্যহেতু আপনাকে ও সন্তানকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম, গৃহ নাই—বিক্রয় করিয়া অন্নসংস্থান করিতে হইয়াছে—সম্মুখে অনাহারে মৃত্যু, আর পাপের প্রলোভন ! এই অবস্থাও সম্ভব হইয়াছে এবং সচিবসঙ্ঘ সরকারের অর্থ ও সামর্থ্য লইয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই। ইহাই যথেষ্ট লজ্জার—কলঙ্কের কথা। তাহার পরে আবার আশ্রম প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে, সে নির্দ্দেশ এখনও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। কত দিনে তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে, তাহারও কোন আভাস নাই।

ইহাই যদি দুর্ভিক্ষাক্রান্ত বাঙ্গালার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আভাস হয়, তবে সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বরূপ কি, তাহা যেমন—সে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের দ্বারা হইতে পারে কি না তাহাও তেমনই বাঙ্গালার লোকের চিন্তার বিষয়।

উপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী

গত ২৫শে ফাল্গুন দোল-পূর্ণিমার দিন লৌহজঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যবসায়ী রায় সাহেব উপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জে শশিমোহন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা স্থানে লোককে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান জন্য টিউবওয়েল করিয়া গিয়াছেন। এ বার দুর্ভিক্ষে দুর্গতদিগের জন্য তিনি ৫ হাজার টাকার বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করিয়াছেন। তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া লৌহজঙ্গ হাইস্কুল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। উপেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে এক জন উদার-হৃদয় দানশীল ব্যক্তির তিরোভাব হইল।
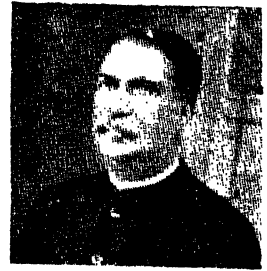
উপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী

ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গত ...১শে চৈত্র মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ রাজনীতিক কর্ম্মী ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় কংগ্রেস-জাতীয় দলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাঠদশাতেই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি একাধিক বার কারাবরণ করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্যের সহিত জাতীয় দল গঠনে সাহায্য-নিয়োগ করেন। ধীরেশচন্দ্র তাঁহার বন্ধু শ্রীযুত চপলা ভট্টাচার্য্যের সহিত একযোগে ইংরেজীতে কংগ্রেসের উদ্ভব-বিবরণ বিবৃত করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে এ দেশে গত অর্দ্ধ শতাব্দী কালের রাজনীতিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও গতি দেখান হইয়াছে। ধীরেশচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু আমাদিগের বিশেষ বেদনার কারণ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত